

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

সর্বজনীন উপাসনালয়



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।**

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

'উদ্বোধন'-এর বক্তব্য

বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ এই বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখছেন, টেলিফোন করছেন, কেউ কেউ আবার সাক্ষাতে যোগাযোগ করছেন। এসম্পর্কে আমরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক সাধারণকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে (উদ্বোধন কার্যালয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা কোন শাখা-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপনগুলি ভিন্ন) উদ্বোধন কার্যালয়ের বা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্ক নেই।—সম্পাদক, উদ্বোধন

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র

৯৮তম বর্ষ মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬ ১ম সংখ্যা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □ ১০০০ টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়) : প্রথম কিস্তি কমপক্ষে ১০০ টাকা □ বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য □ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ □ ৫৬ টাকা □ সডাক □ ৬৬ টাকা □ আলাদাভাবে কিনলে □ বর্তমান সংখ্যার মূল্য □ ৮ টাকা



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৮তম বর্ষ : মাঘ ১৪০২—পৌষ ১৪০৩/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৬

☐ **মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে আগামী বর্ষের (৯৮তম বর্ষ : ১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। অবিলম্বে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। গত বছর যাঁদের টাকা দেরিতে কার্যালয়ে এসেছে তাঁদের অনেকে পত্রিকা দেরিতে পেয়েছেন, আবার টাকা দেরিতে জমা পড়ায় অনেককে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।**

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : ৫৬ টাকা** ☐ **ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : ৬৬ টাকা**

☐ **বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩০০ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬০০ টাকা (বিমানডাক)** ☐ **বাংলাদেশ—১২০ টাকা**

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) : ১০০০ টাকা

☐ **আজীবন গ্রাহকমূল্য** (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ১০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ৯০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৩০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার** যোগে টাকা পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"** এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।** পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের **প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট** পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ **কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত **প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ** (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' **কলকাতার কলুটোলা R.M.S-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়।** ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ঐবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশে ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের **একমাস পর্যন্ত** অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে** (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের **২৪ তারিখ/পরবর্তী** বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) **পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে** কার্যালয়ে জানালে **ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি** পাঠানো হয়। **দুমাস পরে জানালে** সংশ্লিষ্ট সংখ্যার **ডুপ্লিকেট কপি** পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

☐ **গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।**

☐ **আশ্বিন বা শারদীয়া** সংখ্যার **ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না।** সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, **সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না।** কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে **সংখ্যাটির অতিরিক্ত কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।**

☐ **যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা **ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ** থেকে **বিতরণ শুরু হয়।** স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। **শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।**

উদ্বোধন

দিব্য বাণী

মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬

☐ আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে তাহাদের বেশির ভাগ দূরীভূত হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নরনারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা বিশেষ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস।

☐ যদি কোন ব্যক্তি দিবারাত্র নিজেকে দীন দুঃখী হীন ভাবে, সে হীনই হইয়া যায়। তুমি যদি বল—'আমার মধ্যেও শক্তি আছে', তোমার ভিতর শক্তি জাগিবে ; আর যদি তুমি বল—'আমি কিছুই নই', ভাব যে, তুমি কিছুই নও, দিবারাত্র যদি ভাবিতে থাক যে তুমি কিছুই নও, তবে তুমিও 'কিছু না' হইয়া দাঁড়াইবে। এই মহান তত্ত্বটি তোমাদের মনে রাখা কর্তব্য। আমরা সেই সর্বশক্তিমানের সন্তান, আমরা সেই অনন্ত ব্রহ্মাগ্নির স্ফুলিঙ্গ। আমরা 'কিছু না' কিরূপে হইতে পারি ? আমরা সব করিতে প্রস্তুত, সব করিতে পারি, আমাদিগকে সব করিতেই হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণের হৃদয়ে এই আত্মবিশ্বাস ছিল, এই আত্মবিশ্বাসরূপ প্রেরণাশক্তিই তাঁহাদিগকে সভ্যতার উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরূঢ় করাইয়াছিল।

☐ বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস ! নিজের উপর বিশ্বাস ! ঈশ্বরে বিশ্বাস ! ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়। যদি তোমার পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার এবং বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সকল দেবতার আমদানি করিয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতেই বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি তোমার আত্মবিশ্বাস না থাকে, তবে তোমার কখনই মুক্তি হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও ও বীর্যবান হও। ইহাই এখন আমাদের আবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন' জাতির উদ্বোধক

'উদ্বোধন' ৯৮তম বর্ষে পদার্পণ করিল। সামনে মাত্র আরেকটি বছর। তাহার পরেই আসিবে সেই ঐতিহাসিক মাহেন্দ্র মুহূর্ত। 'উদ্বোধন'-এর শততম বর্ষে পদার্পণ। বিগত দীর্ঘ সাতানব্বই বছর ধরিয়া স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-শরীর, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-কায়া এবং শ্রীমা সারদাদেবীর উদ্ঘোষিত সান্নিধ্য-তনু 'উদ্বোধন' দেশ ও সমাজের সেবায় আপনাকে নিবেদিত রাখিয়াছে। তাহার যাত্রা কখনও খরস্রোতা নদীর মতো সাময়িক উচ্ছ্বাসতরঙ্গে কিছুদূর গিয়া হারাইয়া যায় নাই। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ধীরে ধীরে একটির পর একটি দশক সে অতিক্রম করিয়াছে। আজও সগৌরবে তাহার গতিকে সে শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাই নহে, দেশীয় ভাষায় সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর প্রায় সমস্ত সাময়িকপত্রের অকালমৃত্যু, মড়ক অথবা রক্তশূন্যতার ধারাবাহিকতায় আজও তাহার শরীরে যৌবনের সজীবতা ও প্রাণশক্তির প্রকাশ অভ্রান্ত। 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমবর্ধমান। ইহার পিছনে রহিয়াছে 'মহান ত্রয়ী'র আশীর্বাদের শক্তি, যাহা তাহাকে আরও বহুশতবর্ষ দেশ ও সমাজের সেবায় উত্তরোত্তর সামর্থ্যে উৎসর্গীকৃত রাখিবে।

'উদ্বোধন' যে স্বামীজীর 'বাণী-শরীর' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 'ভাব-কায়া' সেবিষয়ে আলোচনা পূর্বে একাধিকবার 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় হইয়াছে, কিন্তু 'উদ্বোধন' যে শ্রীশ্রীমায়ের 'উদ্ঘোষিত সান্নিধ্য-তনু'—উহা বোধহয় বিশেষ উল্লিখিত হয় নাই। পাঠকদের বিষয়টি জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। ঘটনাটি হইলঃ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বরিশালের সুরেন্দ্রনাথ রায় একবার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মনে একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভাব প্রবল হয়। সেই আকাঙ্ক্ষা হইল—একটিবারের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শন। সেই আকুতি কাতরভাবে ব্যক্ত করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমাকে একটি পত্র লিখিলেন। তাঁহার অসুখের বৃত্তান্ত সবিশেষ লিখিয়া পত্রে তিনি প্রার্থনা করেন, মা যদি দয়া করিয়া বরিশালে একটিবার আসেন তাহা হইলে তাঁহার অন্তিম সাধটি পূর্ণ হইতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাইলে তিনি তাঁহার বরিশালে আসিবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন। উত্তরে মা নিজের একখানি ফটো এবং এক বছরের বাঁধানো 'উদ্বোধন' পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে জানান যে, তাঁহার পক্ষে তখনই অতদূরে যাওয়া সম্ভব হইবে না। তবে ভয় নাই। অসুখ সারিয়া যাইবে। তিনি যেন ফটোখানি দেখেন এবং 'উদ্বোধন' পাঠ করেন, তাহাতেই তাঁহার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য তিনি লাভ করিবেন। সুরেন্দ্রনাথ রায় নির্নিমেষ নয়নে নিত্য ফটোখানি দেখিতেন। 'উদ্বোধন' তিনি নিত্য পাঠ করিতেন। ফটো এবং 'উদ্বোধন' সর্বদা তাঁহার শিয়রে থাকিত। অল্পদিনের মধ্যে তিনি রোগমুক্ত হইয়া গেলেন। (দ্রঃ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩৯১, পৃঃ ৪৭৮)

নিজের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির পরিবর্তে নিজের ফটো এবং একবছরের বাঁধানো 'উদ্বোধন' পাঠাইয়া শ্রীশ্রীমা সুস্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার 'ছায়া' ও 'কায়া'য় যেমন পার্থক্য নাই, তেমনই পার্থক্য নাই তাঁহার এবং তাঁহার বাক্-প্রতিমা ও ভাব-তনু 'উদ্বোধন'-এর মধ্যেও। অর্থাৎ 'উদ্বোধন' ও তিনি অভেদ। 'উদ্বোধন' পড়িলে তাঁহারই সান্নিধ্যলাভ হয়।

সুতরাং 'উদ্বোধন' পত্রিকামাত্র নহে, 'উদ্বোধন' একটি ভাবাদর্শের, একটি ভাবান্দোলনের, একটি জীবনাদর্শের কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের বাণীকেই 'উদ্বোধন' নানা ভাবে ও ভাষায় মানুষের "ঘরে ঘরে" বিগত সাতানব্বই বছর ধরিয়া বহন করিয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে। কিন্তু ঐ কথা, ভাব ও বাণী কোন সম্প্রদায়বিশেষের নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষেরও নহে। উহা ভারতের শাশ্বত ও সনাতন কথা, ভাব ও বাণী। উহা ধর্মের কথা, ভাব ও বাণী। উহা আধ্যাত্মিকতার কথা, ভাব ও বাণী। যে-কথা, যে-ভাব ও যে-বাণীকে পৃথিবী রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের জীবনে ও সাধনায় সাকার হইতে দেখিয়াছিল, 'উদ্বোধন' তাহারই প্রচারের ব্রতে আত্মনিবেদিত। সে-অর্থে 'উদ্বোধন' দেশ ও সমাজের আলোকদূত, আলোর দিশারী।

'উদ্বোধন' উহার প্রাথমিক পরিচয়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র। ঐ পরিচয়েই উহার আত্মপ্রকাশ হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্য মাথায় রাখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ঐ পরিচয় এবং ঐ উদ্দেশ্য 'উদ্বোধন'-এর আপাত-পরিচয় এবং আপাত-উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দই সেকথা 'উদ্বোধন'-এর আবির্ভাব-লগ্নে স্বলিখিত 'উদ্বোধন-এর প্রস্তাবনা'য় সুস্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া

দিয়াছিলেন। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, 'উদ্বোধন' বর্তমান সমাজে ভারতের শাশ্বত ও সনাতন ঐতিহ্য ও সাধনাকে যেমন যুগোপযোগী ভাষায় ও ভঙ্গিতে উপস্থাপন করিবে, তেমনই সমাজবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেসমস্ত ভাব ও কর্মপদ্ধতি পাশ্চাত্যে কল্যাণকর বলিয়া পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হইয়াছে সেগুলিকেও গ্রহণ করিবার পরামর্শ দান করিবে। অনুকরণ নহে, সুস্থ অনুসরণের মাধ্যমে ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের চিন্তা, আদর্শ এবং কর্মের মেলবন্ধন ঘটাইতে হইবে। ভারতের শাস্ত্র, ভারতের আচার্যকুল প্রধানতঃ ত্যাগ এবং সত্যের সাধনার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। সাধারণভাবে মনে হয়, ঐহিক সমৃদ্ধির প্রশ্নটি ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যে যেন উপেক্ষিত। ঐহিক সমৃদ্ধির আগ্রহ আসে রজোগুণ হইতে এবং ত্যাগ ও সত্যের সাধনার মূলে থাকে সত্ত্বগুণ। ভারতের পরিবেশ, জলবায়ু, ঐতিহ্য সত্ত্বগুণের অনুকূল হওয়ার সুবাদে এদেশের অধিবাসীদের মানসিকতায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সত্ত্বগুণের ছদ্মবেশে তমোগুণের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। ফলতঃ, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কোটি কোটি মানুষের উপর ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিকতার নামে শোষণ চালাইবার সুযোগ পাইয়াছে। এইভাবে দেশব্যাপী যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের দুর্গের পর দুর্গ। ইহাতে সামগ্রিকভাবে জাতি হইয়া পড়িয়াছিল দুর্বল, বিগতবীর্য। ইহার ফলশ্রুতি বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করিবার অক্ষমতা এবং পরিণামে সহস্র বছরের দাসত্ব। এই ব্যাধির মূলকে ব্যক্তি অর্জুনের চরিত্রে শনাক্ত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আজ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। সত্ত্বের মুখোশে তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন অর্জুনের মগ্ন-চৈতন্যে আঘাত করিয়া তিনি বজ্রনাদে উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই আগ্নেয় আহ্বান: "উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ"—উঠ কৌন্তেয়, যুদ্ধের জন্য নিশ্চিতসঙ্কল্প হও। শ্রীকৃষ্ণের এই আহ্বান উপনিষদের আত্ম-উদ্বোধন ও সমন্বয়ের মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। গীতোক্ত ঐ অগ্নিবাণী হতোদ্যম অর্জুনের স্নায়ুতে, ধমনীতে সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল রজোগুণের দুর্বার তরঙ্গ। অর্জুনের উদ্বোধিত রজোগুণকে শ্রীকৃষ্ণ মিলিত করিয়াছিলেন অর্জুনের অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের সহিত। সত্ত্ব এবং রজোগুণের এই সম্মিলন ও মিশ্রণ কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে করিয়া তুলিয়াছিল অপরাজেয়—কুরুক্ষেত্রের নায়ক। কুরুক্ষেত্রের সেই নায়ককে মাধ্যম করিয়া সমকালীন ভারতের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ নির্মাণ করিয়াছিলেন মহাভারতের বনিয়াদ। পাঁচ হাজার বছর পর যখন শুধু একজন ব্যক্তিকে নহে, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতিকে তামসিকতা গ্রাস করিয়াছিল তখন যেন পুনর্বার "গীতার ভঙ্গিতে"ই স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চেষ্ট জাতিকে উদ্বোধিত করিতে উপনিষদের বীর্যমন্ত্রে জানাইলেন তাঁহার আগ্নেয় আহ্বান: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না।

"গীতার ভঙ্গিতে"—ভাবগত অর্থে নহে, আক্ষরিক অর্থেই। পাশ্চাত্য-প্রত্যাগত স্বামীজীকে মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া হল-এ সর্বসাধারণের পক্ষে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সমগ্র মাদ্রাজ শহরের মানুষ যেন সামিল হইয়াছিল সেই অভূতপূর্ব জনজোয়ারে। সহস্র সহস্র মানুষের সমাগমে বিরাট ভিক্টোরিয়া হলে সভার অনুষ্ঠান চালানো অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, কানায় কানায় ভর্তি ভিক্টোরিয়া হলের বাহিরে স্বামীজীকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অস্থির উন্মাদনায় প্রতীক্ষা করিতেছিল সহস্র সহস্র মানুষ। হলের মধ্যে আয়োজিত সভায় সংবর্ধনার উত্তর দিতে গিয়া স্বামীজী শুনিতে পাইলেন হলের বাহিরে অগণিত অধৈর্য মানুষের গর্জন: "খোলা মাঠে সভা হউক, খোলা মাঠে সভা হউক।" জনতার সেই উন্মত্ত গর্জন-ধ্বনি হলের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছিল। স্বামীজী বুঝিলেন, এই অবস্থায় হলের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। তিনি বলিলেন: "অধিকাংশ মানুষ হলের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। আমি জনগণের ভিতর হইতে আসিয়াছি, আমি জনগণের জন্যই প্রচারক, আমি জনগণেরই কর্মী—আমার প্রাণ আমাকে আহ্বান করিতেছে ওখানেই।"

স্থির হইল খোলা মাঠে সভা হইবে। স্বামীজী হল হইতে বাহির হইয়া তাঁহার ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন। কোচবক্সে দাঁড়াইয়া সেই বিশাল জনতার সামনে তিনি বক্তৃতা শুরু করিলেন। এ যেন রথের উপর দাঁড়াইয়া অর্জুনের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের গীতা-ভাষণ। সাহেবী পত্রিকা 'মাদ্রাজ মেল' স্বামীজীর বক্তৃতার সম্পূর্ণ প্রতিবেদন উপস্থাপন করিতে গিয়া লিখিয়াছিল:

"স্বামীজী বলিলেন, 'বলা হয়—মানুষ যাহা স্থির করে, ঈশ্বর তাহা বরবাদ করিয়া দেন। এখানে স্থির হইয়াছিল সংবর্ধনা-পত্রগুলি পাঠ এবং তাহাদের উত্তর প্রদান করা হইবে ইংরেজী পদ্ধতিতে ("in the English fashion"), কিন্তু ঈশ্বর তাহাতে বাদ সাধিলেন। আমি

এখন আমার চতুর্দিকে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে গীতার ভঙ্গিতে ("in the Gita fashion") রথে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছি।... বলিতে বলিতে আমার উন্মাদনা আসিতেছে, যাহা বলিতে যাইতেছি তাহাতে আমার মধ্যে শক্তি ভর করিতেছে।' " (দ্রঃ 'মাদ্রাজ মেল', ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭)

উত্তেজনায় অস্থির অন্ততপক্ষে দশ হাজার মানুষের জমায়েতে মাইকহীন সেই ভাষণ স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণগোচর হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রোতৃবৃন্দের তুমুল উদ্দীপনায় স্বামীজীকে তাঁহার ভাষণ সেদিনের মতো শেষ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু "গীতার ভঙ্গি"তে আবির্ভূত নূতন যুগাচার্য সেদিন সত্যিই আনিয়া দিয়াছিলেন নিদ্রিত ভারতবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ। সেই জাগরণ জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির। সেই জাগরণ সমন্বিত ধর্ম ও কর্মের, যোগ ও ভোগের, সত্ত্ব ও রজঃ গুণের, স্থিতি ও গতির।

ইহার ঠিক দুই বছর পরে সেই জাগরণের বার্তাকেই তিনি বাঙালীর "ঘরে ঘরে" পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বাছিয়া লইয়াছিলেন 'উদ্বোধন'-কে। 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে মন্দ্রিত হইয়াছিল নূতন যুগাচার্যের পাঞ্চজন্যের বজ্রনাদ। স্বামীজীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল 'উদ্বোধন' ঘটাইবে বাঙালীর জীবনে নূতন শক্তির উদ্বোধন। 'উদ্বোধন' হইবে জাতির উদ্বোধক। স্বামীজীর সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করিবার ব্রতে 'উদ্বোধন' আপনাকে অর্পণ করিয়াছে।□

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণচলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবীর মূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে "যত মত তত পথ"—সমন্বয়ের এই মহাবাণী প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য— মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দূর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্ত কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"

—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ভর্তিস্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ত্রিনিটি শিল্পিগোষ্ঠী

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেব রায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

ভাষণ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম প্রেসিডেন্ট। সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে যাকে 'রুল' (rule) করা, শাসন করা বলে, সেরকমভাবে তিনি সংঘকে চালাতেন না। বেশির ভাগ সময়ই তিনি মৌন থাকতেন, কথা কম বলতেন। তাঁর নেতৃত্বে সংঘ এইভাবে চলেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাকে 'লেখাপড়া' বলে তা তাঁর খুব বেশি ছিল না। সেদিক দিয়ে তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান' হবার উপযুক্ত। তবে তিনি এন্ট্রান্স ক্লাস অবধি পড়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর বলতেন: "রাখালের রাজবুদ্ধি, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।" তাই স্বামীজী এই 'রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য' পরিচালনার ভার মহারাজের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। রামকৃষ্ণ সংঘে 'মহারাজ' বলতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বোঝায়, যেমন 'স্বামীজী' বললে স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝায়। অথবা তাঁকে বলা হয় 'রাজা মহারাজ'। 'রাজা' নামটি স্বামীজীর দেওয়া। ঐ যে ঠাকুর বলতেন রাখালের রাজবুদ্ধির কথা, তাঁর রাজ্য-চালনার ক্ষমতার কথা। তা থেকেই স্বামীজী বলতেন: "রাখাল আমাদের রাজা।" আরেকটি কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি ছিলেন ঠাকুরের 'মানসপুত্র'। সেজন্য তাঁকেই স্বামীজী সংঘের নেতৃত্বে বসিয়েছিলেন এবং বসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

মহারাজ কারো প্রতি নির্মম ব্যবহার করতে পারতেন না এবং অপর কেউ করছে দেখলে তিনি ব্যথা পেতেন। তাঁর স্বভাব ছিল এতই কোমল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। ঠাকুরের মতো খেলার সময় ধর্মবিষয়ক গান গাইতেন। অনেক বিষয়ে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল। আবার স্বামীজীর মতো তিনিও তাঁর সঙ্গীদের নেতা ছিলেন। তবে ঠাকুর অখ্যাত গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, গ্রামের বাইরে তাঁদের কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু মহারাজ জন্মেছিলেন সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে।

ঠাকুর বলতেন: "সংসারী লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। মন এত ঘোরতর সংসারী লোকের সঙ্গে থাকতে পারে না। একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে যদি আমার কাছে থাকত তাহলে বেশ আনন্দে থাকা যেত।" একদিন দেখলেন বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। হৃদয়কে সেই দর্শনের কথা বলতে তিনি বললেন: "মামা, তোমার ছেলে হবে।" পরে একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন—গঙ্গায় একটি পদ্ম ভাসছে, তার ওপর বালক শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এক বালকসখার সঙ্গে নাচছেন। রাখাল মহারাজকে যখন প্রথম ঠাকুর দেখলেন তখনই তাঁর মনে হলো—এই তো সেই ছেলেটি, যাকে কৃষ্ণসখারূপে তিনি গঙ্গায় দেখেছিলেন। দৈববাণী শুনেছিলেন: "রাখাল তোমার মানসপুত্র। তোমার কাছে থাকবে, তোমার ভাবের ধারণা করতে পারবে।"

ঠাকুরের কাছে আসবার আগেই রাখালের বিবাহ হয়েছিল। অল্পবয়স থেকেই তাঁর সংসারে মন নেই দেখে তাঁর বাবা, যিনি একজন বিষয়ী লোক, স্থির করলেন ছেলের মনকে সংসারে আকৃষ্ট করতে হলে তাঁকে বিয়ে দিতে হবে। দৈববিধানে বিয়ে হলো একটি ভক্ত-পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। ঠাকুরের অন্যতম গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বোনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মনোমোহনই মহারাজকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে চিনলেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করে তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করলেন। মহারাজও অন্তরে ঠাকুরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেন।

মহারাজ বাল্যে মাতৃহারা হওয়ায় বিমাতা তাঁকে লালনপালন করেছিলেন। কিন্তু বিমাতা সাধারণ বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেননি, মহারাজকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। ঠাকুরকে প্রথম দেখেই মহারাজ ঠাকুরের ভিতর যেন তাঁর স্বর্গগতা মাকে দেখতে পেলেন এবং মাতৃভাবে ঠাকুরকে গ্রহণ করলেন। বিচিত্র ব্যাপার! স্বামী শিবানন্দও ঠাকুরকে মাতৃভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে মহারাজ যেমন ঠাকুরের সঙ্গে অসঙ্কোচে ব্যবহার করতেন, অন্য পার্ষদরা তা করেননি। ঠাকুরকে তিনি প্রথম থেকেই একান্ত আপনার করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরও প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে সেইমত ব্যবহার করেছেন।

ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় মহারাজ যুবক, অল্পবয়সী নন। কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল চার-পাঁচ বছরের বালকের মতো—ছোট ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে সেইরকম। ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছেন, রাখাল খেলার মাঝে ছুটে এসে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং আশ্চর্যের কথা, ছোট ছেলেরা যেমন মায়ের স্তন্যপান করে মহারাজও তেমনি ঠাকুরের স্তন্যপান করতেন! বিচিত্র হলেও আসলে ঠাকুরের মধ্যে

তিনি মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা দর্শন করেছেন বলেই এই ব্যবহার তাঁর পক্ষে ছিল শোভন।

পরবর্তী কালে শুনেছি, মহারাজের চলাফেরা, অঙ্গভঙ্গি অনেকটা ঠাকুরের মতো ছিল। পিছন দিক থেকে দেখলে মহারাজকে ঠাকুর বলে ভ্রম হতো। পিতাপুত্রের যেমন সাদৃশ্য থাকে সেইরকম। ঠাকুরের সংসর্গে আসার আগেই তাঁর মনে ধর্মভাব প্রবল ছিল এবং সেই প্রেরণাবশে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনিও ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরের কাছে আসার অল্পদিন পরেই নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন। আগে থেকেই দুজনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ঠাকুরের সান্নিধ্যে তা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হলেও ঠাকুরের কাছে আসার পরে ঠাকুর মন্দিরে গেলে মহারাজও সঙ্গে যেতেন এবং ঠাকুরের দেখাদেখি মা কালীকে প্রণাম করতেন। ব্রাহ্মসমাজের কট্টর সদস্য স্বামীজী তা দেখে জনান্তিকে মহারাজকে বলেন: "তুমি না ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখিয়েছ, সেখানে দেবদেবীকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। তুমি যে করছ এতো কপটতা।" বন্ধু হলেও স্বামীজীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সামনে তিনি যেন ঐ কথায় জড়সড় হয়ে গেলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। ঠাকুর তাঁর সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য স্বামীজীকে বললেন: "তুই ওকে বকেছিস? তুই না মানিস, ওকে বারণ করিস কেন?" ঠাকুরের কথায় স্বামীজী নিরস্ত হন। সগুণভাবে ভগবানকে আস্বাদন করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ছিল বলে সেই ভাবটিই মহারাজের ব্যবহারে ফুটে উঠেছিল।

ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব যেমন স্বামীজীকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল, তেমনি ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে মহারাজও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব থেকে কতকটা মুক্ত হলেন। কিন্তু দুজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব চিরকাল ছিল। স্বামীজী বলতেন: "আমি জানি, সবাই আমাকে পরিত্যাগ করলেও রাখাল কখনো করবে না।" মহারাজের ওপর তাঁর এমনই বিশ্বাস ছিল।

লেখাপড়ায় মহারাজের মন ছিল না, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি ছিল। সেই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পেয়েই স্বামীজী প্রথম থেকেই তাঁকে সঙ্ঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। ঠাকুর স্বয়ং স্বামীজীকে সঙ্ঘনেতা নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। স্বামীজী আবার তাঁর উত্তরাধিকারিরূপে মহারাজকে নির্বাচন করেছিলেন। কিভাবে এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন তার কিছু কিছু দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। ঠাকুরের কাছে যখন মহারাজ ছিলেন তখন তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধ্যান-ধারণা, কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন। তারপর ঠাকুরের স্থূলশরীর সংবরণের পর তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মতো মহারাজও তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় পাহাড়ে পর্বতে তপস্যায় চলে যান। আরও উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যাপ্রবণ ঐ ভাবটি বরাবরই তাঁর ভিতর প্রবল ছিল।

মহারাজ ছিলেন ধনীর সন্তান। তিনি আজন্ম বিলাসে লালিত। ঠাকুরের কাছেও তিনি অতি যত্নে বড় হয়ে উঠেছেন, কিন্তু পরে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন, নানা জায়গায় তপস্যায় কাটিয়েছেন। বৃন্দাবনের কাছে কুসুম সরোবর আছে। সেখানে সাধুদের ত্যাগ না করে উপায় নেই! কারো কিছু থাকলে চোর-ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে। কারো কাছে একটি কম্বল থাকলেও চোরে এসে নিয়ে যাবে। সেখানে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে তিনি শীত কাটাতেন, যা চোরেও নেবে না। আর ভিক্ষার মধ্যে পাওয়া যেত শুধু রুটি, তাই জলে ভিজিয়ে নরম করে তিনি খেতেন। দিনান্তে এই ভোজন, আর বাকি সময় ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকা। তিনি আর স্বামী তুরীয়ানন্দ একসঙ্গে তপস্যায় ছিলেন। যে-ঘরে মহারাজ থাকতেন সেই ঘর আমরা পরে দেখে এসেছি। ঠাণ্ডা পাথরের বাড়ি। শীতের সময় দারুণ ঠাণ্ডা। আশপাশে দরিদ্র লোকদের বাস। কোন সাধু ভিক্ষা করতে গেলে তারা আর কি দেবে! তারা শুকনো রুটি দিত, তাতেই জীবনধারণ। কিন্তু মহারাজের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এমনই তপস্যার ভাব মহারাজের চিরকাল ছিল এবং পরে সাধু-ব্রহ্মচারীদের ভিতর যাতে এই ভাব সবসময় জাগ্রত থাকে সেইজন্য জ্বলন্ত ভাষায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন তিনি। তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো, কখনো রূঢ় কথা বা নীতিবাক্য বলে তিনি শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন, তারা শুধরে যেত। এমনকি সাংসারিক বিষয়েও পূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি এমন উপদেশ দিতেন যে, লোকে অবাক হয়ে যেত। এইজন্য মহারাজের কাছে সবরকমের লোক আসত। ভগবানের পথের পথিক যাঁরা তাঁরা তো আসতেনই, আবার বিষয়ী লোকেরাও বৈষয়িক পরামর্শ নিতে আসতেন। ঠাকুর যে বলেছিলেন, রাজা একটা রাজ্য চালাতে পারে—সেই রাজ্য চালাতে হলে সবরকম লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়—তা তিনি পারতেন।

মহারাজ সঙ্ঘের নিয়মকানুনের বড় একটা ধার

ধারতেন না। কিরকম করে তিনি সংঘ চালাতেন সে-সম্বন্ধে প্রাচীন সাধুদের মুখে আমরা শুনেছি, বিশেষ করে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দের কাছে। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠের গোড়ার দিকে সংঘের পরিচালকবৃন্দের অন্যতম এবং যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) ছিলেন। সংঘ পরিচালনার জন্য পরিচালকবৃন্দের মাঝে মাঝে মীটিং-এ বসা প্রয়োজন হয়। মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, তিনি না বললে কি করে মীটিং হবে! শুদ্ধানন্দ মহারাজ বললেন: "মহারাজ, আমাদের একটা মীটিং ডাকা দরকার।" মহারাজ উত্তর দেন: "এখন থাক, আমার শরীরটা ভাল না।" তিনি মীটিং পছন্দ করতেন না। বলতেন: "মীটিং-এর নামে আমার জ্বর আসে।" সহজে মীটিং করতে তিনি রাজি হতেন না, অনেক সাধাসাধি করলে তবে রাজি হতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠে হয়তো উপস্থিত নেই, পরিচালকদের অন্যান্যরা বললেন: "মহারাজ, একটা মীটিং করা দরকার।" মহারাজ বললেন: "সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ) নেই তো মীটিং কি করে হবে?" মীটিং যখন হয় মহারাজ চুপ করে বসে থাকেন আর একটু একটু তামাক খান। সবাই আলোচনা করছেন, মহারাজ কিছু বলছেনই না। সব তর্ক-বিতর্ক শেষ হলে হয়তো স্বামী শুদ্ধানন্দ বললেন: "মহারাজ, এখন সিদ্ধান্ত কি হবে?" মহারাজ বলে দিলেন: "এই কর।" যা বলে দিলেন তাই লেখা হলো। মহারাজ অত যুক্তিতর্কের ভিতর যেতেন না কিন্তু সকলেই জানত যে, এই পুরুষের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। তর্কের ভিতর দিয়ে নয়, অতীন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে তাঁর এই সিদ্ধান্ত। কাজেই বিনা দ্বিধায় সকলে তাঁর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতেন। মহারাজের পরিচালনা ছিল এইরকম। তাঁকে সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং সে-শ্রদ্ধা ভয়মিশ্রিতও বটে! সকলেই তাঁকে ভালবাসতেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর নির্দেশকে কেউ লঙ্ঘন করার কথা চিন্তা করতে পারতেন না।

একবার বাবুরাম মহারাজ মঠের সবজিবাগান থেকে কোন ভক্তকে দু-একটা লাউ দিয়েছেন। বাগানের কাজ বাবুরাম মহারাজই করেন, তিনি দু-একটা লাউ কাউকে দিতেই পারেন। কিন্তু মহারাজ শুনে তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলেন। বাবুরাম মহারাজ প্রথমে বুঝতে পারছেন না কি ব্যাপার। তারপর মহারাজের কাছে গিয়ে বলছেন: "বল, কি তোমার মনের ভাব।" মহারাজ কিছু বললেন না, চুপ করে আছেন। বাবুরাম মহারাজ বুঝলেন, ভক্তকে লাউ দেওয়া তাঁর অন্যায় হয়েছে। তখন মহারাজের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে বললেন: "ভাই, ক্ষমা কর।" মহারাজের চেয়ে বাবুরাম মহারাজ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু মহারাজের কাছে এইরকম নত হয়ে থাকতেন। মহারাজের ভাব হচ্ছে, মঠের সম্পত্তি ঠাকুরের সম্পত্তি। সেই সম্পত্তির ওপরে কারো অধিকার নেই, এমনকি স্বামী প্রেমানন্দেরও নয়। এদিক দিয়ে দেখলে, মহারাজ নিজেও কর্তৃত্ব করতেন না।

একবার একটা বিশেষ কারণে মঠের কিছু দেনা হয়েছে। কিরকম দেনা? এক ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা নেওয়া হয়েছে, পরে শোধ হয়ে যাবে। স্বামী সারদানন্দ এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যস, মহারাজ গুম হয়ে গেলেন, আর কথাবার্তা নেই। কি হয়েছে কিছু বলেন না। শেষকালে বললেন: "শাকের কড়ি মাছে যাবে?" সারদানন্দ মহারাজ বললেন: "আর এরকম হবে না।" এইরকম ছোটখাট ব্যাপারেও মহারাজের শাসন ছিল বড় কঠিন। এক চুল এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। তাঁর নির্দেশ ছিল— মঠ-মিশন যেন কোনদিন ধার করে কিছু না করে। তাঁর ইচ্ছে একটি পয়সা কোথাও ঋণ করবার উপায় ছিল না। তিনি বলতেন: "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমরা কিভাবে [illegible] শোধ করবে? কার ওপর দায়িত্ব বর্তাবে? এমন [illegible] এইভাবে মঠ-মিশন প্রথম থেকেই স্বনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা পেয়েছে মহারাজের কাছ থেকে।

এইরকম ঘটনা আরও আছে। শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন মঠ-মিশনের একজন দিকপাল। দক্ষিণ ভারত তিনি উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি মাদ্রাজ মঠে মহারাজকে নিয়ে যেতেন এবং তাঁকে ঠাকুরের সমমর্যাদা দিতেন। একবার তাঁর কি ব্যবহারে বা কাজে মহারাজের মনে একটু অসন্তোষ হয়েছে, কিন্তু কথায় কোনকিছু প্রকাশ করেননি। শুধু শশী মহারাজ মাদ্রাজ যাবার জন্য বললে তিনি আর মাদ্রাজে যেতে চাইলেন না। শশী মহারাজ বুঝলেন, তাঁরই কোন ভুল হয়েছে। তিনি এসে মহারাজের পায়ে পড়ে বললেন: "রাজা, তোমার এ কি বুদ্ধি! আমি কি একটা মানুষ যে, আমার ওপর তুমি রাগ অভিমান কর? আমার মতো কত শশী তোমার প্রভাবে বেরিয়ে যায়!" মহারাজ তাঁর বিনয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আবার মাদ্রাজ গেলেন। পরস্পরের প্রতি তাঁদের এমন শ্রদ্ধা ছিল বলে সংঘ এইভাবে গড়ে উঠেছে।

ঠাকুর তাঁর সন্তানদের চিহ্নিত করে প্রত্যেকের জন্য এক-একটি বিশেষ স্থান দিয়ে গিয়েছেন। মহারাজকে

স্বামীজীর পরেই সংঘনেতা নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং। তিনি 'ঠাকুরের সন্তান'—এই ছিল তাঁর পরিচয়। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে তাঁর চেয়ে আরও বিদ্বান অনেকেই ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতাও ছিল না, কখনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেননি। কিন্তু আইন-কানুন ভাল জানতেন। তাঁর বাবা জমিদার ছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি শাসনবুদ্ধি পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, কখন কি করতে হয়। কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিই ছিল প্রধান। এই আধ্যাত্মিকতার বলেই তিনি সকলকে প্রভাবিত করতেন, সংঘকে সেইভাবেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

একবার কাশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈত আশ্রমে সাধুদের ভিতর কোন এক বিষয়ে মনোমালিন্য হয়েছে। সকলেই তো মানুষ, মাঝে মাঝে তাই ভুল বোঝাবুঝি হয়। সাধুদের পরস্পরের মধ্যে বনিবনার অভাবে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। সকলে মহারাজকে বললেন: "আপনি না গেলে সুরাহা হবে না, আপনাকে যেতে হবে।" মহারাজ যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলেন। গিয়ে কাউকে শাসন করা বা পরামর্শ দেওয়া নয়, কোন বিচার বিতর্ক বা আলোচনা নয়, তিনি জপ-ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর দেখাদেখি সকলেই বিবাদ-বিতর্ক ভুলে জপ-ধ্যান করতে লাগলেন। কার দোষ, কার অন্যায়—এসব কোন কথাই হলো না। দেখা গেল, তাঁর সান্নিধ্যে পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে সব শান্ত হয়ে গিয়েছে। মহারাজের নেতৃত্বের ছিল এই ধারা। কাউকে বুঝিয়ে স্বমতে নিয়ে আসা নয়, নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অপরকে তাঁর অনুবর্তী করতেন। বলতেন, আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কোন কারণে আধ্যাত্মিকতার ত্রুটি হয়, তখনই নানারকম ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তাই যাতে আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হয় তা করলেই সব শান্ত হয়ে যাবে। কার কি শক্তি, কে কিভাবে সংঘে কাজ করছে, কাকে কিভাবে চালাতে হবে—সব তিনি জানতেন। কাকে দিয়ে কোন্ কাজটি সুষ্ঠুভাবে করানো যায় তা তিনি যেমন জানতেন, তেমনি করিয়েও নিতেন। কোন বক্তৃতা না দিয়েও মহারাজ ছিলেন সংঘে সর্বজয়ী। এটি তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য।

মহারাজ অনেক সময় কলকাতায় বলরাম মন্দিরে থাকতেন। মঠে তখন খুব ম্যালেরিয়া হতো। বালকস্বভাব মহারাজ ম্যালেরিয়ার ভয়ে মঠে আসতেন না। একবার তিনি খুব ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলেন, সেই থেকে ছেলেমানুষের মতো ভয় হয়েছিল। ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলে তিনি গঙ্গাস্নানেও যেতেন না। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতে হতো। তেমনি মায়ের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি সত্ত্বেও সহজে মায়ের কাছে যেতেন না। ছোট ছেলে যেমন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে সঙ্কোচ বোধ করে, মহারাজ মায়ের কাছে সেইরকম সঙ্কোচ বোধ করতেন। ছেলেমানুষের মতো তাঁকে ধরে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। মা বাইরে থেকে ফিরেছেন, স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে সাধুরা অনেকে গিয়েছেন। মহারাজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, কাছে যাচ্ছেন না। সকলে ধরে তাঁকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন 'মা, মা, মা' বলতে বলতে প্রণাম করে তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন। মায়ের সামনে তিনি কোন কথা বলতে পারতেন না। তাঁর প্রবল অনুভূতি কে বুঝবে? একবার মা বললেন: "আমার ভার এক যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বইতে পারত, আর শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) পারে।" একজন বলছে: "কেন মা, মহারাজ?" মা বললেন: "না, ওর অন্য ভাব, ও এত ঝামেলা সইতে পারে না।"

ছেলেবেলা থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর আনন্দে কেটেছে। তিনি দীর্ঘ জীবন পাননি, কিন্তু সংঘের সূচনা থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে শরীরত্যাগ পর্যন্ত সংঘের পরিচালনা করেছেন—আনুষ্ঠানিকভাবে বলতে গেলে বাইশ বছর। মহারাজ কেবল তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সংঘ পরিচালনা করেছেন, আর কোন কিছুর প্রয়োজন তাঁর হতো না। স্বামীজীর দেহত্যাগ হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে। স্বামীজী যখন ছিলেন তখন মহারাজের ওপরেই তিনি সব ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাধারণভাবে কোন ব্যাপারে স্বামীজী নিজে সিদ্ধান্ত নিতেন না, শুধু বকুনি দেওয়া ছাড়া। স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক হিসাবে সংঘের প্রত্যক্ষ পরিচালনার কাজ করতেন। মহারাজ ঐসবের ভিতরেই যেতেন না। কিন্তু সংঘের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন এবং সর্বত্র তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকত। অথচ মানুষ তাঁকে মনে করত, তিনি বিলাসী। বাইরে বোঝা যেত না, এইরকম অদ্ভুত ছিল তাঁর ব্যবহার। মহারাজ তো একেবারে মহারাজ! সবসময় রাজারাজড়ার মতো ব্যবহার। দোলের সময় তিনি খুব আনন্দ করতেন। একবার দেখেছি, আবির এসেছে আর আবির গোলবার জন্য ভক্তরা পাঠিয়েছেন গোলাপজল। তিনি ঐ আবিরগোলা গোলাপজল চারদিকে ছড়াচ্ছেন। এ মহারাজের পক্ষেই সম্ভব। আমরা দেখলাম, আনন্দের হাট বসেছে। অবশ্য তখন সংবাদপত্রে লেখবার লোক ছিল না

যে লিখবে—সাধুরা গোলাপজল ছোড়াছুড়ি করছে।

মহারাজ ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে ভালবাসতেন। মহারাজের মাছ-ধরা মহাপুরুষ মহারাজ পছন্দ করতেন না। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে মহারাজ তাঁকে ভয় করতেন। তিনি দেখলে বকবেন এবং তিনি দেখতে পাবেন বলে অন্যদের বলতেন ঃ "ছিপটা নিয়ে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে পুকুরধারে যা। আমি পরে যাচ্ছি।" সাধুরা সেভাবেই লুকিয়ে যেতেন। আর মহারাজ কিছুক্ষণ পর দুহাত নাড়াতে নাড়াতে যেতেন, যেন হাতে কিছু নেই। মহাপুরুষ মহারাজ যে বুঝতেন না তা নয়, বুঝতেন এবং হাসতেন। মহারাজ সংঘের নেতা, তা বলে বড় ভাইকে কি সম্মান কম করবেন? তাই তাঁর সামনে দিয়ে ছিপ নিয়ে যাওয়া চলে না। তাঁর ব্যবহারের এমনই একটা সুন্দর মাধুর্য ছিল। এটি দেখবার জিনিস, শেখবার জিনিস।

মহারাজ বলতেন ঃ "আমরা ঠাকুরের প্রেমে একসঙ্গে আবদ্ধ হয়ে এই সংঘ গড়েছি। সুতরাং এই সংঘের ভিত্তি হলো প্রেম। প্রেম যদি অক্ষুণ্ণ থাকে সংঘও অক্ষুণ্ণ থাকবে।" তিনি বারবার একথা বলতেন এবং সেইভাবেই সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, আর সকলের ভিতর যাতে এই জিনিসটি প্রেরণারূপে কাজ করে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এটি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। সংঘের নেতা হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন প্রেমস্বরূপ, তেমনি সংঘকে পরিচালনা করেছেন তাঁর অপূর্ব প্রেমের মাধ্যমে।

মহারাজের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। একবার গিরিশবাবুর ভাই অতুলবাবু এক বন্ধুকে মঠে নিয়ে গিয়েছেন। বন্ধুটি কখনো মহারাজকে দেখেননি, তাই সাধু দেখাবার জন্য অতুলবাবু তাঁকে মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। মহারাজের কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তখন ছেলেদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করছেন। এরকম অনেকক্ষণ কাটল। অতুলবাবু ভাবছেন, বন্ধুকে নিয়ে এলাম সাধু দেখাতে আর সাধুর যে কি 'মুড'—একটিও ধর্মকথা বলছেন না, খালি ছেলেদের নিয়ে রঙ্গরস করছেন। বন্ধুটি কি মনে করবে! এরকম অনেকক্ষণ বসার পর যখন বন্ধুটি উঠছেন তখন মহারাজ বলছেন ঃ "ওগো আমাদের আবার ভাল কথাও হয়।" বন্ধুটি হাতজোড় করে চলে গেলেন। অতুলবাবু ভাবছেন, না জানি বন্ধুটি কি ভাব নিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে বন্ধুটি বলছেন ঃ "আজ একজন আনন্দময় পুরুষকে দেখলাম। শুনেছি যাঁরা আত্মানন্দের সন্ধান পান তাঁরা আনন্দময় হন। এমন আনন্দময় পুরুষ কখনো দেখিনি, আজ দেখলাম।"

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা আমরা তাঁর একজন সেবকের কাছ থেকে শুনেছি। মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে আছেন। তাঁর ঘরের সামনের বৈঠকখানায় অনেক সময় তিনি পায়চারি করতেন, কখনো সেখানে বসতেন। একদিন মহারাজ বৈঠকখানায় বসে আছেন, হঠাৎ সেবকদের বললেন ঃ "তোরা ভিতরের দিকের দরজাগুলো সব বন্ধ করে দিয়ে বাইরে যা।" তিনি কেন এমন কথা বললেন তারা জানে না। তাদের ঔৎসুক্য, কি ব্যাপার! কিছুক্ষণ পরে তিনটি অল্পবয়সী ছেলে ভিতরে ঢুকে মহারাজের সঙ্গে কথা-বার্তা আরম্ভ করেছে। কি কথা হচ্ছে সেবকরা কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, খুব হাসি-তামাশা আর হৈহৈ হচ্ছে। এভাবে অনেকক্ষণ চলল, তারপর তারা চলে গেল। এবার মহারাজ সেবকদের ডাকলেন। দরজা খোলা হলো।

ঘটনাটি হলো—তিনজন যুবক কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে। তখনকার আধুনিক ছেলে, তারা ঠাকুর-দেবতা, সাধু-সন্ন্যাসী মানে না। এসব বিষয়কে তারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা বিদ্রূপ করে। তারা একটা হোটেলে উঠেছে। কি কি দ্রষ্টব্য আছে জানতে চাওয়ায় হোটেলের মালিক বলেছে ঃ "এখানে কি আর এমন আছে? মন্দির আছে, উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, আর বেলুড় মঠে সাধু আশ্রম আছে। সেখানে যে-মহারাজ আছেন তিনি রাজার মতো আড়ম্বরে থাকেন। তাঁর সোনার গড়গড়া, আর কি ঠাটবাট!" ছেলে তিনটি বলল ঃ "কেন তাঁকে কেউ শিক্ষা দিতে পারে না?" হোটেলের মালিক বলল ঃ "তিনি কত বড় মানুষ! তাঁর কাছে গিয়ে কে কি শিক্ষা দেবে?" ছোকরা তিনজন বলল ঃ "আচ্ছা আমরাই দেখব।" তাই তারা এসেছিল মহারাজকে 'শিক্ষা' দিতে। মহারাজের কাছে এসে তারা খুব আদর আপ্যায়ন পেল। শুধু তাই নয়, তারা যেমন তাদের সঙ্গে ঠিক তেমনি করে তিনি হাসি-তামাশা করলেন। তারা দেখল, মহারাজ তো এসবেও আমাদের হারিয়ে দেবেন। তখন মহারাজের কাছে মাথা নুইয়ে তারা চলে গেল। শিক্ষা দিতে এসে মহারাজের কাছেই তাদের শিক্ষা নিতে হলো—দিনের পর দিন! তাদের সেই উদ্ধত ভাব চলে গেল, শান্ত বিনয়ী হলো। মহারাজের শিক্ষা দেওয়ার ধারা ছিল এইরকম।

তিনি যেন ।ককরে লোকের ভিতরটা জানতে পারতেন। ঠাকুর যেমন বলতেন ঃ "কাচের আলমারির ভিতরে জিনিস থাকলে যেমন দেখা যায় তেমনি তোমাদের ভিতরটা আমি দেখতে পাই", মহারাজেরও সেইরকম একটা

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যেকের ভিতরটা দেখতে পেতেন এবং যে যেমন তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করতেন। আবার এত লাজুক ছিলেন যে, কেউ আসছে শুনলে তিনি দেখা করতেই চাইতেন না। বলতেন, আমার জ্বর আসছে। কিন্তু যে দর্শনের সুযোগ পেত—প্রশ্ন না করেও তাঁর কাছে বসে সে প্রভাবিত হয়ে যেত। এরকম ঘটনা অনেক আছে। আমরাও আমাদের অপরিপক্ক বুদ্ধি নিয়ে মহারাজের কাছে যখন যেতাম তখনো তিনি বেশ গল্পসল্প, হাসি-তামাশা করতেন। সৎপ্রসঙ্গও হতো। আর যেদিন অন্য মুড সেদিন বলতেন : "বাবা, আমার পেটটা বড় খারাপ।" বুঝতাম, আজ আর কথাটথা হবে না। প্রণাম করে চলে আসতাম।

তিনি কখন কিরকম থাকবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এমন অদ্ভুত প্রভাব, যে-কেউ তাঁর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারত না। যাঁরা তাঁর কাছে থাকতেন তাঁরা ছিলেন এক-একজন দিক্‌পাল, কিন্তু তাঁর কাছে এলে তাঁরা সব যেন একেবারে স্তিমিত। মহারাজের বেশ কয়েকজন সেবক ছিলেন। তাঁদের ভিতর কেউ গাইয়ে, কেউ বাজিয়ে, কেউ ভাল রান্না করেন, কেউ তাঁর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। খুব আসর জমিয়ে থাকতে তিনি ভালবাসতেন, যখন যেখানে যেতেন সেখানে কেবল আনন্দের হাট নয়—মহাতীর্থস্থান হয়ে যেত।

মহারাজ কাজকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু সাধন-ভজনকে ব্যাহত করে নয়। তিনি মঠে থাকলে সকলেরই তাঁর কাছে বসে গল্প করা, ভজন করা চাই। সকলেই মহারাজের সান্নিধ্যে থাকতে ভালবাসতেন। বাবুরাম মহারাজকে মঠের কাজ চালাতে হয়। তিনি একদিন বললেন : "এত বেলা হয়ে গিয়েছে ছেলেগুলো এখনো কেউ কাজে যায়নি, কি করে মঠের কাজ চলবে?" মহারাজ সেদিন অন্য মুডে ছিলেন। বললেন : "বাবুরাম-দা, এরা যে ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে সে কি কেবল ঘরঝাঁট দিতে, বাগান করতে, তরকারি কুটতে? এদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছু দেখছ?" এমনভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন যে, শুনে বাবুরাম মহারাজ স্তম্ভিত। আবার পরে ছেলেদের বলছেন : "যাও, কাজ না করলে কি করে হবে? এরকম চলবে না।"

আবার যখন তিনি সাধন-ভজনের কথা বলতেন তখন আর অন্য কথা নয়। সে-জায়গার হাওয়াই তখন যেন বদলে যেত। এমন জোর দিয়ে তিনি বলতেন। তাঁর ওপর তাঁর গুরুভাইদের এবং সব সাধুদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সবাই জানত যে, মহারাজ যা বলবেন তাতে কোন ভুলচুক থাকবে না। সংঘে যতদিন তিনি নেতারূপে ছিলেন—সেই শেষদিন পর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল যে, মহারাজের সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার মতো। কারণ, তা সবসময় সংঘের কল্যাণের জন্য।

কেউ তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মহারাজ যা বলতেন সে বিনা বিচারে, বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করত। কারণ, সে জানত মহারাজের মতো কল্যাণকামী তার কেউ নেই। সংঘে মহারাজের সঙ্গে কারও মতভেদ ছিল না। মহারাজ যা বলতেন সকলে নতমস্তকে তা মেনে নিত। এই মহারাজই আবার যখন স্বামীজীর নেতৃত্বাধীনে কাজ করেছেন তখন যেন শশব্যস্ত হয়ে থাকতেন। স্বামীজীর বকুনি তো আমরা কল্পনা করতে পারি না। এমনও হয়েছে যে, সেই বকুনি সহ্য করতে না পেরে মহারাজের চোখে জল পড়েছে। ঠাকুরের মানসপুত্রের চোখে জল! স্বামীজী শশব্যস্ত হয়ে বলছেন : "রাজা, আমাকে ক্ষমা কর।" মহারাজ তখন সাষ্টাঙ্গ হয়ে স্বামীজীকে প্রণাম করছেন, স্বামীজীও সাষ্টাঙ্গ হয়ে মহারাজকে প্রণাম করছেন। গুরুভাইদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ ছিল দেবতাদেরও দ্রষ্টব্য। এ আমাদের কল্পনারও বাইরে। স্বামীজীকে যেমন মহারাজ শ্রদ্ধা করতেন, স্বামীজীও মহারাজকে ঠিক তেমনই শ্রদ্ধা করতেন। অনেকেরই জানা আছে যে, স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করে বলেছেন : "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু", আবার মহারাজ স্বামীজীকে প্রণাম করে বলেছেন : "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমঃ পিতা।"

স্বামীজী বলেছেন : "রাখাল, পড়াশুনা করতে হবে।" একদিন স্বামীজী একটা পুরনো ইংরেজী বই পড়ে বললেন : "বইটি ভারী সুন্দর।" মহারাজ যেখানে যান বইটি তাঁর সঙ্গে থাকে, কতটুকু পড়া হলো তার ঠিক নেই। স্বামীজীর কথা এইরকম বিনা দ্বিধায় তিনি সবসময় মেনে চলতেন, জানতেন—ঠাকুরের নির্বাচিত সংঘনেতা স্বামীজী। স্বামীজীর আদেশ ঠাকুরেরই আদেশ। আবার স্বামীজীও ঠাকুরের মানসপুত্র বলে মহারাজকে বলতেন : "রাজা আমাদের ভিতর আধ্যাত্মিকতায় রাজা।"

মহারাজের যাঁরা সাক্ষাৎ শিষ্য একসময় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিভ্রান্ত হয়ে মনে করতেন যে, তাঁরা একটু উচ্চতর থাকের। স্বামীজী স্বামী প্রেমানন্দকে বলেছিলেন : "বাবুরাম-দা, তুমি চেলা করো না, তাহলে রাজার চেলা আর তোমার চেলায় লাঠালাঠি চলবে।" বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দকে মঠ-মিশনে বলা হতো "মঠের মা"। তাঁর

এত প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, তিনি চেলা করলে আর রক্ষা ছিল না। স্বামীজী তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে বুঝে বলেছিলেন ঃ "তুমি চেলা করো না।" বাবুরাম মহারাজ কখনো দীক্ষা দেননি। তাঁদের পরস্পরের সম্বন্ধ এমন ছিল যে, সেখানে কোন সংঘর্ষের অবকাশ ছিল না। এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে শাসন কেবল প্রেমের শাসন। ছোটখাট ব্যাপারেও মহারাজের সেই প্রেমের শাসন কম ছিল না। একবার তাঁর সেবকদের একজন, যিনি মহারাজের সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর চিঠিপত্র লিখতেন, একজন ভক্তের কাছে একটি ভাল কলম চেয়েছেন। মহারাজ সব লক্ষ্য রাখতেন। বললেন ঃ "তুই কেন চাইলি?" তিনি বললেন ঃ "আমার নিজের তো কলম দরকার নেই, আপনার চিঠিপত্র লিখি, সেজন্যই চেয়েছি।" মহারাজ বললেন ঃ "আজ কলম চাইবি, কাল আরেকটা জিনিস চাইবি, চাইতে চাইতে চাওয়া অভ্যাস হয়ে যাবে।" তীব্র ভর্ৎসনা! এতটুকুও ত্রুটি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর দৃষ্টি সবসময় ত্যাগে এমন প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কোন জায়গায় এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে তিনি সহ্য করতেন না।

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সেই আশৈশবের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি সর্বত্র যেন ঠাকুরকে দেখতেন, সেইভাবে ব্যবহার করতেন। সমাধির কথা আমরা শুনি, কিন্তু কারো সমাধি হয়েছে এমন লোক দেখা যায় না। মহারাজের জীবনে সমাধি অহরহ দেখা যেত। মহারাজ তামাক খেতেন। সেবক গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গিয়েছেন। মহারাজ স্থির হয়ে বসে আছেন, তামাক পুড়ে যাচ্ছে—কোন দৃষ্টি নেই। সেবক এসে আবার বদলে দিয়ে গেলেন। তিনি বসে আছেন গড়গড়ার নল মুখে, কিন্তু সমাধিস্থ। তাঁর তামাক খাবার দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বুঝেছেন যে, তামাক খাওয়া একটা উপলক্ষ মাত্র। তাঁর মন তখন গভীরভাবে সমাধিস্থ। এই দৃশ্যটি সকলের মনকে এত অভিভূত করত যে, সেজন্য দৃশ্যটির ফটো রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই ভাবটি সকলের মনে গভীর ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনা এনে দিত। মুখটা একটু উঁচু করে তিনি এমনভাবে হাঁটতেন, তাঁর চলনভঙ্গি আমাদের মনে বিশেষ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করত। যখন তিনি পায়চারি করতেন তখন সিংহের মতো আপনভাবে পায়চারি করতেন।

ঠাকুরের সন্তানদের এই যে আত্মভোলা অন্তর্মুখী ভাব, এটি অন্য কোথাও দেখা যায় না। বড় বড় নাম করা সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, বড় বড় পণ্ডিত আছেন, খুব সুন্দর বক্তা আছেন, কিন্তু এই আত্মবিস্মৃত ভাব, অন্তরে একেবারে ডুবে যাওয়া—এ অন্যত্র দুর্লভ। এটি ঠাকুরের একেবারে নিজস্ব ভাব।

মহারাজ স্থূলশরীরে নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতি সংঘে আজও ওতপ্রোত হয়ে আছে। কারণ, মহারাজ ছাড়া সংঘকে ভাবা যায় না। তাঁরই তপস্যা যেন ঘনীভূত হয়ে এই সংঘকে ধরে আছে।★□



স্বামী ব্রহ্মানন্দ (ভুবনেশ্বর মঠে) ঃ আপাতদৃষ্টিতে নল মুখে, কিন্তু আসলে সমাধিস্থ।

★ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ পুরী রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

স্বামীজীর কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

সাধু ও ভক্তদের কাছে বিভিন্ন সময়ে কথোপকথনের সঙ্কলন।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

ঠাকুরের সন্তানরা এক-একজন কত বড় বড় আধার! কিন্তু তাঁর সন্তানদের মধ্যে এক স্বামীজীকে ছাড়া আর সবাইকে তিনি ভক্তিমার্গের উপদেশ দিতেন। স্বামীজীকে দিতেন অদ্বৈত-শিক্ষা। তবে স্বামীজীকে শুধু যে অদ্বৈত-শিক্ষাই দিয়েছেন তা নয়, লীলাও মানিয়েছেন তাঁকে। শুধু ধ্যান-ভজন তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা জীবন্মুক্ত। সাধারণ লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয় বলে স্বামীজী সেবাকাজের প্রচলন করেছিলেন। স্বামীজী বলতেন ঃ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" কিন্তু কোন শুভ কাজে যদি সেই শরীরও পাত করতে হয়, তাও করতে হবে।

১৮৯৭-এ স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন (২০ ফেব্রুয়ারি)। এসে মহারাজকে তাঁর ওদেশে পাওয়া সব টাকা দিয়ে দিলেন। এরপরেই তিনি দার্জিলিং চলে গেলেন বিশ্রামের জন্য (মার্চ ১৮৯৭)। সঙ্গে গেলেন গিরিশবাবু, মহারাজ, সারদা মহারাজ। তিনি ফিরে এলে বলরাম মন্দিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রথম সভা হলো ১ মে। স্বামীজী President, মহারাজ President of Calcutta Centre; আর আলমবাজার মঠের Vice-President হলেন হরি মহারাজ ও যোগীন মহারাজ। তারপর মঠবাড়ি কেনা হলো (৫ মার্চ ১৮৯৮)। প্রায় 40,000 টাকায় ১৮ বিঘা জমি। রাজা মহারাজের পত্রে "প্রায় ২০ বিঘা", ত্রিগুণাতীতানন্দজীর পত্রে "১৮ বিঘা" জমির পরিমাণ উল্লেখ আছে। ক্রয়মূল্য উভয় পত্রেই 40,000 টাকা এবং বাবুরাম মহারাজের পত্রে ৩৯,000 টাকা বলা আছে। কিন্তু ট্রাস্ট ডীড অনুযায়ী জমির পরিমাণ ২২ বিঘা। জি. টি. রোড তখন ফাঁকা রাস্তা ছিল। জঙ্গলাকীর্ণ, ডাকাতের জায়গা। স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিদেশে যাবার সময় (২০ জুন ১৮৯৯) একটা উইল করে গেলেন। মঠের স্থাবর, অস্থাবর সব সম্পত্তি মহারাজকে দিয়ে গেলেন। মহারাজ কিন্তু বললেন ট্রাস্ট করতে। মহারাজই ট্রাস্ট তৈরি করে প্যারিসে স্বামীজীর কাছে পাঠান। প্যারিসে ব্রিটিশ কনসালের সামনে বসে স্বামীজী তাতে সই করে মঠে পাঠিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে তিনি লিখেছিলেন ঃ আজ থেকে আমার সবকিছু রাখালের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি শরৎ মহারাজকে মঠের Secretary করলেন, আর মহারাজকে President।

যেদিন স্বামীজী আত্মারামের কৌটা নিয়ে এসে মঠে রাখলেন, সেদিন স্বহস্তে পায়েস রান্না করে তিনি ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। পরে ঠাকুরকে বললেন ঃ "বল, তুমি এখানে থাকবে।" ঠাকুর বললেন ঃ 'থাকব'। আবার বললেন ঃ "বল, জীবকল্যাণে তুমি এখানে থাকবে।" ঠাকুর বললেন ঃ 'থাকব'। তারপর স্বামীজীর সে কী কান্না! চোখের জলে মাটি ভিজে গেল।

মহারাজ আর স্বামীজীর মধ্যে যে কী অকৃত্রিম আর অপার্থিব ভালবাসা ছিল এই ঘটনাটি বললে বোঝা যাবে।

তাঁরা (স্বামীজীর গুরুভাইরা) সংসার ত্যাগ করে বরানগর মঠে আছেন। সকলেই বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। তিনি সংসার ত্যাগ করেও মাঝে মাঝে বাড়িতে বিধবা মা ও ছোট ছোট ভাইবোনদের দেখতে যান। বাবা (বিশ্বনাথ দত্ত) মারা যাবার পর তাঁদের খুব সাংসারিক কষ্ট দেখা দেয়। তার ওপর আত্মীয়রা তাঁদের সম্পত্তি, বসতবাটী আত্মসাৎ করার জন্য মামলা আরম্ভ করে। কাজেই এই অবস্থায় মামলা দেখাশুনা করার জন্য তাঁকে মাঝে মধ্যে আদালতেও যাতায়াত করতে হয়। স্বামীজীর তখনকার অন্তরের কথা কে বুঝবে? স্বামীজীর সঙ্গে মহারাজের অন্তরের মিল ছিল এক অদ্ভুত রকমের। তিনি যেকোন অবস্থায় স্বামীজীর পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন। সংসারে দেখাশুনার কেউ নেই। এই অবস্থায় তাঁদের একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত স্বামীজী নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। এত তত্ত্বাবধানের পরও লোয়ার কোর্টে তিনি হেরে গেলেন। হাইকোর্টে আপীল করবার সময় নেই। বাড়ি দখলের জন্য আত্মীয়রা তোড়জোড় করছে। কি উপায় করা যায়! মহারাজ এই সময়েও স্বামীজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ হচ্ছেন জমিদারের ছেলে। জানেন, কিভাবে সম্পত্তি রক্ষা করতে হয়। তিনি অভয় দিয়ে বললেন, যেমন করেই হোক একদিনের জন্য বাড়ি রক্ষা করবেনই।

করলেনও তাই। কৈশোরে স্বামীজী আর মহারাজ দুজনেই এক আখড়াতে কুস্তি করতেন। আরও অনেকে করতেন। আখড়ার সকলেই সমবয়সী এবং তাঁদের বিশেষ পরিচিত। এদিকে আত্মীয়রা স্বামীজীর বাড়ি দখল করার জন্য লোকজন নিয়ে আসবে বলে শোনা গেল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল, আখড়ার ছেলেরা সবাই স্বামীজীর বাড়িতে

রয়েছে। তাদের দেখে কেউই আর বাড়ি দখল করতে সাহস করল না। পরদিন স্বামীজী হাইকোর্টে আপীল করে ঘটনার আপাততঃ নিষ্পত্তি করলেন। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে ও অবর্তমানে মহারাজ স্বামীজীর মা ও ভাইবোনদের খোঁজ-খবর নিতেন; আর দীর্ঘদিনস্থায়ী এই মামলার তত্ত্বাবধান করতেন। শেষপর্যন্ত মামলায় স্বামীজীদের জয় হয়েছিল। ভাবা যায় না, সে কী অদ্ভুত ভালবাসা, প্রীতি ও সংবেদনশীল প্রত্যয় ছিল উভয়ের মধ্যে! একদিকে সংসার ত্যাগ করে বিষয়কে বিষবৎ অনুভব করা, অপরদিকে স্বেচ্ছায় প্রাণাধিক প্রিয় নেতার জন্য যেকোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়া! এ কী সহজ জিনিস!

আরেকদিনের ঘটনা। স্বামীজীকে যে-পরিচারিকা মানুষ করেছিল, সে হঠাৎ দুপুরবেলা বলরাম মন্দিরে এসে হাজির। মহারাজ বর্তমান ঠাকুরঘরের বারান্দায় বেঞ্চে বসে আছেন। স্বামীজী ঘরের ভিতর বিশ্রাম করছেন। মহারাজ তাই তাকে ফিরিয়ে দিলেন। বিশ্রামের পর স্বামীজী যখন শুনলেন তাঁদের পরিচারিকা এসে ফিরে গেছে, তখন তীব্র তিরস্কার করে মহারাজকে বললেন : "হয়তো মা কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাকে পাঠিয়েছিলেন। তুই কেন আমাকে না ডেকে তাকে ফিরিয়ে দিলি?"—ইত্যাদি। মহারাজ সমস্তই নীরবে সহ্য করলেন। যাহোক, অজস্র শব্দবাণ নিক্ষেপ করে স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ভাড়া করে মায়ের কাছে উপস্থিত। যখন শুনলেন মায়ের কোন কাজে সে যায়নি, সে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে গিয়েছিল আর কাছেই তাদের নরেন থাকে তাই দেখা করতে এসেছিল তখন স্বামীজী আর স্থির থাকতে পারলেন না, অধীর হয়ে পড়লেন আর ভাবতে লাগলেন—তাই তো অযথা রাখালকে এত কষ্ট দিয়েছি। মাকে বললেন : মা, রাখালকে গাড়ি করে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর। আমি না জেনে রাখালকে এত কষ্ট দিয়েছি। মহারাজকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। স্বামীজী মহারাজকে আলিঙ্গন করে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে নিজকৃত ত্রুটির জন্য কত অনুনয় করতে লাগলেন, আর নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। মহারাজের চোখেও জল ঝরতে লাগল। শেষে স্বামীজীর মা উভয়কে সান্ত্বনা দিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক করলেন। জাগতিক যেকোন সম্বন্ধই এই প্রীতি উৎপাদনে অক্ষম। ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই তাঁদের এই গভীর ভালবাসা।

মহারাজ কতবার আমাদের কাছে বলেছেন : "স্বামীজী সাক্ষাৎ শিব, তাঁকে চটালে উপায় নেই।" আর স্বামীজী মহারাজকে কী চোখে দেখতেন, তাও আমরা তাঁর গুরুভাইদের মুখেই শুনেছি। তিনি বলতেন : "রাজা আমার মাথার মণি। রাজা আমার প্রাণ।" গুরুভাইদের মধ্যে স্বামীজী একমাত্র রাজা মহারাজকেই চিঠিতে 'অভিন্নহৃদয়েষু' ও 'প্রিয়তমেষু' বলে সম্বোধন করতেন। আর 'প্রাণাধিকেষু' সম্বোধনও তাঁকে। তবে 'প্রাণাধিকেষু' সম্বোধন গঙ্গাধর মহারাজকে (স্বামী অখণ্ডানন্দকে) লেখা তাঁর দু-একটি চিঠিতেও দেখা যায়। যাহোক, স্বামীজী এবং মহারাজ পরস্পরকে কী চোখে দেখতেন তার কিছুটা অনুমানই শুধু আমরা করতে পারি। কোন্ সুরে তাঁদের জীবনবীণা বাঁধা ছিল তা তাঁরাই জানতেন। সাধারণ লোকে তাঁদের সম্পর্ক কি বুঝবে? শুধু তাঁদের দুজনের মধ্যেই নয়, অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গেও ছিল স্বামীজীর গভীর ভালবাসা, এবং এই ভালবাসার মূল ছিলেন ঠাকুর।

তিরিশের দশকে আমাদের নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারের স্বামী নিখিলানন্দ জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। একদিন একজন এসে তাঁকে বললেন, এই জাহাজে ফ্রান্সের একজন ডিউক যাচ্ছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ডিউকের সঙ্গে স্বামী নিখিলানন্দের দেখা হলে ডিউক (তখন তাঁর বয়স বছর ষাটেক, নিখিলানন্দের প্রায় চল্লিশ) তাঁকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের প্রসঙ্গ বলেন। ডিউক নিখিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী যা তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন তা কি তিনি দিতে পারেন? নিখিলানন্দ বললেন : "স্বামী বিবেকানন্দ যা আপনাকে দিতে পারতেন তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া 'opportunity comes but once'—সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। আপনি সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তা হারিয়েছেন।" প্রসঙ্গক্রমে স্বামী নিখিলানন্দ ডিউককে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামীজী তাঁকে কী দিতে চেয়েছিলেন? ডিউক বললেন : "স্বামীজী বলেছিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে আমার দেশে যাবে?' আমি উত্তরে বলেছিলাম, 'সেদেশে গেলে আমি কী পাব?' স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কেমন করে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়।' আমি বললাম, 'না স্বামীজী, আমার সামনে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আমার গোটা জীবন। আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হবার শিক্ষা নিতে আপনার দেশে কেন যাব?' বহু বছর পরে একবার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এসে পড়ি। আমার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন স্বামীজীর কথাগুলি আমার মনে পড়েছিল। তখন থেকেই তাঁকে খুঁজছি। যদি তিনি বা আর কেউ আমাকে সেই শিক্ষা দিতে পারেন।" □

কবিতা

রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্

স্বামী বিবেকানন্দ

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্ত অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্ত চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ॥
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহর ব্রহ্মাদিদেবৈর্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ॥

হোয়াইট বার্চ লজ

অসীম চৌধুরী

স্বামীজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে ১৯৯৫ সালের ১৯ জুলাই আমার চরম সৌভাগ্য হয়েছিল নিউ হ্যাম্পশায়ারের পার্সি শহরে একদিন কাটাবার। পাহাড়ে ঘেরা, লেক ক্রিস্টাইনের তীরে সেই 'হোয়াইট বার্চ লজ'-এ কাটানো দিনের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

যেদিনের কথা আমি বলছি, তার প্রায় একশ বছর আগে (১৮৯৫ সালের জুন মাসে) নিউ ইয়র্কের ফ্রান্সিস লেগেটের অতিথি হয়ে স্বামীজী এই লজে দশ-বার দিন কাটিয়েছিলেন। এখানকার শান্ত পরিবেশ স্বামীজীর খুব ভাল লেগেছিল। একশ বছরের বেশি পুরনো পাইন ও বার্চ গাছ আজও লজের আশপাশে ছড়িয়ে আছে। এরকম একটি গাছের তলাতেই সমাধিমগ্ন স্বামীজীকে দেখে সবাই ভেবেছিলেন, তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

লজের চেহারা এখনো সেদিনের মতনই রয়ে গেছে। বারান্দায় বসে লেক আর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ছিল সেই মহাপুরুষের কথা। এই চেয়ারেই হয়তো তিনি বসে থাকতেন। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! এই কবিতাটি তখনই লেখা।

—অসীম চৌধুরী

ভাবানুবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণে মরণভয় নাশ

প্রসিত রায়চৌধুরী

দেহ তো আত্মা নয়,
দেহ যাবে তাই ভয়,
কাঁদে যারা দীন হীন
তারা নাস্তিক, তাই নয় নির্ভয়।
যারা পেল রামকৃষ্ণ-পদের আশ্রয়
তাদের ঘুচলো প্রপঞ্চ-ভয়
তারা তাঁর কাছে পেয়েছে অভয়,
আস্তিক তারা, বীর নির্ভয়।
বেদসাগর মন্থন করা সুধার সার,
শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার,
করি ধ্যান অবিরাম চরণ তাঁর,
হব পার, ভব-পারাবার।
আত্মা তো দেহ নয়, তার নাহি নাশ হয়,
তবে কেন এত ভয়।
শ্রীরামকৃষ্ণ সুধা পানে
ভবধামে হও মৃত্যুঞ্জয়।

রোদে ঝিকিমিকি করে নীল লেক ক্রিস্টাইনের জল—
অগাধ, অতল।
চারিদিকে পাইনের সারি—
বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে ফেলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ভারি।
সে-বাতাস খুঁজে মরে মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাসীর কায়া।
ঘন বনানীর মাঝে খেলা করে আলো আর ছায়া।
সাদা আর কালোতে যে হেথা কোন ভেদাভেদ নাই।
কালো পাইন, সাদা বার্চ একসাথে মিশে আছে তাই।
পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে—
নীলাকাশ কোলে নেয় সাদা মেঘে হাতটি বাড়িয়ে।
পাথরের বুকে জল অবিশ্রান্ত তোলে কলতান।
দুঃখকষ্ট ভুলে গিয়ে মনে জাগে আনন্দেরই গান।
শান্ত, স্নিগ্ধ, সমাহিত, নির্জন লজের পরিবেশ—
স্বামীজীর পুণ্যস্পর্শে হয়েছে যে পবিত্র অশেষ।
হেথা শতবর্ষ আগে গাছের ছায়ায় কতদিন
সে-গেরুয়াধারীর মন হয়েছিল ব্রহ্মেতে বিলীন।
তাই আজ সে-লেকের জল
কৃতজ্ঞ অসীম; ধুতে পেরে তার পুণ্য পদতল।
নগরের কোলাহল থেকে বহুদূরে,
স্বর্গ যদি কোথা থাকে আছে লেক ক্রিস্টাইনের তীরে;
পার্সি শহরে।

কর তুমি আজি

স্বামী ভাবঘনানন্দ

রামকৃষ্ণ-লীলাসাথী ওগো নরঋষি!
ধ্বনিত মহিমা তব বিশ্বে দশদিশি॥
প্রভুকার্যে সর্বত্যাগ কর অকাতরে।
তাঁরি বাণী প্রচারিলে সারা জগৎ জুড়ে॥
কি যে তুমি করে গেলে জগতের তরে।
সাধ্য কারো নাহি হয় ইহা শোধ করে॥
জীবনই দিয়ে গেলে সকলের হিতে।
শিবজ্ঞানে জীবসেবা দেখালে জগতে॥
যেখানেই থাক নাকো হে প্রিয় স্বামীজী!
সকলেতে কৃপাদৃষ্টি কর তুমি আজি॥





সূর্য-চেনা

মানসী বরাট

একি গো উদয় হওয়া
জ্বালিয়ে আগুন আকাশতলে।
একি গো বিদায় নেওয়া
আকাশ ধুইয়ে নয়নজলে!

এ তুমি সেই রবি যে ভৈরবীতে
পুবগগনে বাজাও বাঁশি।
এ তুমি সেই রুদ্ররাগে বাজাও বীণে
মধ্যদিনে হে উদাসী।

এ তুমি কাহার আশে সন্ধ্যাকাশে!
তোল যে-সুর পুরবীতে
সে-সুরের কাঁপন লাগে চাঁদের বুকে
সাত সাগরের জলছবিতে।

দাও সবে আজ ডাক

বিভাস রায়

তোমার কানে দিলেন গুরু প্রেমের মন্ত্রধ্বনি,
বিলিয়ে দিলে, ছড়িয়ে দিলে মন্ত্র জাগরণি—
তোমার মনে সেবার বীজ দিলেন পুঁতে গুরু,
সেদিন থেকেই জগতে তার বিজয়যাত্রা শুরু।
বৈরাগ্যের অগ্নি জেলে পুড়িয়ে দিলেন কাম,
তোমার গুরু মহাসাধক রামকৃষ্ণ নাম।
ভয়ঙ্করী কালীর মুখে এঁকে দিলেন কবি
সত্য শিব সুন্দরের চিরকালীন ছবি।
জানান গুরু জীবের মধ্যে শিবের অধিষ্ঠান,
জাগ্রত সেই নারায়ণের করলে যে সম্মান।
দীক্ষা নিলে, করলে বরণ ত্যাগের মহাব্রত,
সারাজীবন রয়ে গেলে মানবসেবায় রত।
বীতরাগভয়ক্রোধ, ভোগে পরাঙ্মুখ;
জাগল বিবেক, আসল চেতন, আনন্দ ও সুখ।
তোমার হাতেই দিলেন গুরু পাঞ্চজন্য শাঁখ,
আওয়াজ তোল, আওয়াজ তোল, দাও সবে আজ ডাক।

অমৃতাভ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

সমগ্র ধরণী আজ উদ্বেগ ও শঙ্কায়
নিদ্রাহীন অস্থির উদ্বেল।
শ্যামল সমুদ্রবক্ষে রক্তলোভী ক্রুদ্ধ অক্টোপাস
নির্বিবাদে করে বিচরণ,
রুদ্ধদ্বার মন্ত্রগৃহে বসি'
সর্পচক্ষু জুডাসের দল
বিশ্বজুড়ে করিতেছে বিষাক্ত মন্ত্রণা।
জীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হতাশার সর্বগ্রাসী ছায়া
নিরুদ্বেগে মেলিয়াছে দ্বিধাহীন বিস্তৃত অঞ্চল,
তৃণহীন সাহারার রুদ্র খর তাপে
মর্তের কস্তুরী-মৃগ মাথা কুটে মরে
নিষ্ফল আক্রোশে।
সীমাহীন কামনার দুর্নিবার স্রোত
যত্রতত্র বয়ে যায় উদগ্র নির্লাজ;
লেলিহান লালসার ঊর্ধ্বমুখী শিখা
নিঃশেষে করিছে গ্রাস
জীবনের আশা অবশেষ।
বিস্ফোরণ-প্রতীক্ষায় কাঁপে থরথর
ধূমায়িত আগ্নেয়পর্বত।

ফিরে এস—অমৃতাভ,
সৃষ্টির সঙ্কটে, সভ্যতার তামসী সন্ধ্যায়
ক্রুশক্ষত দীপ্ত-শান্ত তনুখানি তব
অমার্জিত পশুত্বের ফিরাক প্রত্যয়;
তোমার পবিত্র রক্ত যজ্ঞাগ্নির শিখা অনির্বাণ,
প্রজ্বলন্ত তীব্র তার তেজে
বিষণ্ণ বিশ্বের বিবর্ণ বিবেক
প্রোজ্জ্বল হইয়া যাক স্বকীয় বিভায়।
ক্রূর ঈর্ষা আর অন্ধ হিংসার
নির্বাধ ফেনিল তরঙ্গধারা
স্তব্ধ করি প্রেম আর করুণায়
শর্তহীন আত্মবলিদানে
এস তুমি মৃত্যুহীন মানব-ঈশ্বর,
বোধহীন স্বার্থপর মানব-পশুর
হিংসার নির্মম ক্ষতচিহ্ন
এঁকে নিতে পুনরায় সর্ব অঙ্গে তব
এস তুমি ক্ষমা মূর্তিমান!
ক্রন্দসী ধরণীর পাণ্ডুর নয়নে দিতে
জীবনের নির্ভয় অঞ্জন,
অশান্ত আগ্নেয়পাহাড়-শীর্ষে
অমৃতপুরুষ—এস যীশু,
জ্যোতির তনয়॥

উদ্বোধন

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

বুকের গভীরে
কেউ যেন নিরন্তর বলে চলেছে
ভাঙো!
কিভাবে ভাঙব?
কেমন করে ভাঙতে হয়?
যেভাবে বীজ ভেঙে
মাথা তোলে অঙ্কুর!
অথবা
ফুলের গন্ধ যেভাবে
নিজেকে ভেঙে
টুকরো করে
ছড়িয়ে দেয় বাতাসে!
এই নাও স্বস্তি
একে ভাঙো;
এই নাও স্বপ্ন
একে ভাঙো;
এই নাও শরীর
একে ভাঙো;
দোহাই! শুধু—
আমার জন্য রেখো
আমার দুটো হাত
আর হৃৎপিণ্ড
আমি তাকে নিজের হাতে
ভেঙে রেখে যাব।

প্রবন্ধ

স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম'-ভাষণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান

বিশ্বরঞ্জন নাগ

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রথম ও শেষদিন সহ আরও কয়েক দিন ভাষণ দেন। সেগুলির মধ্যে দীর্ঘতমটি প্রদত্ত হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর। এটি ছিল ধর্মমহাসভার নিয়মানুসারে একটি পঠিত ভাষণ। এর শিরোনাম— 'Paper on Hinduism'। এই ভাষণে স্বামীজী হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের উল্লেখ করেন।

বিগত একশ বছরে বিজ্ঞানে অনেক পরিবর্তন এসেছে, অনেক নতুন তত্ত্ব সংযোজিত হয়েছে, যার ফলে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানে স্বীকৃত অনেক সত্য আজ আর সত্য নয়। যেসব তত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তার অধিকাংশই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি মূল তত্ত্ব—'রিলেটিভিটি' এবং 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কণাসমূহ (Elementary particles) তখনো অনাবিষ্কৃত এবং কণাতত্ত্বও (Particle Physics) বিকশিত হয়নি। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্স প্লাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রথম উপস্থাপন করেন, রিলেটিভিটির কথা আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। নীল্‌স বোরের অণুর গঠনতত্ত্ব প্রকাশিত হয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে এবং এই তত্ত্ব পূর্ণরূপ পায় ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণে (Wave Equation)। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি তত্ত্বে বস্তুর ভর ও শক্তির অভিন্নতার কথা বলা হলেও বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরের কথা স্বীকৃত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে রেডিও অ্যাক্টিভিটির শক্তির উৎসের ব্যাখ্যায়। এই অভিন্নতা আরও সুদৃঢ় স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে অ্যান্ডারসন ইলেকট্রনের প্রতিকণা (antiparticle) পজিট্রন আবিষ্কার করার পর।

দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান যেসব তত্ত্বের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তার অধিকাংশই স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই রকম পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও। জীবতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণের সময়ে ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজে পায়নি, কিন্তু আজ এইসব বিষয়ও পদার্থবিজ্ঞানের মতোই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ-করা সত্যকেই তাঁর ভাষণাবলীর ভিত্তি করেছিলেন—এবিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও জানবার কৌতূহল হয়, স্বামীজীর বক্তৃতার পরে গত একশ বছরে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন হলেও তার বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিগুলি গ্রহণীয় থাকছে কিনা। এই কৌতূহল নিরসনের জন্যই এই প্রবন্ধ।

স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম'-বক্তৃতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর প্রমাণসাপেক্ষ যুক্তি। বক্তৃতায় তিনি অদ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন; জন্মান্তরবাদ, প্রতিমাপূজা ইত্যাদি হিন্দুদের ধর্মাচরণের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি কিন্তু কখনো বলেননি যে, তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কথা শ্রোতাদের মেনে নিতে হবে। ঐ ভাষণে একটি কথাই তিনি বারবার বলেছেন যে, হিন্দুঋষিগণ সত্যকে জেনেছিলেন এবং যথার্থ সত্যান্বেষী হলে ঋষিগণের বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষার মাধ্যমে সেই পরম সত্যকে অনুভব করা সম্ভব। জন্মান্তরবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, অনুশীলন করলে পূর্বজন্মের কথাও স্মরণে আনা যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতোই তিনি বলেছেন, পরীক্ষাই যেকোন তাত্ত্বিক মতবাদের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদি যুগে পরীক্ষার কোন স্থান ছিল না। আজ আমরা যাকে 'বিজ্ঞান' বলি তখন তাকে বলা হতো 'প্রাকৃতিক দর্শন'। প্রাকৃতিক ঘটনার আপাত-সত্যকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করাই ছিল এই দর্শনের লক্ষ্য। যুক্তি, তর্কের মাধ্যমে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র, বল কাজ না করলে কোন বস্তু গতিশীল থাকতে পারে না, ভারী বস্তু হালকা বস্তুর চেয়ে তাড়াতাড়ি ওপর থেকে মাটিতে পৌঁছায়—এমনই সব আপাতসত্য। বিজ্ঞানীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয় গ্যালিলিও ও নিউটনের সময় থেকে। গ্যালিলিও আপাতসত্যের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, উল্লিখিত তিনটি আপাতসত্যের কোনটিই সত্য নয়। পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়, বল ক্রিয়া না করলেও বস্তু গতিশীল থাকে এবং সব বস্তুর একই সময় লাগে উঁচু স্থান থেকে মাটিতে পড়তে। পরীক্ষিত সত্যের পর্যালোচনা থেকে তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করা এবং গণিতের সাহায্যে সেই নিয়মের মাধ্যমে সত্যকে প্রমাণ করার পদ্ধতি

নিউটন প্রবর্তন করেন। মহাকর্ষ বল (Gravitational Force) এবং গতির নিয়মের (Laws of Motion) সূত্রগুলি আবিষ্কার করে নিউটন গ্যালিলিওর পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করেন। এর পর থেকেই পরীক্ষা ও তত্ত্ব হয় বিজ্ঞানের ভিত্তি। তাই মিলিকান, যিনি ইলেকট্রনের আধান (charge) মেপে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের নোবেল-বক্তৃতায় বলেছিলেন: "বিজ্ঞান পরীক্ষা ও তত্ত্ব—এই দুই পায়ে চলে।" স্বামীজীও তাঁর বক্তব্য রেখেছেন বিজ্ঞানের এই প্রমাণিত কার্যধারাকে স্বীকার করে। তিনি হিন্দুধর্মের যথার্থতা প্রসঙ্গে বলেছেন: "The Hindu does not want to live upon words and theories.... The Hindu religion does not consist in struggles and attempts to believe a certain doctrine or dogma, but in realising—not in believing, but in being and becoming." (হিন্দু কেবল মতবাদ ও শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকতে চায় না।... কোন মতবাদ অথবা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করার চেষ্টাতেই হিন্দুধর্ম নিহিত নয়; অপরোক্ষানুভূতিই তার মূলমন্ত্র; শুধু বিশ্বাস করা নয়, আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়াই—সেটি জীবনে পরিণত করাই ধর্ম।) অর্থাৎ শুধু বিশ্বাস নয়, ঋষিদের পরিজ্ঞাত সত্যকে জীবনে কার্যকরী করাই হিন্দুধর্ম। শুধু তত্ত্ব নয়—তত্ত্বকে উপলব্ধি করা এবং উপলব্ধিকে জীবনে রূপায়িত করাই হিন্দুর ধর্ম।

বেদকে হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলে নির্দেশ করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, বেদ অনাদি ও অনন্ত। একথার সপক্ষে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, বেদে কতকগুলি আধ্যাত্মিক নিয়ম বিধৃত। প্রকৃতির জড়জগতের নিয়মগুলির মতোই আধ্যাত্মিক নিয়মেরও কোন আরম্ভ নেই এবং শেষ নেই। তিনি মহাকর্ষ বলের নিয়মের উল্লেখ করে বলেছেন, আবিষ্কৃত হওয়ার আগেও যেমন নিয়মটি ছিল তেমনি আমরা ভুলে গেলেও নিয়মটি থাকবে। আবার অনাদিকাল ধরেই যে আধ্যাত্মিক নিয়মগুলি আছে তার প্রমাণ হিসাবে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, সৃষ্টি সবসময়েই ছিল। ভগবানের শক্তিতে বিশৃঙ্খলা (chaos) থেকে শৃঙ্খলা (system) হয়, কিছুদিন এই শৃঙ্খলা চলে, আবার ধ্বংস হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, শোনা যায় বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে—মহাবিশ্বের শক্তির মোট পরিমাণ সব সময়েই এক।

স্বামীজীর বক্তৃতার সময় বিজ্ঞানীরা জানতেন, বস্তুর ভর এবং শক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন সত্তা। কোন বস্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (chemical reaction) অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে, কিন্তু এধরনের রূপান্তরে মোট ভর একই থাকে। আবার শক্তিও এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু মোট শক্তির পরিমাণ একই থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রিলেটিভিটি, রেডিও অ্যাক্টিভিটি ও প্রতিকণার আবিষ্কারের পরে জানা যায় যে, বস্তু ও শক্তি মূলতঃ অভিন্ন। বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, আবার শক্তিও বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু বস্তু ও শক্তির মিলিত পরিমাণ সব সময়েই এক থাকে। স্বামীজী বলেছেন—"Cosmic Energy", বস্তুকে তিনি আলাদাভাবে উল্লেখ করেননি। কিন্তু মহাবিশ্বের মূল উপাদান যে ধ্রুবক, আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি স্বামীজীর উক্তিটি।

স্বামীজী বলেছেন, সৃষ্টি (creation) চিরন্তন। এপ্রসঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানে আদি বিশ্ব (early universe) নিয়ে গবেষণার আলোচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, বিশ্ব কয়েকটি মূল বস্তুকণা ও শক্তিকণার যোগাযোগেই প্রকাশিত হয়েছে এবং বিশ্বের সব ঘটনার মূলে আছে চার ধরনের বল—মহাকর্ষ বল (Gravitational Force), তড়িৎ চুম্বকীয় বল (Electro-Magnetic Force), দুর্বল অন্তর্বল (Weak interaction) ও সবল অন্তর্বল (Strong interaction)। বিভিন্ন বস্তুর ভর ও পরস্পরের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে মহাকর্ষ বল আকর্ষণ ঘটায়। গ্রহ, নক্ষত্র এবং বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে ধরে রেখেছে এই মহাকর্ষ বল। তড়িৎ চুম্বকীয় বল বস্তুর আধানের প্রকার ও পরিমাণ এবং পরস্পরের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ঘটায়। অণু ও পরমাণুর স্থায়িত্ব আসে এই বলের কার্যকারিতা থেকে। অপর দুটি বল কাজ করে কেন্দ্রকের (Nucleus) অভ্যন্তরে এবং কেন্দ্রকের নিউট্রন, প্রোটন বা কোয়ার্কদের একত্রে ধরে রেখে বস্তুর স্থায়িত্ব দেয়। কয়েক বছর আগে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্বল অন্তর্বল এবং তড়িৎ চুম্বকীয় বল একই বলের বিভিন্ন রূপ—উচ্চ তাপমাত্রায় এই দুটি বলকে আলাদাভাবে ধরা যায় না। অপর দুটি বলকেও একীকরণের জন্য গবেষণা চলছে। সবল অন্তর্বলের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সাফল্য এসেছে, কিন্তু পরীক্ষায় প্রমাণ এখনো মেলেনি। মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রেও চেষ্টা চলছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম অগ্রগতি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আরও মনে করছেন যে, এই বলগুলি কাজ করে কতগুলি শক্তিকণা বা বোসনের (Boson)

মাধ্যমে ; যেমন—দুটি তড়িৎযুক্ত বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ঘটে তড়িৎ চুম্বকীয় বলের শক্তিকণা ফোটনের বিনিময়ের জন্য। এই ফোটনই যখন বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন রেডিওতরঙ্গ বিকীর্ণ তাপ বা আলো হয়ে দেখা দেয়। দুর্বল অন্তর্বলেরও ফোটনের মতো শক্তিকণার সন্ধান পাওয়া গেছে। সবল অন্তর্বল এবং মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রেও একই ধরনের শক্তিকণার কথা ভাবা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা এইসব তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বসৃষ্টির কয়েকটি 'মডেল' দাঁড় করিয়েছেন। মডেলগুলি সাধারণভাবে বোধগম্য নয়—সাধারণ বুদ্ধিতে সিদ্ধান্তগুলিকে মনে হয় কষ্টকল্পনা। তবে মডেলগুলির মধ্যে 'বিগ ব্যাং' (Big Bang) মডেলটিই প্রাধান্য পাচ্ছে। সহজে বোধগম্য না হলেও এই মডেলটির মূল বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মনে করা হয়, বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান শূন্যে (vacuum) সঞ্চিত অসীম শক্তি। সৃষ্টির শুরুতে মহাবিশ্ব একটি বিন্দু থেকে বিস্তৃত হতে আরম্ভ করে। এই বিস্তৃতির ফলে যে-শূন্য সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যের সঞ্চিত শক্তিই প্রথমে শক্তিকণারূপে প্রকাশিত হয়। পরে শক্তিকণা থেকে বস্তুর কণা ও প্রতিকণাগুলি জন্ম নেয়। প্রতিকণাগুলি মিলিয়ে যায়, কিন্তু কণাগুলির একটা অংশ থেকে যায়। পরবর্তী কালে মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সম্মিলিত কণাগুলি থেকে পরমাণু, অণু, গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকা সৃষ্টি হয়। যে-শক্তিকণাগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু দুর্বল ও সবল অন্তর্বলের শক্তিকণা অণু-পরমাণুর কেন্দ্রকে বাঁধা পড়ে। বাকিরা মিলিয়ে যায়। তড়িৎ চুম্বকীয় বলের শক্তিকণা ফোটনগুলির কিছু অংশও অণু-পরমাণুতে বাঁধা পড়ে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ফোটনকণা বিশ্বের মুক্তস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষায় এই ফোটনগুলির অস্তিত্ব মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকীরণরূপে ধরা পড়ায় বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মনে করছেন যে, বিগ ব্যাং মডেলটিই আদি বিশ্বের ঠিক ঠিক বর্ণনা দিচ্ছে। লক্ষণীয় যে, এই বর্ণনায় মহাকর্ষ বল সৃষ্টির আদি থেকেই আলাদাভাবে ছিল ধরা হয়েছে, যদিও অন্য তিনটি বলের শক্তিকণার একীভূত অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে।

শুরু থেকে যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে আদি বিশ্বের বর্ণনায় বিজ্ঞানীরা তার আলোচনা করেছেন। কিন্তু শুরু কেন হলো এবং শুরুর আগে কি ছিল সে-সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কথা তাঁদের কেউই বলতে পারছেন না। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, শুরুর আগে বিশ্বের যেমন কোন আকাশ (space) ছিল না, তেমনি কালও (time) ছিল না। কাজেই শুরুর আগের কথার কোন বৈজ্ঞানিক অর্থ নেই। আবার বিশ্বের শেষ কিভাবে হবে তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা একমত নন। একদল বিজ্ঞানীর মতে যে মূল বস্তুকণা বস্তুজগতের ভিত্তি, সেই প্রোটনও কালক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই মতবাদের পরীক্ষা চলছে, এখনো প্রমাণিত হয়নি। যদি প্রমাণিত হয় তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, সৃষ্টির শেষে সব বস্তুকণা শক্তিকণায় রূপান্তরিত হয়ে আবার আদিম অবস্থায় ফিরে যাবে। অন্য একদল বিজ্ঞানীর মতে, যদিও বিশ্ব বর্তমানে বিস্তৃত হয়ে চলেছে, একসময় আবার সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করবে বা 'বিগ ক্রাঞ্চ' (Big Crunch) আসবে। তখন আবার সঙ্কুচিত বিশ্ব মহাকর্ষের প্রভাবে একীভূত হয়ে বিন্দুতে ফিরে যাবে। বিগ ব্যাং নিয়ে যারা অঙ্ক কষছেন তাঁরা বলছেন, এভাবে সঙ্কুচিত বিশ্ব থেকেও আবার নতুন বিশ্ব জন্ম নিতে পারে। তাই বিশ্বের শুরু এবং শেষ নিয়ে কোন মতবাদ এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও, বিশ্ব একবার বিন্দু থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আবার অন্তিমকালে সেই বিন্দুতে ফিরে যাচ্ছে—এই মতবাদই প্রাধান্য পাচ্ছে। এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিশ্বের মোট পরিমাণ দৃশ্যমান বস্তুর চেয়ে বেশি হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, বিশ্বে অনেক পরিমাণ বস্তু অদৃশ্য অবস্থায় আছে। এই অদৃশ্য বস্তুর (Dark Matter) সন্ধান চলছে।

আদি বিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মতবাদ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে স্বামীজীর উল্লিখিত বক্তব্যের কোন বিরোধ নেই। মহাকর্ষ বল আদিতে ছিল, অন্তেও থাকবে। আবার বিশ্ব একবার প্রকাশিত হবে, কিছুদিন চলবে, আবার মিলিয়ে যাবে—এই বক্তব্যকেও বিজ্ঞানসম্মত বলতে হবে। সৃষ্টি সম্পর্কে স্বামীজীর সুস্পষ্ট বক্তব্য : "And this agrees with modern science."

স্বামীজী হিন্দুধর্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিজ্ঞানের কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"Are not all the tendencies of the mind and the body accounted for by inherited aptitude?" (দেহ-মনের প্রবণতা মাতাপিতার দেহ-মনের প্রবণতা থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ হয় না কি?) "But it cannot be proved that thought has been evolved out of matter...." (কিন্তু জড় থেকে চিন্তা উদ্ভূত হয়েছে—এটা প্রমাণ করা যায় না।) "We

cannot deny that bodies acquire certain tendencies from heredity...." (আমরা অস্বীকার করতে পারি না, শরীরমাত্রেই উত্তরাধিকার-সূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে।)

এর পরে আত্মার কথা বলে স্বামীজী বলছেন, আত্মার স্বভাবও অভ্যাস দ্বারা নির্ধারিত এবং এই অভ্যাস এই জীবনে হয়নি, নিশ্চয়ই অতীত জীবন থেকে এসেছে।

বংশগতি (Heredity) বর্তমানে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্য। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের দুটি অংশ আছে—একটি হলো জেনোটাইপ এবং অপরটি ফেনোটাইপ। যে-শরীর নিয়ে মানুষ জন্মায়, তার মধ্যেই মানুষের বিভিন্ন কার্যকৌশলের ক্ষমতা নিহিত থাকে। এটি হলো বংশগতির মাধ্যমে পাওয়া জেনোটাইপ। কিন্তু ফেনোটাইপ হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং পরিবেশের ওপর নির্ভর করে যে-কার্যক্ষমতা গড়ে ওঠে। জেনোটাইপ এক হলেও ফেনোটাইপ আলাদা হতে পারে। স্বামীজীর বক্তব্য, শরীর ও মনের সম্ভাবনাময় দিকটি যে বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত তা আধুনিক বিজ্ঞানে স্বীকৃত সত্য।

বিজ্ঞানীরা thought বা চিন্তা এবং চেতনা বা consciousness নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করছেন। একদল বিজ্ঞানীর মতে চিন্তা ও চেতনা বস্তুভিত্তিক। শরীরের বস্তুসত্তাকে ভেঙে ভেঙে দেখলে চিন্তা ও চেতনা কি করে উদ্ভূত হয় তা বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখলে চিন্তাকে বস্তুরই প্রকৃতি বলে বোঝা যাবে। উদাহরণ হিসাবে বলা হচ্ছে যে, একটি ছবিকে যদি কেউ ভেঙে ভেঙে খুঁচিয়ে দেখে তাহলে মনে হবে সেটি কতগুলি রঙের সমষ্টি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ছবিটি রঙের সমারোহের বাইরে অন্য একটা চেহারা পেয়ে যায়। অনেকে বলছেন কম্পিউটারের কথা। কম্পিউটার কতগুলো যন্ত্রাংশের সমষ্টি হলেও মানুষের মতো বিভিন্ন গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান করতে পারে, ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত দিতে পারে, খাতা লেখার কাজ এবং দৈনন্দিন বহু কাজ মানুষের মতোই করতে পারে। এমনকি যেসব প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটার কাজ করে, প্রয়োজনানুসারে সেই প্রোগ্রামও পালটে নিতে পারে। কিন্তু মানুষের মতো অনেক কাজ করতে পারলেও কম্পিউটারের যে 'আমি' আছে—এ-সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা করতে পারছেন না। চিন্তা বা cognition-কে বিজ্ঞানীরা এখনো বুঝে উঠতে পারেননি। কোন খবর মস্তিষ্কে পৌঁছালে মস্তিষ্কের যে রাসায়নিক বা অন্যান্য পরিবর্তন হয় তার ওপরে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের ফলে কোন মানুষের যে-চেতনা জন্মে তাকে পরীক্ষার আওতায় আনা যায়নি। অনেক বিজ্ঞানীর অন্যমত হলেও স্বামীজীর যে-উক্তি—চিন্তা বস্তু থেকে উদ্ভূত তা প্রমাণ করা যায় না—এখনো পর্যন্ত তার বিরোধী সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চিন্তার কথা বলার পরে স্বামীজী আত্মার কথা বলেছেন। আত্মা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কোন পরীক্ষা করেছেন বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যাবে—একথা বলা যায় না। জাতিস্মর বা যাদের পূর্বজীবনের স্মৃতি আছে এমন লোকের কথা মাঝে মধ্যে শোনা গেছে, দেখাও গেছে। Parapsychology বা অসাধারণ মনস্তত্ত্ব একসময়ে বিশেষভাবে অনুশীলিত হয়েছিল। এমনকি এবিষয়ে বিজ্ঞান-পত্রিকাও রয়েছে। কিন্তু কোন সঠিক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা জাতিস্মরদের নিয়ে করতে পেরেছেন, সেকথা বলা যায় না। আত্মা বিজ্ঞানীদের যন্ত্রে ধরা না দিলে পূর্বজন্ম ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার—এসবও বিজ্ঞানের আওতায় আসার সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে স্বামীজীর নির্দেশিত পথের বিকল্প নেই। স্বামীজীর উক্তি : "Try and struggle, they would come up and you would be conscious even of your past life." (চেষ্টা ও সাধনা কর, ঐগুলি [পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ বা স্মৃতি] সব ওপরে উঠে আসবে, এমনকি পূর্বজন্ম সম্বন্ধেও তুমি জানতে পারবে।) এর সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এটুকুই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী জার্মান বিজ্ঞানী শ্রোডিঙ্গার অন্যান্য আরও বহু জার্মান বিজ্ঞানীদের মতোই বেদান্তের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করলেও পুনর্জন্মবাদ গ্রহণ করতে পারেননি। মানুষের বিদেহী অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া বিজ্ঞানীদের পক্ষে সহজে সম্ভব হবে মনে হয় না। একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞানীরা কিন্তু শক্তির কণা বা শক্তির তরঙ্গের বস্তুবিহীন অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। একসময়ে আলোর সঙ্গে জড়িত শক্তিকে বুঝবার জন্য বিজ্ঞানীরা কাল্পনিক বস্তু ইথারের কথা ভেবেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, শক্তির প্রকাশের জন্য বস্তুর প্রয়োজন নেই। আকাশেই (space) শক্তি প্রকাশিত হয়, যার বহুল ব্যবহার বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে। কাজেই চেতনাকে বস্তুনির্ভর হতে হবে এমন কোন যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড় করানো যায় না। শক্তির মতো চেতনাও (consci-

ousness) আকাশকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হতে পারে; তবে এসম্পর্কে সিদ্ধান্ত করতে হলে আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে পদার্থবিদ্যা এবং মনস্তত্ত্ববিদ্যার আরও উন্নতি প্রয়োজন।

স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞান বোঝাতে গিয়েও বিজ্ঞানের কথা বলেছেন। তিনি বলছেন যে, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানুষের শরীর বিশ্বের বস্তু-মহাসমুদ্রেরই একটি অংশ। একইভাবে বলা যায়, মানুষের আত্মাও বিশ্বাত্মার একটি অংশ। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য একত্বকে (unity) খুঁজে বার করা। ধর্মীয় বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যও সেই 'এক'কে আবিষ্কার করা, সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যাঁর মায়াময় প্রকাশ অন্য আত্মায় বা জীবাত্মায়। এর পরেই স্বামীজী বলছেন ঃ "Manifestation, and not creation, is the word of science today, and the Hindu is only glad that what he has been cherishing in his bosom for ages is going to be taught in more forcible language, and with further light from the latest conclusions of science." (আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলে 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নতুনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হওয়ার উপক্রম দেখে তার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।) এরই সঙ্গে স্মরণ করা দরকার স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম'-ভাষণের প্রায় সূচনার এই উক্তিটি—"... the high spiritual flights of the Vedanta philosophy, of which the latest discoveries of science seem like echoes...." (বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহ বেদান্তের মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়... ।) আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যে, দৃশ্যমান বিশ্ব একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থা —এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত সংখ্যায় সিদ্ধান্ত করছেন যে, এই বিশ্ব-চরাচর একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ। কিন্তু স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। তখন বিজ্ঞানীরা বস্তু ও শক্তির স্বরূপ আলাদা জানতেন। স্বামীজীর বক্তব্যকে তখনকার বিজ্ঞানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত বলা যায় না। অথচ আজ সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। আজ আধুনিক বিজ্ঞান স্বামীজীর বক্তব্যকেই অনুসরণ করছে। হিন্দুধর্মের শিক্ষা—যাকিছু আমরা দেখছি তা-ই ব্রহ্মের প্রকাশিত সত্তা, নতুন করে কিছু সৃষ্টি হয় না। যা ছিল তা-ই নতুনভাবে প্রকাশিত হয়—"manifestation, and not creation"—এই সত্য বিজ্ঞানীরা না মেনে পারছেন না। শূন্যের পুঞ্জীভূত শক্তিই বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে দৃশ্যমান বিশ্ব হয়েছে। আবার বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অদৃশ্য হবে—এটাই হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। মনে রাখা দরকার যে, এই সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচিত হয়েছে স্বামীজীর বক্তৃতার অর্ধশতাব্দী পরে এবং সিদ্ধান্ত বিকশিত হয়েছে অতি সম্প্রতি—স্বামীজীর বক্তৃতার প্রায় এক শতাব্দী পরে। যে-আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তার সঙ্গে স্বামীজী এই স্বীকৃতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার কথা ভাবলে বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে উপায় নেই।

এই প্রবন্ধে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর 'Paper on Hinduism' বা 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক ভাষণে বিজ্ঞান-সম্পর্কিত উক্তিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী উক্তিগুলি করেছিলেন হিন্দুধর্ম যে বিজ্ঞানভিত্তিক তা বোঝাবার জন্য। আজ একশ বছর পরে বিজ্ঞানের জগতে আমূল পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজীর উক্তিগুলির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণ ঘটেনি, বরং কোন কোন উক্তির বিজ্ঞান-ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়েছে। অবশ্য স্বামীজীর চিন্তা (thought) ও আত্মা (soul) সম্পর্কিত উক্তি সম্পর্কে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এখনো সম্ভব হয়নি। কেননা এখন পর্যন্ত জানা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা বা আত্মার ওপরে পরীক্ষা করা যায় না। তবে একথাও বলা যাবে না যে, কোনদিন এধরনের পরীক্ষা করা যাবে না। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগে বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করেননি যে, অজ্ঞাত ও অদৃশ্য রেডিওতরঙ্গ আবিষ্কৃত হবে এবং সেই তরঙ্গ ব্যবহার করে একদিন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে খবর আদান-প্রদান করা যাবে বা দূরবর্তী দৃশ্যকে দেখা যাবে বা মহাবিশ্বের প্রান্তদেশের খবর সংগ্রহ করা যাবে। কাজেই আজ চিন্তা ও আত্মা বিজ্ঞানের আওতায় না থাকলেও কোনদিন আসবে না—একথা বলা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। যখন এই বিষয়-দুটিও বিজ্ঞানের আসরে আসবে তখনই বলা যাবে এসম্পর্কে স্বামীজীর উক্তি বিজ্ঞানসম্মত কিনা। আশা করা যায়, স্বামীজীর অন্যান্য উক্তির মতোই চিন্তা ও আত্মা সম্পর্কিত উক্তিও একদিন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত হবে।□

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ আধুনিক ভারত ঃ সত্যযুগ

সুমণি মিত্র

॥ ১ ॥

আচার্যবরিষ্ঠ বিবেকানন্দের বলদৃপ্ত ঘোষণা ঃ "যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।"[১] বক্তৃতাবলীতেও ঐ একই বক্তব্য—কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যাসহ—"When the cycle turns round they will go back to that Brahmanical origin. The cycle is turning round now, and I draw your attention to this fact."[২] (যখন যুগচক্র ঘুরে সত্যযুগ আসবে তখন আবার সকলেই 'ব্রাহ্মণ' হবে। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরে 'সত্যযুগ'-এর অভ্যুদয় হচ্ছে—আমি এব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।)

অতঃপর ১৮৯৯ সালের ১৪ জানুয়ারিতে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী স্বয়ং এই 'সত্যযুগে'র উদ্বোধন করে গেছেন। আর "এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ" হলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রমুখ অতিকায় মনীষিবৃন্দ। সেই ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সম্পাদক মহারাজের একনিষ্ঠ সেবায় 'উদ্বোধন' উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হয়ে আজ শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে যেভাবে চন্‌মন্ করছে, তাতেই প্রমাণিত হয়, এদেশে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মতো 'উদ্বোধন' আক্ষরিক অর্থে সাময়িক নয়—অর্থাৎ একপুরুষ-দুপুরুষের পত্রিকা নয়। এবং এই কথা স্মরণে রেখে তার ৯০ বছরে পদার্পণের সময় 'Statesman' থেকে শুরু করে 'দেশ', 'Telegraph', 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', 'যুগান্তর', 'বর্তমান', 'আজকাল', 'কথাসাহিত্য' বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকার অভিনন্দনের দুন্দুভিনিনাদ এখনো তো কানে বাজছে! আজ ৯৮ বছরে পড়েও যে-যৌবনান্বিত জীবন নিয়ে সে ওঠাবসা, নড়াচড়া, ছুটোছুটি করে চলেছে তাতে একশ বছর কেন, পাঁচশ বছরও তার অগ্রগতির লক্ষ্য হতে পারে না—ইদানীন্তনের বেড়া ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সে চিরন্তনের দিকে এগিয়ে যাবেই। আর চিরন্তন মানেই সত্য, যেহেতু সত্যই একমাত্র চিরন্তন।

স্বামীজী তাঁর দুহাতে পরস্পরবিরোধী দুজাতের মালমসলা যোগান দিয়ে গেছেন, যাতে তারা মিলেমিশে একজাতিতে পরিণত হতে পারে। একহাতে 'প্রাচ্য'—আরেক হাতে 'পাশ্চাত্য'; একহাতে 'ধর্ম'—আরেক হাতে 'বিজ্ঞান'; একহাতে 'সত্ত্ব'—আরেক হাতে 'রজঃ'। "এই দুই শক্তির সম্মিলনে ও মিশ্রণেই"[৩] সত্যযুগের বিশ্বব্যাপী শান্তিসৌধ নির্মিত হবে। এর বাসিন্দাদের ধর্ম হবে 'নয়াবেদান্ত', আর ইষ্টমন্ত্র হবে "যত মত তত পথ"। তাই "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"।[৪]

তবে কি সত্যিই 'রামকৃষ্ণ—Modern India—সত্যযুগ' তিনে এক, একে তিন?

দেখা যাক, এখনই কোন সিদ্ধান্ত নয়—স্বামীজীই তেড়ে আসবেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, নয়। যা বলি সবকথাগুলো বুঝে নিবি—মুর্খের মতো সবকথায় সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন।"[৫]

অতএব এইবার 'বোঝার' পালা—'নেবার' কথা এখন উঠছেই না।

॥ ২ ॥

বিবেকানন্দ-দুহিতা নিবেদিতার মতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'সত্যযুগের' প্রতীক অবশ্যই তবে 'Modern India'-র প্রতিভূ নন, বরং প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের তিনি পরাকাষ্ঠা—"... simple, half-naked, orthodox, the ideal of old time in India."[৬] (সাধাসিধে, অর্ধনগ্ন, আচারনিষ্ঠ, পৌরাণিক ভারতের আদর্শস্বরূপ।)

১ পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫৫, পৃঃ ৪৫৭ [স্বামীজীর অন্য চিঠিতেও ঐ কথা পাওয়া যায়। দ্রঃ পত্রাবলী, ১৩৯৪, পৃঃ ৪১২, ৪২১—সম্পাদক, উদ্বোধন]

২ Complete Works of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Vol. III, 6th ed., 1948, pp. 197-198

৩ 'বর্তমান সমস্যা' ['উদ্বোধনের প্রস্তাবনা']—স্বামী বিবেকানন্দ, ভাববার কথা, ১০ম সং, ১৩৫৩, পৃঃ ২৩

৪ ঐ, পৃঃ ১৮

৫ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, পূর্বকাণ্ড, ৯ম সং, ১৩৫৮, পৃঃ ৯৩

৬ The Master as I saw Him—Sister Nivedita, 6th ed., p. 97

একথা একদিন স্বামীজীর মুখ থেকেই শুনেছিলেন তিনি। কথাটা তাঁর এমন মনে ধরেছিল যে, পরবর্তী লাইনেই তিনি সগর্বে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি—"It was at once the greatness and the tragedy of my own master's life that he was not of this type. His was the modern mind in its completeness."[৭] (আমার গুরুদেবের জীবনের মহত্ত্ব এবং সেইসঙ্গে খেদের বিষয়ও এই যে, তিনি এই ছাঁচের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্বাঙ্গীণভাবে আধুনিক-মানসিকতাসম্পন্ন।)

নিবেদিতার তখনো বোধহয় স্বামীজীর সবটা বোধগম্য হয়নি। স্বামীজী কখন কোন্ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন, কখন সেটিকেই আবার নস্যাৎ করে দেবেন, তা তাঁর গুরুভাইরাও ভেবে ঠাওর করতে পারতেন না। এব্যাপারে খেদোক্তি শুনেছি খোদ 'দ্বিতীয় স্বামীজীর' মুখ থেকে। 'দ্বিতীয় স্বামীজী' মানে শরৎ মহারাজ—স্বামী সারদানন্দ। মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর পাশ্চাত্য ভক্ত ও শিষ্যারা "বিবেকানন্দ স্বামীকে Swami No. 1 এবং সারদানন্দ স্বামীকে Swami No. 2 বলতেন"।[৮] সেই Swami No. 2 একবার কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে যোগীন মহারাজকে (স্বামী যোগানন্দ) বলেছিলেন ঃ "নরেনের সব কথা তো বুঝতে পারি না ; কতরকম কথা বলে—যখন যেটাকে ধরবে তখন সেটাকে এমন বড় করবে যে, অপরগুলো একেবারে ছোট্ট হয়ে যায়।"[৯]

যাঁর কথায় স্বামী সারদানন্দের মতো বাঘা দার্শনিকেরও ধাঁধা লাগে, সেক্ষেত্রে আমাদের মতো হাঁদারা স্বামীজীকে কি বুঝবে? এখন আমরা কার কথা 'লব'? বিবেকানন্দ না নিবেদিতার? নিলে যুগাচার্যের কথাই নিতে হবে—যুগতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি সমধিক ওয়াকিবহাল।

আমরা জানি, 'সত্যযুগ'-এ একটিমাত্র বর্ণই ছিল—'ব্রাহ্মণ'। পরে অবনতির যুগে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি হয়। তাই স্বামীজীর নিঃসংশয় ইঙ্গিত—সবাইকে 'ব্রাহ্মণ' করার অভিযানে আমাদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে—"ক্রমে সকলকে ব্রাহ্মণ-পদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে।"[১০] ১৮৯৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার দিন ৪০/৫০ জন অব্রাহ্মণকে যজ্ঞোপবীত দিয়ে স্বামীজী স্বয়ং আনুষ্ঠানিকভাবে এই 'সত্যযুগ'-এর প্রতীক-উদ্বোধন করে গেছেন—"আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব।... আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে—বুঝলি?"[১১]

শিষ্য কতদূর কি বুঝেছিলেন জানি না, তবে স্বামীজী দেশজননীকে সম্রাজ্ঞীর মতো অপ্রতিরোধ্য গতিতে এক অত্যুজ্জ্বল যুগের দিকে পা বাড়াতে দেখেছিলেন—"I stand in awe before the unbroken procession of scores of shining centuries,... and there she is walking with her own majestic steps—my motherland—to fulfil her glorious destiny, which no power on earth or in heaven can check the regeneration of man the brute into man the God."[১২] (শতশত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সামনে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, আমাদের দেশজননী মহিমময় পদবিক্ষেপে পশু-মানবকে দেব-মানবে রূপান্তরিত করবার জন্য এক অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন ; স্বর্গ বা মর্তের কোন শক্তির সাধ্য নেই—এই জয়যাত্রার গতিরোধ করে।)

স্বপ্নায়িত এক ভবিষ্যতের দিকে কী ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রবল প্রেমিক আচার্য। ভাষাও তাই বিবেকানন্দসুলভ ঝঞ্ঝায়িত নয়—অসম্ভব এক বিশ্বাসের আবেগে স্নিগ্ধ এবং সঙ্গীতময়!

॥ ৩ ॥

কিন্তু এ-বিশ্বাসের ভিত্তিটা কি? এত আশা এবং উদ্দীপনার উৎসটি কোথায়? জাতিবর্ণনির্বিশেষে সবাইকে 'ব্রাহ্মণ' করবার অবাস্তব আদর্শে এতটা মেতে ওঠার কারণটা কি? স্বামীজী যাই বলুন, এ তো 'সত্যযুগ' নয়—'ঘোর কলি'। 'সত্যযুগের' কোনরকম সাত্ত্বিক গন্ধ তো নেই-ই, বরং আকাশে-বাতাসে কুচকুচে 'কলি'র বিশ্রী বোটকা গন্ধ। তামসিকতার দাপাদাপিতে বিশ্বজীবন দুর্বিসহ। 'পারমাণবিক' ও 'তারকাযুদ্ধে'র হুমকিতে

৭ The Master as I saw Him, p. 97

৮ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৪১, পৃঃ ১৭০

৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ১৭০

১০ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ১২০ ১১ ঐ, পৃঃ ১১৯ ১২ 'Complete Works', Vol. IV, 7th imp., p. 314

তামাম দুনিয়া দুঃস্বপ্নাক্রান্ত ও আতঙ্কিত! তাই আমরা স্বামীজীর এই অবিশ্বাস্য বিশ্বাসের অংশীদার হতে পারছি না—অথচ তাকে নড়াতেও পারছি না। কি জ্বালা!

মন থেকে সুখাসুখ, লাভালাভ, প্রিয়াপ্রিয় জ্ঞানের দ্বন্দ্বকে হটিয়ে দিয়ে বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের আলোয় যে ভাস্বরিত, সর্বত্যাগের অনাবিল আনন্দে যে হিল্লোলিত—সেই তো পারে এমন অসম্ভব অনাগতকে অভিনন্দন জানাতে। ব্রহ্মের বিরাট 'আমি'টা গায়েব করে সেই তো পারে অবাস্তবকে ঘাড় ধরে টেনে আনতে—মর্তে আকাশকুসুমের চাষ করতে। আমরা পারি না। তবে আমরা পারি না বলেই ত্রিকালজ্ঞ আচার্যের কথাটি বেবাক উড়িয়ে দেওয়া চলে কি? কিছু না হোক, একটা ব্যাখ্যার অন্ততঃ অপেক্ষা রাখে। অতএব প্রথমে স্বামীজীর স্বপ্নটাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে, ওতে অবিশ্বাস করার মতো অনিবার্য কোন যুক্তি আছে কিনা। এইভাবে এগনোই বুদ্ধিমানের কাজ—এতে ঠকতে হয় না।

কোন ঋতু যেমন ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট তারিখ থেকে শুরু হয় না, তেমনি কোন যুগও কোন নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হয় না—একটা যুগের অন্তর্যুগ হিসেবে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা-টিপে ঢুকে পড়ে। তখনো পূর্ববর্তী যুগের প্রাধান্য বজায় থাকে বলে আমরা নবীন যুগের আবির্ভাব টের পাই না। কিন্তু সাপ যেমন বেড়ালের নিঃশব্দ পদবিক্ষেপ বুক দিয়ে অনুভব করতে পারে, তেমনি ত্রিকালজ্ঞের সদাজাগ্রত কুণ্ডলিনী নবীন যুগের পদসঞ্চার অব্যর্থভাবে টের পায়। নিঃসাড়ে ঢুকলেও সে ছাইচাপা অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে না—ক্রমশঃ নিজেকে বিস্ফারিত করতে থাকে। এই অভ্যুদয়টা ত্রিকালজ্ঞের দৃষ্টি এড়ায় না।

একটা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—অনেকটা খোলসা হবে। ধরা যাক, বাড়ির একজনের 'টাইফয়েড' বা 'নিউমোনিয়া' হয়েছে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থেকে রোগমুক্তও হয়েছে, তবু এখনো বেশ কিছুদিন তাকে ডাক্তারের নির্দেশে বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে ও রোগীর পথ্য পেতে হচ্ছে। রোগ নেই, সেরে গেছে—তবুও। বাড়ির লোকেরা তাকে রোগী বলেই মনে করছে এবং তার সঙ্গে রোগীর মতোই ব্যবহার করছে। ডাক্তার নিশ্চিন্ত। তিনি জানেন, সে রোগমুক্ত—দুদিন পরেই বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠবে। সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে কলির কলুষ (germ) পালিয়েছে, তবু কলির অবসানে অন্তর্যুগরূপে সত্যযুগের প্রথম উন্মেষ তত স্পষ্ট নয় বলে আমরা বাড়ির লোকেরা তার আবির্ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না। কিন্তু যুগবৈদ্য নিশ্চিন্ত, তিনি জানেন—কলির কল্মষ কেটে গেছে, 'সত্যযুগ' এসে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের হিসেবমত তিনরকম বৈদ্য আছে—"একরকম, তারা নাড়ি দেখে ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। রোগীকে কেবল বলে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ কতকগুলি আচার্য উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু উপদেশে লোকের ভাল হলো কি মন্দ হলো তা দেখে না, তার জন্য ভাবে না। কতকগুলি বৈদ্য আছে, তারা ঔষধ ব্যবস্থা করে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তাকে অনেক বোঝায়। এরা মধ্যম থাকের বৈদ্য। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্যও আছে। তাঁরা উপদেশ দেন, আবার অনেক করে লোকদের বোঝান যাতে তারা উপদেশ অনুসারে চলে। আবার উত্তম বৈদ্য আছে। মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝলে তারা জোর পর্যন্ত করে। দরকার হয় রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেইরকম উত্তম থাকের আচার্য আছেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্যে জোর পর্যন্ত করেন।"[১৩]

॥ ৪ ॥

এখন বিচার্য, বিবেকানন্দ কোন্ থাকের বৈদ্য বা আচার্য—উত্তম, মধ্যম না অধম? অবশ্যই উত্তম থাকের—কেননা 'অবতারবরিষ্ঠে'র বরপুত্রকে তো 'আচার্যবরিষ্ঠ' হতেই হবে। তা যদি না হতেন তাহলে তিনি স্রেফ ওষুধ লিখে দিয়ে, মানে বক্তৃতা দিয়েই কাজ সারতেন; বড়জোর 'ওষুধ খেয়ো হে' বলে রোগীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরে পড়তেন—'বুকে হাঁটু' দেবার এমন বিশ্রীরকম তোড়জোর করতেন না:

"Therefore my plan is to start institutions in India to train our youngmen as preachers of truths of our scriptures in India and outside India."[১৪] (আমার পরিকল্পনা, আমি ভারতে কতকগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করব—যেখানে

১৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১১।৫।১৮৪-১৮৫

১৪ 'Complete Works', Vol. III, p. 223

আমাদের যুবকরা ভারতে এবং বহির্ভারতে আমাদের শাস্ত্রের সত্যসমূহ প্রচার করার ব্যাপারে শিক্ষালাভ করবে।)

সেরেছে! অতঃপর 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' প্রতিষ্ঠা করে সত্যি সত্যিই বিশ্ববাসীর 'বুকে হাঁটু' দেবার ব্যবস্থাটা তিনি পাকা করলেন! এখন সারা দুনিয়ায় (আক্ষরিক অর্থে) তার অজস্র ছোট-বড় ছানাপোনা—সব কোমর বেঁধে 'সত্যযুগে'র আনাগোনার জন্যে পেঁকো রাস্তা পাকা করছে। পরনে কুলির কালচে 'ইউনিফর্ম' নয়—ত্যাগীর লালচে গৈরিক। 'সত্যযুগে'র সড়ক তৈরি হচ্ছে না! হিমালয় থেকে পাথর এনে, সেই পাথরকে কুচিকুচি করে প্রেমের পিচে চুবিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিছিয়ে দিতে হবে না? 'আরণ্যক'কে জনারণ্যে ছড়াতে হলে, 'গুহার তত্ত্বে' বাড়ির উঠোন ভরাতে হলে আগে গুহাবাসীদের জটা-দাড়ি মুড়িয়ে, জামা-জুতো পরিয়ে লোকালয়ে আনতে হবে তো! নইলে যে ব্যবহারিক জীবনে বেদান্তই আসবেন না—কলির পঙ্কিলতা যাবে কি করে? 'সত্যযুগ' পা হড়কাবেন যে! তাই এ-কাজে যারা সেরা শ্রমিক তাদের পাহাড়-জঙ্গল থেকে টেনে এনে, সেই সর্বত্যাগীর দঙ্গলকে 'অসাম্প্রদায়িকতার' ব্যাজ পরিয়ে, পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে শহরে-আধাশহরে গ্রামে-গঞ্জে 'ডিউটি' দিয়ে গেছেন স্বামীজী। উনি স্বয়ং কুলিগিরি করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, 'সত্যযুগের' সড়ক তৈরির কাজে কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়—প্রেমে বুঁদ হয়ে কিভাবে একেবারে নেই হয়ে যেতে হয়। তিনি এইভাবে এক বিচিত্র সাধুসমাজকে ভারতীয় সন্ন্যাসাশ্রমের সনাতন খোলস থেকে খালাস করে বিশ্বসমাজের পরতে পরতে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাতে আমাদের 'সাধুসঙ্গ' শুধু সম্ভবই হয়নি—বাধ্যতামূলক হয়েছে, যা চিরদিনই দুর্লভ এবং লভ্য হলেও যাতে আমাদের সহজাত অনীহা। শরীরে পিত্তি বেড়ে গেলে যা হয় আর কি—তখন মিছরিও তেতো লাগে। তবু তা জোর করে খেতে কিংবা খাওয়াতে হয়, কেননা ঐ মিছরিই আবার পিত্তিনাশক। এখানেই স্বামীজী প্রথম শ্রেণীর প্রথম বৈদ্য—তাই 'মঠ ও মিশনে'র সাঁড়াশি আক্রমণে বিশ্বসমাজের বুকে 'ডবল' হাঁটু দেওয়ার এই উৎকট ব্যবস্থা!

আর কি অপূর্ব কৌশলে! "সেবাযোগে"র মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় যোগকে যোগ করে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে বিয়োগ করে দিয়ে এক অকল্পনীয় পরিকল্পনায় 'কলি'র দুর্যোগকে সামাল দিয়েছেন স্বামীজী। সাধুদের আত্মসাম্যবোধ বেহুঁশদের মনুষ্যত্বকে খুঁচিয়ে তাদের 'মান' সম্বন্ধে 'হুঁশ' আনতে তৎপর—যা আত্মসত্যে উপনীত হবার অন্তিম সোপান। এক্ষেত্রে স্বামীজীর পাল্লায় পড়ে সাধুরাই আগ বাড়িয়ে অসাধুদের সঙ্গ করতে বাধ্য হচ্ছেন—অবশ্যই পর্বতপ্রমাণ ঝুঁকি নিয়ে—পাহাড়-পর্বতে ঘাপটি মেরে বসে থাকলে যার কোন বালাই ছিল না। স্বামীজী তা জানতেন, কিন্তু তাঁর অত্যাভিজ্ঞানে নিজের ভক্তি ও মুক্তি পরের ভক্তি ও মুক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং তার জন্য হাসিমুখে 'দু-চারবার নরককুণ্ডে' যাওয়ার জন্য ready থাকা—"মুক্তি নাই বা হলো, দু-চারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা।... স্বর্গ, নরক, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care... আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।... আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ!"[১৫] বাপ্‌রে!

'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিনব জীব-ব্রহ্মবাদের আনকোরা যন্ত্রবিশেষ—কালোকে ধলো করবার, গাধাকে ঘোড়া করবার, ছাগলকে মানুষ করবার, অতঃপর মানুষকে দেবতা বানিয়ে কালচে 'কলি'র কলি-ফেরাবার সচল কারখানা। এ-কারখানায় 'শ্রমিক আন্দোলন' নেই, যেহেতু শ্রমের কোন পারিশ্রমিকই নেই—থাকলেও তা ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহার্য নয়। এবং পারিশ্রমিক নেই বলেই শ্রমে কাতরতাও নেই—বরং আগ্রহের আতিশয্য আছে। তাই এ-কারখানায় 'লকআউট' হয় না। তবে আমরা কিছু 'দ্বেষ-প্রেমিকে'র দল বাইরে থেকে নাক গলিয়ে সে-চেষ্টার ত্রুটি করি না। আসলে আমরা 'নারসিসাস', কিন্তু আত্মপ্রেমে 'নকআউট' হয়ে ফুল হয়েও ফুটতে পারি না![১৬] [ক্রমশঃ]

১৫ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৫২ ও ৪৪৯-৪৫০

১৬ গ্রীক ও রোমীয় উপকথার নারসিসাস অনুপম রূপ ও যৌবনে ভূষিত হয়েও কোনদিন কোন কামনাবিধুর অপ্সরার কাছে আত্মনিবেদনের আগ্রহবোধ করেননি। একদিন ভ্রমণরত অবস্থায় কোন জলাশয়ের তীরে যেতেই জলে তার অপরূপ রূপ দেখে তিনি এতই কামনাবিহ্বল হন যে, সেই আত্মপ্রতিবিম্বকে বাস্তবায়িত করার ব্যর্থ প্রয়াসে দিনের পর দিন সেদিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন এবং অবশেষে জরাজির্ণ দেহে মৃত্যুবরণ করেন। দেহত্যাগের সঙ্গেসঙ্গেই দেখা যায়, তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ একটি অনিন্দ্যসুন্দর সুগন্ধি ফুলে বিবর্তিত হয়েছে। সেই ফুলই 'নারসিসাস'—আজও তাঁর বিয়োগান্ত জীবনস্মৃতি বহন করছে। (দ্রঃ Myth Stories of Greece and Rome—G. Davidson, Gresham, London, pp. 95-98)

শ্রাদ্ধ-কথা

তারাপদ ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি: অগ্রহায়ণ ১৪০২ সংখ্যার পর]

শাস্ত্রের আদর্শ হলো নির্ভুল মন্ত্রোচ্চারণ এবং যথাবিহিত ক্রিয়াপদ্ধতি। মন্ত্র যেমন আছে, স্বরবর্ণে বা ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা সন্ধি বা সমাসবদ্ধভাবে, অবিকল তেমনি উচ্চারণ করতে হবে। এই জন্যই দেব-পিতৃকার্যে মন্ত্রের অনুবাদ ব্যবহার অনুমোদিত হয়নি। একটি শব্দের জায়গায় সমান অর্থবোধক শব্দও প্রতিষিদ্ধ হয়েছে। "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ"—শ্রাদ্ধের সময় যদি মধুর অভাব হয়ে পড়ে তবে গুড় দেবে, এইটি শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু নির্দেশ রয়েছে, গুড় দিলেও "মধু মধু মধু ইত্যেব বক্তব্যম্"—'মধু মধু মধু' এই শব্দই বলতে হবে। গুড় দিচ্ছি বলে 'গুড়ম্ গুড়ম্ গুড়ম্' বলা চলবে না। কারণ, দ্রব্যের প্রতিনিধিমূলক পরিবর্তন ঘটলেও এখানে মন্ত্রের বদল হবে না। তেমনি পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডের ওপরে সুতো দেবার মন্ত্র হলো: "এতদ্ বঃ পিতরো বাসঃ।" শ্রাদ্ধ যদি মায়ের হয় তবে তাঁর পিণ্ডের ওপরেও "এতদ্ বঃ পিতরো বাসঃ"—এই মন্ত্রই বলতে হবে, 'পিতরঃ' স্থলে 'মাতরঃ' বলা চলবে না। 'উহ' অর্থাৎ মন্ত্রের কোন শব্দ প্রয়োজনবশে পরিবর্তিত করে তার ক্ষেত্রে কোন নতুন শব্দ বসানো অচল নয়, কিন্তু সেসব ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত ও বহু বিচারসাপেক্ষ এবং কোন স্থলেই অনুবাদ বিধেয় নয়। মন্ত্রের বিশুদ্ধিতার জন্য বলা হয়েছে যে: "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা, মিথ্যা প্রযুক্তো ন তম্ অর্থম্ আহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি॥" (শিক্ষা, ৫৯)—মন্ত্র যদি স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণে ভুল উচ্চারিত হয় তবে মিথ্যা প্রয়োগ হলো বলে মন্ত্রের যা প্রকৃত অর্থ তা বলল না। সেই ভুল মন্ত্রবাক্য বজ্রের মতো যজমানের অনিষ্ট করে। সূর্যার্ঘ্যের মন্ত্র—"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্"-এর জায়গায় "নমো বীভৎস তে ব্রহ্মন্" বলতে শুনেছি। "শরমেব্রহ্মম্ বকে গৌরী"—এ তো প্রসিদ্ধ প্রয়োগ। অতীতে মন্ত্রের বিশুদ্ধিতার জন্য হয় বেদাঙ্গের অন্যতম 'ব্যাকরণ' অবশ্যপাঠ্য ছিল। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন: "রক্ষার্থং বেদানাম্ অধ্যেয়ং ব্যাকরণম্" (১।১।১)—বেদগুলির রক্ষার জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে হবে। "লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞো হি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি।" (১।১।১)—বর্ণের লোপ, বর্ণের আগম, বর্ণের পরিবর্তন যিনি জানেন তিনিই ঠিকমত বেদকে পরিপালন করবেন। মন্ত্রশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি"—একটি শব্দ যদি ঠিকমত জানা হয়, ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় তবে তা স্বর্গে এবং মর্ত্যে মানুষের কামনা পূর্ণ করে। অর্থাৎ সেযুগে বিদ্যা আয়ত্ত না হলে মন্ত্রপ্রয়োগকারী পুরোহিত হওয়া যেত না। যেখানে মন্ত্রবিশুদ্ধির জন্য এত অনুশাসন সেখানে বুদ্ধিপৌরুষহীনদের জীবিকার জন্য মন্ত্রপ্রয়োগমূলক শ্রাদ্ধ, পূজা, যজ্ঞ প্রভৃতি পরিকল্পিত হয়েছে —একথা সারবান নয়। শুধু মন্ত্রের বিশুদ্ধিতা নয়, এইসব কাজের মধ্যে বহুরকমের জটিল প্রক্রিয়া আছে। জৈমিনির 'মীমাংসাদর্শন', আশ্বলায়ন, পারস্কর, গোভিল প্রভৃতির শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্রগুলি বহু বিচার-বিতর্কের পরে এই প্রক্রিয়াগুলি প্রবর্তিত করেছেন। নির্বোধ এবং শক্তিহীনদের জন্য যজন এবং যাজন ক্রিয়ার প্রবর্তন হলে এত পরিশ্রমের সার্থকতা থাকে না। তাদের অপদার্থতার দিকে নজর রেখে তাদের যোগ্য করেই পদ্ধতিগুলি তৈরি করা হতো। রীতিমত বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ এবং কর্মঠ ব্যক্তিরাই যাজক হিসাবে যজনক্রিয়াশাস্ত্রের লক্ষ্য। তার আরেক লক্ষ্য হলেন শ্রদ্ধাবান গৃহস্থ যজমান। দেবতার প্রসন্নতা এবং পরলোকগতের তৃপ্তিই তার উদ্দেশ্য, বুদ্ধি-পৌরুষহীনদের অন্নসংস্থান নয়।

মন্ত্রের বিশুদ্ধিতার ওপরে যে কঠোর নির্দেশ রয়েছে তারই বিপরীতে অন্য কথাও উচ্চারিত হয়েছে—"মূর্খো বদতি বিষ্ণায়, বুধো বদতি বিষ্ণবে। দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং, ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥"—বিষ্ণুকে নমস্কার করতে গিয়ে শুদ্ধ শব্দ যাঁর জানা নেই সেই ব্যক্তি বলেন 'বিষ্ণায় নমঃ', যাঁর জানা আছে তিনি বলেন 'বিষ্ণবে নমঃ'। দুজনেরই সমান পুণ্য, কারণ জনার্দন ভাবগ্রাহী। 'ভাবগ্রাহী' অর্থাৎ ভগবান ভাবকেই গ্রহণ করেন। 'ভাব' শব্দের অর্থ ভক্তি। বিষ্ণু ভক্তি-ই গ্রহণ করেন। "ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি" (গীতা, ১৮।৫৫)—ভক্তির দ্বারা [মানুষ] আমাকে জানতে পারে। "ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ" (গীতা, ১২।১৯)—ভক্তিমান মানুষ আমার প্রিয়।

এসব প্রসিদ্ধ কথা। অক্ষরজ্ঞানহীন একাধিক পুরুষ ভক্তির দ্বারাই দেবসান্নিধ্য লাভ করেছেন। শিশু আধ-আধ ভাষায় জননীকে যতটা আকর্ষণ করে, বড় বড় বয়সের ছেলেমেয়েরা স্পষ্ট উচ্চারণেও তা পারে না। এখানে মায়ের মনে ঐ শিশুর অসহায় ভাব যদি ক্রিয়া করে থাকে তবে সে যে আকুলভাবে মাকে চাইছে এবং মাকে না পেলে যে তার চলবে না—অন্তরের এই ভাবটা ঐ অর্ধস্ফুট শব্দের মধ্যে ধরা পড়েছে বলেই মা শুদ্ধবাক্ সন্তানের চেয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসেন আগে। দেবকার্যে এবং লোকান্তরিত পিতামাতার কাজে এই ভক্তি এবং শ্রদ্ধার বড় ভূমিকা রয়েছে।

দেব-পিতৃকার্যে এক পক্ষে অর্থজ্ঞানপূর্বক বিশুদ্ধ মন্ত্রের দাবি করা হয়েছে, আরেক পক্ষ শব্দশুদ্ধি-নিরপেক্ষ ভক্তির অপরিহার্যতার কথা শুনিয়েছেন। দুটিতে বিরোধ নেই, কারণ দুটি দায়িত্ব দুজনের। মন্ত্রের অনিন্দিত প্রয়োগের প্রধান দায় পুরোহিতের, ভক্তির মুখ্য আধার হবেন যজমান।

বিষ্ণুপুরাণে ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য এবং শ্রাদ্ধকালে তাঁর অবস্থান ইত্যাদি অনুসারে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন ঃ "চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ। পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তিঃ॥" (৩।১৪।২১)—শুদ্ধ মন, সৎপথে উপার্জিত বিত্ত, উপযুক্ত সময়, কথিত বিধি, শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে তেমনি পাত্র এবং পরম ভক্তিই শ্রাদ্ধের সম্পদ। এতে ব্যক্তির অবস্থা অনুসারে শ্রাদ্ধের সম্বন্ধে বলা আছে ঃ সন্তানের যদি বিভব থাকে তবে শ্রাদ্ধে পরলোকগতের উদ্দেশে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, ধান, অর্থ এবং সব রকমের ভোগ্য জিনিস সে দেবে। তেমন টাকা না থাকলে শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের ভোজন করাবে। যদি ব্রাহ্মণদের আহার করাবার শক্তি না থাকে তবে ক্ষমতা অনুসারে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের ধান এবং 'স্বল্পাল্পাম্ অপি দক্ষিণাম্' অর্থাৎ খুব অল্প থেকেও অল্পতর দক্ষিণা দান করবে। এতেও যদি শক্তি না থাকে তবে হাতে কিছু তিল নিয়ে কোন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করে অর্পণ করবে অথবা ভক্তিনম্র মনে হাতের অঞ্জলির জলে "তিলৈঃ সপ্তাষ্টভিঃ' —সাত-আটটি তিল মিশিয়ে পরলোকগতের উদ্দেশে নিবেদন করবে। এটাও না পারলে, যেকোন জায়গা থেকে 'গবাহ্নিক' অর্থাৎ গরুর একদিন চলে এমন ঘাস এনে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শ্রাদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিকে প্রীত করবার জন্য গাভীকে ঐ ঘাস দান করবে। 'সর্বাভাবে' অর্থাৎ এই সব কিছুরই যদি অভাব ঘটে তবে 'কক্ষমূলপ্রদর্শকঃ' অর্থাৎ দুই হাত আকাশের দিকে তুলে সূর্যাদিলোকপালদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে এই মন্ত্রপাঠ করতে হবে ঃ "ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ, শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্ নতোঽস্মি। তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো ময়ৈতৌ, ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য॥" (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১৪।২৪-৩১)—আমার দ্রব্য নেই, অর্থ নেই, শ্রাদ্ধের উপযোগী অন্য কিছু নেই। আমার পিতৃগণকে আমি নমস্কার করছি। তাঁরা আমার ভক্তিতে তৃপ্ত হোন। এই দুই বাহু আমি বায়ুর গতিপথে (আকাশে) উত্তোলিত করলাম।

এইটি হলো নিঃস্বের শ্রাদ্ধ।

বিত্তবানের শ্রাদ্ধের যে-ফল, বিত্তহীনেরও সেই ফল—এই কথা শাস্ত্রের। নিষ্কিঞ্চনের বাইরের উপকরণবর্জিত শ্রাদ্ধের একমাত্র উপকরণ হলো অন্তরের ভাবনা। তা যদি দ্রব্য বিনাই পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করতে পারে তবে শ্রদ্ধার প্রাথমিকত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে বিত্তবহুল শ্রাদ্ধেও। শ্রাদ্ধের বস্তু অতি সামান্য অথবা অত্যধিক হোক, বারবার ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দান করবার নির্দেশ থাকায় "বুদ্ধিপৌরুষহীনদের" জীবিকার জন্য শ্রাদ্ধ পরিকল্পিত হয়নি—একথা স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে। অকিঞ্চনের শ্রাদ্ধের উপকরণ সেই পুরনো উক্তি দৃঢ়তর করল—শ্রাদ্ধ কারো জীবিকামূলক নয়, কিন্তু পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিমূলক।

বহুযুগ আগেকার কথা। বনবাসী রামচন্দ্র ভরতের মুখে পিতার পরলোকগমনের সংবাদ শুনলেন। মন্দাকিনীর তীরে গিয়ে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন। বাল্মীকি তার বৃত্তান্ত দিয়েছেন ঃ "ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে। ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনম্ অব্রবীৎ॥ ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্। যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥" (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৩।২৯-৩০)—ইঙ্গুদীফলের শাঁস টোপাকুলের সঙ্গে মিশিয়ে কুশের আস্তরণের ওপরে রেখে রাম অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই কথা বললেন ঃ হে রাজন, আমরা যা খাই আপনি সন্তুষ্ট মনে এই সেই বস্তু ভোজন করুন। মানুষ যা আহার করে পিতৃগণ এবং দেবকুলও তা-ই আহার করেন।

শ্রাদ্ধ বা পূজার জন্য ব্রাহ্মণের উত্তুঙ্গ আদর্শ রয়েছে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখের গ্রন্থে, যেমন—তিনি নির্লোভ এবং তপোপরায়ণ হবেন। তাঁর 'গ্রামযাজক' অর্থাৎ বহু যজমানের পুরোহিত হওয়া চলবে না। তাঁকে সন্ধ্যাবন্দনাদি আচার নিত্য পালন করতে হবে। তিনি মাতা-



পিতাকে ত্যাগ করে থাকলে তাঁকে দিয়ে চলবে না, ইত্যাদি। সর্বোপরি জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর শিক্ষার উৎকর্ষের প্রতি। মনু বলেছেন: "জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।" (মনুসংহিতা, ৩।১৩২)—পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে দেওয়া দ্রব্য এবং দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য তাঁকে দিতে হবে যিনি জ্ঞানে উৎকৃষ্ট। এই দুই জাতীয় বস্তু যদি 'অমন্ত্রবিৎ' অর্থাৎ অজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় তবে মনু রূঢ় ভাষায় সেই শ্রাদ্ধকর্তাকে ভর্ৎসনা করেছেন। (দ্রঃ মনুসংহিতা, ৩।১৩৩)

কথা হলো যে, এই আদর্শের পুরোহিত ব্রাহ্মণ আজ দুষ্প্রাপ্য। এইজন্যই কুশ দিয়ে ব্রাহ্মণ গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করে তার ওপরে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলে নিবেদিত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দিয়ে দেবার নির্দেশ রয়েছে পুরাকাল থেকে। সমাজে এখন নৈতিক ভাবনা দুর্বল হয়েছে। শুধু ব্রাহ্মণগোষ্ঠীতে নয়—সর্বত্রই আজ আচারহীনতা, অসত্য, অন্যায়ভাবে অর্থসংগ্রহ, হিংস্রতা ইত্যাদি। শিক্ষিত পদস্থ মানুষদেরও দুর্নীতি দমনের জন্য চিন্তিত হয়েছেন রাষ্ট্রশাসকেরা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়/যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।" (গীতবিতান, বিচিত্র, ৪০) আজকের সমাজে তার প্রতিধ্বনিও ক্ষীণ হয়েছে। প্রাপ্তির জন্য অতীতের চেষ্টা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, বাণিজ্য, চিকিৎসা, রাজনীতি প্রভৃতি মানুষের সাধনার ক্ষেত্রগুলিতে উত্তুঙ্গ স্থান অধিকার করেছিল ভারতবর্ষ। কিন্তু তখন পথ এবং পাথেয় মস্ত বিচারের বিষয় ছিল। আজ তা লুপ্তপ্রায়। সংস্কৃত অনাদৃত হবার ফলে সংস্কৃতাধ্যায়ীর জীবিকার দুর্দশায় সংস্কৃত বর্জন করেছে ছাত্ররা। মন্ত্রশুদ্ধি সম্ভব কেমন করে? মন্ত্রের অর্থ শ্রাদ্ধকর্তা উপলব্ধি করলে কর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবিড়তর হবে, কিন্তু অসংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রের অর্থ বোঝাবেন কোন্ উপায়ে? ভারতীয় সংস্কৃতি সংস্কৃত-ভাষাভিত্তিক। রাষ্ট্রনায়কেরা ভারতীয় সংস্কৃতির জয়গান করেন অহরহ, কিন্তু যা এই সংস্কৃতির উৎস তার সঙ্গে পরিচয়ের আবশ্যিক ব্যবস্থা করেন না।

ব্রাহ্মণ সমাজেরই সদস্য। আজ সমাজ যদি নৈতিক দিক থেকে পারদর্শী বলে চিহ্নিত না হয় তবে তার অন্তর্বর্তী ব্রাহ্মণ একাকী নির্মল থাকবেন—এই আশা করার যুক্তি নেই। কিন্তু সেই কারণে কি শ্রাদ্ধ বর্জন করব? ভাল রাঁধুনী পাই না বলে খাওয়া বন্ধ করি না। যেমন পাই তেমন দিয়ে চালিয়ে নিই। জন্মেছে যে ব্রাহ্মণ হয়ে, পৌরোহিত্য যে গ্রহণ করেছে—তাকে দিয়েই শ্রাদ্ধ, পূজা অব্যাহত রাখতে হবে আপৎকালীন ব্যবস্থা ভেবে। কাজের যিনি উদ্যোক্তা তাঁর শ্রদ্ধা তো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সেটি থেকেই 'শ্রাদ্ধ' নাম, সেটিই বড় কথা। অনেক মন্ত্র, অনেক প্রক্রিয়া, অনেক দ্রব্য—এ যেমন শ্রাদ্ধে দরকার, তেমনি শ্রদ্ধাভরে 'আমি রিক্ত, আমার বাক্যে তোমরা তৃপ্ত হও'—এই উক্তিও তো শ্রাদ্ধকর্ম বলে বিহিত হয়েছে। রাজার ছেলে রাজার পিণ্ড দিলেন ইঙ্গুদীফলে ভক্তিকে সম্বল করে। উপকরণে যদি 'যখন যেমন তখন তেমন'—এই ব্যবস্থা থাকে তবে বিধি-নিয়মেও তা-ই ভাবতে হবে। জন্মের দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণ তিনি 'ব্রাহ্মণ' শব্দের যোগ্য নাও হতে পারেন। মনু এইরকম ছয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ বলেছেন, কিন্তু এখানে যে নঞ্তৎপুরুষ সমাস রয়েছে তাতে 'নঞ্' অর্থাৎ 'না'-এর অর্থ 'অপ্রশস্ত' অর্থাৎ 'যথাযথ' বা 'প্রশংসনীয়' ব্রাহ্মণগুণের অধিকারী নয়। তার ব্রাহ্মণত্ব এখানে অস্বীকার করা হয়নি। ল্যাংড়া আমের বীজে বা কলমে ল্যাংড়া আমেরই গাছ হবে এবং তার ফলও ল্যাংড়া আমই হবে। হতে পারে সে-ফলে পোকা লেগেছে, কিন্তু ল্যাংড়া আম হিসাবে তার সত্তার অপলাপ ঘটবে না এবং কীটাকুলিত হলেও অন্য আম থেকে তার স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য থাকবে। একে জন্মগত সংস্কার বলা যায়। এই জাতীয় ব্রাহ্মণ অবশ্যই ব্রাহ্মণকার্যের যোগ্য নন, কিন্তু যে-শাস্ত্র শ্রাদ্ধ, পূজার বিধিব্যবস্থা করেছেন তাতেই যখন রয়েছে ব্রাহ্মণ ছাড়া যাজনক্রিয়া হবে না তখন ভাল ডাক্তারের অভাবে অগত্যা হাতুড়ে দিয়ে চিকিৎসার মতো সুযোগ্য ব্রাহ্মণ না পেলে যা পেলাম তা দিয়েই কর্ম উদ্‌যাপন করতে হবে। দ্রব্যের বেলায় যেমন রামচন্দ্রের ইঙ্গুদীর পিণ্ড আদর্শ নয়, মন্ত্রের বেলায়ও তেমনি অশুদ্ধ মন্ত্র বা ক্রিয়া আদর্শ নয়। দুটোই নিরুপায়ের অবলম্বন। এতে কোনমতেই অশিক্ষিত পুরোহিতের সমর্থন নেই।

অর্থ পুরোহিতের ছিল না; তার কামনাও পুরোহিত করেননি। কিন্তু টোলের অধ্যাপক, যিনি পৌরোহিত্য করতেন কিংবা অধ্যাপক না হয়েও যিনি পৌরোহিত্যে ব্রতী ছিলেন তিনি সম্মানিত হতেন বলে আপন কর্মের উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। সমাজ পণ্ডিত-পুরোহিত অভিলাষ করে তার জন্য পথ অবলম্বন করেছে, তাই পেয়েছে। আজ সেই অভিলাষ খর্ব হয়েছে। সংস্কৃত অপাঙ্‌ক্তেয়, তাই মন্ত্রবিৎ ক্রিয়াবিৎ ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায়। এর প্রতিকার সামাজিকদের হাতে।

মন্ত্রের অনুবাদ করে শ্রাদ্ধে বা পূজায় তার প্রয়োগ শাস্ত্র-অনুমোদিত নয়। মন্ত্র সংস্কৃতভাষায় রচিত। সংস্কৃত যিনি জানতেন না তাঁর শ্রাদ্ধেও সংস্কৃত মন্ত্রই পাঠ করতে হবে। শব্দের শক্তি আছে, শব্দময় মন্ত্রেরও শক্তি আছে। গানের ভাষা না বুঝলেও তার ধ্বনি চিত্তে আনন্দ বা দুঃখ জাগায়, ধ্বনিতেই ফুটে ওঠে আবেদন, নিবেদন। কর্মের মূল লক্ষ্য যে পরলোকগতকে বিবিধ দ্রব্য দিয়ে তৃপ্ত করা—এই ভাবটি শ্রাদ্ধকর্তার হৃদয়ে জাগরূক রয়েছে। তাঁর শ্রদ্ধাই শ্রাদ্ধের পরমতম সম্পদ। এরাই ইহ এবং পরলোকের সংযোজক।

শ্রাদ্ধের তাৎক্ষণিক ফল চিত্তের প্রশান্তি। পিতামাতাকে ভরণপোষণের যা আনন্দ সেটি সঙ্গে সঙ্গে মেলে। অলক্ষ্য শক্তির আশীর্বাদের আশায় মনের বল বাড়ে। বহুযুগের ওপার থেকে যে-সন্তানধারা এসেছে আমি তারই এক অবিচ্ছিন্ন বিকাশ—এই চেতনা জীবনে মর্যাদাবোধ উদ্দীপ্ত করে।

শাস্ত্র বলেছেন—শ্রাদ্ধ থেকে শ্রাদ্ধকর্তার প্রাপ্তি দুটি, ইহকালের এবং পরকালের। এই জীবনে ভোগ্যবস্তু এবং ভোগের শক্তি লাভ একটি ফল। "শ্রাদ্ধপুষ্পম্ ইদং প্রোক্তম্"—এটিকে বলা হয়েছে শ্রাদ্ধের 'ফুল'। শ্রাদ্ধের দ্বিতীয় অর্জন ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন। "ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ" —এটি শ্রাদ্ধের 'ফল'।

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ" (বৈশেষিক-সূত্র, ১।১।২)—যা থেকে ইহলোকে অভ্যুদয় ঘটে এবং দেহবিয়োগের পর চূড়ান্ত কল্যাণ অর্থাৎ মুক্তি লাভ হয় তারই নাম ধর্ম। শ্রাদ্ধের প্রথম ফলটি জাগতিক প্রাপ্তি, দ্বিতীয়টি চিরকালের জন্য দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি। দুটিই সম্পাদন করে বলে শ্রাদ্ধ একটি ধর্মকার্য। [সমাপ্ত]□

অনুষ্ঠান-সূচী (মাঘ-ফাল্গুন ১৪০২)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ মাঘ	সোমবার	২২ জানুয়ারি	১৯৯৬
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৯ মাঘ	মঙ্গলবার	২৩ জানুয়ারি	১৯৯৬
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	২১ মাঘ	রবিবার	৪ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৭ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২০ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১২ ফাল্গুন	রবিবার	২৫ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৫ মার্চ	১৯৯৬
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৫ ফাল্গুন	শনিবার	৯ মার্চ	১৯৯৬

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	১০ মাঘ	বুধবার	২৪ জানুয়ারি	১৯৯৬
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৪ ফাল্গুন	শনিবার	১৭ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৩, ১৭ মাঘ	বুধবার, বুধবার	১৭ জানুয়ারি, ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৬
২, ১৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার, শুক্রবার	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ ১৯৯৬

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ডাকে পত্রিকা/চিঠি পৌঁছাতে এক মাস থেকে পাঁচ মাস লাগছে

আমাদের দপ্তরে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের বহু অভিযোগ আসছে যে, তাঁরা রিপ্লাই কার্ডে চিঠি দিয়েছেন একমাস কি তারও আগে অথচ আমাদের কাছ থেকে কোন উত্তর পাননি। কেউ লিখছেন, আষাঢ় মাসের পত্রিকাটি কার্তিক মাসে পেয়েছেন অথবা ভাদ্র মাসের পত্রিকাটি অগ্রহায়ণ মাসে পেয়েছেন, কেউবা লিখছেন শারদীয়া/আশ্বিন সংখ্যাটি অগ্রহায়ণ মাসে পেয়েছেন—যে সংখ্যা-তিনটি যথাক্রমে জুন মাসের ২৩ তারিখ, আগস্ট মাসের ২৩ তারিখ এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ আমাদের পক্ষ থেকে কলকাতার জিপিও-তে ডাকে দেওয়া হয়েছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে নয়া দিল্লী থেকে শ্রীআশুতোষ মুখার্জী এবং শ্রীবিমল চক্রবর্তী জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের শারদীয়া সংখ্যা নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পেয়েছেন।

যাঁরা চিঠিপত্রের উত্তর পাননি বলে আমাদের কাছে অনুযোগ করেছেন তাঁদের জন্য জানাচ্ছি যে, জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীপ্রদীপকান্তি কর্মকার গত ১৪।৭।৯৫ তারিখে যে-চিঠি আমাদের কাছে লিখেছিলেন (চিঠিতে জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্পও ১৪।৭।৯৫ তারিখের) সেই চিঠি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৬।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্পও ৬।১২।৯৫ তারিখের। জলপাইগুড়ি থেকে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সরকার ২০।৭।৯৫ তারিখে যে-চিঠি আমাদের লিখেছেন (চিঠিতে জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও ২০।৭।৯৫ তারিখের), সে-চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছেছে ৫।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও ৫।১২।৯৫ তারিখের। বাঁকুড়া থেকে শ্রীশুভময় মুখার্জী ২৪।৯।৯৫ তারিখ (চিঠিতে বাঁকুড়া পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্প ২৫।৯।৯৫ তারিখের) যে-চিঠি আমাদের লিখেছিলেন সেটি আমরা পেয়েছি ১।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও ১।১২।৯৫ তারিখের। মেদিনীপুরের দেউলপোতা থেকে শ্রীভুবনমোহন পণ্ডা ১১।১০।৯৫ তারিখ (স্থানীয় পোস্ট অফিসের নাম বোঝা যাচ্ছে না—ডেট-স্ট্যাম্প ১৩।১০।৯৫ তারিখের) যে-চিঠি আমাদের লিখেছিলেন তা আমরা পেয়েছি ১।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্প ১।১২।৯৫ তারিখের। বাঁকুড়া থেকে কুমারী বাসন্তী মণ্ডল যে-চিঠি আমাদের কাছে ১৮।৯।৯৫ তারিখ লিখেছেন (স্থানীয় পোস্ট অফিসের নাম বোঝা যাচ্ছে না—ডেট-স্ট্যাম্প ১৮।৯।৯৫ তারিখের) সে-চিঠি আমরা পেয়েছি ৮।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও একই তারিখের। ডানকুনি (হুগলী জেলা) থেকে শ্রীবিস্ময় মুখোপাধ্যায় ২০।৯।৯৫ তারিখ যে-চিঠি আমাদের কাছে লিখেছেন, সেই চিঠিতে ডানকুনি পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পের '৯।৯৫' অংশটুকু পড়া যাচ্ছে অর্থাৎ তারিখটি পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু চিঠিটি যে সেপ্টেম্বরে ডাকে দেওয়া হয়েছে তা ডেট-স্ট্যাম্পের '৯।৯৫' অংশ থেকেই স্পষ্ট। চিঠিটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ৮।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও ৮।১২।৯৫ তারিখের। মেদিনীপুরের কলসবাড় থেকে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত পাল ১৮।৯।৯৫ তারিখ যে-চিঠি লিখেছেন সে-চিঠি আমরা পেয়েছি ১১।১২।৯৫ তারিখ। চিঠিতে বাগবাজার পোস্ট অফিসের ডেট-স্ট্যাম্পও ১১।১২।৯৫ তারিখের। 184172

এই ধরনের বহু চিঠির মাত্র কয়েকটিই এখানে উল্লেখ করলাম 'উদ্বোধন'-এর অগণিত গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য। এথেকে তাঁরা অন্ততঃ এটুকু বুঝবেন যে, পত্রিকা ডাকে দেরিতে পাওয়ার ব্যাপারে এবং আমাদের উত্তর না পাওয়ার ব্যাপারে ডাকবিভাগের হঠকারিতাই দায়ী। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পত্রিকার অপ্রাপ্তি বা চিঠির উত্তর অপ্রাপ্তির জন্য ক্ষোভ খুবই সঙ্গত। কিন্তু ডাকবিভাগের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অসহায় অবস্থাটিও তাঁরা নিশ্চয় অনুধাবন করবেন। আমরা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অভিযোগের ভিত্তিতে নিয়মিত ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছি, কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ

'উদ্বোধন' বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'বঙ্গাব্দের সূচনা' শীর্ষক অংশে প্রকাশিত আমার চিঠির মধ্যে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণিত ৭, ৪১, ৪ সংখ্যাগুলি তথা এগুলির ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন রেখে লেখা অগ্রহায়ণ ১৪০২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের চিঠির প্রেক্ষিতে এই লেখা।

বঙ্গাব্দ সৌর অব্দ। সৌর অব্দরূপী বঙ্গাব্দের প্রকৃত বর্ষমান ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫·২৪২১৯৯ দিন। বঙ্গাব্দের বর্ষমান পূর্ণসংখ্যক দিন না হওয়ায় ৩৬৫ দিন হিসাবে সাধারণ বছর গণনা করলে বছরে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ০·২৪২১৯৯ দিন করে সময় অবশিষ্ট থেকে যায়। এই অবশিষ্ট দিন ১ দিন হয় ১÷০·২৪২১৯৯= ৪·১২৮৮৩৬২ বছরে অর্থাৎ ৪১ বছরে ১০টি অধিক দিন হয়। তাই ৪১ বছরে প্রকৃত অধিবর্ষের সংখ্যাও হয় ১০টি। এভাবেই

৪১ সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে প্রতি ৪ বছর অন্তর অধিবর্ষ হয়। তাই প্রথম থেকে এভাবে গণনা শুরু করলে অধিবর্ষরূপে পাওয়া যায় ৪, ৮, ১২, ১৬, ২০, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৬, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৫২... ৮০, ৮৪, ৮৮ বঙ্গাব্দ বছরগুলি। উল্লিখিত অধিবর্ষগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায়, বঙ্গাব্দের প্রথম ১০টি অধিবর্ষ ৪১ বছরের পরিবর্তে ৪০ বছরে হয়েছে। সঠিক হিসাব ধরলে দশম অধিবর্ষের ৩ বছর পরে ৪৪ বঙ্গাব্দে একাদশ, ৭ বছর পরে ৪৮ বঙ্গাব্দে দ্বাদশ ও ১১ বছর পরে ৫২ বঙ্গাব্দে ত্রয়োদশ অধিবর্ষ হয়েছে। কিন্তু সৌর অব্দের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হয় যথাক্রমে অনধিক ২৫ ও ৯৭টি করে। তাই ৩ বছরে ১টি ও ৭ বছরে ২টি অধিবর্ষ একবার হলেও এর পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। বরং উল্লিখিত শর্ত বজায় রাখতে হলে কখনো কখনো ৫ বছরে ১টি ও ৯ বছরে ২টি করে অধিবর্ষ হওয়া প্রয়োজন।

উল্লিখিত দ্বাদশ অধিবর্ষ বছর ৪৮ বঙ্গাব্দ থেকে ৭ বিয়োগ করলে পাওয়া যায় ৪১ বঙ্গাব্দ ; ৫২ বঙ্গাব্দ থেকে ৭ বিয়োগ করে পাওয়া ৪৫-কে ৪১ দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট ৪ থাকে। অনুরূপ-ভাবে ৫৬, ৬০, ৬৪, ৮০, ৮৪, ৮৮ বঙ্গাব্দ থেকে ৭ বিয়োগ করে পাওয়া বিয়োগফলগুলিকে ৪১ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে ৮, ১২, ১৬, ৩২, ৩৬, ৪০ অবশিষ্ট থাকে। অনুরূপভাবেই (৫২ + ৪১) বা ৯৩ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৪ ; ৯৭ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৮ ; ১২৫ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৩৬ ; ১২৯ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৪০ ; (৫২ + ৪১ × ২) বা ১৩৪ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৪ ; ১৩৮ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে ৮ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ প্রকৃত দশম অধিবর্ষ বছর ৪১ বঙ্গাব্দ থেকে ৪৮ বঙ্গাব্দ—এই ৭ বছরের মধ্যে ২টি অধিবর্ষ হয়ে হিসাবের ক্ষেত্রে যে গরমিল তা প্রতি ক্ষেত্রে সংশোধন করে অর্থাৎ ৭ বাদ দিয়ে হিসাব করে চললে দেখা যায়, প্রত্যেক বিয়োগফলগুলিকে ৪১ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ৪ বা তার গুণিতক অবশিষ্ট থাকে এবং ৫২ বঙ্গাব্দের পর প্রত্যেক দশম ও একাদশ এবং দশম ও দ্বাদশ অধিবর্ষ বছরের মধ্যে পার্থক্য যথাক্রমে ৫ ও ৯ হয়। এভাবেই ৪১ সহ ৭ ও ৪ সংখ্যা-দুটি পাওয়া যায়। এখানে বলে রাখা দরকার, আমার মূল চিঠিতে অধিবর্ষ গণনার নিয়মটি বিস্তারিত বলা হয়নি। সময় ও সুযোগ পেলে অবশ্যই জানিয়ে দেব।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণের দ্বারা অধিবর্ষরূপে চিহ্নিত এবং সরকারি ও বেসরকারি মতে বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ বছর বলে স্বীকৃত ১৪০০ বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সূত্রটি প্রয়োগ করলে এর গুরুত্ব বোঝা যায়। পরে, প্রথম পর্যায়ে হিসাবের পরিধি ৪৩,২০০ বঙ্গাব্দ (যদি ততদিন বঙ্গাব্দ চালু থাকে) পর্যন্ত বিস্তৃত করলে ঐ সময় পর্যন্ত বঙ্গাব্দের সঠিক অধিবর্ষ সংখ্যা (৪৩,২০০ ÷ ৪০০ × ৯৭ − ১৩) বা ১০,৪৬৩-র সঙ্গে প্রদত্ত অধিবর্ষ গণনার সূত্রানুসারে ঐসময় পর্যন্ত প্রাপ্ত অধিবর্ষ-সংখ্যা যথাযথভাবেই মিলে যায়।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গোবরডাঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা

সংশোধন

'উদ্বোধন' শারদীয়া সংখ্যায় (১৪০২) প্রকাশিত আমার লেখা 'প্রান্তিক বাংলার জনজীবন ও ধর্মীয় ভাবনা' প্রসঙ্গে সবিনয়ে জানাই : ৫২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মন্দিরটি পুরুলিয়া-রাঁচী রোডে গড়জয়পুরের অনতিদূরে দেউলঘাটার সুপ্রাচীন মন্দির। সেখানে কোন দেববিগ্রহ নেই। পরিত্যক্ত, জীর্ণদশায় মন্দিরটি কালের সাক্ষী মাত্র। প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন অষ্টভুজা মহিষাসুর-মর্দিনী দেবী—এই পরিত্যক্ত মন্দিরের কয়েকশ গজ দূরে, হাল আমলের খাপরা-আচ্ছাদিত মাটির দেয়ালযুক্ত ঘরে পূজিতা।

অন্যদিকে, পুরুলিয়া-বরাকর রোডে রঘুনাথপুরমুখী রাস্তার বাঁদিকের অনতিদূরে বর্ধিষ্ণু পাড়া গ্রাম। ঐ গ্রামের এক প্রাচীন মন্দিরের গর্ভগৃহে আরেক অষ্টভুজা দেবী মহিষাসুরমর্দিনী পূজিতা। তাঁকে স্থানীয় নরনারীরা 'উদয়চণ্ডী'-রূপে পূজা করেন।

ফলতঃ পাড়া গ্রামের উদয়চণ্ডী-মন্দির এবং দেউলঘাটার সুপ্রাচীন মন্দির-দুটি ভিন্নস্থানে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ আলাদা।

আরও লক্ষণীয়, ৫২৬ পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'সোনাতোপল' গ্রামের নাম 'সোনাতোপন' মুদ্রিত হয়েছে।

ডঃ শান্তি সিংহ
গুরুপল্লী, বিবেকানন্দনগর, পুরুলিয়া

শারদীয় উদ্বোধন

এবারের শারদীয় 'উদ্বোধন' (১৪০২) পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। প্রতিটি রচনাই অপূর্ব। খুব ভাল লেগেছে এবারের শারদীয় 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদ। অষ্টধাতুনির্মিত চাকেশ্বরী দুর্গাপ্রতিমাটি যাঁরা দেখেছেন তারা জানেন, মাত্র দুই ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই মূর্তিটিকে প্রচ্ছদে ফুটিয়ে তোলা রীতিমত কঠিন কাজ। প্রচ্ছদটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় এবং বর্ণনাটিও ভারি সুন্দর। এর জন্য সম্পাদককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। কবিতাগুলিও ভাল লেগেছে। তবে বিশেষভাবে ভাল লাগল স্বামী প্রভানন্দের " 'অপ্রকাশিত'কে প্রকাশিত করবার অপপ্রচেষ্টা" লেখাটি। লেখকের নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে। এই ধরনের ঐতিহাসিক গবেষণা প্রকাশ আরও হওয়া দরকার। এবারের পরিক্রমায় স্বামী বিমলাত্মানন্দের 'দেখে এলাম আলমোড়া' লেখাটি পড়ে আমাদেরও মানসভ্রমণ হয়ে যায় দেবীপক্ষে। খুবই বলিষ্ঠ এই ভ্রমণকাহিনীটি। এবারের শারদীয় 'উদ্বোধন' সবদিক দিয়ে খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়েছে। বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে এবং উপস্থাপনে এই সংখ্যা সহজেই আমাদের মন কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি খুবই মনোগ্রাহী।

সলিল মুখোপাধ্যায়
কোল কমপ্লেক্স টাউনশিপ, ডানকুনি, হুগলী

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

যে আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পাই কলকাতায় তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে, সেই সালটা ছিল ১৯০৯ কিংবা ১৯১০। আমার তখন বার বছর বয়স, কলকাতা থেকে মাইল বার দূরের একটি গ্রামের বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। এক শনিবারের বিকালে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত এক শিষ্যের সঙ্গে আমি বাগবাজারে আসি। মায়ের এই শিষ্য প্রায়ই আমাদের গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ প্রচার করতেন। শ্রীশ্রীমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করার সময় একটা ভয় আমার সারা মন জুড়ে ছিল। শ্রীশ্রীমা অবগুণ্ঠিতা হয়ে শ্রীচরণপদ্ম-দুখানি মাটিতে ঝুলিয়ে খাটের ওপর বসেছিলেন। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চরণে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার সময় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি যখন মুখ তুললাম, তিনি তখন তাঁর ঘোমটাটি একটু সরালেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তাঁর ঐ হাসি, আমি অনুভব করলাম, পার্থিব সকল কিছুর উর্ধ্বে। আমাদের মধ্যে কিন্তু কোন কথা হলো না। এরপর আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এলাম। মায়ের সেই কয়েক মুহূর্তের স্নেহদৃষ্টি এমনভাবে আমার মনকে অভিভূত করেছিল যে, আমার মনে সে-স্মৃতি এখনো সজীব হয়ে আছে।

বাড়িতে ফিরে আসার পর, মাকে আবার দেখার জন্য একটা গভীর আগ্রহ আমার মনে উদয় হলো। কয়েকমাস পরে তাঁর দর্শনের আবার একটা সুযোগ এল। সেবারে যদিও তিনি দু-একটি কথা বলেছিলেন তবে তা ছিল আমার স্বাস্থ্য এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত। কিন্তু আমি বেশ অনুভব করলাম যে, তাঁর প্রতি আমার টান ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, আর এর মূলে রয়েছে আমার প্রতি তাঁর নীরব সুগভীর স্নেহ।

দু-তিন বছর কেটে গেল। এর মধ্যে আমি বেশ কয়েকবার তাঁর দর্শন পেয়েছি। ১৯১২ সালের গ্রীষ্মের এক শনিবার সন্ধ্যাবেলায় আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছে আমার অন্তরের ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিচে নেমে এসে আমার পরিচিত এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় রাত্রিবাস করার জন্য বললেন। তারপর আমরা দুজনে শ্রীশ্রীমায়ের এক সেবক স্বামী ধীরানন্দের সঙ্গে কাছেই গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলাম। সেখানে গঙ্গার ঢালু পাড়ে ঘাসের ওপর বসে বেলুড় মঠ, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। স্বামী ধীরানন্দ আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে একান্ত আপনজনের মতো কথা বলছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করার কথা আমার বেশ কয়েকবার মনে হলো, কিন্তু তা বলা হলো না। গ্রামে ফেরার পরের রবিবার আমার দীক্ষাগ্রহণ বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে আমি তাঁকে একটি চিঠি লিখলাম। ছয়-সাত দিন পর তাঁর উত্তর এল। তিনি লিখলেন, মা দয়া করে দীক্ষা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং দিন ও সময় তিনি স্বয়ং ঠিক করে দিয়েছেন। আমি যেন সেই অনুযায়ী বাগবাজারে যাই। আমার পরিচিত যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে আগের বার উদ্বোধনে দেখা হয়েছিল, তাঁকে এই চিঠিটি দেখালাম।[১] একমাত্র তাঁকেই বিশ্বাস করে এই চিঠির কথা জানিয়েছিলাম। চিঠিটি দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং আমাকে বললেন যে, আমার চিঠি পাওয়ার পর কৃষ্ণলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) তাঁর কাছে আমার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তিনি আমাকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, আমি একজন পরম সৌভাগ্যবান, কারণ এইভাবে এত কম বয়সে আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাচ্ছি। আমি যে স্বয়ং জগজ্জননীর কাছ থেকে দীক্ষা পেতে চলেছি—এসম্বন্ধে তখন আমার খুব অল্প ধারণা ছিল। আমি শুধু এইটুকু অনুভব করেছিলাম যে, তিনি আমার নিজের মা এবং গুরুরূপে আমার বাকি জীবনে তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। এই অনুভূতি আমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে তোলপাড় করতে লাগল এবং আমি অন্তরে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যা আমি লাভ করতে চলেছি, মনুষ্যজীবনে এরপর আর কিছু আকাঙ্ক্ষা

১ মনে হয় ভদ্রলোক এবং লেখক একই গ্রামের লোক। ভদ্রলোক কলকাতা থেকে হয়তো সপ্তাহান্তে গ্রামের বাড়িতে আসতেন। সেসময় লেখক তাঁকে চিঠিটি দেখিয়ে থাকবেন। কারণ, লেখক কলকাতায় এসে তাঁকে চিঠি দেখানোর কথা উল্লেখ করেননি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

করার থাকতে পারে না।

নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমি বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। শ্রীশ্রীমা পূজা শেষ করে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ঘরে যখন আমি প্রবেশ করলাম তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে আমার মধ্যে আর কোন ভয় রইল না। বাড়িতে যেমন আমার মায়ের সাথে কথা বলি, সেইভাবে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলাম। স্বামী ধীরানন্দের পরম করুণা ও স্নেহময় সহায়তায় সেদিন প্রথমে আমারই দীক্ষা হলো। যখন মা আমাকে তাঁর বাঁদিকের একটি আসনে বসতে বললেন, তখন আমি লক্ষ্য করলাম—প্রকৃতপক্ষে আমি স্বচক্ষে দেখলাম—তিনি আর আগের মানুষটি নেই। এক স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁকে ঘিরে রয়েছে, আর তাঁর মুখমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে সেই মাধুর্য, সেই স্বর্গীয় আনন্দ, সেই গভীর করুণা—যা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু ইতিপূর্বে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। এরপর একবার কি দুবার তিনি তাঁর হাত আমার মাথা থেকে পিঠ বরাবর বুলিয়ে দিলেন এবং বললেন : "এস বাবা, এস—এত ছোট তুমি! আহা, আহা!" এই কথার মাধ্যমে সম্ভবতঃ তিনি এটাই সকরুণভাবে বোঝাতে চাইলেন যে, আমাকে এই দুঃখকষ্টের পৃথিবীতে অনেকদিন থাকতে হবে এবং আমার জন্য অনেক দুঃখযন্ত্রণা ও ভোগ জমা আছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেই ব্যক্তি আমাকে যেমন বলে দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী আমি একটি রুপোর টাকা গুরুদক্ষিণা হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলাম। যখন আমি মাকে প্রণাম করে টাকাটি তাঁকে দিতে গেলাম, তিনি বলে উঠলেন : "না, না, তোমাকে টাকা দিতে হবে না। তুমি কোথা থেকে টাকা পাবে বাবা? তুমি একজন স্কুলের ছাত্র আর তোমার এত কম বয়স! তুমি এই হরীতকীটি নাও (এই বলে তিনি একটি হরীতকী আমার হাতে দিলেন), আর আমাকে ওটি দাও।" আমি আবদারের সুরে বললাম : "না মা, আপনাকে এই টাকা নিতেই হবে। এই টাকা আমি আমার হাতখরচ বাঁচিয়ে জমিয়েছি।" ইতিমধ্যে স্বামী ধীরানন্দ দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি এতক্ষণ ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন এবং আমাদের কথাবার্তা হয়তো শুনেছিলেন। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে টাকাটি হরীতকীর সঙ্গে মায়ের সামনে রাখতে বললেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাই করলাম। মা ধীরানন্দজীর হাতে টাকাটি দিলেন। তিনি আমাকে বললেন : "এই টাকাটি ঠাকুরের পূজায় খরচ হবে।" শুনে মা মৃদু হাসলেন। এরপর মা গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর কৃষ্ণলাল মহারাজকে আমায় কিছু প্রসাদ দিতে বললেন। মায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করে বাইরে এলাম। মায়ের ঘরের সামনে ছোট বারান্দায়[২] দরজা থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আমি প্রসাদ গ্রহণ করলাম। দেখলাম, কৃষ্ণলাল মহারাজ দীক্ষার জন্য অন্য দীক্ষার্থীদের এক-একজন করে ঠাকুরঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

মায়ের কাছে আমি প্রায় পনের মিনিট ছিলাম। যখন বাইরে এলাম, তখন আমার মনে হলো আমি যেন আনন্দের সাগরে সাঁতার কাটছি। দীক্ষার পর ঠাকুরঘর থেকে বের হবার আগে মা আমাকে বলেছিলেন, বাড়ি ফেরার আগে আমি যেন অবশ্যই দুপুরে প্রসাদ পেয়ে যাই। আমি এরপর নিচে একটি ছোট ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণবাবু তখন সেখানে আসেন। তিনি আমার দীক্ষা হয়েছে শুনে আমাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেন যে, কয়েক বছর পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে আমাকে যোগদান করতে দেখলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। কিন্তু হায়! তা হবার ছিল না। মা আমার ভাগ্যে অন্য পথ নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন।

বেলা একটা নাগাদ প্রসাদগ্রহণের জন্য আমাকে ডাকা হলো। প্রসাদ পেতে যে-ঘরটিতে গেলাম, সে-ঘরটি তখন লোকে পরিপূর্ণ। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ, রামকৃষ্ণবাবু এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একসাথে বসে আহার করার সৌভাগ্য আমার হলো। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ আসন গ্রহণের পর আমি আবার শ্রীশ্রীমাকে দেখতে পেলাম। তিনি সেই ঘরের দরজার কাছে এসে তাঁর নিজের কিছু প্রসাদ একজন বিধবা ভদ্রমহিলার হাতে দিলেন এবং আমার দিকে দেখিয়ে সেই ভদ্রমহিলাকে বললেন : "ওই ছোট ছেলেটিকে এগুলি দাও।" এই ঘটনায় সেখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি, এমনকি শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) অবধি আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। এতে আমি কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলাম।

২ আগে মায়ের ঘরের সামনে লম্বা একফালি বারান্দা ছিল সিঁড়ি বরাবর। পরবর্তী কালে বারান্দাটি বাড়ানো হয়েছে।—সম্পাদক,উদ্বোধন

কিভাবে ধ্যান করব মা আমাকে দীক্ষার সময় দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ "মা, আপনাকে আমি কিভাবে ধ্যান করব?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "তোমাকে সেরকম কিছু করতে হবে না। তোমার ইষ্টের ধ্যানেই সব হবে।" নিজেকে সাধারণের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখার অসংখ্য ঘটনার একটিমাত্র নিদর্শন হিসাবে এটি উল্লেখ করলাম।

সেদিন বিকালে মায়ের বাড়ী থেকে ফিরে আসার আগে আবার আমি তাঁর দর্শন পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মা, আপনি মন্ত্রটি সকালে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ ১০৮ বার করে আমাকে জপ করতে বলেছেন, এছাড়া অন্যসময়েও যতটা পারি করতে পারি। আমি কি যেকোন জায়গায় জপ করতে পারি?" মা বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তোমার যেখানে খুশি করতে পার।" আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "খাবার সময়ে বা কোন অপরিষ্কার স্থানেও কি জপ করতে পারি?" মা খুব জোর দিয়ে বললেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপরিষ্কার স্থানেও করতে পার। ওসব নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না বাবা।" তিনি আমার মাথার ওপর হাত রাখলেন এবং চোখ বন্ধ করে কয়েক মিনিট নীরব রইলেন। এরপর তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার চিবুক স্পর্শ করলেন। যখন আমি চলে আসছি, তিনি তখন বললেন ঃ "আবার এস বাবা।" কথাগুলি সাধারণ, সাধারণভাবেই বলা। অন্য কারোর কাছে একথাগুলির প্রভাব হয়তো সামান্যই, কিন্তু আমার কাছে এই কথাগুলি সকল প্রেরণার উৎস। জীবনের কঠিন উত্থান-পতনে এই কথাগুলিই আমাকে উজ্জীবিত রাখে। যে-আশ্বাস তিনি আমাকে দিয়েছিলেন, তা আমার কাছে পরম নিশ্চিন্ততা এবং বিপুল সাহসের উৎস। যখনি আমি কোন কারণে বিমর্ষ বা দুর্বল বোধ করেছি অথবা কোন প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েছি, কিংবা কোন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি তখনই মায়ের কথাগুলি আমার কাছে অফুরন্ত শক্তির মতো কাজ করেছে। আমার এই সামান্য স্মৃতিচারণা থেকে এই কথাগুলিই সুস্পষ্ট হবে যে, তাঁর অসীম স্নেহ আমার মতো অনেক মানুষকে তাঁর চরণকমলে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে যে, পবিত্রতা, একনিষ্ঠতা, আন্তরিক ভক্তি, অভীষ্ট লাভ করার তীব্র ইচ্ছা—এই সকল গুণ তাঁকে সবচেয়ে সন্তুষ্ট করত।★ □

অনুবাদ ঃ সন্দীপকুমার দাঁ
সংগ্রহ ঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

★ Prabuddha Bharata, Vol. LX, February 1955, pp. 73-75. লেখকের বাঙলায় লেখা মাতৃস্মৃতি উদ্বোধন-এর ৩১তম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে, বর্তমান নিবন্ধটিতেও কিছু অতিরিক্ত তথ্য আছে। পরবর্তী কালে স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থে মূল বাঙলা স্মৃতিকথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।—সম্পাদক, উদ্বোধন

☐ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ☐

চিরন্তনী

মদালসা

কথা ঃ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ☐ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত।



মৃত্যুর পর এভাবে ফিরে আসায় শিবের কৃপায় মদালসার মনের অজ্ঞান চলে গিয়েছিল। জীবনের সারকথা, চরম সত্য তিনি জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু কাউকে তা বলতেন না। যেমন আর পাঁচজন থাকে, তেমনি-ভাবেই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

তিনি জ্ঞানের কথা শোনাতেন শুধু তাঁর প্রথম পুত্র বিক্রান্তকে। দোলনায় ছেলেকে রেখে দোল দিতে দিতে গান গেয়ে শোনাতেন ঃ "বাবা, তুমি আনন্দময়। তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। ভয়, শোক—এসবের অতীত তুমি। শরীরের ভিতর তুমি আছ, কিন্তু তুমি শরীর নও। তুমি আত্মা, তুমি নিষ্কলঙ্ক, তুমি আনন্দময়।"





জ্ঞানী মায়ের মুখে ছেলেবেলা থেকেই এসব কথা শুনতে শুনতে বিক্রান্তের চৈতন্য হলো। বড় হয়ে সে আর রাজ্যভোগ করল না, নিজের স্বরূপ-চিন্তায় সব সময় কাটাবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

নিউ ইয়র্কে কয়েকদিন

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে কয়েকমাস আগে যাবার সুযোগ ঘটে। সোসাইটির একটি রবিবারের বক্তৃতা আমায় দিতে হবে—তার আমন্ত্রণ ছিল। এদেশে রবিবারের বক্তৃতা (Sunday Service) দেওয়াই আমাদের আশ্রমগুলির সন্ন্যাসীদের প্রধান কাজ। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির 'মিনিস্টার' স্বামী তথাগতানন্দ ব্যতীত সেখানে আর দ্বিতীয় সাধুকর্মী নেই। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁর নির্ধারিত রবিবারের বক্তৃতা আমায় দিতে হবে। এদেশে আমাদের আশ্রমগুলির প্রয়োজনে আমরা পরস্পরকে এভাবে সাহায্য করে থাকি। ভারতবর্ষের আশ্রমগুলির মতো একাধিক সাধুকর্মী এদেশে অনেক আশ্রমেই নেই। ভক্তরাই আশ্রমের নানাবিধ কাজকর্মে সাহায্য করে থাকেন। সেন্ট্রাল পার্কের পশ্চিমদিকে সোসাইটির নিজস্ব পাঁচতলা-বিশিষ্ট একটি বাড়িতে তিনি থাকেন। আরও দু-তিনজন ভক্ত ঐ বাড়িতে থেকে তাঁকে বিভিন্নভাবে কাজকর্মে সাহায্য করেন। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিই আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো আশ্রম। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মমহাসভায় বেদান্তের সমন্বয়বাণী প্রচার করে বিশ্ববিখ্যাত হবার পর নিউ ইয়র্ক শহরে তিনি স্থায়িভাবে কাজ আরম্ভ করেন। অচিরেই তাঁর যোগের ক্লাসগুলি খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফলে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বামী অভেদানন্দের সুদক্ষ পরিচালনায় এর যথেষ্ট প্রসারলাভ ঘটে।

নিউ ইয়র্ক শহরে অপর একটি বেদান্তকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিখিলানন্দ। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও সেন্ট্রাল পার্কের পূর্বদিকে অবস্থিত এই আশ্রমটির নাম 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার'। আশ্রমের বর্তমান মিনিস্টার স্বামী আদীশ্বরানন্দ। বছর দশেক আগে ভারত থেকে এদেশে আসার সময় আমার এই দুটি আশ্রম দেখার সুযোগ হয়েছিল। তবে সময়াভাবে 'ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়াম' (Natural History Museum) ভিন্ন নিউ ইয়র্ক শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার আর সুযোগ হয়নি। কাজেই এবারের আমন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই আমায় সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল। আরও খবর পেলাম, 'রিজলী ম্যানর' (Ridgely Manor)-এ একটা ছোটখাট অনুষ্ঠান হবে শনিবার সকালে। স্বামী তথাগতানন্দের ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা ছিল, কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁর পরিবর্তে আমাকে সেখানে যেতে হবে। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির কয়েকজন ভক্ত উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। জোন শ্যাক নামে এক ভদ্রমহিলা এর উদ্যোক্তা, তিনিই আমায় বস্টনে ফোন করে অনুরোধ জানালেন। আমার কাছে সংবাদটি খুব আনন্দদায়ক হয়েছিল। কারণ, এই সুযোগে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত ঐ পবিত্র স্থানটি দেখার সৌভাগ্য আমার হবে।

নিউ ইয়র্ক শহর থেকে এর দূরত্ব প্রায় শ-খানেক মাইল। হাডসন নদীর ভ্যালিতে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ও একান্ত অনুরক্ত ধনী বন্ধু ফ্রান্সিস লেগেটের বাগানবাড়ি এই রিজলী ম্যানর। কর্মক্লান্ত স্বামীজী এখানে দু-তিনবার এসেছেন এবং কিছুদিন থেকে বিশ্রামাদি নিয়ে পুনরায় বক্তৃতার কাজে লেগেছেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার তিনি যখন আমেরিকায় আসেন তখন ভগ্নপ্রায় স্বাস্থ্যের উদ্ধারকল্পে এখানে একনাগাড়ে প্রায় আড়াই মাস অতিবাহিত করেন। বন্ধুবর্গের সহৃদয় আতিথেয়তায় তাঁর শারীরিক উন্নতিলাভ হলে তিনি এখান থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যাত্রা করেন ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস, প্যাসেডিনা প্রভৃতি স্থানে এবং পরে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো শহরে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এবারের অনুষ্ঠানটি স্বামীজীকেই কেন্দ্র করে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথমবার এখানে আসেন। তাঁর ঐ শুভাগমনের শতবার্ষিকী স্মৃতি-উৎসব

হিসেবে ভক্তদের এই আয়োজন। আমি কল্পনাও করিনি যে, আমার পক্ষে এরকম একটি অনুষ্ঠানে যোগদান সম্ভব হবে।

এদিকে আমার নিউ ইয়র্ক যাবার সংবাদ ইতিমধ্যে স্বামী আদীশ্বরানন্দ জেনেছেন। তাই তিনি আমায় শুক্রবার সকালে সেখানে পৌঁছানোর কথা জানালেন যাতে সেদিনের সান্ধ্য ক্লাসে ভক্তদের আমি কিছু বলি। বড়দের কথা অমান্য করা যায় না, অগত্যা রাজি হতে বাধ্য হলাম। শুক্রবার সকাল সাড়ে নটায় প্রভিডেন্স এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়ল। ছোট্ট প্লেন—আমাদের দেশের ফকার ফ্রেন্ডশিপের মতোই। মাত্র একজন পাইলট এবং একজন হোস্টেস। মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই নিউ ইয়র্কের লাগুয়াডিয়া এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। নিউ ইয়র্কে দু-তিনটি এয়ারপোর্ট আছে, তার মধ্যে কেনেডি ইন্টারন্যাশানাল এয়ার-পোর্টই বড়। প্লেন খুব একটা উঁচুতে ওঠেনি, তাই নিচের সবকিছু বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল দৃশ্যাবলী। প্রায় অ্যাট-লান্টিক কোস্ট ধরেই প্লেন যাচ্ছিল, তাই জলাশয়ই বেশির ভাগ চোখে পড়ল। তার মাঝে অসংখ্য ছোটবড় দ্বীপের সমষ্টি। আর এইসমস্ত দ্বীপে ঘন গাছপালার ফাঁকে সারি সারি বাড়িগুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই দুর্গম স্থানে এত লোকের বসতি দেখে খুব আশ্চর্য লাগছিল। বিশাল প্রকৃতির তুলনায় মানুষ যে কত ক্ষুদ্র ও অসহায় তার স্পষ্ট ধারণা হলো। সাড়ে দশটার পূর্বেই প্লেন ল্যান্ড করল নিউ ইয়র্কে। গেটের বাইরে এসে দেখলাম, স্বামী আদীশ্বরানন্দ জনৈক সন্ন্যাসী ও ভক্তসহ আমায় নিতে এসেছেন। লাগুয়াডিয়া এয়ারপোর্ট আমাদের আশ্রমের নিকটতম বিমানবন্দর। পনের-বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম ইস্ট সাইড সেন্টারে (অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে)। নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল পার্কের পূর্বদিকে অবস্থিত বলে এই আশ্রমটিকে সাধারণতঃ 'ইস্ট সাইড সেন্টার' এবং বেদান্ত সোসাইটি পশ্চিমদিকে হওয়ায় সেটিকে 'ওয়েস্ট সাইড সেন্টার' বলা হয়। সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে গল্পগুজব ও লাঞ্চপর্ব সেরে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া গেল। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঠাকুরঘরে বসে সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে জপধ্যান করলাম। এই আশ্রমে দুজন আমেরিকান সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী আছেন। ক্লাসের দিন বলে সাড়ে ছটার পরেই রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা। তখনো কিন্তু সূর্যাস্ত হয়নি, এসময়ে সূর্যাস্ত হতে প্রায় সাড়ে সাতটা



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার
নিউইয়র্ক, (সামনের অংশ)

বেজে যায়। বছরের কয়েক মাস এদেশে সূর্যাস্ত হবার আগেই আমাদের রাত্রের আহারপর্ব সমাধা করতে হয়।

সন্ধ্যা আটটায় স্বামী আদীশ্বরানন্দ-সহ প্রবেশ করলাম তাঁদের চ্যাপেলের বক্তৃতামঞ্চে। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুন্দর 'বাস্ট' রয়েছে মঞ্চমধ্যস্থ বেদিতে। পার্শ্বস্থ দেওয়ালের একদিকে টাঙানো রয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের এবং অপরদিকে স্বামীজীর বড় ফটো। বেশ ভাবগম্ভীর পরিবেশ। ভক্তসংখ্যাও কম হয়নি। এখানকার চ্যাপেলের বসার ব্যবস্থা খুব সুন্দর। ব্যালকনি থাকার জন্য আসনসংখ্যাও বেশি। যন্ত্রসঙ্গীতের পর শান্তিপাঠ ও কয়েকজন ভক্তের সমবেতকণ্ঠে বেদপাঠাদি সম্পন্ন হলে স্বামী আদীশ্বরানন্দ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু : 'Mind—its attachment and detachment'। এদেশে আমাদের আশ্রমগুলিতে প্রতি রবিবার নিয়মিত বেদান্তের ওপর আলোচনা হয়। শ্রোতারা প্রায় একই, কাজেই আমাদেরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হয়। বক্তৃতা-শেষে ভক্তদের সঙ্গে পরিচয় হলো। নিউ ইয়র্কে ভারতীয় ভক্তের সংখ্যা খুব একটা কম নয় দেখলাম। ববি ও ফ্র্যাঙ্ক কিচেন্স নামে এক আমেরিকান দম্পতি তাঁদের পরিচয় জানিয়ে বললেন, তাঁরা আমাকে পরদিন সকালে তাঁদের গাড়িতে 'রিজলী ম্যানর' নিয়ে যাবেন। আমাদের সঙ্গে 'ব্রেকফাস্ট' করার জন্য স্বামী আদীশ্বরানন্দ তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন। ববিকে আমি ইতিমধ্যে কয়েকদিন আমাদের প্রভিডেন্স আশ্রমে দেখেছি। তিনি সেখানকার 'রোড আইল্যান্ড স্কুল অব ডিজাইন অ্যান্ড ফাইন আর্টস' (Rhode Island School of Design and Fine Arts) কলেজের আর্ট-শিক্ষিকা। সপ্তাহে দুদিন তিনি সেখানে ক্লাস নেন ও পরে নিউ ইয়র্কে ফিরে যান। প্রভিডেন্সে থাকাকালীন মঙ্গলবার তিনি আমাদের সান্ধ্য ক্লাসে দিনকয়েক হলো যোগদান করছেন। ববি তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার নিউ ইয়র্ক আসাতে তাঁরা উভয়ে খুশি হয়েছেন বললেন।

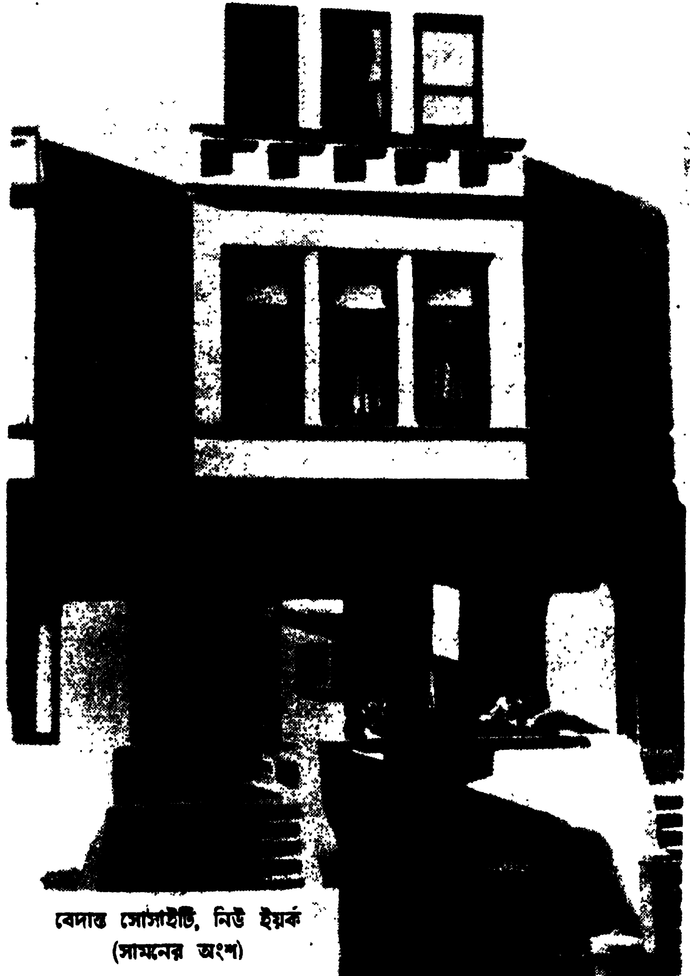


রিজলী ম্যানর (সামনের অংশ) : সময়—আনুমানিক ১৮৯৬

শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটার পর সাধু-ব্রহ্মচারী

সকলে একসঙ্গে ঠাকুরঘরে বসে জপধ্যান করলাম। সাড়ে সাতটার মধ্যে ববি ও ফ্র্যাঙ্ক এসে গেলেন। তাঁদের নিয়ে ব্রেকফাস্ট পর্ব সেরে সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা রিজলী ম্যানরের উদ্দেশে রওনা হলাম। শহর ছাড়িয়ে ক্রমে গ্রামের পথে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। দীর্ঘকাল একটানা শীতের পর এদিকে এখন বসন্তের আমেজ। তাই গাছপালা সব সবুজ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে নানারকম ফুলের সমারোহ। আবহাওয়া সুন্দর হওয়ায় দিনটি আমাদের খুব উপভোগ্য হয়েছিল। ঘণ্টা দুই পরে আমরা রিজলী পৌঁছে গেলাম। 'মেন গেট' পেরিয়ে আমাদের গাড়ি সোজা প্রধান বাড়িটির সম্মুখে দাঁড়াল। জনাকয়েক ভক্ত সেখানে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। তন্মধ্যে জোন শ্যাক আমায় ইতিপূর্বে বারকয়েক বস্টনে দেখেছেন। রিজলী ম্যানরের বর্তমান উত্তরাধিকারী লর্ড ও লেডি মার্জেসনের সঙ্গে তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের খুবই শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়নম্র স্বভাবের মনে হলো। মিস্টার ও মিসেস লেগেটের একমাত্র কন্যা ফ্রান্সেস। স্বামীজী ফ্রান্সেসকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। সেখানে তাঁর ভাল না লাগায় পরে তিনি আমেরিকায় ফিরে আসেন এবং বাকি জীবন এদেশেই অতিবাহিত করেন। তাঁরই পুত্র লর্ড মার্জেসন মাতামহের সম্পত্তির মালিক। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ক্যাম্প পার্শির বাড়িটি তাঁরই। স্বামীজী এই উভয় স্থানেই লেগেট-পরিবারের অতিথি হিসেবে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এই ক্যাম্প পার্শি থেকে স্বামীজী সোজা সহস্র দ্বীপোদ্যান বা থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে যান ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে।

আজকের উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী প্রথমে আমরা হেঁটে গেটের সম্মুখে গেলাম। সেখানে রাস্তার বাঁদিকে 'ক্যাসিনো' বাড়ির কাছে একজোড়া বেশ বড় ঘোড়ায় টানা ঝকঝকে সুন্দর একটি গাড়ি অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। সহিসের চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদও বেশ আকর্ষণীয়। সহিস আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। লর্ড ও লেডী মার্জেসন-সহ আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। জোন এবং জনৈক ভক্তও গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটি আমাদের সমস্ত বাগানবাড়ি ঘুরিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট পরে প্রধান বাড়ির সম্মুখে নামিয়ে দিল। শুনলাম এই ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থাও স্বামীজীর স্মরণে করা হয়েছে। তখনকার দিনে মোটরগাড়ি ছিল না। একশ বছর আগে স্বামীজীকে নিকটবর্তী রেলরোড স্টেশন



বেদান্ত সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক
(সামনের অংশ)

থেকে এখানে ঘোড়ার গাড়িতেই আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রায় সাত মাইল দূরবর্তী সেই রেলরোড স্টেশন এখন অচল। সেকালে ধনীব্যক্তিরা যেরকম গাড়ি ব্যবহার করতেন তেমনই একটি গাড়ি স্বামীজীকে আনার জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই মধুর স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য ভক্তদের এই ব্যবস্থা! এরপর লর্ড মার্জেসন আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত স্থানটি ভাল করে দেখালেন। 'ক্যাসিনো' বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন—এটি খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ গৃহ হিসেবে তখন ব্যবহৃত হতো। কয়েক বছর আগে হঠাৎ আগুন লেগে বাড়িটির একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তবে তা সুন্দরভাবে পুনরায় সারানো হয়েছে। বিরাট বাড়ি। শয়নঘরগুলি ও স্নানাগারগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পুরনো কয়েকটি তৈলচিত্র দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ যে-বাড়িতে রাত্রিবাস করেছেন, সেই বাড়িটি এখন এক মহিলাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। মেন গেটে প্রবেশের আগে রাস্তার বাঁদিকে বাড়িটি অবস্থিত। ভদ্রমহিলা সেদিন বাড়িতে না থাকার জন্য আমার আর বাড়ির ভিতরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। রিজলীর সম্পত্তি একশ একরের ওপর ছিল, দু-একটি বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবার জন্য এখন প্রায় আশি একরে দাঁড়িয়েছে। অতিরিক্ত সম্পত্তিকর এড়াবার জন্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন—লর্ড মার্জেসন জানালেন। সম্মুখস্থ মাঠের একদিকে রাস্তার ধারে একটি চিরসবুজ পাইন গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছটির নিচের শাখা-প্রশাখাগুলি একরকম মাটি স্পর্শ করছে বলা যায়। গ্রীনএকরে স্বামীজী যে বিরাট পাইন গাছটির নিচে বসে ভারতীয় পদ্ধতিতে ক্যাম্পবাসী ভক্তদের ধর্মশিক্ষা দিতেন সেই গাছটির দু-একটি চারা এখানে এনে লাগানো হয়েছিল। তার মধ্যে এই একটিমাত্র গাছই জীবিত রয়েছে—লর্ড মার্জেসন জানালেন। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় গাছটির ডালপালা তাঁরা অক্ষত অবস্থায় রেখেছেন। গাছটি 'স্বামীজীর পাইন' নামে অভিহিত। এবার আমরা প্রধান ভবনটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। বাগানের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই ভবনটির নামই 'রিজলী ম্যানর'।

[ক্রমশঃ]

অন্য নেতাজী

সন্দীপন বিশ্বাস

[নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত।—সম্পাদক, উদ্বোধন]

অন্ধকার রাত্রি। তার মধ্যে ঝড়ের তীব্র গর্জন। সবকিছু ওলট-পালট করে দিচ্ছে ঝড়। কে কোন্‌দিকে যাবে, কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। এর মধ্যে বিদ্যুতের তীব্র বিচ্ছুরণ। সকলে আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকারকে টুকরো-টুকরো করে দিল সেই বিদ্যুৎশিখা। তার আলোর ঝলকে মানুষ চিনতে পারল পরস্পরকে, চিনতে পারল চলার পথ। অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ মানুষকে খুঁজে দিল মুক্তির দিশা। ভারতের পরাধীনতাকে এই প্রতীকী রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। আর বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণকে তুলনা করা যেতে পারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। কার্যতঃ তিনি এক তীব্র আলোকশিখা, যা মানুষকে চিনিয়েছিল তাদের প্রকৃত লক্ষ্যকে।

কী চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র? শুধুই কি ভারতের স্বাধীনতা? শুধুই কি তিনি বিদেশী শৃঙ্খলের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে? ভারত থেকে উৎপাটিত করতে চেয়েছিলেন বিদেশী ঔপনিবেশিকতার শিকড়? একটা হতোদ্যম জাতিকে মেরুদণ্ড সোজা করে মুক্তিসূর্য ছিনিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন? হ্যাঁ, এসব তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু এটাই সব নয়। "এহ বাহ্য আগে কহ আর"।

এক প্রগাঢ় আত্মনিবেদনে নেতাজী নিজেকে বেঁধেছিলেন। একটা জাতির সার্বিক মুক্তিকে সামনে রেখে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন দুর্গম পথে। সে-পথে তাঁর প্রেরণা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "ত্যাগে বেহিসেবী, কর্মে বিরামহীন, প্রেমে সীমাহীন, জ্ঞানে গভীর ও বহুমুখী, আবেগে আত্মহারা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণে নির্মম, অথচ শিশুর মতোই সরল—আমাদের এই জগতে সত্যই বিরল ব্যক্তিত্ব তিনি।" স্বামীজীর জীবন থেকে উৎসারিত এই যে আলোক-বিচ্ছুরণ, তাতেই নেতাজী আলোকিত করেছিলেন তাঁর জীবন, মনন ও লক্ষ্য। তিনি নিজেই বলেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কী করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।... আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম।" কিন্তু তিনি তাঁর মননে স্বামীজীকে স্থান দিয়েছিলেন 'গুরু' হিসাবেই। তাই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্বে সমুজ্জ্বল, লক্ষ্যে স্থির, আত্মনিবেদনে নিষ্ঠাবান। কোনভাবেই হার-না-মানা জেদ—তাও তো তিনি দেখেছিলেন স্বামীজীর মধ্যে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের ঢেউ উঠল সারা দেশ জুড়ে। জাতীয়তাবাদী চেতনার আলোকে দেশের মানুষ চিনতে পারল আপন আপন স্বরূপ। প্রায় সকলের মধ্যেই তখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই দেশ তখন উদ্বেল মুক্তি-আন্দোলনে। কিন্তু সবাই যেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত, সুভাষচন্দ্র সেভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নন। তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস বদলাচ্ছে। সেই পরিবর্তিত ইতিহাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে স্বাধীনতা সহজলভ্য হবে না। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো। সেই যুদ্ধকে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে কাজে লাগাতে হবে ব্রিটিশের শত্রুদের। সেই সঙ্গে তিনি স্বপ্ন দেখেন এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার।

১৯৪১ সালের ১৬/১৭ জানুয়ারি (রাত প্রায় সাড়ে বারটায়) ঘটে তাঁর সেই মহানিষ্ক্রমণ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করার জন্য বিদেশী সাহায্যের সন্ধান। কিন্তু তিনি সতর্ক ছিলেন, কেউ যাতে না তাঁকে হাতের পুতুল করতে পারে। ভারতকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে তিনি যেভাবে নিয়ে যান, তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু স্বাধীনতার লড়াই চালানোর পাশাপাশি তিনি বুকে লালন করেছিলেন অন্য এক স্বপ্নকে। সে-স্বপ্নকে তিনি শুধু বুকে লালনই করেননি, তাকে সার্থক করে তুলতে করেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কী ছিল সেই স্বপ্ন? কিভাবেই বা তিনি সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন? সেই অন্য নেতাজী, অজানা নেতাজীর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই নিবন্ধে।

ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে নেতাজীর কোন সংশয় ছিল না। তিনি জানতেন, সেটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনের পাশাপাশি নতুন ভারতকে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেন। স্বামী বিবেকানন্দের

মতো তিনিও দেখেছিলেন, ভারতের রয়েছে এক গৌরবময় অতীত। ব্রিটিশের অপশাসনের সেই গৌরব ভূলুণ্ঠিত। ভূলুণ্ঠিত দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। তাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। এই ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করতে হবে স্বাধীনতার ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই। নেতাজী জানতেন, বিশ্বযুদ্ধের আঁচে বিশ্বের সমস্ত দেশই কমবেশি বিধ্বস্ত। বিশ্বযুদ্ধের শেষে সব দেশই শুরু করবে নতুন করে দেশ গড়ার কাজ। যুদ্ধের জন্য ভেঙে পড়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। যুদ্ধের শেষে সব দেশই চাইবে অর্থনীতিকে মজবুত করে তুলতে। নেতাজী চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকেও পাল্লা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তিনি চেয়েছিলেন, ভারত অর্থনীতির দিক থেকে কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠলেই অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে অগ্রগতির প্রতিযোগিতায় নামাবেন। সারা বিশ্ব তখন এক আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সেখানে বিজ্ঞান এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে সামনের সারিতে। তাই ভারত গড়ার ক্ষেত্রে তিনি প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানকে।

নানা ভাষা, নানা ধর্ম এবং নানা সম্প্রদায়কে নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো এর সংস্কৃতি, এর শক্তি। নেতাজী চেয়েছিলেন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের গোষ্ঠিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতাকে ভেঙে ফেলে এক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে। সেখানে সকলেই বাঁধা থাকবে এক পারিবারিক বন্ধনে। নিজ নিজ সম্প্রদায়গত আচরণটুকু পালন করেও সকলে উঠে আসবে বিভেদের ঊর্ধ্বে। সেই একই সুরে মানুষকে বাঁধার মতো রয়েছে একটিই সুতো। তা হলো ভাষা। নেতাজী চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতে ভাষা-বৈচিত্র্যের সমস্যাকে দূর করার জন্য একটি সাধারণ ভাষাকে চালু করতে। জাতির মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়তে পারে ভাষাই। সবদিক বিবেচনা করে নেতাজী বেছে নিয়েছিলেন হিন্দীভাষাকেই।

কেন হিন্দীভাষা? নেতাজী দেখলেন, এ এমন এক ভাষা যা ভারতের অধিকাংশ মানুষই বলে এবং বোঝে। তাছাড়া হিন্দীভাষার মধ্যে রয়েছে এক ওজস্বিতা। এই ভাষায় রয়েছে শৌর্য, আচারনিষ্ঠতাও। তাই এই ভাষাতে যেমন সামরিক নির্দেশ দেওয়া যায়, তেমনই নাগরিক জীবনের হাসি-কান্নার আবেগকেও প্রকাশ করা যায়। এখানেই তিনি থামেননি, হিন্দীভাষাকে আরও শক্তিশালী ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা করেন তিনি।

ভাষা নিয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাই তিনি চেয়েছিলেন আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত, ইংরেজী থেকে শব্দ গ্রহণ করে হিন্দীভাষাকে পরিপুষ্ট করতে। ভাষাকে মজবুত করতে গিয়ে তার শব্দভাণ্ডার যাতে না বিশাল হয়ে যায়, সে-ব্যাপারেও তিনি নজর দিতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন একটি সাধারণ অভিধান তৈরি করতে।

ভাষাকে সর্বগামী করে তোলার জন্য নেতাজী হিন্দীর হরফই বদলে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, বহু ভাষাভাষীর দেশে হিন্দীভাষাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন একটি সাধারণ হরফ। সেই ভেবেই তিনি রোমান হরফে হিন্দী ভাষা চালু করতে চেয়েছিলেন। এতে অন্যান্য সুবিধাও রয়েছে। যেমন, ছাপাখানার সুবিধা এবং দ্বিতীয়তঃ বিদেশীদের কাছে প্রাথমিকভাবে এই ভাষা পাঠযোগ্য হবে। কেউ কোন ভাষা যদি পড়তে পারেন, তবে তার অর্থ বোঝা তার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। এতে আগ্রহও বাড়বে। রোমান হরফ হলে সংবাদপত্র ও বই প্রকাশে সুবিধা হবে, সুবিধা হবে ডাক ও তার বিভাগেরও। আবার কেউ রোমান হরফ শিখে নিতে পারলে তার ইংরেজী এবং হিন্দী দুটির বর্ণমালাই চেনা হয়ে যায়। নিরক্ষরতা যেদেশে অভিশাপের মতো, সেদেশে মানুষকে স্বাক্ষর করে তোলার পক্ষে তাঁর এই চিন্তাভাবনা ছিল যথেষ্ট প্রাগ্রসর।

কিন্তু নেতাজী শুধু পরিকল্পনা নিয়ে দিন কাটাননি, সেই পরিকল্পনাকে হাতে কলমে রূপদান করার চেষ্টাও করেছিলেন। নেতাজী যখন সুদূর প্রাচ্যে যান, তখন সেখানে রোমান হরফের হিন্দীভাষায় একটি পূর্ণ আকারের সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন বের করেছিলেন। ততদিনে আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক নির্দেশগুলি রোমান হরফে বই করে বের করার জন্য কম্পোজও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের দেশে যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, তা প্রত্যেক সম্প্রদায় ও ধর্ম অনুসারী। যেমন—কেউ বলেন 'নমস্তে', কেউ বলেন 'সালাম', কেউ বলেন 'রাম, রাম'। নেতাজী দেখলেন, এই শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটা বিভেদ। এই বিভেদটুকু দূর করার জন্য প্রয়োজন একটি সাধারণ শুভেচ্ছাজ্ঞাপকবাণী। সেই বাণী মানুষের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক বিভেদটুকু যেমন মুছে ফেলবে, তেমনই তাদের মধ্যে গড়ে তুলবে ঐক্যবোধ এবং আত্মিক সম্পর্ক। তিনি চেয়েছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বাণী ছড়িয়ে পড়ুক। সেই বাণী সারা দেশের মানুষকে

বাঁধুক একই আত্মীয়তার বন্ধনে। সেই বাণী হলো 'জয় হিন্দ'। এর মধ্য দিয়ে যেমন শুভেচ্ছা বিনিময় হবে, তেমনই দেশের মানুষের চেতনার মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে যাবে একটি বোধ, তা হলো—আমরা ভারতবাসী।

নেতাজী জানতেন, ভারতের মুক্তি-আন্দোলন ব্যর্থ হবে না। সেই আন্দোলন একদিন শেষ হবে এক তিমির-বিনাশী প্রভাতে। সেই প্রভাত থেকেই শুরু হবে নতুন চলার পথ। কোন্ পথে চলবে স্বাধীন ভারতবর্ষ, তার রূপরেখাও তৈরি করেছিলেন তিনি।

অর্থনীতি ছিল নেতাজীর কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকার সময় পরাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি দলীয় বৈঠকে আলোচনা করেন। তিনি চেয়েছিলেন, এই সমস্যাগুলির দিকে নজর রেখেই কংগ্রেস কাজ করুক।

জার্মানিতে থাকার সময় তাঁর হাতে ভারতীয় অর্থনীতি ও কৃষি সংক্রান্ত কয়েকটি বই আসে। এগুলি যুদ্ধের আগে প্রকাশিত। ভারতীয় কৃষি, অরণ্য, পশুপালন, বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও খনিজ সম্পদ এবং শিল্প ও কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদ নিয়ে বইগুলিতে বিস্তারিতভাবে লেখা ছিল। এই তথ্যগুলি তাঁকে স্বাধীন ভারতের রূপরেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন কৃষিক্ষেত্র, অরণ্য সম্পদের ব্যবহার, পশুপালন ইত্যাদির ওপর জোর দিতে। এই রূপরেখা অঙ্কনের সময় তিনি জার্মানি, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের অনুসৃত নীতিগুলির ভাল ভাল দিকগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। ইউরোপের অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি এবং সামগ্রিক জীবনকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছিলেন। প্রত্যেকের 'ভাল'গুলিকে একত্রিত করে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষকে।

শুধু অর্থনীতি, কৃষি বা জীবনধারণের বিকাশই সব কথা নয়, স্বাধীন ভারতের অন্যতম চিন্তা তার প্রতিরক্ষা। প্রতিরক্ষা নিয়ে বিস্তারিতভাবে ভেবেছিলেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতে অস্ত্র-কারখানা গড়তে। সেজন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রুয়েনে দুটি অস্ত্রের কারখানা 'স্কোদা' এবং 'ব্রেন' পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। নেতাজীর পরিকল্পনার কথা শুনে চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতকে সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল। স্বাধীন ভারতে নতুন নতুন কারখানা গড়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তাই তিনি প্রতিটি দেশের শিল্পপ্রসারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া, জার্মানি, হল্যান্ড সহ বহু দেশে তিনি কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। মুক্ত ভারতের জাতীয় জীবনের সমৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য তিনি তাঁর ভাবনাকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

দেশের সেনাবাহিনীর জন্য নতুন ধরনের মেডেল তৈরির কথাও তিনি মাথায় রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, মেডেলের পরিকল্পনা করে তা ভিয়েনার একটি কোম্পানি থেকে তৈরিও করিয়েছিলেন। এক রকমের নয়, দশ রকমের মেডেল। সেইসঙ্গে তৈরি করিয়েছিলেন পোস্ট্যাল স্ট্যাম্প ও পাসপোর্ট। নতুন ধরনের মুদ্রা চালু করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল।

সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন স্বাধীন ভারতের জন্য। ব্রিটিশের নাগপাশ থেকে ভারত মুক্ত হলেই নতুন উদ্যমে কাজে নামার শক্তি তাঁর মধ্যে অটুট ছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পর তাঁর পরিকল্পনাগুলি কাজে লাগানো যায়নি। 'যোদ্ধা' নেতাজীর স্বরূপ আমরা চিনি। কিন্তু 'স্বাধীন ভারতের রূপকার' নেতাজীকে আমরা পাইনি। সেই 'অন্য নেতাজী'র স্বপ্নকে আমরা রূপদান করতে পারিনি। তাঁর পোঁতা গাছকে আমরা নিজেরাই বাড়তে দিইনি। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সামরিক শক্তি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও কৃষিতে ভারতকে প্রথম সারিতে আনতে চেয়েছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্নের রশি ধরে ভারতকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে তরুণ সমাজ। আজকের হতোদ্যম, ক্রমেই পিছিয়ে পড়া, সংঘাত-দীর্ণ ভারতের দিকে তাকিয়ে শুধুই দীর্ঘশ্বাস পড়ে। 'অন্য নেতাজী'র পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণ করতে আমরা পারিনি, তাই আমাদের আরও অনেক মূল্য দিতে হবে। বাকি এখনো অনেক প্রায়শ্চিত্ত।□

সহায়ক গ্রন্থ

- □ Netaji in Germany: A Little-known Chapter—N. G. Ganpuley
- □ Netaji and India's Freedom (Proceedings of the International Netaji Seminar, 1973), Ed.—Sisir K. Bose
- □ This Europe—Girija Mookerjee
- □ Story of the INA—S. A. Ayar
- □ তরুণের স্বপ্ন—সুভাষচন্দ্র বসু
- □ লোকমত (নেতাজী জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫), সম্পাদক—চিত্ত বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমার দ্বারা যা সম্ভব হবে না, তোমাকে তা করতে হবে। আমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ। আমি কর্তা, তুমি কর্ম। প্রথমে তুমি আমাকে বাজাও। তোমার সংশয়ে, তোমার বিশ্বাসে, তোমার অবিশ্বাসে, তোমার বিলিতি বিদ্যায়, তোমার কান্ট, হেগেল, হিউম, স্পিনোজা, ডেকার্ট, হবস-এ তুমি আমাকে প্রেক্ষণ কর। উনবিংশের শহরজীবনের প্রেক্ষায় আমাকে নিরীক্ষণ কর। আমি পোশাকী সভ্যতাকে বর্জন করেছি। আমার তন্ত্র নেই, মন্ত্র নেই, আমি আকাশের মতো উদার। আমি কেতাবী জ্ঞানকে উপেক্ষা করেছি এই সত্য প্রমাণে যে, প্রকৃত জ্ঞান উদিত হয় ঠিক সূর্যোদয়ের মতো। হাজার বছরের অন্ধকার একটি দেশলাইকাঠির আলোকে নিমেষে আলোকিত হয়। আমি এই প্রমাণ করতে চেয়েছি—আমি যা বলব, আমার পিছনে শাস্ত্রগণ 'যো হুজুর' বলে হাজির থাকবেন। তুমি যা বলছ, এই তো আমাতে রয়েছে। আমি প্রমাণ করব, জ্ঞান আগে চলে পিছনে চলে শাস্ত্র। তোমার প্রিয় গ্রন্থ 'ইমিটেসান অব ক্রাইস্ট'-এ টমাস আ কেম্পিস যে-কথা বলেছেন, আমি তার প্রমাণ ঃ

"How happy a man is when the truth teaches him directly, not through symbols and words that are soon forgotten, but by contact with itself."

সেই মানুষ কত আনন্দিত হয়, যখন সত্য স্বয়ং এসে তাকে শেখায়। প্রতীক ও বর্ণমালার মাধ্যমে যে-শিক্ষা, তার স্মৃতি-বিস্মৃতি আছে ; কিন্তু সত্য যখন নিজে এসে উদিত হন তখন ভরপুর আনন্দ। শোন নরেন্দ্র, উপমা অথবা তুলনাটা এইভাবেও করা যায়, যেমন—একটি মেয়ের সদ্য বিবাহ হয়েছে। সে এইবার বাপের বাড়িতে এসেছে। বান্ধবীরা সবাই ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করছে, ভাই সে কেমন! সেই 'কেমন'টা বর্ণনা করা যায়, উপলব্ধিটা আসে না। সেই 'কেমন'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে উপলব্ধি আসে। আমার দেহাবসানের পর তুমি এই কথাই অন্যভাবে বলবে। জ্ঞান অন্তরেই আছে, বিকাশই হলো শিক্ষা। চিন্তা স্বাধীন। আরোপ হলো বন্ধন। পরাধীনতা।

তিন থাকে সাজিয়ে গেলাম মানুষের মনের ধারাকে—অজ্ঞান, জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জগৎ-কারণস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে অস্বীকার করার নাম অজ্ঞান—সে তুমি বি. এ., এম. এ., ডক্টরেট, ডি ফিল, যাই হও না কেন। তিনিই সব, তিনিই সব করাচ্ছেন, মানুষ যন্ত্রমাত্র—এই বোধের উদয় হলো জ্ঞান। আর বিজ্ঞান! তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সমগ্র একটা হাতিকে সে স্বচক্ষে দেখেছে। স্পর্শনজ্ঞান নয়—দর্শন। তখন 'জ্ঞান' শব্দটাই লোপাট, তখন অনুভূতি, তখন আস্বাদন। স্বামী কেমন? যতভাবেই বলি না কেন, মস্ত বড় একটা দিক—আস্বাদনের দিক—সেটি বলা যাবে না। সেটি পেতে হলে স্বামিসঙ্গ করতে হবে। পাখি ওড়ে, আমি জানি। এটি জ্ঞান। বিজ্ঞানে যেতে হলে আমাকে উড়তে হবে নীল আকাশে পাখা মেলে।

তুমি আমাকে পরীক্ষা করলেই বুঝবে, তুমি যেখানে যেতে চাইছ জ্ঞানের পথ ধরে, আমি সেইখান থেকেই এসেছি—ওদিক থেকে এদিকে। আমি জাত নই, আমি অবতীর্ণ। "I am not born, I have descended." তোমরাই আমাকে 'অবতার' করবে, আমি কিন্তু কোন বিশেষণের পরোয়া করি না, তুমিও আমাকে কোন বিশেষণে ভূষিত করতে চাইবে না ; কারণ তুমিও আমার মতো প্রথাভাঙা, সংস্কারভাঙা এক বিদ্রোহী। তুমি আর আমি কোন একটি কালে বদ্ধ থাকব না, আমরা হব সর্বকালের, সর্বধর্মের। আমাদের দেবতা মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় থাকবেন না ; তিনি থাকবেন সর্বভূতে শিব হয়ে। সেই শিবের সেবাই হবে আমাদের ফলিত ধর্ম। আমি 'গুরু' হতে আসিনি, আমি এসেছি মানুষের গরিমা বাড়াতে।

আমি যেমন তোমাকে ধরতে পারব, তুমিও সেইরকম ধরতে পারবে আমাকে। এ যেন সেই শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। রতনের রতন চেনা। কদর্থে নয়, সদর্থে। প্রথম যেদিন দেখা হলো দক্ষিণেশ্বরে, মনে পড়ে নিশ্চয়! মনের আবেগে তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম উত্তরের নির্জনের ঝাঁপফেলা বারান্দায়। তুমি ভেবেছিলে, গোটা কতক সাধারণ উপদেশ দিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেব। চিরাচরিত পথে তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ চলে না বাছা! আমি তখন তোমার হাত-দুটি ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম ঃ "এতদিন পরে আসতে হয়! আমি তোমার জন্যে কিভাবে প্রতীক্ষা করে রয়েছি, তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমার

কান ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে ; প্রাণের কথা কাউকেও বলতে না পেয়ে আমার পেট ফুলে রয়েছে।" সেদিন করজোড়ে এই বলে তোমার বন্দনা করেছিলাম, যেন কোন দেবতার বন্দনা—"প্রভু ! আমি জানি, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীরধারণ করিয়াছ।"

নরেন্দ্রের অহং-এর আবরণ ভেঙে স্বামী বিবেকানন্দকে মুক্ত করাই ছিল আমার কাজ। আমি দর্পণ, তুমি বিম্ব। তুমি রথ, আমি রথী। তুমি সচেতন যন্ত্র, আমি যন্ত্রী। আমি গোখরো। আমি আর তুমি গুরু-শিষ্য নই, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আমি মর্ম, তুমি কর্ম। আমি মন্ত্র, তুমি তন্ত্র। আমি শক্তি, তুমি শাক্ত। আমি বলেছিলাম, তোমার মধ্য দিয়ে ঘটবে আমার সিদ্ধাইয়ের কিঞ্চিৎ প্রকাশ। আমি বিন্দু, তুমি চরাচর। এমন প্রেম, এমন ভালবাসা তুমি কারো কাছে পেয়েছিলে কি ? আমার চেনা দিয়ে তুমি নিজেকে চিনেছিলে। আমার ধর্মের তো একটিই কথা ছিল—ঈশ্বর নয়, নিজেকে চেন। চৈতন্য। তার জন্য একটি শলাকাই যথেষ্ট, সেটি হলো জ্ঞান। আমি একালের, সর্বকালের সার কথা সেকালেই বলে গেছি—"Don't think God as a being, God is Being." সর্বভূতে তিনি রেণু রেণু হয়ে আছেন। তুমি আমার সাধনার অনির্বাণ ধ্বনি।

তাই তো তুমি বলতে পারবে ঃ

"এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এজগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ 'লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী' বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত 'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।"

তুমি উঠলে চৈতন্যসাগরে স্নাত হয়ে! রোমাঁ রোলাঁ আমার সম্বন্ধে বলবেন ঃ

"Paramahansa—the Indian Swan—rested his great white wings on the sapphire lake of eternity beyond the veil of tumultuous days."

আর তোমার সম্পর্কে বলবেন ঃ "The spirit with the widest wings—Vivekananda."

আমি চৈতন্যসাগরের হংস, তুমি আমার ওড়ার শক্তি।

ঘরে ঘরে আজ তোমার দৃপ্ত পরিব্রাজক-মূর্তি। তোমার হাতে ধরা বিশাল এক দণ্ড। ঐ দণ্ডের স্বরূপ কী জান তুমি ? ওটি শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার সঙ্গে আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে।

প্রথমে আমি তোমাকে ধরেছিলাম, পরে তুমি আমাকে ধরলে।

সংশয় হতে এলে সত্য সদনে। "শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণিধানাদ্বা"। আমি শাস্ত্র, তুমি ব্যাখ্যা ॥ □

বিজ্ঞান

অনন্ত যৌবনের সন্ধানে

হেলেন সল

অনন্ত যৌবন লাভের চেষ্টা সুদূর অতীত কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু তা আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। এর জন্য কত ওষুধই না ব্যবহৃত হয়েছে! তবুও এ-চেষ্টা যে অব্যাহত আছে তার কারণ—বৃদ্ধ হতে কেউ চায় না। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের সব দেশের সরকারই সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য আর খরচ বাড়াতে চায় না। এই দুটি কারণে বার্ধক্য এড়াবার জন্য গবেষণা চলেই আসছে। এখন মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যেন খানিকটা সাফল্যের দিকে এগিয়েছেন।

এই ব্যাপারে নতুন যে-দ্রব্যটি শিরোনামে এসেছে তা হলো মানবদেহবৃদ্ধির হরমোন (Human growth hormone)। এই হরমোন প্রাণিদেহের এক বিশেষ রস যা রক্তের সঙ্গে মিশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সক্রিয় করে তোলে। এবিষয়ে অত্যুৎসাহী গবেষকরা বলতে আরম্ভ করেছেন—এটি এমন জোরাল ওষুধ যে, বার্ধক্যের গতিকে এটি বিপরীতমুখী করে দেবে এবং সকল বৃদ্ধের পক্ষে প্রযোজ্য ওষুধ হয়ে দাঁড়াবে। এ-মতের বিরোধীরা বলছেন যে, বৃদ্ধদের অসুখ সারানো এবং বার্ধক্যের চিকিৎসা—এ-দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যবান বয়স্ক লোকের পক্ষে এর প্রয়োগ ক্ষতিকর হতে পারে এবং এর বেশি প্রয়োগে অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly) নামক অসুখের সম্ভাবনা, যাতে চোয়াল বড় হয় ও হাত-পা দীর্ঘতর হয়।

ওষুধটি এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে, কিন্তু যৌবনকে ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি এতই মনোমুগ্ধকর যে, আমেরিকায় কেউ কেউ নিয়মবহির্ভূতভাবে এই ওষুধ যোগাড় করে ফেলছে। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ ফলাফল দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। গবেষকরা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধান ছাড়া এই ওষুধ ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনার কথা ভেবে চিন্তিত হয়েছেন, কারণ তাতে এই নতুন গবেষণা কলঙ্কিত হবে।

গত পঞ্চাশের দশকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ পিটুইটারি গ্রন্থি-নিঃসৃত দেহের বৃদ্ধিকারক এই হরমোন আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখন বেশি পরিমাণে এটি না পাওয়ায় যেসব শিশু এই হরমোনের অভাবে বাড়ছিল না, কেবল তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সত্তর দশকের শেষদিকে এটি ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা (synthesis) সম্ভব হয় এবং বেশি পরিমাণে পাওয়ায় বয়ঃপ্রাপ্তদের ওপর এর প্রভাব পরীক্ষিত হতে থাকে। যেসব বয়স্ক রোগীর পিটুইটারি গ্রন্থি অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে স্থির করা হয়, এটি যে কেবলমাত্র শিশুদের ওপর প্রযোজ্য তা নয়—বয়স্কদেরও এর প্রয়োজন আছে।

মানবদেহবৃদ্ধির হরমোন বিষয়ে বিশিষ্ট বার্ধক্য-বিশেষজ্ঞ এবং আমেরিকার 'ভেটারেন্স অ্যাফেয়ার মেডিক্যাল সেন্টারে'র বার্ধক্য বিষয়ের অধ্যাপক ড্যানিয়েল রুডম্যানের মতে, বয়োবৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পরিমাণে এই হরমোনের প্রয়োজনীয়তা আছে। নবজাতকদের দেহে এই হরমোন প্রচুর থাকে, তারপরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ কমতে থাকে। যৌবনে দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধিকালে এর পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যায়। তারপর বয়সের প্রতি দশকে এর পরিমাণ কমতে থাকে। ৬০ থেকে ৯০ বছরে এটি সামান্য পরিমাণ তৈরি হয়। ব্যাপারটি খানিকটা স্ত্রীলোকের রজোনিবৃত্তির মতো। রুডম্যান মনে করেন, বার্ধক্যের কোন কোন অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তবে এই হরমোন ও অন্যান্য হরমোন কমে গেলে তা পূরণ করে চিকিৎসা করা সম্ভব।

১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে গবেষকরা ২৪জন রোগীকে (যাদের মধ্যে অনেকের পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমার ছিল) এই হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করেন। তাঁরা দেখলেন যে, চিকিৎসার ছয় মাস আগে ও ছয় মাস পরে রোগীদের শারীরিক ওজন ঠিক থাকে, তবে তাদের ৫.৫ কিলোগ্রাম চর্বি কমেছে এবং সমপরিমাণে মাংস ইত্যাদি অন্যান্য টিসু (lean tissuc)

বেড়েছে। অন্যান্য জায়গায় গবেষণাতেও এইরকম ফল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এই হরমোন কমলে 'মেটাবলিজম' (জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তর) কমে যায়, যার ফলে চর্বি বাড়ে এবং অন্যান্য টিসু কমে। এই হরমোন প্রয়োগে কোলেস্টেরল কমে এবং মাংসপেশী ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্ষমতা বাড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি হরমোন এতরকম কাজ কিভাবে করে? অতি প্রচলিত একটি মত হচ্ছে—মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে যকৃতে গিয়ে ইনসুলিন-এর (যা কমলে মানুষের ডায়াবেটিস হয়) মতো আরেকটি দ্রব্য ফ্যাক্টর-১ বা আই. জি. এফ.-১ (IGF-1) তৈরি করে, যা দেহের সর্বাংশের বৃদ্ধির কারণ। অন্যান্য গবেষকরা মনে করেন, এই হরমোন শুধু যকৃতে নয়, দেহের সব টিসুতেই (মাংসপেশী, কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি কিংবা অন্যান্য অংশেও) আই. জি. এফ.-১ তৈরি করতে সমর্থ। ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকোর এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান ডগলাস ক্রিস্ট বিশ্বাস করেন যে, দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর এই হরমোনের কাজ ভিন্ন ধরনের। তিনি দেখিয়েছেন যে, দেহে এই হরমোন ইনজেকসন করার পর সেই ব্যক্তির রক্ত ল্যাবরেটরিতে চাষ করা (cultured) ক্যানসার-দেহকোষকে অনেক তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে পারে।

আশির দশকের মাঝামাঝি দেহবৃদ্ধির হরমোন বয়স্ক মানুষের কোন উপকারে আসতে পারে কিনা সে-বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অনেকেই গবেষণায় নেমে পড়েন, তবে আমেরিকায় রুডম্যানের নেতৃত্বে দলটি সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি দেখায়। রুডম্যান ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে' তাঁর গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ করেন। তিনি ২১ জন স্বাস্থ্যবান ৬০ বছরের উর্ধ্ব বয়সের লোকের (যাদের শরীরে এই হরমোন অল্প ছিল এবং কুঞ্চিত ত্বক ও বেশি চর্বি ছিল) ওপর এই হরমোন প্রয়োগ করে দেখেন যে, তাদের দেহে বয়োবৃদ্ধির ছাপ চলে গেছে; এদের চর্বি কমেছে এবং অন্যান্য লিন টিসু বেড়েছে। এই গবেষণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ও এই বিষয়ে গবেষণা আরও জোরদার হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, এই হরমোনের ফলে অনেকের বয়স অর্ধেক হয়ে গেছে। 'ইউ. এস. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ' বয়স্কদের ওপর এর প্রভাব দেখার জন্য ৮টি গবেষণা-খাতে টাকা মঞ্জুর করে।

এই হরমোনের ওপর গবেষণা বাড়ায় এবিষয়ে জনগণের উৎসাহ বেড়ে গেছে। কারণ, এ এমন এক চিকিৎসা যা সময়ের চক্রকে বিপরীতমুখী করতে পারে। বৃদ্ধদের বয়স অর্ধেক কমে যাওয়া এবং জীবনীশক্তি ও যৌবনশক্তি ফিরে পাওয়ার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার কোন কোন ব্যবসাদার আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশে (যেখানে নিয়মকানুন তত কড়া নয়) এই হরমোন প্রয়োগের চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে বসেন। রোগীরা ঘরে বসে যাতে আমেরিকা থেকে এই হরমোন পায়, তারও ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা গবেষকদের কাছে খুবই অস্বস্তিকর। বেশিদিন এই হরমোন ব্যবহার করলে কি কুফল হয় তা জানার আগেই এরকম ব্যবসা শুরু হওয়াতে রুডম্যান ও অন্যান্য গবেষকরা খুবই বিব্রত।

অন্য একটি ভেটারেন্স হসপিটালের বিশেষজ্ঞ অ্যানড্রু হফম্যান প্রশ্ন তুলেছেন যে, যেসব বয়স্কের স্বাস্থ্য ভাল, তাঁদের এরূপ জোরাল হরমোন দেওয়ার কি কোন অর্থ হয়? এবিষয়ে আরেকজন গবেষক উইসবার্জার বলেন: "আমি মনে করি না, এই হরমোন তারুণ্যের টনিক হয়ে দাঁড়াবে। শরীরের কিছু কিছু উন্নতি হয় বটে তবে আমি যেসব রোগীকে দেখেছি, তাদের কাউকেই বারান্দায় লাফঝাঁপ করতে দেখিনি।"

ইতিমধ্যেই রুডম্যানের চিকিৎসায় থাকা এবং এই হরমোন প্রাপ্ত হওয়া কিছু কিছু রোগীর রক্তে অত্যধিক শর্করা, স্তনের স্ফীতি ইত্যাদি নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই হরমোনের সঠিক প্রয়োগমাত্রা এবং তা কতদিন প্রয়োগ করা উচিত—এগুলি এখনো নির্ধারিত হয়নি। এই হরমোন প্রয়োগে আরও কত কুফল হতে পারে তাও সঠিকভাবে জানা হয়নি।

হরমোন প্রয়োগের পক্ষে ও বিপক্ষে যাঁরা, তাঁদের কোন্ দলটি ঠিক তা ভবিষ্যতে জানা যাবে। তবে সকল গবেষকই স্বীকার করেন যে, গবেষণালব্ধ ফলকে এভাবে পয়সা রোজগারের কাজে লাগানো ঠিক নয়। অনন্ত যৌবন লাভের জন্য এই হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে গবেষণার কাজ বিপর্যস্ত হবে এবং অনেকের মৃত্যুও হতে পারে।□

সৌজন্য: **New Scientist, 19 February 1994, pp. 22-24**

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রসঙ্গ বিবেকানন্দ ও মার্কস

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

মার্কসবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ (২য় সং)। সম্পাদনা: তাপস বসু। প্রকাশক: পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ৬+১৩৪। মূল্য: ৩৫ টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি সগর্বে বলেছিলেন: "আমি সমাজতন্ত্রী।" আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন: "নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে... হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোপ জঙ্গল পাহাড় থেকে।" অর্থাৎ শূদ্র অভ্যুত্থানের তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা। 'স্বপ্নদ্রষ্টা' বললে কথাটা ভুল বলা হবে। তিনি ছিলেন শূদ্রজাগরণের বাস্তব-দ্রষ্টা। কার্ল মার্কসও নিপীড়িত মানুষের উত্থানের কথা বলেছেন। স্বামীজীর মতো তিনিও দেখেছেন শোষণমুক্ত এক সমাজের স্বপ্ন। উভয়ের বিপ্লবপন্থায় স্বাতন্ত্র্য আছে। তবুও এখানেই উভয়ের চিন্তার মিলনকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ যে পরীক্ষামূলক সুবিধা পেয়েছে স্বামীজীর মতবাদ তা পায়নি। কিন্তু মার্কসবাদ আজ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এর অসম্পূর্ণতা টের পেয়ে আজ বিভ্রান্ত। হতবুদ্ধি মানুষ আজ রাশিয়াতে কম্যুনিস্ট সমাজ গড়তে চাইছেন ধর্মকে বাদ দিয়ে নয়—ধর্মকে স্বীকার করে নিয়ে, মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে পরিপূর্ণ বিকশিত করার সুযোগ রচনা করে। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে কৌতূহলোদ্দীপক একখানি বই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তরুণ অধ্যাপক তাপস বসু। তাঁর সম্পাদিত প্রবন্ধ-সঙ্কলনটির নাম মার্কসবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ। বইটির শেষে রয়েছে প্রাবন্ধিক পরিচিতি। লেখকসূচীতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে হাল আমলের মার্কসবাদী নেতারাও আছেন। আছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও। অবশ্য এখানে তাঁর ভাষণ সঙ্কলিত হয়েছে, লিখিত কোন প্রবন্ধ নয়। যাই হোক, তিনি মার্কসবাদ ও স্বামীজীর 'নব বেদান্তবাদ'-এর কোন তুলনামূলক তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক উপযোগিতার আলোচনায় না গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। স্বামীজী-ব্যাখ্যাত ধর্মের সামাজিক প্রয়োগোপযোগিতার দিকটিই তুলে ধরেছেন তিনি। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধটি যথেষ্ট মননঋদ্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ। স্বামীজী বলতেন, 'আর্য' ও 'তামিল'—এই দুটি শব্দের পার্থক্য বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তবে এই পার্থক্য ভাষাগত, রক্তগত নয়। স্বামীজীর এই বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নিরূপিত হয়েছে বিভিন্ন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানীদের বাস্তব তথ্যানুসন্ধানে। প্রবন্ধটি স্বামীজীর অকল্পনীয় সমাজতত্ত্ব-জ্ঞান ও মনীষার যথাযথ পরিচয় তুলে ধরে। এরপরেই রয়েছে সম্প্রতি প্রয়াত মার্কসবাদী সাহিত্যিক গোপাল হালদারের ('চতুরঙ্গ' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) উপলব্ধিপ্রসূত ও অনুভবদীপ্র প্রবন্ধ—'স্বামী বিবেকানন্দ: আমার উপলব্ধিতে'। তিনি বিবেকানন্দকে দেখেছেন জাতীয় স্বাধীনতার এক বৈপ্লবিক প্রেরণা ও যুগনায়করূপে জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি ভেদোত্তীর্ণ প্রাণবান নতুন জীবনের উদ্বোধক হিসেবে। তবে কিছু বিতর্কিত প্রসঙ্গও তিনি তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন: "সুভাষচন্দ্র ছাড়া বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কয়জন নেতা?" অগ্নিযুগের অধিকাংশ নেতা ও বিপ্লবী যে স্বামীজীর বাণী ও রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তা কি তাঁর কাছে অজ্ঞাত? অরবিন্দ, বাঘা যতীন, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতা এবং কানাইলাল, গণেশ ঘোষ প্রমুখ অগণিত বিপ্লবী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। মার্কসবাদী নেতা বলে নিজেকে পরিচয় দিলেও তিনিও তো স্বীকার করেছেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বামীজীর প্রেরণাতে তাঁরও উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধটি সত্যিই স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। তিনি তাঁর বিপ্লব-জীবনে বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রেরণা অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করে মানুষের চরিত্রের 'basic qualities'-র 'development'-এর প্রয়োজনে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করেছেন। প্রয়াত সি.পি.এম সাংসদ প্রয়াত গণেশ ঘোষ এবং প্রাক্তন সি.পি.আই. সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর 'মানুষ হওয়া'র আহ্বানকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন।

বিবেকানন্দের মতাদর্শ কোন একটি জাতির বা দেশের বা কোন কালের, কোন স্থানের মধ্যে প্রকটিত হবে এমন কথা নয়, তা সর্বকালের সর্বদেশের জন্য অমোঘ চিরন্তন এক সত্য—কোন 'ইজম' বা মতবাদ নয়। তাই এর প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। মানবজীবনকে প্রগতিশীল ও উন্নত করতে তিনি কোন অর্থনৈতিক কাঠামো দিয়ে যাননি সত্য, কিন্তু বলেছেন সমস্ত কাঠামোর মূল ভিত্তি মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা। মার্কসবাদের ব্যর্থতার মূল কারণ মানবমন বা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসের অগভীর চিন্তা। মানুষের সহজাত মুক্তমনের তিনি সঠিক হদিস পাননি।

শ্রেণীসংগ্রামকে স্বামীজী সম্ভাব্য বলে মনে করলেও অনিবার্য বলেননি। ভারতে এক নতুন ধরনের বিপ্লবের কথা বলছেন স্বামীজী: "ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশ সহায়ে।" বিপ্লবের এই অভিনব চরিত্রেই ক্রমে আকৃষ্ট হবে সমস্ত জগৎ।

পরিশেষে এটুকু বলতে হয়, জলিমোহন কল, তরুণ সান্যাল, রণেন দাশগুপ্ত, অমলেন্দু দে প্রমুখের বিবেকানন্দ-ভাবনা পাঠকের কৌতূহলকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়াস যোগাবে। সামগ্রিকভাবে আলোচ্য গ্রন্থটি বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন নিঃসন্দেহে।□

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শিক্ষক সম্মেলন

কোয়েম্বাটোর (তামিলনাড়ু) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় গত ২৯ অক্টোবর 'ছাত্রদের মধ্যে নীতিশিক্ষাপ্রসারে শিক্ষকের ভূমিকা' বিষয়ে এক শিক্ষক-সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই বিদ্যালয়ের ১০০ জন শিক্ষক ছাড়াও অন্যান্য ২৫টি বিদ্যালয় থেকে আরও ১৫০ জন শিক্ষক তাতে যোগদান করেছিলেন।

ক্যান্সারনির্ণয়-শিবির

কোয়েম্বাটোর আশ্রম গত ৫ নভেম্বর বিনামূল্যে এক ক্যান্সারনির্ণয়-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৫০ জন দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করা হয়।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবির

আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনায় গত ৪ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর '৯৫ পর্যন্ত বিনাখরচে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ দুঃস্থ রোগীদের জন্য এটি দ্বাদশ শিবির। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ চক্ষু-বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ এই অস্ত্রোপচার করেন। শিবিরে ২৮ জন পুরুষ ও ৩৮ জন মহিলা সহ ৬৬ জন দুঃস্থ রোগী ছিলেন। তাঁদের বিনামূল্যে চশমা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রাণ

বিহার দুঃস্থত্রাণ

জামতাড়া আশ্রম দুমকা জেলার জামতাড়া ও তার আশপাশের ১৪৭টি দুঃস্থ উপজাতি পরিবারের মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও কম্বল বিতরণ করেছে।

তামিলনাড়ু দুঃস্থত্রাণ

চিঙ্গেলপত্তু আশ্রম দুঃস্থদের মধ্যে ধুতি, শাড়ি ও ২০০ ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ের পোশাক বিতরণ করেছে।

মেঘালয় বন্যাত্রাণ

চেরাপুঞ্জি আশ্রমের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম খাসিপাহাড় জেলায় ২৭১টি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৩৫০টি বাসনপত্র, ৪২৬০টি পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ

দিনাজপুর আশ্রম দিনাজপুরের পার্শ্ববর্তী ৩০টি গ্রামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ২৪১টি শাড়ি, ২৬১টি ধুতি, ৩৪৫টি লুঙ্গি ও ৬৭টি কম্বল পুনরায় বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্র

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লাতুর জেলার কাওয়ালি গ্রামে ১৬৭টি নবনির্মিত বাড়ি, একটি প্রশস্ত সমাজগৃহ ও একটি বিদ্যালয়গৃহের উদ্বোধন হয় গত ২৪ নভেম্বর। উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ডঃ পি. সি. আলেকজান্ডার। ঐদিন বিকালে দুটি শিশু-উদ্যানেরও উদ্বোধন করা হয়। ২৫ নভেম্বর জাবাল-গাওয়াদি গ্রামে ৫৫টি নবনির্মিত ভূমিকম্প-প্রতিরোধী বাড়ির উদ্বোধন করেন স্টেটসম্যান পত্রিকার কার্যনির্বাহী পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক সি. আর. ইরাণী। ঐদিন তাঁর পত্নী এই গ্রামে একটি শিশু-উদ্যানের উদ্বোধন করেন। সমাজগৃহের উদ্বোধন করেন পিয়ারলেস কোম্পানির যুগ্ম কার্যনির্বাহী পরিচালক সুনীলকুমার রায় এবং নবনির্মিত বিদ্যালয়গৃহের উদ্বোধন করেন বম্বে মেট্যাল এক্সচেঞ্জের চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর প্রেসিডেন্ট এস. এম. মোরাখিয়া ও চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রভাই এন. পারেখ। অনুষ্ঠানে গৃহ-প্রাপকদের প্রত্যেকের হাতে চাবি, মালিকানার কাগজপত্র, এক ট্রাঙ্কভর্তি কাপড়, বাসনপত্র, অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ল্যামিনেশন-করা রঙিন ছবি দেওয়া হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের সমবায়মন্ত্রী জয়সিং রাও গাইকোয়াড় এবং বহু সরকারি পদাধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, স্থানীয় জনসাধারণ যোগদান করেছিলেন। দুদিনই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী শ্রীকরানন্দ। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রত্যেককে প্রসাদের প্যাকেট দেওয়া হয়।

বহির্ভারত

গত ১১ নভেম্বর '৯৫ শিকাগোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মিশিগান অ্যাভিনিউ-র একাংশের নতুন নামকরণ করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে। ঐদিন স্বামীজীর একটি বিরাট আলোকচিত্র নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রবেশদ্বারে, যেখান থেকে রাস্তাটির নতুন নাম চিহ্নিত হয়েছে সেখানে পৌঁছায়। ঐস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাস্তার নাম-ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ভারতীয় দূতাবাসের কনসাল জেনারেল কুমুদরঞ্জন সিংহ প্রমুখ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। নাম-ফলকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত হয়েছে বলে তা প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিগোচর হবে। প্রসঙ্গতঃ, আর্ট ইনস্টিটিউটেই ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিকাগোর সিটি কাউন্সিল স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ধর্মমহাসভায় তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের স্বীকৃতি ও স্মরণে এই নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মরিশাস আশ্রমে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী অনিরুদ্ধ জগন্নাথ ও মরিশাসের ভারতের হাই কমিশনার শ্যাম শরণ যোগদান করেছিলেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিস্কো : এই কেন্দ্রের নতুন মন্দির 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি হল' উৎসর্গ উপলক্ষে গত ১৩ ও ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ এবং ১ জানুয়ারি '৯৬ এই তিনদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৩ ডিসেম্বর দুপুর ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান ও বিকাল ৩টায় আলোচনা-সভা। ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়

শ্রীশ্রীমায়ের ওপর সঙ্গীতানুষ্ঠান, ১১.৩০ মিনিটে মায়ের ওপর আলোচনা এবং ৩টায় স্লাইড শো প্রদর্শিত হয়। এদিন রাত ১১.৩০ মিনিটে ধ্যান ও স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে ইংরেজী প্রাক্ নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। ১ জানুয়ারি সকালে পূজা ও হোম, দুপুরে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি হল'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও বিকাল ৩টায় শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-সভাগুলিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিবৃন্দ যোগদান করেন।

১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, জপধ্যান, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে পালন করা হয়েছে। তাছাড়া সাপ্তাহিক ভাষণ ও ক্লাস যথারীতি হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক: গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ। তিনি প্রতি শুক্রবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাসও নিয়েছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস: গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি ও ১৮ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। ৫ ও ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্র এবং ৭ ও ১৪ ডিসেম্বর 'দ্য গস্‌পেল অব হোলি মাদার'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড: ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি এবং ১৮ ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ও ২৭ ডিসেম্বর স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। তাছাড়া ২৪ ডিসেম্বর যিশুখ্রীস্টের জন্মের প্রাক্‌সন্ধ্যা ও ৩১ ডিসেম্বর প্রাক্ নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন: গত ডিসেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে ধর্মীয় ভাষণ ও প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। গত ১৪ ডিসেম্বর পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয় এবং অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ২৪ ডিসেম্বর যিশুখ্রীস্টের জন্মের প্রাক্‌সন্ধ্যা পালন করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো: গত ১৪ ডিসেম্বর পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিগীতি, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করা হয়। রবিবারগুলিতে যথারীতি ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে এবং ঐ মাসের ২ তারিখ কঠ-উপনিষদ্, ১৬ তারিখ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী এবং ২৩ তারিখ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী শ্রেয়সানন্দ (শৈলেন্দ্র) গত ১৬ নভেম্বর রাত ১০.৫৫ মিনিটে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বাঁকুড়া আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী শ্রেয়সানন্দ ১৯৩২ সালে চণ্ডীপুর (জেলা—মেদিনীপুর) আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪১ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে ভুবনেশ্বর, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কামারপুকুর মঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি চণ্ডীপুর আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ১৯৮১ সালে বাঁকুড়া আশ্রমে যাওয়ার পূর্বে দুবছর ধরে তিনি বেলুড় মঠের গ্রন্থাগারে কর্মরত ছিলেন। সরল, অমায়িক ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৩তম আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাছাড়া সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল ৭টায় মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন 'আনন্দম্'-এর শিল্পিবৃন্দ। সকাল ১০.১৫ মিনিটে 'মা সারদামণি' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। তারপর 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন 'উত্তরায়ণ' সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। বিকালে মাতৃবন্দনা পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ। সন্ধ্যারতির পর লীলাগীতি পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিখ্যাত সানাইবাদক আলী হোসেন সানাই পরিবেশন করেন। এদিন ভোর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অগণিত ভক্তবৃন্দ মাতৃচরণে প্রণাম নিবেদন করে। দুপুরে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে আগত সকল ভক্তকেই প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ৩০ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি ও ১৮ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।□

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ হামিরপুর (রাউরকেলা, উড়িষ্যা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নাটমন্দিরে সন্ধ্যারতির পরে 'সংসারীদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক ভক্ত উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করেন। সম্মেলনের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল সমবেত স্তোত্রপাঠ, ভজন, পাঠ, ভাষণ এবং প্রশ্নোত্তর। ভজনে অংশগ্রহণ করেন গোপেন চক্রবর্তী, অজিত ভট্টাচার্য ; তবলায় সহযোগিতা করেন জীবন দত্ত ও সুমন বাগচী। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনা এবং 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' থেকে পাঠ করেন তাপস বসু, বিজনকুমার মজুমদার, শ্রীমতী চক্রবর্তী এবং রমেন ঘোষ। ভাষণ দেন অরুণকুমার রায়চৌধুরী, ব্রজকিশোর দত্ত এবং অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর প্রদান-সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এছাড়া অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণও তিনি দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ ভরতভূষণ মহান্তি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নলিনীকান্ত নায়েক।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ (পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা-৭০০ ০৩৯)-এর উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো-বক্তৃতার স্মরণে গত ১০ সেপ্টেম্বর '৯৫ সারাদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন তিলজলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে ভাষণ দেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু, প্রণবেশ চক্রবর্তী, উমেশপ্রসাদ সিং এবং যুবপ্রতিনিধিবৃন্দ। আবৃত্তি, বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন শৈলেন্দ্র নন্দী এবং সবশেষে প্রত্যেককে স্বামী বিবেকানন্দের বই ও ফটো উপহার দেন সংস্থার সভাপতি অশোককুমার মাইতি। সম্মেলনে ২০০ যুবক-যুবতী অংশ নিয়েছিল।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসঙ্ঘ (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৪ সেপ্টেম্বর '৯৫ মহালয়া ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে এই আশ্রমের উদ্যোগে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় এক যুব ও ছাত্র-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় সকাল ১০টায় এবং দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় বিকাল ৩.৩০ মিনিটে। প্রথম অধিবেশনে যুব ও ছাত্র-প্রতিনিধিরা সঙ্গীত, আবৃত্তি ও স্বামীজীর সেবাভাবনা বিষয়ে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অধিবেশন পরিচালনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবন আলোচনা করেন স্বামী কাশীনাথানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রারম্ভে বেদমন্ত্র ও দেবীসূক্ত আবৃত্তি করেন অদিতি মল্লিক। গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন আশ্রম-সদস্যাগণ। ভাষণ দেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর ও স্বামী পরিপূর্ণানন্দ। সভাপতিত্ব করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী জয়ানন্দ। এদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৬০ জন ছেলেমেয়েকে জামা, প্যান্ট ও ৩২ জনকে ধুতি, শাড়ি দেওয়া হয়। বস্ত্র বিতরণ করেন রানাঘাট মহকুমা শাসকের পত্নী স্নিগ্ধা বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং সম্মেলনে যোগদানকারী সকল ছাত্রছাত্রীকেই বেলুড় মঠ থেকে প্রাপ্ত স্বামীজীর পুস্তক দেওয়া হয়।

গত ১৫ অক্টোবর ঘাটাল টাউন হল-এ ঘাটাল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) আয়োজিত একদিনের ভক্ত ও ভাবানুরাগী সম্মেলন তিনশতাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে এবং ভাবগম্ভীর শান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। বেদমন্ত্র পাঠ, গীতাপাঠ, আশ্রম-সম্পাদকের ভাষণ, সমবেত ধ্যান, 'কথামৃত' পাঠ, ভাষণ, ভজন-সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তর ছিল সম্মেলনের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানসূচীর অঙ্গ। ভক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী হরিদেবানন্দ বলেন ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনালোকে নিজেদের জীবন গঠন করা এবং পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানই এর উদ্দেশ্য। 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 'ধ্যান' প্রসঙ্গে বলেন—ধ্যানের মাধ্যমে শুভ ভাবনাকে নিজের হৃদয়ে ধরে রাখার অভ্যাস করতে হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ভক্ত সুরেন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের একদিনের আগমন অংশ পাঠ করেন এবং বলেন যে, ভগবানকে সব সমর্পণ করলে ভগবানের অপরিমেয় কৃপালাভ করে ভক্তের জীবন ধন্য হবে। সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং সমবেত ভক্তদের অনুরোধে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ 'উদ্বোধন' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন— 'উদ্বোধন' ঠাকুর, মা, স্বামীজীর ভাব ও বাণী-শরীর। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান অস্থিরতা ও অবক্ষয়ের কালে 'উদ্বোধন'-এর চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শ্রীশ্রীমা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্মদাত্রী এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপরিসীম স্নেহে ও অপূর্ব শাসনে তিনি সঙ্ঘকে পালন করেছেন, রক্ষা করেছেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। স্বামীজীর শিকাগো-সাফল্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মপ্রকাশের মূলে ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অভ্রান্ত ও অনিবার্য ভূমিকা। সম্মেলনের একটি মূল আকর্ষণ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এদিন

সম্মেলন উপলক্ষে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর বিশেষ পূজা হয় ও সমস্ত ভক্তরা বসে প্রসাদ পান। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ঘাটাল সেবাশ্রমের এই প্রথম ভক্ত ও ভাবানুরাগী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী চারশ জন ভক্ত নরনারী প্রভূত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছেন।

গত ৬ অক্টোবর ১৯৯৫, শুক্রবার বাঁশবেড়িয়া-স্থিত (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) বিখ্যাত হংসেশ্বরী-মন্দিরে বেলা সাড়ে দশটায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের রঙিন প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপিত হয়। কল্যাণীর (জেলা—নদীয়া) ঠাকুরদাস ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং মন্দিরের পুরোহিত তপন চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে এই প্রতিকৃতির পুনঃস্থাপন-কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। জনশ্রুতি, শ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) আনুমানিক ১৯১৫ সালে মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। স্বামী বিজ্ঞানানন্দও শ্রীমন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে। প্রসঙ্গতঃ গত ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ মহাপুরুষ মহারাজের একটি রঙিন প্রতিকৃতি শ্রীমন্দিরে পুনঃস্থাপিত হয়েছে।

ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলন

গত ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদের দ্বাদশ ষাণ্মাসিক সম্মেলন করিমগঞ্জ (আসাম) রামকৃষ্ণ মিশনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯টি সদস্য-আশ্রমের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার-বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক স্বামী শিবময়ানন্দ, উত্তর পূর্বাঞ্চল ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী উদ্গীথানন্দ এবং স্বামী ক্লান্ত্যানন্দ, স্বামী রঘুনাথানন্দ ও স্বামী ইষ্টানন্দ। অধিবেশনে তাঁরা ধর্মালোচনাও করেন।

উত্তর ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন বিগত ১৫ অক্টোবর '৯৫ রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ৩২টি আশ্রমের মোট ৯৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন পরিষদ-সভাপতি স্বামী অমলানন্দ। তাছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ভাবপ্রচার কমিটির প্রতিনিধি স্বামী সত্যব্রতানন্দ এবং উত্তর ২৪ পরগনা ভাবপ্রচার পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী মহেশানন্দ। সভায় বন্যার্তদের সাহায্য, যুব-ছাত্র সম্মেলন ও সংস্কৃতভাষার শিক্ষা প্রসারকল্পে ৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নবব্যারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক ও হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সম্পাদক যথাক্রমে উক্ত পরিষদের আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি আশ্রম, খেপুত (জেলা—মেদিনীপুর, পঃ বঙ্গ) দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৬০টি বিভিন্ন রকমের প্যান্ট ও ৪০টি শীতের মোটা গেঞ্জি দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অধ্যাপিকা সবিতা পাল গত ২৪ জুলাই '৯৫ তাঁর নিউ দিল্লীর চিত্তরঞ্জন পার্কের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তাঁর যাতায়াত ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বাংলাদেশের সিলেট শ্রীমঙ্গল গ্রামনিবাসী গিরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য গত ২৮ জুলাই '৯৫ সকাল ৯টায় তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইষ্টমন্ত্র জপরত ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নবগ্রাম (কোন্নগর) বিধানপল্লী-নিবাসী সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী গত ২ আগস্ট রাত ৯.৩০ মিনিটে রিষড়া গ্যালাক্সী নার্সিংহোমে পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি অনেক জনহিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মিষ্টভাষণ, শিষ্টাচরণ এবং বিনয়ের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনি আসামের ডিব্রুগড়ে থাকাকালীন সেখানকার স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনেক জনহিতকর কাজ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, চুঁচুড়া দেওয়ানজীবাগান-নিবাসী লীলাবতী রায় গত ৬ আগস্ট '৯৫ বেলা ১.১০ মিনিটে স্বল্প রোগভোগান্তে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

গত ১৭ আগস্ট শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং মেদিনীপুর বাকলসা গ্রাম-নিবাসী মনোরঞ্জন চক্রবর্তী দীর্ঘ একমাস সন্ন্যাসরোগে ভোগার পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার বহুদিনের গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর-নিবাসী প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ অনিলচন্দ্র দাস (এ. সি. দাস) গত ২০ আগস্ট '৯৫ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ছাত্রজীবনে কৃতি ছাত্র এই শিক্ষাবিদ্ কর্মজীবনে ছিলেন একজন সফল ও ছাত্রদরদী শিক্ষক। পরে তিনি সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক হয়েছিলেন। আসামে শিক্ষাবিস্তারে ও শিক্ষা-পরিকল্পনায় তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। শিলচর রাধামাধব কলেজের অধ্যক্ষপদে ব্রত হন। সমাজসেবী হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন সমিতির একজন সদস্যও ছিলেন তিনি।□



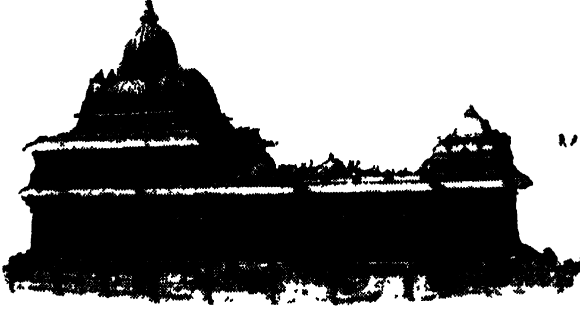
বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। ... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

সর্বজনীন উপাসনালয়





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

'উদ্বোধন'-এর বক্তব্য

বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ এই বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখছেন, টেলিফোন করছেন, কেউ কেউ আবার সাক্ষাতে যোগাযোগ করছেন। এসম্পর্কে আমরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক সাধারণকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে (উদ্বোধন কার্যালয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা কোন শাখা-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপনগুলি ভিন্ন) উদ্বোধন কার্যালয়ের বা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্ক নেই।—সম্পাদক, উদ্বোধন

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ ফাল্গুন ১৪০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ২য় সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□১০০০ টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়) : প্রথম কিস্তি কমপক্ষে
১০০ টাকা□বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য□ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ□৫৬ টাকা□
সডাক□৬৬ টাকা□আলাদাভাবে কিনলে□বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৮তম বর্ষ : মাঘ ১৪০২—পৌষ ১৪০৩/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৬

☐ **মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে বর্তমান বর্ষের (৯৮তম বর্ষ : ১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। অবিলম্বে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। গত বছর যাঁদের টাকা দেরিতে কার্যালয়ে এসেছে তাঁদের অনেকে পত্রিকা দেরিতে পেয়েছেন, আবার টাকা দেরিতে জমা পড়ায় অনেককে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।**

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : ৫৬ টাকা** ☐ **ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : ৬৬ টাকা**

☐ **বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩০০ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬০০ টাকা (বিমানডাক)** ☐ **বাংলাদেশ—১২০ টাকা**

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) : ১০০০ টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ১০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ৯০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৩০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার** যোগে টাকা পাঠালে **"Udbodhan Office, Calcutta"** এই নামে পাঠাবেন। **পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়।** পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও **বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়** ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ **কার্যালয় খোলা থাকে :** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' কলকাতার কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাবার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশে ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। **একমাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে** সংশ্লিষ্ট সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে।

☐ **গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।**

☐ **আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না।** সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, **সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না।** কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে **সংখ্যাটির অতিরিক্ত কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।**

☐ **যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের **পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে** বিতরণ **শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়।** তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের **সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।**

দিব্য বাণী

মানুষগুলি দেখতে সব একরকম, কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারু ভিতর সত্ত্বগুণ বেশি, কারু রজোগুণ বেশি, কারু তমোগুণ। পুলিগুলি দেখতে সব একরকম। কিন্তু কারু ভিতর ক্ষীরের পোর, কারু ভিতর নারিকেল ছাঁই, কারু ভিতর কলায়ের পোর। (সকলের হাস্য)।

আমার কি ভাব জান? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়!

লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জান! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে।—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো তো ছেড়ে দিলে! আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল; ছেড়ে দিলে! আরেক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো! এইরকম!

আবার মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে-কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সে-কথার অনুসারে কাজ করবে না। ও-দেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা লোকে বাহ্যে করে রাখত। যারা সকালবেলা আসে তারা খুব গালাগাল দেয়। আবার তারপর দিন সেইরূপ। বাহ্যে আর থামে না। (সকলের হাস্য)। তখন লোকে কোম্পানীকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিলে—'বাহ্যে করিও না' তখন সব বন্ধ হলো। (সকলের হাস্য)।

লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে লয়ে যাচ্ছে। (হাস্য)। হিতে বিপরীত। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি'—এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না—এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। 'আমি কর্তা', 'আমি কর্তা'—এই বোধ থেকেই যত দুঃখ, অশান্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ

"কথা অমৃতসমান"

হিন্দুশাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্মের স্থান দেওয়া হইয়াছে। 'শব্দব্রহ্ম' অথবা 'নাদব্রহ্ম' বলিতে সেই সর্বাতীত পরমেশ্বরকে বুঝানো হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শব্দব্রহ্ম বা নাদব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব। বাইবেলেও একথা রহিয়াছে। শব্দ বা নাদ প্রকাশিত হয় বাক্ বা কথা-রূপে। এক-একজনের কথার মধ্যে সেইজন্য এত শক্তি—এত প্রভাব। কৃষ্ণবাণী, বুদ্ধবাণী, খ্রীস্টবাণীর শক্তি যে কত তাহা আমরা নিত্যই প্রমাণ পাইতেছি। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি মানুষের অন্তরে ঐ বাণী ধ্বনি তুলিয়া চলিয়াছে। মাত্র শতাধিক বৎসর পূর্বে কথিত দক্ষিণেশ্বর পল্লীর নিভৃত কক্ষে, শ্যামপুকুরের এক অপরিসর গৃহে অথবা কাশীপুরের নির্জন উদ্যানবাটীতে দরিদ্র, প্রায়-নিরক্ষর এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রামকৃষ্ণের কিছু ঘরোয়া আলাপচারিতা আজ গোটা দুনিয়ার ভিত্তি কাঁপাইয়া দিতেছে। শতবর্ষ পূর্বে এক অজ্ঞাতপরিচয় সহায়-সম্বলহীন তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মাইক-বিহীন তিন মিনিটের ভাষণ পাশ্চাত্যের কয়েক সহস্র শিক্ষিত নরনারীকে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিল। ভাষণ তো পরের কথা, ভাষণের সূচনাতে পাঁচটি শব্দের সম্ভাষণ-বচনেই সহস্র সহস্র শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব বিদ্যুৎ-শিহরণ জাগাইয়া দিয়াছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে তিনি বলিয়াছিলেন: শব্দগুলি তাঁহার কণ্ঠ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল ঠিকই, কিন্তু শব্দগুলি তাঁহার ছিল না—ছিল তাঁহার আচার্য রামকৃষ্ণের।

বস্তুতঃ, তিন মিনিটের একটি ভাষণে বিশ্বজয়ের এবং পৃথিবীর চিন্তাস্রোতকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিবার এইরূপ অভাবনীয় ঘটনা পূর্বে আর কখনও ঘটে নাই। কিন্তু কিভাবে ইহা ঘটিল? উহার উৎস সন্ধান করিতে হইলে আমাদের যাইতে হইবে দক্ষিণেশ্বরে—শ্যামপুকুরে—কাশীপুরে। কী দেখি আমরা সেখানে? দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলিতেছেন। আর সেই কথামুখে ঝরনার মতো অফুরন্তভাবে অনর্গল উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে বেদ-বেদান্ত, গীতা-ভাগবত-চণ্ডী, তন্ত্র-পুরাণ-স্মৃতি, বাইবেল-কোরান-জেন্দাবেস্তা। শ্যামপুকুরে এবং প্রধানতঃ কাশীপুরে তাঁহার শরীর যখন গলরোগের নির্মম আক্রমণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, তখনও সেই কথা-নির্ঝর হইতে অমৃত ক্ষরিত হইয়া চলিয়াছে। সেই কথার এমনই মাদকতা—এমনই আকর্ষণ যে, যিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রধান চিকিৎসকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল—তিনি যেন কাহারও সহিত কথা না বলেন, কারণ তাহাতে রোগ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইবে, দেখা যাইত, সেই চিকিৎসকই তাঁহাকে বেশি কথা বলাইতেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, বক্তারও বিরাম নাই এবং মুগ্ধ চিকিৎসকেরও উঠিবার নামটি নাই! চিকিৎসক বলিতেন: অপর কাহারও সহিত কথা বলিবে না, শুধু আমার সহিত বলিবে! পৃথিবীর ইতিহাসে দরদী চিকিৎসকের এরূপ বি-সদৃশ আচরণের অপর কোন নজির সম্ভবতঃ আর নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে। কলকাতার লোকেরা ব্রাহ্ম পত্র-পত্রিকার সূত্রে তাঁহার কথা জানিতে পারিয়াছেন। শুরু হইয়াছে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কক্ষে কলকাতার বিশিষ্ট মানুষদের যাতায়াত। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উইলিয়াম হেস্টি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ। জগদ্বিখ্যাত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন নতজানু হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসিয়া নীরবে তাঁহার কথা শুনিতেন। তখন বক্তা শুধুই শ্রীরামকৃষ্ণ। আচার্য কেশবচন্দ্র তাঁহার শিক্ষিত এবং প্রতিপত্তিশালী সতীর্থগণ সমভিব্যাহারে সেই কথার মুগ্ধ শ্রোতা। কেশবচন্দ্রের প্রধান সহকারী বিখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন: "আমি একজন ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত মানুষ, একজন সভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, সংশয়ী, তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ—আর তিনি [শ্রীরামকৃষ্ণ] দরিদ্র, অশিক্ষিত, সঙ্কুচিত, অমার্জিত, রুগ্ন, অর্ধনগ্ন, অর্ধপৌত্তলিক, বন্ধুবান্ধবহীন এক হিন্দু পুরোহিত। কেন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনি—যে-আমি ডিস্রেলী, ফসেট, স্ট্যানলী, ম্যাক্সমূলার এবং আরও কত ইউরোপীয় বিদ্বজ্জন ও ধর্মবেত্তাদের বক্তৃতা শুনিয়াছি; যে-আমি স্বয়ং একজন কট্টর খ্রীস্টভক্ত ও একান্তভাবে খ্রীস্টমতের অনুরাগী এবং উদারমনা খ্রীস্টীয় ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারকদের একজন বন্ধু ও তাঁহাদের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; যে-আমি যুক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মসমাজের একজন একনিষ্ঠ অনুগামী ও কর্মী—কেন আমি তাঁহার কথা সম্মোহিতের মতো স্তব্ধ হইয়া শুনি! আর, শুধু তো আমিই নহি, আমার মতো আরও বহু মানুষকেও তো দেখিয়াছি তাহাই করিতে!...

"তাঁহার কথা তাঁহার অন্তর্জ্যোতির উৎস হইতে

অনর্গলভাবে উচ্ছলিত হইয়া বাহির হইয়া আসে।... তিনি কোন গ্রন্থ লেখেন নাই, কাহারও সহিত তিনি কদাচিৎ বিচারে প্রবৃত্ত হন।... তিনি শুধু নিরন্তর তাঁহার আত্মাকেই উন্মোচিত করিয়া চলেন তাঁহার উদ্দীপ্ত আবেগতপ্ত সঙ্গীতময় আধ্যাত্মিক বাণীতে।"

যাঁহারা তাঁহার কাছে গিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে তাঁহার কথার যাদুতে সম্মোহিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। তাঁহারা দেখিতেন—কথার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অপূর্ব কথার অনিবার্য শক্তিতে তাঁহার চারিদিকে এক জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, আর তিনি যেন সেই আলোকিত পরিবেশের মধ্যে স্বয়ং আনন্দে ভাসিতেছেন এবং উপস্থিত সকলের মনকেও সেখানে ভাসমান রাখিয়াছেন। পরম গভীর তত্ত্ব ও কথাসমূহ এক অনির্বচনীয় রমণীয় অনুভূতির রসে জারিত হইয়া অসাধারণ সহজ ও সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গিতে সকলের মর্মমূলে গাঁথিয়া যাইতেছে।

লাহোরের বিখ্যাত 'ট্রিবিউন' এবং এলাহাবাদের বিখ্যাত 'লীডার' পত্রিকার একসময়ের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাশ্রবণের স্মৃতিচারণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন : "কথোপকথন বলিতে যা বোঝায়, এটি তাহা ছিল না। প্রায় আট ঘণ্টা ধরিয়া শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত একটি কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়াছিল, সে-কণ্ঠ রামকৃষ্ণের। মাঝেমধ্যে অল্প তোতলামি, তাহা কিন্তু বাক্যপ্রবাহে বাধাসৃষ্টি করে নাই। কথাবার্তার মধ্যে 'তুমি' ও 'আপনি' মিশিয়া যাইতেছিল, ভাষায় পরিমার্জনার অভাব থাকিলে যেমন হয়। কিন্তু কে কবে কাহাকে এমন করিয়া কথা বলিতে শুনিয়াছে? প্রজ্ঞা ও ঈশ্বরচৈতন্যের অফুরন্ত উৎস হইতে নির্গলিত হইতেছিল শব্দধারা। পরবর্তী কালেই কেবল আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম—কী সুমহান সৌভাগ্য ও মহাপুণ্যের সেই দিনটি আমার ছিল!... রামকৃষ্ণ, সর্বোচ্চ আকারে প্রকাশিত তখন।... তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেসকল অমূল্য শব্দরাজি নির্গত হইতেছে, তাহার কোনটি যাহাতে কান এড়াইয়া না যায় সেজন্য সকলে মাথা ঝুঁকাইয়া, ঘাড় বাড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া আছে। আমাদের হৃদয়তন্ত্রী একেবারে টানটান। দারুণ আবেগে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছি ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত, প্রত্যক্ষ বর্ণরঞ্জিত, ঐশ্বর্যময়, উপমা ও কথাগল্পের মালা।... আমরা শুধু চাহিয়া আছি আমাদের সামনের নিবিড় ভাবাঙ্কিত তৃপঃশুদ্ধ মুখটির দিকে। কেবল শুনিতেছি শব্দের স্রোতধ্বনি, একটি ভাব হইতে আরেকটি ভাবকে স্পর্শ করিয়া শব্দগুলি আগাইয়া যাইতেছে আর ঈশ্বরবোধকে করিয়া তুলিতেছে সজীব স্পন্দমান জাগ্রত সত্য।"

বস্তুতঃ, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহার সেই অপূর্ব কথার সম্ভারকে যিনি বৃহদংশে পৃথিবীর মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন সেই "ভুরিদা" শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে আমাদের ঋণের শেষ নাই। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে দুই হাতে উন্মোচিত করিতে করিতে শিশুর আনন্দে পরমপুরুষ সকরুণ আর্তিতে পদচারণা করিয়াছেন, আর তাঁহার নির্দিষ্ট নির্বাচিত ভাণ্ডারী শ্রীম তাহাকে পরম যত্নে ধরিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার মনের মণিকোঠায় এবং অবশেষে জগৎকে উপহার দিয়াছেন অমৃতনির্ঝর 'কথামৃত'। পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে এবং জীবনীসাহিত্যে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' সত্যই একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, 'কথামৃত' পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধর্মসাহিত্য এবং সর্বোত্তম জীবনীসাহিত্য।

কী পাই আমরা 'কথামৃত'-এ? উত্তর দেওয়া যায় আরেকটি প্রশ্নেরই আকারে—'কথামৃত'-এ আমরা কী পাই না? প্রশ্নের আকারে হইলেও এটি কিন্তু প্রশ্ন নহে—এটিই উত্তর এবং সর্বসার্থক ও সর্বশেষ উত্তর। 'কথামৃত'-এ আমরা সব পাই। আমরা পাই জীবনকে, আমরা পাই জীবনাতীতকে। আমরা পাই লৌকিককে, আমরা পাই লোকোত্তরকে। আমরা পাই সমকালকে। আমরা পাই অতীতকে। আমরা পাই ভবিষ্যৎকে। আমরা পাই অতি সাম্প্রতিক বর্তমানকে। এই মুহূর্তকে। 'কথামৃত'-এ আমরা পাই ইতিহাসকে, পুরাণকে, ভূগোলকে, বিজ্ঞানকে। আমরা পাই বেদকে, বাইবেলকে, ত্রিপিটককে, কোরানকে, জেন্দাবেস্তাকে, গ্রন্থসাহেবকে।

আমরা পাই হিন্দুধর্মকে, বৌদ্ধধর্মকে, খ্রীস্টধর্মকে, ইসলামধর্মকে—সব ধর্মকে। আমরা পাই 'ধর্ম'কে। আমরা পাই সংসারকে, পাই স্বর্গকে। আমরা পাই মানুষকে। আমরা পাই দেবতাকে। আমরা পাই মানব-ঈশ্বরকে। আমরা পাই নরকে—পাই নরোত্তমকে। আমরা পাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে, লৌকিক এবং লোকোত্তর—দুই মেরুকে দুই হাতে স্পর্শ করিয়া যিনি দুইয়ের সন্ধিপুরুষ হইয়া মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

'কথামৃত'-এর সূচনায়—যখন 'কথামৃত'-এর জন্ম হইতেছে—দেখিতেছি, শ্রীম প্রথম দেখিতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাঁহার মনে হইল, স্বয়ং ঈশ্বর যেন আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন : "তোমার জীবনে অসীমের

লীলাপথে নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।" আমরা ক্রমে দেখিব, 'কথামৃত'-এর আদি, মধ্য ও অন্ত জুড়িয়া একটি ধ্বনি—সমাগম—সমন্বয়। 'কথামৃত' যেন একই সঙ্গে গঙ্গা এবং গঙ্গাসাগর।

সময়টি কখন? শ্রীম বলিতেছেন : "সন্ধ্যা হয় হয়"। দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, রাত্রি নামিতেছে প্রকৃতিতে। সন্ধ্যা মানে তাহাই। সন্ধিক্ষণ। দিন ও রাত্রির সন্ধিমুহূর্ত। প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সময়টি ছিল সন্ধিক্ষণ ঠিকই, আবার মহাপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেও সময়টি ছিল সন্ধিক্ষণ। একজন মানুষকে দেখিতেছেন শ্রীম, কিন্তু দর্শনমাত্র মনে হইল—এ কাহাকে দেখিতেছেন তিনি? ইনি কি মানুষ, না দেবতা? শ্রীম-র উপলব্ধি : তিনি এক সন্ধিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতেছেন—মানুষ ও দেবতার সন্ধি। শ্রীম যেন উপনীত পুরাণ ও ইতিহাসের সন্ধিতে। যে-শ্রীরামকৃষ্ণ বলিবেন : যে রাম, যে কৃষ্ণ—ইদানীং তিনিই এই শরীরে রামকৃষ্ণ। অর্থাৎ তিনি পুরাণপুরুষ। তিনি ঈশ্বরের অবতার। আবার এই শ্রীম-ই শুনিবেন সমকালীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞানজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র মহেন্দ্রলালের মুখে : রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার—এসব ভক্তদের ভাবালুতার কথা। উহাতে আমি বিশ্বাস করি না। ভগবান মানুষ হন—এসব বিজ্ঞানসম্মত কথা নহে। তবে মানুষ রামকৃষ্ণের প্রতি আমার সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা—"As man I have the greatest regard for him." নরোত্তমকে—পুরুষোত্তমকেই তো পুরাণ বলিয়াছেন ভগবান—অবতার। তাহা হইলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের কৃষ্টিকেন্দ্র এবং সমকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতার বুকে সমকালের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধকের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় নরোত্তম—পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকৃত। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন এক সন্ধিস্থলে। সেই সন্ধি পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের। কল্পনা ও বাস্তবের।

আরও একটি সন্ধিতে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার পরিচয় রহিয়াছে 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন যুগ ও যুগান্তরের সন্ধিতে। একই সঙ্গে তিনি যুগের এবং যুগান্তরের সন্ধিপুরুষ।

এই প্রথম একজন অবতারপুরুষের বা আবির্ভূত ভগবানের সংলাপ, তাঁহার মুখের কথা যেমনটি তিনি বলিয়াছেন, যখন তিনি বলিয়াছেন, যাহাকে যাহা বলিয়াছেন—সব লিপিবদ্ধ হইয়া রহিল। "Almost stenographic"—রোমাঁ রোলাঁ বলিলেন। মনে হয় যেন চোখের সম্মুখে সব ঘটিতেছে। তিনি কথা বলিতেছেন, তিনি হাঁটিতেছেন, তিনি হাসিতেছেন, তিনি হাসাইতেছেন। রঙ্গরসে, ভাবে, ভাবনায় অতি সাধারণ, আবার অতি অসাধারণ এক মানুষ। যেন "Photographic details"—অল্ডাস হাক্সলী বলিলেন। সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা বলিয়াছেন। শ্রীম নিজেও সেই কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং অবতারপুরুষগণের বাণী ও জীবনীসাহিত্যে 'কথামৃত' এক অনন্য স্থানের অধিকারী।

'কথামৃত'-এর সর্বাংশে রহিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আরেকজনও রহিয়াছেন 'কথামৃত'-এর সর্বত্র। তবে কখনও কখনও নেপথ্যে, কখনও ছদ্মনামের আড়ালে, কখনও প্রকাশ্যে। তিনি শ্রীম।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। নিজেকে তিনি 'মূর্খ'—এমনকি 'মূর্খোত্তম'ও বলিয়াছেন। কিন্তু 'কথামৃত' সেই অসাধারণ অভ্রান্ত দলিল, যাহাতে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের অপরিমেয় জ্ঞানের ঐশ্বর্য। সে-জ্ঞান অনুভূতিলব্ধ—যে-জ্ঞান বেদের ঋষিরা লাভ করিয়াছিলেন—যে-জ্ঞানের ভাণ্ডার বেদ চতুষ্টয়। ভারতের চিরন্তন সাধনা সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের সেই চিরন্তন সাধন-ঐতিহ্যের প্রমাণ-পুরুষ। এবং পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনে সুপণ্ডিত শ্রীম-র নিকট ভারতের সেই সার্থক অক্ষর-পুরুষকে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন 'কথামৃত'-এর জন্মলগ্নে এক নিরক্ষর গ্রাম্য পারিচারিকা—বৃন্দে। এ যেন তথা-কথিত সাড়ম্বর শিক্ষাব্যবস্থার কাছে যথার্থ ও নিরাভরণ শিক্ষার জবাব।—"আর বাবা, বই-টই! সব ওঁর মুখে!"

'কথামৃত' সর্বশাস্ত্রসার। নজরুল বলিয়াছেন : "তব কথামৃত কলির নব বেদ/একাধারে ভাগবত ও গীতা।" শুধু বেদ, ভাগবত ও গীতাই নহে, 'কথামৃত' নবযুগের নূতন ত্রিপিটক, নূতন বাইবেল, নূতন কোরান।

'কথামৃত' অমর। 'কথামৃত' অক্ষয়। 'কথামৃত' সনাতন ভারতের প্রাণপ্রবাহিনী পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর মতো নিত্য অমৃতপ্রবাহিনী। অমৃতনির্ঝর। গঙ্গা যেমন চিরন্তন, তেমনি গঙ্গাতীরের দক্ষিণেশ্বরের যুগাবতারের 'কথামৃত'ও চিরন্তন। কাল যতদিন থাকিবে, ততদিন থাকিবে তপ্তজীবন-শীতলকারী, কল্মষাপহ, শ্রবণমঙ্গল 'কথামৃত'। আর কাল যখন থাকিবে না, তখনো মহাকালের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে থাকিবে 'কথামৃত'। থাকিবেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এবং অবশ্যই সেই সঙ্গে থাকিবেন 'কথামৃত'-এর ধারক ও বাহক শ্রীমও।□

ভাষণ

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ভূতেশানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে।"

কথাটি বিশেষ করে ভাববার মতো। কাকে 'সত্যযুগ' বলে? বিভিন্ন যুগের তাৎপর্য কি? কেন স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগের আগমন বললেন?—এটা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। একটি বিশেষ চিন্তার ধারা যখন প্রধানভাবে মানুষের ভিতর চলতে থাকে তখন তাকে একটা 'যুগ' বলে। সেই ধারার যখন পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে 'যুগ-পরিবর্তন' বলে। এরকম করে একটির পর একটি যুগ জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, সত্যযুগের ধর্ম 'চতুষ্পাদ' অর্থাৎ পরিপূর্ণ। ত্রেতাযুগে ধর্ম ত্রিপাদ; অর্থাৎ ধর্ম একপাদ বা এক-চতুর্থাংশ কমে যায়। দ্বাপরে ধর্ম দ্বিপাদ বা অর্ধেক কমে যায়, আর কলিযুগে তা একপাদ, অর্থাৎ ধর্ম খুব স্তিমিত হয়ে যায়।

আবার আরেকভাবে যুগবিভাগের ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, সত্যযুগ জ্ঞানপ্রধান। সত্যযুগে মানুষের মন সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করতে বেশি সমর্থ। ত্রেতাযুগ কর্মপ্রধান। 'কর্ম' বলতে যাগযজ্ঞাদি কর্মকে বোঝায়। ক্রমে মানুষের যাগযজ্ঞাদি কর্ম করার সামর্থ্য এবং মনের ওপর তার প্রভাবও কমে আসে। তারপর আসে দ্বাপরযুগ। দ্বাপরযুগ তপশ্চর্যা-প্রধান। ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যার দ্বারা সাধকেরা এ যুগে আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করতে চেষ্টা করে থাকেন। কলিযুগে মানুষের জ্ঞানপথের অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তার মন উচ্চ সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। মানুষের বৈরাগ্য অত তীব্র থাকে না। ত্রেতাযুগের মতো বহু ব্যয় এবং বহু শ্রমসাধ্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম করবার সামর্থ্যও কলিতে নেই। দ্বাপরের মতো ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যাও মানুষ করতে পারে না। এইজন্য কলিযুগ হলো ভক্তিপ্রধান। দুর্বল অসমর্থ হয়েও মানুষ নামের সাহায্যে, ভক্তির সাহায্যে পরম তত্ত্বকে লাভ করতে পারে।

ভাগবতে (১১।৫।৩৮) বলা আছে ঃ "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্"—যারা সত্যযুগের মানুষ তারাও কলিযুগে এসে জন্মগ্রহণ করার ইচ্ছা করেন। কারণ, এ যুগে ভক্তি আশ্রয় করে অনায়াসে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায়। তীব্র বৈরাগ্য বা সূক্ষ্ম জ্ঞানের দরকার নেই। যাগযজ্ঞ করার মতো বৈভব, ঐশ্বর্যের দরকার নেই। কঠোর তপশ্চর্যা না করলেও চলে। ঠাকুরও বলেছেন ঃ "কলিতে নারদীয় ভক্তি।" 'নারদীয় ভক্তি'র অর্থ অহেতুকী নিষ্কাম ভক্তি, যাতে ভক্ত ভগবানের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল তাঁকে তার হৃদয়ের ভালবাসা দিয়েই চরিতার্থ বোধ করে। কলিতে নাম-মাহাত্ম্যের কথাও আছে ঃ

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

—কলিতে একমাত্র ভগবানের নামই সাধন। নাম ভিন্ন কলিযুগে আর অন্য গতি নেই।

ভগবানের নাম করাই কলিযুগের একমাত্র তপস্যা। ঠাকুর আরও একটি কথা বলেছেন ঃ "কলিতে সত্যকথাই তপস্যা।" সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে অন্য তপস্যা না করলেও চলে।

তাহলে কলিযুগ সম্বন্ধে দুটি কথা পাওয়া গেল ঃ (১) ভগবানের নামগুণগান এবং (২) সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। এ হলো আরেক দিক দিয়ে কলিযুগের ব্যাখ্যা। এখন স্বামীজী যে বললেন, ঠাকুরের আগমন থেকে সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে—কথাটি একটু বিচার করে দেখতে হবে। আমরা 'সত্যযুগ' বলতে এখানে এই বুঝব যে, যে-যুগে মানুষের ভিতরে ধর্মভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। সেই সত্যযুগের আরম্ভ হয়েছে ঠাকুরের আগমন থেকে। যুগপরিবর্তন অকস্মাৎ হয় না। একটি যুগ থেকে অন্য যুগের সংক্রমণ—সেটি ক্রমিক বিবর্তন। শাস্ত্রমতে ধর্ম যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন কলিকাল। ধর্মকে ধরে মানুষ বেঁচে থাকে, সেই ধর্ম থেকে মানুষ যখন ভ্রষ্ট হয় তখন তার রক্ষার কোন উপায় থাকে না। নিরুপায় হয়ে মানুষ ভগবানের কাছে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। ভগবানের আবির্ভাবের যেন সেই যোগ্য সময়। যেমন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম প্রবল হয় তখন আমি অবতীর্ণ হই।"

ভগবান আসেন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। ঠাকুরের আগমনের প্রাক্কালে দেখা যায়, ঘোর কলি আমাদের হতাশামগ্ন করেছে, মানুষ সনাতন ধর্মে আস্থা হারিয়েছে; কিন্তু নতুন একটা কিছু যে অবলম্বন করতে পেরেছে তা নয়। নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত অবস্থায় মানুষ যেন দিশাহারা। এমনি সময়ে যে ভগবান

অবতীর্ণ হবেন সেটা ভগবানেরই প্রতিশ্রুতি। তাই স্বামীজী বলেছেন, ঐ অবস্থা যেন কলিযুগের চূড়ান্ত অবস্থা এবং সত্যযুগের উন্মেষপর্ব।

কেন তিনি সত্যযুগের উন্মেষ বা আরম্ভ বলছেন? কারণ, ধর্ম বিষয়ে মানুষের যে-বিভ্রান্তি ছিল, ঠাকুর এসে সেই বিভ্রান্তি দূর করে তাকে দিগ্‌দর্শন করালেন, তার মৃতপ্রায় দেহে যেন প্রাণসঞ্চার করলেন। মানুষ আবার নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেল। ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে এই পরিবর্তন কিভাবে ঘটছে, যাঁরা চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁরা ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন। ঠাকুর যখন এসেছিলেন ঠিক সেই সময়ে কয়জনই বা তাঁকে চিনেছিলেন? গীতায় ভগবান বলেছেন:

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" (৯।১১)

—মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা আমাকে দেহধারী মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে। আমার যে পরম তত্ত্ব তা তারা জানে না।

কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। যেখানে যেখানে অবতারগণ অবতীর্ণ হয়েছেন অথবা লীলা করেছেন, প্রায়ই দেখা যায় সেগুলি অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত স্থান। অবশ্য বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ রাজার ঘরে জন্মেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রকে রাজসিংহাসন ছেড়ে বনবাসে যেতে হলো। কৃষ্ণকে কত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কারারুদ্ধ মাতামহ, পিতা ও মাতাকে উদ্ধার করতে হয়েছে এবং মাতামহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে হয়েছে! বুদ্ধ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেও জীবনের বিভিন্ন অবস্থা বিচার করে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সব ত্যাগ করে চলে গেলেন সত্যের সন্ধানে। অবতারদের সকলের জীবনেই একটা বিপুল পরিবর্তন আসে, যে-পরিবর্তন সমগ্র জগতের পরিবর্তনকে সূচিত করে। এজন্য তাঁকে আমরা 'যুগপ্রবর্তক' বলি। ভগবান এসে তাঁর জন্ম এবং কার্যের দ্বারা মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রেরণা সঞ্চার করেন, যার ফলে জগতের পরিবর্তন আরম্ভ হয় এবং সেই পরিবর্তনের ধারা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে।

ঠাকুর বলেছেন: "আমি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানি না।" তিনি এসেছেন সকলকে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে। অন্য কিছু জানবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। কোন লৌকিক বিদ্যা তিনি শিখলেন না। যাকে আমরা 'সাধারণ শিক্ষা' বলি, তাকে তিনি "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা" বলে পরিহার করলেন। শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তিকে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারের কারণ বলে তাও পরিত্যাগ করলেন। কাজেই সেদিক দিয়ে তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য কিছু নেই, অন্য ঐশ্বর্যও নেই।

ধনীর ঘরে জন্মাননি; অপূর্ব শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন বলে জানা যায়, কিন্তু তাও তিনি জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করে ধীরে ধীরে গোপন করলেন। আমাদের খুব নিকট হওয়ার জন্য তিনি এগুলি করলেন। ভগবান সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ, কিন্তু তিনি আমাদের নাগালের বহু দূরে, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কাজেই তাঁকে আমরা ধরতে পারি না, চিনতে পারি না। ভাগবতে একটি সুন্দর উপমা আছে। চাঁদ জলের ওপরে প্রতিবিম্বিত হয়, মাছগুলি সেই প্রতিবিম্বিত চাঁদকে দেখে তার সঙ্গে খেলা করে। ভাবে, চাঁদ আমাদেরই খেলার সঙ্গী। ঠিক ভগবান আবির্ভূত হলে মানুষ তাঁকে তাদেরই মতো মনে করে, তার সঙ্গে সাধারণভাবে ব্যবহার করে। এমনকি তাকে উপহাস, অবজ্ঞাও করে। যেমন গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন: আমি তোমাকে সাধারণ মানুষের মতো ভেবে অবজ্ঞা করেছি, আমায় তুমি ক্ষমা কর। একথা তিনি কখন বলছেন? যখন ভগবান বিশ্বরূপ দেখিয়ে অর্জুনকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছেন। অর্জুন তখন আর কৃষ্ণের সখা নন—তাঁর ভক্ত, তাঁর আশ্রিত, শরণাগত। আমরা যখন ভগবানকে এইভাবে কাছে পাই তখন তাঁকে ভগবান বলে সহজে বুঝতে পারি না; কেবল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানেরা বুঝতে পারেন। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন—রামচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন বার জন ঋষি তাঁকে অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন। পুরাণাদিতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। ঠিক সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়েও যাঁরা তাঁর কাছে সর্বদা থেকেছেন তাঁরাও তাঁর স্বরূপকে বুঝতে পারেননি, বুঝতে চেষ্টাও করেননি। ঠাকুরেরই কথা—লণ্ঠনের নিচে অন্ধকার। যে-আলো বিশ্বকে আলোকিত করবে সেই আলোকের পাশে যারা, তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

এই সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রথমবার যখন কামারপুকুর গিয়েছি তখন গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করছি—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ি কোথায়? দেখলাম, তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। তখন খেয়াল হলো যে, 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' বললে ওরা বুঝবে না। বললাম—রামলাল চাটুজ্যের বাড়ি কোথায়? তখন দেখিয়ে দিল। সেখানে লোকে

রামলাল চাটুজ্যেকে চেনে, শ্রীরামকৃষ্ণকে চেনে না। সর্বত্রই এই হয়। যে-কংসের কারাগারে ভগবান জন্ম নিলেন সেই কংস কি তাঁকে ভগবানের অবতার বলে বুঝেছিল, না তার আশপাশের লোকেরা বুঝেছিল? দেবকী ও বসুদেবকে তিনি চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিলেন। তাঁরা দেখে বললেন: প্রভু, তোমার এই রূপ সংবরণ কর। এখনি কংসের চরেরা এসে দেখে ফেলবে আর কংস তোমাকে বিনাশ করবে। এই কথা তাঁদের মনে হলো না যে, যিনি ভগবান তাঁকে কংসের বিনাশ করার সাধ্য কি? তাঁরা তখন অপত্য-স্নেহে মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের ঐশ্বর্যকে বুঝতে পারলেন না। তাঁরা ভগবানকে ভগবানরূপে দেখলেন না, সন্তানরূপে দেখলেন। যেমন, একজন প্রতিপত্তিশালী জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা-মা তাঁদের সন্তানকে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটরূপে দেখেন না। তাঁরা তাঁদের খোকাকে খোকারূপেই দেখেন। বাপ-মায়ের কাছে সন্তানের নাবালকত্ব কখনো ঘোচে না। ঠিক সেইরকম ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সবচেয়ে কাছে যাঁরা থাকেন তাঁরাও তাঁর পরিচয় বিশেষ পান না।

একবার উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে একজন নবাগত ভক্ত এসে বললেন: "সাধুসঙ্গ করতে এসেছি।" সারদানন্দ মহারাজ বললেন: "তুমি তো বাপু সাধুসঙ্গ করতে এসেছ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বাস করতেন; দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের চাকর, বামুন বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতিবেশি মানুষেরা বছরের পর বছর ঠাকুরকে নিত্য দেখেছেন। তাঁদের কারও জীবনে কি তার কোন প্রভাব দেখা গিয়েছে?" কাজেই অবতারের কাছাকাছি থাকলেই যে তাঁর প্রভাব অনুভূত হবে তা নয়। যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁদের ভিতর তাঁর প্রভাব কি করে প্রসারিত হচ্ছে তা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। অবতারদের লীলা এইরকমই হয়। যুগের পরিবর্তন যখন তিনি করেন তখন সেই যুগের প্রভাব কেবল আশপাশের লোকদের ভিতরই আবদ্ধ থাকে না, সমস্ত জগৎজুড়ে সেই প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। কি করে হয়, কোন্ সূত্র দিয়ে হয়, তা আমরা জানি না। তাঁদের কার্যধারা বুঝবার সাধ্য আমাদের কোথায়? কাজেই আমরা যেটুকু পারি সেইটুকুই ধারণা করার চেষ্টা করি। স্বামীজীর উক্তি সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝতে না পারলেও এটা দেখছি—শ্রীরামকৃষ্ণ আজ মাত্র দু-এক জনের কৌতূহলের বিষয় বা দু-চার জন ভক্তের কাছে ঈশ্বর-অবতার বলে পূজ্য নন; আজ শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল দক্ষিণেশ্বরের বা বাংলা বা ভারতের ঠাকুর নন। তিনি এখন সমগ্র বিশ্বের ভগবান। চিন্তাশীল মানুষ তাঁকে নিয়ে চিন্তা করছেন, কত লোক তাঁদের জীবনে তাঁর ভাবধারায় নিষ্ণাত হয়ে ধন্য হচ্ছেন। দিন দিন এইভাবে তাঁর প্রভাব প্রসারিত হচ্ছে। এই ব্যাপারটা শুধু আমাদের আশপাশের দিকে চেয়ে থাকলে বুঝতে পারব না। ধর্মজগৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে ওঠে এবং তার প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তা ধরতে পারব না। সত্যযুগের সঙ্গে আমাদের বর্তমান যুগের পরিস্থিতির তুলনা করলে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সত্যযুগের সব মানুষই যে ধর্মভাবে ভাবিত ছিল তা মনে হয় না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভিতরে ক্বচিৎ কেউ ভগবানকে জানতে চেষ্টা করেন, তাদের ভিতরে দৈবাৎ কেউ জানতে পারেন। গীতায় ভগবান বলেছেন:

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" (৭।৩)

—সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেউ ধর্মভাবের বিকাশের জন্য চেষ্টা করে। আবার যারা চেষ্টা করে তাদের মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে জানতে পারে।

সকলেই ভগবানের ভাবে মগ্ন হয়ে থাকবে—এ কোন যুগে হয় না। সত্যযুগেও হয়নি এবং কোন যুগেও হওয়ার নয়। আমরা এটুকু জানি, জীবনে ভগবানের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারে, তাঁর ভাব নিয়ে জীবনকে উন্নত করতে পারে—এরকম লোকের সংখ্যা সর্বদাই সীমিত। কিন্তু সীমিত কয়েকজন ব্যক্তিই জগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁরা যদি না থাকতেন তাহলে জগতের কোন সত্তা থাকত না। তাঁদের সাধনা ও উপলব্ধি এখনো জগৎকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে এবং যত সঙ্কটের ভিতর দিয়েই জগৎ চলুক—তাঁদের উপলব্ধিকে চিন্তা করলে, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করলে জগতের কোন ভয় নেই। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" (৯।৩১)—হে অর্জুন, তুমি জগতের সামনে ঘোষণা করে বল যে, আমার ভক্তের বিনাশ নেই। সুতরাং আমরা জানি বা না জানি, এরূপ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি তাঁদের অধ্যাত্মশক্তির প্রভাবে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং চিরকাল রাখবেন।

অনেক সময় বাহ্যজগতের প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে চিন্তাশীল মানুষের ভিতরেও হতাশার ভাব আসে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর পশ্চাতে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে আধ্যাত্মিক স্রোতের ধারা অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত, তাকে

বুঝার মতো সূক্ষ্মদৃষ্টি মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষেরই থাকে। কাজেই জগতের যত দুর্নীতি, দুর্দশাই দেখি না কেন, আমাদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, ঠাকুরের ভাবকে যে বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখছি—এর কি কোন সার্থকতা নেই! এত লোক যে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন—সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ—এর কি কোন তাৎপর্য নেই! আমরা সবটুকু বুঝতে না পারলেও খানিকটা ধারণা করতে তো পারি যে, নিশ্চয়ই এর সার্থকতা আছে। এই যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছেন, তাঁরা সকলেই কি নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আসছেন? হয়তো অনেকেই তাই। কিন্তু কিছু মানুষের আন্তরিক ধর্মপিপাসা আছে। তাঁরা সেই পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্য আসছেন। বস্তুতঃ, এঁরাই ধর্মকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখেন।

আশা করি এই ভাব দিন দিন প্রসারিত হবে, যা দেখে পরে ঐতিহাসিকরা এই প্রভাবের মূল্যায়ন করবেন। অবতার যখন আসেন তাঁকে তখনই বিচার করে সবাই অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, পারবেও না। শ্রীরামকৃষ্ণকে দু-চারজন যখন অবতার বলতে আরম্ভ করেছেন, তিনি তখন বিরক্ত হয়েছেন। বলেছেন: "কেউ ডাক্তার, কেউ অভিনেতা—তারা বলে অবতার। এরা অবতারের বোঝে কি? কত বড় বড় পণ্ডিত অবতার বলে গেছেন! 'অবতার' কথায় ঘেন্না ধরে গেছে।"

তাঁর অবতারত্বের প্রসঙ্গে রুচি ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন যে, যারা অবতার বলছে তারা অবতারের কিছুই বোঝে না। একবার একটি ছেলে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে একটি ছবি নিয়ে এসে বলছে: "বলুন তো ইনি অবতার কিনা।" স্বামীজী হেসে বললেন: "বাবা, না খেয়ে তোমার মাথাটা শুকিয়ে গেছে, তুমি একটু ভাল করে খাওয়াদাওয়া কর। অবতারকে মুনি-ঋষিরাও বোঝেন না, আমরা ছবি দেখে তাঁকে বুঝব অবতার!" অবতারকে এইভাবে বোঝা যায় না। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে তাঁর সমগ্র জীবনকে বিচার করে তারপর অবতারকে অবতার বলে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং তিনি নিজেকে প্রকাশ না করলে মানুষের সাধ্য নেই তাঁকে প্রকাশ করে। কারণ, একমাত্র তিনিই শুধু তাঁকে জানেন! গীতায় অর্জুন বলেছিলেন: "স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।" (১০।১৫)—হে ভগবান, আপনি আপনার নিজের জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানেন, আপনার স্বরূপ আর কেউ জানে না। সত্যিই তো তাঁকে আর কে জানবে! সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আধার তাঁকে ধারণা করবে—এ কল্পনা একেবারে অবাস্তব।

আমরা যখন 'অবতার' বলি তখন তা কথার কথা মাত্র। ঠাকুর বলছেন, ছোট ছেলেমেয়েরা ঝগড়ার সময় বলে 'ঈশ্বরের দিব্যি'। তারা ঈশ্বরের কি বোঝে? অথচ বড়দের কাছে শুনেছে, তাই শোনা কথা না বুঝে আওড়ে যাচ্ছে। আমরা যখন অবতারের কথা বলি তখনো ঐরকম। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমরা যদি অবতারকে ধারণা করতে যাই, তাহলে অবতার আমাদের কাছে ঐ ছোটদের ঈশ্বরের ধারণার মতো কথার কথা হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আমরা বুঝতে পারব না। সে-চেষ্টাই বাতুলতা। তবে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি বা না পারি—যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর জীবন আলোচনা করি, তাঁর কথা ভাবি তাহলে ভেবে ভেবে আমাদের অন্তর শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে। তখন সেখানে তাঁর 'আসন' প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই আসনে তাঁর অধিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা ধীরে ধীরে অবহিত হতে পারব এবং তার দ্বারা আমাদের জীবন কৃতার্থ হবে। এই অবহিত হওয়া দুদিনের ব্যাপার নয়। আজ যে ঠাকুরকে আমরা অবতার বলছি তা তাঁর আবির্ভাবের কত বছর পরে! এই বলা এবং আলোচনা হাজার হাজার বছর ধরে চলবে। কত দীর্ঘকাল চলবে তা বছরের সংখ্যা দিয়ে বিচার করে বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। মানুষের ধারণাশক্তি বাড়তে বাড়তে যতদিন না তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারবে ততদিন চলবে। তারপর? তার পরের কথা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা যে-যুগে জন্মেছি তা কতদিন চলবে তা জানি না; কিন্তু আমাদের বিশেষ করে সচেতন হতে হবে যে, একটা অসাধারণ যুগে আমরা জন্মেছি। এর সুযোগ আমরা কতটুকু নিচ্ছি তা আমাদের অন্তরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শুধু মুখে 'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ' বললে এযুগে জন্মানোর সার্থকতা পুরোপুরি হবে না। আমাদের দেখতে হবে, সেই ভাব আমরা আমাদের জীবনচর্যায় কতটা গ্রহণ করেছি।

ঠাকুর বলেছেন: "এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।" 'এখানে' মানে কি কামারপুকুরে, দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে? 'এখানে' মানে কি ঠাকুরের স্থূলদেহের কাছে? ঠাকুর সত্যস্বরূপ। তাঁর কথা মিথ্যা হবে না। তাঁর কাছে যাঁরা আসবেন তাঁদের অবশ্যই শেষজন্ম। কারা তাঁরা?—যাঁরা তাঁর ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করার জন্য আন্তরিকভাবে তাঁর শরণাগত হবে।

আমরা যদি সেই আদর্শকে আমাদের জীবনে যতদূর সম্ভব প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করি তাহলে তাঁর কৃপায় আমাদেরও শেষজন্ম। আমরা যে সকলেই এক-একজন রামকৃষ্ণ পরমহংস হব, তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অবহিত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের বলছেন ঃ "তোরা কি ভেবেছিস, তোরা সবাই এক-একটা রামকৃষ্ণ হবি! সে সাতমণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না।" অর্থাৎ সেটা অসম্ভব কল্পনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ দিক আমরা এবিষয়ে চিন্তা করতে পারি। প্রথম কথা হলো ঃ "ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।" তিনি তাঁর জীবন ও শিক্ষার ভিতর দিয়ে এই কথাটি আমাদের ভিতরে খুব দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের নানা লক্ষ্যের দিকে ছোটার জন্য বহু সময় ও শক্তি অপচয় হয়ে যায়। এই শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে আমরা ভগবানের দিকে নিজেদের প্রেরিত করতে পারি তাহলেই আমাদের জীবনে চরম সার্থকতা লাভ হবে। এটাই আমাদের তিনি বিশেষ করে বলছেন। ঈশ্বরলাভকে একমাত্র লক্ষ্য বলছেন। কারণ, অন্য লক্ষ্যগুলি এর তুলনায় নিতান্ত গৌণ। দ্বিতীয় কথা—"কেবল অন্তরের সঙ্গে চাইলেই ঈশ্বরলাভ হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে এই শিক্ষা আমাদের দিচ্ছেন। তিনি যখন সাধনা করেছিলেন তখন তিনি কারো দ্বারা পরিচালিত হয়ে তা করেননি। নিজেই নিজের অন্তরের প্রেরণায় যা মনে এসেছে করেছেন এবং দেখা গেল, তার দ্বারাই তাঁর ঈশ্বরের অনুভূতি পরিপূর্ণরূপে হয়েছিল। এটি জগতে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বলতে পারি। কারণ, কোন অবলম্বন ছাড়া বা কোন বিশেষ পথকে অনুসরণ না করেই কেবল অন্তরের আবেগে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুভূতি এই সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ভগবানকে লাভ করবার জন্য আমাদের যে-সাধন নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলি ছাড়াও আমরা কেবল অন্তরের প্রেরণাতেই, আন্তরিকভাবে তাঁকে চাওয়াতেই তাঁকে লাভ করতে পারি। এ একটি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কথা—"ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁকে লাভ করার পথও তেমনি অনন্ত।" "যত মত তত পথ।" নিজের সাধনার ফলে এটা উপলব্ধ সত্য বলে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রচার করেছেন। কেবল একটা বৌদ্ধিক দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত নয়। তিনি নিজে বিভিন্ন পথের সাধনায় সেই সেই পথের সমস্ত খুঁটিনাটির অনুসরণ করে সত্যের সন্ধান করেছেন। করে দেখেছেন, অন্তে সকল পথ একই সত্যে পৌঁছে দিচ্ছে। অনন্ত পথ এইজন্য যে, সাধকেরা অন্তরের প্রেরণায়, তাঁদের সংস্কারবশে ভগবানকে লাভ করার পথ নির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত করে গেছেন দেশে দেশে কালে কালে। তাঁদের সংখ্যা যেহেতু অসংখ্য, তাঁদের বুদ্ধির বিভিন্নতা অনুসারে সেই পথগুলিও বিভিন্ন—অনন্ত। চতুর্থতঃ, ভগবানের ভাবে মগ্ন হয়ে থাকা ভাল কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা সেই তত্ত্ব লাভ করার জন্য সকলকে সাহায্য করা। এই কথাটি বিশেষ করে ঠাকুরের জীবন থেকে আমরা শিখি। কারণ, স্বামীজীকে তিনি যখন প্রশ্ন করলেন ঃ "তুই কি চাস?" স্বামীজী বললেন ঃ "আমি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই, হয়তো কখনো কখনো সাধারণ ভূমিতে নামব, একটু খাব আবার গিয়ে সেই সমাধিতে মগ্ন হয়ে যাব।" ঠাকুর শুনে তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ "তুই যা বলছিস এতো খুব নীচু থাকের কথা। এর থেকেও বড় অবস্থা আছে।" সেই বড় অবস্থা হলো এই—সমাধিতে উপলব্ধ তত্ত্ব সকলকে দিতে হবে, নিজের সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফল সকলকে বিতরণ করতে হবে, সকলের দুঃখ দূর করবার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। পঞ্চমতঃ, অপরকে নিজের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা সাহায্য করতে হবে, কিন্তু কারো ভাব নষ্ট করে নয়। প্রত্যেককে তার নিজের ভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। স্বামীজী তাঁর অনুভূত শক্তিকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর এক গুরুভাইকে নিজের ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "কখনো এরকম করিসনি। কারো ভাব নষ্ট করিসনি।" স্বামীজী চিরকাল সেই শিক্ষা স্মরণ রেখেছিলেন। তাঁরও উপদেশের ভিতরে আমরা বারবার পাই যে, কারো ভাব নষ্ট করতে নেই। ষষ্ঠতঃ, তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক নারীই তাঁর চোখে জগন্মাতার মূর্তি। এটি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর শিক্ষায় সর্বত্র তা আমরা দেখতে পাই। ভাল-মন্দ, উঁচু-নীচু, এমনকি যিনি সমাজের ঘৃণিতা—পতিতা, সেরকম মেয়ের ভিতরেও শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নারীজাতি সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টির ফলস্বরূপ তিনি স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজ পত্নীকে জগন্মাতারূপে পূজা করেছিলেন। নিজ পত্নীকে জগন্মাতারূপে পূজা করা জগতে একটি অনন্য ঘটনা। এইরকম পূর্বে আর কেউ করেছেন কিনা আমরা জানি না। সপ্তমতঃ, নিজ জীবনে একাধারে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয়ের চরম আদর্শ দেখানো। তিনি একাধারে

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। যখন তিনি সন্ন্যাস নেবেন তখনো তিনি তাঁর মায়ের প্রতি কর্তব্য স্মরণ করছেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কিন্তু গোপনে করলেন। কারণ, মায়ের মনে যেন আঘাত না লাগে। আরও একটি দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে পাই। বৃন্দাবনে তিনি সাধিকা গঙ্গামায়ীর কাছে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। গঙ্গামায়ী তাঁর ভিতরে শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল যে, নহবতে মা আছেন। তাঁর কি হবে? সিদ্ধান্ত নিলেন, বৃন্দাবনে থাকা হবে না। সন্ন্যাসী হয়েও, সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে মগ্ন থেকেও গর্ভধারিণীর প্রতি কর্তব্যকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। তেমনি পত্নীর প্রতি কর্তব্যও তিনি কখনো ভোলেননি। যখন শ্রীশ্রীমা তাঁর কাছে এসেছেন, তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে তাঁর প্রতি স্বামীর সস্নেহ কর্তব্য পালন করেছেন। অথচ সমস্ত কর্তব্য পালন করেও পত্নীর প্রতি ছিল তাঁর জগন্মাতার দৃষ্টি। একদিন শ্রীশ্রীমা তাঁর পদসেবা করতে করতে তাঁকে বললেন: "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন: "যে-মা নহবতে আছেন (গর্ভধারিণী), যে-মা মন্দিরে আছেন (জগজ্জননী), সেই মা-ই আমার পদসেবা করছেন।" কাজেই এখানে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সেই ঈশ্বরদৃষ্টি। জগন্মাতা-দৃষ্টিতেই তিনি সর্বদা পত্নীকে দেখেছেন। আবার তাঁর মধ্যে দেখতে পাই সন্ন্যাসীর চরম আদর্শ। তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল আপসহীন ত্যাগের আদর্শ। কাঞ্চনকে তিনি সর্বতোভাবে বর্জন করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর সম্পর্কে বলতেন 'ত্যাগীশ্বর', 'ত্যাগীর বাদশা'। অষ্টমতঃ, প্রতি জীবে শিবকে দর্শন করে সর্বদা পরমেশ্বরের পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের আগে বোধহয় এমন জোর দিয়ে একথা আর কেউ বলেননি। ঘটনাটি আমাদের সকলের জানা। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন: "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন।" "জীবে দয়া"—এই কথাটি বলে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্য দশায় বলছেন: "জীবে দয়া নয়, দয়া নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। কীটানুকীট তুই! তুই দয়া করবার কে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" এই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—কথাটি স্বামীজী মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "ভগবান যদি দিন দেন তাহলে ভবিষ্যতে এই ভাব সর্বত্র আমি প্রচার করব।" ঠাকুর বলতেন: "কাঠে পাথরে ভগবানের পূজা হয়, আর মানুষে হয় না!" মানুষের ভিতরে ভগবানকে দেখে তাঁর পূজা করতে হবে। ভাল মানুষ, মন্দ মানুষ—কোন মানুষই এই পূজা থেকে বাদ যাবে না। তিনি বলতেন: "চোখ বুজলে তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই তিনি নেই?" একদিন বলছেন: "চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না। ভাবলাম চোখ বুজলে তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই তিনি নেই! চোখ খুলেও দেখলাম তিনিই সর্বত্র আছেন।" সর্বত্র চোখ চেয়েও সেই ভগবানকেই দেখা। ধ্যান করে নয়, সর্বত্র—স্বাভাবিকভাবে। এই হলো সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন করা। এই অবস্থাকে তিনি বলেছেন 'বিজ্ঞানীর অবস্থা'। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন এবং সর্বদা সেইভাবে ব্যবহার। বিজ্ঞানীর অবস্থাকে এইভাবে ব্যাখ্যা ঠাকুর ছাড়া আর কেউ করেছেন কিনা জানি না। তিনি বলছেন, শুধু ব্রহ্মজ্ঞান নয়, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বত্র সকলের সঙ্গে সেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে ব্যবহার করার অবস্থাকে তিনি বলছেন বিজ্ঞানীর অবস্থা। ঠাকুর বারবার বলেছেন: "নিত্যের পর লীলা।" ভগবানের নিত্যস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধির পর বিজ্ঞানী দেখেন যে, যিনি সেই সর্বভূতের অতীত পরমতত্ত্ব তিনিই আবার জীব-জগৎ চতুর্বিংশ তত্ত্ব হয়েছেন। বিজ্ঞানী সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে সর্বদা সেইভাবে ব্যবহার করেন। ঠাকুর এই অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে বললাম তাতে যে তাঁর সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করা হলো তা নয়। আরও অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁর আছে, যা হয়তো বিচার করতে করতে আমাদের চোখে প্রতিভাত হবে। পরিশেষে বলতে চাই, ভগবান অতুলনীয়, অপরিমেয়। তাঁকে আমরা ভাবতেও পারি না। তাঁর মতো আর একটি নেই যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা যাবে। তিনি এক, অদ্বিতীয়। আমরা সেই অদ্বিতীয় বস্তু থেকে যত দূরেই থাকি না কেন, শুধু আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে যদি তাঁর একটি কিরণকেও গ্রহণ করতে পারি তা হলে লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্ধকার অপসারিত হবে। জীবনকে সেইভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করলে হয়তো ধীরে ধীরে সেই আদর্শ আমাদের ভিতরে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটাবে। তিনি ভাস্বর সূর্যস্বরূপ। তাঁর একটি ক্ষুদ্র কিরণও যদি আমাদের জীবনে প্রবেশ করে তাহলেই আমাদের জীবন মধুময় হবে, জীবন সার্থক হবে।★ □

★ মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৩০ মে, ১৯৮৫ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজজীর প্রদত্ত ভাষণ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ঠাকুরের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

সাধু ও গৃহী ভক্তদের সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন, দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন। রাত্রে যখনই ঘুম ভাঙত, দেখতেন—হয় ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন, একেবারে নিঃশব্দ, না হয় ভাবস্থ হয়ে ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর 'মা', 'মা' বলছেন। সেই সময় তাঁর পরিধানে কাপড়চোপড় প্রায়ই থাকত না। লৌকিক আচরণে তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে নিয়মের বাইরে দেখা যেত। তা না হলে স্বাভাবিক অবস্থায় ঠাকুরের পানের বটুয়া পর্যন্ত ভুল হতো না।

একদিনের ঘটনা মহারাজ বলছেন: "রাত্রি প্রায় দুটোর সময় ঠাকুর আলু-পটল-মশলা একটা জায়গায় সাজিয়ে রাখছেন। ঠাকুরের তখন পেটের অবস্থা ভাল নয়। ঝোলভাত খান। পাছে রান্না করতে গিয়ে বেশি মশলা দিয়ে ফেলে অথবা বেশি বেশি রান্না করে সেইজন্য সব গুছিয়ে এক জায়গায় রাখছেন। ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, 'মামা, ও কি করছ?' ঠাকুর তখন বললেন, 'কালকের ঝোল-ভাতের জন্য সব ঠিক করে রাখছি।' হৃদয় তখন বললেন, 'সে তো কালকে। এত রাত্রে কি?' ঠাকুরের অবস্থা কখন কি হয় তিনি নিজেই জানেন না। ভাবের ঘোরে হয়তো বা তিনি সেসময় অন্য রাজ্যে থাকবেন, তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলি গুছিয়ে রাখছেন। হৃদয়ের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর তাই বললেন, 'কাল কোন্ অবস্থায় থাকি তার কোন ঠিক নেই।' "

একথা গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা করলে তবে যদি কিছু ধারণা হয়।

মহারাজ বলতেন: "দেখ, যুগাবতার এলে একটা শক্তি জাগ্রত হয়। ঠাকুর যুগাবতার, তাঁর আগমনে একটা শক্তি জাগ্রত হয়েছে। এ সুযোগ নাও। আর এ জন্মে যদি না হয়, তবে বহু জন্ম লেগে যাবে। কাজেই উঠে পড়ে লাগ। এ জন্মেই হয়ে যাবে।"

অন্য একদিন মহারাজ আরেকটি আশার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন। কথামৃতকার মাস্টারমশাই বলরাম মন্দিরে এসেছেন। মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরে রয়েছেন। মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রসঙ্গ হচ্ছে। মহারাজ যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছেন। সহসা বলে উঠলেন: "দেখুন মাস্টারমশাই, এবার ঠাকুর এসে জীবলোক এবং শিবলোকের—নরলোক এবং দেবলোকের মধ্যে একটা bridge (সেতু) তৈরি করেছেন। এবার সহজেই মানুষ ভগবানের কাছে যেতে পারবে।"

ঠাকুরের মহিমার কথা ভাবতে গিয়ে বাবুরাম মহারাজের একটা কথা মনে পড়ে। বাবুরাম মহারাজ মঠঘাটের পোস্তার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে দেখে সেখানে গেলাম। তিনি আবেগভরে বলে উঠলেন: "এখানে দাঁড়িয়েই একদিন দেখেছিলাম (ভাবে দর্শন), সমস্ত জগতে অশান্তির আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। চারিদিকে আগুন আর আগুন! আর এখানে এসে সব নিভে গেল, সব শান্ত হয়ে গেল।" তাঁর কথাগুলি শুনে আমার এতই আনন্দ হচ্ছিল যে, 'এখানে' কথাটি বলে তিনি কি mean করেছিলেন তা জানবার কথা তখন আমার মনে মোটেই আসেনি। আমার মনে হয়েছিল, ঠাকুরকে লক্ষ্য করেই তিনি এটা বলেছিলেন। অর্থাৎ জগতে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি কাটাকাটি চলছে, একমাত্র ঠাকুরকে আশ্রয় করলেই তার সমাধান হয়ে যাবে।

ঠাকুর নিত্য থেকে লীলায় নামবার সময় বিভিন্ন sphere (স্তর) থেকে বলবার চেষ্টা করেছেন। যখন নিত্য থেকে লীলাতে একশ ধাপ নেমে আসছেন, তখন শুধু 'ওঁ', 'ওঁ' বলছেন। মহারাজ বলতেন: "ঠাকুর যখন সমাধির পর নামতেন, তখন তিনি বিড়বিড় করে কত কথা বলতেন, সেগুলি কিছুই বোঝা যেত না। অনেক পরে তাঁর কথা স্পষ্ট হতো।"

ঠাকুর প্রায় সবসময়ই ভাবসমাধিতে থাকতেন। রাজা মহারাজ বলতেন: "সমাধি থেকে নামবার সময় ঠাকুর মুখের ওপর থেকে বুকের কাছ পর্যন্ত হাতটা নামিয়ে আনতেন আর কি যেন বলতে চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'কত কথা তোদের বলতে চাই, কিন্তু মা যেন মুখ চেপে ধরছেন।' "

বালিতে কল্যাণেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে। ঠাকুর কল্যাণেশ্বর শিবকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। রাজা মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলতেন: "কল্যাণেশ্বরকে দর্শন করে ঠাকুরের এমন গভীর সমাধি

হয়েছিল যে, তিনি কখনো ঠাকুরের এইরকম সমাধি আর দেখেননি। সমস্ত মন্দির আলোয় আলো হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর আর কল্যাণেশ্বর শিব এক হয়ে গিয়েছিলেন।" কল্যাণেশ্বর স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। খুব জাগ্রত। রাজা মহারাজ প্রায়ই যেতেন মন্দিরে। এখনো মঠ থেকে প্রতি সোমবার কল্যাণেশ্বর মন্দিরে পূজা দেওয়া হয়।

ঠাকুরের আগমন থেকেই সত্যযুগের শুরু। সুতরাং আমরা সব সত্যযুগে জন্মেছি। আমরা সবাই সত্যযুগের মানুষ।

আমি নিত্য 'কথামৃত' পাঠ করি। 'কথামৃত' পাঠ করলে রোজই নতুন বলে মনে হয়। রোজই ঠাকুরের এক-একটি কথার নতুন নতুন অর্থ ধরা পড়ে। তার কারণ আর কিছু নয়—'অনন্তভাবময় ঠাকুর' যে-ভাবে অবস্থিত থেকে কথাগুলি বলেছিলেন সে-ভাবে না পৌঁছানো পর্যন্ত পাঠকের কাছে তাঁর কথা ও তার অর্থ নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী এক-একদিন এক-একরকম মনে হবেই। এক-একদিন দেখি, 'কথামৃতে' ঠাকুরের কোন একটা কথা বিশেষভাবে মনে লাগল। ঐ কথাটির ওপর তখন চিন্তা করতে থাকি। ক্রমে ক্রমে দেখি, ঐ কথাটির নানা তাৎপর্য মনে এসে যাচ্ছে। তবে সেগুলিই যে তাঁর কথার ঠিক ঠিক তাৎপর্য তা নাও হতে পারে। ঠাকুরের কথা ঠিক ঠিক বুঝতে হলে সাধন-ভজন করে মন শুদ্ধ করতে হবে। তিনি যে-স্তর থেকে, যে-উচ্চভূমি থেকে কথাগুলি বলেছেন, সাধন-ভজনের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়ে ঐ ভূমিতে উঠলে তবে তাঁর কথা ঠিক ঠিক উপলব্ধি হবে।

'কথামৃতে' যাঁর কথা আমরা পাই তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, স্বয়ং জগদম্বা তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে তাঁর লীলা করেছেন। তিনি এবং জগজ্জননী ছিলেন অভেদ। মহারাজের কাছে একটি ঘটনা শুনেছিলাম ঃ

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর মহারাজকে তাঁর পদসেবা করতে বললেন। মহারাজও ঐ সেবায় নিযুক্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ দেখলেন, ভবতারিণীর মন্দির থেকে একটি কালোরঙের মেয়ে ধীরে ধীরে ঠাকুরের ঘরে এসে ঢুকল এবং ঠাকুরের দিকে এগিয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে মেয়েটি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মিলিয়ে গেল। মহারাজের মনে সন্দেহ হলো, তিনি কি ভুল দেখলেন? এমন সময় অন্তর্যামী ঠাকুর মহারাজকে বললেন ঃ "কী, হাতে হাতে [পদসেবার] ফল পেলি তো?" □

অনুষ্ঠান-সূচী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০২)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৭ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২০ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১২ ফাল্গুন	রবিবার	২৫ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২১ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৫ মার্চ	১৯৯৬
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৫ ফাল্গুন	শনিবার	৯ মার্চ	১৯৯৬
শ্রীশ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৪ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	২৮ মার্চ	১৯৯৬

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৪ ফাল্গুন	শনিবার	১৭ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

২, ১৭ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার,	শুক্রবার	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ	১৯৯৬
১, ১৬ চৈত্র	শুক্রবার,	শনিবার	১৫ মার্চ, ৩০ মার্চ	১৯৯৬

স্মৃতিকথা

রামকৃষ্ণ পরমহংস

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ভাষান্তর : শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[প্রথমাংশ গত আশ্বিন ১৪০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে
—সম্পাদক, উদ্বোধন।]

রামকৃষ্ণের মধ্য দিয়েই সিদ্ধ হয়েছিল ঈশ্বরের সুমহান দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায়। লোকে সমাধির কথা শুনেছে বা পড়েছে, কিন্তু কেউই রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে সমাধির যে-রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনুরূপ কিছু দর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেনি। জানান না দিয়েই তিনি সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। যেকোন একটি উদ্দীপক চিন্তা, শব্দ বা সঙ্গীত তাঁকে দিব্যানন্দের সমাধিলোকে প্রেরণ করত। কলকাতার চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখেছেন কি অমনই তাঁর মনে জেগেছে দেবী দুর্গার বাহন সিংহের কথা, আর তৎক্ষণাৎ সমাধি। তিনি যে নিরন্তর ঈশ্বরচেতনায় নিমজ্জিত, এসব তারই নিদর্শন। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন বিষয়ে কথাই তিনি বলতেন না। তিনি বলতেন, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, পুরুষরূপে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াত্মিকা। ঈশ্বর তাঁর কাছে কেবল নিত্য বর্তমানই নয়, তাঁকে তিনি প্রত্যক্ষ দর্শন করতেন। এত সহজ এবং সর্বাত্মক তাঁর বিশ্বাস যে, উপস্থিত কেউ কখনো ও-বিষয়ে প্রশ্ন করার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিরাট বাগ্মী এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত। প্রায়ই তাঁরা পরস্পরের সাক্ষাতে উপস্থিত হতেন। কেশবের মৃত্যুর অল্প পূর্বে রামকৃষ্ণ কেশবের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। কেশব রামকৃষ্ণকে এতই ভক্তি করতেন যে, তিনি তাঁর পদধূলি নিতেন। তাঁর সমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিও রামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন, রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎপর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। পরবর্তী কালে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে তিনি রামকৃষ্ণের অনুগামী হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুই নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রায়শই তাঁর কাছে যেতেন। বিজয়কৃষ্ণ পরে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে হিন্দুসন্ন্যাসী হয়ে যান। একবার তিনি রামকৃষ্ণের শ্রীচরণ বুকে ধরে আকার-ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছিলেন—রামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার। রামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে বাৎসরিক উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সেইসঙ্গে ঠিকঠাক পোশাক পরে আসতে অনুরোধ জানান। কিন্তু রামকৃষ্ণ বলেন : "আমি বাবু সাজতে পারবুনি।" পরে দেবেন্দ্রনাথ চিঠি পাঠিয়ে বলেন, রামকৃষ্ণকে সভাস্থলে আনা উচিত হবে না। দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন ঠিকই, তবে একই সঙ্গে তিনি কলকাতার অভিজাত ভদ্রসমাজের মানুষও। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থাকবেন—সেখানে এমনকি এক পরমহংস পর্যন্ত যদি পরিষ্কার সাদা জামাকাপড় পরে না আসেন, নিতান্ত বেমানান হয়ে দাঁড়াবেন। যীশুখ্রীস্টকে কি 'হাউস অব লর্ডস'-এ বসতে দেওয়া সম্ভব?

স্বামী বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে বলেছেন, তাঁর সবকিছুই তিনি পেয়েছেন গুরু রামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তাঁর প্রধান ঋণ—নির্ভয় সত্যকথনের সামর্থ্য। রামকৃষ্ণ প্রত্যেক মানুষকে তার নাম ধরে ডাকতেন। আর যদি কারো মধ্যে হামবড়াই ভাব দেখতেন, তাঁকে প্রকাশ্যেই তিরস্কার করতেন। ধর্মবোধে, স্বতঃপ্রজ্ঞায় এবং আত্মশাসনে তিনি নিতান্ত নম্র, কিন্তু অকারণ চাপল্য কিংবা দম্ভ একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। 'রাজা' উপাধিধারী এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি বলেছিলেন : "দ্যাখ বাপু, তোমাকে মিথ্যে রাজা-টাজা বলতে পারবুনি। তুমি তো সত্যি রাজা নও।" সত্যকার রাজা বলতে [দেশাধিপতি] শাসনকর্তা বোঝায়। আর যাদের রয়েছে নিছক 'রাজা' উপাধি তাঁদের সঙ্গে [সেকালের] ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কোন পার্থক্য ছিল না। নিছক পাণ্ডিত্য কিংবা বৈদগ্ধ্য, যার বিষয়ে আমাদের মাতামাতি কিংবা ধনসম্পদ, খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—এসকলের কোন মূল্যই তাঁর কাছে ছিল না। একমাত্র যাদের আছে ধর্মবোধ, যারা ঈশ্বরচিন্তা করে—তাদের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। একবার যখন বিখ্যাত এক জননেতা তাঁকে বলেন, তিনি পরোপকার করে থাকেন; রামকৃষ্ণ তাঁর মুখের ওপর সোজা বলে দেন, ঈশ্বর না চাইলে তাঁর কি ক্ষমতা যে পরোপকার করবেন? সেই কালে কলকাতায় বহু বাগ্মী ছিলেন—কেশবচন্দ্র সেন তাঁদের সেরা। রামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন : "লেকচার-ফেকচারের কি দাম যদি না ঈশ্বরের চাপরাস সঙ্গে থাকে! লোকে বক্তৃতা শুনবে, খানিক পরে ভুলে যাবে।" হায়! সত্যিই তো, কে আর এখন কেশবচন্দ্র সেনের অতুলনীয় বক্তৃতার কথা স্মরণ করে?

আর সেই কালে সমুচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন এই মানুষটি—প্রায় নিরক্ষর, সভ্য রীতিনীতির ধার ধারেন না, গ্রাম্য অজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলার ভঙ্গি, মুখে অনর্গল বাক্যস্রোত নয়, তোতলামির কারণে কথা মাঝে মাঝে বেধে যায়, কখনো দশ-বিশ জনের বেশি লোকের কাছে কথা

বলেননি। দেখা গেল, তাঁর জন্মের পরে একশ বছরের চাকা ঘুরতে না ঘুরতে—যার মধ্যে আবার পঞ্চাশ বছর তিনি পৃথিবীর লোকচক্ষে নেই—তাঁর কথা পৃথিবীর সকল অংশে উদ্ধৃত হচ্ছে, পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হচ্ছে, আর আনন্দধ্বনি উঠছে চতুর্দিকে। পৃথিবী এখন আবার দেখল, আগেও যা দেখেছে—একজন আচার্য কোন বাগ্মীর চেয়ে কত বড়, মনীষার চেয়ে কত উচ্চে অবস্থিত আত্মিক শক্তি। রামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, যখন তিনি ভাবে থাকেন তখন পণ্ডিত-ফণ্ডিতকে একেবারে তুচ্ছ মনে হয়। আত্মার আলোকের সামনে অপর সকল আলোক ম্লান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হয় সূর্যোদয়ে তারকা বা চন্দ্রের দশা।

কোন্ হিসেবে ধরতে পারব, কিভাবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক তরুণকে—তাদের অনেকে আবার কিশোর, বালক—আকর্ষণ করে নিজের কাছে জড়ো করেছিলেন; তারপর পবিত্র জীবনযাপন করে ঈশ্বরের জন্য আত্মোৎসর্গ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন? কিভাবে তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তর্নিহিত শক্তি দর্শন করতে পেরেছিলেন, যিনি পরে হিন্দুসন্ন্যাসী বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীর চোখ ঝলসে দেন? কোথা থেকে এসেছিল তাঁর এই অন্তর্ভেদী অবিশ্বাস্য ভবিষ্যদর্শনের ক্ষমতা, যা এই তরুণ বালকের মধ্যে (যার মধ্যে বিশেষ সম্ভাবনা তখনো দেখা যায়নি) দর্শন করতে পেরেছিল এক বিশ্বখ্যাত বিরাট বার্তাবহ আচার্যকে? বিবেকানন্দের সঙ্গে আমি একই কলেজে ছিলাম, তাঁকে কেউই উজ্জ্বল ছাত্র বলে মনে করেনি। [কথাটি বিতর্কযোগ্য।] যা শোনা গিয়েছিল তা হলো—সে খুব ভাল গায়ক। পুরো পড়াশোনা শেষ করতে না পেরে আমি ডিগ্রি ছাড়াই কলেজ ছাড়ি, আর বিবেকানন্দ ডিস্টিংশন ছাড়া সাধারণভাবে বি. এ. পাস করেন। বহু বছর পরে বিবেকানন্দ লাহোরে আমার অতিথি হিসেবে কাটিয়েছেন। আমি তখন 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক। তখন তাঁর মাথায় শিকাগো ধর্মমহাসভায় অর্জিত গৌরবমুকুট। রামকৃষ্ণ পূর্বাহ্নে কেবল বিবেকানন্দের বিরাটত্বের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেননি, এও বলেছিলেন—ও যদি নিজের স্বরূপ জানতে পারে তাহলে বেশিদিন বাঁচবে না। বস্তুতপক্ষে বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বয়ং আমাকে মৃত্যুর তিন বছর আগেই নিজের ভাবী মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। রামকৃষ্ণ আরও কিছু শিষ্য রেখে গেছেন যাঁরা অসাধারণ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রে ভূষিত এবং অপূর্ব আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী।

॥ ২ ॥

পরমহংসকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনার পুণ্যার্জন আমি করেছি, আর কলম ধরে সেকথা লেখার জন্য আমি এখনো [১৯৩৬] বেঁচে আছি। ১৮৮১ সালের জুলাই মাসে তাঁকে দেখেছি—উনিশ বছরের তরুণ বালক তখন আমি। তাঁকে দেখেছি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে—সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্ম প্রচারক-সহ আরও কিছু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কেশবের জামাতা, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের ছোট একটি স্টীমারে (বাষ্পীয় নৌকা বলাই ঠিক) আমরা ছিলাম। দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংস তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে উঠলেন। তিনি এবং কেশব পরস্পরকে করজোড়ে একেবারে নত হয়ে—মাথা প্রায় জাহাজের ডেকে ঠেকে যাচ্ছিল—নমস্কার করলেন। ডেকের ওপরে গা ঘেঁষে মুখোমুখি তাঁরা বসলেন। কেশব আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। সেটা আমার সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়াল। সামনে দেখলাম মধ্যবয়সের, মাঝারি উচ্চতার, শ্যামবর্ণ, দুর্বল চেহারার একটি মানুষকে—তাঁর চুল এলোমেলো, আঁচড়ানো হয়নি, কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখ অর্ধমুদিত এবং আত্মমগ্ন। ঠোঁট অল্প স্থূল, নিচের ঠোঁট একটু শিথিল, তার ফলে সামনের দাঁত দেখা যায়। লালপাড় ধুতি পরনে, গায়ে খাটো শার্ট, বোতাম খোলা। পায়ে জুতো নেই। তবে অন্য ক্ষেত্রে চটি বা জুতো পরতে তাঁকে দেখা গেছে। তিনি কুঞ্চিত চোখে চারদিক দেখে নিলেন—দেখলেন সকলের দৃষ্টি ভাল। তারপর নজর পড়ল জাহাজের কাছি জড়াবার লোহার খুঁটির ওপরে বসে থাকা ইউরোপীয় পোশাক-পরা যুবকটির ওপরে। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন: "ওটি কে?" কেশব আন্দাজে বললেন: "ও বোধহয় সদ্য ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছে।" "ঠিক ঠিক"—রামকৃষ্ণ বললেন "জানোই তো, সাহেব দেখলেই ভয় ধরে যায়!" শুনে আমরা সকলে হাসতে লাগলাম। তারপরেই রামকৃষ্ণ সরাসরি গভীর বিষয়ে কথাবার্তায় নেমে পড়লেন।

কথোপকথন বলতে যা বোঝায়, এটা তা ছিল না। প্রায় আট ঘণ্টা ধরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি কণ্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল, সে-কণ্ঠ রামকৃষ্ণের। মাঝেমধ্যে অল্প তোতলামি, তা কিন্তু বাক্যপ্রবাহে বাধাসৃষ্টি করেনি। কথাবার্তার মধ্যে 'তুমি' ও 'আপনি' মিশে যাচ্ছিল, ভাষায় পরিমার্জনার অভাব থাকলে যেমন হয়। কিন্তু কে কবে কাউকে এমন করে কথা বলতে শুনেছে? প্রজ্ঞা ও ঈশ্বরচৈতন্যের অফুরন্ত উৎস থেকে নির্গলিত হচ্ছিল শব্দধারা। পরবর্তী কালেই কেবল আমি উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম—কী সুমহান সৌভাগ্য ও মহাপুণ্যের সেই দিনটি আমার ছিল! আমার সামনে মিলিত দুই আত্মার আত্মীয়, যাঁরা অধ্যাত্মজগতে নির্ধারিত স্থানের অধিকারী। রামকৃষ্ণ সর্বোচ্চ আকারে প্রকাশিত তখন। ডেক একেবারে নিস্তব্ধ। আচার্যের কণ্ঠ থেকে যেসকল অমূল্য শব্দরাজি

নির্গত হচ্ছে, তার কোনটি যাতে কান এড়িয়ে না যায় সেজন্য সকলে মাথা ঝুঁকিয়ে, ঘাড় বাড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছে। আমাদের হৃদয়তন্ত্রী একেবারে টানটান। দারুণ আবেগে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে শুনছি ঐশ্বরিক উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত, প্রত্যক্ষ বর্ণরঞ্জিত, ঐশ্বর্যময়, উপমা ও কথাগল্পের মালা। স্টীমারের তলা দিয়ে তরঙ্গভঙ্গে বয়ে যাচ্ছিল পবিত্র গঙ্গার ধারা—সরে যাচ্ছিল নদীর দুপাশের সারি সারি গাছ ও বাড়ির রেখা। সেসব দিকে আমাদের মনই ছিল না। আমরা শুধু চেয়ে আছি আমাদের সামনের নিবিড় ভাবাঙ্কিত, তপঃশুদ্ধ মুখটির দিকে। কেবল শুনছি শব্দের স্রোতধ্বনি, একটি ভাব থেকে আরেকটি ভাবকে স্পর্শ করে শব্দগুলি এগিয়ে যাচ্ছে, আর ঈশ্বরবোধকে করে তুলছে সজীব স্পন্দমান জাগ্রত সত্য। কথা বলতে বলতে উপবিষ্ট রামকৃষ্ণ একটু একটু করে কেশবের দিকে সরে যাচ্ছিলেন—শেষপর্যন্ত তাঁর একটি হাঁটু কেশবের কোলের ওপরে উঠে পড়ল। কেশব একেবারে স্থির—এই ঘনিষ্ঠ স্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করলেন না। এক মুহূর্তের জন্যও রামকৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর দৃষ্টি সরেনি—রামকৃষ্ণের কোমর থেকে ধুতি খসে নিচে জড়ো হয়ে পড়েছে। সহসা তাঁর চৈতন্য ফিরল, সরে গিয়ে কাপড় ঠিক করলেন। কেশব তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনি কি নিরাকার [ব্রহ্ম] সম্বন্ধে কিছু শোনাবেন না?" তখনি অর্ধমুদিত নেত্র একমুহূর্তের জন্য খুলে গেল, চোখে নতুন আলোর চকিত ঝলক। পরমহংস বললেন : "নিরাকারের কথা জিজ্ঞাসা করছ? বোঝানো বড় শক্ত। নিরাকার—নিরাকার—।" তারপর শব্দমাত্র উচ্চারণ না করে সমাধিতে ডুবে গেলেন।

সমাধি! সে কি জিনিস!! আমি কেবল শব্দটি আগে শুনেছি। আমার বয়স অল্প, তখনো কুড়ির কোঠাতে আছি। আমি এবং আমার মতো উপস্থিত আর সকলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম রামকৃষ্ণের মুখের দিকে—সেখানে এক অনন্য অপূর্ব রূপান্তর ঘটেছে। এতক্ষণ ধরে রুদ্ধশ্বাস মনোযোগের সঙ্গে যে-কণ্ঠস্বর শুনছিলাম—কোমল মধুর একাগ্র আচ্ছন্নকারী কণ্ঠস্বর—হঠাৎ তা স্তব্ধ। উপবিষ্ট শরীর স্থির, নিষ্কম্প। তাতে কিন্তু কোন আড়ষ্টতা বা কৃচ্ছ্রকাঠিন্য নেই। অর্ধপদ্মাসনে দুই পা, ভঙ্গি স্বচ্ছন্দ। কোলে ন্যস্ত দুটি হাত, আঙুলগুলি আলগাভাবে পরস্পর জড়ানো। এর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় মুখমণ্ডলটি, সেখানেই প্রকাশিত রামকৃষ্ণকে কোন্ চৈতন্য এখন অধিকার করে রূপান্তর ঘটিয়েছে, তার প্রতিচ্ছবি। অক্ষিপল্লব যদিও আবৃত করেছে চোখের অর্ধাংশকে, কিন্তু পৃথিবী পুরোপুরি হারিয়ে গেছে সেই চোখের সামনে থেকে। বহির্জগতের কোন কিছু যে তাঁর কাছে বর্তমান আছে, তার চিহ্নমাত্র নেই সেই চোখে। ঠোঁট অল্প ফাঁক—যেন হাসছেন, আর মুখটিতে এমন এক অতীন্দ্রিয় দিব্যানন্দের দ্যুতি যার বর্ণনা কেবল অসম্ভবই নয়, ক্যামেরার ছবিতেও ধরা অসম্ভব। ঐ হলো নিরাকার ব্রহ্মোপলব্ধির রসোল্লাস। পরমহংস প্রায়ই বলতেন, সমাধির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা যায় না।

মনে পড়ে, সেই সময়ে নিজেদের ধর্মনিষ্ঠ মানুষ বলে পরিচয় দেন এমন কেউ কেউ রামকৃষ্ণের সমাধিকে একধরনের মৃগীরোগের মূর্ছা বলতেন। এইসব লোকের ধারণায় ধর্ম হলো তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা, সাড়ম্বর উচ্চম্মন্যতার রূপ। ঐশ্বরিক প্রেমের গভীরতা এবং উপলব্ধির উন্মাদনা এঁদের কাছে অজ্ঞাত ব্যাপার।

বহু বাগ্মীর বক্তৃতা আমি শুনেছি, কিন্তু তাঁদের কটা কথাই বা মনে আছে? বাতাসে ভেসে সব হারিয়ে গেছে। অথচ রামকৃষ্ণের কথাগুলি মনে আছে, ঠিক যেভাবে পঞ্চাশ বছর আগে শুনেছিলাম সেইভাবেই। চেষ্টা করলেও তাদের ভুলতে পারতাম না, কেননা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, তাদের মধ্যে ছিল শক্তি, করুণা, শুশ্রূষা এবং সান্ত্বনা।

রামকৃষ্ণকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনার পরে আমি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার আত্মীয়, বয়সে কয়েক বছরের বড়। সবকিছু বলে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য তাগিদ দিয়েছিলাম। পরের বছরে তিনি রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণের কথা শুনে এমনই মোহিত হন যে, তিনি যাকিছু বলতেন সবই মহেন্দ্রনাথ ডায়েরিতে টুকে রাখতেন। তিনি আমাকে বলেছেন, একদিনের শোনা কথা তিন দিন ধরে লিখতে হতো। জীবনধারণের জন্য তিনি স্কুলে শিক্ষকতা এবং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি 'মাস্টার মহাশয়' নামে পরিচিত। তাঁর ডায়েরিগুলিই 'শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র উৎস। এই বইই রামকৃষ্ণ-কথার একমাত্র প্রামাণ্য এবং অনেকাংশে সম্পূর্ণ সংগ্রহ। মহেন্দ্রনাথ প্রতিদিন রামকৃষ্ণ-সন্নিধানে উপনীত হতে পারতেন না, কিংবা সর্বদা আচার্যের কাছে থাকতেও পারতেন না। ফলে আচার্য মূল্যবান এবং আলোকিত অন্য নানা উক্তি করেছেন, একথা খুবই সম্ভব, যেগুলি লিখে রাখা হয়নি। যেসব শিষ্য সর্বদাই রামকৃষ্ণের কাছে থাকতেন ও পরবর্তী কালে সংসারত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা গুরুর ব্যক্তিত্বের চৌম্বকশক্তি এবং চরিত্রের প্রভাবে এমনই সম্পূর্ণভাবে অভিভূত ছিলেন যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে যেসব অমূল্য কথা শুনেছেন সেগুলি লিখে রাখার কথা তাঁদের কখনো মনে হয়নি। এক গৃহী শিষ্যের ঐকান্তিক ভক্তি এবং ধৈর্যস্থির পরিশ্রমের ফলেই সেসব

রক্ষিত হতে পেরেছে। অন্য যাকিছু রামকৃষ্ণ-কথার সঙ্কলন বেরিয়েছে, সকলই প্রধানতঃ এই উৎস থেকে সংগৃহীত—একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্র সঙ্কলন।

রামকৃষ্ণকে দর্শন করার অল্প পরে আমাকে ভারতের অন্যত্র করাচীতে চলে যেতে হয়। আমি তাঁকে জীবিত অবস্থায় আর দেখিনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধির দিন, ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, আমি কলকাতায় ছিলাম। বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময়ে আমার কাছে একটুকরো মুদ্রিত কাগজ পৌঁছাল—রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধি হয়েছে। গাড়ি করে আমি সোজা কাশীপুর বাগানবাটীতে পৌঁছালাম—সেখানেই সুমহান পুরুষটি তাঁর শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীদের অখণ্ড ভক্তি, ভালবাসা ও সেবার মধ্যে শেষ অসুখের দিনগুলি কাটিয়েছিলেন। দেখলাম, গাড়িবারান্দার সামনে মুক্ত আকাশের নিচে তাঁর মরদেহ খাটিয়ায় সুন্দর একটি বিছানার চাদরের ওপরে স্থাপিত ; দেহ শুভ্র চাদরে ঢাকা, তার ওপরে ফুলের রাশি। ডানপাশ ফিরে আছেন, মাথার নিচে বালিশ, দুই পায়ের মধ্যে আরেকটি বালিশ। যে-অধরোষ্ঠ শিক্ষাদানে কখনো বিরত হয়নি—কণ্ঠে ক্যানসার হয়ে যখন অসহ্য কষ্ট পাচ্ছেন তখনো নয়—এখন তা মৃত্যুতে চিরস্থির। যন্ত্রণার অবসানে মুখ কোমল—তাতে মহামরণের অপার মৌন শান্তি। মুখের হাস্যরেখা থেকে বোঝা যায়, সমাধির আনন্দেই আত্মার মহাপ্রয়াণ। নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও অন্য শিষ্যগণ এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রৈলোক্যনাথ [সান্যাল]-সহ অনেকে ভূমিতে উপবিষ্ট। যখন তাঁদের পাশে গিয়ে বসেছি এবং রামকৃষ্ণের মুখের অপরিম্লান শান্ত রূপ দেখছি তখন তাঁর এই কথাগুলি মনের মধ্যে ফিরে এল—শরীরটা বস্ত্র ছাড়া কিছু নয়, যার ভিতরে থাকে দুর্জ্ঞেয় সত্তা। সেই হলো মানুষের স্বরূপ, যাকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। এধারে ক্রমে ম্লান হয়ে এল অপরাহ্ণের আলো, দিনের উত্তাপ কমে যাবার পরেই মরদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাবার কথা। আমরা বসে আছি—এমন সময় ওপরে ভেসে এল একখণ্ড মেঘ, আর বৃষ্টির কয়েকটি বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ল। উপস্থিত মানুষরা বললেন, এই হলো পুষ্পবৃষ্টি, স্বর্গ থেকে অমর দেবতারা তা বর্ষণ করেন মর্ত্যমানুষের ওপর—তেমন মানুষের ওপর যিনি মর্ত্যে ও স্বর্গে সুমহিম। পুষ্পবৃষ্টি তাঁকে অমরলোকে বরণের অর্ঘ্য—প্রাচীন শাস্ত্রে তাই লিখেছে।

এই বিশ্বাস আমার হয়েছে, এতগুলি বছর যে আমি বাঁচবার অধিকার পেয়েছি তার কারণ, মানুষের কাছে যাতে সশরীরে উপস্থিত থেকে এই সাক্ষ্য দিতে পারি—আমি রামকৃষ্ণকে তাঁর জীবনকালে দেখেছি, তাঁকে কথা বলতে শুনেছি এবং তাঁকে দেখেছি তাঁর মহাপ্রয়াণের পরমা শান্তির মধ্যে শয়ান অবস্থায়।

মহাকাল কিভাবে না স্থান ও পাত্রের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়! বাংলার শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অমর্যাদাকর অশালীন কথা শোনা গেছে। এহেন দাবি করা হয়েছে যে, এক বা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে না গেলে দক্ষিণেশ্বরের সাধুর কথা কেউ জানতেই পারত না। তাই যদি হয়, হায় মানবজাতি, কি দুর্ভাগ্য তার! তবে এইসব চালাকি কোন মনোযোগেরই যোগ্য নয়। পরমহংস রামকৃষ্ণের সংস্রবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কেউই ধর্মের ইতিহাসে বা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সমপঙ্ক্তির অধিকারী নন। যেসব ধনী মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বা তিনি যাঁদের বাড়িতে গেছেন, তাঁদের কেউই মানুষের স্মরণে থাকবেন না, যদি না তাঁরা 'রামকৃষ্ণকথামৃত'-এ উল্লিখিত হয়ে থাকেন। স্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে তাঁদের অধিকাংশের নাম ইতিমধ্যেই মুছে গেছে, ধুলোয় মিশিয়ে গেছে তাঁদের ধনসম্পদ ও উপাধির সম্ভার। কেউ কেউ তাঁকে 'খ্যাপা' বলে মনে করতেন, অন্যরা নিছক কৌতূহলের বস্তু। কোথায় হারিয়ে গেছেন ঐসব লোক, আর মহাকাল মানবসমাজের মহত্তম আচার্যদের মধ্যে রামকৃষ্ণের স্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেসব যুবক তাঁর সান্নিধ্যে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিমহিমা লাভ করেছেন। আর তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রশংসাপ্রাপ্ত বিবেকানন্দ অক্ষয় খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। নিজ জাতি ও তার সুপ্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে বিজয়ী মহাবীর যোদ্ধা তিনি—দেশপ্রেমিক, আচার্য এবং প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ।

রামকৃষ্ণের মতবাদের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে—সেগুলি অপর মতের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রথম ও প্রধান হলো তাঁর বিখ্যাত প্রবচন—"যত মত তত পথ"। তিনি স্বয়ং নানা ধর্মের সাধনা করেছেন। যদি তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে হয় তাহলে সকল ধর্মের সত্য স্বীকার করতে হবে, সকলকে শ্রদ্ধা করতে হবে, কাউকে নিন্দা করা চলবে না। প্রতিটি ধর্মমত, ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের কাছে বা সত্যের কাছে পৌঁছাবার পথ। তারপর, পাপবাদ নামক দুঃখজনক মতবাদের জোরালো বিরোধিতা তিনি করেছেন। এই মতবাদ বলে—মানুষের পাপে জন্ম এবং সে পাপের উত্তরাধিকারী। রামকৃষ্ণ সেকথা মানতেনই না। তিনি সবিস্ময়ে বলতেন ঃ ঈশ্বরের সন্তান মানুষ কিভাবে পাপসম্ভব হবে? মানুষ ভুল করার পরে যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আর সে-কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে সে ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে যাবে। যে কেবল নিজেকে 'পাপী পাপী' বলে, সে পাপীই হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ আরও বলেছেন, মানুষ কেন কেবল ঈশ্বরের দয়া প্রার্থনা করে? ঈশ্বরের সন্তান সে, তাঁর

ভালবাসা তো সে পাবেই। তাই "দয়া কর, দয়া কর" বলে চেঁচাবে কেন? রামকৃষ্ণ তাঁর প্রবল ও ঐকান্তিক উপলব্ধি এবং নিরন্তর ঈশ্বরসান্নিধ্যের বিহ্বল আনন্দকে উন্মোচন করে মানুষকে ঈশ্বরের যতখানি নিকটবর্তী করতে পেরেছেন, এমনটি পূর্বে কেউ করতে পারেননি।

মানবসমাজের এই শেষ মহান আচার্যের জন্য তাঁর শিষ্য ও অনুগামীরা কোন্ স্থান নির্ধারণ করেছেন? রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ এবং গৃহী ভক্তগণ এবিষয়ে তাঁদের চরম সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে 'ঈশ্বরের অবতার' মনে করেন। পৌরাণিক দশ অবতারের অতিরিক্ত এক অবতার তিনি। বাইরের মানুষের কাছে যাই হোক, ভারতবর্ষে এটা অদ্ভুত কিছু নয়। অন্য দেশের এবং অন্য ধর্মের মানুষরা, কোন একজন পৃথিবীর মানুষকে দেহধারী ঈশ্বর বলা হচ্ছে—একথা শুনলে আঁতকে উঠবে। ভারতবর্ষে তেমন হয় না।...

রামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে এমন কিছু নেই যাকে বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, তন্ত্রধর্ম বা অন্য কোন ধর্ম বলে চিহ্নিত করা যাবে।... রামকৃষ্ণ কখনো নতুন ধর্ম বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চাননি।... দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁর ঘরটি যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই রক্ষিত আছে। দেওয়ালে টাঙানো আছে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকের চিত্র। এই আচার্য কিন্তু কোন নতুন ধর্মের প্রবর্তক নন। যে-সাধনা তিনি করেছিলেন, তারই শিক্ষা দিয়েছেন—সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা কর।... বহিরঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মন্দিরগুলি অন্য হিন্দুমন্দিরের মতোই। কিন্তু সেখানকার বৈশিষ্ট্য হলো—সকলেরই সেখানে প্রবেশাধিকার আছে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ বোম্বাই শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে খারে রামকৃষ্ণ মিশন-আয়োজিত পরমহংস রামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। ভোর থেকেই বৈদিক স্তোত্রগীত হচ্ছিল। সন্ধ্যাকালে এক পারসী মহিলা পূজাঘরের সামনে মেঝেয় বসে সুন্দরভাবে মীরাবাঈয়ের ও অন্যান্যের ভজন গাইলেন। তার কিছু পরে বেশ বড় সংখ্যায় মানুষ লাইব্রেরি-ঘরের মেঝেয় বসল প্রসাদগ্রহণের জন্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুজরাটি, দক্ষিণী, মাদ্রাজী, পারসী, বাঙালী, ইংরেজ এবং আমেরিকান—নর ও নারী। প্রসাদগ্রহণ শেষ হয়েছে কিনা হয়েছে, এক ভারতীয় নারী ভরা গলায় গভীর আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠলেন বন্দনাসঙ্গীত। হিন্দুধর্ম, জরথুস্টধর্ম, খ্রীস্টধর্ম, বাহাইধর্ম—এই সকল ধর্মের মানুষ সেখানে উপস্থিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটি আমার কাছে রামকৃষ্ণের বিশেষ জীবনোদ্দেশ্যের তাৎপর্যবাহী বলে মনে হলো। এখানে ঘটেছে সর্বধর্মের সমাবেশ— প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে উপস্থিত। "যত মত তত পথ"-বাহী সেইসব মানুষেরা। নাম বহু, কিন্তু সত্য এক। এই হলো ধর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্র, প্রত্যেকের সমমর্যাদা, প্রত্যেকের সমানাধিকার।

ভারত যেন বৃথা 'গর্বিত' নয়—গভীরভাবে 'কৃতজ্ঞ' হয় এই মনে করে যে, সে সর্বশেষ প্রফেটের জন্ম দিতে পেরেছে, যাঁর দৃষ্টির দূরপ্রসার, বিশ্বাসের সার্বভৌমিকতা এবং ঈশ্বরোপলব্ধির প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা সমগ্র বিশ্বের কাছে পরমাশ্চর্য সঙ্ঘটন বলে প্রতীয়মান। পরমহংস রামকৃষ্ণের 'কথামৃত'-এর গভীরতর এক তাৎপর্য আছে। তা ভারতীয় মনন ও প্রজ্ঞার মূলদেশকে আরও গভীর ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। তা দেখিয়েছে, কিভাবে কেবল অধ্যাত্মশক্তি তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পারে ধনসম্পদ, পুঁথিগত বিদ্যা এবং সামাজিক প্রতিপত্তিকে। এই অধ্যাত্মশক্তিই নানা আকারে অভিব্যক্ত হয়ে ভারতের চরম ও পরম ত্রাণ ও মুক্তি ঘটাবে। পাশ্চাত্য যেখানে বাদ-বিসংবাদ, সন্দেহ-সংশয় এবং অবিরাম যুদ্ধ-সম্ভাবনায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ভারত সেখানে বিশ্বাস ও ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকে দৃঢ় করে তুলছে। [সমাপ্ত]□

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠকবর্গের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন'-এর প্রথমদিকে **'মা সারদামণি ওল্ড এজ হোম'** এবং **'মা সারদামণি হাউসিং কমপ্লেক্স'** শিরোনামে যে-বিজ্ঞাপনটি কয়েক মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছে সে-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আমরা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনটির সঙ্গেই গত কয়েক মাস ধরে জানিয়ে আসছি। সম্প্রতি আমাদের কাছে কেউ কেউ মৌখিকভাবে জানিয়েছেন যে, বিজ্ঞাপিত প্রকল্পটিতে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন এবং আরও অনেকে প্রতারিত হতে চলেছেন। এই অভিযোগ আমরা বিজ্ঞাপনদাতাকে জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন। যাই হোক, **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহক এবং পাঠকবর্গের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন প্রকল্পটির সঙ্গে নিজ দায়িত্বে সংযুক্ত হন। **'উদ্বোধন'**-এ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে তা যেন তাঁরা কখনো ধরে না নেন। অবশ্য একথা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের সঙ্গে 'উদ্বোধন-এর বক্তব্যে'ও মুদ্রিত হয়েছে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

নিবন্ধ

পরমরসিক পরমহংসদেবের কিছু রম্য রসিকতা

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

নির্মল শুভ্র ঝলমলে হাসিতে মানুষের মনকে দুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ। শক্ত এইজন্য যে, লাভ-লোকসানের হিসেব করতে করতে মানুষ মনের কাঁচা রঙটা হারিয়ে ফেলে। তাই হাসিতেও সাংসারিক গন্ধ মিশে যায়। অথচ এই শক্ত কাজটাই একটি প্রাণবন্ত শিশুর কাছে সবচেয়ে সহজ। মানবজীবনের যেসব অসঙ্গতি মুক্তহাসির উৎস, একটি শিশুর অবুঝ সবুজ মন সে-হাসির মণিমুক্তা হরির লুটের মতো ছড়িয়ে দেয় দেদার। তার মন এসব মণিমুক্তার অফুরন্ত ভাণ্ডার, আর শিশু হলো দুনিয়ার এক নম্বর বেহিসেবী। তাই সে নির্ভাবনায় "অবাধে পাথেয় করে ক্ষয়"। খাঁটি রসিক হতে হলে শিশুর এই গুণটা অবশ্যই থাকা চাই।

ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শিশুত্ব ছিল পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন শিশু-স্বভাব। তাই ছিলেন স্বভাব-রসিক, জাত-রসিক, সিদ্ধ-রসিক—রসিকোত্তম, অফুরন্ত রসের ভাণ্ডারী। আর সে-রস পরিবেশনে তিনি ছিলেন শিশুর মতোই বেহিসেবী, অকৃপণ। তাঁর রসিকতা যে শুধু ভক্তদের মন-প্রাণ ভরে দিত তাই নয়, অনেক সময় অনেক ভক্ত সেই অনাবিল হাসির আলোকে নিজেদের ভিতরটাও দেখে নিতে পারতেন, তাঁদের মনের ম্লানতা মুছে যেত। তবে তাঁর এই ধরনের রসিকতায় একটু মোলায়েম খোঁচা থাকত। এ হলো যাকে বলে 'satire' বা ব্যঙ্গ। পণ্ডিতরা যতরকম হাস্যরসের কথা বলেছেন ঠাকুরের রসিকতায় তার একটিরও অভাব নেই। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পণ্ডিত সাহিত্যিকদের নিয়ে অথবা অন্য প্রসঙ্গে তাঁর যে সুপ্রসিদ্ধ রসিকতাগুলি আছে, বলে রাখি, এখানে সেগুলির একটিরও উল্লেখ করা হয়নি।

অধর সেনের বাড়িতে নামগানের আসর। অনেক রাত পর্যন্ত চলল। তারপর ভোজনপর্ব। খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুর প্রতিমাকে প্রণাম করে নিচে নামতে নামতে হঠাৎ বলে উঠলেন: "ও-রা-জু-আ?" এই সাঙ্কেতিক শব্দগুলোর মানে বুঝলেন শুধু রাখাল (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে প্রায়ই জুতো চুরি যায়। তাই ঠাকুরের এই সাঙ্কেতিক প্রশ্ন: "ও রাখাল, জুতো আছে?"

॥ আমি তো পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস! দুধ খাব ॥

ছোট খাটটিতে বসে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন। একজন ভক্ত জানতে চাইলেন—সংসারীদের কি ভগবানলাভের কোন উপায় নেই? ঠাকুর বললেন: কেন থাকবে না? তার জন্য চাই তীব্র বৈরাগ্য আর অদম্য জেদ। বলেই নিজের একটা অসুখের প্রসঙ্গ এনে বললেন: "যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, স্বর্ণপর্পটি খেতে হবে। কিন্তু জল খেতে পাবে না। বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকব। আমি রোক করলুম। আর জল খাব না। পরমহংস! আমি তো পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস! দুধ খাব।"

॥ হংস-হংসী এসেচে ॥

ঠাকুর নিজেকে নিয়ে রসিকতা তো করেছেনই, শ্রীশ্রীমাকেও ছাড়েননি। পানিহাটিতে বিখ্যাত চিড়ার মহোৎসব। প্রভু নিত্যানন্দের আদেশে রঘুনাথ গোস্বামীর সময় থেকে চলে আসছে। ঠাকুর সেই মেলায় গেলেন। সঙ্গে অনেক ভক্ত। নাচ ও নামসঙ্কীর্তন হলো খুব। ঠাকুর আবার সদলে ক্লান্ত শরীরে ও প্রফুল্ল মনে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই উৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের যাবার হয়তো ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠাকুর তাঁকে সঙ্গে নেননি। কেন? কারণটা জানালেন ফিরে এসে। একজন মহিলা ভক্তকে বললেন: "অত ভিড়, আর ভাবসমাধির জন্যে আমাকে সকলে লক্ষ্য করছিল। ও [শ্রীশ্রীমা] সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত—'হংস-হংসী এসেচে'!"

॥ ফরে ফক্ট, ফরে ফক্ট... ॥

অধরচন্দ্রের বাড়িতে একদিন খুব নাচগান হলো। তারপর ডাক পড়ল আহারের। সবাই বসলেন, শুধু মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ দুই ভাই দাঁড়িয়ে রইলেন। অধরচন্দ্র সোনার বেনে আর তাঁরা মুখুজ্জে—এ বাড়িতে খান কি করে! ব্যাপারটা ঠাকুর বুঝতে পেরে তাঁদের এই ঠুনকো জাত্যভিমানে একটা মোলায়েম খোঁচা দিয়ে বললেন: "এঁরা সবই করছেন শুধু এইটেতেই সঙ্কোচ।" বলেই তাঁদের শোনালেন—

"ফরে ফক্ট, ফরে ফক্ট, ফক্ট ফক্ট ফরে ফরে।
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে॥"

আমাদের সমাজে গৃহবধূরা স্বামী বা শ্বশুর-ভাসুরের নাম ধরেন না। কিন্তু কাজ চালাবার জন্য তাঁদের নামের প্রথম বর্ণটা সুবিধামত বদলে নেন। (এখন অবশ্য শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজে এ-প্রথা উঠে যাচ্ছে।) এখন হয়েছে কী, এক বধূর শ্বশুর-ভাসুরের নাম ছিল 'হরি' ও 'কৃষ্ণ'। কিন্তু বধূটি ভগবানের নাম করেন কি করে? তাই ভগবানের এই নতুন নামকরণ।

॥ 'হাতি' বলতে গিয়ে 'হা—' ॥

শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ঠাকুর বললেন, সচ্চিদানন্দে লয় হয়ে গেলে আর কথা বলা যায় না। তখন এই সত্তাটা তাতেই লীন হয়ে যায়। ব্যাপারটা বোঝাতে তিনি একটা উদাহরণ দিলেন: "যেমন ধর কীর্তন গাইছে—'নিতাই আমার মাতা (মত্ত) হাতি।' যখন প্রথম গান ধরেছে তখন গানের কথা সুর তাল মান লয় সকল দিকেই মন রেখে ঠিক করেই গাইছে। তারপর সেই গানের ভাবে মন একটু লয় হয়েছে তখন কেবল বলছে—'মাতা হাতি, মাতা হাতি।' পরে যেই আরও মন ভাবে লয় হলো অমনি খালি বলছে—'হাতি হাতি'। আর যেই মন আরও ভাবে লয় হলো অমনি 'হাতি' বলতে গিয়ে 'হা—' বলেই হাঁ করে রইল।"

॥ পঞ্চদশী-টশী পড়েছ? ॥

মাঝে মাঝে এসে ঠাকুরকে কেউ কেউ খুব জ্বালাতন করতেন, এমন ভাব দেখাতেন যেন শাস্ত্রবিশারদ্ মহাপণ্ডিত। শরতের (স্বামী সারদানন্দ) সঙ্গে তাঁর বন্ধু বৈকুণ্ঠ (সান্যাল) একদিন ঠাকুরের কাছে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন: "পঞ্চদশী-টশী পড়েছ?" বৈকুণ্ঠ তো অবাক। এ আবার কী প্রশ্ন! বললেন: "সে কার নাম মহাশয়? আমি জানি না।" ঠাকুর শুনে বললেন: "বাঁচলুম! কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐসব পড়ে আসে। কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জ্বালায়।"

॥ পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না ॥

ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে অনেকেই ঠাকুরকে প্রশ্ন করতেন। ঠাকুর পরিষ্কার বলতেন, শাস্ত্রচর্চা ও কামিনীকাঞ্চন-চর্চা একসঙ্গে চালালে কি ঈশ্বরলাভ হয়? নির্ভেজাল ভক্তি চাই আর আন্তরিক ত্যাগ চাই। শুধু শাস্ত্র পড়লেও পণ্ডিত হবে—কাঠ-পণ্ডিত! ভিতরে কিছু নেই, একেবারে খটখটে। ঠাকুর উপমা দিলেন: "পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল। কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। এক ফোঁটাই পড়—কিন্তু এক ফোঁটাও পড়ে না!"

॥ গোলমালে 'মাল' আছে ॥

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন। গাড়িতে ওঠার সময় তিনি ঈশানচন্দ্রকে আবার কিছু উপদেশ দিলেন। বললেন: সংসারের সবটাই অনিত্য নয়। এতে নিত্যও আছে, অনিত্যও আছে। তাই সংসার থেকেও নেবার জিনিস আছে। তাঁর কথা—"গোলমালে 'মাল' আছে, 'গোল' ছেড়ে 'মাল'টি নেবে।"

॥ কি বলে গো! ॥

ঠাকুর অসুস্থ। কলকাতার শ্যামপুকুরের বাড়িতে আছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা করছেন। ডাক্তার বললেন: "কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল। ঘুংড়ি-কাশি (whooping cough)। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি নাই। শেষে জানতে পারলাম, গাধা ভিজেছিল, যে-গাধার দুধ মেয়েটি খেত।" শুনে ঠাকুর বললেন: "কি বলে গো! তেঁতুলতলায় আমার গাড়ি গিছিল, তাই আমার অম্বল হয়েছে!"

॥ কিন্তু আমি ছাড়ছি না ॥

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের প্রতি একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করতেন। অসুস্থ ঠাকুরকে দেখতে গিয়ে ওঠার কথা তাঁর মনে থাকত না, অন্য রোগীদের দেখার কথাও ভুলে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঠাকুরের কাছে কাটাতেন। ঠাকুরের মধুর আকর্ষণে যে একবার পড়েছে সে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই আকর্ষণের ব্যাপারটা বোঝাতে ঠাকুর যা বললেন তার তুলনা নেই: "ছেলে বলেছিল, 'বাবা, একটু (মদ) চেখে দেখ। তারপর আমায় ছাড়তে বল তো ছাড়া যাবে।' বাবা খেয়ে বললেন, 'তুমি বাছা, ছাড় আপত্তি নেই, কিন্তু আমি ছাড়ছি না'।"

এমন অমূল্য রসিকতার পরিচয় ঠাকুরের কথায় প্রচুর। ভক্তরা সেইসব রত্ন বিনামূল্যে সংগ্রহ করতেন। সিদ্ধ-সাধকের সঙ্গে সিদ্ধ-রসিকের অপূর্ব 'রাজযোটক মিল' ঘটেছিল তাঁর পরম রমণীয় সত্তায়।□

যুবভাবনা

এই বিভাগে কুড়ি থেকে তিরিশ বছর বয়স্ক যুবক-যুবতীদের রচনা প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক উদ্বোধন

বসন্ত

অনসূয়া হালদার

"বসন্ত সমাগত রে!" প্রকৃতির দুয়ারে বসন্ত সমাগত। আকাশের অনন্ত নীলে তার বার্তা, নীলমণি লতার গভীর নীলে তারই পদধ্বনি। দিগন্তের বনশ্রেণী তার প্রগাঢ় সবুজে সেই ঋতু উৎসবের অভ্যর্থনায় মগ্ন। কিন্তু বসন্তের গভীর বাণী কি শুধু এইটুকুই? ফুলে ফুলে, রঙে রঙে, দখিন হাওয়ার কানাকানিতে ঋতুরাজ কি শুধু সুখের উচ্ছ্বসিত ঝরনা ঝঙ্কৃত করে ফেরে? না, শুধুমাত্র এইটুকু নয়, এইটুকুতে যে কোন পূর্ণতা নেই! বসন্তের মাঝে ধ্বনিত আরেক গভীরতর, গম্ভীরতর বাণী। সে-বাণী চিরকাল মানবাত্মার অন্তরদ্বারে ডাক দিয়ে ফিরেছে। সে-ডাক অজান্তে মানবের রক্তে দিয়েছে দোলা, প্রাণকে করেছে চঞ্চল, মনকে করেছে অস্থির।

বসন্তের সেই বাসন্তিক আহ্বান হলো যুদ্ধের আহ্বান। কেউ তা শুনেছে, কেউ বা শোনেনি। যে শুনেছে সে আপন বুকের রক্তে রক্তপলাশ ফুটিয়ে বসন্তকে করেছে নিবেদন। আজ আবার সেই আনন্দরূপ বসন্ত আগত। মন-প্রাণ ঋতু-উৎসবের বহিরাঙিনায় ফাগখেলা নিয়ে চায় মেতে উঠতে। কিন্তু আজ শুধু খেলা নয়, নয় শুধু সুখমিলন। বাসন্তী পূর্ণিমার ভরা রাতে সুগন্ধি আঁধারে কান পেতে বসন্তের সেই শাশ্বত আহ্বান, সেই অশ্রুত সুরলহরী শুনে নিতে হবে। তার গোপন বার্তা যে ঐ বনপুলকের সৌরভের মতো চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত! হৃদয় পাতলেই সেই সুরতরঙ্গ মনের গহনে বেজে ওঠে। বসন্তের অন্তরতম, গোপনতম আহ্বান হলো বৈরাগ্যের আহ্বান, ত্যাগের আহ্বান, জীর্ণ জরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। অসত্যের গ্লানি, মৃত্যুর অন্ধকার এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সে-আহ্বান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বসন্তের মাঝেও যে চলেছে এই সংগ্রাম। তাই তো তার পলাশ শিমুল রক্তকিংশুক অমন লালে লাল, অমন রক্তবরন। বসন্তের সমস্ত ফুলই আবার গৈরিক বর্ণে আঁকা। গৈরিক রঙ দিয়ে বসন্ত যেন সংগোপনে রুদ্রেরই আরাধনা করে চলেছে। সে-আরাধনা মধুর নয়, তা সমুদ্যত বজ্রের ন্যায় কঠিন। আপনাকে আহুতি দিয়েই সে-বন্দনার যজ্ঞানল জ্বলে ওঠে। অজস্র ফুল ঝরিয়ে, মঞ্জরীদলকে লুটিয়ে ফেলে আপনাকে একেবারে নিঃশেষ করে নটরাজ রুদ্র ভৈরবকে মর্ত্যে নামিয়ে আনে বসন্ত। বসন্তোৎসবের সুললিত ছন্দমধুর নৃত্যের তালে প্রচ্ছন্ন থাকে শঙ্করের তাণ্ডব ঝঙ্কার। এই তো বসন্তের সাধনা, এই তার প্রাণের তপস্যা। তাই তো তারপর সমস্ত মালিন্যকে ধ্বংস করে, দিগ্‌বিদিক্ দহন করে আবির্ভূত হন রুদ্র সন্ন্যাসী গ্রীষ্ম। বসন্ত তাই শুধুমাত্র সুখের ঋতু নয়, তার মাঝে ঢাকা আছে এক ভীষণ আগ্নেয় প্রতীক্ষা।

আজ সেই বসন্ত দুয়ারে আবির্ভূত। কিন্তু মানবকে আজ তার অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হতে হবে নবরূপে। ঋতু-সংহারের দিন আর নেই। শিমুল পলাশের আগ্নেয় বর্ণের অগ্নিমন্ত্র হবে আজ বসন্ত-ভাবনার মূল তান। মহাতমসা চতুর্দিকে সমাচ্ছন্ন। বসন্ত যে মরণের ডাক দিয়েছে তাতে সাড়া দিয়ে ভেঙে ফেলতে হবে এই অন্ধকারের কারাগার। শুধু ফাগ নয়, শুধু ফুল নিয়ে খেলা নয়—রক্তের হোলিখেলা হোক আজ। ত্র্যম্বকের তাণ্ডবনৃত্যে যোগ দিতে হবে সকলকে। বসন্তোৎসবে আজ মরণ-খেলায় মাতুক সকলে। চরম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানব উপলব্ধি করুক বসন্তকে, চিনে নিক আপনার মৃত্যুহীন প্রাণকে। মরণের মধ্য দিয়ে অমৃতত্বলাভের সেই উদাত্ত আহ্বান আজ অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত। তাই আজ আর বৃথা ভোগ নয়, বৃথা কামনার উৎসব নয়। নিভে যাক বাসনার দীপ। মরণের আঁধার থেকে অমৃতের আলোক-বার্তা জয় করে নিয়ে আসুক মানব। সেই হবে সত্যকার বসন্তোৎসব। তাই এবার বসন্তোৎসব হোক যুদ্ধক্ষেত্র। অজ্ঞানতা, অচেতনতা, জড়তার সঙ্গে সংগ্রাম করে এই ফাল্গুনে সার্থক মৃত্যুবরণ করুক মানব, জয় করে নিক অমৃতের অধিকার।

বসন্তের সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি আহ্বান করেছিলেন যৌবনশক্তিকে, বসন্তের জাতক শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্নিতনয় সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বিবেকানন্দ আজ হোন মানবের আদর্শ। এই ফাল্গুন উৎসবে তিনিই প্রধান পুরোহিত। কারণ, বসন্তের যজ্ঞবেদিতে সংগ্রামের হোমানল তিনিই যে সর্বপ্রথম প্রজ্বলিত করেছিলেন। তাঁর সেই অতিগম্ভীর 'অভীঃ' মন্ত্র বসন্তের গোপন মর্মে ধ্বনিত। তাই নব বসন্তের হাতে আজ গৈরিক পতাকা। তার যুদ্ধের শঙ্খধ্বনি শুনে ঘর ছেড়ে পথে নামতে হবে সকলকে। কারণ, উপভোগের জন্য জীবন নয়। আজ এক নবতর

যাত্রার জন্য এসেছে আহ্বান। এবারের দখিনা হাওয়ায় তারই মন্ত্রধ্বনি গুঞ্জরিত। আবিরখেলায় নয়, মৃত্যুস্নানে আজ শুচি হতে হবে। বসন্তের ফুলে ফুলে তাই মৃত্যুযজ্ঞের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে। মরণের প্রজ্বলিত অগ্নিতে আপনাকে নিঃশেষে আহুতি দেবার দিন এল আজ। ঐ বকুল, পারুল, পিয়ালের মতো আপনাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে শূন্য হতে হবে, তবেই না জীবনে রুদ্র ভৈরবের করুণা হবে। তাঁর তাণ্ডবনৃত্যের যোগ্য বেদিকা হবে এই দেহ! সেই নবতর অঙ্গীকারের দিন এল আজ। বসন্তোৎসবে এবার প্রাণ দেবার পণ করতে হবে, তবেই না প্রখরতর গ্রীষ্মের মতো সত্যের জ্যোতি জীবনে প্রকাশিত হবে।★ □

★ লেখিকা বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর বাঙলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী।—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট দেবীর মূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য]। মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে এটি চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান : হৃদয়, চক্র : অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দূর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"

—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ডাঃ বসন্ত মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ক্লিনিক্ট শিল্পিগোষ্ঠী

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

প্রবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'কথামৃতে'র কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র

নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

'কথামৃত' মহাগ্রন্থ যেন একটা জীবন্ত চিত্রশালা। কত মানুষ জ্ঞানি-গুণী, শিল্পি-বাদ্যকর, নট-নাট্যকার, কবি, লেখক, মনীষীরা রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে 'কথামৃত' গ্রন্থের পাতায় পাতায়। তাঁদের মধ্যে অনেককে শ্রীম দেখেছেন, অনেককে খুঁজে পেয়েছেন ঠাকুরের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। শ্রীম সেখানে শুধু শ্রুতিলেখক। নিপুণ শিল্পীর মতো কখনো ঠাকুর যেন তুলির দু-একটা আঁচড়েই এক-একটা মূর্তি হঠাৎ গড়ে তুলেছেন, আবার অনেক সময় দ্রষ্টা থেকে স্রষ্টা হয়েছেন শ্রীম-ই।

অবশ্যই সব চরিত্র 'কথামৃত' গ্রন্থে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়—কেউ আছেন লীলাসহচর হিসাবে, কেউ প্রখ্যাত ব্যক্তি, অনেকে আবার অতি সাধারণ ভক্ত বা কৌতূহলী দর্শক। 'কথামৃত' গ্রন্থে বারবার কারো আবির্ভাব ঘটেছে, কেউ আবার হঠাৎ এসে হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছেন।

আমরা কতগুলো অপ্রধান চরিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি—তাঁরা বিখ্যাত নন, তাঁদের গুরুত্বও তেমন নেই। অথচ স্বল্প পরিসরেই তাঁরা কিছু কিছু ছাপ রেখে গিয়েছেন। একবার-দুবার পাদপ্রদীপের আলোয় এলেও তাঁদের যেন ভোলা যায় না—সেটা দোষের জন্য হোক, আর গুণের জন্যই হোক।

প্রথমেই কিছু ব্যক্তির কথা বলি, শ্রীম যাঁদের দেখেননি—ঠাকুরের স্মৃতিচারণায় প্রসঙ্গতঃ তাঁদের কথা দু-একবার এসে পড়েছে।

কৃষ্ণকিশোরের কথা ধরা যাক। তিনি ছিলেন পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু কী বিশ্বাস তাঁর! বৃন্দাবনে বেড়ানোর সময় তাঁর জলতৃষ্ণা পেয়েছে। কুয়োর কাছে গিয়ে দেখেন, একজন লোক দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, সে হীন জাত—মুচি। কৃষ্ণকিশোর বললেন : "তুই বল 'শিব'! নে, এখন জল তুলে দে।" (১।২।৬) আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি, কিন্তু কী উদার আর কী ভক্তি!

ঠাকুর বলেছেন : "কৃষ্ণকিশোর জ্ঞানীদের মতো বলত, আমি 'খ' অর্থাৎ আকাশবৎ। তা, সে পরম ভক্ত, তাঁর মুখে ও-কথা বরং সাজে...।" (১।৭।১)

আবার রতির মায়ের কথা মনে করা যাক। তিনি ছিলেন বৈষ্ণবচরণের দলের লোক, গোঁড়া বৈষ্ণবী। ঠাকুর বলেছেন : "এখানে খুব আসা-যাওয়া করত। ভক্তি দ্যাখে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালাল!" (৪।১৫।১) আরেকজন হলো শালগ্রামের ভাই। "বিরাশি রকম আসন জানত, আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলত! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট পড়েছিল। টাকার লোভে সে টপ করে খেয়ে ফেলেছে...। নোট আদায় হলো। শেষে তিন বৎসর মেয়াদ (জেল)।" (৩।৬।২)

চমৎকার এক চরিত্র জয়গোপাল। ঠাকুর বলেছেন : "গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙা লণ্ঠন, ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া,... হাসপাতাল-ফেরত দ্বারবান; আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" (৩।৮।২) সামান্য একটু তুলির টানে এক কৃপণ ধনীর চরিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনায়াসে মানুষের রূপ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে ঠাকুরের জুড়ি মেলে না। জয়গোপাল সেনই তার প্রমাণ।

এক পলকের জন্য অন্য একজনকে দেখুন—"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গেছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধ হয়, হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি—আছ কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম : 'ওরে হৃদে, এলোকটার টাকা হয়েছে ...।' " (১।৪।৬) গরিব বিনয়ী ব্যক্তির অর্থপ্রাপ্তির ফলে স্বরগ্রামের পরিবর্তন ও ভঙ্গি বদলের যে-রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তা অত্যন্ত উপভোগ্য। এই ব্রাহ্মণের মধ্যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকেই যেন আমরা খুঁজে পাই।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার পর একজন পাগল এসেছিল। কিন্তু সত্যিই কী পাগল? একটু লক্ষ্য করা যাক—"ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি—এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা-আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তারপর কালীঘরে গিয়ে স্তব করতে লাগল। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল!... অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো

খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলোকে সরিয়ে নিজে খেতে লাগল, তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল, আর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কে! তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী?' তখন সে বলেছিল, 'আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!'... ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলব! এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।' তারপর বেশ হন্‌হন্ করে চলে গেল।" (৪৷১৫৷২)

নিঃসন্দেহে 'কথামৃত' গ্রন্থের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র এই পাগল—অথচ অজ্ঞাত তাঁর নাম, তাঁর সন্ধানও আর পাওয়া যায়নি। তাঁর রহস্যময় প্রস্থানের পরেও একটা শব্দ আমাদের আবিষ্ট করে রাখে—"চুপ!"

একজন সাধুর কথা মনে পড়ছে? মাঝে মাঝে ধ্যান থেকে বাইরে এসে প্রকৃতির চারদিকে তাকিয়ে মহানন্দে বলেন: "বাঃ, বেশ করেছ!" (৪৷২১৷৫) নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ চরিত্র। ঠাকুর যেন তুলির এক টানেই এই পরম সাধকের আনন্দ-মূর্তি এঁকে দিয়েছেন। আরেকজন কিন্তু অন্য ধরনের। কলকাতা থেকে রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখের সঙ্গে একজন সাধু গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে খুশি হন। ঠাকুরের সমাধি দেখে তিনি বিস্মিত হন। তাঁকে দেখে ঠাকুর ত্যাগী বলে চিনেছিলেন। (৪৷৯৷১)

স্বল্প পরিসরে উজ্জ্বল মাড়োয়ারি লক্ষ্মীনারায়ণও। বিরাট ধনী, ঠাকুরের পরম ভক্ত। ঠাকুরকে তিনি দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তা নিতে পারেননি। লক্ষ্মীনারায়ণ মজার মানুষ, তার্কিকও। অনায়াসে টিপ্পনী কেটেছেন—"তাহলে এখনো আপনার ত্যাজ্য গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই!" ঠাকুর বলেছেন: "আমার বাপু এতদূর হয় নাই!" (৪৷২১৷৪) কাপ্তেন ঠাকুরের পরম ভক্ত, নেপালের রাজকর্মচারী। সাত্ত্বিক, নিষ্ঠাবান মানুষ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী? ঠাকুর তাঁদের বাড়ি গেলে গাড়িভাড়া নিয়ে একটু গণ্ডগোল হতো। কাপ্তেনের কাছে ঠাকুর গাড়িভাড়া চেয়েছেন। কাপ্তেন চেয়েছেন তাঁর স্ত্রীর কাছে—"সে-মাগও তেমনি, 'ক্যা হুয়া', 'ক্যা হুয়া' করতে লাগল।" (৪৷১৩৷২)

পাঁড়েও বেশ স্বাভাবিক, কিন্তু মনে রাখার মতো চরিত্র নয়। অথচ তার সমস্যাটা নিদারুণ। সে খোট্টা বুড়ো, কিন্তু বৌয়ের বয়স মাত্র চৌদ্দ। ঠাকুর বলছেন: "বুড়োর সঙ্গে তার থাকতে হয়! গোলপাতার ঘর। গোলপাতা খুলে খুলে লোকে দ্যাখে। এখন মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে।" (৪৷২২৷৩) এক্ষেত্রে পাঁড়ের একটা সংলাপও নেই, কিন্তু ঠাকুরের স্মৃতিচারণাতেই তার বিষণ্ণ রূপটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্ত্রীকে আগলাতে তার প্রাণান্তকর অবস্থা—গোলপাতার ঘরটাও বে-আব্রু হয়ে গিয়েছে। তাতেও শেষরক্ষা হয়নি, বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে গিয়েছে বৌটা। অসহায় বৃদ্ধের এই বিপর্যয় অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাদের বিষণ্ণ করে তোলে।

অথচ গোপাল সেন! বছর কুড়ির ছেলে তিনি তখন। যখন দক্ষিণেশ্বরে আসতেন, এত ভাব হতো যে হৃদয়কে ধরতে হতো—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যায়। একদিন তিনি হঠাৎ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে বলছেন: "আর আমি আসতে পারব না—তবে আমি চললুম।" কিছুদিন পরেই তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। ঠাকুর বলেছেন: "যদি ঈশ্বরে দর্শন হয়ে কেউ শরীর ত্যাগ করে, তাকে আত্মহত্যা বলে না। সে-শরীর ত্যাগে দোষ নাই।" (১৷৪৷১) কিশোর বয়সের এই বাক্‌সিদ্ধ সাধকের কথা মনে পড়লেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।

শম্ভু মল্লিকও নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। ঠাকুরের সেবার জন্য তিনি ছিলেন উন্মুখ। তিনি ছিলেন ঠাকুরের দ্বিতীয় 'রসদদার'। (৪৷৩১৷২) ঠাকুর কিছু চাননি বলেই তিনি তাঁর সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। কিন্তু হৃদয় যখন টাকা চেয়েছে তখন তাঁর অন্য মূর্তি। তখন তাঁর যুক্তি—"তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হোক কিছু রোজগার করছ। তবে খুব গরিব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া, পঙ্গু; এদের দিলে কাজ হয়।" (৩৷৮৷২)

হনুমান সিংও ঠাকুর-অন্তপ্রাণ। পাঞ্জাবী কুস্তিগীর এসেছে—বিশালবপু। পনের দিন ধরে সে মাংস-দুধ খেয়েছে। কিন্তু হনুমান সিং ঠাকুরের নাম নিয়েছে আর স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে। কুস্তিতে সে-ই জিতল।

এমন কত চরিত্রই ঠাকুরের জবানীতে বর্ণময় হয়ে উঠেছে। ঠাকুরকে হতাশ করেছে বেশ কিছু মানুষ—তার মধ্যে বড়ও ছিলেন, ছোটও। এক ডেপুটি ধর্মীয় নাটক দেখতে গিয়েছেন ছোট ছেলেকে নিয়ে। নাটক দেখবেন কি, শুধু ছেলের সঙ্গে কথা। একটুও নাটক দেখলেন না। জানা গেল—একেবারে স্ত্রৈণ, স্ত্রী ওঠায় বসায়। সুতরাং ঈশ্বরে মন দেবে কি? (৩৷১৪৷৪)

তেমনি ঠাকুর হতাশ হয়েছেন বাল্যসখা শ্রীরাম

মল্লিককে নিয়েও। ছেলেবেলায় এত ভাব ছিল, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে ছুঁতেই পারলেন না। ছেলেপুলে হয়নি, ভাইপোকে বড় করেছিলেন। সেও মারা গেছে। সে-শোকে অস্থির—"একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে!... দেখলাম তাতে আর কিছু নাই।" (৩।১৭।২)

শ্রীম-র দেখা কিছু অপ্রধান চরিত্রও মনে রাখার মতো। কতরকম মানুষ এসেছেন ঠাকুরের কাছে—অদ্ভুত পর্যবেক্ষণক্ষমতার ফলে শ্রীম অনায়াসেই সেই চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছেন। 'শোকাতুরা' ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা মৃত্যুবরণ করলে তিনি দুঃখে ভেঙে পড়েন এবং সান্ত্বনার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যান। ঠাকুর তাঁকে সময়োচিত উপদেশাদি দেন এবং একদিন তাঁর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সত্যিই যেদিন তিনি গিয়েছেন, ব্রাহ্মণীর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল? "ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন, 'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না, গো! তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে করে আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো! ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই।... যাই, সকলকে বলি—আয়রে, আমার সুখ দেখে যা! যাই, যোগীনকে বলি গে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!'" (৩।১৯।১) শোকার্তা জননী নিজ গৃহে ঠাকুরকে দেখে সব শোক ভুলে আনন্দ-বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। এক অবিশ্বাস্য মুহূর্তে ভক্তিব্যাকুল এই নারী 'কথামৃত' গ্রন্থে অসাধারণ হয়ে উঠেছেন যেন।

আবার কাটোয়ার ট্যারা বৈষ্ণবের কথা মনে করুন। ঠাকুরের কাছে ভক্তি-ভাব চাইতে পারতেন, কিন্তু শুধু প্রশ্ন, তর্ক, প্রমাণ নিয়েই তাঁর কারবার। প্রশ্ন তুলেছেন—জন্মান্তর আছে? ঠাকুর বলেছেন, আছে। তাছাড়া মৃত্যুকালে মানুষ যা চিন্তা করে, সেই ভাব নিয়ে আবার জন্মায়। হরিণের কথা চিন্তা করেই ভরত রাজার হরিণজন্ম হয়েছিল। বৈষ্ণব আবার বলেছেন: "এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে তো বিশ্বাস হয়।" বিরক্ত হয়ে ঠাকুর (তখন অসুস্থ) বলেছেন: "তা জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!" (৪।২৬।২)

আরেক সাধকের কথা মনে করা যাক—"দেখিলে বোধ হয় ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে।" তিনি অনেক জ্ঞান-বিতর্কের কথা বলেছেন। একসময় ঠাকুর বলেছেন, শুধু শাস্ত্র আউড়ে লাভ নেই—সাধনা দরকার। তা না হলে শাস্ত্রের অর্থ বোঝা যায় না। দুধে মাখন আছে—এটা বললেই হবে না, মাখন তোলা দরকার।

সাধক বলেছেন: "মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন?"

কী অদ্ভুত, অভদ্র প্রশ্ন! ঠাকুর বলেছেন: "আমি কি করেছি আর না করেছি—সে-কথা থাক।" কিছুক্ষণ পরে সাধক রেগে গিয়ে বলছেন: "আপনি তাঁকে যদি জানতে পেরেছেন বলুন—প্রত্যক্ষই হোক, আর অনুভবেই হোক। ইচ্ছা হয় পারেন বলুন, না হয় না বলুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলেছেন: "কি বলব! কেবল আভাস বলা যায়।" সাধকের এবারের মন্তব্যটা লক্ষ্য করা যাক—"তাই বলুন!"(৪।১৯।২)

আবার সংসারী মানুষও কত রকম!

ঠাকুর গিয়েছেন দেবেন্দ্র-ভবনে। তাঁকে দেখার জন্য পাড়ার একজন আগেভাগেই এসেছিলেন। গরম বোধ হওয়াতে মাদুর পেতে ঘুম দিয়েছেন তিনি। ঠাকুর এলেন। কত কথা হলো, গান হলো। দেবেন্দ্র ঠাকুরকে বিদায় দিয়ে এসে ঘুমন্ত মানুষটাকে তুলতেই তিনি বলে উঠলেন: "পরমহংসদেব কি এসেছেন?" (৩।১০।৪)

শ্রীম-র বন্ধু হরিবাবু কিন্তু অন্য ধরনের। চাকরি-বাকরি করতেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সারাদিন বাড়ির অন্যদের সাহায্য করতেন, ঈশ্বরচিন্তা কিন্তু তখনো আসেনি। ঠাকুর তখন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন "কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর"-এর কথা। (৩।৫।১) আবার কৃষ্ণধন নামক রসিক ব্রাহ্মণ রসিকতা নিয়েই থাকতেন। সব কিছুতেই তাঁর ছিল মজা। ঠাকুর তাঁকে বলেছেন: "ও সামান্য রসিকতা ছেড়ে ঈশ্বরের পথে এগিয়ে পড়।" কৃষ্ণধন তাতেও যেন গুরুত্ব দেননি, বলেছেন: "এপথের শেষ নাই!" সেই সঙ্গে ছিল তাঁর দায়িত্ব-স্খালন—"আপনি টেনে নিন।" (৪।২৩।২)

ঠাকুরদাদা আবার অন্যরকম। ভাল গাইতেন, বৈরাগ্য নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন। সাধন-ভজন করতেন, কিন্তু সহজভাবে বলেছেন—ঈশ্বরকে ডেকে মাঝে মাঝে ভাল থাকেন, আবার অশান্তিও হয়। ঠাকুর বলেছেন: "বুঝেছি, ঠিক পড়ছে না। কারিগর দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয়—তাহলে হয়। একটু কোথায় আটকে আছে।" কিন্তু তাঁর একটা গান ঠাকুর দুবার শুনেছেন অল্প সময়ের ব্যবধানে। ভরসা দিয়ে বলেছেন: "তোমার

ভিতর থেকে এমন গান ভাল লাগছে—আবার কি!" (৪।১২।২)

রাখালের বাবা ও দ্বিজের বাবা কেউই চান না তাঁদের ছেলে বৈরাগ্য নিক। দক্ষিণেশ্বরে তারা যাতায়াত করায় তাঁদের আপত্তি ছিল। রাখালের বাবাকে ঠাকুর বুঝিয়েছেন—ওরা নিত্যসিদ্ধের থাক। ওরা ঈশ্বরজ্ঞান নিয়েই জন্মেছে। কিন্তু তারপরেই—"আহা, রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে নাই বা কেন? ওল যদি ভাল হয়, তার মুখীটিও ভাল হয়। (সকলের হাস্য)। যেমন বাপ, তার তেমনি ছেলে।" (২।২।৬) বলা বাহুল্য, রাখালের বাবা নরম হয়ে গিয়েছেন। দ্বিজর বাবাকেও ঠাকুর এমনি করেই বশীভূত করেছেন—"আপনি যে এদের বকেন-টকেন, তার মানে বুঝেছি। আপনি ভয় দেখান।" অর্থাৎ রাগটা সত্যি নয়। দ্বিজর বাবার প্রতিক্রিয়া—"দ্বিজর পিতা হাসিতেছেন।" (৪।২৪।১)

জ্ঞানবাবু উচ্চশিক্ষিত, *কিন্তু বিনয়ী। ঠাকুর তাঁকে* দেখে বলেছেন: "কি গো, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!" জ্ঞানবাবু সহাস্যে উত্তর দিয়েছেন: "আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।" এক লহমায় শিক্ষিত, রসিক ও বিনয়ী মানুষটাকে চিনে নেওয়া যায়। (৪।১৯।১)

বলরাম বসুর দাদা হরিবল্লভ বসুর পরিবর্তন এসেছে অন্যভাবে। বলরাম বসু ঠাকুরের কাছে যান—বিশেষতঃ মেয়েদের নিয়ে, এটা তাঁর অপছন্দ ছিল। কিন্তু শ্যামপুকুরে ঠাকুরকে দেখে তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করেছেন। ঠাকুর তাঁকে আবার আসতে বলায় তিনি বলেছেন: "আজ্ঞা, আমাদের টানেই আসব, আপনি বলছেন কেন?" ঠাকুর তখন খোঁচা দিয়েছেন: "বলরাম অনেক দুঃখ করে। আমি মনে করলাম, একদিন যাই—গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করি। তা আবার ভয় হয়! পাছে তোমরা বল, একে কে আনলে!" বিব্রত হরিবল্লভ বলেছেন: "ওসব কথা কে বলেছে? আপনি কিছু ভাববেন না।" (৪।৩০।১) পরে দেখছি—"হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদুরের নিচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন।" ঠাকুর তাঁকে বলেছেন: "তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।" (৩।২২।২)

বিদ্যাসুন্দরের নায়কের কথা মনে করা যাক। ঠাকুর তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। তারপর প্রশ্ন করে জেনেছেন—তাঁর একটা কন্যা মারা গিয়েছে। আবার একটা হয়েছে। ঠাকুর বললেন: "এর মধ্যে হলো, গেল। তোমার এই কম বয়স। বলে—'সাঁজ-সকালে ভাতার মলো, কাঁদব কত রাত'?" বিব্রত নায়ক তারপর শান্তভাবে কথা শুনেছেন, প্রশ্ন করেছেন, মেনে নিয়েছেন সব উপদেশ। ঠাকুর আবার আসতে বলায় তিনি বলেছেন: "আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব, সে তো আমাদের ভাগ্য।" (৫।১৫।১)

ঠাকুর একটা ছেলের কথা বলেছেন: "এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা জামাপরা। চলবার যে ঢং। প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খুলে দেয়—আবার এদিক-ওদিক চায়, কেউ দেখছে কিনা। চলবার সময় কাঁকাল ভাঙা।" (৩।২০।৫) চালিয়াত এক নব্য যুবকের নিখুঁত বর্ণনা। আরেকটা ছেলেকে তিনি দেখেছিলেন কাপ্তেনের বাড়ি যাবার সময়—"উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, বাঁকা সিঁতে কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে!" (৩।১৭।১)

আবার ভণ্ডও আছে। গেরুয়া-পরা একজন এসে *প্রণাম করেছেন, কিন্তু আড়ালে ঠাকুরের নিন্দা করেন।* বলরাম তাই হেসে ফেলায় ঠাকুর বললেন: "তা হোক, বলুক গে ভণ্ড।" (৪।২৩।২)

দু-একটা নারীচরিত্র দেখা যাক। এত বড় মানুষ কেশবচন্দ্র, তাঁর মা কিন্তু চিরন্তনী মা। কেশবচন্দ্রের শেষ অসুখের সময় তাঁর মা আড়াল থেকে কেশবের জন্য ঠাকুরের আশীর্বাদ চেয়েছেন। সেই যুগে ঠাকুরের সামনে আসার ব্যাপারে তাঁর দ্বিধা ছিল, কিন্তু উমানাথের মাধ্যমে দুবার ঠাকুরের অভয় প্রার্থনা করেছেন তিনি। (২।১০।৫) আর ঝি ভগবতী? যৌবনে স্বভাব ভাল ছিল না, অথচ ঠাকুর সহজভাবে গল্প করায় হঠাৎ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছেন। ঠাকুর তাতে বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা অনুভব করায় ভগবতী লজ্জায় অধোবদনে রয়েছেন অনেকক্ষণ। ঠাকুর তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন। (২।৬।৪) মন ছুঁয়ে যায় বিশ্বম্ভরের সাত বছরের কন্যাটি। ঠাকুরকে সে বলেছে: "আমি তোমায় নমস্কার করলাম, দেখলে না?" ঠাকুর দেখেননি। সে তখন বলেছে: "তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি। দাঁড়াও, এ পা-টা করি।" ঠাকুর গান গাইতে বলায় উত্তর দিয়েছে: "মাইরি, গান জানি না।" ঠাকুর তখন তাকে গান শুনিয়েছেন—"আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দিই, তোর ভাতার এলে বলবে কি!" (৪।১৫।২) গান শুনে হেসেছেন সবাই, মেয়েটিও যোগ দিয়েছে তাতে।

কিন্তু বৃন্দে ঝি? তার ভাষায়—"সব ওঁর মুখে!"

ঠাকুরের ঘরে সে কাজ করেছে অনেক দিন, কিন্তু খাবার দিতে দেরি হলেই অনর্থ বাধাত। 'কথামৃত'-এ আছে—বৃন্দে রামলালকে বলেছে ঠাকুরের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু সেইসঙ্গে আসল কথাটা—"আমার খাবার তারপরে দিও।" ঠাকুর সেই কথা শুনেই প্রশ্ন করেছেন ঃ "বৃন্দেকে খাবার এখনো দেয় নাই ?" (২।২।৬)

পাগলী কিন্তু ধন্য। কাশীপুরে ঠাকুর যখন শয্যাশায়ী, পাগলী বারবার তাঁকে দেখতে এসেছে। ভক্তেরা প্রহারও করেছে, "কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না।" (৩।২৬।২) এক ঝলকেই এক পরম অনুরাগিণীকে দেখা গেল যেন।

এমন কত ধরনের কত মানুষের কথাই 'কথামৃত' গ্রন্থে আছে। দু-এক ঝলকে দেখা দিয়ে তাঁরা হারিয়ে গিয়েছেন—কারো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, অনেকেই আবার অনুল্লেখ্য ব্যক্তি। তাঁদের সকলকেই যে ঠাকুর সমানভাবে নিয়েছেন, তাও নয়। ডাক্তার সরকারের বন্ধু অধ্যাপক নীলমণির কথা মনে করুন। সুবিত্ত মানুষ হলেও সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন বিনয়ী ও ধার্মিক। একটা সংলাপও তাঁর নেই, কিন্তু "ঠাকুর তাঁহার মান রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, 'আজ আমার খুব দিন'।" (৩।২২।২) অথচ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে একজন চশমা-পরা বন্ধু গিয়েছেন। তিনি চলে যাবার পর ঠাকুর বলেছেন ঃ "তোমাকে আর হরে প্যালাকে বলি, জোর করে কারুকে নিয়ে এসো না—সময় না হলে হয় না।" সেই সময় একজন ভক্ত প্রণাম করলেন, তাঁরও সঙ্গে একটা ছেলে। ঠাকুর তাঁকেও বলেছেন ঃ "তবে তুমি এসো, আবার উটি সঙ্গে।" (৪।২৩।৬) একদিন একটা ছয়-সাত বছরের ছেলে এসেছিল। ঠাকুরের তখন বালকের অবস্থা—জিলিপির চেঙারিটা লুকোচ্ছেন। ক্রমে তিনি সেটা একদিকে সরিয়ে দিলেন। আবার "বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।" (৪।১।১)

কলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছেন, স্বভাব তেমন ভাল নয়। ঠাকুর নানা কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা খাবার পর তাঁর মন্তব্য ঃ "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" (৩।৬।২) অথচ ঠাকুরবাড়ির রাঁধুনী-পরিচারকরা কীর্তন করছেন—তাদের কেউ মদ্যপ, কেউ কুস্থানে যায় ; কিন্তু ঠাকুর গান শুনেছেন, বলেছেন ঃ "আমি মনে করলাম, তোমাদের সঙ্গে নাচব। গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন-টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্যন্ত। আমি আর কি দিয়ে সম্বরা করব।" তাঁরা প্রণাম করেছেন, তিনিও আশীর্বাদ দিয়েছেন। (৪।২০।৭)

এদের কাউকেই শ্রীম অবজ্ঞা করেননি। সবাইকে স্থান দিয়েছেন তাঁর মহাগ্রন্থে।☐

☐ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ☐

মদালসা

কথা ঃ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ☐ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত।



মদালসার পরপর আরও দুটি ছেলের বেলাও একই কাণ্ড হলো দেখে রাজা ঋতধ্বজ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। সব ছেলেগুলিই যদি এভাবে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তো পরে রাজ্য চালাবে কে?

অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন তিনি মদালসাকে বললেন ঃ "এর পর তোমার যে-ছেলে হবে, তাকে সংসারধর্ম শিখিয়ে দিও। সংসারে থেকে যেভাবে জ্ঞানলাভ করতে হয়, তাই তাকে শেখাবে।"





স্বামীর কথামত চতুর্থ পুত্র অলর্কের বেলা মদালসা তাই করলেন। মাতার শিক্ষাগুণে বড় হয়ে অলর্ক খুব ধার্মিক হয়েছিল, রাজকার্যও পরিচালনা করত খুব দক্ষতার সঙ্গে। বহু বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল অলর্ক। [সমাপ্ত]☐

[পরের সংখ্যা থেকে 'শিবিরাজার উপাখ্যান' ☐কথা ঃ ভগিনী নিবেদিতা।]

বিশেষ নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ আধুনিক ভারত ঃ সত্যযুগ

সুমণি মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ মাঘ ১৪০২ সংখ্যার পর]

এই চলমান কারখানার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী ও নিয়মাবলী স্বামীজী স্বয়ং প্রস্তুত করে গেছেন— "এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ঃ মানবকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত ও তদীয় জীবনে প্রদর্শিত সত্য প্রচার করা এবং সকলকে ঐহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ঐগুলি কর্মজীবনে পরিণত করিতে সাহায্য করা।

"এই মিশনের কর্তব্য ঃ সকল ধর্মকে এক সনাতন ধর্মেরই নানা রূপ জানিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের যে-সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণ করিয়া গিয়াছেন— যথোপযুক্তভাবে সেই কার্য পরিচালনা করা।

"ইহার কার্যপদ্ধতি ঃ ১) এমন সব শিক্ষক শিক্ষিত করিতে হইবে যাহারা জনগণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইতে সমর্থ।

২) শিল্প ও কলাকে উৎসাহিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাবগুলি যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রকটিত হইয়াছে—সেইভাবে প্রচার করিতে হইবে।

৩) ভারতীয় বিভাগের কাজ—ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষা-প্রসারচিকির্ষু গৃহস্থকে শিক্ষিত করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারে।

৪) বৈদেশিক কার্যবিভাগ—সঙ্ঘের শিক্ষিত সন্ন্যাসীকে ভারতের বাহিরে পাঠাইতে হইবে, তাহাতে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সম্বন্ধ নিকটতর হইবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াও ভাল হইবে।

৫) মিশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও মানবকল্যাণমূলক—রাজনীতির সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।"[১৭]

এতে স্বামীজীর সর্বগ্রাসী 'সত্যযুগে'র স্বপ্নই বাস্তবায়িত হতে চাইছে—শুধু ভারতীয় সমাজকে নয়, তামাম বিশ্বসমাজকে ঘষামাজা করে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ বিশ্ববাসিন্দাদের সবাইকে একের অনুবর্তী করে একান্নবর্তী করা; এবং যেহেতু সে-দায় ভারতের, তাই প্রথমেই ভারতীয় যুবসমাজকে সে-যুগের বিজাতীয় ঠুনকো আদর্শ থেকে বিযুক্ত করে তাকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বহির্ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। সত্যযুগের আবির্ভাব তো একটা দেশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

আর স্বামীজীর স্বপ্ন মানেই সঙ্কল্প, সঙ্কল্প মানেই রূপায়ণ। এই সুবাদেই আমরা ম্যাক্সমূলার, রোমাঁ রোলাঁ, অলডাস হাক্সলি, ক্রিস্টোফার ইশারউড, জেরাল্ড হার্ড, সমারসেট মম, টমাস ম্যান, আরউইন এডম্যান, হেনরি জিমার, মেরী লুইস বার্ক, আর্নল্ড টয়েনবী প্রমুখ পাশ্চাত্য দিকপালদের পেয়েছি। এরপরেও কি শুনতে হবে—"বিবেকানন্দের চেলারা এদেশে (আমেরিকা) বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বেদান্ত ও ভারতবর্ষের বিদ্যাবুদ্ধির উপর এদের শ্রদ্ধা একেবারে ঘুচিয়ে দিয়েছে"?[১৮]

যাই হোক, বিবেকানন্দের সবেতেই 'উত্তম আচার্যের' লক্ষণ। 'অধম' বা 'মধ্যম' থাকের আচার্যকে একথা বলতে শোনা যায় না—"I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God."[১৯] (যে-পর্যন্ত না দুনিয়ায় সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হচ্ছে—কাজে আমার ছেদ বা বিশ্রাম নেই।) এবং এই যুগস্পর্শী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মনোভাব উৎকট ব্যাধির মতো সংক্রামিত হয়ে 'বিবেকানন্দের চেলা'দের পোল্যান্ড, রাশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিত্যনতুন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে স্বামীজীর 'মঠ-মিশন', 'নিয়মাবলী-

১৭ 'উদ্বোধন' পত্রিকার হীরক-জয়ন্তী বর্ষ (৬০তম), ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫-৬

১৮ আমেরিকা থেকে ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি, দেশ, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৬, ৫৩তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩

১৯ 'Complete Works', Vol. V, 6th Ed., 1954, p. 328

কার্যাবলী', পিলেচমকানো 'পত্রাবলী', বারুদঠাসা 'বক্তৃতাবলী', মারমুখো 'আশীর্বাণী'—সবই 'সত্যযুগের' উদ্বোধন-সঙ্গীত। একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

আচ্ছা, 'সত্যযুগে'র সমাজব্যবস্থা কিরকম ছিল? 'মহাভারতে' পাই—সেযুগে সবাই 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ছিল না। ভূসম্পত্তি ছিল সর্বসাধারণের ভোগদখলে। এখন যাকে 'রাষ্ট্র' (state) বলা হয়, তার অস্তিত্ব ছিল না—প্রয়োজনও ছিল না। তখন ছিল সত্যিকারের 'স্বভাবের রাজত্ব'—যার মানে ঠিক 'state of nature' নয়। স্বভাব অর্থে 'ব্রহ্মভাব' ও রাজত্ব অর্থে 'অভিব্যক্তি' বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। সেযুগের মূল নীতি ছিল 'স্বাভাবিক ন্যায়'—যাকে 'Natural Justice' বললেও বলা চলে, তবে nature-টাকেও ঐ 'ব্রহ্মকুণ্ডে' একটু চুবিয়ে নিলে ভাল হয়। মহাভারতে আমরা 'stateless society'-র এইরকম বর্ণনা পাই :

নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্॥[২০]

—তখন রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। লোকে একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করে পরস্পরকে রক্ষা করত।

॥ ৫ ॥

মার্কসও 'classless society' চেয়েছিলেন এবং 'classless society'-কে 'stateless' করার জন্য কড়া দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেছেন—'রক্তাক্ত বিপ্লব'! State তাঁর মতে, 'parasite on society'। তাহলে society থাকবে অথচ class থাকবে না—যার বাঙলা মানে দাঁড়ায়, মাথা থাকবে না অথচ মাথাব্যথা থাকবে! Society stateless হতে পারে, কিন্তু classless হলে যে society-ই থাকে না। একটা ক্লাসের মানুষকে তো সেখানে থাকতেই হবে—সে 'ব্রাহ্মণ' 'শূদ্র' যাই হোক। স্বামীজী ব্রাহ্মণ-ক্লাসকে চেয়েছিলেন, মার্কস শূদ্র-ক্লাসকে। মার্কসেরই পোয়াবারো—শূদ্রের 'স্লোগানে' সারা দুনিয়া তটস্থ! স্বামীজী তাল বুঝে তাকেই পৈতে পরিয়ে ব্রাহ্মণ পদবীতে টেনে তুলতে তৎপর—তার জন্যই তাঁর এত দৌড়ঝাঁপ, এত পরিশ্রম, এত অগ্নিবর্ষণ—M-কে উলটে W করতেই হবে। এক হিসেবে স্বামীজীর পক্ষে সুবিধেই হয়েছে। একপাল শূদ্রকে একসঙ্গে একটা ময়দানে পেলে তাদের পৈতে পরানোর কাজটা যতটা সহজ হয়, প্রত্যেকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পরাতে হলে তা হয় না। যেমন, একপাল গাধাকে একত্র পেলে তাদের পিটিয়ে-পিটিয়ে ঘোড়া করার কাজটা অনেক কম সময় ও পরিশ্রমে সম্পন্ন হয়।

সে-হিসেবে মার্কসকে 'সত্যযুগ-উদ্বোধনে' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'অগ্রদূত' বলতে কোন বাধা আছে কি? আমার তো মনে হয় না। দুনিয়ার যাবতীয় কুলিমজুর প্রভৃতি শূদ্রদের একটা platform-এ টেনে আনার সঙ্কল্প ও হিম্মত ওঁদের যুগ-উদ্বোধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিবন্ধকতা নয়—সহায়ক। তবে ওঁদের এই 'one caste' ও 'stateless society' মার্কসের মতো রক্তরঞ্জিত বিপ্লবের মাধ্যমে নয়—আসবে প্রেমানুরঞ্জিত বিপ্লবের যাদুস্পর্শে।

কানে খটকা লাগছে? লাগবেই। রক্ত থাকবে না—এ আবার কি জাতের 'বিপ্লব'? রাজশেখর বসুর ভাষায়—"হয় Zাস্তি পার না" ('চিকিৎসা-সঙ্কট')। ভারতের ইতিহাস খুললেই জানতে পারবে—কিভাবে কবীর, দাদূ, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চালিয়ে গেছেন। অদৃশ্য শিশিরসম্পাতে একটি কুঁড়ির পুষ্পান্বিত হওয়ার মতোই 'বৈপ্লবিক'—অথচ নিঃশব্দ এবং নিরুপদ্রব!

মার্কসের মদতে 'Communist Manifesto'-তে বলা হয়েছে—"Communists disdain to conceal the fact that their ends can be attained by the forcible overthrow of all existing social conditions." [২১] (তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বর্তমান সামাজিক পরিবেশের আগাপাস্তলা বলপূর্বক নিশ্চিহ্ন করতে হবে—এই তথ্যটা গোপন করতে কমিউনিস্টরা ঘৃণাবোধ করে।)

বাপরে! কি দাম্ভিক ফতোয়া—সশস্ত্র বিপ্লবের কি উলঙ্গ হুমকি! কিন্তু এত তাড়াই বা কেন—যেন বাঘে তাড়া করেছে? কারণ, ফলটা নিজেদের পকেটে পুরতে অকারণ দেরি হয়ে যায় যে! ফলের আকাঙ্ক্ষাটা যে অনুপাতে চাড়া মারে, আমাদের সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধিও সেই অনুপাতে তাড়া মারে; এবং এই সনাতন সত্যটা গোপন করতে আমরাও ঘৃণাবোধ করি।

এটা 'জনগণে'র প্রতি মমতা না অত্যাচার?

২০ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৫৮।১৪

২১ Communist Manifesto, 1848

স্বৈরাচারীরা 'জনগণে'র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জবাই করে তাদের ভেড়িয়ে যদৃচ্ছা চরাতে চায়। সবদেশের স্বৈরাচারীদের ঐ একই ধান্দা। তাই তারা ধর্মকে আমল দেয় না, পাছে 'জনগণ' আবার 'মানুষ' হয়ে তাদের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রকে জাহান্নামে পাঠায়। খ্রীস্টের অনুবর্তীদের আত্মসাৎ করার জন্য তারা খ্রীস্টকে বারবার ক্রুশে চড়ায়!

এব্যাপারে খ্রীস্টান ধর্মযাজকরাও এককালে কম যেতেন না, তাদের স্বৈরাচারী অনুশাসনে খ্রীস্টানী থাকবে, কিন্তু খ্রীস্ট থাকবেন না। যদি তিনি স্বপ্নেও কোনদিন করুণায় ক্রুশ থেকে নেমে আসেন—যেমন Dostoevsky-র Karamazov-এর কাছে এসেছিলেন—তাহলে তৎক্ষণাৎ তিনি গ্রেপ্তার হবেন, কেননা তিনি 'চার্চে'র শত্রু! ভেড়ারা স্বাধীনতা চায় না—চাইলেও ভেড়ার সর্দাররা স্বাধীনতা দিতে চায় না। তিনি যদি ভালয় ভালয় সরে না পড়েন, তাহলে 'The Grand Inquisitor' (ধর্মগত অপরাধের প্রধান বিচারপতি) আবার তাঁকে ক্রুশে চড়াবে![২২]

তার মানে শুধু 'সমাজবাদ'ই নয়—'সামাজিক ধর্ম'ও সত্যধর্মকে পাত্তা দেয় না। কারণ দুক্ষেত্রেই এক—'বিশেষ সুবিধা'ভোগের বিশেষ অসুবিধা! ফলে জনগণ একদিকের আতিশয্য থেকে রেহাই পেয়ে আরেকদিকের আতিশয্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে! এই দুজাতের আতিশয্যই জনগণের পক্ষে মারাত্মক। আবার বর্তমান আতিশয্য পূর্বতন আতিশয্যকে সর্বদা টেক্কা দেয় বলে কিছু বেশি মর্মান্তিক। জনগণ কখনো শাস্ত্রশাসনের, কখনো সমাজ-শাস্ত্রশাসনের ডাণ্ডার আন্ডারে কেবল এদিক থেকে ওদিক উন্মত্তের মতো চরে বেড়ায়। আর উন্মত্ততার জন্য ডাণ্ডাও মন্দ লাগে না।

যে-দেশে জনগণের ওঠা-বসা, থাকা-খাওয়ার স্বাধীনতা পর্যন্ত থাকে না, তাকে কোন বিশেষ দলের 'বিশেষ সুবিধা' ভাবতে কি বিশেষ কোন অসুবিধা আছে? সেই কারণেই গোয়েন্দা বিভাগকে 'গ্যালিভার' বানাতে হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হয়, চিন্তাশীলদের স্বাধীনচিন্তাকে কবলিত করতে না পারলে তাদের নির্বাসনে পাঠাতে হয়, কিংবা বেকায়দায় ফেলে কবরিত করতে হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি! 'Classless society' মানে ছাঁচে-ফেলা একপাল লোমাক্ত প্রাণী নিয়ে এক এবং অদ্বিতীয় কোন গোষ্ঠীর একচেটে মাতব্বরি নয়। তাই ধর্ম যেখানে খ্রীস্টকে বন্দী করে 'জনগণের আফিম' হতে পারে—'সাম্যবাদী রাষ্ট্র'ও পারে—ততোধিক পারার ক্ষমতাও ধরে। তাই ধর্মের কমিউনিস্ট-ভীতি এবং কমিউনিস্টদের ধর্ম-ভীতি। একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী যে।

কিন্তু এ ধর্ম 'সামাজিক ধর্ম'—'সত্যধর্ম' নয়। তবে সামাজিক ধর্ম ডিঙি মেরে মেরে সত্যধর্মে পৌঁছালে, 'সাম্যবাদ' বেদাগ হয়ে বিশ্বসমাজকে ঝকঝকে তকতকে করতে পারে। সেই ধোপদুরস্ত সমাজই 'সত্যযুগ'-এ ছিল—পুরাণে তার প্রমাণ আছে।

স্বামীজী যে বেদান্তের 'আত্মসাম্যবাদ' প্রচার করেছেন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে—তাতে ঐ পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির অবকাশই নেই, কেননা সেখানে আত্ম-পর প্রভেদবুদ্ধিই নেই। সেখানে তুমি-আমি, সাদা-কালো, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, ধর্ম-সমাজ, ব্যবহারিক-আধ্যাত্মিক—সব একান্নবর্তী, মানে 'একে'র অনুবর্তী। তখনই নির্জলা সাম্য—যা মার্কস, এঙ্গেলস ও সবযুগের সমাজকল্যাণকামীরা নিরন্তর কামনা করেন। তার আগে সাম্য নয়—সাম্যবাদের স্লোগান। ঠাকুর-স্বামীজীর 'আত্মসাম্যবাদে' না আসা পর্যন্ত আমরা 'classless society' (আসলে 'One caste society') ও 'stateless society'-র 'টেস্ট' পাব না।

এখন মনে হচ্ছে—ঠাকুর-স্বামীজীর 'ব্যবহারিক বেদান্ত', মা যার জীবন্ত প্রতিমা, আসলে 'সত্যযুগের' বারোয়ারী সম্পত্তি—যা যুগ-সিন্দুকে এতকাল কুলুপ দেওয়া ছিল। ওঁরা তাল বুঝে তালা ভেঙে সেই অমূল্য রত্নরাজি হরির লুটের বাতাসার মতো বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে এসেছেন। তাহলে প্রশ্ন: হরির লুটের বাতাসার জন্য যেমন ছেলে-বুড়োয় কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'বেদান্ত-বাতাসা'র জন্য সেইরকম হুড়োহুড়ি পড়েছে কি? তাতেই 'সত্যযুগে'র পদধ্বনি কর্ণগোচর হবে।

কী আশ্চর্য! বিশ্বের চিন্তাকাশে এতকাল যে মেকি সাম্যবাদের ঝোড়ো হাওয়া বইছিল, এই কিছুদিন থেকে সেটা উলটোদিকে বইতে শুরু করেছে—M উলটে যেমন W হয়ে যায়—অনেকটা সেইভাবে। তাতেই মনে হয়—সত্যযুগীয় শুভবুদ্ধির সুপ্রভাত হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা সুখবর—দেখলাম, চীন, রাশিয়া, পোল্যান্ডও বাতাসার জন্য লাইন দিয়েছে। চীন অবশ্য লাইনের শেষের দিকে।

২২ দ্রঃ The Brothers Karamazov—F. Dostoevsky, Landsborough Publication, London, 1958, pp. 221-225

ফলে আমাদের দেশের মার্কসবাদী-মাওবাদী বুদ্ধিজীবীদের সুর পালটাচ্ছে। তাঁরাও W হব-হব করছেন। এই সেদিনও যাঁরা স্বামীজী সম্বন্ধে অজ্ঞ ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতেন, যথা—'প্রতিক্রিয়াশীল' 'প্রতিবিপ্লবী' ইত্যাদি, হালে তার নিরসন ঘটিয়ে স্বামীজীর 'সর্বাত্মক সাম্যবাদে'র যথার্থ মূল্যায়নে ব্রতী হচ্ছেন। এটাও নিঃসন্দেহে আরেকটা সুখবর। এরপর মনে হয়, স্বামীজীর সত্যযুগ-তত্ত্বে আস্থাবান হতে আর আমাদের লজ্জা করবে না—নাকচ করতে তো সাহসেই কুলোবে না।

তবে সন্দেহও বিলক্ষণ আছে। যারা বাতাসাপ্রার্থী, মানে W হবার উপক্রম করছে, তারাই আবার ডিগবাজি খেয়ে তারকাযুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে! তারাই আবার ফের উলটে এই সর্বনেশে যুদ্ধ এড়াবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন-সহ বিশ্বের শান্তিকামী মনীষী ও সাধুসমাজের দ্বারস্থ হচ্ছে! তাজ্জব ব্যাপার! এখন তাদের এই দোদুল্যমান মানসিকতা থিতিয়ে কোথায় পাকাপাকিভাবে থিতু হয়—তারই ওপর স্বামীজীর স্বপ্নসফলতা নির্ভর করছে। আমাদের 'সত্যযুগ-তত্ত্বে' আস্থা সেই কারণে কিছুটা আন্দোলিত।

সবাই কি ব্রাহ্মণ হবে? ব্রাহ্মণ মানে কি সমপ্রকৃতি-সম্পন্ন একটা শ্রেণী? তা মনে হয় না—তবে মোটামুটি সমশক্তিসম্পন্ন একটা শ্রেণী। প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকবেই—যেহেতু বৈচিত্র্যই প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। স্কুলের 'A' section-এর ছেলেরা সবাই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখলেও সকলের আকৃতি বা প্রকৃতি সমান নয়। এও সেইরকম। সৃষ্টির পার্থক্যকে সর্বব্যাপ্তিতে ধূসরিত করা চলবে না।

'ব্রাহ্মণ' মানে—ব্রহ্মজ্ঞানী, যে ব্রহ্মকে জেনেছে—"ব্রহ্মং জানাতি যঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ।" ব্রহ্মকে জানা মানেই প্রতীয়মান নানার অন্তর্নিহিত একত্বের উপলব্ধি। তাহলে 'নানা' অর্থাৎ বৈচিত্র্য থাকছে, তবে বিচিত্রতার প্রতি বিরূপতা বা বিদ্বেষ থাকছে না—উলটে শ্রদ্ধা থাকবে। 'এক'ই তো 'নানা' হয়েছেন। শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণ মানে দাঁড়াচ্ছে 'যত মত তত পথ'-এর পৈতেধারী মানুষ। এখনই জাতিগতভাবে তা সম্ভব নয়, তবে ব্যক্তিগতভাবে এর খদ্দের বেড়ে গেলেই কাজ হাসিল হবে—ব্যক্তিকে নিয়েই তো জাতি। যখন সাদা চোখে দেখা যাচ্ছে এই পৈতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, তখন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণপন্থীদের সেই অনুপাতে এর ক্রমবর্ধমান যোগান দিয়ে যেতে হবে। স্বামীজীর স্বপ্নকে হাতছাড়া করার এখনই কোন কারণ ঘটেনি।

॥ ৬ ॥

সংশয় কি স্বামীজীরও ছিল যে, তাঁর স্বপ্ন সফল হবে কিনা? স্নিগ্ধদর্শন আচার্য স্পৃহাহীন দুচোখের নির্মোহ দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে স্বপ্নায়িত কণ্ঠে বলেছেন: "It may be only a dream. I do not know whether it will ever be realised in this world, but sometimes it is better to dream a dream than die on hard facts. Great truths, even in a dream, are good, better than bad facts. So let us dream a dream."[২৩] (হয়তো এটা স্বপ্নই। জানি না, এটা জগতে কখনো বাস্তবায়িত হবে কিনা। কিন্তু রূঢ় বাস্তবে ঠোক্কর খেয়ে মরার চেয়ে কখনো কখনো স্বপ্ন দেখাও ভাল। স্বপ্নলীন মহান সত্যগুলিও উৎকৃষ্ট—অন্ততঃ নিকৃষ্ট বাস্তবের চেয়ে অনেক ভাল। অতএব একটা স্বপ্নই দেখা যাক না কেন।)

স্বামীজীর স্বপ্নমায়ানুলীন জবাব শুনে কিছুটা ধাক্কা খেলাম। স্বামীজীর কথায় জাদু আছে। কথাটা মরীচিকার মতো লোভনীয়। বুঝলাম, স্বামীজীর লাভ-অলাভ পাওয়া-না-পাওয়া জ্ঞানের কোন দ্বন্দ্বই নেই, কিন্তু তাতে আমাদের লাভ? বিশ্বাসে কিছুটা বিপর্যয় ঘটে গেল! বস্তুতান্ত্রিক যুক্তিবাদী মনে বেশ কিছুটা আঘাত নিয়ে আমি স্বামীজীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বিশ্বাসটা তখন প্রায় হাতছাড়া! রাস্তায় যেতে যেতে ভাবলাম—স্বামীজীর কথাটা শাস্ত্র, মহাপুরুষদের বাণী ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে দোষ কি? না মিললে তখন পাকাপাকিভাবে হাতছাড়া করা যাবে।

দেখলাম, সব শেয়ালের একই রা—"যাদৃশী ভাবনা যস্য", "যেমন ভাব তেমনি লাভ", "As you think so you become" ইত্যাদি ইত্যাদি আমাকেই ভেঙচি কাটছে। বুঝলাম স্বপ্নই বাস্তবের বীজ। আর স্বামীজীর উপরি উক্ত স্বপ্নাক্রান্ত উক্তির অন্তিমের "Let us"-টা ("Let me" নয়) অনুধাবন করে এইটাই হৃদয়ঙ্গম করলাম—সদলবলে প্রবলভাবে স্বপ্ন দেখতে পারলে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে কতক্ষণ? [ক্রমশঃ]

২৩ 'Complete Works', Vol. II, 8th Ed., 1955, p. 371

কবিতা

ধন্য মর্ত্যভূমি

জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়

স্বর্গ এসেছে নামিয়া হেথায় ধন্য মর্ত্যভূমি।
কামারপুকুর ধন্য হলো যে তোমার চরণ চুমি॥
ক্ষুদিরাম আর চন্দ্রমণির কোল-আলো-করা ছেলে।
গদাধর এল গয়াধাম থেকে তাকাল চক্ষু মেলে॥
সাতটি বছর পার হতে দেখে আকাশে বলাকা আঁকা।
এ কী অপরূপ রূপরাশি হেরে একা শ্যামরায় বাঁকা॥
সেই সে-ভাবের ঘোরেতে প্রথম সমাধি হলো যে তার।
তারপর থেকে শুরু হলো কাজ জগতের উদ্ধার॥
ধনী-দরিদ্র ছোট-বড় আর হিন্দু-মুসলমান।
কোন ভেদ নাই মানুষে সবাই মায়েরই যে সন্তান॥
জয়রামবাটী আলো করে বসে ছিলেন জগন্মাতা।
রামকৃষ্ণে পরিণয়ে দোঁহে হলেন পরিত্রাতা॥
আপন জায়াকে জননীর মতো পূজা করিবার শেষে।
প্রতিষ্ঠা করে মায়ের কাজেতে সঁপে দিল অবশেষে॥
এ-পূজা লওয়ার সাধ্য কাহার ছিল এই মাতা ছাড়া।
লক্ষ ছেলের 'মা' ডাক শুনিয়া হয় নাই দিশাহারা॥
নদের নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া ও কানাই শ্রীরাধা এল।
সাথে লয়ে এল শ্রীদাম সুদাম আর কত এল গেল॥
এবারে এলেন প্রাণের ঠাকুর শ্রীমাকে লইয়া সাথে।
বিবেকানন্দ সাথে লয়ে সব শিষ্য লইয়া মাতে॥
কী দিন গিয়েছে ভবতারিণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে।
ধনী দরিদ্র নীচ চণ্ডাল বসে সবে একাসনে॥
সর্বধর্মের মূলকথা এক, রীতি-নীতি হয় ভিন্ন
'যত মত তত পথ' নিয়ে জাগে এক মহা-চৈতন্য॥
হিংসা দ্বন্দ্ব বন্ধ করিয়া জাগ্রত কর সবে।
হানাহানি আর কাটাকাটি ছাড়ি মিলন মহোৎসবে॥
সকল কলুষ বিনাশ করিয়া শূন্য ভুবন ভর।
বিবেক-শক্তি জাগ্রত করি জীবের দুঃখ হর॥

কথামৃত

হিরণ্ময় গৌতম

সংসারী, তো কী হয়েছে—কেল্লা থেকে যুদ্ধ করি,
চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা, তৈরি হয়ে মন্ত্র পড়ি।
ডর দেখালে ভয় করে না ঝড়-বাদলে ডরাই নাকো
দ্বন্দ্ব হলে যুদ্ধে নামি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে স্মরি॥

কে গো তুমি

স্বামী অচ্যুতানন্দ

পূর্ণব্রহ্ম হয়ে অবতার
যুগে যুগে এলে তুমি।
যুগপ্রয়োজনে মিটাতে ধরার
নবরূপে এলে নামি॥ ১

ভক্ত-হৃদয়ে পিতামাতা কভু
পুত্র অথবা পতি।
নানান ভাবেতে ধরা দাও প্রভু
অগতির তুমি গতি॥ ২

তুমি মম নাথ, সখা তুমি মম
সব চিন্তার আদি।
মন তুমি মম, প্রাণবায়ু মোর
জীবনে মরণে সাথী॥ ৩

তত্ত্ব তোমার দুর্জ্ঞেয় অতি
যায় না সহজে ধরা।
ধরা নাহি দিলে, এ মায়া-জগতে
হয়ে যাব দিশেহারা॥ ৪

এক যদি হও তবুও আমার
বহু যদি হও আমারই তবু।
জানি আমি ওগো ভোলাতে আমায়
কত রূপ তুমি ধরো গো প্রভু॥ ৫

কভু কালী, কভু শিবরূপে তুমি
ভক্তে দিয়েছ দেখা।
কারো কাছে তুমি চেতনস্বরূপ
নিত্য রূপেতে একা॥ ৬

ত্রেতায় শ্রীরাম, দ্বাপরে কৃষ্ণ
আরও কত রূপ ধরি।
এ যুগেতে রামকৃষ্ণ-রূপেতে
আসিলে ধরায় হরি॥ ৭

ওগো প্রাণনাথ, গদাই আমার,
কতদিন আর ছলিবে মোরে।
মোর বাহুপাশে কবে দেবে ধরা
চরণ ধোয়াব নয়ন-নীরে॥ ৮

অপরূপ রূপ নয়নে হেরিব,
নামে কবে হব আত্মহারা।
ওগো দয়াময়, কৃপা করি মোরে
বুকে তুলে নাও করিয়া ত্বরা॥ ৯

অশ্রুফুলের রাশি

সাগরিকা শর্মা

নীল আকাশে তোমায় খুঁজি, খুঁজি সবুজ মাঠে
জনারণ্যে তোমায় খুঁজি, খুঁজি হাটে বাটে।
কোথায় তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ, দাও না দেখা মোরে
আমার মনের ভক্তি পড়ুক তোমার পায়ে ঝরে।
মুক্তিদাতা শান্তিদাতা ভুবনত্রাতা তুমি
তোমায় পেয়ে ধন্য হলো নিখিল বিশ্বভূমি।

আজকে আমি বসে আছি পঞ্চবটীর ছায়ে
শীতল হাওয়ার স্পর্শ লাগে আমার সারা গায়ে।
হাওয়ার সাথে ভেসে আসে ভক্তজনের গান
মার দেউলে ঘণ্টা বাজে ভরল আমার প্রাণ।
গঙ্গাধারায় মনটি ভাসে শান্ত এই সাঁঝে
হঠাৎ শুনি কে যেন গো বলছে প্রাণের মাঝে—
"কেন তুমি খুঁজছ আমায় এই ভুবনের দ্বারে?
কেন তুমি খুঁজছ আমায় মন্দাকিনীর পারে?
আমি আছি ভক্তজনের ভক্তিভরা গানে
আমি আছি তোমার মনে, আছি সবার প্রাণে।"

চমকে উঠে অনুভবে বুঝতে পারি আমি
আমার মনে শ্রীরামকৃষ্ণ, তুমিই অন্তর্যামী।
মনের মাঝে খুঁজলে পরে সবাই পাবে তাঁরে
সবার প্রাণে প্রীতি জাগান, তিনিই বারে বারে।
মনটি হলো অভিভূত চোখের জলে ভাসি
তোমার পায়ে দিলাম আমি অশ্রুফুলের রাশি।

টাকার এপিঠ ওপিঠ

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সনাতন এ সংসারে ধর্ম হলে যোগ,
তবে তো সেথায় পাই সন্ন্যাসীর খোঁজ।
সন্ন্যাসী সংসারী দেখি ভেদ নেই কোন,
একে করে জ্ঞান দান, অন্যজনে অন্ন।
ঠাকুরের 'কথামৃত' নিত্য কর পান,
পাঁকাল মাছের মতো কর অবস্থান।
পাঁকে ভরা পুকুরেতে পদ্মফুল ফোটে,
পচা খানা-খন্দ থেকে দুর্গন্ধই ওঠে।
টাকার এপিঠ ওপিঠ জ্ঞান আর ধন,
সন্ন্যাস সংসারে দেখি তাহার মতন।

আলোকের ছোঁয়া

শচীন মুখোপাধ্যায়

আলোকের ছোঁয়া পেয়েছি জীবনে
তবুও আঁধার ডাকে,
সোজা পথে চলি তবু কেন বল
চোরাবালি থাকে বাঁকে?

তোমাকে ডাকার সময় পাইনে—
তাই কিগো ভুলে থাক,
দূরে ঠেলে দিয়ে তবু কেন তুমি
মাঝে মাঝে কাছে ডাক?

তাই বলি শোন, আলোকের ছোঁয়া
দিয়ে যাও এই প্রাণে,
আঁধার হৃদয় ভরে দাও তুমি
স্নিগ্ধ-মধুর গানে।

তোমার আমার মহামিলনের
দিন শুধু গুণে যাই,
আমাকে দেখার তুমি ছাড়া আর
কেহ নাই কিছু নাই।

বন্দনা

সৈয়দ আনিসুল আলম

সর্ব মহিমা তোমারই ওগো
তুমি যে পালিছ নিখিল ভুবন,
গাহিছে তোমার শুভ গুণগান
অসীম গগনে তারকা তপন।

তোমার অপার করুণাধারায়
ফলফুলে ভরা কুঞ্জ-কানন,
ধরার বুকেতে দানিলে তুমি
অসীম রতন নয়নলোভন।

ভালবাসা প্রেম দিয়েছ হৃদয়ে
সঙ্গী-সাথী কত প্রিয়জন,
প্রদীপ জ্বেলেছ মনের গহনে
দেখিতে অসীম জ্ঞানের রতন।

লোভ ও পাপের যে-পথ ধরার,
সে-পথে চলিতে নিষেধ তোমার,
যে-পথে চলিতে তব আহ্বান
সে-পথে হাঁটিতে চায় যেন প্রাণ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আসন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

লোকান্তরিত হওয়ার পর সাধকের কী পড়ে থাকে! দণ্ড, কমণ্ডলু, আর তাঁর সাধনের আসনখানি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কমণ্ডলু হলেন অমৃতনিঃস্রাবী মা সারদা। ঠাকুর মাকে বলে গেলেন ঃ আমি যাচ্ছি, তুমি রইলে। মানুষের বড় কষ্ট, তুমি ওদের দেখো। তোমাকে আমি ভরপুর করে রেখে গেলাম। নিরন্তর আনন্দধারা তুমি বর্ষণ করে যাবে। তুমি সতেরও মা, অসতেরও মা।

দণ্ড হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। দণ্ডের কাজ কী? শিষ্টের পালন, অশিষ্টের দমন। সে তো বাইরে। আর অন্তরে? তামসিকতাকে, জীবের জড়তা আর মূঢ়তাকে মেরে দিব্যচেতনার প্রতিষ্ঠা করবে তুমি। আমি একটি প্রার্থনাই রেখে গেলাম—তোমাদের চৈতন্য হোক, সেই চৈতন্য তুমি আনবে। প্রয়োজন হলে পেটাবে, কারোকে খাতির করবে না। রাজা, মহারাজা, প্রজা, পুরোহিত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাদা, কালো—সকলকেই চাবকাবে।

আর আসন! ভগবানের আসন কোন্‌টি? আমাদের হৃদয়! ঠাকুর বলছেন ঃ "ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বৈঠকখানা। ভগবান কে? তিনি কোথায়? কোন্ ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে? সাক্ষাৎ দর্শন! ঠিকানা জানা নেই আপাততঃ। কামারপুকুরে এসেছিলেন। যেভাবে পৃথিবীতে আসতে হয়—ঠিক সেইভাবে, সেই পথে। সে কেমন? ট্রেনে চলেছে শত যাত্রী, হাওড়া থেকে হরিদ্বার। সেই শত যাত্রীর মধ্যেই একটি কামরায় বসে আছেন রাষ্ট্রপতি। যেভাবে সবাই যাচ্ছে, তিনিও সেই ভাবেই যাচ্ছেন। ভগবান স্থির করলেন, নিজের সৃষ্টিতে একবার যাব। জমিদার আসছেন তালুক দেখতে, মানুষের অবস্থা দেখতে। মানুষের কাছে যেতে হলে মানুষের মতোই একটি শরীর চাই। কোথায় পাবেন সেই শরীর! নিজেরই তো তৈরি নিয়ম! অন্য রকম হয় কি করে! হঠাৎ দিগন্তের দিক থেকে পূর্ণ একটি মানবশরীর নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন। বীজের মধ্যে বট, বটের মধ্যে বীজ—এই তো নিয়ম। বিন্দু থেকে সিন্ধু, সিন্ধুরই বিন্দু।

নিয়ম যখন এই, তখন শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, ধর্মাচারী পিতা-মাতার আশ্রয়ে আসতেই হবে। ভগবান আসছেন নরলীলায়। নরদেহেই তিনি নারায়ণ হবেন। ভগবান হবেন। ভগবানের সংজ্ঞা মানুষ নির্ধারণ করেছে, জ্ঞানাদি ষড়্‌গুণবিশিষ্ট। কী কী গুণ! প্রথম হলো ঐশ্বর্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব। দ্বিতীয় গুণ হলো বীর্য অর্থাৎ সর্বশক্তি। এরপর যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই ষড়্‌গুণেই ভূষিত ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভু সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

"চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে॥"

হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে তাঁর পবিত্র আসনখানি পাতা রয়েছে। তিনি আসবেন, তিনি বসবেন। অন্ধকারে তিনি আলো জ্বালাবেন, আলো জ্বালা থাকলে সেটিকে আরও উজ্জ্বল করবেন। আর যদি দেখেন দুয়ার বন্ধ, তিনি অপেক্ষা করবেন। আমাদের মত্ততা, আমাদের তামসিকতায় দুঃখ পাবেন। আমার চোখে জল নেই, আমার জীবন আমাকে দুঃখিত করে না; কিন্তু তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। আমার চেতনার কলিং বেলে আঙুল রাখেন। দেখেন বৈদ্যুতিক যোগ বিচ্ছিন্ন। নিরেট মূঢ়সত্তা ঘরের দখল নিয়েছে। সজাগ থাকলে দেখা যেত ঃ

"শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে
নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি
চাহ মম মুখপানে।" ['গাই গীত শুনাতে তোমায়']

গুরু কে? স্বামীজী বলেছেন ঃ "যে-ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে এবং যে-ব্যক্তির আত্মার শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে। এইরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন।"

রামপ্রসাদ আক্ষেপ করেছিলেন ঃ "মনরে কৃষিকাজ জান না,/এমন মানবজমিন, রইল পতিত...।" পতিত কেন থাকবে! তাঁর পায়ের তলায় ফেলে দি না কেন? হৃদয়টিকে পেতে দিই আসনের মতো করে। স্বামীজী বলছেন ঃ "ধর্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে একটা সমগ্র জীবন পরিবর্তিত হইতে পারে।... ধর্মদান করা সম্ভব, আর মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, 'জগতের অন্যান্য জিনিস যেমন দেওয়া-নেওয়া যায়, ধর্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া-নেওয়া যাইতে পারে'।"

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ক্ষমতা ছিল। সমস্ত হৃদয়ের

দখলদারি নিয়ে প্রেম, বৈরাগ্য, ভক্তির ফুল ফোটাতে পারতেন। তবে সকলের নয়। বেনা বনে মুক্তো ছড়াতেন না। আধার দেখতেন, জমি দেখতেন। খুব বেশি অঙ্কটবঙ্কট দেখলে নিষ্ঠুরের মতো সরিয়ে দিতেন। সংস্কার দেখতেন, ঘর দেখতেন। কেন? তাঁর পক্ষে যদি সবই সম্ভব ছিল তাহলে সকলকেই কেন চৈতন্য করলেন না? এ কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব? অনেকে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের উদাহরণ টেনে আনেন। সেকালের বিশিষ্ট এক পণ্ডিত এমন কথাও লিখেছেন: "রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমার সহিত তাঁহার খুব অল্পই দেখা হয়—অবশ্য ইহার পিছনে ছিল দুইটি কারণ। প্রথমতঃ, এসময়ে তাঁহার নিকট কয়েকজন নতুন ভক্ত আসেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চের দু-একটি অভিনেতারও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উক্ত ব্যক্তিদের আমি মোটেই পছন্দ করিতাম না। সুতরাং উহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আমার মনে তিক্ততারই সৃষ্টি করে।" [মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে—শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাচী পাবলিকেশনস, ১৯৯৪, পৃঃ ৮৮]

স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ সম্পর্কে কি বলছেন: "ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল তখন কবিরাজ বললে, এই পাতাটি মরিচ দিয়ে বেটে খাও। তারপর রোগ ভাল হলো। তা মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হলো, না আপনি ভাল হলো, কে বলবে!" নিজের সম্পর্কে গিরিশবাবুর খুব হীন ধারণা ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বে স্বীকার করছেন: "আমি যে পাপী। মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে-মাটি অশুদ্ধ।" পরিচয় যখন বেশ প্রগাঢ় তখন একদিন বলছেন: "রসুনের গন্ধ কি যাবে?" গিরিশ সম্পর্কে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন: "রসুন-গোলা বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়?" সেদিন গিরিশবাবুর খুব অভিমান হয়েছিল। ঠাকুর এইবার বললেন: "যাবে।" কিভাবে যাবে? ঠাকুর বলছেন: "অত আগুন জ্বললে গন্ধ-ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড়ি হয়ে যায়।"

এরপরে সর্বকালের সব মানুষকে শোনাচ্ছেন আশার কথা, শক্তির কথা, বীর্যের কথা, সাইকোলজির কথা: "যে বলে 'আমার হবে না', তার হয় না। মুক্ত-অভিমানী মুক্তই হয়, আর বদ্ধ-অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে 'আমি মুক্ত হয়েছি', সে মুক্তই হয়। যে রাতদিন 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়।" শ্রীম এই আলোচনা শুনে নিজের মন্তব্যে লিখলেন: "The Lord's message of hope for so-called sinners."

ঠাকুরের খেলা বোঝে সাধ্য কার! গিরিশকে কৃপা করলেন, অহেতুকী কৃপা; কিন্তু ভক্ত কেদারকে সরিয়ে দিলেন। কারণ? "কেদারকে বললুম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছা হলো, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি—কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কটবঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ, ঢুকতে পারলাম না।"

কাম-কাঞ্চন হলো বিষ্ঠার গন্ধ। অন্তরের অঙ্কটবঙ্কট। নিজেকে মার্জনা না করলে তিনি এসে আসনে বসবেন না, সে-আসন যত মূল্যবানই হোক। তুলসীদাস বলছেন:

"যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি, যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক নাহি মিলে, রবি রজনী এক ঠাম॥"

ঠাকুর যেন বলছেন: একটা ব্যাপারে আমি খুব স্বার্থপর, আমাকে যদি চাও তো আমাকেই চাও—ষোল আনা পাঁচ পো।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" [গীতা]
—তোমার মন আমাকে দাও, তোমার ভক্তি আমাকে দাও। তোমার পূজা, তোমার নমস্কার সব আমাকে দাও। বিনিময়ে কি পাবে? তুমি আমাকেই পাবে।

স্বামীজী বলছেন: "যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্মাণ করিতে চাও বেশ, কিন্তু পূর্ব হইতেই ঐ মন্দির অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির তো রহিয়াছে।" সেখানে পেতেছি হৃদয়াসন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের বুরুশ দিয়ে কাম-কাঞ্চনের ময়লা ঝেড়ে ফেলেছি। তিন টানের পিদিম জ্বেলেছি। বিবেকের শঙ্খধ্বনি। আর পূজারী? স্বয়ং বৈরাগ্য। স্বামীজীর কাছে শিখেছি:

বিষয়ে বিতৃষ্ণা না হলে, কাকবিষ্ঠার ন্যায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে "ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি"—ব্রহ্মার কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নেই। জপ-ধ্যান-পূজা-হোম-তপস্যা কেবল তীব্র বৈরাগ্য আনবার জন্য। তা যার হয়নি, তার জানবি—নোঙর ফেলে নৌকোর দাঁড় টানার মতো হচ্ছে। "ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

যতনে হৃদয়ে রাখি আদরের ঠাকুরকে, ও মন! তুই দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে।

ঠাকুরের ঘরখানিকে তুলে আনি। জীবনের সায়াহ্নে জ্বালিয়ে দি ধূপ, ধুনো, জ্ঞানের বাতি। মৃদু করতালি দিতে দিতে ঐ যে ঠাকুর সেখানে পায়চারি করছেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর ডাকছেন: হৃদে, ও হৃদে! সে আমার হৃদয়। মা ভবতারিণীর মন্দিরে শুরু হয়েছে আরতি। □

নিউ ইয়র্কে কয়েকদিন

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ মাঘ ১৪০২ সংখ্যার পর]

তিনতলবিশিষ্ট এই রিজলী ম্যানরের সঙ্গে স্বামীজীর স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। কালের ব্যবধানে আজও তা ম্লান হয়নি। মিসেস মার্জেসন আমাদের সমস্ত ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। ঘরগুলি নানা সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্রে ভর্তি। দোতলায় মিস্টার ও মিসেস লেগেটের প্রশস্ত শয়নঘর, মিস ম্যাকলাউডের (মিসেস লেগেটের বোন) ঘর প্রভৃতি দেখলাম। তিনতলার ঘরগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। প্রতি ঘরেই প্রচুর বইপত্র রয়েছে। লেগেট পরিবার বিদ্যানুরাগী ছিলেন। খাট-বিছানা ও আসবাবপত্র সব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।

সমস্ত কিছু ঘুরে ঘুরে দেখতে অনেক বেলা হয়েছে—প্রায় দেড়টা বাজে। এখন লাঞ্চের প্রস্তুতি। রান্না ও খাবার ঘর, বসার জন্য প্রশস্ত একটি ঘর ও বারান্দায় অপর একটি অর্ধগোলাকৃতি বসার ঘর—এগুলি সব নিচের তলায়। বারান্দার ঘরটির সম্মুখভাগ স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে ঢাকা থাকায় সামনের বিস্তৃত সবুজ মাঠ ও গাছপালা দেখা যায়। এই বসার ঘরটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। এখানকার 'গ্রীন কোচ'-এ শুয়ে স্বামীজী কতদিন দিনের বেলায় বিশ্রাম নিয়েছেন! ডাইনিং রুমে গোলটেবিলের চারপাশে বসে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা। লর্ড ও লেডি মার্জেসন, জোন, ববি ও ফ্র্যাঙ্ক এবং আমি আহারে বসলাম। খাদ্যসামগ্রীর খুব একটা আড়ম্বর নেই—সাদাসিধে বাঙালীর আহার্য ভাত, ডাল, তরকারি ও কিছু মিষ্টি। নিউ ইয়র্ক থেকে ভক্তরাই রান্না করে এনেছেন জানলাম—এখানে কেবল গরম করে নেওয়া হয়েছে। আমাকে বাঙালী জেনেই সম্ভবতঃ তাঁদের এই ব্যবস্থা। সবশেষে চকোলেট আইসক্রীমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, কারণ চকোলেট আইসক্রীম ছিল স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয়। এই বাড়িতে স্বামীজী থাকাকালীন এমন অনেকদিন হয়েছে যে, আহারাদির পর স্বামীজী উঠে পড়েছেন। তাই দেখে মিসেস লেগেটের ঘোষণাঃ স্বামীজী, চকোলেট আইসক্রীম আছে। স্বামীজী পুনরায় আসন গ্রহণ করেছেন ও অতি তৃপ্তির সঙ্গে আইসক্রীম খেয়েছেন।

মিসেস লেগেট স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন এবং সবসময় স্বামীজীর পাশের চেয়ারে বসতেন। স্বামীজীও তাঁকে মাতৃসম্বোধন করতেন। আমার কৌতূহলবশতঃ লর্ড মার্জেসনকে 'স্বামীজী কোন্ চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করেছিলেন' জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেনঃ "এই সমস্ত আসবাবপত্রই স্বামীজীর সময়ে ছিল, কারণ এ বাড়ির কিছুই স্থানান্তরিত বা বিক্রি হয়নি। চেয়ারগুলির হাতলের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে সেগুলি প্রাচীন বলেই মনে হয়। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে এই বাড়িটিতে কত জ্ঞানিগুণী ও অনুরাগী ভক্তের সমাগম হয়েছে। লেগেট পরিবার ও তাঁদের বন্ধুবান্ধব ব্যতীত এখানে মিসেস সারা বুল, নিবেদিতা, শিকাগোর হেল পরিবারভুক্ত ম্যাককিন্ডলী ভগ্নীদ্বয় (হ্যারিয়েট ও ইসাবেল) এবং আরও অনেকে এসেছেন। জনৈক ফরাসী ভাষাবিদের নিকট স্বামীজীর ফরাসী ভাষা শিক্ষাগ্রহণ, মডস্টাম নামে এক চিত্রশিল্পীর নিকট প্রথম অঙ্কনশিক্ষা প্রভৃতি এখানেই হয়েছিল। এবাড়িতে থাকাকালীন একদিন স্বামীজী মিসেস বুলকে একটি গেরুয়া উত্তরীয় প্রদান করেন। আরও কত ঘটনা যে এখানে ঘটেছে তার কে হিসাব রাখে!

লাঞ্চপর্ব সমাপ্ত হলে আমাদের সকলকে বসার ঘরটিতে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হলো। সেখানে ছোটখাট একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেদিনের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জোন সভারম্ভের পূর্বে আমায় একটি বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠ করার অনুরোধ জানালেন। তারপর 'Reminiscences of Swami Vivekananda' বই থেকে তিনি ভগিনী ক্রিস্টিনের লেখাটির কিয়দংশ পাঠ করে শোনালেন। দু-একজন ভক্ত স্বামীজীর লেখা থেকে কিছু অংশ পাঠ করলেন। অবশেষে আমায় দু-চার কথা বলতে হলো। কিছু সময় প্রশ্নোত্তরও চলল। সব শেষে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রণামমন্ত্র পাঠ করে সভার সমাপ্তি হলো।

বেলা প্রায় চারটা বাজে। চায়ের আয়োজন চলছে। চা-পানের পূর্বে লর্ড মার্জেসন আমাকে লেগেট পরিবারের একটি পুরনো অ্যালবাম দেখালেন। সেখানে স্বামীজীরও কয়েকটি ফটো রয়েছে দেখলাম। তাঁদের সুরক্ষিত ভিজিটার্স বুক-এ স্বামীজী একটি সংস্কৃত উপদেশসহ তাঁর নাম সই করেছেন দেখলাম। ক্যাম্প পার্সিতে থাকাকালীন স্বামীজী সেখানকার ভিজিটার্স বুক-এ মজা করে 'এ হীদেন হিন্দু' লিখে তাঁর নাম সই করেছিলেন—সেই বইটিও এখন এখানে রয়েছে। চায়ের গোলটেবিল আসরে লর্ড মার্জেসনের সঙ্গে স্বামীজীর বিষয়ে আমার আরও কিছু কথাবার্তা হলো। তাঁর মায়ের মুখে তিনি স্বামীজীর কথা শুনেছেন বললেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে আমরা সামনের খোলা বারান্দায় সমবেত হলাম। সেখান থেকে হাডসন ভ্যালির দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ ও বনানী বেশ সুন্দর ছবির মতো দেখাচ্ছিল। ভক্তেরা অনেকে ক্যামেরা এনেছেন। বেশ কয়েকটি ফটো নেওয়া হলো। স্বামীজী যে-থামটির পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুলিয়েছিলেন আমাকে তাঁরা সেখানে দাঁড়াবার নির্দেশ দিয়ে ফটো তুললেন। লর্ড ও লেডি মার্জেসন এবং ভক্তদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিকাল পাঁচটা নাগাদ রিজলী থেকে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হলাম। ফ্র্যাঙ্ক গাড়ি চালাচ্ছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর-স্বামীজীর বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হলো। 'কিভাবে বেদান্তের প্রতি আকৃষ্ট হলেন' জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, মাসকয়েক পূর্বে বিভিন্ন যোগের ওপর স্বামীজীর বক্তৃতার ক্যাসেট (জনৈক ব্যক্তির দ্বারা পঠিত ও টেপরেকর্ডে সংগৃহীত) শুনে প্রথমে তাঁরা বেদান্তের বিষয়ে ও পরে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির খবর জানতে পারেন। এখন তাঁরা নিয়মিতভাবে সেখানে রবিবারের বক্তৃতাদি শুনতে যান। ফ্র্যাঙ্ক তাঁর নিজস্ব একটি



স্থান: রিজলী ম্যানরের গোলবারান্দা
দণ্ডায়মান: স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ।
আসীন: জোসেফিন ম্যাকলাউড, অ্যালবার্টার (মিসেস বেটী লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা) বান্ধবী, অ্যালবার্টা, মিসেস বেটী লেগেট।

'বেকারী' পরিচালনা করেন। পরের দিন বিকালে তাঁদের সময় ও সুবিধা হলে আমায় যদি তাঁরা নিউ ইয়র্ক শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখান তাহলে খুশি হব বলায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সানন্দে রাজি হলেন। বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হলো। কিছুক্ষণ স্বামী তথাগতানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ববি ও ফ্র্যাঙ্ককে বিদায় জানিয়ে রাত্রিকালীন আহারাদি করতে নিচের তলায় গেলাম। সবে হাসপাতাল-ফেরত স্বামী তথাগতানন্দের শরীর তখনো বেশ দুর্বল বলে সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে খুব সাবধানে ওঠানামা করতে হয়। খাবার টেবিলে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হলো। আহার সমাপনান্তে সকলকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে পাঁচতলায় আমার ঘরে গেলাম বিশ্রাম নিতে।

পরদিন বেলা ১১টায় আমার বক্তৃতা। নির্দিষ্ট সময়ে স্বামী তথাগতানন্দ আমায় নিয়ে গেলেন তাঁদের 'চ্যাপেল'-এ। প্রথমে একটি শান্তিমন্ত্র পাঠ করে তিনি শ্রোতাদের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু : 'Swami Vivekananda and Universal Values' (স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিশ্বজনীন মূল্যবোধ)। একশ বছর আগে স্বামীজী আমেরিকায় প্রথম এই বেদান্ত-কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁকে স্মরণ করেই আজকের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছিল। বক্তৃতা-শেষে ভক্তদের সমবেত কণ্ঠে একটি প্রার্থনাসঙ্গীত ও একটি প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হলো। ভক্তদের কয়েকজনের সঙ্গে পরে কথাবার্তাও হলো। ববি ও ফ্র্যাঙ্ক এসেছেন দেখে আনন্দিত হলাম। স্বামী তথাগতানন্দ আমাদের সঙ্গে একত্রে লাঞ্চ করার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন।

আহারাদি সম্পন্ন হলে তাঁদের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক শহর দেখতে রওনা হলাম। হাডসন নদীকে ডানদিকে রেখে আমাদের গাড়ি সোজা দক্ষিণমুখো এগিয়ে চলেছে। নদীর ধার ধরেই রাস্তাটি। নদীর অপর পারে নিউ জার্সি শহর দেখা যাচ্ছে। নদীতে ভাসমান একটি বিরাট যুদ্ধজাহাজ দেখিয়ে ফ্র্যাঙ্ক জানালেন, জাহাজটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। জাহাজটির ছাদের ওপর প্রায় ডজনখানেক বোমারু বিমান রয়েছে দেখলাম। পথে পুরনো জাহাজঘাট পড়ল। এখান থেকে স্বামীজী লন্ডনে গেছেন এবং লন্ডন থেকে পুনরায় এখানে অবতরণ করেছেন। এখন এই জাহাজঘাট প্রায় অচল। ক্রমে আমরা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, রকফেলার বিল্ডিং, ইউনাইটেড নেশন বিল্ডিং, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং প্রভৃতি উঁচু বাড়িগুলি দেখলাম। এককালে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটিই এদেশের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ছিল। এখন অবশ্য তার আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বাড়িটি এখন নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু বাড়ি এবং এই বাড়িটির ছাদ পর্যন্ত যাওয়ার সকলের অধিকার রয়েছে। আর ছাদ পর্যন্ত যাওয়া যায় বলে দর্শন-অলিন্দ হিসেবে এটিই সবচেয়ে উচ্চস্থানরূপে (highest view point) নির্ধারিত হয়েছে—গাইড বুক থেকে জানলাম। পাশে দাঁড়িয়ে আকাশচুম্বী বাড়িটির ওপরদিকে তাকালে অবাক হতে হয়। রবিবারের বিকেলে দর্শনার্থীর ভিড় থাকায় আমাদের আর বাড়িটির ওপরে যাবার তেমন ইচ্ছে জাগেনি। বিশেষ করে আরও দর্শনীয় স্থান রয়েছে এবং আমাদের হাতে সময়ও অল্প।

ওয়াল স্ট্রীট মার্কেট নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কর্মব্যস্ত ও শব্দমুখর স্থান বলে শুনেছি। রবিবার ছুটির দিন বলে এই শেয়ার মার্কেট নিশ্চুপ ও জনমানবশূন্য দেখলাম। এবার আমরা হাডসন নদীর ধারে সুন্দর সাজানো-গোছানো একটি পার্কে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে স্ট্যাচু অব লিবার্টি কাছাকাছি দেখা যায়। ঐ বিশাল মূর্তিটি একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। অ্যাটলান্টিক মহাসাগর থেকে নিউ ইয়র্ক শহরে প্রবেশের মুখে মূর্তিটি সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মটরলঞ্চে সেখানে যাবার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের সময়াভাবে সে-প্রচেষ্টা আমরা আর করিনি। ক্রমে আমরা নিউ ইয়র্ক শহরের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হলাম। শহরকে প্রায় বেষ্টন করে আমরা চলেছি এবার উত্তরমুখো হয়ে ইস্ট নদীর (East River) ধার ধরে। নিউ ইয়র্ক শহরটি আসলে একটি দ্বীপ এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। শহরের পূর্বদিকে ইস্ট নদী এবং পশ্চিমদিকে হাডসন নদী শহরটিকে বেষ্টন করে দক্ষিণে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। শহরের মধ্যস্থলে (উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত) আয়তাকার এক বিশাল স্থান জুড়ে সেন্ট্রাল পার্ক অবস্থিত। পার্কের পার্শ্বস্থিত বাড়িগুলি অধিকাংশই সরু ও দীর্ঘাকৃতি। জনবসতিবহুল আভিজাত্যপূর্ণ এই শহরটি 'ম্যানহাটন' নামে সুবিদিত। ইস্ট নদীর পূর্বতীরে (দক্ষিণদিক থেকে উত্তরে যথাক্রমে) ব্রুকলীন, কুইন্স ও ব্রঙ্ক (Brooklyn, Queens & Bronk) নামে তিনটি শহর অবস্থিত। শহরগুলির প্রত্যেকের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের যোগাযোগসেতু বর্তমান। সর্বদক্ষিণের শহরটির নাম স্ট্যাটেন (Staten)। ব্রুকলীনের

সঙ্গে এর যোগসেতু রয়েছে। সকল শহরগুলি মিলিয়েই বৃহত্তর নিউ ইয়র্ক শহর।

ব্রুকলীন ব্রীজের পাশ দিয়ে আমরা গাড়িতে চলেছি। মনে পড়ল মিস ওয়াল্ডোর (হরিদাসী) কথা। প্রতিদিন সকালে তাঁর ব্রুকলীনের বাড়ি থেকে এই সেতুটি পার হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি নিউ ইয়র্ক যেতেন স্বামীজীকে কাজকর্মে সাহায্য করতে। রান্না থেকে আরম্ভ করে ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা ও স্বামীজীর ক্লাসের নোট নেওয়া প্রভৃতি সবকিছু এই বুদ্ধিমতী নিরলস ভদ্রমহিলা অতি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এ (সহস্র দ্বীপোদ্যানে) স্বামীজীর ক্লাসনোটগুলি তিনিই লিখে রাখতেন। পরে তা-ই 'Inspired Talks' বা 'দেববাণী' নামক পুস্তকাকারে পাই। বক্তৃতাদিতে ব্যস্ত না থাকলে স্বামীজীও কখনো কখনো নিউ ইয়র্ক থেকে এই সেতু পার হয়ে মিস ওয়াল্ডোর ব্রুকলীনের বাড়িতে গিয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কের বেকারীটি ব্রুকলীনে অবস্থিত জেনে আমি সেটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ফ্র্যাঙ্ক আনন্দ সহকারে আমায় তাঁর আধুনিক যন্ত্রচালিত বেকারী দেখাতে নিয়ে চললেন। ফলে ব্রুকলীন সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হলো। বেকারীটি না দেখলে আমার আধুনিক বেকারী সম্বন্ধে কোন ধারণাই হতো না। বিরাট এলাকা জুড়ে একটি দ্বিতল বাড়ি—নিচের তলার সবটাই বেকারীর কাজে ব্যবহৃত। নানারকমের ব্রেড, কেক, পেস্ট্রী প্রভৃতি তৈরি হয় এখানে। যন্ত্রচালিত বিরাট আভেনের ভিতর রোলারের ওপর দিয়ে প্রতি মিনিটে শত শত ব্রেড ইত্যাদি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসছে দেখলাম। প্যাকিং, লোডিং ইত্যাদি সমানে চলেছে। সপ্তাহের প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টাই পালাক্রমে কাজ চলে শুনলাম। প্রায় একশ কর্মী এখানে কাজে নিযুক্ত। ওপরতলার ঘরগুলি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়। নিজস্ব টেস্টিং ল্যাবরেটারি ও মেশিনপত্র ঝটিতি সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাদি রয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক সমস্তকিছু ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখালেন। চুলের সাবধানতার জন্য আমাদের সকলকে হালকা টুপি পরতে হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা সোজা আশ্রমে ফিরলাম সন্ধ্যা নাগাদ।

পরের দিন সোমবার। ঐদিন বিকালের ফ্লাইটে আমায় প্রভিডেন্স ফিরতে হবে। গতকাল আমার ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং-এর ওপর ওঠা হয়নি বলে জনৈক তরুণ ভক্ত ব্রেকফাস্টের পর আমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আগ্রহী হলেন। সাবওয়ে লাইন সোজা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পাশ দিয়ে গেছে। এদেশে পাতাল রেলকে 'সাবওয়ে' বলা হয়। আমরা মিনিট চার-পাঁচ হেঁটে স্থানীয় স্টেশনে পৌঁছালাম। কয়েক মিনিট পর-পর ট্রেন। ট্রেড সেন্টারে পৌঁছে টিকিট কেটে লিফটে উঠলাম। সোমবার বলে তেমন ভিড় নেই। প্রথম লিফট আমাদের ৭০ তলা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর আরেকটি লিফট ১০৭ তলায় পৌঁছে দিল। সেখান থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়। চারদিক স্বচ্ছ কাঁচের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বসে দেখারও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। রিফ্রেসমেন্টেরও ব্যবস্থাদি রয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি, বরফপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এই পর্যন্তই উঠতে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছাদ পর্যন্ত ওঠা যায়। এখান থেকে বাইনোকুলারের সাহায্যে আমি স্ট্যাচু অব লিবার্টি বেশ স্পষ্টভাবে দেখলাম। বিরাট এই মূর্তিটি সকালের রোদে ঝকঝকে দেখাচ্ছিল। এদিন আবহাওয়া ভাল থাকায় আমরা ছাদ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম। ছাদে যাবার জন্য পৃথক এসক্যালেটর (escalator) রয়েছে। ছাদের চারপাশ রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাথার ওপর খোলা আকাশ।

বেদান্ত সোসাইটির পাশেই সেন্ট্রাল পার্ক। খেতে তখনো দেরি আছে জেনে আমরা পার্কটি দেখতে গেলাম। বিরাট পার্ক বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নানারকমের গাছপালায় ভর্তি। স্থানে স্থানে ছোট বড় মাঝারি আকারের অনেক স্ট্যাচু রয়েছে দেখলাম। মাঝখানে একটি জলাধার থাকায় পার্কের সৌন্দর্য আরও বেড়েছে। দেখতে দেখতে আমরা পার্কের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে পার্কের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত গেলাম এবং পুনরায় ফিরে এলাম। পার্কটি দৈর্ঘে প্রায় মাইল চারেক ও প্রস্থে আধ মাইলের মতো।

আশ্রমে ফিরে আহারাদি সম্পন্ন হলো। এবার ফেরার পালা। ফ্র্যাঙ্ক আমায় নিতে এসেছেন এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠলাম। লাগুয়াডিয়া এয়ারপোর্টটি কুইন্স শহরের অন্তর্গত। দেখতে দেখতে ব্রীজ পেরিয়ে আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলাম। তখন প্রায় বেলা তিনটা। সাড়ে তিনটায় আমাদের প্লেন ছাড়ল। রৌদ্রস্নাত ছোট-বড় দ্বীপপুঞ্জসমন্বিত মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে প্রভিডেন্স পৌঁছে গেলাম। মনে জেগে রইল নিউ ইয়র্ক ভ্রমণের এক সুমধুর স্মৃতি। [সমাপ্ত]☐

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।—সম্পাদক, উদ্বোধন

'উদ্বোধন' ঃ শারদীয়া সংখ্যা ১৪০২

দেবীপক্ষের পুণ্য অবকাশে 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যা হাতে এল। ঐতিহ্যবাহী অথচ নবচেতনায় সমৃদ্ধ সেই অন্তরস্পর্শী পত্রিকা। 'উদ্বোধন'-এর পাতা উলটে প্রথমেই মনে হলো, সম্পাদক তাঁর বিনম্র প্রচেষ্টায় শারদ-প্রকৃতির বন্দনা এবং মাতৃপূজার সমস্ত উপচার সাজিয়ে পাঠক-পাঠিকার হাতে তুলে দিয়েছেন। এই একটি মাত্র পত্রিকা, যে বাণিজ্যকে উপেক্ষা করে আবহমান সংস্কৃতি ও চিরায়ত সাহিত্যকে সঞ্জীবিত রেখেছে তার সুচারু কলেবরে। সৎ সাহিত্য পাঠ করে আমরা যেমন লৌকিক তৃপ্তি পেয়েছি, তেমনই আমাদের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা সঠিক পথে চালিত হয়েছে। শারদীয় 'উদ্বোধন'-এর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক হিসেবে আমি গর্বিত। গর্ব এই কারণে যে, এক, এর সর্বতোসুন্দর পরিকল্পনা; দুই, প্রচ্ছদ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত পরম উপভোগ্য; তিন, প্রতিটি রচনা সুচয়িত, সুনির্বাচিত, সুসম্পাদিত; চার, মুদ্রিত বিজ্ঞাপনগুলি রুচিসম্মত এবং ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবধারাবাহী; পাঁচ, দৃষ্টিনন্দন এবং নির্ভুল মুদ্রণ; ছয়, পাঠক-পাঠিকাকে নানা রসের আস্বাদন দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের রচনার সমাবেশ; সাত, সাধুভাষায় রচিত অনবদ্য সম্পাদকীয়—যা এই বিশেষ সংখ্যাটির অনন্য মুখপাত এবং আট, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভারতের এই প্রাচীনতম সাময়িকপত্র তার লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি, বরং স্বমহিমায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কোন বিশেষ লেখা বা লেখকের নাম উল্লেখ করে কিছু আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কেননা, শারদীয় 'উদ্বোধন' আসলে একটি পুষ্পমালা। বিভিন্ন ফুলে সুগ্রথিত। একটি মালা যেমন সামগ্রিক সৌন্দর্যে গরীয়ান, তেমনই এই সংখ্যাটি। ফুলগুলির আলাদা উল্লেখ সেখানে অপ্রয়োজনীয়।

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে দেবী দুর্গা বলেছেন ঃ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" (১০।৩)—এই পৃথিবীতে একমাত্র আমিই বিদ্যমান, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? আপন চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত এই পত্রিকাটি যদি এমনতর আত্মঘোষণা করে, তাহলে কি খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে?

হর্ষ দত্ত
ফরডাইস লেন
কলকাতা-৭০০০১৪

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'

মার্কিন দেশের টেক্সাস স্টেটের হিউস্টন শহর থেকে এই পত্র লিখছি। সুদূর প্রবাস জীবনে আমি 'উদ্বোধন'-এর বহুদিনব্যাপী নিয়মিত গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক। বলা বাহুল্য, বিবিধ বিষয়বস্তু—ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, পরিক্রমা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যা ভাববাঞ্জনায় সমৃদ্ধ ও অনন্য। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে দূর পরবাসে লাভ করি অশেষ আনন্দ, যুক্ত হই স্বদেশের সাথে, সতেজ হই নিজের সংস্কৃতির অবগাহনে। সেই সঙ্গে অনুভব করি দেশের নাড়ীর সাথে নিগূঢ় আত্মিক যোগাযোগ। গত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু বিশেষ বিশেষ রচনা আমাকে এত আনন্দ দিয়েছে যে, সেগুলি সম্পর্কে আমার কিছু অনুভূতি নিবেদন করতে প্রয়াসী হলাম।

প্রথমে উল্লেখ করতে চাই আকর্ষণীয় সম্পাদকীয় 'কথাপ্রসঙ্গে' নিবন্ধগুলির। সম্পাদকের বলিষ্ঠ ভাষা, ভাবের সম্প্রসারণ, তথ্যের বিন্যাস যেকোন পাঠককে বিমোহিত করবে নিঃসন্দেহে। গত অগ্রহায়ণ ১৪০১ সংখ্যায় 'লক্ষ্মী ও তাঁহার বাহন' একটি অনুপম নিবন্ধ, যেটি আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছে। তন্ত্র ও পুরাণের উক্তি উদ্ধৃতির মাধ্যমে লক্ষ্মীর স্বরূপ, বাহন পেঁচার আধ্যাত্মিক অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য, মা দুর্গার কন্যারূপে লক্ষ্মী সম্পর্কে বাঙালীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা—এককথায় অনবদ্য।

শারদীয়া আশ্বিন ১৪০১ সংখ্যার প্রতিটি নিবন্ধ যেকোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে সুউচ্চ পর্যায়ের। বিষয়বস্তু, ভাষার সৌন্দর্য, প্রকাশ অভিব্যক্তিতে সব রচনাই মনোগ্রাহী। "'পরিবার-সমন্বিতা' দুর্গা ঃ একটি অন্বেষণ" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ মৌলিক চিন্তাধারার ঐশ্বর্যে প্রোজ্জ্বল। সম্পাদক লক্ষ্য করেছেন, একচালা কাঠামোর পরিবর্তে প্রতিটি মূর্তি পৃথকীকরণের প্রবণতায় আধুনিক ভগ্ন-পরিবারের ও ভগ্ন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশের মনোভাব প্রতিফলিত। শিবের বিবাগী রূপের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, বাহন বৃষভের যাথার্থ্য, গণশক্তির সংহতির প্রয়াসে গণেশের হস্তী ও মূষিকের প্রসঙ্গ আলোচনার মুনশিয়ানায় সমুজ্জ্বল।

চৈত্র ১৪০১ সংখ্যার 'সরস্বতী ও তাঁহার বাহন', আষাঢ় ১৪০২ সংখ্যার 'গুরু প্রসঙ্গ', শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৪০২ সংখ্যার 'কার্তিক এবং তাঁহার বাহন', আশ্বিন ১৪০২ সংখ্যার 'দুর্গা ও তাঁহার বাহন' এবং কার্তিক ১৪০২ সংখ্যার 'বিজয়ার তাৎপর্য'—প্রত্যেকটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ তথ্য, ভাববিন্যাস, বলিষ্ঠ ভাষার সমন্বয়ে স্বীয় অভিব্যক্তিতে অনুপম সৃষ্টির নিদর্শন। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের উদ্ধৃতিতে, সংস্কৃত শব্দের উৎস নির্ণয়ে ও অর্থ বিশ্লেষণে প্রতিটি আলোচনা হিন্দুধর্মের মূল সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে আরও দুটি রচনার উল্লেখ বিশেষভাবে আমি করতে চাই। প্রথমটি শারদীয়া ১৪০১ সংখ্যার তপোব্রত

সান্যালের 'প্রসঙ্গ ঃ নির্বাণ ও মোক্ষ' প্রবন্ধ। নির্বাণ ও মোক্ষের মতো জটিল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সনাতন আস্তিক ষড়্দর্শন ও নাস্তিক বৌদ্ধধর্মতত্ত্বের মূলনীতিগুলি সংক্ষিপ্তাকারে প্রাঞ্জলভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন। রচনাটি কঠিন বিষয়কেন্দ্রিক হলেও অত্যন্ত সুখপাঠ্য। সেজন্য লেখক আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ এবং অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখেন।

দ্বিতীয়টি অগ্রহায়ণ ১৪০২ সংখ্যার কথাপ্রসঙ্গে 'দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য ও হিংসা-মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন কি স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে?' রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্ভব, উদ্দেশ্য, ব্যর্থতা অতি প্রাঞ্জলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এই সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির নিছক ক্রীড়নকে পরিণত এই আন্তর্জাতিক সংস্থা যে এক প্রহসনমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে সেই নির্মম সত্যটিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এই অনবদ্য রচনায়। বলা বাহুল্য, এই রচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না যে, 'উদ্বোধন'-এর বিবিধ রচনাবলীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক স্পর্শ ও ধর্মজীবনের উপলব্ধি পাই তা এই প্রতীচ্যের ভোগবাদী, বস্তুতান্ত্রিক, যান্ত্রিক গতানুগতিক অশান্ত জীবনযাত্রায় পরম শান্তির আশ্বাস সঞ্চার করে। উপরন্তু রচনাগুলির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হিন্দুদর্শন, হিন্দুধর্ম, হিন্দু-জীবনাদর্শের মহিমা ও গৌরব।

উপসংহারে আরেকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে যেসব তথ্য পরিবেশিত হয় সেগুলির একটি বিশেষ দিক বর্তমান। ভারতীয় নতুন প্রজন্ম, যারা এদেশে অর্থাৎ পাশ্চাত্যে লালিত-পালিত হয়েছে তাদেরকে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে এই রচনাবলী বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায় এদেশে বসবাস করছে যাদের সঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর ভাবধারার বিনিময়, বিবিধ আলোচনাকে কেন্দ্র করে হয় সহজতর। উপরন্তু বেশ কিছু সংখ্যক অভারতীয় স্থানীয় বিদেশী অধিবাসীর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, হিন্দুধর্ম ইত্যাদির প্রতি যে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা বর্তমান, সেই তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রেও এই নিবন্ধগুলি নিশ্চিতভাবে পথনির্দেশক।

স্বামীজী-প্রবর্তিত ও পরিকল্পিত 'উদ্বোধন' উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

আশুতোষ বিশ্বাস
গ্লেনওল্ড ড্রাইভ, হিউস্টন, টেক্সাস-৭৭০৯৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

প্রসঙ্গ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের স্টীমার-ভ্রমণ

শারদীয় 'উদ্বোধন' ১৪০২ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গ্রন্থ থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' শিরোনামে যে-স্মৃতিলিপির অনুবাদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু উপহার দিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। অধ্যাপক বসুকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার আলোচ্য বিষয় অধ্যাপক বসুর নিবন্ধের 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'-এ বর্ণিত শ্রীরামকৃষ্ণের স্টীমার-ভ্রমণ প্রসঙ্গ। ৫৪২ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক বসু প্রশ্ন করেছেন ঃ "তবে কি কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি স্টীমার-ভ্রমণ হয়েছিল, যার হদিশ আমরা পাইনি?" ওঁর লেখা মুখবন্ধ পড়ে মনে হলো, প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দুটি স্টীমার-ভ্রমণের ঘটনা নিশ্চিতভাবে জানা যায়—প্রথমটি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি, যার বিবরণ 'নিউ ডিসপেনসেশন', 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই সফরে পাদরী জোসেফ কুক, মিস পিগট, কেশবচন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন। দ্বিতীয় সফর হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর, যার বিবরণ 'কথামৃত'-এর প্রথম খণ্ডে শ্রীম স্বয়ং দিয়েছেন। এ-দুটি ভ্রমণের একটিতেও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন না—এটা শঙ্করীবাবু বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাহলে নগেন্দ্রনাথ-সহ কোন ভ্রমণ হয়েছিল?—সেটাই প্রশ্ন।

'কথামৃত'-এর পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে (শ্রীম-র ঠাকুরবাটী প্রকাশিত, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ) ২২৫ পৃষ্ঠায় দেখি ঃ "১লা শ্রাবণ, ১৫ই জুলাই ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ শুক্রবার কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজের জাহাজে করিয়া অনেক ব্রাহ্মভক্ত লইয়া কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন। পথে দক্ষিণেশ্বরে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন, সঙ্গে হৃদয়। জাহাজে কেশব, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি।" ঐ পৃষ্ঠারই পাদটীকায় পাচ্ছি ঃ "শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই বিবরণ মাস্টারকে দু-তিন মাস পরে বলিয়াছিলেন। বলিবার কয়েক মাস পরে মাস্টার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন, ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ।"

পাওয়া গেল শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে নগেন্দ্রনাথের স্টীমার-ভ্রমণের হদিশ।

শ্রীমর বর্ণনামত 'দু-তিন মাস'কে তিনমাস ধরলে এবং 'কয়েক মাস'কে চারমাস ধরলে হিসেবে মিলে যায়। তিনমাস+চারমাস, অর্থাৎ এই ভ্রমণের ঠিক সাতমাস পরে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। অবশ্য এই দর্শনের মাত্র তিনদিন আগে শ্রীম-র অজ্ঞাতে শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি স্টীমার-ভ্রমণ হয়ে গেছে, যাতে ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন কুক সাহেব প্রমুখ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২।

এখন শ্রীবসুর দেওয়া এবং 'কথামৃত' থেকে পাওয়া তথ্যগুলি থেকে তিনটি স্টীমার-ভ্রমণের ঘটনা জানা গেল এবং এই তিনটির সঙ্গে নগেন্দ্র, কুকসাহেব এবং শ্রীমর উপস্থিতির সম্ভাব্য

ঘটনা এইরকম হতে পারে ঃ

(১) ১৫ জুলাই ১৮৮১ তারিখের স্টীমার-ভ্রমণে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্গী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের "একাধিক রচনায় স্টীমারে কেশবচন্দ্র-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-স্মৃতির সমুজ্জ্বল চিত্রের" (অধ্যাপক বসু উল্লেখ করেছেন) উৎস এই ভ্রমণ। কুকসাহেব তখনো ভারতে আসেননি, এই ভ্রমণে তাঁর উপস্থিতি সম্ভব নয়। শ্রীম তখনো শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবহিত নন, তিনিও এই ভ্রমণে ছিলেন না।

(২) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ তারিখের স্টীমার-ভ্রমণে কুকসাহেব প্রমুখ ছিলেন; নগেন্দ্র অথবা শ্রীম কেউই ছিলেন না। অধ্যাপক বসু এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন এবং উদ্ধৃতি দিয়েছেন (শারদীয় 'উদ্বোধন' ১৪০২, পৃঃ ৫৪০-৫৪১)। এই ভ্রমণে নগেন্দ্র থাকলে তাঁর রচনায় অবশ্যই কুকসাহেব ও মিস পিগটের উপস্থিতির, বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এঁদের প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ থাকত। শ্রীম এই ভ্রমণের খবর/আমন্ত্রণ সম্ভবতঃ পাননি। শ্রীমর দ্বিতীয় দর্শনের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কুকসাহেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীম বলেছিলেন ঃ "তাঁর বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না।" ('কথামৃত', ১ম ভাগ, ১৩৮৭ পুনর্মুদ্রণ, শ্রীমর ঠাকুরবাটী, পৃষ্ঠা ১৮) শ্রীমর দ্বিতীয় দর্শনের মাত্র ৪।৫ দিন আগে এই স্টীমার-ভ্রমণ হয়।

(৩) ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখের স্টীমার-ভ্রমণের বর্ণনা শ্রীম নিজেই দিয়েছেন। এই ভ্রমণে নগেন্দ্র বা কুকসাহেব কেউই ছিলেন না। পূর্বোক্ত ত্রয়ীর মধ্যে শুধু শ্রীম-ই এই ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন।

কিন্তু এই তিনটি স্টীমার-ভ্রমণের ঘটনাই শেষ নয়, আরও একটা স্টীমার-ভ্রমণের উল্লেখ পাচ্ছি 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'জীবনপঞ্জী' অধ্যায়ের ৯৩২ পৃষ্ঠায় (উদ্বোধন কার্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)। এখানে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর তারিখের ঘটনায় লেখা আছে ঃ "প্রায় আশিজন ব্রাহ্মভক্তসহ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে। রাত্রি ৮টায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।" এই তথ্যের উৎসের কোন উল্লেখ এখানে নেই। 'জীবনপঞ্জী' সঙ্কলন করেছেন কলকাতার রামমোহন কলেজের পদার্থ বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা রেণুকা চট্টোপাধ্যায়। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে আমার মতো অনেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইটিই কি তাহলে প্রথম স্টীমার-ভ্রমণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মোট স্টীমার-ভ্রমণের সংখ্যা কি তাহলে চার, এবং এই ভ্রমণের উৎস কি?

লক্ষণীয়, 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের 'জীবনপঞ্জী'তে তিনটি স্টীমার-ভ্রমণের ঘটনা লেখা আছে, কিন্তু ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারির স্টীমার-ভ্রমণ যাতে কুকসাহেব ছিলেন—সেটি অনুল্লিখিত থেকে গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্টীমার-ভ্রমণ প্রসঙ্গ থেকে আরেকটা সূত্র পাই, যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা একটা সংশয়ের অবসান ঘটাবে। আমরা জানি, 'কথামৃত'-এ শ্রীম তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনটির তারিখ উল্লেখ করেননি, প্রথম দর্শনের দিনটি রবিবার উল্লেখ থাকায় ঐ দিনটি ১৯ অথবা ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ধরা হয়। ১৯ তারিখে প্রথম দর্শন হলে, তখনো শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে কুকসাহেবের দেখা হয়নি। অথচ শ্রীম ঠাকুরকে দর্শন করেছেন ঠাকুরের কুকসাহেব-সহ স্টীমার-ভ্রমণের পর। সুতরাং শ্রীমর প্রথম দর্শন ১৯ ফেব্রুয়ারি না হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি হওয়া উচিত। এটা ঠিক হলে "মতান্তরের" সংশয় আর থাকে না। এ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সনৎকুমার মিত্র
ফোরম্যান কলোনী, কাঁচরাপাড়া
উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৪৫

'উদ্বোধন' শারদীয়া ১৪০২ সংখ্যায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' (ভাষান্তর ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু) স্মৃতিনিবন্ধের ৫৪০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের ২৩ পঙ্ক্তিতে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন ঃ

(১) "তিনি (নগেন্দ্রনাথ) বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কাল জুলাই ১৮৮১।" শ্রীবসু আরও লিখেছেন ঃ (২) "তবে কি কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি স্টীমার-ভ্রমণ হয়েছিল, যার হদিশ আমরা পাইনি?" (পৃঃ ৫৪২, দ্বিতীয় স্তম্ভ, প্রথম পঙ্ক্তি) এই দুটি সংশয়ের উত্তরে আমরা 'কথামৃত' থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, এতে অনুবাদকের সংশয় নিরসন হবে—এমন আশা করি।

দ্রষ্টব্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন সং, পৃঃ ১২০০ —পঙ্ক্তি ৩ থেকে আরম্ভ ঃ (১) "১লা শ্রাবণ, ১৫ই জুলাই ১৮৮১ (শুক্রবার) কেশব তাঁহার জামাতা কুচবিহারের মহারাজার জাহাজে (Steam Yacht) করিয়া অনেক ব্রাহ্মভক্ত লইয়া কলিকাতা হইতে সোমড়া পর্যন্ত বেড়াইয়াছিলেন। পাদটীকায় আছে—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র মাস্টারকে এই বিবরণ দু-তিন মাস পরে বলিয়াছিলেন।... পথে দক্ষিণেশ্বরে জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন, সঙ্গে হৃদয়।

জাহাজে কেশব, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্তগণ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্র প্রভৃতি। অনুবাদকের দুটি সংশয়ের উত্তর এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের এই ১৫ জুলাই ১৮৮১ স্টীমার-ভ্রমণটি প্রথম। অন্য দুটির কথা প্রাসঙ্গিক তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। (২) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ যাতে জোসেফ কুক ও মিস পিগট উপস্থিত ছিলেন এবং (৩) ২৭ অক্টোবর ১৮৮২, স্টীমার-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ- দর্শী শ্রীম যার বিবরণ দিয়েছেন 'কথামৃতে'র প্রথম খণ্ডে।

স্বামী রামানন্দ
প্রযত্নে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
পোঃ কনখল, হরিদ্বার, উত্তরপ্রদেশ

বিজ্ঞান

বৃত্তিগত ব্যাধি

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিপোক্রেটিস বলতেন : যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, কি হয়েছিল? কতদিন হলো? কেমন আছেন? কি খাচ্ছেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি না, আপনি কি করতেন? আমি মনে করি, এটা জিজ্ঞাসা করাও বিশেষ জরুরী। এ বক্তব্য বহু শতাব্দীর অতীতের হলেও আজও তা সমান প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তির অসুস্থতার সঙ্গে তার বৃত্তির বিশেষ সম্পর্ক নিহিত—একথা সকল চিকিৎসকই স্বীকার করেন এবং এই তথ্য সামনে রাখলে ব্যক্তির চিকিৎসাও সহজতর হয়। বৃত্তিগত ব্যাধি আজ সমাজ-মানসে এক করুণ চিত্র হাজির করেছে। এ বিপন্নতা আজ বিশ্বব্যাপী। বিভিন্ন দেশের প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, প্রতি তিন মিনিটে বিশ্বের একজন শ্রমিক ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে এবং প্রতি সেকেন্ডে তিনজন শ্রমিক আহত হচ্ছে। পৃথিবীতে প্রতিবছর বৃত্তিগত ব্যাধির কবলে পড়ে মারা যাচ্ছে প্রায় ১.৮ লক্ষ শ্রমিক এবং আহত হচ্ছে ১১ কোটি ব্যক্তি।

ভারতের মতো বেকারত্ব-জর্জর ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশে কলকারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ক্রমশই বিপন্নতার পথে। দূষণক্লিষ্ট পরিবেশে দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে বহু ব্যাধির শিকার হয় তারা, যদিও এই ঘটনার নেপথ্যে কোন জীবাণু সংক্রমণের ব্যাপার নেই। অথচ তারা ক্রমশঃ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হয় এবং অবশেষে অকালমৃত্যুকে সঙ্গী করে নেয়। এ-চিত্র যেমন প্রকৃতির দূষণ ব্যক্ত করে তেমনি আমাদের বিজ্ঞানমনস্কহীনতার কথাও ব্যক্ত করে। সভ্যতা বিকাশের সিঁড়ি বেয়ে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের যেমন দ্রুত প্রসার ঘটেছে—তার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যাপারে আমাদের ততটা তৎপরতা আসেনি। আর সেই খেসারত দিতে হচ্ছে কলকারখানার তাবৎ শ্রমিককুলকে রক্ত ও অশ্রুতে। এ নিবন্ধ সেই বিপন্নতারই চালচিত্র!

ভারতে বৃত্তিগত ব্যাধির তথ্য খুব উজ্জ্বল না হলেও এ ঘটনার ব্যাপকতা যথেষ্টই। এযাবৎ সংগৃহীত তথ্যের সম্মিলনে যে-চিত্র উপস্থিত করা সম্ভব হয়েছে তাও নগণ্য নয়। ভারতের বিভিন্ন কলকারখানায় আহত ও নিহতের হিসাব থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রতি বছর ১,০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে অসুস্থ হন ৭,০০০ এবং মারা যান ৭৫ জন। পাঞ্জাবে এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সেখানে প্রতি বছর লক্ষাধিক ব্যক্তি বৃত্তিগত ব্যাধির কবলে পড়ে প্রতিবন্ধী হয়—আর সেই সঙ্গে অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের অভিশাপকে বিধিলিপি বলে বরণ করতে বাধ্য হয় তারা।

'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতে ফুসফুস-সংক্রান্ত বৃত্তিগত ব্যাধিগ্রস্ত ১২০ জনের মধ্যে ৩৪ জন সিলিকোসিস রোগে (বিহারের খনি অঞ্চলে), ৪৫ জন নিউমোকোনিওসিস রোগে (কয়লা খনি-অধ্যুষিত অঞ্চলে) এবং ১৪ জন বাইসিনোসিস রোগে (টেক্সটাইল কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলে) ভোগে। অ্যাসবেস্টস কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিদের প্রায় শতকরা ৩০ জন অ্যাসবেস্টোসিস রোগে ভোগেন; বৃত্তিগত ব্যাধির আরেক করুণ চিত্র লক্ষিত হয় স্লেট কারখানার কর্মীদের মধ্যে। মধ্যপ্রদেশের ম্যান্ডসুর-এর স্লেট কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিদের শতকরা ৮০ জনের বয়স ৩৫ বছরের কম এবং তাদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই ১০ বছরের বেশি কাজ করতে পারে। তার আগেই তারা অকালবার্ধক্য ও ভয়ঙ্কর ব্যাধির কবলে পড়ে। ঐ কারখানার অসুস্থ কর্মীদের অধিকাংশই শ্বাসকষ্টে ভোগে; কারো বা সিলিকোসিস, কারো বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, কারো বা দেখা দেয় ফুসফুসে ক্ষত। অকালমৃত্যুর তালিকায় এই কারখানা শীর্ষে।

ভারতের আরেক উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো খনিজ পাথরের। রাজস্থান ও বিহার এ ব্যাপারে উজ্জ্বল নিদর্শন। বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য ঐ সমস্ত অঞ্চলের খনি থেকে সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে থাকে বহু ধাতব ও অধাতব বস্তু। রাজস্থানের উল্লেখ্য খনিজ দ্রব্য হলো জিপসাম, লাইমস্টোন ও স্যান্ড-স্টোন। 'সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ ইন এশিয়া'র এক সমীক্ষায় (১৯৮৬ সাল) জানা যায় যে, 'রাজস্থানের ক্রমবর্ধমান শিল্পসম্ভার শহরের বায়ু, জল ও ভূমিকে করে তুলেছে দূষণক্লিষ্ট;... টিউবারকুলোসিস (যক্ষ্মা) ও সিলিকোসিস রোগ সেখানকার অধিবাসীদের নিত্যসঙ্গী।' রাজস্থানের খনিজ শিল্পের বিশেষ সম্ভার হলো স্যান্ডস্টোন—যার মূল উপাদান সিলিকা বা বালুকণা। এই কণার পরিমাপ খুবই ছোট (০.৫ থেকে ৫ মাইক্রনের মধ্যে); বায়ুর মাধ্যমে মানুষের দেহে তাদের অবাধ গতিবিধি। সিলিকা-কণা নাসাপথ দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে এবং ক্রমে তারা ফুসফুসের অ্যালভিওলাই প্রকোষ্ঠের গায়ে এক আস্তরণ রচনা করে। অঙ্গ-সংলগ্ন ম্যাক্রোফাজ কোষ বালুকণা ভক্ষণ করলে ধীরে ধীরে তারাও (অর্থাৎ বালুকণা) কোষের উপাদান হয়ে যায়। বিপত্তি ঘটে তখনই। রাইবোজোম ও লাইসোজোমের আবশ্যিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় ঐ বালুকণা অসঙ্গতি ঘটায় এবং দেহ তখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। ঐ সমস্ত শ্রমিকরা সপ্তাহে ৪০ থেকে ৪৮ ঘণ্টা এবং বছরে ৮ থেকে ১০ মাস এভাবে সিলিকা-ধূমে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। ফলে সিলিকা-আধিক্যজনিত বিচিত্র ব্যাধির শিকার হয় তারা। সেখানকার সাধারণ ফুসফুসীয় ব্যাধিগুলি হলো—সিলিকোসিস (ফুসফুসে যন্ত্রণা ও ক্ষত), টিউবারকুলোসিস (কাশি ও ফুসফুসের প্রদাহ) এবং সিলিকো-টিউবারকুলোসিস (ফুসফুসের যন্ত্রণা, কাশি ও

রক্তস্রাব)। স্যান্ডস্টোন শ্রমিকদের ব্যাধির এক পরিসংখ্যানগত হিসাব হলো—শতকরা ৪ জনের সিলিকোসিস রোগ, ১২ জনের টিউবারকুলোসিস, ৬ জনের সিলিকো-টিউবারকুলোসিস এবং সামগ্রিক হিসাবে শতকরা ২২ জন শ্রমিকের দেহে ঐ সমস্ত রোগের লক্ষণ প্রকটিত। সবচেয়ে বড় কথা, ঐ ব্যাধিগ্রস্ত শ্রমিকদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ—২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে তাদের বয়স।

টেক্সটাইল মিলের কর্মীদের যন্ত্রণাও বিশেষ ভাবায়। সেক্ষেত্রে ঐ কারখানার উপাদান তুলা ও সিন্থেটিক তন্তুকণা কারখানার কর্মীদের ফুসফুসে প্রবেশ করে। ধুলাও যেমন সেখানকার বাতাসের অনিবার্য উপাদান তেমনি তন্তুকণারও সেখানে অবাধ বিচরণ। ঐ পরিবেশে প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে তন্তুকণা থাকে ০.৮ মিলিগ্রাম থেকে ১৯০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত। গড়ে ঐ তন্তুর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮.২ মিলিগ্রাম। দেহের যেখানে সহনমাত্রা মাত্র ১ মিলিগ্রাম (প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে) সেখানে ঐ মাত্রা কেবল অবাঞ্ছিতই নয়—অস্বাস্থ্যকর ও ব্যাধির কারণ। ঐ সমস্ত কারখানায় শ্রমিকদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয় হাঁচি, কাশি, চোখজ্বালা করা, শিরঃপীড়া, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, নাক দিয়ে রক্ত পড়া প্রভৃতি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ঐ সমস্ত অসুস্থ ব্যক্তিদের থুতু, রক্ত ও ফুসফুসের পরীক্ষায় কোন জীবাণুর সন্ধান মেলেনি। আবার ছুটির দিনে যখন তারা গৃহপরিবেশে থাকে তখন তারা কোনরকম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয় না। অথচ সোমবার কাজের দিন এলেই ঐ সমস্ত রোগের উপসর্গ তাদের দেহে ভর করে। একে সাধারণে বলে 'মানডে সিকনেস' (Monday Sickness); চিকিৎসাশাস্ত্রে একে বলে 'বাইসিনোসিস'। অন্য এক সমীক্ষার মতে টেক্সটাইল শিল্পে কর্মরত ব্যক্তিদের ২১৫ জনের মধ্যে ৯৩ জন শ্বাসকষ্টের শিকার; ঐ ৯৩ জনের মধ্যে ৫০ জনের বাইসিনোসিস রোগ; আবার ঐ ৫০ জন ব্যাধিকাতর ব্যক্তির মধ্যে ১৭ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। এ চিত্র প্রতিদিনের এবং সর্বত্র।

বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরী, অফিস ও কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিরাও কী বিচিত্রভাবে ব্যাধির শিকার হচ্ছেন তা অনেকেরই অজানা। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সভ্যতার বিশেষ অবদান। বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পদার্থের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংযোগ ও সংঘর্ষ শারীরিক সুস্থতাকে বিঘ্ন করছে এবং দেহে ডেকে আনছে উপশমহীন ব্যাধির বন্যা। এক্স-রে ক্লিনিকে কর্মরত ব্যক্তিদের রক্তের উপাদানে বিশেষ বৈকল্য দেখা যায়। তাদের অস্থিমজ্জার কোষে বিকৃতি আসে; তারা লিউকিমিয়া ও অন্যান্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রজনন-অক্ষমতার অভিশাপ কুড়ায়। পরমাণু গবেষণা-কেন্দ্র, বিরল মৃত্তিকা (rare metal) গবেষণাগার, ভিডিও কারখানা প্রভৃতি রেডিয়েশন অঞ্চলে কর্মরত ব্যক্তিরা জিন-বিনষ্টি ব্যাধির কবলে পড়ে। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে এর্নাকুলামে 'ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ' ডিপার্টমেন্টের ১৪ জন কর্মী ক্যানসার রোগে মারা যান এবং ঐ সংস্থার অধিকাংশ কর্মীই হৃদ্‌রোগ ও বন্ধ্যাত্ব রোগের শিকার। সেই কারণে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যাপক সংযোগই এই প্রতিক্রিয়ার মুখ্য কারণ।

পেট্রল পাম্প, গ্যারেজ, স্প্রে পেন্টিং কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অসুস্থতার চিত্রও বড় মর্মন্তুদ! ভারতে জ্বালানী পেট্রোলিয়ামের চাহিদা দিন দিন বাড়ার মুখে। আটের দশকে ভারতে মোট পেট্রল পাম্পের সংখ্যা ছিল ১১,৭০০; বর্তমানে সে-সংখ্যাও বহুলাংশে বেড়েছে। লখনৌয়ের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল টক্সিকোলজি রিসার্চ সেন্টার' কর্তৃক প্রদত্ত পেট্রল পাম্প-কর্মীদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত এক সমীক্ষার মতে, পেট্রল পাম্প-শ্রমিকরা বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে গরমের দিনে অধিক পরিমাণ পেট্রল-বাষ্পে আক্রান্ত হয়। পেট্রোলিয়ামের অন্তর্গত বেঞ্জিন যৌগ বাষ্পাকারে তাদের দেহে প্রবেশ করে এবং শারীরবৃত্তীয় বিপাকে তারা অংশগ্রহণ করে; ফলে দৈহিক প্রতিক্রিয়ার আধিক্য দেখা দেয় সেখানে। ঐ সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে যে, পেট্রল পাম্প-শ্রমিকদের শতকরা ৪১ জনের দেহে ২১ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম এবং শতকরা ৪৭ জনের দেহে ৪১ মিলিগ্রাম ফেনল যৌগ প্রতি লিটার মূত্রে বর্তমান। ফেনল বেঞ্জিনের বিপাকজাত দ্রব্য। মূত্রে ফেনলের উপস্থিতি বেঞ্জিনের অপ্রতিহত অনুপ্রবেশকে ব্যক্ত করে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেহে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির উপসর্গ আসে; যেমন, অস্থিমজ্জার বিকৃতি, যকৃত-ক্ষত, মাথাধরা, নিদ্রা-বিঘ্ন, স্মৃতিভ্রংশ ও সামগ্রিক দুর্বলতা। আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অকুপেশনাল সেফটি হেলথ' ১৯৭৭ সালের এপিডেমিওলজিক্যাল সমীক্ষায় মন্তব্য করেছে যে, বেঞ্জিন-বাষ্পের স্থায়ী উপস্থিতি লিউকিমিয়ার মতো অভিশপ্ত রোগও ঘটাতে পারে; সেই কারণে ঐ বাষ্প থেকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের যতটা নিরাপদ দূরত্বে রাখা যায় ততই মঙ্গল। ইটালি (১৯৬৪ সাল) ও ইংল্যান্ডের (১৯৬৫) ক্রোমোজোম-বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হলো—বেঞ্জিন-বাষ্পের দীর্ঘ উপস্থিতি ক্রোমোজোমের পরিবর্তন আনে এবং এই পরিবর্তন তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত পরিবর্তনেরই সমতুল। গ্যারেজ-কর্মীরাও ডিজেল-বাষ্পের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে শরীরকে ক্ষয় করে। তাদের দেহে চুলকানি, নাসাক্ষরণ, মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। রঙের কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিদের ত্বক, চোখ, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধিকাংশ রঙে দেখা যায় সীসার কণা। ঐ সীসা-কণা দেহে প্রবেশ করলে সহজে তা বর্জিত হয় না; দেহে অন্তর্লীন থেকে তারা স্নায়ুতন্ত্রকে বিকৃত ও বিকল করে তোলে।

পেস্টিসাইড (কীটনাশক) কারখানাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতে পেস্টিসাইড (কীট-বিধ্বংসী বিষ) ব্যবহার শুরু হয় স্বাধীনতার কিছু পরে। ব্যবসায়িকভাবে পেস্টিসাইড উৎপাদনের জন্য প্রথম প্রকল্পটি চালু হয় ১৯৫২ সালে এবং উৎপাদিত দ্রব্য হলো বি. এইচ. সি.; এরপর ১৯৫৫ সালে ডি. ডি. টি. প্রকল্প চালু হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতে পেস্টিসাইড কারখানা গড়ে ওঠে। বর্তমানে ভারতে ৮৬টি কেন্দ্রে ৪৪ রকমের পেস্টিসাইড উৎপন্ন হচ্ছে। বছরে লক্ষাধিক টন বিষাক্ত কীটনাশক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত প্রায় ২৫,০০০ কর্মী। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা যায় হাজার হাজার কৃষি-শ্রমিকের কথা—যারা প্রত্যক্ষভাবে সেই কীটনাশক বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কীটনাশক ভক্ষণজনিত আত্মহত্যার ঘটনা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এন্ড্রিন, ম্যালাথিয়ন, ডি. ডি. টি. প্রভৃতি কীটনাশক খাদ্যনালীতে ঢুকলে মৃত্যুকে যেমন ত্বরান্বিত করে—তেমনি দেহের বাইরে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগও বিবিধ বিপত্তির কারণ হয়। চোখজ্বালা করা, চামড়ায় ফোস্কা হওয়া, একজিমা, অ্যালার্জি, গাঁটে ব্যথা, পেটে ব্যথা, মাথাধরা, বমি বমি ভাব প্রভৃতি উপসর্গ পেস্টিসাইড সংযোগী প্রতিক্রিয়া। তাই বাজার থেকে শাকসবজি, ফল কিনে তা ভালভাবে জলে ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

কয়লাখনির শ্রমিকদের বৃত্তিগত ব্যাধির চিত্রও কোন অংশে কম নয়। গভীর খাদের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কয়লাখনির শ্রমিকরা সভ্যতার রসদকে তুলে আনছে মাটির ওপর। কয়লা কাটা, কয়লা তোলা এবং সেই কয়লাকে ওয়াগনে বা লরিতে ভর্তি করা প্রভৃতি কঠিন কাজের সঙ্গে তারা প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকে। সেই সঙ্গে কয়লাখনি এলাকার কঠিন কণা ও ধুলা-বাষ্পে প্রতি মুহূর্তে তাদের ফুসফুস দূষণক্লিষ্ট হচ্ছে। কয়লাখনির শ্রমিকদের অধিকাংশই ভোগে ব্ল্যাকলাঙ রোগে; সেই সঙ্গে থাকে এমফাইসিমা, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসীয় ক্যানসার।

বৃত্তিগত ব্যাধির আরেক করুণ চিত্র লক্ষিত হয় 'সিফটিং ডিউটি'র মধ্যে। সভ্যতা ও শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে 'সিফটিং ডিউটি'র আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার বিস্তার বিশ্বব্যাপী। তবু এর প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। কাজের সময়সূচীর পরিবর্তনই এই ধরনের বৃত্তির বৈশিষ্ট্য। এই পরিবর্তনে ব্যক্তির আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ব্যক্তির দেহে শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন আসে—যা ব্যক্তির নিজস্ব জীবন ও পারিবারিক জীবনের বিশেষ পীড়ার কারণ। দিনের শ্রম ও রাতের ঘুমের মাধ্যমে হরমোনতন্ত্রের ক্ষরণক্রিয়ার বিশেষ শারীরবৃত্তীয় সাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়; এই ঘটনাকে বলে জৈবিক ছন্দ বা Biorhythm। এর পরিবর্তনে শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য দেখা যায়। সেই কারণে ঐ বৃত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বদহজম, খিটখিটে মেজাজ, রাগের আধিক্য ও উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়।

এই আলোচনায় আমরা বৃত্তিগত ব্যাধির এক সামগ্রিক চিত্র পাচ্ছি। শিল্পায়নের প্রগতির সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দিচ্ছে অনিবার্যভাবে। তার সঙ্গে উপযুক্ত মোকাবিলা করাই বিজ্ঞান-মনস্কতা ও সভ্যতা। এই বিপন্নতা প্রতিরোধে বিশ্বও আজ সরব। এই সমস্যা সমাধানের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই ব্যাধির সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও তার উপযুক্ত বিশ্লেষণ। এ কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হলেই তবে আসবে পরিপূরক প্রতিবিধান পরিকল্পনা। ভারতে 'অকুপেশনাল হেলথ রিসার্চ' (OHR), 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অকুপেশনাল হেলথ' (NIOH) প্রভৃতি সংস্থা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও আরও ব্যাপক উদ্যোগ আবশ্যক। সেই উদ্যোগের প্রতি সচেতনতাই যেন আমাদের প্রতিজ্ঞা হয়।□

গ্রন্থ-পরিচয়

আচার্যবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

Sri Ramakrishna: The Great Educator—Archana Bandyopadhyay. Publisher: Susoban Prakashan, 160/C, Bakul Bagan Road, Cal.-25. Pages: 12+102. Price: Rs. 25·00 only.

"আচ্ছা, সংসারী লোকের কি কোন উপায় নেই?" ঠাকুর বললেনঃ "হ্যাঁ, আছে বৈকি। মায়ায় বদ্ধ জীবও যদি তাঁর উপর অচলাভক্তি রাখে তবে ক্রমে তার উপলব্ধি হয়। বিশ্বাসই বড় কথা।" বলেই গল্প শুরু করলেনঃ একবার এক লোক সমুদ্র পেরুতে চাইল। বিভীষণ ছোট্ট একটি পাতায় 'রাম' কথাটি লিখে বেঁধে দিল লোকটির ধুতির খুঁটে। বলল, ভয়ের কিছু নেই। বিশ্বাস রেখে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাও। কিন্তু মনে রেখো, যখনি বিশ্বাস হারাবে তখনি ডুববে। লোকটি তো অনায়াসে জলের ওপর পা ফেলে হেঁটে এল। হঠাৎ দেখার ইচ্ছে হলো, দেখি তো ধুতির খোঁটায় কি এমন বাঁধল! খুলে দেখে, একটা পাতা। আর তাতে লেখা—'রাম'। একি! শুধু রাম! সংশয় দানা বাঁধল। আর অমনি টুপ করে জলের তলায়। কী অনুপম কথকতা! গল্প দিয়ে ঠাকুর বোঝাতে চাইছেন বিশ্বাস কত জরুরী। এপ্রসঙ্গে খ্রীস্টের প্যারাবলগুলির (Parables) কথাও মনে আসে। কিন্তু শুধু কি গল্প! কখনো গান, কখনো উপমা, কখনো জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অননুকরণীয় ঢঙে বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরেছেন শিষ্য বা শ্রোতাদের সামনে। আর কি আশ্চর্য! আক্ষরিক অর্থে শিক্ষাহীন এক গ্রাম্য পূজক ব্রাহ্মণের কাছে ছুটে এসেছেন তৎকালীন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মনীষীরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ছিলেন আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের প্রাণপুরুষ, তেমনি ছিলেন লোকগুরু। আর তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ছিল আধুনিকতম। যদিও তিনি কখনো নিজেকে শিক্ষক বলে দাবি করেননি। যুগাবতারের এই শিক্ষাদান-পদ্ধতি যে সর্বাধুনিক শিক্ষাদান-প্রণালীর চেয়েও অন্যতর ও স্বতন্ত্র, উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে সেকথাই তুলে ধরেছেন অধ্যাপিকা অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণাপ্রতিম আলোচ্য গ্রন্থটিতে। সুদৃশ্য প্রচ্ছদের আবরণ উন্মোচন করলেই চোখে ভেসে ওঠে শিক্ষাগুরু যুগাবতারের অনিন্দ্য ছবি। প্রাঞ্জল ভাষা ও গভীর মননশীলতার যাদুমন্ত্রে পাঠক-হৃদয়কে সহজেই আঁকড়ে ধরে বইটি।

উপসংহার-সহ সাতটি অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণ, তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক যুগ, চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিক্ষাচিন্তা, শেষ অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অনুপম শিক্ষাদান-পদ্ধতি এবং পরিশেষে উপসংহার—এই সাতটি অধ্যায় নিয়ে বইটি যেন এককথায় প্রস্ফুটিত এক শতদল।

উপযুক্ত দৃষ্টান্ত চয়নে লেখিকা দেখিয়েছেন, রুশো ফ্রয়েবল, হার্বার্ট স্পেনসার, ম্যাডাম মন্টেসরি, জন ডিউই প্রমুখের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাদানে স্বাধীনতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বীকার করে নিয়েছেন মানবমনের বৈচিত্র্যকে। তাই এসেছে ব্যক্তি-অনুসারী শিক্ষাধারা (individualistic approach)। স্বামী যোগানন্দকে ঠাকুর তিরস্কার করছেন, কারণ দক্ষিণেশ্বরে আসার পথে নৌকায় সহযাত্রীরা তাঁর গুরুর নিন্দা করেছে আর তিনি নীরবে থেকেছেন। আবার স্বামী নিরঞ্জনানন্দ একদিন অনুরূপ ঘটনায় নৌকা ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় দেখালে তাঁকে তাঁর ক্রোধসংবরণের উপদেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিবিশেষের মানসিক গঠনের ভিত্তিতেই শিক্ষাদানে পার্থক্য এসেছে। যুবক স্বামী যোগানন্দ ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে বড় কোমলচিত্ত আর যুবক স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ছিলেন একটু উদ্ধত স্বভাবের মানুষ।

জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষাবিদরা শিক্ষায় সমাজসেবার ওপর জোর দিয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষাকমিশন, শিক্ষাকমিটিগুলিও শিক্ষায় সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলাতে দৃষ্টি দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও স্বামীজীকে নিজমুক্তির বাসনা ত্যাগ করে সমাজসেবায় জীবনপাত করতে বলেছেন। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, নটী বিনোদিনী, শ্রীম প্রভৃতিকে তিনি বারংবার বলেছেন স্ব স্ব ভাবে থেকে ঈশ্বরমুখী হতে। আসলে 'যত মত তত পথ'-এর প্রবক্তা তিনি। তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অলক্ষ্য সুতোটি তিনি ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর এই লীলায়।

এরূপ মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

পূর্ণ মানবত্ব প্রসঙ্গে

শান্তি সিংহ

The Spiritual Man—Santi Nath Chattopadhyay. Publisher : Minerva Associates (Publications) Pvt. Ltd., 7-B, Lake Place, Calcutta-700 029. Pages : 132+30. Price : Rs. 180·00.

অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলস্রোতের বহমানতা, সর্পের ক্রূরতা তাদের ধর্ম। জীব ও জড়ের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যে তাদের 'ধর্ম' নিরূপিত হয়। আর, মূল্যবোধযুক্ত মনের ঐশ্বর্যই আধ্যাত্মিকতা। তা বস্তুবাদী বিশ্বে তথা তাবৎ জীবকুলের প্রতিনিয়ত কল্যাণকামী, মঙ্গলাশ্রয়ী—শ্রেয়স্ চেতনাযুক্ত।

চল্লিশ বছরেরও কম আয়ুষ্কাল নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজীবনে চিরতারুণ্যের, অনিঃশেষ কর্মযোগের প্রতীক। জীবকল্যাণকর চিরায়ত মূল্যবোধযুক্ত মনীষার সঙ্গে বিশ্বব্যাপ্ত মানবপ্রেমের আরেক নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বিভিন্ন ভাষণে ও লেখায় জগৎকল্যাণকর প্রায়োগিক (pragmatic) দিক সুস্পষ্ট ছিল। লক্ষণীয়, মার্কসের ধ্যান-ধারণা আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিতে নিছক বস্তুবাদী। অথচ, জগৎ ও জীবনের প্রকৃত মঙ্গলভাবনায় ধ্রুব মানবত্বের অনুধ্যায়ী স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার মূর্ত আদর্শ, জীবন্ত প্রতীক।

লেখক ডঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায় একদা গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এ 'The Religion of Man and Swami Vivekananda' শীর্ষক ভাষণ দান করেন। পরবর্তী সময়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায় প্রাগুক্ত ভাষণের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ হিসেবে 'The Spiritual Man' গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমন্বয়সন্ধানী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মননদৃপ্ত আলোচনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মানবসমাজের বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে স্বামীজীর বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তি-পারম্পর্যে আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিচেতনার বিশ্ববোধে উত্তরণ, বিচিত্র বিরোধীচেতনার অন্তরশায়ী গভীর সমন্বয়বোধ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ—সব একই স্থির লক্ষ্যের অনুগামী—এ সবই সুষম যুক্তিবিন্যাসে আলোচিত হয়েছে ক্রান্তদর্শী স্বামী বিবেকানন্দের চিরায়ত ভাবাদর্শের প্রেক্ষিতে। বিশ্বের সকল শোষিত বঞ্চিত মেহনতি মানুষের 'জাগরণ'-এর কথা গভীর মানবতাবাদী, দূরদর্শী স্বামীজীর ভাবলোকে একদা উদ্ভাসিত হয়েছিল। ডঃ চট্টোপাধ্যায় আলোচনাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধদর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় 'অবিচ্ছিন্ন চেতনাপ্রবাহ'-এর কথাও বলেছেন।

তথ্যসমৃদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থের 'প্রাক্‌কথন'-এ ডঃ অমিয়-কুমার মজুমদারের সুদীর্ঘ দার্শনিক আলোচনা আমাদের মুগ্ধ করে। গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনার মান উন্নত, সেই সঙ্গে গ্রন্থের ক্রয়মূল্যও সাধারণ ক্রেতার বহু ঊর্ধ্বে।□

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর কয়েকটি নতুন গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

□ পশ্চিমবঙ্গ □

উত্তর ২৪ পরগনা

হৃদয়রঞ্জন বেরা
গ্রাঃ+পোঃ ন্যাজাট হাটখোলা, পিন-৭৪৩৪৪২

হৃদয়ভূষণ নস্কর
প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
গ্রাঃ+পোঃ কন্যানগর, পিন-৭৪৩৩৯৮

বাঁকুড়া

শ্রীমা সারদা পাঠচক্র
কোতুলপুর, পিন-৭২২১৪১

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
"অঞ্জন", স্টল নং-২
মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১

মেদিনীপুর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ মঠ-চণ্ডীপুর

কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সংঘ
গ্রাম : আঠিলাগড়ি, পোঃ কাঁথি

খড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
পোঃ খড়ার, পিন-৭২১২২২

হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মন্দির
গ্রাম+পোঃ শ্যামসুন্দরপুর পাটনা
ভায়া : পাঁশকুড়া

বর্ধমান

অঞ্জনকুমার পাল
প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া

শীতল ব্যানার্জী
প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি
শ্রীখণ্ড, পিন-৭১৩১৫০

হুগলী

তপন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত
হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া
পিন-৭১২৫০২

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির ১৯৯৪-১৯৯৫ সালের প্রতিবেদনের সারাংশ

রবিবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদের স্মৃতি-বিজড়িত দ্রব্যাদি প্রদর্শনীর জন্য বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ সংগ্রহালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে (পশ্চিমবঙ্গ) যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি যাত্রিনিবাস উদ্বোধন করা হয়। কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে একটি সারা-শরীর সি. টি. স্ক্যানার চালু করা হয়েছে। মিশনের চণ্ডীগড় (হরিয়ানা) কেন্দ্র একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসা-সেবা শুরু করেছে। মিশনের ভুবনেশ্বর কেন্দ্রে (উড়িষ্যা) উপজাতি ছাত্রদের নিঃশুল্ক ছাত্রাবাসে একটি নতুন আবাসিক ভবন সংযোজিত হয়েছে।

মিশনের পক্ষ থেকে এবারও ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য পরিচালিত হয়েছে। ভারতের ৬টি রাজ্যে এইসব ত্রাণকাজ করার জন্য খরচ পড়েছে মোট ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলায় ৪২৪টি ভূকম্প-নিরোধক গৃহ, একটি বিদ্যালয় ও একটি সমাজমন্দির নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি, বৃদ্ধ ও দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য-সেবার ক্ষেত্রে মিশনের ৯টি হাসপাতাল ও ৮৮টি ডিসপেনসারির মাধ্যমে ১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৪৮ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। উপরন্তু ৯টি চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবির, ৮টি দন্তচিকিৎসা-শিবির, ১টি বধির ব্যক্তিদের শ্রবণের সুবিধার্থে যন্ত্রদান-শিবির ও ৭টি সাধারণ রোগারোগ্য-শিবিরের মাধ্যমে ৫,৪৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করা ছাড়াও ১টি রক্তদান-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য বছরের মতো এবারও মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশন-পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির ৪৮০ জন ছাত্র স্টার (গড়ে ৭৫% বা ততোধিক) নম্বর পেয়েছে। ১৯৯৪ সালে বিভিন্ন পর্ষদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। [নিচের তালিকা দ্রষ্টব্য]

পর্ষদ্/বিশ্ববিদ্যালয়	পরীক্ষা (১৯৯৪)	প্রাপ্ত স্থান
কেন্দ্রীয় পর্ষদ্	মাধ্যমিক	অরুণাচলপ্রদেশ মেরিট লিস্ট অনুযায়ী প্রথম, চতুর্থ ও নবম
কেন্দ্রীয় পর্ষদ্	উচ্চ মাধ্যমিক	অরুণাচলপ্রদেশ উপজাতি তালিকানুসারে প্রথম
মেঘালয় পর্ষদ্	মাধ্যমিক	উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও দশম
পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদ্ পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদ্	মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক	পঞ্চম, ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও চতুর্দশ পঞ্চম ও সপ্তদশ
ভারতীয়ার বিশ্ববিদ্যালয়	বি. পি. এড. এম. পি. এড.	প্রথম থেকে সপ্তম প্রথম থেকে তৃতীয়
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	বি. এসসি. (অনার্স) রসায়নবিদ্যা বি. এসসি. (অনার্স) গণিতশাস্ত্র বি. এসসি. (অনার্স) পরিসংখ্যানবিদ্যা	চতুর্থ প্রথম ও তৃতীয় প্রথম
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	বি. এ. সংস্কৃত বি. এ. দর্শনশাস্ত্র এম. এ. সংস্কৃত	দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রথম ও দ্বিতীয়

পর্ষদ্/বিশ্ববিদ্যালয়	পরীক্ষা (১৯৯৪)	প্রাপ্ত স্থান
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	এম. এ. দর্শনশাস্ত্র এম. এসসি. উদ্ভিদ্‌বিদ্যা	প্রথম থেকে তৃতীয় নবম
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়	বি. এড.	প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম
পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিল	সাধারণ নার্সিং	প্রথম

আলোচ্য বর্ষে প্রায় ২ লক্ষ ৭ হাজার বিদ্যার্থীর মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০-এর ওপর এবং এই খাতে খরচ হয়েছে ৩৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা।

মিশন ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ ও উপজাতি-উন্নয়নমূলক প্রকল্পও রূপায়ণ করেছে। স্বল্পব্যয়ে গৃহনির্মাণ এই সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর অন্তর্গত। কামারপুকুর ও জয়রামবাটী (পশ্চিমবঙ্গ) অঞ্চলে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুবিধার্থে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৫টি গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ্ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ব্যাপক গ্রামোন্নয়ন-কর্মসূচী অব্যাহত রেখেছেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৩তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত হয়। সুন্দর আবহাওয়ায় সারাদিন ধরে মঠে বহু ভক্তের সমাগম হয়। প্রায় ৩০,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নির্জরানন্দ।

রামকৃষ্ণ মঠ, মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-এ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম পুণ্য আবির্ভাব-তিথি গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল সকালে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও আলোচনা। দুপুরে প্রায় ১,৭০০ জন ভক্তকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী' নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু এবং মেদিনীপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রভাকর সেনগুপ্ত। সভায় বহু ভক্ত সমাগম হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের ১৩৫তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। এই উপলক্ষে গ্রামের দুঃস্থদের মধ্যে ২০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। প্রায় ৭০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী সভাপতিত্ব করেন। স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী বলভদ্রানন্দ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জীবনীর ওপর আলোচনা করেন।

পুরী রামকৃষ্ণ মঠ (উড়িষ্যা) গত ২৫ থেকে ২৯ নভেম্বর '৯৫ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ৬৮ জন ভক্ত উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা থেকে যোগদান করেছিল। মঠ থেকেই পাঁচদিন ধরে সকলের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী।

শিলান্যাস

গত ১৪ ডিসেম্বর **আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার আশ্রমে** প্রস্তাবিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্রের শিলান্যাস করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং যোজনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপ-রাজ্যপাল ভাক্কম পুরুষোত্থমন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার সদস্য মনোরঞ্জন ভক্ত ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বহু স্থানীয় মানুষ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল।

উদ্বোধন

গত ৩ ডিসেম্বর **জলপাইগুড়ি আশ্রমের (পশ্চিমবঙ্গ)** নবনির্মিত চিকিৎসাভবনের উদ্বোধন হয়েছে।

শিক্ষা-সপ্তাহ পালন

রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) গত ২০ থেকে ২৫ ডিসেম্বর শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্‌যাপন করে। ২০ ডিসেম্বর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্রীড়া, যুবকল্যাণ ও পর্যটন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। ছয়দিনের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ : আজ ও আগামীকাল' বিষয়ে সেমিনার, সভা, নাটক এবং পুরস্কার-বিতরণ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

গত মে মাসে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এড. পরীক্ষায় **মহীশূরের রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব মর্যাল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল এডুকেশন (RIMSE)**-এর ছাত্ররা ৮ম, ৯ম এবং ১০ম স্থান অধিকার করেছে।

বস্ত্র-বিতরণ

জয়রামবাটী মাতৃমন্দির (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৪ ডিসেম্বর ১৫টি গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে ৬০০ ধুতি, ১১০০ শাড়ি এবং ১০০ কম্বল বিতরণ করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

গত ১৪ থেকে ১৯ নভেম্বর **মায়াবতীস্থ অদ্বৈত আশ্রম (উত্তর-**

প্রদেশ) একটি বিনামূল্যে চক্ষু-চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৩৫ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত ১৬ থেকে ২০ ডিসেম্বর **পুরী মঠ** কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৬১ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এবং তাদের সকলকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

গত ১১ নভেম্বর **নট্টরামপল্লী মঠ (তামিলনাড়ু)** থিরুপ্পাত্তুর (এন. এ.) জেলার লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় একটি চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ১০৩ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত ১৩ ডিসেম্বর **ইছাপুর মঠ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)** একটি দন্ত-চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৪২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

গত ৮ ডিসেম্বর **জামতাড়া মঠ (বিহার)** একটি চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবিরের আয়োজন করে। ১২ জন রোগীর মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর **জলপাইগুড়ি আশ্রমে (পশ্চিমবঙ্গ)** এক ভক্তসম্মেলন ও সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ইজ্যানন্দ। সম্মেলনে মোট ১১৭ জন ভক্ত যোগদান করে। সারাদিনব্যাপী পাঠ, ভজন, ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া, স্যানফ্রান্সিস্কো : গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। সকাল ৭টায় নতুন মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, জপ-ধ্যান, ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ২১ ও ২৮ জানুয়ারি, রবিবার এবং ২৪ ও ৩১ জানুয়ারি বুধবার সাপ্তাহিক ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড : গত জানুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। তাছাড়া 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর সাপ্তাহিক ক্লাস এবং ৪, ১৩, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি যথাক্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দজী, স্বামী বিবেকানন্দজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন এবং ২৪ জানুয়ারি সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১ ডিসেম্বর লিনফিল্ড কলেজের দর্শন বিভাগের আমন্ত্রণে এই কেন্দ্রের স্বামী শান্তরূপানন্দ উক্ত কলেজে 'হিন্দুধর্ম' বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী সহজানন্দ (টমাস ফিলিপ ওয়ারেন) গত ২ ডিসেম্বর ভোরে স্যানফ্রান্সিস্কোর নিকটবর্তী ওলেমা বেদান্ত রিট্রিট-এ পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন। উপযুক্ত চিকিৎসার ফলে তিনি মোটামুটি ভালই ছিলেন এবং শেষদিন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী অশোকানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সহজানন্দ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সারাজীবনে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রেরই কর্মী ছিলেন। ভারতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক কেন্দ্রে তিনি প্রচুর চিকিৎসা-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়েছেন। অক্লান্ত কর্মী, সেই সঙ্গে সহৃদয়তা ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস ১৯৯৬ : গত ১২ জানুয়ারি **উদ্বোধন কার্যালয়ে** জাতীয় যুবদিবস পালন করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। যুবদিবস উপলক্ষে ৭ জানুয়ারি স্বামীজীর ওপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কলকাতার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ১২ তারিখের অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

খ্রীস্টোৎসব : গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৫ যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যায় তাঁর প্রতিকৃতির সামনে পূজা, আরতি ও ভোগাদি নিবেদন করা হয়। তারপর যীশুর জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে এবং গত ১৩ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর ২৭ ডিসেম্বর সারদানন্দজীর জীবনী এবং ১৩ জানুয়ারি স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ৪ জানুয়ারি '৯৬ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।□

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ঃ গত ১২ ডিসেম্বর '৯৫ সন্ধ্যায় সোসাইটি-ভবনে 'নিতাইচন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করা হয়। বক্তৃতা প্রদান করেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিষয় ছিল 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্ম'। ১৯ ডিসেম্বর '৯৫ 'স্বামী অভেদানন্দ স্মারক বক্তৃতা'য় স্বামী অভেদানন্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী পূতানন্দ। ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম আবির্ভাব-তিথি সারাদিনব্যাপী পূজা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যায় সোসাইটির সম্পাদক দীপ্তিকুমার শীল 'আনন্দময়ী মা সারদাদেবী' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নমিতা ভট্টাচার্য ও মোহিত মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যান্ডেলের বিল (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ১৯ ও ২০ নভেম্বর '৯৫ এই আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় যথাক্রমে শিক্ষক ও ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সম্মেলনে মোট ১৩৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক, প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ও অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিও ছিল। শিক্ষক সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান শিক্ষা—তার সমস্যা ও উত্তরণের উপায়'। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি-বিষয়ক ১৫টি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা হয়। ভক্তসম্মেলনে মোট ২২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল পূজা, পাঠ, আলোচনা, জপ-ধ্যান, সমবেত ভজন, বিশেষ আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, প্রতিনিধিদের অনুভূতি ও মতামত-জ্ঞাপন। উভয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী হিতকামানন্দ। বিশেষ বক্তা ছিলেন ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘের (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় গত ১৯ নভেম্বর '৯৫ রবিবার গোবরডাঙা-খাঁটুরা উচ্চবিদ্যালয়ে সারাদিন ধরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ৩য় বর্ষ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ পাল এবং প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে স্থানীয় পৌরপ্রধান বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও উপ-পৌরপ্রধান অসীম তরফদার। সম্মেলনের মূল অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ১,৩০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)-এর সৌজন্যে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১০ ডিসেম্বর '৯৫ **বিরাটী নবাদর্শের (কলকাতা-৫১)** 'রামকৃষ্ণ কুটিরে' ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক শুভ জন্মোৎসব রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, বসে আঁকো, আবৃত্তি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। প্রায় ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশ নেয়। প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা ও পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান। সফল প্রতিযোগিদের বিশেষ পুরস্কার ও অন্য অংশগ্রহণকারীদের সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বোধাতীতানন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বলভদ্রানন্দ, স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু।

শিবপুর বি. ই. কলেজ (ডিমড ইউনিভার্সিটি, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) বিবেকানন্দ ইউথ সার্কেল (হাওড়া)-এর একাদশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২২ নভেম্বর '৯৫, সন্ধ্যায় শিবপুর বি. ই. কলেজ (ডিমড ইউনিভার্সিটি)-অডিটোরিয়ামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল আলোচনাচক্র। ইউথ সার্কেলের সভাপতি ডঃ অসীমকুমার বসু স্বাগত ভাষণ দেন। আলোচনাচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিবপুর বি. ই. কলেজের ডিরেক্টর ডঃ স্পর্শমণি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সন্দীপ নন্দ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সাফল্য-মণ্ডিত করতে নিবেদিতা পাঠচক্রের মেয়েরা বিশেষভাবে সহযোগিতা করে।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) 'জাতীয় সেবাপ্রকল্প'-এর উদ্যোগে ১৫ ডিসেম্বর '৯৫ কলেজের অডিটোরিয়ামে এক বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন হয়েছিল। 'বর্তমান সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' ছিল আলোচনার বিষয়। আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রভাকর সেনগুপ্ত। সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয় সেবাপ্রকল্পের নির্দেশিকা অধ্যাপিকা নন্দিতা ঘোষ। আয়োজিত অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রী এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার শেষে ছাত্রীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু।

বিবেকানন্দ যুব পরিষদ, টালিগঞ্জ (কলকাতা-৩৩) আয়োজিত সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলন গত ৩ ডিসেম্বর '৯৫ টালিগঞ্জের যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি ও দর্শক মিলে প্রায় ৩০০ জন এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মুখ্য বক্তা ছিলেন চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ভবেশ্বরানন্দ। স্বামী বলভদ্রানন্দও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এই উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ২ ডিসেম্বর '৯৫। প্রায় ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করেন রেবতী মণ্ডল ও সুশান্ত দত্ত। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনটি আয়োজিত হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের সহযোগিতায়।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৩তম শুভ আবির্ভাব তিথি-উৎসব পালিত হয় বিশেষ পূজা, হোম, জীবনী পাঠ, আলোচনা, সঙ্গীত-পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত উৎসব চলে। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে স্থানীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিগীতি ও ভজন পরিবেশিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রাণী পার্ক (কলকাতা) ঃ গত ১২ নভেম্বর '৯৫ সন্ধ্যায় পাঠচক্রের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী পুরাণানন্দ। এরপর তিনি সদ্যপ্রয়াত পাঠচক্রের কার্যকরী সভাপতি সন্তোষচন্দ্র রক্ষিতের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি গ্রন্থাগারের উদ্বোধন এবং পাঠচক্রের বার্ষিক স্মারক পত্রিকার প্রকাশ করেন। এরপর শুরু হয় পাঠচক্রের ফ্রি-কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বক্তৃতা ও আবৃত্তি। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবির

গত ১১-১৬ অক্টোবর '৯৫ **এগরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দিরের (জেলা—মেদিনীপুর)** পরিচালনায় অনুষ্ঠিত দাতব্য চক্ষু-অস্ত্রোপচার-শিবিরে ৬৬ জন রোগীর বিনামূল্যে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। ১১ অক্টোবর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শিবির উদ্বোধন করেন কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আপ্তকামানন্দ। উল্লেখ্য, গত বছরেও অনুরূপ দাতব্য শিবিরে ৭৬ জন রোগীর চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছিল। শিবিরে অস্ত্রোপচার করেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল।

পরলোকে

গত ১০ সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৯টায় পণ্ডিতপ্রবর **গৌর শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য)** নবদ্বীপের শ্রীধর জীউর ঠাকুরবাড়িতে ৯০ বছর বয়সে সজ্ঞানে শরীরত্যাগ করেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরের অন্তর্গত দেশড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পর্কে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আত্মীয় হওয়ায় শৈশবেই তাঁর স্নেহসংস্পর্শে আসেন।

বাল্যকালেই তিনি কাশী গমন করেন এবং বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত হারাণ শাস্ত্রী প্রমুখের অধীনে উপাধি লাভ করে পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্-পরিচালিত কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্তদর্শন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বসহ উত্তীর্ণ হন। কাশীতে বাসকালে তিনি অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি দক্ষিণ ভারতেও বেদ অধ্যয়ন করেন এবং মহারাষ্ট্রে শ্রীগণেশন অবধূতের সান্নিধ্য লাভ করেন। পরে কাশ্মীরে শৈবাগম দর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। সুফী সাধনা ও তিব্বতের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনধারার সংস্পর্শেও তিনি আসেন। প্রথম যৌবনে কেদারনাথে তপস্যার্থে তিনি দুবছর যাপন করেন।

চুঁচুড়ার সংস্কৃত মহাসম্মেলনে পণ্ডিত শশীভূষণ দাশগুপ্ত ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নবদ্বীপে শ্রীগুরু চতুষ্পাঠি নামে এক টোল স্থাপন করেন। অধ্যক্ষরূপে 'শ্রীমদ্ভাগবতীয় রাধাকৃষ্ণ কথা' ও 'ভারতে শক্তি উপাসনার ধারা' রচনায় সংক্ষেপে বৈষ্ণব ও শাক্তসাধনা ব্যাখ্যায় এই চিরকুমার পরিব্রাজকের বিশিষ্টতা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় বহন করছে।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য** গত ২৭ আগস্ট '৯৫ ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ডিগবয়ে ব্যাঙ্কে উচ্চপদে কার্যরত থাকাকালে তিনি ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। পরে কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তিনি প্রায় ২৫ বছর যাবৎ 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চুঁচুড়া-নিবাসী **ক্ষিতীশচন্দ্র বসুরায়** গত ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৫ অপরাহ্ণ ৩.৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। 'প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ'-এর চুঁচুড়া শাখার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। কিছুকালের জন্য তিনি এই শাখার অধ্যক্ষও ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চুঁচুড়া-নিবাসী **অতুল নিয়োগী** গত ২৮ আগস্ট ৭৩ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত রোগে পরলোকগমন করেন। অকৃতদার প্রয়াত নিয়োগী স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শেষপর্যন্ত 'প্রবুদ্ধ ভারত সংঘে'র চুঁচুড়া শাখার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি দুইখানি বই লিখেছিলেন।□

দ্বোধন

তম বর্ষ

চৈত্র ১৪০২ ৩য় সংখ্যা



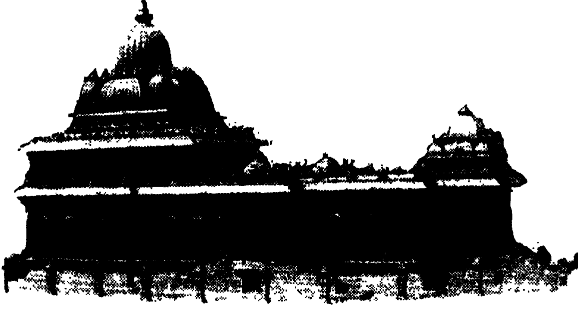


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। … ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
সর্বজনীন উপাসনালয়





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ চৈত্র ১৪০২ মার্চ ১৯৯৬ ৩য় সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস ঃ বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□১০০০ টাকা (কিস্তিতেও প্রদেয়) ঃ প্রথম কিস্তি কমপক্ষে ১০০ টাকা□বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য□ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ□৫৬ টাকা□ সডাক□৬৬ টাকা□আলাদাভাবে কিনলে□বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Calcutta-700003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
Editor's Name	Swami Purnatmananda
Nationality	Indian
Address	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

Name & Address of individuals who own the Newspaper	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal	
Swami Bhuteshananda	*President*	do
Swami Ranganathananda	*Vice-President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*General Secretary*	do
Swami Smaranananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Bhajanananda	" "	do
Swami Srikarananda	" "	do
Swami Satyaghanananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda		do
Swami Gautamananda		do
Swami Gitananda		do
Swami Hiranmayananda		do
Swami Mumukshananda		do
Swami Prabhananda		do
Swami Prameyananda		do
Swami Shivamayananda		do
Swami Suhitananda		do
Swami Tattwabodhananda		do
Swami Vagishananda		do
Swami Vandanananda		do

I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 1996

Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

চৈত্র ১৪০২ | মার্চ ১৯৯৬

দিব্য বাণী

☐ পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য-অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয়রস। হংসের মতো দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মতো। গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে।

আর পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকে থাকে, কিন্তু গা দেখ—পরিষ্কার উজ্জ্বল।

গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।

★

☐ সরার মাপে শাশুড়ি বউদের ভাত দিত। তাতে ভাত কিছু কম হতো। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বউরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ি বললেন ঃ “নাচ কোঁদ বউমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।”

★

☐ সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা স্ত্রী-পুত্র আছে। তাদের সঞ্চয় করা দরকার। স্ত্রী-পুত্রদের খাওয়াতে হবে। সঞ্চয় করবে না কেবল পঞ্ছী আউর দরবেশ, অর্থাৎ পাখি আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখির ছানা হলে সে [পাখি] মুখে করে খাবার আনে। তারও তখন সঞ্চয় করতে হয়। তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়।

সংসারকূপ, সংসারগহন—কেন বল? তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন—

এই সংসার মজার কুটি,
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসে ছিল ত্রুটি!
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটি!

★

☐ কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা। জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও। কিসের ভয়? যে বুড়ি ছোঁয় সে কি আর চোর হয়? জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের। পাকা খেলোয়াড়ের কিছু ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

৯৮তম বর্ষ—৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

ভগবান বুদ্ধ-নির্দেশিত 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর কথা জগৎ-প্রসিদ্ধ। মানুষের দুঃখনিবৃত্তি এবং নির্বাণলাভের উপায় হিসাবে বুদ্ধ তাঁহার অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধ বলিতেন, এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ কোন দার্শনিক জটিলতার দ্বারা কণ্টকিত নহে—উহারা শুধুই আটটি সৎনীতি বা নৈতিক অনুশাসনের নির্দেশিকা। শুধু এই আটটি ইতিবাচক ও কল্যাণপ্রদ নীতি বা অনুশাসন জীবনে অনুশীলন করিলেই মানুষ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু-কবলিত জীবনে অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। বুদ্ধদেব বলিতেন, আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই, শুধু এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিবৃত্তি এবং শান্তিলাভের জন্য যথেষ্ট। উহাই ধর্মজীবনের অমোঘ ভিত্তি। ভিক্ষু, অভিক্ষু সকলেই উহাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মজীবন গঠন ও বিকাশ করিতে পারেন। বুদ্ধ-প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ হইলঃ ১) [দুঃখময় জীবন ও জগৎ সম্পর্কে] সম্যক্ দৃষ্টি, ২) সম্যক্ সঙ্কল্প, ৩) সম্যক্ বাক্য, ৪) সম্যক্ কর্ম, ৫) সম্যক্ জীবিকা (বৃত্তি), ৬) সম্যক্ ব্যায়াম (সাধনা), ৭) সম্যক্ স্মৃতি (দুঃখময় জগতের স্বরূপকে স্মরণ) এবং ৮) সম্যক্ সমাধি (গভীর একাগ্রতা বা ধ্যান)। বুদ্ধের এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে শুধুমাত্র ধর্মনীতি বলিলে উহার প্রতি অবিচার করা হয়। এই ধর্মনীতি প্রকৃতপক্ষে একটি জীবনপদ্ধতি—একটি জীবনপ্রণালী—যাহার মূল ভাবনা মৈত্রী, মুদিতা ও করুণার দ্বারা সর্বতোভাবে অভিষিক্ত। এই নীতি-অষ্টক মানুষকে দিব্যজীবনের অধিকারী করে, ক্ষুদ্র-আমিকে বৃহৎ-আমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। আঞ্চলিক ব্যক্তিকে বিশ্ব-ব্যক্তিত্বে উন্নীত করিয়া দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখিয়া আমরা ভগবান রামকৃষ্ণ-নির্দেশিত মার্গের আলোচনা করিতে পারি। অবশ্য রামকৃষ্ণ বুদ্ধের মতো সুনির্দিষ্টভাবে 'আর্যসত্য চতুষ্টয়' বা 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' হিসাবে কোন উপদেশ দেন নাই। তিনি বারংবার একটি মার্গকে এবং একটি লক্ষ্যকে নির্দেশ করিয়াছেন। উহা হইল ঈশ্বর-ব্যাকুলতা এবং ঈশ্বরলাভ। ব্যাকুলতা উপায়, ঈশ্বরলাভ উপেয়। ব্যাকুলতার তীব্রতার সূচীমুখেই ঈশ্বরের অনিবার্য আবির্ভাব। এই ব্যাকুলতার অপর পৃষ্ঠে রামকৃষ্ণ স্থাপন করিতেন সত্যের প্রতি 'আঁট'-কে। বলিতেন, সত্য হইল কলির তপস্যা। এই সত্য যেমন মার্গ, তেমনই আবার মার্গের অন্তিম প্রান্তমুখ বা লক্ষ্যও। তাঁহার মতে, সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সত্য। এই কথা অবশ্য পৃথিবীর সকল ধর্মের শাস্ত্র এবং আচার্যগণেরাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বগ্রাহ্য অভিধা সত্য-ই। মানবভাষায় ঈশ্বরের সর্বোচ্চ বাচক শব্দ সত্য-ই। বুদ্ধ যদিও প্রত্যক্ষভাবে কখনও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আনেন নাই, কিন্তু সত্যকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরবিশ্বাসী অথবা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী সকলকেই জীবনের মূল ভিত্তি বলিয়া সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ঈশ্বরলাভকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়াছেন, তেমনই সত্য আচরণকেও জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সকল বাণীর মূলে আছে ঐ ধ্বনিঃ সত্যের সন্ধান এবং সত্যে প্রতিষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ "অনন্ত ভাবময়"। তাঁহার ভাব অনন্ত, তাঁহার বাণীও অনন্ত। সুতরাং কোন একটি ভাব বা বাণীকে অথবা কয়েকটি ভাব বা বাণীকে তাঁহার একমাত্র ভাব বা বাণী অথবা তাঁহার প্রধান প্রধান ভাব বা বাণী বলিয়া নির্দেশ করাও অতিসরলীকরণ-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সন্ন্যাসি-সংসারী, উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন সকলের উত্তোলনের জন্য। তাঁহার 'দায়' সকলকে সত্য এবং ঈশ্বরের পথে পরিচালনা এবং সকলকে সত্য ও ঈশ্বরলাভে সমর্থ করিবার জন্য। তাঁহার অনন্ত আলিঙ্গন সকলের প্রতি সর্বদেশে সর্বকালে সমভাবে প্রসারিত। কোন নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে তাঁহার ঐ উত্তোলন এবং পরিচালনা-প্রণালী গণ্ডিবদ্ধ নহে। কোন বিশেষ মার্গের অনুশীলনের মধ্যে তাঁহার পদ্ধতিকে আবদ্ধ করা চলে না। তবুও আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাঁহার অনন্ত ভাবরাশি ও অগণিত উপদেশ হইতে মাত্র আটটিকে নির্বাচন করিয়াছি, যাহাতে আমরা তাঁহার ভাবরাশি ও জীবনের ব্যঞ্জনাকে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারি। আমাদের জীবনকে সার্থক ও মধুময় করিতে পারি। আমাদের জীবনকে সত্য ও ঈশ্বর-লাভের অভিযানে নিয়োজিত করিতে পারি এবং অবশেষে সত্য ও ঈশ্বর-লাভে চরিতার্থ হইতে পারি। আমরা জানি, আমাদের এই নির্বাচন 'অন্ধের হস্তিদর্শন'-এর মতোই একান্তভাবে খণ্ডিত এবং চূড়ান্তভাবে অসম্পূর্ণ।

যে-ভাবের শেষ নাই, যে-বাণীর ইয়ত্তা নাই, যে-কথার ইতি নাই—তাহার সম্পর্কে এই প্রয়াস অবশ্যই বাতুলতা। তবুও যেহেতু আমরা সসীম তাই অসীম পুরুষোত্তমকে আমরা ছবির চারটি ফ্রেমে আটকাইতে চাহি। ভাবি ঐ ছবির মধ্যেই তাঁহাকে দেখিব, তাঁহাকে পাইব। সেইরূপ 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর মধ্যে রামকৃষ্ণ-ভাব ও রামকৃষ্ণ-বাণীকে ধরা অসম্ভব জানিয়াও ধরিবার অক্ষম প্রয়াস আমাদের।

আমাদের নির্বাচিত শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'কে যেভাবে আমরা ভাবিয়াছি এবং যাহাকে ক্রমান্বয়ে আমরা বর্তমান ও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে উপস্থাপন করিব, তাহা হইলঃ ১) সতর্কতা, ২) সততা, ৩) সংযম, ৪) সরসতা, ৫) সংহতি, ৬) সমন্বয়, ৭) সৎসঙ্গ, ৮) সমর্পণ।

সতর্কতা

'ভক্তি' এবং 'ভক্ত' বলিলেই আমাদের অনেকের মনে হয় 'ভক্তি' এবং 'ভক্ত'-এর সহিত যেন একটি অগোছালো ভাব, একটি আলগা-আলগা ভাব, একটি 'বোকা-বোকা' ভাব অনিবার্যভাবে সংযুক্ত। ভক্তের যেন কোন বিষয়েই 'আঁট' থাকিতে নাই, উন্মনা-এবং উদাসীন ভাব যেন তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি অতিমাত্রায় সরল হইবেন এবং সেই সারল্যের রূপ এমনই যে, সর্ববিষয়ে সকলের নিকট তিনি পদে পদে তাঁহার লৌকিক নির্বুদ্ধিতাকে প্রকট করিবেন। এই সাংসারিক নির্বুদ্ধিতা যেন ভক্তের ভক্তির মাপকাঠি! আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু সাধারণ জ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞানের তাঁহার বড়ই অভাব, এবং এই অভাব যেন তাঁহার গৌরব। 'ভক্তি' এবং 'ভক্ত' সম্পর্কে এই বিসদৃশ ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'ক' বলিতে 'কৃষ্ণ'কে ভাবিয়া যাঁহারা বিগলিত, তাঁহাদের সেই ভাব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত ভাবালুতা এবং তাহার স্থায়িত্ব যে অতি সাময়িক তাহা তিনি কঠোর ভাষায় বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সহিত পরিচিত সকলেই জানেন যে, অধিকাংশ সময়েই তাঁহার মন সমাধির স্তরে—অতি-জাগতিক ভূমিতে অবস্থান করিত। পরমের পথে ধাবমান আত্মভোলা শ্রীরামকৃষ্ণের পরিধানের বস্ত্র কখন অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িত সে-সম্পর্কে তাঁহার হুঁশ থাকিত না। কিন্তু সেই মানুষটিরই আবার মুখশুদ্ধির বেটুয়াটি লইতে কখনও ভুল হইত না, পঞ্চবটীতে কেহ ছাতাটি ফেলিয়া আসিলে তাঁহারই চোখে পড়িত সর্বাগ্রে। কোন্ ব্যঞ্জনে কোন্ মশলা কতখানি লাগে তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। দোকানে বা বাজারে জিনিস কিনিবার সময় জিনিসের গুণাগুণ অথবা দামের যথার্থতা নিরূপণ করিতে জানিতেন নিখুঁতভাবে। এই বিষয়ে যুবকভক্ত যোগীনকে (পরবর্তী কালে স্বামী যোগানন্দ) তাঁহার নির্দেশিকার দুইটি দৃষ্টান্ত সুপরিচিত। একটি, লেবু কিনিবার সময় 'ফাউটি' পর্যন্ত লইবার নির্দেশ। অন্যটি, কড়াই কিনিবার সময় অন্যান্য দোকানে উহার দাম যাচাই না করায় এবং কড়াইটি নিখুঁত কিনা পরখ করিয়া না লওয়ায় তিরস্কার। সেইসঙ্গে এই সতর্কবাণীও তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন: "ভক্ত হতে হবে বলে কি বোকা হতে হবে?" তাঁহার ঘরে ছুরির হাতলটি যেই দিকে রাখিতেন রোজ সেই দিকেই সেটি রাখিতেন, কোনদিনই ভুল হইত না। ফলে অন্ধকারেও উহা লইতে তাঁহার কোন অসুবিধা হইত না। প্রদীপের সলিতা কেমন করিয়া পাকাইতে হয়, কেমন করিয়া পাকাইলে একটুও আঁশ সলিতার গায়ে থাকে না—সলিতা নিখুঁত হয়, সে-সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। সমাধিতে মুহুর্মুহুঃ লীন হইলেও, মায়ের বা ভগবানের নামে কাঁদিয়া বুক ভাসাইলেও তিনি অত্যন্ত প্রখরভাবে সাংসারিক বুদ্ধি বা বাস্তববুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল অসাধারণ। লৌকিক এবং লোকোত্তর জীবনের মধ্যে এই সমন্বয়-কৌশলটির নাম সতর্কতা (alertness)। এই সতর্কতা না থাকিলে ধর্মজীবন অথবা সংসারজীবন কোনটিই সুসমঞ্জস হইতে পারে না।

এই সতর্কতার গুরুত্ব ধর্মজীবনে কতখানি তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পার্ষদদের বুঝাইতেন। ধর্মজীবনে অনেক সময় এই সতর্কতার অভাবে আলস্য, বিলাসিতা আসিয়া বাসা বাঁধে। সাধক নিজের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে পতনের পথ বাহিয়া নামিতে থাকেন। প্রয়োজন এবং বিলাসিতার গণ্ডি ধীরে ধীরে মুছিয়া যায় এবং ধীরে ধীরে বিলাসিতা প্রয়োজনের স্থান অধিকার করিয়া লয়। সতর্কতার অভাবে সাধক তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া ফেলেন এবং ক্রমে তাঁহার পতন সম্পূর্ণ হয়। এই সতর্কতা (vigilance) না থাকিলে ধর্মজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পার্ষদদের এই বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিতেন এবং স্বয়ং কঠোরভাবে তাঁহাদের জীবনকে গঠন করিতেন। শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখও তাঁহাদের জীবনের দৃষ্টান্তে এবং শিক্ষায় সতর্কতাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতেন। জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের একটি অধিকতর বিখ্যাত উক্তির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত: "Eternal vigilance is the price of liberty" (স্বাধীনতার মূল্য নিরন্তর সতর্কতা)। একটি জাতি বা দেশের অসতর্কতার অবকাশেই তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হয়। সেজন্য স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রয়োজন সর্বক্ষণ সদাজাগ্রত সতর্কতার। কোন্ রন্ধ্রপথে শত্রুর আক্রমণ আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহা কে জানে? ধর্মজীবনেও সেইরূপ কোন্ অসতর্কতায়, কোন্ অসাবধানতার সূত্রে পতনের পথ প্রস্তুত হইবে তাহা অতিবড় কৌশলী সাধকেরও অজ্ঞাত। সেজন্য মনের অলিতে গলিতে সর্বদা বিচারের সন্ধানী আলো ফেলিতে হইবে যাহাতে মনের দ্বারা আমরা প্রতারিত না হই। ধর্মজীবনে তন্দ্রার কোন স্থান নাই, অসাবধানতার কোন অবকাশ নাই। অ্যারিস্টটল বলিতেন: "There is no holiday in moral life" (নৈতিক জীবনে অবকাশ বা ছুটির কোন স্থান নাই)।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কখনও মনে করিও না তুমি নিরাপদ, কখনও আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টির ভাব যেন তোমাদের অধিকার না করে। মহামায়ার রাজ্যে যিনি যত বড়ই অধিকারী হউন না কেন, সাধনার পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নহে, প্রতিবন্ধকহীন নহে। স্বয়ং ভগবানও বরাহ-অবতারে কেমন করিয়া মায়ায় বদ্ধ হইয়া তাঁহার আবির্ভাব-উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ কেমন করিয়া মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবানের আদেশ ও অনুজ্ঞাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেসমস্ত সবিস্তারে বলিতেন। তিনি বলিতেন: "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" সাধারণ মানুষ বা সাধারণ বা মহান সাধকদের কথা কোন্ ছাড়, স্বয়ং ঈশ্বরও মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত নহেন।

অতএব প্রয়োজন সদাজাগ্রত, অতন্দ্র সতর্কতার। উহাই সাধকের জীবনকে সুরক্ষিত রাখে, তাঁহার চলার পথকে কণ্টকমুক্ত করে, তাঁহার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে।

বলা বাহুল্য, এই সতর্কতা যেমন ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনই প্রযোজ্য লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রেও। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: সংসার করিতে দোষ নাই, সংসার কর। কিন্তু জানিয়া রাখিও, সংসার অনিত্য। সংসারের ঐশ্বর্য, মান-সম্মান অনিত্য। দেহের শক্তি, সৌন্দর্য অনিত্য। সংসারে ব্যাধি, ব্যথা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা বাস্তব সত্য। এই সমস্ত মনে রাখিয়া সংসারে থাক, কিন্তু মন রাখিও এই অনিত্য সংসারের পিছনে যিনি নিত্যস্বরূপ সত্তারূপে বিরাজমান তাঁহাতে। তিনি ঈশ্বর। ধনীলোকের বাড়িতে কাজের লোক থাকে। তাহারা বাড়ির মালিকের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করে। আপাতদৃষ্টিতে আপন সন্তানের মতোই তাহারা তাহাদের দেখে। হয়তো-বা মুখে বলে, 'আমার হরি' বা 'আমার অমুক', কিন্তু মনে মনে জানে যে, তাহাদের 'হরি' বা তাহাদের 'অমুক' তাহাদের গ্রামের কুঁড়েঘরে রহিয়াছে। এই যে জ্ঞান—ইহা সতর্কতা হইতে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের উদ্দেশে বলিতেছেন: ঠিক ঐ ভাবে তোমরা তোমাদের পরিজনদের দেখ, যেন তাহারা তোমাদের কত আপন, কত প্রিয়। কিন্তু মনে মনে এই বুদ্ধি জাগ্রত রাখিও যে, তোমাদের আসল আপন ঈশ্বর, আসল প্রিয় ঈশ্বর।

এই বুদ্ধি বা সতর্কতা একদিনে আসিবে না। ইহা অনুশীলনসাপেক্ষ—অভ্যাসসাপেক্ষ। কিন্তু অনুশীলন ও অভ্যাসের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ঐ ভাব মনে দানা বাঁধিতে শুরু করিবে এবং ঐ ভাব মনকে অধিকার করিবে। ক্রমে মনে অনাসক্তির ভাব প্রস্ফুটিত হইবে। এই অনাসক্তির মধ্যেই সংসারে সার্থক জীবনযাপনের মূল কৌশলটি নিহিত। এই অনাসক্তিকেই 'গীতা'য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন: "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। (গীতা, ২।৫০)

মনে রাখিতে হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণ কখনও বলিতেছেন না—কর্ম হইতে, সংসার হইতে সরিয়া থাক। বরং কর্মের মধ্যে, সংসারের মধ্যে আরও বেশি করিয়াই যুক্ত থাকিবার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন। কিন্তু সেই যুক্ত থাকার কৌশলটি অধিগত করিতে হইবে। সংসারের সকল কাজেই যুক্ত রহিব, কিন্তু সতর্ক থাকিব যেন সংসার আমাকে আসক্ত করিতে না পারে। নৌকা জলে ভাসে, ডাঙায় ভাসে না। কিন্তু নৌকার মধ্যে যদি কোনভাবে জল ঢুকিয়া যায় তাহা হইলে নৌকা আর জলে ভাসিতে পারে না, ডুবিয়া যায়। কিন্তু যদি নৌকায় জল ঢুকিবার পথ বন্ধ করিতে পারি, জল যাহাতে ঢুকিতে না পারে সেবিষয়ে সতর্ক থাকি তাহা হইলে অনায়াসে জলের উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিতে পারিব।

কাঁঠাল ভাঙিতে গেলে হাতে কাঁঠালের বিশ্রী আঠা লাগিয়া যায়। ঐ হাত তখন অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু কাঁঠাল ভাঙিবার আগে যদি হাতে তেল মাখিয়া লই, তাহা হইলে আর আঠা লাগিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। জলে নামিলে কুমিরের কবলে পড়িবার আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যদি গায়ে হলুদ মাখিয়া নামা হয় তাহা হইলে হলুদের গন্ধে কুমির কাছে আসিতে পারে না। এই যে 'হাতে তেল মাখা' অথবা 'গায়ে হলুদ মাখা'—শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, ইহাই হইল সতর্কতা। সংসারে যেমন সংযত জীবনযাপনের সুবিধা আছে, তেমনি আছে অধঃপতনেরও অবকাশ। কিন্তু যদি আমরা সতর্ক থাকি, আমাদের বিবেককে, আমাদের বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখি তাহা হইলে এই সংসার 'ধোঁকার টাটি' না হইয়া 'মজার কুঠি'তে রূপান্তরিত হইয়া যাইতে পারে। সংসারে আসক্তির 'আঠা' বা কামক্রোধাদি 'কুমির' যেমন আছে, তেমন আছে বিবেক-বৈরাগ্যরূপ 'তেল' বা 'হলুদ'-এর অনুশীলনের নির্দেশিকাও। নিত্য-অনিত্য, সৎ-অসৎ—এই বিচারের নাম বিবেক এবং সেই বিচারের দ্বারা অনিত্য ও অসৎ হইতে নিজেকে দূরে রাখিবার নাম বৈরাগ্য। কিন্তু যুক্তির শাণিত সতর্কতায় বুদ্ধিকে পরিশীলিত না করিলে বিচারে প্রবৃত্তি আসে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের মতো সেই সতর্কতা যেন আমাদের সর্বদা পরিচালিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, গ্রামাঞ্চলে চাষী-পরিবারের মেয়েরা ঢেঁকিতে ধান হইতে চিড়া কোটে। চিড়া কুটিবার সময় দেখা যায়, মেয়েরা একহাত দিয়া ঢেঁকির গর্তে ক্ষিপ্রভাবে ধান নাড়ে, আরেক হাতে শিশুসন্তানকে স্তন্য পান করায়, আবার খরিদ্দারের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাবও করে। সবই চলিতেছে, কিন্তু বার কি পনের আনা মন পড়িয়া রহিয়াছে হাতের উপর যাহাতে ঢেঁকির মুষলটা হাতে না পড়িয়া যায়। সতর্কতার কী মোক্ষম দৃষ্টান্ত! সতর্কতা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁকাল মাছের উপমাও দিতেন। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু একটুও পাঁক উহার গায়ে লাগিতে পারে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির সঙ্গে যুক্তিকে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছেন। এই যুক্তি বা বাস্তববাদিতার অঙ্গ হিসাবে তিনি প্রতিটি গৃহিভক্তকে অবশ্যকর্তব্যরূপে সঞ্চয়ের নির্দেশ দিয়াছেন। ভবিষ্যতের জন্য, লোক-লৌকিকতার জন্য, সাধু-ভক্তের সেবার জন্য, হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য, স্বজনবর্গের ভরণপোষণের জন্য সঞ্চয় দরকার। সঞ্চয় সতর্কতারই অঙ্গ এবং ধর্মজীবনের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই, বরং ধর্মজীবনের উহা সহায়ক। যুক্তির সহিত ভক্তি মিলিত না হইলে ভক্তি পর্যবসিত হয় ভাবালুতায়। জগন্মাতার নিকট তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'র জন্য। তাঁহার প্রার্থনা ছিল: মা আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও, আর এই কর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় বদ্ধ না হই। অপূর্ব প্রার্থনা! একই সঙ্গে ভক্তি এবং জ্ঞান। একই সঙ্গে ব্যাকুলতা এবং বিচার। একই সঙ্গে ধর্ম এবং বিজ্ঞান। সেজন্যই প্রত্যেকের কাছে তাঁহার সুস্পষ্ট নির্দেশ: "ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?" □

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ বেলুড় মঠ
হাওড়া, ভারতবর্ষ
২১ মার্চ ১৯২৮

প্রিয় ট্যানটিন জয়ানন্দ,[১]

আমার ধারণা এটা সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন শুধু ভারতাত্মা নয়—বিশ্বাত্মার পুনর্জাগরণের জন্য। এবং স্বামীজী ছিলেন শক্তিশালী লাল তাজা রক্ত। তাঁর অভ্যাগমন হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য, সেই ভাবগুচ্ছকে সুসংহত করে মানবজীবনের লক্ষ্য-সূচটি সতত উত্তরমুখীন অর্থাৎ ভগবদ্মুখীন করে দেবার জন্য।

আমি হতাশ হইনি। আমি জানি, এই প্রচণ্ড শক্তিমান আত্মাকে বরণ করে নেবার জন্য (সমাজ-) দেহকে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই ভাবতরঙ্গের সৃষ্টিকর্তা কারিগর, স্থপতি এসব নিশ্চিত পাঠাবেন সমাজ-অট্টালিকা পুনর্গঠনের জন্য। এ অট্টালিকা ও তার প্রাঙ্গণ এরূপ বিশাল হবে যে, জাতির পর জাতি এতে অন্বিত হবে, বিশ্বের সবকিছু হবে এর অন্তর্ভূত—এর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ শিবের তাণ্ডবনৃত্য নাচতে থাকবেন এবং যাবতীয় পুরনো দুর্বল নিষ্ক্রিয় চিন্তা-ভাবনাকে গুঁড়িয়ে ফেলবেন যা থেকে রামকৃষ্ণ-ভাবোন্মত্ত বাস্তুশিল্পী, নির্মাতা ও স্থপতিগণ যুগোপযোগী নতুন নতুন রূপদান করতে পারবেন।

তুমি জান, অতীতে যীশু, বুদ্ধ ও অন্যান্যদের সময়ে এধরনের ঘটনা ঘটেছিল, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস। শ্রীভগবান যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে এসকল ঘটনারাজি দেখবার জন্য রাবণজননী নিকষার মতো আমি বেঁচে থাকতে চাইব। নিকষার কাহিনীটি হচ্ছে—লঙ্কা (সিলোন) বিজয়ের পর রামচন্দ্র আদেশ করেছিলেন সব রাক্ষসদের ধরে তাঁর সম্মুখে হাজির করার জন্য। তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তিনি রাক্ষসদের ভয়মুক্ত করবেন। দূতেরা নিকষার কাছে যেতেই তিনি দৌড়ে পালাতে থাকেন। রাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তোমার ভয় পাবার কি হলো? তুমি বুড়ি হয়েছ, তোমাকে যদি বা আমি মেরেই ফেলি তাতে কি আর হবে? বুঝতে পারছ, তোমার শিয়রে শমন, তাছাড়া তুমি চোখের সামনে তোমার ছেলে ও নাতিদের মরতে দেখলে—এসব সত্ত্বেও তোমার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা!" এ কথা শুনে নিকষা সসম্ভ্রমে বললেন : "রাম, তুমি আমায় ভুল বুঝছ। শুধুমাত্র আমার এই জীবনটা দীর্ঘায়িত করার জন্য আমি পালাচ্ছিলাম না; আমার আকাঙ্ক্ষা—যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকি আমি তোমার নরলীলা আরও দেখার সুযোগ পাব।"

ব্রুস বার্টনের (Bruce Burton's) লেখা 'যে-মানুষটিকে কেউ চেনে না' ('The Man Nobody Knows')[২] পড়লাম। লেখক যদিও যীশুর জীবনালেখ্য নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে এঁকেছেন, এ গ্রন্থখানি সত্যসত্যই স্বামীজীরই জীবনী। পার্থক্য এই যে, লেখকের রচিত জীবননাট্য উন্মোচিত হয়েছিল জুডিয়াতে। সেই একজাতীয় আত্মপ্রত্যয়শীল, সহানুভূতিসম্পন্ন বীর্যবান পুরুষ নিজের জীবনোদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন! তিনি জানতেন তাঁর জীবনের পরিণতি। লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এক পতাকার নিচে তিনি কয়েকজনকে একত্র করেছিলেন, তিনি তাদের মধ্যে (অগ্নিময়) বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিলেন, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁকে (স্বামীজীকে) দেখবার ও তাঁর সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা এই গ্রন্থখানির যাবতীয় অংশে চিত্রিত যীশুখ্রীস্টের চরিত্র-অবয়বের মধ্যে স্বামীজীকে বিস্ফুরিত না দেখে পারে না।—এ বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত। গ্রন্থখানি আমাকে পাঠাবার জন্য এবং তোমার ইঙ্গিতবহ মন্তব্যের জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। গ্রন্থখানি পাঠ করে আমি আনন্দলাভ করেছি।

* ইংরেজী থেকে অনুবাদ : স্বামী প্রভানন্দ

১ মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের (Miss Josephine Macleod, 1858-1949) জন্ম আমেরিকার ইলিনয়ে। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা। কিন্তু তিনি নিজেকে 'স্বামীজীর বন্ধু' বলে পরিচয় দিতেন। "ভারতবর্ষকে ভালবাস"—স্বামীজীর এই নির্দেশকে তিনি জীবনব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন 'জো' বা 'জয়া' বলে। শ্রীমা সারদাদেবী তাঁকে ও তাঁর বোন মিসেস বেট্টী লেগেটকে যথাক্রমে 'জয়া' ও 'বিজয়া' নামে ডাকতেন। রামকৃষ্ণ সংঘে ছোট-বড় সকলেই তাঁকে ডাকতেন 'ট্যানটিন' (পিসিমা) বলে। স্বামী শিবানন্দ তাঁকে একটি বিশেষ নামে ডাকতেন, সেটা হলো 'জয়ানন্দ'।—অনুবাদক

২ The Man Nobody Knows (A Discovery of the Real Jesus)—Bruce Burton, The Bobbs-Merrill Co., Indianapolis, 1924—অনুবাদক

২

এ প্রসঙ্গে জানাই, আমরা ইতিমধ্যে 'The Man Nobody Knows' ও 'The Book Nobody Knows' গ্রন্থ দুখানির প্রত্যেকটির চারখানি করে পেয়েছি। এর একটা 'সেট' (set) আমার নিজের জন্য রেখেছি। আরেকটি করে সেট মঠ (বেলুড় মঠ), মাদ্রাজ ও মায়াবতী আশ্রমের গ্রন্থাগারের জন্য দিয়েছি। মেসার্স Leggule & Co. জানিয়েছে যে, তারা আমাদের সাত কপি ডাকযোগে পাঠিয়েছে; সম্ভবতঃ ভুল করে সাত সেটের কথা লিখেছে। পরবর্তী মেলের অপেক্ষায় আছি; গ্রন্থ পেলেই আমরা তাঁদের প্রাপ্তিসংবাদ দেব।

ইতিমধ্যে তুমি স্যার উইলকক্সের (Sir Willcocks)[৩] বক্তৃতালিপি পেয়ে থাকবে। তাঁর বক্তৃতা আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছে এবং আমাদের মনে হয়েছে যে, তাঁর ভাবনা বাস্তবমুখী। বর্তমানে প্রচলিত সেচব্যবস্থার যে-চিত্র তিনি উপস্থাপিত করেছেন, তা খুবই সত্য।[৪] আমার ধারণা, উইলকক্সের একান্ত নিশ্চয়তা সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সরকার সাহস করবে না এবং সরকার সেচের জল করমুক্ত করবে না। যা হোক, এবার বাজেটের প্রস্তাব উপস্থাপনার সময় স্বায়ত্তশাসনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার পেরো মিথা (Sir Peorah Mitha) ঘোষণা করেছেন যে, সেচের জল সরবরাহের জন্য তিনি সরকারকে এককোটি টাকা ধার করতে সম্মত করিয়েছেন। দেখা যাক, তিনি কি চাইছেন এবং উইলকক্সের পরিকল্পনা কতটুকু কার্যকর করা হয়। ইতিমধ্যে স্যার উইলকক্স (এদেশ থেকে) চলে গেছেন।

রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে আর কোন খবর আসেনি।[৫] তাঁর চিঠির যে-উত্তর আমি দিয়েছিলাম তার একটা নকল আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। আমি সে-সময়ে বারাণসীতে। তুমি সেটা কি এখনো পাওনি?

বশী[৬] ভগিনী ক্রিস্টিনকে নিয়ে খুব সম্ভবতঃ ২৫ মার্চ সকালের জাহাজে যাত্রা করবে। আমি শুনে খুবই খুশি যে, ভগিনী ক্রিস্টিন স্বামীজীর অনুমতি[৭] নিয়ে এদেশে ফিরে আসতে চায়। সুস্থ-সবল শরীর নিয়ে সে যদি ফিরে আসে তাহলে খুবই ভাল হয়। বশীর কাছে জানলাম যে, সে একটি বৃত্তি পেয়েছে এবং তাকে ঐ দেশে সম্ভবতঃ বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আমার প্রত্যাশা, তার বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি[৮] একটা প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিলাভ করবে।

পত্রিকা থেকে জানতে পারলাম যে, মহাত্মা গান্ধী জেনেভাতে অনুষ্ঠিতব্য যুবসম্মেলনে যোগদানের জন্য যাত্রা করতে পারেন। রোমাঁ রোলাঁর কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার পর তিনি পাকা সিদ্ধান্ত নেবেন। শ্রীভগবান এরূপ ছলাকলাহীন উপায়ে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সহিত পাশ্চাত্যের ধুরন্ধরদের মিলন ঘটিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাতে আমরা এখানে সুখেই আছি। তোমার ও ভগিনীদের ভাগ্যও অনুরূপভাবে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠুক। গতকাল রাত থেকে মঠে আমরা বৈদ্যুতিক আলো উপভোগ করছি।

আমার স্নেহসিক্ত শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ইতি
তোমাদের চিরস্নেহাবদ্ধ
শিবানন্দ

৩ পাণ্ডুলিপিতে বানান রয়েছে Sir Willcox, সঠিক বানান Sir [William] Willcocks।

৪ স্যার উইলিয়াম উইলকক্স ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার। ইনি মিশরের নীলনদ-সংক্রান্ত বিশাল সেচ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করেছিলেন। আমেরিকা যাওয়ার পথে মিস ম্যাকলাউড তাঁর সঙ্গে কায়রোতে দেখা করেন। তখন স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের বয়স ৭২ বছর। ম্যাকলাউডের একান্ত অনুরোধে তিনি দুবছর পরে কলকাতায় আসেন এবং বঙ্গদেশের সেচব্যবস্থার উন্নয়নের প্রকল্প রচনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুধীবৃন্দের সম্মুখে তিনি তাঁর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। বিদ্বজ্জন-সমাদৃত এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য ম্যাকলাউড দীর্ঘকাল চেষ্টা চালিয়ে যান। এমনকি ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়াভেলের কাছেও ম্যাকলাউড তাঁর অনুরোধ জানান। বঙ্গদেশকে পুনরায় শস্যশ্যামলা করে তোলার এই পরিকল্পনা ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত রূপায়ণ করেননি। (প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা রচিত 'Tantine' গ্রন্থ Sri Sarada Math, 1990 দ্রষ্টব্য)।—অনুবাদক

৫ বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ ধনগোপাল মুখার্জীর অনুরোধে এবং বিশেষ করে মিস ম্যাকলাউডের অনুপ্রেরণায় ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনী লিখতে অগ্রসর হন। রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎশিষ্য স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন।—অনুবাদক

৬ বশীশ্বর সেন (১৮৮৭—১৯৭১)। স্বামী সদানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের সকলেরই তিনি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করেন।—অনুবাদক

৭ আমাদের অনুমান, ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁর অন্তরের প্রার্থনায় স্বপ্নে বা ভাবে স্বামীজীর কোন প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন।—অনুবাদক

৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট শিক্ষানবিশী সম্পূর্ণ করে বশীশ্বর সেন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে বোসপাড়া লেনে 'বিবেকানন্দ রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ' নাম দিয়ে একটি কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে গবেষণাকেন্দ্রটি আলমোড়াতে স্থানান্তরিত ও সম্প্রসারিত হয়। সেখানে 'কুন্দন হাউসে' অবস্থিত এই বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্রটি তিনি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেন।—অনুবাদক

ভাষণ

বেলুড় মঠের বেদবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

স্বামী ভূতেশানন্দ

বেলুড় মঠে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন আমাদের কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে করতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি আরম্ভ করবার সময় আমাদের মনে কিছু সংশয় ছিল যে, আমাদের উদ্দেশ্য কতদূর সার্থক হবে। আরম্ভ হয়েছিল অবশ্য অতি ক্ষুদ্রভাবেই। কিন্তু একটি ভরসা ছিল যে, স্বামীজীর শুভ ইচ্ছা এতে প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে, আমাদের চেষ্টা নিরর্থক হবে না। স্বামীজীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল বেলুড় মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করার। তিরোধানের দিন বিকেলেও স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে স্বামীজী তাঁর বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "বেদপাঠে কি উপকার হবে?" স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন: "আর কিছু না হোক, কুসংস্কারগুলো তো দূর হবে।"

প্রাচীন যাকিছু তাকে উপেক্ষা করা, অবজ্ঞা করা, পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখা আমাদের যেন একটি স্বভাব। আমরা ভুলে যাই যে, একটা জাতির জীবন থেকে তার প্রাচীন অস্তিত্বকে, ঐতিহ্যকে বাদ দেওয়া যায় না। প্রাচীনের ভিত্তির ওপরে নবীনের সৌধ গড়তে হয়। ভিত্তি না থাকলে অট্টালিকা তো শূন্যে তৈরি করা যায় না।

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি যেন বেদমূলক হয়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিরূপ হচ্ছে বেদ। বেদকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে নানাদিক দিয়ে আমাদের প্রগতি হয়েছে। স্বামীজী প্রগতি চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন প্রাচীনকে অস্বীকার করে যেন এই প্রগতি না হয়। আমাদের মূল সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে নতুন একটা ধারাকে গ্রহণ করার অর্থ আমাদের অস্তিত্বকেই বিলীন করা। স্বামীজী এবিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। প্রাচীন এবং নবীন উভয় দিকেই তাঁর দৃষ্টি সমভাবে ছিল। প্রাচীনকে বাদ দিয়ে তিনি নতুনকে গড়তে চাননি, আবার প্রাচীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাননি। তিনি চেয়েছেন মূল ভিত্তিকে দৃঢ় রেখে, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জীবনকে রক্ষা করে যা কল্যাণকর, যা সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করতে সমর্থ তা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ভাব, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি থেকে গ্রহণ করতে হবে।

স্বামীজীর ইঙ্গিত অনুসারে প্রাচীন এবং নবীনের সমন্বয় করবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিতে আমরা বিস্মৃতপ্রায় বেদের পুনরালোচনার ব্যবস্থা করছি এবং আধুনিক শিক্ষাকে অস্বীকার না করে সে-শিক্ষারও কিছু অবকাশ এর ভিতরে রাখা হয়েছে যাতে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা প্রাচীনকে জেনে, তাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে নতুন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে, তাকে পরিপাক করে নিজের করে নিতে পারে। একটা আগাছার মতো করে নেওয়া নয়। তার প্রাণশক্তি তাকে যেভাবে গড়ে তুলতে চাইছে তারই অনুকূল পরিবেশ এখানে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটির আরম্ভ হয়েছে।

আগেই বলেছি, প্রতিষ্ঠানটি একটু সঙ্কোচ ও সংশয়ের সঙ্গে আরম্ভ করা হয়। ভবিষ্যতে এটি কি রূপ নেবে তা ক্রমে দেখতে পাব। এখন এইভাবে চলছে, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ কিভাবে গড়ে উঠবে আমরা জানি না। তবে এখানে চেষ্টা করা হবে যাতে প্রাচীন আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ও তাতে অবিচল থেকে এখানকার ছাত্ররা তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে নতুনের মধ্যে যাকিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করে নবীন আদর্শকে গড়ে তুলবে।

এই আদর্শকে 'নবীন' বলছি এই জন্য যে, এখন প্রাচীন যাকিছু তা প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে। আজকাল অনেকের রচনা পড়ে বা ভাষণ শুনে মনে সন্দেহ হয় যে, আমরা এই দেশেরই অধিবাসী কিনা—যেখানে ঋষিরা প্রথমে তাঁদের কৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে, তারই প্রতিষেধক হিসাবে প্রাচীনকে আবার স্মরণ করিয়ে দেবার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে।

আমরা আশা করব যে, এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে এবং এখানে যারা শিক্ষা পাবে তাদের দৃষ্টি উভয়মুখী হবে। প্রাচীন এবং নবীনের মধ্যে যাকিছু কল্যাণকর তারা তা নেবে এবং নবীন ও প্রাচীনকে আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করবে। স্বামীজী বলেছিলেন, সেই প্রাচীন যুগে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, যজ্ঞধূমে আবার এদেশের আকাশ আচ্ছন্ন হবে না। সেটাই বাস্তব। তা সত্ত্বেও প্রাচীনের ভিতরে যাকিছু শাশ্বত, যাকিছু সত্য ছিল তা যেন নষ্ট হয়ে না যায়। প্রাচীন আদর্শের কথা স্বামীজীর বারবার মনে হয়েছে এবং তার বিলোপের আশঙ্কা তাঁকে বেদনা দিয়েছে। তাই স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে এবং এর ভবিষ্যৎ সার্থকতা

তাঁর আশীর্বাদের ওপর নির্ভর করছে। আর নির্ভর করছে এখানকার ছাত্রদের শ্রদ্ধা, অধ্যবসায়, একপ্রাণতার ওপর। তাই আমরা এখানকার ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছি। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ক্ষুদ্র, এখানকার ছাত্ররাও অল্পবয়সী। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি এবং তার ছাত্ররা আমাদের কাছে তুচ্ছ নয়। এখানকার ছাত্ররা একটি গাছের নতুন চারা হয়ে এখানে এসেছে। তাদের পুষ্টির জন্য যাকিছু সম্ভব আমরা তা করব। বড় হয়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ তাদের আমরা দেব। কিন্তু গড়ে উঠতে হবে তাদের নিজেদের শক্তিতে। আলো, বাতাস, সার—সব তাদের দেওয়া হবে, কিন্তু সেগুলির ভিতর থেকে শক্তি আহরণ করে তাদের বড় হয়ে উঠতে হবে। এই ভাব নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি আরম্ভ করা হয়েছে। স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদ আমাদের ওপর চিরকাল আছে ও থাকবে। তাঁর ইচ্ছা বৃথা হবে না। সত্যসঙ্কল্প তিনি। একদিন না একদিন তাঁর সঙ্কল্প ফলপ্রসূ হবেই। যদিও আজ আমাদের দৃষ্টি খুব পরিষ্কার নয়, আমরা এখনো ভাল করে বুঝতে পারছি না কিভাবে এই শিক্ষা ধীরে ধীরে পরিণতি পাবে। বুঝতে না পারলেও এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা চলছি যে, একদিন না একদিন স্বামীজীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পূর্ণ হবে।

আগেই বলেছি, প্রাচীন শিক্ষা আমাদের ভিত্তিস্বরূপ হবে, কিন্তু সেই শিক্ষাকে কেবল একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে না রেখে তার জানালা-দরজা খোলা রেখে নবীন যাকিছু কল্যাণকর তাকে আমরা বরণ করে নেব এবং তাকে প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে, যাতে সমাজের কল্যাণ হয় এমনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা আশা করছি যে, তারা এর রূপায়ণে নিজেদের জীবনকে অর্পণ করে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবে।

আমি ঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি যাতে এই প্রতিষ্ঠানটি তার ক্ষুদ্র আকার থেকে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। লক্ষ্য স্থির রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এই প্রতিষ্ঠান দেশের একটা গুরুতর প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে সফল হবে। আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে ভুলে গেলে শুধু আমাদেরই নয়, সমস্ত বিশ্বেরই বিপুল ক্ষতি হবে। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য স্মরণ রেখে পরিচালকরা এই বেদবিদ্যালয়কে সেইভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। আমরা আশা করি, ছাত্ররাও আমাদের সেই আশাকে এবং স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে তাদের মনপ্রাণ নিবেদন করবে। আমরা পুনরায় ঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি—যারা এখানে শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য এসেছে তাঁদের কৃপায় তাদের জীবন যেন কল্যাণকর হয় এবং যাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন তাঁদের ওপরেও যেন তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।★ □

★ গত ২৯ জুন, ১৯৯৫ বেলুড় মঠে বেদবিদ্যালয়ে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ মহারাজজীর আশীর্বাণী।—সম্পাদক, উদ্বোধন

অনুধ্যান

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

সাধু ও গৃহি-ভক্তদের সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

বলে, রাজা মহারাজের কথা বলুন। ও কি আর যে-সে কথা! অনেক উচ্চস্তর থেকে বলতে হয়, মনটা অনেক উঠিয়ে শুনতে হয়। পবিত্র মনে শুনতে হয়, তবে তো বোঝা যায়। ওগুলো ঠিক বিশ্বাস করতে হয়। ঠাকুর বলতেন: "রাখাল আমার ছেলে। ওর সঙ্গে আমার নিত্য সম্বন্ধ, বেদের আদিতে যিনি তাঁর অংশের।" ঠাকুর ভাবচক্ষে রাজা মহারাজ সম্বন্ধে কত কি দেখতেন! বলতেন: "ও ব্রজমণ্ডলের রাখাল!"

রাজা মহারাজের কাছে যেতে সবাই একটা সম্ভ্রম-মিশ্রিত ভয় পেত। তার কারণ, তাঁর একটা spiritual halo (আধ্যাত্মিক আভা) ছিল। তাঁর কাছে গেলে সবার মনটাই spiritually (আধ্যাত্মিকভাবে) অনেক ওপরে উঠে যেত। তাঁর সান্নিধ্যের একটা great influence (বিরাট প্রভাব) ছিল। তিনি যা বলতেন তাই শুনতে হতো, যা করতেন তাই করতে হতো।

১৮৯৩ সালের জুলাই মাসের কথা। আবু পাহাড় থেকে মহারাজ এবং হরি মহারাজ বৃন্দাবনে এসে পৌঁছালেন। হেঁটে এসেছিলেন। এদিকে ভিক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হরি মহারাজ বললেন: "দেখা যাক, রাধারানীর কৃপা। ভিক্ষায় বের হব না।" সকালে এক শেঠ খাবার নিয়ে এল। প্রয়োজনমত তাঁরা নিলেন।

মহারাজের কাছে কয়েকজন সাধু তপস্যায় যাবার অনুমতি চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন: "তোদের শরীর-মন তপস্যার জন্য নয়। Work (কাজ)-কে worship (পূজা) হিসেবে নে। ওতেই হবে।"

১৮৯৫-এর গোড়ায় বৃন্দাবন থেকে মহারাজ মঠের (আলমবাজার মঠের) দিকে রওনা হলেন। হেঁটে এসেছিলেন বলে কয়েকমাস সময় লেগেছিল। তখন হরি মহারাজও সেখানে এসে গেছেন। মহারাজ মঠেই আছেন। স্বামীজীর plan অনুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করছেন। একবার দারুণ ম্যালেরিয়া। ওষুধের তো প্রশ্নই ওঠে না, এদিকে খাবারও নেই। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ), সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) প্রত্যেকে পরিব্রজ্যা থেকে ফিরে এসেছেন। মঠের তখন খুব আর্থিক অনটন। একদিন বলরাম মন্দিরে ১০৩°-১০৪° জ্বরে মহারাজ শুয়ে আছেন। বিকেলে একজন এসে জিজ্ঞেস করছে: "মহারাজ, আপনি কিছু খাবেন?" মহারাজ বললেন: "হ্যাঁ।" "কি খাবেন?" "যা পাওয়া যায়।" একবার সী— মহারাজের জ্বর হয়েছিল। তিনি খবর পাঠিয়েছিলেন, যদি খাবার জন্য একটু বিস্কুট ও একজন সেবক পাওয়া যায়, তাহলে ভাল হয়। ব্যবস্থা হলো। তার পরদিন বললেন: "বেদানা হলে ভাল হয়।" এই প্রসঙ্গে মহারাজ নিজের জীবনের উক্ত ঘটনাটি বলেছিলেন। বলেছিলেন: "ভগবানের ওপর যে তোমাদের নির্ভরতা নেই এবং তোমরা যে নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ব্যস্ত এতেই বেশ বোঝা যায়।"

ঠাকুরের শরীর যাবার পর থেকে মহারাজ পয়সা ছুঁতেন না। একবার একটি মেয়ে রাজা মহারাজকে কিছু দিতে চাইল। মহারাজ বললেন: "আমরা সর্বত্যাগী, আমাদের কিছুই চাই না।" মেয়েটি খুব পীড়াপীড়ি করাতে বললেন: "তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা হয়, তবে একটা ফতুয়া দিতে পার।" এই হচ্ছেন মহারাজ।

মহারাজ বলতেন: "ঠাকুর স্বয়ং ভগবান। অবতার হয়ে এসেছেন। এখন তোদের এখানে (মঠে) সবকিছুই আসবে। তোরা যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য ঠিক না রাখিস আর বিলাসিতায় ডুবে যাস, তবে ভেসে যাবি।"

মহারাজ বলতেন: "গৃহস্থ লোকের অন্ন খেলে তাদের সত্তা তোদের মধ্যে এসে যাবে। তোদের ত্যাগ-তপস্যা এমন থাকা চাই, যাতে ওটা কেটে দিতে পারে। না হলে গৃহস্থের মতো বুদ্ধি হয়ে যাবে।"

ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় করার বিরোধী ছিলেন ঠাকুরের ছেলেরা প্রত্যেকে। যোগেন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ) একখানা লেবুর জায়গায় তিনখানা লেবু কেটেছিলেন বলে মহারাজ তাঁকে বকেছিলেন। পরিবেশনের সময় ভাত মাটিতে পড়লে বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) বকতেন। প্রথমতঃ, ঠাকুরের জিনিস অপচয়

হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ, পরিবেশক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে। যাকে পরিবেশন করছি, তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কাজ দেখে লোকে বুঝবে আমার মনের গতি কোন্ দিকে। লোকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকলে কাজের বিকাশও তেমনি সুন্দর হবে। ঘর ঝাড়া, উঠান ঝাঁট দেওয়া— এসব মহারাজ খুব দেখতেন। গেস্ট হাউসে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখতেন ঝাঁট দেওয়া হলো কিনা। বলতেন: "সব কাজের ভেতরে যার একটা সুচুতা আছে, তার জপ জমবে।" মহারাজ একদিন আলুর খোসা ছাড়াতে বললেন। আলু ছাড়ানোর পর আলুর টুকরিগুলো নিয়ে আসতে বললেন। দেখে বললেন: "এই আলুগুলো যে ছাড়িয়েছে তার ধ্যান-জপ ভাল হয়।" সেই আলুগুলোর খোসা ছাড়িয়েছিলেন সুধীর মহারাজ—স্বামী শুদ্ধানন্দ।

মাখন মহারাজ (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) একরাতে ধ্যান করবেন বলে মঠে স্বামীজীর মন্দিরের পাশে বেলতলায় বসেন। যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন সেজন্য বেলগাছের সাথে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। মহারাজ সেকথা শুনে বলেছিলেন: "মন ভগবদ্‌মুখী না হলে ওভাবে বেঁধে কি হয়? আস্তে আস্তে অভ্যাস কর।"

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের কথা। ত্রিগুণাতীতানন্দজী তখন আমেরিকায় আছেন। কিন্তু বেলুড় মঠে মহারাজ একদিন ভাবচক্ষে দেখলেন ত্রিগুণাতীতানন্দজী তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরেই সেই মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। এই ঘটনায় মহারাজের খুব চিন্তা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমেরিকায় তার পাঠাতে বললেন। তাঁর আদেশে আমেরিকায় তার পাঠানো হলো। সেই তার আমেরিকায় পৌঁছানোর আগেই আমেরিকা থেকে খবর এল, একটি উন্মাদ যুবকের বোমার আঘাতে ত্রিগুণাতীতানন্দজী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন, হাসপাতালে ভর্তি আছেন। দিন পনের খুব কষ্টভোগ করে সারদা মহারাজ দেহত্যাগ করলেন। সেই খবর আসার কয়েকদিন আগেই মহারাজ তাঁর ঐ পূর্বের দর্শনের কথা আমাদের বলেছিলেন।

মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। সেখানে এক মেথরানী ছিল। সকলে মন্দিরে ঠাকুর-দর্শনে যায় দেখে তারও মন্দিরে ঠাকুর-দর্শন করতে ইচ্ছা হলো। সে তখন মহারাজকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল: "বাবা গো, আমারও বড় ইচ্ছে হয় মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর-দর্শন করতে। আপনি আমায় যেতে দেবেন? আমার কি সেখানে যাবার অধিকার আছে গো বাবা?" মহারাজ খুশি হয়ে বললেন: "কেন যেতে পারবি না? এই নে একখানা সাবান নে। ভাল করে কাপড়-জামা, শরীর পরিষ্কার করে পরিষ্কার কাপড় পরে ঠাকুর-দর্শন করে আয়।" মেথরানী তাই করল। কিন্তু একথাটি তার সমাজের লোকেরা জানতে পেরে তাকে নানারকম বলতে লাগল। বলল: "এ তুই কি করেছিস? কেন মন্দিরে গেলি? এতে নিশ্চয়ই তোর অকল্যাণ হবে।" মেথরানীটি তখন ভয় পেয়ে আবার মহারাজের কাছে গিয়ে সব বলল। মহারাজ তাকে অভয় দিয়ে বলতে লাগলেন: "তোর কোন ভয় নেই। ঠাকুর কারও অকল্যাণ করেন না, সকলের কল্যাণ করেন।"

ভুবনেশ্বর মঠ মহারাজের জায়গা। তিনি চাইতেন, এই মঠ হবে তপস্যার স্থান। বলতেন: "কত আর ঘুমোবি এখানে? চার ঘণ্টার বেশি ঘুমোনো রোগ বিশেষ।" মহারাজ চাইতেন এখানে নানা জাতের গাছ থাকবে, গরু থাকবে, সাধন-কুটির থাকবে। মহারাজ খুব আতা ভালবাসতেন। ভুবনেশ্বর মঠের চারিদিকে অনেক আতা গাছ ছিল।

মহারাজ দক্ষিণদেশে রামনাম-সঙ্কীর্তন শুনেছিলেন। সে-সুর অন্য ছিল। উনি এখনকার (মঠে) প্রচলিত সুন্দর সুর সংযোজন করেছেন। প্রথমে অন্যরকম করেছিলেন। ১০৮ রামনামের আগে পরে যে-স্তবকগুলি সংযোজিত হয়েছে তা মহারাজের নির্দেশে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) করেছিলেন। এই 'কনকাম্বর' বিষ্ণুদিগম্বর যখন গাইতেন তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। আহা সে কি ভাব! এই সুরটি ইমনকল্যাণ।

মহারাজকে পিছন থেকে ঠিক ঠাকুরের মতো লাগত, ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদরা বলতেন। একদিন হরি মহারাজ দেখেন, ঠিক যেন ঠাকুর বেড়াচ্ছেন। কাছে গিয়ে দেখেন মহারাজ। রাজা মহারাজ বেশ লম্বা-চওড়া ছিলেন। সেই রাজা মহারাজকে ঠাকুর অনায়াসে কাঁধে তুলে নিতেন।

একদিন রাজা মহারাজ আর বিজ্ঞান মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) কথা বলছেন, তখন স্বামীজীর ঘরের কাছে গঙ্গার ঘাটটা তৈরি হচ্ছে। নৌকায় করে চুন আসার কথা। মহারাজ বললেন: "যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে মুশকিল হবে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "না, না, বৃষ্টি হবে না।" মহারাজ তখন বললেন: "হ্যাঁ, বৃষ্টি হবে।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "না, কোথাও কিছু নেই, বৃষ্টি হবে না।" তখন দশ টাকা বাজি ফেলা হলো।

নৌকো যখন প্রায় ঘাটের কাছাকাছি এসেছে তখন মেঘ নেই, কিছু নেই হঠাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল। তখন রাজা মহারাজ বললেন: "দে, দে, বাজির টাকাটা দে!" এমনি ওঁদের ছেলেমানুষি ছিল।

হরি মহারাজ একদিন বলেছিলেন: "মহারাজের তপস্যা আপনা থেকেই হয়ে যেত। চরম অন্তর্মুখী মন। রাত সাতটায় জপ করতে বসলেন, সকাল আটটায় উঠলেন।"

একবার স্বামীজীর শিষ্য শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) মহারাজকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। মহারাজকে তামাক সেজে দেওয়া হয়েছে। আমি যখন সেখানে গিয়েছি, তখন অনেক কথা হয়ে গিয়েছে। কেবল মহারাজের কয়েকটি কথা শুনতে পেলাম। মহারাজ বলছেন: "দেখতে পাচ্ছি, নিত্য আর লীলার মাঝে যেন একটা fine (সূক্ষ্ম) কাঁচের পর্দা দেওয়া আছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এটা ভেঙে নিত্যে মিশে যাই। কিন্তু ঠাকুর দিচ্ছেন না।"

বাবুরাম মহারাজ ভক্তদের কাছে বলতেন: "মহারাজ বৃন্দাবনের রাখাল বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ঠাকুরের লীলাভিনয়ে তাঁর পালা গাইতে মহারাজ অবতীর্ণ হয়েছেন। জয় রামকৃষ্ণ! বহু জন্মের তপস্যার ফলে কেউ মহারাজের মতো মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে।" স্বামীজী বলতেন: "আধ্যাত্মিকতায় রাজা আমাদের সকলের চেয়ে বড়।"

মঠে আমরা কুটনো কুটতে বসেছি, বলছি: "কিরকম দেশে এসেছি, যেখানে আলু নেই!" বাবুরাম মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন: "কি বললি?" ঝুড়ি দেখিয়ে বললেন: "নে কোট, কত আলু খাবি—খা!"

কাশীতে তখন হরি মহারাজ থাকতেন। পিঠে ভীষণ কার্বাঙ্কল। কলকাতা থেকে নামকরা সার্জন ডাঃ ভট্টাচার্য গেছেন অপারেশন করতে। গিয়ে দেখেন সদানন্দ পুরুষ হাসিমুখে বসে আছেন। আনন্দ যেন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে। হরি মহারাজ অনেকক্ষণ ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করলেন। গল্প শুনতে শুনতে ডাক্তার ভুলে গেলেন তিনি রোগী দেখতে এসেছেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পরে বললেন: "আমি এসেছি আপনার শরীরে অপারেশন করতে।" তখন হরি মহারাজ আস্তে আস্তে তাঁর গায়ের চাদর উঠিয়ে ফোঁড়াটি দেখালেন। ডাক্তার দেখে চমকে উঠলেন। বললেন: "মহারাজ, আপনি কি করে এত বড় ফোঁড়া নিয়ে বসে গল্প করছেন!" তিনি বুঝতে পারলেন না যে, কি করে শরীরে এত কষ্ট সত্ত্বেও মন এত আনন্দে মগ্ন!

ভগবানকে পেতে গেলে নিঃস্বার্থভাবে ব্যাকুল হতে হবে। কোনকিছুর জন্য ভগবানকে ডাকা নয়, শুধু তাঁকে পাওয়ার জন্যই ডাকা। তাঁকে পাওয়ার জন্যই ব্যাকুল হওয়া। ঠাকুরের ছেলেদের কেমন ব্যাকুলতা দেখেছি! তাঁরা প্রত্যেকেই পরম সত্যকে ঠাকুরের কৃপায় জেনেছিলেন নিজের নিজের ভাব অনুযায়ী। তাঁদের কারো কিছু বাকি ছিল না, ঠাকুর তাঁদের সব করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু ঠাকুরের নির্দেশে তাঁরা সেগুলিকে নিজস্ব করে নেবার জন্য সাধন-ভজন করেছিলেন। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ৫/৬ বছর তাঁরা কঠোর তপস্যা করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়া নেই, পোশাক-পরিচ্ছদ নেই—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন যা পাচ্ছেন, দুটি মুখে দিয়ে আবার ব্যাকুল হয়ে তাঁর নামে, তাঁর ধ্যানে মশগুল হয়ে রয়েছেন। খাবারের কোন বিচার নেই। বিচার করবার সময় নেই। কী সব দিন গেছে তাঁদের!

ঠাকুরের ত্যাগী পার্ষদরা প্রত্যেকেই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁদের নজর ছিল না। কঠোর ত্যাগ করে করে তাঁদের জীবন গঠন তাঁরা করেছিলেন। অপরিগ্রহ অভ্যাস করতে হবে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়ে মন-মুখ এক করতে হবে। নাহলে বিলাসিতার সঙ্গে adjustment হয়ে যাবে। ঠাকুর বারবার বলতেন: "মন-মুখ এক করতে হবে।"

কাজকর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁদের যত্ন ছিল কত! তখনকার দিনে কুটনো কোটার খুব attraction (আকর্ষণ) ছিল। বাবুরাম মহারাজ নিজে বসে ঠাকুরের কথা বলতেন। তাই আমাদের মন বহির্মুখী হতে পারত না। আমাদের কাজের ভাগ করে দেওয়া ছিল। হ্যারিকেনের ফিতেটা পর্যন্ত ঠিক করে কাটতে হতো। নতুবা বাবুরাম মহারাজ বলতেন: "তোমরা কি ব্যাগার দিতে এসেছ?" অবশ্য তাঁদের সব বিষয়েই খুব নজর ছিল। কারণ, তাঁরা মনে-প্রাণে বলতেন যে, সব কাজই ঠাকুরের। তাঁরা আমাদের চেষ্টা করাতেন কিভাবে কাজ করলে সব মনটা ঠাকুরের দিকে যাবে। বলতেন: "সব কাজই আমাদের ঠাকুর শিখিয়েছেন।" *[ক্রমশঃ]*

বিশেষ নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ আধুনিক ভারত ঃ সত্যযুগ

সুমণি মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ফাল্গুন ১৪০২ সংখ্যার পর]

তবুও 'হ্যাঁ-বটে-কিন্তু'র কবল থেকে নিস্তার পাবার জন্যে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ-এর দ্বারস্থ হলাম। উনি স্বামীজী-সংক্রান্ত প্রশ্নে সবিনয়ে বলছেন ঃ "We are today at a critical period not merely in the history of our country but in the history of the world. ... Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission, which has centres in India and abroad. I know of the splendid work which that Mission is doing in the way of spiritual enlightenment and social service. We owe that Mission to his farsighted vision, and I have no doubt that it will continue for many years to come to function for the spiritual succour and the physical sustenance of the large part of humanity which is now enmeshed in materialism, crude and trivial. ... And if there is any call which Vivekananda made to us, it is to rely on our spiritual resources... inexhaustible spiritual resources. ... There is nothing inevitable in this world, and we can ward off the worst dangers and worst disabilities with which we are now faced."[২৪] (আমরা আজ শুধু ভারতের নয়—বিশ্ব-ইতিহাসের একটা সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা ভারতে এবং বহির্ভারতে শাখায়িত। মানুষকে অধ্যাত্ম-আলোয় সমুজ্জ্বল করার ও সমাজসেবার মাধ্যমে তাদের কর্মনিষ্ঠার কথা আমি জানি। বিবেকানন্দের দূরদৃষ্টির সাকার রূপ হিসেবে আমরা এই মিশনকে পেয়েছি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এই মিশন অনাগত বহুকাল ধরে বিশ্বের অধিকাংশ দুর্গত মানুষের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক দুঃখ-দুর্দশার মোকাবিলা করবে—যারা আজ তুচ্ছ ও অমার্জিত জড়বাদে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতি বিবেকানন্দের একটি মাত্রই বাণী—নিজেদের অফুরন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে আস্থাবান হতে হবে। ভবিতব্য বলে দুনিয়ায় কিছুই নেই। [এই বাণীর শক্তিতে] আমরা আজ যে-পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, সেই মহাপ্রলয় ও নিজেদের সাংঘাতিক অক্ষমতাকে আমরা প্রতিহত করতে পারি।)

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক-দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি ঐ একই আশ্বাস দিলেন ঃ "At this supremely dangerous moment of human history, the only way of salvation of mankind is an Indian way. ... Sri Ramakrishna's testimony to the harmony of religions can make it possible for human race to grow together into a 'single family' and in the Atomic Age, this is the only alternative to destroying ourselves."[২৫] (মানব-ইতিহাসের এই প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তে বিশ্ববাসীর বাঁচার একমাত্র পথ—ভারতীয় পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' ঘোষণা বিশ্বের সব মানুষকে কাছে টেনে 'একান্নবর্তী' করতে পারে—আর এই 'পারমাণবিক যুগে' এই হচ্ছে আমাদের আত্মহননের একমাত্র বিকল্প।)

সমাজতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক বিনয় সরকার বলছেন ঃ "Vedanta has been tending to break down the distinctions between the modern peoples,... working hand in hand in diverse fields of social endeavour both at home and abroad. The movement was pioneered by Vivekananda. ... Until Vivekananda came

২৪ Our Heritage—S. Radhakrishnan, Oriental Paperbacks, Delhi, 1976, pp.97-98

২৫ Foreward: Sri Ramakrishna and His Unique Message -Swami Ghanananda, Advaita Ashrama, 5th ed., 1987, pp. viii-ix

upon the scene modern India's position in the cultural trade with the rest of the world was almost exclusively 'passive'. But with Vivekananda began an 'epoch' in which men and women of India have been functioning also as active partners and creative collegues in spiritual commerce of mankind.

"...The neo-Vedantic positivism of the Gangetic Delta of today is but six thousand year old Indian tradition of 'digvijaya'—world conquest, and elevation of the most diverse races and classes to soul-enfranchising ideals and activities that Vivekananda and after him the Swamis of the Ramakrishna Order have been pursuing under modern conditions, thereby exhibiting the virility and strenousness of Hindu humanism and spirituality. ... It has proved to be a powerful unifying force calculated to strengthen the foundations of World peace."[২৬] (বেদান্ত আধুনিককালে মানুষে মানুষে বৈষম্য উচ্ছেদে তৎপর। কি দেশে কি বিদেশে—সবাই হাতে হাত মিলিয়ে সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। বিবেকানন্দই এই বেদান্ত-আন্দোলনের পথিকৃৎ। বিবেকানন্দের আবির্ভাবের আগে বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগে আধুনিক ভারতের ভূমিকা প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু বিবেকানন্দের আবির্ভাবে একটা নবযুগের [সত্যযুগের?] অভ্যুদয় হলো—যে-যুগে ভারতের পুরুষ ও মহিলারা মানবজাতির অধ্যাত্মচেতনার উদ্বোধনের ব্যাপারে সক্রিয় অংশীদার তো বটেই—সৃজনশীল সহযোগীও। আজ গাঙ্গেয় বদ্বীপের (বাংলার) এই 'নব বেদান্তের' প্রত্যক্ষবাদ আসলে ছ-হাজার বছরের প্রাচীন 'দিগ্বিজয়'-এর ঐতিহ্য। আর বিশ্বের বহুবিচিত্র জাতিকে ও শ্রেণীকে উন্নীত করে তাদের মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার কাজে, প্রথম বিবেকানন্দ এবং পরে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরা আধুনিক অবস্থা অনুযায়ী চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা হিন্দু মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ় করার কাজে এটা যে একটা পূর্বনিরূপিত ঐক্যসাধনের প্রবল প্রয়াস—সেইটাই প্রতিপন্ন হচ্ছে।)

তাঁর 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তনে' ঐ একই কথা : "নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতে রামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংঘের আত্মসংযম, আত্মোৎসর্গ ও সমাজসেবা বর্তমান শতাব্দীর জনগণের জীবন্ত ধর্ম হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিবেকানন্দের বাণী ও কার্যধারার একখানি বিশ্বকোষ প্রণীত হইতে পারে।"[২৭]

রাশিয়ার প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ রিবাকোভ সত্যযুগ-উদ্বোধনের প্রতীক 'উদ্বোধন'-এ এসে যেকথা শুনিয়ে গেলেন, তা অনেকেরই বিশ্বাসের মরা আঁচে বিশুদ্ধ কেরোসিন। উনি বললেন : "সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের সময় সেদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা... সম্ভবতঃ কাকতালীয় নয়, এর একটি প্রতীকী তাৎপর্য আছে।"[২৮]

॥ ৭ ॥

বিভিন্ন মনীষীর উপরি-উক্ত আলোচনার পর আমরা আর স্বামীজীর 'সত্যযুগে'র 'স্বপ্ন'কে বিফল মনে করে হাতছাড়া করতে রাজি নই, যদিও স্বামীজী বলেছিলেন, বিফল হলেও কিছু এসে যায় না, স্বপ্ন স্বপ্ন হলেও রূঢ় বাস্তবের চেয়ে ঢের ভাল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কাছে তো জগৎটাই স্বপ্ন, মায়া, মিথ্যা। কিন্তু যাদের কাছে স্বপ্ন নয়, তাদের স্বপ্ন ভাঙানোর জন্যই তো তাঁর আসা। তাই তাঁকে সত্যমিথ্যার মাঝখানে থাকতে হয়। জগৎকে সত্যজ্ঞানও তাঁকে করতে হয়, আবার মিথ্যাজ্ঞানও করতে হয়। তিনি একসময় বলেছিলেন : "এই বীভৎস নরককুণ্ডে আর আসব না—I hate this world—this dream—this horrible nightmare."[২৯] (আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে—এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে।) আবার এও তো বলেছিলেন : "May I be born again and again."[৩০] (আমি যেন বারবার জন্মগ্রহণ করি।)

২৬ The Might of Man in the Social Philosophy of Ramakrishna and Vivekananda -Benoy Kr. Sarker, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, 2nd ed., pp. 41-46

২৭ নয়া বাংলার গোড়াপত্তন—বিনয়কুমার সরকার, ২য় ভাগ, ১৯৩২, পৃঃ ৩৩৮

২৮ উদ্বোধন, ৯৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০২, পৃঃ ২০৪

২৯ Letters of Swami Vivekananda, 2nd ed., 1943, p. 193

৩০ Ibid., p. 304

আবার বলছেন : "A time must come when that Oneness, the Harmony of Oneness, will pervade the whole world. The whole of mankind will become 'Jivanmuktas'—free whilst living."[৩১] (এমন দিন আসবেই আসবে, যখন সেই একত্ব—[শ্রীরামকৃষ্ণের] একত্বের সমন্বয় সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত হবে। আর বিশ্বের গোটা মানবসমাজ জীবন্মুক্ত হয়ে নড়েচড়ে ঘুরেফিরে বেড়াবে।)

এই বিবেকানন্দই আচার্যবরিষ্ঠ বিবেকানন্দ।

॥ ৮ ॥

আমার সিদ্ধান্তেও আর কোনরকম নড়চড় নেই। রামকৃষ্ণ—Modern India—সত্যযুগ, তিনে এক—একে তিন তো বটেই—মনে হচ্ছে আরও বেশি কোন কিছু। স্বামীজী সবশেষে ঠাকুরের ঐ যে 'Harmony of Oneness'-এর কথা শোনালেন—যার 'সাতফোকরের রাগরাগিণী' বিশ্বের বিচিত্র মানবসমাজকে 'অদ্বৈত'-মঞ্চে টেনে তুলে 'জীবন্মুক্ত' করতে বদ্ধপরিকর, তাতে 'Modern India'-র জনকই যে 'Modern World'-এর জনক—এই ইঙ্গিতটা প্রকট। অশ্রুতপূর্ব এবং অচিন্ত্যপূর্ব এই অত্যাধুনিক মানসিকতা যখন 'বর্তমানেই' শুধু নয়—ভবিষ্যতেও 'বর্তমান', তখন তা 'আধুনিক'ও নয়, 'পৌরাণিক'ও নয়—চিরন্তন। 'চিরন্তন'কে চিরন্তন বলাই নিরাপদ—'কেমন ঘি না যেমন ঘি'। সেহিসেবে নিবেদিতার নিজের গুরু ও তাঁর গুরুর গুরু সম্বন্ধে ঐ একপেশে ইঙ্গিত (যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই উদ্ধৃত হয়েছে) নিঃসঙ্কোচে নাকচ করা চলে। আবার মজা করে এও বলা যেতে পারে—নিবেদিতার গুরু 'কোট-প্যান্ট' পরেও 'পৌরাণিক', বিবেকানন্দের গুরু "half-naked" হয়েও "modern mind in its completeness"।

তাঁর মনের মধ্যে 'একাল'ও আছে 'সেকাল'ও আছে, আবার 'আসছে কাল'ও আছে—যেহেতু তা 'চিরন্তন'। তবে ঐ তিনটের প্রথম দুটোর কোন একটার ওপর জোর দেওয়া চলে না। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুকে 'Modern' বলেননি—'Modern India'-র জনক বলেছেন, দুটো এক নয়।

আর খাস বিবেকানন্দের মুখে শুনেই যদি নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে আসেন, তাহলে যোগীন মহারাজের (স্বামী যোগানন্দ) উপদেশমত[৩২] যদি একবার মা-ঠাকরুনের কাছে যেতেন তাহলে দেখতেন মা বলতেন : "হ্যাঁ বাবা, নরেন ঠিকই বলেছে—ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে 'সত্যযুগ' আরম্ভ হয়ে গেছে।"[৩৩]

এখন ঠাকুর কি-'minded'—'একেলে' কি 'সেকেলে'—তা জানতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর 'mind'-এর ঠিকানাটা আমাদের জানা দরকার—অবশ্যই স্থায়ী ঠিকানা (permanent address)। অর্থাৎ কোন্‌খানে তাঁর মনের স্থায়ী অধিষ্ঠান।

পাড়ায় ডাকাতি হলে থানায় জানালে পুলিস শুনেই হাতকড়া, দড়াদড়ি প্রভৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে না—আগে জানতে ছোটে ডাকাতদল কোথায় আস্তানা গেড়েছে। ধরা-বাঁধা তার পর। সেইরকম ঠাকুরের মনের ঠিকানা না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি 'পৌরাণিক' কি 'আধুনিক'—কার বলার হিম্মত আছে? বিবেকানন্দেরও নেই। কামারপুকুর-দক্ষিণেশ্বর-শ্যামপুকুর-কাশীপুরে তিনি ছিলেন বটে কিন্তু শোনা যায়, তাঁর মন কোনদিনই সেখানে থাকেনি।

তাহলে ঠাকুর ও ঠাকুরের মনের 'হাঁড়ি' কি আলাদা? বিজ্ঞেরা বলেন—নিশ্চয়ই। আমাদেরও নাকি একান্নবর্তী নয়। তবে আমরা আমাদের মনের খবর রাখি না—রাখতে চাইও না—আজীবন দেহাত্মবুদ্ধির 'ঘরজামাই' হয়ে থাকার ফলে মনের ঠিকানাও ভুলে গেছি। আমাদের মনের permanent address তাই 'শ্বশুরবাড়ি'। সেখানে আমাদের 'পুঁচকে আমি'গুলো হাঁড়ির ফুটন্ত জলে আলু-পটলের মতো লাফায় আর মনে করে, আমি আমার নিজের শক্তিতেই লাফালাফি-নাচানাচি করছি; তাই 'হাম্বা-হাম্বা' রবে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াই—'আমিই তো অমুকের অমুক, তমুকের তমুক ব্যবস্থা করে দিলাম—কেউ তো এগিয়ে এল না।' ভুলেও একবার ভাবি না, তলা থেকে ঐ 'বিরাট আমি'র কাঠের জ্বালটা সরিয়ে নিলেই আমরা সব 'ঠুঁটো জগন্নাথ'—হাত-পা নাড়ারও শক্তি থাকে না! এক্ষেত্রে অবিশ্যি হাত-পা-ই থাকে না।

৩১ 'Complete Works', Vol. II, p. 188

৩২ যোগানন্দ মহারাজ স্বামীজীর কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সারদানন্দ মহারাজকে বলেছিলেন : "শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি—তুই মাকে ধর, মা যা বলবেন তাই ঠিক।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৭০)

৩৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৫৩, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৭৯

বিশেষজ্ঞরা ঠাকুরের মনের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে নিজেদের বিশেষরূপে অজ্ঞ মনে করেন, তবে শাস্ত্রাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে অনুমান করেন—ব্রহ্মের 'স্বগতভেদে'র দরুন 'নির্গুণ' ও 'সগুণের' মাঝবরাবর যে 'বিরাট আমি'র আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী পাঁচিলটা আছে—সেইটাই নাকি ঠাকুরের মনের 'permanent address' (স্থায়ী ঠিকানা)।

পাঁচিলের আবার address কি? বাড়িরই তো address হয়—আমাদের মনের permanent address যেমন 'শ্বশুরবাড়ি'। হয়। বিশ্বের সবকিছুরই ঠিকানা আছে। ঠাকুর গভীর রাত্রে অন্ধকারেও দেশলাই এনে পিলসুজ জ্বালাতেন—দেশলাইয়ের ঠিকানা জানতেন বলেই তো।

যাই হোক, বিশ্বের স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় 'মন'কে পকেটে পুরে (অবশ্যই ফতুয়ার) ঠাকুরের 'বিরাট আমি'টা অনন্ত ভাবতরঙ্গে তরঙ্গিত 'বিরাট মন' নিয়ে (আসলে কোনটাই ওঁর নয়—দুটোই ঈশ্বরের, উনি বারো বছর অবিরাম 'ডনবৈঠক' দিয়ে গায়ের জোরে গায়েব করেছেন) 'স্বগতভেদে'র এই অত্যুচ্চ পাঁচিলে উঠে সার্কাসে তারের ওপর দিয়ে হাঁটা 'বিবি'র মতো যথাসাধ্য ভারসাম্য বজায় রেখে 'দুহাত তুলে' নেচে নেচে বেড়ান—'একহাত বগলে টিপে' নয়। আশ্চর্য! পাঁচিলটা লম্বায় অনন্ত হলেও চওড়ায় শুনেছি, বেশি নয়—তবে বেশ উঁচু। অবিশ্যি মাঝেমাঝে যে balance (ভারসাম্য) হারিয়ে মাথা ঘুরে 'ওপারে', মানে 'নির্গুণে'র দিকে পড়ে যান না তাও নয়—প্রায়ই যান; তবু আবার 'জল খেয়ে', 'তামাক খেয়ে' চাঙ্গা হলে ফের ঐ পাঁচিলে তাঁকে দেখা যায়! তবে বলতেই হবে, 'এপারের' গিন্নী, মানে 'সগুণে'র গিন্নী এ-ব্যাপারে ওঁকে প্রভূত সাহায্য করেন। তাঁর ইচ্ছে নয়, উনি 'ওপারে' বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন—তাহলে আমাদের মতো 'ঘরজামাই'দের হুঁশ আনবে কে? কেই বা আমাদের নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে দেবে?[৩৪]

শাস্ত্রাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে ঠাকুরের ঐ 'বিশ্বব্যাপী মনে'র ঠিকানা পেলেও কোনদিনই তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না—বিশ্বের সবকিছুতেই অনুপ্রবিষ্ট কিনা। তাই তাকে বাঁধার মতো দড়ি কিংবা হিম্মত দুনিয়ার কোথাও নেই। খোদ বিবেকানন্দের মতো সমর্থ ব্যক্তিও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেন—কিছু করার নেই। তাই নিবেদিতার গুরু বিবেকানন্দ তাঁর নিজের গুরু সম্বন্ধে কখনোই মুখ খুলতে চাইতেন না। একবার ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হলে সন্ত্রস্ত হরিণের মতো 'দুহাত পেছিয়ে গিয়ে' ঐ ত্রিলোকসন্ত্রাসী পুরুষসিংহকে ত্রাসবিকম্পিত স্বরে হাতজোড় করে বলতে হয়েছে—"দেখুন গিরিশবাবু, আমায় ঐ অনুরোধটি করবেন না। ওকাজ ছাড়া আমাকে আর যা কাজ বলবেন, আমি তাই আনন্দে করব। যদি পৃথিবী ওলটপালট করে ফেলতে বলেন তো সেও আচ্ছা, কিন্তু ঐ কাজটি পারব না। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এত বড় ছিলেন, আমি তাঁর কিছুই বুঝতে পারিনি, তাঁর জীবনের এক কণাও জানতে পারিনি। শেষে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে বসব! আমি তা পারব না।"[৩৫]

"His character was so great that if I, or any of his disciples spent hundreds of lives, we could not do justice to a millionth part of what he really was."[৩৬] (তিনি এতই মহানচরিত্র ছিলেন যে, আমি বা তাঁর অন্যান্য সন্তানরা যদি শত শত জন্ম ধরেও বোঝবার চেষ্টা করি, তবুও আমরা তাঁর লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগও বুঝতে পারব না।)

তাই যিনি 'আধুনিক ভারতে' রক্তমাংসে আবির্ভূত হয়ে 'সত্যযুগের' পত্তন করে গেলেন, সেই 'নিত্য বর্তমান' শ্রীরামকৃষ্ণকে অনন্যোপায় হয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধ বিবেকানন্দ তাঁর অনন্ততাকে কোন নড়বড়ে বিশেষণে খণ্ডিত না করে বেপরোয়া ডবল বিশেষ্যে বিশেষিত করতে বাধ্য হয়েছেন এবং আত্মদীনতায় কুণ্ঠিতচিত্তে তাঁর পাদপদ্মে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের permanent address-এ পাড়ি মেরেছেন—"ভায়া রামকৃষ্ণ পরমহংস যে 'ভগবানের বাবা'—তাতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস—তস্য দাস দাস দাসোঽহম্।"[৩৭]

একশবার। নইলে অনলোদ্গারী বিবেকানন্দ—যাঁর মুখে আমরা চিরদিন 'সোঽহং'-এর সিংহনাদ শুনতে অভ্যস্ত, যে "কাকেও care করে না—আমারই [গুরু রামকৃষ্ণের] অপেক্ষা রাখে না"[৩৮]—সে কেন তাঁর 'জন্ম-জন্মান্তরের দাস' হয়ে 'সোঽহং'-এর রাজকীয়তাকে 'দাসোঽহম্'-এর নমনীয়তায় খোয়াতে যাবে? [সমাপ্ত]☐

৩৪ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ২য় ভাগ, পূর্বার্ধ, গুরুভাব, ৩য় অধ্যায়
৩৫ শিবানন্দ-বাণী, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১২৯-১৩০
৩৬ Lectures from Colombo to Almora, Advaita Ashrama, 5th ed., 1947, p. 243
৩৭ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪
৩৮ 'কথামৃত', ১।৭।৬

প্রদোষে

মঞ্জু নন্দী মজুমদার

সিঁদুর রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
দিনের পরিক্রমা শেষে
সূর্য গেছে অস্তাচলে
পশ্চিম দিগন্ততটে।
শান্ত এমন সাঁঝবেলাতে
মনোহরণ স্নিগ্ধ রূপে
সন্ধ্যাতারা দেয় যে দেখা
শান্ত মেদুর গগনপটে॥

দিনের খেলা সাঙ্গ করে,
দলে দলে পাখিরা সব
ফিরছে কুলায়
ক্লান্ত ডানার সঞ্চালনে।
নতুন খেলা খেললে তুমি,
নতুনভাবে দিলে দেখা
অনেক দূরে, তবু কাছে
দিনের শেষে সন্ধিক্ষণে॥

দাঁড়াও এসে অলিন্দেতে,
হাঁটছ বিলম্বিত লয়ে,
বসছ কখন সিংহাসনে—
ধরা দিয়েও রও অধরা।
অবাক অপার বিস্ময়ে তা
নির্নিমেষে দেখছে চেয়ে,
সাঁঝ-আকাশের মৃগশিরা
রোহিণী আর লুব্ধকেরা॥

জমাটবাঁধা ভক্তি-জোয়ার
ছিল ভাবের অলিন্দরে,
হিল্লোলে ও কল্লোলে তা
আছড়ে পড়ে সবার মনে।
স্তব্ধ বিশাল মানবমেলায়
ভক্তজনের কণ্ঠ থেকে
আকুল সুরে আসছে ভেসে
"দয়া কর দীনজনে"॥

যে-সেতু মানুষের মুক্তিদাতা

শেখ আবদুল মান্নান

আমার চারপাশে একটা দাম্ভিক বৃত্ত রচনা করা
এখানে সমীহ নয় ভয়ের সঙ্গে ভালমন্দের ফারাক
একটা তাজা গোলাপের শেষ ঘ্রাণ...
জীবনের 'লাস্ট সাপার',
ফুটন্ত বুদ্বুদের কাছের মানুষ আমরা
সারা গায়ে সুখ মেখে দরজায় খিল দিয়ে বসে থাকি,
ঐশী প্রেরণায় দীপ্ত আচার্য উদাত্ত কণ্ঠে
শোনায় দরদী ও সুরসিক স্বর...।
শাশ্বত সনাতন বেদান্তের সুর কোকিলের
কণ্ঠ বেয়ে অনায়াসেই দিগ্বিজয় সম্পন্ন করতে পারে
একটা মসৃণ, কুসুমাস্তীর্ণ সেতু অনায়াসেই
সাত রঙের বর্ণালী... এক সূর্যকিরণ
জ্যোতির বর্ষণই সমান মুক্তিদাতা
বিষণ্ণ মুখগুলো সারবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তায়
জ্যোতির জ্যোৎস্নায় অভিস্নাত হবার ব্যগ্রতায়...॥

কথা দিয়েছিলে

নন্দিনী মিত্র

পৃথিবীর শেষ আশ্রয়টুকু হারিয়ে যাবার সময়ে
সবার অলক্ষ্যে তুমি এসে হাত ধরবে—
সেইরকম কথাই তুমি দিয়েছিলে।
সারাক্ষণ খেলার সময় অনেক ধুলোকাদা মেখেছি,
তা মুছিয়ে দিতে চেয়েছ তুমি,
অনেক কিছু নিজের করে আঁকড়ে ধরেছি
রঙিন খেলনা যত;
নির্বাসনা হতে পারিনি, হতে চাইনি বোধহয়,
কিন্তু তোমাকে পাবার বাসনা
মনের গহনে থেকেই গিয়েছিল।
তাই তো তোমার দেওয়া সেই অভয়মন্ত্র
রণিত হয়ে চলেছে অহরহ—
"বিধিরও সাধ্য নেই আমার সন্তানের অমঙ্গল করে"!
আর যতই দূরে দূরে থেকেছি,
স্নেহমাখা চাহনি দিয়ে
আমার অজান্তে আমাকেই কাছে টেনেছ,
কারণ, তুমি যে "সত্যিকারের মা"!

বাঁশরি বাজাবে কবে ?

স্বামী জ্ঞানালোকানন্দ

এমন সুদিন হবে কি যখন
আমাতে তুমিই রবে
শুধুই তোমার মননে এমন
পূর্ণ মগন হবে।

আহার নিদ্রা সকল ভুলিয়া
এ মন কেবল তোমার লাগিয়া
পথপানে সদা রহিবে চাহিয়া
আর কিছু নাহি চাবে।

মধু আহরণে ভ্রমর যেমন
পুষ্পে পুষ্পে করে বিচরণ
সেই মতো কবে তনু প্রাণ মন
তোমাতে মগন হবে ?

ধনুর্ক্ষিপ্ত শরের মতন
তোমা পানে বেগে ধাইবে এ মন
এমন সুদিন আসিবে কখন
মোহ-নিদ ছুটে যাবে ?

সতী যথা হয় পতিগতপ্রাণ
বিষয়ীর যথা বিষয়ের ধ্যান
সন্তান তরে মায়ের সমান
প্রেমটান কবে হবে ?

পতঙ্গ যথা অগ্নি-আলোকে
প্রাণ সঁপে দেয় পরম পুলকে
তেমনি তোমার দিব্য আলোকে
নিজেরে সঁপিব কবে ?

তটিনী যথা উন্মাদপ্রায়
সাগরের পানে সবেগেতে ধায়
সেই মতো আমি পাগলের প্রায়
তোমাতে পশিব কবে ?

বনমৃগ যথা ব্যাধের বাঁশরি
শুনিবারে ধায় আপনা পাসরি
সেই মতো মোরে ডাকিতে শ্রীহরি
বাঁশরি বাজাবে কবে ?

কৃপা

নিতাই নাগ

স্বাতী নক্ষত্রের এক ফোঁটা জলের জন্য
ঝিনুকের মতো ঊর্ধ্বমুখী উন্মুখ যদি হয় জীবন ;
গভীর সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে সংলগ্ন
শুভ্র শঙ্খের মতো সমর্পিত যদি হয় প্রাণ ;
তবেই জীবন জ্বলজ্বল করবে মুক্তোর আলোয়,
তবেই প্রাণে বাজবে সুর, মন্ত্রিত হবে মন্ত্র।

শতেকায়ু সান্নিধ্যে উদ্বোধন

স্বামী মহানন্দ

সহস্রী* তুমি শতকের কাছে, উদ্বেল হলে উদ্বোধন,
কত সুখ-স্মৃতি বাজে ব্যথাতুর তোমার জীবনে সারাক্ষণ।
নির্বিকল্প সমাধিবানের শতেক লেখায় পেয়েছ প্রাণ
সে তো কিছু আর সাধারণ নয়, ভাবের শিখায় জ্যোতিষ্মান্।
দেহ নও তুমি, তুমি যে আত্মা, জনম-মরণের পারেতে আছ,
অসীমের সুরে ওতপ্রোত তুমি, তবে আর কেন জীবন যাচ ?
বিবেকানন্দের নব-বাঙলা তোমার বুকেতে তুলেছে ঢেউ,
অধ্যাত্মের পুলক-পরশে তুমি জাগরিত, ভেবেছে কেউ ?
আরও আরও তোল মহাজয়গান, মহাজাগরণ তোমার বুকে—
দেখুক জগৎ, বুঝুক জগৎ, মহাপ্রাণধৃত অসীম সুখে।
হে পূষন্! আজ তোমায় আহ্বান, জ্ঞানের ঢাকাটা দাও গো খুলে,
ভারতের যাহা নিজস্ব-কৃতি জগতের হাতে দাও গো তুলে।
মাভৈঃ-তে ভরা শাশ্বত-বাণী নির্বাসনায় জারিত করে,
সেই বিবর্তন—মহানর্তন, তাতা থৈ থৈ, চেতনা পারে।
মহাবিস্মিত জগৎ-সভায় তোমার মন্ত্রে মহাবোধন—
ভারত-আত্মার মহা-আলাপনে জাগাও সবারে, হে উদ্বোধন!
[★ সহস্রী = যার পরমায়ু সহস্র বছর।]

যখন টাকা মাটি

সমরেশ মণ্ডল

যখন আমার দুই হাত এসে ধরেন দুই জাগ্রত শরীর
তখন কেঁপে ওঠে আনখশির আমি ভিতরে ডুবি, নিজেরই
ভিতরে। বুঝি কোথাও চাঁদ আছে, দিঘি আছে কোথাও ;
জলজ দর্পণের মতন দিঘি। কেবল ধোঁয়ায় ঢেকে থাকে যখন
মন, বাষ্পে দুচোখ যখন আপাত অন্ধ থাকে তখন বুঝি না,
যখন সূর্যের মতো দুই জাগ্রত শরীর থেকে আলো এসে
দু-ভ্রূর মাঝখানে এসে থেমে যায়, বুঝি টাকা মাটি, দেহ মাটি
মাটির ভিতরে অমৃর মাখনের মাটি মানুষ গড়ে প্রতিদিন॥

নাটিকা

শ্রীহরিদাসঠাকুর ও সুন্দরী

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী নাট্যকার চন্দননগরের গোন্দলপাড়া-নিবাসী শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ ৭৮ বছর বয়সে ইষ্টনামজপরত অবস্থায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি ছিলেন অগ্নিযুগের বিখ্যাত বিপ্লবিনায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী' এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তিনি বর্তমান নাটিকাটি আমাদের কাছে 'উদ্বোধন'-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, নাটিকাটি একটি বৃহত্তর নাটকের প্রথম অংশ মাত্র। 'উদ্বোধন'-এর পরম অনুরাগী ও আগ্রহী পাঠক প্রয়াত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগত আত্মার আমরা শান্তি কামনা করি।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

নিবেদন

শ্রীহরিদাসঠাকুরের মহান জীবনকথা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য নানা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরমপ্রিয় ভক্ত হরিদাসঠাকুরকে 'নামমূর্তি' বলা হয়। নামের প্রচারে তাঁর অবদান শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মতোই অসামান্য।

'শ্রীহরিদাসঠাকুর ও সুন্দরী' নাটিকায় তাঁর পূত জীবনের একটিমাত্র ঘটনার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। আশা করি নাটকের আকারে উপস্থাপিত সুপরিচিত এই ঘটনাটি ভক্ত পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে অধ্যাত্মভাবকে পুষ্ট করতে সমর্থ হবে।

ভক্তপদরেণুপ্রার্থী
দাসানুদাস
শৈলেন্দ্রনাথ

কুশীলবগণ

হরিদাসঠাকুর, গ্রামবাসিগণ, জমিদার রামচন্দ্র খান, নায়েব, মোসাহেবদ্বয়, সুন্দরী (বারবনিতা)।

নান্দী

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদে করিয়া প্রণাম।
হরিদাসঠাকুরের গাহিব আখ্যান॥
ভক্তগণ-পদরেণু সর্ব অঙ্গে মাখি।
নিতাই গৌরাঙ্গ যুগল হৃদয়েতে রাখি॥
হরিদাসঠাকুরের করিব বন্দন।
যাঁহার প্রসাদে ঘুচে সকল বন্ধন॥

করুণার মূর্তিখানি প্রভু হরিদাস।
যাঁহার স্মরণে সর্ব পাপ হয় নাশ॥
প্রভু হরিদাস হন শ্রীনাম-মূর্তি।
প্রাণভরে করিব যে তাঁহার আরতি॥
ঠাকুর হরিদাস হন নামের পাগল।
তাঁহার প্রীতিতে সবে গাই হরিবোল॥
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল॥

প্রথম অঙ্ক
প্রথম দৃশ্য

বেনাপোলের বনভূমি। হরেকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে হরিদাসঠাকুরের প্রবেশ কিছুক্ষণ নাম চলিল। এমন সময়ে তিনজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।

১ম ব্যক্তি—প্রণাম হই ঠাকুর! রোজ একবার করে এই বেনাপোলের জঙ্গলে না এলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না! নেশা ধরে গেছে! (প্রণাম)

২য় ব্যক্তি—কি মধুর হরিনাম যে আপনি করেন, শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। (সকলের প্রণাম)

হরিদাস—(প্রতিপ্রণাম করিয়া) আপনারা দয়া করে আমার কাছে আসেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। ধন্য তারা, যাদের হরিনাম ভাল লাগে।

৩য় ব্যক্তি—কারুর মুখেই তো হরিনাম শুনতে পাই না। সবাই শুধু বিষয়কথাই কয়। দিনরাত্তির কি তা ভাল লাগে! কেবল টাকাপয়সা আর ঘরসংসার!

১ম ব্যক্তি—বড় খাঁটি কথা বলেছ ভাই। দিনরাত যত আজেবাজে কথা। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। শুধু ঠাকুরের কাছেই হরিকথা শোনা যায়।

২য় ব্যক্তি—তাইতো বারবার এখানে পালিয়ে আসি। এখানে এলে প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। প্রাণ আনন্দে ভরে ওঠে।

হরিদাস—আমার কোন গুণই নেই ভাই। সব গুণ এই

হরিনামের। যেখানে হরিনাম সেখানেই শান্তি, সেখানেই আনন্দ। হরিনাম সব পাপ নাশ করে।

৩য় ব্যক্তি—আচ্ছা ঠাকুর, হরিনাম করলেই কি সব পাপ কেটে যায়? নাকি আরও কিছু যোগযাগ করতে হয়?

হরিদাস—শুধু 'হরি' শব্দটি মুখে উচ্চারণ করলেই সব পাপ কেটে যায়। তাই বা বলি কেন, হরিনাম কানে শুনলেই সব পাপ কেটে যায়। হরিনামের যে কত গুণ, তা কি মুখে বলা যায়?

১ম ব্যক্তি—তাই যদি হয় ঠাকুর, হরিনামের যদি এতই গুণ, তবে সবাই হরিনাম করে না কেন? মানুষ তো এত চালাক, তবে আসল কাজে ভুল করে কেন?

হরিদাস—(হাসিয়া) বড় সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি। মানুষ খুবই বুদ্ধিমান, সন্দেহ নেই। তবে কি জানেন, ভগবানের মায়ায় মানুষ ভুলে থাকে বলে আসল কাজ বাদ পড়ে যায়।

১ম ব্যক্তি—তা ভগবান মায়া সৃষ্টি করলেন কেন? মায়া না থাকলে মানুষ ভগবানকে ভুলত না। বেশ আনন্দে জীবন কেটে যেত।

হরিদাস—মায়া না থাকলে সৃষ্টিলীলা বন্ধ হয়ে যেত। মায়া আছে বলেই তো সৃষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসার যে এত বৈচিত্র্যময়, সে তো ঐ মায়ারই জন্য।

২য় ব্যক্তি—তা যদি বলেন, তাহলে বলতে হয়, আমাদের সব দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী ভগবান স্বয়ং। ভগবানের মায়া সৃষ্টি করা উচিত হয়নি।

হরিদাস—(হাসিয়া) ভগবানের দয়ারও যে অন্ত নেই ভাই। ভগবান সাধু-মহাপুরুষদের জগতে পাঠান মানুষকে সত্যপথ দেখাবার জন্য। কিন্তু মানুষ সাধু-মহাপুরুষের কথা, শাস্ত্রবাক্য শোনে কই? যদি শুনত তাহলে মায়ার হাত থেকে অনায়াসে রেহাই পেত।

৩য় ব্যক্তি—আমরা দুর্বল জীব। আমাদের তাহলে উপায় কি?

হরিদাস—উপায় গুরুকৃপা, উপায় সাধুসঙ্গ, উপায় হরিনাম। সদা-সর্বদা হরিনাম করুন, মায়া আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না। হরিনামের চেয়ে সহজ পথ আর নেই। হরিবোল, হরিবোল! চলুন, স্নানের সময় হলো। সবাই মিলে নাম করতে করতে স্নানে যাই।

(সকলের নাম করিতে করিতে প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ। বাউলের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।

আর কতকাল থাকব হরি,
তোমারই পথ চেয়ে,
এবার আমায় নাও গো তুলে
ওগো নবীন নেয়ে।
তীরে আছি দাঁড়িয়ে একা
ওগো দয়াল, দাও হে দেখা,
ভরসা তোমার চরণতরী,
এস বৈঠা বেয়ে॥

পারের কড়ি নাইকো কিছু
সে তো তুমি জান,
দয়াল, তোমার দয়াল নামে
দোষ পড়ে না যেন।
তরঙ্গসঙ্কুল ভবনদী
কাঁদছি বসে নিরবধি,
দয়া করে নাও গো পারে
চরণে ঠাঁই দিয়ে॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

জমিদার রামচন্দ্র খানের বহির্বাটী।
মোসাহেবগণ-সহ রামচন্দ্র খান দণ্ডায়মান।

রামচন্দ্র—নাঃ! আর সহ্য হয় না। অসহ্য, অসহ্য! এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কি বলেন নায়েবমশাই?

নায়েব—আমি তো বরাবর হুজুরকে বলছি, হরিদাসকে চাবুক মেরে আপনার এলাকা থেকে বের করে দিন। ওকে আর বেশি বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

রামচন্দ্র—আমার প্রজারা আমাকে যত না সম্মান করে, তার চেয়ে ঢের বেশি সম্মান করে ঐ ভণ্ডটাকে। নীচ যবন ম্লেচ্ছ একটা! আমার প্রজারা তার পায়ের তলায় গিয়ে নাকি গড়াগড়ি খায়! শুনতেও ঘেন্না করে।

১ম মোসাহেব—আপনি দয়ার অবতার, তাই সহ্য করছেন। আমি হলে—

২য় মোসাহেব—থাক থাক, আর বলতে হবে না। তুমি হলে যে কি করতে, তা আমার জানা আছে।

১ম মোসাহেব—আমি হলে (হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) নাক ফাটিয়ে দিতুম।

২য় মোসাহেব—তুমিও গিয়ে ঐ পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে। তোমায় জানতে আর আমার বাকি নেই।

(রামচন্দ্রকে) হুজুর, আমার মনে হয় লোকটা জাদু জানে। আপনি যেন ওর সামনে যাবেন না।

রামচন্দ্র—ওর যাদু আমি বের করব, তবে আমার নাম রামচন্দ্র খান। হ্যাঁ—নায়েবমশাই, আপনি যেন চাবুকের কথা কি বলছিলেন?

নায়েব—আমি বলছিলুম—কালু সর্দারকে পাঠিয়ে দিন। কালু সর্দারের হাতের চাবুক খেলে ও আর পালাবার পথ পাবে না।

১ম মোসাহেব—ব্যাটা হুজুরের জমিদারিতে বাস করছে, অথচ হুজুরের বাড়িতে একদিন ভিক্ষে পর্যন্ত করতে এল না! কি আস্পর্ধা! ব্যাটা একেবারে ছোটলোক!

২য় মোসাহেব—শুনলুম ভণ্ডটা নাকি সৎ ব্রাহ্মণের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও ভিক্ষে করে না। ঢং দেখে বাঁচি না!

রামচন্দ্র—ওর বুজরুকি আমি বের করব। ওর সাধুতার মুখোশ আমি টেনে খুলে দেব। দেখুন নায়েবমশাই, আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।

নায়েব—কি মতলব হুজুর?

রামচন্দ্র—আপনি যে চাবুকের কথা বলছিলেন, ও কথা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? ঐ ভণ্ডটাকে লোকে যেরকম শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাতে কড়া ব্যবস্থা নিতে গেলে হয়তো উলটো ফল হবে। প্রজারা হয়তো ক্ষেপে গিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকাবে।

নায়েব—তাহলে? আপনার ইচ্ছেটা কি?

রামচন্দ্র—আমি যে-ব্যবস্থা নেব, তাতে সাপও মরবে, অথচ লাঠিও ভাঙবে না। শুনুন, আমার কাছে আসুন—(জমিদার রামচন্দ্র নায়েবের কানে কানে কি বলিল। মোসাহেবদ্বয় গলা বাড়াইয়া তাহা শুনিতে লাগিল।)

নায়েব—চমৎকার মতলব! হুজুরের বুদ্ধির কাছে আর কার বুদ্ধি লাগে! এবার বাছাধন ঠিক জব্দ হবে।

১ম মোসাহেব—হ্যাঁ, এবার খুব মজা হবে। উঃ! হুজুরের কী ক্ষুরধার বুদ্ধি! কেটে রক্ত পড়বে, অথচ যার কাটল সে টেরও পাবে না। বলিহারী যাই!

২য় মোসাহেব—যা বলেছ ভাই। হুজুরের এত বুদ্ধি না থাকলে কি আর আমরা করে খাচ্ছি! হুজুরের জয় হোক।

রামচন্দ্র—(ব্যস্তভাবে) অনেকক্ষণ তো সুন্দরীকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছি। এখনো এল না কেন? যত সব অপদার্থ!

নায়েব—ঐ যে, এসে গেছে।

(সুন্দরী ও লাঠিহস্তে পাইকের প্রবেশ)

সুন্দরী—পেন্নাম হই হুজুর, আমায় ডেকেছেন?

রামচন্দ্র—হ্যাঁ, তোর আসতে এত দেরি হলো কেন? অনেকক্ষণ তো লোক পাঠিয়েছি?

সুন্দরী—(হাসিয়া) একটু সাজগোজ করছিলুম হুজুর। হুজুরের মন ভোলাতে হবে তো, তাই দেরি হলো।

রামচন্দ্র—আমার মন ভোলাতে হবে না তোকে। আমি তো ভুলেই আছি। তোকে হরিদাসের মন ভোলাতে হবে। ঐ যে, বেনাপোলের জঙ্গলে ভণ্ডটা লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে, ওর মন ভোলাতে হবে। পারবি তো?

সুন্দরী—তাই বলুন। ঐ সাধুটার কথা শুনেছি বটে। তা ওর নাম বুঝি হরিদাস? যাই বলুন—নামটি কিন্তু বেশ।

রামচন্দ্র—হ্যাঁ, ওটা একেবারে সাধুর শিরোমণি। ওটাকে যদি ঘায়েল করতে পারিস, মোটা বকশিশ পাবি।

১ম মোসাহেব—হাজার টাকার তোড়া, বুঝলি? করকরে হাজার টাকা।

২য় মোসাহেব—আর একছড়া মুক্তোর মালা। মালাটা পরলে তোকে যা মানাবে, আঃ! আসল মুক্তোর মালা—

সুন্দরী—(হাসিয়া) হুজুরের হুকুম হলে শুধু হরিদাসকে কেন, হরিদাসের হরিকে পর্যন্ত লটকে দেব। আমার নাম সুন্দরী!

রামচন্দ্র—সন্ধ্যেবেলা পাইক সঙ্গে নিয়ে যাবি। পাইক আড়ালে থাকবে। তারপর সঙ্গ ঘটলে—

সুন্দরী—আজ আর পাইক নেব না হুজুর। আজ একলাই যাব। আগে সঙ্গ ঘটুক, তারপর পাইক সঙ্গে নেব।

রামচন্দ্র—তাই হবে। এবার দেখব সেই ভণ্ডটার দৌড় কতদূর! শয়তান—

সুন্দরী—কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। আমি যাব আর কাজ হাসিল করব। (হাসিয়া) এবার তবে আসি হুজুর। পেন্নাম। হ্যাঁ, বকশিশটার কথা মনে রাখবেন।

(সুন্দরীর প্রস্থান)

নায়েব—এবার আর ব্যাটার রক্ষে নেই। এ কালনাগিনীর ছোবল। বিষে নীল হয়ে যাবে।

রামচন্দ্র—একবার ধরা পড়ুক, তারপর চাবুক মেরে তার চামড়া আমি খুলে নেব। কত বড় ধূর্ত আমি দেখে নেব। আমার জমিদারিতে বাস করে নষ্টামো! পাজি, শয়তান!

১ম মোসাহেব—চলুন হুজুর, আপনার আহারের সময় হলো। খাবার আগে রাগারাগি করা ঠিক নয়। চলুন।

২য় মোসাহেব—ঠিক সময়ে না খেলে আপনার আবার পিত্তি পড়ে অসুখ করবে। চলুন, চলুন।

রামচন্দ্র—(হাসিয়া) হ্যাঁ—চল, চল। (সকলের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ]

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

চিরন্তনী

শিবিরাজার উপাখ্যান

কথা : ভগিনী নিবেদিতা ❑ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত।



পুরাকালে শিবি নামে অমিত-শক্তিশালী এক রাজা ছিলেন। এত দ্রুতবেগে তাঁর শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছিল যে, স্বর্গবাসী দেবতারা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন ; মনে করলেন যে, তাঁদের স্বর্গরাজ্য হয়তো শিবিরাজা অধিকার করে নেবেন।

দেবতারা বিশেষভাবে চিন্তা করে এক উপায় ঠিক করলেন, যার দ্বারা তাঁর আত্মসংযমের পরীক্ষা করা যায় এবং তাঁর দুর্বলতা আবিষ্কার করে তাঁকে সংযত করা যায়। কারণ, দেবতারা মনে করতেন—একমাত্র আত্মসংযমী পুরুষই অপরাজেয়।





একদিন শিবিরাজা তাঁর স্তম্ভশোভিত রাজসভায় আপন সিংহাসনে বসে আছেন, সামনে প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, ফোয়ারা। হঠাৎ শিবিরাজা দেখলেন, সামনের উন্মুক্ত আকাশে একটি পায়রা দ্রুতগতিতে তাঁকে লক্ষ্য করে উড়ে আসছে।

[ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণধারা গঙ্গা। তার দুই কূলে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে মঠ, মণ্ডপ, মন্দির। গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মঠ, নির্মিত হয়েছে নয়নাভিরাম রামকৃষ্ণ-মন্দির। এসব গঠিত হয়েছে ক্রমে ক্রমে—কয়েকটি পর্যায়ে। মঠের গৌরবময় যাত্রারম্ভ কাশীপুরের একটি বাগানবাড়ি থেকে। বরানগরে সংঘটিত হয়েছিল মঠের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় আলমবাজারে। চতুর্থ পর্যায় বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। নীরবে নিভৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ-রোপিত বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত হচ্ছিল। দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় লোকের এবিষয়ে কিছু কৌতূহল মাত্র ছিল, কিন্তু মঠ সম্বন্ধে কিছু প্রত্যাশা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী গৃহী ভক্তদের অনেকেরই ছিল উপেক্ষার ভাব, সামান্য কয়েকজনের মঠবাসীদের প্রতি ছিল আস্থা ও সহমর্মিতা।[১] অন্যের কী কথা, যাঁরা কঠোর তপশ্চর্যা করে মঠজীবনকে বিকশিত করবার জীবনব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মঠের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সু-উচ্চ কোন স্পষ্ট ভাবনা করতেন কিনা সন্দেহ। এদের ব্যতিক্রম ছিলেন দুই ব্যক্তি। একজন পুরুষ, একজন নারী। প্রথম ব্যক্তি মঠের তাপসগণের নেতা 'ঠাকুরের নরেন্দ্র'—পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভুবনবিখ্যাত। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক পল্লীরমণী, সামাজিক সম্পর্কে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটি ভাষণে বিবেকানন্দ আক্ষেপ করে বলেছিলেন : "তাঁহারই (শ্রীরামকৃষ্ণেরই) চরণপ্রান্তে কয়েকজন যুবকের সহিত একত্র আমি এই ভাবধারা লাভ করিয়াছি।... সবসুদ্ধ বারজন বা কিছু বেশি হইবে। সকলে মিলিয়া এই আদর্শ প্রচারের কথা ভাবিলাম।... মুষ্টিমেয় ঐ কয়টি বালক এই মহান ভাবধারার প্রেরণায় নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল।... সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিত। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।... তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়।... সে কী হৃদয়-বেদনা!... অপরপক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই।... একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।... তিনি একজন নারী।... সেই নারী তাঁহারই সহধর্মিণী, তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষাও তিনি দরিদ্র ছিলেন। যাহা হউক, আমরা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম।"[২] রোমহর্ষক সেই কঠোর সংগ্রামের কাহিনী। সে-অভিজ্ঞতার স্মৃতি, শ্রীগুরুর প্রেরণা ও দৃঢ় সঙ্কল্প সম্বল করে মঠবাসিগণ বরানগরের এক পোড়োবাড়ি থেকে আলমবাজারের এক ভূতুড়ে বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। এ খবর কোন পত্রপত্রিকাতে স্থান পায়নি, এর জন্য কোন সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান হয়নি, সামান্য কয়েকজন লোক তা জানতে পেরেছিল।

বৃহৎ এক দায়িত্বের দুশ্চিন্তা নিয়ে নেতা নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে চলেছিলেন। সে-দায়িত্বের ছিল দুটি মুখ্যাংশ। প্রথমতঃ, গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে মহান সত্য প্রতিষ্ঠা করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতের কল্যাণের জন্য তার প্রচার ও সম্যক্ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা,[৩] এবং দ্বিতীয়তঃ, তাঁর নিজের ভাষায়, "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব,... তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।"[৪] এই গুরুদায়িত্ব স্মরণে রেখেই তিনি কখনো কঠোর সাধন-ভজনে ডুব দিয়েছেন, কখনো মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয়লাভের জন্য পরিভ্রমণ করেছেন, আর কখনো বা সাত-সমুদ্র পেরিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—তার মুনিঋষিদের আবিষ্কৃত সম্পদ বিতরণ করেছেন। ১৮৯০-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি বরানগর মঠ থেকে

১ পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে গুরুভাই রাখালচন্দ্রকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) লিখেছিলেন : "রাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে মনে করে। কেবল বলরাম, সুরেন, মাস্টার ও চুনীবাবু এঁরা সকলে আমাদের বন্ধু। অতএব এঁদের ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারব না।"

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৩-১৬৬

৩ দ্রঃ হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা স্বামীজীর ২৯।১।১৮৯৪ তারিখের চিঠি

৪ প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামীজীর ২৬।৫।১৮৯০ তারিখের চিঠি

বেরিয়েছিলেন নগণ্য এক ফকিরের বেশে। প্রায় সাত বছর পর যখন আলমবাজার মঠে ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ। প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দ তাঁর আরব্ধ পরিকল্পনার পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পরিণতিতে মঠজীবনে উপস্থিত হয়েছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। মঠবাসীদের দিনচর্যার ভোল পালটে গিয়েছিল।

এ পরিবর্তনের প্রবল প্রবাহ পৌঁছাবার পাঁচ বছর আগেই মঠের সর্বজনস্বীকৃত 'কোঠারি' (ম্যানেজার) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উপস্থিত মঠবাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ প্রথমশ্রেণীর অপর নেতৃবৃন্দ এবিষয়ে জানতে পেরেছিলেন কিছুকাল পরে। পোড়োবাড়িটির জীর্ণতর দশা, মঠবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পোড়োবাড়ির মালিকের বাড়ি ছাড়বার জন্য তাগাদা, আবার অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়াতে প্রশস্ত একটি বাড়ির সন্ধান তাঁদের স্থান পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করেছিল। উপরন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতি-বিজড়িত দক্ষিণেশ্বর এ বাড়ি থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে।[৫]

আলমবাজার চৌমাথার নিকট রামলোচন ঘোষ ঘাটে[৬] যাওয়ার পথের দক্ষিণদিকে অবস্থিত এই বাড়িটি। এই দোতলা বাড়ির প্রশস্ত সম্মুখভাগে রাস্তার অপরদিকে ছিল জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি। এ বাড়ির অধিকাংশই বিধ্বস্ত, তবে ঠাকুরদালানটি এখনো বর্তমান। তার ঠিকানা—৪০, দেশবন্ধু রোড[৭] (পশ্চিম)। শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাকালীন জীবনের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত এই বাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছিলেন: "কি অবস্থাই গিয়েছে। এখানে খেতুম না। বরানগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এঁড়েদায় কোন বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম।... আলমবাজারে রাম চাটুজ্যের বাড়ি যেতুম।"[৮] পরবর্তী কালে রাম চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠপুত্র জয়কৃষ্ণের নামেই এ বাড়ির পরিচয় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়াও এ অঞ্চলে শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি, নটবর পাঁজার তেলকল, কবিরাজ ঈশান মজুমদারের বাড়ি, ভাগবতের পণ্ডিতের বাড়ি[৯] শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে ধন্য।

আলোচ্য বাড়িতে দুটি অপমৃত্যু ঘটাতে সামান্য ভাড়াতেও ভাড়াটে পাওয়া যেত না। কিন্তু মঠবাসীদের ভয়ডর ছিল না। তাঁরা নিজেদের বলতেন 'দানা' বা দৈত্য। সেসময়ে বাড়িটির ঠিকানা ছিল—৫১, রামচন্দ্র বাগচি লেন। বর্তমান ঠিকানা—৬০/১, রামচন্দ্র বাগচি লেন। সেসময়ে বাড়িটি ছিল বরানগর ডাকঘরের এলাকাধীন,[১০] বর্তমানে নতুন ডাকঘর আলমবাজারের এলাকাধীন।

আলমবাজারে মঠের স্থানান্তর ঘটেছিল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে নয়—১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির পূর্বে।[১১] সেবার শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পড়েছিল সোমবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২, ১৮ ফাল্গুন ১২৯৮ সাল।

৫ দ্রঃ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ৫০। বর্তমানে বড় রাস্তা ধরে গেলে দূরত্ব হয় প্রায় দেড় মাইল।

৬ রামলোচন ঘোষ হেস্টিংস সাহেবের বড় কুঠি কিনেছিলেন। জীর্ণ কুঠি ভেঙে ফেলা হয়। তার পাশে প্রচুর অর্থব্যয় করে রামলোচন দ্বাদশ শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত ঘাট নির্মাণ করেন। (দ্রঃ আঞ্চলিক ইতিহাস : বরানগর—অজিত সেন, ৩য় খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ ৫২)

৭ বর্তমান আলমবাজার খেয়াঘাটের উত্তরে ডাচ সরকারের আমলে হেজার (Hedger) সাহেবের কয়েকটি কুঠি ছিল। তিনি তাঁর কুঠির সঙ্গে যুক্ত এই রাস্তা তৈরি করেছিলেন। রাস্তার বর্তমান নাম দেশবন্ধু রোড। (দ্রঃ আঞ্চলিক ইতিহাস : বরানগর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১)

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।৭।১

৯ এ বাড়িগুলির বর্তমান ঠিকানা—শম্ভুচরণ মল্লিকের বাগানবাড়ি : ৯৬, সূর্য সেন রোড, কলিকাতা-৩৫। নটবর পাঁজার তেলকল (বর্তমানে নেই) : ১১৩, সূর্য সেন রোড। কবিরাজ ঈশান মজুমদারের বাড়ি : ১২৩, রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৩৫। ভাগবত পণ্ডিতের বাড়ি : ১৬/১, দেশবন্ধু রোড, কলিকাতা-৩৫ (দ্রঃ আঞ্চলিক ইতিহাস : বরানগর, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯, পৃঃ ১৪)

১০ ডাকঘর যেমন ভিন্ন হয়, তেমনি পৌরসভার এলাকাও বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১ আগস্ট বরানগর পৌর অঞ্চল থেকে কামারহাটি পৌর অঞ্চল পৃথক করা হয়। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে বরানগর পৌর অঞ্চলের দ্বিতীয়বার অঙ্গচ্ছেদ হয়। দক্ষিণেশ্বর মৌজা কামারহাটি পৌর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১ আলমবাজার মঠ, পোঃ বরানগর, ২৪-পরগনা ঠিকানা থেকে স্বামী শিবানন্দ ৬।৫।১৮৯২ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছিলেন : "আমি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন অবধি কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই—শ্রীশ্রীঠাকুরের

মঠ স্থানান্তরিত হলেও বরানগরের পোড়োবাড়িতে অবস্থিত আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভার পাঠাগার এবং তার আশপাশের কিছু সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে মঠবাসীদের যোগাযোগ বরাবরই ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূতাস্থি, তাঁর ব্যবহৃত পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, ঠাকুরঘরের পূজার সাজসরঞ্জাম, মঠবাসীদের কয়েকখানি বই, জামাকাপড়, রান্নার বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছিল কাপড় শুকাবার প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা একটা বাঁশ নিয়ে। তরুণ কানাই (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) সেই বাঁশটি কাঁধে করে বাজারের মধ্য দিয়ে আলমবাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১২]

দুবিঘা পাঁচ কাঠা সাত ছটাক বাইশ বর্গফুট জমির ওপর ছিল এই বাড়ি, পুষ্করিণী, কুয়ো, ফলের বাগান ইত্যাদি। জমি ও বাড়ির মালিক ছিলেন ১৮, শ্যামাচরণ মৈত্র লেনের দাশরথী দে। এর মধ্যে চার কাঠা দুই ছটাক জমিখণ্ড দখল করেছিল উপরি উক্ত বাড়ি। এ বাড়ির দক্ষিণাংশ বা অন্দরমহল অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যানন্দ আলমবাজার মঠ—সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের শাখা। আর বাকি উত্তরাংশ রয়েছে হীরালাল আগরওয়ালার মালিকাধীনে। বাড়িটির দক্ষিণ দিককার পুষ্করিণী, ফলবাগান ও খালি জমি টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জনের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।



আলমবাজার মঠ : অতীতের ছবি

জন্মতিথির দিন আমি এখানে পৌঁছাই। পরে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার পবিত্র জন্মস্থানদর্শনে যাই।... সেখানকার জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ। পৌঁছিয়া ৩।৪ দিনের মধ্যেই জ্বরে আক্রান্ত হই, প্রায় একমাসের উপর সেখানে থাকি। সম্প্রতি সেখান হইতে আসিয়াছি। এখনও শরীর সবল হয় নাই।"

১২ দ্রঃ উদ্বোধন, ৫২ বর্ষ, ৯ম সং, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃঃ ৪৫৪

১৩ ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মঠবাড়ি ঃ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিচারণের বিশ্লেষণ এবং সরজমিনে তদন্ত করে নিম্নোক্ত বিবরণী তৈরি করা হয়েছে। মঠবাড়িটি ছিল বার ও ভিতর দিকে চকমিলানো দোতলা একটি অট্টালিকা। চওড়া রাস্তার ওপর (বর্তমানে দেশবন্ধু রোড) মঠবাড়ির প্রশস্ত সম্মুখভাগে ওপরে ও নিচে মোটা থামওয়ালা সরু বারান্দা। বাড়ির পশ্চিম গায়ে রামচন্দ্র বাগচি লেন। বারবাড়ির পশ্চিমাংশে ওপর ও নিচতলায় ছিল একই ধরনের মোটা থাম। মূল অট্টালিকার কাঠামো অপরিবর্তিত থাকলেও তার বাইরে ও ভিতরে বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। (বর্তমানের ও অতীতের ছবি দ্রষ্টব্য)।

রামচন্দ্র বাগচি লেন ধরে কিছুটা এগোলে বাঁদিকে পাওয়া যেত বাড়ির সদর দরজা। ঢুকে দুপাশে দুটো-ছোট ছোট রোয়াক, সামনে প্রশস্ত আঙিনা, তার পিছনে ছিল পশ্চিমমুখী তিন ফোকরওয়ালা ঠাকুরদালান বা চণ্ডীমণ্ডপ। উত্তরে এক কোণায় একটি ঘোরানো পাকা সিঁড়ি। দোতলায় উঠে দক্ষিণ ও পুবদিকে দুটি বারান্দা। বারান্দা-দুটি লাল নীল রঙিন টাইল দিয়ে মোড়া। পুব বারান্দার উত্তরদিকে একটি হলঘর, তার তিনটি দরজা, আর বড় রাস্তার দিকে জানালাযুক্ত বারান্দা। হলঘরের ভিতর একটি দরজার পর পুবদিকে ছিল একটি ছোট ঘর। হলঘরে মঠবাসীরা বসতেন; রাতে মাদুর ও সতরঞ্চি পাতা ঢালা বিছানায় ৮/১০ জন পাশাপাশি শুতেন। বারবাড়ির নিচতলায় সিঁড়ির ডানপাশের দুটি ঘর ছিল প্রায় অন্ধকার। জনশ্রুতি, বড় ঘরটিতে দুজন আত্মঘাতী হয়েছিল। 'ভূতুড়ে বাড়ি' বলে পরিচিত এই বাড়িতে প্রতিবেশিগণ, এমনকি মঠবাসীদের কেউ কেউ ভূত দেখেছিলেন। বড় ঘরটিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং পরে স্বামী বিরজানন্দ পাঠ ও জপধ্যান করতেন।

গবাক্ষ ও থামওয়ালা বারান্দা ধরে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হলে পাওয়া যেত কাঠের ঝিলিমিলি দেওয়া একটা স্নানের ঘর। ঘরের পাশেই ছিল একটা দরজা। দরজা পেরোলেই অন্দরমহল। তার বামদিকে ছিল ঠাকুরঘর—এ ঘরের দরজা ও দুটি জানালাই দক্ষিণমুখী। ঠাকুরঘরের পুবদিকে নিচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পর দোতলায় পুবকোণের ঘরটি ছিল ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘর। তার দক্ষিণে ছিল আরেকটি ঘর।[১৪] তারপর খোলা ছাদ। ছাদের পুবদিকে প্রাচীরের কাছে উনুনের ধোঁয়া বেরোবার জন্য ছিল অনেকগুলি ঘুলঘুলি। অল্প দূরে দক্ষিণের ছাদের কোণে ছিল একটি পায়খানা। ছাদে গ্রীষ্মের রাতে মাদুর বিছিয়ে অনেকে শুতেন, বসে পুরনো দিনের গল্পগুজব করতেন।

উপরি উক্ত পুবমুখী প্রশস্ত পথের ডাইনে ছিল তিনটি ঘর। সর্বশেষ দক্ষিণের ঘরটিতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, মাঝের ঘরটিতে স্বামী অভেদানন্দ এবং উত্তরের ঘরটিতে স্বামী নির্মলানন্দ বাস করতেন। রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে গলির অনেকটা দেখতে পেতেন।

ঠাকুরঘর ও ভাঁড়ারের মধ্যকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে বামদিকে পাওয়া যেত রান্নাঘর। ঘরের সামনের বারান্দা খাওয়ার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। রান্নাঘরের সম্মুখে ছিল একটা গলি, তার পুবদিকে ছিল শানবাঁধানো ঘাটসমেত একটা পুকুর। পুকুরটি ছিল বাড়ির অন্তর্গত।

তাছাড়া ভিতরবাড়ির নিচতলায় ছিল দুটি গুদামঘর ও একটি জলের ঘর। সেখানে থাকত কয়েকটি বড় মাটির জালা। ভারী গঙ্গা থেকে খাবার ও রান্নার জল এনে ভরে রাখত। নিচতলায় ছিল একটি খালি ঘর। সেখানে কখনো কখনো 'গোপালের মা' এসে দু-তিনদিন বাস করতেন; সেখানে কচিৎ কখনো গৌরী-মা রাত্রিবাস করেছেন।

আলমবাজার মঠের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে পরিচিতির জন্য প্রথমেই স্মরণ করা যেতে পারে যে, সেসময়ে মঠ, এমনকি দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছিল বরানগর পৌরপ্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ১ অক্টোবর, ১৯৪৯ থেকে দক্ষিণেশ্বর মৌজা কামারহাটি পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধীনে চলে যায়। বরানগর কলকাতা থেকে প্রাচীনতর, বরানগর জনপদের জন্ম পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বা ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে। পাশ্চাত্যের বিদেশী বণিকদের বরানগরে আবির্ভাব ঘটেছিল বাণিজ্যের স্বার্থে। প্রথম সেখানে গড়ে উঠেছিল একটি পর্তুগীজদের বন্দর। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজদের আগমনের পর এ অঞ্চলে কয়েকটি কলকারখানা তৈরি হয়েছিল, আমদানি-রপ্তানিতে বরানগর হয়েছিল সমৃদ্ধ। এখানকার 'বাফ্‌তা' কাপড় ছিল প্রসিদ্ধ। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপস্থিতির পর বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে

১৪ এ ঘরটিতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ কখনো কখনো বাস করেছেন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ২৯৮)

উঠেছিল। পরিণতিতে বরানগর ইংরেজদের কবলে চলে গিয়েছিল ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। অতঃপর বরানগরের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

সিপাহি-বিদ্রোহের পর জর্জ হেন্ডারসন কলকাতায় আসেন এবং বরানগরে জমি কিনে জুট মিল স্থাপন করেন। তখন নাম ছিল বোর্নিও জুট কোম্পানি। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম যন্ত্রচালিত তাঁত বসিয়ে জুট মিলের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ অক্টোবরের ('আশ্বিনের') ঝড়ে জুট মিলের অনেক ক্ষতি হয়। বোর্নিও কোম্পানির পাটকল হবার আগে সেখানে একটি চিনির কারবার ছিল।[১৫] ক্রমে বোর্নিও কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত দুটি জুট মিল কিনে নিয়ে বিশাল আকারে বরানগর জুট ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। কয়েক হাজার শ্রমিকের[১৬] এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল আলমবাজার মঠের দক্ষিণে কিছুটা দূরে। প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত কিছু সংখ্যক ইংরেজ অফিসার ঐ অঞ্চলে বাস করতেন। বড় কলকারখানা ছাড়াও ৬০টি রেড়ির তেলের ও ২০টি দড়ি তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছিল।[১৭] [ক্রমশঃ]



আলমবাজার মঠ ঃ বর্তমান ছবি আলোকচিত্র ঃ পার্থসারথি নিয়োগী

১৫ দ্রঃ আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ বরানগর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭-৩৯

১৬ ও-ম্যালির গেজেটিয়র (পৃঃ ২১৫) থেকে জানা যায়, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ঐ দুটি জুট মিলে প্রতিদিন গড়ে ৬১৪৮ জন শ্রমিক কাজ করত।

১৭ দ্রঃ Calcutta and Its Hinterland (1833-1900)—Prajnananda Banerjee, 1875, p. 78

অনুষ্ঠান-সূচী (চৈত্র ১৪০২)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)
জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৪ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	২৮ মার্চ	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১, ১৬ চৈত্র	শুক্রবার	শনিবার	১৫ মার্চ, ৩০ মার্চ ১৯৯৬

বিষ্ণুতীর্থ আলালনাথ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

"নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজম্।
করোমি নারায়ণপূজনং সদা।
বদামি নারায়ণনামনির্মলম্।
স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্।।"

দূর থেকে মাইকে বাজছিল সুর করে 'মুকুন্দমালা' স্তোত্রের এই অংশটি। আমাদের গাড়ি মন্দির-দ্বারে এসে পৌঁছাতেই দ্বিতীয় চরণ শুরু হলো—

"শ্রীনাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-প্রিয় চক্রপাণে।
শ্রীপদ্মনাভাচ্যুত কৈটভারে শ্রীরাম পদ্মাক্ষ হরে মুরারে।।"

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান সুরে এই স্তোত্রাংশ গাওয়া হচ্ছিল। আমরা এসে পৌঁছালাম আলালনাথ-মন্দিরের বিশাল তোরণের সামনে।

পুরীতে রথ দেখতে এসেছিলাম, তার সঙ্গে ইচ্ছে ছিল কাছাকাছি আরও দু-একটি তীর্থ দর্শন করব। আমাদের মিশন কেন্দ্রের মোবাইল ভ্যান সপ্তাহে একদিন আলালনাথে যায় শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের অনুরোধ করলাম—আমাকে একদিন ঐ প্রাচীন মন্দির-দর্শনে নিয়ে যেতে হবে। আশ্রমাধ্যক্ষ, ব্রহ্মচারী নিষ্ঠাচৈতন্য ও তাঁর সহকর্মী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে তাঁদের ঐ গাড়িতে আলালনাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। রথযাত্রার পরে দুই দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথেই দর্শন করে আমরা দু-তিন জন সাধু-ব্রহ্মচারী ৩ জুলাই পুরী মিশন আশ্রম থেকে রওনা হয়েছিলাম।

নরেন্দ্র সরোবর ও জটীয়াবাবার মঠের পাশ দিয়ে যে-রাস্তা গিয়েছে দক্ষিণ-পূর্বে, সেই পথ দিয়ে সকালে চা খাওয়ার পর আমরা এগিয়ে চলেছি। গাড়ির ড্রাইভার খুব ভাল গাইড। সে ঐ অঞ্চলেরই লোক। নাম ধানু। সে যেতে যেতে একে একে ২০টি গ্রামের নাম শুনিয়ে দিল। মাঝে এক জায়গায় মূল রাস্তা ছেড়ে একটু সরু পথ ধরে দুপাশে শুধু কাজুবাদাম আর ঝাউ গাছের সারির মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি চলতে লাগল।

ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে প্রায় সমুদ্রের সঙ্গে ভার্গী নদীর সঙ্গমের কাছে একটা পাহাড়ী টিলার কাছে এসে আমাদের গাড়ি থামল। চারিধারে তেঁতুল গাছ আর বকুল গাছ। বহু প্রাচীন সেইসব গাছ। দেখেই বোঝা যায়। বড় বড় শ্যাওলা-ধরা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে এলাম। ছোট মন্দির। ভিতরে খুব প্রাচীন অষ্টভুজা দুর্গা-মূর্তি—মহিষাসুরমর্দিনী। অন্ধকারে প্রদীপ ধরে পূজারী দেখালেন। শোনালেন, এই দেবীমন্দির বালির স্তূপের নিচে চাপা পড়েছিল। ওপর থেকে শুধু মন্দিরের সামনের স্তম্ভের সিংহের মাথাটুকু দেখা যেত। বছর তিরিশ আগে এই জঙ্গলের পথে কোন সমুদ্রযাত্রী জেলেদের নজরে সেই সিংহের শরীরের কিছু অংশ ধরা পড়ে। তারাই লোকজন ডেকে এনে বালি খুঁড়ে এই দেবীর ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দির ও তার মধ্যে অক্ষত এই সুন্দর দেবীমূর্তি এবং তার পাশেই আরেকটি ক্ষুদ্রতর মন্দিরে আরও প্রাচীন ক্ষয়ে যাওয়া এক শিবলিঙ্গ দেখতে পায়। পরে আশপাশের গ্রামের মানুষের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে এই দেবীর প্রাচীন অস্তিত্বের কথা। এই দেবীর নাম হরচণ্ডী, শিবের নাম চণ্ডেশ্বর। এখন সেবা-পূজার বেশ ভাল ব্যবস্থা। ঐ তিন মাইল দূরের গ্রাম থেকে পূজারীরা আসেন। দেবীর ভোগের জন্য নিত্য শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ আসে। সন্ধ্যার পরে মন্দির বন্ধ করে সকলে চলে যান। তখন এখানে আর কেউ থাকেন না। এখানে মন্দিরের একপাশে সাত ফুট লম্বা একটি হাঙরের হাড় রাখা আছে দেখলাম। কোন সময় সমুদ্রের জোয়ারে সেটি ভেসে এদিকে চলে আসে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। আর দেখা যায় ভার্গী নদী ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে সমুদ্রসঙ্গমে। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা আবার ছয় মাইল ফিরে এসে বড় রাস্তা ধরলাম। আলালনাথ যাওয়ার পথে এই হরচণ্ডী-দর্শন আমাদের অতিরিক্ত প্রাপ্তি।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা আলালনাথে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটির প্রাচীন নাম ব্রহ্মগিরি। পুরী থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। চারধারে গাছপালা ও পাথরের প্রাচীন দেওয়াল-ঘেরা অত্যন্ত নির্জন ও সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

আবার ভজন শুরু হয়েছে—"হে রাম নারায়ণ বাসুদেব, হে লক্ষ্মীকান্ত, হে বাসুদেব..."।

আমরা সামনের বিশাল প্রাচীন তোরণ পার হয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যে নাতিবৃহৎ মন্দির। মনে হয় প্রাচীন মন্দির নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। তবে ভিত্তির অংশ বেশ প্রাচীন ও ক্ষয়ে যাওয়া ল্যাটেরাইট পাথরের ওপর সূক্ষ্ম খোদাই করা নক্সার কাজ এখনো বোঝা যায়। তবে বিমান বা দেউল যেটি দেবতার গর্ভগৃহ, সেটি সাদা চুনবালির আস্তরণে ঢাকা।

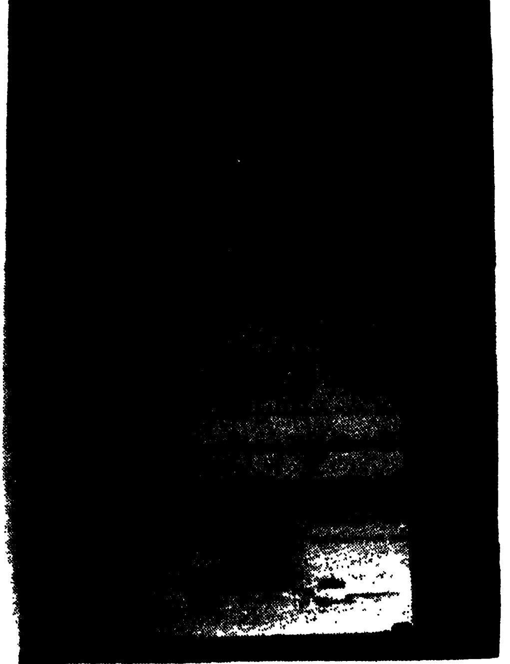


সম্ভবতঃ পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের মতো দেওয়ালের কারুকার্য বাঁচাবার জন্য চুনবালির আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তবে এরই মধ্যে বাইরের দেওয়ালের তিনদিকে তিনটি কুলুঙ্গিতে অপরূপ সুন্দর হাতদুয়েক উঁচু নৃসিংহদেব, বরাহাবতার ও ত্রিবিক্রম বিগ্রহ তিনটি এখনো অটুট। অতি সুন্দর বিগ্রহ তিনটি তেল মাখিয়ে খুব যত্ন করে রাখা হয়েছে। মন্দিরে ঢোকার বাঁদিকে কুড়ি-পঁচিশ হাত লম্বা ও ফুট দেড়েক চওড়া বিরাট একটি কালো পাথরের খিলান পড়ে আছে। পুরীর সব প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশদ্বারের মাথার ওপর এটি থাকতে দেখা যায়। এই পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে নবগ্রহের নয়টি মূর্তি। সম্ভবতঃ এটিও প্রাচীন মন্দিরের জগমোহন বা বিমানের প্রবেশপথের মাথার ওপর চৌকাটের কাজ করত। আরও কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এপাশে-ওপাশে ছড়ানো রয়েছে। মনে হয় কোন কালাপাহাড়ী কুকীর্তির চিহ্ন এগুলি।

মূল মন্দিরের সামনে একটি মাঝারি ধরনের গরুড়স্তম্ভ। গরুড়স্তম্ভে প্রণাম করে আমরা মন্দিরের নাটমন্দির পার হয়ে জগমোহন বা দর্শনার্থীদের দাঁড়াবার জায়গায় গিয়ে পৌঁছালাম। তিন-চার হাত দূরেই গর্ভমন্দির বা দেউলের মধ্যে প্রমাণ আকারের কালো কষ্টিপাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। দক্ষিণ উর্ধ্বহস্তে শঙ্খ, নিচের হাতে পদ্ম। বাম উর্ধ্বহস্তে চক্র এবং নিচের হাতে গদা। মূর্তির শরীরে নানা অলঙ্কার, মাথায় কিরীট। পিছনে বিরাট চালচিত্র ঐ একই পাথরের, তাতে খোদাই করা বামদিকে পায়ের কাছে রুক্মিণী ও ডানদিকে সত্যভামা। আরেকটু ওপরে একদিকে ললিতা অন্যদিকে বিশাখা। নিচে ডানদিকে নতজানু যুক্তকর গরুড়ের মূর্তি। সদ্য স্নান শেষ হয়েছে। সারা গায়ে তেলজাতীয় কিছু মাখিয়ে তার সঙ্গে রঙিন জরির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে মাঝে মাঝে আলো পড়লেই চক্‌চক্ করছে। বিগ্রহের চোখে সোনার চোখ লাগানো। গলায় অনেক অলঙ্কার।

ভক্তিমান পূজারী আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আমি এই মন্দির ও বিগ্রহ সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলতে বলায় তিনি শোনালেন এখানকার দিব্যলীলা-কথা।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য রামানুজ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে। তিনি সেসময় জগন্নাথক্ষেত্রে এসেছিলেন। সেই সময়কার উৎকলাধিপ চোরগঙ্গদেব তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-মতে অনুপ্রাণিত হন ও শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-মন্দিরে তাঁর মতবাদ অনুযায়ী পূজাপদ্ধতির প্রচলন করতে আগ্রহী হন। কিন্তু তার আগে থেকেই শ্রীধামের পূজাদির ব্যবস্থা আদি শঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্যের প্রভাবে অদ্বৈত মত ও তান্ত্রিক মতের মিশ্রণে চলে আসছিল। রাজা চোরগঙ্গদেবের ইচ্ছা থাকলেও মন্দিরের পণ্ডিতকুল ও পাণ্ডারা সেই দীর্ঘকাল ধরে, অর্থাৎ নবম শতাব্দী থেকে অনুসৃত পূজাপদ্ধতির পরিবর্তনে রাজি হলেন না। তখন রামানুজ পুরীতে এমার মঠ বা রামানুজ মঠ প্রতিষ্ঠা করে এই আলালনাথে চলে এসে শ্রীবিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মতবাদ অনুযায়ী সেবা-পূজার প্রচলন করেন। আর সেবার ভার দিলেন তাঁর সঙ্গী জনৈক ভক্তের ওপর। এই ভক্তটি ছিলেন তামিল আলবার সম্প্রদায়ের। বিষ্ণুভক্ত এই আলবারী ভক্তের দ্বারা পূজিত বলে বিগ্রহের



আলালনাথের মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহ এবং শ্রীবিগ্রহের আলোকচিত্র তোলা নিষিদ্ধ।

নাম হয় 'আলবারনাথ'। তা থেকে অপভ্রংশ হতে হতে 'আলোয়ালনাথ'—অবশেষে 'আলালনাথ'-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এখানকার পূজার ধারা দক্ষিণ ভারতীয় শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের ক্রম অনুযায়ী হয়। মন্দিরে দেবতার বেদির নিচে আরও দুটি অষ্টধাতুর বিগ্রহ আছে—একটি লক্ষ্মীর ও অন্যটি সরস্বতীর। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মন্দিরে সেবা-পূজাদি হয়।

এর পরে আমি একবার গর্ভমন্দিরে গিয়ে বিগ্রহকে কাছ থেকে দর্শন করতে চাইলাম। কি জানি কি ভেবে পুরোহিত রাজি হয়ে গেলেন। আমরা গর্ভমন্দিরে বিগ্রহের কাছে যেতে তিনি দেশলাই জ্বেলে প্রদীপ ধরিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস আমাদের দেখালেন আর শোনালেন আরও অদ্ভুত এক কাহিনী।

অনেকদিন আগে এই মন্দিরের যিনি পূজারী ছিলেন তাঁকে একবার কোন কাজের জন্য কয়েকদিন বাইরে যেতে হয়েছিল। যাওয়ার সময় তাঁর সদ্য উপনয়ন হওয়া কিশোর পুত্রকে পূজার ভার দিয়ে গেলেন, পূজার ব্যাপার যথাসাধ্য শিখিয়েও দিয়ে গেলেন। নবীন বালক পূজার ভার নিয়ে খুব সরলপ্রাণে পূজাদি করে ভোগ নিবেদনের সময় ভগবানকে ডাকতে লাগল নৈবেদ্য গ্রহণ করার জন্য। তাদের নিত্য পায়েস দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। ছেলেটি বারবার অনুনয় করছেঃ "এস, পায়েস খাও, বাবা বলে গেছেন তোমাকে পায়েস দেওয়ার জন্য।" পাথরের মূর্তি কিন্তু নিশ্চল-নীরব। বালক তাতে আরও বিচলিত। সে বুঝতেই পারছে না কেন ঠাকুর এসে পায়েস খাচ্ছেন না। তার ধারণা, বাবার কাছ থেকে ঠাকুর এসে রোজ পায়েস খেয়ে যান। সরলবিশ্বাসী শিশুর আন্তরিক আকুল আহ্বান শেষে ক্রন্দনে পরিণত হলো। কাঁদতে কাঁদতে সে বলেঃ "তুমি যদি না খাও আমি উঠব না।" আশ্চর্য! আকুল সরলবিশ্বাসী ভক্তের ঐকান্তিক আহ্বানে দেবতার আসন নড়ে ওঠে। তিনি শরীর পরিগ্রহ করে নেমে এসে বাটি ধরে পায়েস কিছুটা গ্রহণ করেন। তৃপ্ত হয় পূজারী। পায়েস কম দেখে মায়ের সন্দেহ হওয়ায় তাঁর প্রশ্নের জবাবে শিশু যখন বলে ঠাকুর পায়েস খেয়ে গেছেন, তখন মা ভাবেন ছেলে নিজে খেয়ে মিথ্যা বলছে। এর মধ্যে বাবা তাঁর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় সেদিনই ফিরে এসে সব শুনে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সরলবিশ্বাসী শিশু-পূজারী তার অভিজ্ঞতা থেকে একচুল নড়ে না। যা দেখেছে তার সত্যতা সে কি করে অস্বীকার করবে! পরদিন বাবা ছেলেকে পূজায় পাঠিয়ে দিয়ে বললেনঃ "আজ যদি ঠাকুর তোমার পায়েস খান তাহলে বিশ্বাস করব।" ছেলে পূজার শেষে পায়েস নিবেদনের সময় আবার তার ডাকে সাড়া দিয়ে ভগবান এলেন, কিন্তু এবার তিনি বললেনঃ "তুমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা কর। আমি ঠিক তোমার পায়েস খেয়ে নেব।" সরলবিশ্বাসী বালক তাই বিশ্বাস করে ভোগ নিবেদন করে দরজা বন্ধ করে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে বৃদ্ধ পিতা সন্দেহবশতঃ ছেলের কথা না শুনে হঠাৎ দরজা খুলে ফেলতেই দেখলেন আশ্চর্য কাণ্ড। গরম পায়েস ঠাকুর তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে হাতে মুখে লাগিয়ে বসে আছেন। আর গরম পায়েস লাগার জন্য তাঁর ডান গালে, বুকের মাঝখানে আর ডান হাতের শঙ্খ ধরে থাকা পাঁচটি আঙুলের ডগাতেই ফোস্কা পরে ফুলে উঠেছে। অনুতপ্ত হতচকিত বিহ্বল পিতা তাঁর পুত্রের সরলবিশ্বাস ও ভক্তির প্রমাণ পেয়ে এই দিব্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলেন। আর স্বয়ং ভগবান আজও তাঁর বালক ভক্তের ভক্তির মহিমার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য তাঁর ডান গালে, বুকের মাঝখানে ও ডান হাতের পাঁচটি আঙুলেই ঐ ফোস্কার মতো ফুলে থাকার চিহ্ন ধরে রেখেছেন—অনাগত কালের ভক্ত দর্শনার্থীদের মনে সরল ভক্তি-বিশ্বাসকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আমরা প্রদীপের আলোয় ঐ ফোলা ফোলা আঙুলে, গালে ও বুকে কালো পাথরের মাঝে ফোস্কার আকারে ভক্তের ভক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়ার স্পষ্ট পাথুরে প্রমাণ দেখে বিস্মিত হলাম।

পূজারীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বললামঃ

"অনন্ত বৈকুণ্ঠ মুকুন্দ কৃষ্ণ, গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
বেক্তুং সমর্থোঽপি ন ব্যক্তি কশ্চিদ্ অহো জনানাম্ ব্যসনাভিমুখ্যম্।"

মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পাশেই দেখা গেল আরেকটি ছোট মন্দির। এর দেওয়ালে শ্রীচৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্তি আঁকা আছে। আর মূর্তির নিচে খুব বড় একটি চওড়া পাথর পড়ে আছে। একজন কিশোর পূজারী আমাদের জানাল—এইখানেই এই পাথরের ওপর শ্রীচৈতন্যদেব থাকতেন। স্নানযাত্রার পরে জগন্নাথদেবের জ্বর হওয়ার জন্য যখন মন্দির বন্ধ থাকত, সেই সময় তাঁর বিরহ সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যদেব এখানে চলে আসতেন ও বেশির ভাগ সময় এখানেই শুয়ে বসে নাম করতেন। পুরীতে তিনি ফিরে যেতেন নবযৌবন বেশে জগন্নাথদেব বাইরে আসার পরে। পুরীতে বাসকালে ১৬-১৭ বছর ধরে এইভাবেই আলালনাথে এসে তিনি

কাটিয়ে যেতেন। আলালনাথ তাঁর বড় প্রিয় স্থান ছিল। এর নির্জনতা ও নারায়ণের জাগ্রত উপস্থিতি তাঁকে বছর বছর এখানে আকৃষ্ট করত।

আমারও মনে পড়ল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যলীলা, ৭।৭৪-৭৬) পড়েছি—শ্রীচৈতন্যদেব পুরী থেকে দক্ষিণ ভারতে যাত্রাপথে প্রথমেই সমুদ্রের তীরে আলালনাথে যান। এখানে এসে—

"সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা,
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা কতক্ষণ,
দেখিতে আইল্ল তাঁহা বৈসে যত জন।
চৌদিকেতে লোকে সবে বলে হরি হরি,
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি।
কাঞ্চনসদৃশ দেহ অরুণ বসন,
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥"

সেখানে সেদিন থেকে "সেই রাত্রি গোঁয়াইল কৃষ্ণকথারঙ্গে" —পরদিন সকালে মহাপ্রভু দক্ষিণাপথে যাত্রা করলেন।

দক্ষিণদেশ থেকে ফিরে আসার পরে পুরীতে জগন্নাথদেবের

"স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহা দুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িঞা॥"
(মধ্যলীলা, ১১।৫১-৫২)

তারপরে ক্রমে গৌড়ীয় ভক্তেরাও এই সময় সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আনন্দে নামকীর্তনে কাটাতেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, ৯ম পরিঃ) আরেক বার মহাপ্রভুর মুখে এই তীর্থের নাম শোনা যায়। তাঁর ভক্ত গোপীনাথ ও তার ভাই বাণীনাথ ছিলেন উৎকলরাজের কর্মচারী। রাজার আদেশে তাঁরা শাস্তি পেলে অন্য ভক্তেরা তাঁদের শাস্তি মকুব করার জন্য মহাপ্রভুর কাছে মিনতি জানালে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন:

"ইহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইহা না পাই সোয়াথ॥" (৫৯)

তাঁর এই মনোভাব জেনে ভক্তরা বলেন:

"তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথে।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাতে॥" (৭৬)

তাঁরা একথা বললেও মহাপ্রভু চেয়েছিলেন—

"আলালনাথ যাই তাহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা না শুনিব॥" (৯১)

এইরকম ছিল মহাপ্রভুর আকর্ষণ আলালনাথের ওপর। এখানকার নির্জন পরিবেশ, চারিদিকে গাছপালা-ঘেরা তপোবনের মতো এই স্থান আচার্য রামানুজের ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত। ভক্ত-ভগবানের লীলায় আজও জাগ্রত এই স্থান। খুব ভাল লাগল আমাদেরও।

ফিরবার পথে প্রণাম জানালাম—

"শঙ্খং সুচক্রং সুগদাং সরোজং দোর্ভির্দধানং গরুড়াধিরূঢ়ং।
শ্রীবৎসচিহ্নং জগদাদিমূলং তমালনীলং হৃদি বিষ্ণুমীড়ে॥"

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর আরাধ্য আলালনাথকে প্রণাম জানিয়ে, সেই বালক ভক্তকেও প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম আবার পুরীর পথে।☐

মায়ের কথা

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীমায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। তাঁকে কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছি? ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে লিখেছেন, অবতারপুরুষেরাও হুবহু মানুষের মতো লীলা করেন; তবে তা নিজেদের কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য নয়, জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁরা মানুষের মতো আচরণ করেন। তাঁরা নিজেদের শরীরকে পর্যন্ত লোকহিতার্থে আহুতি দিয়ে থাকেন।

ঠাকুর বিনা আমন্ত্রণে কেশব সেনের কলুটোলার বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলেন। কেশব সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। ঠাকুর পরদিন হৃদয়কে নিয়ে বেলঘরেতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কেশবের বাড়িতে এই যে ছোটাছুটি, এর পিছনে ঠাকুরের নিজের কোন স্বার্থ ছিল না; ঠাকুরের যাতায়াত তাঁকে কিছু দেবার জন্য। কেশবের অসুখের সময় ঠাকুর সিদ্ধেশ্বরীকে ডাবচিনি মেনেছিলেন, যা আত্মীয়স্বজনের জন্য লোকে করে থাকে। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে কত ভালবাসতেন! তাঁর অহৈতুকী ভালবাসা। সে-ভালবাসার আস্বাদ যারা পেয়েছে তাদের জীবনের ধারা বদলে গেছে। সে-আস্বাদ মুখে ব্যক্ত করা যায় না। ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষ আমাদের বলেছিলেন: "ঠাকুর আমাকে দেবতা করে দিয়ে গেছেন। তিরস্কার বা ভর্ৎসনার ভিতর দিয়ে নয় রে, ভালবাসা দিয়ে।"

জীবনে প্রথম এই অহৈতুকী ভালবাসা আস্বাদন করেছি শ্রীমার কাছে। তাঁর অপার স্নেহলাভের সৌভাগ্য হয়েছে। সংসারাশ্রমে জননীর একমাত্র পুত্ররূপে আদরযত্নে পালিত হয়েছিলাম; গর্ভধারিণীর ভালবাসাই তখন সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ করতাম। শ্রীমার সান্নিধ্যে এসে সে-ভালবাসা আলুনি লেগেছিল।

জয়রামবাটীতে শ্রীমার প্রথম দর্শন লাভ করি। তখন ১৯০৫ কি ১৯০৬ সাল। আমার বয়স বাইশ-তেইশ। কলকাতার ছেলে পল্লীগ্রামে চলেছিলাম; ভাবনা হলো, কে শ্রীমার কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। মনে একটা সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। যখন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মা তরকারি কুটছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন: "কেমন আছ বাবা? রাস্তায় আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?" সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি। "কেমন আছ বাবা?" এ কি প্রশ্ন! আমার জীবনে সেটি একটি স্মরণীয় দিন। সে-দিনটির কথা ভাবলে আজও অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। সেবার মার কাছে সাতদিন ছিলাম। কত স্নেহ করেছিলেন! কত স্নেহবিগলিত কথা বলেছিলেন! তিনি তখনি ভাবসমাধি করিয়ে দিলেন না, চিরকালের মতো সন্তান বলে গ্রহণ করে নিলেন।

উদ্বোধনে একদিন পূর্ববঙ্গের একটি মেয়েকে মা দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার পর তার সঙ্গে একত্র আহার করলেন। পরে তার হাতে এক ঘটি জল তুলে দিয়ে মা বললেন: "হাত ধোও।" হাত ধোওয়া হলে তাকে আরেক ঘটি জল দিয়ে মা বললেন: "পা ধোও।" মেয়েটি তো কেঁদে ফেললে। বললে, এমন আদেশ মা যেন না করেন। মা বললেন: "তুমি আমার কে?" সে উত্তর দিলে: "আমি তোমার মেয়ে।" তখন মা বললেন: "তবে যা বলছি শোন। পা ধোও।" তখন সে পা ধুলো।

জয়রামবাটীতে একদিন একজন মুসলমান মজুর রোয়াকে খেতে বসেছে। ১৯০৫-১৯০৬ সালের পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবারের কথা বলছি। প্রসন্নমামার মেয়ে নলিনী উঠোন থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই মজুরকে খেতে দিচ্ছিলেন। মা একটু কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন; ব্যাপারটি তাঁর নজরে পড়তেই তিনি "ও কি রে!" বলে নলিনীর হাত থেকে থালা কেড়ে নিলেন। কাছে বসে "বাবা খাও" বলে পরিপাটি করে লোকটিকে খাওয়ালেন। তারপর এঁটো পরিষ্কার করে মা গোবরজল ছড়া দিচ্ছেন, এমন সময় নলিনী বললেন: "পিসীমা, তোমার জাত যাবে যে!" মা বললেন: "ছেলের এঁটো পরিষ্কার করলে জাত যায় নাকি!"

নিবেদিতা তো মেম ছিলেন। মা তাঁর ভাষা জানতেন না; অথচ নিবেদিতার সঙ্গে একত্র খেতে বসতেন। তাঁর কী উদারতা! এইসব দৃষ্টান্ত আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি মার ভালবাসা কি অদ্ভুত জিনিস। এই ভালবাসা দিয়েই তিনি 'সকলের মা' হতে পেরেছিলেন।

১৯১১ সালে দক্ষিণ দেশে গিয়ে মা ব্যাঙ্গালোরে এক সপ্তাহ ছিলেন। সেই দিনগুলির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ঠাকুরের তখনো এত প্রচার হয়নি। মা আশ্রম দেখতে এসেছেন। কথা কানে হাঁটে। এই সাতদিন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান থেকে আরম্ভ করে গরিব দুঃখী পর্যন্ত কত লোক যে আশ্রমে এসেছিলেন তার ঠিকানা নেই। ন-বিঘে আশ্রম-প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীতে ভরে যেত। মার এত আকর্ষণ! তিনি শুধু একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন; একটু একটু হাসতেন। ওদেশের ভাষা জানেন না বলে তাঁর খুবই কষ্ট হতো।

ব্যাঙ্গালোরে একদিন আড়াইটে-তিনটেয় মাকে ফিটনে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময়টা আশ্রমে ভিড় ছিল না। কাছেই গোবিপুরের গুহা-মন্দির দর্শন করে আমরা যখন আশ্রমে ফিরলাম, তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। মাকে বললাম: "দেখুন কত লোক দর্শনের জন্য এসেছে।" মা গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর পায়ে বাত ছিল, একটু টেনে টেনে চলতেন। মাকে দেখে দর্শনার্থী জনতা দক্ষিণদেশে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মা অমনি সমাধিস্থা হয়ে বরাভয়করা মূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল পাছে পড়ে যান। সেদিন তিনি সকলের হৃদয় পুলকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। মা ব্যুত্থিতা হলে দর্শনার্থীরা আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন। একজন বললেন: "ইনি তো দেবী, আমাদের সত্যিকারের মা।"

একদিন আশ্রমে একঘর লোক বসে। ত্রিশ-চল্লিশ জন। মা আমাকে বললেন: "বাবা, এদেশের ভাষা জানি না। একটা কথাও বলতে পারছি না।" আমি তাঁদের সে-কথা জানালাম। তাঁরা বললেন: "আমাদের প্রাণ মাতৃদর্শনে আজ আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে। কথা নাই বা বললেন।" মা হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

মার তো তবু ঠাকুরের মতো মুহুর্মুহুঃ সমাধি হতো না। ঠাকুর স্পর্শমাত্রেই লোকের কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিতে পারতেন। মা এমনিতেই এত! আজ তাঁকে নিয়ে জগতে তোলপাড় হচ্ছে।

নারী ধর্মজগতে এক প্রহেলিকা। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ অবতারদের জীবনে নারীর স্থান ছিল না। স্ত্রী ত্যাগ না করলে পরমার্থ লাভ হয় না—এই তাঁদের ভাব। শিবাবতার শঙ্কর বলেছেন: "নরকের দ্বার কি?—নারী।" সন্ত তুলসীদাসের দোঁহায় নারীকে "দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী" বলে অভিহিত করা হয়েছে। রামকৃষ্ণাবতারে কিন্তু এমন নয়। ঠাকুরের জন্য যখন পাত্রীর সন্ধান চলছিল, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন: "জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্জের বাড়িতে পাত্রী কুটোবাঁধা হয়ে আছে।" শ্রীমা ঠাকুরের সেই "কুটোবাঁধা" মেয়ে। সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর অন্য কাউকে গ্রহণ করলেন না। চিহ্নিত মেয়েটিকে নিয়ে সংসার-রঙ্গমঞ্চে তিনি যে অদ্ভুত লীলা, যে নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন জগতের ইতিহাসে তার নজির মেলে না।

কৌরবসভায় দ্রৌপদী যখন লাঞ্ছিতা হন, যুধিষ্ঠির তখন সত্যবদ্ধ; তাই পাণ্ডবেরা ছিলেন নিষ্ক্রিয়। সতীর বেদনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা দপ্‌দপ্ করছিল। চণ্ডীতে আছে: "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। ঠাকুর এবং স্বামীজীও স্পষ্ট দেখেছিলেন—নারীজাতি না জাগলে দেশের উন্নতি হবে না। সত্যসঙ্কল্প স্বামীজীর একটি স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল। মাকে কেন্দ্র করে গঙ্গার পূর্বতীরে স্বামীজীর স্ত্রীমঠের পরিকল্পনা আজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। সেখানে সন্ন্যাসিনীরা থাকবেন। তার ওপর বেলুড় মঠের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।[১] একদা অমাবস্যায় মাকে ষোড়শী জ্ঞানে পূজা করে ঠাকুর ব্রহ্মকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। ভারতে আবার মৈত্রেয়ী গার্গীদের আবির্ভাব হবে। সমগ্র নারীজাতির ভিতর মাতৃভাবের উদ্বোধন—ষোড়শী পূজার এটাই গূঢ়ার্থ।

এখন ঠাকুর ও মায়ের যুগ। আমাদের সেইভাবে জীবন গঠন করতে হবে। মা কম সংসারী ছিলেন না! সংসারের মধ্যে থেকেই মেয়েদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে হবে তাঁকে আদর্শ রেখে।

মার একটি উপদেশ আমি প্রত্যহ চিন্তা করি। লীলাসংবরণের চার-পাঁচ দিন আগে তিনি অন্নপূর্ণার-মা নামে আসন্ন মাতৃবিয়োগে শোকাকুলা একটি ভক্ত মেয়েকে বলেছিলেন: "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" নিমগাছের সবই তেতো। কিন্তু মৌমাছি নিমফুল থেকেও একটু মধু আহরণ করে নিয়ে যায়। তেমনি, সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রয়েছে বটে, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান। প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় সত্তা বর্তমান বলে সকলকেই আপনার জ্ঞান করতে হবে।

মার এই অন্তিম উপদেশটি পালন করলে আমাদের জীবন মধুময় হয়ে যাবে।★ ☐

সংগ্রহ: স্বামী চেতনানন্দ

১ দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে শ্রীসারদা মঠের উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ সালের ২ ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

★ মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ১১ এপ্রিল ১৯৫৪ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ। অনুলিখন: বিমলকুমার ভট্টাচার্য (দ্রঃ 'বিদ্যার্থী', শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৬১, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা)

মেলেনী পুজো ও তার গান

তাপস বসু

লোকসংস্কৃতির ধারায় অনাবিষ্কৃত ও উপেক্ষিত এই বিষয়টি। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার পদ্মার অববাহিকা অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে লেখক প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

বাংলার লোকসংস্কৃতির বর্ণময়, বহুমুখী, বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রেক্ষাপটে মেলেনী পুজো ও তার গান একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করে রয়েছে। লোকসংস্কৃতির এই প্রবাহটি ৬ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত কিশোরীদের জন্য নির্দিষ্ট একটি উৎসব। এ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত মেলেনী পুজো ও তার গান শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলগুলি পদ্মার সন্নিহিত। পদ্মার অপর পারে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলাতেও এই পুজো প্রচলিত। পদ্মার সঙ্গে লোক-সংস্কৃতির এই প্রবাহটির একটি গভীর সংযোগ আছে। মেলেনী পুজোর গানে তা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পদ্মার লাগোয়া মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে, লালবাগ থানার পশ্চিম প্রান্তে, জলঙ্গী, রানীনগর, ইসলামপুর, নবগ্রাম, দৌলতাবাদ থানার সন্নিহিত অঞ্চলেই শুধু এই পুজো প্রচলিত।

মেলেনী পুজো শুরু হয় ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে এবং একমাস ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে চৈত্র সংক্রান্তিতে, অর্থাৎ গোটা চৈত্র মাস জুড়েই চলে এই পুজো। চৈত্র মাস গাজনের, চড়কের মাস; অর্থাৎ শৈবসাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এই চৈত্র মাস। ঋতুচক্রের সুচিহ্নিত আবর্তনে চৈত্র মাসটিতে বসন্তের সমাপ্তি। তারপর বৈশাখ থেকে বাংলায় নববর্ষের শুরু। সারা বছরে বুকে যে মালিন্য, কালিমা, আবর্জনা জড়ো হয় তাকে উড়িয়ে দিয়ে চৈত্রের অবসানে নবজীবনের নির্যাস ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, বাতাসে, মানুষের অন্তরে। চৈত্র শেষে কালবৈশাখী সম্পর্কে বাংলার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত খুঁজে পান শিবের কল্যাণকর ভূমিকা। তাই তিনি লেখেন: "চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর।" বহু ব্যবহৃত পৃথিবীর জ্বালা তো 'নীলকণ্ঠ' শিবই জুড়িয়ে দিতে পারেন এবং দেনও। শিব-এ আসলে বৈদিক রুদ্রেরই রূপান্তর, তাই রুদ্রের বিনাশের মাঝে শিবের মঙ্গলময় নবচেতনার, নবজীবনের আশ্বাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় চৈত্রের কালবৈশাখীর মাঝে। বসন্তকালের অন্তিমে শৈব আরাধনার গুরুত্ব এটাই যে, তিনি বাংলার লোকজীবনে, লোকসমাজে উজ্জীবনের, সঞ্জীবনের দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শৈব আরাধনার সঙ্গে মেলেনী পুজোরও সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। আরও একটি কথা, এই চৈত্র মাসেই শিবের ঘরণী শিবানীর পুজো—অন্নপূর্ণা ও বাসন্তী পুজো। মেলেনী পুজো ও তার গানে শিব ও শিবানীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

মেলেনী পুজোর জন্য ৬ থেকে ১২ বছরের কিশোরীরা মাটি দিয়ে ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি মাপের মাটির দুটি মূর্তি তৈরি করে। এই দুটি মূর্তির মধ্যে একটি নারীমূর্তি, অপরটি পুরুষ। মূর্তি-দুটিতে কোন রঙ লাগানো হয় না; কেবলমাত্র কুঁচ ফল মূর্তি-দুটির চোখে বসিয়ে দিয়ে চোখের মণির উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করা হয়। কুঁচ ফল অনেকটা গোটা মুসুর ডালের মতো। তার একটা দিক টকটকে লাল। আরেকটা দিক কুচকুচে কালো। লাল অংশটি মাটির তৈরি মূর্তির চোখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর কালো অংশটি চোখের মণিরূপে বাইরের দিকে থাকে।

এই দুটি মূর্তি আসলে হর-গৌরীরই মূর্তি। মা মেলেনী হলেন গৌরী। মেলেনীর পাশে হর অর্থাৎ শিবের অবস্থান যথার্থ এবং স্বাভাবিক। বাড়ির উঠোনে ছোট চালাঘর তৈরি করে একটি মাটির বেদিতে হর-গৌরীর মূর্তি বসিয়ে কিশোরীরা গোটা একমাস গোধূলিবেলায় মেলেনী পুজো করে থাকে। বিভিন্ন রকমের ফুল-ফল সংগ্রহ করে গানের মাধ্যমে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রতিদিন পুজো অনুষ্ঠিত হয়। যবের ছাতু এই পুজোর প্রধান সামগ্রী। অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে আছে ছোলার ডাল, কাঁচা দুধ, আখের গুড়, আতপ চাল এবং ঘি।

মেলেনী পুজো ও তার গানের উৎস খুঁজতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে অবিভক্ত বাংলার নবাবী আমলে। ১৭০৭-এ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তামাম ভারতবর্ষ জুড়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ এই সূত্রেই স্বাধীন নবাব বনে যান। বাংলাদেশে শুরু হয়

নবাবী আমল—তা চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পলাশীর আমবাগানের যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয় পর্যন্ত। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। সেই সময়ে নবাব, জমিদার, ইজারাদার প্রমুখেরা বড় বড় ফুলের বাগিচা বানাতেন; সেই বাগিচায় তৈরি হতো নাচমহল, বাইজীমহল। আর এই বাগিচাগুলি তৈরি হতো পদ্মানদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। নবাব, ইমানদার, জমিদার, ইজারাদারদের বজরা ভাসত পদ্মার বুকে। চলত আমোদ-প্রমোদ-ফুর্তি প্রজাশোষণের অর্থে। ফুলের বাগিচা তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু মালীরা কাজের মাঝে অবসরের সময়টা বেড়ে যাওয়ায় সম্মিলিতভাবে চৈত্র মাসে হর-গৌরীর আরাধনায় মেতে উঠতেন। এ বিষয়ে তাদের ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা যেত।

'মেলেনী' শব্দটির উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে আমাদের তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়: (১) বাগিচার মালীরা ছিল এই পুজোর প্রবর্তক, (২) মিলিতভাবে পুজোয় অংশ নেওয়া এবং (৩) পুজোর মূল লক্ষ্য—হর-গৌরীর বিবাহ অর্থাৎ মিলন। এই তিনটি সূত্র মেলেনী পুজো ও তার গানের উৎস। গানই হলো পুজোর মন্ত্র। উত্তরকালে পদ্মাতীরের বাগিচাগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মেলেনী পুজো কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। স্বল্পাক্ষর, নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজে কিশোরীরা লোকসংস্কৃতির, লোকধর্মের, লোকবিশ্বাসের এবং তাকে কেন্দ্র করে চিত্তাকর্ষক লোকসঙ্গীতের বিষয়টিকে জিইয়ে রেখেছে।

॥ ২ ॥

কিশোরীরা ফুল, ফল ও অন্যান্য উপচার কলাপাতায় সাজিয়ে দিয়ে মন্ত্রের পরিবর্তে গান গেয়ে পুজোর রীতি-নীতিগুলি পালন করে। প্রথমে মাটির মূর্তি-দুটিকে হলুদ আর তেল মাখানো হয়। তখন সম্মিলিত কিশোরীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যে-গানটি তা হলো:

হলুদ-তেল মাখতে বসল মেলেনী ঘামল রে গা
সোনার আঁচল দিয়ে মোছাব রে গা
চানে [স্নানে] বসল মেলেনী, ঘামল রে গা
সোনার আঁচল দিয়ে মোছাব রে গা।

চৈত্র মাসের প্রতপ্ততায় মা মেলেনীর কষ্ট হবারই কথা। তাঁর বা তাঁদের গা থেকে ঘাম ঝরে পড়াও স্বাভাবিক। তাই স্নানের আয়োজন; স্নানশেষে গা মোছার এবং বস্ত্র পরিধানের পালা। তাই তখন গীত হয়:

গা মুছতে বসল মেলেনী ঘামল রে গা
সোনার আঁচল দিয়ে মোছাব রে গা
বার হাত কাপড়খানি তের হাত দোসী*
ঘুরিয়া ফিরিয়া পরাব মাজার কলসী
সিঁদুর ওলা—ঝোলা, কাজলে বত্রিশ তুলা
কাজলে ওলা—ঝোলা, সিঁদুরে বত্রিশ তুলা।

[* কাপড়ের বর্ধিত অংশ]

মেলেনীর স্নান, গা মোছানো, কাপড় পরা, প্রসাধনের পর পুজো শুরু হয়। বস্ত্র পরিধানের 'মাজার কলসী' শব্দ-দুটিতে বোঝানো হয়েছে যে, এমনভাবে মা মেলেনীকে কাপড় পরানো হবে যাতে আঁটোসাঁটো ভাব থাকে। তাই কলসীর উপমা। আসলে কলসী কাঁখে নিলে যাতে 'মাজা'র (কোমরের) কাপড় আলগা না হয়ে যায় সেই চিন্তা মাথায় রেখে কাপড় পরানোর কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে। ছোট ছোট বত্রিশটা তুলো দিয়ে সিঁদুর পরানো ও কাজল পরানোর বিষয়টি পরিচ্ছন্নভাবেই উপস্থাপিত।

পুজো শুরু হয় এই গানটি সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে:

ভাঁটের ফুল তুলতে গেলাম ভাঁটতলাতে গিয়ে
গৌরী বদন চেয়ে
হে গৌরি হে গৌরি, তোমার ফুলের নাম নেই
হাত চুলকায়, পা চুলকায়, চুলকায় সর্ব গা
মা মেলেনী ভাঁটির দেশে যা
ভাঁটি থেকে এল মেলেনী
উদয় হলো থানে [স্থানে]
নরলোকে পুজো খেয়ে মা মেলেনী থাকে চেয়ে।

বিভিন্ন রকমের বনজ ফুলে মেলেনীর পুজো হয়। বনজ ফুল তুলতে গিয়ে নানা বিষাক্ত লতা-পাতার স্পর্শ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। আর মা মেলেনী যে গৌরী তা গানে স্পষ্ট।

এই সময় শিমুল ফুল ফোটার সময়। শিমুল ফুলের মালা গেঁথে হর-গৌরীকে পরানো হয়।

ছ-কুড়ি শিমুলের ফুল পাড় রে
মা মেলেনীর মালা গাঁথ রে
গাঁথা মালা মেলেনী পর রে।

প্রতিটি গানের শেষে কিশোরীরা উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। পুষ্পচয়ন এবং গান গেয়ে অঞ্জলি এই পুজোর বৈশিষ্ট্য। তাই আবার বনজ ফুলের প্রসঙ্গ আসে গানে—

কাঁটাফুল কেরাকুরার ফুল তুলতে গেলাম
হাতে ঢুকল কাঁটা

সরু সরু লাটাকী [কাঁটাযুক্ত ফল]
চাঁদবদন খোঁপা
কাঁটায় কাঁটায় বেঁধে দেব
মা মেলেনীর পুজো রে।

আবার ফুল নিয়ে আরেকটি গান—তবে এই গানটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বসন্ত ঋতুর বন্দনাও ঃ

সব ফুল তুলিয়া জোয়ার ঘাটে দুলিয়া
চ্যাঙ চ্যাঙা চ্যাঙরে বসন্তেরই বাহারে
আয়রে সবাই বসন্তের ফুল তুলতে যাই
ফুলের মালা গেঁথে মা মেলেনীরে পরাই।

পরের গানটিও পুষ্পচয়নের, তবে গানটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

মামাগো মামা ফুল গাছের ডাল ভেঙ না
ডালে চড়ে যাব সোনার সাজি কাঁখায় করি
ইহা ফুল যাবেরে ভাই কারো কারো বাড়ি
এই ফুল যাবেরে বন্যা ভায়ের বাড়ি
বন্যা ভায়ের ঘরখানি পাথরের থলি
বন্যা ভায়ের ঘর থেকে বেরোয় মেলেনী
সিঁথি কেন তার খালি?
সিঁথি ভরে দেব সিঁদুর
ধপ্‌ধপ্‌ করে জ্বলে।

পুষ্পচয়নের সময় যাতে গাছের ডাল না ভাঙে, গাছের কোন ক্ষতি না হয় তার কথা যেমন উচ্চারিত হয়েছে, তেমনি ফুলের বাগিচা যাদের হাতে তৈরি হয় তারাও এই গানে 'বন্যা' ভাইরূপে (অর্থাৎ বনজ বা বন্য শব্দগত অপভ্রংশে 'বন্যা' হয়েছে) উল্লেখিত, যাদের ঘরবাড়ি আর্থিক অসচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ভাঙা ইট-পাথরের তৈরি—কোনরকমে টিকে থাকার ব্যবস্থা সেখানে। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি তিনশ বছরের ধারাবাহিকতায় একটুও বদলায়নি। আজও মালীদের বাসস্থান 'পাথরের থলি'।

এবার পুজোতে অর্ঘ্য নিবেদন করে গাওয়া হয় ঃ

ঐ পারেতে নৌকাখানি টলমল করে
এ পারেতে সবাই মিলে মা মেলেনীর পুজো করে
এক কোপটে [মাটির সরা] আলো চাল [আতপ চাল]
দু কোপটে ঘি
বছরান্তে মায়ের পুজো করব নাতো কী!

বসন্তের শেষে চঞ্চল বাতাসে নদীতে নৌকা টলমলের চিত্রকল্প তুলে মেলেনী পুজোর গানে তার উপস্থাপনা আমাদের আবিষ্ট করে। নদীর কথা এরপর বারেবারেই আসবে, কেননা গঙ্গা-তীরবর্তী অঞ্চলের কিশোরীরাই তো এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

হর-গৌরীর বিবাহে গৌরীর মাতা-পিতার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাগ্‌-বিবাহ পর্বে তাই গানের রেশ ছড়িয়ে পড়ে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে—

নদীর ঐ পারেতে মেলেনীর মা এসেছে
তাই দেখে মেলেনী হেসে উঠেছে
আসুক মা বসুক ঘাটে
পা ধুয়ে আসুক গুড়ার ['গোড়া' অর্থাৎ প্রশস্ত] ঘাটে
পান খেয়ে বিরাজ করুক
পাকা চুলে সিঁদুর পড়ুক।

ঐ পারেতে মেলেনীর বাবা এসেছে
তাই দেখে মেলেনী আবার হেসে উঠেছে
আসুক বাবা বসুক ঘাটে
পা ধুয়ে আসুক গুড়ার ঘাটে
পান খেয়ে বিরাজ করুক
পাকা চুলে আবির পড়ুক।

পুজোর সমাপ্তি—হর-গৌরীর মিলনে। প্রাগ্‌-মিলন পর্বের আবেগ-উল্লাস চৈত্রে প্রকৃতিকেও স্পর্শ করে—

আম ধরে থোকা থোকা তেঁতুল ধরে বাঁকা
আমার মেলেনীর বিয়ে লেগেছে বাক্স-ভরা টাকা।

বিবাহ-পর্বে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে বাস্তবতার ছবি ফুটে ওঠে—

ক) ছোল-বুট [ছোলা] হলো রে ছালা ছালা [বস্তা বস্তা]
তাই তুলতে এত বেলা!
সাজল রে সাজের কুঁচ [চোখের মণি]
তাই তুলতে এতক্ষণ!

খ) শাঁখারু [শাঁখারি] বাড়ি গেলাম যদি
শাঁখারু বলল বস।
বসব না ভাই, বসব না ভাই
আমার মেলেনীর বিয়ে লেগেছে
গয়না দিয়ে এস।

গ) গয়না নিলেম একেবারে
মূল্য দিলেম বারেবারে।

এই সব নাতিদীর্ঘ গানগুলির মধ্য দিয়ে শস্যশ্যামলা, নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছবি যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি গ্রামীণ মানুষের অসচ্ছলতার কথাও প্রকাশ পেয়েছে। মেয়ের বিয়ের গয়নার দাম একেবারে দিতে

অসমর্থ গরিব মালীরা, তাই কিস্তিতে পরিশোধ করাতে হয়। তবুও গয়নাগুলো সোনার নয়, শাঁখের।

মেলেনীর বিয়ে হয়ে গেল। আনন্দে ভরে উঠল ভুবন।

মা মেলেনীর বিয়ে হলো
হর-গৌরীর মিলন হলো
মা মেলেনীর ঘর ভরে যাক আলোয়
নতুন বছর কাটুক মোদের ভালয়, ভালয়।

গ্রহণ করে। পুজো শেষ হলে চৈত্র সংক্রান্তির গোধূলি-বেলায় পদ্মা বা স্থানীয় কোন নদীর জলে হর-গৌরীর মাটির মূর্তি-দুটি বিসর্জন দেওয়া হয়।

তিন-চারশ বছর আগে লোকসংস্কৃতির এই ধারাটি পথ চলা শুরু করে আজ স্বল্পাক্ষর-নিরক্ষর কিশোরীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রাণচাঞ্চল্যে টিকে রয়েছে। সময়ের ব্যবধানে মেলেনীর পুজো ও গানে আধুনিকতার স্পর্শ



পদ্মানদীতে মা মেলেনীর বিসর্জন

আলোকচিত্র : সনৎকুমার মিত্র

এই গান গাইতে গাইতে উলুধ্বনি দিয়ে হর-গৌরীর মুখে পুজোর সমস্ত নৈবেদ্য ছোঁয়ানো হয়। যবের ছাতু সাতটি কলার পাতায় রেখে উৎসর্গ করা হয়। সাধ্যমত ছাতুতে ঘি মাখিয়ে দেওয়া হয়। আতপচাল, কাঁচা দুধ তো থাকেই। হর-গৌরীকে উৎসর্গের পর সকলে প্রসাদ

হয়তো লেগেছে, কিন্তু গ্রামীণ সরল নিরক্ষর ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের গভীর আকুতিতে তা এখনো পূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং জীবন্ত হয়ে রয়েছে মেলেনী পুজো ও তার গানে লোকসংস্কৃতির এক উজ্জ্বল ধারা।□

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার : নৈমুদ্দিন শাহ, ভাস্কর চক্রবর্তী।

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

আমার দেখা দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা

শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধান

৪ শ্রাবণ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ (২১ জুলাই ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ) রাত্রি দেড়টার সময় শ্রীশ্রীমা ধরাধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেষ্টলাল মহারাজ (স্বামী ধীরানন্দ) কিরণচন্দ্র দত্তকে সংবাদ দিতে আসিলেন তাঁহাদের বাগবাজারের বাড়ি 'লক্ষ্মী-নিবাসে'। তখন কিরণচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ এবং সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিপদ দত্তের কাছে কেষ্টলাল মহারাজ কিরণচন্দ্রের ঐ অবস্থার কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি আসেন এবং কিরণচন্দ্রকে ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ জানান। সঙ্গে সঙ্গে সারা দত্ত পরিবারে নামিয়া আসিল গভীর শোকের ছায়া। মায়ের ঔর্ধ্বদেহিক কার্যের চন্দনকাঠ ও ঘিয়ের জন্য কিরণচন্দ্র কেষ্টলাল মহারাজের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ দিলেন। কেষ্টলাল মহারাজ চলিয়া গেলেন।

কিরণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, বাড়ির প্রত্যেকে যাইয়া শ্রীশ্রীমাকে শেষ প্রণাম জানাইয়া আসিবে, আর বাড়ির সকলে তিনদিন অশৌচ পালন করিবে। কিরণচন্দ্রের নির্দেশে দত্তবাড়ির আবালবৃদ্ধবনিতা মাকে প্রণাম করিতে গেল। কিরণচন্দ্র আমার পিতৃদেব। আমার বয়স তখন প্রায় দশ বছর। আমিও বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। মায়ের বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, বর্তমান ঠাকুরঘরের মাঝখানে মায়ের ভাগবতী তনু শায়িত; মাথাটি পূর্বে সিংহাসনের দিকে। কয়েকদিন পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় যখন মাকে মেঝেতে শোয়ানো হয় তখন ঠাকুরের ছবি সিংহাসন-সহ তিনতলায় স্থানান্তরিত করা হয়। মায়ের বিছানার সামনে একটি জবাফুলের ঝুড়ি লইয়া কেষ্টলাল মহারাজ দণ্ডায়মান। তিনি প্রত্যেক দর্শনার্থীর হাতে একটি করিয়া জবাফুল দিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে সারিবদ্ধভাবে সেই ফুল মায়ের পায়ে দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমরাও সকলে তাহাই করিলাম।

আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলে তিনদিন অশৌচ পালন করিয়াছিলাম। পরদিন যথারীতি আমরা স্কুলে গিয়াছি—খালি পা, তৈলবিহীন শুষ্ক মাথা। মাস্টারমশাইরা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছি: "শ্রীশ্রীমা দেহ রেখেছেন, তাই আমাদের অশৌচ।" মাস্টারমশায়দের ঘরে আলোচনা কানে আসিল: "শুনেছেন মশাই, রামকেষ্ট পরমহংসের স্ত্রী মারা গেছে—দত্তবাড়ির অশৌচ!" তাঁহাদের বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য আমাকে খুব কষ্ট দিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর বেলুড় মঠ পরিদর্শন

শ্রীশ্রীমায়ের তিরোধানের কয়েক মাস পরের ঘটনা। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ১৭ মাঘ, রবিবার, পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি (৩০ জানুয়ারি ১৯২১)। বেলুড় মঠে স্বামীজীর তিথিপূজা উৎসব। সেদিনের উৎসবে ধ্রুপদ গান ও কালীকীর্তনের বিশেষ আয়োজন ছিল। মঠপ্রাঙ্গণে 'স্বামীজীর মতে বর্তমান যুগে আমাদের কর্তব্য' সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য (পরে স্বামী নির্বেদানন্দ) প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐদিন বৈকালে মহাত্মা গান্ধী সহধর্মিণী কস্তুরবা ও এক পুত্রকে লইয়া বেলুড় মঠে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মৌলানা সওকত আলি, মতিলাল নেহরু, তাঁহার কন্যা কৃষ্ণা নেহরু (পরে কৃষ্ণা হাতি সিং) এবং অন্যান্য মহিলা। পুরাতন ঠাকুরঘরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত ঠাকুর-প্রণাম করেন। স্বামীজীর সেবক কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ লইয়া সকলকে দিলেন এবং তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন। মৌলানা সওকত আলিকে কানাই মহারাজ বলিলেন: "ইয়ে গরীবখানা মেঁ আউর কুছ জ্যাস্তি (বেশি কিছু) কাঁহা মিলে গা?" মৌলানাজী প্রত্যুত্তরে বলিলেন: "ইয়ে ভগবান কা দৌলতখানা হ্যায়—ঈশ্বর কা প্রসাদ। বহুত উমদার (অমূল্য)!" পরে তাঁহারা ঠাকুরের শয়নকক্ষে যান। গান্ধীজী ঠাকুরের ব্যবহৃত হুঁকাটি দেখিয়া খুব হাসিতে থাকেন। বলিলেন: "Hubble-bubble, Hubble-bubble!" তাহার পর তাঁহারা পুরাতন মন্দিরের সংলগ্ন ছাদ দিয়া স্বামীজীর ঘরে আসিলেন। স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখিয়া গান্ধীজী খুব প্রীত হন। পরে তাঁহারা সকলে গঙ্গার ধারে দ্বিতলের বারান্দায় আসেন। সামনের মাঠে ভক্তবৃন্দ, জনতা, পুলিস এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। কাহাকেও দোতলায় উঠিতে দেওয়া হয় নাই। গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। গান্ধীজী বলিলেন: "আমি ইংরেজীতে বলিব না।" হিন্দী এবং উর্দুতে তিনি কয়েকটি কথা বলিলেন। প্রথমেই বলিলেন: "ম্যায় গুরুস্থান মেঁ আয়া।" তাহার পর তিনি স্বামীজী-প্রবর্তিত জাতিগঠন সম্বন্ধীয় কার্যাবলী এবং জাতীয় জাগরণে তাঁহার বিরাট অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছিলেন: "স্বামীজীর ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক আমি দ্বিতীয় আর কাহাকেও জানি না। আমার স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা স্বামীজীর উপদেশ হইতে আমি পাইয়াছি। তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া আমার স্বদেশপ্রেম সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।" মঠের তরফ হইতে মহাত্মাজীকে স্বামীজীর 'Complete Works' উপহার দেওয়া হয়। গান্ধীজী তখন বলেন: "আমি তাঁহার পুস্তকাদি বহু পূর্বেই পড়িয়াছি।" ঐদিন পিতৃদেব কিরণচন্দ্রের সঙ্গে আমিও মঠে উপস্থিত ছিলাম এবং এইসকল ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার বয়স তখন পূর্ণ দশ বছর। গান্ধীজীর বেলুড় মঠ দর্শনের বিবরণ লিখিবার সময়

আমি পিতৃদেবের ঐদিনের ডায়েরীর সাহায্য লইয়াছি।

ব্রহ্মগোপাল দত্ত

লক্ষ্মী দত্ত লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩

সুন্দরের উপাসক কবি কীটস

'উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৪০২ সংখ্যায় প্রকাশিত তাপস বসুর 'সুন্দরের উপাসক কবি কীটস' একটি অত্যন্ত উপভোগ্য, মূল্যবান এবং নবমূল্যায়নমূলক রচনা। শ্রীবসু তাঁর রচনায় যে নিপুণতার সঙ্গে কবি কীটসের রোমান্টিকতার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারার আলোচনা, কবি কীটসের সাহিত্যকৃতির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান আমাদের উপহার দিয়েছেন, তা আমার ন্যায় স্বল্পশিক্ষিত আগ্রহী বৃদ্ধের (৭০+) কাছে 'রেভিলেশন'।

কীটসের 'হেলেনিজম' সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা থাকলে মন আরও তৃপ্ত হতো। আগ্রহী পড়ুয়ারাও উপকৃত হতো, আজকাল তো কলেজে এসব পড়ানো হয় না। লেখক তাপস বসুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অমলকান্তি বসু

বোসপুকুর রোড, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২

'উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৪০২ সংখ্যার 'সাহিত্য' বিভাগে তাপস বসুর 'সুন্দরের উপাসক কবি কীটস' এক মূল্যবান নিবন্ধ। বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবির জন্মদ্বিশতবর্ষপূর্তিতে, যখন এই চিঠিটি লিখছি (৪ নভেম্বর ১৯৯৫) তখন পর্যন্ত, আমাদের দেশের সমস্ত নামী দামী পত্র-পত্রিকাগুলি—এমনকি বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকাগুলিও তাঁকে এতটুকু স্থান দিতে পারল না। কিন্তু 'উদ্বোধন' নিজের ধারায় পরম মমতায় ও তার ঐতিহ্য অনুসারে প্রকাশ করল এই সুন্দর স্মারক রচনাটি। 'উদ্বোধন' আবার প্রমাণ করল যে, সে নিছক একটি প্রাচীন ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সেখানে বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজচিন্তার পাশে প্রকাশিত হয় সাহিত্য-বিষয়ক মূল্যবান রচনাও। তাপস বসু তুলে ধরেছেন কীটসের দারিদ্র্য এবং সংগ্রামী জীবনের পাশে এক সরল সৌন্দর্য-উপাসক, প্রকৃতিপ্রেমী, রোমান্টিক কবির মূল্যবান ও মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনী। মাত্র পঁচিশটি বসন্তের পরমায়ু নিয়ে কীটস কিভাবে তাঁর অনবদ্য কবিতা, কাব্য এবং ওড (ode)-গুলি রচনা করেছেন তাপসবাবুর রচনায় তার বর্ণনা পড়ে শিহরিত হয়েছি। সেইসঙ্গে স্বামীজীর সত্য-শিব-সুন্দর আদর্শের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

গোপেন্দ্র চৌধুরী

গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫

আমি সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের (ইংরেজী বিভাগের) ছাত্র। 'উদ্বোধন'-এর কার্তিক ১৪০২ সংখ্যাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তাপস বসুর 'সুন্দরের উপাসক কবি কীটস'—নিবন্ধটি আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে। সাহিত্য-সম্পর্কিত এমন একটা সুন্দর ও হৃদয়স্পর্শী তথ্যবহুল রচনার জন্য লেখককে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেইসঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদককেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যিনি এমন একটি মূল্যবান রচনাকে পত্রিকায় স্থান দিয়ে পাঠকবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কীটসের জীবনী ইতিপূর্বে বহুবার পড়েছি। কিন্তু এই প্রথম পেলাম এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহীভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত কীটসের জীবনের কয়েকটি পৃষ্ঠা। কবির ক্ষয়রোগকালীন দুরবস্থার এবং প্রেম ও ব্যর্থতার বর্ণনা এতই প্রাণস্পর্শী যে, তা পাঠকের চোখে জল না এনে পারে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য কবি যেভাবে উপভোগ করেছেন তার বর্ণনাও অনবদ্য। কবির 'এপিটাফ' ও তার পরবর্তী কয়েকটি লাইন তাঁর হতাশা ও জীবন সম্পর্কে আমাদের মনে তীব্র বেদনাবোধ জাগ্রত করে। সত্য ও সুন্দরের উপাসক কীটস সম্পর্কে সময়োপযোগী আলোচনা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে এইরকম হৃদয়গ্রাহী রচনা লেখক বা 'উদ্বোধন' আমাদের কাছে উপস্থাপিত করবেন।

রামকৃষ্ণ চন্দ্র

সুভাষপল্লী, সিউড়ী, জেলা—বীরভূম

মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প-ত্রাণে রামকৃষ্ণ মিশনের অতুলনীয় সেবাব্রত

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৪০২ সংখ্যায় স্বামী অচ্যুতানন্দের লেখা 'গোহাল দুঃখ-রজনী' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলার ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম। অসংখ্য মানুষের দুঃখ ও নিরাশ্রয়তার কথা ভেবে মন দুঃখে ও বেদনায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আজ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের সক্রিয় সেবাব্রতের জন্য আমরা গর্ববোধ করছি। 'উদ্বোধন' মারফত দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহান ও বিশাল কার্যাবলীর সংবাদ প্রতি মাসেই আমরা জানতে পারি। মহারাষ্ট্রের লাতুরে মর্মন্তুদ ভূমিকম্পের পর অভূতপূর্ব তৎপরতায় যে অতুলনীয় সেবাব্রত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা করলেন তা সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং সেবাব্রতী মানুষের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। এই সেবাব্রতের মর্মস্পর্শী তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য লেখক স্বামী অচ্যুতানন্দকে এবং 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদককে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ নিবেদন করছি।

অনুরাধা মল্লিক

ঘাটাল, জেলা—মেদিনীপুর, পিন-৭২১২১২

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"ঈশ্বরকে কি আপনি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, দেখেছি, ঠিক তোমাকে যেমন দেখছি।"

দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত ঠাকুরের উত্তর। "ঠিক যেমন তোমাকে দেখছি, ঈশ্বরকে আমি সেইভাবেই দেখেছি।"

"আমাকে দেখাতে পারেন?"

"অবশ্যই পারি।"

তবে তোমার ঐ চোখে হবে না। প্রেমের চোখ চাই। প্রেমিক হতে হবে। ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর রকমের আঁকুপাঁকু ভাব আনতে হবে, মানুষকে জলে চুবিয়ে ধরলে যেমনটি হয়। সবাই বলে বটে, দর্শন চাই, কিন্তু হায়! সেই ব্যাকুলতা কোথায়!

এই ব্যস্তসমস্ত, জগঝম্প বিজ্ঞানের যুগে, বিজ্ঞ মানুষের ঈশ্বরে কিবা প্রয়োজন! জীবিকা, অর্থ, সংসার, ভোগ, রোগ-আরোগ্য, প্রমোদভ্রমণ, বিত্ত, প্রতিপত্তি, খ্যাতি—স্তরে স্তরে এই প্রাপ্তি, এর বাইরে কী আছে, কে আছে—মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! একালের একটি সুন্দর শব্দ 'সব ফালতু'। আলু, পটল, মাছ, মাংস ইত্যাদির অভাব বড় অভাব। ঈশ্বরের অভাবে জীবন অচল হবে না। যাঁকে না হলে জীবন চলে যায় তাঁর জন্য ব্যাকুল হবে কোন্ মূর্খ!

প্রতাপশালী অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার তাগিদ আছে। একটা ফ্ল্যাট চাই, কি ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাই, কি হাসপাতালের বেড। নাম জানি, ধামও জানি। সাতসকালেই ধরনা। দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য দূর গ্রামে সিদ্ধাইজানা মানুষের আস্তানায় গিয়ে কৃপাকবচের প্রত্যাশায় ফাঁকা মাঠে সারা রাত উবু হয়ে বসে থাকতেও রাজি। ঈশ্বরের জন্য সারা রাত মেঝেতে 'কোথা তুমি, কোথা তুমি' বলে গড়াগড়ি দিতে প্রস্তুত নই। কারণ, কোন ধারণাই নেই তাঁকে পেলে কি হয়; সেই সুখ, সেই আনন্দ কেমন। দুধ কেমন, না ধোবো ধোবো। অর্থাৎ সাদা, তরল একটি পদার্থ। সেইটাই সব নয়। যিনি দুগ্ধ পান করেছেন তিনি বলবেন, ভাই আরও আছে। দুধ শুধু সাদা নয়—স্নিগ্ধ, সুস্বাদু, স্নেহমিশ্রিত অপূর্ব এক বস্তু। গরু দেখলে দুধের জ্ঞান হবে না, দুধ দেখলে আংশিক জ্ঞান হবে, আর পান করলে হবে পূর্ণ জ্ঞান। সেই জ্ঞানের ফল সুস্বাস্থ্য।

ঈশ্বরের হরেক কথা গ্রন্থে আছে। পণ্ডিতের যুক্তি, তর্ক। সাকার, নিরাকার। ভক্তের প্রেম, উচ্ছ্বাস, অশ্রুজল, বিরহ, অভিমান। আছে ভক্তের জীবনী, অবতারের লীলাকাহিনী। পাঠ্যের অভাব নেই। সাধও জাগতে পারে, কিন্তু সাধ্যি নেই। সদ্যবিবাহিতা তরুণী তার অবিবাহিতা সখীদের স্বামীর কথা বলতে পারে, কিন্তু স্বামিসঙ্গ কেমন জানতে হলে স্বামিসঙ্গ করতে হবে। অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বিস্তর ফারাক।

ঠাকুরের জীবনী জানি। তাঁর সমাধি হতো তাও জানি। আলোকচিত্রে ধরাও আছে সেই অবস্থার ভঙ্গি। শ্রীম তাঁর 'কথামৃতে' ঠাকুরকে চিরজীবন্ত করে রেখেছেন। ততঃ কিম্। তাতে আমার কী হলো? সঙ্কীর্ণতা গেছে? লোভ, লালসা ঘুচেছে? সংশয়মুক্ত হতে পেরেছি? বেঁচে থাকার ভয় গেছে? আনন্দে সদ্যোজাত বাছুরের মতো লাফাতে পারি? ভিতরের অক্কটবক্কট গেছে কি? বিষ্ঠার গন্ধ?

যখন ছাত্র ছিলাম তখন ওস্তাদ বন্ধুরা শিখিয়েছিল অঙ্কের 'ব্যাক ক্যালকুলেশন'। উত্তরটা জেনে নিয়ে তলার দিক থেকে কষে আসা। ধর্মেরও 'ব্যাক ক্যালকুলেশন' আছে। সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ জেনে অনুরূপ অভিনয় করা। চোখ উলটে ফেললাম, বিষয়ীর বিষয় মাখানো মুখে প্রেমিকের হাসি খেলালাম, জ্ঞানমুদ্রা করে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসলাম, কেউ প্রণাম করলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ভরতনাট্যমের কায়দায় হাত তুললাম যেন গৌতম বুদ্ধের 'আপটু ডেট এডিশন'! সব কথাতেই একই প্রত্যয়—'সবই তাঁর ইচ্ছা'। ভোগজীর্ণ ফুসফুসে বাতাস ভরে নাভি থেকে প্রণবমন্ত্র উদ্গীরণের চেষ্টা, 'হরি ওঁ'। 'ওম্' আধমাত্রা উঠেই অষ্টখণ্ড হয়ে গোবৎসের ডাকের মতো শোনাল। তা হোক, গরুও তো গোমাতা। যা-তা নয়। শরীরে চন্দন তেল রগড়েছি। কাছে এলেই গন্ধ। কেউ প্রশ্ন করলে বলি, সাধন-ভজন করলে অমন হয় ভাই। দিব্যগন্ধ! মহাপ্রভুর পর এই আমার হলো। চেহারায় দিব্য চেকনাই আনার জন্য সপ্তাহে একটা করে স্টেরয়েড ইনজেকশন। মাথার পিছনে জ্যোতি ছেটকাবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও হতে পারে। ঘাড়ে টুনি, কোমরে ব্যাটারি।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সংবরণের পর কলকাতার এক ভদ্রলোক ঢোল-শোহরত করে ঘোষণা করলেন, তাঁরও সমাধি হচ্ছে। তিনি দ্বিতীয় শ্রীরামকৃষ্ণ। সব চলে এস আমার কাছে। আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান সব পেয়ে যাবে আমার কাছে। দুর্ভাগ্য, অভিনয় তেমন জমল না।

সমস্যা এই—জড়বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে যেসব বিজ্ঞানী এতকাল ঈশ্বরের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করছিলেন

তাঁরাও থমকে গেছেন। কারণ, "Physics has at last invaded the territory of theology." বললেন ফ্র্যাঙ্ক জে. টিপলার (Frank. J. Tipler)। কে এই টিপলার! একালের এক শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। তিনি একটি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বই লিখেছেন। ভারতে বইটির সামান্য কয়েক কপি এসেছে। নাম 'দ্য ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটি'। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-র প্রথম ভাগ পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানের মহাবিপ্লবের কাল। দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ আর স্টিফেন হকিং এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। বিশ্ব অর্থাৎ মহাবিশ্বকে বিজ্ঞানীরা এতকাল ঠাকুরের উপমায় 'অন্ধের হস্তিদর্শন'-এর কায়দায় দেখেছেন। স্থান আর কালের সীমাবদ্ধতায় বসে যে-বিচার ও সত্য উদ্ঘাটন করে মনে করেছেন—'এই হলো শেষ কথা', সে-কথা ঠাকুরের ভাষায়, 'মতুয়ার বুদ্ধি'। শেষ তো নয়ই, শুরুর কথা কিনা তাই বা কে বলবে! 'শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে!'

ঋষি আর কবির পক্ষেই বলা সম্ভব, পরীক্ষা অথবা গণিতের মাধ্যমে নয়, মননের সাহায্যে—

> শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।
> আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।
> সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
> বরফ জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।
> ফুরায় যা, তা ফুরায় শুধু চোখে—
> অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
> পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
> জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।
>
> [রবীন্দ্রনাথ : 'গীতালি']

ঠাকুর অনন্ত, বিশ্বচৈতন্যের কথা বলতেন। মাঝে মাঝে ধমকে উঠতেন: "তুমি বোঝাবার কে? তিনি না বোঝালে!" সসীম হয়ে অসীমকে ধরতে চাও মূর্খ! "নুনের পুতুল মাপতে চলেছ সাগর!" টিপলার একটি সুন্দর কথা বলছেন। বলছেন, এই মহাবিশ্বের বয়স হলো মাত্র ২০ বিলিয়ান বছর! আনুমানিক আরও ১০০ বিলিয়ান বছর পড়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। অতএব বিজ্ঞানী! তুমি কোন্ সত্যের শেষ কথা বলতে চাইছ? "Almost all of space and time lies in the future." বলেই বলছেন: "I shall show exactly why this power to resurrect which modern Physics allows will actually exist in the far future, and why it will infact be used." বলছেন: "Physics will permit the resurrection to eternal life of every one who has lived, is living, and will live." শোনাচ্ছেন বড় আশার কথা: "If any reader has lost a loved one, or is afraid of death, modern Physics says—BE COMFORTED, YOU AND THEY SHALL LIVE AGAIN."

আমার ঠাকুরকে দেখতে পাব। গীতা সত্য, বাইবেল সত্য।

জীবনের শেষ কোথায়? মরণও কি সত্য! আগামীবারে সেই আলোচনা।□

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠকবর্গের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন'-এর প্রথমদিকে 'মা সারদামণি ওল্ড এজ হোম' এবং 'মা সারদামণি হাউসিং কমপ্লেক্স' শিরোনামে যে-বিজ্ঞাপনটি কয়েক মাস ধরে প্রকাশিত হচ্ছে সে-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আমরা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনটির সঙ্গেই গত কয়েক মাস ধরে জানিয়ে আসছি। সম্প্রতি আমাদের কাছে কেউ কেউ মৌখিকভাবে জানিয়েছেন যে, বিজ্ঞাপিত প্রকল্পটিতে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন এবং আরও অনেকে প্রতারিত হতে চলেছেন। এই অভিযোগ আমরা বিজ্ঞাপনদাতাকে জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, ঐ অভিযোগ ভিত্তিহীন। যাই হোক, 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক এবং পাঠকবর্গের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন প্রকল্পটির সঙ্গে নিজ দায়িত্বে সংযুক্ত হন। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে তা যেন তাঁরা কখনো ধরে না নেন। অবশ্য একথা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনের সঙ্গে 'উদ্বোধন-এর বক্তব্য'-এও মুদ্রিত হয়েছে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

পুষ্টিচিন্তা

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

খাদ্য রুচিমত হলেও বিজ্ঞানসম্মত নাও হতে পারে। খাদ্য এমন হওয়া উচিত যেন পুষ্টির চাহিদা মেটে এবং কোনভাবেই শরীরের ক্ষতি না হয়। পুষ্টি কি? পুষ্টি হলো একটা শারীরিক প্রক্রিয়া। পুষ্টি দ্বারা শরীরের দৈনন্দিন কাজ করবার ক্ষমতা আসে, ক্ষয়পূরণ হয়, বৃদ্ধির বয়সে বৃদ্ধি হয় এবং প্রজনন ও সন্তানপালন সম্ভব হয়। পুষ্টি স্বাস্থ্যরক্ষা করে। স্বাস্থ্য বলতে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাকে বোঝায়। উপযুক্ত বা সুষম খাদ্যের দ্বারা যে দৈহিক পুষ্টি হয় তা বোঝা কিছুটা সহজ কিন্তু মানসিক পুষ্টির দিকটা একটু জটিল, সেখানেই আসে রুচির কথা। খাদ্যরুচি এমন হতে পারে যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষ করে অসুস্থ শরীরে। সামাজিক মেলামেশা, উৎসব ইত্যাদিতে খাদ্য (ও পানীয়) বিশেষ ভূমিকা নেয়। এইসব সময়ে যে-ধরনের পানভোজন চলে তা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল হয় না। কাজেই যা রুচি অর্থাৎ যা ভাল লাগে তা খেলে বেশির ভাগ সময়েই পুষ্টির চাহিদা মিটবে না, উপরন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।

পুষ্টিজ্ঞান

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুষ্টির চাহিদা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। কিন্তু পুষ্টি হলো জীবের স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। এবিষয়ে বিশেষ জানবার কি প্রয়োজন? এই পৃথিবীতে জীব বলতে শুধু মানুষকেই বোঝায় না, অন্যান্য জীবজন্তুও রয়েছে। উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এদের কারোরই পুষ্টির জ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। যদি মনে করা যায়, মানুষ এই পৃথিবীতে অস্তিত্বের শুরু থেকে পুষ্টিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা না করেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল, সুতরাং পুষ্টিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই—এরূপ চিন্তা যথার্থ হবে না। আদিম যুগে মানুষকে হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। সেজন্য সে শরীরের উপযোগী খাদ্য বেছে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। পরবর্তী কালে সে কৃষিকাজ ও পশুপালন শিখেছে। সেসময়ও স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ থেকে সে তার খাদ্য বেছে নিয়েছে। ধরতে হবে সেই থেকেই পুষ্টিবিজ্ঞানের শুরু। অবশ্য আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের বয়স মাত্র দুশ বছরের মতো। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার (Lavoisier—1743-1794)-কে এর জনক বলা যেতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সেই আদিম যুগে বা পরবর্তী কালে সব মানুষই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। তখনো খাদ্যসংগ্রহে প্রতিকূলতা ছিল। ধারনা করা যেতে পারে, তাদের একটা অংশ অপুষ্টিতে ভুগত। যারা উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম ছিল তারাই দীর্ঘায়ু লাভ করত। বাকিরা অকালেই মারা যেত অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগে। মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের পুষ্টিজ্ঞান নেই, কিন্তু একথা মনে করা ভুল যে, তারা অপুষ্টিতে ভোগে না।

বর্তমানে পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যার পুষ্টির চাহিদা মিটছে না। তার ওপর স্বাভাবিক খাদ্যের বদলে এসেছে নানারকম প্রস্তুত, আধা-প্রস্তুত ও সংরক্ষিত খাদ্য এবং পুষ্টির দিক থেকে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় পানীয়। জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিবেশ কলুষিত, সংক্রামক রোগ ঘটছে উদ্বেগজনকভাবে, বিশেষ করে তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। যদি এরই মধ্যে মোটামুটি সুস্থভাবে বাঁচতে হয় তাহলে পুষ্টিজ্ঞান খুবই জরুরী। তাই সাধারণ মানুষের চাই পুষ্টি সম্বন্ধে একটা ব্যবহারিক জ্ঞান। খাদ্যে প্রোটিন, ক্যালরি (শক্তির পরিমাপ) বা ভিটামিনের সঠিক হিসাব দরকার শুধু কিছু কিছু অসুস্থ মানুষের জন্য। সে-হিসাব করে দেবেন চিকিৎসক বা খাদ্যবিশারদ্‌রা। বাকিরা মোটামুটি কোন্‌ খাদ্য কতটা খাবেন আর কি খাবেন না এবং কোন খাদ্যের পুষ্টিগুণ কিরকম—এটুকু জানলেই হবে।

সুষম খাদ্য (balanced diet)

সুষম খাদ্যই পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য দিতে পারে। সুষম খাদ্যে শক্তি আসে শর্করা (carbohydrate) ও স্নেহ বা তৈলজাতীয় (fat বা তেল) খাদ্য থেকে। শরীরের ক্ষয়পূরণ হয় প্রোটিন দিয়ে। বৃদ্ধির জন্য চাই প্রোটিন ও শক্তি দুই-ই। ভিটামিন ও খনিজ লবণ বিপাকীয় কাজে সাহায্য করে। শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রধান হলো চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি দানাশস্য; আলু, কচু ইত্যাদি মূল এবং চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য। তৈলজাতীয় খাদ্যে সম ওজনের শর্করাজাতীয় খাদ্যের দুগুণ বেশি শক্তি (ক্যালরি) পাওয়া যায়। অবশ্য মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য বেশি খেলে শক্তিও যোগায়, তবে তার আর্থিক দিকটা সুবিধার নয়। ভিটামিন ও খনিজ লবণ অনেক খাদ্যেই থাকে কিন্তু এগুলির মূল্যবান উৎস হলো শাকসবজি ও ফলমূল।

পুষ্টির চাহিদা

পুষ্টির চাহিদা নির্ভর করে বয়স, কায়িক শ্রম, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, শরীরের ওজন প্রভৃতির ওপর। এইভাবে কার কোন্ পুষ্টি-উপাদান কতটা পরিমাণে লাগবে সেটা পুষ্টিবিজ্ঞানীরা ঠিক করেছেন। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' অনুমোদিত পুষ্টির চাহিদার তালিকা আছে। কিন্তু এটা অবাস্তব যে, সাধারণ মানুষ দৈনিক কত ক্যালরি শক্তি, কত গ্রাম প্রোটিন, কত মিলিগ্রাম খনিজ লবণ এবং কোন্ কোন্ ভিটামিন কত মিলিগ্রাম অথবা মাইক্রোগ্রাম করে খাওয়া উচিত তা হিসাব করে খাবে। তাকে কেবল জানতে হবে, সাধারণভাবে কোন্ ধরনের খাদ্য কতটা পরিমাণে খেলে পুষ্টির চাহিদা মোটামুটি মিটবে। দানাশস্য নিয়ে বিশেষ সমস্যা নয়, কিন্তু চাল ভাল না গম ভাল—এ নিয়ে অনেক সংশয় থাকে। দুটি শস্য থেকেই সমান শক্তি পাওয়া যায়। চালের চেয়ে গমে প্রোটিন একটু বেশি কিন্তু গুণগত দিক থেকে চালের প্রোটিন অপেক্ষাকৃত ভাল। সমস্যা হলো পরিমাণ নিয়ে। যেহেতু আর্থিক কারণে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী যথেষ্ট নাও থাকতে পারে, তাই নিম্নবিত্ত পরিবারে অনেকেই ভাত-রুটি বেশি খেয়ে ফেলেন। প্রোটিন যথেষ্ট খাওয়া সত্যিই সমস্যা। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ব্যয়সাপেক্ষ। বিকল্পে বা পরিপূরক হিসাবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন—যেমন ডাল, চীনাবাদাম, সয়াবীন যে সস্তা তা নয়। সাধারণ শ্রম করেন এমন একজন পুরুষের দৈনিক চাহিদা মেটাতে পারে এমন অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের খাদ্য ('ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ' অনুমোদিত) হলো—দানাশস্য ৪৬০ গ্রাম, ডাল ৪০ গ্রাম, শাক ৫০ গ্রাম, অন্য সবজি ৬০ গ্রাম, আলু (বা ঐ জাতীয়) ৫০ গ্রাম, দুধ ১৫০ গ্রাম, তেল ও ফ্যাট ৪০ গ্রাম এবং চিনি/গুড় ২০ গ্রাম। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে প্রোটিন বেশি খাওয়ায় রসনাতৃপ্তি ছাড়া বাড়তি লাভ কিছু হয় না, উপরন্তু জৈবিক ক্রিয়ার ওপর অনাবশ্যক চাপ পড়ে। প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পুষ্টিগুণে নিকৃষ্ট। কিন্তু কয়েক রকম উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও শাকসবজি একসঙ্গে খেলে এর গুণমান উন্নত হয়।

তৈলজাতীয় খাদ্য

ঘি, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্য, চর্বি, বনস্পতি এবং প্রাণীজ (মাছ) ও উদ্ভিজ্জ তেল—এগুলিকে 'ফ্যাট ও তেল' বলা যায়। এদের ব্যবহারে খাদ্যের স্বাদ বাড়ে, খাদ্য তৃপ্তিকর হয়। মাখন ও প্রাণীজ তেলে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে, যা বনস্পতি তৈরি করার সময় মেশানো হয়। পাম তেলে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন উদ্ভিজ্জ তেলে উল্লেখযোগ্য কোন ভিটামিন থাকে না। ফ্যাট ও তেল থেকে খাদ্যে শক্তির ৩০%-এর বেশি আসা উচিত নয়—মোটামুটি এমনই ধরা হয়। তবে উন্নত দেশগুলিতে এগুলি বেশি খাওয়া হয়, ভারতে অনেক কম। অন্ততঃ ১৫% শক্তি পেতে হলে সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে ২০ গ্রাম তেল খেতে হবে। খাদ্যে ফ্যাট ও তেল, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ও হৃদ্‌রোগ—এগুলির সম্পর্ক একটি জটিল বিষয়। রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লে ধমনীর ভিতরের দিকে ফ্যাটজাতীয় বস্তু জমে নালী ছোট হয়ে যায় ও রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। হৃদ্‌যন্ত্রে এটাই করোনারি হৃদ্‌রোগের কারণ। ফ্যাট ও তেলে দুরকম ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে—সম্পৃক্ত (saturated) ও অসম্পৃক্ত (unsaturated)। সম্পৃক্ত ফ্যাট কোলেস্টেরল বাড়ায়। বলা হয়, খাদ্যে এই দুরকমের ফ্যাট প্রায় সমান সমান থাকা উচিত। দুগ্ধজাত ফ্যাট, চর্বি, বনস্পতি—এগুলিতে সম্পৃক্ত ফ্যাট খুব বেশি, অন্যদিকে উদ্ভিজ্জ তেলে দুই-ই কম-বেশি থাকে। অবশ্য যে-তেল যত অসম্পৃক্ত সেটা তত উপকারী—এমন নয়। অসম্পৃক্ত ফ্যাটেরও রকমভেদ আছে, যেগুলির অনুপাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মাছের তেল (মাছসমেত), ডাল, চাল, শাকসবজি, ফল ইত্যাদিতেও অসম্পৃক্ত ফ্যাট আছে যেটি খুবই উপকারী। সূর্যমুখী, কুসুমবীচি বা বাদাম তেলে এই দুধরনের ফ্যাটের অনুপাতটা সুবিধার নয়। অন্যদিকে সরিষা, রেপসীড, তিসি অপেক্ষাকৃত ভাল। মোটামুটি বলা যায়, উচ্চ কোলেস্টেরলজনিত হৃদ্‌রোগের সম্ভাবনা কমাতে সম্পৃক্ত ফ্যাট কম খেতে হবে। উদ্ভিজ্জ তেল, মাছ, শাকসবজি ফলমূল, অঙ্কুরিত ছোলা, পিঁয়াজ, রসুন উপকারী। আর কোলেস্টেরল আছে এমন খাবার—যেমন মাখন, ডিম, চর্বি, লাল মাংস, মাথার ঘিলু বর্জন করতে হবে। হৃদ্‌রোগের অবশ্য জন্মগত প্রবণতাও থাকে। তাই ওজন ঠিক রাখা দরকার। সেইজন্য নিয়মিত কায়িক শ্রম করতে হবে এবং লবণ কম খেতে হবে।

ভিটামিন, খনিজ লবণ

শাকসবজি ও ফলমূল থেকে ভিটামিন ও খনিজ লবণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। রোজ ৫০ গ্রাম সবুজ শাকপাতা খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। যেকোন ফলই উপকারী, বেশি দামী ফল খেতে হবে এমন কথা নেই। ডালে প্রোটিন ছাড়া খনিজ লবণ ও ভিটামিন পাওয়া যায়। অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ইত্যাদি ভিটামিন 'সি' ও 'বি$_1$'-এর সমৃদ্ধ। খনিজ লবণগুলির চাহিদা সাধারণ খাদ্য থেকেই

মেটে কিন্তু লোহা ও ক্যালসিয়াম নিয়ে একটু অসুবিধা আছে। ভারতীয় খাদ্যে প্রচুর লোহা থাকলেও অন্ত্রে শোষিত হয় সামান্য, কারণ ফাইটেটস (phytates) ও অক্সালেটস (oxalates)-এর উপস্থিতি। সন্তানধারণের বয়সের মেয়েরা ও ছোট শিশুরা প্রায়ই লোহার অভাবে রক্তাল্পতায় ভোগে। রক্ত তৈরির আরেকটি ভিটামিন ফলিক অ্যাসিড শাকপাতায় প্রচুর ও অন্যান্য খাদ্যে কম-বেশি থাকলেও এর অভাবও প্রায়ই দেখা যায়। এর প্রতিকারে সরকারি ব্যবস্থায় লোহা ও ফলিক অ্যাসিডের ট্যাবলেট (folifar) বিনামূল্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি জনপ্রিয় নয়। ক্যালসিয়াম দুধে থাকে তবে দানাশস্য, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদিতেও পাওয়া যায়। মোটকথা, সাধারণ খাদ্য থেকেই প্রায় সব ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়। ওষুধ হিসাবে ভিটামিনের প্রয়োজন শুধু অসুস্থ শরীরেই।

পানীয়

সুপেয় জল একটি সমস্যা। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, জিয়ার্ডিয়াসিস, জন্ডিস—এসবের বাহন দূষিত জল। ফিল্টার করে নিলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায় না, ১৫/২০ মিনিট ফোটালে চলে কিন্তু তা ব্যয়সাপেক্ষ। পানীয় জল থেকে আয়োডিন ও ফ্লোরিন পাওয়া যায়, যার পুষ্টিমূল্য অনেক। কোন কোন জলে (যেমন—hard water) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা হার্টের পক্ষে ভাল। নলকূপের জলে লোহা থাকতে পারে। তবে তাতে হজমের অসুবিধা হতে পারে।

দুধ সম্বন্ধে বিশেষ বলা দরকার। দুধের ফ্যাট কমাতে হলে টোন্ড দুধ বা মাখনতোলা দুধ খেতে হবে। এতে প্রোটিন উচ্চমানের কিন্তু ছোট শিশুদের জন্য মায়ের দুধের মতো নয়। কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুধের প্রোটিনে অ্যালার্জি (allergy) হতে পারে এবং কখনো কখনো তা মারাত্মকও হতে পারে। দুধে যে-শর্করা (lactose) থাকে সেটা অনেকেই সহ্য করতে পারে না। দই-এ এই শর্করা জীবাণুদ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়, কাজেই পেটের গোলমাল থাকলে দই ভাল। ছানার জল খেলেও এই lactose পেট ফাঁপায়। রসগোল্লাতে ফ্যাট কম, সন্দেশে বেশি। সন্দেশ তৈরি করা হয় বেশি অপরিচ্ছন্নভাবে। গুঁড়ো দুধ আর গরুর দুধে তফাত হলো—গুঁড়ো দুধে কিছু কিছু ভিটামিন না থাকতে পারে, যদি না সেগুলি মেশানো হয়। তবে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া দুষ্কর।

হালকা পানীয়তে (soft drinks) কিছু চিনি ও উত্তেজক ক্যাফিন (caffeine) ও গন্ধদ্রব্য থাকে এবং জলটা হয় carbonated অর্থাৎ এতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস মেশানো থাকে। খেলে চনমনে ভাব আসে কিন্তু এর দাম অনেক বেশি। এর চেয়ে যেকোন ফলের রস উপকারী। কিন্তু তা বাজারে পরিচ্ছন্নভাবে পাওয়া অসম্ভব। রাস্তায় আখের রস বিক্রি হয় খুবই নোংরাভাবে। অনেকে জন্ডিস সারাতে এই রস খান। জন্ডিসে চিনি উপকারী কিন্তু অপরিচ্ছন্ন আখের রস আবার অসুখের কারণ হয়। ডাবের জল একটি উত্তম পানীয়। এতে অল্প শর্করা, অল্প সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। রক্তচাপবৃদ্ধি, লিভার সিরোসিস ও পেটের অসুখে ডাবের জল উপকারী। চা খুবই জনপ্রিয় পানীয়। কফি এবং কোলাও খুব চলে। এগুলিতে ক্যাফিন থাকায় উত্তেজনা আসে। এতে অল্পমাত্রায় নানারকম খনিজ লবণও থাকে। চিনি মেশানো হলে তা শক্তি যোগায়। বেশি চা, কফি খেলে কারো কারো বুক ধড়ফড় করে। চায়ে ট্যানিন থাকে, খেতে কষা লাগে, যেটা আবার অনেকের পছন্দ। কফির তুলনায় চায়ে ক্যাফিন কম। চা-কফি মাত্রারিক্ত ভাল নয়। বেশি কফি খেলে হৃদ্‌রোগ হতে পারে—এমন সঠিক প্রমাণ নেই; বিষয়টি কিছুটা বিতর্কিত।

মদ্যপানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে বলেই মনে হয়। সামাজিক মেলামেশায় পরিমিত মদ্যপান সাধারণতঃ দোষের মনে করা হয় না। তবে এই পান অভ্যাসে দাঁড়ালে আর মাত্রা ছাড়ালেই বিপদ। আর এটা প্রায়ই ঘটে। মদ ব্রেন, লিভার ও প্রায় সব দেহযন্ত্রেরই ক্ষতি করে, বিশেষ করে মস্তিষ্ক ও যকৃত (liver)-এর। এতে রক্তচাপ বাড়তে পারে। অল্পমাত্রায় পান হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ভাল—এমন যুক্তি আছে, তবে ভারসাম্য রাখা সহজ নয়। বেশি মাত্রায় মদ্যপান হৃদ্‌রোগেরও কারণ। বেশি বয়সে অনেক সময়েই কিছু ওষুধ খেতে হয়। মদ্যপান সেইসব ওষুধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

রন্ধনপ্রণালী

খোসা ছাড়িয়ে সবজি কাটলে ও কাটা সবজি ধোয়ার সময় তা থেকে ভিটামিন বেরিয়ে যায়। তাই ধুয়ে কাটাই ভাল। রান্নার সময় ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয়ে যায় বা সিদ্ধ করে জল ফেলে দিলে তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। বেশি উত্তাপে ভাজলে শাকসবজির খাদ্যগুণ নষ্ট হয়। বেশি পরিষ্কার করে ছাঁটা চালে ভিটামিন বি$_১$ কম থাকে। বেশি ভাজলে, অনেকক্ষণ ধরে ফোটালে (অল্প আঁচে হলেও) ও বারবার গরম করলে খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হয়। ফ্রিজে

থাকা খাবারে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ভিটামিন নষ্ট হয়। প্রেসার কুকারে রান্না করলে ভিটামিন নষ্ট হয় না।

জলদি খাবার

আধুনিক জীবনযাত্রার ব্যস্ততার জন্য তৈরি বা আধা-তৈরি খাবারের প্রচলন হয়েছে ও তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এগুলিকে 'fast foods' বলা হয়। জলদি তৈরি খাবার বা 'জলদি খাবার'ও বলা যেতে পারে। কোনটি একেবারে তৈরি অবস্থায় প্যাক করা, কোনটি আবার আধা-রান্না করা অবস্থায় থাকে। ব্যাপক অর্থে, দেশি প্রথায় তৈরি চিঁড়া, পাঁপড়, বড়ি, ডালমুট, আচার, মোয়া, নাড়ু, রসগোল্লা, সন্দেশ, বাজারের নোনতা খাবার, দই—সবই জলদি খাবার। তবে 'জলদি খাবার' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় চিপস, নুডুলস, সিমাই, প্যাটিস, প্যাস্ট্রী, কেক, হামবার্গার প্রভৃতি। এছাড়াও আছে নানারকম মিষ্টি তৈরির মিশ্রণ, সয়াবীনের বড়ি, আলুসিদ্ধর গুঁড়ো, টিনজাত মাছ, সুপের গুঁড়ো, শুকনো মটরদানা ইত্যাদি। এগুলির চাহিদা আছে। আবার প্রস্তুতকারক বড় বড় সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাহিদা তৈরি করেও নেয়। জলদি খাবার সাধারণতঃ সুষম নয়। কোনটিতে শর্করা বেশি, কোনটিতে ফ্যাট। ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রায়ই অভাব দেখা যায়। আর থাকে না আঁশ (fibre)। আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ও বৃহদন্ত্রে ক্যানসারের সম্ভাবনা কমাতে পারে। টিফিন হিসাবে জলদি খাবার চলতে পারে, কিন্তু এগুলি কখনই সুষম খাদ্য হতে পারে না। এইসব খাবার তৈরির সময় কিছু ক্ষতিকর রাসায়নিক মিশে যেতে পারে, আবার রং ও স্বাদ আনবার জন্য কিছু রাসায়নিক মেশানোও হতে পারে। জীবাণুমুক্ত করার জন্য বিকিরণের (radiation) সাহায্য নেওয়া হয় অনেক সময়ে। এসবের ফল ক্ষতিকর হতে পারে। মোটকথা, জলদি খাবার যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল।

খাদ্যদূষণ

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম অবদান পরিবেশ-দূষণ, যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রয়েছে খাদ্যদূষণ। ভোগবাদ যতই বাড়ছে খাদ্য, জল, বাতাস ততই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে দূষিত হচ্ছে। এই দূষণ আমাদের ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহীনতা ও অসুখের কারণ হচ্ছে। হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, ক্যানসার, শ্বাসরোগ সবই বাড়ছে। অপেক্ষাকৃত চমকপ্রদ খাদ্যদূষণ সময়ে সময়ে খবর হয়ে যায়। তেল, ময়দা ইত্যাদির সঙ্গে একরকমের খনিজ তেল (tricresyl phosphate) মিশে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে কয়েকবার ঘটেছে। সরিষার তেলে শেয়ালকাঁটা বীজের তেল মেশানোর খবর আগে প্রায়ই শোনা যেত, যার ফলে হৃদ্‌রোগ হতো। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে, যার ফল খুবই ক্ষতিকর। দুধে নোংরা জল মেশানো হয়। পরিবহনের সময় দুধে খড় দেওয়াও হয়। বাজারে যে-ছানা বিক্রি হয় তার প্রস্তুতপ্রণালী ও পরিবহন খুবই অপরিষ্কারভাবে করা হয়। সন্দেশও তৈরি হয় অপরিচ্ছন্নভাবে। টিনের গুঁড়ো দুধ মোটামুটি বিশুদ্ধ, কিন্তু তৈরি করা হতে পারে নোংরাভাবে। প্যাসচুরাইজেশান (pasteurization) করা দুধ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। সরকারি দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। দই কিছু কিছু ক্ষতিকর জীবাণুর দ্বারা দূষিত হতে পারে, তাতে মেশানো হতে পারে বনস্পতি। চীনাবাদাম মাটি থেকে তোলার সময়ে বিষাক্ত ছত্রাকে আক্রান্ত হতে পারে। চাল ঠিকভাবে না রাখলেও তাতে এইরকম ছত্রাক জন্মাতে পারে, যা যকৃতের সিরোসিস ও ক্যানসারের কারণ হয়। দূষিত চীনাবাদামের খইল গরু খেলে গরুর দুধেও ঐ বিষাক্ত পদার্থ থেকে যায়। হাঁসের ডিমের বাইরে টাইফয়েড-জীবাণু থাকতে পারে। গরু ও শূকরের মাংস কম রান্না করে খেলে পেটে ফিতাকৃমি হতে পারে। পানীয়ের মধ্যে চা এবং গুঁড়ো মশলাতে ভেজাল দেওয়া হয়। কৃষিকাজে নানারকম কীটনাশক ব্যবহার করা হয় যেগুলি মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী—এদের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। সম্প্রতি কৃষিকাজে DDT নিষিদ্ধ হচ্ছে কিন্তু পরিবর্তে যে কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে তাও বিষাক্ত। শাকসবজি সার থেকে দূষিত হয়, আবার ভালভাবে ধোয়া বা রান্না না করা হলে তা কৃমি, আমাশয় ইত্যাদির কারণ হয়। সবুজ রং করা সবজি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। সর্বস্তরে সচেতনতা না এলে খাদ্যদূষণ চলতেই থাকবে।

উপসংহার

আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। সেটিকে সাধারণভাবে পুষ্টিগুণসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে ধরা হয় না, অথচ শরীরের পুষ্টিসাধনে এর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। এটি হচ্ছে অম্লজান বা অক্সিজেন। অক্সিজেনের অভাবে শরীরকোষের বিপাকীয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। দুঃখের বিষয়, বাতাসও আজ দূষিত। বর্তমান পরিবেশে নিম্নমানের স্বাস্থ্য নিয়ে জীবনযাপন এখন স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। শুধু খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন করে এর প্রতিকার সম্ভব নয়।□

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রেয়োলাভের অন্যতম পথ স্বধর্মপালন

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

ব্যাধগীতা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। প্রকাশক ঃ কমলকৃষ্ণ ঘোষ, ৮/২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা ঃ ৮+১৬৮। মূল্য ঃ ১০ টাকা।

'গীতা' শব্দটি শ্রবণমাত্রই ধর্মপ্রাণ হিন্দুমনে একটি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। গীতায় সকল শাস্ত্রের সার নিহিত থাকায় ধর্মপিপাসু সকল মানুষের নিকট তা অতি আদরণীয়। তাই পুরাণাদি গ্রন্থের যেসকল অংশে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তা উপলব্ধি করার উপায় বর্ণিত হয়েছে সেসব অংশ কিংবা সেসব অংশ থেকে শ্লোকসমূহ সঙ্কলন করে 'গীতা' নামে আখ্যায়িত করার স্পৃহা সুধীজনের মধ্যে দেখা যায়। এজন্যই আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (যা সাধারণের মধ্যে শুধু 'গীতা' নামে পরিচিত) ব্যতীত 'গীতা' নামে আরও কয়েকটি গ্রন্থ দেখতে পাই। যথা—গোপীগীতা, উদ্ধবগীতা ইত্যাদি। এরকমই একটি স্বল্প আয়তনের গ্রন্থ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার মহাভারতের বনপর্ব থেকে 'ব্যাধগীতা' নামে সঙ্কলিত করেছেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট ধর্মসম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করলেন। তখন মার্কণ্ডেয় ঋষি ধর্মব্যাধের কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন। কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণকুমার জনৈকা পতিব্রতা ব্রাহ্মণী, যিনি শুধু গার্হস্থ্যধর্ম যথাযথভাবে পালন করার ফলেই আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণী কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে ধর্মশিক্ষার্থে একজন সদাচারী ও স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যাধের নিকট গমন করেন। সদাচারী ও স্বধর্মনিষ্ঠ বলে সে 'ধর্মব্যাধ' নামে পরিচিত ছিল। ব্রাহ্মণ কৌশিক সেই ব্যাধের নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্মোপদেশ প্রার্থনা করলে ব্যাধ তাঁকে উদ্দেশ করে অনেক ধর্মকথা শোনালেন। সেসকল কথাগুলি চয়ন করে গ্রন্থকার 'ব্যাধগীতা' সঙ্কলন করেছেন।

মোক্ষ বা মুক্তিলাভই ভারতীয় জীবনদর্শন। কারণ, মোক্ষলাভই পরম শান্তি। কিন্তু মোক্ষ আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শন-সাপেক্ষ। তাই ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানলাভের বা ভগবদ্দর্শনের উপায়রূপে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সাধনপথের নির্দেশ আছে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কোন সাধনপথেরই যথার্থ অধিকারী কেউ হতে পারে না। আর চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সদ্ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন। স্বধর্ম-পালনের মাধ্যমেই মানুষ শ্রেয়োলাভ করতে পারে—এটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি বিশেষ শিক্ষা। অর্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ করা তাঁর স্বধর্ম। তিনি যখন তা করতে পরাঙ্মুখ তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে গিয়েই গীতা উপদেশ করেছেন। সুতরাং স্বধর্মপালন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়। 'ব্যাধগীতা'য়ও স্বধর্মপালনের বিষয়টি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। বরং স্বধর্মপালনের বিষয়টিই ব্যাধগীতার প্রধান আলোচ্য বিষয়। স্বকর্তব্যপালন, পিতামাতার সেবা এবং সদ্ভাবে জীবনযাপনই যে গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট পথ—এই বিষয়টিই ধর্মব্যাধ কৌশিকের মনে বিশেষভাবে জাগরিত করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া শিষ্টাচার, হিংসা-অহিংসা সম্বন্ধে সূক্ষ্মবিচার, সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে বিচার, কর্মফল, পাপপুণ্য, প্রারব্ধ, পঞ্চমহাভূতের বর্ণনা, সৃষ্টির ক্রম ও বিস্তার, গুণানুযায়ী ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ—এসকল বিষয়ও গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বইটির প্রচ্ছদে 'ব্যাধগীতা' নামকরণ থাকলেও ভিতরের পৃষ্ঠাসমূহে শিরোনাম আছে 'ধর্মব্যাধ'। নাম নিয়ে পাঠকবর্গ বিভ্রান্ত হতে পারেন মনে করে গ্রন্থকার গ্রন্থের মুখবন্ধে বিষয়টি পরিষ্কার করেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে ব্যাধগীতা। কিন্তু গ্রন্থের ভিতরের পৃষ্ঠার শিরোনামে ছাপা হয়েছে ধর্মব্যাধ। ধর্মব্যাধই ব্যাধগীতার ভাষ্যকার। তাই তার নামের গুরুত্ব হেতু এই গ্রন্থের শিরোনামে ধর্মব্যাধ নামই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাধগীতা বা ধর্মব্যাধ মূলতঃ একই। ধর্মব্যাধের উপদেশও গীতোপদেশ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বইটির নামকরণ 'ব্যাধগীতা'ই করা হলো।"

শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সাধুভাষায় লিখিত হলেও বেশ প্রাঞ্জল। অনুধ্যান নামে নিজস্ব ব্যাখ্যার মধ্যে শ্লোকের তাৎপর্য এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সঙ্গে এ গ্রন্থের সাদৃশ্য বেশ চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সুন্দর। মুদ্রণও পরিচ্ছন্ন। বর্তমান স্বীয় কর্তব্যে অবহেলা ও মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যপালনে অনীহার যুগে এরূপ গ্রন্থ সঙ্কলনে সমাজের বিশেষ উপকার হবে।

ভাগবতী কথা

তারকনাথ ঘোষ

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ শ্রীভক্তিদর্শন আচার্য মহারাজ (অনুবাদক ও সম্পাদক)। প্রকাশকঃ জ্যোতির্ময় পণ্ডা। ১০/১৯এ, আই. ও. সি. টাউনশিপ, পোঃ হলদিয়া টাউনশিপ, জেলাঃ মেদিনীপুর। পৃষ্ঠাঃ ৪০+৫১২। মূল্যঃ অনুল্লিখিত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ। ভারতের দুই অমর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের সমপর্যায়ভুক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্যের আকর মহাগ্রন্থরূপে এর বিশেষ মর্যাদা। ভাগবতের কাহিনী লোকসাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের সর্বত্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, আবার বৈষ্ণব সাধকসমাজে এটি সাধনশাস্ত্রতুল্য। এর প্রতিটি শ্লোক একদিকে যেমন কাব্যরূপে হৃদয়গ্রাহী, তেমনই ভক্তিমার্গের সাধনার দৃষ্টিতে গভীর সঙ্কেতময়।

কৃষ্ণলীলার বর্ণনাময় দশম স্কন্ধকে কাব্যসৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য ভাগবতের আননরূপে কল্পনা করা হয়। মনে হয়, এই স্কন্ধের উনত্রিংশ থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ (২৯-৩৩) অধ্যায় নয়নস্বরূপ। রাসলীলার বর্ণনার জন্য এই পাঁচটি অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ এবং কাব্যরসিক ও ভক্তজন সকলেরই বিশেষ সমাদৃত। এই পাঁচটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু—কৃষ্ণের বেণুধ্বনির আহ্বানে ব্রজগোপীদের কৃষ্ণসকাশে আগমন ও রাসক্রীড়া, রাসমণ্ডল থেকে বিশেষ একজন গোপীসহ কৃষ্ণের অন্তর্ধান, গোপীদের অন্বেষণ-আর্তি-ভাববিকার, বিশেষ গোপীর ('রাধা' নামের উল্লেখ নেই) কাছ থেকে কৃষ্ণের অন্তর্ধান ও ঐ গোপীর আর্তি, কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব ও রাসলীলার পরিপূর্ণতা।

শ্রীভক্তিদর্শন আচার্য মহারাজ শব্দানুবাদ-সহ অন্বয় ও সরল অনুবাদের সঙ্গে তিনটি অমূল্য টীকা সংযোজন করেছেন—শ্রীধর স্বামীর 'ভাবার্থদীপিকা', শ্রীজীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী' আর বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'সারার্থদর্শিনী'। এই তিনটি টীকার জন্যই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান সঙ্কলনরূপে সুধী ভক্ত ও বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হবে সন্দেহ নেই। তিনটি টীকারই মূলানুগ অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে আচার্য মহারাজ মাঝে মাঝে নিছক আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে সুপরিমিত ব্যাখ্যান করে বক্তব্য বিষয় বা দুরূহ তত্ত্ব পরিস্ফুট করেছেন। ঐ অনুবাদ ভক্তিসাধন-শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ও সামর্থ্যের নিদর্শন। অনুবাদ সংস্কৃত-ঘেঁষা অর্থাৎ তৎসম শব্দবহুল হলেও প্রাঞ্জল। মুখ্যতঃ বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর জন্য রচিত হলেও অনুরাগী সাধারণ পাঠকও গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন। গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে 'ভূমিকা'টি বিশেষ মূল্যবান।

গ্রন্থটির বাঁধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি সুন্দর। মুদ্রণে প্রচুর অশুদ্ধি পীড়াদায়ক—এই ধরনের বিশিষ্ট একটি গ্রন্থের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হয়। মনে হয়, গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ছিল তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাবই এর কারণ।□

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর কয়েকটি নতুন গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

ত্রিপুরা□ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
আসাম□শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১□শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
□গুজরাট□সলিল ঘোষ, সি-৩-৫০১ ও. এন. জি. সি. কলোনী, আমেদাবাদ-৩৮০০০৫

কলকাতা
বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল
১৩১, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস
কলকাতা-৭০০০৩৯

মলয় ভৌমিক
৪।১, বেনেপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০১৪

মিডিয়া সেন্টার
১১০, কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স
৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা-৭০০০৩৪

নদীয়া
বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন
চাকদহ, জেলাঃ নদীয়া
পিন-৭৪১২২২

হাওড়া
গোবিন্দলাল চ্যাটার্জী
প্রযত্নে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
৪, নস্কর পাড়া লেন, হাওড়া-১

হুগলী
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ
গ্রাঃ+পোঃ পইনান
জেলাঃ হুগলী, পিন-৭১২৩০৫

বর্ধমান
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
শ্যামসায়র (পূর্ব)
পোঃ+জেলাঃ বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সারাদিনে হাজার হাজার ভক্ত উৎসবে যোগদান করেছে। মধ্যাহ্নে প্রায় ২৭ হাজার ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্নে স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১-৩ জানুয়ারি ১৯৯৬ কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠে (কাশীপুর উদ্যানবাটীতে) প্রতি বছরের মতো ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনদিন-ব্যাপী 'কল্পতরু উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর জনসমাগম অনেক বেশি হয়। উৎসবের প্রথম দিন প্রায় ৪০ হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু লীলা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, স্বামী মুমুক্ষানন্দ, বিচারপতি মুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, স্বামী রমানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ এবং স্বামী জয়ানন্দ। তিনদিনের ধর্মসভায় সমাপ্তি ভাষণ দেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন যথাক্রমে স্বামী সনকানন্দ, স্বামী পূতানন্দ ও স্বামী অমলানন্দ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিত মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর সোম, রুদ্র রায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ। 'ভক্তের ভগবান' নাটকটি স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের পরিচালনায় জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্টুডেন্টস হোম-এর ছাত্ররা অভিনয় করে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-এর ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমির দৃষ্টিহীন ছাত্ররা ঐকতান বাদন (অর্কেস্ট্রা) পরিবেশন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ নাট্যসমাজ পরিবেশন করে 'সাধক রামপ্রসাদ' যাত্রাপালা।

গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে। এদিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী নিয়ে সকালে আলোচনা করেন স্বামী ধর্মদানন্দ এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী হরিদেবানন্দ।

অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথিও উদ্‌যাপন করা হয়। ঐদিন প্রায় ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন

বেলুড় মঠ: গত ১২ জানুয়ারি '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন জাতীয় যুবদিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে ৩৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫৫০০ যুবক-যুবতী ব্যান্ড, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে মঠে আসে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ্-প্রযোজিত 'বিবেকানন্দ—ভারতের পথে পথে' নামে ৫২ মিনিটের একটি ভিডিও ক্যাসেটের উদ্বোধন করেন। পরে বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং গোষ্ঠী আলোচনায় যুবক-যুবতীরা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ।

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ১৩০০ যুবক-যুবতী এবং প্রায় ২০০ স্থানীয় মানুষ অংশগ্রহণ করে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী সুরেশভাই মেহেতা, সংসদ সদস্য চিমনভাই শুক্লা এবং রাজকোটের মেয়র ভাবনাবেন যোশীপুরা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেন। এর পরে ১৫ ও ১৭ জানুয়ারি একটি শিক্ষক-সমাবেশে গুজরাটের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বক্তারা সভায় বক্তব্য রাখেন।

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ৯ জানুয়ারি ২৫০০ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রাটি ৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।

আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) বিবেক উদ্যানে স্বামীজীর মূর্তির সামনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। ত্রিপুরা সরকারের দুই মন্ত্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী ও অনিল সরকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ১১ জানুয়ারি ক্রীড়া ও সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং ১২ জানুয়ারি শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এদিন জনসভায় সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে ৫৫০ জন ছাত্রছাত্রী, ৭৫ জন শিক্ষক এবং আরও বহু মানুষ যোগদান করেন।

গড়বেতা আশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) শোভাযাত্রা, আলোচনা, আবৃত্তি, ভক্তিগীতি, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে।

মালদা আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ)-আয়োজিত শোভাযাত্রায় শহরের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং ভক্তবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

ইছাপুর আশ্রম (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)-আয়োজিত শোভাযাত্রা এবং বক্তৃতা, আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় স্থানীয়

বিদ্যালয়গুলি থেকে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় ৪৬ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়।

পুরী মঠ (উড়িষ্যা) ৪-২৫ জানুয়ারি পুরী জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ৪০টি বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতার অংশ নেয়। ২১ জানুয়ারি আশ্রমে আয়োজিত আন্তঃ-মহাবিদ্যালয় প্রবন্ধ-রচনা প্রতিযোগিতায় ২৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ, কাঁকুড়গাছি (কলকাতা-৫৪) গত ১৪ জানুয়ারি একটি যুবশিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৭০০ যুবক-যুবতী এবং ৫৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগদান করেন। সভায় স্বাগত ও উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

ব্যাঙ্গালোর আশ্রম (কর্নাটক) গত ৭ জানুয়ারি ৭২১ জন কলেজ-ছাত্রকে নিয়ে একটি আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করেছে।

গদাধর আশ্রম (কলকাতা-২৫)-আয়োজিত এক শোভাযাত্রায় প্রায় ২৫০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। তারপর হরিশ পার্কে এক সভাতে আবৃত্তি, ভাষণ ও গানের পর সকলকে টিফিন প্যাকেট দেওয়া হয়।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (জেলা—মেদিনীপুর) জাতীয় যুবদিবসে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় ভক্ত অনুরাগীদের নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। পরিক্রমা-শেষে যুবদিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন স্বামী ধর্মদানন্দ। এরপর সকলকে টিফিন প্যাকেট দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে গত ২১ জানুয়ারি সারাদিনব্যাপী পঞ্চদশ বর্ষ যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পরিচালনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। সমাপ্তি ভাষণ দেন স্বামী ধর্মদানন্দ। সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন যোগ দিয়েছিল।

উদ্বোধন

গত ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ কালাডির মাত্তুরে **কালাডি আশ্রমের (কেরল)** অন্তর্গত তফসিলী জাতির মেয়েদের জন্য ক্রেশ ও টেলারিং স্কুলের নবনির্মিত গৃহের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই অনুষ্ঠানে বহু ছাত্রী, শিক্ষিকা ও ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৫ জানুয়ারি **চিঙ্গালপত্তু আশ্রমের (তামিলনাড়ু)** অন্তর্গত ছেলেদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ব্লক' (গবেষণাগার ও ঐচ্ছিক বিষয়ের শ্রেণীকক্ষ)-এর উদ্বোধন করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। গত ১১ জানুয়ারি আশ্রম-আয়োজিত সাধনশিবিরে প্রায় ১০০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

গত ১২ জানুয়ারি **কাটিহার আশ্রমের (বিহার)** কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও প্রাইমারি স্কুল ব্লকের দ্বিতলের উদ্বোধন হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ২৪ জানুয়ারি মাদ্রাজের বার্কিট রোডে **মাদ্রাজ মিশন আশ্রমের** প্রস্তাবিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। অনুষ্ঠানে কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসী, বহু ভক্ত এবং আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও কর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসা-শিবির

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ব্যবস্থাপনায় গত ২১ ডিসেম্বর '৯৫ উড়িষ্যার জগৎসিংপুর জেলার রঘুনাথপুর গ্রামে একটি বিনামূল্যে দন্তচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডাঃ সঞ্জয়কুমার মহাপাত্র ও ডাঃ অসিমকুমার সাহু ২৫৬ জনের চিকিৎসা করেন। শিবিরে ৪৭ জনের দাঁত তোলা হয়। সকল রোগীকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেওয়া হয়।

গত ২৫ জানুয়ারি উড়িষ্যার চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কোনারকে মাঘী সপ্তমী মেলা উপলক্ষে **পুরী মঠ** যে বিনামূল্যে চিকিৎসা-শিবির ও পানীয় জলদানের ব্যবস্থা করেছিল। শিবিরে ২৭৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।

কাটিহার আশ্রম গত ১৬ নভেম্বর '৯৫ এবং ৮ জানুয়ারি '৯৬ যথাক্রমে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এবং কাটিহার জেলার মণিহারীতে বিনামূল্যে দুটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করেছে। দুটি শিবিরে মোট ১৯৯ জন রোগীর চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ শীতত্রাণ

হাওড়া জেলার বালী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত বেলুড় গ্রামের তিনটি অঞ্চলের গরিব শিশুদের মধ্যে **বেলুড় মঠ** থেকে ৩০০ সোয়েটার বিতরণ করা হয়েছে। শিশুদের ফল-মিষ্টিও বিতরণ করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বিতরণ কর্মসূচীর সূচনা করেন।

হুগলী জেলার গোঘাট ব্লকের ৯টি গ্রামের ২৯৩টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে **কামারপুকুর আশ্রমের (জেলা—হুগলী)** মাধ্যমে ১২৪৫টি শীতের পোশাক ও পুরনো জামাকাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

শিকড়া-কুলীনগ্রাম আশ্রমের (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) মাধ্যমে শীতার্ত মানুষের মধ্যে নতুন ও পুরনো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলা-ত্রাণ

কলকাতার **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান** এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার **সরিষা** ও **মনসাদ্বীপ আশ্রম** যৌথভাবে গত ১০-১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে মকর-সংক্রান্তি মেলায় অন্যান্য বছরের মতো এবারেও চিকিৎসাত্রাণের ব্যবস্থা করে। শিবিরের বাইরে ২৪৩৩ জন এবং ভিতরে ১৭ জন রোগীর সেবা ছাড়াও দুঃস্থ

মানুষের মধ্যে ৯০টি উলের পোশাক, ১০টি ধুতি এবং ৩০টি পুরনো পোশাক বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মনসাদ্বীপ আশ্রমে ৫০০ তীর্থযাত্রীর জন্য থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

মেঘালয় বন্যাত্রাণ

চেরাপুঞ্জী আশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ-সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বন্যার্তদের মধ্যে ২০০টি উলের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

উড়িষ্যা অগ্নিত্রাণ

পুরী জেলার পুরী সদর ব্লকের গৌদাকেরা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত ১৯৪ জন মানুষের মধ্যে পুরী মঠ চারদিন ধরে রান্না-করা খাবার বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রতি রবিবার ধর্মীয় ভাষণ হয়েছে। ২০ তারিখ ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস হয়েছে। ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি, ১৭ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি ও ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, হলিউড ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে এই কেন্দ্রের মন্দিরে পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তিগীতি, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথিতেও অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি হয়েছে। অন্যান্য রবিবারগুলিতে সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ এবং সাপ্তাহিক ক্লাসসমূহও যথারীতি হয়েছে। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত স্যান্টা বারবারা, সাউথ প্যাসাডোনা, ট্রেবুকো ক্যানিয়ন ও স্যান দিয়াগো কেন্দ্রেও রবিবাসরীয় ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া, স্যানফ্রান্সিস্কো ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি পূজা, জপধ্যান, সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শিবরাত্রিও পালিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতি রবিবার ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।

এই কেন্দ্রের মন্দিরের নবনির্মিত অংশের (যার মধ্যে একটি হলঘর, অফিস, গ্রন্থাগার আছে) উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ এবং ১ জানুয়ারি '৯৬ এই তিনদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কেন্দ্রসমূহ থেকে সন্ন্যাসিগণ যোগদান করেছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২৫ তারিখ ছাড়া অন্যান্য রবিবারগুলিতে সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে পূজা, জপধ্যান, সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবারের ক্লাসগুলিও যথারীতি হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, সিয়াটল ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৭ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রিও পালিত হয়। তাছাড়া প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক ধর্মীয় ভাষণ দিয়েছেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) ঃ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রি ও ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া রবিবারগুলিতে সাপ্তাহিক আলোচনা হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী চিদ্রূপানন্দ (আলফ্রেড টি. ক্লিফটন) গত ৩ জানুয়ারি স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের পুরনো মন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ফুসফুসের রোগ ও হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় ভুগছিলেন।

স্বামী অশোকানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী চিদ্রূপানন্দ ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অশোকানন্দজী মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন।

স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের অন্তর্গত ওলেমা বেদান্ত রিট্রীট উন্নয়নে তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ এবং এই কেন্দ্রের নতুন মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন প্রধান কর্মকর্তা। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে বার্কলে কেন্দ্রের ও ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের উন্নতিতেও বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। অসাধারণ ধৈর্য, সমমতিত্ব এবং সংঘের কার্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথির দিন সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। গত ২২ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, ২৩ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজ এবং ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সন্ধ্যায় তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ও স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (কলকাতা-৩৬)-আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসব ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন যথাক্রমে ৯, ১০ ও ১৪ ডিসেম্বর '৯৫-তে অনুষ্ঠিত হয়। ৯ তারিখে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, রামচরিতমানস পাঠ, কালীকীর্তন, দুঃস্থদের কম্বল-বিতরণ, বাউলসঙ্গীত, ধর্মসভা, মঠের কোচিং ক্লাসের ছাত্রদের পোশাক-বিতরণ,গীতি-আলেখ্য ও সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রসাদ-বিতরণ, নবব্রত ব্রহ্মচারী কর্তৃক 'কথায় ও গানে শ্রীমদ্ভাগবত' পরিবেশন, ধর্মসভা, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি। ঐদিন প্রায় ৩০০০ ভক্তকে হাতে হাতে এবং ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

১৪ তারিখে অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালনের মধ্য দিয়ে তিনদিনের উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। উক্ত দিবসত্রয়ে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী রমানন্দ, স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী বিধানানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ ও স্বামী গোকুলেশানন্দ। স্বামী সর্বগানন্দের পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ ও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দের কালীকীর্তন এবং স্বামী অনিমেষানন্দের ভক্তিসঙ্গীত উল্লেখযোগ্য।

নববারাকপুর (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর '৯৫ পর্যন্ত পরিষদ-প্রাঙ্গণে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা ও পূজার্চনার পর ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। সকালে রক্তদান-শিবির উদ্বোধন করেন স্বামী একাত্মানন্দ। মোট ৩৬ জন রক্তদান করেন। অপরাহ্ণে যুব-ছাত্র সভায় ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দ। তিনদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ, প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। অনুষ্ঠানে ২১৪টি নতুন কম্বল বিতরণ করেন পৌরপ্রধান মৃণালেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্যবৃন্দ 'বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ', 'মাতৃসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' ও 'বিপ্লবী সূর্য সেন' নাটক মঞ্চস্থ করে। উৎসব উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া) : গত ১৪-১৭ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম শুভ আবির্ভাব-তিথি ও সাধনালয়ের পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, যুবসম্মেলন প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। ১৬ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ (অন্যতম সহাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী ভবেশ্বরানন্দ এবং প্রণবেশ চক্রবর্তী।

গত ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম জন্মতিথি-উৎসব **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—নদীয়া)**-এ পালিত হয়েছে। সকালে চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, ভোগ, হোম এবং দুপুরে ৬০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন দেবপ্রসূন ঘটক ও নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিগণ।

গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর ১৩৪তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসংঘের (জেলা—নদীয়া) উদ্যোগে গত ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ৪০০ নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় সেবাসংঘের সদস্যগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক ডঃ প্রশান্ত মুখার্জী ও অধ্যাপক নিজন দে চৌধুরী। এই উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর বিকালে আরেকটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী দিব্যানন্দ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘ, গোয়াবাগান (কলকাতা-৬) : গত ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজা-হোমাদির পর সহস্রাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যারতির পর স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। তারপর ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (জেলা—বীরভূম) : গত ১৪ ডিসেম্বর এই আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। ঐদিন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী আশ্রমের প্রস্তাবিত দাতব্য চিকিৎসা-কেন্দ্রের শিলান্যাস করেন এবং এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। দুপুরে প্রায় ১০ হাজার ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐদিন ধর্মসভা, পালাকীর্তন, চিত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়।

সাঁতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (উত্তর বাকসাড়া, জেলা—হাওড়া) গত ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম

জন্মতিথি উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের বাণী, 'কথামৃত' পাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনকথা আলোচনা এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়, লালগড় (জেলা—মেদিনীপুর) : গত ১৬ ডিসেম্বর '৯৫ দুপুর ১টায় বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ আলোচনা-চক্রে 'বর্তমান ছাত্র ও যুবজীবনে বিবেকানন্দকে কেন প্রয়োজন' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। এই আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। সভায় বহু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

শহর হাওড়ার কেন্দ্রস্থল হাওড়া ময়দানে গত ১০ ডিসেম্বর '৯৫ এক অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের নয় ফুট উচ্চতার একটি ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। হাওড়া শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের দ্বারা গঠিত হাওড়া বিবেকানন্দ স্মারক সমিতি এই মূর্তিপ্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। উপবিষ্ট আকারে এগার ফুট বেদির ওপর স্থাপিত স্বামীজীর এই মূর্তিটি ভারতবর্ষে স্থাপিত স্বামীজীর উপবিষ্ট মূর্তির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্ববৃহৎ। মূর্তিটি নির্মাণ করেছেন শিল্পী নিত্যানন্দ ভকত। জনাকীর্ণ সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ, হাওড়ার মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী, পি. সি. সেন, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী, ডঃ নিমাইসাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুমন্ত্র চৌধুরী, দিলীপ দাস, অশোক মল্লিক ও বিমলকুমার ঘোষ। সঙ্গীতে অংশ নেন অমিত ঘোষ, গণেশ দাস ও সত্য চট্টোপাধ্যায়। শিল্পী নিত্যানন্দ ভকতকে সম্মান-স্মারক অর্পণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী এবং একটি স্মারক পুস্তক প্রকাশ করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী। বেলুড় মঠ থেকে প্রায় চল্লিশ জন সন্ন্যাসী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

চিকিৎসা-শিবির

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১৭ ডিসেম্বর '৯৫ রবিবার বেলা ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত আশ্রমে দ্বাদশ চিকিৎসা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য প্রসিদ্ধ শল্যচিকিৎসক ডাঃ কমলকুমার দাঁ, ই. এন. টি এবং চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ যথাক্রমে ডাঃ অনিলকুমার আঢ্য ও ডাঃ পার্থ সেনের সহযোগিতায় এবং আশ্রম-সভাপতি ডাঃ সুধীরকুমার রাহা, সদস্য ডাঃ নির্মল কর্মকার ও স্থানীয় চিকিৎসকদের সহায়তায় আশ্রম-সংলগ্ন ঘোষবাটী দুর্গামণ্ডপ-প্রাঙ্গণে শিবির পরিচালনা করেন। মোট ১৪৫ জন রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থাপত্র-সহ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, স্যান্ডেলের বিল (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) : এই আশ্রমের উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ও লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৫ গ্রামগঞ্জের ৭২ জন দুঃস্থ রোগীর বিনাব্যয়ে চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের ৪টি ব্লকের রোগীরা এই সুযোগ পেয়েছে। অস্ত্রোপচারের দিন সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৬ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও তাঁদের কয়েকজন সহকারী-সহ স্বামী সর্বলোকানন্দ ও স্বামী গতসঙ্গানন্দ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় যুবক-যুবতীরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিল।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, নেতাজীনগর (রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৪০)-নিবাসী **ক্ষিতীশচন্দ্র পাল** গত ২ অক্টোবর কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি মূত্রাশয়ের রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। আমৃত্যু তাঁর এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ক্ষিতীশবাবু পরোপকারী, দানশীল ও বন্ধুবৎসল হিসাবে পরিচিত মহলে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মালদহ জেলার চাঁচল-নিবাসিনী **রেখা চক্রবর্তী** গত ৫ সেপ্টেম্বর '৯৫ রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটে ৬২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।□

বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' পত্রিকায় উৎসবাদি বা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির অন্ততঃপক্ষে ১৫ দিনের মধ্যে সেই সংবাদ আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

স্বর্ণসন্ধানে

আজ পর্যন্ত খনি থেকে যত স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে, তার প্রায় ৪০ শতাংশ হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার খনি থেকে। এর দাম প্রায় পাঁচ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ('১ বিলিয়ন প্রকৃতপক্ষে এক হাজার কোটি, কিন্তু আমেরিকায় ১ বিলিয়ন = একশ কোটি ধরায় বিলিয়নের এই মূল্যায়নই এখন চালু)। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ উইটওয়াটারস্ট্র্যান্ড (Witwaterstrand, চলিত নাম 'উইটস') থেকেই এই বিপুল সোনা তোলা হয়েছে। বহু বছর ধরে অনুসন্ধান চালিয়েও সারা পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি এইধরনের স্বর্ণখনি পাওয়া গেছে, তবে তার কোনটিতেই এত বিপুল পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই এখানে কয়েকটি অসাধারণ ঘটনার সমাবেশেই এটি সম্ভব হয়েছে, কিন্তু ঐ ঘটনাগুলি যে কী ধরনের তা নিয়ে তর্কাতর্কি চলতেই থাকছে। আপাতদৃষ্টিতে এই তর্ক অনাবশ্যক মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। ঐ জায়গায় এত সোনা কি করে এল—এটা খনি-ইঞ্জিনিয়াররা জানতে পারলে কোন্ নতুন জায়গায় বেশি স্বর্ণধারক আকরিক (high grade ore) মজুত আছে তার অনুসন্ধানের রহস্যসূত্র মিলবে। আর এটা দরকারও, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রধান আর্থিক সম্বলের মজুত এখন ক্ষীয়মাণ হয়ে আসছে। অবশ্য এখনো সারা পৃথিবীর সোনার ২৭ শতাংশ এদেশ সরবরাহ করছে। তবে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের পরে দেখা যাচ্ছে যে, স্বর্ণধারক আকরিকের মজুত বেশ কমে যাচ্ছে। অবশ্য স্বর্ণের মজুত কমে আসছে কথাটাও পুরো সত্য নয়; কারণ, চার কিলোমিটার গভীর খনিগুলিকে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হচ্ছে। সেজন্য খনির মালিকরা স্বর্ণধারক আকরিক পাবার জন্য অপেক্ষাকৃত অগভীর খনির সন্ধান বিষয়ে গবেষণা করার কথা বলছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরা এব্যাপারে দ্বিমত এবং দুই বিপরীতমুখী মত অগভীর স্বর্ণখনি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জায়গার নির্দেশ করে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত। সেটি হচ্ছে যে, উইটওয়াটার-স্ট্র্যান্ডের স্বর্ণধারক জায়গাগুলি সৃষ্ট হয়েছে তিন বিলিয়ন (তিনশ কোটি) বছর আগে, পৃথিবীর শৈশব অবস্থায়—এখন বর্তমান আয়ার্ল্যান্ডের অনুরূপ আয়তনের এই জায়গাটি উচ্চ পর্বতশ্রেণী ও বহু প্রাচীন এক সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। ঝড়বৃষ্টির ফলে উঠতি পর্বতশ্রেণীর চূড়াগুলি ক্ষয় হয়ে নিচে দ্রুতগামী নদীস্রোতে পড়ত; স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোন সমতল ক্ষেত্রে এসে যখন স্রোতের বেগ কমে যেত, তখন পর্বতচূড়ার ধ্বংসাবশেষসমূহ জলের নিচে জমা হতো। পরে ভূমিকম্পনের ফলে জায়গাটা নেমে যায়, সেই নেমে যাওয়ার ফলে সেখানে বালি, নুড়ি-পাথরও জমতে থাকে এবং এইভাবে ওপরের বালি ও পাথরের স্তর প্রায় সাত কিলোমিটার উঁচু হয়ে যায়। কিন্তু এই মতবাদে, সাত কিলোমিটার নিচে থাকা সোনা কোথা থেকে এল, তার উত্তর মেলে না। 'প্লেসার'-মতে ('placer—বালি, কাঁকড় ও সোনার মিশ্রণ) বলে যে, প্রাচীনকালে পাহাড়চূড়ার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে এই প্লেসার মিশ্রণ একসঙ্গেই উইট উপত্যকায় নদীপথে ভেসে এসেছে। 'এপিজেনেটিক' (epigenetic)-মতে বলে যে, সোনা কয়েক লক্ষ বছর পরে এসেছে, যখন গরম জলে থাকা গলিত সোনা পাহাড়ী অঞ্চলের গর্ত বা ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে নিচে নামার সময় সোনা পাহাড়ের লোহা, নুড়িপাথর, কার্বন ইত্যাদির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে নিচে জমা পড়ে। যদি 'প্লেসার' মত সত্য হয়, তাহলে ঐসব অঞ্চলে যেখানেই নুড়িপাথরের স্তর আছে, সেখানেই সোনা পাওয়া উচিত। এপিজেনেটিক মত সত্য হলে ঐ অঞ্চলে নুড়িপাথরের স্তরে যেখানে প্রচুর লোহা নেই, সেখানে সোনা অনুসন্ধান নিরর্থক, এমনকি নুড়িপাথরের গাদার কাছাকাছি, সব লোহা-থাকা পাহাড়ী জায়গাতেই সোনা পাওয়া উচিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক স্বর্ণধারক আকরই পাওয়া গেছে বহু প্রাচীন নদীর গতিপথের সমান্তরাল অঞ্চলে।

উপরি উক্ত দুই মতেরই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'উইটস' ক্ষেত্রটির বিরাট আয়তন। এই বিরাট আয়তনের জায়গায় সোনা জমতে হলে সেই সোনার একটা উৎস থাকতে হবে। উইটস অঞ্চলের এক জায়গায় যেখানে প্রচুর সোনা পাওয়া যায়, সেখানে প্রচুর কার্বন পাওয়া যাচ্ছে কেন, তার উত্তর পাওয়া একটি সমস্যা। কার্বন কোথা থেকে এল? অনেকেই মনে করছেন—এই কার্বনের উৎস হলো এক ধরনের 'অ্যালগি' (algae—শেওলা), যা জন্মাত উইটস-এর সাগরে বা স্রোতস্বতী নদীর ধারে ধারে এবং সেই অ্যালগিই জীবাশ্ম বা 'ফসিল' হয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, অ্যালগি তাদের লম্বা শুঁড়ের দ্বারা জলস্রোত থেকে সোনা ধরে ফেলত। অনেকে ভাবেন, উইটস এলাকার জৈব (organic) পদার্থের সঙ্গে অ্যালগির সম্পর্ক না থাকলে ব্যাপারটা ইউরেনিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কিত।

খনি-মালিকরা এসব তথ্য থেকে কি উপকার পাচ্ছেন? প্লেসার ও এপিজেনেটিক— দু-মতেই আদিকালের নদীপথের ওপর জোর দিচ্ছে। সোনার সন্ধান পেলেই তাঁরা নদীর গতিপথ ধরে জীবাশ্ম বা ফসিল লক্ষ্য করে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারেন। তবে তাতেই গণ্ডগোল মিটছে না। প্লেসারিস্টরা বলেছেন, নুড়িপাথরের স্তরের ওপর নজর দিতে, অন্য মতে কার্বন ও লোহা (Iron Oxide)-র বিষয়ে জোর দিতে।

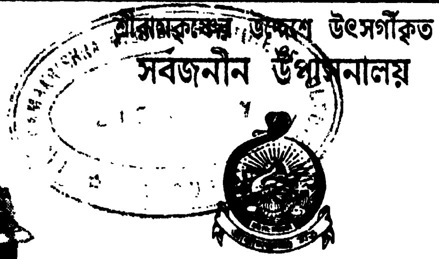
তাই সোনা কিভাবে বা কোথা থেকে এল—এর সঠিক উত্তর এখনো আসেনি। [New Scientist, 15 April 1995, pp. 26-31]□

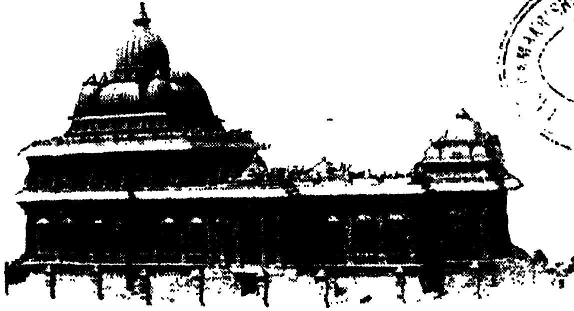


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে — প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তুব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার অধিক সুবিধা পায় তাহা করিতে হইবে। এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে — লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতদের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল — দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

30 APR 199

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ



'উদ্বোধন'-এর বক্তব্য

বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ এই বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখছেন, টেলিফোন করছেন, কেউ কেউ আবার সাক্ষাতে যোগাযোগ করছেন। এসম্পর্কে আমরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক সাধারণকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে (উদ্বোধন কার্যালয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা কোন শাখা-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপনগুলি ভিন্ন) উদ্বোধন কার্যালয়ের বা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্ক নেই।—সম্পাদক, উদ্বোধন

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ বৈশাখ ১৪০৩ এপ্রিল ১৯৯৬ ৪র্থ সংখ্যা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □ ৩০০০ টাকা □ কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য কিস্তিতেও প্রদেয় □ বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য □ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ □ ৫৬ টাকা □ সডাক □ ৬৬ টাকা □ আলাদাভাবে কিনলে □ বর্তমান সংখ্যার মূল্য □ ৮ টাকা

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৬-৯৭ খ্রীস্টাব্দ



তিথি-কৃত্য

১। শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	২৩ এপ্রিল	১৯৯৬
২। শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২০ বৈশাখ	শুক্রবার	৩ মে	„
৩। গুরুপূর্ণিমা	আষাঢ় পূর্ণিমা	১৪ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	৩০ জুলাই	„
৪। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৭ শ্রাবণ	সোমবার	১২ আগস্ট	„
৫। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১২ ভাদ্র	বুধবার	২৮ আগস্ট	„
৬। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৯ ভাদ্র	বুধবার	৪ সেপ্টেম্বর	„
৭। স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৬ ভাদ্র	বুধবার	১১ সেপ্টেম্বর	„
৮। স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২০ আশ্বিন	রবিবার	৬ অক্টোবর	„
৯। স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৬ আশ্বিন	শনিবার	১২ অক্টোবর	„
১০। স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	২২ নভেম্বর	„
১১। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	২৪ নভেম্বর	„
১২। স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৩ পৌষ	বুধবার	১৮ ডিসেম্বর	„
১৩। শ্রীযীশুখ্রীস্ট	————	৯ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর	„
১৪। শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ পৌষ	বুধবার	১ জানুয়ারি	১৯৯৭
১৫। স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২১ পৌষ	রবিবার	৫ জানুয়ারি	„
১৬। স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৩০ পৌষ	মঙ্গলবার	১৪ জানুয়ারি	„
১৭। স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৮ মাঘ	বুধবার	২২ জানুয়ারি	„
১৮। শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ মাঘ	শুক্রবার	৩১ জানুয়ারি	„
১৯। স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৬ মাঘ	রবিবার	৯ ফেব্রুয়ারি	„
২০। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৮ মাঘ	মঙ্গলবার	১১ ফেব্রুয়ারি	„
২১। স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	১০ ফাল্গুন	শনিবার	২২ ফেব্রুয়ারি	„
২২। শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৬ ফাল্গুন	সোমবার	১০ মার্চ	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২ চৈত্র	রবিবার	১৬ মার্চ	„
২৩। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১০ চৈত্র	সোমবার	২৪ মার্চ	„
২৪। স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৪ চৈত্র	শুক্রবার	২৮ মার্চ	„

পূজা-কৃত্য

১। শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতিবার	১৬ মে	১৯৯৬
২। স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১ জুন	„
৩। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২ কার্তিক	শনিবার	১৯ অক্টোবর	„
৪। শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৪ কার্তিক	রবিবার	১০ নভেম্বর	„
৫। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৮ মাঘ	মঙ্গলবার	১১ ফেব্রুয়ারি	১৯৯৭
৬। শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৩ ফাল্গুন	শুক্রবার	৭ মার্চ	„

একাদশী-তিথি

(রামনামসঙ্কীর্তন)

বৈশাখ— ১/১৬/৩০ (এপ্রিল ১৪/২৯, মে ১৩)
জ্যৈষ্ঠ—১৫/২৮ (মে ২৯, জুন ১১)
আষাঢ়—১৩/২৭ (জুন ২৭, জুলাই ১১)
শ্রাবণ—১১/২৪ (জুলাই ২৭, আগস্ট ৯)
ভাদ্র—৯/২৩ (আগস্ট ২৫, সেপ্টেম্বর ৮)
আশ্বিন—৭/২২ (সেপ্টেম্বর ২৩, অক্টোবর ৮)

কার্তিক—৬/২১ (অক্টোবর ২৩, নভেম্বর ৭)
অগ্রহায়ণ—৫/২০ (নভেম্বর ২১, ডিসেম্বর ৬)
পৌষ—৫/২১ (ডিসেম্বর ২০, জানুয়ারি ৫)
মাঘ—৫/২১ (জানুয়ারি ১৯, ফেব্রুয়ারি ৪)
ফাল্গুন—৫/২১ (ফেব্রুয়ারি ১৭, মার্চ ৫)
চৈত্র—৫/২১ (মার্চ ১৯, এপ্রিল ৪)

দিব্য বাণী

□ আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেওয়া হবে ; অন্বেষণ কর, তোমরা পাবে ; দ্বারে করাঘাত কর, দ্বার খুলে যাবে। কারণ, যে চায় সে পায়। যে অন্বেষণ করে সে সন্ধান পায়। আর যে দ্বারে করাঘাত করে তার সামনে দ্বার খুলে যায়।

□ সাবধান, লোককে দেখানোর জন্য তাদের সামনে তোমরা প্রার্থনা করবে না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে তোমরা পুরস্কৃত হবে না।



□ তোমরা যখন প্রার্থনা করবে তখন কপট ভক্তদের মতো হয়ো না। তারা উপাসনালয়ে এবং পথের কোণে দাঁড়িয়ে লোকদেখানো প্রার্থনা করতে ভালবাসে। কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করবে তখন তোমার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করবে এবং যিনি গোপনে বিরাজমান, গোপনে সেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে। তোমাদের পিতা সেই ভগবান যিনি গোপন করলেও সব দেখতে পান, তিনি প্রকাশ্যে তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।



□ তোমরা যখন উপবাস কর তখন কপট ভক্তদের মতো বিষণ্ণবদন হয়ো না। তারা লোকেদের কাছে তাদের উপবাসকে খ্যাপন করার জন্য নিজেদের মুখকে মলিন করে দেখায়। কিন্তু তুমি যখন উপবাস করবে তখন মাথায় তেল দেবে এবং মুখ ধোবে [যেন তুমি আহারের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলে এবং আহারের পর মুখ ধুচ্ছ], যেন লোকে তোমার উপবাসের কথা বুঝতে না পারে। তোমাদের পিতা যিনি গোপনে বিরাজমান তিনি গোপনেই দেখতে পান এবং যিনি গোপন করলেও সব দেখতে পান তিনি তোমাদের প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করবেন।

যীশুখ্রীস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সততা

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর প্রথমে 'সতর্কতা'র স্থান কেন তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। সতর্কতা ভিন্ন ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবনই মানুষের প্রকৃত জীবন। সেই জীবনকে গঠন করিতে হইলে কি পরিমাণ মূল্য দিতে হয় সে-সম্পর্কে সচেতনতা না থাকিলে ধর্মজীবন বা অধ্যাত্মজীবন যাপনের প্রয়াস অবান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ জীবনই মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্যের এবং মানুষের সঙ্গে দেবতার নৈকট্য ও অভিন্নতার নির্ধারক। সুতরাং সেই মহামূল্যবান জীবনযাপন করিবার জন্য কোন মূল্যই বোধ হয় যথেষ্ট নহে। প্রসঙ্গতঃ 'বাইবেল'-এ যীশুখ্রীস্টের দশজন কুমারীর বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে। বিবাহবাসরে আপন আপন প্রদীপ লইয়া ঐ কুমারীরা বর দেখিতে গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল সতর্ক, আর পাঁচজন ছিল অলস এবং অসতর্ক। প্রথম পাঁচজন বরকে দেখিবার জন্য তাহাদের দীপাধারে তেল ভরিয়া লইয়াছিল, বাকি পাঁচজন প্রদীপ লইলেও তেল লয় নাই। বরের আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। কুমারী দশজন ঢুলিতে ঢুলিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িল। মধ্যরাত্রে উচ্চস্বরে কাহারা বলিল: 'ঐ দেখ, বর আসিয়া পড়িয়াছে।' ঐ শব্দে কুমারীরা জাগিয়া উঠিল এবং প্রদীপ জ্বালাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। যাহাদের প্রদীপে তেল ছিল তাহারা সহজেই তাহাদের প্রদীপ জ্বালাইল, কিন্তু যাহাদের প্রদীপে তেল ছিল না তাহারা জ্বালাইতে পারিল না। দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলকে বলিল: 'তোমাদের তেল হইতে আমাদের কিছু তেল দাও নতুবা আমরা প্রদীপ জ্বালাইতে পারিতেছি না।' প্রথম দল বলিল: 'আমাদের যাহা তেল আছে তাহাতে তোমাদের এবং আমাদের কুলাইবে না। তোমরা বরং দোকান হইতে তেল কিনিয়া আন।' দ্বিতীয় দলটি তেল কিনিবার জন্য বাহির হইল। ইতিমধ্যে বর আসিয়া গিয়াছে। প্রথম দলটি প্রস্তুত ছিল। তাহারা বরের সঙ্গে বিবাহবাসরে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় দলটি যখন দোকান হইতে তেল কিনিয়া উপস্থিত হইল তখন বিবাহবাড়ির দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের আর বরকে দেখা হইল না। এই বিভ্রাটের কারণ—তাহারা যথাসময়ে প্রস্তুত ছিল না, সতর্ক ছিল না। (St. Matthew, 25.1-13)

গল্পটি বলিয়া যীশু ভারী সুন্দরভাবে বলিলেন: "Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh." (অতএব তোমরা সতর্ক থাক। কারণ, তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ সম্পর্কে অবহিত নহ কখন [তোমাদের জীবনে] ঈশ্বরপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইবেন।) বস্তুতঃ, এই সদাজাগ্রত সতর্কতা ভিন্ন প্রকৃত অর্থে ধর্মজীবন যাপন অসম্ভব। সেজন্য শবরীর প্রতীক্ষায় ধর্মজিজ্ঞাসুর দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ, প্রতিটি মুহূর্তই যে মূল্যবান, প্রতিটি পদক্ষেপই যে জরুরী। কখন যে প্রার্থিত লগ্নটি আসিবে কে জানে?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন। "একজন মাদুর বগলে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল। যাত্রার দেরি দেখে মাদুরটি পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন উঠল তখন সব [যাত্রা] শেষ হয়ে গেছে। তখন মাদুর বগলে করে বাড়ি ফিরে গেল।" বগলে মাদুর বহাই তাহার সার হইল। যে-উদ্দেশ্যে মাদুরটি সঙ্গে লইয়া যাওয়া সেই যাত্রা দেখা আর হইল না!

এই সতর্কতা সার্থক হয় কখন? যখন আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য, আমাদের লক্ষ্যে, উপনীত হইবার জন্য আন্তরিক হই, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অকপট হই। অর্থাৎ আমরা আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে সৎ হই। সতর্কতা তখনই ঠিক ঠিক হয় যখন আমরা সততার (honesty) অধিকারী হই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "ভাবের ঘরে যেন চুরি না থাকে।" বলিতেন: "মন মুখ যেন এক হয়।" অধিকাংশ মানুষের এবং অধিকাংশ ধর্মজিজ্ঞাসুরও সমস্যা সততার সমস্যা। মন যাহা বলে মুখ তাহা বলে না। মুখ যাহা বলে মন তাহা বলে না। এই মনের কথায় মুখের সায় না থাকা অথবা মুখের কথায় মনের সায় না থাকা—ইহাই ধর্মজীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিবন্ধক। আমরা ধর্মের ভান করি, ধর্মের ভেক ধারণ করি, কিন্তু আমাদের অধিকাংশই প্রকৃত ধর্মজীবন যাপন করিতে চাহি না,

প্রকৃত ধর্মজীবন যাপন করি না। আমাদের অধিকাংশের সমস্যা এই মুখ এবং মুখোশের সমস্যা।

মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম এবং লোভ, আধ্যাত্মিকতা এবং বিলাসিতা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়। দুই বিপরীত মেরুতে উহাদের অবস্থান। আলো এবং অন্ধকার, দিন এবং রাত্রির যেমন পার্থক্য, যোগ এবং ভোগের মধ্যে, ঈশ্বরচিন্তা এবং বিষয়চিন্তার মধ্যে তেমনই পার্থক্য। স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় তুলসীদাসের সেই বিখ্যাত দোঁহাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিতেছে ঃ

"জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহী, জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।
দুহ মিলত নহী রব রজনী মিলত একঠাম॥"

—যেখানে ঈশ্বর সেখানে কামনা থাকিতে পারে না, যেখানে কামনা সেখানে ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই দুইয়ের সহাবস্থান অসম্ভব, যেমন অসম্ভব সূর্য এবং রজনীর সহাবস্থান।

মনকে ঐভাবে একমুখী করিবার শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের পার্যদ্গণ পাইয়াছিলেন। তুলসীদাসের দোঁহাটি উল্লেখ করিয়া কথামৃতকার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লব্ধ সেই শিক্ষাই যেন ঝালাইয়া লইতেন ঃ "রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয়?" শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁহারা শিখিয়াছেন ঃ হয় না। হয় নাই। হইবে না। হইতে পারে না।

যখন পণ্ডিতকে অথবা কোন সন্ন্যাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতেন মুখে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছেন, শাস্ত্রের বুলি ঝাড়িতেছেন অথচ জীবনে ও আচরণে আদর্শ এবং শাস্ত্রবচনের ছিটেফোঁটাও পালনের আগ্রহ বা চিহ্ন নাই, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের মুখের উপর তিনি বলিয়া দিতেন ঃ তোমাদের অমন শাস্ত্রকে আমি মানি না। ধর্মের নামে, আধ্যাত্মিকতার নামে এই জঘন্য সুবিধাবাদকে তিনি তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়াছেন। সততার এই নিন্দনীয় অভাব তাঁহার নিকট ছিল অসহ্য। মর্মভেদী বিদ্রূপে তিনি এই গল্পটি বলিতেন ঃ

একজনের বাড়িতে খুব ধুমধাম করিয়া দুর্গাপূজা হইত। দুর্গোৎসবে উদয়াস্ত পাঁঠাবলি হইত। কয়েক বছর পর আর সেই ধুমধাম নাই, পূজায় বলিও নাই। ধীরে ধীরে পূজা বন্ধই হইয়া গেল। একজন বাড়ির কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিল—মশাই, আজকাল আর দুর্গাপূজা করেন না কেন? কর্তা উত্তর দিল—আরে, এখন যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে! পাঁঠা খাইবার শক্তিও গিয়াছে!

সেজন্য ধর্মজিজ্ঞাসু এবং ধর্মজীবন যাপনে আগ্রহী ব্যক্তিদের সততার প্রশ্নটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ যাচাই করিয়া লইতে বলিতেন। তুমি কি সত্যই ধর্মকে ভালবাস? তুমি কি সত্যই ঈশ্বরকে ভালবাস? তুমি কি সত্যই ধর্মজীবন যাপন করিতে একান্তভাবে ইচ্ছুক? মনের গভীরে চাহিয়া দেখ। বিবেক এবং বিচারের সন্ধানী আলো ফেলিয়া দেখ মনের আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে অন্য কোন বাসনা, অন্য কোন বৃত্তি বাসা বাঁধিয়া নাই তো—উঁকি মারিতেছে না তো? জানিবে, মনও প্রতারণা করে। মনের প্রতারণাকে ধরিবার জন্য চাই বিবেক ও বিচারের তীক্ষ্ণতা। চাই সর্বদা আত্মবিশ্লেষণের অভ্যাস। চাই ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয়শক্তির উপর আপন নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষাগ্রহণ। এই অভ্যাস, এই পরীক্ষাগ্রহণ কতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ করিয়াছেন! আর কী সেই অভ্যাস ও পরীক্ষার ইতিবৃত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুসন্ধানী পাঠকমাত্রই তাহা জানেন। একটিমাত্র ঘটনার কথা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উল্লেখ করিব। নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমা তখন প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পূর্ণযৌবন স্বামীর সন্নিধানে বাস করিতেছেন, যে-স্বামীর মন সর্বদা ঈশ্বরময়, ঈশ্বরের জন্য এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীর সব আকর্ষণকে যিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সমস্ত পার্থিব কামনাকে যিনি পদানত করিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি করিয়াছেন? স্বয়ং স্বামীই তাহার চরম পরীক্ষা লইলেন। সেই অতুলনীয় পরীক্ষার বিবরণ দিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিতেছেন ঃ "একদিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—'মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে—গ্রহণ কর।' ঐরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে-রাত্রিতে আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।" (লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, সাধকভাব, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৬২-৩৬৩)

বাস্তবিক এই পরীক্ষা, এই সাফল্য এবং এই সততার অগ্নিময় কাহিনী আজ কিংবদন্তীতে পরিণত। কিন্তু এই

সততা, এই পরীক্ষা এবং এই সাফল্য কি শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের একার ? না, এক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমাও তাঁহারই সমতুল কৃতিত্বের অধিকারিণী। অকথিত সেই মহান বীরত্বের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিতেছেন ঃ "ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল [সঠিকভাবে আটমাস কাল] অতীত হইল। কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না। একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদের মন প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না। ঐকালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখনও কখনও বলিয়াছেন, 'ও (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে ?" (ঐ, পৃঃ ৩৬৪)

ইহার পূর্বে শ্রীমাকে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ ?" শ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন ঃ "না। আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব ? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৬২) শ্রীমায়ের নিষ্কম্প প্রত্যয়পূর্ণ উত্তর ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক সততা-সঞ্জাত। তিনি মুখে যাহা বলিয়াছিলেন উহাই ছিল তাঁহার অন্তরের অকপট কথা। পরবর্তী ঘটনায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট উক্তিতে প্রমাণিত তাঁহার সততা কোন্ গভীর তল হইতে উত্থিত।

আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সততার যে-নজির দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়, সাধারণ মানব-মানবীর পক্ষে উহার অনুষ্ঠান অসম্ভব। অসম্ভব হইলেও উহাই কিন্তু আমাদের আদর্শ। আমরা উহার "ষোল আনা" জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারিব না, কিন্তু আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলে এক আনা, কি দুই আনা অবশ্যই করিতে পারিব। বস্তুতঃ, তাঁহাদের ঐ আদর্শ দেখাইবার উদ্দেশ্য তাহাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মন মুখ এক করিয়া স্থির কর কী চাহ তুমি। যদি ঈশ্বরকে চাহ তাহা হইলে সংসারের প্রতি, বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি আকর্ষণ কমাইতে হইবে এবং অবশেষে নাশ করিতে হইবে। দুই নৌকায় পা দিলে বিপর্যয় কে ঠেকাইবে ? দুধ এবং তামাক কি একইসঙ্গে খাওয়া যায় ? সন্ন্যাসীর প্রতিও ছিল তাঁহার 'নির্জলা একাদশী'র নির্দেশ। ভোগৈষণা, লোকৈষণা, রূপৈষণাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া সন্ন্যাসী আত্মচিন্তা বা ঈশ্বরচিন্তা এবং লোককল্যাণচিন্তায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করিবেন। নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সততার অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

"কালীবাড়িতে কাঙালীরা খেয়ে গেল। তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, 'তুই করছিস কি ? কাঙালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে ?' আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তাহলে কি হয় ? তাকে বললাম, 'তবে রে শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড় ? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠাওরেছ ! তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন !' "

ত্যাগ মানে পরিপূর্ণ ত্যাগ। কোথাও কামনার কোন আঁশমাত্রও থাকিবে না। অন্তরের গভীরে, মস্তিষ্কের ভিতরে, স্নায়ুতে, ধমনীতে, শিরা-উপশিরায় কোথাও ভোগের এতটুকুও ফুট উঠিবে না। ইহাকেই স্বামীজীর ভাষায় বলা যায়—"Nervous association"। সততার সম্পূর্ণতা না হইলে উহা সম্ভব নহে। বাইবেলে যীশুখ্রীস্ট বলিতেছেন ঃ তোমার আনুগত্যে যেন কোন ফাঁক না থাকে। মাথা বিকাইলে এক প্রভুর কাছেই বিকাও। প্রভুর সংখ্যা একাধিক হইলে আনুগত্যে ফাটল থাকিবেই। প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনা সেক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। যীশুর ভাষায়, "No man can serve two masters : for either he will hate the one, and love the other ; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon." (St. Matthew, 6.24)

—কোন মানুষ একসঙ্গে দুইজন প্রভুকে সেবা করিতে পারে না। কারণ, হয় সে একজনকে ঘৃণা করিয়া অপরকে ভালবাসিবে অথবা একজনের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া অপরকে অবজ্ঞা করিবে। ঈশ্বর এবং বিত্তদেবতা—দুইজনকে একসঙ্গে তোমরা সেবা করিতে পার না।

অর্থাৎ চাই চিন্তায়, চেতনায়, আচরণে গোপীদের মতো অব্যাভিচারিণী নিষ্ঠা। ঐ নিষ্ঠা এমনই যে, বালক কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কৃষ্ণকে দেখাও তাঁহাদের কাছে 'দ্বিচারিণী' হওয়ার নামান্তর। উহাই সততা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন ঃ "চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—সাতসমুদ্র যত নদী পুকুর সব ভরপুর, তবু সে জল খাবে না। বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে।" হ্যাঁ, জীবনের মহান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঐ নিরঙ্কুশ অকপটতা, ঐ 'চাতকতা' সততার সংজ্ঞা এবং উপমা।□

ভাষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ : আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ

স্বামী ভূতেশানন্দ

বর্তমানে দেশে বিদেশে নানা স্থানে ভক্তদের চেষ্টায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ থেকে একটি বিষয় সূচিত হচ্ছে যে, দিকে দিকে তাঁর ভাব ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কোন স্থানবিশেষের সম্পদ নন, তিনি সর্বজগতের মহান আদর্শ। এই আদর্শের প্রকাশ আমরা ধীরে ধীরে অনুভব করতে পারছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুরের এক দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সেই পরিবেশ আর আজকের কামারপুকুরে তাঁর বাসগৃহের পরিবেশের কত পার্থক্য! সেখানে যে একটি সুন্দর মন্দির গড়ে উঠেছে সেটা তত বড় কথা নয়, তার চেয়েও বড় কথা হলো, তাঁর ভক্তরা তাঁকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে কিভাবে আনন্দ অনুভব করছেন। স্বামীজী বলেছিলেন : "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"। এখন মনে হচ্ছে, সারা বিশ্বের কেন্দ্র হতে চলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে অগণিত নরনারী আজ ভারতবর্ষে আসছেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে পড়াশোনা করছেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আজ আধ্যাত্মিকতার মূর্ত বিগ্রহ হয়ে জগতের সামনে প্রতিভাত। শ্রীরামকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র বললে নিতান্ত গোঁড়ামি মনে হবে না। তাঁর বিভূতি অসাধারণ। তিনি স্বয়ং বলেছেন, এখানে যা দেখছ এরকম আর কোথাও নেই। তাঁর সম্বন্ধে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন : অন্য জায়গায় এক আনা কি আধ আনা, আর এখানে পেটভরা, হেউ-ঢেউ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের এই 'হেউ-ঢেউ' চলছে চারদিকে। এটি আমাদের পক্ষে যেমন আনন্দের তেমনি প্রণিধানেরও বিষয়। আমাদের অন্তরে আমরা তাঁকে কতখানি গ্রহণ করতে পারছি সেটাই ভাববার বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বলে নিজেদের যখন পরিচয় দিই তখন ভাবতে হবে তাঁর আদর্শ আমাদের ভিতরে কতখানি প্রকাশিত। আমরা মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকি, কিন্তু হৃদয়মন্দির শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন, মার্জিত করেছি তো? তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁর আসনকে তাঁর অধিষ্ঠানের যোগ্য করে তুলতে হবে। সে-চেষ্টা করছি কি? নিজ নিজ অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে সেখানে তাঁর প্রভাব কতখানি গভীর। তাঁরই ভাষায়, "কেবল শাঁখ ফুঁকে গোল" করলে হবে না, হৃদয়মন্দির শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন করে তাঁকে সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি যখন আমাদের তাঁর পদপ্রান্তে নিয়ে এসেছেন তখন তাঁর কৃপা থেকে নিশ্চয়ই কেউ বঞ্চিত হব না।

আমরা যেমন যেমন আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হব তেমন তেমন তাঁর আদর্শ, তাঁর ভাবমূর্তি আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবে। তাছাড়া তাঁর আদর্শ প্রসারের ফলে আমাদের দায়িত্বও বাড়ছে—'আমরা' বলতে শুধু রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরা নন, যাঁরাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি হৃদয়ে ধারণ করে সংসারে আছেন তাঁদের সকলেরই। তাঁদের ভিতর দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সাধারণের অর্থাৎ যাঁরা এখনো তাঁর সম্বন্ধে অবহিত নন, তাঁদের ধারণা হবে। কাজেই এটি একটি মহান দায়িত্ব। ঠাকুরের সেবা, তাঁর প্রতি নিষ্ঠা কেবল মন্দিরের পরিধির ভিতরেই সীমিত থাকবে না, সর্বক্ষেত্রে সকলের প্রতি প্রসারিত হবে। প্রতি জীবকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীকরূপে দেখে তাঁর সেবার মনোভাব নিয়ে তাঁদের সেবা করতে পারব কি? একদিকে তাঁর সেবার আদর্শ আরেকদিকে শুদ্ধ অন্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠা—এই দুটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংশ্লিষ্ট। অন্তর যত শুদ্ধ হবে তত স্পষ্টভাবে তাঁর আদর্শ ধারণা করতে পারব; ধারণা করতে পারলে জগতের কল্যাণ কি করে হবে, কিভাবে মানুষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করতে পারব সে-বিষয়ে সঠিক উপলব্ধি হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে, তাঁরা খুব ভাল ভাল কাজ করছেন। ঠিক কথা, কিন্তু সেই কাজের উৎস কোথায়? উৎস হলো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁদের ভাব থেকে প্রেরণা পেয়ে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন সেবার কাজ করছে। যদি আমরা তাঁদের প্রদর্শিত আদর্শের দিকে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখি তাহলে আমাদের কাজে ত্রুটি থাকবে না, 'সেবা' তখন 'পূজা'য় পরিণত হবে। অন্তরে এবং বাইরে একযোগে তাঁকে যুক্ত করে সাধনজীবনে অগ্রসর হতে হবে, যে-জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মানুষের সেবা—দুটি আদর্শ অভিন্নভাবে যুক্ত থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্ত ভাবমূর্তিকে আমরা সঙ্কুচিত করতে পারি না। বিভিন্ন মানুষ অন্তরের প্রবণতা অনুসারে তাঁর এক-একটি আদর্শকে গ্রহণ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে যে যতটুকু বুঝতে পারবে তাতেই তার

কল্যাণ হবে। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলেছেন : "তোরা কি ভেবেছিস যে, তোরা এক-একটি রামকৃষ্ণ হবি? সে সাতমন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।" আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে কেউ-ই পারব না। কিন্তু যে যতটুকু পারি, সেই আলোকরশ্মির একটি কণাও যদি নিতে পারি তাতেই আমাদের জীবন আলোকিত হবে এবং তাঁর ভাব আমাদের সমস্ত কর্মে দিগ্‌দর্শন করাবে।

প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপা আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক। শ্রীশ্রীমা আমাদের ওপর তাঁর কল্যাণদৃষ্টি দিন এবং স্বামীজী তাঁর প্রবল শক্তি-সামর্থ্য আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করুন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব আমাদের জীবনে সার্থক হোক।★□

★ গত ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ সরিষা (জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির স্থাপনের তাৎপর্য' প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ। প্রসঙ্গতঃ, ঐদিন পূর্বাহ্নে পূজ্যপাদ মহারাজজী নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট কালীমূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে এটি চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান : হৃদয়, চক্র : অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির নৃসিংহদেবের পূর্বপুরুষ বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হংসেশ্বরী-মন্দিরের একটি আত্মিক সম্পর্কের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পুজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দুর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ডাঃ বসন্ত মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলংকরণ : স্লিনিটি সিদ্দিকোতী

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি : চৈত্র ১৪০২ সংখ্যার পর]

সাধু ও গৃহি-ভক্তদের সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। একদিন মঠবাড়ির উঠনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ ওপর থেকে গোলা রং পড়ল মহারাজের পায়ের কাছে। ছাদের ওপরে, আশ্রমের চারদিকে খোঁজা হলো—কেউ কোথাও নেই। ভদ্রলোকও অবাক, আমরাও অবাক। কোথা থেকে রং এল? কে রং দিল? মহারাজ বললেন : "আজ কি দোলপূর্ণিমা?" পঞ্জিকা দেখা হলো। দেখা গেল সত্যিই সেদিন দোলপূর্ণিমা। ভুবনেশ্বর তখন জঙ্গল। মঠের চারপাশেও জঙ্গল; মানুষজন নেই। মঠে বিশেষ কেউ আসেও না। আমরাও কবে কোন্ তিথি কেউ খোঁজ রাখতাম না। কিন্তু ভগবান তাঁর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ায় তাঁর অংশে জাত ব্রজের রাখালকে হোলির দিনটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আবির কিনে এনে ঠাকুরকে নিবেদন করে সবাইকে রং খেলতে বললেন। তাঁর নির্দেশে লিঙ্গরাজ মন্দিরের কাছে একটি দোকান থেকে আবির কিনে আনলাম। ঠাকুরকে নিবেদন করে বাকিটা মহারাজের পায়ে সবাই দিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : "এটা কি রং খেলা হলো?" বলে নিজেই খানিকটা আবির তুলে নিয়ে আমাদের মুখে কপালে মাখিয়ে দিলেন। সেদিন মহারাজকে খুব উৎফুল্ল এবং আনন্দময় দেখেছিলাম। তাঁর নির্দেশে মন্দিরে নন্দদুলালের গান ধরলাম। বেলুড় মঠে থাকলে মহারাজ হোলির দিন মহাপুরুষ মহারাজকে (স্বামী শিবানন্দকে), গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) থাকলে তাঁকেও, আবির ও রং দিতেন। মহাপুরুষ মহারাজও বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে বলতেন : "বাঃ! বাঃ! বেশ, বেশ! চমৎকার, চমৎকার!"

মঠে আজ ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। আমরা যখন মঠে এসেছি তখন কী দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছি! কিন্তু আমরা কখনো ঐসব নিয়ে ভাবতাম না। খাওয়া-থাকার সুবিধা-অসুবিধা তখন গৌণ ব্যাপার ছিল। মুখ্য ব্যাপার ছিল মহারাজ ও ঠাকুরের সাক্ষাৎ পার্ষদ্‌দের সান্নিধ্যলাভ, ঠাকুরের সেবা। ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের সান্নিধ্যে থাকা-খাওয়ার কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হতো না। মহানন্দে মন ভরে থাকত। মহাপুরুষদের সান্নিধ্যের এমনই প্রভাব! এই সময় সকালে কলাইকরা গ্লাসে এক গ্লাস করে কালো চা, সঙ্গে ছোট্ট কৌটোর এক কৌটো মুড়ি, দুটি প্রসাদী বাতাসা কখনো কখনো। কিন্তু শেষের দিকে যারা আসত তাদের ভাগ্যে এই মুড়িও জুটত না। দুপুরেও ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল ও বাগানের শাকপাতা দিয়ে একটা চচ্চড়ির মতো। কোন-কোন দিন টক আমড়ার অম্বল। রাত্রে রুটি-ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। সবকিছুর মধ্যেই তখন দারিদ্র্যের ছাপ। মঠের কাজকর্ম দেখাশোনা-তদারকি করতেন বাবুরাম মহারাজ। খুব সম্ভব মহাপুরুষ মহারাজ তখন কাশীতে ছিলেন। বাংলাদেশে হোমিওপ্যাথির পথিকৃত মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয় তখন মঠের অতিথি হয়ে আছেন। তাঁর তখন স্ত্রীবিয়োগ ও নানান বিপর্যয় ঘটে গেছে। শান্তির প্রত্যাশায় মঠবাস ও সাধুসঙ্গ করছেন। প্রত্যহ রাজা মহারাজের দর্শনাদি, প্রণাম, জপধ্যান করেন। বাবুরাম মহারাজের স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সম্পত্তি, টাকা-পয়সা অনেক কিছু ঠাকুরের কাজে দান করে দিতে চান। মহেশবাবুর এই ইচ্ছার কথা রাজা মহারাজকে জানালেন বাবুরাম মহারাজ। রাজা মহারাজ সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন : "বাবুরামদা, গৃহস্থব্যক্তি সাধুসঙ্গ ও মঠবাস করে মনে বৈরাগ্য নিয়ে তার কষ্টার্জিত সম্পদ ত্যাগ করতে চাইছে, আর আমরা—সন্ন্যাসী, অপরিগ্রহ আমাদের আদর্শ—গৃহস্থের ঐশ্বর্যে লুব্ধ হয়ে আমাদের আদর্শকে ভুলতে চাইছি! আপনিই ঠিক করুন না বাবুরামদা, কোন্‌টি শ্রেয়।" বাবুরাম মহারাজ সসঙ্কোচে বলে উঠলেন : "ও হোঃ বুঝেছি—যেমন আছে

তেমনিই থাকবে, তাহলে মহেশবাবুর বৈরাগ্য আরও বৃদ্ধি পাবে ; জগতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য আর সব অনিত্য—এটি বোধে বোধ হবে। আমাদের তিতিক্ষাও বৃদ্ধি পাবে।"

প্রতিটি ব্যাপারেই মহারাজের সিদ্ধান্ত ছিল হিমালয়সদৃশ দৃঢ়, গম্ভীর, ধীর-স্থির ও নিশ্চিত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। এই স্বভাব তাঁর সহজাত ছিল অবশ্যই, তবে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আরও বলশালী করেছেন, স্বামীজী আরও আত্মপ্রত্যয়ী হতে শিখিয়েছেন। গুরুভাইদের মধ্যেও যখন কোন বিষয়ে আদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্টতার আভাস দেখতেন তখন তিনি এধরনের কথা বলতেন।

তখন মঠে নিবেদিতার কাজকর্ম নিয়ে নানান দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে। স্বামীজীর দেহান্ত হয়েছে। নিবেদিতা অনেক সক্রিয় বিখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করছেন। পরবর্তী কালে অনেক সক্রিয় বিপ্লবী তাঁদের আগের জীবন ত্যাগ করে স্বামীজীর আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনের ধ্রুবতারা-জ্ঞানে সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন। যাই হোক, নিবেদিতার কাজে মঠের ওপর ব্রিটিশ সরকারের শ্যেন দৃষ্টি, মঠ তুলে দেওয়া হবে—এরকম আশঙ্কা। শরৎ মহারাজকে পরবর্তী কালে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে, এখান থেকে কোনরূপ রাজবিদ্রোহী কাজ হয় না। এটি অধ্যাত্মচিন্তার স্থান, এখান থেকে দুঃস্থ-পীড়িত মানুষের সেবা হয়, ইত্যাদি। স্বামীজী একদিকে যেমন বিপ্লবীদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের জন্য আত্মনিবেদন করতে বলছেন, 'অভীঃ' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে বলছেন, অন্যদিকে তাঁর গুরুভাইদের বারবার সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন : তোমাদের জীবনের মন্ত্র 'বহুজনসুখায় বহুজনহিতায়'। তোমরা সহনশীলতা, ধৈর্য-স্থৈর্য, ক্ষমা ও উদারতার পরাকাষ্ঠায় 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই মহামন্ত্রের দ্বারা জীবের মধ্যেই শিবের সন্ধানে শরীরপাত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে।—এই তাঁর বাণী, এই তাঁর নির্দেশ। ওদিকে সন্ন্যাসিসঙ্ঘের মধ্যে থেকেও নিবেদিতা স্বামীজীরই প্রেরণায় ভারতমাতার বন্ধনমোচনে নিজেকে বলি দিতে বদ্ধপরিকর। সব শুনে রাজা মহারাজ তাঁকে মঠে ডাকলেন। স্বামীজীর ঘরের লাগোয়া গঙ্গার দিকের খোলা বারান্দায় রাজা মহারাজ গম্ভীরভাবে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। নিবেদিতা তাঁর পাদবন্দনা করে মেঝেতে বসলেন। মহারাজের দিকে তাঁর সপ্রশ্ন দৃষ্টি। স্নিগ্ধকণ্ঠে মহারাজ বললেন : "মার্গট, তুমি সন্ন্যাসের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, সন্ন্যাসিসংস্থার একজন সভ্যা। নিজেকে বড় বেশি রাজনীতি ও সক্রিয় বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছ নাকি?" নিবেদিতার চোখ রাজা মহারাজের পায়ের দিকে। শান্ত ধীর কণ্ঠে নিবেদিতা উত্তর দিলেন : "স্বামীজী আমায় ভারতমাতার কাজের জন্য এভাবেই তো উৎসর্গ করেছেন, মহারাজ!" রাজা মহারাজ ততোধিক শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : "মার্গট, স্বামীজী আমাদের বারবার সতর্ক করেছেন। বহুবার, বহু পত্রে নির্দেশ দিয়েছেন, মঠের সদস্যরা রাজনীতি বা কোনপ্রকার বিপ্লবের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে না। তার কাজ সকল জীবের মধ্যে শিবের উপস্থিতি বোধে আমরণ সেবা করা।" উভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। নিবেদিতার আনত মুখমণ্ডল, ছলছল চোখ। শান্তভাবে তিনি রাজা মহারাজকে প্রণাম করে উঠে গেলেন। পরের দিন পত্রিকাতে বিবৃতি দিলেন : "রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমার কোনপ্রকার সম্পর্ক নেই। আমার কোনপ্রকার কাজকর্মের জন্য মিশন দায়ী নয়।" এইভাবে ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিন্ন হলেও শেষদিন পর্যন্ত রাজা মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বরাবর তাঁর হার্দিক সম্পর্ক ছিল, মঠে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মঠ-মিশন ছিল নিবেদিতার প্রাণ। ঠাকুরের পার্ষদগণ ছিলেন তাঁর পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদের কাছেও তিনি ছিলেন পরম স্নেহের পাত্রী। শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি'। মহারাজ এবং শরৎ মহারাজ স্বামীজীর 'কমপ্লীট ওয়ার্কস'-এর 'ভূমিকা' লিখিয়েছেন তাঁকে দিয়ে। কতখানি স্নেহ এবং আস্থা থাকলে তবে এটি সম্ভব তা বুঝে দেখতে হবে।

একদিন সন্ধ্যার মুখে মহারাজ বললেন : "সুধী, সন্ধ্যারতির কত দেরি?" আমি বললাম : "মিনিট বিশেক বাকি।" মহারাজ বললেন : "আমার খুব খিদে পেয়েছে, কয়েকটা গরম লুচি খাওয়াতে পারিস?" অসম্ভব আর্জি জেনেও 'আচ্ছা মহারাজ' বলে নিচে দৌড়ে গেলাম। রান্নাঘরের কাছে একটা তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছিল। ভাণ্ডারীকে বলে সেটা নিয়ে এলাম। তখন মঠবাড়ির সিঁড়ির নিচে এখন যেখানে টেলিফোন, ঐ জায়গায় রাজা মহারাজের রান্নার টুকিটাকি সব থাকত। দু-তিন মিনিটের মধ্যে কড়াইতে অল্প জল দিয়ে আঁচে বসিয়ে তাতে একটা বড় আলু সরু করে কেটে সেদ্ধ করতে দিলাম এবং একমুঠো ময়দায় ঘি ঘষে জল মাখিয়ে চারটি গোল্লা বানালাম। একটা স্টোভ ধরিয়ে কড়াইতে ঘি দিলাম। হাতে ময়দার গোল্লাগুলি বেলে

নিয়ে গরম ঘিতে গোটা চারেক লুচি ভেজে নিলাম। ইতিমধ্যে ঐ বাড়তি গরম ঘিতে ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ আলুর কুচিগুলোও ভেজে নিয়ে একটা প্লেটে চিনি, আচার ও ভাজা লুচি চারটি, একগ্লাস জল, আলুভাজা নিয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি তখন দেওয়াল-ঘড়িতে দেখলাম আরতি হতে তখনো কয়েক মিনিট দেরি আছে। টেবিলের ওপর খাবার সাজিয়ে খেতে দিতে মহারাজ মহা খুশি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ "সুয্যি, তুই আজ আদর্শ গুরুসেবা দেখালি, বাবা। যদি এই গুরুসেবা ও নিষ্ঠার জন্য কারুর ব্রহ্মজ্ঞান হয় তবে আমি বলছি তোর সবার আগে হবে।"

তাঁর কৃপায় জীবন তো কাটিয়ে দিলাম, এখন হাত ধুয়ে বসে আছি। কবে তিনি কৃপা করবেন সে-ভাবনা আমার নয়, তাঁর। আমি তো জানি—আমার নিজের কিছুই নেই। সবই তাঁর, সবই তাঁদের। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজী, জয় মহারাজ!

ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মঠ ও মিশনের একান্ত ভক্ত ছিলেন। যখনই তাঁকে ডাকা হতো তখনই সাধুদের দেখতে যেতেন। শ্রীশ্রীমায়ের চিকিৎসাও তিনি করেছেন। ঐকালে মঠের যে-কয়জন ভক্তের গাড়ি ছিল ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাঁদের অন্যতম। তাঁর গাড়িতে মহারাজকে অনেকবার তিনি ঘুরিয়েছেনও। ডাক্তার কাঞ্জিলাল সাধুসঙ্গ করতে করতে, সাধুদের স্নেহ-ভালবাসা পেতে পেতে সন্ন্যাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর মনের এই বাসনাটি যখন প্রবল হলো তখন একদিন মহারাজকে ধরে বসলেন, সংসারে থেকেও সন্ন্যাস নেওয়া যায় কিনা। মহারাজ তাঁর প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে বললেন ঃ "তা নেওয়া যায়, তাকে কৌলসন্ন্যাস বলে, এটি তান্ত্রিক মতে। আশ্রমে ও সংসারে দু-জায়গাতেই থাকা যায়। তবে কি জান? মান-যশ, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহগুলো না ছাড়লে সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক নয়। জনক রাজা কি সবাই হতে পারে?" ডাক্তারবাবু সেদিন কিছু না বললেও পরে মহারাজকে ধরে বসলেন ঃ "আমাকে কৌলসন্ন্যাস দিন।" মহারাজ হেসে, তামাসা করে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু ডাক্তার নাছোড়। পরে একদিন তাঁর পীড়াপীড়িতে বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে (স্বামী হরিহরানন্দ) সব অনুষ্ঠানাদি করতে বললেন—মঠেরই গঙ্গাতীরে। এখন যেখানে স্বামীজীর মন্দির তার পিছনে গঙ্গার ঢালে দু-তিন ঝাড় করবীফুলের গাছ ছিল। সেখানেই গোবর দিয়ে নিকিয়ে সব আয়োজন করে তান্ত্রিক মতের অনুষ্ঠানাদি রাত্রি ৯টার পর আরম্ভ হলো। ডাক্তার কাঞ্জিলালও স্নানাদি সেরে একটি আসনে উপবিষ্ট। মধ্যরাত্রিতে পূজাদি অনুষ্ঠান প্রায় শেষ। "শিবাবলি" দেওয়া হয়েছে। পূজারী ধ্যান করছেন, এমন সময় ডাক্তারবাবুর আর্ত ভীত স্বর শুনে বিশ্বরঞ্জন মহারাজ তাকিয়ে দেখলেন—রামছাগলের মতো বিরাট চেহারার দুই শিয়াল "শিবাবলি"কে পিছনের পায়ে করে আঁচড়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। এই ঘটনায় সন্ন্যাস-অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হলো। রাজা মহারাজ যখন সব শুনলেন তখন মৃদু হেসে বললেন ঃ "ডাক্তার, আমি জানতুম, হবে না। তবু তোমার নিজের চোখে দেখা প্রয়োজন ছিল। দেখ ডাক্তার, 'মনের ত্যাগই ত্যাগ, কলির তপস্যা সত্যকথা'—এসব তো ঠাকুর বলে গেছেন। তুমি বাহ্যচিহ্নের জন্য এত কাতর কেন, তোমার স্টেথোস্কোপ যদি আমি গলায় নিয়ে ঘুরি, আমায় কি মানাবে?" মহারাজ যতদিন ইহলোকে ছিলেন ডাক্তার কাঞ্জিলাল আর কখনো সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলেননি। কিন্তু তাঁর দেহাবসানের পর 'উদ্বোধন'-এ গিয়ে শরৎ মহারাজকে ধরলেন। শরৎ মহারাজও তাঁকে নিরস্ত করেন। কিন্তু তাঁর বারংবার পীড়াপীড়িতে শরৎ মহারাজ একজন সাধুকে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর পাশে সন্ন্যাসের আয়োজন করান। তাতেও অনেক বাধা-বিপত্তি আসে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডাক্তার কৌলসন্ন্যাস গ্রহণও করেন। কিন্তু আমরা জানি, তাঁর জীবনের শেষের দিকে নানা বিঘ্ন ও অসুখকর ঘটনা ঘটেছিল। এজন্যই রাজা মহারাজ জোর করে কোন কিছু করতে মানা করতেন। জোর করে সাধ্যাতীত ধ্যানজপ করতেও মানা করতেন। দু-একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, যারা মহারাজের নিষেধ সত্ত্বেও বেশি ধ্যানাদি প্রাণায়াম করেছে, তাদের মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে। শুধু মহারাজই নন, ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদের নিষেধ সত্ত্বেও যারা সেসব করেছে, তাদেরও ঐ পরিণতি হয়েছে।

ঠাকুরের পার্ষদদের দেখেছি, তাঁরা খুব simple (সাধারণ) ভাবে থাকতেন। আমাদের সাথে এমনভাবে মিশতেন যে, আমরা তাঁদের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি কিছুই মনে করতাম না, অবশ্য তাঁরা এসব বুঝবার সুযোগও দিতেন না আমাদের। শরৎ মহারাজ সেক্রেটারি —একটু পাশেই বসে আছেন, আর আমরা শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছি। সমীহ করতে হতো না। তাঁরা আমাদের খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং খুবই sympathetic (দরদী) ছিলেন। [ক্রমশঃ]

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ চৈত্র ১৪০২ সংখ্যার পর]

বরানগরে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির রয়েছে। তাদের মধ্যে শিবমন্দিরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।[১৮] বরানগরের কয়েকটি অংশে মুসলমান প্রভাবের ছাপও সুস্পষ্ট। যেমন—আলমবাজার, মসজিদ বাড়ি লেন, হাতেম মুন্সী লেন, নৈনান মুসলমানপাড়া লেন, শাহিবান বাগিচা ইত্যাদি।[১৯] কয়েকটি মসজিদ, কবরখানা ও দরগাও বর্তমান। জনপ্রবাদ, আলমবাজার নামের উৎস ফকির শাহ আলম, যিনি ঐ অঞ্চলে বাস করতেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমান দেশবন্ধু রোডের প্রাক্তন নাম ছিল হেজার (Hedger) রোড। হেজার সাহেব ছিলেন প্রসিদ্ধ মদ্যব্যবসায়ী। সূর্য সেন রোডের ভূতপূর্ব নাম হেস্টি (Hastie) রোড। হেস্টি সাহেব ২৪ পরগনার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও জুট মিলের ম্যানেজার ছিলেন। জুট মিলের বড়সাহেব ও বরানগর পৌরপ্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ম্যাকফারসন সাহেবের নামে হয়েছিল ম্যাকফারসন রোড। রাস্তাটির বর্তমান নাম অমৃতলাল দাঁ রোড। ভিক্টোরিয়া রোডের বর্তমান নাম মহারাজ নন্দকুমার রোড।

আলোচ্য কালে আলমবাজার-দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বিত্তবান ব্যক্তির বাড়ি, সখের বাগানবাড়ি, ফুলবাগিচা ইত্যাদি ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলমবাজারের চ্যাটার্জী বাড়ি, বাগচি বাড়ি, বিনোদলাল ঘোষের বাড়ি, প্রামাণিক বাড়ি, সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ি, শম্ভু মল্লিকের বাগানবাড়ি, যদুলাল মল্লিকের বাগানবাড়ি, প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগান ইত্যাদি।

আলমবাজার মঠবাড়ির প্রবেশদ্বার রামচন্দ্র বাগচি লেনের ওপর। এই গলিতে অবস্থিত ছিল একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রামচন্দ্র বাগচির দুই পুত্র—কেদারনাথ ও কালোধন। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কেদারনাথ বাড়ির প্রাঙ্গণে গড়ে তুলেছিলেন একটি নাট্যমঞ্চ। কয়েক দশক ধরে এই মঞ্চে বিবিধ নাটক ও সঙ্গীতের আসর বসেছিল। বিনোদলাল ঘোষ ছিলেন বোর্নিও কোম্পানির জুট মিলের এক কর্তাব্যক্তি। তিনি রামচন্দ্র বাগচি লেনে মাতুলস্থানীয় যদুনাথ ব্রহ্মের বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। ধার্মিক বিনোদলাল বাড়িতে খুব ঘটা করে দুর্গাপূজা করতেন। পূর্বে উল্লিখিত জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র কানাইলাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র অমূল্যধন একটি বড় ঠাকুরদালান তৈরি করেছিলেন। সেটা অবশ্য ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। এই চাটুজ্যে-বাড়িতেও নামকরা সঙ্গীতজ্ঞদের আসর বসত।[২০] বলা বাহুল্য, এসব স্থানীয় বিত্তবান ও সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে মঠবাসীদের যোগাযোগ সামান্যই ছিল।

ঐ অঞ্চলে গঙ্গানদীতে ফেরি স্টীমার সার্ভিস প্রথম চালু করে কলকাতা পোর্ট কমিশনার্স। চালু হয়েছিল ১৯০৯-১৯১০ খ্রীস্টাব্দে। তখনো বাস চালু হয়নি। ফলে আলোচ্য কালে কলকাতা থেকে আলমবাজার মঠে কম খরচে আসার দুটি উপায় ছিল। শোভাবাজার থেকে বরানগর পর্যন্ত ছ্যাকড়া গাড়ি পাওয়া যেত, শেয়ারের গাড়িতে মাথাপিছু ভাড়া ছিল চার পয়সা। অধিকাংশ ব্যক্তি বরানগর থেকে আলমবাজার হেঁটে যেত, অর্থবানরা যেত ঘোড়ার গাড়িতে। দ্বিতীয় উপায় ছিল গঙ্গাপথে গহনার বা শেয়ারের নৌকা। আলমবাজারে বেণী পালের ভাড়া খাটানোর ঘোড়াগাড়ির একটি আস্তানা ছিল। সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণতঃ কলকাতায় যাতায়াত করতেন। মনে হয়, এই আস্তানাটি ১৮৯০-এর দশকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বোধ করি একথা স্মরণ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বর্তমান বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের আকর ব্রহ্মানন্দ বালকাশ্রম আলমবাজারে পাঁজাদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে।[২১]

কাশীপুর উদ্যানবাটী ও বরানগরের পর মঠ আসে আলমবাজারে। এ-পর্যায়ের শেষের দিকে মঠের ভোল পালটে গেল, পরিবর্তিত মঠের রূপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠল তৎপরবর্তী পর্যায়ে, মঠ তখন গঙ্গার অপর তীরে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে। অবশ্য মঠের ভবিষ্যরূপের

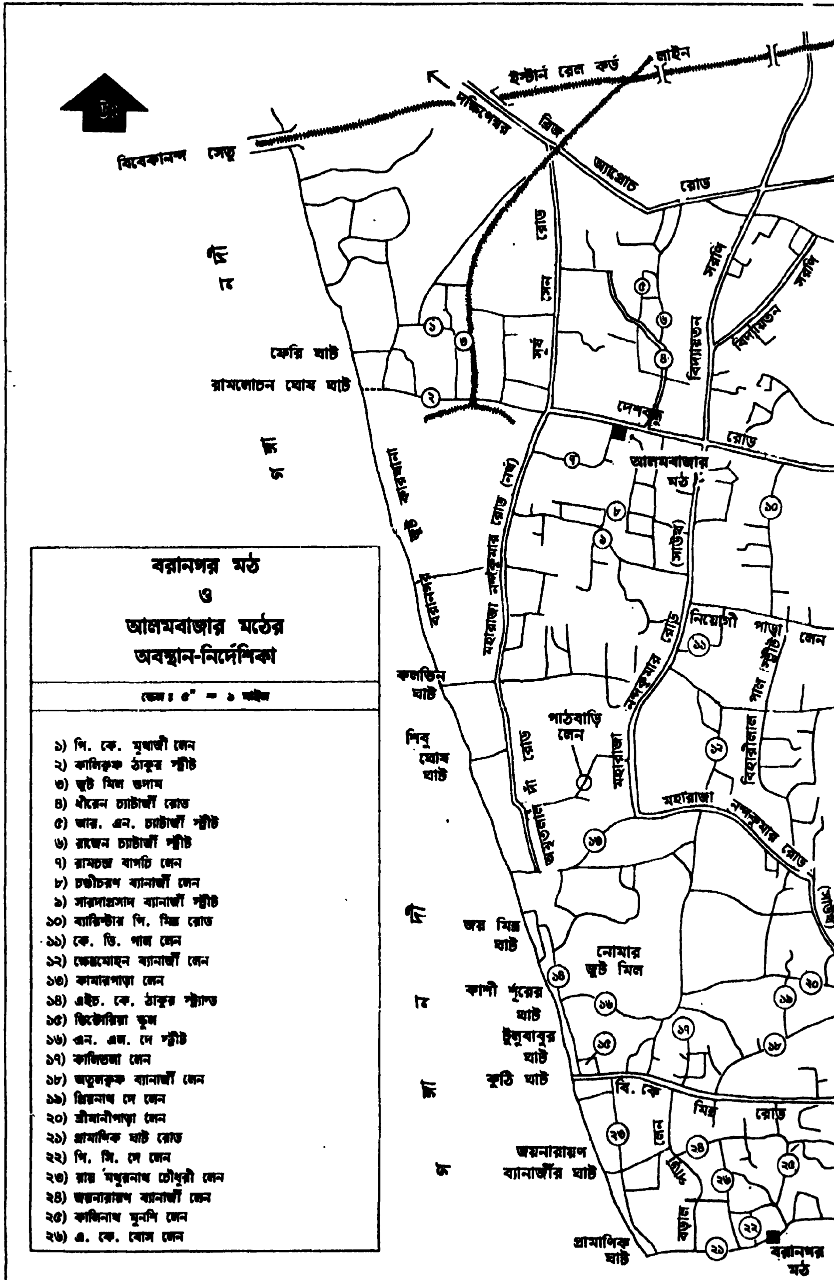
১৮ আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ বরানগর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮ ১৯ ঐ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ১

২০ এল. এস. এস. ও'ম্যালি (L. S. S. O'Malley) এবং বরুণ দে-কৃত দুটি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র (২৪ পরগনা) থেকে সামান্য তথ্য এবং সমীক্ষা পরিষদ্-প্রকাশিত 'বরানগর, ইতিহাস ও সমীক্ষা' থেকে অনেক তথ্য গৃহীত হয়েছে।

২১ বরানগর পৌর শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ, ১৯৭০, পৃঃ ৪৬

প্রকৃত আদল পাওয়া গিয়েছিল বেলুড় গ্রামে নিজস্ব জমিখণ্ডে মঠ সংস্থাপনের পরে।

মঠের এই বিবর্তন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে। কার্ল বেকার (Carl Beeker) নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত তাঁর 'Everyone His Own Historian' গ্রন্থে (পৃঃ ২৫৩) মন্তব্য করেছেন ঃ "The appropriate



trick for any age is not a malacious invention to take anyone in, but an unconscious and necessary effort on the part of the society to understand what it is doing in the light of what it has done and what it hopes to do." এ-দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা রামকৃষ্ণ মঠের বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়—আলমবাজারে অবস্থানকালে মঠজীবনের বিকাশ জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করব। দেখতে পাব, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আদর্শ নতুন এক আলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল মঠবাসীদের সম্মুখে। নেতা নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শের গভীরতর ও মহত্তর তাৎপর্য গুরুভাইদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। মঠবাসিগণ সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য মঠবাসিগণের অধিকাংশ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণরূপী জগদম্বার ইচ্ছানুসারে মঠজীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। নেতা স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, মঠ থেকে সমুত্থিত মহাতরঙ্গ মহাপ্লাবনের ন্যায় সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত করে মুক্তিপথে নিয়ে যাবে এবং প্রাণপণে এর সাধনেই তিনি ও তাঁর গুরুভাইগণ কটিবদ্ধ।

আলমবাজার মঠের সূচনা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের কিছুদিন আগে এবং সমাপ্তি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ আলমবাজার মঠের আয়ুষ্কাল প্রায় ছয়বছর। এই ছয়বছর মঠের বিকাশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবৃত্তকাল। এই কালেই মঠজীবনের গতিমুখ স্থায়িভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, সুমহান এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মঠবাসিগণ অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই কালের ঘটনাতরঙ্গগুলি সমনস্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনটি কালানুক্রমিক পর্যায়। একটি পর্যায়ের সঙ্গে অপর পর্যায়ের পার্থক্য অবশ্যই ছিল। সময়ানুযায়ী পট পরিবর্তন এবং সেই সময়সীমার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল সেই পার্থক্য। অবশ্য পর্যায়গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় এবং তাদের মধ্যে গ্রথিত পারম্পর্যের সূত্রটির প্রতি দৃষ্টি না রাখলে সামগ্রিক রূপটি আমরা ধরতে পারব না।

পর্যায় তিনটির কালসীমা মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ: (ক) ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৯৪-র এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়। ১৮৯২-এর ফেব্রুয়ারিতে আলমবাজারে মঠের স্থানান্তরের দুবছর পর ১৯ মার্চ তারিখে মঠবাসীদের উদ্দেশে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা প্রথম চিঠিখানি মঠজীবনে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ইতিমধ্যে বিশ্বমঞ্চে বিবেকানন্দ-শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, স্বদেশে অভাবনীয় আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror) পত্রিকা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সংখ্যায় ঘোষণা করল: "Among those who created the greatest stir at Chicago was Swami Vivekananda"। আলমবাজারের শান্ত মঠ-জীবনে এই সংবাদ প্রবল স্পন্দন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

আলমবাজারের প্রথম দুবছর ছিল বরানগর মঠেরই সম্প্রসারিত অংশ। ভারতীয় সন্ন্যাসজীবনের পরম্পরা ছিল সেখানে প্রধান। প্রব্রজ্যা, শাস্ত্রচর্চা, তপশ্চর্যা ইত্যাদি আশ্রয় করে মঠবাসিগণ আত্মমুক্তির সাধনায় নিরত ছিলেন।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা এপ্রিল ১৮৯৪ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ পর্যন্ত। ১৮৯৪-এর এপ্রিলে মঠবাসিগণ তাঁদের প্রিয় নেতা নরেন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি পেয়েছিলেন, আর ১৮৯৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নেতা স্বশরীরে আলমবাজার মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। মধ্যবর্তী প্রায় তিনবছর চারমাস কাল স্বামী বিবেকানন্দ-প্রেরিত প্রেরণা-গোলকগুলির বর্ষণ মঠবাসীদের কখনো শিহরিত, কখনো বা উত্তেজিত করে তুলেছিল। মঠবাসীদের এবং গৃহি-ভক্তদের অনেকে এক মহিমময় ভবিষ্যতের ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ সাফল্যে আনন্দ ও গর্ববোধ করছিলেন। কিন্তু মঠজীবনের দুর্বোধ্য ভবিষ্যৎ কল্পনা করে কয়েকজন যে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি, নেতা বিবেকানন্দ কি চাইছিলেন তা তাঁর গুরুভাইদের কেউই যেন স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিলেন না।

বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা যেতে পারে। গুরুভাইরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে মুখ্যতঃ বেদান্তধর্ম, বিশেষতঃ অদ্বৈততত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জন্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রচার সমর্থন করতেন না। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজী আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে জনসমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রায় কিছু বলেননি, যাও বা তিনি প্রচার করেছিলেন তা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ-সম্পর্কিত; অথচ এই বিবেকানন্দকে দেখা গিয়েছিল আলমবাজার মঠবাসীদের এবং মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যত্র তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য অনুরাগীদেরকে লেখা চিঠিপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতারশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী।

তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য খ্যাপন করতে তিনি মহোৎসাহী, জগৎকল্যাণে তাঁর জীবনসাধনা সমর্পণ করতে প্রবলভাবে প্রয়াসী। মা সারদামণি সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রবল ভক্তি গুরুভাইদের বিস্মিত করেছিল। তিনি ব্রহ্মানন্দজীকে লিখেছিলেন ঃ "যাঁর তাঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) বিশ্বাস নাই আর মা-ঠাকুরানীতে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙলা বল্লুম, মনে রেখো।"[২২] তৃতীয়তঃ, ১৮৯৪-এর মধ্যভাগ থেকেই স্বামীজী গুরুভাইদের জগদ্ধিতায় আত্মদান, দরিদ্র পতিত মানুষদের নরনারায়ণ-জ্ঞানে সেবা, অবহেলিত পদদলিত পুরুষ ও নারীদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়ে প্রোৎসাহিত করছিলেন এবং এসকল কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এসব দেখেশুনে মঠের গুরুভাইদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কেউ বা বিরূপ ভাবনার শিকার হয়েছিলেন। তাঁদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য তাঁরা তেজস্বী ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। গিরিশচন্দ্র একটি চিঠি লেখেন স্বামীজীকে। তাঁর সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে গিরিশচন্দ্র মঠের গুরুভাইদের একজনকে লিখে জানালেন যে, নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ঠাকুরের নরেন্দ্র নির্ভেজাল ছিলেন এবং রয়েছেন।[২৩]

(গ) তৃতীয় পর্যায় ১৮৯৭-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৯৮-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কালের মধ্যে সীমিত। শেষোক্ত দিনটিতে মঠ উঠে গিয়েছিল গঙ্গার পূর্বকূল থেকে পশ্চিমকূলে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, তিনি ঘুমন্তপ্রায় ভারতের বিশাল জনসমষ্টির ওপর হিমবাহের মতো নেমে আসবেন এবং পরিণতিতে ভারতবাসী জেগে উঠবে। সমগ্র দেশের মানুষ তাঁর মর্মবাণী সঠিক বুঝতে না পারলেও আলমবাজার মঠের অধিবাসীরা সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। তাঁদের সত্যসত্যই মনে হয়েছিল যে, তাঁদের প্রিয় নরেন্দ্র বিবেকানন্দরূপ ধারণ করে প্রচণ্ড শক্তিশালী হিমবাহের মতো মঠজীবনের ওপর আপতিত। জড়শক্তির জোরে হিমবাহের অগ্রগতি দুর্দমনীয়, আর বিবেকানন্দ অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, অতুলনীয় মনীষা ও অগাধ হৃদয়বত্তার অমোঘ শক্তিতে। মঠবাসীদের সব ওজর-আপত্তি, দ্বিধাদ্বন্দ্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনবছর ধরে যেসব চিন্তাভাবনার ঢেলা তিনি মঠবাসীদের প্রশান্ত চিত্ত-সরোবরে ছুঁড়ে চলেছিলেন, সেগুলিকে এখন বাস্তবে রূপদান করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্মবীর বিভিন্ন কর্মসূচী আরম্ভ করলেন। পরিণতিতে আত্মমুক্তির সাধনায় একনিষ্ঠ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জীবনে উপস্থিত হয়েছিল এক অভাবনীয় পরিবর্তন। তাঁদের মনের অস্থিরতা প্রশ্ন ও চাপা বিক্ষোভ ইত্যাদির আকারে ভেসে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে একটি ঘটনা। কিছুকাল পরে ধীমান স্বামী স্বরূপানন্দ সরাসরি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন স্বামীজীকে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তখনকার জন্য বরানগর মঠের life আবশ্যক ছিল। এখনকার জন্য এরূপই আবশ্যক, ওভাবে থাকলে আর চলবে না।"[২৪] এতদিন মঠের অঙ্গগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল নিজের নিজের নিঃশ্রেয়স মুক্তির প্রতি। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হলো সংঘভাবনা এবং সংঘের মাধ্যমে নরনারায়ণের সেবাপূজা, যা পরোক্ষভাবে সামাজিক অভ্যুদয় ঘটাতে সাহায্য করবে। নতুন পরিস্থিতির চাপে যে মঠজীবন ছিল মুখ্যতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তা হলো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং এবিষয়ে নিয়ামক হলো নতুন প্রবর্তিত দৈনিক সময়সূচী, নিয়মানুবর্তিতা, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি।

উপরি উক্ত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ঘটনাবিন্যাসের পশ্চাতে সমাজবিজ্ঞানী দেখতে পান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবব্যঞ্জনা। ঐসব ঘটনাসকলের প্রত্যেকটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি একটি 'ক্যারিসমা' (charisma)। সে-ক্যারিসমার প্রতিকর্ষ, প্রভাব ও প্রেরণা প্রায় সমভাবাপন্ন কয়েকজন দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী যুবককে গোষ্ঠীবদ্ধ করেছিল মঠকে কেন্দ্র করে। তাঁদের এবং অপর জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে, শ্যামপুকুর বাড়িতে ও কাশীপুর বাগানবাড়ির আঙিনায় এই গোষ্ঠী ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছিল। তা থেকে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে মঠ, যা কালের পথ দিয়ে গড়িয়ে চলতে চলতে তুষারগোলক স্ফীত হওয়ার মতো আকারে ও প্রকারে বৃহৎ হয়ে ওঠে—সংঘের বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওয়েবারের ভাষায় এই পরিণতিকে বলা চলে— "the routinization of charisma" বা ক্যারিসমার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহণ।

[ক্রমশঃ]

২২ স্বামীজীর ৪ অক্টোবর ১৮৯৫ তারিখের চিঠি

২৩ Swami Premananda—Swami Asokananda, 1970, p. 17

২৪ স্মৃতির আলোয় স্বামীজী—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদিত), ১৯৯০, পৃঃ ৬৩

আলো হয়ে জাগো

[মা সারদার প্রতি নিবেদিত]

শান্তি সিংহ

তোমার নামে মাঠে মাঠে ভরা ফসলের হাসি
দিগন্ত ও নীলিমায় ভালবাসাবাসি!

যন্ত্রণাকাতর মুখ হতাশ জীবনে
আনন্দ ও প্রেরণায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
ভরে দাও তুমি, আনন্দরূপিণী মাগো—
নিবিড় আঁধার মাঝে আলো হয়ে জাগো!

জীবনের দিকে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

হৃদয়কে সমস্ত আবিলতা দূষণের থেকে
নির্মুক্ত পরিচ্ছন্ন কর।
জীবনকে সমস্ত ক্লান্তি ভয় অন্ধকার থেকে
অপাবৃত কর।
সমাজকে সমস্ত আবর্জনার পঙ্ককুণ্ড থেকে
উন্মোচিত কর।
তাহলে এ মানবজীবন
বিকশিত হয়ে উঠবে বিশুদ্ধ বিবেকে।
বিশুদ্ধ বিবেক মানে মানুষের জয়।
মানুষের জয় মানে পরাজিত সব পাপ, সমস্ত মরণ।
মরণ নিহত মানে চারিদিকে আশ্চর্য 'বহতা'।
এবং 'বহতা' মানে দুই চোখে অপার বিস্ময়।
এবং বিস্ময় মানে আবার জীবন।

অন্যথায় আকাশের অলৌকিক আনন্দ চলে যাবে।
অন্যথা নদীরা সব তাদের 'বহতা' ভুলে যাবে
এবং তখনই জেনো নিশ্চিত মরণ।
হে নদী, হে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য—আলোর চারণ,
হে হাওয়া, শিশির, বৃষ্টি! জীবনের সমস্ত আনন্দ উত্তাপে
তোমাদের আশীর্বাদ ফুল হয়ে ফোটে।
নদী, তুমি দাও তোমার অমোঘ উত্তরণ।
হে আকাশ, দাও তুমি তোমার বিবিক্ত আহরণ।
আমাদের সব কাজ, মন ও মনন যেন বর্ণ হয়ে ওঠে
তোমার আগ্নেয় স্পর্শে, হে সূর্য, সবিতা!
এ জীবন কবে হয়ে উঠবে আহা, একটি কবিতা!

ইচ্ছের কালস্রোতে

লতিকা ঘোষ

ইচ্ছের কারিগরের শত রূপ
মনের তলে-অতলে!
দেখাও যায় না, বোঝা দায়!
রাতদিন তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া!
এ পথ থেকে ও পথ পর্যন্ত!
মানবজমিনের গা চুষে খাবে!
কতখানি অমৃত পান করাবে কে জানে!
শতভাগ মহাবিষের সমুদ্রে
ডুবিয়ে অবোধ মানবজন্মকে
ক্ষতবিক্ষত করে তোলা।
মানবজীবন তাতেও অসাড়!
তাতেও চরৈবেতি, চরৈবেতি!
ধ্যানে জ্ঞানেও যেমন চরৈবেতির লোভ!
তেমন মহাবিষপানেও ঐ
একই কামনার রথ!
ঠেকায় কে! একটা প্রাণও নেই!
হায়রে! ও মহাবিষপানকে ঠেকাতে যায়!
আসাও একা, যাওয়াও একা!
অতএব একা-একাই পান।
সংঘর্ষে, কলরবে, প্রেমে, দ্বন্দ্বে।
জীবন তাতেই গড়ায়
রথের চাকার মতো। ভুলেই সবাই গেল যে,
দেহটা, প্রাণটা
ঈশ্বরের মন্দির শুধু!

শারীরিক

হিমাংশুশেখর চক্রবর্তী

দেশের নামী কেউ দামী না হয়েও
স্বর্গত হলে যেমন শোনা যায়
দেশের অপূরণীয় ক্ষতির কথা,
ঠিক তেমনই লোকটি মারা যাবার
পর থেকেই পাড়ার সবাই
ওর গুণগান করছিল।
অথচ এতদিন জেনে এসেছিলাম
লোকটি ছিল অসৎ দুশ্চরিত্র ঠগ।

সেদিন কিন্তু সবাই ওর গুণের কথাই বলছিল
এবং সেসব কথা ছিল খাঁটি সত্যি
তা ওরাই একেবারে দিনক্ষণ উল্লেখে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রমাণেই যেন ব্যস্ত ছিল।
আশ্চর্য! কেউ কিন্তু প্রতিবাদও করেনি সেদিন
বরং কে কতটা বেশি প্রশংসা করতে পারে
যেন তারই প্রতিযোগিতা চলছিল।

তারপর একসময় লোকটি বরবেশে
প্রতিবেশীদের কাঁধে চড়ে
শ্মশান-বাসরে চলে গেল
এবং সেখানে চিতার আগুনে
সমবেত সকলের পরম শ্রদ্ধায়
ছাই হয়ে গেল মহতের মতোই।

তবে কি মানুষের যত পাপ নজরে আসে
শুধু শরীর বেঁচে থাকলেই!

জয়তু রামকৃষ্ণ

তারেন্দ্রচরণ ভট্টাচার্য

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ, জয়তু জয়তু জয়তু জয়—
মানবকল্যাণে বিশ্বে দিব্য সেই অরুণোদয়,
জগৎ আছিল কত সতৃষ্ণ
তুমি রামকৃষ্ণ হলে অবতীর্ণ
পথে পথে করি জ্যোতি বিকীর্ণ
জয় মহামানব অভ্যুদয়!

ছাঁকনি

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

চিন্তার আলোগুলোকে ছেঁকে নিই;
ছেঁকে নিই রোজ চেতনার ছাঁকনি
ধরে শক্তহাতে।
তোমার মনন, স্মরণ, অনুধ্যানে
গড়ে তোলা অপূর্ব ছাঁকনি।

'সঙ' সেজে বসে আছি সংসারে।
ভক্তির ব্রডগেজে এসে যাবে ঠিক
এক্সপ্রেস ট্রেন। ট্রেনে উঠে 'সার'
খুঁজতে খুঁজতে দেশ-বিদেশ ঘুরে নেব।
ভরে নেব সঞ্চয়ের ঝুলি।

তবু, ছেঁকে ধরে কুয়াশা-কাদম্বিনী
মাঝে মাঝে জহ্নুমুনির মতো আলো-গঙ্গা
শুষে খেয়ে নেয়। তবু জানি,
ঠিক দেখে নেবে ছাঁকনি ধরার স্থৈর্য
ও আলোর আকুতি।

সপ্তরথী ঘিরে আছে সতত
ষড়্‌রিপু আর কামনা-কাঞ্চন
থাকে ঘিরে অনন্ত সময়,
বেরনোর পথ বলে গেছ তুমি।

অদৃশ্য আবির্ভাব

সনৎকুমার মিত্র

কে
ডাকে
আমাকে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, অথচ অধরা হয়ে থাকে?

তাকে
কাছে ডাকি,
সে অদৃশ্য থাকে
তাই জীবনের গতি অন্বেষণে অব্যাহত রাখি।

তাকে পেলে
এই গতি থেমে যাবে,
ভক্তির বিনম্র দীপ জ্বেলে
নদী তার আকাঙ্ক্ষিত রত্নময় সাগরকে পাবে।

নাটিকা

শ্রীহরিদাসঠাকুর ও সুন্দরী

শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ চৈত্র ১৪০২ সংখ্যার পর]

৪র্থ দৃশ্য

বেনাপোলের জঙ্গল

হরিদাস—আর কতকাল অপেক্ষা করব ঠাকুর? দয়াময়, এ সংসার যে তোমাহারা হয়ে জ্বলেপুড়ে গেল। ভক্তিশূন্য, বিশ্বাসশূন্য প্রাণ নিয়ে মানুষগুলো পশুর মতো দিন কাটাচ্ছে। ভুলেও কেউ একবার হরিনাম করে না! হরিনামের মহিমা জানেও না। তুমি এস প্রভু! মানুষের ভক্তিশূন্য প্রাণে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। তুমি নিজে না এলে কেমন করে অজ্ঞানী জীব উদ্ধার পাবে দয়াময়! দুরন্ত কলির প্রভাব থেকে কে কলিহত জীবকে উদ্ধারের পথ দেখাবে প্রভু!

(তিনজন গ্রামবাসীর প্রবেশ)

১ম গ্রামবাসী—প্রণাম হই ঠাকুর (সকলের প্রণাম। হরিদাসের প্রতিপ্রণাম।)

হরিদাস—আসুন, আসুন। আজ আপনাদের আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

১ম গ্রামবাসী—সংসারের বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন ঠাকুর। আসব—মনে করলেই আসা যায় না। হাজারটা বাধা সামনে এসে হাজির হয়।

২য় গ্রামবাসী—পথে বেরিয়েও আমাকে ফিরে যেতে হলো। ছেলেটা ছুটতে ছুটতে এসে বললে—বাবা, বাছুরটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আবার ফিরে যেতে হলো। জ্বালাতন!

হরিদাস—এরই নাম সংসার বাবা! এই সংসারই আনন্দময় হয়ে উঠবে, যদি সেখানে হরিনাম হয়। হরিভোলা সংসার নয়, চাই হরিবোলা সংসার।

৩য় গ্রামবাসী—এক-এক সময় মনে হয়, সংসার ছেড়ে পালাই। হাড় কালি হয়ে গেল! মনে হয়, সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে হরিনাম করলে শান্তি পাব।

হরিদাস—শান্তি বনে নয় বাবা, শান্তি মনে। মন শান্ত হলে তবেই শান্তি, তবেই আনন্দ।

১ম গ্রামবাসী—মন কি করে শান্ত হয় ঠাকুর?

হরিদাস—মনে শান্তি পাবার সহজ উপায় হরিনাম। খেতে শুতে চলতে ফিরতে হরিনাম করুন। নামের কৃপায় মন শান্ত হয়ে যাবে।

২য় গ্রামবাসী—ঠাকুর, এসব কথা তো রোজই শুনছি তবু ভুলে যাই কেন? আপনার কাছে যতক্ষণ থাকি বেশ থাকি, বাড়ি ফিরলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। আবার যে কে সেই।

৩য় গ্রামবাসী—যা বুঝছি—এ জীবনটা এইরকমই যাবে। এ জীবনে আর প্রভুর কৃপা পাব না। আমরা অতি হতভাগা—

হরিদাস—ও কথা বলবেন না বাবা। প্রভুর আমার দয়ার সীমা নেই। আমি এমন আভাস পেয়েছি, প্রভু শীঘ্রই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর পায়ের নূপুরধ্বনি আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তিনি আসছেন—আসছেন, আসছেন!

১ম গ্রামবাসী—বলেন কি ঠাকুর? প্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন? কবে ঠাকুর? কবে এমন শুভদিন আসবে? কবে তাঁকে আমরা স্বচক্ষে দেখে জীবন সার্থক করব?

(বাউলের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

প্রভু তুমি আর কতদূর?
পথ চলা মোর হয়নি কি শেষ
কত দূরে তব মধুপুর?
তোমার বাঁশরী ডাক দেয় কানে
চলে আয় ওরে চলে আয়,
সকল পিয়াসা দিব রে মিটায়ে
বৃথা বেলা কেন বয়ে যায়।
আর যে চলিতে পারি না শ্রীহরি
শ্রান্ত ক্লান্ত তৃষাতুর॥

তব নাম গেয়ে বেয়ে চলি পথ
পথ শেষ তবু হয় না,
সুন্দর তব হেরিব শ্রীমুখ
আর দেরি প্রাণে সয় না।
কবে প্রভু তুমি দিবে দেখা মোরে
কবে প্রাণ হবে সুমধুর॥

(বাউলের প্রস্থান)

২য় গ্রামবাসী—আহা, কি গানই গাইলে! যেন অমৃত! প্রভু, তুমি আর কতদূর!

৩য় গ্রামবাসী—মনের কথা যেন টেনে বললে। কবে যে ভগবানের দর্শন পাব, তা জানি না। ঐ বাউল যে কে, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, তাও জানি না। বড় রহস্যময় মানুষ।

হরিদাস—ও এক মরমী ভক্ত। ওদের চেনা বড় শক্ত। হরিবোল, হরিবোল।

১ম গ্রামবাসী—এবার তাহলে আসি প্রভু। সন্ধ্যে হলো।

(সকলের প্রণাম ও প্রস্থান)

হরিদাস—এবার আমি আমার নামকীর্তন শুরু করি। হরি হে, দয়াময়, তোমার লীলা আমি কি বুঝব প্রভু! (হরিদাসের নামকীর্তন)

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারদিক আলো হয়ে আছে। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। সবকিছু বেশ দেখা যাচ্ছে। ঐ যে, ওখানে বসে সাধু নামগান করছে। একটু কাছে যাই, ভাল করে দেখি। (অনেকক্ষণ দেখিল) আহা, কি রূপ! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প! এই সাধুর মন ভোলাতে হবে। ঠিক আছে, আগে একটা গান গাই। দেখি কি হয়।

(গীত)

মুখ তুলে চাও যোগী।
হৃদয় আমার অনুরাগে হলো রাঙা,
আমি তব অনুরাগী।
শয়নে স্বপনে তোমারি লাগিয়া
আমি দিবানিশি কাঁদি,
নয়ন মেলিয়া চাহ মোর পানে
বাহুপাশে লহ বাঁধি।
আঁখি মেলি দেখ ওগো সুন্দর
তব প্রেম আমি মাগি॥
মুখ তুলে চাও যোগী॥

হরিদাস—কে গো তুমি? এত রাত্রে এখানে কেন এসেছ? এ যে বিজন বনভূমি!

সুন্দরী—সাধু, তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি। তোমার রূপ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তুমি আমায় দয়া কর সাধুবাবা। আমার প্রাণের জ্বালা নিভিয়ে দাও।

হরিদাস—প্রাণের জ্বালা নেভাবে? বেশ তো, একটু অপেক্ষা কর। আমি আমার নামসংখ্যা পূর্ণ করে নিই। আমার নামসংখ্যা পূর্ণ হলে তারপর আমি তোমায় অঙ্গীকার করব। (নামকীর্তন)

সুন্দরী—(স্বগতঃ) যাক, টোপ গিলেছে। আমায় মনে ধরেছে। এখন ধৈর্য ধরে একটু অপেক্ষা করি। মনে হয় এখুনি শেষ হবে।

(হরিদাস মধুর স্বরে নামকীর্তন করিতেছেন)

সুন্দরী—উঃ, কি মশা! যেন ছিঁড়ে খাচ্ছে! সাধু কেমন করে স্থির হয়ে আছে কে জানে! গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে বসি।—কি আপদ, আবার ঘুমও পাচ্ছে। কি করা যায়? আচ্ছা, সাধুকে কি মশা কামড়াচ্ছে না? কী আশ্চর্য! মশায় একেবারে ছেঁকে ধরেছে সাধুকে। কিন্তু সাধুর তো কোন ভ্রূক্ষেপই নেই দেখছি। বিভোর হয়ে নামকীর্তন করে চলেছে!

(কিছুক্ষণ পরে)

হরিদাস—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। সকাল হয়ে গেল দেখছি।

সুন্দরী—(চমকাইয়া) অ্যাঁ, সকাল হয়ে গেল? তাইতো দেখছি! পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে! তাহলে ঠাকুর, আমার কামনা তো তুমি পূর্ণ করলে না?

হরিদাস—কি করব বল? আমার সংখ্যা যে সারারাতেও পূরণ হলো না। তুমি আবার আজ এস। আজ মনে হয় আমার নামসংখ্যা পূরণ হয়ে যাবে।

সুন্দরী—আজ রাত্রে আমা[illegible]র ফিরিয়ে দিও না ঠাকুর। আমি মরে যাব।

হরিদাস—আমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম নিই। মাসে এক কোটি নাম নেওয়াই আমার ব্রত। আজ আমি নামসংখ্যা শেষ করতে পারব বলেই মনে হয়। তুমি দুঃখ করো না।

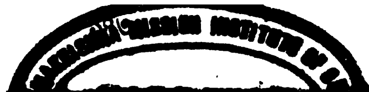
সুন্দরী—সকাল হয়ে গেল। পথে লোক-চলাচল শুরু হয়ে গেল। আমি যাই। আবার রাত্রে আসব।

(সুন্দরীর প্রস্থান)

হরিদাস—হায় মা! দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করেও এ কোন্ সর্বনাশা পথে তুমি ছুটে চলেছ! কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন।

যাই, নদীতে স্নান করে আসি। হরিবোল, হরিবোল!

(হরিদাসের প্রস্থান)



৫ম দৃশ্য

মোসাহেবগণ-সহ রামচন্দ্র খান দণ্ডায়মান

রামচন্দ্র—সুন্দরীর পাত্তা নেই। কি হলো জানতে পারছি না। এই, কে আছিস, যা—সুন্দরীকে ডেকে নিয়ে আয়। যত সব অপদার্থ!

(পাইকের প্রস্থান)

১ম মোসাহেব—হজুর, সুন্দরীকে না পাঠিয়ে যদি একথালা খাবার দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিতেন, তাহলে কাজ হতো। একদিনে ব্যাটাকে টিট করে দিতুম।

রামচন্দ্র—কিরকম? তোমাকে পাঠালে কি হতো?

১ম মোসাহেব—হজুর, আপনার বাড়ির কালিয়া পোলাও দুদিন ব্যাটার পেটে পড়লে, তিনদিনের দিন ব্যাটা আপনার সেরেস্তায় চাকরির দরখাস্ত দিত।

রামচন্দ্র—কেন?

১ম মোসাহেব—আহা! এটা কেন বুঝছেন না হজুর, লোকে সাধু হয় পেটের দায়ে। খেতে যারা পায় না, তারাই 'হরি হরি' করে। একটা কিছু নিয়ে পেটের জ্বালা ভুলে থাকতে হবে তো!

২য় মোসাহেব—বড় খাঁটি কথা বলেছ ভাই। আমার মামাশ্বশুর—

রামচন্দ্র—থাক, তোমার মামাশ্বশুরের কাহিনী পরে বললেও চলবে। এখন সুন্দরী আসছে কিনা একটু এগিয়ে দেখ।

১ম মোসাহেব—ওকে যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি—

২য় মোসাহেব—হজুর আমায় যেতে বলেছেন। আমি যাব। তুই দাঁড়িয়ে দ্যাখ—

(পেয়াদা-সহ সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী—পেন্নাম হই হজুর।

রামচন্দ্র—তা তো হলি, এখন কাজের কাজ কি করলি? ঐ ভণ্ডটাকে জব্দ করতে পারলি না? হেরে গেলি?

সুন্দরী—(আনমনা ভাবে) হেরে গেলুম? তাই হবে বোধ হয় হজুর, আমি হেরেই গেলুম! নইলে এমন কেন হলো!

রামচন্দ্র—(রেগে) কি বলছিস তুই? তোর মতো সুন্দরী এ তল্লাটে নেই। তোকে দেখলে রাজা-বাদশার মাথা ঘুরে যায়! আর তুই বলছিস কিনা হেরে গেলুম? ঐ ভণ্ডটার ভণ্ডামিতে তুইও ভুলে গেলি?

সুন্দরী—ভণ্ড? ভণ্ডের কি এত রূপ হয় হজুর? এত পবিত্রতা? আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত! হজুর, হরিদাস বোধহয় ভণ্ড নয়, সত্যই সাধু।

রামচন্দ্র—চুপ কর। ফের ঐ ভণ্ডটাকে সাধু বললে তোর জিভ আমি উপড়ে ফেলব। একটি রাত চলে গেল, কিছু করতে পারলি না! তার ওপর আবার ভণ্ডটার গুণগান করছিস? তোর ওপর আমার অনেক আশা। আজ সঙ্গে পাইক নিবি, বুঝলি?

সুন্দরী—আজ নয় হজুর, কাল সঙ্গে পাইক নেব। সাধু আমায় কথা দিয়েছে আজ আমার কামনা পূরণ করবে। আমার বিশ্বাস, সাধু মিছে কথা বলে না।

রামচন্দ্র—ঠিক আছে, আজকের দিনটা দেখব। আজ যদি না পারিস, কাল অন্য ব্যবস্থা করব।

সুন্দরী—না, না, আজ ঠিক পারব। আজ আর আমি হার মানব না। সাধুকে বশ করতেই হবে। ওকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। আমার নাম সুন্দরী।

রামচন্দ্র—ফের তুই 'সাধু সাধু' করছিস? ও ব্যাটা আবার সাধু হলো কবে? নীচ যবন একটা! তুই কি ভণ্ডটার প্রেমে পড়লি নাকি?

সুন্দরী—প্রেম? প্রেম কাকে বলে হজুর? আমরা বিষাক্ত প্রাণী, বিষ ঢেলে শিকারকে বশ করি। তারপর তার রক্ত চুষে খাই। প্রেম তো স্বর্গের বস্তু। আমরা প্রেমের অভিনয় করি।

রামচন্দ্র—তাই বল। তোর ভাব দেখে মনে হলো, তুই লোকটাকে ভালবেসে ফেলেছিস। খুব সাবধান!

সুন্দরী—ভালবাসা আমাদের রক্তে নেই হজুর। আমাদের কাছে যারা ভালবাসা আশা করে তারা মূর্খ।

রামচন্দ্র—তাহলে আজ কাজ হাসিল করবি?

সুন্দরী—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হজুর। আজ সুন্দরী হয় মারবে, নয় মরবে। শুধুহাতে সে ফিরবে না।

১ম মোসাহেব—খুব ভাল, খুব ভাল। তোর জন্য মুক্তোর মালা ঠিক করে রেখেছি। ইয়া বড় বড় মুক্তো—

২য় মোসাহেব—আর হাজার টাকার তোড়া, বুঝলি? করকরে হাজার টাকা।

(সকলের হাস্য)

সুন্দরী—তাহলে এখন আসি হজুর, পেন্নাম। কাল সুখবর পাবেন।

(সুন্দরীর প্রস্থান)

রামচন্দ্র—চল হে, চাবুকটাকে ঠিক করে রাখি গে। কাল দরকার হবে। সুন্দরী আজ একটা হেস্তনেস্ত কিছু করবেই করবে। তারপর ভণ্ডটাকে উচিত শিক্ষা দেব। শয়তান!

(সকলের প্রস্থান)

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(বেনাপোলের জঙ্গল। ঠাকুর হরিদাস নামকীর্তন করিতেছেন। কয়েকজন ভক্তের প্রবেশ।)

১ম ভক্ত—আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন ঠাকুর।

(সকলের প্রণাম)

হরিদাস—আসুন, আসুন। আপনাদের কথাই মনে হচ্ছিল।

২য় ভক্ত—আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনি আমাদের মতো অভাজনদের কথা চিন্তা করছিলেন।

হরিদাস—আপনাদের আশ্রয়ে বড় সুখে ছিলুম। শ্রীহরির ইচ্ছায় আমাকে এবার এস্থান ত্যাগ করতে হবে। আগামী কালই আমি এস্থান ত্যাগ করে চলে যাব।

৩য় ভক্ত—কি বলছেন প্রভু? আমাদের ত্যাগ করে আপনি চলে যাবেন? আমরা কি অপরাধ করলুম. প্রভু?

১ম ভক্ত—আমরা কার কাছে বসে হরিকথা শুনব প্রভু? না না, এ হতেই পারে না। আমরা আপনাকে যেতে দেব না।

২য় ভক্ত—আপনার পুণ্যসঙ্গ লাভ করে আমরা বড় সুখে দিন কাটাচ্ছিলুম। এখন আপনাকে ছেড়ে আমরা কি নিয়ে থাকব প্রভু?

হরিদাস—আপনারা দুঃখ করবেন না। শ্রীহরি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। অনেক কথাই তো আপনারা শুনেছেন। শ্রীহরির নামগান করবেন। সর্বদা শ্রীহরির কথা কইবেন। তাহলে আর কোন দুঃখই থাকবে না। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

৩য় ভক্ত—আপনাকে কি একান্তই এখান থেকে যেতে হবে?

হরিদাস—হ্যাঁ ভাই, এখানকার কাজ আমার শেষ হলো। আপনাদের কাছে যদি কিছু অপরাধ করে থাকি নিজ গুণে মার্জনা করবেন।

৩য় ভক্ত—এ আপনি কি বলছেন ঠাকুর? আমরাই বরং সময়ে অসময়ে আপনাকে কত বিরক্ত করেছি। আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আশীর্বাদ করুন যেন আমরা আপনার শেখানো পথে চলতে পারি।

হরিদাস—কৃষ্ণ আপনাদের মঙ্গল করবেন। কৃষ্ণ দয়াময়, পতিতপাবন। তাঁর দয়ার সীমা নেই। আপনারা যেন কখনো তাঁকে ভুলবেন না। হরিবোল হরিবোল।

১ম ভক্ত—এখন কোথায় যাবেন?

হরিদাস—যাবার কিছু ঠিক নেই ভাই। হরি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাব। এবার আমার জপের সময় হলো। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। আসুন, আমাকে আপনারা আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করুন। হরির ইচ্ছা হলে আবার আমাদের দেখা হবে।

(সকলের প্রণাম ও আলিঙ্গন)

হরি দয়াময়! হরিবোল, হরিবোল। আপনারা আমায় হাসিমুখে বিদায় দিয়ে যে যার গৃহে ফিরে যান। কৃষ্ণ আপনাদের মঙ্গল করুন।

(সকলের বিদায় গ্রহণ)

(হরিদাস মধুর সুরে নামকীর্তন শুরু করিলেন।)

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দরী—ঠাকুর, আমি এসেছি। আজ আর আমায় ফিরিয়ে দেবেন না। আপনি কথা দিয়েছেন—আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। মনে আছে তো সে-কথা?

হরিদাস—মনে আছে বৈকি। আজ আমি তোমাকে অঙ্গীকার করব।

সুন্দরী—দয়া করাই সাধুদের স্বভাব। আজ যদি আপনি আমায় দয়া না করেন, আমি আত্মহত্যা করব।

হরিদাস—আজ আশা করছি আমার নামসংখ্যা পূরণ হয়ে যাবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর।

সুন্দরী—এই যৌবনকালে এত রূপ নিয়ে, সব সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, কেন যে আপনি এত কঠোর ব্রত নিয়েছেন বুঝতে পারি না। বড় নিষ্ঠুর আপনি।

হরিদাস—আমার জন্য তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। এর জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আর একটু ধৈর্যধারণ কর। তোমার মনোবাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

(হরিদাস নাম করিতে লাগিলেন)

(কিছুক্ষণ পরে)

সুন্দরী—এ কি? আমার এমন হচ্ছে কেন? আমার শরীর কাঁপছে কেন? কী এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন ডুবে যাচ্ছি! আমার শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে! আমার সর্বাঙ্গ যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে! উঃ! উঃ! বড় জ্বালা! ঠাকুর, ঠাকুর, আমায় বাঁচান, আমি মরে গেলুম,—আঃ, আঃ—

হরিদাস—কি হলো? তুমি অমন করছ কেন?

সুন্দরী—উঃ! উঃ! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! জ্বলে গেলুম! ঠাকুর আমায় রক্ষে করুন। (ক্রন্দন) আমায় বাঁচান! আমার সমস্ত শরীর জ্বলে পুড়ে গেল! আমি মরে গেলুম—

হরিদাস—স্থির হও, কি হয়েছে তোমার?

সুন্দরী—ঠাকুর, আমি মহাপাপী, আমায় আপনি রক্ষে করুন। জমিদারের আদেশে আমি আপনার কাছে এসেছিলুম। আমার নরকেও স্থান হবে না। উঃ! উঃ! বড় জ্বালা! (সুন্দরী হরিদাসের চরণে লুটাইয়া পড়িল।) আমায় চরণে স্থান দিন—

হরিদাস—স্থির হও মা! কোন ভয় নেই। তোমার মনে অনুতাপের আগুন জ্বলে উঠেছে, তাতেই তোমার সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!

(মস্তকে হস্তার্পণ)

সুন্দরী—ঠাকুর, আমি একজন পতিতা রমণী। জমিদারের আদেশে—

হরিদাস—সব জানি মা। আমি অনেক আগেই এখান থেকে চলে যেতুম। শুধু তোমার জন্যই অপেক্ষা করলুম। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন। তিনি তোমার মনের সব জ্বালা নিভিয়ে দেবেন। হরিবোল, হরিবোল।

সুন্দরী—প্রভু, আপনিই আমার দয়াময় হরি। আপনার কৃপাতেই আমি উদ্ধার পেলুম। আপনি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে চরণে স্থান দিন। (ক্রন্দন)

হরিদাস—যাও মা, বাড়ি যাও। তোমার যাকিছু ধন-সম্পদ আছে সব গরিবদের বিলিয়ে দাও। তারপর মস্তক মুণ্ডন করে, স্নান করে তুমি আমার কাছে এস। এই ভজন-কুটিরে বসে তুমি দিবারাত্র হরিনাম কর। হরিনাম করে জীবন অতিবাহিত করবে। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।

সুন্দরী—তাই হবে প্রভু। আমি এখনই আপনার আদেশ পালন করব। প্রণাম।

(সুন্দরীর প্রস্থান)

হরিদাস—ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার লীলা! লীলাময়, তোমার লীলা বোঝে কার সাধ্য! হরিবোল, হরিবোল!

(প্রস্থান) [সমাপ্ত]

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর কয়েকটি নতুন গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

ত্রিপুরা ☐ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১

আসাম ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১ ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫

গুজরাট ☐ সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী, আমেদাবাদ-৩৮০০০৫

পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা

বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল
১৩১, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস
কলকাতা-৭০০০৩৯

মলয় ভৌমিক
৪/১, বেনেপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০১৪

মিডিয়া সেন্টার
১১০, কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স
৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা-৭০০০৩৪

নদীয়া

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন
চাকদহ, জেলাঃ নদীয়া
পিন-৭৪১২২২

হাওড়া

গোবিন্দলাল চ্যাটার্জী
প্রযত্নে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
৪, নস্কর পাড়া লেন, হাওড়া-১

হুগলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সংঘ
গ্রাঃ+পোঃ পুইনান
জেলাঃ হুগলী, পিন-৭১২৩০৫

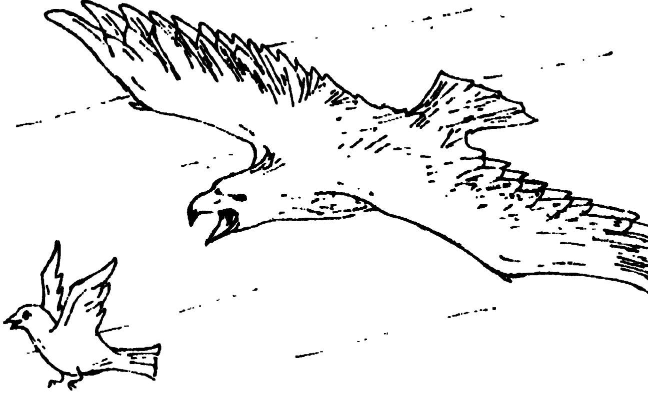
তপন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত
হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া
পিন-৭১২৫০২

☐ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ☐

চিরন্তনী

শিবিরাজার উপাখ্যান ২

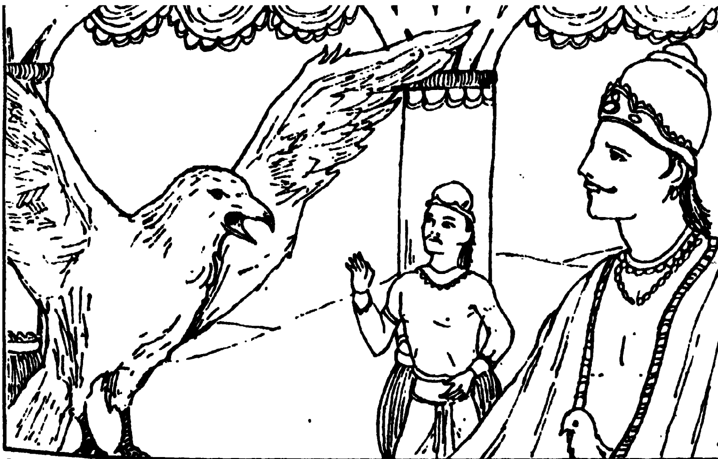
কথা : ভগিনী নিবেদিতা ☐ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত।



পায়রাটির পিছনে ধাওয়া করে আসছে একটা হিংস্র বাজপাখি। সে নিশ্চিতভাবে তাকে হত্যা করতে উদ্যত। আতঙ্কগ্রস্ত পায়রাটি প্রাণপণে উড়ে আসছিল, কিন্তু তার থেকেও ক্ষিপ্রবেগে তাকে তাড়া করে আসছিল বাজপাখিটি।

কিন্তু ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তে ছোট্ট পাখিটি শিবিরাজার সিংহাসনে পৌঁছে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের উত্তরীয় মেলে ধরলেন। পাখিটিও কোন দ্বিধা না করে তার মধ্যে আশ্রয় নিল। সেখানে সঙ্গোপনে রাজার বুকের আশ্রয়ে সে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে লাগল ও মরণভয়ে কাঁপতে লাগল।





সঙ্গে সঙ্গেই বাজপাখিটিও সিংহাসনের কাছে এসে পৌঁছাল। তার সমস্ত অবয়ব যেন ক্রোধানলে জ্বলছে। রাজা ছাড়া সকলেই ভয়ে কেঁপে উঠল এবং সে যখন কথা বলল তখন কারুরই আশ্চর্য লাগল না। বাজপাখিটি উঁচুগলায় রাজার দিকে তাকিয়ে তার শিকার ফিরিয়ে দিতে আদেশ করল।

[ক্রমশঃ]

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের ভক্ত স্বরূপ

আশুতোষ বিশ্বাস

বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি উপলক্ষে এই রচনাটি নিবেদিত।—সম্পাদক, উদ্বোধন

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য মুখ্যতঃ অদ্বৈত বেদান্ত বা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবন ও প্রচারের প্রভাবে সমগ্র ভারতভূমিতে বেদান্তধর্ম বা সনাতন ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্ত-প্রচারিত "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১), "তত্ত্বমসি" (ঐ, ৬।৮-১৬), "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৫।১৯), "অহং ব্রহ্মাস্মি"(ঐ, ১।৪।১০), "জীবঃ শিবঃ শিবো জীবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" (স্কন্দ উপনিষদ্, ৬)—জগৎ ও ব্রহ্মের, জীব ও শিবের এই অভেদত্ব—এইসব মহাবাণীর বাস্তবতা রূপায়িত হয়েছিল তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে এবং সেই সঙ্গে এই সমুদয় মহাবাক্যের সত্যতা সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মায়াবাদী। তাঁর কাছে এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়, অলীক-মরীচিকার মতো তার অস্তিত্ব রয়েছে। রজ্জুই সত্য, সর্প তার ওপর আরোপিত অজ্ঞানের ক্রিয়ামাত্র। জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সংসার ও জীবনের প্রতি তাই তাঁর চরম বৈরাগ্যের দৃষ্টি। এই কারণে তাঁর 'দ্বাদশপঞ্জরিকা' ('মোহমুদ্গর'), 'নির্বাণষট্‌ক', 'পরাপূজা' প্রভৃতি স্তোত্রের প্রতিটি শ্লোকে অনাসক্তির অপরূপ ভাবব্যঞ্জনা প্রতীয়মান। 'মোহমুদ্গর' থেকে দুটি সুবিখ্যাত শ্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যার মধ্যে কঠোর বৈরাগ্য এবং সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে শঙ্করাচার্যের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য পরিস্ফুট ঃ

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত-স্তত্ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"

—কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি কার, কোথা থেকে এসেছ—হে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্ব চিন্তা কর।

ধন, জন এবং যৌবনের গর্ব করো না, কারণ কাল সমস্তই নিমেষে হরণ করে। মায়াময় এই অখিল জগৎকে ত্যাগ করে অবিলম্বে পরব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞাত হয়ে তাতে প্রবেশ কর।

বৈরাগ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দেহাভিমানের বিরুদ্ধে কী কঠোর তাঁর বক্তব্য!—

"ত্বঙ্-মাংস-রুধির-স্নায়ু-মেদোমজ্জাস্থিসঙ্কুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ৮৭)

—ত্বক্ মাংস রক্ত স্নায়ু মেদ মজ্জা ও অস্থির সমবায়ে গঠিত এবং মলমূত্রে পরিপূর্ণ এই স্থূলশরীর ঘৃণার বস্তু।

আচার্য শঙ্কর ছিলেন শুষ্ক কঠোর বৈদান্তিক। তাঁর মন-প্রাণ বৈরাগ্যের তীব্র ধারায় অভিষিক্ত। তাঁর মহৎ জীবনে ও চরিত্রে সমন্বিত হয়েছে সাধনলব্ধ জ্ঞান, তপঃসঞ্জাত যোগৈশ্চর্য, সহজাত বৈরাগ্য। কিন্তু এই সব-কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর মধ্যে ছিল এক অকৃত্রিম ভক্তিভাব। দেবদেবীর প্রতি ছিল তাঁর অনন্যা ভক্তি। তিনি শুধু মহাজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন পরম ভক্ত ও মহান কবি। তিনি শুধু প্রস্থানত্রয়ের সমুচ্চ দার্শনিক ব্যাখ্যা রচনা করেননি, সেই সঙ্গে রচনা করেছেন অসংখ্য মর্মস্পর্শী ভক্তি-আপ্লুত স্তব-স্তোত্রাদি। একদিকে তিনি বেদান্ত ও 'বেদান্তসূত্র'-এর অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার, আবার অন্যদিকে 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী', 'গঙ্গাস্তোত্র', 'বিষ্ণুষট্‌পদী' প্রভৃতি অপূর্ব স্তোত্রাবলীর দ্বৈতবাদী রচয়িতা। তাঁর মধ্যে দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী প্রতিভার অনবদ্য প্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত হই। তাঁর সুললিত গঙ্গাস্তোত্রটি দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণ করছি। আচার্য অনেক দিন অতিবাহিত করেছিলেন পুণ্যতীর্থ কেদারক্ষেত্রে। চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতমালাবেষ্টিত, শান্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ মহাতীর্থ কেদারক্ষেত্র। প্রতিদিন কেদারনাথের মন্দিরে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন তিনি। কেদারের নির্জন পরিবেশের মধ্যে কিছুকাল আনন্দ সম্ভোগ করে ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল গোমুখ অভিমুখে একদিন পদযাত্রা করলেন আচার্যদেব। দুর্গম পথ, মৃত্যুর শঙ্কা প্রতি পদক্ষেপে। সবকিছুকে তুচ্ছ করে এক পক্ষকাল পদযাত্রার পর ভাগীরথীর উৎসের দর্শন পেলেন। অপরূপ শোভা ত্রিলোকপাবনী সুরনদীর। পর্বতের সঙ্গে চলেছে যুগ যুগ ধরে অনন্ত সংঘর্ষ। উচ্ছ্বাসময় অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হয়েছেন গঙ্গা, বিদীর্ণ হয়েছে কঠিন পর্বতগাত্র। কত রমণীয় সমৃদ্ধ নগরী, গ্রাম, বন, উপবন ও জনপদকে পবিত্র করে সমুদ্রে উপনীত হবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন 'দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা'।

সন্নিহিত পর্বতগাত্রের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনির অপূর্ব ঝঙ্কার। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হলেন জগদ্‌গুরু। হৃদয় উদ্বেলিত হলো এক অপার্থিব অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি রূপায়িত হলো ঐকান্তিক ভক্তিতে। উল্লসিত চিত্তে সুললিত স্তবগানে আচার্য স্তুতিবন্দনা করলেন সুরেশ্বরী গঙ্গার ঃ

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥"

—হে সুরেশ্বরি ভগবতি ত্রিভুবনতারিণি দেবী তরলতরঙ্গশালিনি শিবশিরোবাসিনি বিমলে গঙ্গে, তোমার পাদপদ্মে আমার মতি স্থির হোক।

ছন্দ ও শব্দের মাধুর্যের সঙ্গে আচার্যের ভক্তির সুউচ্চ ভাব কী অপূর্বভাবে সমন্বিত!

পরবর্তী শ্লোকে জগদ্‌গুরুর বিনম্রতার অপরূপ অভিব্যক্তি। শরণাগত হচ্ছেন তিনি দেবী গঙ্গার চরণে ঃ

"ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥"

—হে সুখদায়িনি মাতঃ ভাগীরথি! বেদে তোমার পুণ্যবারির মহিমা খ্যাত আছে। আমি তোমার অনন্ত মহিমা জানি না। হে কৃপাময়ি! আমি অজ্ঞান, আমাকে ত্রাণ কর।

উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে শঙ্করাচার্যের অপরূপ ভক্তস্বরূপের সঙ্গে তাঁর কবিত্বশক্তির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, স্তোত্রটি নিছক ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশ নয়, একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেবীর মাহাত্ম্য ও মহিমার উপলব্ধিরও প্রকাশ।

একসময়ে আচার্য শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হয়েছিলেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে তিনি পরম শ্রদ্ধার সাথে ভগবানের লীলাস্থানগুলি এবং প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি পরিদর্শন করেন। শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরে তাঁর প্রাণে বিশেষ ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। 'শ্রীকৃষ্ণাষ্টকম্' রচনা করে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ঃ

"শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্বেদবিষয়ো
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥"

—লক্ষ্মী যাঁর দেহ আলিঙ্গন করে আছেন, যিনি স্থাবর-জঙ্গম সমগ্র জগতের গুরু, যিনি বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, যিনি বুদ্ধিপ্রবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী ও শুদ্ধস্বরূপ, যিনি অসুরহন্তা, কমললোচন হরি, যিনি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও গলায় বিমল বনমালা ধারণ করেছেন, স্থিররুচিবিশিষ্ট সেই সর্বজগতের আশ্রয় ও সকল লোকের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হোন।

স্তবটির আরেকটি অংশ ঃ

"নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জুনসখঃ।
স্বয়ম্ভূর্ভূতানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥"

—যিনি মনুষ্যগণের ভয়হারী, শরণাগতের শরণ, জগতের ভ্রান্তিনাশক, যিনি নবীন মেঘশ্যাম, রামরূপধারী ব্রজবালক সাথী, অর্জুনের সখা, যিনি স্বয়ম্ভু, সর্বলোকের জনক, জীবগণের কর্মানুসারে সুখদাতা সর্বজগতের আশ্রয় ও সর্বলোকের ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ আমায় দর্শন দিন।

জগদ্‌গুরু কাশ্মীরের নানা স্থান পরিভ্রমণান্তে এসেছেন শ্রীনগরে এবং নিকটবর্তী একটি অনুচ্চ শৈলোপরি শিব-মন্দির দেখতে পেয়ে দেবদর্শনে গেলেন। দেবাদিদেবের দর্শন ও অর্চনানন্তর শৈলপাদদেশে অবস্থিত দেবীর স্থান-দর্শনে এলেন আচার্যদেব। ভাবাবেশে দেবীর অপূর্ব বন্দনা করলেন তিনি। দেবীর প্রতি ভক্তিতে তাঁর অন্তর পূর্ণ হলো এবং তিনি তন্ময় হয়ে একটি সুললিত স্তবের মাধ্যমে দেবীর মহিমা কীর্তন করলেন। স্তবটি 'সৌন্দর্য-লহরী' বা 'আনন্দলহরী' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্তবটি ১০৪ শ্লোকে সমন্বিত। প্রতিটি শ্লোকের মাধ্যমে আদ্যাশক্তিকে তিনি জীবনে কিভাবে গ্রহণ করেছেন তার একটি সুন্দর রূপ পরিস্ফুট। আচার্যের অপরিসীম ভক্তি ও দীনভাব আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। প্রথম শ্লোকে জগদ্‌গুরু বলেছেন ঃ

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভাবিতুং,
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥"

—শিব যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহলেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করতে সমর্থ হন। অন্যথা সেই পরম দেবতা স্পন্দিত হতেও সক্ষম নন। এই কারণে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর প্রভৃতি দেবতাগণ তোমার আরাধনা করেন। অতএব আমার মতো অকৃতী ব্যক্তি কিভাবে তোমাকে প্রণাম বা তোমার স্তব করতে সমর্থ হবে!

শঙ্করাচার্য মুখ্যতঃ অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করেছিলেন। অদ্বৈত বেদান্ত-মতে পরব্রহ্ম এক—অদ্বৈত। তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবী ব্রহ্মেরই মায়াশ্রিত রূপভেদ। তিনি আরও বলেছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই কৈবল্যমুক্তি হয়। মুক্তিতে জীব তার জৈব ভাব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সগুণ ব্রহ্মের প্রতীকজ্ঞানে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা প্রকট করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা করেছেন। দেবদেবীর উপাসনার মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা ও প্রসন্নতা লাভ হয়। সেই কারণে সাধারণের জন্য অধিকারভেদে উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন। অধিকার ও রুচিভেদে সকল দেবদেবীই সগুণ ব্রহ্মের প্রকাশজ্ঞানে উপাস্য। সেই কারণে কঠোর বৈদান্তিক হয়েও বিভিন্ন স্তবের মাধ্যমে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকটিত হয়েছে সমস্ত দেবদেবীর ওপর, বিশেষ কোন দেবদেবীর প্রতি আচার্যদেবের অনুরাগ পরিস্ফুট হয়নি।

'আনন্দলহরী'তে লক্ষিত হবে শক্তিরূপিণী দেবীর প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির নিবেদন। দেবীশক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে আরও কয়েকটি স্তোত্রে, যেমন 'ললিতাপঞ্চক', 'মীনাক্ষীপঞ্চরত্ন', 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র', 'ভবান্যষ্টক'। প্রতিটি স্তোত্রেই আচার্যের অপরিসীম বিনম্রতা, অনুপম ভক্তি, আর্তির সকরুণতা ও আত্মনিবেদন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। এই প্রসঙ্গে 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র'-এর প্রথম শ্লোকে আচার্য বলছেন ঃ

> "ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুতিমহো
> ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
> ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
> পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥"

—আহা, আমি মন্ত্র জানি না, এমনকি স্তুতিও জানি না। আবাহন ও ধ্যান জানি না। স্তুতি কিভাবে করতে হয় তাও জানি না। কাতরতা প্রকাশ করতেও জানি না। কিন্তু মা, আমি এই জানি যে, তোমার অনুসরণে দুঃখনাশ হয়।

শিবের প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন স্তোত্রাবলীতে। 'শিবনামবল্যষ্টক', 'শিবপঞ্চাক্ষর-স্তোত্র', 'শিবাষ্টকস্তোত্র','বেদসারশিবস্তোত্র', 'শিবাপরাধ-ক্ষমাপনস্তোত্র' প্রভৃতি স্তোত্রগুলি অপরূপ ভক্তিমাধুর্যের রসে পূর্ণ।

আচার্য শঙ্করের স্তোত্রাবলীর সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি স্তবের বিশেষ বিশেষ অংশ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর ভক্ত স্বরূপ উদ্ঘাটন করার সামান্য প্রয়াস মাত্র এখানে করা হয়েছে। তা থেকে এটুকু অন্ততঃ পরিস্ফুট যে, তিনি শুষ্ক বৈদান্তিক ছিলেন না, অন্তর্গূঢ় ভক্তিরসের মাধুর্যে সর্বতোভাবে আপ্লুত ছিলেন তিনি।☐

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর আরও কয়েকটি গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

☐ পশ্চিমবঙ্গ ☐

উত্তর ২৪ পরগনা

হৃদয়রঞ্জন বেরা
গ্রাঃ+পোঃ ন্যাজাট হাটখোলা, পিন-৭৪৩৪৪২

হৃদয়ভূষণ নস্কর
প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
গ্রাঃ+পোঃ কন্যানগর, পিন-৭৪৩৩৯৮

বাঁকুড়া

শ্রীমা সারদা পাঠচক্র
কোতুলপুর, পিন-৭২২১৪১

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
"অঙ্কন", স্টল নং ২
মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১

মেদিনীপুর

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
পোঃ মঠ-চণ্ডীপুর

কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সংঘ
গ্রাম ঃ আঠিলাগড়ি, পোঃ কাঁথি

খড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
পোঃ খড়ার, পিন-৭২১২২২

হরেকৃষ্ণপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মন্দির
গ্রাম+পোঃ শ্যামসুন্দরপুর পাটনা
ভায়া ঃ পাঁশকুড়া

বর্ধমান

অঞ্জনকুমার পাল
প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া

শীতল ব্যানার্জী
প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিস্টকা সমিতি
শ্রীখণ্ড, পিন-৭১৩১৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
শ্যামসায়র (পূর্ব)
পোঃ+জেলা ঃ বর্ধমান, পিন-৭১৩১০১

বিশেষ নিবন্ধ

বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪০২ বঙ্গাব্দ শেষ হয়ে শুরু হলো ১৪০৩ বঙ্গাব্দ। নববর্ষের প্রথম দিন ১ বৈশাখ রবিবার। খ্রীস্টীয় ও হিজরী ক্যালেন্ডারের হিসাবে দিনটি হলো যথাক্রমে ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ ও ১৪১৬ হিজরী সনের জেল্কদ মাসের ২৫ তারিখ। বঙ্গাব্দ, খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের উপর্যুক্ত তারিখগুলি যথাক্রমে ১. ১. ১৪০৩, ১৪. ৪. ১৯৯৬ এবং ২৫. ১১. ১৪১৬ রূপে লেখা যায়। উল্লিখিত তারিখগুলির পর পর তিনটি অংশের প্রথমটি মাসের দিনসংখ্যা, দ্বিতীয়টি মাসের ক্রমিক সংখ্যা ও শেষ অংশটি বছরের সংখ্যা নির্দেশ করে। ওপরের বর্ণনানুসারে বঙ্গাব্দের ১৪০২, খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫ ও হিজরী সনের ১৪১৫ বছর শেষ হয়ে গেছে। খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের বছরসংখ্যা তথা বয়স নিয়ে কোন মতপার্থক্য না থাকলেও বঙ্গাব্দের বছরসংখ্যা তথা বয়স নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের ওপর প্রকাশিত বক্তব্যগুলিই এই মতভেদের কারণ। ফলে এই অব্দ বা সনের উৎপত্তি নিয়েও বিভ্রান্তির অন্ত নেই।

বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন নিয়ে লেখালেখি ও আলোচনা বহুকাল ধরেই চলছে। কিন্তু এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনো জনমনে প্রস্ফুটিত হয়নি, বরং এর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত এর যথার্থ সূচনাকাল, সঠিক বয়স ও প্রকৃত প্রবর্তককে অস্পষ্ট করে রেখেছে। অথচ বঙ্গাব্দ বঙ্গদেশের অব্দ, বাঙালীর অব্দ—বাঙালী ঐতিহ্য ও বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতীক। খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো এই অব্দের সূচনাকালেরও একটা নির্দিষ্ট তারিখ ও বার আছে, একটা আদি বিন্দু আছে। এই অব্দ বা সন সম্বন্ধে বহু বছর ধরে প্রকাশিত শতাধিক বর্ণনার সারাংশ দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং অন্যত্র এযাবৎকালের আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত অব্দ বা সনের প্রবর্তক হিসাবে যে-চারটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলোঃ (১) সম্রাট আকবর, (২) সুলতান হুসেন শাহ, (৩) তিব্বতী শাসক স্রং-সন-গাম্পো ও (৪) গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক। এক বাঙলা পুঁথির তারিখ "সাকে ১৭২৩ যবন নৃপতে সকাব্দা ১২০৮" সম্ভবতঃ প্রথম মত-দুটির উৎস।

বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন সম্বন্ধে আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে আছে আকবরের নাম, তাঁর রাজ্যাভিষেক তথা সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের হিজরী সংখ্যা ৯৬৩ ও ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ। পি. এম. বাকচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা (১৩১৮, ১৩৪৮, ১৪০০ সাল), ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের 'Chronology of Nepal' (Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXII, 1936) শীর্ষক বর্ণনা, 'Report of the Calendar Reform Committee'-র (Govt. of India, 1955) বর্ণনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষ' (প্রথম খণ্ড)-এর 'অব্দ' শীর্ষক অংশ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', মুহম্মদ আবু তালিব রচিত ও বাঙলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বাংলা সনের জন্মকথা' গ্রন্থ, ডঃ রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীর 'The Scientific Base of Indian Astrology' (1993) গ্রন্থ, ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় অব্দ প্রসঙ্গ ও নববর্ষ' ('শারদীয়া জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত', অক্টোবর ১৯৯০) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ রমাতোষ সরকারের 'প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ' (১ বৈশাখ ১৪০০, বাঙলা একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ) পুস্তিকা, হরিপদ মাইতির 'বঙ্গাব্দ' ('দেশ', ১৩ আগস্ট ১৯৯৪) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রভৃতিতে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্রাট আকবরের পক্ষে মতপ্রকাশ করা হয়েছে।

'বিশ্বকোষ' প্রথম ও একবিংশ ভাগ (বি. আর. পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী) 'অব্দ' ও 'সংবৎসর' শীর্ষক বর্ণনা, ত্রিদিবনাথ রায়ের 'বাংলা সন' ('মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৫৬) শীর্ষক প্রবন্ধ, অশোক হালদারের 'বঙ্গাব্দ' ('আনন্দবাজার পত্রিকা' রবিবাসরীয়, ২৬, ৪. ১৯৮৭), 'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০০ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বঙ্গাব্দের জন্মরহস্য প্রসঙ্গে' শীর্ষক আলোচনায় হুসেন শাহ বাঙলা সনের প্রবর্তক। 'Le Nepal' গ্রন্থের লেখক মঁশিয়ে সিলভাঁ লেভির মতে তিব্বতী শাসক স্রং-সন-গাম্পোর

নামের অংশ 'সন' শব্দ থেকে বাঙলা সনের উৎপত্তি ও তিনি এর প্রবর্তক। 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকার পূর্ব উল্লিখিত প্রবন্ধে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত 'The History of Bengal', Vol. I, (1943) গ্রন্থের 'Relations of Tibet with India' শীর্ষক বর্ণনা প্রভৃতিতেও এ-মতের উল্লেখ দেখা যায়।

চতুর্থ মতানুসারে গৌড়াধিপতি মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। প্রখ্যাত গণিতাচার্য ও পঞ্জিকাবিদ্ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী পরিচালিত 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'য় (১৩৮০ সাল) এ-মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ অজিত-কুমার ঘোষের '১৪০০ সালের গলায় শতনরী হার' ('বিধাননগর সংবাদ', ১৪০০ সাল, ১ বৈশাখ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধ, ডঃ সুখময় সরকারের 'বাঙলা বর্ষ-গণনা প্রসঙ্গে' ('উদ্বোধন', পৌষ ১৪০০) শীর্ষক নিবন্ধ, বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ অতুল সুরের বক্তব্য ('দেশ', ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), ডঃ প্রসিতকুমার রায়চৌধুরীর 'বাংলা সন ১৪০০, সাল না অব্দ' ('বিভাসন', অক্টোবর-ডিসেম্বর '৯৩) শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রলয় ভট্টাচার্যের 'আজ পয়লা বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ' ('ওভারল্যান্ড', ১৪ এপ্রিল ১৯৯৩) প্রবন্ধ, ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়ের বক্তব্য ('উদ্বোধন', আশ্বিন ১৪০২) এবং গত বৈশাখ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই মত পোষণ করা হয়েছে। দেবসহায় ত্রিবেদীর 'The Fasli Era' (Journal of Indian History, Vol. XIX, 1940) শীর্ষক প্রবন্ধেও এই মত নিয়ে আলোচনা দেখা যায়।

বলা হয়, আকবরের সিংহাসনারোহণের বছর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের হিজরী সংখ্যা ৯৬৩ বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রথম বছর এবং (১৫৫৬ – ৯৬৩) অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই অব্দ বা সনের গণনা শুরু। তাই আকবরই এর প্রবর্তক। কিন্তু যে-আকবর জিজিয়া কর তুলে দিয়ে হিন্দুদের প্রীতিভাজন হন, যিনি নিজে হিজরী সনের অবলুপ্তি ঘটান—তিনি কেন ৯৬৩ হিজরীকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর করে হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের বিরাগভাজন হতে যাবেন আর তারাই বা কেন ৯৬৩ হিজরীকে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর বলে মেনে নেবে? আর আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হলে ৯৬৩ হিজরীতে ১ বঙ্গাব্দই হতো (যেমন হয়েছে 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দের ক্ষেত্রে ১ অব্দ), ৯৬৩ বঙ্গাব্দ কখনই নয়। তাছাড়া ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে বঙ্গাব্দ শুরুর কথা সত্যি হলে হিসাবেরও প্রচণ্ড গরমিল দেখা দেবে। কারণ, ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের কোন নির্দিষ্ট তারিখ থেকে ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্য এপ্রিল (৩১ চৈত্র ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হয়ে যাবে ১৪০০ সৌর বছরের পরিবর্তে ১৪০১ সৌর বছর। অতএব ঐতিহাসিক জয়সোয়ালের হিসাব (১৫৫৬ – ৯৬৩ = ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ) গোঁজামিল ছাড়া আর কিছু নয়। এই হিসাবেরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায় উল্লিখিত পঞ্জিকা সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন ও 'ভারতকোষ'-এর বর্ণনায়। তাই বলা যায়, আকবর বঙ্গাব্দের প্রবর্তক নন, ৯৬৩ হিজরী সংখ্যার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেও এই অব্দ বা সনের গণনা শুরু হয়নি।

সুলতান হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন করেন বলে যে-মত আছে তাও মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, পিতা হুসেন শাহ-প্রবর্তিত কোন অব্দ বা সন থাকলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র নসরৎ শাহ কখনই 'নছরৎশাহী সন' নামে আলাদা একটি অব্দ প্রবর্তন করতেন না। পরন্তু হুসেন শাহ-প্রতিষ্ঠিত কোন মসজিদের প্রতিষ্ঠাফলকে বাঙলা সনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমসাময়িক কোন বইপত্র বা নথিতেও হুসেন শাহ কর্তৃক বাঙলা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তাই বলা যায়, হুসেন শাহ বাঙলা সন প্রবর্তন করেননি।

শেরশাহ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাণকর্তা, আকবর 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দের প্রবর্তক, জব চার্ণক আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তনকার—এসব ঐতিহাসিক সত্য, প্রমাণোত্তীর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে আকবর, হুসেন শাহ বা স্রং-সন-গাম্পোর নাম কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এর পিছনে কোন প্রমাণ বা বিশ্বাস নেই। আর আকবর ও হুসেন শাহর সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয় যথাক্রমে ৯৮৩ বঙ্গাব্দ (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) ও ৯০৫ বঙ্গাব্দ (১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ) থেকে।

সমকালের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'-র ব্লকম্যান-কৃত ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থে আকবর কর্তৃক হিজরী সনের অবলুপ্তি, 'তারিখ-ই-ইলাহী' অব্দ প্রবর্তন প্রভৃতির কথা থাকলেও বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ নেই। আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমলের 'আসল-ই-জমা তুমার' গ্রন্থেও আকবর কর্তৃক উল্লিখিত অব্দ বা সন প্রবর্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বর্তমান কালের কিছু

বইপত্র, প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক প্রভৃতিতে আকবর তথা হুসেন শাহের পূর্বে বঙ্গদেশে 'বঙ্গাব্দ'-এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও উত্তর জীবনে খ্যাতিমান প্রশাসক অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় রচিত 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে '১০২ বঙ্গাব্দ'-র উল্লেখ; ১৩২০ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে প্রকাশিত ও বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড-রচিত 'চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস' গ্রন্থে 'বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল' বলে বর্ণনা; উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ও স্বামী সারদেশানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মসাল হিসাবে বাঙলা ৮৯১ সনের উল্লেখ; কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট) অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী (ফিরিঙ্গি কালী নামেও পরিচিত) মন্দিরের বর্তমান প্রতিষ্ঠাফলকে 'স্থাপিত ৯০৫ সাল' বলে উল্লেখ; ১৩২৪ বঙ্গাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত ও অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি-রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' (উত্তরাংশ ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ) গ্রন্থে 'সন ৯০৬ বঙ্গাব্দ'-র উল্লেখ; ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত ও প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবুদ্ধ) রচিত 'ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাঙলা ৯৭৩ সালের উল্লেখ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্ থেকে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ' (দ্বিতীয় খণ্ড) পুস্তকে প্রকাশিত বাঙলা ৯৮৫ সালে হাতে লেখা কাশীদাসের আদিপর্বের একখানি পুঁথির ফটো কপি প্রভৃতি বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে ও আকবর তথা হুসেন শাহ কর্তৃক এই অব্দ বা সন প্রবর্তনের কাহিনীকে ভিত্তিহীন করে দেয়।

উপর্যুক্ত বঙ্গাব্দ, বাঙলা সন বা সালগুলি পরবর্তী কালে খ্রীস্টাব্দ থেকে রূপান্তরিত (convert) করে লেখা—একথা কেউ কেউ বললেও তা ঠিক নয়। কারণ, খ্রীস্টাব্দ ব্যবহারকারী পর্তুগীজরা ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বঙ্গদেশে খ্রীস্টাব্দের ব্যবহার শুরু করে। কারণ, ঐ বছরেই শেরশাহের বিরুদ্ধে পর্তুগীজদের সাহায্যলাভের আশায় বাংলার সুলতান মামুদ শাহ তাদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। কার্যতঃ ইংরেজ আমলের সূচনা থেকেই বঙ্গদেশে খ্রীস্টাব্দের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

মঁশিয়ে সিলভাঁ লেভি বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে স্রং-সন-গাম্পোর নাম বললেও তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ দশকের মধ্যভাগে তিনি যদি কোন সন বা অব্দ প্রবর্তন করতেন তবে তা তিব্বত-সহ তাঁর বিজিত সমস্ত অংশেই বলবৎ হতো। তাছাড়া ঠিক ঐ সময় থেকে তিব্বতে কোন সন বা অব্দ প্রচলিত হয়েছে বলেও জানা যায় না।

এবার চতুর্থ মত অর্থাৎ শশাঙ্কের প্রসঙ্গ। শশাঙ্কের বংশপরিচয় এখনো অজ্ঞাত। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, গুপ্ত প্রশাসনে সামন্ত হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু, মহাসামন্তে উত্তরণ ও পরে দ্বিতীয় গুপ্তবংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্তের অধীনতামুক্ত হয়ে গৌড় নামক স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন তিনি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী হওয়ায় সমসাময়িক গ্রন্থে শশাঙ্ক সম্বন্ধে কোন সঠিক বিবরণ নেই। ঐতিহাসিকগণও শশাঙ্ক সম্বন্ধে নীরব। ফলে শশাঙ্ক সম্বন্ধে জনমনে এক বিরাট অস্পষ্টতা রয়েই গিয়েছে। বাণভট্ট, হিউয়েন সাঙ বা আবুল ফজলের মতো কোন লেখক বন্ধুও তাঁর ছিল না। আত্মভোলা, প্রচারবিমুখ, শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্ক অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও গৌড়বঙ্গে স্বাধীন রাজত্বের সূচনাকালের স্মারক হিসাবে করাননি কোন প্রতিষ্ঠাফলক, লেখেননি কোন আত্মজীবনী, রাখেননি কোন লিখিত বিবরণও। চার দশকেরও বেশি তাঁর পরাক্রমশালী রাজত্বকাল। তিনিই বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি। বর্তমান মালদহ জেলার কর্ণসুবর্ণে ছিল তাঁর রাজধানী। তাঁর রাজ্যসীমা বঙ্গদেশের বাইরেও বিস্তারলাভ করেছিল। কান্যকুব্জ, উড়িষ্যা, গঞ্জাম প্রভৃতি তিনি জয় করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ অনুযায়ী নিজ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রেখে ও স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করে এবং 'মঞ্জুশ্রী মূলকল্প'-র গ্রন্থকারের মতে পুত্র মানবদেবকে উত্তরাধিকারী রেখে মৃত্যুবরণ করেন তিনি (৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ)। ডঃ কালিদাস নাগ রচিত 'স্বদেশ ও সভ্যতা' (৩য় সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, "ষষ্ঠ শতকের শেষ অথবা সপ্তম শতকের প্রারম্ভে মহারাজ শশাঙ্ক গৌড়ে একটি স্বাধীন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন।" ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়-প্রণীত 'ভারত পরিচয়' (নতুন সংস্করণ, ১৯৭২) থেকে জানা যায়, "ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে ও সপ্তম শতকের প্রারম্ভে পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করে গৌড়রাজ্য। এই খ্যাতির মূলে ছিল মহারাজ শশাঙ্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব।" ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'শশাঙ্ক' ('ভারতকোষ', পঞ্চম খণ্ড) শীর্ষক বর্ণনা থেকে জানা যায়, "খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে অথবা তাহার কিছু পূর্বেই তিনি (শশাঙ্ক) বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা হন।" অতএব বলা যায়, ১৪০০ বছরের

অধিক বয়সী বঙ্গাব্দের প্রকৃত সূচনাকাল মহারাজ শশাঙ্কের আমলে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন, শশাঙ্কের আমলেই যদি বঙ্গাব্দের সূচনা হয়ে থাকে তাহলে প্রথম প্রায় হাজার বছর পর্যন্ত ঐ অব্দের প্রচলন-সংক্রান্ত নিদর্শনের অভাব কেন? বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে, বঙ্গভাষায় লেখা প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের উল্লেখ মেলা কষ্টকর কেন?

সমসাময়িক গ্রন্থে 'ঘোরতর বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী' বলে বর্ণিত ও মরণোত্তর কালে যিনি 'কুষ্ঠব্যাধির শিকার' আখ্যায় ভূষিত সেই শৈবধর্মাবলম্বী শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনাকাল এবং ঐ সময় থেকে প্রচলিত কোন সৌর অব্দের হিসাব কে রাখবে? মাৎসন্যায়ের যুগে বা পরবর্তী কালে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী পাল ও সেন রাজাদের আমলে শশাঙ্ক বা বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া কি সম্ভব? পরন্তু পাল ও সেন রাজাদের পৃথক পৃথক অব্দ থাকায় তাঁরাই বা কেন বঙ্গাব্দকে লালন-পালন করে টিকিয়ে রাখতে যাবেন? আর বঙ্গদেশের প্রাচীন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে ও বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দের উল্লেখ? বঙ্গদেশে কটা প্রাচীন মন্দিরের (খ্রীস্টীয় ষোড়শ অব্দের পূর্বেকার) অস্তিত্ব ও কখানা প্রাচীন পুঁথির হিসাব এখন পাওয়া যায়? বলতে গেলে সেসবই তো প্রাকৃতিক কারণে এবং সম্ভবতঃ বিধর্মীদের আক্রমণে নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেছে।

কোন বাদশাহী ফরমানে, সুলতানী নির্দেশনামায় বা রাজদত্ত দলিলপত্রে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সন প্রবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোন তাম্রশাসনে, মুদ্রায় বা অন্য কোন প্রাচীন পুঁথিপত্রে বঙ্গাব্দের সূচনাকাল সংক্রান্ত তথ্য মেলে না। বঙ্গাব্দের জন্মলগ্নের কোন জীবিত সাক্ষীও নেই। সম্ভবতঃ এসব কারণেই ঐতিহাসিকগণ বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে নীরব। অনেকে আবার বঙ্গাব্দের প্রবর্তক হিসাবে আকবরের পক্ষে মত প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন। তাই ঐসব ব্যক্তিরা নতুন করে আর বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চান না। সম্রাট আকবরকে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সনের প্রবর্তক হিসাবে মোটামুটি প্রতিপন্ন করে ঢাকার বাঙলা একাডেমি থেকে একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রবর্তক ও প্রবর্তনকাল নিয়ে কোন সার্থক গবেষণা হয়েছে বলে জানা যায় না। বঙ্গাব্দের উৎসভূমি গৌড়বঙ্গে বঙ্গাব্দের অবস্থা যেন 'নিজভূমে পরবাসী'র মতো। তাই বঙ্গাব্দের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক সূচনাকাল নির্ধারিত হওয়া একান্ত দরকার এবং তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাণিতিক পদ্ধতিই সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আর অব্দ, শতাব্দ, অধিবর্ষ প্রভৃতির সঠিক হিসাব ও প্রয়োগবিধি এজাকের প্রধান সহায়ক।

কালবোধক বর্ষনির্ণায়ক সংখ্যাই অব্দ। কোন শাসক, ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা থেকে অব্দের সূচনা ও প্রত্যেক অব্দেরই আরম্ভ ১ থেকে। অব্দ দুপ্রকার—সৌর ও চান্দ্র অব্দ। বুদ্ধাব্দ, খ্রীস্টাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বঙ্গাব্দ, হর্ষাব্দ, মল্লাব্দ প্রভৃতি সৌর অব্দ। হিজরী চান্দ্র অব্দ। সূর্যের চারদিকে ডিম্বাকার (উপবৃত্তাকার) আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবীর একবার পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড বা ৩৬৫.২৪২১৯৯ দিন সময়কে ১ সৌর অব্দ বা বছর বলে। সৌর অব্দের উল্লিখিত বর্ষমান বহু-পরীক্ষিত সত্য ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। খ্রীস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি অব্দগুলি সৌর বর্ষমানে গণিত। পৃথিবীর চারদিকে প্রায় গোলাকার আপন কক্ষপথে পশ্চিম থেকে পূর্বে চন্দ্রের ১২ বার পরিভ্রমণকাল অর্থাৎ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময়কে ১ চান্দ্র অব্দ বা বছর বলে। হিজরী চান্দ্রমানে গণিত। এক অমাবস্যা থেকে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত সময়কে ১ চান্দ্র মাস ও এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কে ১ সৌর দিন বলে।

সৌর অব্দের বর্ষমান পূর্ণসংখ্যক দিন না হওয়ায় এ অব্দের দিনসংখ্যাও প্রত্যেক বছর সমান থাকে না। সাধারণভাবে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা বা ৩৬৫.২৫ দিন হিসাবে বছর ধরে ৩৬৫ দিন হিসাবে সৌর বছর গণনা চলে ও প্রতি চতুর্থ বছরের দিনসংখ্যা ১ দিন বৃদ্ধি করে ৩৬৬ দিন করা হয় এবং ঐ ৩৬৬ দিনের বছরকে অধিবর্ষ (Leap-year) বলে। কিন্তু এভাবে চললে প্রতি বছরে ১১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ও প্রতি ৪০০ বছরে ৭৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই প্রতি ৪০০ বছরে ৩টি করে অধিবর্ষ কমে যায়। কিন্তু এভাবে চললেও প্রতি ৩৩২৩ বছরে ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড সময় বেশি গণনা হয়ে যায়। তাই ঐ সময়ে আরও ১টি অধিবর্ষ কম হয়, অর্থাৎ ঐ সময়ে মোট অধিবর্ষের সংখ্যা হয় প্রায় ৮০৫টি। কোন অব্দের অধিবর্ষ গণনার সঠিক নিয়ম জানা থাকলে গাণিতিক নিয়মে ঐ অব্দের আদিবিন্দু নির্ধারণ করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক অব্দ খ্রীস্টাব্দের বিষয়টি ধরা যাক।

১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর রবিবারে ঐ খ্রীস্টীয় বছরটি শেষ হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধির বিচারে ঐদিনেই খ্রীস্টাব্দের ১৯৯৫টি বছর পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। খ্রীস্টাব্দের পূর্বাপর অধিবর্ষ (জুলীয় ও গ্রেগোরিয়) গণনা-পদ্ধতি মেনে উল্লিখিত ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর থেকে পিছন দিকে (১৯৯৫ × ৩৬৫ + ৪৯৮ − ১০ − ৩) বা ৭,২৮,৬৬০ (সাত লক্ষ আটাশ হাজার ছয়শ ষাট)-তম দিন থেকেই শুরু খ্রীস্টাব্দের। উল্লিখিত ৭,২৮,৬৬০ সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ১,০৪,০৯৪ এবং ২ ভাগশেষ থাকে। অতএব ১ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শনিবার ছিল।

১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র (১৪ এপ্রিল ১৯৯৪) দিনটির গুরুত্ব বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পঞ্জিকাকারগণ ১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটিকে অধিবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারি ও বেসরকারি মতে উপর্যুক্ত ৩১ চৈত্র দিনটি আবার বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিন বলেও স্বীকৃত। সাধারণ মানুষও মনে করে, উল্লিখিত দিনেই বঙ্গাব্দের ১৪০০ বছরের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাই ঐ দিন থেকে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার নিয়ম মেনে ১৪০০ সৌর বছর পিছিয়ে (১৪০০ × ৩৬৫ + ৯৭ × ৩ + ২৪ + ২৫) বা ৫,১১,৩৪০ (পাঁচ লক্ষ এগার হাজার তিনশ চল্লিশ)-তম দিন থেকে শুরু বঙ্গাব্দের। উল্লিখিত ৫,১১,৩৪০ সংখ্যাকে ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় ৭৩০৪৮ এবং ৪ ভাগশেষ থাকে। অতএব ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ছিল সোমবার এবং খ্রীস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে তারিখটি হলো ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার। যেহেতু বঙ্গাব্দের সূচনার দিনটি সোমবার, যেহেতু সোমবার দিনটি শৈবধর্মাবলম্বীদের নিকট পরম পবিত্র এবং যেহেতু বঙ্গাব্দের সূচনাকালে অর্থাৎ ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশে মহাপরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্ক ভিন্ন আর কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির সন্ধান মেলে না—যিনি বঙ্গাব্দের সূচনা করতে পারেন অথবা যাঁর আমল থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা হতে পারে। তাই সঙ্গত কারণেই শৈবধর্মাবলম্বী মহারাজ শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রবর্তক এবং তাঁর আমল থেকে বঙ্গাব্দের সূচনা—একথা বলা যায়।

এখানে বঙ্গাব্দের অধিবর্ষ গণনার নিয়মটি বিশদভাবে বলা দরকার। নিয়মটি হলো ঃ সাধারণভাবে প্রতি ৪ বছর অন্তর অধিবর্ষ হয়। বঙ্গাব্দ বছরসংখ্যা থেকে ৭ বিয়োগ করার পর বিয়োগফলকে ৪১ দ্বারা ভাগ করলে যে-ভাগশেষ থাকে তা যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবেই ঐ বছর অধিবর্ষ হবে এবং ঐ বছরের চৈত্র মাসের দিনসংখ্যা ৩০ স্থলে ৩১ দিন হয়ে ঐ বছরের দিনসংখ্যা দাঁড়াবে ৩৬৬; কিন্তু ৪০০, ৫০০ ও ৬০০ দ্বারা বিভাজ্য বছরগুলি কখনই অধিবর্ষ হবে না। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ১০০, ১০১ থেকে ২০০ এবং ১ থেকে ৪০০, ৪০১ থেকে ৮০০ বছর —এই ক্রমে প্রতি ১০০ ও ৪০০ বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হবে যথাক্রমে অনধিক ২৫ ও ৯৭টি করে। উপর্যুক্ত নিয়মে যদি কখনো কোন ৪০০ বছরে ৯৮টি অধিবর্ষ আসে তবে সর্বশেষ অর্থাৎ ৯৮তম অধিবর্ষটি ৩৬৫ দিনের সাধারণ বর্ষই হবে, অধিবর্ষ হবে না।

উল্লিখিত নিয়মে ১৪০০ বঙ্গাব্দ বছরটি অধিবর্ষ। বঙ্গাব্দের ১ থেকে ৪০০, ৪০১ থেকে ৮০০, ৮০১ থেকে ১২০০, ১২০১ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত প্রতি ৪০০ বছরে অধিবর্ষের সংখ্যা হলো ৯৭টি এবং ১৩০১ থেকে ১৪০০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অধিবর্ষের সংখ্যা ২৫টি। এই নিয়মেই বঙ্গাব্দের পরবর্তী অধিবর্ষ হবে ১৪০৫ বঙ্গাব্দ বছরটি এবং পরে, প্রথম পর্যায়ে হিসাবের পরিধি ৪৩,২০০ বঙ্গাব্দ (যদি ততদিন বঙ্গাব্দ চালু থাকে) পর্যন্ত বিস্তৃত করলে ঐ সময় পর্যন্ত বঙ্গাব্দের সঠিক অধিবর্ষ-সংখ্যা (৪৩,২০০ ÷ ৪০০ × ৯৭ − ১৩) বা ১০,৪৬৩-র সঙ্গে প্রদত্ত অধিবর্ষ গণনার সূত্রানুসারে ঐ সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত অধিবর্ষ-সংখ্যা যথাযথভাবেই মিলে যাবে। উল্লিখিত নিয়মানুসারেই ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল সোমবার, ৩৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার, ৭০১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ এপ্রিল বুধবার, ১০৫১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ও ১৪০০ বঙ্গাব্দের ৩১ চৈত্র ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ছিল।

বঙ্গাব্দের উৎসমুখ তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এজন্য কে বা কারা দায়ী তা অনুসন্ধান করার থেকে জরুরী হলো খ্রীস্টাব্দ ও হিজরী সনের মতো বঙ্গাব্দেরও একটা সর্বজনগ্রাহ্য সূচনাকাল তথা আদিবিন্দু নির্ধারণ করা। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও এই অব্দের একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিতর্কমুক্ত আদিবিন্দু নির্ধারিত হওয়া একান্ত দরকার। ব্যক্তিবিদ্বেষ নয়, ব্যক্তিপ্রীতি নয়, খোলা মন এবং নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৌতূহলী ও অভিজ্ঞজনেরা এগিয়ে এলেই বিষয়টির নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে।□

ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত হাম্পি (প্রাচীন বিজয়নগর)

চিররঞ্জন মজুমদার

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বেলারী জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ভারত-ইতিহাসের একসময়ের বৃহত্তম হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে সম্প্রতি হাম্পিতে গিয়েছিলাম। হাম্পির ধ্বংসাবশেষ অতুলনীয় অতীত গৌরবের ইতিহাস বহন করছে। হরিহর ও বুক্কের হাতে ১৩৪৩ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত বিজয়নগরের গোড়াপত্তন হয় পম্পার তীরে বর্তমানের এই হাম্পি শহরে। ঐ সময়ে দিল্লীর সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘলক। শঙ্করা- চার্যের শৃঙ্গেরী মঠের আচার্য মাধব বিদ্যারণ্যের বুদ্ধি-কৌশলে ও সাহচর্যে এই হিন্দুরাজ্য গঠন সম্ভব হয়েছিল। রাজ্যের নামও হয়েছিল বিদ্যারণ্য। পরে অবশ্য রাজ্যের অনেক প্রসার হয়ে তা বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। বিজয়নগর অর্থাৎ 'সিটি অব ভিক্টরি'। হরিহর ও বুক্কের পর বীর নরসিংহ, কৃষ্ণদেব রায়, অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় বিজয়নগরের অধীশ্বর ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের কালে (১৫০৯-১৫২৯) ছিল বিজয়নগরের স্বর্ণযুগ। তাঁর সময় রাজ্য কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ জুড়ে পূর্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরবসাগর পর্যন্ত প্রসার পায়। প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অসংখ্য মন্দির, সৌধ, বাগিচা ও আরও নানা জাঁকজমকের ঠাঁট নিয়ে গড়ে উঠেছিল সেকালের বিজয়নগর। ব্যবসা-বাণিজ্যের ছিল রমরমা। হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে দশ লক্ষ সৈনিক অতন্দ্র প্রহরায় রত ছিলেন বিজয়নগরে। পারস্যের পর্যটক আবদুল রাজ্জাক এই নগর দেখে মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীতে এর তুল্য শহর আর নেই। পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ডোমিঙ্গ পায়েস বিজয়নগরের সঙ্গে রোমের তুলনা করেছিলেন। বিজয়নগর আজ ইতিহাসের মহাশ্মশান। বিজয়নগর বর্তমানে এক ভাঙা স্থাপত্যের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। এর জন্য দায়ী রাজা সদাশিব রায়ের মন্ত্রী রামরাজা। তারই ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের দরুন এই শক্তিশালী রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ১৫৬৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর টালিকোটার যুদ্ধে পাঁচ শাহীর (বিদার, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমদনগর ও বেরার) সম্মিলিত মুসলিম শক্তির কাছে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের পরাজয়ে ধ্বংস হয় তেত্রিশ বর্গকিলোমিটারের ওপর রাজধানী শহর হাম্পি। সেকালে রাজধানীর তিনদিকে ছিল পাথরের প্রাচীর আর একদিকে ছিল বেগবতী তুঙ্গভদ্রা। এখন ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় প্রাচীরের পাথরগুলি এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। পাথরের ওপর পাথর চাপানো আছে বিপজ্জনকভাবে। বর্তমানে বন্য প্রান্তরের রুক্ষতা, কিছু চাষবাস ও চরে বেড়ানো নানান গবাদি পশু ও আদিবাসীদের বাস চোখে পড়েছে ধ্বংসস্তূপে।

পুরাকালে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য নাকি এখানেই ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজা বালী আর সুগ্রীবের কথা পড়েছি রামায়ণে। সেই স্থানের ওপরই নাকি পরবর্তী কালে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বালী ও রাবণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাও মনে পড়ে। বালী সমুদ্রতীরে জপতপ করছেন। পিছন থেকে রাবণ আসছেন আক্রমণ করতে। বালী বুঝতে পেরেই চুপ করে আছেন। কাছাকাছি আসতেই তাঁর লেজ লম্বা করে রাবণকে পেঁচিয়ে ধরলেন। তারপর সাত সমুদ্র তের নদীর জলে চুবিয়ে রাবণের নাকালের একশেষ করলেন। এই হলো পৌরাণিক কাহিনী। সুগ্রীব বালীর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে গিয়েছিলেন রামের সাহসে, কিন্তু রাম সম্মুখ সমরে না এসে আড়াল থেকে শরক্ষেপ করে বালীকে বধ করেন। রামের জীবনে এত বড় কলঙ্ক বুঝি আর নেই! কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের সীমানা ছিল সমুদ্রের তীর পর্যন্ত। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের পদধূলিতে সেযুগের কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য ধন্য হয়েছিল। তুঙ্গভদ্রার উভয় তীরে ঋষ্যমূক পর্বতে সত্য ও ত্রেতা যুগের নানা নিদর্শন এখনো ছড়িয়ে আছে। অঞ্জনা পাহাড়, পম্পা নদী ও পম্পা সরোবর, মাতঙ্গ ঋষির আশ্রম এবং আরও সব পবিত্র স্থল।

হাম্পির ধ্বংসাবশেষ দেখার পক্ষে একদিনই যথেষ্ট। ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ১৫৩০-১৫৪২ সালের তৈরি পট্টভিরামা-মন্দির আজও সুন্দর পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে। এরই উত্তরে এলোমেলো শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে তুঙ্গভদ্রা। দশেরা দিব্বা বা বিজয়ভবানী-মন্দিরটি তৈরি করেন স্বয়ং কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যাজয়ের স্মারকরূপে। কম করেও একতলার সমান উঁচু ভিত। কারুকার্য খুবই মনোগ্রাহী। স্থাপত্যে দেখেছি নৃত্যপরা সুঠাম নারী, সেনাদল, হাতি

আর ঘোড়ার শোভাযাত্রা। এরপর পম্পাপতি মন্দিরের দেবতা বিরুপাক্ষ শিব দর্শন করেছি। সম্ভবতঃ ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণদেব রায়ের রাজ্যাভিষেকের স্মারক হিসাবে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। একখণ্ড পাথর কুঁদে বৃহৎ আকারের শিব রয়েছেন গর্ভমন্দিরে। আর আছেন বিরুপাক্ষ-জায়া দেবী পম্পা ভুবনেশ্বরী। এখনো তাঁদের নিত্যপূজা চলছে। শুনলাম, বিশেষ বিশেষ উৎসবাদিতে অনেক ভক্তের আগমন হয়। এছাড়া আরও অনেক দেবদেবীর মন্দিরও দর্শন করেছি। এগুলি চালুক্য ও পরবর্তী হোয়সলরাজদের স্থাপত্যরীতি অনুসারে তৈরি মূর্তিটি। লাগোয়া মন্দিরে জলমগ্ন শিবঠাকুর। এর পর আমরা রাজপ্রাসাদের চত্বরে চলে এলাম। প্রাকারে ঘেরা রাজপ্রাসাদটিরও ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। শুধুমাত্র ভিতটুকু আছে। তাতে প্রচুর সূক্ষ্ম কারুকার্য চোখে পড়ল। ভিতের বিস্তৃতি দেখলে সেকালের রাজপ্রাসাদটির বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা হয়। সামনে কুইন্স প্যালেস। প্রতিটি গম্বুজ স্ব স্ব ভাস্কর্যে আজও মহান। হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে তৈরি অপূর্ব স্নানাগারটির মাঝখানে আট ফিট গভীর জলাধার। সেকালে জল আসত পম্পা নদী থেকে। দুদিক থেকে সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে তলা পর্যন্ত।



একখণ্ড শিলা থেকে খোদিত নৃসিংহ-মূর্তি আলোকচিত্র ঃ চিররঞ্জন মজুমদার

বলেও পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন। হাম্পিবাজারমুখী মন্দিরের পূর্বে নয়তলা ৫০ মিটার উঁচু গোপুরমটি আজও মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আছে। মনে হয়, এটা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় শৈলীর সুউচ্চ গোপুরম বা তোরণদ্বার। বিরাট বিরাট চত্বর নিয়ে মূল মন্দির সেযুগ থেকেই চলে আসছিল। এরই দক্ষিণে সুবৃহৎ পাথরে খোদিত অবস্থায় দুটি গণেশমূর্তিও দর্শনীয়। আরও দক্ষিণে রাজপ্রাসাদের দিকে কিছুটা চলতেই ৭ মিটার উঁচু নৃসিংহমূর্তিটিও কম আকর্ষণীয় নয়। পাহাড় কুঁদে তৈরি হয়েছে মনোলিথ এই জলাশয়ের চারদিকে ঝুলন্ত ব্যালকনি। পদ্মাকার সুন্দর দ্বিতল বাড়ির লোটাস মহলও হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের এক নমুনা। রানীরা নাকি এই মহলের ওপরের খিলান থেকে রাজ-উৎসবাদি উপভোগ করতেন। তাই একে রানী-মহলও বলে। রাজপ্রাসাদের অপর পাশেই ১১টি কক্ষযুক্ত বিশ্বের বৃহত্তম রাজকীয় হাতিশালা। এর মাথার ওপরকার গম্বুজগুলি মুসলিম স্থাপত্যে তৈরি হয়েছে বলেই মনে হলো। একধারে জৈনমন্দিরও আছে। চলতে চলতে আরও অনেক ধ্বংসস্তূপে হাম্পির অতীতকে যেন রোমন্থন



বিরূপাক্ষ-মন্দির আলোকচিত্র ঃ চিররঞ্জন মজুমদার

রায়ের তৈরি। বিধ্বস্ত গোপুরম দিয়ে ঢুকতেই বিরাট আয়তাকার প্রাঙ্গণ। ৫৬টি থামে ভর করে প্রধান বিষ্ণুমন্দির ও কল্যাণমণ্ডপ। সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ভাস্কর্য-মণ্ডিত মিউজিক্যাল স্তম্ভগুলিতে সঙ্গীতের সুর বাজে। মন্দিরের মূল আকর্ষণ একখণ্ড শিলার বিরাট রথ। পাথরের চাকাগুলিতে গহনার ন্যায় সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম সকলকে মুগ্ধ করবে। গণেশমূর্তি ও হাতিগুলিও অক্ষত অবস্থায় আছে।

বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্যের গৌরব-গাথা আজ ইতিহাস। সেকালের ভাস্কর্য ও অপূর্ব শিল্পকলা-সমন্বিত বিভিন্ন স্থাপত্যের সাথে পরিচিত হতে হলে পর্যটক এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের অবশ্যই কর্ণাটকের হাম্পির ধ্বংসাবশেষ দেখতে হসপেটে আসতে হবে। হসপেট রেলস্টেশন থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাস টার্মিনাস। হসপেট থেকে আরও ১৩ কিলোমিটার গিয়ে হাম্পি—সেকালের রাজধানী শহর, ৩৩ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বর্তমান ধ্বংসাবশেষ। হসপেট থেকে ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে এসে তুঙ্গভদ্রা বাঁধ। দাক্ষিণাত্যের সর্ববৃহৎ তুঙ্গভদ্রা নদীর এই বাঁধ। ৫০০ মিটার লম্বা আর ৪৯ মিটার উঁচু বাঁধের জলাধারটি থেকে দুই মিলিয়ন একর জমিতে চাষের জল যাচ্ছে আর ৯৯,৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ভিউ

করায়। এর পর রাজপ্রাসাদ-চত্বর ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসে বামদিকের রাস্তা ধরে এসেই রাজপরিবারের গৃহদেবতা হাজারা রামস্বামীর মন্দিরটি দেখলাম। মন্দিরটির কারুকার্য আজও অক্ষত রয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান, ভিতরের ও বাইরের দেওয়ালে রয়েছে পাথরে খোদিত সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম। হস্তী, অশ্ব, পদাতিক বাহিনী-সম্মিলিত যুদ্ধযাত্রার দৃশ্যাবলী দারুণভাবে চোখ টানে। এরপর পশ্চিমদিকে বেশ কিছুটা এসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিঠলস্বামীর মন্দির দর্শন করলাম। সেকালের স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দিরও মহারাজা কৃষ্ণদেব

টাওয়ার ও বৈকুণ্ঠ গেস্ট হাউসের আবাসন থেকে বাঁধ তথা লেকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে অপূর্ব লাগে। মাছের পুকুর, জাপানী প্রথায় বাগিচা-পার্ক, হর্টিকালচার ফার্মও দর্শনীয়। বাঁধের পাশেই ১০০০ ফুট উঁচু কৈলাস পাহাড় এবং চূড়ায় হনুমান-মন্দিরটি দেখতেও মনোরম।

কর্ণাটকের হসপেট সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

দক্ষিণ-মধ্য রেলওয়ের গুন্টাকল-হুবলী সেকশনে গুন্টাকল থেকে ১১৬ এবং হুবলী থেকে ১৪৪ কিলো-মিটার দূরত্বে হসপেট একটি প্রধান রেলস্টেশন। কলকাতার যাত্রীদের হাওড়া থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

ফালুকনামা অথবা ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে সরাসরি হায়দ্রাবাদ পৌঁছে, ৭০৮৬ হায়দ্রাবাদ-ব্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস ট্রেনে গুন্টাকল জংশনে এসে ট্রেন বদল করে ৬৫৯২ হাম্পি এক্সপ্রেসে হসপেটে পৌঁছানো সহজ হবে। মোট দূরত্ব ২০৯০ কিলোমিটার। রেলভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লীপার শ্রেণীতে ৩০২ টাকা। হায়দ্রাবাদে ২-৩ দিন থেকে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত গোলকুণ্ডা দুর্গ, বিখ্যাত সালারজঙ্গ মিউজিয়াম, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এবং অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলিও দেখে ট্যুরিস্ট বাস প্রত্যহ সকাল ৯টায় ছেড়ে হাম্পি ও তুঙ্গভদ্রা দেখিয়ে বিকাল ৫টার মধ্যে ফিরে আসে। প্রতিজনের জন্য ৪৫ টাকা ভাড়া লাগে। অথবা অটো ভাড়া করেও একদিনের চুক্তিতে ১৫০ টাকায় হাম্পি ও তুঙ্গভদ্রা দেখে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। রেলস্টেশন-চত্বর পেরতেই শহরমুখী স্টেশন রোডে অনেক হোটেলে দুই বেডের জন্য দৈনিক ১২৫-১৭৫ টাকা মাশুল দিয়ে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। কম খরচে থাকার জন্য মিউনিসিপ্যাল প্রবাসী মন্দিরে ডরমিটরি প্রথায় মাথাপিছু দৈনিক ৩০ টাকায়



হাম্পি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আলোকচিত্র ঃ চিররঞ্জন মজুমদার

নেওয়া যেতে পারে। আবার হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর এক্সপ্রেস ট্রেনে সরাসরি ব্যাঙ্গালোরে এসে রাত ৯.৫৫-র হাম্পি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে পরদিন সকাল ৭.৪৫-এ হসপেটে পৌঁছানো যায়। তবে এ পথে হাওড়া থেকে দূরত্ব ২৫৪০ কিলোমিটার হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লীপার শ্রেণীর রেলভাড়া ৩৪০ টাকা। ব্যাঙ্গালোর সিটি থেকে বাসপথে ৩৪০ কিলোমিটার দূরত্বে হসপেটে আসতে ৮-৯ ঘণ্টা সময় লাগে।

হসপেট বাস টার্মিনাসের পিছনেই তালুক অফিস সার্কেলে কে.এস.টি.ডি.সি. (K.S.T.D.C)-র সরকারি ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে। অক্টোবর থেকে মার্চ ভ্রমণের সবচেয়ে ভাল সময়। শীতের প্রাবল্য সেরকম একটা নয়। তবে অক্টোবর-নভেম্বরে বৃষ্টির আবহাওয়াতে কোন কোন সময়ে অসুবিধা হতে পারে।

উত্তরের সাথে দক্ষিণ ভারতের অনেক কিছুই মিল নেই। কর্ণাটকের ভাষা কানাড়ী, উত্তরের হিন্দীর সাথে কোন মিল নেই। সুতরাং কথাবার্তা প্রধানতঃ ইংরেজীতে অথবা ইশারাতেই চালিয়ে নিতে হবে। ওঁদের বিবাহপ্রথায় বরকে সেজেগুজে 'কাশীযাত্রা' করে সকালেই কনের বাড়িতে আসতে হয়। শিবের বেশে কন্যাকে বিয়ে

করার প্রচলন। অধিবাসীরা প্রধানতঃ শান্ত, শিষ্ট, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত বলা চলে। মেধাশক্তিতে কর্ণাটকী সঙ্গীত বিশ্বের দরবারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত বলা চলে। এঁদের প্রিয় খাবার ইডলি, ধোসা এবং দইবড়া। ভাতের



হাম্পির ধ্বংসাবশেষ, এলোমেলো শিলাখণ্ড আলোকচিত্র ঃ চিররঞ্জন মজুমদার

ভারতরাষ্ট্রে দক্ষিণীরা আজ অনন্য। এঁরা প্রধানতঃ ধর্মপরায়ণ। প্রত্যেক বাড়ির সামনে আলপনা দিয়ে নানারূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রথা লক্ষ্য করেছি। সঙ্গে রশম, সম্বর, টকদই ও তেঁতুলের চাটনি থাকবেই। এখানে প্রধানতঃ নিরামিষ খাবারের প্রচলন বেশি। চায়ের বদলে এঁরা সাধারণতঃ কফি পান করেন।□

শ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী মাধবানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাশক্তি হইয়াও শ্রীশ্রীমা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিয়াই তাঁহার দিব্য-জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার পুণ্যপ্রভাব অলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অসংখ্য নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়াছে। নতুবা তাঁহার অদর্শনের পর তাঁহার নামে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইত না। তাঁহার জন্মস্থান জয়রামবাটীতে তাঁহার মর্মরবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর যে অপূর্ব আনন্দ-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা উহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উহা শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুত আকর্ষণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিকই যেখানে যথার্থ ঐশী শক্তির বিকাশ, সেখানে ঐরূপই হইয়া থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দ এক পত্রে লিখিতেছেন ঃ "... যে-বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি নে, সব মার নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি—অপার করুণা!... স্বয়ং ঠাকুরকেও ওটি করতে দেখিনি। তিনিও কত বাজিয়ে বাছাই করে লোক নিতেন। আর এখানে—মার এখানে কি দেখছি? অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা, মা! জয় মা!"

শ্রীমার এইরূপ অবারিত দ্বার ছিল বলিয়াই আমাদের মতো অনেকে তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। মনে পড়ে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের একটি দিনের কথা। পূজনীয় শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন কলিকাতায় বলরামবাবুর বাটীতে (বর্তমান বলরাম মন্দিরে)। আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অন্য দু-চার কথার পরে লেখককে বলিলেন ঃ "আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও। তাহলে সব হবে।" প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই শ্রীশ্রীমার মহিমা যথার্থ বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। মানুষ নিজ নিজ মনোভাব অনুসারেই জগতের সব জিনিস দেখিয়া থাকে। তাই জগন্নাথদর্শন করিতে গিয়া কাহারও কাহারও পুঁইমাচা দেখা আশ্চর্যের কথা নয়। ১৯০৮ সালের শেষভাগে পঠদ্দশায় তিন বন্ধুর সহিত জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শনলাভ করি। দুঃখের বিষয়, সেই দর্শনের অতি অস্ফুট স্মৃতিই এখন মনে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী যাই ১৯১০ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, মঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পূজনীয় বিরজানন্দ স্বামীর সহিত। তখন তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। মনে আছে, মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইতে ব্যগ্র ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনি যে, ঠাকুরই সব ; সাধন-ভজন সকলের সহজসাধ্য নয়, উহা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া করিতে হয় এবং সঙ্ঘের কাজ ঠাকুরেরই সেবা। ১৯১৩ সালের শেষের দিক হইতে বৎসর দুই কাল উদ্বোধনে থাকিবার সময় শ্রীশ্রীমা কলিকাতায় আসিলে তাঁহার নিত্য দর্শনলাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার কথা মনে উঠে নাই। তাঁহার চরণতলে বাস করিতেছি, ইহা ভাবিয়াই তৃপ্তিবোধ করিতাম।

তাঁহার শেষ দর্শন লাভ করি জয়রামবাটীতে ১৯১৮ সালে। কি উদ্বোধনে কি অন্যত্র, অনেক ছোটখাট ব্যাপারের মধ্য দিয়া তাঁহার সহজ অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ ও অহেতুক করুণার নিদর্শন পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ইহাতে আমাদের গুণপনা কিছু নাই, ইহা তাঁহারই জগজ্জননী-সুলভ মাহাত্ম্য। পরে যখন ভক্তগণরচিত তাঁহার স্মৃতিকথা পাঠ করি, তখন এক-একবার মনে হইয়াছে, মাকে ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হয়তো ভাল হইত। কিন্তু তাঁহারই উক্তি হইতে আমরা ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি দীক্ষাদান-কালে শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য।

স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও সূক্ষ্মশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ জীবোদ্ধার-কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি পতির অদর্শনের পর অত দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় মায়াবন্ধন গ্রহণ করিয়া ধরাধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ধর্মজগতের ইতিহাসে তাঁহার তুলনা মিলে না। শিবশক্তির এই অপূর্ব লীলা অনুধ্যান করিবার সুযোগ পাইয়া আমরা সকলেই ধন্য হইয়াছি। মহাপুরুষগণের দেহবিয়োগে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি আরও ব্যাপকভাবে কার্য করিতে থাকে। জগতের সকল নরনারী তাঁহার দিব্য জীবন ও উপদেশামৃত আস্বাদন করিয়া অমরত্ব লাভ করুক, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা।★ □

সংগ্রহ ঃ স্বামী চেতনানন্দ

★ উদ্বোধন ঃ শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ চিত্রকূট ধাম

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০২ সংখ্যায় চিররঞ্জন মজুমদারের 'চিত্রকূট ধাম' পড়লাম। খুব ভাল লাগল। লেখককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে লেখাটিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রথমতঃ, লেখক লিখেছেন ঃ "বুন্দেলখণ্ড মালভূমির পাধার অঞ্চলে... চিত্রকূট ধাম অবস্থিত।" কিন্তু কথাটি 'পাধার' নয়, হবে 'পাদার'। দ্বিতীয়তঃ, লেখক তুলসীদাসের জন্মস্থানের নাম লিখেছেন 'রামপুর গ্রাম'। যদিও তুলসীদাসের জন্মস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে তবে 'রামপুর' নামে কোন গ্রামে তুলসীদাসের জন্ম হয়েছে বলে শোনা যায়নি। লেখক ভুল করেছেন, এটি হবে 'রাজাপুর'। তৃতীয়তঃ, লেখক লিখেছেন রামঘাট থেকে চার কিলোমিটার দূরে হনুমানধারায় গিয়েছেন। তারপর হনুমানধারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে কাম্‌তানাথে গিয়েছেন। লেখকের দূরত্বের হিসাবে কিছু ভুল হয়েছে। আসলে সবাই রামঘাটে স্নান করে কাম্‌তানাথজীকে প্রথমে দর্শন করেন, তারপরে চিত্রকূটের বাকি দর্শনীয় স্থান ঘুরতে যান।

মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়
বাঁদা, উত্তরপ্রদেশ-২১০০০১

প্রসঙ্গ 'উদ্বোধন'

আমি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক এবং পাঠক। গত পৌষ ১৪০২ সংখ্যায় পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসাধারণ ভাষণ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান' পড়ে আমি অভিভূত। বস্তুতঃ, আমার অনুভূতিকে কোন বিশেষণ দিয়ে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে আমি অসমর্থ। শুধু বলি, পূজনীয় মহারাজের আলোচনা এককথায় অনবদ্য। মহারাজ মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছেন, মা যেন সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক যা আমাদের শুধু চোখকেই তৃপ্তি দেয় না—হৃদয়-মনকে আনন্দে পূর্ণ করে। বলেছেন, ঠাকুর যেন সূর্য—অনন্ত, অসীম তেজোময়। আমরা তাঁর প্রচণ্ড তেজ সইতে পারি না।

মায়ের জীবন আমাদের জীবনকে পূর্ণ করুক। তাঁর জীবনের শিক্ষায় আমরা যেন সমস্ত ভেদাভেদ, রেষারেষি, দলাদলি ভুলে সবাইকে আপন করে নিতে পারি। আজকের সঙ্কটময় সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে মায়ের জীবন আমাদের আলোর পথ দেখাতে পারে। পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজের হৃদয়স্পর্শী ভাষণ উপহার দেবার জন্য 'উদ্বোধন'-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাজেশ দে
ফরিদপুর, দুর্গাপুর, বর্ধমান-৭১৩২১৩

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ সংখ্যাটি পড়ে কি যে আনন্দ পেলাম তা বলতে পারব না। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণে বলেছেন ঃ "মায়ের কথা বলতেও আনন্দ, শুনতেও আনন্দ।" পূজ্যপাদ মহারাজেরই অনুসরণে বলি—মায়ের কথা পড়তেও আনন্দ। পূজ্যপাদ মহারাজ বলেছেন, মায়ের কথা যখন শুনি তখন মনে হয় "আমার অন্তরের কথাই তিনি বলছেন।" খুব খাঁটি কথা। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ মহারাজ শ্রীশ্রীমা-সম্পর্কে তাঁর এই অসাধারণ ভাষণে আমাদের সকলের মনের কথাগুলিকেই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

পৌষ সংখ্যাতে অন্যান্য পূজ্যপাদ মহারাজদের শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে আলোচনা এবং অন্যান্য লেখক-লেখিকার মাতৃস্মরণে নিবেদনগুলি পড়ে মন বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছে। বস্তুতঃ, মায়ের সম্পর্কে পড়তে গেলে কী এক গভীর আকুতি জাগে প্রাণে, এক অপূর্ব ভাবের তরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের মনকে ঈর্ষা-দ্বেষ-কলুষক্লিষ্ট সংসার থেকে অনেক দূরে। এক পরম নির্ভরতার শান্ত আশ্রয়ে মন যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনার অর্থ নারীর মূল্য এবং মাতৃত্বের মহিমা সম্পর্কে সম্যক্‌ভাবে অবহিত হওয়া। সে-আলোচনায় মায়ের অভয় আশ্রয় এবং বিশ্ব-মাতৃত্বের মহিমার বোধ যেন সবসময়েই জেগে থাকে প্রাণে—"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।"

> “ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণে বলেছেন ঃ "মায়ের কথা বলতেও আনন্দ, শুনতেও আনন্দ।" পূজ্যপাদ মহারাজেরই অনুসরণে বলি—মায়ের কথা পড়তেও আনন্দ। ”

মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বরঞ্জন নাগের "স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম'-ভাষণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান" প্রবন্ধটিও খুবই সময়োচিত। তবে বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানের নিতান্ত অভাবে লেখকের সব বক্তব্য ঠিকমত বোধগম্য হয়নি। 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স', 'তরঙ্গ

সমীকরণ', 'দুর্বল অন্তর্বল' ও 'সবল অন্তর্বল' এবং 'শূন্যে সঞ্চিত অসীম শক্তি'—এই পারিভাষিক শব্দগুলির একটু ব্যাখ্যা পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বুঝতে সুবিধা হতো। শক্তিকণাগুলির বৃত্তাকার গতি ও ক্রমসঙ্কোচন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কিছু আছে কিনা খুবই জানতে ইচ্ছা করে।

প্রীতি ভট্টাচার্য
দলমাদল সরণি, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

কয়েক বছর ধরে আমি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক। বড় প্রিয় আমার 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন' আমার ধ্যান, 'উদ্বোধন' আমার জপ। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা (কথাপ্রসঙ্গে, ভাষণ, ধর্মবিজ্ঞান, পরিক্রমা, স্মৃতিকথা, পরমপদকমলে প্রভৃতি) পড়তে পড়তে আমি যেন সেগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। এক-এক দিন ৭/৮ পৃষ্ঠা অথবা একটি-দুটি রচনার বেশি পড়তে পারি না। পড়তে পড়তে বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে যাবার চেষ্টা করি। পড়ার পর স্তব্ধ হয়ে যাই। এই স্তব্ধতা থাকে পরের দিন আবার পাঠ শুরু করা পর্যন্ত। স্তব্ধতার কারণ মুগ্ধতা। আমার প্রাণের ইচ্ছা, 'উদ্বোধন' আরও বহু লোক পড়ুক, 'উদ্বোধন' প্রতিটি বাঙালীর ঘরে ঘরে থাকুক। আমি কয়েকজনকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক করেছি। আমি ভিন্ন আমার স্ত্রী এবং পুত্রও 'উদ্বোধন'-এর খুব আগ্রহী পাঠিকা ও পাঠক। 'উদ্বোধন'-এর দৌলতে আমাদের পরিবারের পরিবেশ খুব ভাল হয়েছে। আমরা নিত্যই অনুভব করি, আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও জ্ঞানের শুভ উদ্বোধন ঘটিয়েছে আমাদের প্রিয় 'উদ্বোধন'।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০

'উদ্বোধন'-এর মাঘ ১৪০২ সংখ্যা এককথায় দারুণ। অনুপম। প্রচ্ছদটি বড়ই সুন্দর। প্রচ্ছদের বিবরণ পড়ে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির ও ইনসেটে মা হংসেশ্বরীর আলোকচিত্র 'উদ্বোধন'কে তার কর্তব্যকর্মের আদর্শপথে ভাস্বর করে তুলেছে। প্রথমেই 'কথাপ্রসঙ্গে' "'উদ্বোধন' জাতির উদ্বোধক" সেই আদর্শব্রতচিত্রকে প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেছে নতুনভাবে এবং অতুলনীয় যুক্তিনিষ্ঠতায়। 'ভাষণ' বিভাগে স্বামী ভূতেশানন্দজীর 'স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা' এবং 'অনুধ্যান' বিভাগে স্বামী নির্বাণানন্দজীর 'স্বামীজীর কথা' পড়ে অভিভূত হতে হয়। কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত, বিশেষ করে 'হোয়াইট বার্চ লজ' আর 'অমৃতাভ' পাঠককে স্তম্ভিত করে, শ্রদ্ধাবনত করে। স্বামী সর্বাত্মানন্দের 'পরিক্রমা' নিবন্ধ 'নিউ ইয়র্কে কয়েকদিন' পড়ে আমাদেরও মানসভ্রমণ হয়ে যায়। সুমণি মিত্রের ধারাবাহিক নিবন্ধে পাই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে স্বামীজী-ঘোষিত 'সত্যযুগ'-এর আবির্ভাবের অদ্ভুত প্রাজ্ঞব্যাখ্যা। সন্দীপন বিশ্বাসের 'অন্য নেতাজী', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমপদকমলে' রচনাদুটিও মাঘ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। বিজ্ঞান-নিবন্ধ 'অনন্ত যৌবনের সন্ধানে' পড়ে মনে হলো অনন্ত-যৌবন 'উদ্বোধন' পাঠেই মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অনন্ত যৌবন লাভ করা সম্ভব।

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ
বেনুছায়া, কাঁথি
মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

'উদ্বোধন'-এর নতুন প্রচ্ছদ

'উদ্বোধন' মাঘ ১৪০২ সংখ্যার প্রচ্ছদপট দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। পত্রিকার মধ্যে প্রচ্ছদের বিবরণ পড়ে আনন্দ আরও বেড়ে গেল। দেখেছি, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর শয়নকক্ষে মা হংসেশ্বরীর একখানি আলোকচিত্র রাখতেন। ঐ আলোকচিত্র তাঁর এমনই প্রিয় ছিল যে, রাত্রে বিশ্রামের মধ্যেও মাঝে মাঝে উঠে টর্চ জ্বেলে মায়ের ছবিটি তিনি দেখতেন। বাকি অন্যান্য কথা প্রচ্ছদ-বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে। শুনেছিলাম, রাজা নৃসিংহদেব কাশীতে মায়ের যে-স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন তাতে মন্দিরের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে পূজার সমস্ত বাসন-কোসন পাওয়া যাবে—এই নির্দেশও ছিল। জানি না, আমার শোনা এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য।

ব্রজগোপাল দত্ত
লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩

বহুদিন আগে বাঁশবেড়িয়ার রানী শঙ্করী দেবী-প্রতিষ্ঠিত হংসেশ্বরী-মন্দিরের কথা শুনেছিলাম। তখন থেকেই আমার ধর্মপ্রাণ হৃদয়ে হংসেশ্বরী-মন্দির সম্পর্কে একটি আনন্দঘন অনুভূতি লালন করে আসছি। দুঃখের বিষয়, বহুদিনের ইচ্ছে থাকলেও আজও মন্দির ও দেবী-দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটেনি। আমার সেই অপূর্ব বাসনার সার্থক সমাধান করে দিয়েছে 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের অপূর্ব প্রচ্ছদটি। আমার প্রিয় ঐতিহাসিক হংসেশ্বরী-মন্দির এবং দেবীর মূর্তির আলোকচিত্র-সহ 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদ যখন আমার হাতে এল, মনে হলো এ যেন আমার কাছে মায়ের আশীর্বাদ—মায়ের পায়ে নিবেদিত ফুল। 'উদ্বোধন' বরাবরই আমার প্রিয় পত্রিকা। আমি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা। প্রতিটি সংখ্যার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকি। কিন্তু এবছর যেন এই প্রচ্ছদটির জন্য 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বর্ষ আরম্ভের লগ্নে 'উদ্বোধন'-এর অভিনব, অনবদ্য এবং পবিত্র এই উপহারের কথা স্মরণ থাকবে চিরকাল। পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অসংখ্য ধন্যবাদ 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদককে।

রমা দাশগুপ্তা
যশোর রোড, কলকাতা-৭০০০২৮

কেঁদুলীর মেলা ঃ এক শাশ্বত কালের মেলা

দিলীপকুমার দত্ত

উপকরণ নিন মাত্র কয়েক মুঠো সরষে—পায়ের নিচে ছড়িয়ে দেবার জন্য; আর যৎসামান্য পাথেয়—শুধু যাওয়া-আসার গাড়িভাড়া বাবদ। ভোলানাথের ঝোলাঝুলিও ফেলে রেখে আসুন বাকি তিনশ বাষট্টি দিনের একঘেয়ে শহর গ্রামের ডেরায়। শেষ পৌষের আমন্ত্রণী চিঠির খোলা পাতা আপনার বুকের ডাকঘরে পাবেনই পাবেন। ব্যস, তার ডাকে সাড়া দিয়ে কলকল্লোলে লাজ দেওয়া অজয়ের প্রবল প্রাণবন্যায় শরীর-মন-আত্মা সব কিছু নিয়ে তলিয়ে যাবার অগাধ আনন্দলহরী—সে তো আপনার হাতের মুঠোয়। হরিকথা শুনিয়ে আপামর বিশ্ববাসীর মনকে সরস করে ছেড়েছেন কবি জয়দেব, আর আপনি সেই জয়দেবের মাটিতে পৌঁছে শুধু নিজেকে ছেড়ে দিন পায়ের নিচে সরষে ফেলে, দেখবেন আপনার মতো হরিপদ কেরানীও একাকার হয়ে যাবেন কবি অরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে, গলা মিলিয়ে তাঁর সঙ্গে আবৃত্তি করে উঠবেন ঃ

"মাড়িয়ে ছাওন পা টেনে নেয় হলুদ বালিয়াড়ি
জল পেরুলেই কদমখণ্ডী বাউলগানের বাড়ি,
ঠিক বাড়ি নয় বাড়ির মতন, জানলা দরজা
দুহাট করে খোলা,
দেয়াল-টেয়াল ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে আকাশে
আলভোলা
এইখানেতেই গানভাসি এক পাখির ওড়াউড়ি
তিনটি দিনের বাড়ি আমার তিনটি দিনের বাড়ি
ঠিক বাড়ি নয়, গানের বাগান, বাউল বাগানবাড়ি।"

দেখবেন মানুষের ঢল তিনটি দিনরাত্রির সারাক্ষণ জুড়ে মুহর্মুহঃ আছড়ে পড়ছে অজয়ের উত্তরতীর বরাবর লম্বায় এক মাইলেরও বেশি আর প্রস্থে আধমাইল জায়গা জুড়ে কেঁদুলীর মেলায়। আবালবৃদ্ধবনিতা দলে-বেদলে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চলেছে। কোন পিছুটান রাখেনি। "ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে"—সকাল-সন্ধ্যায় আখড়ায় আখড়ায় পরিবেশিত হচ্ছে গরম ধোঁয়া-ওঠা খিচুড়ি। জাতের কিংবা অর্থের কোন কৌলীন্যের বিচার সেখানে নেই। দুপুরে অজয়ের হাঁটুজলে গড়াগড়ি স্নান আর ঘুরতে-ঘুরতে ছুটতে-ছুটতে দুপুরে কি মধ্যরাতে কি ভোররাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে গানভাসি সেই অজস্র আখড়ার সামিয়ানার নিচে কোথাও একটু ফাঁক খুঁজে নিয়ে চটের ওপর গড়িয়ে নেওয়া কিংবা চেয়ারে বসেই দুচোখ এক করে দেওয়া—গান শুনতে শুনতে ক্লান্তিহর ঘুমটুকু ঠিক এসে যাবেই।

এই মেলা মুখ্যতঃ বাউলমেলা, আধুনিকতার বা বিলাসী নাগরিকতার অজস্র প্রলেপ পড়লেও এই মেলা ফকির, বাউল-সাধকদের মেলা—যাঁরা মানুষতত্ত্বকেই ভজনের সার করে তোলেন তাঁদের গানে, তাঁদের জীবনচর্যায়। তাঁরা উচ্চারণ করেন ঃ

"এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন,
তাইতে মানুষরূপ গঠিল নিরঞ্জন।"

প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন জাতবিচারী গোটা দুনিয়ার প্রতি ঃ

"আসবার সময় কী জাত ছিলে
এসে তুমি কী জাত নিলে
যাবার সময় কী জাত হবা
একবার ভেবে তা বল না।"

বিভেদপ্রসারী দুনিয়ায় এই কেঁদুলীমেলার প্রাসঙ্গিকতা তাই শাশ্বতকালের। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নে অশান্ত আজকের ভারতের বুকে এই মেলা হতে পারে তার নিত্যকালের আলোকবর্তিকা। তার বিশ্বজয়ী অধ্যাত্ম-গৌরবের মূল্যকে, তার বিবিধের মাঝে মহান মিলনের ঐতিহ্যকে—শান্তির ললিতবাণীকে চিরস্থায়ী করতে পারে ফকির, বাউল, লালনের এই মন্ত্রই—

"ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই॥"

কেঁদুলীর বাউলমেলা প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমানে যেন আরও বেশি মাত্রা পেয়েছে। মেলাকমিটির মূল বাউলমঞ্চে গতবারের শ্লোগান ছিল—"বিভেদ নয়, সম্প্রীতি বড়।" সন্ধ্যা-সকাল তিনটি রাতভর বাউলগানের আসরেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে পুরুষ-নারী-শিশু-বৃদ্ধ বাউল সাধক-সাধিকার কণ্ঠে ঘুরেফিরেই এসেছে সম্প্রীতির আবেদন। এমনকি সাধনদাস বৈরাগ্যের দলের জাপানী বাউল-সাধিকা মাকি কাজুমীর কণ্ঠেও "সময় গেলে আর কি ফেরানো যায়", "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়" প্রভৃতি গানের পাশে আন্তরিক আবেদনে আমাদের লজ্জা দিয়ে মর্ম ছুঁয়ে যায়—"মন আমার মথুরা রে, মন আমার মদিনা রে...।"

একের পর এক বাউলগান শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগলে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার আরও হাজারো উপকরণ পাবেন কেঁদুলীর মেলায়। অজয়ের তীরে বাঁধ ধরে

কদমখণ্ডীর ঘাট ছাড়িয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে স্থায়ী অস্থায়ী অজস্র আখড়া, মন্দির যেখানে সামিয়ানার নিচে দিনরাত জুড়ে চলেছে কীর্তন-কথকতা-ধর্মালোচনা-যাত্রা, আরও কত কী যে! দেখা যাবে নানা প্রদর্শনী—অজস্র দোকানপসার। তীর ছেড়ে একটু ভিতরে ঢুকলে পুতুলনাচ-সার্কাস-ভ্রাম্যমাণ চিড়িয়াখানা প্রভৃতির পাশাপাশি আধুনিক শহুরে মেলায় যা দেখা যায় সেই বিশাল বিশাল আকারের নানা ধরনের বিদ্যুৎচালিত নাগরদোলাও। কয়েক ঘণ্টার জন্য শৈশবকে ফিরিয়ে আনলে মন্দ কি! একটা কথা—অজয়ের পাড়ে মাটি দিয়ে লেপা বিশাল বিশাল চৌকো অমসৃণ ঢিবিগুলোকে কারও সমাধি বলে মনে হবে হয়তো। তবে অপেক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে—সেই ঢিবি ভেঙে বার হচ্ছে শত শত কাঁদি পুষ্ট পাকা কলা—যেমন মিষ্টি তেমনই ঠাণ্ডা। কলা পাকাবার এ এক বিচিত্র উপায়।

বাউলের গানে আর অজয়ের শীতল বাতাসে প্রাণ-মন ভরিয়ে সারা মেলা জুড়ে ঘুরে ঘুরে দেখা যায় মাটির পরে লুটিয়ে চলা অগণিত পরিচয়হীন মানুষকে, তাদের জীবনকে, তাদের প্রাণের উচ্ছল প্রবাহ আর ব্যাকুলতাকে। দেখা যায় কিভাবে তারা তিলে তিলে সঞ্চয় করে চলেছে হৃদয়-মনের উর্ধ্বগামী উত্তরণের তথা তীর্থের পুণ্যকে, কিভাবে তারা রক্ষা করে চলেছে সত্য-মঙ্গল আর আত্মার বিকাশমন্ত্রকে, ধারণ করে রেখেছে চিরভাস্বর ধর্মকে। আর এসব দেখতে দেখতে ধুলায় ধুলায় ধূসর হয়ে যে-কেউ ঠিক পৌঁছে যাবেন সেই চির-অম্লান উপলব্ধিতে, যে-উপলব্ধি নিয়ে বাউল-গুরু রবীন্দ্রনাথ একান্ত মুগ্ধতায় উচ্চারণ করেছিলেন :

"কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির বুকে ধুলামাটির মানুষ।"

কেঁদুলীর এই মেলায় এসে আপনি অবশ্যই বুক ভরে সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারবেন—না, মেলার কোন চটকদার ভোগ্য-পসরা নয়, ফিরতে পারবেন এ-মেলার সেরা পসরা—নিরক্ষর ধুলামাটির মানুষের পরিপূর্ণ হৃদয়কে, মাটির বুকে ভেদহীন মেলবন্ধনের মন্ত্রে দীক্ষিত পবিত্র মানবমনকে সঙ্গে নিয়ে—যে-মনের অতল গহ্বর থেকে নিয়ত উচ্চারিত হয় : "মন আমার মথুরা রে, মন আমার মদিনা রে...।"

এই মন্ত্রই তো শাশ্বত ভারতের প্রাণগরিমার উৎসমুখ, যা কেঁদুলীর মেলা বহন করে আসছে আবহমান কাল ধরে।□

গ্রাহকবর্গের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : মাঘ ১৪০২ সংখ্যার ডাকযোগে অপ্রাপ্তি

বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি অর্থাৎ মাঘ ১৪০২ (জানুয়ারি ১৯৯৬) সংখ্যাটি আমরা গত ২১ জানুয়ারি ১৯৯৬ কলুটোলা আর. এম. এস.-এ ডাকে দিয়েছিলাম। গত ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৬ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে ছুটি থাকায় গত ২১ জানুয়ারি পোস্ট অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থামত পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়েছিল। গ্রাহকবর্গের মধ্যে যাঁরা ডাকযোগে 'উদ্বোধন' সংগ্রহ করেন তাঁদের কাছে যা খবর পেয়েছি বা এখনো পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যা বা মাঘ সংখ্যা অনেক গ্রাহক এখনো পাননি। যাঁরা যথাসময়ে (অর্থাৎ একমাস পর বা ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬-এর পর) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁদের সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট কপি' পাঠানো হয়েছে বা হচ্ছে। আমাদের মনে হচ্ছে, প্রধানতঃ আজীবন গ্রাহকদের একটি বড় অংশই মাঘ সংখ্যাটি ডাকযোগে পাননি। যাঁরা মূল সংখ্যাটি পাননি তাঁরা যদি অবিলম্বে আমাদের জানান তাহলে আমরা তাঁদেরকে সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট কপি' ডাকে পাঠিয়ে দেব। তবে ডাকবিভাগের বর্তমান অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কারও ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার অসুবিধা না থাকে তাহলে তিনি বা তাঁরা যেন ব্যক্তিগতভাবেই (By Hand) উল্লিখিত সংখ্যাটির 'ডুপ্লিকেট কপি'টি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এতে ডাকযোগে পুনরায় অপ্রাপ্তি-বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করার অসুবিধা থাকলে অবশ্য ডাকযোগেই পাঠানো হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকবর্গের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন অবিলম্বে মাঘ সংখ্যার 'ডুপ্লিকেট কপি'র জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ, আমাদের মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পরে মানুষ আবার জীবন পাবে অনন্তের কোলে। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'রেসারেকশান'। ফ্র্যাঙ্ক জে. টিপলার তাঁর গ্রন্থ 'দ্য ফিজিক্স অব ইমমর্টালিটি'তে বলছেন : "I shall show exactly how physics will permit the resurrection to eternal life of everyone who has lived, is living and will live. I shall show exactly why this power to resurrect which modern physics allows will actually exist in the far future, and why it will in fact be used. If any reader has lost a loved one, or is afraid of death, modern physics says—'Be comforted, you and they shall live again.'"

হিন্দুদর্শনে জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ,
নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো,
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" (গীতা, ২।২০)

দেহখাঁচায় একটা ভ্রম আটকে গেছে। আমি আমার, তুমি তোমার। এই ভ্রম কার নেই? যোগীর।

"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥"
(গীতা, ২।৬৯)

সাধনা হলো অনুভূতির স্তর বেয়ে সত্যে উপনীত হওয়া। 'রিয়ালিটি' বস্তুটা কী? হিন্দুদর্শন বলবেন 'ভ্রম'। এই ভ্রমকেই যন্ত্রবিজ্ঞান বলবে 'রিয়ালিটি'। উলটোটাই হলো ভ্রম। ঈশ্বর অনুভূতিতে। বাস্তবে অপ্রমাণিত। অনুভূতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সাধকের সাধনার ধন। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি তাঁকে দেখা যায়, তবে তোমার ঐ নয়নে নয়। ওটা তো ক্যামেরা। প্রেমের নয়ন চাই। প্রেমের শরীরে রমণও সম্ভব। অর্থাৎ য়ুফরিয়া (euphoria), a feeling of elation। এক চমকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ। সমস্ত নার্ভাস সিস্টেমটা অন্যরকম হয়ে যাওয়া। ক্ষুদ্র 'আমি'তে বিশাল 'আমি'র ঢুকে পড়া। আকাশ হয়ে যাওয়া, খ হয়ে যাওয়া।

কার্ল ইয়ুঙ্গ বলছেন, এইটাই প্রকৃত 'সিক্রেট', প্রকৃতই গোপনীয়। আমরা যখন কিছু গোপনীয় রাখতে চাই, অর্থাৎ আমি জানি কিন্তু অপরকে জানাব না, যেমন গুপ্তধন, কি গোপন কথা, তখন সেটা আর 'সিক্রেট' থাকে না, সেটা হয়ে যায় 'ওপন সিক্রেট'। ইয়ুঙ্গ বলছেন : "For as soon as you keep a secret it is already an open secret : you know about it and other people know about it, and then it is no longer a secret. The real secrets are secrets because no one understands them. One cannot even talk about them, and of such a kind are the experiences of kundalini yoga."

একেবারে ঠাকুরের কথা। বিদ্যাসাগর মশাইকে বললেন, সব কিছুই উচ্ছিষ্ট হয় একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া। ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হয় না। আবার বলছেন, নুনের পুতুল সাগর মাপতে গিয়েছিল। সে আর ফিরে এল না। একাকার হয়ে গেল। সমাধি থেকে একমাত্র অবতাররাই নেমে আসতে পারেন। নেমে এসে তিনি কি বলেন, ব্রহ্মের কথা বলতে পারেন কী? না, তিনি আনন্দে বালকবৎ হয়ে যান অথবা জড়বৎ কিংবা পিশাচবৎ। বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে অক্ষম। ভগবান বলছেন :

"আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্,
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি,
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥"
(গীতা, ২।২৯)

আত্মা, সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। একথা শুনেছি, কিন্তু সেই আশ্চর্য আত্মস্বরূপকে জানতে পারিনি! কেন পারিনি! কারণ ব্রহ্মে 'ডুয়ালিটি' নেই। তুমি আমি, আমার তোমার নেই। অহং বললে সোঽহং থাকে না।

ঠাকুর বললেন ঃ 'হাম্বা হাম্বা!' বলদের বরাত। জোয়াল পরাচ্ছে, লাঙল চাপাচ্ছে, রোদে জমি চষাচ্ছে, বেধড়ক পেটাচ্ছে, হাম্বার ইতর পরিণতি। অবশেষে কসাইখানায়। কাটা হলো। চামড়া গেল জুতো হতে। হাড় গেল সার হতে। নাড়ি-ভুঁড়ি শুকিয়ে চড়ল গিয়ে একতারাতে। তখন 'তুঁহুঁ' বোল। 'হাম্বা'র অবসান।

এক এবং অদ্বৈত। দুই এবং দ্বৈত হয় কি করে! ওটা মধ্যপন্থা—আস্বাদনের পথ। ভক্তির পথ। লীলার পথ। বোঝার সুবিধে। এক লাফে ছাদে হনুমানের দ্বারা ওঠা সম্ভব হলেও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে একসময় এঁকি এঁকি বলে অহং-এর পাঁচিলের ওপারে ঝাঁপ!

যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' আছে ততক্ষণ এই দেহ, এই জগৎ, এই দুঃখ-সুখ সব সত্য বলেই ধরতে হয়। ইয়ুঙ্গ বলছেন ঃ "The instinct of individuation is found everywhere in life, for there is no life on earth that is not individual. Individuation takes place only when you are conscious of it, but individuality is always there from the beginning of your existence." আত্মজ্ঞান ও চেতনা, দুটি দুধারা। মানুষ জন্মের পর কয়েক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। এইটাই আমাদের ধারণা। প্রি-কনসাসনেস, অথবা কসমিক কনসাসনেস সে ভিন্নতর গবেষণা। অতঃপর তার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান কিন্তু আত্মস্বরূপে জাগ্রত হয় না। জাগ্রত হয় দেহস্বরূপে। আমি, আমার নাম, ঠিকানা, বংশ, বড়লোক, মধ্যবিত্ত, গরিব, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ইত্যাদি বোধে জাগ্রত হওয়া। আমি। অসংখ্য আমি সারা বিশ্বময়। এইবার সারকথা বলছেন তন্ত্র ঃ "Ahamkar makes you who you are now, Kundalini makes you into what you will become."

কথাটা এই, যা ঠাকুর বলছেন এই ভাবে—মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্যই হলো ঈশ্বরকে জানা। ভগবান আছেন, এই বোধই হলো জ্ঞান। আর বলছেন, মূলাধার জাগ্রত না হলে অনুভূতি হয় না। তারপরেই বলছেন, কে চায় তাঁকে জানতে!

টিপলার মানুষের মানবত্ব ও যাবতীয় অহং-এর খেলাকে মেনে নিলেন। বিজ্ঞান মনুষ্য নামক জীবটি সম্পর্কে যা বলছে তা নস্যাৎ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করলেন না, বরং বললেন ঃ "The resurrection theory requires us to accept that a human being is a purely physical object." আত্মার পুনরুত্থান তত্ত্বের জন্যে মানুষকে পুরোপুরি একটি ভৌত প্রাণী বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রাণীটি কেমন—"a biochemical machine completely and exhaustively described by the known laws of physics", অর্থাৎ একটি জৈব-রাসায়নিক যন্ত্র, পদার্থবিদ্যার যাবতীয় তত্ত্বসহায়ে যার বর্ণনা সম্ভব। "There are no mysterious 'vital' forces." অলৌকিক কোন প্রাণশক্তির অস্তিত্ব সেখানে নেই। "More generally, it requires us to regard a 'person' as a particular (very complicated) type of computer program, the human 'soul' is nothing but a specific program being run on a computing machine called the brain."

টিপলার বলছেন, এইটাই আমি চাই। এর ওপর দাঁড়িয়ে আমি প্রমাণ করব ঃ "I shall show that accepting this allows us to show not only that we shall be resurrected to eternal life, but also that we have free will."

বলেই বলছেন ঠাকুরের সেই কথা, স্বামীজীর সেই কথা, আমাদের চৈতন্যময় সত্তার কথা—"We are indeed machines, but we in contrast to the machines we ourselves have built, possess true free will."

ঠাকুরের শেষ বিদায়বাণী ঃ "তোমাদের চৈতন্য হোক!" অর্থাৎ চৈতন্যে তোমাদের পুনর্জন্ম হোক।□

সংশোধন

গত চৈত্র ১৪০২ সংখ্যার ১৫৬ পৃষ্ঠায় 'বিজ্ঞান সংবাদে'র ১ম কলমের ৩য় পঙ্ক্তিতে "১ বিলিয়ন প্রকৃতপক্ষে এক হাজার কোটি"র স্থলে "১ বিলিয়ন প্রকৃতপক্ষে ১ লক্ষ কোটি" হবে। —সম্পাদক, উদ্বোধন

ভিটামিনের কার্যকারিতা

সৈয়দ আনিসুল আলম

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভিটামিন বি$_{১}$ আবিষ্কার করেন ক্যাসিমিন ফ্র্যাঙ্ক। এরপর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে হপকিন্স ভিটামিন গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

ভিটামিন-এর গ্রীক শব্দাংশ ভাইটা (Vita) । এর অর্থ জীবন। ভাইটার সঙ্গে একটি রাসায়নিক গ্রুপ অ্যামিন (amine) যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে ভিটামিন শব্দ। এর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভিটামিন ছাড়া মানবজীবন রক্ষা অসম্ভব। তাই এর অপর নাম খাদ্যপ্রাণ। ভিটামিনের বিপাকক্রিয়া থেকে কোন শক্তির উৎপাদন হয় না। অথবা প্রত্যক্ষভাবে ভিটামিন কোন দেহকোষ গঠন করে না। ভিটামিন অনুঘটক হিসেবে এনজাইমগুলোকে সক্রিয় করে, খাদ্যবস্তু থেকে শক্তির বিকাশে সাহায্য করে এবং বিপাকক্রিয়ার সময় খাদ্যবস্তুকে দেহের গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এছাড়া প্রোটীন, ফ্যাট ও শর্করা বিপাক-ক্রিয়ার জন্য ভিটামিন অপরিহার্য। ভিটামিনের অভাব ঘটলে মানবদেহে নানারকম জটিল ও মারাত্মক রোগ জন্মে। যেমন বেরিবেরি, রিকেট, চক্ষুরোগ, চর্মরোগ ইত্যাদি অসংখ্য রোগ। তাছাড়া দেহের অপুষ্টি, দুর্বলতা ও মনের বৈকল্য আসে। ভিটামিনের সাধারণভাবে দুটি শ্রেণী—(১) ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'ডি', ভিটামিন 'ই' এবং ভিটামিন 'কে'; (২) জলে দ্রবণীয় ভিটামিন। যেমন ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, ভিটামিন 'সি' এবং ভিটামিন 'পি'।

ভিটামিন 'এ' ঃ ভিটামিন 'এ'-র দুটি উৎস—প্রাণীদের থেকে প্রাণীজ ভিটামিন এবং উদ্ভিদ থেকে পাই উদ্ভিজ্জ ভিটামিন। প্রাণীদের দেহ থেকে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়—মাংসের চর্বিতে, মাছের তেলে, কডলিভার তেলে, ডিমের কুসুমে; দুধ ও দুধজাত খাদ্যদ্রব্যে—ছানা, পনির, মাখন, ঘি, দই, দুধের সর প্রভৃতিতে; উদ্ভিদ থেকে—টাটকা সবুজ শাকসবজিতে—পালং শাক, বাঁধাকপি, লেটুস এবং কড়াইশুঁটি, টমেটো, গাজর, রসুন, অঙ্কুর-সহ ছোলা, গমের আটা, আতপচাল, সয়াবিন, সুজি, যব ও বিভিন্ন ডালে। কলের সাদা ময়দা, সাদা চাল, সিদ্ধচাল, মার্জারিন, ডালডা, সরষের তেলে ভিটামিন 'এ' থাকে না। উদ্ভিদ থেকে আমরা সরাসরি ভিটামিন 'এ' পাই না। উদ্ভিদ থেকে আমরা 'ক্যারোটিন' নামক রঞ্জক পদার্থ (Pigment) পাই, যা পাকাশয়ের কোষে ভিটামিন 'এ'-তে পরিবর্তিত হয়। ফলের মধ্যে পাকা আম, পাকা পেঁপে, পাকা কলা, কমলালেবু, পীচ, খুবানিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

'এ' ভিটামিনের অভাবে রাতকানা ইত্যাদি চোখের অসুখ হয়, দেহত্বকের ক্ষয় হতে থাকে, দেহ রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হারায়। গায়ের চামড়া শুকনো, আঁশযুক্ত এবং খসখসে হয়ে যায়। তাছাড়া শিশুদের দাঁত ও হাড়ের বৃদ্ধি স্তিমিত হয়। অবশ্য ভিটামিনের অভাবের সঙ্গে প্রোটীনের অভাব যুক্ত হলে এই অবস্থা হবেই। তবে ভিটামিন 'এ' বেশি খেলে এর বিষক্রিয়া হয়। এই বিষক্রিয়ায় চুল উঠে যাওয়া, চামড়া খসখসে হওয়া, মাথা ব্যথা, পাতলা বাহ্যে, ক্ষুধামান্দ্য, বমিভাব, হাড়ে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। বেশি পরিমাণে কডলিভার অয়েল বা হাঙরের তেল, যকৃৎ, গাজর খেলে অথবা ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ খাদ্য বেশিদিন ধরে প্রচুর আহার করলে এই সকল মন্দ লক্ষণ দেখা দেয়।

ভিটামিন 'ডি' ঃ এর অপর নাম 'ক্যালসিফেরল'। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে থাকা ছাড়াও এই ভিটামিন তৈরি হয় ত্বকে—সূর্য থেকে আলট্রাভায়লেট রশ্মির প্রভাবে।

ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায় ইলিশ ও খয়রা মাছে, দুধ ও মাখনে, ডিমের কুসুমে। সবচেয়ে বেশি থাকে কড ও হাঙর মাছের তেলে।

শীতকালে শিশুদের গায়ে তেল মাখিয়ে রোদে রাখলে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই ভিটামিন ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। এই ভিটামিনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে শিশুদের হাড় ও দাঁত গঠনে। ভিটামিন 'ডি' ক্ষুদ্রান্ত্রের ঝিল্লিকোষ মাধ্যমে ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামকে শোষণ এবং আত্তীকরণের (assimilation) কাজ পরিচালনা করে। এই ভিটামিন তাপে, অম্লক্ষার ও জারণে নষ্ট হয় না, জলেও দ্রবীভূত হয় না। একমাত্র ফ্যাট বা স্নেহপদার্থেই দ্রবীভূত হয়। এই ভিটামিন ত্বকে, অস্থিতে, প্লীহায় এবং মস্তিষ্কে অল্প পরিমাণে জমা থাকে, বিশেষভাবে যকৃতেই বেশি থাকে। ভিটামিন 'ডি'-এর ঘাটতির ফলে শিশুদের

রিকেট হয়, হাড়ের গঠন নরম হয়, সহজে বেঁকে যায়, দাঁত উঠতে দেরি হয়। মাথার ওপরের তরুণাস্থি (epiphysis) সুগঠিত হতে পারে না। মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে কোমর ও পিঠ নুয়ে যায়। এর প্রতিরোধে ভিটামিন 'ডি'-এর সঙ্গে ক্যালসিয়াম প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই' (টোকোফেরল) ঃ প্রজনন-বিষয়ে এই ভিটামিনের বিশেষ কার্যকারিতা আছে। ভিটামিন 'ই' প্রায় সবরকম দৈনন্দিন খাদ্যে পাওয়া যায়—চাল, গম, যব, ডাল, ভুট্টা ইত্যাদি নানাজাতীয় শস্যে, সবজিতে, অঙ্কুরিত ছোলা এবং ডিমের হলুদ অংশে, যকৃতে ও মাংসে। এছাড়া গমের অঙ্কুর-তেলে (Wheatgerm oil) থাকে বেশি। এই ভিটামিন প্রতিদিন ৫ থেকে ১৫ গ্রাম আবশ্যক। এর ঘাটতি হলে রক্তের লোহিতকণিকার আয়ু কমে যায় এবং অ্যানিমিয়া হতে পারে। এর অভাবে রক্তের শ্বেতকণিকাও বিনষ্ট হতে পারে।

ভিটামিন 'কে' ঃ পশুর যকৃতে এবং বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক ও অন্যান্য সবজির মধ্যে এই ভিটামিন যথেষ্ট পাওয়া যায়। রক্ত জমাট বাঁধার কাজে প্রোথ্রমবিনের আবশ্যক। ভিটামিন 'কে'-এর ঘাটতি হলে রক্তে প্রোথ্রমবিন কমে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হতে চায় না।

ভিটামিন 'সি' (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড) ঃ ভিটামিন 'সি' স্কার্ভিরোগকে প্রতিষেধ এবং নিরাময় করে। পূর্বে দূর সমুদ্রগামী নাবিকদের এই রোগ হতো এবং অনেকে প্রাণ হারাত, কারণ তাদের শুকনো ফল খেয়ে বহুদিন থাকতে হতো। শুকনো ফল ও শাকসবজিতে এই ভিটামিন থাকে না, টাটকা সবুজ শাকসবজি এবং ফলে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এই রোগে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত, ক্ষুধাহীনতা, দেহের দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। পাতিলেবু, কমলালেবু, টমেটো, পালং শাক, বাঁধাকপি, গাজরে এই ভিটামিন প্রচুর থাকে। তাছাড়া এটি থাকে শশা, আম, জাম, আনারস, পেঁপে, লিচু, পেয়ারা, আপেল, কুল, কলা, ঢেঁড়স, লেটুস, পটল, ফুলকপি, রসুন, পেঁয়াজ, আলু, দুধ, দই প্রভৃতি খাদ্যে। অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ, সীমবীজে এই ভিটামিন প্রচুর উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা দেহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় ঃ (১) সংক্রামক রোগ প্রতিষেধ, (২) রক্ত পরিষ্কার, (৩) দাঁত ও হাড়ের গঠনে তরুণাস্থি (Cartilage) এবং সংযোজক কলা (Connective Tissue) গঠনে অংশগ্রহণ এবং (৪) রক্তবহা সূক্ষ্ম নালীগুলোকে (Capillary) সুস্থ রাখা।

ভিটামিন 'সি' জলে সহজেই দ্রবণীয়, তাই সবজি কেটে জলে ভিজিয়ে রাখলে, ধুয়ে ফেললে অথবা সিদ্ধ করে জল ফেলে দিলে অধিকাংশ ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য ফল ও সবজি প্রথমে ধুয়ে নিয়ে তারপর কাটলে ভাল। রান্নার সময় সিদ্ধ করা তরকারির জলও ফেলা উচিত নয়। সবজি-খণ্ড বড় করাই ভাল, এতে ভিটামিন নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকে। এই ভিটামিন তাপ সহ্য করতে পারে। দুধ বারবার ফোটালে বা সর পড়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে ফোটাতে থাকলে অনেকখানি ভিটামিন নষ্ট হয়। আলোর প্রভাবে, বেশি টকে এর ক্ষতি হয়। হাঁড়ির মুখ খুলে রান্না করলেও এই ভিটামিন নষ্ট হয়। চিনি-সহ জেলি, জ্যাম বা আচার করলে ভিটামিন 'সি' তেমন নষ্ট হয় না। ফ্রিজে রাখা ফল বা সবজির ভিটামিন প্রায় কিছুই নষ্ট হয় না। রোদে শুকনো ফল বা সবজির ভিটামিন প্রায় অর্ধেকের বেশি নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া তামার পাত্রে রান্না করা খাদ্য ভিটামিন 'সি'-বিহীন হয়ে যায়।

শিশুর ভিটামিন 'সি'-এর প্রয়োজন বেশি। তার দাঁত ও দেহের অস্থি সুগঠিত হবার জন্য এই ভিটামিন আবশ্যক। এজন্য শিশুর মাকে ঠিকমত টাটকা সবুজ শাকসবজি, তাজা ফল ইত্যাদি খাওয়ালে মায়ের বুকের দুধে এই ভিটামিন থাকবে এবং শিশুর এই ভিটামিনের অভাব হবে না। শিশুরা ৬ মাস বয়স থেকে টাটকা ফল ও সবজি খেতে পারে।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ঃ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সে একই শ্রেণীর কতকগুলি ভিটামিন রয়েছে। দেহের পুষ্টিরক্ষার জন্য এগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সে আছে—(১) বি$_{১}$ বা থিয়ামিন, (২) বি$_{২}$ বা রিবোফ্লেবিন, (৩) বি$_{৬}$ বা পাইরিডক্সিন, (৪) ফোলিক অ্যাসিড, (৫) বি$_{৭}$ বা নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং (৬) বি$_{১২}$ বা সয়ানো কোবালামিন। এই ভিটামিনগুলো পরস্পর সহযোগিতায় দলবদ্ধভাবে কাজ করে। এই গোষ্ঠীর আর কয়েকটি ভিটামিন—প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, আইনোসিটল, বায়োটিন এবং প্যারা-অ্যামাইনোবেনজয়িক অ্যাসিড। এদের অভাবজনিত রোগ বড় একটা দেখা যায় না। সেজন্য এখানে এদের আলোচনা করা হলো না।

ভিটামিন বি$_{১}$ ঃ চাল, গম, ডাল ইত্যাদিতে প্রচুর থাকে; দুধ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃত, তাজা

শাকসবজি ও বিভিন্ন ফলে পাওয়া যায়। তাছাড়া বাদাম, নারিকেল, আখরোট, পিঁয়াজ, শশা, গাজরেও পাই। এই ভিটামিন শর্করাজাতীয় খাদ্যবিপাকে অংশ নেয়, ক্ষুধা অক্ষুণ্ণ রাখে, স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখে। থিয়ামিনের অভাব হলে ক্ষুধামান্দ্য, হজমের গোলমাল, দুর্বলতা, দেহের ওজন হ্রাস, মাথা ধরা, দেহতাপমাত্রার হ্রাস, অনিদ্রা ও বুক ধড়ফড়, ড্রপসি বা শোথ, অ্যানিমিয়া ইত্যাদি হতে পারে। বেশি ঘাটতি হলে বেরিবেরি নামক কঠিন রোগ হয়।

থিয়ামিন জলে দ্রবণীয়। এজন্য কাটা সবজি জলে ভিজিয়ে রাখলে বা জলে ধুয়ে সেই জল ফেলে দিলে এবং ভাতের ফ্যান, সিদ্ধ করা তরকারির জল ফেলে দিলে থিয়ামিন নষ্ট হয়। উচ্চ তাপে অনেকক্ষণ রেখে রান্না করলে, চাল ও গমের ওপরের লাল খোসা ফেলে দিলে অর্থাৎ কলে ছাঁটা চাল ও ময়দায় ভিটামিন বি$_১$ প্রায় থাকে না। খাদ্যে সোডাজাতীয় ক্ষার ব্যবহার করলে থিয়ামিন ক্ষয় হয়। ফ্রিজে কিংবা কাচের শিশিতে ঠাণ্ডায় রাখলে ফল ইত্যাদির ভিটামিন 'বি'-এর খুব কমই ক্ষতি হয়। আমাদের সাধারণভাবে প্রতিদিন ১.০ থেকে ১.২ মিলিগ্রাম এই ভিটামিনের প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন বি$_২$ (রিবোফ্লেবিন) : ফ্যাটি অ্যাসিড ও শর্করার বিপাকে অংশ নেয় এবং খাদ্যবিপাকের সময় তা থেকে শক্তি বের করতে এবং তাকে আত্তীকরণ করতে কাজে আসে। ভিটামিন বি$_২$ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, অঙ্কুরিত ছোলা, সবুজ শাক, কড়াইশুঁটি, সিম ইত্যাদিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। দুধে যথেষ্ট পরিমাণ এই ভিটামিন আছে।

আলোর প্রভাবে ভিটামিন বি$_২$ নষ্ট হয়। তাই দুধ বা দুধের বোতল অনেক সময় ধরে রোদে পড়ে থাকলে তা নষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে যে, এই ভিটামিনও জলে দ্রবণীয়।

রিবোফ্লেবিনের ঘাটতি হলে কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়, আলোতে চোখ করকর করে, চোখ থেকে জল পড়ে, চোখ চুলকায় ও লাল হয়ে যায়। মুখ ও ঠোঁটের কোণ ফাটে। এই ভিটামিন সাধারণভাবে দৈনিক ১.৩ থেকে ১.৭ মিলিগ্রাম প্রয়োজন।

ভিটামিন বি$_৬$ (পাইরিডক্সিন) : পাইরিডক্সিন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংশ্লেষে ও বিশ্লেষে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। চাল, গম, বিভিন্ন ডাল, মাছ, মাংস, দুধ ও সমস্ত সবুজ শাকসবজিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। তাছাড়া অঙ্কুরিত ছোলায় এই ভিটামিন যথেষ্ট তৈরি হয়। যে-সকল খাদ্যদ্রব্যে প্রচুর পরিমাণ থিয়ামিন এবং রিবোফ্লেবিন থাকে সেই সকল খাদ্যে পাইরিডক্সিনও পাওয়া যায়। এই ভিটামিনের ঘাটতির ফলে ক্ষুধামান্দ্য, ঘুমঘুম ভাব, অবসাদ, বমিভাব, চর্মরোগ, চোখের প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে। শিশুদের এই ভিটামিনের অভাবে দেহের বৃদ্ধি কমে যায় এবং অ্যানিমিয়া হতে পারে।

ফোলিক অ্যাসিড : উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ভিটামিন, জলে দ্রবণীয়। দেহকোষের নিউক্লিও প্রোটীন সংশ্লেষের কাজে একান্ত আবশ্যক। নতুন রক্তকণা সৃষ্টিতে এর ভূমিকা রয়েছে। দেহকোষের বিভাজনে এবং নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করতে ফোলিক অ্যাসিড সাহায্য করে। গাঢ় সবুজ শাকে, পালং ও হিঞ্চে শাকে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। তাছাড়া ছাগলের যকৃত ও মাংসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সিদ্ধ খাবারে ফোলিক অ্যাসিড নষ্ট হয় না, তাই পরিমাণে বেশি থাকে। ফোলিক অ্যাসিডের অভাবে রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা কমে, দেহের ওজন কমে, পাতলা পায়খানা হয়। অ্যানিমিয়ার চিকিৎসায় ফোলিক অ্যাসিড ভিটামিন বি$_{১২}$-এর সঙ্গে ব্যবহার করলে ফল ভাল হয়।

ভিটামিন বি$_৭$ বা নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড : থিয়ামিন ও রাইবোফ্লেবিনের মতো এই ভিটামিনও শর্করাজাতীয় খাদ্য বিপাকক্রিয়ায় সহায়তা করে। দুধ, মাছ, মাংস ও ডিমে এই ভিটামিন থাকে। তাছাড়া গোটা দানাশস্যে, যেমন চাল, গম, ডাল ইত্যাদিতে যথেষ্ট আছে। কিন্তু কলে ছাঁটা চাল অথবা ময়দায় এই ভিটামিন অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। এর ঘাটতি হলে পেলেগ্রা নামক রোগ হয়।

ভিটামিন বি$_{১২}$ বা কোবালামিন : এই ভিটামিন মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগের (pernicious anaemia) প্রতিরোধক হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এই ভিটামিন রক্তে লোহিত কণিকা উৎপাদন ও বৃদ্ধির সহায়ক। শর্করা, প্রোটীন ও ফ্যাট বিপাকে এবং অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধির কাজেও সাহায্যকারী। স্নায়ুকলার বিপাকক্রিয়াতেও এই ভিটামিন অংশ নেয়। নিউক্লিক অ্যাসিড, নিউক্লিও প্রোটীন তৈরি করতে এর প্রয়োজন হয়।

ভিটামিন বি$_{১২}$ পাওয়া যায় যকৃতে, ডিমে ও দুধে। এর অভাবে পার্নিসাস অ্যানিমিয়া হতে পারে। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় দেখা যায়। প্রতিদিন এই ভিটামিন ১-৩ মাইক্রোগ্রাম প্রয়োজন।□

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

জীবন মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও দেশ-কাল—মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—নবার্ক, ডি. সি. ৯/৪, শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৭০০ ০৫৯। পৃষ্ঠা: ২০০। মূল্য: ৪০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে ভূমিকা-সহ মোট দশটি নিবন্ধে মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করেছেন। 'একটি বিকল্প ব্যবস্থা', 'ধর্ম বনাম সংহতি', 'জনশিক্ষায় বিষয়-নির্বাচনের গুরুত্ব', 'শিক্ষানীতি লোকসংগ্রহ ও সফল সংস্কার' প্রভৃতি নিবন্ধগুলি বিশেষভাবে নজর কাড়ে এবং আমাদের নতুন করে ভাবায়। 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে' নিবন্ধে তিনি বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন: যে-শিক্ষা আমাদের সমাজে মাত্র মুষ্টিমেয়েরই সমৃদ্ধি দিতে পারে, যে-শিক্ষার কিঞ্চিৎ প্রসারে দেশে ভয়াবহ বেকারসমস্যা দেখা দেয় সেই শিক্ষা হুবহু জনগণের জন্য প্রসারিত হওয়া উচিত কিনা? তিনি সারা ভারতব্যাপী একই ধরনের পাঠক্রম, গ্রন্থ-নির্বাচন ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রযুক্ত হবার কথা বলেছেন। 'ধর্ম বনাম সংহতি' শীর্ষক নিবন্ধে ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ধর্মবিযুক্ত শিক্ষার পরিবর্তে তিনি বিভিন্ন ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপের সম্যক্ ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, এভাবে জনমানসে ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। 'জনশিক্ষায় ধর্মশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভারতীয় জীবনবোধের মূলে যে সত্য ও তপস্যার ধারণা নিহিত আছে, জনশিক্ষাব্যবস্থা তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই সমাজে আজ বহুবিধ বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি ঘটেছে। তাঁর মতে, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সমতারক্ষার জন্যই ধর্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষার দ্বারাই সমগ্র সমাজ-মন ও চৈতন্যের উন্নয়ন সম্ভব। কাম্য সমাজ-মানসিকতা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আত্মসংযম, সমাজবোধ, তামসিকতা-দূরীকরণ, আত্মজাগরণ, সহনশীলতা ও জাতীয়তাবোধের শিক্ষা সংযুক্ত করার পক্ষপাতী (পৃঃ ১৩৬)। 'একটি বিকল্প ব্যবস্থা' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন—যদিও তার সবই নতুন নয়। তবে প্রশ্ন উঠবে: সেগুলি কি বাস্তবায়িত করা সম্ভব?

সারা বইটি জুড়েই অনেক সৎ কথা, পরিকল্পনা, আদর্শ ও সিদ্ধান্ত আছে। লেখিকার অনেক বক্তব্যই চমকপ্রদ, যা সত্যিই আমাদের নতুন চিন্তার খোরাক যোগায়। তবে একথাও ঠিক, তাঁর সব সিদ্ধান্তই বাস্তবসম্মত নয় এবং সকলে একবাক্যে তা মেনেও নেবেন না।

কালের সেতু

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবকাব্য ও আধুনিকতা—তরুণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—রমা প্রকাশনী, ৭৯/৪/২ডি, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৫। পৃষ্ঠা: ৮+৪৬। মূল্য: ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধ রচনার প্রয়াস সর্বকালেই দেখা যায়। সময় এবং দূরত্ব—এই দুই গূঢ় বিষয়কে নিজ অবস্থান-বৃত্তে স্থাপন করাই এই প্রয়াসের প্রধান প্রস্তুতি। তা না হলে এ কাজে সফল হওয়া যায় না। অথচ এ কাজটুকু কঠিন। বিশেষ করে তা যদি বৈষ্ণবকাব্য হয় এবং সেই বৈষ্ণবকাব্য থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রেমাশ্রয়ী ভাবনার গতিপথ নিরূপণের বিষয় হয়, তাহলে একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল তা জাগাবেই।

৪৬ পৃষ্ঠার অতি ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক ছয়টি বিষয়ের উপস্থাপনার মাধ্যমে—শ্রীগীতগোবিন্দম্: যদি হরিস্মরণে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যের কৃষ্ণ: উপেক্ষিত প্রেমিক, যশোদার বাৎসল্য: ছদ্মরতি, চণ্ডীদাসের রাধা: যৌবনে যোগিনী, একটি বৈষ্ণব কবিতা: পুনর্বীক্ষণ, এবং আধুনিকতা ও বৈষ্ণবকাব্য—এই গ্রন্থ শেষ করেছেন। এতে বিষয়ের প্রতি পাঠকের প্রত্যাশিত পিপাসা মেটার নয়। কারণ, এত ক্ষুদ্র পরিসরে এর সামগ্রিকতা প্রতিফলিত করা যায় বলে মনে হয় না। প্রথম প্রবন্ধ 'শ্রীগীতগোবিন্দম্: যদি হরিস্মরণে'-তে লেখক প্রমথ চৌধুরী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গীতগোবিন্দের শৃঙ্গাররস সম্পর্কে মন্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন: "যদি তাঁর

কাব্য শুধুমাত্র রতিবিলাসের উদাহরণ হতো, তবে আটশ বছর পরেও বাঙালী এই কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করত না।" যুক্তি হিসাবে আরও যা দাঁড় করিয়েছেন, তা হলো—জয়দেব রাজসভার কবি এবং উদর সংস্থানের জন্য কাব্য-রচনা করতে দিয়ে শৃঙ্গাররস পরিবেশনের মাধ্যমে জনপ্রিয় করার প্রয়াস পেয়েছেন। দৃষ্টান্তও কম ব্যবহার করেননি। কিন্তু এ ধরনের মূল্যায়ন গভীরতা দাবি করে না। এর মধ্যে 'যশোদার বাৎসল্য' প্রবন্ধটি অতি অল্প পরিসরে লেখা হলেও চমৎকার। এখানে একটি মন্তব্য—"যশোদা এই সীমা অসীমের যোগসূত্র; রাধা যা হতে পারত অথচ হয়নি, যশোদা তাই।" সত্যিই ভাবিয়ে তোলে। আধুনিক কালের বোধির সামনে এমনতর একটি অনুভব প্রকৃতই রাধা এবং যশোদা উভয়কেই পুনর্মূল্যায়নের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। 'চণ্ডীদাসের রাধা' প্রবন্ধে রামী রজকিনীকে রাধার প্রতিরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানেও লেখক রাধার অনুরাগিণী সত্তার চেয়ে বৈরাগিণী সত্তার অধিকতর প্রকাশ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন এবং অধিকাংশের মতের বিরোধিতা করে বলেছেন: "বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অধ্যাত্মপ্রেমের নয়, লৌকিক প্রেমের কাব্য—এবিষয় সন্দেহ নেই।" লেখক বলছেন, মুখোশ ব্যবহার করেই কবি মধ্যযুগের রীতি অনুসরণ করে রাধাকৃষ্ণের রূপকই শুধু ব্যবহার করেছেন, নাহলে আশিরনখর রক্তমাংসের প্রেমিক আত্মগোপন করেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের পিছনে।

এরপর বিদ্যাপতির মাথুরপদের "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর" পদটি উদ্ধৃতি দিয়ে টেনিসন, রবীন্দ্রনাথ, হাইনে প্রমুখের রচনা থেকে উৎকলিত করে দেখাতে চেয়েছেন—বিদ্যাপতির এই পদটি স্বমহিমায় এখনো একটি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে আছে। কিন্তু হঠাৎ একটি মন্তব্য: "তবু হিয়া জুড়ন না গেল—..." এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়'-এর মৃদুগুঞ্জন ফিকে লাগে"—চমকে দেয়। এধরনের কথা আসে কোন্ সূত্রে? এভাবে কি তুলনা করা যায় যখন দুটি কবিতার পরিপ্রেক্ষিতই ভিন্ন?

'আধুনিকতা ও বৈষ্ণবকাব্য' প্রবন্ধে লেখক একটি দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন—এটুকুই বলা যাবে। যেমনভাবে কাজটুকু করা সঙ্গত তারও একটি ছক তৈরি করেছিলেন, যেমন—দাদাইজম, কিউবিজম, ইমপ্রেশনিজম, স্যুররিয়ালিজম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তার মিল দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য তো বাঙলা ব্যাকরণের সংজ্ঞার মতো করে বললে হবে না। ব্যঞ্জনা, বিশ্লেষণ—এসব তো চাই। সেই অভাব খুব বেশি বাজে। এরপর একে একে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন থেকে শুরু করে নিজের কবিতা থেকেও উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন—আধুনিকতার গতিপথ আসলে ঐতিহ্যের সঙ্গে একই সেতুবন্ধ।

বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ে। কাগজ ও বাঁধাইও তেমন ভাল নয়। এধরনের গ্রন্থে এবিষয়ে একটু সতর্কতা প্রত্যাশিত। সাহসের সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশের বিষয়টি কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও প্রশংসার্হ।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন গ্রন্থ

পলাশ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি—সুধাংশুবিমল বড়ুয়া। পরিবেশক—সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। পৃষ্ঠা: ১৮+২৩৪। মূল্য: ২৫ টাকা।

বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করে প্রণতি নিবেদন করেছেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেবের চারিত্রমহিমা ও তাঁর প্রবর্তিত নীতিধর্মের প্রেরণায় এক সময়ে ভারতবর্ষের নানা ক্ষেত্রে যে-উজ্জীবন ঘটেছিল এবং উত্তরকালে রবীন্দ্রসাহিত্যে সেই সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের যে-প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল, আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক তা অনুভব করতে পারবেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতির যে মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে, লেখক সে-সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। মোট ছয়টি অধ্যায়ে লেখক বাংলায় বৌদ্ধধর্ম, রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধদেব ও অশোক, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম এবং শেষ অধ্যায়ে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা-সহ রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। গবেষণাগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও লেখকের আলোচনা যেন এক রসবোদ্ধা ও মর্মজ্ঞ রসিকের আলোচনা। রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, বাঙলা সাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির অবদানের প্রামাণ্য ইতিহাসে যাঁদের আগ্রহ, এই গ্রন্থ তাঁদের অবশ্য পাঠ্য। নয়ন-সুখকর প্রচ্ছদ ও সুশোভন মুদ্রণে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২০ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬১তম আবির্ভাবোৎসব সমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ২৭ হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। বক্তা ছিলেন স্বামী প্রভানন্দ এবং ডঃ এম. শিবরামকৃষ্ণ। ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ উৎসব। ঐদিন লক্ষাধিক ভক্ত সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঐদিনও দুপুরে প্রায় ৩৫ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে (কলকাতা-৭০০ ০৫৪) গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এক যুবশিবির এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুবশিবিরে ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ১৩৫জন যুবপ্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ৫০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন। উভয় অনুষ্ঠানেই স্বাগত ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ভক্তসম্মেলনে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী রমানন্দ, স্বামী গর্গানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পাঠ ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী সর্বগানন্দ এবং স্বামী নাগেশ্বরানন্দ।

পুরী মিশন আশ্রমের (উড়িষ্যা) বার্ষিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত আশ্রমের সভাগৃহে তিনটি সাধারণ সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও স্বামী ভাগবতানন্দ বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর উপযোগিতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। পুরী ও খুরদা জেলার তিনটি গ্রামে যুব-শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ৯০ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যোপকরণ প্রদান করা হয়। ২১ তারিখের সভায় আশ্রমের ছাত্র ও অন্যান্য প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণের সঙ্গে আশ্রমের ১২ জন স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রকে বিদ্যালয়ের পোশাক ও পাঠ্যোপকরণ প্রদান করা হয়।

ভুবনেশ্বর আশ্রমে (উড়িষ্যা) গত ২৮ জানুয়ারি এক ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে প্রস্তাবিত নতুন সংগ্রহশালা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী ও অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন

গত ২৮ জানুয়ারি রাঁচি মোরাবাদী আশ্রমে (বিহার) নবনির্মিত স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো-বক্তৃতা শতবার্ষিকী স্মারক ভবনের উদ্বোধন করেন স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং বহু ছাত্র, কর্মী ও ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় যুবদিবস

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার-বিতরণের মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপিত হয়—

ভুবনেশ্বর মঠ (উড়িষ্যা) : ১২-১৮ জানুয়ারি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার পর্যটন ও সাংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভূপেন্দর সিং।

জয়পুর আশ্রম (রাজস্থান) : ২০-২১ জানুয়ারি দুদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। ৪ ফেব্রুয়ারি ১২৫ জন অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কার বিতরণ করেন রাজস্থানের রাজ্যপাল বলিরাম ভগত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী সুজন সিং যাদব।

অদ্বৈত আশ্রম (কলকাতা) : ১৪ ও ২১ জানুয়ারি দুদিনের অনুষ্ঠানে ২২৫ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল।

নট্টরামপল্লী আশ্রম (তামিলনাড়ু) : বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে মোট ৬৬২ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল।

দিল্লী আশ্রম : ১২ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা পুরী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই আশ্রমের উদ্যোগে উড়িষ্যার বিভিন্ন গ্রামে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জলপাইগুড়ি আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ) : অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

রাঁচি স্যানাটরিয়াম (বিহার) : অনুষ্ঠানে ৭০০ যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেছিল। উপজাতিনৃত্য ও গানবাজনা ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

রামহরিপুর আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) : ১২ জানুয়ারির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় ৩১০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

মনসাদ্বীপ আশ্রম (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) : অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী-সহ প্রায় ১১০০ যুবক-যুবতী যোগদান করেছিল।

জামতাড়া আশ্রম (বিহার) : প্রায় ৪৫০ জন যুবক-যুবতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল।

ছাত্রকৃতিত্ব

১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্ররা নিম্নলিখিত স্থানগুলি অধিকার করেছে ঃ

বি.এ. ঃ দর্শনশাস্ত্রে—২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান।

এম.এ. ঃ দর্শনশাস্ত্রে—২য় স্থান

সংস্কৃতে—১ম, ২য় ও ৩য় স্থান।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে **নরোত্তমনগর (অরুণাচলপ্রদেশ) বিদ্যালয়ের** একজন ছাত্র ২য় স্থান অধিকার করেছে।

আলং বিদ্যালয়ের (অরুণাচলপ্রদেশ) জিমন্যাস্টিক দল স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের (জেলা—বাঁকুড়া) অষ্টম শ্রেণীর তিনজন ছাত্র জাতীয় বৃত্তি লাভ করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

এলাহাবাদ আশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) মাঘমেলা উপলক্ষে ত্রিবেণী সঙ্গমে একমাসব্যাপী বিনামূল্যে এক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১৯,৩০০ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। শিবিরে একটি বই বিক্রয়কেন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ওপর একটি ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

নারায়ণপুর আশ্রম (মধ্যপ্রদেশ) গত ১-৬ ফেব্রুয়ারি এক চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৬৯ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয় এবং প্রত্যেককে একটি করে কম্বল দেওয়া হয়।

পুরী মিশন আশ্রম উড়িষ্যার খুরদা জেলায় গত ২৫ জানুয়ারি '৯৬ একটি দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১১৪ জনের চিকিৎসা করা হয়।

গড়বেতা আশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর) গত ৫-১০ ফেব্রুয়ারি বিনামূল্যে এক চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ২৫ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

গত বছর অক্টোবর মাসে **রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলের** ব্যবস্থাপনায় কামারপুকুরে অনুষ্ঠিত চক্ষুশিবিরে যে ১৬১ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, গত ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ তাদেরকে চশমা বিতরণ করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ শীতকালীন ত্রাণ

জলপাইগুড়ি আশ্রম ঐ জেলার দুটি গ্রামে ২২৪টি চাদর ও ৪০০টি শিশুদের পোশাক বিতরণ করেছে।

শিকড়া-কুলীন গ্রাম আশ্রমের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার নয়টি গ্রামে ১২০০ পরিবারের মধ্যে ৭৮৭ সেট শিশুদের পোশাক ও ১৪৩টি পুরনো কাপড় বিতরণ করা হয়েছে।

কামারপুকুর আশ্রমের মাধ্যমে হুগলী জেলার গোঘাট ব্লকের দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

বিধাননগর (সল্টলেক, কলকাতা) পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত নয়াপট্টিতে **কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় মঠ** থেকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ২১২টি পরিবারের মধ্যে ২৭৫টি শাড়ি, ২৪৭টি ধুতি, ৫২টি লুঙ্গি, ২৭৪টি চাদর, ২৮৬ সেট শিশুদের পোশাক, ২০০ সোয়েটার, ৭১টি বিছানার চাদর, ৪৭টি শতরঞ্জি, ১৮০৩টি পুরনো কাপড়, ২৫ কিলোগ্রাম চাল ও ১০ কিলোগ্রাম চা বিতরণ করা হয়েছে।

মালদা আশ্রম স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে ২২০টি পশমী কম্বল বিতরণ করেছে।

বিহার শীতকালীন ত্রাণ

রাঁচি স্যানাটরিয়ামের মাধ্যমে রাঁচি জেলার নামকম ব্লকের ১৮টি গ্রামের দুঃস্থ উপজাতি ও তফশিলী জাতির লোকেদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬১তম জন্মতিথি ও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে **ঢাকা আশ্রমে (বাংলাদেশ)** গত ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন রামায়ণ গান, ধর্মসভা, বাউলগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত এস. বি. আতুগোদা। সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। বাউলগান পরিবেশন করেন কিরণচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় দিন রামায়ণ গান, ধর্মসভা, শিশুদের বিচিত্রানুষ্ঠান, ভক্তিগীতি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা শামছুন্নাহার গফুর, ডঃ মারুফা খান, ডাঃ বীথিকা মল্লিক এবং সুরাইয়া বানু। সভানেত্রী ছিলেন চিত্রা ভট্টাচার্য। তৃতীয় দিন ধর্মসভায় স্বামীজীর সম্পর্কে বলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দেব মুখার্জী, বাংলাদেশ সংবাদসংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক ডি. পি. বড়ুয়া, কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী এবং পরেশচন্দ্র মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন। রাতে নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তবৃন্দ নাট্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ এবং আলোচ্য বিষয়ের মূল ভাবটি তুলে ধরেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ।

২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। প্রায় ৮,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে শিশুদের ভক্তিগীতি এবং রাতে প্রখ্যাত শিল্পিদের বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রতিদিনই আশ্রমে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে।

বেদান্ত সোসাইটি, টরন্টো (কানাডা) ঃ গত ৩ মার্চ এবং ৩১ মার্চ যথাক্রমে 'ঈশ্বরের মানবলীলা' প্রসঙ্গে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এবং 'বর্তমান বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের দুটি ভাষণ ভিডিও-র মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। ৯ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের ওপর আলোচনা এবং শিশুদের একটি অনুষ্ঠান হয়েছে। ১০ মার্চ শ্রীচৈতন্যদেবের ওপর আলোচনা হয়েছে। ১৪ মার্চ আলোচিত হয়েছে ঈশ উপনিষদ্। ১৬ মার্চ বিবেকানন্দ পাঠচক্রে 'রাজযোগ' সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। পরদিন এল্ডার লিলিয়ান ম্যাকগ্রেগর ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ২৩ ও ৩০ মার্চ কঠ উপনিষদ্ এবং ২৪ মার্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (স্যান ফ্রান্সিস্কো) ঃ গত মার্চ মাসের প্রতি রবি ও বুধবার ধর্মপ্রসঙ্গ করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। প্রতি শনিবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণীর ওপর আলোচনা এবং ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, সিয়াটল ঃ মার্চ মাসের প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। এছাড়া প্রতি মঙ্গলবার তিনি 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপরও আলোচনা করেছেন।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ মার্চ মাসের প্রথম রবিবার ৩ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে এই কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা হয়েছে। অন্যান্য রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী ভৈরবানন্দ (আনন্দ) গত ২৮ জানুয়ারি '৯৬ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ভোর ৪.৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। বুকে ব্যথা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী ভৈরবানন্দ ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে কানপুর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পূর্বে সারগাছি আশ্রমে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি সারগাছি ও গদাধর আশ্রমের কর্মী ছিলেন। গত ১০ বছর ধরে তিনি কলকাতার গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের 'ক্যাশিয়ার'-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন।

স্বামী ভৈরবানন্দ ছিলেন সুবক্তা এবং গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রে পারদর্শী। ইনস্টিটিউটে তাঁর মাসিক শাস্ত্রব্যাখ্যার ক্লাস বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। তাঁর শান্ত ও ধীর স্বভাব এবং অমায়িক ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। অক্রোধ এবং নিস্পৃহতা ছিল তাঁর চরিত্রের দর্শনীয় বৈশিষ্ট্য। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'উদ্বোধন'-এর পরম আগ্রহী পাঠক ছিলেন।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যালয়ের সম্পাদক **এস. কে. শিবরামন** গত ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য প্রয়াত শিবরামন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ গত তিন দশক ধরে তিনি মাদ্রাজ মঠের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সারদা বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং শেষদিন পর্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্ত শিবরামন মহাশয় গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ঠাকুরের সেবা করে গেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধনে পদার্পণ-স্মরণোৎসব

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী উদ্বোধনে (বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে) শুভ পদার্পণ করেছিলেন। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছর ২৩ মে 'শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধনে পদার্পণ-স্মরণোৎসব' পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৩ মে ১৯৯৬ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে সকল ভক্তবৃন্দের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

ঐ দিন বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙড় (জেলা—দঃ ২৪ পরগনা) ১ জানুয়ারি '৯৬ মহাসমারোহে অষ্টাদশ বার্ষিক কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপন করে। মাঙ্গলিক সানাই, মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, নগর-পরিক্রমা, সঙ্গীতাঞ্জলি, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম, চিত্রপ্রদর্শনী, 'কথামৃত' পাঠ ও লীলাকীর্তন প্রভৃতি ছিল সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বাসবানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ এবং স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ধর্মেশ্বরানন্দ। সারাদিনব্যাপী প্রায় ৫০ হাজার ভক্তানুরাগী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২০ হাজার ভক্তকে বসিয়ে এবং ১২ হাজার ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব গত ১০ জানুয়ারি '৯৬ হাওড়ার রামরাজাতলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে সম্পন্ন হয়েছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা, হোম, আরাত্রিক কীর্তন, আলোচনা, রামনাম ও ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহস্রাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ উক্ত সমিতির দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহেশরঞ্জন সোম, অমৃক সিং অরোরা ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬৪)-এ গত ১২-১৪ জানুয়ারি '৯৬ জাতীয় যুবদিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। যুবদিবসে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৩ জানুয়ারি বিশেষ পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক ও অভিভাবকদের আলোচনাচক্র এবং পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান। আলোচনাচক্রে বিশেষ বক্তব্য রাখেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ। পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণানন্দ। এদিন ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিধাননগরের একজন কৃতি ছাত্র ও ছাত্রীকে এক সেট করে স্বামীজীর রচনাবলী দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘের পরিচালনায় দমদম করুণাময়ী আশ্রমে শ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, কীর্তন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন শঙ্কর সোম, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর মায়ের কথা আলোচনা করেন তারাপদ বসু এবং অমলেন্দুবিকাশ চক্রবর্তী।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সংঘ, গোয়াবাগান (কলকাতা-৬)-এ গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে সকালে বিশেষ পূজা, দুপুরে ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ এবং সন্ধ্যা ৭টায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন দুলালচন্দ্র মান্না। মায়ের জীবনী আলোচনা করেন নির্মাল্য বসু। সংঘের কোচিং সেন্টারের ছাত্রীগণ ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করে।

গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ স্বামীজীর জন্মতিথি ও যুব উৎসব উপলক্ষে সকালে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় সংঘ-পরিচালিত ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজীর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করে ও ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করে। শেষে স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন নির্মাল্য বসু। উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম জন্মতিথি-উৎসব দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) পালিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা, দুপুরে প্রায় ৩৫০ জনের অন্নপ্রসাদ গ্রহণ ও বিকালে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ, বচেলী (মধ্যপ্রদেশ) গত ২৮ অগ্রহায়ণ শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পালন করে। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, প্রার্থনা, পাঠ ও মাতৃসঙ্গীত, পূজা প্রভৃতি। সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা ও ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরে তিন শতাধিক ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ বলরামপুর (জেলা—মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, সকালে বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি এবং মধ্যাহ্নে প্রাসদ-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর বেতারশিল্পী চিন্তামণি মিশ্র রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, খগৌল, পাটনা (বিহার) গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। বিশেষ পূজা, পূজার শেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হয়। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তারপর পরিবেশিত হয় ভক্তিসঙ্গীত। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (জেলা—কুচবিহার) কর্তৃক নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন সংঘের পরিচালনায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দিনহাটা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই উৎসব স্থানীয় মানুষের মধ্যে বেশ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

বহির্ভারত

৬ জানুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, যশোর (বাংলাদেশ)-এর উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম জন্মতিথি উপলক্ষে এই আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই ও ফল বিতরণ করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ ও স্বামী স্থিরাত্মানন্দ। ১৩ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথির দিন সকালে বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় যশোর জেনারেল হাসপাতাল ও যশোর টি. বি. ক্লিনিকে ফল বিতরণ করা হয়। ফল বিতরণ করেন যশোরের সিভিল সার্জেন ডাঃ মোঃ আবদুল জলিল। সন্ধ্যায় স্বামীজীর জীবনী পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

পরলোকে

গত ২০ অক্টোবর '৯৫ ডাঃ সত্যব্রত রাহা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিজ বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলা ১.৪০ মিনিটে লোকান্তরিত হন। ডাঃ রাহা ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। জয়রামবাটী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাথে তাঁর দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর আদর্শ জীবনযাপনে অনেকেই ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ।

বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাসের হরিপদ দত্তের কন্যা প্রতিমা বসু গত ২১ ভাদ্র ১৪০২ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর ৯ বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির দিন তাঁর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তাঁর এক কন্যা বর্তমানে শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, অশোকগড় (ডানলপ, . কলকাতা-৩৫)-নিবাসিনী সতীরানী ঘোষ গত ৩ অক্টোবর '৯৫ বিজয়া দশমীর দিন বুধবার সকাল ৮.৫৫ মিনিটে ৮৪ বছর বয়সে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, পুত্রবধূ, চার কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার সল্টলেকের 'মা সারদা কুঠী'-র কল্পনা বাগ মাত্র ৫৪ বছর বয়সে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১১টায় নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মী ছিলেন, অবসরগ্রহণের আরও চার বছর বাকি ছিল। তিনি স্থানীয় সারদা সংঘের সদস্যা ছিলেন। প্রতি বছর গুড ফ্রাইডের দিন তাঁর বাড়ির প্রার্থনাগৃহে বিশেষ পূজানুষ্ঠানে অনেক ভক্ত ও গুণী সমাগমে সারাদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যে পালিত হতো। মঠ-মিশনের অনেক সাধুর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। দরিদ্র শিশুদের পালন করা ও তাঁদের লেখাপড়ায় নিয়মিত সাহায্য করা তাঁর জীবনের ধর্ম ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহিকা ছিলেন। সরল, অনাড়ম্বর, সাধুসেবাপরায়ণ স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কামারহাটি (কলকাতা-৫৮)-নিবাসিনী বাদলরানী ব্যানার্জী ছয়দিনের রোগভোগের পর গত বিজয়া দশমীর দিন (৩ অক্টোবর '৯৫) সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। ধর্মপ্রাণা এই মহিলা 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতা গলফগ্রীন-নিবাসিনী পিকু বসু গত ১০ নভেম্বর '৯৫ বিকাল ৫টায় ৬৯ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্বামী মোহিতকুমার বসু শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের ভাইঝি রাজলক্ষ্মী দেবীর পুত্র। প্রয়াতা বসু বৃহৎ যৌথ পরিবারে সেবাপরায়ণা গৃহবধূ ছিলেন। তাঁর সহজ-সরল জীবনযাত্রা, অতিথিসেবা ও ভক্তিপরায়ণতার জন্য তিনি মঠ ও মিশনের অনেক সন্ন্যাসীর স্নেহের পাত্রী ছিলেন। কয়েক বছর আগে ৪ জন সদস্য নিয়ে গলফগ্রীনে তাঁদের বাড়িতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্রের গোড়াপত্তন হয়।□

বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' পত্রিকায় উৎসবাদি বা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির অন্ততঃপক্ষে ১৫ দিনের মধ্যে সেই সংবাদ আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো বাঞ্ছনীয়। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

বিজ্ঞান সংবাদ

মানুষের দেহে জন্তুর দেহাঙ্গ প্রতিস্থাপন কি নিরাপদ?

গত অগ্রহায়ণ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ (পৃঃ ৬৬০) মনুষ্য-দেহে অন্য মনুষ্যদেহ থেকে নেওয়া দেহাঙ্গ প্রতিস্থাপনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। —সম্পাদক, উদ্বোধন

স্যান ফ্রান্সিস্কো জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকবর্গ যখন ১৫ বছর যাবৎ এইচ. আই. ভি. ভাইরাস-আক্রান্ত (অর্থাৎ এইডস রোগী) জেফ গেটির দেহে পরীক্ষামূলকভাবে বেবুনের (বানরজাতীয় প্রাণীর) দেহ থেকে নেওয়া অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (বোন ম্যারো ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট) করলেন, রোগ-অনাক্রম্যবিশেষজ্ঞরা (ইমিউনোলজিস্টস) তখন সতর্ক করে দিলেন যে, রোগীর দেহ নিশ্চয়ই অ-মানবীয় দেহাংশকে প্রত্যাখ্যান (রিজেক্ট) করবে এবং এই অস্ত্রোপচার রোগীর আয়ুবৃদ্ধি না করে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু গেটি এখনো বেঁচে আছেন, যদিও বোঝা যাচ্ছে না যে কতদিন তাঁর আয়ু থাকবে। এই ঘটনাকে গেটির বন্ধু ও আত্মীয়েরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করেন। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে, সেটা হলো যে গেটির মতো অন্য লোকেরা মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহাঙ্গ নিতে থাকলে একদিন হয়তো চিকিৎসাগত সর্বনাশ ডেকে আনবে। সর্বনাশ এই জন্য যে, এইধরনের দেহাঙ্গের সাথী হয়ে জন্তুজানোয়ারের শরীরে বসবাসকারী অনেক অজ্ঞাত জীবাণুও মনুষ্যশরীরে চলে আসবে। অতীতে দেখা গেছে যে, ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস যখনই জন্তু থেকে এসে মানুষের শরীরে নিজেদের মানিয়ে নেয়, তারা তখনই ভীষণ রূপ নেয়। এইডস রোগের জীবাণু এইচ. আই. ভি., এবোলা ভাইরাস, হ্যান্টা ভাইরাস—এই ধরনের উদাহরণ। এইভাবে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মড়ক এনে দেবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আগে এই ধরনের ভয়ের কথা ওঠেনি, কারণ আগে জন্তুর দেহাংশ মনুষ্যদেহে প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হতো না। এমনিতে মনুষ্যদেহে অন্য মানুষ থেকে নেওয়া দেহাংশকে গ্রহণযোগ্য করতেই হিমসিম খেতে হয়। দুবছর আগে পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেবুনের দেহাংশ দুজন সাংঘাতিকভাবে পীড়িত রোগীর দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল এবং দুজনই অস্ত্রোপচারের পরেই মারা গিয়েছিলেন। গেটির ক্ষেত্রে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সুজেন ইল্ডস্ট্যাড-এর আবিষ্কৃত এক কৌশলকে কাজে লাগানো হয়েছিল। তিনি একধরনের ছাঁকনির সাহায্যে অস্থিমজ্জার পরিণত ও নবীন দেহকোষকে আলাদা করতে পারতেন। খুব তরুণ দেহকোষগুলির অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকায়, বেবুনের এই দেহকোষগুলিই গেটির ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ইল্ডস্ট্যাডের ধারণা যে, বেবুনের এই কোষগুলি গেটির শরীরে গিয়ে দোঁআশলা (হাইব্রিড) অনাক্রম্যতা শক্তি গঠন করবে। যদি শ্রীমতী ইল্ডস্ট্যাডের ধারণা সত্য হয়, তবে গেটির পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হবে, কারণ এইচ. আই. ভি. ভাইরাস বেবুনদেহে রোগ সৃষ্টি করতে অক্ষম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, বেবুনদের শরীরে নানাধরনের জীবাণু, ছত্রাক থেকে আরম্ভ করে লিউকিমিয়া রোগ সৃষ্টিকারক ভাইরাস পর্যন্ত থাকে। যত ভাল চালুনিই ব্যবহৃত হোক না কেন, মানুষের দিক থেকে তা সর্বাত্মক গ্যারান্টি হতে পারবে না। কারণ, সব ভাইরাসের রোগসৃষ্টি করার ক্ষমতা ধরতে পারে এমন পরীক্ষাপ্রণালী এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। এইচ. আই. ভি ভাইরাসের ব্যাপারে পূর্বে জানা পরীক্ষাপ্রণালীর অক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। এই ভাইরাস মনে হয় বানরে জন্ম নিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে মানুষে ঢুকে পড়েছে।

এসব তো গেল জানা ভাইরাসগুলির ব্যাপার। বেবুনের শরীরে বসবাসকারী যেসব ভাইরাসের পরীক্ষাপ্রণালী এখনো আবিষ্কৃত হয়নি, তাদের সম্বন্ধে কি হবে? এইসব বিবেচনা করে অনেক বৈজ্ঞানিক শুয়োরকে নিয়ে গবেষণা করতে চান, কারণ, জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত বিবেচনায় (বায়োলজিক্যালি) ক্ষুরওয়ালা প্রাণীরা (শুয়োর, গরু, হরিণ প্রভৃতি) বানরজাতীয় প্রাণীদের তুলনায় মানুষ থেকে অনেক দূরে। ফলে যেসব ভাইরাস বেবুনের দেহে আছে, তারা মানুষকে আক্রমণ করবার ক্ষমতা অনেকটা অর্জন করে ফেলেছে, কিন্তু শুয়োরে থাকা ভাইরাসদের মানুষদেহরূপ অপরিচিত রাজ্যে মানিয়ে নিতে বেশ বেগ পেতে হবে।

সে যাইহোক, এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটা নিয়ে এখনই গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—মানুষের দেহে জন্তু দেহাংশ স্থায়িভাবে বাসা বাঁধবার আগেই। [Express Pharma Pulse, 26 January 1996, p. 27]□

উদ্বোধন

"[illegible] নিবোধত"

৯৮তম বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ ৫ম সংখ্যা



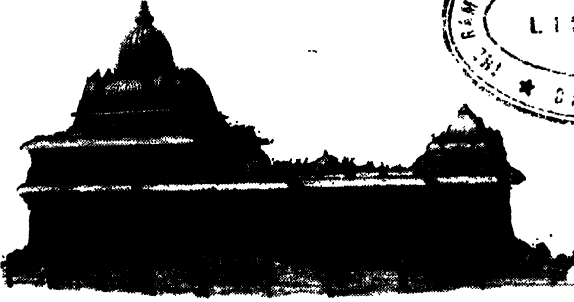


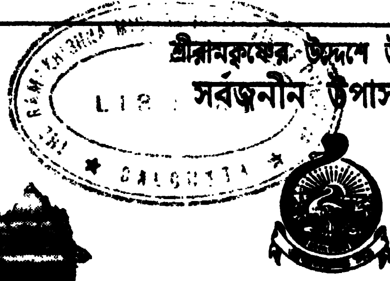


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।… ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১





শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
সর্বজনীন উপাসনালয়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯



'উদ্বোধন'-এর বক্তব্য

বিশেষতঃ এবং প্রধানতঃ এই বিজ্ঞাপনটি সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশদ বিবরণ জানতে চেয়ে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখছেন, টেলিফোন করছেন, কেউ কেউ আবার সাক্ষাতে যোগাযোগ করছেন। এসম্পর্কে আমরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক সাধারণকে স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত কোন বিজ্ঞাপনের সঙ্গে (উদ্বোধন কার্যালয় এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা কোন শাখা-কেন্দ্রের বিজ্ঞাপনগুলি ভিন্ন) উদ্বোধন কার্যালয়ের বা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সম্পর্ক নেই।—সম্পাদক, উদ্বোধন

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ মে ১৯৯৬ ৫ম সংখ্যা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেণ্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □ ৩০০০ টাকা □ কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য কিস্তিতেও প্রদেয় □ বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য □ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ □ ৫৬ টাকা □ সডাক □ ৬৬ টাকা □ আলাদাভাবে কিনলে □ বর্তমান সংখ্যার মূল্য □ ৮ টাকা



উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৩ সংখ্যা

- ❑ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য ঃ ছত্রিশ টাকা।
- ❑ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি সাতাশ টাকায় পাবেন ; ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে যে-কেউ প্রতি কপি পঁচিশ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে ডাকখরচ বাবদ দশ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করা যাবে।
- ❑ সাধারণ ডাকে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ৩১ জুলাই ৯৬-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- ❑ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা সর্বতোভাবে পাব।
- ❑ অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।
- ❑ সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বা ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ❑ গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি পাঠানোর কোন ব্যবস্থা থাকছে না। গত কয়েক বছর গ্রাহকেরা 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যা ইচ্ছা করলে সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারতেন। সংখ্যাটির মূল্য ও চাহিদা বেশি থাকায় তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, সাধারণ ডাকে পাঠানো শারদীয়া সংখ্যাগুলি বরং অনেক গ্রাহক ঠিকমত পেয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো সংখ্যাগুলির চেয়ে সেগুলি আগে পৌঁছেছে। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা দেড় মাস বা দু-মাস পরে গ্রাহকরা পেয়েছেন। এমন খবরও পেয়েছি যে, রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা বহুদিন পরেও পৌঁছায়নি। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যেসব গ্রাহককে রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের হয়রানির চূড়ান্ত হয়েছিল। এবিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রাহকরা যাতে যথাসময়ে ও নিশ্চিতভাবে সংখ্যাটি পান সেজন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা আমরা কয়েক বছর ধরে করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বেশি ডাকমাশুল দিয়েও তাঁরা কোন সুবিধা তো পানইনি বরং তাঁদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং বিলম্ব বেড়েই চলেছিল—এমনকি অপ্রাপ্তির ঘটনাও ঘটেছিল। যাঁরা বিলম্বে পত্রিকাটি পেয়েছিলেন তাঁরা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানিয়েছিলেন।

  এই পরিস্থিতিতে গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে আর শারদীয়া সংখ্যা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে না। যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা এই সংখ্যাটি সাধারণ ডাকেই নিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে বা সুবিধা থাকলে আমাদের দপ্তর থেকে ব্যক্তিগতভাবেও (By Hand) সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে, আগেই বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে সেই সংবাদ অবশ্যই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- ❑ যাঁরা প্রতিমাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন, তাঁদের এবং যাঁরা শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁদের সকলকেই ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যাটি দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২৯ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- ❑ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। ১৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ('৯৬) পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।

দিব্য বাণী

☐ অন্যের যে-ব্যবহার তোমার বিরক্তি উৎপাদন করে সেরূপ ব্যবহার অন্যের প্রতি ভুলেও করো না।

☐ উন্নতির পথে আবর্জনা জমা করো না। কর্তব্যসাধনে বা কথাবার্তায় যখনি নিজের ত্রুটি দেখতে পাবে, স্বীকার করো।

☐ যে উত্তম সে গম্ভীর, অথচ অহঙ্কারী নয়; যে অধম সে অহঙ্কারী, অথচ গম্ভীর নয়।

কনফুসিয়াস



☐ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর, চিন্তা ও কার্যে পবিত্র থাক, বিপদে ধৈর্য অবলম্বন কর, অহঙ্কার ও ক্রোধ থেকে দূরে থাক।

☐ মোটা খাও, মোটা পর, আর সাদাসিধা জীবনযাপন কর।

☐ সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান, যার হস্ত কিংবা জিহ্বা দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয় না।

হজরত মহম্মদ

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সংযম

'সততা'র আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, আদর্শের প্রতি কায়মনোবাক্যে আনুগত্যই সততা। প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রত্যেক মানুষের একটি বা একাধিক নিজস্ব 'আদর্শ' থাকিতে পারে এবং সেই আদর্শের প্রতি তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে চূড়ান্ত 'আনুগত্য'ও থাকিতে পারে; একজন খুনী, একজন দস্যু, একজন ব্যাভিচারী নিজ নিজ 'আদর্শ' সম্পর্কে ধারণা এবং সংশ্লিষ্ট আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা অনুসারে 'সৎ' হইতে পারে; কিন্তু উহা কি যথার্থ আদর্শ বলিয়া এবং যথার্থ সততা বলিয়া গণ্য হইবে? বলা বাহুল্য, একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি, একজন নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট তাহার আদর্শের ও সততার ধারণা এবং কার্যক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন অন্যরকম হইবে। একজন নাস্তিক ব্যক্তি অথবা একজন নাস্তিক সমাজদর্শনে অনুরাগী ব্যক্তি পরোপকারের আদর্শে বিশ্বাসী হইতে পারে এবং নির্লোভ ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারে, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত কি সভ্যতার অভিপ্রেত সততার পর্যায়ে পড়িবে? একজন রাজনৈতিক নেতার একটি 'আদর্শ' থাকে এবং থাকে সেই আদর্শের প্রতি 'আনুগত্য'ও; কিন্তু সেই আদর্শ কী এবং সেই আনুগত্যের স্বরূপ কী তাহা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কাহাকেও বলার বা কাহারও নিকট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যেন তেন প্রকারেণ আপন স্বার্থসিদ্ধি এবং দলের স্বার্থসিদ্ধিই যেন এখন তাহাদের 'আদর্শ' এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিবার ব্যাপারে তাহাদের প্রশ্নাতীত 'সততা'! কিন্তু এই 'আদর্শ' এবং এই 'সততা' কী কোন সমাজে, কোন সভ্যতায়, কোন মানদণ্ডে প্রশংসিত অথবা কাঙ্ক্ষিত? আমরা জানি, তাহা কখনও প্রশংসিত অথবা কাঙ্ক্ষিত হইতে পারে না। আমরা সততাকে জীবনে পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করিতে সমর্থ হইতে না পারি, কিন্তু সততার যে কোন বিকল্প নাই তাহা সকলেই অনুভব করি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের সম্মুখে জীবনের যে-দৃষ্টান্ত রাখিয়াছিলেন তাহা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে হইতে পারে, কিন্তু ঐ জীবনই যে মানুষের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ জীবন সেবিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলেন, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সততার কোন মূল্য নাই, সৎ জীবনযাপনের কোন তাৎপর্য নাই; সত্যকথন, সৎ আচরণ, সৎ চিন্তা, কর্মে অথবা চিন্তায় অপরের অনিষ্ট না করা, সততার শক্তিতে বিশ্বাস—এসমস্ত পৌরাণিক আদর্শ; বর্তমানের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক সমাজে এবং বিস্তৃত মূল্যবোধহীনতায় উহারা চূড়ান্তভাবে সামঞ্জস্য এবং গুরুত্ব-হীন। তাঁহারা বলেন, সততার অনুসরণ করিলেই বরং জীবনে অন্যায় শাস্তি, বঞ্চনা ও দুঃখকে স্বীকার করিতে হয়, পক্ষান্তরে সততাকে অগ্রাহ্য করিলে অনেক সহজে জীবনে মর্যাদা, অর্থ ইত্যাদি পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এবং সাময়িকভাবে তাহা হয় বলিয়া সততা সম্পর্কে অনেকের আস্থা হারাইয়া যায়। তাহা হইলে পুরস্কারের প্রলোভনে অথবা দুঃখ ও শাস্তির ভয়ে কি অসৎ হইতে হইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাহা মনে করিতেন না। তাঁহার সময়েও সমাজে দুর্নীতি ছিল, অবক্ষয় ছিল, মূল্যবোধহীনতা ছিল, ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ উহার মধ্যেও 'ষোল টাং' নিখুঁত ও সৎ জীবনযাপন করিয়াছেন, সততার প্রশ্নে কখনও তিনি আপস করেন নাই। গান্ধীজী প্রচলিত এই প্রবাদবাক্যটি বলিতেন: "Honesty is the best policy"—সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি শুধু বলিতেন না, তাঁহার বিশ্বাসে ও কর্মে, তাঁহার কথায় ও কাজে তিনি উহাকে সতত প্রতিফলিত করিতেন। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঐ প্রচলিত প্রবাদবাক্যটিকে সামান্য সংশোধন করিয়া বলিতেন: "Honesty is not only the best policy, it is the only policy"—সততা শুধু যে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা তাহাই নহে, সততাই একমাত্র পন্থা। তাঁহার বিখ্যাত বাণীটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়: "সত্যের জন্য সবকিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।" স্বামীজীর এই অসাধারণ বাণীর পিছনে ছিল তাঁহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবনের প্রেরণা, যিনি জগন্মাতার নিকট সমস্ত কিছু উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সত্যের প্রতি এই 'আঁট' না থাকিলে সততা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী মহাত্মা গান্ধী পরিণত বয়সে বলিতেন: "So long I knew God is truth. Now I have realised Truth is God. Disbelief in God is possible, but denial of Truth is impossible." (এতদিন আমি জানিতাম ঈশ্বরই সত্য। এখন আমি উপলব্ধি করিয়াছি, সত্যই

ঈশ্বর। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস হয়তো সম্ভব, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার অসম্ভব।)

সততার মূলে যদি এই সত্য-দর্শন না থাকে তাহা হইলে সততার যথার্থ অনুশীলন অসম্ভব। সত্য হইল সততার ভিত্তিভূমি।

ভিত্তির উপর ইমারত দাঁড়াইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ভিত্তিকে শক্ত ও মজবুত না করিলে ইমারতের স্থায়িত্ব লইয়াই প্রশ্ন উঠে। ভিত্তির উপকরণ এবং উপাদানের উৎকর্ষের উপর ইমারতের উৎকর্ষ নির্ভরশীল। সততার ভিত্তি সত্য ঠিকই, কিন্তু সত্যের অনুশীলন করিবার জন্য যাহা একান্ত আবশ্যিক তাহা হইল সংযম। শুধু বাহ্য সংযম নহে, সংযম অন্তরে ও বাহিরে। কায়িক, বাচিক, মানসিক ও আত্মিক সংযম। সংযম বা ত্যাগ ভিন্ন সৎ জীবনযাপন অসম্ভব—শ্রীরামকৃষ্ণ বারংবার বলিতেন।

'সংযম' শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে 'যম' অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ। সংযম মানুষের অমূল্য সম্পদ। বেদান্তের মতে সংযম মোক্ষলাভের অন্যতম প্রধান সাধন। সংযমের মাধ্যমে চিত্তকে মার্জিত না করিলে সাধনপথে অগ্রগতি অসম্ভব এবং চিত্ত মার্জিত বা শুদ্ধ না হইলে সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। বেদান্তমতে সংযম বলিতে বুঝায় শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা। 'শম' অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। 'দম' অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ। 'উপরতি' অর্থাৎ বিষয়-ভোগবাসনায় স্বাভাবিক বিরাগ। 'তিতিক্ষা' অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, হর্ষ-বিষাদ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান ইত্যাদি দেহ-মনকে বিচলিত ও অভিভূত-কারী বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে অবলীলায় উপেক্ষা করিবার সামর্থ্য। 'সমাধান' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে সম্পূর্ণ উপরত মনকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে ইষ্টাকারা বৃত্তিতে নিবাতনিষ্কম্প দীপের ন্যায় সংস্থাপন। 'শ্রদ্ধা' অর্থাৎ ইষ্টবিষয়ে অকম্পিত ও অবিচলিত আস্থা বা বিশ্বাস। বেদান্তমতে বা জ্ঞানযোগমতে সংযমকে বা এই গুণগুলিকে বলা হয় "ষট্‌ সম্পত্তি" এবং আত্মজ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে ইহারা অপরিহার্য। সুতরাং ইহাদের অনুশীলন অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু সেই অনুশীলন অত্যন্ত কঠিন।

শুধু যে বেদান্তমতেই সংযমকে এত বড় স্থান বা এতখানি মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, যোগমতে বা রাজযোগমতেও সংযমের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, রাজযোগ-সাধন প্রধানতঃ সংযমকেন্দ্রিক এবং এই সংযম কিছুটা শরীর-সংযম বিষয়ক, কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযম বিষয়ক। স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ'-এর 'অবতরণিকা'য় বলিয়াছেন ঃ "মন শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। যদি আমরা বিশ্বাস করি, মন শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ, আর মন শরীরের উপর কার্য করে তাহা হইলে ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, শরীরও মনের উপর কার্য করে। শরীর অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ এবং সতেজ থাকে। যখন কোন ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহার মন উত্তেজিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মন চঞ্চল হইলে শরীরও অস্থির হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকেরই মন বিশেষভাবে শরীরের অধীন, তাহাদের মন অতি অল্প-বিকশিত।... অধিকাংশ মানুষ পশু হইতে অতি অল্পই উন্নত। শুধু তাহাই নয়, অনেক স্থলে ইতর প্রাণী অপেক্ষা তাহাদের সংযমশক্তি বড় বেশি নয়। মনের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই নাই। মনের উপর এই ক্ষমতালাভের জন্য, শরীর ও মনকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের —দৈহিক সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবে, তখন মনকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার চেষ্টা করিতে পারি। এইরূপে মনকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে পারিব, ইচ্ছামত উহাকে দিয়া কাজ করাইতে পারিব এবং মনের শক্তিগুলি একাগ্র করিতে পারিব।... যিনি এই আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলি আবিষ্কার করিয়া ইচ্ছামত উহাদিগকে পরিচালিত করিতে শিখিয়াছেন, সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন।... মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতার অর্থ—শুধু এই প্রকৃতিকে [আন্তর ও বাহ্য] নিয়ন্ত্রিত করা।"

এই নিয়ন্ত্রণের জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি 'অষ্টাঙ্গযোগ'-এর বিধান দিয়াছেন ঃ ১. যম (অহিংসা, সত্যকথন, অস্তেয় বা অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ), ২. নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বা ঈশ্বরের স্তুতি, স্মরণ ও পূজারূপ ভক্তি), ৩. আসন (সাধন অভ্যাসের জন্য বসিবার প্রণালী), ৪. প্রাণায়াম (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ), ৫. প্রত্যাহার (মনের বিষয়াভিমুখী গতিকে ফিরাইয়া উহাকে অন্তর্মুখী করা), ৬. ধারণা (মনের একাগ্রতা), ৭. ধ্যান (একাগ্রতার গভীরতর স্তর) এবং ৮. সমাধি (ধ্যানের গভীরতম অবস্থা)।

অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ছয়টি অঙ্গ সংযমেরই বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়। সপ্তম ও অষ্টম স্তর যথাক্রমে সংযমের ফলশ্রুতি ও সর্বশেষ পরিণতি। শ্রীরামকৃষ্ণ সুকঠিন অষ্টাঙ্গযোগের সমস্ত স্তর নিবিড়ভাবে অনুশীলন করিয়া উপলব্ধির চূড়ান্ত স্তরে শুধু যে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা নহে, উহাকে অতিক্রমও করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর নিকট অষ্টাঙ্গযোগের মূল শিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় সাধনায় চরম যোগসিদ্ধি তাঁহারও লাভ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, সংযমের বৈদান্তিক সাধন অথবা যৌগিক সাধন সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুশীলন করা অসম্ভব। সেজন্য সংযমের সহজ সাধনের সরল বিধান তিনি দিয়াছিলেন। সেই সাধন ভক্তির সাধন। সেই সাধন 'নাম-সাধন'। তিনি বলিতেন ঃ তুমি শুধু ঈশ্বরের নাম

করিয়া যাও। তাঁহাকে ব্যাকুলভাবে ডাক। আন্তরিকভাবে স্মরণ-মনন কর। তাঁহাতে অনুরাগ বাড়াও। তোমার প্রাণায়ামের প্রয়োজন হইবে না। প্রাণায়ামের যাহা উদ্দেশ্য সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দোময় নিয়ন্ত্রণ তোমার আপনা-আপনি হইয়া যাইবে। আসনের নিখুঁত ভঙ্গির জন্য তোমার ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। শৈথিল্য বর্জন করিয়া সুখাসনে বস (যে-ভঙ্গিতে তিনি তাঁহার সর্বাধিক সুপরিচিত আলোকচিত্রে বসিয়া আছেন)। মনের মধ্যে শুদ্ধ চিন্তার প্রবাহ বহাইয়া দাও। মনকে সংযত করিবার—মনের অশুভ চিন্তাকে দূর করিবার ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও অব্যর্থ উপায়। এই পদ্ধতিকে দীর্ঘস্থায়ী ও কার্যকরী করিবার কৌশল হইল মনে জগতের সকলের কল্যাণচিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত করা—জগতে সকলেই সুখী হউক, সকলেই শান্তি লাভ করুক, সকলেই আনন্দ লাভ করুক। পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে এইভাবে পবিত্র চিন্তা প্রবাহিত করিতে হইবে। প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে ক্রমে মন শুদ্ধ হইয়া আসিবে। অপরের অনিষ্ট-চিন্তা, অকল্যাণ-চিন্তা, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, ইন্দ্রিয়পরতার বৃত্তি ধীরে ধীরে কমিতে থাকিবে এবং অবশেষে অপসৃত হইবে। মনে তখন সম্পূর্ণ বৈরাগ্যভাব বিরাজ করিবে। এই বৈরাগ্য সংযমের ফলশ্রুতি। অতীব কষ্টসাধ্য এবং সাধনসাপেক্ষ বৈদান্তিক ও যৌগিক সংযম-সাধনকে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিক সংযম-সাধনে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ইহাতে উহাদের মর্ম ও সিদ্ধি পূর্ণমাত্রায় রহিল, অথচ অনুশীলনের কাঠিন্য ও কঠোরতার লেশমাত্র রহিল না।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সংযম কোন নেতিবাচক বিষয় নয়। 'সংযম' মানে ভোগাকাঙ্ক্ষা ও ভোগক্রিয়া হইতে নিবৃত্তির বাসনা এবং সামর্থ্য। অর্থাৎ সংযম শুধু শারীরিক ব্যাপার নহে, মানসিক ব্যাপারও। 'নিবৃত্তি'র মধ্যে নেতিবাচক ভাব অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 'নিবৃত্তি'কে 'প্রবৃত্তি'তে রূপান্তরিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কাহার প্রতি প্রবৃত্তি? ভগবৎ-বিষয়ের প্রতি, আত্ম-বিষয়ের প্রতি, পারত্রিক বিষয়ের প্রতি। ভগবৎ-বিষয়ে, আত্ম-বিষয়ে, পারত্রিক বিষয়ে অনুরাগ বাড়াইলে লৌকিক বিষয়ে, ঐহিক বিষয়ে বিরাগ আপনা-আপনিই উৎপন্ন হইবে এবং ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকিবে। এই ইতিবাচক এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "মোড় ফেরানো"। এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের যুবক হরিনাথের (পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দের) প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সুপরিচিত উপদেশটি মনে পড়িবে। হরিনাথ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন : "মশাই, কামটা একেবারে যায় কি করে?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন : "যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না!" [শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, ১৩৭৯, পৃঃ ৪৭০] হরিনাথ জানিতেন, যেমন আমরাও সাধারণতঃ জানি, ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়ম-বিধির মাধ্যমে, কঠিন ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মাধ্যমে ভোগেচ্ছা দমন সম্ভব। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ উহার ধার দিয়াও গেলেন না, অথচ এমন 'কৌশল' বাৎলাইয়া দিলেন যাহাতে কোনরূপ দমনক্রিয়া বা কোনরূপ নিগ্রহ ভিন্নই ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি হইবে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। 'সরানো' হইতেছে ঠিকই—কারণ 'সরানো'ই সংযমের উদ্দেশ্য, কিন্তু নেতিবাচক পদ্ধতির সাহায্যে নহে, আগাগোড়া ইতিবাচক পদ্ধতিতে।

এই ইতিবাচক পদ্ধতি হইল আধ্যাত্মিকভাবে মনকে পূর্ণ করা—ঈশ্বরের অনুরাগে মনকে রঞ্জিত করা। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের নিকট সুন্দরভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করিতেছেন :

"নরেন্দ্র—কেউ কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদুস্বরে)—ত্যাগ দরকার।

ঠাকুর নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বলিতেছেন, 'একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?'

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে, মৃদুস্বরে)—সেই-ময় [ঈশ্বরময়] দেখলে আর কিছু কি দেখা যায়?

নরেন্দ্র—সংসারত্যাগ করতে হবেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যা বললুম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? সংসার-ফংসার আর কিছু দেখা যায়?"

['কথামৃত', উদ্বোধন সং, পৃঃ ১১২৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেছেন, আমরা যেন সংযমের মর্মটি বুঝি, উদ্দেশ্যটি বুঝি। এই ভাব গ্রহণই আসল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন : "গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়।" অর্থাৎ 'ত্যাগী' হয়। অর্থাৎ 'গীতা'র মর্ম হইল সংযম—ত্যাগ—বৈরাগ্য। শ্রীভগবানের ভাষায়, "বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে" (গীতা, ৬।৩৫)। গীতা মুখস্থ করিলে ত্যাগ হয় না, গীতা নিংড়াইলে ত্যাগের নির্যাস উৎসারিত হয় না। গীতাকে জীবনের প্রতি কর্মে অনুশীলন করিতে হয়। সেই অনুশীলন-পদ্ধতিই গীতার 'কর্মকৌশল'। অর্জুনকে সেই কৌশল উপদেশ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, যে-কৌশল নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রূপায়ণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল তাঁহার উপদেশের সাক্ষাৎ নজির। তিনি নিজেই বলিতেছেন : "আমার অবস্থা নজিরের জন্য।" [কথামৃত, পৃঃ ৯১৫] এবং, শ্রীশ্রীমায়ের কথায়, "ঠাকুর এসেছিলেন ত্যাগের ভাব দেখাতে।"□

ভাষণ

কামারপুকুরে যাত্রিনিবাস

স্বামী ভূতেশানন্দ

অখ্যাত অজ্ঞাত একজন ভক্তরূপে দু-একটি বন্ধুর সঙ্গে প্রথম কামারপুকুর দর্শন করতে এসেছিলাম বহু বছর আগে। তখনো সংঘে যোগদান করিনি। তখন চাঁপাডাঙা থেকে হেঁটে কামারপুকুরে পৌঁছাতে হতো। কলকাতা থেকে আর কোন পথ বা যানবাহন ছিল না। একমাত্র গরুর গাড়ি ছিল, যাতে যাতায়াত ছিল অনেক সময়সাপেক্ষ। সুতরাং আমরা হেঁটেই এসেছিলাম। কামারপুকুরে পৌঁছে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম: "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ি কোথায়?" আমরা তাঁকে 'ঠাকুর' বলি। কিন্তু গ্রামের লোকের হয়তো তা পছন্দ হবে না ভেবে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে বললাম: "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ি কোথায়?" তখন তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ভাবটা হলো—'কোথায় রে? এ আবার কার কথা এঁরা বলছেন?' তখন বুঝতে পারলাম। বললাম: "রামলাল চাটুজ্যের বাড়ি কোথায়?" তখন বলে: "তাই বল, হাই যে দেখা যাচ্ছে!"

ঠাকুরের বাড়ির এই যে বর্তমান অবস্থা এখন দেখি, তখন তা ছিল না। খড়ের ঘর অবশ্য যেমন আছে, তখনো তা ছিল। ঠাকুরের ভাইপো শিবু-দা (শিবরাম চট্টোপাধ্যায়) তখন বাড়িতে ছিলেন। তিনি বললেন: "ভাই, জান তো এখানে শিবের সংসার।" আমি বললাম: "হ্যাঁ শিবু-দা, ভাবতে হবে না। আমরা বাজার থেকে মুড়ি আর মিছরি কিনে এনেছি। তা এনে সেই সন্ধ্যারাত্রে যা খাওয়ার খেয়ে শুলাম ঠাকুরের বৈঠকখানায়। শিবুদাও সেখানে শুলেন। আমরা সবাই সেই বৈঠকখানায় স্থান পেলাম।

তারপরে কালক্রমে অনেক পরিবর্তন হলো। ১৯৪৭ সালে এটি মঠের কেন্দ্র হলো। তারপর ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হলো। মঠের প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে ঘরবাড়ি সব হলো। কিন্তু যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা তেমন কিছু দীর্ঘকাল অবধি হয়নি। হয়েছে যাকিছু ঐ হালদারপুকুরের ধারে—কতকগুলি কটেজ। কিন্তু তাতে আর কয়জন লোক ধরে? তারপর ক্রমশঃ একটা যাত্রিনিবাসের ভাবনা অনেকের মনে উঠেছে। কিন্তু আমাদের অর্থাভাব ছিল। বড় করে কিছু করবার সামর্থ্য ছিল না, এমনকি কল্পনাও ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে ঠাকুরের ইচ্ছায় ঘরবাড়ি, সাধু-ভক্তদের থাকার জায়গা এবং অবশেষে এই বিরাট যাত্রিনিবাসটিও হলো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "এই জায়গাটা, এই জয়রামবাটী-কামারপুকুর, এই সব অঞ্চল আনন্দের কুয়াশায় ভরা দেখছি।" "আনন্দের কুয়াশা!"—তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে সেই আনন্দের কুয়াশা হবে। ঠাকুর বলেছিলেন: "ইচ্ছে করলে আমি কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে পারতাম।" তা তিনি পারতেন। কিন্তু সর্বত্যাগী তিনি। তাই তাঁর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ভক্তদের কল্যাণের পথ দেখানো। তাঁদের ভিতরে সেই ভাবনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য, যাতে তাঁরা নিজেদের জীবনের পরম সার্থকতা—পরম চরিতার্থতা লাভ করতে পারেন, জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ দলে দলে যাত্রীরা আসছেন, ভক্তরা আসছেন—ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর থেকে তো বটেই, সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছেন। এই মহাতীর্থস্থানে এসে পবিত্র হবার জন্য তাঁরা উদ্গ্রীব হয়ে আসছেন, ব্যাকুলতা নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাঁদের সেবার জন্য আমরা এতদিন বিশেষ কিছু ব্যবস্থা এখানে করতে পারিনি। এই যাত্রিনিবাসটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেই দীর্ঘকালের অভাব কিছুটা মিটল। তবে এই মেটাটাও সাময়িকভাবে। কারণ, ঠাকুরের ভক্তদের সংখ্যা সীমিত নয়, সীমিত থাকবেও না। দূর দূর থেকে আরও কত ভক্ত আসবেন। তাঁদের জন্য প্রথম পর্যায়ে একটু জায়গা অন্ততঃ হলো।

এখন এখানে যাত্রীরা এসে কি দেখবেন? দেখবেন ঠাকুরের স্থান—তাঁদের দীর্ঘকালের কল্পনালোকের এখানে বাস্তব প্রকাশ। এই পবিত্র আবহাওয়াতে তাঁরা একটু আনন্দ করে বসতে পারবেন, থাকতে পারবেন। সেইজন্য এই যাত্রিনিবাস। এই যাত্রিনিবাসের পরিকল্পনা যাঁদের তাঁরা ধন্য। যাঁদের সহযোগিতায় এই যাত্রিনিবাসের প্রতিষ্ঠা হলো তাঁরাও ধন্য। ঠাকুরের কৃপা তাঁদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক, বর্ষিত হোক আজকের এবং আগামী দিনের সমস্ত যাত্রীদের ওপর।

ঠাকুরের ভক্তযাত্রীরা বড় সোজা জিনিস নয়। ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন:

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥"
(১১।১৪।১৬)

—নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর ও সমদর্শন মুনিকে (অর্থাৎ ভক্তকে) আমি সর্বদা অনুগমন করি। কারণ, এরূপ ব্যক্তির পদধূলিতে আমি পবিত্র হই।

ভক্তদের পদরেণু—ভক্তরজঃ! তিনি মহান, তাই তাঁর ভক্তেরাও মহান। আমি ভক্তদের স্তুতির জন্য বলছি না। আমি বলছি, তাঁদের স্মরণ রাখবার জন্য। কী বিশাল একটা আদর্শকে তাঁরা জীবনে নিয়েছেন! এতে ঠাকুরের কত কৃপা তাঁদের ওপর পরিস্ফুট তা বোঝা যাচ্ছে এবং সেই সুযোগ যাতে আমাদের সকলের—ভক্ত হোন, সাধু হোন—জীবনে যাতে ফলদায়ী হয় তার জন্য সেই ভাব নিয়ে আমাদের এখানে আসা দরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার, এটি মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থে আসতে পেরে যেন নিজেদের আমরা ধন্য মনে করি। যাঁরা খুব আনন্দ করে আসছেন, একটা শুদ্ধ ভাব নিয়ে—তাঁদের একটা উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করে এই যাত্রিনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যথেষ্ট যে হয়েছে—আগেই বলেছি—তা নয়। তবে ধীরে ধীরে আজ এতটা হলো। ক্রমশঃ আরও বিশাল এর পরিণতি হবে।

ঠাকুরের চরণে, মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই। তাঁদের কৃপায় এই যাত্রিনিবাস যেন ধন্য হয়ে যায়। এখানে মহাতীর্থে যাঁরা আসবেন তাঁরা যেন ধন্য হয়ে যান। তাঁরা যেন তাঁদের কৃপা অনুভব করেন। ঠাকুর ও মায়ের চরণে পুনরায় প্রণাম ও প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি।□

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট কালীমূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে এটি চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান : হৃদয়, চক্র : অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির নৃসিংহদেবের পূর্বপুরুষ বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হংসেশ্বরী-মন্দিরের একটি আত্মিক সম্পর্কের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দুর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ডাঃ স্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি গ্রাফিকস

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

অনুধ্যান

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাধু ও গৃহি-ভক্তদের সূত্রে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ে পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

ঠাকুর বলতেন ঃ "সাধুর রাগ জলের দাগ।" এটা তাঁর পার্ষদ্‌দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এই মুহূর্তে খুব বকলেন কোন কারণে, পরমুহূর্তেই অন্য মানুষ—ভালবাসায় ভরপুর! তাঁদের simplicity (সরলতা) ছিল wonderful (অপূর্ব)। আমাদের সঙ্গে যে মেলামেশা করেছেন—এটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। বলতেন ঃ "তোরা এসেছিস—ঠাকুরের আশ্রয়ে থাক। ধন্য হ!"

তাঁদের চরিত্রের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তাঁরা কখনো কারো দোষ দেখতেন না। যে যেমনই হোক—প্রত্যেককেই বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেককে ভালভাবে চলবার সুযোগ দিতেন। ভুল করেছে, আবার সুযোগ দিয়েছেন। কী উদার ছিলেন তাঁরা! তাঁদের সময় নিয়মের কড়াকড়ি ছিল না। তার কারণ, তাঁদের আধ্যাত্মিকতার জোর ছিল। তাঁদের সান্নিধ্যে এমন একটা ভাব আসত যে, মনে কোনপ্রকার প্রশ্নই উঠত না। আমাদের spirituality (আধ্যাত্মিকতা) নেই বলে নিয়ম-শৃঙ্খলার ওপর এত জোর দিতে হয়। তাঁদের কাছে যখন ছিলাম, তখন নিজেকে struggle (লড়াই) করে কখনো মনের ভাবকে উঁচুতে রাখতে হয়নি। তাঁদের কৃপাতেই মনের বৃত্তি আপনিই সংযত হয়ে থাকত।

ভুবনেশ্বর মঠের বিরাট গেট তৈরির কাজ যখন আরম্ভ হয়, মহারাজ তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেই কাজ দেখতেন। ঐ সময় কোন কোন ভক্ত বলেছিলেন ঃ "মহারাজ, এই জঙ্গলে এত বড় গেট করাচ্ছেন কেন?" (তখন ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়া চতুর্দিকে মহুয়া, নাক্সভমিকা, শাল-সেগুনের জঙ্গল ছিল।) মহারাজ স্মিত হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ "কালে এই স্থান জেগে উঠবে; ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার প্রাণকেন্দ্র হবে।" ১৯১৮-১৯১৯ সালে এই কথাগুলি মহারাজ বলেছিলেন। তারপর চারের দশকে দেখা গেল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে চলেছে। ছয়ের দশকে ভুবনেশ্বর পরিপূর্ণ নগরী। আর আটের দশকের শেষে দেখা যাচ্ছে, হারিয়ে গেছে শাল-মহুয়ার অরণ্য; এখন চতুর্দিকে শুধু জনারণ্য। তিনের দশকেও চারিদিকের জঙ্গলে বাঘের আনাগোনা ছিল। স্টেশন থেকে এখানে আসতে দুদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। গা ছম্‌ছম্ করত। ঐ সময়ে একবার আশ্রমের বড় কুয়োতে একটা ভালুক পড়েছিল। অনেক লোক মিলে চেন-দড়ি দিয়ে তোলা হয়েছিল সেটিকে। ওপরে তুলতেই দৌড়ে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। একবার এক পরিচিত শিকারী বন্দুক নিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে বললেন ঃ "মহারাজ আশীর্বাদ করুন। এই জঙ্গলে একটা বাঘ খুব অত্যাচার করছে, সেটাকে মারতে যাচ্ছি, যেন সফল হই।" মহারাজ গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "তা বাপু একটা জীবহত্যার জন্য তোমায় আশীর্বাদ করতে পারব না। তবে তোমার কোন বিপদ না হয়, তা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব।" সব ব্যাপারেই দেখেছি, তাঁর চিন্তাধারা ছিল ইতিবাচক একটা সুরে বাঁধা। কখনো কোনরকম এলোমেলো দেখিনি। সেটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

ছিপ দিয়ে মাছ ধরা মহারাজের একটা সখ ছিল। একবার দক্ষিণ ভারত ও পুরী থেকে ফেরার পর ডিসেম্বর কি জানুয়ারিতে বেলুড় মঠে একদিন মহারাজ মাছ ধরার তোড়জোড় করছেন। বাবুরাম মহারাজ চান না মঠাধ্যক্ষ বসে বসে মাছ ধরুক। কিন্তু মহারাজ আরও বেশি করে বসতেন আর মিটমিট করে হাসতেন। শীতকালে ছিপে মাছ ধরা যায় না। কারণ, জলের কিনারে মাছ আসে না। তবু ছিপ নিয়ে একদৃষ্টে ফাতনার দিকে চেয়ে বসে থাকাই মহারাজের যেন একটা নেশা। তখনকার প্রধান ফটক (ঠাকুরের মন্দিরের দক্ষিণদিকের যে-গেট, এখনকার পল্লীমঙ্গল শোরুমের সামনে) পেরিয়ে মঠে ঢোকার সময়ে বাঁদিকে ডোবার মতো একটা পুকুর ছিল। তার চারিদিকে নারকেল গাছ। এখনো সেই নারকেল গাছের দু-চারটা আছে। সেদিন বিকাল তিনটা নাগাদ ঐ পুকুরের ধারে গিয়ে মহারাজ বসলেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে মহারাজকে বসিয়ে কাজে গেলাম। শীতকাল বলে ছাতার ব্যবস্থা করতে হয়নি। মহারাজ যেন রোদ পোয়াচ্ছেন, আর মাছ ধরছেন। কচিৎ দু-একবার ফাতনা নড়ছে। মহারাজ একদৃষ্টে ফাতনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। ঐ সময় এক ভদ্রলোকও ঐ গেট দিয়ে ঢুকে মঠের দিকে যাওয়ার সময় দেখলেন, এক সাধু গামছা মাথায় দিয়ে রোদ-পিঠো হয়ে বসে ছিপ-হাতে

মাছ ধরছেন। সেই ভদ্রলোক মঠের প্রাঙ্গণে এসে বাবুরাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এখানকার অধ্যক্ষ কে?" বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ "কেন?" তিনি বললেনঃ "আমি মেদিনীপুরের ডি. এম.। দু-চারদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি কাজে। আমার খুব ইচ্ছা, এখানকার অধ্যক্ষের কাছে দীক্ষা নিই।" বাবুরাম মহারাজ সব শুনে বললেনঃ "বেশ তো বসুন, প্রসাদ নিন, একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।" ভদ্রলোক প্রসাদ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আচ্ছা ঐ পুকুরে এক সাধু গামছা মাথায় বসে মাছ ধরছেন, উনি কে?" বাবুরাম মহারাজ সসঙ্কোচে জানালেন, উনিই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ। এই কথা শুনেই ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেনঃ "মশাই, মেছো সাধুর কাছে দীক্ষা নিতে পারব না।" বলেই হনহন করে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়, আমরা লক্ষ্য করলাম, মহারাজ যেখানে বসেছিলেন সেদিকে তাকালেন না পর্যন্ত। বাবুরাম মহারাজকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। মহারাজ যখন ফিরলেন, বাবুরাম মহারাজ তাঁর কাছে অনুযোগও করলেন একটু। মহারাজ হাসতে হাসতে ওপরে ওঠার সময় বললেনঃ "বাবুরাম-দা, তাঁর কৃপায় কত ডি. এম. আসবে যাবে। এখন আর কি হয়েছে!"

দুদিন পরেই ঐ ভদ্রলোক আবার এলেন। এবার তাঁর কথাবার্তা ও চালচলন যেন বদলে গেছে। সবিনয়ে বাবুরাম মহারাজকে অনুরোধ করলেন তাঁকে একটিবার 'ব্রহ্মানন্দ স্বামী'র দর্শন করিয়ে দিতে। বাবুরাম মহারাজ বিস্মিত হয়ে বললেনঃ "সে কি মশাই? সেদিন উনি ছিপ ফেলেছেন দেখে 'মেছো সাধু' বলে চলে গেলেন, আজ আবার দর্শন করতে চাইছেন?" ভদ্রলোক প্রায় কাঁদকাঁদ গলায় যা বললেন তার অর্থ হলোঃ দুদিন ঘুমোতে পারছেন না। তন্দ্রা এলেই ঠাকুরের মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে। ঠাকুর বলছেন, "ওরে ওর আরও একটা রূপ আছে দেখে আয়।" এই কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ তাঁকে নিয়ে ওপরে গেলেন। মহারাজ তখন মঠবাড়ির ওপরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। স্থির নেত্র। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে ঐ চিত্র দেখলেন। তারপর হাউহাউ করে কেঁদে মহারাজের পায়ের কাছে পড়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি মহারাজের কাছে কৃপালাভ করেছিলেন। দীক্ষার দিন দক্ষিণা হিসেবে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিপ, হুইল, ডোর, বঁড়শি সব দিয়েছিলেন। সেগুলি এখনো রাজা মহারাজের মন্দিরের ওপরে আলমারিতে রাখা আছে। ওঁদের সবটাতেই ছিল বালকস্বভাব। যেন সবটাই খেলা। ছিপ ফেলা ও সমাধি—দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না ওঁদের জীবনে। "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা!"

মহারাজ যেমন বালকস্বভাব ছিলেন, তেমনই ছিলেন গম্ভীর, আবার তেমনই ছিল তাঁর ভালবাসা। একদিন মঠবাড়িতে তাঁর ঘরের পাশে বারান্দায় শুয়ে আছি। শীতকাল। বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প। গঙ্গার দিকের বারান্দা ত্রিপলের পর্দায় ঢাকা। তখন বিছানাপত্রও তেমন ছিল না, দুটো তুলোর কম্বল মাত্র। একটা পাতার, একটা গায়ে দেওয়ার। একটু জ্বর এসেছে। সেদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যে হয়তো ককিয়েছি জ্বরের জন্য। ঘর থেকে মহারাজ শুনেছেন। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে নিজের লেপটা আমার গায়ে ভাল করে ঢাকা দিয়ে গিয়েছেন। আমি টেরও পাইনি। পরন্তু গরম লাগাতে আরামে খুব ঘুমিয়েছি। ভোররাত্রে যখন ঘুম ভাঙল, দেখি মহারাজের লেপ আমার গায়ে। তড়িঘড়ি উঠে লেপ ভাঁজ করে, তাঁর লেপে মাথা ঠেকিয়ে ঘরে গেলাম। দেখি, মহারাজ একটা আলোয়ান গায়ে ধ্যান করছেন। ঘরে আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে বললেনঃ "কিরে, জ্বরটা একটু কমেছে বাবা?" সবিনয়ে বললামঃ "আপনার লেপ কেন আমার গায়ে দিলেন মহারাজ? আমার অপরাধ হবে।" তিনি মধুর স্বরে উত্তর দিলেনঃ "আরে বোকা, তুই তো নিজে নিসনি। আমিই তোর গায়ে দিয়েছি। তোর শরীর খারাপ হলে তো আমারই কষ্ট। যাই হোক, আজ ডিসপেনসারি থেকে ঔষধ নিয়ে এসে খাস।" ছোটখাট ঘটনার মধ্যে তাঁর কত ভালবাসা ও দরদ যে দেখেছি তা বলার নয়। মা-বাবার ভালবাসা আর কতখানি! এঁদের, ঠাকুরের সব সন্তানদের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম এবং অসীম।

মহারাজ যখন মজা করতেন, হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যেত। এত নির্মল ছিল তাঁর মন। গঙ্গাধর মহারাজকে নিয়ে খুব তামাসা করতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ এবং আমাদের সঙ্গেও রসিকতা করতেন। একটা ঘটনা বলি। মহারাজ যেমন খেতেও পারতেন, আবার উপবাসও করতে পারতেন। সারাদিন-রাত উপোস করে পরদিন সকালে খেতেন। এইরকম একবার সারাদিন উপবাসে আছেন। পরদিন সকালে খাবেন বলে কিছু সন্দেশ, কয়েকটা

রসগোল্লা আলমারিতে রাখা হয়েছে। ভোরে উঠে দেখি, আলমারিতে সন্দেশের বাক্স, রসগোল্লার পাত্র সব ঠিক আছে। শুধু ভিতরে কিছু নেই। কে এরকম করতে পারে? কার এত বড় সাহস হবে? ভাবলাম, এখন কি হবে? মহারাজকে তো একটু পরেই খেতে দিতে হবে। কি দেব? মহারাজের ঘরে গিয়ে দেখি, মহারাজ চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান করছেন। ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাবুরাম মহারাজকে বললাম: "এক্ষুণি বালিতে লোক পাঠাতে হবে সন্দেশ ও রসগোল্লা কিনতে।" সব শুনে বাবুরাম মহারাজ আমায় বকা শুরু করলেন আর বললেন, তিনি নিজে গিয়ে ঘটনাস্থল দেখবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আবার একপ্রস্থ আমায় বকুনি: "তোরা এত হতচ্ছাড়া কেন? আলমারিটা ভাল করে লাগাতে পারিস না। হুলো বেড়ালটা তো বহুদিন ধরেই উৎপাত করছে জানা কথা।" আমি কিছু বলার আগেই মহারাজ বলে উঠলেন এবং হাত দিয়ে দেখালেন: "হ্যাঁ বাবুরাম-দা, আমি দেখেছি, এই অ্যাত্তবড় (হাত দিয়ে দেখিয়ে) একটা হুলো এসে সবগুলো কপকপ করে খেয়ে গেল। এমনই সেয়ানা সে যে, আলমারিটা খুলে মিষ্টিগুলি খেয়ে আবার আলমারিটা বন্ধ করে দিয়েছে!" বাবুরাম মহারাজ উচ্চহাস্য করে উঠলেন। আমিও ব্যাপারটা বুঝে বাইরে চলে এলাম। রাত্রে খিদে পেয়ে যাওয়ায় মহারাজ সব খেয়ে নিয়ে আমাদের চমকে দেওয়ার জন্য এইরকম করে রেখে দিয়েছেন!

আরেকদিনের ঘটনা। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র। বিকেল তিনটা হবে। মহারাজ বিশ্রামের পর খোলা ছাদে উঠেছেন। মুখ ধোবেন। আমি জল ঢেলে দিচ্ছি। হঠাৎ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে তিনি স্থির হয়ে গেলেন। হাতের জল সব গলে গেল। চোখ স্থির। ছাদের উত্তাপে পা পুড়ে যাচ্ছে, মাথায় রোদ। আমি নিজেই দাঁড়াতে পারছি না। মহারাজ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণ পর হুঁশ এল। মুখ ধুলেন। এঁদের ভাবসমাধি, হাস্য-পরিহাস সবই শ্রীরামকৃষ্ণময় ছিল। আপাতদর্শনে মনে হতো জাগতিক—সাধারণ লোক। কিন্তু ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কথা বা দেবদেবীর কথা হলেই মুহূর্তে ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। এই হলো এঁদের মনের আসল স্বরূপ।

মহারাজ রাত্রিবেলাটা এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে থাকতেন। মধ্যরাত্রে উঠে বসে জপ করা তাঁর নিত্যকার অভ্যাস, আবার দুটোর পর শুয়ে পড়লেও ফের চারটে-সাড়ে চারটেয় উঠে বাথরুমে যেতেন। ঐ সময় খোলা ছাদের মধ্য দিয়ে যেতেন বলে আলনা থেকে একটা ফতুয়া টেনে নিয়ে পরতেন এবং ফতুয়াটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই রাখা থাকত। এই বাথরুমে যাওয়া এবং ফিরে এসে জপে বসার মাঝে তিনি সাধারণতঃ চোখ খুলতেন না এবং কথাও বলতেন না। একদিন আমি ভুল করে আলনার নির্দিষ্ট জায়গায় ফতুয়া না রেখে অন্য জায়গায় রেখেছিলাম। ভোরে মহারাজ যথারীতি নির্দিষ্ট স্থানে ফতুয়া না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত হয়েছেন। গম্ভীরভাবে আমায় ডাকলেন: "সূয্যি, আমার ফতুয়াটি কি হলো?" আমি বারান্দায় বসে জপ করছিলাম, মহারাজের গলা শুনে শশব্যস্তে ঘরে এলাম এবং অন্য জায়গা থেকে ফতুয়াটা নিয়ে মহারাজকে দিতে গেলাম। মহারাজ বিরক্ত হয়ে—"যাঃ, এভাবে সেবা করতে হবে না তোদের"—বলে আমায় একটা ঠেলা দিলেন, তাতেই আমি ছিটকে বারান্দায় পড়লাম। ওঁর গায়ে এত শক্তি আগে জানতাম না। আমায় পড়ে যেতে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে দরদভরা গলায় বললেন: "বাবা, শরীরটা বুড়ো হয়েছে বলে তোদের ওপর এত নির্ভর করি, আর তোরা যদি একটু সতর্ক হয়ে কাজ না করিস তো চলি কিভাবে? দ্যাখ দিকিনি, আজ সকালটা মাটি করে দিলি।"—অর্থাৎ এই কথা বলা, চোখ খোলা ইত্যাদি কারণে আজ আর মহারাজের ঠিক ঠিক ধ্যান হবে না। আমার খুব অনুশোচনা হলো। মহারাজকে প্রণাম করে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলাম। মহারাজ স্নিগ্ধকণ্ঠে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: "যা, ঠিক আছে। এমন ভুল আর না হলেই হলো। সব কাজে সতর্কতা চাই, বুঝলি।"

মহারাজের স্বভাব যেমন ছিল স্নিগ্ধ ও কোমল, তেমনই কঠোর হতেন প্রয়োজনে। সেই অবস্থায় মঠ বা আশ্রম-ভূমি থমথম করত। একবার একজন ব্রহ্মচারী হতে এসেই মঠের নিয়মশৃঙ্খলা ও ধ্যান-ভজন, পাঠ-আলোচনা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ সমালোচনা করতে শুরু করল। তরকারি কাটা, বাসন মাজা—এসব মেয়েলি কাজ করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। এইসব কথা সে বলত। মহারাজ সব শুনছিলেন কয়দিন ধরেই। একদিন তাকে ডেকে বললেন: "দেখ বাবা, তোমার অনেক শক্তি আছে, কাজও করবে অনেক, তবে এই ঘরানার তুমি নও। তুমি বাবা যেখানে ভাল লাগে চলে যাও।" ব্রহ্মচারী তখন স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল এবং আরেকবার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ

জানাল। মহারাজ ততোধিক গম্ভীর ও দৃঢ়ভাবে বললেনঃ "দেখ, এই জীবন যাপনের জন্য সুযোগ বারবার আসে না, একবারই আসে। তুমি সে-সুযোগ নিতে চাওনি, অবহেলা করেছ, অন্যের ভাব নষ্ট করছ। তাই বলছি, তোমার অন্য ঘরানা।" পরবর্তী কালে সেই ব্রহ্মচারী অন্যত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিজেই একটি বড় সেবাসংস্থা গড়েছিল।

মহারাজের মন ছিল বড় কোমল। নটী তারাসুন্দরী মহারাজের কৃপাধন্যা ছিলেন। মহারাজের কাছে তিনি আসতেন এবং পরবর্তী কালে ভুবনেশ্বরে একটা ঘর করে, ঠাকুরের ছবি সাজিয়ে, ঠাকুরের সামনে আপন মনে গান করতেন, নাচতেন—যেন ঠাকুর সামনে বসে সব দেখছেন, শুনছেন। এই ছিল তারাসুন্দরীর ভাব, ভক্তি নিবেদনের রীতি। তাঁর একান্ত অনুরোধে মহারাজ একদিন থিয়েটার দেখতে গেলেন। 'স্টারে' কি কোথায় মনে নেই। কি নাটক দেখতে যাওয়া হয়েছিল তাও এখন মনে নেই। তবে ঘটনার একটা দৃশ্য মনে এখনো জেগে আছে। বক্সে মহারাজ বসেছেন। আমরা সঙ্গে যারা গেছি, আশেপাশে বসেছি। ভক্তি-আশ্রয়ী আবেগধর্মী কোন একটি নাটক হচ্ছিল। নাটকের মাঝামাঝি একটি হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য। তারাসুন্দরীর অভিনয় খুবই প্রাণস্পর্শী হয়েছিল। মহারাজ এই দৃশ্য দেখে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমি হাওয়া করতে লাগলাম, ঈশ্বর মহারাজ (স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ) পায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। বেশ খানিক পরে মহারাজ স্বাভাবিক হলেন এবং পুরো নাটক না দেখেই হল থেকে বেরিয়ে এলেন। বলরাম-মন্দিরে এসে সোজা শুয়ে পড়লেন, কিছুই খেলেন না। আমরা তাঁর এই গম্ভীর ও থমথমে ভাব দেখলে সন্ত্রস্ত থাকতাম। পরের দিনও এই ভাব কাটল না। দক্ষিণেশ্বর থেকে রামলাল-দাদাকে আনানো হলো। তিনি এসে মহারাজের সঙ্গে অনেক রঙ্গ-তামাসা করলেন, হাত-পা নেড়ে ঘোমটা দিয়ে মেয়েদের অভিনয় দেখাতে লাগলেন। এইসব দেখে পূজনীয় মহারাজ শিশুর মতো হেসে কুটিকুটি হলেন। আগের সেই ভাবটি চলে গেল।

মহারাজের সহনশীল ভাবটি ছিল তাঁর সহজাত। তাঁর অপছন্দ কিছু ঘটলে গম্ভীর হয়ে যেতেন বটে, কিন্তু কখনো বিরক্ত ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। একদিন কথায় কথায় আমাদের বলছিলেনঃ "তোরা আমাদের আর কতটুকু বকুনি খেয়েছিস? আমি স্বামীজীর কাছে যে গালাগালি খেয়েছি তার শতাংশের একাংশও তোরা খাসনি। অবশ্য পরমুহূর্তে আমার মন খারাপ দেখলেই স্বামীজী এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলত—'তোকে গালাবো না তো কাকে গাল দেব? আমার আর কে আছে বল? তুই মুখ গোমড়া করলে আমি যাই কোথা? তোর-আমার এই সব কাজকর্মের, মঠ-ফটের দরকার নেই। কিন্তু যারা তাঁর নাম করে আসছে তারা যাবে কোথায়? এই সব বুঝবেই বা কে বল? তাই আমার গালাগালগুলো তুই খা। ঠাকুরের কাছে তো অনেক আদর খেয়েছিস।' এইসব বলে হাসাহাসি হতো।" স্বামীজীই মহারাজকে সঙ্ঘাধ্যক্ষ করে বলেছিলেনঃ "রাজা, তোকে দিলাম 'রাজা' করে, এবার দায়-দায়িত্ব সামলাতে হবে তোকে। কিভাবে রাজ্যরক্ষা করবি ঠিক কর।" লাটু মহারাজ মজা করে বলতেনঃ "তুমি তো সতের বিঘা জমিন কা রাজা আছ, লেকিন নরেন ভাই তামাম দুনিয়াকা রাজা আছে।"

রোজ ভোরে মহারাজ সমস্ত মঠভূমি প্রদক্ষিণ করতেন। চাষবাস, সেবাপূজা, ফুলফলের বাগান, রান্নাঘর, গঙ্গাঘাট সব দেখতেন আর বলতেনঃ "স্বয়ং ঠাকুর এখানে জগৎ শেঠের সাক্ষীর মতো বাঁধা হয়ে আছেন। স্বামীজীকে তিনি বলেছিলেন, 'তুই আমায় যেখানে মাথায় করে বসাবি আমি সেখানেই থাকব।' স্বামীজী সাশ্রুনয়নে ঠাকুরের পূতপবিত্র আত্মারামের কলস মাথায় করে এনে এই মঠভূমির নিমগাছতলায় বসিয়ে পায়েস ভোগ দিয়েছিলেন। [এখন যেখানে উৎসবের বড় প্যান্ডেল হয় তার পিছনে যে গোলাপবাগান তারই কিনারে সেই নিমগাছ ছিল। তার পাশ দিয়ে একটা নালা গিয়ে গঙ্গায় পড়েছিল।] বলেছিলেন, 'আজ থেকে যুগ যুগ ধরে তোমায় এখান থেকেই কৃপা-করুণা বিতরণ করতে হবে।' স্বামীজীর কান্না যেন থামতেই চাইছিল না। ঠাকুরকে বসিয়ে স্বামীজীর সে কী কান্না!"

রাজা মহারাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ঠাকুরের শিক্ষারই ফল। কেরালায় দেখতাম, সেখানকার ভক্ত লোকজনদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য, সংস্কৃতি তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেন এবং সম্মান দিতেন। আমাকে এক বৃদ্ধার কাছে করম্ব রসম, আবিয়াল উপমা—এইসব শিখতে পাঠাতেন। নিজে তৃপ্তি করে খেতেনও। কর্ণাটকে অবস্থানকালে এক নামকরা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে কর্ণাটকী সঙ্গীত শিখতে বললেন। রামনাম-সঙ্কীর্তনের "কনকাম্বর" স্তবটি ভাল করে শিখে নিতে বললেন। মঠেও দেখেছি, ভিজিটার্স রুমে কালীকীর্তনের মহড়ার সময় তিনি গঙ্গার

ধারের বারান্দায় বসে শুনতেন, ভুল হলে তিনি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলতেন: "কিরে, তোরা কি আজ ভাঙ-গুলি খেয়ে গান করতে আরম্ভ করেছিস?" কিন্তু যখন ভালভাবে গান গাওয়া হতো তখন মুদিতনয়নে উপভোগ করতেন ও হাতে তাল দিতেন।

মহারাজ মাদ্রাজে একটি ভক্ত-পরিবারের অনুরোধে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁরা রামানুজপন্থী ছিলেন। মহারাজকে বাড়ির উঠোনের টুলে বসিয়ে নানারকম উপচার দিয়ে বরণ করে, আরতি করে, ক্ষীর-সর-ননী এইসব খাইয়ে তাঁর চারিদিকে নাচ ও গান অনেকক্ষণ ধরে চলল। মহারাজও স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টিতে তাঁদের এই পূজা গ্রহণ করলেন। পরে তাঁদের নানা প্রশ্নের উত্তর দু-চারটি কথায় সুন্দরভাবে সমাধান করে দিলেন। মহিলারা অনেকে তামিল ভাষায় প্রশ্ন করছিলেন। একজন ভক্ত প্রশ্নগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন আর মহারাজ ইংরেজীতে সেগুলির উত্তর দিচ্ছিলেন।

একটি তামিল প্রশ্নের অনুবাদ মহারাজের পছন্দ হলো না। মহারাজ ভক্তটিকে বললেন: "না, আপনার অনুবাদ ঠিক হয়নি, এইরকম হবে।" যে-মহিলারা মোটামুটি ইংরেজী জানেন তাঁরা সমস্বরে বলে উঠলেন: "মহারাজ ঠিক বলেছেন।" ভক্তের ভাব বুঝতেন মহারাজ। সেক্ষেত্রে ভাষা কোন বাধা হতো না। মাদ্রাজ মঠে থাকাকালেই মহারাজ সেবকদের প্রায়ই বলতেন: "ভাল করে শাস্ত্রাদি পড়বি, তা না হলে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আসে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আমাদের ওসব বিধিবৎ পড়তে হয়নি। শাস্ত্রস্বরূপ তিনিই তো আমাদের প্রতি পদে সব শিক্ষাদি দিয়েছেন। কথায় বলে না, 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল'। আমরা তাঁকে দেখেছি, তাঁর শ্রীমুখে কথা শুনেছি, পরে শাস্ত্রে পড়ে মিলিয়েছি। অদ্ভুত! তা তো তোরা ধারণা করতে পারবি না বাবা, তাই শাস্ত্রাদি পড়তে বলছি। এসব দেশে অনেক পণ্ডিত আছেন। যাঁরা মোটামুটি ইংরেজী জানেন, তাঁদের কাছে পড়। সব না বুঝলেও শাস্ত্রকথা তো, 'শ্রবণমঙ্গলম্'—পরে 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' হয়ে যাবে।" আমাদের মধ্যে একজন বললেন: "কেন আমরা তো আপনাকে দেখছি, আপনার কথা শুনছি, এতেই হবে বিশ্বাস করি।" তখন মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন: "তা বিশ্বাস যদি থাকে ভাল, তবে এই 'বিশ্বাস'টা বড়ই ভঙ্গুর; তাই এসব কথা বলছি। আমরা যা বলি বিনাতর্কে নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ ও পালন করলে তোদের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ নেই জানবি।" এই কথার পর মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমরা সকলে তাঁর পাদমূলে বসে নিঃশব্দে ধ্যান-জপ করতে থাকলাম। মহারাজ মাদ্রাজে কয়মাস থাকাকালে আমরা একজন পণ্ডিতের কাছে উপনিষদ্ পড়েছিলাম। বারবার বলতেন: "শাস্ত্রপাঠ খুব দরকার। স্বামীজী বলতেন, বিদ্যার চর্চা না থাকলে মঠ হীনদশা প্রাপ্ত হয়।" মঠে বিদ্যাচর্চার যে ট্র্যাডিশন তা স্বামীজী, মহারাজ এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের প্রেরণা ও উৎসাহেই গড়ে উঠেছে। শুধু বিদ্যাচর্চার ট্র্যাডিশনই নয়, পুরনো সব ট্র্যাডিশনই তাঁদের গড়া। মঠের সব নিয়ম এবং ট্র্যাডিশনেরই একটা কারণ আছে। সেজন্য পুরনো নিয়ম বা ট্র্যাডিশনকে ভাঙতে দেখলে আমাদের কষ্ট হয়। ঠাকুরের ভোগরাগের ত্রুটি হলে ওঁরা বিরক্ত হতেন। ওঁদের কাছে শুনেছি: "পূজা-অর্চা, ভোগরাগ, সাধন-ভজন সব কিছুরই সার্থকতা তখনই, যদি ভাবটি ধরে চলতে পার। ভাববিহীন যাকিছু করবে সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি। ভাবময় অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম তোমায় মহত্ত্বের দিকে, দেবত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তা যদি না হয় তাহলে জীবনের আরম্ভ যেখানে শেষও সেখানেই হবে।"

ভুবনেশ্বর মঠে শাল, সেগুন, আম, সফেদা, কামরাঙা, কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে মহারাজ বলতেন: "এই শীতে এখানে অনেক পাখি আসবে।" কয়েকটা পাখিকে দেখিয়ে বলতেন: "এইগুলো দোয়েল, ঐটে কাঠঠোকরা, ঐ হলো ফিঙে আর ওদিকে সাতভায়া ঘুঘু।" পরের দিকে যখন ভুবনেশ্বর মঠের দায়িত্ব নিয়ে রয়েছি তখন মহারাজের ঐসব কথা মনে পড়ত। দুপুরবেলা চারিদিক নির্জন। ঘুঘুগুলো আপনার মনে ডাকত। তার মাঝে মাঝে দোয়েল ও ফিঙের ডাক। তখন মন খুব উদাস হয়ে যেত। মনে হতো, জগৎ-সংসারে কে কার? কিসের আশ্রম? দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে পড়তে মন চাইত। আবার ভাবতাম, মহারাজ কী পরিশ্রম করে এই মঠ করেছেন! সাধুরা ও ভক্তেরা এসে ঠাকুরের নাম করবে, তাঁর নাম জগৎময় ছড়াবে। জিজ্ঞাসু মানুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। কেবল নিজের সুখ, নিজের মুক্তি তো ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজদের উদ্দেশ্য নয়। সেইজন্যই তো স্বামীজী আমাদের এই মহামন্ত্রটি দিয়ে গেলেন: "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" এবং "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়"। [ক্রমশঃ]

স্মৃতিকথা

মায়ের স্মৃতি

স্বামী শঙ্করানন্দ

১৯০৪ কি ১৯০৫ সাল। খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ), আমি ও বিশ্বরঞ্জন (স্বামী হরিহরানন্দ) মায়ের দেশে গেছি। মা তখন জয়রামবাটীতে। আমরা পৌঁছাতেই তিনি জেলে ডাকিয়ে পুকুরে মাছ ধরালেন। প্রথমবারেই দুটো মাছ পড়ল মাঝারি রকমের। দুটোই রেখে দিলেন। মা বললেন ঃ "তোমরা এসেছ বলে প্রথমবারেই মনোমত মাছ পাওয়া গেল। তোমরা পয়মন্ত। এই সেদিন কালীর বিয়ের পাকা দেখার দিনে, অনেকবার জাল ফেলে কয়েকটি ছোট ছোট মাছ পাওয়া গেল।" মা নিজেই সব রান্না করলেন। আমাদের কাছে বসিয়ে কত আদরযত্ন করে খাওয়ালেন। সে স্নেহ-ভালবাসা কত সহজ সুন্দর! একেবারে নাগালের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্তলে।

"মা নিজেই সব রান্না করলেন। আমাদের কাছে বসিয়ে কত আদরযত্ন করে খাওয়ালেন। সে স্নেহ-ভালবাসা কত সহজ সুন্দর! একেবারে নাগালের মধ্যে, অন্তরের অন্তস্তলে।"

ভোররাত্রে উঠে আমি আর খোকা মহারাজ শৌচে বেরিয়েছি। মাঠের মাঝখান দিয়ে আমোদর নদের দিকে এগোচ্ছি। খোকা মহারাজ লক্ষ্য করলেন, একটি মেয়ে মাথায় ঝুড়ি কিংবা চাঙাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখতে পেয়ে, আরেকটি মেয়ের মাথায় বোঝাটি চাপিয়ে দিয়ে তারই আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একটু চোখের আড়ালে চলে গেলে তারা মায়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। আমি খোকা মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "আপনি কি চিনতে পেরেছেন, উনি কে?" তিনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি চিনেছি, বেশ স্পষ্ট করে দেখেছি। আমাদেরই মা। কত রাত থেকে উঠে পাশের গ্রামের হাট থেকে আমাদের জন্য তরিতরকারি সংগ্রহ করতে গিছলেন। পাড়াগাঁয়ে কী আর পাবেন? কয়েকটি ডাঁটা, থোড়, কাঁচকলা ছিল ঐ চাঙাড়িতে।" আমি শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাহলে তো বেশিদিন আর এখানে থাকা হবে না! আমাদের জন্য মায়ের কষ্টের অবধি নেই। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাত্রেও একটু ঘুমাতে পারেন না। তেরাত্রি বাস করে আমরা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আরামবাগে এলাম।

★

১৯১২ সাল। (রাজা) মহারাজের সঙ্গে আমি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে। মহারাজ আমায় বললেন ঃ "দেখ অমূল্য, মাকে আজ চপ তৈরি করে খাওয়াতে হবে।" আমি বাজার থেকে মোচা ও আলু কিনে আনলাম। সিদ্ধ করলাম। মোচা ভিতরকার পুর। আলু সিদ্ধ করে ছাড়িয়ে মাখছি, দেখলাম—থসথসে নরম। তখন আরেকটা জিনিস দিয়ে সেটাকে শক্ত করে নিলাম। চপ তৈরি করে যখন একটি থালায় সাজিয়ে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলাম, তখন মা পূজা শেষ করেছেন। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে মা চপও ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মা অন্য প্রসাদের সঙ্গে চপ-প্রসাদও খেলেন। খুব ভাল লেগেছে। গোলাপ-মাও খেয়েছেন। বেশ মচমচে চপ। খেয়ে তারিফ করলেন। বিকেলে ওপরের বারান্দা থেকে গোলাপ-মা আমায় জিজ্ঞেস করছেন ঃ "হ্যাঁ অমূল্য, এত চমৎকার চপ কি করে তৈরি করলে? কেমন মচমচে, খুব সুস্বাদু।" মহারাজও তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। আমায় চোখ টিপে দিলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোন উত্তর দিলাম না। মহারাজ উত্তর দিলেন ঃ "গোলাপ-মা, তোমরা ভেবেছ তোমরাই ভাল রান্না করতে জান। এখন দেখ, আমরাও তোমাদের চেয়ে ভাল রান্না করতে পারি।" মহারাজ পরে আমায় তৈরি করার প্রণালী জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললাম ঃ "যখন আলু চটকাতেই নরম চট্‌চটে হয়ে গেল, তখন সুজি ভেজে ওর সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম। মশলাও ভেজে গুঁড়িয়ে পুরের সঙ্গে ঠেসে নিয়েছিলাম।"

সংগ্রহ ঃ স্বামী চেতনানন্দ

[উৎস ঃ স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা, পৃঃ ৯, ১৮]

পরিত্রাণ

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অশ্রু পড়ে টাপুর টুপুর
মনে এল বান
ভাসল রে মন চোখের জলে
কোথায় পরিত্রাণ?

ভাবের ঘরে সিঁদ কেটে তো
দিনগুলো বেশ কাটছিল,
ভবের হাটের লাভের কড়ি
দু-হাত ভরে আসছিল।
লাভের কড়ি লোভের কড়ি
যতই ঘরে জমছিল
মনের মধ্যে অহংবাদ্য
ততই জোরে বাজছিল।

হঠাৎ এল আঘাত নেমে
চক্ষু অন্ধকার,
কোথায় স্বজন কোথায় বন্ধু—
সবাই পগার পার।
বিকট বিকট ভাবনাগুলো
মাথার মধ্যে মারছে ঘা,
বলছে যেন—"থামলি কেন?
অহংবাদ্য বাজিয়ে যা!"

অশ্রুবাদল নামল এবার
পাইনে কিছুই খুঁজি,
লাভের কড়ি হারাল সব
লোভের যত পুঁজি।
হারিয়ে এখন হচ্ছে মনে
(যেন) ঠাণ্ডা হলো প্রাণ!
চোখের জলে এবার তবে
পেলাম পরিত্রাণ।

৯ মার্চ ১৯৯৬

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

সেদিন অকাল দেওয়ালী ছিল,
গভীর রাতের স্ফূর্তি
জ্বেলেছিল হাসি আর আলো।
আনন্দ-ফোয়ারা-সুধা
উপচে পড়েছিল
তৃষ্ণার সাগ্রহ পাত্রে।
লোভ আর ঘৃণা দিয়ে
চিরে ফেলা অনন্ত আকাশ
তখনো নিঃস্পন্দ, নির্বাক।
কে জিতেছিল?
কেন জিতেছিল?
কে হেরেছিল?
কেন হেরেছিল?
অথচ নিরুত্তর মৌন হিমালয়।
ভাঙা মনে কিভাবে জিতে
নেওয়া যায়?
কিভাবে বিচ্ছিন্ন শরীর
নড়েচড়ে সাজানো খেলার মাঠে?
বারুদের গন্ধমাখা
সিন্ধু নদের হাওয়া
ছুটে যায় পদ্মার কিনারে।
নো-ম্যান্‌সল্যান্ড-এর অন্ধকারে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেউ যেন
কেঁদেছিল একা একা
তার মুখ দেখনি কোনদিন,
মাঠে ইতিউতি ধুলো উড়েছিল
বুক ছিল অসম্ভব ফাঁকা।
শীতল কবরের নিচে
নিশ্চিন্ত মাউন্টব্যাটেন
পাশ ফিরে শুয়েছিল হেসে।
বিজয়ীর ললাটে মহাকাল
এঁকেছিল গ্লানির টিকা
ইতিহাসের রুদ্ধ স্রোত শেষে।

মায়াবতী

অশোক ঘোষ

এখানে কেবল স্থির—
অভঙ্গুর স্তব্ধতা—
আকাশের ঘন নীল মিশে গেছে
ঘন বন সবুজের কোলে।
অন্তহীন আকাশ আর
স্তব্ধ বনাঞ্চল পাহাড়ে পাহাড়ে।
অলি-গুঞ্জন,
বাতাসের মৃদু সঞ্চালন
শুধু এই স্থির সমুদ্রে ঢেউ তোলে।
দূর উত্তর সীমানায়—
মৌন পর্বতশ্রেণী—
তুষারমৌলি ধ্যানমগ্ন ঋষি-সমাবেশ।
সমস্ত জগৎ তাই
অতলান্ত নীরবতায়
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভূ।
সান্ত জগতের বলয় বন্ধন ফেলে
তৃতীয় মেরুর এই নিস্তব্ধ জগতে
যদি এসে আত্মমগ্ন হয় মন
আত্মার সন্ধানে,
তবে বনের গভীর হতে যে-বাণী
প্রকৃতিকে করে সঞ্চারণ,
যে-ওঙ্কারধ্বনি ওঠে
আকাশে আকাশে
দিনে রাত্রে নক্ষত্রে নক্ষত্রে
উজ্জ্বল জ্যোতিপুঞ্জে,
সেই মহাপ্রাণ অনন্তের নিঃশব্দ আমন্ত্রণে
আত্মার সাধনা
ভীষণ নীরবে পাবে বাণী অনন্ত আলোকে।
দেহের কন্দরে সুপ্ত কুণ্ডলিনী জেগে
পাবে প্রাণ,
পাবে মুক্তি অসীম আকাশে।
আত্মার বিকাশে প্রাণ মিশে যাবে
ব্রহ্মের সাগরে।
এখানে তখন কেবল আলোর প্লাবনে
আমি হব ব্রহ্মময় অমৃত আস্বাদে।
মায়াবতী তাই তীর্থ অদ্বৈত সাধনে।

বেভুল

নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায়

আমি যতবার চাহি এড়াতে তোমায়
তুমি যাও তত জড়ায়ে,
আমার সঙ্গে তোমার রঙ্গ
এ কী লীলা তব ছড়ায়ে!
ওগো লীলাময়, আমার এ-সুখ
হেয় দান বলে হয়েছি বিমুখ
ছিঁড়িয়াছি যত কণ্ঠের হার
বলিয়াছি নিব গড়ায়ে,
তুমি হেসে হেসে গেছ থেকে থেকে
তত ছুঁয়ে ছুঁয়ে মোর একে একে
সকল অঙ্গ অমনি পলকে
সোনা হয়ে গেছে ঝরায়ে।
যতবার দ্বার খুলেছে আমার
ভেসে ভেসে এসে বাতাসে
চুপে চুপে কানে কয়ে গেছ মোর
তোমার ইশারা আভাসে।
আমি শুনি নাই নিমেষেরও ক্ষণে
তবু থমকিয়া মম প্রাঙ্গণে
কয়েছ ব্যাকুল, ওরে ও বেভুল
কিসের বিরাগ, নাই বা দেউল
গড়িলি আমার অন্তরে তোর
প্রেমবীজ দে রে ছড়ায়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ উবাচ

লালী মুখার্জী

মতও যত পথও তত
একটা তোমায় বাছতে হবে,
নইলে তুমি বিপথ কুপথ এ-পথ সে-পথ
নানা পথে ঘুরতে রবে।
পানিও যা, ওয়াটারও তাই
জলের সঙ্গে প্রভেদ তো নাই,
এই সত্য গুরুর কৃপায়
যখন তুমি বুঝে যাবে,
নির্ভুল পথ তখন তুমি
নিজেই নিজে বেছে নেবে॥

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, কোন ধর্ম বা ধর্মসঙ্ঘের বিবর্তন একটি জটিল সামাজিক প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্যঃ প্রথমটি ক্যারিসমার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ, দ্বিতীয়টি মূল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে যুগোপযোগী পরিবর্তিত রূপে সংরক্ষণ করা বা টিকিয়ে রাখা।[২৫] দ্বিতীয় বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক, যদিও বিষয়দুটি পরস্পরসাপেক্ষ। আলমবাজারে অবস্থানকালীন মঠজীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দেখা যায় এই দুটি উপাদানের বিকাশ এবং সে-সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া। অবশ্য এসবকিছুর পশ্চাতে ছিল জগৎকল্যাণে সমর্পিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনা। সেই সাধনার তাৎপর্য অবধারণ, নিজ নিজ জীবন স্বীকরণ এবং মঠজীবনে তার সম্যক্ বিকাশ মঠবাসীদের নিয়ত প্রবোধিত করেছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহামানবের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে তিনটি দিক থেকে। সেই মহাপুরুষের অনুসরণকারীদের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি বিশিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি। একই সাথে বিকশিত হয়ে ওঠে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনা বা একগুচ্ছ বিশ্বাস। এবং এসবের সাথে সমবেত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে সংস্থা বা সংগঠনের অবয়ব। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণেও বুদ্ধি, বিশ্বাস ও সংগঠনক্রিয়ার ভূমিকা স্পষ্ট। অবশ্য যেকোন ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই তিনটি উপকরণ একই মৌল উপাদানের বিভিন্ন প্রকাশ বৈ তো নয়।[২৬]

জনস্টোন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে যেকোন ধর্মীয় সংস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও একটি সামাজিক সংস্থা বৈ তো নয় ("In short, a group is a group.")।[২৭] অন্যান্য সংস্থার মতো ধর্মীয় সংস্থারও সংগঠন, কাঠামো, ভূমিকা ইত্যাদি অনস্বীকার্য। অপর সংস্থাগুলির মতো মঠ আখড়া ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের লক্ষ্য, আদর্শ ও ভূমিকা নিয়ত মূল্যায়ন করে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রিত করে এবং নিজেদের সক্রিয় রাখতে চেষ্টা করে। এই সাধারণ রীতি অনুসরণ করে আলমবাজার মঠেরও তিনটি পর্যায়ের ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে পরিবর্তনাদি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মঠের মূল ভাবাদর্শের প্রতি মঠের বাসিন্দাদের বৌদ্ধিক ও বিশ্বাসগত আনুগত্য ছিল অপরিবর্তিত ও অটুট। শুধুমাত্র পরিস্থিতির তারতম্যে ও নতুন নতুন ভাবনার তাগাদায় মঠজীবনে কিছু বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়েছিল। পরিণতিতে এগার বছর এক ধারানুযায়ী চালিত মঠজীবনে অভিজ্ঞ প্রাচীনদের নিকট পরিবর্তনাদি মনে হয়েছিল বিপ্লবাত্মক, কারও বা আশঙ্কা হয়েছিল—তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে চলেছেন। এভাবে বিবেকানন্দ-ভাবপ্রকম্পে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিয়েছিল মঠের অঙ্গদের দিনচর্যায়, কিন্তু সেসব সামলাবার আগেই জুন মাসের (১৮৯৭) মধ্যভাগে এক ভীষণ ভূমিকম্পে কলকাতা ও তার আশপাশের অনেক বাড়িঘর ভেঙে পড়েছিল, আলমবাজার মঠবাড়িও খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অপর একটি ভাড়াটে বাড়িতে মঠের স্থানান্তর অথবা সম্ভব হলে নিজস্ব জমিতে বাড়ি তৈরি করে মঠের স্থায়ী সংস্থাপন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। অনেক চেষ্টার পর একটি জমিখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু সেই জমি গঙ্গার অপর পারে। সেই জমি কিনে তার ওপর মঠবাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এবং নতুন বাড়িঘর তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ঐ জমিখণ্ডের নিকটবর্তী একটি বাগানবাড়িতে মঠ সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করা হলো। গঙ্গার পূর্বতটে প্রাণপ্রতিম শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসকল ত্যাগ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত স্মৃতিসুধা এবং দশ বছরের বেশি মঠজীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার স্মৃতি বহন করে মঠবাসিগণ বিবেকানন্দ-নির্দেশিত সন্ন্যাসীর নবীন আদর্শ রূপায়ণে অগ্রসর হলেন।

আলমবাজারে মঠবাসীদের ছয়বছরের জীবনের বিবর্তনের গতিমুখ অনুধাবনের জন্য আমরা উল্লিখিত তিনটি কালপর্যায়ে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জের প্রতি সমনস্ক দৃষ্টিপাতের আগে সামুদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ছয়বছরের

২৫ The Sociology of Religion—Thomas F. O'Dea & Janet O'Dea Aviad, 1983, p. 39

২৬ Ibid., p. 41

২৭ Religion in Society—Ronald L. Johnstone, 1988, p. 57

মঠজীবনের অবিশেষ সাধারণ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করব।

প্রথমেই আমরা মঠবাসীদের পরিচয়লাভের চেষ্টা করব। মঠ বা আশ্রমের অধিবাসীদের জীবনচর্যা, তাঁদের জীবনের মান, তাঁদের ভাবাদর্শের বিশিষ্টতা ইত্যাদি গড়ে তোলে মঠের ভাবমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের কামকাঞ্চনত্যাগী শিষ্যবৃন্দই ছিলেন বরানগর ও আলমবাজার মঠের প্রবীণ বাসিন্দা। এঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, যিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মাদ্রাজে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মঠে একনাগাড়ে বাস করেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজার ব্যত্যয় হবার আশঙ্কায় তিনি কলকাতায় পর্যন্ত যেতে চাইতেন না। তিনিই ছিলেন মঠের 'কোঠারি'। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন ঃ "শশী কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ!"

দলপতি স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯০-এর জুলাইয়ের মাঝামাঝি বরানগর মঠ থেকে প্রব্রজ্যায় বেরিয়েছিলেন। ভারতদর্শন এবং পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচার শেষ করে তিনি আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। পরবর্তী একবছরের অধিকাংশ সময় তাঁর দার্জিলিং, আলমোড়া, শ্রীনগর, লখনৌ ইত্যাদি স্থানে ব্যয়িত হয়েছিল। এইকালে তিনি কলকাতায় ও আলমবাজার মঠে বাস করেছিলেন আনুমানিক ৫০ দিন মাত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ উত্তর ভারতের কয়েকটি তীর্থস্থানে তপস্যাদি করে আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন ১৮৯৫-এর জানুয়ারিতে। তিনি কখনো মঠে, কখনো বা কলকাতায় বলরামভবনে বাস করতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ একসঙ্গে মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে। মাঝে একবার নারায়ণগঞ্জে নাগমশায়কে দেখতে এবং ১৮৯৬-এর শেষভাগে মুঙ্গের, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া ছাড়া স্বামী তুরীয়ানন্দ আলমবাজার মঠেই বাস করেছিলেন। এদিকে স্বামী শিবানন্দ মঠ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণভারতে যান এবং মাদুরাতে বিদেশ-প্রত্যাবৃত্ত বিবেকানন্দ স্বামীকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গেই কলকাতায় ফেরেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বামীজীর অনুরোধে সিংহলে যান বেদান্তপ্রচারের উদ্দেশ্যে। মঠে ফেরেন ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারিতে।[২৮] স্বামী প্রেমানন্দ কয়েকটি তীর্থ দর্শনান্তে বৃন্দাবনে একনাগাড়ে কয়েক বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ)। তাঁরা দুজনে আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন স্বামীজীর কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের ৪-৫ দিন পরে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সিংহল ও দক্ষিণভারতের কয়েকটি অঞ্চলে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচার করে মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের আগে।[২৯] এদিকে স্বামী যোগানন্দ প্রয়াগ ও কাশীতে কঠোর তপশ্চর্যা করে মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯২-এ। তখন তাঁর দেহ শীর্ণ-জীর্ণ। অতঃপর তিনি সময়-সুযোগ পেলেই শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। আলমবাজার মঠে তাঁর বসবাস সামান্যই কয়েক দিনের। বলরামভবনে তিনি একদিন যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন ঃ "যীশুর সময় কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করেছিল। এইবার আরেকবার কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় করবে।"[৩০]

উত্তরভারতে পর্যটন ও তপস্যাদির পর স্বামী সারদানন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে বরানগর মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। আলমবাজার মঠের আরম্ভ থেকেই তিনি সেখানকার একজন বাসিন্দা। মাঝে একবার কৈলোয়ার এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানা ও গুজরাট অঞ্চলে কিছুদিন পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে স্বামীজীর আহ্বানে তিনি ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। পরে আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করে স্বামীজীর নির্দেশে স্বদেশে ফিরে আসেন। মঠ সেসময়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে।

দীর্ঘ প্রব্রজ্যার পর স্বামী অভেদানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন ১৮৯২-এর অক্টোবর মাসে।[৩১] ১৮৯৫-এ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের পর তিনি পুনরায় তীর্থ পরিক্রমায় বের হন। ১৮৯৬-এর মাঝামাঝি স্বামীজীর নির্দেশে তিনি প্রচারকার্যের জন্য ইংল্যান্ড যাত্রা করেন।

২৮ ১৪।২।১৮৯৮ তারিখে তিনি প্রমদাবাবুকে লেখেন ঃ "আমাকে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ কলম্বোতে বেদান্তপ্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আমি সাতমাস ছিলাম। ৩।৪ দিবস হইল মঠে আসিয়াছি।"

২৯ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠিতে মন্তব্য ঃ "নিরঞ্জন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্য করিয়াছে।"

৩০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৭৫

৩১ স্বামী সারদানন্দের ২৬।১০।১৮৯২ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয়, স্বামী অদ্বৈতানন্দের আলমবাজার মঠে অবস্থান স্বল্পকালের। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ বা তারও আগে থেকে তিনি কাশীতে সোনাপুরায় বংশী দত্তের[৩২] বাড়িতে জপধ্যান করেছিলেন দীর্ঘকাল। স্বামীজীর সপ্রেম আহ্বানে তিনি আলমবাজার মঠে ফিরেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ৬৯ বছর, কিন্তু স্বামীজীর ইঙ্গিত অনুসরণ করে 'লঘুকৌমুদী' পড়তে আরম্ভ করেন। অবশ্য ২৫ নভেম্বর (১৮৯৭) তিনি কোন্নগরের ভক্ত নবাই-চৈতন্যের সহিত রামেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করেন।[৩৩]

গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ বরানগর মঠ থেকে সর্বপ্রথম প্রব্রজ্যায় নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ ও সাধন-ভজন করে তিনি প্রথমে জামনগরে এবং পরে খেতড়িতে সেবাব্রতের সূচনা করেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ত জুগিয়েছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সমারোহের পর মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দীর্ঘকাল পরিব্রাজনের পর ২ এপ্রিল ১৮৯২ থেকে আলমবাজার মঠে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তিনি আবার কৈলাস যাত্রা করেন ১৮৯৪-এ।[৩৪] সেখান থেকে ফেরার পর মঠে ও কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি স্থানে গীতা, উপনিষদাদির ক্লাস নেন এবং তিনটি ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেন। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় তিনি তাঁর তিব্বত-ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশ করেন।

স্বামী সুবোধানন্দের আলমবাজারে মঠবাস সামান্য সময়ের জন্য। দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ, নির্জনে সাধন-ভজন ইত্যাদি সমাপ্ত করে তিনি মঠে ফিরেছিলেন ১৮৯৮-এর ২৩ মার্চ। মঠ তখন গঙ্গার পশ্চিমকূলে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (তখন তিনি হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) এটাওয়াতে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করছিলেন। স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এপ্রিল মাসে[৩৫] মঠে যোগদান করেন। বেলুড়ে নিজস্ব জমিতে মঠ-মন্দির স্থাপনের পর তিনি ১৮৯৯-এর ৯ আগস্ট আত্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ১৩ অক্টোবর (১৮৯৭) ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দের সহিত আম্বালা যাত্রা করে স্বামীজীর সঙ্গে রাজপুতানা ও উত্তরভারতের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী বোধানন্দ স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন যে, তিনি আলমবাজার মঠে প্রথম দুই-তিন বছরের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ ছাড়া অপর সব সন্ন্যাসীদের দেখেছিলেন।[৩৬]

ওপরে সংক্ষেপে আলোচিত মঠবাসীদের প্রত্যেকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে এঁদের লালন-পালন করেছিলেন। অসাধারণ শক্তিধর এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী অত্যাশ্চর্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ আত্মীকরণ করেছিলেন, দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দের অনুচিন্তন লক্ষ্য করবার মতো। তিনি স্বামী সারদানন্দকে গভীরভাবে অধ্যয়নরত দেখে সিদ্ধান্ত করেছিলেন : "হামনে বুঝলুম যে, তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যার যেমন ভাব তাকে তেমনি বুঝিয়েছেন।"[৩৭] প্রথম প্রজন্মের এসব সন্ন্যাসীরা ছিলেন "পবিত্র, খাঁটি ও প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তি"। এঁদের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি, কেবল বাক্‌সর্বস্ব না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামবিহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা

৩২ বংশীধর দত্তের (১২১০-১২৮৬ সাল) বরানগরে জন্ম। অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তিনি মসলার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। কয়েকটি তীর্থস্থানে তিনি দেবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১২৭৩ সালে তিনি কাশীর সোনাপুরায় একটি বাড়ি কিনে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। (দ্রঃ আঞ্চলিক ইতিহাস : বরানগর, ৫ম খণ্ড, ১৯৯১, পৃঃ ২২)

৩৩ স্বামীজীর নিকট প্রেরিত মঠের ২৮।১১।১৮৯৭ তারিখের সাপ্তাহিক প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

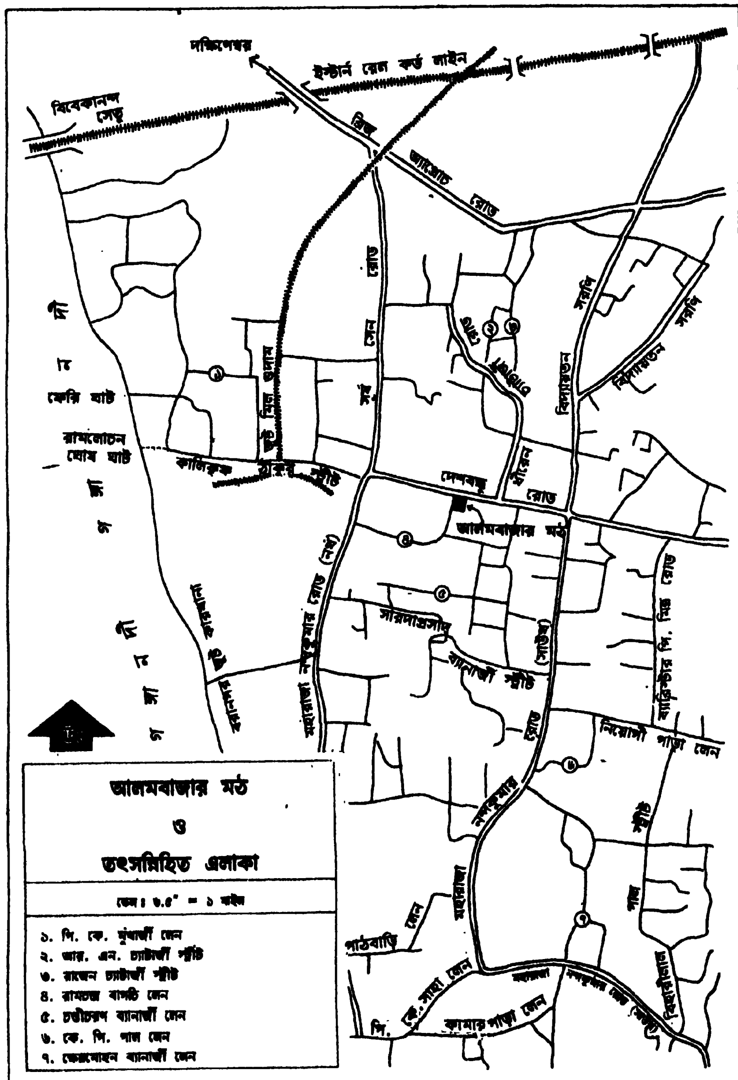
৩৪ স্বামী অখণ্ডানন্দের ৯।৭।১৮৯৪ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৩৫ ১৮৯৭-এর মে মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা স্বামী প্রেমানন্দের চিঠি দ্রষ্টব্য। স্বামীজী ২০।৬।১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে লেখেন : "যেসব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতে ইহা একটি উচ্চপদ। সে খড়কুটোর মতো তা পরিত্যাগ করেছে।"

৩৬ উদ্বোধন, ৫২তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭৬

৩৭ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৮৬

লাভ করিয়াছিলাম।”[৩৮] এসব অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীরাই নবাগত অন্তেবাসীদের মঠের আদর্শ ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রীতির বন্ধন দিয়ে তাঁদের আত্মগোষ্ঠিভুক্ত করে নিয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞানী একে বলেন 'socialization'। স্বামীজী বলেছেন 'রামকৃষ্ণ-মুষা'য় চরিত্র গড়ে তোলার শিক্ষা দিতে।[৩৯] বলা বাহুল্য, বরানগর-পর্বে ও আলমবাজার-পর্বের প্রথম দিকে এরূপ প্রশিক্ষণের জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না।



৩৮ ই. টি. স্টার্ডিকে স্বামীজীর লেখা ৯।৮।১৮৯৫ তারিখের চিঠি

৩৯ অনুরূপ বাণী যীশুখ্রীস্টও উপদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "Go therefore and make disciples of all nations... teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." (Mathew, 28 : 19-20)

নবাগতদের মধ্যে কেউ কেউ বরানগর-পর্বেই যোগদান করেছিলেন, যেমন গুপ্ত (স্বামী সদানন্দ), তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ), কালীকৃষ্ণ (স্বামী বিরজানন্দ), বড় কানাই (স্বামী নির্ভয়ানন্দ), দীনু (স্বামী সচ্চিদানন্দ) প্রভৃতি। যাঁরা মঠে যাতায়াত করছিলেন এবং স্বামীজীর মঠে প্রত্যাবর্তনের পরেই আলমবাজার মঠে যোগদান করেছিলেন বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুশীল (স্বামী প্রকাশানন্দ), সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দ), যোগেন্দ্রনাথ (স্বামী নিত্যানন্দ)[৪০], খগেন্দ্রনাথ (স্বামী বিমলানন্দ) প্রমুখ। আর স্বামীজীর আগমনের আগেই স্থায়িভাবে মঠে যোগদান করেছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ 'শুকুল' নামেই সঙ্ঘে বেশি পরিচিত ছিলেন।)। তাছাড়াও বেশ কিছু উৎসাহী যুবক মঠে যাতায়াত করছিলেন।

কয়েকটি সূত্র ধরে আলমবাজার মঠের শেষ পর্যায়ে মঠবাসীদের সম্বন্ধে একটি স্পষ্টতর ছবি পাওয়া যায়। ১৮৯৭-এর ৫ মে তারিখে স্বামীজীর লেখা চিঠি[৪১] থেকে জানা যায় যে, একটি পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িতে ২৪ জন যুবক শিক্ষালাভ করছেন। মিস নোবেলকে পাঠানো স্বামী ব্রহ্মানন্দের ১৮৯৭-এর ১৭ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদনে রয়েছে ঃ "In the beginning they were eleven. Their number has now increased to twenty-three besides six youngmen who though have not formally accepted the vow of a Sannyasin are leading a life of physical, intellectual, moral and religious discipline." মঠের অন্তেবাসীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ২২ জানুয়ারি ১৮৯৮ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের চিঠি থেকে। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ ঃ "মঠে উপস্থিত এই কতিপয় মহাপুরুষ আছেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য, শ্রীমান নন্দলাল মুখোপাধ্যায়। পরে কলকাতায় আছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ, শ্রীমান কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় (পরে স্বামী ধীরানন্দ)। ইহারা দুই-একদিনের মধ্যেই মঠে আসিবেন। ইহা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। আর বিদেশে এই মঠভুক্ত অনেক সাধু-মহাত্মা আছেন। ইহাদিগের মধ্যে কতিপয়কে আপনি জানেন। মঠে আরেকটি লোক আছেন, সেইটি এইসকল মহাপুরুষের দাস। এই দাসকেও আপনি জানেন। মঠে একটি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমাদিগের ভিক্ষা প্রস্তুত ও রন্ধন করিয়া দেন। আরেকটি শূদ্র ব্যক্তি আছেন, যিনি মঠের যাবতীয় পরিচারকের কর্ম করেন।" সেসময়ে মঠের বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্বদেশের পথে স্বামী সারদানন্দ, মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ; মহুলা অনাথাশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ, ব্রহ্মচারী সুরেশ্বরানন্দ ও জনৈক ব্রহ্মচারী এবং কলম্বোতে বেদান্তপ্রচাররত স্বামী শিবানন্দ। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সেসময়ে পরিভ্রমণরত। তাছাড়াও আলমবাজার মঠে বাস করছিলেন ব্রহ্মচারী অমরেন্দ্র। আলোচ্য কালে ব্রহ্মচারী হরিহরানন্দ ২৯ অক্টোবর (১৮৯৭) মঠ ত্যাগ করে চলে যান।

আলমবাজার মঠে উপরি উক্ত স্থায়ী বাসিন্দারা ছাড়াও কেউ কেউ মঠে আসতেন নির্জনবাসের জন্য, সাধুসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোমোহনবাবু, হরীশবাবু, শ্রীম (মাস্টারমশায়), সাধু নাগমশায়, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, হুটকো গোপাল, সুরেশচন্দ্র দত্ত, হরমোহন মিত্র প্রভৃতি। তাছাড়াও যেতেন গিরিশচন্দ্র, অতুলবাবু, নবগোপাল ঘোষ, নিতাই ডাক্তার প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই ঠাকুরসেবার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন। ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মঠে এসে ২-৪ দিন থেকে যেতেন।

তখনকার দিনের মঠজীবনের একটা বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। সেসময়ে সন্ন্যাসের অনেক আগেই কেউ কেউ সন্ন্যাসের নাম পেতেন ও ব্যবহার করতেন। যেমন, ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানানন্দ প্রমুখ। আবার কেউ চৈতন্যযুক্ত নাম ব্যবহার করতেন প্রায় প্রথম থেকেই। যেমন, শুদ্ধচৈতন্য (গোবিন্দ বা শুকুল)। [ক্রমশঃ]

৪০ বিবাহিত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সন্ন্যাসের অধিকার সম্বন্ধে অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। করুণাপরবশ হয়ে স্বামীজী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

৪১ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে লেখা চিঠি।

নিবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ : পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা

জ্যোতির্ময় ঘোষ

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক; বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অনুষদের পূর্বতন ডীন; যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিকাগোয় আয়োজিত বিশ্ব-মেলার (এই বিশ্বমেলায় প্রদর্শনের জন্য ভারতেরও পর্যাপ্ত শিল্পসামগ্রী প্রেরিত হয়েছিল) অন্যতম অঙ্গরূপে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর যে-ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হয়ে নিজ নিজ ধর্মের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। ভারতের বিবিধ ধর্মের প্রতিনিধিরূপে এই ধর্মমহাসম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের পক্ষে এইচ. ধর্মপাল, জৈনধর্মের পক্ষে বীরচাঁদ গান্ধী, নববিধান সমাজের পক্ষে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে বি. বি. নাগরকর, থিয়জফিক্যাল সোসাইটির জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হিন্দুধর্মের স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ।

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি কার্ডিন্যাল গিবন্স স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রোতাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তাঁরা যে-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, তার উত্তরে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। সেই ভাষণের শেষদিকে তিনি যা বলেছিলেন, 'উদ্বোধন কার্যালয়' থেকে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'-র প্রথম খণ্ডে তার বঙ্গানুবাদটি এই রকম: "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করিয়াছে, বারবার ইহাকে নরশোণিতে সিক্ত করিয়াছে, সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করিয়াছে। এইসকল ভীষণ পিশাচ যদি না থাকিত, তাহা হইলে মানবসমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইত।"

কিন্তু এই 'হতাশার' চিত্র যতই রূঢ় বাস্তব হোক না কেন, শতাধিক বর্ষ আগে অনুষ্ঠিত এই ধরনের প্রথম একটি আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর প্রথম আবির্ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ আশাবাদী উচ্চারণ ছিল দ্বিধাহীন—"তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্মমহাসমিতির সম্মানার্থ আজ যে-ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, তাহাই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতনের এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।"

লক্ষণীয়, শতাধিক বর্ষ পূর্বেই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর শিকাগো-অভিভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যরূপে 'tolerance and universal acceptance'-কে চিহ্নিত করেও ("I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.") এবং সেই ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন করেও সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততাকে হিংসা, রক্তপাত, ধ্বংসজনিত জাতীয় জীবনের হতাশার উৎসরূপে চিনিয়ে দিলেন। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামিজনিত ধর্মোন্মত্ততাকে 'ভীষণ পিশাচ'-রূপে তিনি অভিহিত করলেন এবং বললেন, এগুলিই মানবসমাজের উন্নতিকে ব্যাহত করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসম্মেলনে প্রথম আবির্ভাবেই এবং ধর্ম-সম্পর্কিত প্রথম প্রকাশ্য ভাষণেই স্বামীজী ধর্মের স্বরূপ পরিস্ফুট করতে গিয়ে 'পরমতসহিষ্ণুতা' ও 'সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা'ই যে ধর্মের শিক্ষা—তাও যেমন বললেন, তেমনি বললেন—যথার্থ ধর্ম 'বহিষ্করণ' ও 'পরিবর্জন' নয়, 'পরিগ্রহণ'-কেই স্বীকার করে; কেননা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণকালে বিবেকানন্দ পূর্ববর্তী বাক্যেই জানিয়েছেন: "আমরা (হিন্দুরা) শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল

ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি" ("We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true")। পাশাপাশি, শুধু ধর্মবিরোধী ভয়ঙ্কর দানবিক শক্তি ('horrible demons')-রূপে নয়, 'মানবসমাজে'র সর্বপ্রকার 'অগ্রগতির অন্তরায়' বলেও চিহ্নিত করলেন— (১) 'সাম্প্রদায়িকতা', (২) 'গোঁড়ামি' (ধর্মান্ধতা) এবং 'এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ' (৩) 'ধর্মোন্মত্ততা'কে।

পুনশ্চ, ধর্ম কী নয়—সেই বিষয়টি বিবেকানন্দকে স্পষ্ট করতে হয়েছিল ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ধর্মমহাসমিতির পঞ্চম দিবসের অধিবেশনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ স্ব-স্ব ধর্মের প্রাধান্য-প্রতিপাদনের জন্য বাগ্‌বিতণ্ডায় নিযুক্ত হলে। বিবেকানন্দ তখন কুয়োর ব্যাঙ আর সমুদ্রতীরের ব্যাঙের গল্পটি শুনিয়ে উপসংহারে 'কূপমণ্ডূকতা'কেই ধর্ম নিয়ে বিভেদ-বিরোধের ও যাবতীয় ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের কারণরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঃ "হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীস্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন!"

তাঁর নিজের ধর্ম—হিন্দুধর্মের মধ্যেও এই একই সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান, এই একই কূপমণ্ডূকতা, এই কথাটি বিবেকানন্দ ১৫ সেপ্টেম্বরের ভাষণে উল্লেখ বা স্বীকার করে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। কেননা, ১১ সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত মূল ভাষণে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সেই ধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনকালে তিনি এমন কিছু উক্তি করেছিলেন, যেগুলি অহিন্দুদের কাছে তো বটেই, নিরপেক্ষ বিচারেও অতিশয়োক্তি বলে প্রতিভাত হতেই পারে।

মূল শিকাগো-ভাষণটি সংক্ষিপ্ত হলেও বহুভাব-বিচ্ছুরণকারী, বহুদূরপ্রসারী ও ব্যঞ্জনাময়। এই ভাষণটিকে বিচার করতে হবে আজ থেকে শতাধিক বর্ষ পূর্বের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। সেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে ভুলে গিয়ে বা ভুলিয়ে যখনই হোক, বিশেষতঃ আজ শতাধিক বর্ষের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে মূল শিকাগো-ভাষণের একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির সাহায্যে কেউ যদি বিবেকানন্দের বক্তব্য ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করেন, তবে তা হবে বৌদ্ধিক প্রতারণার নামান্তর।

১১ সেপ্টেম্বরের মূল ভাষণটিকে চারটি অংশে ভাগ করে দেখা যায়। প্রথম অংশটি তথা অনুচ্ছেদটি অভ্যর্থনার উত্তরে প্রাথমিক সৌজন্য প্রকাশ। যদিও লক্ষণীয়, বিবেকানন্দ 'সম্বোধন-অংশ' থেকেই তাঁর শ্রোতাদের হৃদয় লুঠ করে নিয়েছিলেন। ধর্মমহাসম্মেলনে তাঁর পোশাক, তাঁর চেহারা, তাঁর প্রবল ও অভিভবকারী সমগ্র ব্যক্তিত্ব এবং এই সবকিছুর সঙ্গে তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত বোধ ও বাগ্মিতার অপূর্ব সমন্বয় তাঁকে বিস্ময়কর সাফল্য এনে দিয়েছিল, যে-সফলতাকে ভাষান্তরে 'এলাম-দেখলাম-জয় করলাম' বলা চলে। আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—পরাক্রান্ত এক তেজস্বী যোদ্ধার ভূমিকা ছিল তাঁর এবং ক্ষিপ্র, দীপ্র, ব্যারিস্টারসুলভ শাণিতবুদ্ধি, বাগ্‌বিভূতি, তার সঙ্গে আবার একসমুদ্র আবেগ সংমিশ্রিত।

এই শুরু হলো তাঁর কথা বলা। এখন থেকে সাতটি বছর শুধু তিনিই বলবেন, অন্য সবাই শুনবে। সেই কথা, সেই বিশিষ্ট উচ্চারণ, যেবিষয়ে রোমাঁ রোলাঁর চেয়ে অমোঘ মূল্যায়ন আর কেউ কখনো করতে পেরেছেন বা পারবেন বলে মনে হয় না—ঋষি দাসের অনুবাদে —"তাঁহার কথাগুলি ছিল সঙ্গীতের মতো, বীঠোফেনের মতো ছিল সেগুলির বাক্যাংশের বিন্যাস এবং হ্যান্ডেলের মিলিত সঙ্গীতের মতো ছিল সেগুলির প্রাণমাতানো ছন্দ। তাঁহার এই সকল কথা ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার লেখা বইগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু তবু যখনই আমি সেগুলিতে হাত দিয়াছি, তখনই চকিতে তড়িৎ-স্পর্শ অনুভব করিয়াছি। কথাগুলি যখন সেই বীরের মুখ হইতে নিঃসৃত হইত তখন সেগুলি কী তড়িৎ-স্পর্শ, কী উন্মাদনাই না সৃষ্টি করিত!"

ধর্মমহাসম্মেলনের "উদ্বোধনী সভায় ত্রিশ বৎসরের এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যুবক যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন", রোলাঁর ভাষায়, "তখন সভায় অন্যান্য সভ্যগণের উপস্থিতির কথা মানুষ ভুলিয়া গেল। বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য ও প্রশান্ত মহিমা, তাঁহার চক্ষের কৃষ্ণাভ দ্যুতি, তাঁহার প্রশান্ত গাম্ভীর্য এবং বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পর হইতে তাঁহার কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি তাঁহার বর্ণবিদ্বেষী মার্কিন অ্যাংলো-স্যাকসন শ্রোতাদেরও বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। এবং ভারতবর্ষের এই সৈনিক দ্রষ্টার চিন্তাধারা যুক্তরাষ্ট্রের বক্ষে গভীরভাবে রেখাপাত করিল।"

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রোলাঁর সামগ্রিক সমীক্ষা হলোঃ বিবেকানন্দ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন, এমন কল্পনাও অসম্ভব। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ, রোমাঁ রোলাঁ জানিয়েছেন, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের কাছে তিনি শুনেছিলেন, বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল ভায়লিনচেলো বাদ্যযন্ত্রের মতো। তাঁর কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য ও ঝঙ্কার সমগ্র সভাকক্ষে ও সমস্ত শ্রোতার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হতো। সেই তীব্র ধ্বনি শ্রোতার কর্ণ ভেদ করে তার আত্মার গভীরে পৌঁছে যেত। এমা কালভে বলতেন, বিবেকানন্দ ছিলেন চমৎকার 'ব্যারিটোন', তাঁর গলার সুর ছিল চীনা গঙের ধ্বনির মতো।

অভ্যর্থনার উত্তরে সৌজন্য ও ধন্যবাদ জানানোর সময়েই লক্ষণীয়, বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষের বিপুল ব্যাপ্তির দিকে, পরিসংখ্যানের প্রসঙ্গে তাঁর শ্রোতাদের সচেতন করতে চাইলেন এবং সেই কারণেই বললেনঃ "সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হইয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

বস্তুতঃ, ঠিক এক সপ্তাহ পরেই ১৯ সেপ্টেম্বর ধর্ম-মহাসম্মেলনের নবম দিবসে বিবেকানন্দ 'হিন্দুধর্ম' শিরোনামে প্রদত্ত ভাষণে যেন এই বাক্যটিকেই বিস্তৃত করেছিলেনঃ "ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায় উত্থিত হইল, বোধ হইল যেন বেদোক্ত ধর্মের ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় সাগরসলিল যেমন কিছু পশ্চাৎপদ হইয়া সহস্রগুণ প্রবল বেগে সর্বগ্রাসী বন্যারূপে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ ইহাদের জননীস্বরূপ বেদোক্ত ধর্মও প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আলোড়নের অগ্রগতি শেষ হইলে ঐ সম্প্রদায়গুলিকে সর্বতোভাবে আত্মসাৎ করিয়া নিজের বিরাট দেহ পুষ্ট করিয়াছে।"

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও পরিসর বলতে ঠিক কী বোঝায়, ৪ জুলাই ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের' নিবেদিতা-লিখিত স্বামীজীর ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ভূমিকা 'Our Master and his Message' থেকেও তা স্পষ্ট। নিবেদিতার এই ভূমিকাটির বঙ্গানুবাদ ('আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী') ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত স্বামীজীর সমগ্র 'বাণী ও রচনার' প্রথম খণ্ডেই মুখবন্ধরূপে সন্নিবেশিত। লক্ষণীয়, নিবেদিতাও ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ধর্মমহাসম্মেলনের বিভিন্ন দিনে প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি অবলম্বনে, সেগুলি থেকে উদ্ধৃতিসহ, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের স্বরূপ তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

স্বামীজীর শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণগুলির, বিশেষতঃ ১১ সেপ্টেম্বরের মূল ভাষণটির প্রসঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই নিবেদিতা তাঁর প্রাগুক্ত ভূমিকাটিতে সঠিকভাবেই লিখেছিলেনঃ "ভারতবর্ষের নিজের দিক দিয়া এই ক্ষুদ্র ভাষণটি ছিল স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এক সংক্ষিপ্ত প্রমাণপত্র।" পরাধীন ভারতবর্ষের অবনত মস্তক দূর বিদেশে, আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে উচ্চতম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন স্বামীজী।

স্বামীজী হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। শিকাগো-বক্তৃতামালার একটিতে (১৯ সেপ্টেম্বর), যার শিরোনাম 'Paper On Hinduism', লিখিত ভাষণ, বললেন স্বামীজীঃ "The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas." 'উদ্বোধন'-সংগঠিত বঙ্গানুবাদ—"আপ্তবাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম লাভ করিয়াছেন।"

স্বামীজী প্রথমতঃ, প্রধানতঃ ও সমগ্রতঃ যুক্তিনিষ্ঠ, তাই হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত উৎস-নির্ণয়ে এই 'আপ্তবাক্য' বা 'Revelation' ধরনের শব্দ অস্বস্তি তৈরি করে দেয়। এই রকমই মনে হবে মাঝে মাঝে। যিনি অসামান্য যুক্তিনিষ্ঠ, তিনিই মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় ভাবধারাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করছেন কেন, প্রশ্ন জাগবে বস্তুসচেতন মানুষের মনে। স্বামীজী কি এবিষয়েও সচেতন ছিলেন না?

এই যে 'যুক্তি'র পরিবর্তে 'বিশ্বাস'কে জায়গা করে দেওয়া। অন্ততঃ কোথাও কোথাও। বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ ও গভীর বিশ্লেষণ দাবি করে। সেই বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তবে বিষয়টির গভীরে যাওয়ার আগেও লক্ষণীয়, স্বামীজী যখনই বুঝেছেন—অন্ততঃ তাঁর পাশ্চাত্য যুক্তিপ্রবণ শ্রোতারা প্রশ্নমনস্ক হয়ে উঠতে পারেন তখনই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এমনকি কোথাও কোথাও বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অবলম্বনে সাদৃশ্য বা 'অ্যানালজি' উদ্ধার করেছেন। যেমন, 'বেদ' কী—সেই সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপনায় তাঁর সতর্কতা ও অবশ্যই সুগভীর মৌলিকতার নিদর্শন 'Paper On Hinduism' রচনাটির পরবর্তী বাক্যগুলিতেই পাব।

হ্যাঁ। মৌলিকতাই। যদিও নিবেদিতা মূলতঃ যথার্থই লিখেছেন—বিবেকানন্দের কাছে অর্থাৎ "তাঁহার চিন্তায় এমন কোন সম্প্রদায়, এমন কোন মতবাদ—ভারতবাসীর এমন কোন অকপট আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকিতে পারে না, যাহা যথার্থভাবে হিন্দুধর্মের বাহুপাশের বহির্ভূত হইতে পারে—ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ সম্প্রদায়, মতবাদ বা অনুভূতি যতই বিপথগামী বলিয়া মনে হউক।"

একই 'ভূমিকা'য় নিবেদিতা বিবেকানন্দকে 'হিন্দুধর্মের প্রবক্তা'-রূপে চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মৌলিকতার নামে বিবেকানন্দ কোন মনগড়া তত্ত্ব কোথাও আরোপ করেননি, বরং গীতার কৃষ্ণের মতো, বুদ্ধের মতো, শঙ্করাচার্যের মতো, এককথায় ভারতীয় চিন্তাজগতের সব আচার্যের মতোই বিবেকানন্দের কথাও বেদ-উপনিষদের উদ্ধৃতিতেই সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল। নিবেদিতার ইংরেজীতে লেখা মূলের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হলো—"যে-রত্নরাজি ভারত নিজেরই মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র সেগুলির প্রকাশকরূপে—ব্যাখ্যাতারূপেই স্বামীজী বিরাজমান।"

নিবেদিতা অতঃপর নিজেই প্রশ্ন তুলে তার উত্তরও দিয়েছেন—যদি স্বামীজী জন্মগ্রহণ নাও করতেন, তাহলেও তাঁর "প্রচারিত সত্যসমূহ সত্যরূপেই থাকিত" এবং "এগুলি সমভাবেই প্রমাণীভূত হইত"। কিন্তু বিবেকানন্দ ছাড়া "ঐগুলি পাওয়া কঠিন হইত, ঐগুলিতে আধুনিক স্বচ্ছতা ও বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা থাকিত না, পারস্পরিক সঙ্গতি ও ঐক্যের হানি ঘটিত।" বিবেকানন্দ ছাড়া বেদ-উপনিষদের সত্যগুলি কেতাবী পণ্ডিতদের "দুর্বোধ্য তর্কবিচারেই পর্যবসিত থাকিয়া যাইত"। কেননা নিবেদিতার মতে, বিবেকানন্দ পণ্ডিতদের মতো কেতাবী বুলি আওড়াতেন না, তিনি বেদ-উপনিষদের সত্য আত্মস্থ করেছিলেন বলেই তাঁর মুখে সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

বিবেকানন্দ যে-ধর্মের প্রবক্তা তা নিশ্চিতরূপে বেদ-উপনিষদ্‌ভিত্তিক, সেখানে তাঁর নিজস্বতা ছিল না; কিন্তু সেই ধর্মের লোকগ্রাহ্য, লোকায়ত রূপায়ণেই তিনি বিবেকানন্দ—নিবেদিতাকে অনুসরণ করেই এই আমার অন্যতম সিদ্ধান্ত। স্বদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের এবং বিদেশীদের কাছে বিবেকানন্দ-প্রচারিত বক্তব্য আর তাই কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম মাত্র নয়, তা কতকগুলি সত্য। নিবেদিতারই এই সিদ্ধান্ত। তাঁরই ভাষায়, "কারণ তিনি যেবিষয়ে শিক্ষা দিতেন—সেবিষয়ের উপলব্ধির গভীরে তিনি অবগাহন করিয়াছেন এবং রামানুজের মতো তিনি সেই অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শুধু পারিয়া, অন্ত্যজ ও বিদেশীদের নিকট ঐ উপলব্ধির রহস্য প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য।" বিবেকানন্দের সুবিপুল পাণ্ডিত্য তর্কাতীত। যখন তিনি 'নরেন' ছিলেন, তখনই সত্যের সন্ধানে তিনি বহু ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি মন্থন করেছেন। তর্ক-বিতর্ক-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তবু যাবতীয় কেতাবী পাণ্ডিত্য তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। পুঁথিগত পাণ্ডিত্য কখনোই পথনির্দেশক নয়।

এমন সময়েই রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্মুখীন হলেন তিনি। থমকে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। তর্ক তিনি কম করেননি। অনায়াসে গ্রহণ করেননি কিছুই। পণ্ডিত নরেন, তার্কিক নরেন, সংশয়ের দোলায় আন্দোলিত, দ্বিধাদীর্ণ নরেন অবশেষে এতদিনে একটি পূর্ণাঙ্গ সজীব গ্রন্থের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ পেলেন। নিবেদিতার ভাষায়, "তাঁহার গুরুর মধ্যে পুরাতন শাস্ত্রসমূহের সেই প্রমাণ পাইয়াছিলেন,... যাহা গ্রন্থসমূহে অস্ফুটভাবে বর্ণিত।... যিনি এইভাবে গ্রন্থসমূহের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, তিনি অজ্ঞাতসারেই এরূপ ছিলেন, কারণ তিনি কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই। গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্যে বিবেকানন্দ জীবনরহস্যের কুঞ্জিকা লাভ করিয়াছিলেন।"

কিন্তু নিবেদিতাই লিখেছেন, তিনি ছাড়া কেই বা জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন সম্পূর্ণভাবে বিবেকানন্দকে, তাই নিবেদিতাই লিখতে পারতেন শুধু এই কথাঃ রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে এসেই বিবেকানন্দের শিক্ষা পূর্ণতা পেল না। নিবেদিতার ভাষায়, "তথাপি এখনও তাঁহার (বিবেকানন্দের) নিজের নির্ধারিত কর্মের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় নাই।" পাণ্ডিত্যজনিত জ্ঞানের অভাব ছিল না নরেনের, রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে এসে নরেন পেলেন 'ভাবশিক্ষা', ভাবাবেগমথিত ভক্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হলো প্রগাঢ় হৃদয়বত্তা তথা অনুরাগ, ভাষান্তরে কেউ বলতে পারেন বোধি বা উপলব্ধি—এইবার বুঝে নিতে হবে স্বদেশ ও স্বজাতিকে, ব্যাপক অর্থে মানুষকে অর্থাৎ কোটি কোটি জনসাধারণকে। কেননা, অর্জিত জ্ঞান ও সমুদ্রগভীর প্রেম নিয়ে শুধু ধ্যান করা যায় না, মানুষকেই তা ফিরিয়ে দিতে হয়। সেইজন্য প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র চাই, নিবেদিতার ভাষায়, "তাঁহার নিজের নির্ধারিত কর্ম"। [ক্রমশঃ]

আঙ্কোরবট, অ্যাঙ্করথোম ও নমপেন

আশুতোষ বিশ্বাস

সুবিখ্যাত অ্যাঙ্করওয়াট (Angkorwat—ভারতীয় উচ্চারণে আঙ্কোরবট) মন্দিরের প্রবেশপথ-সংলগ্ন স্থানটি থেকে আমি বিমোহিত অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করে চলেছি বিশ্ববিশ্রুত একটি বিস্ময়কে। আঙ্গিক গঠনে অনুপম সৌন্দর্যময়, ভাস্কর্যের উৎকর্ষে অপরূপ, স্থাপত্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় কাম্বোডিয়ায় বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক হিন্দু দেবালয় অ্যাঙ্করওয়াট বা আঙ্কোরবট। স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্গূঢ় অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে আমার সামনে দেখছি মহাকালের গ্রাসে একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষকে। এই ধ্বংসাবশেষ ভারতের বাইরে সনাতন হিন্দুধর্মের বিস্তৃতির প্রোজ্জ্বল সাক্ষী। কাম্বোডিয়ার পুরনো রাজধানী আঙ্কোর—কাম্বোডিয়ান উচ্চারণে এ্যাঙ্গকর (Angkor)—বর্তমান রাজধানী নমপেন-এর (Pnompenh) উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২০০ মাইল দূরে। ডিসেম্বর মাসের রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি দিনে আমি দণ্ডায়মান আমার বহুলালিত একটি স্বপ্নের মুখোমুখি। কাম্পুচিয়া, কাম্বোডিয়া, খেমের, এ্যাঙ্গকর প্রভৃতি নামে বিদিত ছিল এই এশীয় রাষ্ট্রটি। 'কম্বোজ দেশ' অথবা 'কম্বুজ' নামে প্রাচীন ভারতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই রাষ্ট্রটির পরিচিতি ছিল। এই রাষ্ট্রের নাম 'কাম্পুচিয়া' বলে গৃহীত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। অবশ্য বহির্বিশ্ব দেশটিকে জানে 'কাম্বোডিয়া' বলে। কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়া ফরাসি 'কম্বোজ'-এর অপভ্রংশ। উল্লেখ্য, 'কম্বোজ' কথাটির উৎস কিন্তু সংস্কৃত 'কম্বুজ' শব্দ।

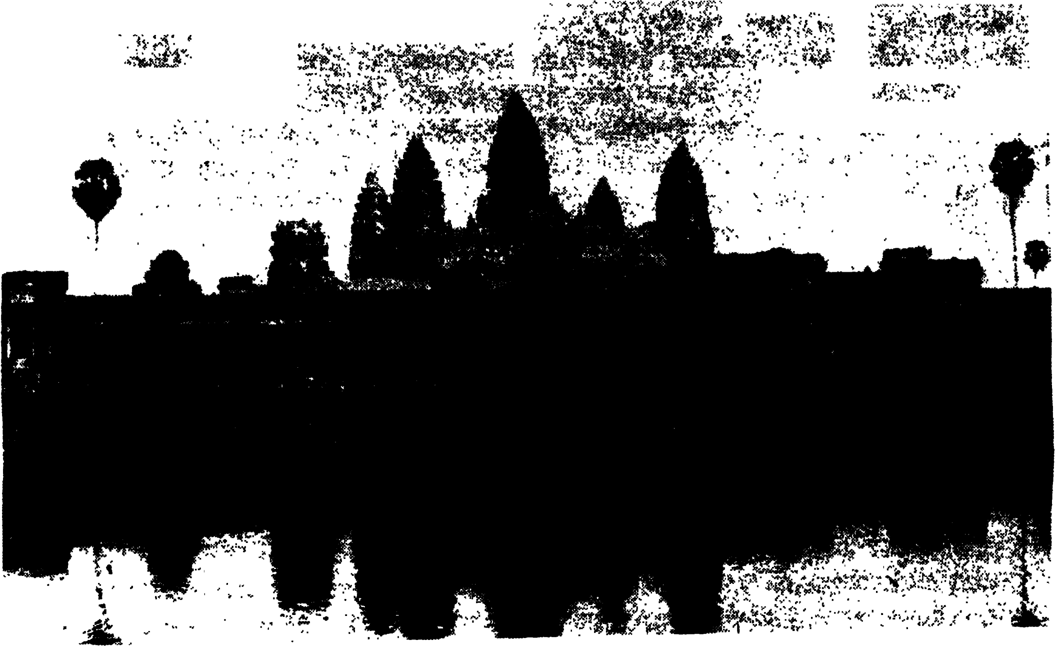
কাম্বোডিয়া রাষ্ট্রটির আয়তন প্রায় ১,৮১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং এর উত্তরদিকে থাইল্যান্ড, লাওস, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে ভিয়েতনাম, পশ্চিম প্রান্তে থাইল্যান্ড উপসাগর। এই রাষ্ট্রটি চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। ইতিহাস পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে, এদেশের ভৌগোলিক স্থিতি ও আভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক গঠন এখানকার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ভূ-বিষুবরেখার উত্তরে ১০ এবং ১৪ ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যবর্তী গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে দেশটি অবস্থিত থাকায় সারা বছর তাপমাত্রা গড়ে ২৫° সেন্টিগ্রেড এবং বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা ৮০ থেকে ৯০-এর মধ্যে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মূল ভূখণ্ডের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে আবহাওয়া থাকে শুষ্ক ও উত্তপ্ত। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জলীয় বাতাসের আধিক্যের জন্য বর্ষা ঋতুর প্রাধান্য। মধ্যবর্তী সময় নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত শীতল।

আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিমমুখী এই বিখ্যাত দেবালয় নির্মিত হয়। প্রায় তিরিশ বছরব্যাপী প্রচেষ্টায় এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। তদানীন্তন প্রখ্যাত হিন্দুধর্মাবলম্বী বিষ্ণু-উপাসক নৃপতি সূর্যবর্মণের (দ্বিতীয়) আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই অপরূপ দেউলসমষ্টি আঙ্কোরবট নির্মিত হয়। এই মন্দিরশ্রেণী জনসাধারণের কাছে এই রাজার সমাধিসৌধ-রূপেও বিখ্যাত। সূর্যাস্ত জীবনের অন্তিমলগ্নের প্রতীক। সেজন্য এই সমাধিমন্দির পশ্চিমমুখী করে স্থাপিত।

মন্দিরে প্রবেশের আগে পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সুপ্রশস্ত পরিখা। পরিখার পাশে বেলে পাথরের তৈরি প্রশস্ত পথ, যার আনুমানিক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৫০ ও ১২ মিটার। একটি নাতি-উচ্চ সমতলে (terrace) মন্দিরাভিমুখী প্রবেশপথটির শুরু। সমতলটির দুপাশে রয়েছে পাথরের দুটি বৃহৎ সিংহ। তারা যেন এই সৌধের অতন্দ্র প্রহরী। পরিখা-প্রবেশমার্গটি দেবালয়ের প্রবেশতোরণের পুরোভাগে এসে শেষ হয়েছে। প্রবেশতোরণটি শিখর-সমন্বিত তিনটি পৃথক অংশে বিভক্ত। একটি তোরণদ্বার হস্তী, অশ্ব, রথ, যানবাহন ইত্যাদির চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হতো। মধ্যবর্তী তোরণটি রাজপুরুষ ও অন্যান্যদের আগমন-

নির্গমনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অন্য তোরণটি তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত। মূল প্রবেশতোরণের আড়ালে পাঁচটি মন্দিরের শীর্ষদেশ ঢাকা পড়ে যাওয়ায় প্রবেশপথ থেকে সমগ্র দেবালয়টি থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে। ধীরে ধীরে উপনীত হলাম মধ্যবর্তী তোরণদ্বারে। তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে অষ্টভুজ বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্তি। প্রবেশতোরণ অতিক্রমের পর মন্দির-অভিমুখী দ্বিতীয় মার্গের প্রারম্ভ। প্রশস্ত বিচরণ-পথ, গীতাদির অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো। উপরন্তু রাজা এখান থেকে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করতেন এবং এখানে বিদেশী প্রতিভূদের অভ্যর্থনা করতেন। বিশাল বিশাল ঝাড়-লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকময় দীপ্তিতে, পুরোহিতবৃন্দের উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণে, নর্তকীদের নূপুরঝঙ্কারে প্রকোষ্ঠটি তখন গমগম করত।

'টেরেস অব অনার' অতিক্রম করার পর মূল মন্দিরের শুরু। মন্দির-অভিমুখী যে-পথ অবলম্বন করে এতক্ষণ



আঙ্কোরবটের ঐতিহাসিক মন্দির

দৈর্ঘ্যে ৩৫০ ও প্রস্থে ৯ মিটার। প্রবেশপথের দুপাশের সুদৃশ্য রেলিংয়ের কারুকার্য দর্শনার্থীর মনোহরণ করে। রেলিঙের উপরস্থ স্তম্ভে অনন্তনাগ নয়টি মস্তক ও সুদীর্ঘ লেজ নিয়ে শায়িত। দ্বিতীয় পথটির সমাপ্তি মন্দির-সংলগ্ন আরেকটি উচ্চ সমতলে, যেটি 'টেরেস অব অনার' (Terrace of Honour) নামে খ্যাত। এই উচ্চ সমতলটির ভারবাহী স্তম্ভসমষ্টি, মেঝের কারুকার্য, তিনটি প্রবেশদ্বার, প্রবেশদ্বারের সম্মুখস্থ সোপানশ্রেণী ও সিংহমূর্তি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এখানে একদা ধর্মীয় নৃত্য-অগ্রসর হচ্ছিলাম, সেই পথের ওপর থেকে সমগ্র সৌধটি একটি সুবৃহৎ প্রস্তরস্তূপরূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত হয়ে রূপান্তরিত হলো সেই দৃশ্য। দৃশ্যমান হলো মন্দির, দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ আচ্ছাদিত অলিন্দের শ্রেণী, বহু প্রকোষ্ঠের সমাহার, বিভিন্ন সোপানশ্রেণীর মাধ্যমে সংযোজিত বর্ণাঢ্য উন্মুক্ত অঙ্গন। আঙ্কোরবটের মন্দিরটি একটি ত্রিতলবিশিষ্ট সৌধ। মন্দিরের অন্ত-সীমানা-সংলগ্ন সর্বনিম্নতলের আয়তন বৃহত্তম ও উপরস্থ দ্বিতীয় তলের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ও সর্বোচ্চ

ত্রিতল ক্ষুদ্রতম। আচ্ছাদিত অলিন্দ, স্তম্ভ ইত্যাদির দ্বারা সর্বনিম্ন ও উপরস্থ দ্বিতীয় তলের সীমানা সুনির্দিষ্ট। তৃতীয় তলে পঞ্চ মন্দিরের অধিষ্ঠান। চার কোণের চারটি মন্দির এবং কেন্দ্রে সর্বোচ্চ মন্দির। ভূমিসংলগ্ন তল থেকে সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় মন্দিরের শীর্ষবিন্দুর উচ্চতা ২১৩ মিটার (৬৯৯ ফুট)। সর্বত্র বক্রাকার অলিন্দ, প্রকোষ্ঠ ও আগমন-নির্গমন পথ, ঢালু আচ্ছাদন আঙ্কোরবট মন্দির-স্থাপত্যের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আবৃত অলিন্দ, সৌধ, বক্রাকৃতি আচ্ছাদন, সোপানশ্রেণী ইত্যাদির সুসংযত ও সুশৃঙ্খল সমাবেশ তদানীন্তন স্থপতিবৃন্দের অসাধারণ কুশলতার দ্যোতক।

আঙ্কোরবট মন্দির যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি। ত্রিতলের কেন্দ্রস্থ সর্বোচ্চ মন্দির মহাজগতের পৌরাণিক মেরুপর্বতের প্রতীক। পঞ্চ মন্দিরশীর্ষ সেই গিরিরাজের পঞ্চশৃঙ্গ। দেবালয়ের বহির্প্রাকার যেন সেই পর্বতমালার সীমান্তের প্রতীক। চতুষ্পার্শ্বস্থ আবেষ্টিত জলাশয়ে মহার্ণবের প্রতিচ্ছায়া। প্রথম ও দ্বিতীয় তল একটি মনোরম অলিন্দের মাধ্যমে সংযুক্ত। এই অলিন্দের একপাশে একটি কক্ষ (Gallery of 1000 Buddhas)। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যকালে বহু বুদ্ধমূর্তি বিভিন্ন মুদ্রায় সুশোভিত ছিল এই কক্ষটিতে। অধুনা কয়েকটির মাত্র অস্তিত্ব রয়েছে। অলিন্দের অন্য পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠটি 'Hall of Echo'-রূপে বিখ্যাত। একটি বিশেষ দেওয়ালের কোণে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করে যেকোন ধ্বনির উৎপত্তিতে প্রতিধ্বনির প্রকটতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সেই হেতু কক্ষটির নামকরণের এই বৈশিষ্ট্য।

ভূসংলগ্ন তলের দেওয়ালের গায়ে খোদিত হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সমকালীন যুগের স্থানীয় যুদ্ধ-ইতিহাসের কাহিনীকে অবলম্বন করে দৃশ্যাবলী। বহির্প্রাচীরের সারি সারি স্তম্ভসমষ্টি দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্যের ওপর কৌতূহলোদ্দীপক আলো ও আঁধারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সারি সারি চিত্রলিপি ও স্থাপত্যের সুসংযত ও শৃঙ্খলিত রূপে সেখানে রচিত হয়েছে এক অপূর্ব জগৎ।

অন্তর্দেওয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীর একটি তালিকা দেবার চেষ্টা করছি।

পশ্চিম অলিন্দ : (১) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, (২) লঙ্কার যুদ্ধ।

দক্ষিণ-পশ্চিম কৌণিক আচ্ছাদন : (১) রামায়ণের দৃশ্য।

দক্ষিণ অলিন্দ : (১) রাজা সূর্যবর্মণের সেনাবাহিনী, (২) যম রাজার বিচার।

পূর্ব অলিন্দ : (১) দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন, (২) উৎকীর্ণ লিপি, (৩) অসুরসংগ্রামে গরুড়বাহন বিষ্ণুর বিজয়।

উত্তর অলিন্দ : (১) অসুরসংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের জয়, (২) দেবাসুর সংগ্রাম।

উত্তর-পশ্চিম কৌণিক আচ্ছাদন : (১) রামায়ণের দৃশ্যাবলী।

ভূমিসংলগ্ন প্রথম তলের উপর্যুক্ত চতুষ্পার্শ্বের আচ্ছাদিত অলিন্দ পরিক্রমার পর উপনীত হলাম দ্বিতীয় তলের আবৃত অলিন্দে। এখানেও দেওয়ালগাত্রে বহুসংখ্যক স্বর্গের অপ্সরার মূর্তি। সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভূতা এইসব অপ্সরাবৃন্দ।

ধীরে ধীরে উপস্থিত হলাম দেবালয়ের সর্বোচ্চ তৃতীয় তলে। এখানে অধিষ্ঠিত পঞ্চমন্দিরের উচ্চতমটির শীর্ষবিন্দু মেঝে থেকে ৪২ মিটার (১৩৭ ফুট)। প্যারিসের বিখ্যাত নতরদাম গির্জার সঙ্গে এটি তুলনীয়। নৃপতি ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পুরোহিতবৃন্দের একমাত্র প্রবেশাধিকার ছিল এই বিশেষ ত্রিতল মন্দির-প্রাঙ্গণে। কেন্দ্রীয় মন্দিরে সংরক্ষিত ছিল দেববিগ্রহ, অধুনা অনুপস্থিত। এই মন্দিরের এক-একটি দিক্-অভিমুখী চারটি প্রবেশদ্বার।

সারাদিনে দেবায়তন-পরিক্রমায় বেলা এগিয়েছে। সূর্যাস্তের বেশি বিলম্ব নেই। ধীরে ধীরে অবতরণ করলাম ত্রিতল থেকে প্রথম তলে। উপনীত হলাম মন্দিরের সীমা-সংলগ্ন পশ্চিম-অভিমুখী একই আগমন-নির্গমন মার্গে। প্রশস্ত পথে লক্ষ্য করলাম উন্মুক্ত পট-ভূমিকায় কয়েকটি গ্রাম্য বালক-বালিকার নৃত্যের অনুষ্ঠান। মহাভারত, রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যভঙ্গি, তাল, ছন্দ, বাদ্য, সাজসজ্জা—সবকিছুতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। দর্শকের ভূমিকায় একটি ফরাসী পর্যটকের দল উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ উপভোগ করলাম সেই কিশোর-কিশোরীদের সাবলীল নৃত্য, সুর ও বাদ্য।

এবারে উপস্থিত হলাম মার্গের শেষ প্রান্তে। সূর্যাস্ত শুরু হয়েছে। শেষবারের মতো পিছন ফিরে তাকালাম আঙ্কোরবটের দিকে—রাজা সূর্যনারায়ণের (দ্বিতীয়) অবিনশ্বর কীর্তি। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিপাতে এক রহস্যময় দীপ্তি বিরাজ করছিল ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নিদর্শনটিতে। [ক্রমশঃ]

স্বামী সারদানন্দের দুটি অপ্রকাশিত ভাষণ

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী সারদানন্দের 'গীতাতত্ত্ব' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের (জন্মাষ্টমী, ১৩৩৫) নিবেদন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "স্বামী সারদানন্দ এই বক্তৃতাগুলি ১৩০৯ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন সভা এবং বালি ও কোন্নগর হরিসভায় প্রদান করেন। উহা প্রবন্ধাকারে 'উদ্বোধন'-এ নিবদ্ধ ছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।" এই গ্রন্থের কোন্ প্রসঙ্গ কোথায় বর্ণিত হয়েছিল তা 'সূচীপত্র'-এ নির্দেশিত হয়েছে। 'বিবেকানন্দ সমিতি'-তে 'পরিচয়' (অর্থাৎ 'গীতা'র ভূমিকা), 'জ্ঞানযোগ' (১ম ও ২য় প্রস্তাব), 'কর্মযোগ' (১ম ও ২য় প্রস্তাব) ; বালি হরিসভায় 'জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়'; কোন্নগর হরিসভাতে 'সাধনা ও সিদ্ধি' এবং রামকৃষ্ণ মিশন সভায় 'বেদ-কথা', 'সৃষ্টি-রহস্য', 'সাধন-নিষ্ঠা', 'কর্মের দ্বিবিধ রূপ', 'কর্ম-রহস্য' এবং 'উপসংহার' বর্ণিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গসমূহের অতিরিক্ত দুটি প্রসঙ্গও এই গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে। 'বালি হরিসভায়' প্রদত্ত 'জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়' প্রসঙ্গটির পর 'বেদান্ত ও ভক্তি' প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে এবং 'উপসংহার'-পর্বের পর 'আপ্ত-পুরুষ ও অবতারকুলের জীবনানুভব' প্রকাশিত হয়েছে। এই শেষ দুটি প্রসঙ্গের উৎস 'গীতাতত্ত্ব'-এ নির্দেশিত হয়নি।

স্বামী গম্ভীরানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্বামী সারদানন্দের জীবনকথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর সারদানন্দজী ধারাবাহিকরূপে অ্যালবার্ট হল-এ অনেক-গুলি বক্তৃতা প্রদান করেন ; ঐগুলি সবিশেষ চিত্তগ্রাহী হওয়ায় পরে 'গীতাতত্ত্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।" এই উক্তি থেকে জানা যায়, অ্যালবার্ট হল-এ 'গীতাতত্ত্ব' বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ঐ বক্তৃতাসমূহ 'গীতাতত্ত্ব' গ্রন্থের সূচনাপর্ব। বলা বাহুল্য, অ্যালবার্ট হল-এ প্রদত্ত বক্তৃতার কোন উল্লেখ 'গীতাতত্ত্ব' গ্রন্থে নেই।

স্বামী গম্ভীরানন্দের উক্তির যাথার্থ্য নির্ণীত হয় 'ক্যালকাটা লিটারেরী সোসাইটি'র ১৮৯৯ সালের কার্যবিবরণীতে (পরবর্তী আলোচনায় 'কলিকাতা সাহিত্যসভা' নামে উল্লিখিত হবে)। কলিকাতা সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। সাহিত্যসভার মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাওয়া যায় ১৮৭৫ থেকে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কলিকাতা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন বাবু শ্যামলাল দে। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জনমণ্ডলীকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা-সূত্রে সম্মিলিত করা। শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে নৈকট্যস্থাপন করা কিছু লোকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সন্দেহ নেই। এর বহু পূর্বেই 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব নলেজ' (১৮৩৮) এধরনের কাজে স্মরণীয় ভূমিকায় চিহ্নিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগোষ্ঠীরা চেষ্টা করেছিলেন আমাদের দেশের যথার্থ অবস্থার সঙ্গে সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিকদের পরিচয়লাভের পথ সুগম করতে। কলিকাতা সাহিত্য-সভার স্থাপনা ও পরিচালনায় যাঁরা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগোষ্ঠী। এই সভা বিদ্বৎ-সমাজের ভাবপ্রচারের মাধ্যমরূপে গড়ে উঠেছিল। রাজনীতির আলোচনা এখানে ছিল না, বলা যেতে পারে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল মুখ্য আলোচনার ক্ষেত্র। বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক মতবাদের আলোচনা কলিকাতা সাহিত্যসভায় বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিল, বিশেষতঃ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরে মোট বাহান্নটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ; তার মধ্যে শুধু ধর্ম, দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠান-বিষয়ক আলোচনা হয়েছিল ৪৯টিতে। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন—জগৎগুরু শঙ্করাচার্য (কোন্ মঠের তা উল্লিখিত হয়নি), আমেরিকার কাউন্টেস এম. এস. কন্নাভারু, পাঞ্জাবের নিত্যানন্দ সরস্বতী, শিকাগোর মহিলা বক্তা স্বামী অভয়ানন্দ (যিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিধিবদ্ধভাবে দীক্ষিতা প্রথমা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা), সিংহলের অনাগারিক এইচ. ধর্মপাল, বৃন্দাবনের পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ শর্মা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্বামী আলারাম সাগর সন্ন্যাসী, কালীঘাটের পণ্ডিত কৃষ্ণ দাস, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী সারদানন্দ, খড়দার পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য মনোমোহন মিত্র, ভারতধর্ম মহামণ্ডলের সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল প্রমুখ। কলিকাতা সাহিত্যসভার অধিবেশনগুলি বেশির ভাগ কলেজ স্কোয়ারের অ্যালবার্ট হল-এ অনুষ্ঠিত হতো। কিছু

কিছু অনুষ্ঠান ৮৪ নিমতলা স্ট্রীটে সভাভবনে অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। সাহিত্যসভার কার্য-বিবরণীতে স্বামী সারদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতাদ্বয় ৪৪ এবং ৪৬ সংখ্যক বক্তৃতারূপে উল্লিখিত হয়েছে।[১]

স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা-দুটির মাঝে ২৫ সেপ্টেম্বর 'ভগবান ও ভক্ত' ('God and the Devotee') বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। তিনটি বক্তৃতা প্রকৃতপক্ষে একই সূত্রে গাঁথা। সাহিত্যসভার কার্য-বিবরণীতে প্রতিটি বক্তৃতার সারাংশ ইংরেজীতে বিবৃত হয়েছে। যাই হোক, অ্যালবার্ট হল-এ প্রদত্ত স্বামী সারদানন্দের গীতাতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতার হদিস পাওয়া গেল। এই বক্তৃতা-দুটির সারাংশ যেভাবে কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় গ্রহণ করলে 'গীতাতত্ত্ব' গ্রন্থের সূচনাপর্বের পটভূমিকাটি স্পষ্ট হবে।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় কলিকাতা সাহিত্যসভার কার্যালয় ৮৪ নিমতলা স্ট্রীটে যে-সভা আহূত হয়েছিল, সেখানে স্বামী সারদানন্দ 'বেদান্ত ও ভক্তি' বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর পরিচয়-দান-প্রসঙ্গে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য এবং সদ্য আমেরিকা-প্রত্যাগতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর তখন মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনকে জনসমাজে ছড়িয়ে দেওয়া। স্বামী গম্ভীরানন্দের ভাষায়, "মঠ ও মিশনের এই প্রথমাবস্থায় সংঘের অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রবাহিত হইত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সমাহিত চিত্তে সংস্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী হইতে। সেই ভাবসমষ্টিকে মঠ ও মিশনের বিশাল ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রণালীতে পরিচালিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন তাঁহার গুরুভ্রাতারা। ইঁহাদের মধ্যে আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সংঘের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টি থাকিত সেই ভাবরাশিকে নির্দিষ্ট কার্যধারায় পরিচালনের প্রতি।"[২] বিবেকানন্দের তাড়নায় সারদানন্দের বক্তৃতা দেওয়ার কাজ বিদেশেই শুরু হয়েছিল। কলিকাতা সাহিত্যসভায় 'বেদান্ত ও ভক্তি' বিষয়ে তিনি জনমণ্ডলীকে প্রায় ঘণ্টাধিক কাল মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। ভাষণটির সারাংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উপস্থাপিত করলাম ঃ

"ভগবানকে শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। ঈশ্বরকে জানা যায় ভক্তি দিয়ে। বিচার এবং ভক্তি—দুটি স্বতন্ত্র বস্তু। যিনি 'ভক্তি' আশ্রয় করেন, তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন 'প্রার্থনায়', সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 'নামগানে' এবং পার্থিব 'সুখ ও আকাঙ্ক্ষার বিসর্জনে'। নারদমুনি দিনযাপন করতেন স্রষ্টারই নামগুণগানে। ঈশ্বর পূর্ণপ্রেমময়। সাণ্ডিলমুনি বলেন—সবকিছু ঈশ্বরে সমর্পণই ভক্তি। প্রহ্লাদ ছিলেন ভক্তির অবতার। আমরা যদি ভগবানকে ভালবাসতে চাই, তাহলে পৃথিবীকে এবং পার্থিব সকল বস্তুকে আমরা যেভাবে চাই, সেইভাবেই চাইতে হবে। সেইটিই পরিত্রাণের পথ। বিচারের মধ্য দিয়েই আমাদের এগোতে হবে। আমাদের সব চাওয়ার মূলে ভগবানকে বসাতে হবে ঠিক সেইভাবে, যেমন ভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষার জগৎকে ঘিরে রেখেছে পার্থিব বস্তু।

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, আমরা ছেলের জন্য কাঁদি, পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য কাঁদি, কিন্তু আমাদের স্রষ্টার জন্য একবারও কাঁদি না। অজ্ঞ জন পার্থিব ভোগ্যবস্তুর জন্য উন্মত্ত। যদি আমরা ঈশ্বরে অনুরাগী হতে পারি, তাহলে সহজেই মোক্ষলাভ হয়।

"ঈশ্বরের ভজনা কর। প্রার্থনা কর। তাহলে অবশ্যই ভক্তি মিলবে। ভগবানকে আকুল হয়ে চাইলে ফল হিসেবে মেলে 'ভক্তি'। ভক্তির মাধ্যমে স্বর্গের দ্বার খুলে গেলে সব পার্থিব লাভ তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের 'চলা' শুরু হয়ে যায়। (করতালি)

১ (44) On Vedanta and Devotion by Swami Saradananda, a disciple of the Late Ramkrishna Paramhansa of Dakhineswar, under the presidency of Dr. Kally Prasanna Sarkar, at the premises no. 84 Nimtola Street, on the 24th September 1899 at 6 p. m.. The hall was over crowded.

(46) On the Ethics of Bhagbat Gita by Swami Saradananda, a disciple of the Late Ramakrishna Paramhansa of Dakhineswar, under the presidency of Babu Gobin Chand Dhar, Chairman, Hindu Family Annuity Fund, at Albert Hall, College Square on Wednesday, the 27th September 1899 at 5 p. m. The meeting was fairly attended.

২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৩৬০, পৃঃ ৩১২

"আমরা চলি, যেমনভাবে তিনি চালান। কে আমি? আমি কোথায়? 'অহঙ্কার' আমাদের চালিত করে। জ্ঞানী ঘোষণা করেন—সবকিছু ত্যাগ কর, দেখবে তোমার বিচারে তুমি কত ক্ষুদ্র! আজ তোমার কত ক্ষমতা, কাল তোমার সবকিছুই যেতে পারে! দেহের মধ্যে একাধিপত্য শুধুই 'আত্মা'র। তুমি তোমার খুশিমত তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করতে পার না, ধ্বংস করতে পার না। কারণ, তিনি 'অবিনশ্বর'। কিন্তু দেহ—'নশ্বর'।

"নিজেকে জান। তাহলে তুমি সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা এবং দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত হবে। জ্ঞানীরা তখন বলবেন, তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ। আত্মাকে বিশ্লেষণ করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তাঁর 'ক্ষমতা'র সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে তবেই সবকিছু বোধগম্য হবে। যখন আমরা দেখি মানুষ দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, তখন আমরা তাদের জন্য দুঃখ-কষ্ট অনুভব করি না। কিন্তু যখন নিজেরা সেই দুর্বিপাকে জর্জরিত হই, তখন বুঝতে পারি অভাব-অনটনের দুঃখ-কষ্টের যথার্থ যাতনা।

"যতক্ষণ 'আছি', ততক্ষণ জগৎটা আমার। তোমার মনকে তুমি যেমন খুশি চালাতে পার। অগ্নি সবকিছুই দগ্ধ করতে পারে। অগ্নির ক্ষমতায় আমরা রান্না করি, নিজেদের শরীর তাতিয়ে নিই। যদি আমরা মানব-কল্যাণের জন্য আমাদের 'ক্ষমতা' প্রয়োগ করতে পারি, তা-হলে পৃথিবীর কাছে 'মহান'রূপে চিহ্নিত হব। (করতালি)

"শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আরও বলতেন—সব শাস্ত্র একই শিক্ষা দেয়, যেমন সব শেয়ালের একই রা। তোমার সকল কামনা-বাসনা ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তোমার আবেগ-ইন্দ্রিয়াদিকে আহুতি দাও ঈশ্বরে, তোমার রাগ, তোমার জটিলতা-কুটিলতা সবকিছু দাও ঈশ্বরে, তুমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন কর ঈশ্বরে। আত্মার শক্তি অপ্রমেয়, অনন্ত। দেহ আত্মা থেকেই সমস্ত শক্তি আহরণ করে।

"ভক্তি তোমাকে বিশ্বাস এনে দেবে। ঈশ্বরে সকল কিছু নির্ভর করার শিক্ষা তোমার অধিগত হবে। হিংসা করো না—তোমার 'ভগবদ্দর্শন' হবে। জ্ঞানী মানুষ বলেন—'আমি তাঁর ভজনা করছি, তাই আমিই সবকিছু করছি।' আর ভক্তজন বলবেন—'তিনিই সব করছেন, আমি তো কিছুই না।'

"আমরা যদি সবাই সবাইকে ঠিকমত বুঝতে পারি, তাহলে খ্রীস্টানেরা, মুসলমানেরা বা হিন্দুরা কেউ কারোর বিরুদ্ধে যাবে না। ধর্মীয় শিক্ষার মূলবস্তু 'এক' এবং তা 'অভিন্ন'। যখন সারা সংসার ঘুমোয়, তখন ঈশ্বর জেগে থাকেন। তুমি তোমার স্বধর্মে বিশ্বাস রাখ—বেদের অনুজ্ঞা। কিন্তু অন্য জাতির পৃথক ধর্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ো না। পার্থিব সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একের পর এক; অবশেষে হবে সবকিছুরই পরিসমাপ্তি। ঈশ্বরই একমাত্র অপরিবর্তনশীল। তাঁর আদি নেই, মধ্য নেই, নেই অন্ত। (করতালি)

"কখনো ভেবো না—আমি বড়, সে ছোট। ভগবানের রাজ্যে এসবের কোন অস্তিত্বই নেই। ধনী-দরিদ্র, বড়-ছোট, বলবান-দুর্বল মৃত্যুর পর সবাই যাবে একই জায়গায় এবং সেখানে নেই জাতি, বর্ণ ও ধর্মের কোন বৈষম্য।" (করতালি)

স্বামী সারদানন্দ তাঁর দ্বিতীয় দিনের ভাষণটি ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর বুধবার বিকাল ৫টায় অ্যালবার্ট হল-এ (কলেজ স্কোয়ার) 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা' বিষয়ে প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় গীতাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী। ভাষণটির সারাংশের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"যাঁরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়েছেন, তাঁরা এই মহান গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন, তাতে সন্দেহ নেই। গীতার উপদেশাবলী যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের কাছে এটি প্রিয় গ্রন্থ। ইউরোপ এবং আমেরিকা পরিভ্রমণকালে দেখেছি ঐ সব দেশেও গীতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। এক ভদ্রলোককে দেখেছি রেলভ্রমণের সময় পকেটে গীতা রাখতে, সুযোগ পেলেই তা পাঠ করবেন—এই মানসে। স্বামীজীর মতে, 'গীতার শ্রেষ্ঠত্ব সকল ধর্মের শাস্ত্রসমূহের উপর।' স্বামীজী বলতেন, 'আমার কোন সন্দেহ নাই যে, পাশ্চাত্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গীতা ক্রমে ক্রমে "বিশ্বজনীন বাইবেল" ("Universal Bible")-রূপে স্বীকৃত হবে। আর যখন পাশ্চাত্য ও দক্ষিণের দেশসমূহ গীতাকে পবিত্র বাইবেল-রূপে গ্রহণ করবে তখন শিক্ষিত ভারতীয়েরা ধীরে ধীরে তাদের অনুকরণ করবে।' (করতালি)

"প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বে মানবরচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে গীতা সর্বোত্তম। এই ভারতেরই পশ্চিমপ্রান্তে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা এই পবিত্র গ্রন্থের একটি বা দুটি অধ্যায় পাঠ না করে প্রাতঃকালীন আহার গ্রহণ করেন না। বিভিন্ন অবতারদের শিক্ষাবলীর প্রতি অমর্যাদা না দেখিয়েই স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভগবদ্গীতা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম মহান দান।' এই গ্রন্থ ইতিহাসের ধারা বেয়ে আজও পরম আদরণীয় এবং গভীর শ্রদ্ধায় নিয়ত বন্দিত।

"ইউরোপে দরিদ্রকে দানব মনে করা হয়। সে যা খুশি তাই করতে পারে। সে চুরি, ডাকাতি, পকেটকাটা, এমনকি মানুষকে সাংঘাতিকভাবে আহত করতে যায় তার দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। পরিণতিতে সে জেলে যায়, নয়তো সংশোধনশালায়। ভারত দারিদ্র্যকে গ্রহণ করেছে ভিন্ন মানসিকতায়। মানুষ ঈশ্বরের নামগান করে চলেছে পথে পথে, দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষার মাধ্যমে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির সাধনের জন্য। এটা সম্ভব হয়েছে গীতার শিক্ষা-মাহাত্ম্যে। এই শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর। এই মহান মর্যাদার অধিকার আমরা পেয়েছি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম দেহধারী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায়। (করতালি)

"গীতায় বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পালনীয় নির্দেশ আশ্চর্য-সুন্দর ভঙ্গিমায় এই কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত। যুদ্ধে জয়ের জন্য তিনি অর্জুনকে প্রদীপ্ত করতে চেয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুপক্ষের বিবদমান সৈন্যদলে শুধুই আত্মীয়, বন্ধু এবং স্বজন দেখে তাদেরই রক্তবন্যার কল্পনায় অর্জুন যখন গাণ্ডীবত্যাগ করে বেপথুমান তখন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি অর্জুনেরই সারথ্য স্বীকার করে অর্জুনের যুদ্ধরথে সমাসীন, তিনি তাঁর কর্তব্যপালন করেছেন এই অবিস্মরণীয় কথোপকথনের সত্যমূল্যে অর্জুনকে জাগ্রত করে। শ্রীকৃষ্ণের অমোঘ বাণী—তাঁর প্রতি সর্বস্ব সমর্পণ এবং তাঁরই ওপর অবিচল নিষ্ঠার সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

"আমরা যদি অন্য ধর্মের কথা ভাবি, তাহলে দেখি 'বাইবেল'-এ রয়েছে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে একটি উদ্দেশ্য এবং যীশু সেই উদ্দেশ্যপূর্তিতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি যদি এই অসম্মানকর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া না চাইতেন, যদি তিনি স্বর্গের দেবদূতদের, তাঁর পিতৃপুরুষদের আহ্বান করতেন, তাহলে? না—তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর পরমপিতারই আজ্ঞায়, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে। সমভাবে আমরা যদি গীতার শিক্ষাবলীর প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে এগুলি শুধু সুন্দরই নয়, এগুলি অত্যাশ্চর্য! শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুরাগীদের শিক্ষাদানপ্রসঙ্গে বলেছেন তাঁর ওপর নির্ভর করতে অর্থাৎ ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে, যা দেবে পরমা শান্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশাবলীর মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয়ের ভাব সুস্পষ্ট। সেখানে রয়েছে দর্শন, রয়েছে ধর্ম, রয়েছে সকল কিছু, যা অন্যত্র অপ্রাপ্য।

"সুবুদ্ধির আশ্রয় নাও, ঈশ্বরকে ভালবাস। সবকিছুর ঊর্ধ্বে সেই প্রেমময়কে স্থাপন কর। দেখবে, দুখদ ইন্দ্রিয়াদির ওপর তোমার নিয়ন্ত্রণ আসবে, আসবে দুষ্ট চিন্তার ওপর তোমার কর্তৃত্ব, যা এই পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। সত্যের অনুসন্ধান কর। তুমি তা পাবেই।" (করতালি)

প্রথম সভায় ডাক্তার কালীপ্রসন্ন সরকার সভাপতিত্ব করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনের সভা 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডে'র চেয়ারম্যান বাবু গোবিন্দচাঁদ ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাবু সুরেন্দ্রনাথ বসু, বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু আশুতোষ মুখার্জী, বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায়, বাবু অমূল্যকৃষ্ণ সেন, বাবু নগেন্দ্রনাথ দে, বাবু খগেন্দ্রভূষণ চক্রবর্তী, বাবু ননীকৃষ্ণ নন্দী, বাবু আশুতোষ চৌধুরী, বাবু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু ফণীন্দ্রনাথ দে, বাবু শ্যামলাল লাহা, পণ্ডিত আশানন্দ স্বামী প্রমুখ। স্বামী সারদানন্দের ভাষণ সমাপ্তির পর বাবু গোবিন্দচাঁদ ধর সভাপতির ভাষণে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেনঃ "তিনি দক্ষিণেশ্বরের মহানপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। যথার্থভাবেই তিনি মহান গুরুর প্রতিনিধিত্ব করেছেন।" এর পর শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ রচিত 'গীতাতত্ত্ব'-এর সূচনাপর্বরূপে কলিকাতা সাহিত্যসভায় প্রদত্ত ভাষণ-দুটিকে সহজেই চিহ্নিত করা চলে। সঙ্ঘের 'অন্তর্নিহিত ভাবরাশি'কে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জনসমাজে প্রচার ও প্রসারের গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ। সেই সংগঠন-শক্তির বিকাশ তথা মাধ্যমরূপে সেকালে সভা-সমিতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করার প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল জাগ্রত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, কলিকাতা সাহিত্য-সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা বা বক্তৃতামূলক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেরই উপস্থিতির কথা জানা যায় এবং কয়েকজন যে বক্তৃতা দান করেছিলেন তার সারমর্ম প্রকাশিত কার্যবিবরণী থেকে পাওয়া যায়। সাহিত্যসভার আসরে স্বামী সারদানন্দের গীতাতত্ত্বের ব্যাখ্যান নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।□

☐ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ☐

শিবিরাজার উপাখ্যান ৩

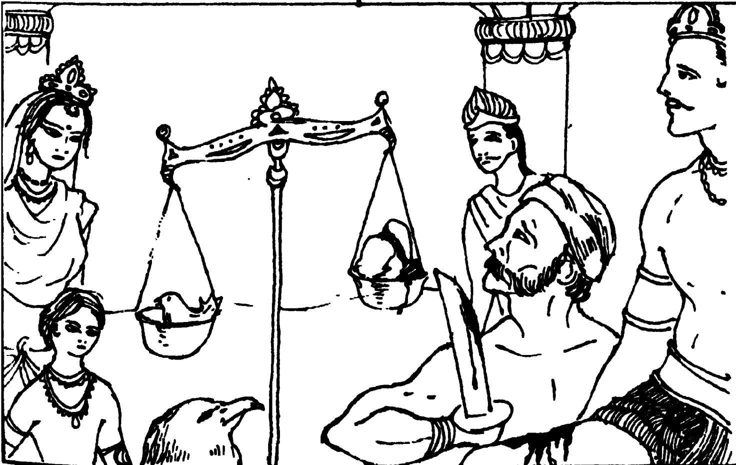
কথা ঃ ভগিনী নিবেদিতা ☐ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত।



রাজা আশ্রিতের বিশ্বাসভঙ্গ করতে কোনভাবেই রাজি হলেন না। পরিবর্তে বাজপাখির রুচি অনুযায়ী যে-কোন খাদ্য দিতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বাজপাখি রাজার দেহ থেকে পায়রাটির ওজনের সমপরিমাণ মাংস দাবি করল। সে বলল, রাজদেহের দক্ষিণ পার্শ্বের মাংসই দিতে হবে এবং এই উৎসর্গপর্বে রাজার স্ত্রী-পুত্রকেও উপস্থিত থাকতে হবে।

এই শর্তে রাজা প্রসন্নচিত্তে সম্মতি দিলেন। রাজার আজ্ঞাক্রমে রাজসভায় তুলাদণ্ড আনা হলো এবং বাজপাখির ইচ্ছানুযায়ী রানী ও রাজপুত্রকেও সভায় আনা হলো। সভাসদ্‌দের চোখের সামনে তুলাদণ্ডের একদিকে পায়রাটিকে রেখে অপরদিকে রাজদেহের দক্ষিণ উরু থেকে মাংস খণ্ড খণ্ড করে দেওয়া হতে লাগল।





আশ্চর্য ব্যাপার! সভাস্থ সকলে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল যে, ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড করে রাজদেহের মাংস তুলাদণ্ডের অপরদিকে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র পায়রাটির ওজনও বেড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই রাজদেহের মাংস পায়রাটির ওজনের সমান হচ্ছে না!

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাটী। সুপরিচিত নাম সারাটী-মায়াপুর। সারাটী গ্রামকে পুরনো দিনের অনেকে বলে থাকেন সারাবাটী। আসলে সারাটী-মায়াপুর একটি গ্রাম নয়—দুটি পাশাপাশি গ্রাম; দ্বারকেশ্বর নদীর বিলুপ্ত-প্রায় এক শাখা এই গ্রামের সীমারেখা রচনা করেছে। মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমান-রাজত্বকালে এই দুটি গ্রামের পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। লোকে বলত সারাটী-মায়াপুর। যেন একটি গ্রাম। এই সারাটী গ্রামেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণিদেবীর জন্মভূমি। তাঁর পিতৃপুরুষের পদধূলিপূতঃ এই স্থান তীর্থভূমিতুল্যই! মায়ের সঙ্গে শৈশবে এবং কৈশোরে গদাধর মাতুলালয়ে এসেছেন। সুতরাং এখানের পথের মাটিতে, ধূলিতে লেগে আছে শিশু ও কিশোর গদাধরের পবিত্র স্পর্শ। গদাধরের ক্রীড়াময় মুহূর্তগুলিতে সারাটীর প্রান্তর মুখরিত থাকত। এখানকার অরণ্যের হনুমান হতো তাঁর খেলার সাথী—এখানের পীরের দরগার ঘোড়া দেখে পুলকিত হতো তাঁর কিশোর মন। এখানকার শ্যামল বৃক্ষ-লতায়, উদার প্রান্তরে ছিল তাঁর ভাবোদ্দীপনের মহতী আয়োজন। সেই সারাবাটী বা সারাটী আজ লোকশূন্য। শ্রীহীন কিন্তু এক বিস্মৃত ইতিহাসের সাক্ষী!

সারাটী গ্রামের বর্তমান শ্রীহীনতার নেপথ্য ইতিহাস জানিয়েছেন এই গ্রামেরই লেখক রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ "চারিদিকে শৃগাল কুকুরের দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কোথাও মৃতদেহ, কোথাও বা জীবন্ত দেহ শৃগাল কুকুরে মনের আনন্দে ছিঁড়িয়া খাইতেছে। কী ভীষণ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! ঘরে বাহিরে শবদেহ—শ্মশানে শবদেহ—পুষ্করিণীতে শবদেহ—পথে, ঘাটে, মাঠে যেদিকে চাহিবে কেবল শবরাশি! একখানা মানবহস্ত বা দেহের একখণ্ড অস্থি লইয়া শৃগাল-কুকুরের কি বিবাদ ও ভয়ঙ্কর চীৎকার-ধ্বনি! সন্ধ্যার পর কুকুর-শৃগালের ভয়ে গৃহের বাহির হইবার উপায় নাই। চারিদিকের পচা শবদেহের উৎকট দুর্গন্ধ; এই ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া রাক্ষসী ভাদ্র মাসের শেষভাগে আগমন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম একেবারে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিল।"[১]

আরেকজন লিখেছেনঃ "হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম এই ম্যালেরিয়া বৎসরে দানবের লীলাভূমি হইয়াছিল। সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রাম একেবারে লোকশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রাম দুইখানির বোধহয় চৌদ্দ আনা লোক ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছিল। পূর্বে সারাবাটী ও মায়াপুর গ্রামের যে শ্রী ছিল এখন তাহার কিছুই নাই।"[২]

অথচ একসময় এই গ্রাম যথেষ্ট সম্পদশালী ছিল। রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যত্র লিখেছেনঃ "হুগলী জেলার অন্তর্গত সারাবাটী গ্রামখানি অতি বৃহৎ। এতবড় বৃহৎ গ্রাম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রামখানির বর্তমান অবস্থার কথা বলিতেছি না, বহু বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি। গ্রামখানির দক্ষিণপ্রান্ত দিয়া বিখ্যাত বেনারস রোড গিয়াছে। হিন্দু নরনারীগণ ও অসংখ্য পথিক প্রত্যহ এই পথ দিয়া কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থে দল বাঁধিয়া মনের আনন্দে গমন করিত। পশ্চিমসীমায় দ্বারকেশ্বর নামে একটি নদী প্রবাহিত ছিল। প্রত্যহ অসংখ্য নৌকা এই নদীতে ভাসিয়া যাইত। বড় বড় মালবোঝাই নৌকা ঝপঝপ শব্দে উজান বাহিয়া চলিত। এখন এই নদীর সে-প্রতাপ নাই। প্রবল বর্ষার সময় ব্যতীত বিখ্যাত দ্বারকেশ্বরের চিহ্নমাত্রও উপলব্ধি হয় না। গ্রামের পূর্ব ও উত্তর দিকে হরিদ্বর্ণের মাঠ। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! সারাবাটীর পূর্ব ও উত্তর দিকের শ্যামল শস্যক্ষেত্র দেখিলে প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। প্রকৃতি যেন স্বহস্তে অতি যত্নে সারাবাটীর এই শ্যামলক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। পল্লীবাসীর আনন্দের দিন পৌষমাসে এই শস্যক্ষেত্রের শোভা যিনি দেখিতেন, তিনিই মোহিত হইতেন। বিদেশী পথিক অনিমেষ নয়নে সারাবাটীর এই শস্যভরা সোনার মাঠের দিকে চাহিয়া থাকিত।"[৩]

লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেনঃ "(শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম) আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুনরায় দ্বিতীয়বার

১ মানবচিত্র— রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৯১০, পৃঃ ১২৬
২ আরামবাগের ইতিকথা—চুনীলাল বসু, ভারতী বুকস্টল, ১৯৫৭, পৃঃ ২২
৩ জীবনসংগ্রাম—রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১৯০৮, পৃঃ ১৭

দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটীতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সারাটী-মায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং ঐ সকলের জন্যই তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং সন ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন জানিয়েছেন, নররূপী ভগবানের বিচিত্র লীলা সংগঠিত হয়েছিল সারাটীতে ঃ

"নিকটে সরাইঘাটা যথা মায়াপুর।
মামাবাড়ি সেই গ্রামে ছিল শ্রীপ্রভুর॥
একবার মার সঙ্গে তথায় গমন।
পথিমধ্যে জননীরে বলিলা বচন॥
বস্ত্রে করি আচ্ছাদন কোলে কর মোরে।
পথে যেতে কেহ যেন না দেখে আমারে॥
যথা কথা মাতা করি বস্ত্রে আবরণ।
গদায়ে করিয়া কোলে করেন গমন॥
পথ-সন্নিকটে এক পীরের অবস্থান।
সুশীতল বৃক্ষতল মনোরম স্থান॥
সন্ধান পাইয়া মায়ে কন ধীরে ধীরে।
দেহ দেহ দেহ গো মা নামাইয়া মোরে॥
বৃক্ষমূলে অধিষ্ঠিত যথা সত্যপীর।
পড়ে কত হাতি ঘোড়া বানান মাটির॥
তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন গদাধর।
কি জানি কি ভাবে ভরে তাঁহার অন্তর।"[৫]

আবার কখনো—

"পথে যেতে পূর্ববৎ গদাধর কোলে।
উপনীত পথপ্রান্তে কোন বৃক্ষতলে॥
ডালে মূলে মুখপোড়া অসংখ্য বানর।
দেখিয়া বড়ই খুশি হৈলা গদাধর॥
হাতে ছড়ি তাড়াতাড়ি গদাধর যান।
যেখানে বসিয়া মুখপোড়া হনুমান॥
অতি অল্পবয়ঃ শিশু ভয় নাহি মনে।
তাড়া করিলেন গিয়া যত হনুমানে॥
আপোষা বনের পশু হনুমানগণ।
গদায়ের প্রতি নাহি করে আক্রমণ॥
নামিয়া আইল যারা বসেছিল ডালে।
নানা রঙ্গে গদায়ের সঙ্গে তারা খেলে॥"[৬]

সারাটী-মায়াপুর আরামবাগ মহকুমার অধীন। এর গায়ে লেগে আছে বাংলার মুসলিম শাসকদের অত্যাচারের ক্ষত, বর্গী হাঙ্গামার আঘাত এবং ইংরেজ-শোষণের কলঙ্কচিহ্ন। এ গল্প নয়, ইতিহাসের দলিল। বহু ক্ষত-আঘাত-কলঙ্কচিহ্ন নিয়েও সারাটী-মায়াপুরের মাটির বুকে শিশিরবিন্দুর মতো ছড়িয়ে আছে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলকুলের সম্পর্ককথা।

মুসলিম শাসনে সারাটী

মধ্যযুগের বাংলায় যখন মুসলিম-শাসন অব্যাহত সেকালে এ গ্রামের চিত্র বিবৃত করেছেন চুনীলাল বসু ঃ "কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে মামুদ শরীফ নামক একজন ডিহিদারের নাম পাওয়া যায়। কবির পৈত্রিক বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। এই স্থান হতে মায়াপুর গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মায়াপুরে ডিহিদারের বাসস্থান ছিল। ডিহিদার শরীফ বংশীয়েরা এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির লেখা হইতে পাওয়া যায় যে, রাজা মানসিংহ যখন গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের শাসনকর্তা ছিলেন তখন উক্ত অঞ্চলের ডিহিদার ছিলেন মামুদ শরীফ। তারপর ডিহিদারের অত্যাচারে তিনি দামুন্যা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগনার মধ্যবর্তী আঁড়রা গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের নিকট যান এবং তাঁহার পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তারপর রাজা রঘুনাথের আদেশে তিনি বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য চণ্ডীমঙ্গল প্রচার করেন। অতএব রাজা মানসিংহের আগমনের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহ বাংলার সুবেদার

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ১৩৯৮, পৃঃ ৩৩-৩৪

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯২, পৃঃ ১২-১৬

৬ ঐ

নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া তাহাকে উক্ত পদ হইতে অপসারণ করিয়া কুতুবুদ্দিন খাঁকে নিযুক্ত করেন। অতএব মানসিংহের আগমনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ কাব্য রচিত হইয়াছিল। আন্দাজ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে এই কাব্যের রচনাকাল হইবে এবং ডিহিদার মামুদ শরীফ উক্ত সময়ে উক্ত অঞ্চলের ডিহিদার ছিলেন।"[৭]

ঘটনাটি কবিকঙ্কণের লেখনীতেও বাঙ্ময়ঃ

"ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।
যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে
হৈল রাজা মামুদ শরীফ॥
উজির হল রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল অরি।
মাপে কোনে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥"[৮]

মুসলিম-রাজত্বের চিহ্ন হিসাবে সারাটী-মায়াপুরের একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষ্য করা যায়। স্টুয়ার্ট-বর্ণিত 'List of Ancient Monuments of Bengal' গ্রন্থে ঐ মসজিদ প্রসঙ্গে লিখিত আছেঃ "Mayapur—Mosque. The site of a mosque which is according to local tradition was built of stone."[৯] ব্ল্যাকম্যান তাঁর 'Notes on places of Historical Interest in the District of Hugli' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, চুঁচুড়ার পশ্চিমে বায়ড়া পরগনাতে দামোদর নদের দক্ষিণ তীর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে মায়াপুরে হুসেন শাহ নির্মিত একটি মসজিদ ও পুষ্করিণী এখনো আছে এবং মায়াপুরের বার মাইল উত্তর-পূর্বে হুসেন শাহের স্মৃতিতে 'শাহহুসেনপুর' নামে একটি গ্রামও আছে। মায়াপুর দামোদরের দক্ষিণ তীর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। এখানে গোঁড়া মুসলমানেরা মায়াচণ্ডীর প্রতিমা ভেঙে ফেলেছিল এবং হুসেন শাহ এখানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মকবারা নির্মাণ করেন।[১০]



সারাটী-মায়াপুরে ডিহিদার মামুদ শরীফের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আলোকচিত্রঃ শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ আরামবাগের ইতিকথা, পৃঃ ১৯

৮ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র শীল সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৪৪, পৃঃ ৬

৯ আরামবাগের ইতিকথা, পৃঃ ১৯ ১০ ঐ

চুনীলাল বসু মায়াপুর পরিভ্রমণ করে এবং প্রাচীন বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করে এই স্থান প্রসঙ্গে বিবরণ ও মন্তব্য দেন ঃ "এখানে মসজিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এবং চতুষ্পার্শে অনুসন্ধানকালে আমি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে দেবদেবীর মূর্তি-খোদিত বহু ভগ্ন প্রস্তর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সেই সময় উহার নিকটে এক পীরের আস্তানায় আমি একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দেখিতে পাই। প্রস্তরের একপার্শ্বে আরবী ভাষায় লিখিত কোরানের একটি বাণী আছে এবং অপরপার্শ্বে আছে নানা ভঙ্গিতে নরনারীর খোদিত মূর্তি ও কারুকার্যসমূহ।

"এই স্থান হইতে কিছু দূরে একটি বৃক্ষতলে আরেকটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই। উহার অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে কোন দেবীর মূর্তি বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, মায়াচণ্ডী নামে কোন এক দেবীর মূর্তি বহু বৎসর পূর্বে হিন্দুগণ কর্তৃক এখানে পূজিতা হইত। দেবীর মন্দিরটি ছিল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং দেবীর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম মায়াপুর হয়। তারপর গোঁড়া মুসলমানেরা মায়াচণ্ডীর প্রতিমা ও মন্দির ধ্বংস করে। হুসেন শাহের সময় মসজিদ নির্মাণকালে উক্ত মন্দিরের প্রস্তরগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উলটাইয়া-পালটাইয়া মসজিদ নির্মাণ এবং মৌলানা সিরাজুদ্দিনের মকবারা নির্মাণের কাজে লাগানো হয়।"[১১]

মায়াপুর মসজিদে প্রোথিত প্রস্তরে যে-কোরানবাণী রয়েছে তা হলো ঃ "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হু আল-হাইয়ু আল কাইয়ুমু লা তা আখুজুহু সিনাতুন ও লা নওমুন লহু মা ফিস্ সামাওয়াতে ও মা ফিল আরদে মন জা আল্লজি ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিয়িজনিহি ইয়ালামু মা বাইনা আইদিহিম ওমা খালফাহুম ওলা ইউহিতুনা বিশয়িন সিন ইলমিহা ইল্লা বিমশায়ান্ ওয়াসেয়া কুরসিয়ুহু আস সনাওয়াতে ওয়াল আরদা ওলা ইউ দুহু হিফ্‌জুহুমা। ওহু আল্ আলিয়ু আল্ আজিমু।"

[আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর নাই, চিরজীব তিনি স্বয়ং স্বত্ত্ব ও বিশ্বসত্তার কারণ তিনি। তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিদ্রাও তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। স্বর্গে ও মর্তে যাহা কিছু আছে—সে-সমস্তের অধিপতি তিনি। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার সন্নিধানে সুপারিশ করিতে সমর্থ—কে আছে এমন ব্যক্তি? তাহাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের সমস্তই তিনি অবগত হন এবং তাঁহার ইচ্ছা যতটুকু—তাহা ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের সামান্য অংশেরও অভিব্যক্তি তাহারা করিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে—অথচ সে-সকলের সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। বস্তুতঃ, তিনিই হইতেছেন মহাসম্ভ্রান্ত মহামহিম।][১২]

সারাটী-মায়াপুর ও বর্গী-হাঙ্গামা

অষ্টাদশ শতকে বাংলার শাসনে যখন আলীবর্দী খাঁ, তখন মারাঠা সৈন্যরা একাধিকবার উড়িষ্যা হয়ে মান্দারণের পথে বাংলায় প্রবেশ করে এবং শতাধিক গ্রামে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, শিশুহত্যা, নারীধর্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার মাটিকে কলুষিত করেছিল। কবি গঙ্গারাম প্রদত্ত মহারাষ্ট্র-পুরাণে সে-ইতিহাস অঙ্কিত আছে ঃ

"বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণুমোগুব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এত মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়া এ লুটিয়া॥

★

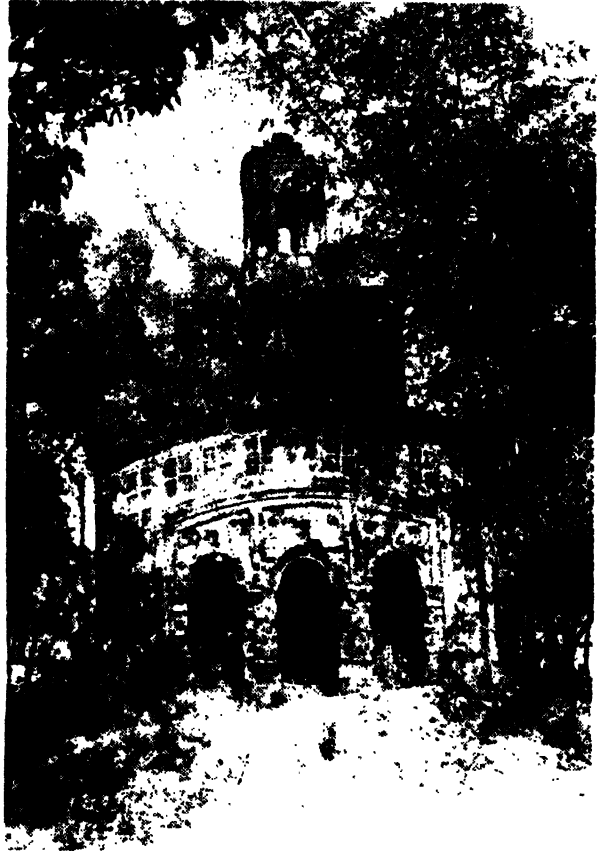
চন্দ্রকোনা মেদিনীপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়ায় আর বর্ধমান শহর॥
নিমগাছি সেড়গা আর সিমাইল।
চণ্ডীপুর (মায়া চণ্ডীপুর—মায়াপুর) শ্যামপুর গ্রাম আনাইল॥"[১৩]

বর্গী-হাঙ্গামা প্রসঙ্গে যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী উল্লেখ করেছেন ঃ "১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে যে-মাসে নবাব (আলীবর্দী) মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করল মারাঠা দলপতি ভাস্কর বীরভূমের পথে স্বদেশে ফিরে যেতে মনস্থ করায় মীর হাবিব তাকে ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে কাটোয়ায় ফিরিয়ে আনেন। মীর হাবিবের পরামর্শে ভাস্কর নূতন নূতন অঞ্চলে লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ করে হুগলীতে উপস্থিত হয় এবং হুগলীর অপদার্থ ফৌজদার মহম্মদ রেজা খানকে বন্দী করে। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর প্রায় সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে শয়তানের অভিশাপ নেমে আসে।[১৪]

১১ আরামবাগের ইতিকথা, পৃঃ ১৯-২০ ১২ ঐ, পৃঃ ১৯-২০
১৩ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১, পৃঃ ১৩৭
১৪ ঐ, পৃঃ ১৩০

সমকালে বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী ও মেদিনীপুরের আপামর জনসাধারণ বর্গীর নামে এরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল যে, এই ঘটনার বহুকাল পরেও এই অত্যাচারের কথা তাদের স্মরণে ছিল। সেই অত্যাচারের ভয়ে দলে দলে লোক ভাগীরথীর পূর্বপারে পলায়ন করে।

শিবাজীর উত্তরসূরীদের হস্তে স্ত্রীজাতির প্রতি এরূপ দলবদ্ধ অত্যাচার মুসলমান সুলতানগণের আমলেও সংগঠিত হয়নি। সালিমুল্লার বিবরণে আছে: "All rich and respectable people abandoned their homes and migrated to the eastern side of the Ganges in order to save the honour of their women."[১৫] বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের 'চিত্রচম্পূ' কাব্যের বর্ণনাতেও অনুরূপ অভিমত পাওয়া যায়: "অদ্ভুত বেগসম্পন্ন অশ্বদল যাদের প্রধান বল, সেই সৈন্যেরা সংগ্রামে উপস্থিত হয়ে দেশান্তরে নিভৃতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তারা একদিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে; অস্ত্রহীন দীন দরিদ্র, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করে; সকল সম্পদ, সাধ্বী স্ত্রীলোক ও গর্ভবতী নারীকেও অপহরণ করে।" [সংস্কৃত থেকে অনুবাদ][১৬] গঙ্গারামের কাব্য-বিবরণে বর্গীদের আক্রমণ-লাঞ্ছিত বহু গ্রামের উল্লেখ আছে; চাঁদপুর, চান্দড়া, মান্দাড়া, কড়ুই, বৈথান প্রভৃতি গ্রামগুলি আরামবাগ মহকুমার অধীন এবং সারাটী-মায়াপুরের নিকটবর্তী। সারাটী-মায়াপুরে এক ভগ্ন দেবদেউল লক্ষ্য করা যায়, যা এই অঞ্চলে বর্গী-হাঙ্গামার দুঃস্বপ্ন-স্মৃতি বহন করছে। কথিত আছে যে, ঐ বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বর্গীদের আগমন লক্ষ্য করা হতো। এমনও কিংবদন্তী আছে যে, ঐ বাড়ির নিচে একটি পাতালকুঠুরী আছে। বর্গী-আক্রমণের সময় নারী ও শিশুরা ঐ কক্ষে আত্মগোপন করে থাকত।



সারাটী-মায়াপুরের দেবদেউল। যার শীর্ষ থেকে বর্গীদের আক্রমণ লক্ষ্য করা হতো। আলোকচিত্র: শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাটী-মায়াপুরের ব্রিটিশ নীলকুঠি

এরপর উনিশ শতকের নীলচাষ প্রসঙ্গে আসা যাক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে গ্রামবাংলার কুটীরশিল্পের বাজার ছিল রমরমা। তখন ঢাকা, মালদহ, কাটোয়া, ক্ষীরপাই ও মেদিনীপুরে রেশমশিল্পের কারখানা ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা থেকে গড়ে প্রতিবছর ৭৫ লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম ইংল্যান্ডে রপ্তানী হতো। এরপর ব্রিটিশরা ইংল্যান্ড থেকে এদেশে রেশম আমদানী

১৫ History of Bengal—Jadunath Sarkar (Ed.), Vol. II, University of Dacca, 1948, p. 456

১৬ বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬

করতে থাকে। ফলে এদেশে তাঁতশিল্প ও তুঁতচাষের বাজার মন্দা হয়। ব্রিটিশ-শাসনের প্রথমপর্বে সারাটী-মায়াপুর রেশমশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে প্রচুর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হতো। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে ঃ "In the early British days a considerable quality of silk cloth was manufactured here (at Mayapur)."[১৭] শ্রমজীবী মানুষ রেশমের বাজার মন্দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ শাসক নীলচাষের ওপর গুরুত্ব দেয়। তখন ইংল্যান্ডে নীলের খোলা বাজারেও চাহিদা খুব। কারণ, ফরাসী উপনিবেশ সেন্ট ডমিঙ্গোতে তখন ভালরকমের নীলচাষ শুরু হয়েছে। ক্রীতদাস বিদ্রোহ দেখা দিলে সেখানে নীলচাষ ব্যাহত হয় (ক্রীতদাসরা নীলচাষে আপত্তি জানিয়েছিল)। ফলে ব্রিটিশরাজ ঐ নীল উৎপাদনের কাজে এদেশীয় শ্রমিক নিয়োগ করা শুরু করে। রেশমশিল্পে সংশ্লিষ্ট তুঁতচাষ বন্ধ হওয়ায় বিকল্প আয়ের উৎস হিসাবে এদেশীয়রা প্রথম প্রথম আগ্রহ ভরেই নীলচাষকে জীবিকার পথ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। পরে নীলকররা চাষীদের ওপর অন্যায় জুলুম চাপিয়ে শোষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বাধ্যতামূলক নীলচাষ, আগাম অল্প মূল্যে দাদন দেওয়া ও নীলচাষের জমিতে অতিরিক্ত করভার ইত্যাদি শোষণে ব্রিটিশ শাসকবর্গ যখন তৎপর, সেইকালেই সারাটী-মায়াপুরে খোলা হয়েছিল নীলকুঠি। বাংলার আর্থিক ইতিহাসের গবেষক সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, ১৮৪৭ থেকে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে নীলের কারবার মূলতঃ কৃষক-শোষণ করে টিকেছিল।[১৮] এই প্রেক্ষাপটে আমরা অনায়াসে ভেবে নিতে পারি, কৃষিপ্রধান সারাটি-মায়াপুরের শ্রমজীবী মানুষকে সেই শোষণের শিকার হয়ে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল। সারাটী-মায়াপুরের নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-শোষণের স্বাক্ষর বহন করছে।[১৯] [ক্রমশঃ]



সারাটী-মায়াপুরে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ

আলোকচিত্র ঃ শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৭ Gazetteer of India; West Bengal: Hooghly—Amiya Kumar Banerjee, West Bengal District Gazetteers, Calcutta, 1972, p. 654

১৮ দ্রঃ বাংলার আর্থিক ইতিহাস—সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ৭৮

১৯ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ—সুধীরকুমার মিত্র, ১ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ১২২

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের স্টীমার-ভ্রমণ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্টীমার-ভ্রমণ নিয়ে দুটি চিঠি 'প্রাসঙ্গিকী'তে (ফাল্গুন ১৪০২, পৃঃ ৯৩-৯৪) পড়লাম। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৫ জুলাই, শুক্রবার, ১৮৮১-র স্টীমার-ভ্রমণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ছিলেন তা আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পেয়েছি। শুধু তাই নয়, 'উদ্বোধন'-এর এই সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৪০২) 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' (ভাষান্তর ঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু) স্মৃতিকথাটিতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখছেন ঃ "১৮৮১ সালের জুলাই মাসে তাঁকে দেখেছি—উনিশ বছরের তরুণ বালক তখন আমি। তাঁকে দেখেছি কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে।... কেশবের জামাতা, কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের ছোট একটি স্টীমারে (বাষ্পীয় নৌকা বলাই ঠিক) আমরা ছিলাম। দক্ষিণেশ্বর থেকে পরমহংস তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়কে নিয়ে উঠলেন।" (পৃঃ ৬৬)

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ঠিকই লিখেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণকে নগেন্দ্রনাথ একাধিকবার দর্শন করেন—ঠিকভাবে বলতে গেলে দুবার; আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে, মর্ত্যজীবনে একবার এবং মহাপ্রয়াণের পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রাঙ্গণে পরম শান্তিতে শায়িত অবস্থায় আরেকবার।" (আশ্বিন ১৪০২, পৃঃ ৫৪০)। অধ্যাপক বসুর এই কথার সমর্থন পাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্মৃতিকথায় ঃ "রামকৃষ্ণকে দর্শন করার অল্প পরে আমাকে ভারতের অন্যত্র করাচীতে চলে যেতে হয়। আমি তাঁকে জীবিত অবস্থায় আর দেখিনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসের মহাসমাধির দিন, ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, আমি কলকাতায় ছিলাম।... গাড়ি করে আমি সোজা কাশীপুর বাগানবাটীতে পৌঁছালাম।... দেখলাম, গাড়িবারান্দার সামনে মুক্ত আকাশের নিচে তাঁর মরদেহ খাটিয়ায় সুন্দর একটি বিছানার চাদরের ওপরে স্থাপিত, দেহ শুভ্রচাদরে ঢাকা, তার ওপরে ফুলের রাশি।" (ফাল্গুন ১৪০২, পৃঃ ৬৮) নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই স্মৃতিকথাটি ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালের আগে অর্থাৎ যে ১৯২৭ সালে লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'মডার্ন রিভিউ'-এ 'এ ডে উইথ রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে সেই প্রবন্ধের বাঙলা অনুবাদ করেন অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ('রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে একদিন')। 'উদ্বোধন'-এর ফাল্গুন ১৩৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখছেন ঃ "১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন (একদিন) একটি বেশ বড় দল নিয়ে তাঁর জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভূপের স্টীমারে চড়ে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য, সে-দলে আমিও ছিলাম। আমরা দক্ষিণেশ্বরে নামিনি—পরমহংস তাঁর ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে জাহাজে এসে উঠেছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিল আমাদের জন্য একঝুড়ি মুড়ি আর কিছু সন্দেশ। স্টীমারে তাঁকে নিয়ে আমরা সোমরা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।... কিছুদূরে জাহাজের ক্যাপস্টানের (নাটাই) ওপর উপবিষ্ট সাহেবী পোশাক-পরা এক তরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি কে? ওঁকে সাহেব সাহেব দেখছি।' মৃদু হেসে কেশব তরুণটির পরিচয় দিয়ে বললেন যে, সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি সবেমাত্র ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। পরমহংস হেসে বললেন, 'তাই বল মশাই, সাহেব দেখলে ভয় করে কিনা!' সেই যুবকটি হলেন কুচবিহারের কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ [ভূপ], যিনি কিছুকাল পরে কেশবের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন।" (পৃঃ ৯১)

ঐ স্টীমার-ভ্রমণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। স্টীমার-ভ্রমণ শেষ হয়েছিল সন্ধ্যার সময়—"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমরা পরমহংসকে দক্ষিণেশ্বরে নামিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে এলাম।" (পৃঃ ৯২)

সলিল মুখোপাধ্যায়
কোল কমপ্লেক্স টাউনশিপ
ডানকুনি, হুগলী

নতুন বছরের প্রচ্ছদ

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ সংখ্যার (১৪০২) প্রচ্ছদে হংসেশ্বরী-মন্দিরের ছবি দেখে ও ভিতরে প্রচ্ছদ-পরিচিতি পড়ে এই মন্দির সম্পর্কে এবং হংসেশ্বরী-মূর্তি সম্পর্কে আরও কিছু জানার কৌতূহল জন্মাল। দেবীর নাম কেন হংসেশ্বরী হলো তা জানতে ইচ্ছা হয়। 'উদ্বোধন'-এর পাতায় দেবীর মূর্তিরহস্য ও সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃততর ব্যাখ্যা-সম্বলিত প্রবন্ধ বা আলোচনা পেলে আমার প্রত্যাশা চরিতার্থ হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'কালিকাসহস্রনামস্তোত্রে' 'হংসেশ্বরী' নামটি রয়েছে—"হংসেশ্বরী ত্রিকোণস্থা শাকম্ভর্যনুকম্পিনী"। অধিকন্তু 'ভগবত্যাঃ সহস্রনামস্তোত্রে'ও পরোক্ষ উল্লেখে 'হংস' শব্দটি দৃষ্ট হয়—"শাস্ত্রেষু ভারতী নীতিঃ পরহংসেষু ভাবিতঃ"।

'হংস' শব্দের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তো আছেনই। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক-মধ্যস্থ জ্ঞানসূর্য-ভক্তিপদ্ম-কর্মজলতরঙ্গ-কুণ্ডলিনীভুজঙ্গ পরিভাবিত পরমাত্মা-হংসও আমাদের মনকে নন্দিত করে। পরিশেষে হংসেশ্বরী-মন্দিরশোভিত এই সুন্দর প্রচ্ছদ নির্বাচনের জন্য 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদককে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

ভূপেশ দাস
ব্যানার্জীপাড়া রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৭০০ ০৪১

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন' পড়ে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। 'উদ্বোধন' সত্যিই দিন দিন এক অমূল্য মাসিক পত্রিকায় পরিণত হচ্ছে। 'উদ্বোধন'-এর 'কথাপ্রসঙ্গে', 'ভাষণ', 'অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ', 'স্মৃতিকথা', 'পরিক্রমা', 'পরমপদকমলে' এবং 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আজকের সমাজকে আদর্শহীনতা চূড়ান্তভাবে গ্রাস করে ফেলছে। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নয়, ন্যায়-নীতি-সত্য ও মূল্যবোধের আদর্শে তাদের কোন আস্থা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগঠনমূলক ও আদর্শবাদী সাহিত্য-প্রচারের খুব প্রয়োজন। 'উদ্বোধন' এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রায় শতবর্ষ ধরে মানুষের কাছে উচ্চ আদর্শের প্রচার করে চলেছে। আমাদের মনে হয়, আমাদের যুবসমাজ যদি 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে পরিচিত হতো, তাহলে তাদের মধ্যে আদর্শহীনতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়কে প্রতিরোধ করতে পারত।

প্রফুল্ল পালচৌধুরী
নস্করপাড়া লেন,
বোটানিক্যাল গার্ডেন
শিবপুর, হাওড়া-৭১১১০৩

গত পৌষ ১৪০২ সংখ্যায় 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'শ্রীশ্রীমা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ইষ্টপথের সহায়িকা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধটি অধীর আগ্রহে পড়েছি। মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ এবং উপমার হৃদয়গ্রাহী প্রয়োগ আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। রচনাটি পড়তে গিয়ে মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে, তা হলো— বিবাহের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স কত ছিল? এবিষয়ে আলোকপাত আগামী কোন সংখ্যায় করলে বাধিত হব।

সুনীলকুমার রুদ্র
ফিডার রোড,
আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭

[বিবাহের সময়, 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'চতুর্বিংশতি বর্ষে' পদার্পণ করেছিলেন।—সম্পাদক, উদ্বোধন]

পৌষ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন' আদ্যোপান্ত পাঠ করে যারপরনাই অভিভূত হয়েছি। 'কথাপ্রসঙ্গে' আলোচিত 'শ্রীশ্রীমা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-ইষ্টপথের সহায়িকা' নিবন্ধটি এত ভাল লেগেছে যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। এই নিবন্ধটি পড়ে মনের অনেক কিছু জিজ্ঞাসারই উত্তর পেয়েছি।

হরিপদ দত্ত
নর্থ হিল ভিউ,
আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩৩০৪

আমার বয়স অল্প হলেও এই যুবা বয়সে আমি সাংসারিক আঘাত এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার দরুন হয়ে পড়েছিলাম মনোরুদ্ধ এবং দিশেহারা। যখন একেবারে সহ্যের শেষ সীমায় চলে যাই তখন হাতে পেলাম 'উদ্বোধন'। পড়তে শুরু করলাম। 'উদ্বোধন'-এ পেলাম শাশ্বত পথের সন্ধান। ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে ভালবাসতাম, কিন্তু গভীরভাবে নয়; তার কারণ অজ্ঞতা। এরপর নতুন করে নিজের পড়াশুনা ও কর্মজীবন শুরু করলাম। স্বামীজীর রচনাবলী বাড়ির আলমারিতে ছোট্ট থেকে দেখে আসছি। কিন্তু ভেবেছি, বড় শক্ত জিনিস। কিন্তু 'উদ্বোধন', বিশেষ করে 'কথাপ্রসঙ্গে' আমাকে বাধ্য করেছে স্বামীজীর রচনা পড়তে। পড়ে পেয়েছি অমৃতখনির সন্ধান, পেয়েছি চলার পথে নির্দিষ্ট নির্দেশ। 'উদ্বোধন'-এ শ্রীশ্রীমায়ের কথা পড়ে যা শান্তি ও আনন্দ পেয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না। এখন আমি প্রতিদিন 'কথামৃত' পাঠ করি, কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার বুঝি না। এক-একবার একই জিনিসের বিভিন্ন মানে পাই। গত কার্তিক ১৪০২ সংখ্যায় দেখলাম, স্বামী নির্বাণানন্দ বলছেন—বুঝি না বুঝি 'কথামৃত' রোজ পড়তে হবে; রোজ 'কথামৃত' পড়লে রোজই নতুনতর অর্থ মনে আসবে। পড়ে বল পেলাম, প্রবল প্রেরণা পেলাম। নতুন আলো পেলাম। 'উদ্বোধন'-এর জন্যই ফিরে এসেছি আলো আর অমৃতের জগতে। বর্তমান যুবসমাজের দিকে চেয়ে মনে হয়, স্বামীজীর শঙ্খনাদস্বরূপ 'উদ্বোধন'-এর আহ্বান কি এরা শুনতে পায় না?

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়
হরিমোহন গোস্বামী স্ট্রীট
পোঃ শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'

বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এই শব্দগুচ্ছ মন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু উপনিষদাদির মন্ত্রাদি সম্বন্ধে আমার যা সামান্য খোঁজখবর নেওয়া আছে তা থেকে আমার ধারণা, এই শব্দগুচ্ছ কোন ঔপনিষদিক মন্ত্রের অংশ নয়। তার মূল কারণ, সম্ভবতঃ 'সুন্দরম্' শব্দটি কোন পরম তত্ত্বের বাচক নয়, যা অন্য দুটি শব্দ 'সত্যম্' এবং 'শিবম্' প্রকাশ করে। উপনিষদাদিতে কোথাও 'সুন্দরম্' শব্দটি নজরে পড়েনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এই শব্দগুচ্ছ কার বা কাদের রচনা এবং কোন্ সময় থেকে এই শব্দগুচ্ছ প্রচারিত হলো ও জনপ্রিয়তা অর্জন করল? এপ্রসঙ্গে কেউ যদি কিছু আলোকপাত করেন তবে কৃতজ্ঞ থাকব।

অরুণেশ কুণ্ডু
শ্যামানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০০২৫

প্রাণের লণ্ঠনে চৈতন্যের আলো

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করেছেন, তিনি নরলীলা সমাপ্ত করে উৎসে ফিরে যাবেন। চোখের সামনে দেখছেন, বিপ্রশাপে যদুবংশ ধ্বংস হচ্ছে। লৌহমুষল সমুদ্রগর্ভে। কালে সেই মুষল থেকে হবে বাণ। ব্যাধের ভ্রমে প্রভু বাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাবেন। সবই জানেন, পারেন; কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা নেই। কারণ, কাজ শেষ। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন: "ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্যমশেষতঃ।/ যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥"—আমি সন্তুষ্ট। ব্রহ্মার অনুরোধে যে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অংশাবতার বলরামের সঙ্গে এই সংসারে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, দেবগণের অভিপ্রেত ভূভারহরণরূপ সেই কাজ আমি সম্পূর্ণ সম্পাদন করেছি। আমি তৃপ্ত। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান—এবংবিধ সন্ধিক্ষণে আমার অবতাররূপে অবতরণ। পাপ ধ্বংস করেছি, অনাগত কালের হাতে সব সমর্পণ করে আমার প্রয়াণ। আমিও নিহত হব।

ছায়ার মতো সদাসঙ্গী উদ্ধব বড় কাতর হয়েছেন। কেমন করে সহ্য করবেন এই চিরবিচ্ছেদ। কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন: "নাহং তবাঙ্‌ঘ্রিকমলং ক্ষণার্ধমপি কেশব।/ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥"—হে কেশব, আমি সামান্য সময়ের জন্যও তোমার চরণকমল ছেড়ে দূরে থাকার সাহস পাই না। হে প্রভু, তুমি আমাকেও তোমার স্বধামে নিয়ে চল।

সে তো হওয়ার নয়, উদ্ধব! আমার অবর্তমানেও তোমাকে থাকতে হবে। কাল পূর্ণ করে যেতে হবে—কালের এই নিয়ম। উদ্ধব তখন অনুরোধ করছেন: প্রভু! বলে যাও, তোমার অবর্তমানে আমি কিভাবে থাকব। মনকে কিভাবে সংযত, সংযুত করব। ভগবান তখন উপদেশ দিচ্ছেন: "ত্বং তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।/ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্॥"—শব্দাদি বিষয় থেকে মন তুলে নাও, আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতা ত্যাগ কর। সমদৃক্ অর্থাৎ সমদর্শী হও। সমদর্শী মানে, জগতের সমস্ত কিছু ব্রহ্ম হতে অভিন্ন—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তারপর, মনঃ ময়ি সম্যক্ আবেশ্য— মনকে সর্বতোভাবে আমার চিন্তায় নিবিষ্ট রাখ।

উদ্ধব তখন চিরকালের মানুষের এক চিরসংশয় ব্যক্ত করলেন: প্রভু! সমদৃক্ হওয়া কি সহজ কথা? এই সংসারে ভাল আর মন্দ মিলেমিশে আছে। যেখানে নির্গুণ বা নির্দোষ কোন বস্তু বা ব্যাপার নেই, সেখানে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে বিচরণ করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে।

এ প্রশ্ন একা উদ্ধবের নয়, এ প্রশ্ন আমাদেরও। সমদর্শী হওয়া কি সহজ কথা! ভগবান তখন বলছেন: উদ্ধব! তুমি তো তোমার জগৎকে তোমার ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখছ, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচার করছ। তারা যেমন বোঝাচ্ছে সেইরকম বুঝছ: "যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।/নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়া-মনোময়ম্॥"—এই যাকিছু মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, সেসবই মনের দ্বারা কল্পিত। অতএব উদ্ধব, সেসবই মায়াময় এবং নশ্বর বলে জানবে। শুধু জানাতেই শেষ নয়, তোমাকে সাধন করতে হবে; যেমন, ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত কর, তোমাকে বাঁদর নাচালেই নাচবে না, তারপর চিত্তকে একাগ্র করে এই বিস্তৃত জগৎকে নিজের আত্মায় দর্শন কর: "তস্মাদ্ যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামো যুক্তচিত্ত ইদং জগৎ।/আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥"—নিজেকে সবকিছুর অধিপতি ব্রহ্মস্বরূপ আমার মধ্যে দর্শন কর।

দুটো পথ, সংযম ও একাগ্র ধ্যান। এর ফলে কি হবে? —মায়া সরে যাবে। শল্যচিকিৎসায় ছানি অপসৃত হবে, তখন দেখবে তুমি নেই, তিনিই আছেন। তিনি তুমি হয়ে বসে আছেন। 'ঘট ঘটমে লেটা'। ধ্যান থেকে ধারণা আসবে।

উপনিষদের কথা—"তত্ত্বমসি"। তৎ ত্বম্ অসি। 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম, 'ত্বম্' মানে তুমি জীব। 'অসি', অর্থাৎ হও। তুমি ব্রহ্ম হও। বড় কঠিন অনুশীলন! ধারণাতেই আসে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতেই প্রকাশিত! জগৎ মায়া। যা ভয়ঙ্করভাবে আছে বলে মনে হচ্ছে, সেটা স্বপ্ন। দীর্ঘ একটা স্বপ্ন। এই যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছি, এটা স্বপ্ন। কেটে গেছে, ওষুধ লাগাচ্ছি, এটা স্বপ্ন। রোজ অফিসে গিয়ে চেয়ারে বসে কাজ করি, এটাও নিত্য স্বপ্ন। এই দেহ, এটা মায়া। চিমটি কাটলে লাগে, ওটা ভুল। চিমটিও নেই, লাগাও নেই। আমিই তো নেই। আমি জন্মাইনি, আমি মরিওনি। বাড়ি করেছি, নেমপ্লেটে নাম লিখেছি। এ হলো, যে নেই তার বাড়ি, তার নাম। লকারে যত সেভিংস সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের পাশবই —ও সব মায়া, কাগজ মাত্র। পোড়া দড়ির ছাই লম্বা হয়ে দড়ির মতোই পড়ে আছে। হাত দিয়ে তুলতে গেলেই সব ভুস। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধুবান্ধব যাবতীয় সম্পর্ক স্বপ্ন। স্বপ্নে বাঘ দেখছি, স্বপ্নে পরিবার সোহাগ করছে, হেঁচকি তুলে মরে যাচ্ছি, স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠছি।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী অদ্বৈত সন্ন্যাসী ছিলেন। পরে মহাপ্রভুর কাছে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। বেদান্তমতে ব্রহ্ম ও জীব অভেদ। দুই বিভু। তাই মহাবাক্য "তত্ত্বমসি"। এই তৎ ও ত্বম্ সমান বিভক্তি, কর্মধারয় সমাস। প্রবোধানন্দের মহা সংশয়। প্রবোধানন্দ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করছেন: "তত্ত্বমসি" মাথায় ঢুকছে না। জীব অণু! অণু কেমন করে ব্রহ্ম হবে? বিন্দু কোন্ আক্কেলে বলে, আমি সিন্ধু। মহাপ্রভু বলেছিলেন: এ তো সোজা! কর্মধারয় সমাসে না ভেবে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করলেই তো সব সংশয়ের অবসান—তস্য ত্বম্ অসি, সেই তত্ত্বমসি-ই হবে। তুমি তাঁর। অণু তুমি, তাঁর দাস।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আসায় আধুনিক মানুষের ধর্মের যাবতীয় শুকনো ধাঁধা ও কচকচি থেকে মুক্তি হলো। ঠাকুর জানতেন বিজ্ঞান আরও গাঢ় হবে, টেকনোলজির চূড়ান্ত হবে, সন্ন্যাস আশ্রম টলমলে হবে, মানুষ ভোগের সংসারে আচারের আমের মতো জরে থাকবে। ধর্মটাও টেকনোলজির কল্যাণে মেকানিক্যাল হয়ে যাবে, ক্যাসেটে আরতি হবে, প্রদীপের বদলে টুনিবাল্ব জ্বলবে, শাঁখে ফুঁ দিলে করে ফুঁসফুঁস করবে, পোঁ আর বেরোবে না। দেবদেবীরা বুফে সিস্টেমে নৈবেদ্য গ্রহণ করবেন। বারোয়ারিতে প্রতিমার চেয়ে প্যান্ডেলের এলাহি চেকনাই ক্রমশঃ বাড়বে। চন্দননগরের আলোর কেরামতিতে ডাইনোসর গলা দোলাবে। জানতেন তিনি। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তত্ত্বমসি, মায়াবাদ প্রভৃতি কথা অলৌকিক শোনাবে। মানুষ আকাশের ঈশ্বর ছেড়ে কাম-কাঞ্চনের পিছনে ছুটবে। ভূমার চেয়ে ভূমি মূল্যবান হবে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনার ভেলকি দেখাতে আসেননি। কখনো কোন সিদ্ধাই হঠাৎ প্রকাশিত হলে 'ও কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিতেন। গ্রাম্য গালাগাল দিয়ে বলতেন, সিদ্ধাই হলো ধামাপোঁদো বেশ্যার বিষ্ঠা ত্যাগ। তিনি গুরুও হতে আসেননি। এসেছিলেন চিরকালের মানুষের চিরবন্ধু হতে। শাস্ত্র, যুক্তি, তর্ক নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। জোরের ধর্ম, তর্কের ধর্ম, ন্যায়ের ধর্ম, ইলাইট ধর্ম, শুকনো ধর্ম—সব টান মেরে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে মায়ার ব্যাখা করলেন, কাম আর কাঞ্চন।

তুমি সত্য, তোমার দেহ সত্য, জগৎ, জীবিকা, পরিবার পরিজন সব সত্য। প্রবল ইন্দ্রিয় সত্য, ভোগ সত্য, আত্মিক লড়াই সত্য, দারিদ্র্য সত্য, প্রাচুর্য সত্য, খল, লোচ্চা, শয়তান, সাধু সব সত্য। জ্ঞান সত্য, বিজ্ঞান সত্য, জড় সত্য, চিৎও সত্য। জগৎ ঠিক যেমনটি দেখছ, তেমনই সত্য। তোমার সংস্কার, তোমার প্রবণতাও সত্য। বাস্তব জগৎ বাস্তবিকই আছে। জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে। অধঃ, উর্ধ্ব আছে। বুদ্ধির স্তরভেদ আছে, আধারের বড় ছোট আছে। হজমশক্তি বিভিন্ন। যার পেটে যেমন সয়, মাছের রান্না ও পরিবেশন সেইভাবেই হবে। ধর্ম মানে 'ড্রিল' নয়, ধর্ম মানে টান। ধর্ম মানে সৎ, সুন্দর, চৈতন্যময় জীবনের আহ্বান। স্বজনে নির্জনতার সন্ধান, প্রকৃত বন্ধুর সন্ধান। নিরাকার আকাশ অথবা সাকার কোন প্রেমঘন মূর্তি—উভয়ই সত্য। সাত্ত্বিকের সংসার কোঁদলে ভরা আশ্রমের চেয়ে ভাল। ঘৃণা-দুখচেটে, তেলচিটে, লক্ষ্মীছাড়ার সংসার নয়; শুকনো সন্ন্যাস নয়, রসেবশের জীবনই জীবন। অস্ত্র হলো বিচার। জয় করতে হবে ভয়। আসক্তিই ভয়ের কারণ। আকাঙ্ক্ষা ধিকিধিকি আগুন। আশকারা পেলেই যা বাড়ে—কাম, বিষয়তৃষ্ণা, আলস্য, অহঙ্কার। বিচার হলো সেই স্পন্দন যা বিবেকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। বিবেক সেই অমোঘ যুক্তি দেয়, এগিয়ে দেখ। জীবনের পাওনা ক্রমেই বাড়বে। অনিত্য থেকে নিত্যের দিকে নিয়ে যাবে, বিষয়ানন্দ থেকে দিব্যানন্দে। মৃত্যুকে স্মরণ কর। রোজ একবার ভাব—আজ আছি কাল নেই। কাঠবিড়ালির মতো কোটরে বাদাম কার জন্য সঞ্চয় করছ? জ্ঞান ও বিদ্যাকে দুখণ্ড করো। জীবিকার জন্য ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। জীবনকে সহজ করার জন্য যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" পেটবৈরাগী কাশী থেকে পরিবারকে চিঠি লেখে—গেরুয়া গঙ্গায় ভাসাইলাম, চাকুরি পাইয়াছি, বাসা ঠিক করিয়া তোমাকে শীঘ্রই লইয়া আসিব। আগে সংসার কর, একটু একটু ভোগ কর। স্বদারা-সহবাস অনুমোদিত, সংসার কর্তব্য, বিবাহ দশবিধ সংস্কারের এক সংস্কার। এধারটা দেখে নিয়ে জ্ঞানের অপর খণ্ডটি বের কর। চিনি থেকে বালি সরাও, দুধ থেকে জল। অনিত্য থেকে নিত্যকে বের কর। বৈরাগ্যে শান দাও। দেনাপাওনার ক্ষুদ্র সংস্কারকে চূর্ণ করে মহাকালের প্রান্তরে বেরিয়ে এস। অহং আমি-কে দাস আমি কর, জ্ঞানদাস —থাক শালা দাস আমি হয়ে, তস্য ত্বম্ অসি, তত্ত্বমসি। শরণাগত, কিন্তু ফোঁস ছাড়লে চলবে না। তুমিই তোমার গুরু। আত্মাই আত্মার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। নিজেকে তৈরি কর, বানাও। ভক্তির ময়ান দিয়ে সংযমে ঠাস, সঙ্কল্পের আঁচে ফেল, দেবভোগ্য হও। সংসারের সব খিটকেল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। মৃত্যু নয়—মুক্তির আনন্দে, শবরূপী জীবনের ওপর তুমি নাচবে মহাকালীর মতো। প্রাণের লণ্ঠনে জ্বাল চৈতন্যের আলো। এই হলেন আমার ঠাকুর!□

অনুষ্ঠান-সূচী (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৩)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)
পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতিবার	১৬ মে	১৯৯৬
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৮ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার	১ জুন	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১৫, ২৮ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার, মঙ্গলবার	২৯ মে, ১১ জুন ১৯৯৬
১৩, ২৭ আষাঢ়	শুক্রবার, শুক্রবার	২৭ জুন, ১১ জুলাই ১৯৯৬

অ্যাকোয়াকালচারে বা জলজপ্রাণিচাষে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

এন. বালকৃষ্ণন নায়ার

সারা পৃথিবীতে মাছের যোগান প্রায় তুঙ্গে পৌঁছেছে। সমুদ্র থেকে মাছ তোলা হচ্ছে প্রায় নয় কোটি টন। তবে ইউরোপে সামুদ্রিক মাছ তোলার পরিমাণ ১৯৮৫ সাল থেকে কমেছে, কারণ সমুদ্রে মাছের মজুদ কমে যাওয়ায় মাছ ধরার প্রতিষ্ঠানগুলিকে মাছ তোলার আনুপাতিক অংশ (quota) বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এমনকি কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে মাছ ধরা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। মাছের মজুদ কমে যাওয়ার ঘটনা ভারতের বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মাছ ধরার প্রতিষ্ঠান-গুলিতেও হচ্ছে। সমুদ্র থেকে বেশি মাছ তোলার জন্যই অনেক জায়গায় সামুদ্রিক মাছের মজুদ কমে গেছে। অন্যদিকে আবার সারা পৃথিবীতে ডানাওয়ালা মাছের (fin fish) বা খোলাওয়ালা মাছের (shell fish) চাহিদা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পথ হচ্ছে অ্যাকোয়াকালচার (aquaculture) বা জলজপ্রাণিচাষ। এতে মাছচাষের একটা সুবিধা এই যে, এতে সীমাবদ্ধ এলাকায় মাছ ধরার প্রতিষ্ঠানগুলিতে (captive fisheries) যেমন এ ওর সীমানায় গিয়ে মাছ ধরার জন্য যেরূপ গোলমাল হয়, অ্যাকোয়াকালচারের প্রতিষ্ঠানগুলির সীমানা বেঁধে দেওয়া থাকে বলে সেরূপ গোলমালের সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া, সমুদ্রে মাছের মজুদ অনেক জায়গায় কমে যাওয়ায় হ্যাচারিতে (hatchery—কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটিয়ে ছানা উৎপাদনের স্থান) মাছের ডিম ফুটিয়ে ছোট মাছ সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটা অ্যাকোয়া-কালচারের পর্যায়ে পড়ে। আমেরিকায় খাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেখানে লোকে লাল মাংস (red meat—ছাগল, গরু, শুয়োর প্রভৃতির মাংস) খাওয়ার চেয়ে সমুদ্রজাত খাদ্য বা গৃহপালিত পাখির (poultry) মাংস বেশি পছন্দ করছে। অ্যাকোয়া-কালচারের প্রযুক্তিবিদ্যা এখন এত অগ্রসর হয়েছে যে, যেখানেই জল ও আলো পাওয়া যায়, সেখানেই মাছচাষ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এদুটিই প্রচুর আছে; এখানকার টাটকা জল (fresh water), লবণাক্ত জল (brackish water) ও সমুদ্রের জল মাছচাষে ব্যবহার করা যেতে পারে। সারা পৃথিবীতে এখন চাষ করা মাছের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় কোটি টন। এর ষাট শতাংশ হয় এশিয়াতে এবং এব্যাপারে চীন ও ভারতের অবদান অনেক। ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে এখানে একধরনের মাছ (টাটকা জলে যেসব মাছ জন্মায়) প্রচুর চাষ করা যেতে পারে। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের অগভীর জলাশয়ে বা হ্রদের জলে অ্যাকোয়াকালচারের প্রচুর সুযোগ; এখানে বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি উৎপাদন করা যেতে পারে। অ্যাকোয়াকালচারে উৎপাদিত এইসব প্রাণী পুষ্টির দিক থেকে খামারে উৎপাদিত প্রাণীদের (farm animals) চেয়ে ভাল। তাছাড়া জলজপ্রাণিচাষে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি হবে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির শূন্য ভাণ্ডারকে পূর্ণ করা যাবে।

মাছচাষ ভারতে নতুন নয়। তবে একে খাদ্যাভাব-পূরণের জন্য কাজে লাগানো এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবসায়ভিত্তিক শিল্প হিসাবে গড়ে তোলাটা নতুন ব্যাপার। এর জন্য ১৯৪৭ সালে 'সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ' স্থাপিত হয়েছে। বহু রাজ্যে বিরাট বিরাট জলা জায়গা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া হ্রদ, পুকুর প্রভৃতি মিলিয়ে আছে প্রায় ৭৫ লক্ষ একর (১ একর=৩ বিঘা) জায়গা। উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এইসব স্থানে ডানাওয়ালা ও খোলাওয়ালা মাছ চাষ করা যেতে পারে। আবার একই জলাশয়ে দ্রুতবৃদ্ধিশীল বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসের মাছ একসঙ্গে বড় করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিকে 'পলি-কালচার' বা 'মিশ্রিত মাছচাষ' (mixed fish farming) বলে। চীনারা প্রথমে এটি চালু করলেও এখন বিভিন্ন দেশে এই প্রথায় মাছচাষ চলছে। জলা জায়গাগুলিতে (marshy lands) হাওয়ায় শ্বাসগ্রহণকারী (airbreathing) আমিষভোজী মাছ যেমন কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি পালন করা যেতে পারে; খরচও এতে বেশি পড়ে না। যেসব ধানক্ষেতে তিন থেকে আট মাস জল জমে থাকে বা ধান কাটার পরে যেসব মাঠ জলে ডুবে থাকে সেখানেও মাছচাষ করা যেতে পারে। তবে

ধানচাষে আজকাল যথেষ্ট কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, যা মাছচাষের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্প্রতি টাটকা জলে জন্মায় এমন এক ধরনের (genus Macrobrachium) বাগদা চিংড়ি চাষ খুব চালু হয়েছে, কারণ পেটে ডিম-ভরা এই স্ত্রী-চিংড়ি প্রায় সারা বছর পাওয়া যায়, এদের ডিম থেকে তাড়াতাড়ি বাচ্চা হয় এবং এরা বাড়েও তাড়াতাড়ি। এই মাছের সঙ্গে নানাধরনের পোনা মাছও চাষ করা যেতে পারে। ছয় মাসেই এই চিংড়ি ধরবার মতো বড় হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় এর চাহিদা খুব বেশি। জাপান ও পশ্চিম ইউরোপে বাণ মাছ ও পাঁকাল মাছের (eel) খুব চাহিদা। এই মাছের চারা অনেক নদীতে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে প্রচুর পাওয়া যায়। এক বছরে এই মাছ ২০০-৩০০ গ্রাম ওজনের হয় এবং বিদেশের বাজারে ১ কিলোর (৬ হাজার চারামাছ) দাম ১৮০০ ডলার। জম্মু ও কাশ্মীরে এখন রুই মাছের চাষ আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশ থেকে বিদেশে নিয়মিতভাবে ব্যাঙ চালান যেতে পারে; তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ বজায় রাখার জন্যও ব্যাঙচাষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সারা পৃথিবীতে বাহারে মাছের (ornamental fish) কারবারে ৬০ কোটি ডলারের আদান-প্রদান হয়, কিন্তু এতে ভারতের অবদান নগণ্য। আমাদের দেশে টাটকা জলে ও সমুদ্রে এধরনের মাছ অনেক আছে এবং এর চালান দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এদেশে নদীর মোহনায় প্রচুর কাঁকড়া পাওয়া যায়, তবে এর চাষের অসুবিধা হচ্ছে যে, এদের খাওয়াতে প্রচুর খরচ পড়ে।

যেসব প্রাণী সমুদ্রের জলে চাষ (mariculture) করা যেতে পারে সেগুলি হলো—গলদা চিংড়ি, ঝিনুক, খোলকী শামুক (clams) এবং সামুদ্রিক আগাছা। ভারতীয় গলদা চিংড়ি যা মাদ্রাজের সমুদ্রের পাহাড়ী উপকূলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তা খুবই সুস্বাদু। সমুদ্রে এদের ছানা ধরে ২০০ দিনে বড় করা যেতে পারে। সুস্বাদু বলে পৃথিবীতে এর চাহিদা প্রায় ৬০ কোটি ডলার মূল্যের। খাদ্যোপযোগী ঝিনুক সমুদ্রোপকূলে প্রচুর পাওয়া যায় এবং এর চাষ করাও যেতে পারে। এই ঝিনুকের লেনদেনে বিশ্ববাজারে ৪.৭ কোটি ডলার খাটে। ভারতে মুক্তাধারী ঝিনুকও পাওয়া যায় এবং এর চাষও আরম্ভ হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য হিসাবে এবং রাসায়নিক কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৩০ লক্ষ টন সামুদ্রিক আগাছা। এদের মধ্যে আর্থিক লাভকারী কয়েক ধরনের আগাছা চাষ করা যেতে পারে।

পৃথিবীতে নানা জায়গায় নতুন ধরনের মাছচাষের কারখানা গড়ে উঠেছে, যেগুলির উন্নতি করার সুযোগ অসীম। আমাদেরও এব্যাপারে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা আহরণ করা উচিত; কারণ, সারা বিশ্বে মাছের ব্যবসায়ে ৩০ বিলিয়ন (এক বিলিয়নকে লক্ষ কোটি না ধরে একশ কোটি বলে ধরা হয়) ডলার খাটে। ফিলিপাইন্স-এ প্রতি বছর হেক্টর প্রতি এলাকায় প্রায় ৬০০ টন তেলাপিয়া মাছ তোলা হয়, তাইওয়ানের জেলেরা হেক্টর প্রতি বড় চিংড়ি (tiger prawn) তোলে ২০ টন, জার্মানিতে হেক্টর প্রতি পোনা মাছ উৎপাদিত হয় ১৫০ টন। দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে ১৯৯১-১৯৯২ সালে মাছের উৎপাদন অনেক বেড়েছে; এই কালে সামগ্রিকভাবে ৪১ লক্ষ টন মাছ তোলা হয়েছিল, যার মধ্যে ২১.৪ লক্ষ টন ছিল সামুদ্রিক মাছ।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদনে সম্ভাবনা

জলজপ্রাণিচাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মাছের মধ্যে বাগদা ও ছোট চিংড়ির বাজারদাম বেশি (কেজি প্রতি প্রায় ২৬ ডলার) হওয়ার জন্য এদুটির ওপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়। পৃথিবীর ধনী জাতিগুলির প্রিয় খাদ্য হওয়ায় এদুটি বাজারে আসতে না আসতেই বিক্রি হয়ে যায়; সেজন্য সামুদ্রিক মাছের বাজারে এদের আদুরে নাম 'ডার্লিং' বা প্রিয়তম। আগামী দশ বছরে এই মাছের চাহিদা দ্বিগুণ হবে বলে মনে হচ্ছে। ভারতের সমুদ্রোপকূলে প্রায় ১৫ লক্ষ হেক্টর নোনা জলাভূমি আছে, যার ১০ লক্ষ হেক্টরে জলজপ্রাণিচাষ করা যেতে পারে। এর মধ্যে মাত্র ৪৪ হাজার হেক্টরে পুরনো পদ্ধতিতে মাছ-চাষ হয়, যার বেশির ভাগ পশ্চিমবঙ্গে (২৫০০০ হেক্টর), কেরালায় (৬০০০ হেক্টর), কর্ণাটকে (৮০০০ হেক্টর) এবং গোয়ায় (৫০০০ হেক্টর)। দুঃখের বিষয়, যেখানে মাছ উৎপাদন করা হয়, সেখানেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুব কম। আমাদের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। সুন্দরবন (৪ লক্ষ হেক্টর) এব্যাপারে একটি উপযোগী এলাকা। এখানে বড় বাগদা চিংড়ি (tiger prawn) উৎপাদনের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদে, অন্ধ্রপ্রদেশে, তামিলনাড়ুতে, কেরালায় ও গুজরাটে চিংড়ি মাছ চাষে জোর দেওয়া হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে ৮০ হাজার হেক্টর এবং কর্ণাটকে ৮ হাজার হেক্টর নোনা জলাভূমি রয়েছে।

বর্তমানে পুরনো পদ্ধতিতে সমুদ্রোপকূলে (বাংলার ভেড়িতে ও কেরালার 'পক্কালি মাঠে') জোয়ারের জল ধরে রাখা হয়। সেখানে অক্টোবর-মে মাসে যখন জলে লবণের ভাগ বেশি থাকে তখন চিংড়ি মাছ চাষ করা হয়; লবণের ভাগ কমে গেলে ঐসব জায়গায় ধানচাষ করা হয়। চাষিরা ফুরন করে (হেক্টর প্রতি প্রায় ৬০০০ টাকা) জমি দখল করে। জোয়ারের জলের সঙ্গে নানা ধরনের চারাপোনা ভেড়িতে ঢুকে যায় এবং তারপরে জেলেরা মাঝে মাঝে এসব ভেড়ি থেকে মাছ ধরে। চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ বড় না হতেই তোলা হয়, কারণ ছমাস পরেই তাদের জমি ছেড়ে দিতে হয়। এরকম না করে যদি খানিকটা জায়গা কেবল মাছের জন্য রাখা হয়, তাহলে মাছ বড় হওয়ার পর ধরলে জেলেদের আয় ৪।৫ গুণ বেড়ে যাবে।

কিভাবে আমাদের চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে

চিল্কা হ্রদে, পুলিক্যাট হ্রদে এবং ভোম্বানাদ হ্রদে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের চারাপোনা পাওয়া যায় (চিল্কা হ্রদ থেকেই বছরে ৬০০ টন); কিন্তু হ্রদের আশপাশের জেলেরা সেগুলি ধরে ছোট মাছ হিসাবে বা শুঁটকি মাছ হিসাবে অল্প দামে (কেজি প্রতি ১০ টাকারও কমে) বিক্রি করে দেয়। দিন দিন এই প্রবণতা বেড়েই চলেছে। অন্যত্র, যেমন জাপান, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশে চারা মাছ ধরে মাছচাষকেন্দ্রে তাদের বড় করে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হয় সমুদ্রের স্বাভাবিক মজুদ বজায় রাখার জন্য। ১৯৬০ সালের পর থেকে পৃথিবীতে চিংড়ির উৎপাদন বেড়েই চলেছে—১৯৭২ সালে ১২ লক্ষ টন, ১৯৮২ সালে ১৭ লক্ষ টন। ভারতে উৎপাদন হয় মাত্র ২১ হাজার টন, যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলিই সমগ্র চিংড়ি উৎপাদনের ৭০ শতাংশ করে। তাইওয়ান মাছচাষে অদ্ভুত সাফল্য দেখিয়েছে; সেখানে ডিম থেকে চারা পোনা তৈরির কেন্দ্র আছে ১২০০ এবং এগুলির সবই আছে পারিবারিক ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে। মাছের ডিম পাড়ানোর কাজে এরা আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি দেওয়া সমুদ্রের জল ব্যবহার করে (জলের দূষিত জীবাণু নষ্ট করার জন্য)।

চিংড়ির চাষে চারাপোনা পাওয়া একটি বিরাট সমস্যা। এর একটিমাত্র সমাধান হলো—ডিম থেকে বাচ্চা বার করে হ্যাচারি তাদের বড় করা। বর্তমানে মাছ-চাষকেন্দ্রগুলি সমুদ্রে গর্ভবতী মাছ ধরে অথবা বড় মাছ ধরে এনে ল্যাবরেটরিতে তাদের গর্ভবতী করে। কিন্তু এই প্রথা চালু রাখতে হলে বছরের নির্দিষ্ট ঋতুতে উপযুক্ত পরিমাণে বড় চিংড়ি মাছ পেতে হবে। গর্ভবতী চিংড়ি ধরার জন্য অনেক সময় সমুদ্রে অনেক দূর যেতে হয়। এর ওপরে আছে মাছের খাবারের সমস্যা। জলজ-প্রাণিচাষকেন্দ্রগুলির সামগ্রিক খরচের ৫০-৭০ শতাংশ চলে যায় মাছের খাদ্যের খাতে, কারণ খাবারের ওপরেই নির্ভর করে মাছের উৎপাদনমাত্রা। বাগদা চিংড়ি বহুপ্রকারের আছে; প্রত্যেক প্রকারের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন কিনা তা পরীক্ষা করা দরকার। তাছাড়া সদ্যজাত চারামাছের মাঝারি বয়সের এবং বড় চিংড়ি মাছের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে এক কেজি চিংড়ি উৎপাদনে খরচ পড়ে—ভারতে ১-২৬ ডলার, তাইওয়ানে ৪.৫৬ ডলার, জাপানে ১৭-২৫ ডলার। বাজারদাম—কেজি প্রতি ১৫-২৫ ডলার।

মাছচাষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক

অনেক দেশে মাছের যোগান সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে বলে উর্ধ্বগামী চাহিদা মেটানোর জন্য জলজপ্রাণিচাষের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সব দেশেই জল থেকে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। জলা জায়গায় জল ধরে রেখে জলজপ্রাণিচাষ সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের লোকের জীবিকা অর্জনের পুরনো প্রথায় আঘাত হানছে। আমাদের দেশে মাছচাষে অ্যাকোয়াকালচার্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উন্নতি করা দরকার। দেশে পুকুর, নদী ইত্যাদিতে ধরা মাছ আর বর্ধিত জনসংখ্যার পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে না। সেজন্য জলজপ্রাণিচাষের বৃদ্ধি এখন খুবই প্রয়োজনীয়।

পোনা মাছ চাষে (বড় মাছের মস্তিষ্ক থেকে নেওয়া) পিটুইটারি গ্ল্যান্ড-এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে একই উদ্দেশ্যে, এর বদলে 'সুম্যাক' (sumach) নামক অন্য দ্রব্যও (human chorionic gonadotropic hormone) বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।□

[সংক্ষেপিত; দ্রষ্টব্য Proceedings of the Indian National Science Academy, Vol. 61, No. 2, pp. 89-111]

মহাজীবনের কথা

সচ্চিদানন্দ কর

Glimpses of Great Lives—Swami Tathagatananda. Publisher : Vedanta Society of New York. Pages : 8+248. Price : Rs. 40·00.

আলোচ্য বইটিতে ইংরেজীতে লেখা ৩৫টি প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে ৩৩টি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন মহাজীবন-কাহিনী নিয়ে লেখা (এঁদের মধ্যে কয়েকজন নারীও আছেন) এবং দুটি প্রবন্ধ সমসাময়িক ঘটনা বা পরিস্থিতির ওপরে লেখা। রচনাগুলি আগে স্বতন্ত্রভাবে 'প্রবুদ্ধ ভারত', 'বেদান্ত কেশরী', 'যুবভারতী' প্রভৃতি ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যাঁদের জীবনকে অবলম্বন করে উল্লিখিত ৩৩টি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাঁরা সকলেই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা এবং তাঁদের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন। ১৭টি রচনা এজাতীয়।

প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত। বিষয়বস্তুর উৎকর্ষের সঙ্গে লেখকের জ্ঞানের গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। লেখকের সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি রচনাগুলিকে খুবই চিত্তাকর্ষক করেছে। যাঁরা এই লেখাগুলি পড়বেন, বিশেষতঃ বিদেশীরা, তাঁরা যে আলোচিত মহাজীবনগুলি সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন তা বলাই বাহুল্য। এই আগ্রহসৃষ্টি বইটির একটি বড় কৃতিত্ব।

বইটির ছাপা সুন্দর ও ত্রুটিহীন। বাঁধাইও মজবুত।

মন্দিরময় দক্ষিণ ভারত

তাপস বসু

দেউলভূমি দক্ষিণাপথে—নৃসিংহ রামানুজদাস। প্রকাশক—শ্রীবলরাম প্রকাশনী, পোঃ—বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা : ২৫৪+৬। মূল্য : ৩০ টাকা।

মন্দিরময় দক্ষিণ ভারত আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু। প্রাচীন কাল থেকে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত নানা মন্দির দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, মহীশূরে রাজ-রাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানা সময়ে ভ্রমণার্থী, তীর্থযাত্রীদের আকৃষ্ট করেছে এবং আজও করে চলেছে। এইসব মন্দিরের অধিদেবতাকে কেন্দ্র করে নানা লোককথা, অলৌকিক বিষয় সংঘটিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এইসব মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। ভক্তরা সেই আধ্যাত্মিকতার টানে ছুটে যান। এইসব মন্দিরের বিশালতা, প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে গর্ভমন্দির পর্যন্ত ভাস্কর্যের বৈচিত্র্যময় বিন্যাস ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণ করেছে দিনের পর দিন। স্থানমাহাত্ম্য, দেবমাহাত্ম্য, বিশেষ উৎসবে যাত্রার বিবরণ ও ঐতিহ্য—এসব কিছু অবহিত হয়ে মন্দিরে দর্শনার্থী হলে এক অপূর্ব আনন্দ, অনুভূতি ও উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব। গ্রন্থকার একথা আমাদের আপন অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তিরুপতি—তিরুমলৈ, মেলকোটা, শ্রীরঙ্গপত্তন, মহীশূর, গুরুবায়ুর, শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চীপুরম, শ্রীপেরুম্বুদুর—এই সাতটি মন্দিরের বৈচিত্র্যময় বর্ণনার আলপনা এঁকেছেন।

দক্ষিণ ভারত পর্যটনে উত্তর ভারতের লোকেদের ভাষা ও খাওয়ার অসুবিধা দেখা দেয়; গ্রন্থকার সেকথা বারেবারেই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার শুধুই পর্যটনে যাননি, তাঁর দেখা মন্দিরগুলির ইতিহাস, ঐতিহ্য—এ সমস্ত কিছু অবহিত হয়েই দর্শনার্থী হয়েছেন; তাই ভাস্কর্য, মন্দিরগুলির বিশালতা ছাড়াও তিনি আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেবস্থান ও দেবতাদের প্রত্যক্ষ করেছেন; তাই আমরা এই ভ্রমণকাহিনী পাঠ করে দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট সাতটি মন্দিরের বর্ণনা যেমন পেয়ে যাই, সেইসঙ্গে দেবতাদের অবস্থান—আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের স্বরূপটিও অনুভব করতে পারি। এইখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থের শুরুতে নানান দেবতার ছবি মুদ্রিত হয়েছে। এই মুদ্রণ বড় অযত্নের।

চিরসুন্দর হিমালয়

স্বামী চৈতন্যানন্দ

সুন্দরভুবনার আলোতে ছায়াতে—অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। প্রকাশক—সরকার প্রকাশন, বি-৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭। পৃষ্ঠা : ৮+১৬২। মূল্য : ২৫ টাকা।

হিমালয়। পবিত্রভূমি। দেবভূমি। দুর্বার আকর্ষণ! যে একবার তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছে সে সেখানে বারবার না গিয়ে থাকতে পারে না। সংসারের কোলাহল থেকে একবারের জন্যও তার মনকে উদাস করে দেবে। হিমালয়ের সৌন্দর্য বড় মনোরম। নিস্তব্ধ পরিবেশ। যেন সদা ধ্যানমগ্ন। সু-উচ্চ দেওদার ও চিরগাছগুলি যেন প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে, যেন কেউ তাঁর ধ্যানের বিঘ্ন না ঘটায়। নাম-না-জানা কত না ফুলের পসরা সাজানো আছে ধ্যানমগ্ন যোগিবরকে পূজা করার জন্য! যেন পার্বতী পূজার ডালি সাজিয়ে শিবকে আরাধনা করছেন, আর বায়ু শোঁশোঁ শব্দে অবিরত ব্যজন করে চলেছে। শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্যই যেন ঝরনা বা নদী উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে নৃত্য করে চলেছে। হিমালয়ের এই অপরূপ মনোহারী রূপমাধুর্য যে একবার দেখেছে সে বারবার না দেখে থাকতে পারে না। তাকে ঘরছাড়া করবেই সে যত কাজে ব্যস্ত থাক না কেন। তাই দেখি হিমালয়ের টানে বিপদসঙ্কুল পথে প্রাণটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নৈস্বর্গিক স্বপ্নের রাজ্যে কত না পথিক চলেছে অজানাকে জানার ঔৎসুক্যে। এমনই একজন পথিক অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি বহুবার দেবভূমির নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন—কর্ম-কোলাহল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে। দেবভূমির পবিত্রতার, শান্তস্নিগ্ধতার রসাস্বাদন করেছেন তিনি প্রাণভরে। রসাস্বাদন করে তিনি একা তৃপ্ত হননি, আরও অনেককে রসাস্বাদন করানোর জন্য স্মৃতিপথে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা জমে আছে তা তিনি দুহাত ভরে বিলিয়েছেন।

লেখকের এবারের যাত্রা সুন্দরডুঙ্গার উপত্যকার উদ্দেশে। সুন্দরডুঙ্গা কুমায়ুন হিমালয়ের একটা উপত্যকা। তিনি যাবার শুরু থেকেই সুন্দর কাব্যিক ঢঙে লিখেছেন, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে যাবার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। সহযাত্রী সঙ্গী থেকে আরম্ভ করে কুলিদের চরিত্রগুলি কয়েকটি শব্দব্যঞ্জনার মাধ্যমে তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। চলতে চলতে পথে পরিচিত-অপরিচিত বহু লোকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে—তাদের পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থার নিটোল বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে যাত্রাপথের ক্লান্তিকর একঘেয়ে বর্ণনার হাত থেকে রেহাই পাবে পাঠকসমাজ।

লেখকের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কুমায়ুন হিমালয়ের মানুষের সামাজিকতা, মানসিকতা, অর্থনীতি ও ধার্মিকতা। এতে সেখানকার মানুষ সম্পর্কে জানার আগ্রহ জাগাবে। এখানেই লেখকের লেখার মুনশিয়ানা।

ভাষা স্বচ্ছ ও গতিশীল। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে পারা যায় না। গ্রন্থে সুন্দরডুঙ্গার পথ ও উপত্যকার মানচিত্র এবং ভ্রমণপথের নির্দেশিকা থাকায় গ্রন্থটি আগ্রহী অভিযাত্রীদের একটি সুন্দর 'গাইডবুক' হয়েছে।

সুন্দরডুঙ্গার যাত্রাপথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং মানুষের কয়েকটি সুন্দর রঙিন ছবি থাকায় গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়েছে। প্রচ্ছদপটও দৃষ্টিনন্দন।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল। সেদিক থেকে বিচার করলে গ্রন্থটির মূল্য সুলভ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সম্পর্কে দুটি পুস্তিকা

অরিন্দম দাস

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে ঈশ্বর—দীপ্তিকুমার শীল। প্রকাশক—দোলগোবিন্দ দত্ত। ১৭ মতিলাল বসাক গার্ডেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৫৪। পৃষ্ঠা ঃ ৮০। মূল্য ঃ ৬ টাকা।

শ্রীশ্রীমা ঃ সারদা-সরস্বতী—দীপ্তিকুমার শীল। প্রকাশক—দিব্যেন্দুনারায়ণ মণ্ডল, বিনীতা মণ্ডল। ১/১০বি, গোপাল বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০৫০। পৃষ্ঠা ঃ ৬৪। মূল্য ঃ ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

লেখক দীপ্তিকুমার শীল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে ঈশ্বর প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য সঙ্কলন করে প্রথম পুস্তিকাটি প্রস্তুত করেছেন। ঈশ্বর সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, তাঁর ইতি করা যায় না। তাঁকে কেউ 'উচ্ছিষ্ট' করতে পারেনি, অর্থাৎ তাঁর কথা বলে কেউ শেষ করতে পারেনি, পারবেও না। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর সম্পর্কিত বক্তব্য তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধি থেকে উঠে এসেছে। তাঁর আলোচনা পণ্ডিতের পুঁথিগত আলোচনা নয়, তা উপলব্ধিবান যুগঋষির মুখোৎসারিত সত্যবচন। বর্তমান যুগ অবিশ্বাস, সন্দেহ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে তাঁর প্রতিটি আচরণে ও কথায় তিনি প্রমাণ করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালবাসার গভীরতম স্বরূপকে। প্রমাণ করেছিলেন, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দর্শন করা যায়। প্রয়োজন পবিত্রতার, প্রয়োজন সংযমের, প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণের, বৈরাগ্যের এবং ব্যাকুলতার। পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিক বাণীগুলিকে চয়ন করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূচীপত্রটিও এবিষয়ে খুব সহায়ক। পাঠক-

পাঠিকারা সহজেই শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর সম্পর্কিত বক্তব্যকে বেছে নিয়ে পড়তে পারবেন এবং পড়ে আনন্দ পাবেন। পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলিকেই শুধু সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, সঙ্কলকের কোন বক্তব্য এখানে নেই। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের মূল কথাগুলি এখানে পাওয়া যাবে। সঙ্কলক বাস্তবিকই একটি সুন্দর কাজ করেছেন। পুস্তিকাটির মুদ্রণ সুন্দর, কাগজও ভাল।

দ্বিতীয় পুস্তিকাটি শ্রীশ্রীমা সম্পর্কিত। শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সারদাদেবীর বিবাহের উল্লেখ করে পুস্তিকাটির শুরু। যেখানে পুস্তিকাটি শেষ হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে—বালিকাবধূ তখন রূপান্তরিত হয়েছেন বিশ্বজননীতে। এখানে মায়ের জীবনী যেমন আমরা পাই তেমনি পাই মায়ের অসাধারণ কথামৃতের কিছু অংশও। পুস্তিকাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনপঞ্জী। এটি পুস্তিকাটির শেষে সংযুক্ত হয়েছে। লেখক অতি সহজভাবে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যকে পাঠক-পাঠিকার কাছে তুলে ধরেছেন। ভাষায় কোথাও আড়ষ্টতা নেই, জটিলতা নেই। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আলোচনা যত সহজ এবং অনাড়ম্বর হবে ততই তা যথার্থ হবে, কারণ তিনি নিজে ছিলেন সরলতা ও সহজতার জীবন্ত প্রতিমা। লেখককে ধন্যবাদ, তিনি একটি দৃষ্টিশোভন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রস্তুত করেছেন, যাতে আমরা যুগজননীর একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য পাই।

উভয় পত্রিকার ভূমিকা এবং প্রারম্ভিক প্রসঙ্গ লিখেছেন কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। বলা বাহুল্য, পুস্তিকা-দুটির বিষয়বস্তু বোঝার ক্ষেত্রে তাঁদের রচনা পাঠক-পাঠিকার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

স্মরণিকা-সমালোচনা

বালকাশ্রমের বাণীবাহক

অরিন্দম দাস

দিব্যায়ন (পঞ্চম বর্ষ)। প্রকাশক—করুণাময় চন্দ, সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম প্রাক্তন ছাত্রসংসদ। পোঃ—রহড়া, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩১৮৬। পৃষ্ঠা : ২১৬। মূল্য : অনুল্লেখিত।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রসংসদের বার্ষিক মুখপত্র **দিব্যায়ন** তার পঞ্চম বর্ষে যেন যৌবনের চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে উপনীত হয়েছে। বালকাশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তীপূর্তি বর্ষে **দিব্যায়ন** তার পঞ্চম বর্ষের সম্ভার আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। স্মরণিকা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মুখপত্র সাধারণতঃ কোন অভিনবত্বের দাবি করতে পারে না। কিন্তু **দিব্যায়নের** পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যাটি এই ধারায় একটি অভাবনীয় ব্যতিক্রমের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে। কী প্রচ্ছদ, কী অঙ্গসৌষ্ঠব, কী অবয়ব, কী আন্তর সম্পদ—সব দিক থেকেই **দিব্যায়নের** পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। পারিপাট্য এবং পরিচ্ছন্নতার মডেল হিসাবে এই সংখ্যাটি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং এই ধরনের প্রকাশনার প্রকাশক-বর্গকে পথ দেখাবে।

পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক হুস্টন স্মিথ **দিব্যায়নের** প্রকাশকবর্গকে যেমন অভিনন্দন জানিয়েছেন, তেমনি নিজের শৈশবের সুখস্মৃতি স্মরণ করে আপ্লুত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হুসেন। পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণীটি **দিব্যায়নের** বর্তমান সংখ্যাটির বিশেষ সম্পদ। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজের মুদ্রিত ভাষণটিও খুব মূল্যবান। আর যাঁদের লেখা **দিব্যায়নে** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁরা সকলেই তাঁদের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট এবং অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্ষীয়ান এবং মনস্বী সন্ন্যাসীরা যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন সারদা মঠ ও মিশনের বর্ষীয়সী ও মনস্বিনী সন্ন্যাসিনীরাও। রয়েছে বালকাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রদেরও কিছু স্মৃতিচারণমূলক রচনা। রয়েছে বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় রচনা। দুই মলাটের মধ্যে পাঠোপযোগী এমন অসাধারণ সম্ভার ইদানিংকালে এজাতীয় অন্য কোন প্রকাশনায় লক্ষ্য করেছি বলে মনে পড়ে না। মুদ্রণ-পারিপাট্য, প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা এবং বিষয়বস্তুর সুনির্বাচনে **দিব্যায়নের** আলোচ্য সংখ্যাটি যথার্থই সংগ্রহযোগ্য একটি অসাধারণ সঙ্কলন হয়ে থাকল। সম্পাদক, প্রকাশক এবং এই প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত সকলকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই।□

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২ চৈত্র ও ৩ চৈত্র ১৪০২ দুদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ, ইছাপুর (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)-এ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ্ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল উষাকীর্তন, পূজার্চনা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী অমেয়ানন্দ এবং বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। সন্ধ্যারতির পর ভক্তিগীতি, বাউলরাজ হরেকৃষ্ণ দাস ও সম্প্রদায়ের বাউলগান ও ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্রদের দ্বারা 'যার নাম বিলে' নাটক অভিনীত হয়। পরদিন ৩ চৈত্র প্রভাতফেরীতে আনুমানিক ২০০০ ছাত্রছাত্রী ও স্কুলের শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেককে টিফিন এবং দুপুরে বসিয়ে ১২০০০ এবং হাতে হাতে ৩০০০ ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। ঐদিন সন্ধ্যারতির পর ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, হাওড়া কর্তৃক 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' অভিনীত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামহরিপুর (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ২২ থেকে ২৪ মার্চ '৯৬ তিনদিন ধরে এই আশ্রমে বিশেষ পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল ভজন-সঙ্গীত, শ্রুতিনাটক, কবিগান, বাউলগান, স্বামী দেবদেবানন্দ কর্তৃক পরিবেশিত 'সঙ্গীতে কথামৃত', আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত 'সাধক রামপ্রসাদ' নাটক প্রভৃতি। উৎসবের তিনদিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিনই সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী বন্দনানন্দজী। সভাগুলিতে ঠাকুর-মা-স্বামীজী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্বামী দেবদেবানন্দ, স্বামী তম্গতানন্দ, সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সাংবাদিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ১২০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১২ মার্চ ভুবনেশ্বর আশ্রম বিদ্যালয়ের (উড়িষ্যা) বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উড়িষ্যার রাজস্ব ও পরিবহন মন্ত্রী কানুচরণ লেঙ্কা এবং আবগারি দপ্তরের মন্ত্রী সুরেশকুমার রাউতরায় যোগদান করেছিলেন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বিবেকনগর আশ্রম (ত্রিপুরা)-এর বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে ত্রিপুরার খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায় যোগদান করেছিলেন।

উদ্বোধন

গত ২০ মার্চ কোয়েম্বাটোর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (তামিলনাডু)-এর নবনির্মিত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল সি. সুব্রহ্মণ্যম। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র, শিক্ষক ও ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

চিকিৎসা-শিবির

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) লিমডি আশ্রমের সহযোগিতায় লিমডিতে এক বিনামূল্যে চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ৯০৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এই আশ্রম রাজকোট জেলায় ১৭ ও ২৪ মার্চ দুটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরও পরিচালনা করেছে। শিবির-দুটিতে মোট ৩২০ জনের চিকিৎসা হয়েছে। পরে রাজকোটে ২৩ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

পোনামপেট আশ্রম (কর্ণাটক) গত ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী বিনামূল্যে এক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ২৫৩ জন দুঃস্থ শিশুর চিকিৎসা করা হয়।

জামতাড়া আশ্রম (বিহার) গত ৩ মার্চ এক দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৮৫ জনের চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

অরুণাচলপ্রদেশ অগ্নিত্রাণ

আলং কেন্দ্রের মাধ্যমে পশ্চিম সিয়াং জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪টি পরিবারকে ৫০০০ কিলোঃ চাল, ৪০০ কিলোঃ লবণ, ৭০ কিলোঃ চা, ৪০০ প্যাকেট বিস্কুট, ৪০টি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ৪০টি অ্যালুমিনিয়ামের কেটলি এবং ৭৬টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গুজরাট ত্রাণ

রাজকোট আশ্রম রাজকোট জেলার গান্ধী গ্রামের খরাপীড়িতদের মধ্যে প্রত্যহ ২০ ট্যাঙ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া পঞ্চমহল জেলায় খরায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্যশস্য ও কাপড় বিতরণের ব্যবস্থা নিয়েছে।

এই আশ্রম পঞ্চমহল জেলার দুটি তালুকের ৫০০ দুঃস্থ পরিবারের প্রত্যেক পরিবারকে ১টি করে মোটা চাদর ও ১০ কিলোঃ করে ভুট্টা বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল)ঃ

এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। এছাড়া মাসের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম মঙ্গলবার ভারতীয় দর্শন এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ১৬ এপ্রিল ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় শঙ্করাচার্যের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২৭ এপ্রিল পূজা, প্রার্থনা, স্লাইড শো, গীতার ওপর আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে এই কেন্দ্রে একটি সাধন-শিবির আয়োজিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক ঃ গত এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে ভাষণ দিয়েছেন এবং প্রতি শুক্রবার গীতা ও প্রতি মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ক্লাস নিয়েছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী আদিশ্বরানন্দ। এছাড়া গুড ফ্রাইডে এবং ইস্টার সানডে উপলক্ষে গত ৫ ও ৭ এপ্রিল যীশুখ্রীস্ট প্রসঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) ঃ গত এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে ভাষণ হয়েছে। ৬ এপ্রিল কঠ-উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নীতি ও মূল্যবোধ বিষয়ে শিশুদের জন্য মাসিক পাঠ আয়োজিত হয়েছে। ১১ এপ্রিল টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ-উপনিষদের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দ। ২০ এপ্রিল কঠ-উপনিষদ্ পাঠ এবং বিবেকানন্দ পাঠচক্রে 'রাজযোগ' বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ২৬ তারিখ পরিবেশিত হয়েছে রামনাম-সঙ্কীর্তন। পরদিন স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ গত এপ্রিল মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ হয়েছে। প্রতি মঙ্গলবার বেদান্তের এবং প্রতি বৃহস্পতিবার 'দ্য গস্‌পেল অব হোলি মাদার'-এর ক্লাস নিয়েছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (স্যান ফ্রান্সিস্কো) ঃ গত এপ্রিল মাসের প্রতি রবি ও বুধবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। এর মধ্যে তৃতীয় বুধবার ১৭ এপ্রিল আলোচনা করেছেন প্রব্রাজিকা বিরজাপ্রাণা। ৬ ও ২০ এপ্রিল শনিবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের ওপর আলোচনা হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল এই কেন্দ্রের শান্তি আশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পূজা, ভক্তিগীতি, স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বার্কলে আশ্রমের স্বামী অপর্ণানন্দ এবং স্যাক্রামেন্টো আশ্রমের স্বামী প্রপন্নানন্দ এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২০ মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হল'-এ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী এবং গত ২৩ মে ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁর জীবন ও দর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ৯ মার্চ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।□

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১২ জানুয়ারি '৯৬ স্যান্ডেলের বিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ১০টি প্রাথমিক ও ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫টি যুব-সংগঠনের প্রায় ১৫০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও যুব-প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমান্তে এ. বি. এম. মদনমোহন বিদ্যাপীঠে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে যুবদিবস প্রসঙ্গে আলোচনান্তে সেবাশ্রমে চার দলের ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১৪ জানুয়ারি সেবাশ্রমের ব্যবস্থাপনায় বিশপুর সামাজিক শিক্ষা-কেন্দ্রে এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ৫টি বিদ্যালয় ও ১৭টি যুব-সংগঠনের মোট ২৬৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন আলোচনায় প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ, অধ্যাপক অভিজিৎ পাণিগ্রাহী, অধ্যাপক শ্যামল সরদার প্রমুখ।

আনন্দধারা সেবা প্রতিষ্ঠান (বেলিয়াচণ্ডী, পোঃ গোচারণ, জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)-আয়োজিত এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় পঞ্চম বার্ষিকী স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ৭ জানুয়ারি '৯৬। এই যুবসম্মেলনে ২০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু এবং যুব-প্রতিনিধিবৃন্দ। বিকালে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ডঃ তাপস বসু ও স্বামী বলভদ্রানন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আনন্দধারা সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা লিপিকা ভট্টাচার্য।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সংঘ (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩ জানুয়ারি বিকালে সংঘের কার্যালয়-প্রাঙ্গণে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করে। আলোচনা-সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন খাঁটুরা প্রীতিলতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা শকুন্তলা চক্রবর্তী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নির্মাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষক গোকুল বিশ্বাস। এদিন হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ফ্রি কোচিং সেণ্টারের উদ্বোধন করা হয়। সংঘের সম্পাদক ভুবন রায় সরস্বতী সহ আরও কয়েকজন স্থানীয় বক্তা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া স্বরচিত কবিতা-পাঠ, স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' আবৃত্তি এবং সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

গত ২১ জানুয়ারি '৯৬ প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের চকপাড়া শাখার (লিলুয়া, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ভাবধারায় আয়োজিত এই যুবসম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন শাখাসংঘের সভাপতি আশুরঞ্জন আইচ। স্বামীজীর ওপর বক্তব্য রাখেন অরূপ মুখোপাধ্যায়, সংঘ-সভাপতি প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী, রণজিৎ সিংহ এবং সুধীর মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দ। অনুষ্ঠানে ৫৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, রায়গড় (মধ্যপ্রদেশ) গত ১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব স্থানীয় মিলনী কালীবাড়িতে উদ্‌যাপন করেছে। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল বিশেষ পূজাদি, প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। উল্লেখ্য, গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৫ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবও উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘে গত ১৪ জানুয়ারি '৯৬ সংঘের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর ভাষণ ছাড়াও স্তবগান, আবৃত্তি, অভিনয় নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের 'ভক্তভৈরব গিরীশচন্দ্র' গীতিনাট্য ছিল আকর্ষণীয় বিষয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, রসুলপুর (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬ ও ৭ জানুয়ারি এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দুদিনের উৎসবের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি ও লীলাগীতি পরিবেশন, বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি। উভয় দিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, স্বামী ঋতানন্দ ও স্বামী অনিমেষানন্দ। উৎসবের দ্বিতীয় দিন প্রায় ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি আশ্রম, খেপুত (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ১২ জানুয়ারি এই আশ্রমে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিভাগে সফল ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিযোগীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুশীলচন্দ্র বেরা। দুপুরে প্রায় ২৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৪ জানুয়ারি '৯৬ দত্তপুকুর (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐদিন সকাল ৮টায় সংঘ-প্রাঙ্গণ থেকে এক বিশাল শোভাযাত্রা দত্তপুকুরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। তারপর বেলা ১১টায় সংঘ-প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক সুব্রত বসু (জাতীয় শিক্ষক) সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) : গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ সেবাশ্রমে স্বামীজীর ১৩৪তম শুভ আবির্ভাব-তিথি উৎসব পালিত হয়। প্রভাতে ভক্তিগীতি পরিবেশন, স্বামীজীর বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা এবং পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন আলোচনা, আরাত্রিকের পর ভজন ও ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় শিল্পিগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা)-নিবাসী গুরুগোবিন্দ ধর গত ১৩ ডিসেম্বর '৯৫ সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দেশসেবা এবং স্বামীজীর ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজীর বিশেষ স্নেহভাজন গুরুগোবিন্দবাবু দেশবিভাগের পূর্বে শ্রীহট্ট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবাকার্য পরিচালনা করেছেন। তিনি কিছুকাল কৈলাসহর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদকও ছিলেন। উদার, অতিথিবৎসল এবং সমাজসেবী হিসাবে তিনি জনসাধারণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধুদের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

কথামৃতকার শ্রীম-র পৌত্র অনিল গুপ্ত গত ১৮ ডিসেম্বর '৯৫ বেলা ১১টায় পরলোকগমন করেন। তিনি শ্রীম এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীদের সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছিলেন। কথামৃত ভবন থেকে প্রকাশিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রকাশনার দায়িত্ব প্রায় ৩০ বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন। অকৃতদার অনিলবাবু ধর্মীয় ও সেবামূলক নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। শেষদিন অবধি উত্তর কলকাতার ঝামাপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

কথামৃতকার শ্রীম-র অন্যতম পৌত্রবধূ এবং শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বীণা গুপ্ত গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৫ রাত্রি ২.২০ মিনিটে ৭৩ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর অশেষ স্নেহ-আশীর্বাদে তিনি ধন্যা ছিলেন। শ্রীম-র 'ঠাকুরঘর'-এর সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ও সাধনা। 'কথামৃত' ছিল তাঁর নিত্যপাঠ্য। দেহত্যাগের কয়েক দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে "মায়ের জন্য বড্ডই মন কেমন করছে" বলে শিশুর মতো অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন। তাঁর একান্ত ইষ্টভক্তি ও দরদী হৃদয়ের জন্য তিনি সবার কাছে খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। কথামৃত ভবনে আয়োজিত তাঁর পারলৌকিক অনুষ্ঠানে বহু মানুষ এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান।

গত ১৭ নভেম্বর '৯৫ কলকাতা শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ রামকৃষ্ণ সরকার ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৭৫ সালে জেনারেল ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন (ইউনিট—ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানি) থেকে সুনামের সঙ্গে চাকরিজীবন সমাপ্ত করে তিনি উদ্বোধন অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করেন এবং প্রায় আঠার বছর নিষ্ঠার সঙ্গে প্রুফ রিডিং এবং অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে সেবা করেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, কর্তব্যপরায়ণ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর ও আন্তরিকতাপূর্ণ।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বাগুইহাটী (কলকাতা-৫৯)-নিবাসী যতীন্দ্রনাথ দত্ত গত ১৭ নভেম্বর '৯৫ পরলোকগমন করেন। ঐদিন সান্ধ্য উপাসনার পর তিনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হন এবং ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ভবানীপুর (চক্রবেড়িয়া লেন, কলকাতা-২০)-নিবাসী সুকৃতি রায়চৌধুরী গত ২৩ নভেম্বর '৯৫ বুধবার রাত্রি ৩.০৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর বড়িষা রামকৃষ্ণ মঠে (বৃদ্ধাশ্রম) বাস করেছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি বোম্বাই শহরে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু কবিতাও তিনি লিখেছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। দুবার তিনি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন রোড-নিবাসী সত্যেন্দ্রচন্দ্র নাথ গত ৩১ ডিসেম্বর '৯৫ এনকেফেলাইটিস রোগে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। ছাত্রজীবনে তিনি শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্র ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য উড়িষ্যার কোকরাঝাড়-নিবাসী বকুলবিকাশ গুহ গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৫ সকাল ৭.৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার বহুদিনের গ্রাহক ছিলেন। কোকরাঝাড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী নগর উখড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা, কাঁচড়াপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী-সদস্যা পূর্ণিমা ব্রহ্ম ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সি. এন. সি. আই. হাসপাতালে (কলকাতা) গত ২০ ডিসেম্বর '৯৫ বেলা ২.১৫ মিনিটে করজপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসীর তিনি স্নেহধন্যা ছিলেন।□

শিক্ষা-সংস্কৃতি

বিবেকানন্দ-গবেষণায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টরেট অব লিটারেচার' (ডি. লিট.) প্রদান

গত ৩০ মার্চ ১৯৯৬ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ)-এর একাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ : সাহিত্যে, চিন্তায়, চেতনায়' বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান ডি. লিট. (ডক্টরেট অব লিটারেচার) উপাধি পেলেন তরুণ অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। এই সর্বোচ্চ সম্মানজ্ঞাপক উপাধি অধ্যাপক ডঃ তাপস বসুর হাতে অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডী। অধ্যাপক বসু ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে 'বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য' বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. অর্থাৎ 'ডক্টরেট অব ফিলোজফি' উপাধি পান। অধ্যাপক বসু আকৈশোর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর সংযুক্তি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত শতবর্ষ-উত্তীর্ণ বঙ্গবাসী কলেজে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং লোকসংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপনায় রত। এইসঙ্গে বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি মৌলিক উচ্চতর গবেষণায় রত আছেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি পান বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ৮৬ বছর বয়স্ক শান্তিনিকেতন-নিবাসী পদ্মভূষণ শান্তিদেব ঘোষ এবং বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ্, প্রেসিডেন্সী কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। আরও দুজন অধ্যাপক মৌলিক উচ্চতর গবেষণার জন্য ডি. লিট. উপাধি পান। এঁরা হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন লাহিড়ী এবং লোকসংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী। এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা অনুষদের ৮৬ জন পিএইচ. ডি. উপাধি পান। এই চারটি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী নানা ছাত্রছাত্রীকে স্মারক, পদক ও উপরি উক্ত উপাধিগুলি অর্পণ করেন আচার্য কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডী।

শ্রী রেড্ডী তাঁর ভাষণে শিক্ষার মাধ্যমে স্বদেশচেতনার জাগরণ ও জাতীয় সংহতি রক্ষার আহ্বান জানান ছাত্রছাত্রীদের কাছে। দীক্ষান্ত ভাষণ দেন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক যশ পাল। তিনি ছিলেন এদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। অধ্যাপক যশ পাল কুসংস্কারমুক্ত, মানবিকতায় পরিপূর্ণ সমাজগঠনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে বলেন। উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ তাঁর দীর্ঘ ভাষণে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান অগ্রগতির সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরেন এবং বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ প্রমুখের ভাবাদর্শে ছাত্রছাত্রীদের জীবনগঠনের আহ্বান জানান। সমাবর্তনের শুরুতে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও সমাপ্তিতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

উচ্চশিক্ষার স্তরে বিবেকানন্দ-চর্চা প্রসারিত হচ্ছে

স্বামী বিবেকানন্দের বাঙলায় লেখা মৌলিক চারটি রচনা—'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ। 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাম্মানিক স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দীর্ঘদিন পাঠ্য ছিল। সাম্প্রতিক কালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের লেখা একটি প্রবন্ধ-সঙ্কলনে বিবেকানন্দের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি সঙ্কলিত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে নতুন পাঠ্যসূচীতে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থদুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরে পড়ানো হচ্ছে।

১৯৯৫-এর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সর্বোচ্চ পরীক্ষার (এম. এ. পার্ট-২) ৬ষ্ঠ পত্রের দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ পূর্ণমানের যে-প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য'। ১৯৯৬-এর পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ (West Bengal Public Service Commission) কর্তৃক গৃহীত সর্বোচ্চ স্তরের পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক কর্মসমূহের (উচ্চ পদাধিকারী—'ক' বিভাগ) প্রশাসক নিয়োগজনিত পরীক্ষায় (W.B.C.S. Executive, A-grade) ৫০ পূর্ণমানের প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের ভারতচিন্তা' বিষয়ে।

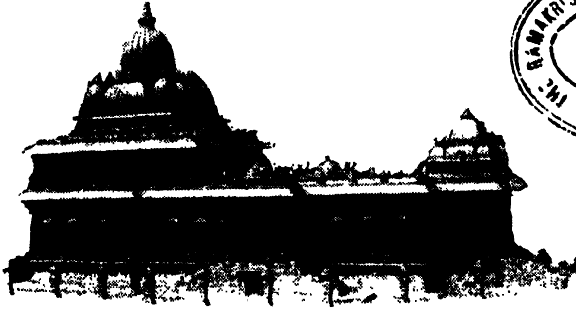
স্বাধীনোত্তর কালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ পাঠ্য ছিল, এখনো আছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার স্তরে বিবেকানন্দ-চর্চা প্রসারিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ-চর্চা যে কালোপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক তা এথেকে সুস্পষ্ট। □



যাহা সভ্যতার আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে — প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার অবসর ও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে — লোককে আরও ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতদের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল, দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা ৭০০০০১





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯ ; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯

KEEPING THE FLAME OF
NATIONAL UNITY ALIVE



AIR-INDIA
एअर·इंडिया



উদ্বোধ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সচীপত্র ৯৮তম আষাঢ় ১৪০৩ জুন ১৯৯৬ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□৩০০০ টাকা□কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য কিস্তিতেও প্রদেয়□বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য□ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ□৫৬ টাকা□সডাক□৬৬ টাকা□আলাদাভাবে কিনলে□বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা



উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
উদ্বোধন ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৩ সংখ্যা

- ☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য ঃ ছত্রিশ টাকা।
- ☐ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি সাতাশ টাকায় পাবেন ; ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে যে-কেউ প্রতি কপি পঁচিশ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে ডাকখরচ বাবদ দশ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করা যাবে।
- ☐ সাধারণ ডাকে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ৩১ জুলাই ৯৬-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- ☐ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা সর্বতোভাবে পাব।
- ☐ অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।
- ☐ সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বা ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি পাঠানোর কোন ব্যবস্থা থাকছে না। গত কয়েক বছর গ্রাহকেরা 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যা ইচ্ছা করলে সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারতেন। সংখ্যাটির মূল্য ও চাহিদা বেশি থাকায় তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, সাধারণ ডাকে পাঠানো শারদীয়া সংখ্যাগুলি বরং অনেক গ্রাহক ঠিকমত পেয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো সংখ্যাগুলির চেয়ে সেগুলি আগে পৌঁছেছে। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা দেড় মাস বা দু-মাস পরে গ্রাহকরা পেয়েছেন। এমন খবরও পেয়েছি যে, রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা বহুদিন পরেও পৌঁছায়নি। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যেসব গ্রাহককে রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের হয়রানির চূড়ান্ত হয়েছিল। এবিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রাহকরা যাতে যথাসময়ে ও নিশ্চিতভাবে সংখ্যাটি পান সেজন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা আমরা কয়েক বছর ধরে করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বেশি ডাকমাশুল দিয়েও তাঁরা কোন সুবিধা তো পানইনি বরং তাঁদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং বিলম্ব বেড়েই চলেছিল—এমনকি অপ্রাপ্তির ঘটনাও ঘটেছিল। যাঁরা বিলম্বে পত্রিকাটি পেয়েছিলেন তাঁরা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানিয়েছিলেন।

  এই পরিস্থিতিতে গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে আর শারদীয়া সংখ্যা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে না। যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা এই সংখ্যাটি সাধারণ ডাকেই নিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে বা সুবিধা থাকলে আমাদের দপ্তর থেকে ব্যক্তিগতভাবেও (By Hand) সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে, আগেই বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে সেই সংবাদ অবশ্যই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- ☐ যাঁরা প্রতিমাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন, তাঁদের এবং যাঁরা শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁদের সকলকেই ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যাটি দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২৯ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- ☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। ১৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ('৯৬) পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।

আষাঢ় ১৪০৩

দিব্য বাণী

জুন ১৯৯৬

একজন হিন্দুস্থানী ভিখারি গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দুই-একটি গান শুনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেনঃ "আবার গাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক থাক। আর কাজ নাই, পয়সা কোথায়? (নরেন্দ্রের প্রতি) তুই তো বললি!

ভক্ত (সহাস্যে)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।



শ্রীরামকৃষ্ণ—যারা শুধু পণ্ডিত, কিন্তু যাদের ভগবানে ভক্তি নাই, তাদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী বলে এক পণ্ডিত বলেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে 'রসস্বরূপ' বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে-ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু কখনো জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন বলেছিল, "আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।" একথায় বুঝতে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই, কেননা গোয়ালে ঘোড়া থাকে না। (সকলের হাস্য)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সরসতা

'সংযম' মানে আত্মশাসন, কিন্তু আত্মশাসন মানে কী রসবোধের বিসর্জন? অনেকে কিন্তু তাহাই ভাবেন। সংযমী হাসিবেন না, সবসময় গম্ভীর থাকিবেন। সরসতা তাঁহার পক্ষে বেমানান। তিনি আপাদমস্তক এক "শুকনো" ব্যক্তিত্ব হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন: "যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। পাশ্চাত্যে অনেকের কাছে ধার্মিকের লক্ষণ—সে কখনও হাসিবে না। তাহার মুখ সর্বদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে, তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুষ্কশরীর ও লম্বামুখ লোক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহারা কখনও যোগী হইতে পারে না।" ('বাণী ও রচনা', ৪র্থ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪১)

পাশ্চাত্যে তাঁহাকে বহুবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে: "স্বামীজী, আপনি এত হাসেন কেন? আপনি না আধ্যাত্মিক মানুষ?" আধ্যাত্মিক মানুষ মানেই তো সংযমী মানুষ। তাঁহাদের মুখে হাসি অশোভন। হাসিতে তাঁহাদের "মানা"। গাম্ভীর্য—হয়তো-বা ছদ্মগাম্ভীর্য—কিন্তু গাম্ভীর্য চাই-ই চাই। সংযম মানেই যেন শুষ্ক-শীর্ণ চেহারা, ছুঁচাল মুখ! সংযম এবং মেদহীনতা যেন সমার্থক। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সংযমের এই বাহ্যলক্ষণগুলির কোন সম্পর্ক ছিল না, ছিল না তাঁহার আচার্য এবং গুরুভাইদের কাছেও। পাশ্চাত্যের মানুষের ঐ তিরস্কারবাহী প্রশ্ন শুনিয়া স্বামীজী অট্টহাসিতে উচ্ছল হইয়া বলিতেন: "আরে, আধ্যাত্মিক মানুষ বলেই তো আমি হাসি। আমরা তো পাপী নই—আমরা আনন্দের, অমৃতের সন্তান।" স্বামীজীর এই উত্তরে কেহ হয়তো অবাক হইতেন, কাহারও-বা ইহা পছন্দ হইত না। কেহ-বা প্রতিপ্রশ্ন করিতেন: "আপনি কি কখনো গম্ভীর হতে পারেন না?" হাসিতে আরও উদ্ভাসিত হইয়া স্বামীজী উত্তর দিতেন: "হ্যাঁ, হই তো! যখন আমার পেট ব্যথা করে তখন খুব গম্ভীর হই।" আধ্যাত্মিক মানুষ কি এত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়? মুখে না বলিলেও স্বামীজীকে দেখিয়া পাশ্চাত্যে অনেকের মনে উঠিত এই অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা। স্বামীজী তাহা বুঝিতেন। তাই সহাস্যে বলিতেন: "আধ্যাত্মিক মানুষেরা আনন্দে মোটা হয়। আমি মোটা মানুষ—সুতরাং আমি আধ্যাত্মিক মানুষ!"

এই অসাধারণ সরসতা স্বামীজীর সহজাত অবশ্যই, কিন্তু সরসতার গভীরতায় এবং ব্যাপকতায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন তাঁহার গুরু। রঙ্গে রসে রসিকতায় কৌতুকে পরিহাসে স্বামীজী অনন্য, কিন্তু তবু তাঁহার স্থান শ্রীরামকৃষ্ণের নিচে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু নহেন, তাঁহার রসেরও গুরু। শুধু বিবেকানন্দ কেন? গিরিশচন্দ্র কী কম রসিক ছিলেন? কিন্তু সরসতায় তিনিও পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরমরসিক গুরুর কাছে।

এই রঙ্গ, এই রস, এই রসিকতা, এই কৌতুক, এই পরিহাস শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অঙ্গ। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া, সমস্ত ব্যক্তিত্ব জুড়িয়া সরসতা ঝরিয়া পড়িত। সরসতা ছিল তাঁহার অন্যতম লক্ষণীয় পরিচয়, তাঁহার জীবনের এক প্রধান বাণী, তাঁহার দর্শনের এক মূল স্তম্ভ।

বয়সে বৃদ্ধ না হইলেও প্রৌঢ় তিনি হইয়াছিলেন—যদিও নরেন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ তাঁহাকে 'বুড়ো' বলিতেই ভালবাসিতেন—কিন্তু বার্ধক্য তাঁহার মনকে কখনও অধিকার করিতে পারে নাই। অদ্ভুত প্রাণোচ্ছলতা, অসাধারণ সজীবতা, অভ্রান্ত সপ্রতিভতা এবং অপরিমেয় সরসতা তাঁহাকে সর্বদা উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। বস্তুতঃ, তাঁহাকে কখনও কেহ 'গোমড়া' মুখে দেখে নাই। গম্ভীর তিনি হইতেন, কিন্তু সে-গাম্ভীর্য হিমালয়ের গাম্ভীর্য। তখন তাঁহার সম্মুখীন হওয়া ছিল দুঃসাধ্য। কিন্তু বিষণ্ণতা এবং অপ্রফুল্লতা ছিল তাঁহার স্বভাববিরোধী। শারীরিক অথবা মানসিক কোন কারণই তাঁহার প্রফুল্লতা ও প্রাণোচ্ছলতার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শুধু নিজেই যে কখনও গোমড়া মুখে থাকিতেন না তাহাই নহে, কাহারও গোমড়া মুখ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অল্পবয়সীদের বুড়োটেপনাও তাঁহার কাছে অসহ্য ছিল। 'অসহ্য ছিল' বলিলে বোধ হয় সবটা বলা হয় না, উহা ছিল তাঁহার দুই চক্ষের বিষ। নিজে সবসময় আনন্দে ভাসিতেন, যাহারা তাঁহার কাছে আসিতেন তাহাদের সবাইকেও আনন্দে ভাসাইতেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলিতেছেন: "তাঁকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি। সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনো বাপু নিরানন্দ দেখিনি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৭ম সং, ১৩৮০, পৃঃ ৫৩) অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "আপনি মজার লোক, আপনার কাছে মজা খুব।" ('কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৫৭)

সাধু-সন্ত মানুষ—কিন্তু অহেতুক কৃচ্ছ্রতায় তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কৃচ্ছ্রতার ভড়ং করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন।

একদিন অশ্বিনীকুমার দত্ত গিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি তাঁহার সেই দর্শন-বিবরণে লিখিতেছেন :

"এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল; এখন তক্তপোশের উপরে উঠে লম্বা হয়ে শুলেন। আমায় বললেন, 'হাওয়া কর।' আমি হাওয়া করতে থাকলাম। চুপ করে রইলেন। একটু পরে বললেন, 'বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও।' আমি বললাম, 'আবার শখ তো আছে দেখছি।' হেসে বললেন, 'কেন থাকবেনি? ক্যা—নো—থাকবেনি?' আমি বললাম, 'তবে থাক, থাক, খুব থাক।' সেদিন কাছে বসে যে-সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।" ('কথামৃত', পৃঃ ১২৫৭)

জগদম্বার কাছে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন : "মা, আমাকে শুকনো সাধু করিসনি—রসেবসে রাখিস।" ('লীলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, ১৩৯০, গুরুভাব : উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৪৯-২৫০) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্ম হইল এই 'রসেবসে' থাকিবার কৌশল। জীবনকে ধার্মিকতার ধ্বজায় আপাদমস্তক জড়াইয়া রাখিতে তিনি বলেন নাই। তিনি জীবনের প্রতিটি অঙ্গকে, প্রতিটি অংশকে, প্রতিটি স্তরকে, প্রতিটি মাত্রাকে স্পর্শ করিতে চাহিয়াছেন। এই স্পর্শে কোথাও বাস্তবকে অস্বীকার করিবার বাসনা নাই, কিন্তু বাস্তবকে ধরিয়া বাস্তবকে অতিক্রম করিবার আহ্বান ফল্গুধারার মতো তাঁহার কথায় ও আচরণে সর্বদা বহমান রহিয়াছে। আচার্য শঙ্কর বা শঙ্করপন্থীদের মতো জগৎকে 'মায়া' বলিয়া, 'মিথ্যা' বলিয়া জগৎ হইতে তাঁহার দৃষ্টিকে তিনি সরাইয়া লন নাই। জগতের দৈন্য, জগতের অনিত্যতা, জগতের ক্লেদ, জগতের গ্লানি—কোন কিছুই তাঁহার চোখ এড়াইয়া যায় নাই, কিন্তু জগতের মধ্যে শুধু দৈন্য, শুধু অনিত্যতা, শুধু ক্লেদ, শুধু গ্লানিকে দেখিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। জগতের অন্ধকারের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন আলো এবং উজ্জ্বলতাকে। এই দৃষ্টির মূলে ছিল তাঁহার জীবনরসিকতার বোধ। 'কথামৃতে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মুক্তার মতো ছড়ানো রহিয়াছে তাঁহার সেই রসদৃষ্টির অজস্র সম্ভার। নিকষার গল্পটিই ধরি না কেন : "রামচন্দ্র রাবণবধের পর রাক্ষসপুরী প্রবেশ করলেন; বুড়ি নিকষা দৌড়ে পালাতে লাগল। লক্ষ্মণ বললেন, 'রাম! এ কী বলুন দেখি, এই নিকষা এত বুড়ি, কত পুত্রশোক পেয়েছে—তার এত প্রাণের ভয়, পালাচ্ছে!' রামচন্দ্র নিকষাকে অভয়দান করে সম্মুখে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করাতে নিকষা বললে, 'রাম, এতদিন বেঁচে আছি বলে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে। তোমার আরও কত লীলা দেখব।' (সকলের হাস্য)।" ('কথামৃত', পৃঃ ১১৭-১১৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিকষা নিছক কোন কাল্পনিক বা পৌরাণিক চরিত্র নহেন, 'নিকষা' তাঁহার কাছে জীবনরসিকতার এক প্রতীক-বিগ্রহ। রাবণ, কুম্ভকর্ণের মতো তাঁহার পুত্ররা নিহত রামচন্দ্রের হাতে, তাঁহার পৌত্ররাও নিহত তাঁহার হাতে। পুত্রের সাধের স্বর্ণলঙ্কা রামচন্দ্রের বাণে বাণে ছারখার হইয়া গিয়াছে। লঙ্কার গৃহে গৃহে মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। স্বামীহারা স্ত্রীদের, পুত্রহারা মায়েদের আর্তনাদে লঙ্কার আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। অথচ বৃদ্ধা নিকষা ইহার মধ্যে রামচন্দ্রের 'লীলা' দেখিতেছেন! কারণ, নিকষার কাছে যে সব রামময়। রাবণ তাঁহার কাছে পুত্র নহেন, তিনি রজোরূপী রাম। কুম্ভকর্ণ তমোরূপী রাম, বিভীষণ সত্ত্বরূপী রাম।

জগৎ মানেই লীলা। আমরা সবাই লীলার মধ্যে রহিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন পারমার্থিক অর্থে লীলা সত্য নহে, কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে লীলাকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি সর্বত্যাগী ছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন জগৎ অনিত্য। ভাইপো রামলালকে বলিয়াছিলেন : যদি জানিতাম জগৎটা নিত্য তাহা হইলে কামারপুকুরটাকে সোনা দিয়া মুড়িয়া দিয়া যাইতাম। জগৎ অনিত্য বলিয়া কামারপুকুরকে তিনি সোনা দিয়া মুড়িয়া দেন নাই ঠিকই, কিন্তু কামারপুকুরের মাটির প্রতি টানকে তিনি কী অস্বীকার করিয়াছেন? কামারপুকুরের মানুষের প্রতি টানকে তিনি কী অস্বীকার করিয়াছেন? কামারপুকুরের রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়-পরিজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতাকে কী তিনি অস্বীকার করিয়াছেন? মায়ের প্রতি, ভাইয়ের প্রতি, ভাইয়ের ছেলে-মেয়ের প্রতি তাঁহার টানের কাহিনী সকলেই জানেন। দেহান্তের আগেও ভাইঝি লক্ষ্মীর জন্য তাঁহার কত চিন্তা! শ্রীশ্রীমাকে বলিতেছেন : "লক্ষ্মীটিকে দেখো।" ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যুতে তিনি অ[illegible]রে [illegible]দিয়াছেন—বুকের ভিতরটা গামছা-নিঙড়ানোর মতো মোচড় দিয়াছে। গর্ভধারিণীর মৃত্যুতে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অবর্তমানে সহধর্মিণীর ভরণ-পোষণের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই টান, এই দরদ, এই কান্না, এই উদ্বেগ কী সন্ন্যাসীর কঠোরতার নিরিখে বেমানান নহে? হ্যাঁ, শুষ্ক সন্ন্যাসের আদর্শে এই হৃদয়রসের কোন স্থান না থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর শিরোমণি হইয়াও সেই আদর্শে ব্যতিক্রমী নজির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অবশ্য তাঁহার পূর্বসূরী বুদ্ধ, খ্রীস্ট এবং চৈতন্য। তবে যেহেতু তিনি সন্ন্যাস ও সমাজকে সম্বদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, সন্ন্যাসকে সমাজমুখী এবং মানবমুখী করিতে চাহিয়াছিলেন, সেইজন্য হৃদয়ের সরসতার ক্ষেত্রে তিনি নূতনতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়াও জন্মভূমি, গর্ভধারিণী, সহধর্মিণী, আত্মীয়-পরিজনের জন্য যে-আচরণ তিনি করিয়াছেন তাহা একদিকে গৃহীদের সামনে আদর্শের নজির সৃষ্টি করিবার

জন্য, অপরদিকে সন্ন্যাসের কঠোরতায় হৃদয়ের রসসঞ্চার করিবার জন্য। তাঁহার প্রধান শিষ্য এবং বার্তাবহ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এই বিষয়ে তাঁহার যোগ্যতম উত্তরসাধক। মনে রাখা প্রয়োজন, আত্মীয়-পরিজনের জন্য দরদকে অটুট রাখিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের মূল আদর্শ ত্যাগ ও অনাসক্তি হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই, বরং প্রতি পদে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের জীবনে ও আচরণে।

রঙ্গে রসে রসিকতায় পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন, আমরা যেন জীবনকে শুধু 'দিনযাপনের গ্লানি' ভাবিয়া এক যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন না হই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা যেন উপভোগ করি। শ্রীরামকৃষ্ণের সরস ব্যক্তিত্ব তাঁহার জীবনকে এক পরম মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। গম্ভীর হইলেও সেই মাধুর্য তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। ভগিনী দেবমাতা তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডেজ ইন অ্যান ইন্ডিয়ান মনাস্টারি' গ্রন্থে শ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন ঃ "ঠাকুর তাঁহার তরুণ শিষ্যদের সঙ্গে খেলা করিতেন—যেন তাঁহারা নেহাৎ ছেলেমানুষ। তিনি ছিলেন খুব রঙ্গপ্রিয়। একদিন পঞ্চবটীর সামনে এক দর্শনার্থী ঠাকুরকে এই ভক্ত ছেলেদের সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলিতে দেখেন। কখনও কখনও তিনি অন্যের নকল করিয়া তাঁহাদের খুব হাসাইতেন। আবার পরমুহূর্তেই তিনি গম্ভীর।...

"গম্ভীর বা রঙ্গরত—যে-অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আনন্দের একটি বাতাবরণ সতত শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরিয়া রাখিত, সতত আনন্দ বিচ্ছুরিত হইত তাঁহার সত্তা হইতে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, যে-ধর্মে মুখ গোমড়া করিয়া রাখিতে হয় সেই ধর্মে তাঁহার কাজ নাই।" (১৯৭৫ সং, পৃঃ ২৪২)

বস্তুতঃ, তাঁহার রসবোধ ছিল তাঁহার জীবনবোধেরই অঙ্গ। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝা গিয়াছে যে, যে-জীবনে রসবোধ নাই, সেখানে সুস্থ কোন জীবনবোধ গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। জীবনে দুঃখ, হতাশা, বিশ্বাসভঙ্গ, বিপর্যয় থাকিবেই। কিন্তু সেইজন্য জীবনের মধুকে হারাইয়া যাইতে দিব কেন? জীবনের মাধুর্যকে ভুলিয়া হতাশায় ডুবিয়া যাইব কেন? জীবনের ইতিবাচক দিকের প্রতি মুখ ফিরাইয়া থাকিব কেন? এই 'অনবসাদ'-এর দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দিয়াছেন। এই দর্শনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জীবনকে সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুভাবে উপভোগের কৌশল।

শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গরসে পূর্ণ এক মানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার রঙ্গরসের একটি গভীর দিক অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো সর্বদা বিদ্যমান। তাঁহার রসিকতায় কোন-না-কোন ভাবে সংযুক্ত ঈশ্বর এবং ঈশ্বররস। তাঁহার প্রতিটি সরস বাক্য, রসময় গল্প অথবা আচরণের গভীর বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিব সেই বাক্য, গল্প বা আচরণের পিছনে রহিয়াছে তাঁহার এক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি। সেই অন্তর্দৃষ্টি উঠিয়া আসিয়াছে তাঁহার পরম গভীর জীবনবোধ হইতে। সেই জীবনবোধের একদিকে জগৎ ও মানুষ এবং অপরদিকে ইন্দ্রিয়াতীত ভূমি ও ঈশ্বর। এই উভয়ের মধ্যে আলোকসেতুরূপে দণ্ডায়মান তিনি স্বয়ং। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইতে পারে ঃ

দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরের মেঝেতে বসিয়া আছেন 'জগদম্বার বালক'। একজন ভক্ত তাঁহার জন্য এক চাঙারি জিলিপি আনিয়াছেন। তিনি একটু জিলিপি ভাঙিয়া খাইলেন। ইহার পর 'কথামৃত'-র বর্ণনা ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদির প্রতি সহাস্যে)—দেখছ, আমি মায়ের নাম করি বলে এইসব জিনিস খেতে পাচ্ছি! (হাস্য)...

"ঘরে একটি ছয়-সাত বছরের ছেলে প্রবেশ করিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালকাবস্থা। একজন ছেলে যেমন আর একজন ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকাইয়া রাখে—পাছে সে খাইয়া ফেলে, ঠাকুরেরও ঠিক সেই অপূর্ব বালকবৎ অবস্থা হইতেছে। তিনি জিলিপির চাঙারিটি হাত চাকা দিয়া লুকাইতেছেন। ক্রমে তিনি চাঙারিটি একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া দিলেন।...

"বালকের ন্যায় হাত ঢাকিয়া মিষ্টান্ন লুকাইতে লুকাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।" ('কথামৃত', পৃঃ ১৪৯)

কী সহজ, অথচ কী গভীর! সহজের মধ্যে এই গভীরতাই শ্রীরামকৃষ্ণের সরসতার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষদর্শী অশ্বিনীকুমার দত্ত লিখিতেছেন ঃ "ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচদিনের দেখা, কিন্তু ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই এমন হয়েছিল যে, তাঁকে (ঠাকুরকে) মনে হতো যেন এক ক্লাসে পড়েছি, কেমন বেয়াদবের মতো কথা বলেছি; সম্মুখ থেকে সরে এলেই মনে হতো, 'ওরে বাপরে, কার কাছে গেছলাম!' ঐ কদিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি তাতে জীবন মধুময় করে রেখেছে।" ('কথামৃত', পৃঃ ১২৫৯)

আমাদের জীবনকেও 'মধুময়' করিবার জন্য আশ্রয় লইতে হইবে ঐ রসিকোত্তমের কাছে। তিনি বলিতেন জীবনে দুঃখ, বিষাদ ও নৈরাশ্যের উপকরণের অভাব নাই। তোমার নিজস্ব দুঃখ, বিষাদ ও নৈরাশ্যকে উহার সহিত যুক্ত করিয়া সংসারকে আরও ভারাক্রান্ত করিও না। সে-অধিকারও তোমার নাই। বরং সংসারের দুঃখ, বিষাদ ও নৈরাশ্যের আবহাওয়াকে তোমার রসবোধ ও সরসতার ঐশ্বর্যের দ্বারা যথাসাধ্য লাঘব করিবার চেষ্টা কর। ইহাতে তুমি যেমন আনন্দ পাইবে, সংসারের পরিবেশও ভারহীন হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের হাসিহীন, রসহীন, দুর্বহ জীবনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ এবং সেখানেই নিহিত আমাদের ব্যাধির অব্যর্থ প্রতিষেধক।□

বিশেষ নিবন্ধ

গুরুর স্বরূপ

স্বামী ভূতেশানন্দ

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে পরম পূজ্যপাদ সংঘগুরু মহারাজের এই বিশেষ নিবন্ধটি প্রকাশিত হলো। —সম্পাদক, উদ্বোধন

সাধারণ মানুষের মনে গুরুবাদ সম্বন্ধে নানা বিতর্ক ও বিভ্রান্তি আছে। এরই পরিপুষ্টিরূপে আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রে গুরুবাদ সম্বন্ধে আপাতবিরোধী অনেক বর্ণনা আছে। সেগুলিকে বুঝতে হলে কতকগুলি বিশেষ সিদ্ধান্ত মনে রেখে বুঝবার চেষ্টা করতে হয়।

প্রথম কথা, গুরু এবং ইষ্ট এক ও অভিন্ন এবং যিনি ইষ্ট তিনিই পরমেশ্বর ঃ "গুরুঃ বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্।" (গুরুগীতা-১৪)।—যে-রূপেই আমরা তাঁকে গ্রহণ করি না কেন, আমাদের ইষ্টমূর্তি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সবই পরমেশ্বরের রূপ। পরমেশ্বর কখনো দুটি হন না। উপনিষদেও এসম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলা আছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রশ্ন করা হয়েছে—কয়টি দেবতা? তার উত্তরে বলা হয়েছে—তিনশো তিন ও তিনহাজার তিন ঃ "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা" (৩।৯।১)। তাৎপর্য হলো—দেবতা অসংখ্য। এই দেবতারা সকলে একই ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। দেবতার সংখ্যা অসংখ্য হলেও স্বরূপতঃ তিনি এক। তাই ক্রমশঃ সংখ্যা সীমিত করে শেষকালে বলা হয়েছে, তিনি এক—"একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।৯)। যত রূপ আমাদের জানা আছে বা যত রূপ আমাদের জানা নেই কিংবা ভবিষ্যতে তিনি যত রূপ পরিগ্রহ করবেন—সব সেই এক পরমেশ্বরেরই রূপ—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৫।১৯; কঠ উপনিষদেও এটি আছে—২।২।৯)। একথাটি ভুলে গিয়ে আমরা তাঁদের বিভিন্ন বলে মনে করি আর এই কারণেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। কোন দেবতা অধিক শক্তিমান, কেউ অল্প শক্তিমান—এইরকম কল্পনা মনে আসে। কিন্তু যদি এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকি যে, সব দেবতাই এক, তাঁরা পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ তাহলে আর বিরোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমেই বলেছি, ইষ্ট আর গুরু এক। যে-রূপ আমাদের সাধনের জন্য গ্রহণ করি তিনিই ইষ্ট। সেই তিনি এক এবং অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ। এখন গুরু আর ইষ্ট যদি অভিন্ন হন তাহলে প্রত্যেকের গুরুই এক পরমেশ্বর। সাধারণতঃ আমরা একজন বিশেষ মানুষকে লক্ষ্য করে গুরু বলে থাকি। মনে করি, আমার গুরু একজন, অন্যের গুরু আরেকজন। এইরকম বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন গুরু কল্পনা করলে গুরু অসংখ্য হয়ে যান। কিন্তু সেই অসংখ্য গুরুর মধ্যে অসংখ্য দেবতার মতো একই পরমেশ্বরের প্রকাশ। তাই গুরু এবং ইষ্ট অভিন্ন—এই তত্ত্বটিকে যদি আমরা ধরে রাখতে পারি তাহলে আর আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসবে না।

আমরা আমাদের সংস্কার অনুসারে দেহ ধারণ করি। দেহত্যাগ করে আবার নতুন দেহ ধারণ করি—তাও সংস্কার অনুসারে, কর্মের ফল অনুসারে। এই যে দেহধারণ, এর অর্থ কি? অর্থ হলো, যেকোন একটি বিশেষ সংস্কারবিশিষ্ট আমার সত্তাকে 'আমি' বলে মনে করা। সেই সত্তাকে কখনো দেহের সঙ্গে মিলিয়ে বলি, কখনো মনের সঙ্গে, কখনো বা দেহমনের অতীত স্বরূপের সঙ্গে। যখন দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ করে বলি আত্মা, সে-আত্মা দেহের বিলয় হলে আর থাকতে পারেন না। যখন মনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখি তখন আমি সুখী আমি দুঃখী, এইরকম মনের নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মারও পরিবর্তন হচ্ছে—এইরকম মনে হবে। কিন্তু সব জায়গাতেই 'আমি' রয়েছে। সেই 'আমি'কে অত পরিবর্তনশীল মনে করলে পরিবর্তনকে জানে কে? যে জানে সে নিজেই যদি অত পরিবর্তনশীল হয় তাহলে তার স্বরূপকে সে ধরে রাখতে পারে না। কাজেই একজন জ্ঞাতা থাকবেন যিনি পরিবর্তনগুলি দেখবেন। তিনি পরিবর্তনের সাক্ষী। তিনিই প্রকৃত আত্মা। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।" একটি সুতো যেমন একটি মালার নানা ফুলের মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে তেমনই তিনি সকল পরিবর্তনের ভিতরে অনুস্যূত হয়ে রয়েছেন ঃ "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" (গীতা, ৭।৭)। আত্মা মানে ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে তিনি আমাদের সমস্ত পরিবর্তনের ভিতরে একরূপ হয়েই পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে সাধারণ

মানুষ বুঝতে পারে না। জ্ঞানিব্যক্তিরাই উপলব্ধি করতে পারেন।—"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।/বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥" (গীতা, ১৫।১০)। এই আত্মাকে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখে তাঁর পরিবর্তনশীল রূপগুলিকে আত্মার স্বরূপ বলে মনে না করে যিনি পরিবর্তনের সাক্ষী তাঁকেই যদি আত্মা বলে জানি তাহলে সেই আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। "যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।" (গীতা, ১৫।১১)। দেহাভিমানী আত্মার জন্ম-মৃত্যু আছে। কাজেই যাকে আমরা প্রারব্ধ ভোগ বলি তার সঙ্গে পূর্বদেহের কোন স্থূলসম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং পূর্বদেহে যে-দীক্ষা হয়েছে তার স্মৃতিও থাকে না এবং তার স্থূল সংস্কারও থাকে না। তাহলে গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ রইল কোথায়?

এখানে বুঝতে হবে যে, যাঁকে গুরু বলি তিনি একটি দেহধারী ব্যক্তিমাত্র নন। কারণ দেহধারী মাত্রেই জন্মমৃত্যুর অধীন। শাস্ত্রে গুরুকে নিত্য বলা হয়েছে— "নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।" (গুরুগীতা-৫০)। কাজেই গুরুর স্থূলদেহের সঙ্গে নিত্যগুরু সংশ্লিষ্ট নন। এইভাবে বুঝলেই গুরুকে নিত্য বলা যায় এবং সেই নিত্যগুরুর সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। ঈশ্বর যে-দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী, নিত্যগুরুও সেই দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী। এই নিত্যগুরুর সঙ্গেই ঈশ্বরের একত্ব। শাস্ত্র গুরুপ্রণামে বলছেন ঃ

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(গুরুগীতা-২৬)

আরও আছে ঃ

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(ঐ-৩৭)

গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; তিনিই পরব্রহ্ম। এই গুরু যেমন আমার গুরু তেমনি অপর সকলেরও গুরু। কারণ এই গুরু বহু নন, এক। এই দৃষ্টি আমরা ধারণা করতে পারি না বলে দেহধারী ব্যক্তিকে গুরু বলে মনে করি। দেহধারী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেহধারী আমাদের নিত্যসম্বন্ধ সম্ভব নয়। সুতরাং শাস্ত্রমতে দেহধারী ব্যক্তিকে গুরু বলা হয় না। আর নিত্যগুরু যিনি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না।

তাহলে দেহধারী গুরুকে আমরা কি দৃষ্টিতে দেখব? তাঁকে আমরা নিত্যগুরুর প্রতীকরূপে দেখব। যেমন দেবদেবীকে প্রত্যক্ষরূপে চিন্তা করতে পারি না বলে তাঁদের মূর্তিগুলিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করি। পূজার শেষে যে-মূর্তিগুলির বিসর্জন দিই তাতে দেবতার বিসর্জন হয় না। সেইরকম স্থূলদেহধারী গুরুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিজের অথবা গুরুর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু নিত্যগুরুর সঙ্গে এই বিচ্ছেদ সম্ভব নয়।

পুরাণের কল্পনা যে, মৃত্যুর পর গুরু আমাদের উপযুক্ত লোকে নিয়ে যান। শাস্ত্রযুক্তিতে দেখলে আত্মা যখন একটি দেহের প্রতি অভিমান ত্যাগ করে সঙ্গে সঙ্গে সে দেহান্তর কল্পনা করে। সেই দেহান্তরের সঙ্গে তার পূর্বদেহের সম্বন্ধ থাকে না। পূর্বদেহ ভস্মসাৎ হয়ে যায় কিন্তু সংস্কারগুলির পরিণামরূপে যে নতুন দেহ হয় তা আবার জন্মান্তরকে নিয়ন্ত্রিত করে পূর্বকর্মের ফল ভোগ করায় এবং নতুন কর্ম সঞ্চয় করে। উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

"তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ॥"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।২)

অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীবাত্মা দেহ থেকে উৎক্রমণ করলে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি উৎক্রান্ত হয়। তখন পূর্বজন্মের সংস্কার প্রবল হয়ে তার ভবিষ্যৎ দেহ কেমন হবে জানিয়ে দেয়। পরজন্মে নতুন দেহপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপ্রজ্ঞা অর্থাৎ কর্মফল ও সংস্কার তাঁর সঙ্গে গমন করে। এই বিষয়ে গীতায় আছে ঃ

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥"

(১৫।৮-৯)

—যেমন পূর্ব পূর্ব কর্মের ফল এই নতুন দেহে সে ভোগ করে, তেমনি পূর্বজন্মে গুরুনির্দিষ্ট যে সাধনপ্রণালী তার ফলও তাতে বর্তায়। এতেই বলা যায়, জন্মান্তরে গুরু শিষ্যকে যোগ্য পথে পরিচালিত করেন। তা না হলে স্থূলদৃষ্টিতে এই সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। আবার এই সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের বিচ্ছেদও হয় না।

শ্রীভগবান আমাদের সেই দৃষ্টি দিন যাতে আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করে মনের পরিশুদ্ধির দ্বারা সেই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি।☐

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ত্যাগ-তপস্যা, সংযম, বিবেক-বৈরাগ্য এবং সচ্চরিত্র মানুষের প্রকৃত সম্পদ। এই সম্পদ না থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। উন্নতি তো পরের কথা, এগুলি ভিন্ন আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করাই সম্ভব নয়। স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা-দ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল অন্তরায়। এগুলি ত্যাগ করা চাই। কুসঙ্গ ও তুচ্ছ কামনা-বাসনার পিছনে ছুটলে কিছুই হবে না। সাধন-ভজনে প্রীতি, ত্যাগ-তপস্যা, বিবেক-বৈরাগ্য ও বিচার না থাকলে শান্তি বা আনন্দের সন্ধান কোথা থেকে পাওয়া যাবে? চাই উন্নত চরিত্র, সরলতা, পবিত্রতা এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরনির্ভরতা।

অনেকে বলেনঃ "আশীর্বাদ করুন।" ঠাকুরের সন্তানরা বলতেনঃ "আশীর্বাদ তো আছেই। কৃপাবাতাস সবসময় বইছে।" কিন্তু সে-বাতাস আমাদের গায়ে যে লাগছে তা আমরা বুঝি কই? বুঝতে গেলে যোগ্যতা দরকার। সেই যোগ্যতা সাধনের দ্বারা অর্জন করতে হয়। আপ্রাণ চেষ্টা এবং ত্যাগ-তপস্যা না থাকলে শুধু আশীর্বাদে কী হবে? আশীর্বাদের যোগ্য হতে হলে জীবনকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা চাই। মনকে বশে আনতে হবে। আমরা সবাই মনের দাস। কিন্তু মনকে 'দাস' করতে পারে কজন? মনকে আমাদের 'দাস' করতে হবে। সেজন্য ত্যাগ-তপস্যা, সংযম, বিবেক-বৈরাগ্য চাই। কিন্তু এগুলির সঙ্গে চাই একান্তভাবে ঈশ্বরনির্ভরতা। ঠাকুর বলতেন, "ইচ্ছালয়"। ভারী সুন্দর কথা! নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছায় "লয়" করতে হবে। অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা আনতে হবে, যেখানে আমার নিজের ইচ্ছা বলে কিছু থাকবে না—সব "তাঁর ইচ্ছা", "রামের ইচ্ছা" হয়ে যাবে। শুধু মুখে বললে হবে না, অন্তরে গেঁথে ফেলতে হবে। তখন দেখা যাবে, মনকে বশে আনার জন্য আমাকে আলাদাভাবে আর কোন চেষ্টা করতে হচ্ছে না। মন তখন প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকবে। মনকে বশে আনতে হলে নিত্য আকুল প্রাণে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। আকুল প্রাণে প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন এবং সব যোগাযোগ করে দেন।

আমরা বলি সাধন-ভজনের কথা, ত্যাগ-তপস্যার কথা, বিবেক-বৈরাগ্যের কথা। এগুলি আমাদের করতেই হবে। কিন্তু সেইসঙ্গে এইটিও জেনে রাখতে হবে, তাঁর কৃপাই হলো আসল। আমরা অবশ্য অহরহ তাঁর কৃপা পাই। তিনি তো তাঁর কৃপার ভাণ্ডার হাট করে খুলেই রেখেছেন, হরির লুটের মতো দুহাত ভরে বিতরণ করে চলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা তা বুঝি কই? নিতে পারি কই? আসলে তাঁর কৃপাতেই তাঁর কৃপা বোঝা যায়, তাঁর কৃপার অধিকারী হওয়া যায়। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁর কৃপা অযাচিতভাবে আমাদের ওপর বর্ষিত হচ্ছে। তাঁর কৃপা হলে তবে সেকথা আমরা উপলব্ধি করতে পারব। আমরা যখন দুঃখ পাই, আঘাত পাই, আমাদের জীবনে যখন দুর্দৈব নেমে আসে তখন কি আমরা মনে করি, এগুলির পিছনে তিনি আছেন? এগুলিতেও তাঁর কৃপাকে আমরা দেখতে পারি কি? সাধারণতঃ পারি না। যখন পারব তখনই আমরা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। যখন দুঃখের মধ্যে, বিপদের মধ্যে তাঁরই করুণাময় উপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করব তখনই বুঝব আমরা তাঁর কৃপা পাচ্ছি। শুধু দুঃখ কেন, সুখ যখন পাই তখনো যেন তাঁকে না ভুলি। যেন বুঝি এই সুখ তাঁরই দেওয়া। দুঃখের সময় যেন স্মরণে থাকে যে, এই দুঃখ দেওয়ার পিছনে তাঁর কোন পরিকল্পনা আছে। পরে এই পথ বেয়েই আমার জীবনে সুখ আসবে। এই অনুভূতি যখন আসবে তখন বুঝতে হবে, তাঁর কৃপাতেই তা আসছে। আসলে তাঁর কৃপাতেই তাঁর কৃপা বোঝা যায়।

সবকিছুতে তাঁর কৃপার অস্তিত্বে বিশ্বাস আধ্যাত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই বিশ্বাসকে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে পুষ্ট করার জন্য সাধুসঙ্গের খুব দরকার। সাধুসঙ্গের ফলেই মনুষ্যত্ব জাগে ও ভগবানে মতি হয়। সদ্‌গ্রন্থপাঠ, তীর্থভ্রমণ, ব্রত-উপবাস, স্মরণ-মনন, ব্যাকুলতা আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে খুবই সহায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু উপলব্ধিবান ব্যক্তির সান্নিধ্য ও পদপ্রদর্শনের ভূমিকাই অধ্যাত্মজীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নিজের চেষ্টা। না খাটলে কিছুই লাভ করা

যায় না। তিনি তো দেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন, কিন্তু পাওয়ার জন্য আমাকে খাটতে হবে। মা বলছেন ঃ "সবসময় সৎ-অসৎ বিচার করতে হয়, আর খুব খাটতে হয়।" যারা অলস তারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। তারা জ্ঞান-বিবেক হারিয়ে জন্ম জন্ম দুঃখ-ব্যথা টেনে আনে। তাদের মতো মূর্খ হতভাগ্য আর কে আছে? আলস্য আধ্যাত্মিক জীবনের এক বিরাট প্রতিবন্ধক। ধর্মজীবনে আলস্যের কোন স্থান নেই। মনের স্বভাবই হচ্ছে শৈথিল্য, আলস্য। কিন্তু পুরুষকারের দ্বারা, কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বারা, সংযমের শাসনের দ্বারা মনকে আমার ইচ্ছামত আমার ইষ্টপথে পরিচালিত করতে পারি। বহু ভাগ্যে এই মানবজীবন। আলস্যে, শৈথিল্যে তাকে নষ্ট করলে অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। পুরুষকার প্রয়োগ করে এজন্মে যতটা এগিয়ে থাকব, পরের জন্মে সেখান থেকেই আবার জীবন শুরু করব। সুতরাং এই জীবনের একটি দিনের—একটি মুহূর্তেরও যেন অপব্যয় না হয়, অপব্যবহার না হয়।

ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছি, তাঁদের প্রতিটি কাজ ছিল ঠাকুর-কেন্দ্রিক। তাঁরা যে সবসময় ঠাকুরের কথা মুখে বলতেন, তা নয়। তাঁদের প্রত্যেক কাজকর্ম, প্রত্যেক আচরণ, আচার-ব্যবহার—সবকিছুতেই মনে হতো, তাঁদের জীবন ঠাকুরময় হয়ে আছে। মঠে সত্যি সত্যি ঠাকুর রয়েছেন, সঙ্ঘ-পরিবারের জীবন্ত সদস্য তিনি এবং তিনিই মধ্যমণি—এই ছিল তাঁদের মূল ভাব ও ভাবনা।

সাধন-ভজন অল্পবয়সে বেশি করে নিতে হয়। এই সময়ই সাধন-ভজনের আসল সময়। বয়স বাড়লে শরীরের শক্তি কমে আসে, মনের ক্ষমতাও কমে আসে। মহারাজ বলতেন ঃ "বল বুদ্ধি ভরসা, ত্রিশ পেরলেই ফরসা।" সুতরাং যতটা পারি ততটা যেন সাধন-ভজনে ব্যয় করি। তাঁর স্মরণ-মননে, নামচিন্তায় ব্যয় করি। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, দুর্গাপূজার তিনদিন, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, শিবরাত্রি প্রভৃতি উপলক্ষেও উপবাস বা অল্পাহার বা নিরামিষ ভোজন খুব ভাল। এতে মন শান্ত থাকে, সংযত থাকে। ফলে এই দিনগুলিতে বেশি সময় ধরে সাধন-ভজন করা যায়। কিছুদিন পর মনে হবে, এরকম দিনগুলি যেন এইভাবেই কাটাতে পারি। এই দিনগুলিতে প্রকৃতিতে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আমাদের মনকে সংযমের দ্বারা শুদ্ধ করলে সেই তরঙ্গের অভিঘাত আমরা অন্তরে অনুভব করতে পারি। লক্ষ্য করলে দেখব, এই দিনগুলিতে সন্ধিমুহূর্তগুলি স্মরণ-মননের জন্য বিশেষ উপযোগী। 'সন্ধিমুহূর্ত' অর্থাৎ প্রত্যূষ বা উষাকাল, দ্বিপ্রহর, প্রদোষ বা সূর্যাস্ত এবং রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যবর্তী কাল ও মধ্যরাত্রি। মধ্যরাত্রিকে বলে মহানিশা। মহানিশায় জপ-ধ্যান খুব জমে। সমস্ত প্রকৃতি তখন নিস্তব্ধ নিথর। যেন প্রকৃতি নিজেই ভগবানের ধ্যানে মগ্ন।

ঠাকুরসেবা, গুরুসেবা, সাধুসেবা খুব কঠিন। মনে অহঙ্কার থাকলে সত্যিকারের সেবা হয় না। যত অহংশূন্য হওয়া যাবে ততই সেবা সার্থক হবে। অহঙ্কার নিয়ে সেবা মহা অনর্থকর। ঠাকুরকে আমরা দেখিনি, কিন্তু ঠাকুরের সন্তানদের আমরা দেখেছি। তাঁদের কাছে শুনেছি, ঠাকুরের সেবা করতে করতে তাঁদের যেন একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েছিল। মুখ ফুটে বলার আগেই ঠাকুরের কি প্রয়োজন তা তাঁরা বুঝে ফেলতেন। হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন ঃ "যে সেবক, তাকে যদি সবসময় বলতেই হয়—কী দরকার, তাহলে সেই সেবক অধম সেবক। বলার আগেই যে বুঝে ফেলে, সে উত্তম সেবক।" মহারাজ বলতেন ঃ "যে-সেবককে প্রয়োজনের কথা বলতে হয়, সে অধম সেবক; যে-সেবক নিজে থেকেই সেব্যের প্রয়োজনমত সবকিছু করে, সে মধ্যম সেবক; আর যে-সেবক রুটিন সেবার বাইরে সেব্যের ইচ্ছা ও প্রয়োজন বুঝে নিয়ে সেবা করে সে উত্তম সেবক।" একটা কথা আছে—"সেবাপরাধ"। সেবা করতে গিয়ে নতুন করে সেবকের অহঙ্কার জন্মায়। এই অহঙ্কার সেবকের সেবাভাবকে গুঁড়িয়ে দেয়। সেব্য সম্পর্কে একটা অধিকারবোধ আসে, যা থেকে পরে সেব্য সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্যভাবও জাগে। বলা বাহুল্য, এই ভাব নিয়ে সেবা হয় না, যা হয় তা সেবার নামে অপরাধ। একেই বলে সেবাপরাধ। এর তুল্য অপরাধ দ্বিতীয়টি নেই। সেবককে তাই অতি সতর্ক থাকতে হয়, যাতে মনে কোনভাবে অভিমান, অহঙ্কার না আসে। অহঙ্কারশূন্য সেবা গৃহী ও সন্ন্যাসী—উভয়ের আদর্শ। ঘরকন্নার কাজই হোক আর আশ্রম-মঠের কাজই হোক, অফিস-কারখানার কাজই হোক আর বাড়িতে রান্নার জন্য কুটনো কোটাই হোক, রান্না করাই হোক আর পূজার কাজই হোক, ঠিক ঠিক সেবাভাব নিয়ে যদি আমরা করতে পারি ফল সবক্ষেত্রেই এক—চিত্তের প্রসন্নতা। এই প্রসন্নতাই ভক্তকে নিয়ে যায় ঈশ্বরদর্শনের পথে এবং

জ্ঞানীকে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথে। স্বামীজী এই সেবার আদর্শ এবার দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর গুরুভাইরা তাঁদের জীবনে সেই আদর্শকে তাঁদের কথায় ও কাজে বাস্তবে রূপদান করেছেন। আমরা মঠে সেই ছকটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। তাঁদের এই ছক এযুগের মানুষের কাছে একটা 'মডেল' বা আদর্শ। যে যত এই আদর্শকে তার নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারবে, তার জীবন হবে তত সার্থক। গীতাতে পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই আদর্শ মানুষকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছিলাম। স্বামীজী এসে এযুগে শ্রীকৃষ্ণের সেই আদর্শকে আবার নতুন করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। বললেন ঃ কোন কাজই কাজ নয়, সব কাজই সেবা। সব কাজই পূজা—উপাসনা। তিনি বলতেন ঃ "প্রথমে Work and Worship অর্থাৎ কাজ এবং পূজা। তারপর Work as Worship অর্থাৎ কাজকে পূজা হিসাবে দেখার চেষ্টা। শেষে Work is Worship অর্থাৎ কাজই পূজা।" শ্রীকৃষ্ণ এভাবে এতখানি বলেননি, কিন্তু স্বামীজী বলেছিলেন এবং এটাকে আদর্শ হিসাবে তাঁর ত্যাগী এবং গৃহী গুরুভাইদের কাছে প্রচার করেছিলেন। মঠ-মিশনের কাজে সেই আদর্শেরই প্রতিফলন আমরা দেখি।

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল ঠাকুরের মানসপুত্র-সহ কয়েকজন ত্যাগী সন্তানের সেবা করার। তাঁদের সেবা সাধারণ সেবা ছিল না। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে। নররূপে অবতীর্ণ ভগবানের অন্তরঙ্গ পার্ষদ তাঁরা। তাই নিজেদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হতো। তবে আমরা যে তাঁদের সেবা করেছি তা আমাদের যোগ্যতায় নয়, তাঁরা কৃপা করে করার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং করিয়ে নিয়েছিলেন। যোগ্যতা যে আমাদের ছিল না সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে, তাঁদের দেখে আমরা আমাদের কাজ করেছিলাম। তাঁরা আমাদের তাঁদের সেবাধিকার দিয়ে আমাদের জীবনকে কৃতার্থ করেছিলেন।

একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। দুপুরে মহারাজ খেতে বসেছেন। ভাত ও অন্যান্য সবজি তাঁর সামনে রেখেছি। ভাত ভেঙে মহারাজ দেখেন একটা দেশলাইকাঠির বারুদের দিকটা ভাতের মধ্যে। থালা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন মহারাজ। গম্ভীরভাবে বললেন ঃ "যা, উঠিয়ে নিয়ে যা। আর খাব না। আমার সামনে আর কখনো আসবি না।" মহারাজ না খেয়ে উঠে গেলেন। দুঃখে বুকটা ভেঙে যেতে লাগল। কয়দিন অন্য সেবকরা মহারাজের সেবা করছেন। গুরুর বাক্য শিরোধার্য করে আমি আর মহারাজের সামনে যাই না, যদিও আড়াল থেকে অন্যান্য সেবার কাজ আমি করে চলেছি। মন-প্রাণ হতাশায় পূর্ণ। একটা বিরাট গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মহারাজের সেবায় আমার ঐ অমনোযোগকে আমি কোনভাবেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না। আহারে রুচি নেই, চোখে ঘুম নেই। দিনদিন শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে বেশ কয়েকদিন চলল। মহারাজের পাশের ঘরে থাকতেন মহাপুরুষ মহারাজ। আমাকে খুব ভালবাসতেন তিনি। আমার অবস্থা দেখে মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। একদিন মহারাজকে গিয়ে বললেন ঃ "দেখ, সুয্যির[১] কোন দোষ নেই। প্রাণ দিয়ে কি সেবাটাই করে! ভুল যা হয়েছে তা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে। তাকে তুমি তোমার কাছে আসতে দাও। কাছে থেকে সেবার সুযোগ দাও। ছেলেটা একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছে!" মহারাজ শুধু শুনে গেলেন, কোন উত্তর দিলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ পর পর তিনদিন ঐ কথা মহারাজকে বললেন। অবশেষে মহারাজের কৃপা হলো। আমাকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে পরম স্নেহে বললেন ঃ "সুয্যিবাবা, তুই আমার যেমন সেবা করছিলি তেমনি করবি।" এথেকে বোঝা যায়, আমার যোগ্যতায় নয়, মহারাজের অহেতুকী কৃপাতে তাঁর সেবার পরম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

১ স্বামী নির্বাণানন্দের ডাকনাম ছিল 'সূর্য'। মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, হরি মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রমুখ তাঁকে আদর করে 'সুয্যি' বা 'সুয্য' বলে ডাকতেন। মহারাজ কখনো কখনো বলতেন 'সুয্যিবাবা'। তবে 'সূর্য' স্বামী নির্বাণানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না। বেলুড় মঠের নথি থেকে জানা যায়, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল গিরীন্দ্রকুমার সেন। 'সূর্য নামটি সম্ভবতঃ মহারাজেরই দেওয়া। তবে এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, প্রাক্তন মুক্তিসংগ্রামী স্বামী নির্বাণানন্দ স্বদেশী করার সময় ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'সূর্য'। মহারাজ কী সেকথা জেনে 'সূর্য' নামটি বহাল রেখেছিলেন? অবশ্য বিপ্লবি-লেখক নলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যেসব বিপ্লবী পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের একটা নামের তালিকা দিয়েছেন। সেই তালিকায় আছে "সূর্যকুমার সেন—স্বামী নির্বাণানন্দ"।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাঁরা পায়ে ঠেলতেন না। ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করে তাঁরা আমাদের গড়েপিটে নিতেন। একদিন আবার একটা অপরাধ করে বসলাম। মহারাজ একটা কাজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় কাজটি করতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য মহারাজ পরে আমাকে কঠিন শাসন করেছিলেন। শুধু বকাবকি নয়, মেরেওছিলেন। একটু দূরে বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের ভোগের জন্য তরকারি কাটছিলেন। দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে মহারাজের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন : "পালা, পালা।" আমি কিন্তু না পালিয়ে দেওয়ালের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবুরাম মহারাজ আবার বললেন : "এক্ষুণি পালা এখান থেকে।" আমি বললাম : "কোথায় পালাব মহারাজ? যেখান থেকে পালাবার সেখান থেকে তো পালিয়ে এসেছি (অর্থাৎ সংসার ছেড়ে এসেছি)। আর কোথায় যাব?" বাবুরাম মহারাজ চুপ করে শুনলেন। মহারাজও শুনলেন। কি বুঝলেন কে জানে! আমাকে কাছে ডেকে স্নেহভরে বললেন : "রাগ করিসনি বাবা। বুড়ো হয়েছি তো।" আমি মহারাজের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম : "আপনি ঠিকই করেছেন মহারাজ। এভাবে শাসন না করলে আমার ভুল শুধরোবে কি করে?" বস্তুতঃ, তাঁদের শাসনের মধ্যেও ছিল তাঁদের অপার্থিব ভালবাসা এবং করুণা।

মহারাজের অহেতুকী কৃপার কথা আর কী বলব! মহারাজ তখন ভুবনেশ্বর মঠে। সেদিন ছিল চন্দ্রগ্রহণ। সন্ধ্যাবেলায় মহারাজ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের মতো মঠবাড়ির বারান্দায় আরামকেদারায় বসে আছেন। ধ্যানস্থ। আমি তাঁর কাছে সিঁড়ির নিচে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। চোখ বুজে মনে মনে জপ করছি। গ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ পায়ে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ পেলাম। চোখ না খুলে হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম সেটা। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই স্পর্শ। তাকিয়ে দেখে প্রথমে মনে হলো, পায়ের ওপর একটা ব্যাঙ বসেছে। হাত দিয়ে সরাতে গিয়ে দেখি—সাপ! জ্যোৎস্নার আলোয় ভাল করে চেয়ে দেখলাম গোখরো সাপ! পায়ের ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। ভুবনেশ্বর তখন বিষধর সাপের জন্য বিখ্যাত। 'সাপ' বলে আমি চেঁচিয়ে উঠেছি। তাতে মহারাজের ধ্যান ভেঙে গেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম সাপটা ধীরে ধীরে নেমে চলে যাচ্ছে। মহারাজ বলে উঠলেন : "চুপ করে বসে থাক। একটুও নড়িসনি।" সাপটা চলে গেলে মহারাজ বললেন : "যা বেটা, গুরুকৃপায় এযাত্রায় বেঁচে গেলি।" মনে হলো, বিষধর সাপের ঘটনায় গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্যই কী এভাবে গুরুর শিক্ষা!*

[ক্রমশঃ]

★ বিভিন্ন সাধুভক্তের সূত্রে প্রাপ্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথা সঙ্কলন ও গ্রন্থনা করেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

অনুষ্ঠান-সূচী (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৩)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

গুরুপূর্ণিমা (ব্যাস পূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	১৪ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	৩০ জুলাই	১৯৯৬
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণ ত্রয়োদশী	২৭ শ্রাবণ	সোমবার	১২ আগস্ট	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১৩, ২৭ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার,	বৃহস্পতিবার	২৭ জুন, ১১ জুলাই	১৯৯৬
১১, ২৪ শ্রাবণ	শনিবার,	শুক্রবার	২৭ জুলাই, ৯ আগস্ট	১৯৯৬

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলোচ্য কালে স্মরণযোগ্য অতিথিদের মধ্যে সাধু নাগ মহাশয় অন্যতম। প্রত্যক্ষদর্শী, পরবর্তী কালে স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন ঃ "নাগ মহাশয়ের সঙ্গে মঠে যাওয়া এক আনন্দের ব্যাপার ছিল। ভাবাবেশে তিনি এখানে সেখানে পড়ে যেতেন, মঠের সাধুরা তাঁকে অতি সন্তর্পণে ধরে বসাতেন। নাগ মহাশয়কে দেখে কি আনন্দের উৎসই যে শশী মহারাজের হৃদয়ে বয়ে যেতে দেখেছি, তা বলতে পারি না। উভয়ে মুখোমুখি বসে "জয় গুরু জয় গুরু" বলতে বলতে সাশ্রুনয়নে ও রুদ্ধকণ্ঠে অবস্থান করতেন। ভাব ও ভাষা উভয়ের রুদ্ধ হয়ে যেত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় উভয়ে যেন উন্মাদ হয়ে উঠতেন।"[৪২]

স্বামীজীর বিদেশে অসামান্য সাফল্যের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই গণ্যমান্য অনেকের দৃষ্টি পড়েছিল মঠের দিকে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই। আফিম কমিশনের সদস্য হিসাবে ১৮৯৩-এর শেষভাগে তিনি কলকাতায় আসেন। সেই অবকাশে তিনি স্বামীজীর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবীর এবং আলমবাজার মঠে মঠবাসীদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আবার একটি সাধুভাণ্ডারাও তিনি দিয়েছিলেন। পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, বহুবল্লভ শাস্ত্রী, সিন্ধুপ্রদেশের প্রসিদ্ধ 'সোফিয়া' পত্রিকার সম্পাদক প্রমুখ মাঝে মাঝে মঠে আসতেন।[৪৩]

স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক সপ্তাহ আগে শিকাগো শহরের ডঃ কলস্টন টার্নবুল (Dr. Colston Turnbull) মঠে প্রায়ই আসতেন। তাঁর কাছ থেকে মঠবাসিগণ স্বামীজীর সম্বন্ধে অনেক টাটকা খবর পেয়েছিলেন। ডঃ টার্নবুল মঠবাসীদের সঙ্গে আপনার জনের মতো মিশে গিয়েছিলেন।[৪৪]

এছাড়াও স্বামীজীর সঙ্গে অথবা কাছাকাছি সময়ে বিদেশী অভ্যাগতগণ যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন জেমস হেনরি সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার, মিস হেনরিয়েটা মুলার, মিঃ জে. জে. গুডউইন, সিংহলের বৌদ্ধনেতা হ্যারিসন ও মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি. জি. নরসিংহাচার্য ও কিডি (সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুডউইনের নিষ্ঠাপূর্বক স্বামীজীর সেবা এবং মঠবাসীদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।[৪৫] স্বামীজীর স্বদেশে আগমনের প্রায় আড়াই বছর আগে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের অন্যতম প্রতিনিধি অনাগারিক ধর্মপাল কলকাতায় এসেছিলেন; সেসময়ে তিনি আলমবাজার মঠেও পদার্পণ করেছিলেন।[৪৬] তাছাড়া স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি মঠে এসেছিলেন। তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরনো ভক্তদের এবং স্বামীজীর পরিচিত অনেকেই এসেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত দেশবিদেশের বহু ব্যক্তির শুভাগমন হয়েছিল। সেসকল সুখস্মৃতির সাক্ষী সেই 'ভুতুড়ে বাড়ি' এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মঠে একদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমাগম হতে থাকে, অপরদিকে স্যালভেশন আর্মি, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা, মহাবোধি

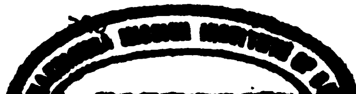
৪২ উদ্বোধন ('পূর্বস্মৃতি'), ২৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯২-৩৯৩

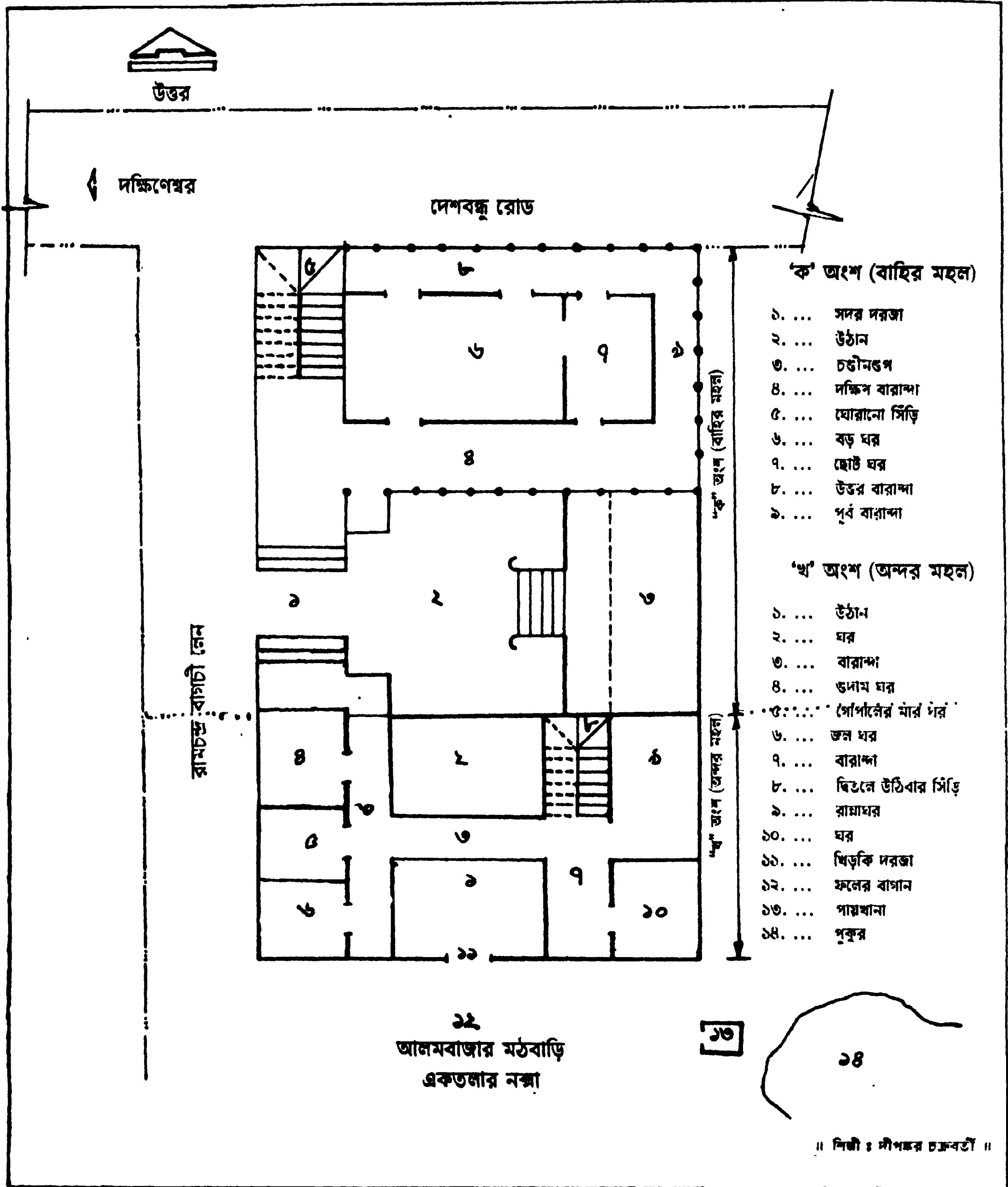
৪৩ স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ৪র্থ সং, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৯

৪৪ ডঃ টার্নবুল মঠে এসে প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা কাটাতেন। তিনি কলকাতার এক হোটেলে থাকতেন, মঠের কাছাকাছি বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আড়িয়াদহে রায়বাহাদুর প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ডঃ টার্নবুল প্রত্যেক দিন সেখান থেকে বেলা ১০টার মধ্যে মঠে আসতেন এবং সন্ধ্যারতি দর্শন করে ফিরে যেতেন। তাঁর মুখে আমেরিকাতে স্বামীজীর প্রতিপত্তি, তাঁর সম্বর্ধনা ইত্যাদি কাহিনী মঠবাসীরা দিনের পর দিন সাগ্রহে শুনতেন। স্বামীজীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরে তিনি আমেরিকায় ফিরে যান।

৪৫ স্বামী বিরজানন্দের মন্তব্য ঃ "গুডউইন (Goodwin) দিনরাত তাঁহার (স্বামীজীর) সেবা করিত, ছায়ার ন্যায় সঙ্গে থাকিত। সে কি সেবা—exemplary! ঠিক ছেলেমানুষের মতো স্বভাব ছিল, মঠের সকলের সঙ্গে স্ফূর্তি ও হাসি, খেলা ও ছেলেমানুষী করত।" (তাঁর নোট বই, পৃঃ ৭৯)

৪৬ ১৪।৫।১৮৯৪ তারিখে অনাগারিক ধর্মপালের মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'আমেরিকায় হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক ভাষণ বিবেকানন্দ-অনুরাগী ও জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।




উত্তর
দক্ষিণেশ্বর
দেশবন্ধু রোড
রামচন্দ্র বাগচী লেন
'ক' অংশ (বাহির মহল)
'খ' অংশ (অন্দর মহল)
'ক' অংশ (বাহির মহল)
১. ... সদর দরজা
২. ... উঠান
৩. ... চণ্ডীমণ্ডপ
৪. ... দক্ষিণ বারান্দা
৫. ... ঘোরানো সিঁড়ি
৬. ... বড় ঘর
৭. ... ছোট ঘর
৮. ... উত্তর বারান্দা
৯. ... পূর্ব বারান্দা
'খ' অংশ (অন্দর মহল)
১. ... উঠান
২. ... ঘর
৩. ... বারান্দা
৪. ... গুদাম ঘর
৫. ... গোপালের মার ঘর
৬. ... জল ঘর
৭. ... বারান্দা
৮. ... দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি
৯. ... রান্নাঘর
১০. ... ঘর
১১. ... খিড়কি দরজা
১২. ... ফলের বাগান
১৩. ... পায়খানা
১৪. ... পুকুর
আলমবাজার মঠবাড়ি
একতলার নক্সা
॥ শিল্পী : দীপঙ্কর চক্রবর্তী ॥

সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সাগ্রহে মঠবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

মঠের আর্থিক অবস্থা

আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরের কিছুদিনের মধ্যে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মঠে এসে যা দেখেছিলেন তার একাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। তিনি লিখেছেন ঃ "মঠে তখন চাকর বা বামুন কেউ ছিল না। শশী মহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন; কানাই মহারাজ হাটবাজার ও বাসন মাজা, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ, সুশীল মহারাজ (স্বামী প্রকাশানন্দ), আরও দুই-একজন সাধু ব্রহ্মচারী ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কুটা, মসলা বাটা প্রভৃতি কাজ করতেন। লেখক যখন-যখন মঠে যেত ও থাকত, তখন শশী মহারাজের আদেশে সে হেঁসেলে গিয়ে ঠাকুরের ভোগ রাঁধত, শশী মহারাজ প্রাত্যহিক রান্নার কাজ থেকে একটু অব্যাহতি পেতেন। লেখক মধ্যে মধ্যে কানাই মহারাজের সঙ্গে হাটবাজার করত এবং কখনো বা তাঁর সঙ্গে সাধুদের উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে নিজেকে ধন্য মনে করত।"[৪৭]

আলমবাজার মঠের প্রথম দিককার অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায় স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিচারণা থেকে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মুখ থেকে এ কাহিনী শুনে তিনি লিখেছিলেন ঃ "মঠে এত অভাব যে, এমন অনেকদিন গিয়াছে, ঠাকুরকে একটু মিছরি শরবত ভোগ দিবার জন্য দু-চার পয়সাও থাকিত না। একটা টেবিলে দুইটি টানা (ড্রয়ার) ছিল, তাহার মধ্যেই যাহা কিছু সামান্য পয়সাকড়ি থাকিত।... অত্যন্ত অভাবের মধ্যে পড়িয়া যখনই ঠাকুরকে কি দিবেন ভাবিতেন তখনই স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের[৪৮] পত্নীর প্রেরিত এক কুঁদা মিছরি, মালসাভরা নবীনের রসগোল্লা এবং ঠাকুরসেবার অন্যান্য দ্রব্যাদি একজন চাকরের মাথায় মঠে আসিয়া পৌঁছিত। বহুবার এরূপ ঘটিয়াছে। রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, অভাবের সময় ঠাকুরসেবার জন্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া তাঁহার মতো কেহই তাঁহাকে অমন নিশ্চিন্ত করেন নাই।"[৪৯]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায়ই মঠে আসতেন। কিন্তু মঠের আর্থিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা যথেষ্ট বাস্তবানুগ মনে হয় না। কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "বরানগর মঠে বিশেষতঃ প্রথম অবস্থায় যেরূপ অনটন হইয়াছিল... আলমবাজার মঠে ততটা না হউক অনেকটা সেই পরিমাণে ছিল, কিন্তু এক বৎসর[৫০] পর অজস্র জিনিসপত্র আসিতে লাগিল। সকলেই তখন তীর্থ পর্যটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।... তাঁহাদের সাধনা বা পুণ্যবলে আলমবাজার মঠে বহুপ্রকারের দ্রব্যাদি আসিতে লাগিল।... হঠাৎ এই পরিবর্তনে সকলেই বিশেষ হর্ষিত হইয়া উঠিলেন।"[৫১]

মহেন্দ্রনাথ-বিবৃত অপর একটি ঘটনাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘটনায় মঠবাসীদের তীব্র বৈরাগ্য একদিকে পরিস্ফুট, আবার তাঁদের আদর্শগত দ্বন্দ্ব-দ্বিধাও যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের নিকট জয়পুরে বিদায় নিয়ে স্বামীজী বোম্বাই যাত্রা করেছিলেন, সেখানে জাহাজে চাপবেন। পথে আবুরোড স্টেশনে গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন। স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন মুন্সী জগমোহনলাল। অনুমান, সেখানকার একটি ঘটনা উদ্ধৃত করে স্বামীজী লন্ডনে একদিন বলেছিলেন ঃ "রাখালকে তখন বললুম যে, খেতড়ির রাজা মঠে মাসিক ১০০ টাকা করে দিতে রাজি হয়েছেন, নে না; রাখাল তখন ঘোর বৈরাগ্য দেখাতে লাগল, নিলে না—কষ্টে মরতে লাগল। তাই আমি রাখালের ওপর চটে গেলুম।"[৫২] স্বামীজী সাময়িকভাবে চটে গেলেও তিনি গুরুভ্রাতার বৈরাগ্যের প্রবল ভাব দেখে খুশি হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

আলমবাজার মঠের প্রথম দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজা, শাস্ত্রপাঠ, নির্জনে সাধনভজন, জপধ্যান করে ভগবানলাভের চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল মঠবাসীদের দিনচর্যা—সংক্ষেপে বলা যেতে পারে আলমবাজার মঠের এই অধ্যায় বরানগর মঠের একটি সম্প্রসারিত রূপ বৈ তো নয়। কিছুটা উত্তরের দিকে গেলেই দক্ষিণেশ্বর, সেখানে গিয়েও কেউ নির্জনে জপধ্যান করে কাটাতেন, গঙ্গার তীরে এখানে সেখানে বিজন স্থানে

৪৭ উদ্বোধন, ২৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯১

৪৮ স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "মহেন্দ্রবাবু মঠ একপ্রকার চালাচ্ছেন; তাকে শত শত ধন্যবাদ; তিনি অতি মহৎ।" (পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৪১৯-৪২০)। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার রাজবল্লভ পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

৪৯ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১২৬-১২৭

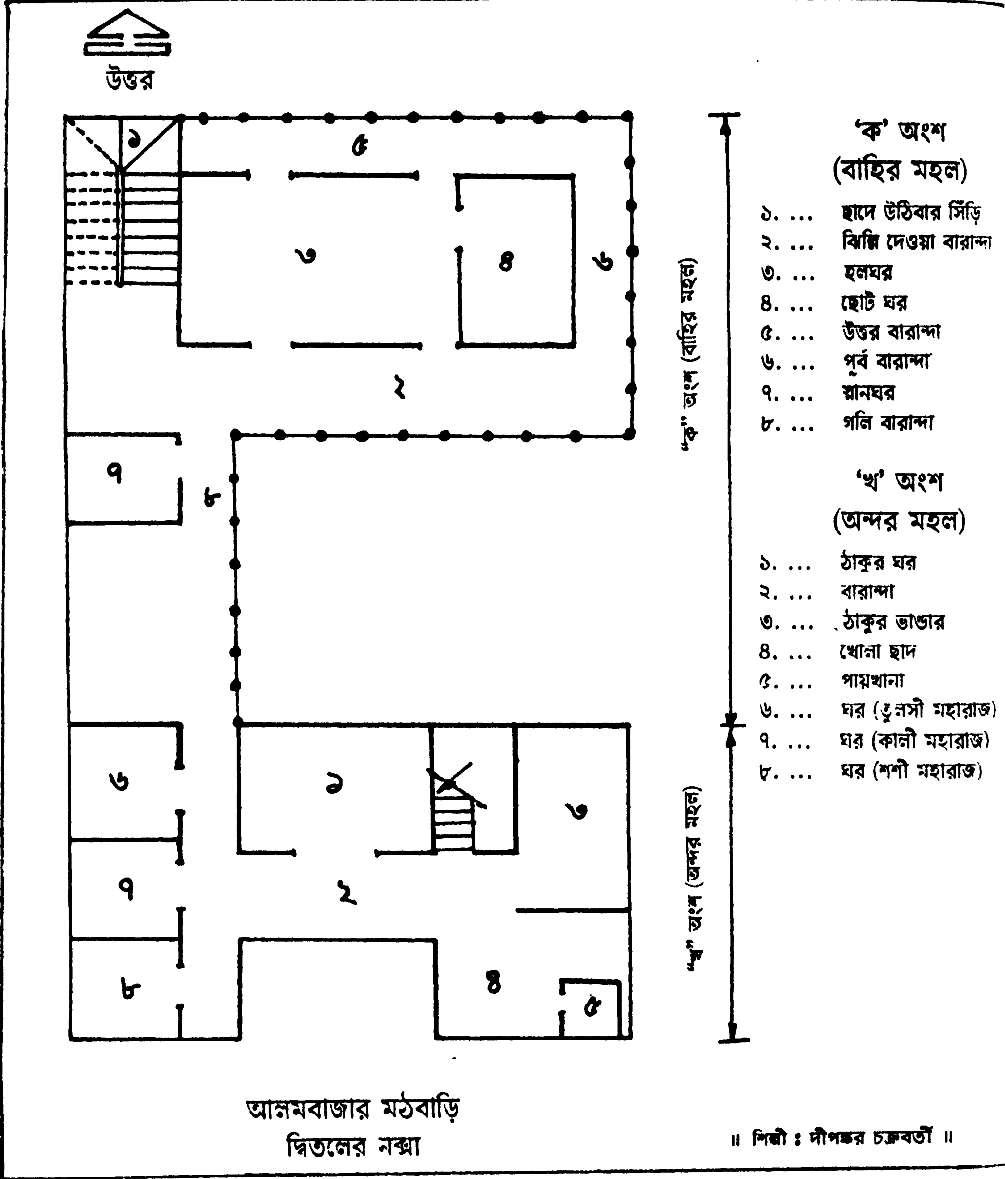
৫০ এধরনের কিছুটা আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং তা হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮৯৫-এর প্রথম দিকে।

৫১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৩২

৫২ ঐ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ১৪৫

দিনরাত কাটাতেন, কেউ বা ভিক্ষা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন।

বিদেশে বেদান্ত প্রচারকার্যে নিরত স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মঠবাসীদের চিঠিপত্রে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। স্বামীজী জানতে চান: "মা-ঠাকুরানীর খরচপত্র কেমন করে চলছে?" "তোমাদের কি করে চলছে,



আলমবাজার মঠবাড়ি
দ্বিতলের নক্শা

॥ শিল্পী: দীপঙ্কর চক্রবর্তী ॥

কে চালাচ্ছে?" মঠের আর্থিক দুরবস্থা জানতে পেরে স্বামীজী মাঝে মাঝে কিছু অর্থসাহায্য করেছেন। অবশ্য বিবিধ কারণে নিত্যকার মাধুকরী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখদের কিছু কিছু অর্থসাহায্য, ঠাকুরের পুরনো ভক্তদের ঠাকুরের পূজা-সেবার জন্য আনীত দ্রব্যাদিও মঠের কৃচ্ছ্রতা কিছুটা লাঘব করেছিল।

মঠের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি দেখা গিয়েছিল ১৮৯৫-এর প্রথম ভাগে। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অখণ্ডানন্দের বিবরণের একাংশ এরূপ ঃ "মঠে আমরা প্রায় ডাল, ভাত ও চচ্চড়ি মাত্র খাইতাম। কোন কোন দিন ডালের সঙ্গে ফালা ফালা করে ঝুনো নারিকেল আমাদের তরকারির সাধ মিটাইত। রাত্রে রুটিতে ঘৃতের সংস্পর্শও থাকিত না। একদিন কোন ভদ্রলোক ঠাকুরসেবার জন্য খানিকটা দুধ পাঠাইয়াছিলেন। ইহা যেন 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া'র মতো মনে হইল। আহারে বসিবার পূর্বে আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আজ ঠাকুরের দুধ-প্রসাদ আছে। দুধ খেলে বল হয়। আমাদের পাতে এক হাতা দুধ পড়িতে না পড়িতেই চারিদিক হইতে রব উঠিল, 'কি হে, বল পাচ্ছ; ওহে, বল পাচ্ছ তো?' সেই আনন্দ কলরবেই সেদিন মঠবাড়ি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেসময়ে আমাদের কি বিমল আনন্দে দিন কাটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এমন আরও কত কথাই না আছে!"[৫৩]

প্রব্রজ্যা থেকে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী অভেদানন্দের বিবরণ প্রায় সমকালীন, কিন্তু তাঁর বিবরণে মঠের আর্থিক অবস্থার সাচ্ছল্য স্পষ্টতর। তিনি লিখেছেন ঃ "এইবার মঠের দৈনন্দিন অবস্থাও পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। আহারেরও অনেক সচ্ছল অবস্থা। ভক্তগণ যাঁহার যেমন ক্ষমতা তেমনি খাবার দ্রব্য মঠে লইয়া আসিতেন। শতচ্ছিন্ন সতরঞ্চির অবসান ঘটাইয়া ভক্তগণ দুই-একটি নূতন সতরঞ্চি আনিয়া দিয়াছেন। একখানি ছোট চৌকি ও পড়ার একটি আলোও পাওয়া গিয়েছিল। মোটামুটিভাবে সকল সন্ন্যাসীদের পরিবার এক-একখানি কাপড় ও চাদরের সংস্থান হইয়াছিল। মোট কথা, আলমবাজার মঠে মা-লক্ষ্মী যেন ক্রমে ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।"[৫৪]

মঠের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল কোন ভক্তপ্রদত্ত দুটি ড্রয়ারযুক্ত একটি টেবিল;[৫৫] প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে মনে হয়, স্বামীজীর মঠে প্রত্যাবর্তনের পর দু-একটি টেবিল, কয়েকটি চেয়ার এবং একটি খাট সংগৃহীত হয়েছিল। যদিও অধিকাংশের ব্যবহারের জন্য ছিল পুরনো চাটাই।

সে-সময়কার কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। অনুমান, স্বামী সুবোধানন্দ ১৮৯৫-এর মধ্যভাগে ভ্রমণ করতে করতে এটোয়াতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এটোয়ার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। স্বামী সুবোধানন্দের নিকট মঠের আর্থিক অবস্থার কথা শুনে তিনি প্রতি মাসে ৬০ টাকা করে মঠে পাঠাতে থাকেন। এই অর্থসাহায্য মঠের অর্থাভাব কিছুটা লাঘব করেছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্যদেশে স্বামীজীর অসামান্য সাফল্যের সংবাদ পত্র-পত্রিকায় আলোচিত হতে থাকলে মঠে ভক্তসমাগম বৃদ্ধি পায়, আর্থিক অবস্থারও কিছু উন্নতি হয়।[৫৬] এ প্রসঙ্গে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের পূর্বে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠির একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তিনি লিখেছেন ঃ "সাণ্ডেল অর্থাভাব লিখেছেন, তথাহি তারকদাদা। বলি এতগুলো লোক তাঁকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) মানে, আর একটা মঠ চলে না?"[৫৭] মনে রাখতে হবে, স্বামীজী তাগাদা দেওয়ায় পরিব্রজ্যা থেকে তাপসগণের অনেকেই ইতিমধ্যে মঠে ফিরেছিলেন। মঠবাসীর জনসংখ্যার তুলনায় ভক্তদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল নেহাৎই অপ্রতুল।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের পর আর্থিক অবস্থার সাময়িকভাবে কিছুটা উন্নতি হলেও অল্পসময় পরেই, স্বামী বিবেকানন্দের আলমোড়া কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে চলে যাওয়ার পর অর্থাভাব দেখা দেয়, মঠ পরিচালনায় জটিলতার সৃষ্টি হয়; সেবিষয়ে আমরা পরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। [ক্রমশঃ]

৫৩ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১২৬ ৫৪ আমার জীবনকথা, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৩, পৃঃ ২০৯

৫৫ এই টেবিল বর্তমানে বেলুড় মঠে সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।

৫৬ নমুনাস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে। স্বামী অখণ্ডানন্দের 'স্মৃতি-কথা' থেকে (পৃঃ ১৮৪) জানা যায় যে, বড়বাজার অঞ্চলের একজন বড় হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডাঃ নিতাইচরণ হালদার স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পূর্ব থেকে প্রতিদিন এক চাঙারি ভাল ভাল খাবার নিয়ে মঠে আসতেন। ৫৭ 'পত্রাবলী', ৫ম সং, ১৯৮৭, পৃঃ ৪১৬

নিবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ : পৃথিবীর বহু-প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা

জ্যোতির্ময় ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; পূর্বতন ডীন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, সাংবাদিকতা এবং গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অনুষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রাক্তন অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের জন্য এবছর (১৯৯৬) 'রবীন্দ্র পুরস্কার'-এ ভূষিত। —সম্পাদক, উদ্বোধন

'কথামৃত'-এর বিশ্বস্ততা নিয়ে কথা উঠেছে, সেখানে বিধৃত সব কথাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ-উচ্চারিত? এই তর্কের মীমাংসা যাই হোক না কেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস নামের অসামান্য ব্যক্তিত্বটি যে সর্বৈব লোকায়ত চেতনারই নামান্তর, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশের অণুমাত্র হেতু দেখি না। নরেন রামকৃষ্ণসান্নিধ্যে এসেই নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করতে পারলেন, লোকচেতনার সঙ্গে অন্বিত করতে না পারলে আধ্যাত্মিক চেতনার কোন মূল্য নেই। বস্তুতঃ, থিয়েটারের মাধ্যমে গিরিশচন্দ্রকে 'লোকশিক্ষা' দানের লক্ষ্যেই প্রাণিত করেছিলেন রামকৃষ্ণ।

সুতরাং, পাণ্ডিত্যজনিত জ্ঞানের সঙ্গে অপরিমেয় প্রেম ও ভক্তিভাবের সমন্বয়সাধনের পরেও এইবার নরেনকে 'বিবেকানন্দ' হতে হবে। তাই লিখেছেন নিবেদিতা: "ইহার পরও তাঁহাকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল—সমভাবে সাধু, পণ্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সহিত মিশিতে হইয়াছিল, সকলের নিকট শিখিতে হইয়াছিল, সকলকে শিখাইতে হইয়াছিল, সকলের সহিত বাস করিতে হইয়াছিল।"

বিবেকানন্দের সত্যোপলব্ধিতে জনজীবনবিচ্ছিন্ন কোন তত্ত্বসর্বস্বতা নেই এবং আদ্যন্ত তা মানবতাবোধে স্পন্দিত বলেই তাঁর চিন্তাধারা এখনো প্রাসঙ্গিক ও আধুনিক। আধ্যাত্মিক পরিভাষায়, নিবেদিতার বিশ্লেষণে, "অদ্বৈত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াও স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মে এই শিক্ষা সংযুক্ত করিয়া দিলেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত একই বিকাশের তিনটি অবস্থা বা ক্রমিক স্তর মাত্র, এই বিকাশের চরম লক্ষ্য হইতেছে শেষোক্ত অদ্বৈত তত্ত্ব। ইহা আরেকটি আরও মহৎ ও আরও সরল তত্ত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ।... বহু এবং এক যদি যথার্থই এক সত্তা হয়, তাহা হইলে শুধু সকল উপাসনাপদ্ধতিই নয়, সমভাবে সকল কর্মপদ্ধতি—সকল প্রকার প্রচেষ্টা, সকল প্রকার সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। তাহা হইলে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক—এই ভেদ আর থাকিতে পারে না। কায়িক পরিশ্রম করাই প্রার্থনা; জয় করাই ত্যাগ করা, সমগ্র জীবনই ধর্মকার্য হইয়া যায়। যোগ ও ক্ষেম—ত্যাগ ও বর্জনের মতোই দায়স্বরূপ।"

গুরু বিবেকানন্দের মধ্যে নিবেদিতা এমন একজন 'কর্মের মহান প্রচারক'কে দেখেছেন, যাঁর কাছে "কর্ম—জ্ঞান ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, পরন্তু উহাদের প্রকাশ"।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে বিবেকানন্দ শিখেছিলেন, যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী, সাকার-নিরাকার নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে হানাহানি নিরর্থক; কেননা, "তিনি (ঈশ্বর) এমন এক তত্ত্ব—যাহাতে সাকার নিরাকার দুই-ই আছে"।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতে তথা সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই বক্তব্যটিকেই প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পেরেছিলেন যে, শুধু সমস্ত উপাসনাপদ্ধতিই নয়—সমভাবে সমস্ত কর্ম-পদ্ধতিও, সমস্ত প্রচেষ্টা, সমস্ত সৃষ্টিকর্মই সত্যোপলব্ধির পন্থা। সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব-বিরোধ তাই হাস্যকর ও অর্থহীন। নিবেদিতা বিবেকানন্দের তুলনারহিত মাহাত্ম্য, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিবেকানন্দের অপরিমেয় দানের মূল্যায়ন করেন এইভাবে—"ইহাই আমাদের গুরুদেবের জীবনের চরম তাৎপর্য, এইখানেই তিনি যে শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনকেন্দ্র হইয়াছেন তাহা নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতেরও।"

শিকাগো-বক্তৃতামালার মধ্যে যেটি প্রদত্ত হয়েছিল ১৯ সেপ্টেম্বর, সেই 'Paper On Hinduism' তথা 'হিন্দুধর্ম' রচনায় স্বামীজী 'বেদ'কে 'আপ্তবাক্য'রূপে পরিচিত করেই ক্ষান্ত হলেন না, বললেন: "তাঁহারা (হিন্দুগণ) বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে এই শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দদ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেইসকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ।"

কিন্তু বিবেকানন্দ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, এইসব আধ্যাত্মিক সত্য আকাশ থেকে পড়েনি, এগুলির "আবিষ্কারকগণের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁহাদিগকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলিয়া ভক্তি ও মান্য করি।"

বিবেকানন্দের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তথাকথিত 'সন্ন্যাস' বা 'ব্রহ্মচর্য' তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। মানুষের জন্য, মানবজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, দুঃখ-দারিদ্র্য-শোষণ-বঞ্চনা-নিরক্ষরতামুক্ত ভারতীয় জনজীবনের তথা বিশ্বমানবজীবনের প্রতিষ্ঠা ও জয় ঘোষণার জন্য জ্ঞান ও প্রেমের শক্তিতে অনুপ্রাণিত নিরাসক্ত কর্মযোগের সাধনা ও প্রচারই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছিল। স্বভাবতই, সাধারণতঃ একজন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী যে-অর্থে কৃচ্ছ্র-সাধনা, আত্মনিগ্রহ এবং নারীবর্জিত পঙ্গু কর্মজীবনের তথাকথিত শুচিতা বা শুদ্ধতা রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প, বিবেকানন্দ সেই চিন্তাধারার অনুগামী ছিলেন না। তাই কর্মজীবনে বা সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞে নারীর যথাযোগ্য ভূমিকা ও নারীর সাফল্য তাঁর প্রসন্ন স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তিনি মার্গারেটকে নতুন ভারত গঠনের অনিবার্য অঙ্গরূপে নারীশিক্ষার কাজে আহ্বান করেছেন, তাঁকে 'নিবেদিতা'য় উন্নীত করেছেন। তাঁর শিকাগো-ভাষণেই দেখা যায়, নারীর প্রতি এই সশ্রদ্ধ প্রত্যয় আকস্মিক ছিল না। ১৯ সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসম্মেলনে ভাষণদানকালে তিনি 'বেদ'-রচয়িতা ঋষিদের প্রসঙ্গে সানন্দে সগৌরবে ঘোষণা করতে ভুললেন না—"আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।"

মনে রাখতে হবে, মার্গারেটের সঙ্গে তখনো বিবেকানন্দের দেখা হয়নি। বস্তুতঃ, এর আগে কয়েকজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলেও তখনো কেউ সেভাবে তাঁর সান্নিধ্যে আসেননি, শিষ্যত্বগ্রহণ তো দূরের কথা। অর্থাৎ বিবেকানন্দ প্রথম থেকেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পুরুষের পাশাপাশি নারীপ্রতিভার সমাদরেও ছিলেন অকুণ্ঠিত। তিনি ছিলেন যথার্থ পুরুষসিংহ। নিবেদিতাকে বলতেন ঃ "জান তো, আমি ক্ষত্রিয়!" সমুন্নত দার্ঢ্যে ও বিগলিত করুণায়, রাজোচিত আভিজাত্যে ও লোকায়ত ঐশ্বর্যে অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতার রচনায় 'King' বা 'রাজা' অভিধাটি প্রায়শঃ প্রযুক্ত হতে দেখা যায়—"Sister Nivedita occasionally used to assign (Swamiji) as 'King'!"

যথার্থ পুরুষের পৌরুষের পরিচয় নারীর প্রতি তার ব্যবহারেই প্রতিবিম্বিত। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ রোলাঁকে বলেছিলেন, নারীর কাছে একজন যথার্থ পুরুষ যে-শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পেতে পারেন, এদেশে একমাত্র বিবেকানন্দই তা পেয়েছিলেন—নিবেদিতার কাছে। ধর্মমহাসভায় ১৯ সেপ্টেম্বর নবম দিনের অধিবেশনে পঠিত 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বিবেকানন্দ বেদনির্ভর ধর্মভাবনাকেই হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করেছিলেন—" 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের পরম প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও; তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ, এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর'—বৈদিক ঋষিগণ এইরূপ গানই গাহিয়াছেন। আমরা কিভাবে তাঁহাকে পূজা করিব?—প্রীতি-ভালবাসা দিয়া। প্রেমাস্পদরূপে—ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তররূপে তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে।

"শুদ্ধ প্রেম সম্বন্ধে বেদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।"

এই সূত্রেই একই ভাষণে বিবেকানন্দের একটি উক্তি একশ বছর পরেও গুরুত্বে ও তাৎপর্যে সমভাবেই প্রণিধানযোগ্য দিঙ্‌নির্দেশক—"কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।"

এই ভাষণে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে যেমন "দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে" দেখেছেন, তেমনি জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকেও ধর্মের স্বরূপ বুঝিয়ে বলতে চেয়েছেন; তাঁর ভাষায়—"রিলিজন অব দ্য ইগ্নোর্‍্যান্ট" বা "অজ্ঞলোকদের ধর্ম"। এই প্রসঙ্গেই এসেছে 'পৌত্তলিকতা'র প্রশ্ন বা অভিযোগ। পাল্টা প্রশ্নের আকারে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন বিবেকানন্দ—"যখন দেখি যে, যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়—পাপ হইতে কি কখনও পবিত্রতা জন্মিতে পারে?"

পৌত্তলিকতা যদি কুসংস্কার হয়, তবে তা "মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ"। খ্রীস্টানরা কেন আদৌ গির্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জায় এত মূর্তি কেন? এইসব প্রশ্ন তুলে

বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "অনন্তের ধারণা অনন্ত নীলাকাশ বা সমুদ্রের প্রতিচ্ছবির সঙ্গে যেমন জড়িত, তেমনি আমরা স্বভাবতই পবিত্রতার ধারণা গির্জা, মসজিদ বা ক্রুশের সহিত যুক্ত করিয়া থাকি।" তাঁর ভাষায়, আক্ষরিকভাবে, "ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মানুষকে দেবতা হইতে হইবে। মন্দির, প্রার্থনাগৃহ, দেববিগ্রহ বা ধর্মশাস্ত্র—সবই মানুষের ধর্মজীবনের প্রাথমিক অবলম্বন ও সহায়ক মাত্র; তাহাকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে।"

মূর্তিপূজার বিষয়টি বিবেকানন্দ তাঁর ঐ দিনের ভাষণের শেষ অংশে পুনরায় উত্থাপন করলেন, বুঝিয়ে বললেন ঃ "ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা বলিলে ভয়াবহ একটা কিছু বুঝায় না। ইহা দুষ্কর্মের প্রসূতি নয়, বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ।"

বিবেকানন্দের এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং আজ থেকে শতাধিক বছর আগের এই উক্তিটি আজও গভীরভাবে বিবেচনার যোগ্য। মূর্তিপূজার সপক্ষে বিবেকানন্দ কোন ধর্মীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন না এখানে। শুধু বলছেন, এটা কোন ভয়াবহ অপরাধ বা অন্যায় অন্ততঃ নয়। কিন্তু ব্যাপক সাধারণ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাগ্রস্ত, সেখানে অজ্ঞতাও থাকবে। বস্তুতঃ, এই অংশটির আলোচনার সূচনাতে বিবেকানন্দ বলেই নিয়েছেন—"এখন দর্শনের উচ্চ শিখর হইতে অবরোহণ করিয়া অজ্ঞলোকদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি।"

আলোচনাকালে বিবেকানন্দ মূর্তিপূজার সপক্ষে কোন কুযুক্তির অবতারণা করেননি। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের "যত মত তত পথ" সূত্রটি মনে রেখে তিনি বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির বাস্তব অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কার্যতঃ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের মতোই হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যেও কিছু কুসংস্কার বিদ্যমান ("কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে" মন্তব্যটি লক্ষণীয়); কিন্তু একই বাক্যে এই কথাও যুক্ত করে দিয়েছেন যে, খ্রীস্টধর্মাবলম্বী ও অন্যান্য ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণ যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সমগ্র হিন্দুধর্মেরই বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেন তখন তা হয়ে দাঁড়ায় সমালোচনাকারী ভিন্নধর্মাবলম্বিগণের পক্ষে ধর্মান্ধতারই নামান্তর ("কিন্তু ধর্মান্ধতা আরও খারাপ।")! এই সূত্রেই তিনি তর্ক তুলেছেন, খ্রীস্টানরাও গির্জায় যান, ক্রুশকে পবিত্র বলে মনে করেন, প্রার্থনার সময় আকাশে তাকান, ক্যাথলিকদের গির্জায় তো অজস্র মূর্তিও থাকে!

এগুলিও কোন ভয়াবহ বা দোষাবহ ঘটনা নয়। "মূর্তির মতো এগুলিও সব প্রতীকমাত্র।" আর একথাও বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন যে, "হিন্দুদেরও অনেক দোষ আছে, অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে।" হিন্দুদের মধ্যেও ধর্মোন্মাদ আছে। এমনই ধর্মোন্মাদনা যে, চিতায় স্বীয় দেহ দগ্ধ করে!

এই ধরনের আচার-ব্যবহার, প্রথা-পদ্ধতিকে বিবেকানন্দ 'ধর্ম' বলেননি, সুস্পষ্ট ভাষায় 'ধর্মোন্মাদনা'ই বলেছেন এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন, এইসব দোষের জন্য হিন্দুধর্মকে অভিযুক্ত করা সঠিক নয়, "যেমন ডাইনী পোড়ানোর দোষ খ্রীস্টধর্মের উপর দেওয়া যায় না।"

তুলনায় মূর্তিপূজা ধর্মোন্মাদনা নিশ্চয়ই নয়, কুসংস্কার মাত্র এবং তাও 'অজ্ঞলোকদের'ই বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের কুসংস্কার থেকে কোন ধর্মই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, তবু মূর্তিপূজা কোন মারাত্মক অপরাধও নয়; "বরং ইহা অপরিণত মন কর্তৃক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ধারণা করিবার চেষ্টাস্বরূপ"। 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ-ভাষণে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপকে বিদেশী শ্রোতা ও অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত করতে হয়েছিল বিবেকানন্দকে। এই ভাষণে ও অন্যান্য যেসব রচনা ও বক্তৃতায় বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেইসব ক্ষেত্রে প্রায়শঃ তাঁকে একজন অপরাজেয় তার্কিকের ভূমিকায় দেখতে পাই। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যোদ্ধরূপটিও এইসব ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট। সর্বোপরি তাঁর সততা ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রশ্নাতীত বলেই স্বধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি হিন্দুধর্মাবলম্বী একাংশের সীমাবদ্ধতা, বিভিন্ন কুসংস্কারজনিত দোষত্রুটি প্রভৃতি, এমনকি সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতার দিকগুলিও তিনি এড়িয়ে যাননি। পরবর্তী কালে জাতের নামে যে বজ্জাতি, তাও ক্রমশঃ তাঁর তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। হিন্দুধর্মাবলম্বিগণের একাংশের ধর্মের নামে এই ধর্মোন্মাদনার অশুভ প্রবণতার উল্লেখের পাশাপাশি তিনি অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির একই ধরনের কুসংস্কার প্রভৃতির দিকে অবশ্য অঙ্গুলিনির্দেশ করতে ভুলে যাননি এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোন বিশেষ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কিছু মানুষের ধর্মান্ধ আচরণের জন্য সেই ধর্মকে দোষ দেওয়া যায় না।

সর্বোপরি, কুসংস্কারজনিত বিচ্যুতিগুলি যখন ইচ্ছাকৃত

নয়—অজ্ঞতাপ্রসূত, তখন বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আক্রমণাত্মক নয়, বরং ক্ষমাসুন্দর। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পাশাপাশি এই সহৃদয়তার গুণেই বিবেকানন্দ শিকাগোয় এবং পরে বিদেশে প্রায় সর্বত্রই ব্যাপকভাবে সাদর শ্রদ্ধায় গৃহীত হয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে, শতাধিক বর্ষ পূর্বের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে বিবেকানন্দ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা অধিকৃত স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তিযুদ্ধের মঞ্চ তথা রণক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েই তাঁর ভাষণগুলি উপস্থাপিত করেছিলেন। ধর্ম-বিষয়ক বিতর্কসভাটি তাঁর কাছে তাৎপর্যের বিচারেও ধর্মযুদ্ধরূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। এও যেন এক কুরুক্ষেত্র! গ্লানিভারে পীড়িত, শোষিত-লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত-অপমানিত স্বদেশ এইবার চির-অজ্ঞাতবাসের পর আত্মপ্রকাশ করল শিকাগোর আন্তর্জাতিক মঞ্চে; বিবেকানন্দের কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠল মূঢ় ম্লান মূক তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি—জ্ঞানোজ্জ্বল, দৃপ্ত, ওজস্বিনী ভাষার তীব্র ঝঙ্কারে। স্বধর্মের জয়ঘোষণা তো উপলক্ষ মাত্র, কেননা সেটাই তো ছিল অব্যবহৃতি অবলম্বন; ধর্মমহাসম্মেলনের মঞ্চটিকে ব্যবহার করারই তো সুযোগ পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব-প্রতিভায় বিশ্ববাসীর কাছে অপমানিত, পৌত্তলিক বলে নিন্দিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ধিক্কৃত, বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানচর্চায় উদাসীন ও মধ্যযুগীয় বলে উপেক্ষিত স্বদেশ ও স্বজাতির যথার্থ সমুজ্জ্বল মানবধর্মের সাধনার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সত্যটি প্রতিষ্ঠার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন পূর্ণতম মাত্রায়। কিন্তু না, শুধু সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেম নয়। সঙ্কীর্ণ ধর্মবুদ্ধির প্রশ্ন তো ওঠেই না। বিবেকানন্দ দাঁড়িয়েছিলেন শিকাগোর আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমস্ত লাঞ্ছিত মানবাত্মার সপক্ষে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দেশ-কাল নিরপেক্ষ-ভাবে। শিকাগোর মঞ্চে বিশ্ববিজয় সম্ভব হয়েছিল তাঁর, কেননা স্বদেশের সমকালীন বাস্তবতাই তাঁর প্রধান প্রেরণা হলেও ভেবেছিলেন বিশ্বমানবের কথাও। খ্রীস্টীয় পাপবোধে জর্জরিত ইউরোপ-আমেরিকার তাবৎ মানুষকে, সমস্ত স্তরের নরনারীকে 'অমৃতের সন্তান' বলে আহ্বান জানালেন বিবেকানন্দ। মুক্ত, সাহসী, আনন্দিত সত্তার অধিকারী মানুষ। না। কোন বন্ধন নেই। কোন ভয় নেই। কোন বিষাদ, নিরানন্দ নেই। 'শোন, অমৃতের পুত্রগণ, শোন'—উপনিষদের এই বাণীর সূত্রে বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশী শ্রোতাদের বললেন ঃ

"'অমৃতের পুত্র'! কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারী। হিন্দুগণ তোমা-দিগকে পাপী বলিতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। অমৃতের অধিকারী—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! তোমরা পাপী? মানুষকে পাপী বলাই এক মহাপাপ। মানবের যথার্থ স্বরূপের উপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কারোপ। ওঠ, এস, সিংহস্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করিতেছ, ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়া দাও। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"

ভোগক্লান্ত, আত্মকেন্দ্রিক, নৈতিকতায় দুর্বল ও পাপবোধে জর্জরিত, হৃদয় ও মনন ঐশ্বর্যের দিক থেকে দেউলিয়া, আত্মিক শক্তির বিচারে মুমূর্ষু পাশ্চাত্য নরনারীর কাছে বিবেকানন্দের এই উদ্দীপক উচ্চারণ মৃতসঞ্জীবনী সুধার মতো কাজ করেছিল। মার্কিন জনসাধারণ বিবেকানন্দের মধ্যে একজন বহু-প্রতীক্ষিত পরিত্রাতার সন্ধান পেলেন যেন।

হিন্দুধর্ম বা মানবধর্ম প্রসঙ্গে, লাঞ্ছিত-অপমানিত স্বদেশ ও স্বজাতি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দকে সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার সুযোগ সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে উদ্বোধন-প্রকাশিত স্বামীজীর সমগ্র 'বাণী ও রচনা'র মুখবন্ধরূপে নিবেদিতার লেখা ভূমিকাটিই বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার গভীরে প্রবেশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথনির্দেশিকা।

সেই ভূমিকাতেই লক্ষণীয়, ১৯ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত শিকাগো-ভাষণের ওপরেই জোর দিয়েছেন নিবেদিতা। এই ভাষণেই হিন্দুধর্মকে সামগ্রিকভাবে বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন স্বামীজী। কিন্তু তিনি বেদের অর্থ ও তাৎপর্যের ব্যাপ্তি ঘটান বিস্ময়করভাবে। নিবেদিতার ভাষায়, "'বেদ' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উহার ধারণাকে অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে তিনি পূর্ণ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট—যাহা সত্য তাহাই 'বেদ'। তিনি বলেন, 'বেদ' শব্দের দ্বারা কোন গ্রন্থ বুঝায় না। উহা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঞ্চিত ভাণ্ডারই বুঝায়।"

ফলতঃ, স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে, ধ্যানে ও ধারণায় হিন্দুধর্মের যে-সংজ্ঞার্থ, সেভাবে হিন্দুধর্মকে কোন হিন্দুই দেখেন না, দেখেনওনি। উক্ত ভাষণে স্বামীজী হিন্দুধর্মের

যে-সংজ্ঞার্থ উপস্থাপিত করেছিলেন, নিবেদিতা তা উদ্ধৃত করেছেন, আমাকেও করতে হবে—

"যাহার তুলনায় বিজ্ঞানের অতি আধুনিক আবিষ্কারসমূহও প্রতিধ্বনির মতো মনে হয়, সেই বেদান্ত-দর্শনের আধ্যাত্মিকতার উত্তুঙ্গ সঞ্চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পুরাণ-সমন্বিত নিম্নতম মূর্তিপূজা, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ, জৈনদের নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত সবকিছুই হিন্দুধর্মে স্থান পাইয়াছে।"

হিন্দুধর্মের পরিধি যদি এতই সুবিস্তীর্ণ হয়, তাহলে সত্যিই নিবেদিতার ভাষায়, "এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করিতে পারে না।"

কোন পরিহাসপ্রিয় আধুনিক পাঠকের মনে হতেই পারে, আধ্যাত্মিক বিশ্বে বিবেকানন্দের তুল্য 'হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদী' আর কেই বা আছেন? আর নিবেদিতা? তাঁর গুরুর, তাঁর দেবতার অভিপ্রায়পূরণে তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ। এদেশে একালে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনেও নিবেদিতাই পথিকৃৎ। 'বিবেকানন্দেরই নিবেদিতা' যে! প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের অকালপ্রয়াত ভ্রাতুষ্পুত্র কবি-প্রাবন্ধিক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর একটি প্রবন্ধে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের কারণরূপে নির্ণয় করেছিলেন 'হিন্দুধর্মের বিরোধগ্রাসিতা'কে! ভারতে বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও ক্রমশঃ তন্ত্রের প্রভাব অনুপ্রবেশ করল এবং কালক্রমে বুদ্ধদেবকেও হিন্দু-অবতাররূপেই হিন্দুরা বরণ করে নিল।

কিন্তু না। বিবেকানন্দ সত্যিই 'হিন্দু-সাম্রাজ্যবাদী' ছিলেন না। তিনি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ অনুধাবন করেছেন মাত্র। তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্যমান কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি সমস্ত রকম সঙ্কীর্ণতা ও হীনতাই সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন। ভণ্ড ও শোষক ব্রাহ্মণ ও পাণ্ডা-পুরোহিতদের উদ্দেশে তীব্রতম ঘৃণা আমৃত্যু বর্ষণ করেছেন। গ্রামীণ ভারত ও লোকায়ত সংস্কৃতিকে তিনি ভারত-পরিক্রমার মাধ্যমে আবিষ্কার ও আত্মস্থ করেছিলেন। তাকে উজ্জীবিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্দেশে।

হিন্দুধর্মকে, বস্তুতঃ যেকোন ধর্মকেই, সেই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ গোষ্ঠী-স্বার্থে, শাসক-শোষক শ্রেণীর স্বার্থে, এমনকি শুধু আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন ও রক্ষার জন্যই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যও ব্যবহার করতে পারে এবং করেও থাকে—এই চেতনা বিবেকানন্দের ছিল।

শিকাগোর আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে তিনি ব্রিটিশ-শাসনাধীন, অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত-শোষিত স্বদেশ স্বজাতির তদানীন্তন ম্রিয়মান নৈতিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে সার্থকভাবে ও অভাবনীয় মাত্রাতেই প্রয়োগ করেছিলেন, সমকালীন ইতিহাস তা দেখিয়ে দিচ্ছে। ধর্মমহাসম্মেলনে বিবেকানন্দের 'বিশ্ববিজয়'-এর সংবাদ ভারতবর্ষে দেরিতে পৌঁছেছিল, কিন্তু পৌঁছানমাত্র অভূতপূর্ব "আনন্দ ও জাতীয় গৌরবের এক বিস্ফোরণ" ঘটে গেল। সর্বস্তরের মানুষ উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁদের "জাতীয় বীর"কে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করল। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের এক বছর পরে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হল-এ অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাপকসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়ে বিবেকানন্দের উদ্দেশে তাঁদের সহর্ষ অভিনন্দন ঘোষণা করেছিল।

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছালেন আরও দু-বছর তিন মাস পরে। বস্তুতঃ, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি তিনি যখন এসে পৌঁছালেন কলম্বোর ঘাটে, রোলাঁর বর্ণনায় পাচ্ছি—

"অগণিত মানুষের আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। দলে দলে মানুষ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। পুরোভাগে পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইল। মন্ত্রপাঠ চলিল। পথ পুষ্পে পুষ্পে ভরিয়া গেল। চারিদিকে গঙ্গাজল ও গোলাপজল ছড়ানো হইল। গৃহগুলির সম্মুখে ধূপ ও ধুনা পুড়িতে লাগিল। ধনী-দরিদ্র হাজার হাজার মানুষ তাঁহার উদ্দেশে অর্ঘ্য বহিয়া আনিল।"

দক্ষিণ থেকে উত্তরের পথে আবার শুরু হলো বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমা। আগে এই পথেই তিনি ভিখারির বেশে গিয়েছিলেন, এবারের পরিক্রমা বিজয়ীর বেশে, সঙ্গে অগণিত উল্লসিত জনতা। "রাজারা তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত" হলেন, তাঁর রথরজ্জু ধারণ করে কৃতার্থ হলেন। কামান গর্জন করল, দলে দলে চলল হাতি, উট। রোলাঁর ভাষায়, গ্রীক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের স্বাধীনতাযুদ্ধের নায়ক জুডাস ম্যাকাবিয়াসের বিজয়সঙ্গীত ধ্বনিত হলো।

নিঃস্বার্থ অটল একাগ্রতায় বিবেকানন্দ বজ্রের চেয়েও দৃঢ় ও নিরাসক্ত কর্মযোগী ছিলেন বলেই ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে সেদিন তিনি স্বদেশে যে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন তা তাঁকে অভিভূত ও আত্মতুষ্ট করতে পারেনি, যদিও গভীরতায় ও ব্যাপকতায় সেই

রাজকীয় সম্বর্ধনার সঙ্গে তুলনীয় কিছু তাঁর আগে বা সমকালে আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়নি। তাঁর প্রয়াণের পরেও অনুরূপ ঘটনা দেশ-কাল-পাত্র বিচারে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবিশ্বাস্য উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনাপূর্ণ গণসম্বর্ধনায় বিবেকানন্দ তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে আরও প্রাণিত, আরও সচেতন হয়ে উঠলেন। রোলাঁর অননুকরণীয় ভাষার অনুবাদেও জেনে নিতে হবে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের সমকালের বৃহত্তর ভারত ও সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার সারাৎসারটুকু—"তিনি ছিলেন অসুস্থ, তাঁহার জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল শুশ্রূষার। কিন্তু কোথায় সেই শুশ্রূষা, তিনি অতিমানবিকভাবে তাঁহার শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত যাত্রাপথে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতায় বাতাসে বাণীর বীজ উড়াইয়া চলিলেন। এমন সুন্দর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা ভারত ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সমস্ত দেশ রোমাঞ্চিত হইল।"

কলম্বো, ক্যান্ডি, অনুরাধাপুরম, জাফনা, পাম্বান, রামেশ্বর, রামনাদ, মাদুরা, তিরুচিরাপল্লী, কুম্ভকোনম (একটি ছোট রেলস্টেশন, এখানে ট্রেন থামানোর জন্য শত শত মানুষ খোলা মাঠে রেলপথের ওপর শুয়ে পড়েছিল), মাদ্রাজ এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে কলকাতায় ছিল বিজয়ী বীরের পরিক্রমা। এখন থেকে শতাব্দীকাল আগে, মাদ্রাজে তাঁর জন্য সতেরটি বিজয়তোরণ তৈরি করা হয়েছিল, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় চব্বিশটি মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, নয়দিনব্যাপী আনন্দমুখরিত উৎসবে মাদ্রাজের সমস্ত কাজকর্ম ছিল স্থগিত। "জনসাধারণের উন্মত্ত প্রত্যাশার" উত্তরে বিবেকানন্দের বাণী ঘোষিত হয়েছিল শঙ্খধ্বনির মতো, রোলাঁর ভাষায়, "সে-শঙ্খধ্বনি রামচন্দ্র, শিব ও কৃষ্ণের দেশকে পুনরায় জাগ্রত হইতে আহ্বান করিল; তাহার শৌর্যশীল মানসসত্তাকে, তাহার অমর আত্মাকে সংগ্রামের জন্য অগ্রসর হইতে বলিল। তিনিই ছিলেন সেনাপতি।"

একটির পর একটি দৃপ্ত ও রোমাঞ্চকর ভাষণে সেনাপতি ঘোষণা করলেন :

"হে আমার ভারত! জাগ্রত হও! কোথায় তোমার জীবনীশক্তি? সে-শক্তি তোমার অমর আত্মায়।... আজ আমাদের দেশ যাহা চায়, তাহা হইল লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, অতিকায় ইচ্ছাশক্তি, যাহা কোন প্রতিরোধ মানে না, যাহা সকল প্রকারে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। তাহাকে যদি সমুদ্রের অতল গভীরে নামিতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়—তাহাতেও ক্ষতি নাই।... চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস।"

ভারতের জাগরণের জন্য কেন বিবেকানন্দের এত ব্যগ্রতা? কারণ, জাগ্রত ভারত যে জাগ্রত করবে পৃথিবীকে! সেই জাগ্রত পৃথিবীর পরিত্রাণের শাশ্বত মন্ত্র শিকাগো ধর্মমহাসভায় উচ্চারণ করেছিলেন ভারতবর্ষের চারণসন্ন্যাসী :

"বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

বস্তুতঃ, বিবেকানন্দের মধ্যে পৃথিবী পেয়েছে তার বহু-প্রতীক্ষিত পরিত্রাতাকে।□

পরিক্রমা

আঙ্কোরবট, আঙ্কোরথোম ও নমপেন

আশুতোষ বিশ্বাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

আঙ্কোরবট মন্দির পরিক্রমার পর সন্নিহিত ধ্বংসাবশেষ আঙ্কোরথোম (Angkorthom) পরিদর্শনের সুযোগ হলো। কাম্বোডিয়ার পরিভাষায় 'আঙ্কোরথোম'-এর অর্থ হলো বৃহৎ নগরী। আঙ্কোরবটের উত্তরদিকে প্রায় ১৭০০ মিটার দূরত্বে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ অবস্থিত, যেটি নির্মিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা জয়বর্মণের (সপ্তম) রাজত্বকালে। খেমের সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগে নির্মিত এই সুবিশাল মহানগরী রাজধানীকে একটি সুরক্ষিত দুর্গের রূপ দিয়েছিল। রাজধানীর সংরক্ষণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল, কারণ অতীতে নিরীহ কাম্বোডিয়া আক্রান্ত হয়েছিল তার প্রতিবেশী ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বর্মা (বর্তমানে মায়ানমার), মধ্য জাভা, সুমাত্রা, মালয়ের দ্বারা।

এই মহানগরী একটি বৃহৎ বর্গক্ষেত্র, যার প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্যে ৩ কিলোমিটার। ৮ মিটার উঁচু একটি প্রাচীর সমগ্র নগরীটিকে চারদিকে বেষ্টিত করে রেখেছিল। পরিবেষ্টিত ভূমির পরিমাপ ৩৬০ একর। বহিঃপ্রাকারের চারপাশে ১০০ মিটার প্রস্থের একটি পরিখা খনন করা হয়েছিল শত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। এখন পরিখাটিতে অবশ্য জল নেই, পরিপূর্ণভাবে শুষ্ক।



আঙ্কোরবট মন্দিরের একটি প্রবেশতোরণ। প্রবেশতোরণের শীর্ষে চতুর্মুখ ব্রহ্মার শিরোদেশ, সম্মুখে দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন।

দুটি স্বতন্ত্র পথ—একটি উত্তর-দক্ষিণ ও অন্যটি পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী—শহরকে সমান চার অংশে বিভক্ত করেছে এবং এই দুটি পথের কেন্দ্রবিন্দুতে বেঅন

(Bayon) মন্দির অবস্থিত। রূপকের দৃষ্টিতে এই রাজধানী যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একটি ক্ষুদ্র রূপ এবং বেঅন মন্দির যেন স্বর্গ ও মর্তের সংযোজক।

এই নগরীর সর্বসমেত পাঁচটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রত্যেকটি দিকে একটি, আর পূর্বদিকে মোট দুটি। পূর্বদিকের একটি দ্বার 'বিজয়-তোরণ' (Gate of Victory) নামে প্রসিদ্ধ।

প্রতিটি প্রবেশদ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত দীর্ঘ আগমন-নির্গমন মার্গ। পথের দুপাশে ৫৪টি প্রস্তরমূর্তির সারি—ডানপাশে দানবদের ও বাঁপাশে দেবতাদের অধিষ্ঠান। সর্বসমেত ১০৮টি দেব-দানবের মূর্তি যেন আঙ্কোরথোম নগরীর আরক্ষিরূপে অতন্দ্র প্রহরায় অনুক্ষণ নিয়োজিত। সামরিক শিরস্ত্রাণে সজ্জিত অসুরদের মুখে বিকৃত হাসি, আর মুকুটধারী দেবতাদের মুখমণ্ডলে নির্মল প্রশান্তি। প্রবেশমার্গের শুরুতেই একটি অতিকায় নাগের মূর্তি। মূর্তিটির নয়টি মাথা। সুর ও অসুরেরা নাগটিকে বহন করে নিয়ে চলেছে [সমুদ্রমন্থনের ছায়া?]। প্রতিটি প্রবেশদ্বারে পথের দুপাশে এই ভাস্কর্যের পরিকল্পনা সত্যিই মনোহারী।

পঞ্চ প্রবেশতোরণের প্রত্যেকটির উচ্চতা ২৩ মিটার। সৌধের শীর্ষে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি যিনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করে রয়েছেন। প্রবেশদ্বারের নিম্নাংশ ত্রিমস্তক হস্তীর শুণ্ডের আকৃতিতে নির্মিত। হস্তিশুণ্ড পদ্মপুষ্প চয়নে নিয়োজিত। ঊর্ধ্বাংশে হস্তিপৃষ্ঠে দক্ষিণহস্তে বজ্রধারণকারী দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তি। তাঁর দুপাশে রূপসী অপ্সরারা আসীন। খেমের স্থাপত্যের উজ্জ্বল বিকাশ এই প্রবেশতোরণের রূপায়ণে লক্ষ্য করা যায়।

একসময়ে উপস্থিত হলাম এই ঐতিহাসিক নগরীর অধুনা জনহীন অন্তঃপুরে। কল্পনা করলাম, একদা এই সুদৃশ্য রাজধানী মুখরিত ছিল নাগরিকদের প্রাণচাঞ্চল্যে। কিন্তু সে এখন দূর অতীতের কথা। এখন এটি জনবিরল একটি ভূখণ্ড। ইতস্ততঃ অসংখ্য ধ্বংসের স্তূপ। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষ সাক্ষ্য দেয় যে, আঙ্কোরথোম একসময় সত্যিই একটি বড় নগরী ছিল, যেখানে ছিল রাজপ্রাসাদ, সামরিক বাহিনীর আবাস, পুরোহিতদের বাসস্থান এবং বহু দেবদেউল।

আঙ্কোরথোমের দ্রষ্টব্যস্থান

বেঅন (Bayon) মন্দির

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত এই মন্দিরের নির্মাণকাল। তদানীন্তন রাজা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জয়বর্মণ (সপ্তম)। এই মন্দিরের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে একটি অপরূপ ভারসাম্য, ঐক্য ও ছন্দ প্রতিফলিত। ৫৪টি সৌধ এবং শীর্ষে উৎকীর্ণ দু-শর বেশি মুখাবয়ব-সমন্বিত এই মন্দিরের সৌন্দর্য অতুলনীয়। প্রতিটি সৌধের শীর্ষে চতুর্মুখ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। মূর্তিগুলির প্রশস্ত ললাট, স্ফীত নাসারন্ধ্র, অবনত নয়ন, মুখে মৃদু হাস্যরেখা খুবই আকর্ষণীয়।

এই মন্দিরেও তিনটি তল বর্তমান। প্রথম দুটি তলের দেওয়ালগাত্রে খোদিত বিভিন্ন মনোরম ভাস্কর্য। প্রথম তলে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম আলেখ্য, যেমন হাট-বাজার, মাছ ধরা, উৎসব, মল্লযুদ্ধ, মোরগের লড়াই ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক দৃশ্য, যেমন সংগ্রাম, সামরিক শোভাযাত্রা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় তলের দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্যগুলিতে প্রধানতঃ পৌরাণিক কাহিনী পরিস্ফুট, যেমন অর্জুনকে শিবের বরদান, সমুদ্রমন্থন, হনুমানের কীর্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বিবিধ উপাখ্যান ইত্যাদি।

ত্রিতল একটি বর্তুলাকার পবিত্র মন্দির এবং চতুর্দিকে বিভিন্ন উচ্চতায় বহুসংখ্যক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমূর্তি।

বাফুঅন (Baphuon) মন্দির

এই মন্দির বেঅন মন্দির থেকে ২০০ মিটার উত্তর-পশ্চিমে। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু রাজা উদয়াদিত্য (দ্বিতীয়) এই মন্দিরের নির্মাণকর্তা। এই দেবালয়ের বিগ্রহ দেবাদিদেব মহাদেব।

একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উচ্চ সমতলের ওপর এই মন্দিরের অবস্থিতি। দীর্ঘ ও উঁচু বেলেপাথরের পথ অগ্রসর হয়েছে এই দেবালয়ের পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারে। বর্তমানে মন্দিরটির খুবই জীর্ণ অবস্থা। মন্দিরের বহির্ভাগে পশ্চিমদিকের দেওয়ালে একটি অসাধারণ ভাস্কর্য রয়েছে। স্খলিত প্রস্তরগুলি বিশেষ সুবিন্যাসে একটি বিশাল শায়িত বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়ে। যদিও ভগবান তথাগত সঠিকভাবে এখানে মূর্ত নন, তবে তাঁর শায়িত আকৃতির ধারণা অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না।

হস্তিমঞ্চ (Terrace of the elephants)

বৌদ্ধ রাজা সূর্যবর্মণ (সপ্তম) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এই উচ্চ সমতল প্রাঙ্গণটি নির্মাণ করেছিলেন। পদ্মফুল উত্তোলনরত ত্রিমস্তকবিশিষ্ট হস্তিশুণ্ড এখানেও সোপানশ্রেণীর স্তম্ভরূপে পরিকল্পিত। উন্নত মঞ্চের

দেওয়ালে সিংহ ও গরুড়ের মূর্তি, সর্প ও গরুড়ের সমন্বয়ে রেলিংয়ের শ্রেণী ইত্যাদি দর্শককে বিমোহিত করবে। মনে হয় মূর্তিগুলির একটি বড় অংশ হলো সম্রাটদের মৃগয়ার আয়োজনের রূপমূর্তি। যেমন, গহন অরণ্যে শিকারের ছবি। রাজকীয় তত্ত্বাবধানে রয়েছে বীর্যশালী মাতঙ্গ-যূথ যার ওপর মৃগয়াভিযানে আসীন সম্রাট, রাজকুমার, বিভিন্ন রাজপুরুষ ও পরিচারকবৃন্দ। মৃগয়ার এই আয়োজনকে ভিত্তি করে হস্তিমঞ্চটি বিভিন্নভাবে রূপায়িত।

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রাজার প্রাঙ্গণ
(Terrace of the leper king)

এই সুবিস্তৃত উচ্চ মঞ্চের নির্মাণকর্তা ছিলেন রাজা জয়বর্মণ (সপ্তম)। এটি নির্মিত হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। এখানে মুখ্য দর্শনীয় বস্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রাজার প্রস্তর প্রতিমূর্তি। এই মূর্তিটি আসলের অনুকরণে নির্মিত হয়ে এখানে স্থাপিত। আসল অবয়বটি অধুনা রাজধানী নমপেনে অবস্থিত জাতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। এই



বেঅন মন্দিরের একটি সৌধশীর্ষে চতুর্মুখ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। মূর্তিগুলির প্রশস্ত ললাট, স্ফীত নাসারন্ধ্র, অবনত নয়ন, মুখে মৃদু হাস্যরেখা খুবই আকর্ষণীয়।

আরেকটি অসাধারণ ভাস্কর্য দেখা যায় এখানে। পঞ্চমস্তকবিশিষ্ট একটি অশ্ব সজীবতায় তুলনাহীন। কিংবদন্তী—বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর এই অশ্বের রূপ ধারণ করেছিলেন জনৈক বণিক ও তার সঙ্গীদের বিপন্মুক্ত করার জন্য। তারা তার পুচ্ছ অবলম্বনে সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে তীরে পৌঁছেছিল।

প্রস্তর প্রতিমূর্তিটি উলঙ্গ, মস্তকস্থ কেশবিন্যাস অবিন্যস্ত, হাঁটু উত্তোলিত। এই বিশেষ উপবেশন জাভাদেশীয় লোকেদের বৈশিষ্ট্য। পদদ্বয় হ্রস্ব, আকৃতি বর্তুলাকার, দেহের পেশী সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট নয়। এই সমস্ত অঙ্গবিকৃতি সত্ত্বেও মূর্তিটি সৌন্দর্যময়। খ্মেরের ভাস্কর্যের এটি একটি অপরূপ নিদর্শন। কেউ কেউ মনে করেন, এটি

ধনদেবতা কুবেরের যিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে এই মূর্তি মৃত্যুদেবতা যমের। খেমের সভ্যতায় এই সৌধগুলি সমাধি-মন্দিররূপে স্বীকৃত এবং রাজন্যবর্গের দেহান্তে ভস্মাবশেষ সংরক্ষিত হতো সেখানে। এই চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে মূর্তিটি মৃত্যুদেবতার হওয়া সম্ভব। অন্য একটি কিংবদন্তী হলো, জনৈক পুরোহিত রাজ-সম্মুখে অবনত হতে অস্বীকৃত হলে নৃপতি ক্রোধান্বিত হয়ে অসি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। তাতে পুরোহিত নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন রাজার গায়ে। তার প্রতিক্রিয়ায় রাজা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন।

মঞ্চের বহির্দেওয়ালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নানাবিধ দৃশ্য উৎকীর্ণ। সেগুলির মধ্যে রয়েছে সাপ, গরুড়, তরবারি ও গদা-ধারী বহুভুজ অসুরবৃন্দ, মুণ্ডহীন নারীমূর্তি ইত্যাদি।

আঙ্কোরথোমের পরিক্রমার পরিসমাপ্তি এখানে। এবার যাব রাজধানী নমপেনে।

নমপেন-দর্শন

প্রাচীন রাজধানী ও মন্দির ধ্বংসাবশেষের প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে গ্র্যান্ড হোটেলে ফিরে এলাম রাত্রিবাসের জন্য। প্রায় ৭৫ বছর আগে ফরাসী সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল হোটেলটি। হোটেলটি কাম্বোডিয়া সরকারের অধীন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও প্রশাসন-নৈপুণ্যের অভাবে হোটেলটি শ্রীহীন। এখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে একটি ক্ষুদ্র শহর সিয়েম রীপ (Siem Reap) রাজধানী নমপেনের সঙ্গে বিমানপথে সংযুক্ত। কাম্বোডিয়ার আভ্যন্তরীণ যানবাহন হিসেবে যে ক্ষুদ্রকায় বিমানগুলো পর্যটকদের নিয়ে দৈনন্দিন সিয়েম রীপ যাতায়াত করে তার সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান ছিলাম। এই ক্ষুদ্র বিমানগুলি স্বাভাবিকভাবে আকাশপথে বেশি উঁচুতে বিচরণ করতে অক্ষম। এগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্ন উচ্চতায় ভ্রমণশীল। ফলে অল্পক্ষণের যাত্রা হলেও প্রায়শঃ পর্যটকদের কাছে অস্বাচ্ছন্দ্যকর মনে হয়। উপরন্ত এই যাত্রার প্রাক্কালে আমেরিকায় কয়েকটি ক্ষুদ্রপাল্লার বিমানের দুর্ঘটনা পরপর ঘটে গেছে। ফলে মনে একটি আশঙ্কার চিত্র ছিল। যাই হোক সংশয় কাটল অচিরেই। বিমানবন্দরে পৌঁছে লক্ষ্য করলাম বায়ুযানটি খুব ক্ষুদ্র আকৃতির নয়। আনুমানিক ৭০জন যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে। ফরাসী বিমান এবং চালকও ফরাসী। বিমানটি প্রতিদিন দুবার যাত্রী নিয়ে সিয়েম রীপ ও রাজধানীর মধ্যে যাতায়াত করে। দুটি খেপেই বিমানটি যাত্রীতে পূর্ণ ছিল। লক্ষ্য করলাম, যাত্রীদের মধ্যে ফরাসী, জাপানী ও চীনারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফরাসীদের থাকার কারণ, এদেশ বহু বছর ফরাসী শাসনের অধীনে ছিল। ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের উদ্যম ও উৎসাহে এদেশে বিভিন্ন খননকার্য হয়েছে এবং বহু প্রাচীন মন্দির, রাজপ্রাসাদ, বহু ভাস্কর্য ও শিল্প-নিদর্শন অধুনা লোকচক্ষুর সম্মুখে এসেছে।

৩৫ মিনিটের ভ্রমণপথ আকাশমার্গে। জানালা দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করে চলেছি। সুবিস্তৃত গ্রামীণ পরিবেশ, হরিৎক্ষেত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। একটি নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। নদীটির নাম টোনি স্যাপ (Tonie Sap)। নদীটির উৎস একটি বিশালাকার হ্রদ—নাম টোনি স্যাপ লেক। লেকটি আঙ্কোরবট মন্দির থেকে বেশি দূরে নয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে রাজধানী নমপেনে মেকং (Mekong) নদীর মধ্যে তার বিলুপ্তি।

ঠিক সময়ে বিমানটি রাজধানী নমপেনে নিরাপদে অবতরণ করল। ক্ষুদ্র, পরিচ্ছন্ন বিমানবন্দর। মেকং নদীর ধারে কাম্বোডিয়ার রাজধানী ছোট শহর নমপেন। প্রথমে উপস্থিত হলাম দেশের জাতীয় সংগ্রহশালায়। বিরাট কিছু নয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শন সেখানে সংরক্ষিত রয়েছে। নানারকম ভঙ্গিমায় বেশ কিছু বুদ্ধের মূর্তি সেখানে রক্ষিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও, যেগুলি খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে, সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। সংগ্রহশালাটি ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়।

পরের দ্রষ্টব্য রৌপ্য প্যাগোডা (Silver Pagoda)। এই বৌদ্ধমন্দিরের পাশেই রাজপ্রাসাদ। সুবিশাল এই মন্দিরটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মন্দিরে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের সুউচ্চ মূর্তি অধিষ্ঠিত। এই কক্ষের নির্মাণকার্যে বহুমূল্য রৌপ্য ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই দেবালয়ের বিশেষ নামকরণ 'রৌপ্য প্যাগোডা'। মন্দিরের চারপাশে স্থানীয় রাজবংশীয় পুরুষদের কয়েকটি সমাধিসৌধ রয়েছে। সিলভার প্যাগোডার সন্নিহিত সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ, পার্লামেন্ট ভবন, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের আধুনিক আবাস, সম্পন্ন গৃহস্বামীদের শ্রীসম্পন্ন নিকেতন, যুদ্ধে নিহত নাগরিকদের স্মারকসৌধ প্রভৃতি রয়েছে।

অল্প দূরত্বে মেকং নদীর অবস্থান। শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান মেকং। সুদূর চীন-সীমান্তে মেকং-এর উৎস অবস্থিত। লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে এর বিলুপ্তি। নদীর তীর ঘেঁষে একটি প্রশস্ত মার্গ।

সারা পথের দুপাশে নানা ধরনের দোকানপত্র। লোকজনদের অনেকের মধ্যে দারিদ্র্যের নির্মম ছায়া। ভিক্ষাজীবীর সংখ্যাও কম নয়। স্থানে স্থানে আবর্জনার বিশাল স্তূপ। প্রাচ্যের দরিদ্রদেশে নদীতটস্থ জনপদের এই অবস্থা অভাবনীয় কিছু নয়। পরিবেশটিকে মনোমুগ্ধকর করা যেতে পারত। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে তা শোচনীয়ভাবে অস্বাস্থ্যকর ও দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়ক। তুলনায় পাশ্চাত্য দেশগুলির নদীতট অপরূপ সৌন্দর্যময়। পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষশ্রেণী ও দৃশ্য নিরীক্ষণের সংরক্ষিত পরিচ্ছন্ন স্থান—সব মিলিয়ে নয়নাভিরাম। নদী পারাপার করার একটি সেতু আছে। এটি জাপান-কাম্বোডিয়ার বন্ধুত্বের প্রতীক।

আরেকটি বুদ্ধমন্দির দর্শনের সুযোগ হলো। নাম ওয়াটনম (Watphnom)। শব্দটির অর্থ—পাহাড়ের ওপর মন্দির। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঁচুতে উঠতে হলো। পাহাড়ের ওপর অপরূপ নৈসর্গিক পরিবেশে এই সুন্দর মন্দিরটি অবস্থিত। বেশ খানিকটা উঁচুতে ওঠায় চারদিক থেকে শহরের চারপাশ অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মন্দিরের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সহাস্য নারীমূর্তি রয়েছে। নারীর নাম নমপেন। কথিত আছে যে, এই সদাশয়া, হাস্যমুখী নারী রাজধানী নমপেনের পত্তন করেন।

প্রায় বেলা শেষ। ফিরে এলাম রাত্রিবাসের নির্দিষ্ট আশ্রয়ে। শুনলাম, শহরের অনতিদূরে গ্রামাঞ্চলে এখনো অরাজকতা বিপজ্জনক পর্যায়ে। পোল পটের (Pol Pot) অনুগামী গেরিলা যোদ্ধারা কাম্বোডিয়ার বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে মেনে নেয়নি। তারা এখনো 'স্বাধীনতা-সংগ্রামে' নিয়োজিত। ফলে রাস্তা-ঘাট, বিশেষ করে বিদেশীর কাছে, বিপদবহুল। এই যাত্রার প্রাক্কালে আমেরিকান সংবাদপত্রে দেখেছিলাম, তিনটি বিদেশী যুবক (ইংরেজ, ফরাসী ও অস্ট্রেলীয়) এদেশে ভ্রমণ করছিল এবং তারা এই গেরিলা বাহিনীর দ্বারা বলপূর্বক অপহৃত হয়েছে। একটি অসম্ভব মুক্তিপণের বিনিময়ে দোদুল্যমান ছিল এদের জীবন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখেছি, এদের তিনজনকেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

পরের দিনের দ্রষ্টব্যস্থানটি ছিল জাতিনির্মূলকরণ সংগ্রহ-শালা (Genocide Museum)। কাম্বোডিয়ার নেতা পোল পটের শাসনকালীন নৃশংস অত্যাচারের অসংখ্য নিদর্শন এখানে রয়েছে। তৈমুর লঙ, স্ট্যালিন, হিটলারের শ্রেণীভুক্ত এই নায়ক। তাঁর সীমাহীন অমানুষিক নির্যাতনের মর্মন্তুদ উদাহরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংরক্ষিত এই সংগ্রহশালায়। পূর্বে এই অট্টালিকা একটি বিদ্যালয় ছিল। পোল পটের শাসনকালে সেটিকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল কারাগারের রূপে। নির্বিচারে মানুষকে বন্দী করে আনা হতো এখানে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ—কারো অব্যাহতি ছিল না। গৃহটির সমস্ত বহির্ভাগ বেষ্টিত ছিল তারের মাধ্যমে এবং এই তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে সচল থাকত বিদ্যুৎপ্রবাহ। অসহায় বন্দীদের পলায়নের কোনরকম সম্ভাবনা ছিল না।

একটি অংশে রয়েছে কয়েকটি লোহার খাট। বন্দীদের সেখানে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাখা হতো ও তাদের ওপর চলত অবর্ণনীয় অত্যাচার। আরেকটি অংশে উপস্থিত হলাম। সেখানে একটি নাতিপ্রশস্ত হলঘরে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। এই অচিন্তানীয় অল্প পরিসর স্থানে বন্দী অবস্থায় বাস করতে হতো বিদ্রোহী নাগরিকদের। তাদের একাকী বন্দিজীবন যাপন করতে হতো। বাইরে কয়েকটি ধাতব পাত্র রয়েছে। বন্দীদের পা বেঁধে মাথা ও মুখ ডুবিয়ে দেওয়া হতো ঐ পাত্রগুলিতে। যেখানে থাকত উত্তপ্ত তরল পদার্থ। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বেয়নেটের সাহায্যে তাদের বিদীর্ণ করা হতো অথবা গুলি করে মারা হতো। এসব ছিল পোল পট-অনুগামীদের দৈনন্দিন ক্রীড়াকলাপের বিশেষ অঙ্গ। মায়ের কোল থেকে বলপ্রয়োগে শিশুকে তুলে নিয়ে এসে হত্যা করা হতো। স্বামী-স্ত্রীকে স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন কারাগারে নিক্ষেপ করে তারা আনন্দ করত। মধ্যযুগীয় বর্বরতার চরম দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছিল এখানে এই বিংশ শতাব্দীতে।

শেষের কক্ষটিতে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লাম। দেওয়ালগাত্রে অস্থি, নরমুণ্ডসমন্বিত একটি বিশাল স্তূপ। প্রথমে মনে হলো, এইগুলো হয়তো কৃত্রিম, অত্যাচারে বহু নরহত্যার রূপক। পরে শুনলাম, স্তূপটি সত্যিই অত্যাচারে নিপীড়িত অসংখ্য জনগণের করোটির প্রকৃত সমাবেশ। কত বেদনা, নৈরাশ্য, নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে এই নির্মম স্তূপে। নমপেন শহর পর্যটনের সমাপ্তি এখানে।

মার্কিন দেশের অন্তর্গত টেক্সাসের হিউস্টন শহর থেকে আমার এই যাত্রার শুরু। দীর্ঘ বিমানযাত্রায় এসেছিলাম কাম্বোডিয়ায়। প্রায় ২৪ ঘণ্টা আকাশমার্গে বিচরণ নিঃসন্দেহে কায়িক ও মানসিক দিক থেকে যথেষ্ট ক্লেশকর। কিন্তু তবুও সারা পথে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সেই ক্লেশকে অগ্রাহ্য করেছিলাম। অবশেষে কাম্বোডিয়া দর্শনের পর মনে হলো, সব মিলিয়ে আমার এই ভ্রমণ খুবই আকর্ষণীয়। কিছুদিন আগেও সাধারণ পর্যটকদের কাছে

এই দেশের প্রবেশদ্বার ছিল অবরুদ্ধ। অধুনা সেই নীতি পরিবর্তিত। এর ফলে ভ্রমণার্থীদের পক্ষে এই দেশে পর্যটন সুসাধ্য হয়েছে। বিমানবন্দরের শান্ত, ভদ্র চেহারার কর্মাধ্যক্ষরা যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তৎপর। লক্ষ্য করলাম, যেসব আগন্তুকদের অনুমতিপত্র নেই তাদের বিমানবন্দরেই সাময়িকভাবে ওদেশে প্রবেশাধিকার দেবার বন্দোবস্ত রয়েছে।

এবারের গন্তব্য ব্যাঙ্কক হয়ে কলকাতা। উন্মুখ হয়ে রইলাম কলকাতায় ফেরার উদ্দীপনা নিয়ে। জীবিকার প্রয়োজনে জীবনের প্রায় সমগ্র অংশই অতিবাহিত হয়েছে আমেরিকায় বিভিন্ন উজ্জ্বল জনপদে। তবুও এই ধূলিমলিন, বিশৃঙ্খল নগরীর সঙ্গে অনুভব করি প্রাণের স্পন্দন। অবশেষে একসময় এসে পৌঁছালাম কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। [সমাপ্ত]□

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট কালীমূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে এটি চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান : হৃদয়, চক্র : অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির নৃসিংহদেবের পূর্বপুরুষ বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হংসেশ্বরী-মন্দিরের একটি আত্মিক সম্পর্কের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দুর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"

—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ডাঃ স্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ট্রিনিটি শিল্পিগোষ্ঠী

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

সেই নির্বাসিত... সাগর...

শেখ আবদুল মান্নান

গভীর রাতে ব্যাকুল কণ্ঠে মা ডেকে ওঠেঃ
'বাবা সাগর এলি!'
সিংহগর্জনে মেঘ বাতাসের উলটো দিকে
পালতোলা নৌকায় ক্রমশঃ অঘোর নীলে
মুষ্টিবদ্ধ হাত হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলেছে.
পার্ক স্ট্রীটের সেই বিধবা শূন্যবুকে চেয়ে আছে
আকাশের গাঢ় নীল দিগন্তে,
দামোদর পেরোতে পেরোতে ট্রেনগুলো হুইসেল মারে।

এখন বীরসিংহে গভীর ছায়া
ভগবতীর বুক রাত্রিতে থরথর কেঁপে ওঠে
নিদ্রা চুরি করে নিয়েছে আঁধারের যৌবন
বিচারের জন্য ওরা সেই যে সাগরকে নিয়ে গেল
মায়ের বুক থেকে, ফিরিয়ে দেয়নি আজো...
বাটি হাতে শীর্ণ হাত ডাকেঃ 'আয়—আয়...
সাগর ফিরে আয়...।'

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

তারক চক্রবর্তী

শুচি শুদ্ধ গৈরিক সন্ন্যাসী কর্মযোগী তেজস্বী বাগ্মী
আদর্শে মহান তুমি বীরত্বের উন্নত মহিমা
জয়গানে মুখরিত আজ আসমুদ্রহিমাচল ভারতের
যত শিশু বৃদ্ধ নারী উদ্ধত যুবক তপঃক্লান্ত সাধক ফকির
মহাযোগী 'হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক'—
প্রলয়ের নৃত্যে ঐ বাজে বুঝি ডমরু-পিনাক
ঘননীল আকাশের গায় দূরে কাছে অগ্নিমূর্তি
রুদ্র নেচে যায়
উত্তাল সাগরে নীল জলে কন্যাকুমারিকা হতে বেলুড়ের
রামকৃষ্ণ মঠে
খুঁজে ফেরে কাকে আজ—তোমাকে তোমায়।
গঙ্গার বিস্তীর্ণ স্রোতে লীয়মান গোধূলি আকাশ
প্রশস্ত ললাট স্পর্শে ধন্য হলো সূর্যস্নাত সায়াহ্ন সমীর
পুষ্পশুভ্র পদধূলি দিয়ে যায় ফল্গুধারা মূলাধার হতে
সহস্রারে
মুহূর্তের শিহরণে জাগরিত চৈতন্যপ্রবাহে মনশ্চক্ষু বিশুদ্ধ
উজ্জ্বল
চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত শুভ্রজ্যোতি নাদব্রহ্ম বৈরাগ্য বিবেক
এই মর্মে উদ্ভাসিত ক্ষমা সত্য সেবা ত্যাগ
মানবতা সর্বধর্মসার
প্রেম সত্য চিতা সত্য, তার চেয়ে সত্য যে মহান
ধ্বনিময় মহা ওঁকারে চতুর্দিকে জেগে ওঠে সেই মুক্তবাণী
"জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"।

আমি যখন 'কথামৃত' পড়ি

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

আমি যখন 'কথামৃত' পড়ি,
মনে মনে স্বপ্ন দেখি আমি
কল্পনাতে কখন গেছি চলে
ঠিক যেখানে ঠাকুর আছেন বসে।

তাঁর সামনে বসে আছেন ঘরে
নরেন রাখাল তারক শ্রীম সবাই।
আমিও আছি ঘরেরই এক কোণে।
মুগ্ধ হয়ে শুনছি তাঁরই কথা।

কথা তো নয়, অমৃতেরই ধারা
ঢেলে দিচ্ছেন কুম্ভে কুম্ভে তিনি।
উপমা আর গল্প ভরা তাতে।
গল্প তো নয়, মুক্তোমালা যেন।

উপমা সব জীবন থেকে তোলা।
অসামান্য ভঙ্গিমা তাঁর বলার।
মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেন সবাই।
শুনছি না তো, গিলছি 'কথামৃত'।

কঠিন কথা কত সহজ করে
অবলীলায় বলে যাচ্ছেন তিনি।
একথা যে ঈশ্বরেরই কথা!
একথা কি মানুষ বলতে পারে?

মাঝেমধ্যে ভাবসমাধি তাঁকে
নিয়ে যাচ্ছে, জানি না কোন্ লোকে।
জ্যোতিঃ! আহা! কী অপরূপ জ্যোতিঃ!
বেরুচ্ছে তাঁর দিব্য দেহ থেকে।
জ্যোতির যেন বান ডেকেছে ঘরে!
আমরা সবাই ভাসছি তারই স্রোতে!

মনের মধ্যে প্রশ্ন ছিল যত,
কী আশ্চর্য! জেনে গেছেন সবই।
উত্তরে তাঁর কথামৃতসুধা
ঢেলে দিলেন সবার প্রাণে প্রাণে।

দিব্য হাসি, এমন দিব্য হাসি
কে দেখেছে অন্য কোথাও আগে?
দুঃখহরণ আনন্দময় পুরুষ
সবসময়ই আছেন রসেবশে।

দুচোখ থেকে নিজের অগোচরেই
ঢল নেমেছে জলের এবং সুখের।
ইচ্ছে করছে, সবাইকে আজ ডেকে
বলি: "ওরে! কোথায় আছিস কে কে?
এই দুনিয়ায় যত আছিস দুখী,
আয় সকলে আনন্দের এই হাটে!
আঁজলা ভরে কথামৃতসুধা
পান করে নে আকণ্ঠ সব তোরা।
সেই সুধাতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বলে
ডুব দিয়ে ওঠ মোক্ষনদীর পারে।"

আমি যখন 'কথামৃত' পড়ি,
আনন্দে আর অশ্রুজলে ভেসে,
ঠাকুর তখন বলেন কানে কানে:
"আমি আছি! ভয় পাস না ওরে!
দুঃখে-সুখে সর্বদা সবখানে
আমি আছি তোরই পাশে পাশে।"

আদ্যিকালের কথা

মঞ্জুমালা বন্দ্যোপাধ্যায়

আদ্যিকালের কথা—
"সত্যের কোন বিকল্প নেই"।
অতীতে ছিল না
বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না।
তোমরা যত আধুনিক হও না কেন,
যতই বল এসব আদ্যিকালের কথা;
তবু তা-ই রইবে চিরকাল।

ভালবাসার কোন বিকল্প নেই।
তোমরা মান আর নাই মান—
ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, ভালবেসে
পৃথিবী জয় করা যায়।
হিংসা শুধু হিংসার পুনরাবৃত্তি ঘটায়
তোমরা মান আর নাই মান।

বুদ্ধ খ্রীস্ট রামকৃষ্ণ
যুগে যুগে এসে চেয়েছেন—
তোমাদের চৈতন্যের উন্মেষ ঘটাতে।
বলেছেন—তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি। ওঠ, জাগ।
তবু তোমরা ঘুমিয়ে আছ,
বিশ্বাস নেই তাঁদের কথায়—
তোমরা আধুনিক,
পুরনোকে উড়িয়ে দাও ফুৎকারে।
তোমাদের মিছিল হয়, সভা বসে,
নিশান ওড়ে, আওয়াজ ওঠে।
কিন্তু শুধুই ফাঁকা সে-আওয়াজ।
নতুন কিছু খুঁজে পাও না।
তোমরা সবাই দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত;
ধনতন্ত্র রাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র গ্লাস্তনস্ত পেরেস্ত্রৈকা—
নানা মতবাদে বিপ্লব ঘটাতে চাও,
ঘটে শুধু মতান্তর আর মনান্তর,
শুধু বাদ আর বিসংবাদ।

তাই তো বলি আদ্যিকালের কথা
সেই সত্যের নামে
সেই ভালবাসার নামে
সেই চেতনার নামে।
জেন সেখানেই পাবে শান্তির সন্ধান।

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

সারাটী-মায়াপুর : ভৌগোলিক তথ্য

নদীর ভূমিকা কেবল ভৌগোলিকই নয়,—নদী সভ্যতার ঐতিহাসিক নথিও বটে। ইতিহাসে বহু সভ্যতার সঙ্গে নদ-নদীর উজ্জ্বল সাক্ষীকরণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সারাটী গ্রামের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে ধলকিশোর তথা দ্বারকেশ্বরের বিশেষ ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে।

জাহানাবাদের (বর্তমান আরামবাগের) সারাটী-মায়াপুর প্রাচীন বঙ্গের উল্লেখ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। বাণিজ্যিক শিল্পসম্ভার (রেশম ও নীল) স্থানান্তরণে ঐ গ্রামের সীমারেখা রচনাকারী দ্বারকেশ্বর নদ গুরুদায়িত্ব পালন করত তার বেগবান জলধারায়। সতের, আঠার ও উনিশ শতকের অর্ধেক পর্যন্ত দ্বারকেশ্বরের সারাটী-সংলগ্ন শাখানদী জলধারায় পুষ্ট ছিল। জাহানাবাদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে দ্বারকেশ্বরের ঐ শাখা নির্গত হয়ে বসন্তপুর, তেঘরী, কাঠদধি, কালিয়াদানা প্রমুখ গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সারাটীর পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে খানাকুলের মধ্যে প্রবেশ করে শেষে রূপনারায়ণে পতিত হয়। পঞ্চাশ বছর আগেও বর্তমানের ক্ষীণস্রোতা এই শাখানদী 'কানা নদী' নামে কথিত ছিল। বহুপূর্বে এই পথেই দ্বারকেশ্বর ছিল বহমান। প্রাচীন খাত বদল করে দ্বারকেশ্বর বর্তমানে আরামবাগের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহমান।

'হুগলী জেলার ইতিহাস' গ্রন্থে দ্বারকেশ্বরের এই গতি পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত আছে : "দ্বারকেশ্বরের আরেকটি নাম ধলকিশোর। বাঁকুড়া জেলা পার হইয়া দ্বারকেশ্বর দক্ষিণ দিকে হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমার ভিতরে ঘুরিবার পূর্বে ইহা বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। আরামবাগের মধ্যে নৈসরাই গ্রামের নিকট দিয়া বলরামপুর, মুথাডাঙা গ্রামের পাশ দিয়া সারাবাটী গ্রামের পশ্চিম সীমা দিয়া এই নদী প্রবাহিত ছিল। প্রত্যহ ছোট-বড় বহু নৌকা এই নদী দিয়া যাত্রা ও মাল বহন করিয়া লইয়া যাইত। এখন দ্বারকেশ্বরের সে-প্রতাপ নাই। স্থানে স্থানে ইহার চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রবল বর্ষা ব্যতীত ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। পরে নদীটির গতিপথের পরিবর্তন ঘটে।



সারাটী-মায়াপুর গ্রামকে পৃথক করে রেখেছে দ্বারকেশ্বর নদের এই প্রাচীনতম শাখা

সেইজন্য নদীর পূর্ব খাত কানা হইয়া যায় এবং উহা 'কানা দ্বারকেশ্বর' নামে পরিচিত। গতিপথ পরিবর্তন হইবার পর নদীটি আরামবাগ শহরকে পূর্বতীরে রাখিয়া মেদিনীপুর জেলার সীমানায় এবং আরামবাগ মহকুমার বন্দর নামক স্থানে শিলাই* নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।"[২০] সারাটী-মায়াপুরের সমৃদ্ধির সঙ্গে যেমন দ্বারকেশ্বর নদের ভূমিকা ছিল, তেমনি সারাটী-সংলগ্ন বেনারস রোডের পার্শ্বস্থ 'চটি'ও ছিল খুব নামকরা। মালিকগণ পথিকদের জন্য আরও ৭-৮ খানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার সময় যে-সমস্ত পথিক এই চটিতে উপস্থিত হয়, তাহারা ভাড়া দিয়া এই ঘরে রাত্রিযাপন করে। যাহারা রন্ধন করিয়া আহারাদি করে তাহাদিগকে আর ঘরের জন্য পৃথক ভাড়া দিতে হয় না। দোকানের মালিকদের নিকট হইতে চাউল, ডাউল, হাঁড়ি, কাঠ ইত্যাদি ক্রয় করিতে হয়। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই দোকানদাররা স্ব স্ব দোকানের চাবি বন্ধ করিয়া গৃহে



সারাটী-মায়াপুরের বাদশাহী দীঘি

সারাটী গ্রামের প্রাচীন চটির পরিচয় দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলকুলের বংশধর রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনসংগ্রাম' গ্রন্থে ঃ "সারাবাটীর চটি মাঠের মধ্যে বেনারস রোডের পার্শ্বে অবস্থিত। দুই ধারেই মাঠ। অর্ধ ক্রোশের মধ্যে কোথাও লোকের বসতি নাই। চটির পূর্ব পার্শ্বে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী;** পুষ্করিণীর একটু দূরেই ২-৩টি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ। সারাবাটীর এই পুরাতন ৩-৪ খানি দোকান আছে। এই দোকানের চলিয়া আসে। এই দোকানদারদের সম্বন্ধে অনেকে অনেকপ্রকার কুৎসা করিত। কেহ বলিত, সারাবাটীর চটিতে যে-সমস্ত হতভাগ্য পথিক দস্যুহস্তে নিহত হয়, এই দোকানদাররা তৎসংবাদ পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারিত, দস্যুদের সঙ্গে দোকানদারদের ষড়যন্ত্র আছে কেহ কেহ বলিত। দস্যুদের ভয়েই ইহারা (দোকানদাররা) রাত্রিকালে দোকানে থাকিত না।"[২১]

ও'ম্যালী উনিশ শতকের শেষপর্বে সারাটী-মায়াপুরে

* নদীটির পোশাকী নাম শিলাবতী। এটি রূপনারায়ণে গিয়ে পড়েছে।

২০ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

** এই পুষ্করিণীটি বাদশাহী আমলের। সেজন্য 'বাদশাহী দীঘি' নামে পরিচিত।

২১ জীবনসংগ্রাম, পৃঃ ৮২-৮৩

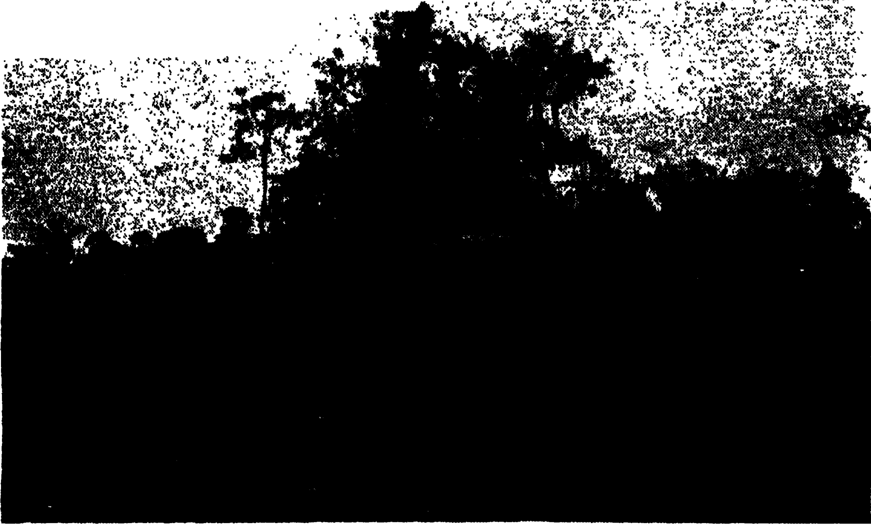
জেলাবোর্ডের বাংলো দেখেছিলেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "Mayapur, a village in thana Arambagh of the Arambagh Sub-division. It is situated on the Old Benaras Road, about five miles east of Arambagh town, and a mile north of the Kana Darakeswar stream. The road to Jagatpur via Khanakul starts from the place, at which a mud-walled thatched hut does duty as a District Board Bungalow."[২২]

এই গ্রামের নবরত্নের মন্দিরের টেরাকোটার কাজ নয়নাভিরাম। 'District Gazetteer Hooghly' গ্রন্থে এই মন্দিরের উল্লেখ আছে ঃ "Mayapur situated on the north of the Old Benaras Road, 9 Km. (6 miles) to the south-east of Arambagh town, has a decorated terracotta temple of the Nabaratna type."[২৩]

সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

সারাটীর 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশ শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল-বংশ। এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রমণিদেবী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সারাটী-মায়াপুরে ঠাকুরের মাতুলকুলের নিশানা রেখে গেছেন স্বামী সারদানন্দ তাঁর অমর গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'-এ।

যখন চন্দ্রমণিদেবীর সঙ্গে ক্ষুদিরামের বিবাহ হয় তখন ক্ষুদিরামের অবস্থান কামারপুকুরের নিকটবর্তী দেরে বা দেরেপুর গ্রামে। সেই সময় ক্ষুদিরামের অবস্থা খুবই সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ ক্ষুদিরামের পিতৃবংশ সদাচারী ও কুলীন এবং রামের উপাসক ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্বিত পুষ্করিণী 'চাটুয্যেপুকুর' আজও তাঁদের পরিচয় দেয়। ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শ বিঘা জমি ছিল। ঐ পরিমাণ জমির আয় একক পরিবারের পক্ষে পর্যাপ্তের চেয়েও



সারাটী গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের পতিত বাস্তুভিটা। এখানে একটি প্রস্তরফলক প্রোথিত ছিল। কিশোরী মহারাজ, রামময় মহারাজ ও বরদা মহারাজ সেই ফলক দেখে এসেছিলেন।

২২ Bengal District Gazetteers: Hooghly—L. S. S. O'Malley, Logos Press, New Delhi, 1985, p. 292

২৩ Gazetteer of West Bengal: Hooghly, p. 654

অনেক বেশি। সমকালে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কুলীন পরিবারেই কুলীনের বিবাহ বিহিত ছিল। সারাটীর 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশ কুলীন ছিলেন। সমকালীন এক কাব্যগাথায় তার উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়ঃ

"হুগলী আরামবাগ থানার অধীন।
(সারাটী) মায়াপুরে যাঁহাদের বাস বহুদিন॥
প্রধান কুলীন যাঁরা বঙ্গের ভূষণ।
একে একে তাঁহাদের স্মরি শ্রীচরণ॥
শাণ্ডিল্য গোত্রজ নন্দকিশোর বিদ্বান।
শ্রীকৃষ্ণমোহন তাঁর পুত্র গুণবান॥
রামময় তাঁর পুত্র সাধু সুচরিত।
বদান্য ধার্মিক বলি চিরপরিচিত॥"[২৪]

সারাটী-মায়াপুরের এই কুলীন ব্রাহ্মণকুলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের ইতিহাসটি হয়তো অবগুণ্ঠিতই থেকে যেত যদি না শ্রীমা সারদাদেবী তাঁর প্রিয় সন্তান কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী) ও রামময় মহারাজের (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী) কাছে সেকথা ব্যক্ত করতেন। এ অনুসন্ধানে দিশারীর ভূমিকা তাঁদেরই।

কিশোরী মহারাজ তেলোর (তেলুয়ার আশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে (১৯৬৫ সাল) যখন সেখানে যাতায়াত করতেন তখন তিনি একবার সারাটী গিয়েছিলেন। তাঁর সহযাত্রী হিসাবে ছিলেন তেলো-ভেলো গ্রামের পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিলকুমার সরকার।[২৫] তাঁরা জানানঃ "মহারাজ [কিশোরী মহারাজ] অনুসন্ধানমাধ্যমে এক পতিত ভিটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই ভিটাই সম্ভবতঃ ঠাকুরের মাতুলকুলের। সেই ভিটাতেই প্রোথিত ছিল এক প্রস্তরফলক। তাতে লেখা ছিল—

॥ নমো জগদ্ধাত্রী ॥
পিতা—রামময় বন্দ্যোপাধ্যায়
তিরোধানঃ ১২৯৬, ৮ই বৈশাখ, শনিবার, রাত্রি ১ প্রহর
মাতা—শারদাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়
তিরোধানঃ ১৩০৬, ২৬শে বৈশাখ, দিবা ২৷৷০ প্রহর
পুত্র হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমির স্মৃতির জন্য ইহা স্থাপিত হইল।

এরপর ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে) তেলুয়ার (তেলো) রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক মহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্রে উৎসব কমিটির সম্পাদক ভক্তজনের কাছে তেলো-ভেলোর পরিচয়দান করতে গিয়ে যে-বিবরণ প্রকাশ করেন তা ছিলঃ "এই পবিত্র তীর্থভূমির (তেলো-ভেলোর মাঠ) পূর্বদিকে বনমালিপুর গ্রাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভূমি; পশ্চিমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর; উত্তরে দামুন্যা গ্রাম, কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জন্মস্থান আর দক্ষিণে সারাটী—কুলীন বন্দ্যো-বংশখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতুলকুলের গ্রাম।"[২৬]

সারাটীর কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ যে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল-বংশ পূজ্যপাদ মহারাজগণ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী) সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রত্যয়েই ঐ বংশের সঠিক পরিবারটিকে সনাক্তকরণে তাঁরা ব্যাকুল ছিলেন। ঘটনা-বিপর্যয়ে যোগাযোগের অভাবে সে-অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হওয়ায় পূজনীয় মহারাজগণের জীবদ্দশায় ঠাকুরের মাতৃকুলের বংশলতা প্রকাশ সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁরা যে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে কৌতূহলী ছিলেন, তেলো গ্রামের পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়রামবাটী থেকে মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী মহারাজের ৮. ১১. ১৯৭২ তারিখে লেখা চিঠিতে[২৭] তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছেঃ

"কল্যাণীয় পঞ্চানন,

...তুমি কি সারাটীর ঠাকুরের মাতুল-বংশের কোন পরিচয় জানতে পেরেছ? ওখানের বন্দ্যোপাধ্যায়রা এখন কোথায়? এব্যাপারে কোন সন্ধান পেলে এখানে জানাবে।..."

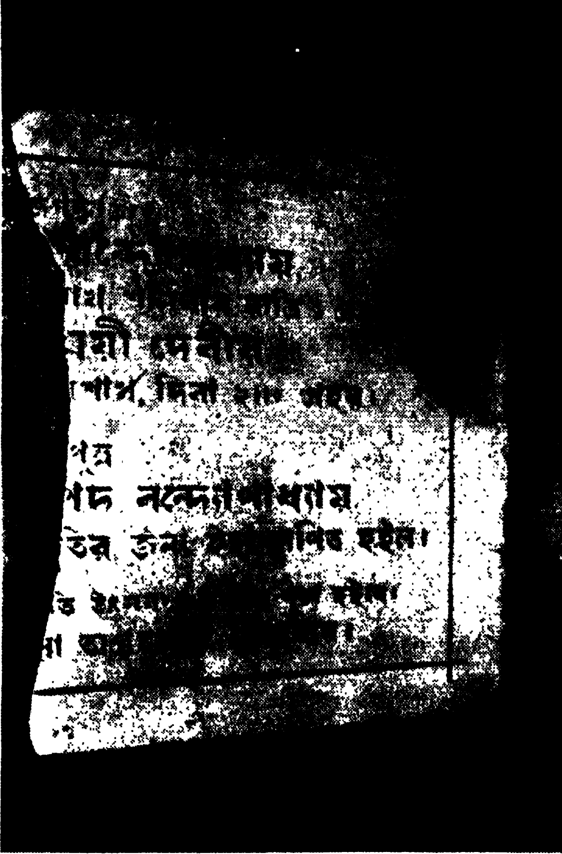
শ্রীশ্রীমার অন্যতম সেবক বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দজী) জয়রামবাটীতে (১৯৬৭-১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ)

২৪ দেওঘরের নিকট কুণ্ডাগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী-মন্দিরের প্রস্তরলিপি থেকে সংগৃহীত।

২৫ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিলকুমার সরকার—দুই ব্যক্তিই তেলো-ভেলোর আশ্রমের সূচনাপর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট এবং কিশোরী মহারাজ ও রামময় মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য। অনিলকুমার সরকার ছিলেন জীবনকালে ঐ অঞ্চলের প্রবীণতম ব্যক্তি (১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ জুলাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৫ বছর), প্রতিথযশা শিক্ষক এবং প্রাক্তন অঞ্চলপ্রধান। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় তেলুয়া রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের ট্রাস্টী এবং সেবাশ্রমের সূচনাপর্বের প্রধান উদ্যোক্তা। (দ্রঃ অর্ঘ্য, ১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯-৩৩)

২৬ দ্রঃ তেলুয়া রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমের ৩য় বার্ষিক মহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র

২৭ অর্ঘ্য, ১৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২৯-৩৩



এই প্রস্তরফলক সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের পতিত বাস্তুভিটায় প্রোথিত ছিল। বর্তমানে এই ভগ্নাবশেষটি শুধু রক্ষিত আছে।

হাজির হলে তিনি তেলো-ভেলো যান এবং পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায়দের পতিত ভিটাটি দেখতে যান। পূর্ববর্ণিত প্রস্তরফলক তিনিও দেখেছিলেন ঐ ভিটার ওপর। বর্তমানে প্রস্তরফলকটি অবশ্য ঐ ভিটাতে নেই। প্রস্তরফলকের ভগ্ন অর্ধাংশ আছে মায়াপুরের পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। প্রসঙ্গক্রমে বরদা মহারাজ জানান যে, তিনি দেওঘরের কুণ্ডায় তাঁদের বংশধরদের দেখেছেন। সারাটীতে বরদা মহারাজদের আগমনকালে সারাটীর প্রবীণ অধিবাসী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ললিতবাবুকে এপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি দ্বিধাহীনকণ্ঠে জানান যে, সারাটীর কুলীন ব্রাহ্মণ বলতে বন্দ্যোপাধ্যায়দেরই বোঝায়। তিনি আরও বলেন যে, চন্দ্রমণিদেবী বন্দ্যোপাধ্যায় বংশেরই মেয়ে এবং তিনি তাঁদেরই জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যক্ষ বংশধররা এখন দেওঘরের কাছে কুণ্ডা নামক জায়গায় থাকে।[২৮] এই ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস (বর্তমানে সারাটী শ্রীরামকৃষ্ণ চন্দ্রমণি সেবাশ্রমের সভাপতি) লেখককে জানিয়েছেন: "ছোটবেলায় প্রাচীনদের অনেকবারই বলতে শুনেছি, চন্দ্রমণিদেবীর (শ্রীরামকৃষ্ণের জননী) পূর্বপুরুষ আমাদেরই জ্ঞাতি; তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন আরামবাগ হাইস্কুলের পণ্ডিতমশাই রাসবিহারী গোস্বামী ও তাঁর সহধর্মিণী হরিভামিনীদেবী। রাসবিহারীবাবু শ্রীশ্রীমাকে বাগবাজারে দর্শন করেছিলেন। তখন তিনি ছাত্র; পঠন-পাঠনের জন্য কলকাতায় থাকতেন। হরিভামিনীদেবী জানান, ১৩৩৩ সালে তাঁর শ্বশুরালয়ে (আরামবাগের নিকট বসন্তপুর গ্রামে) মাসব্যাপী অখণ্ড হরিনামসঙ্কীর্তন, পুরাণ, ভাগবত ও গীতাপাঠ হয়। এই উপলক্ষে একদিন শতাধিক কুলীন ব্রাহ্মণভোজন হয়। সেসময় সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায়রাও এসেছিলেন। পণ্ডিতমশাই তাঁদের সম্পর্কে তাঁকে বলেছিলেন, "এঁরা ঠাকুরের মাতুলকুলের বংশধর।"[২৯]

[ক্রমশঃ]

২৮ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃত তথ্য

২৯ স্বামী সারদানন্দজীর দীক্ষিতা হরিভামিনী মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলের প্রবীণা—বর্তমানে বয়স ৮৫ বছর। আরামবাগের নিকট বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা।

চিরন্তনী

শিবিরাজার উপাখ্যান ৪

কথা ঃ ভগিনী নিবেদিতা ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত।



অন্তিমমুহূর্তে রাজার বামচোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু নেমে এল। বজ্রকণ্ঠে থামতে আদেশ দিল বাজপাখি। রাজার অশ্রুজল তাঁর দানকে মূল্যহীন করেছে। তাই অনিচ্ছায় দেওয়া কোন দান সে গ্রহণ করতে রাজি নয়। আনন্দোজ্জ্বল মুখে রাজা বাজপাখিটিকে বন্ধু হিসাবে সম্বোধন করে জানালেন যে, সে ভুল করছে।

রাজা বললেন, তাঁর বামপার্শ্বই শুধু কাঁদছে। যারা দুর্বল, আশ্রয়হীন তাদের জন্য দুঃখভোগ করার অধিকার একমাত্র রাজারই আছে। সেই কথায় সকলে চমৎকৃত হয়ে উঠল আর দেখা গেল সেই বাজপাখি ও পায়রাটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাদের পরিবর্তে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নিদেব।









শ্রদ্ধাপ্লুত মৃদুস্বরে দেবরাজ বললেন, শিবিরাজার মতো মহাত্মার বিরুদ্ধে দেবতাদের সংগ্রাম নিরর্থক। দেবতাদের আশীর্বাদধন্য শিবিরাজা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা ও সর্বদা ত্যাগের আনন্দে উদ্দীপ্ত। দেবতাদের উচিত এমন এক মহাপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়া, যাতে তাঁরা নিজ নিজ অবস্থা থেকে উন্নীত হতে পারেন। [সমাপ্ত]❑

[আগামী সংখ্যায় 'ধ্রুবের উপাখ্যান']

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

স্বামী জপানন্দ

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকের কথা। কয়েক মাস আগে বাবুরাম মহারাজের শরীর গেছে। স্বামীজীর শিষ্য ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ তখন বেলুড় মঠের কাজকর্ম দেখতেন এবং সাধুব্রহ্মচারীদের দেখাশোনা করতেন। বেলুড় মঠে তখন খুব অভাব-অনটন। তার ওপর ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপ। ঔষধ ও পথ্য ঠিকমত জুটত না। পথ্যের মধ্যে লেবুর রস-সহ সাগু, বার্লি। দুধ কচিৎ জুটত। এককালে ৬-৭ জন সাধু ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন।

একদিন আমি ও একজন সাধু উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাই। আমরা মাকে প্রণাম করে দাঁড়াতে মা আমার সঙ্গী সাধুটিকে দেখে খুব ব্যথিত কণ্ঠে বললেন: "বাবা, তোমার এরকম চেহারা হলো কি করে? তোমার কত ভাল শরীর ছিল!" সাধুটি বললেন: "ম্যালেরিয়ায় ভুগে, মা। মঠে বড় কষ্ট এবং অভাব। সেখানে পথ্য বলতে বার্লি ও লেবুর রস। দুধ জোটে না। অনেকেরই এখন ম্যালেরিয়া হচ্ছে মঠে।"

> "উত্তেজিত কণ্ঠে মা বললেন: "এসব কি শুনছি, শরৎ! বেলুড় মঠে ছেলেরা অসুখে ভুগে ভুগে শেষ হচ্ছে—ঠিকমত পথ্য জোটে না। শুধু বার্লি ও লেবুর রস খেয়ে বাঁচবে কি করে? ... তোমরা যদি কোন ব্যবস্থা করতে না পার, তবে আমিই গিয়ে বেলুড় মঠে বসব।" "

মঠের ছেলেদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে মা ক্ষোভে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। তিনি ওপরের বারান্দা থেকে তীব্র চিৎকার করে ডাকলেন: "শরৎ! শরৎ!" মা সাধারণতঃ লোক দিয়ে শরৎ মহারাজকে ডাকাতেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে কথা বলতেন। তাঁর এরূপ উচ্চকণ্ঠ কেউ কখনো শোনেনি। তাই মায়ের উত্তেজিত কণ্ঠে সবাই চমকে উঠল। সারা বাড়ি যেন কম্পমান। শরৎ মহারাজ ভাবলেন—কী জানি এক গুরুতর কাণ্ড ঘটে গেছে। মা তো কখনো এমন করে ডাকেন না।

শরৎ মহারাজ মোটা মানুষ। নিচের অফিসঘর থেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। আমরা তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে করজোড়ে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: "বলুন মা, কী হয়েছে?"

উত্তেজিত কণ্ঠে মা বললেন: "এসব কী শুনছি, শরৎ! বেলুড় মঠে ছেলেরা অসুখে ভুগে ভুগে শেষ হচ্ছে—ঠিকমত পথ্য জোটে না। শুধু বার্লি ও লেবুর রস খেয়ে বাঁচবে কি করে? সবে বাবুরাম চলে গেছে —ছেলেদের কেউ দেখছে না। তোমরা যদি কোন ব্যবস্থা করতে না পার, তবে আমিই গিয়ে বেলুড় মঠে বসব।" শরৎ মহারাজ বললেন: "মা, এসব তো আমাদের কানে আসেনি। আপনি শান্ত হোন, মা। আমরা এখুনি ব্যবস্থা করছি।" আমরা উভয়ে খুব অপ্রস্তুত হলাম।

মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেসময় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন। শরৎ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে এবং সব ঘটনা তাঁকে জানালেন। সব শুনে অচঞ্চল মহারাজও বিচলিত হলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সচিব অমূল্য মহারাজকে (স্বামী শঙ্করানন্দকে) ডেকে শ্যামবাজার মার্কেট থেকে সবজি, চাল-ডাল-আটা-চিনি-সুজি-ঘি ও নানারকম সওদা কিনিয়ে নৌকা করে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেন। শরৎ মহারাজ এসে মাকে সব জানালেন। মা শান্ত হলেন।□★

★[স্মৃতিকথাটি স্বামী চেতনানন্দের (বর্তমানে আমেরিকায় সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ) কাছে প্রাপ্ত। ১৯৭০ সালে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী জপানন্দজী কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে এই স্মৃতিচারণ করেন। স্বামী চেতনানন্দ স্মৃতিচারণটি আনুপূর্বিক তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখেন।

—সম্পাদক, উদ্বোধন]

বিশেষ রচনা

শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর

স্বামী অচ্যুতানন্দ

জগন্নাথক্ষেত্র বা পুরুষোত্তমক্ষেত্রের একটি বিশিষ্ট উৎসব 'নবকলেবর'। ১০ থেকে ১৯ বছর পর পর আষাঢ় মাসের বিশেষ তিথির যোগাযোগে শ্রীমন্দিরের বিগ্রহগণের 'নবকলেবর' বা বিগ্রহান্তর হয়। এবছর ('৯৬) আগামী ১৪ জুলাই নবকলেবর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে নবকলেবর হয়েছিল ১৯ বছর আগে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৪ জুলাই কৃষ্ণা চতুর্দশীর মধ্যরাত্রে শ্রীমন্দিরে নতুন বিগ্রহগণের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। পরদিন অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত হবে 'নেত্রউৎসব'। সেদিন ভক্তবৃন্দ নবপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণের দর্শন পাবেন। নতুন বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে পুরনো বিগ্রহগুলিকে বিধি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট স্থানে 'সমাধি' দেওয়া হবে। নবকলেবর উৎসব সম্বন্ধে আলোচ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা থাকছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, জগন্নাথ-মন্দিরে 'কালাপাহাড়ী' তাণ্ডবের পর প্রথম নবকলেবর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

নীল সমুদ্রের জলে আবির গোলা মাখিয়ে দিয়ে পূর্ব দিগন্তে সূর্য সবে উঠল। আমরা খুব ভোরে স্বর্গদ্বার থেকে হাঁটতে হাঁটতে চক্রতীর্থে এসে পৌঁছেছি। পিছনে আমাদের পুরী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। সামনে আছড়ে পড়ছে নীল সাগরের ঢেউ সাদা ফেনার মুকুট মাথায় দিয়ে। এখনো এদিকে দর্শনার্থীর ভিড় শুরু হয়নি। সহযাত্রী ব্রহ্মচারীকে নিয়ে বালির ওপরই বসে পড়েছি। বাঁপাশে একটু দূরে বালির মধ্যে কালো পাথরের বেশ বড় একটি চক্র, তারও পিছনে রাস্তার ওপর চক্রনৃসিংহের প্রাচীন মন্দিরে ক্ষুদ্রাকৃতি চক্রনৃসিংহ বিগ্রহ। এই স্থানটি পুরীর প্রাচীন ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

এখানে বসে আমি শ্রীজগন্নাথকে স্মরণ করছিলাম। "নীলাদ্রিশঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং।/ সর্বালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং চাগ্রজেন॥/ ভদ্রায়া বামভাগে রথচরণযুতং ব্রহ্মারুদ্রেন্দ্রবন্দ্যং।/ বেদানাং সারমীশং স্বজনপরিবৃতং দারুব্রহ্মং স্মরামি॥"—নীল পর্বতের শঙ্খক্ষেত্র-মধ্যে শতদলপদ্মে প্রতিষ্ঠিত রত্নসিংহাসনে বিরাজিত, নানা দিব্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত, নবীন মেঘবর্ণ দেহ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও ভদ্রাদেবীকে বামভাগে নিয়ে যিনি ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রদেবের নিত্যপূজিত, সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রসমূহের প্রকাশিত মূলতত্ত্ব যিনি—স্বজনপরিবৃত সেই দারুব্রহ্মকে আমি স্মরণ করি।

আমার এই মন্ত্র আবৃত্তি শুনে সহযাত্রী ব্রহ্মচারী বললেন: "এই তীর্থের উপযুক্ত মন্ত্রই আবৃত্তি করলেন।" শুনে বললাম: "হ্যাঁ, তাই তো। এই তো সেই স্থান যেখানে জগন্নাথদেবের আদি বিগ্রহের 'দারু' ভেসে এসেছিল। সেই কোন্ প্রাচীন যুগে।" কৌতূহলী ব্রহ্মচারীর প্রশ্নের উত্তরে আমাকে শোনাতে হলো সেই কাহিনী।

মালবরাজ মহাবিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন একবার স্বপ্নাদেশ পান, কলিঙ্গের কোন অরণ্য-পর্বতের গুহায় নীলমাধব নামে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজিত আছেন। তিনিই এযুগের মুক্তির উপায়। ব্যাকুল হয়ে রাজা এই বিগ্রহের সন্ধানে তাঁর কুলপুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ যুবক অনেক অনুসন্ধানের পরে এই পুরীর বর্তমান মন্দিরের পাশে এক শবরপল্লীর সন্ধান পেয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ভক্ত বিদ্যাপতি শবরদের নেতা বিশ্বাবসুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার গৃহে আশ্রয়লাভ করেন। বিশ্বাবসুর যুবতী কন্যা ললিতার সঙ্গে দৈবক্রমে বিদ্যাপতির বিবাহ হয়। বিবাহের পরে পত্নীর কাছ থেকেই বিদ্যাপতি জানতে পারেন এই শবরদের পূজিত নীলমাধব বিগ্রহের কথা। আর পত্নীর সহায়তাতেই শ্বশুর শবরাধিপতি বিশ্বাবসুর সঙ্গে গভীর জঙ্গলে গিয়ে গুহামধ্যে নীলমাধব দর্শন হয়। যাওয়ার সময় চোখবাঁধা অবস্থায় গেলেও উপস্থিতবুদ্ধি সহায়ে গোপনে সরষের দানা ছড়িয়ে তিনি ফিরে আসার পথও তৈরি করে রাখেন। এরপরে বিদ্যাপতি স্বদেশে ফিরে গিয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সব ঘটনার কথা জানালে তিনি সসৈন্যে তীর্থদর্শনের নাম করে এই নীলাচলে বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট পথে এসে দেখেন, গুহাতে নীলমাধব নেই। এই অন্তর্ধানের পিছনেও এক কাহিনী আছে।

বরাহ অবতারে বিষ্ণু ধরিত্রীকে রক্ষা করবার পরে ব্রহ্মা নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "মর্ত্যবাসী কিভাবে মুক্তিলাভ করবে?" উত্তরে নারায়ণ বলেন: "আমি পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলমাধবরূপে পূজিত হব। সেখানে আমাকে দর্শন করলেই জীব মুক্ত হবে।" ভগবানের এই কথা শুনে মৃত্যুপতি যম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করলেন: "এরকম হলে আমার গতি কি হবে? সবাই মুক্ত হয়ে গেলে আমি কাদের শাসন করব?" যমের এই কথা শুনে নারায়ণ বললেন: "ঠিক আছে, আমি আপাততঃ সেখান থেকে অন্তর্হিত হচ্ছি।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন এসে এই কারণেই নীলমাধবকে দেখতে পেলেন না। নীলমাধব মৃত্যুপতির ইচ্ছামত সেখান থেকে

অন্তর্ধান করেছেন। এদিকে ভগবান বিষ্ণুর অদর্শনে রাজা দারুণ শোকাহত হয়ে পড়লে এক দৈববাণী শুনে আশ্বস্ত হন যে, অচিরেই সমুদ্র-উপকূলে 'দারু'রূপে তিনি আবির্ভূত হবেন, আর তার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্নকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে। রাজা সেই দৈবাদেশ পেয়ে বর্তমান পুরীর গুণ্ডিচাবাড়ির কাছে অবস্থান করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। প্রবাদ, তাঁর সহস্র যজ্ঞাশ্বের খুরের আঘাতে ও তাদের পরিত্যক্ত সলিলে সেখানে একটি সরোবর হয়ে যায়। সেটিই বর্তমানের গুণ্ডিচাবাড়ির করে দেবেন?

এতক্ষণ ধরে এই কাহিনী শোনানোর পরে ব্রহ্মচারী বলল: "এই তাহলে সেই সমুদ্রকূল—যেখানে আদি দারুব্রহ্ম ভেসে এসেছিলেন?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, এই সেই পবিত্র তীর্থস্থান।"

এরপরে আমরা ফিরে গিয়েছিলাম আশ্রমে। সেখানে প্রাতরাশের পরে আমরা এসেছিলাম শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে। "মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ আজ দেওয়া যাবে না, অন্য সময় তা বলব।"—এই বলে তাকে নিয়ে



জগন্নাথ-মন্দির ('বিমান'), মন্দিরশীর্ষে 'নীলচক্র'-এর ওপর ২৫ গজ পতাকা 'পতিতপাবন-বানা', 'জগমোহন', নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ

উত্তর-পশ্চিমের পবিত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। আর গুণ্ডিচাবাড়ি রাজার প্রাসাদ ও রানী গুণ্ডিচার বাসস্থান। অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষদিনে রাজদূত এসে খবর দিল—পুরীর সমুদ্রকূলে একটি দিব্য বৃক্ষকাণ্ড ভেসে এসেছে, যার চারটি শাখা ও তাতে নানান শুভচিহ্ন যুক্ত। সংবাদ শোনামাত্র রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে ছুটে এসে দেখলেন, তাঁর দৈবাদেশশ্রুত এই সেই শুভলক্ষণযুক্ত পবিত্র দারু। পরম ভক্তিভরে রাজা সেই নিমগাছের গুঁড়িটি তুলে এনে নিজের প্রাসাদে রক্ষা করে ভাবতে থাকেন—এই গুঁড়ি দিয়ে কোন্ মূর্তি তৈরি করবেন, আর কেই বা সেই মূর্তি তৈরি এসেছিলাম একেবারে মূলমন্দিরের মুখশালা বা জগমোহনের দক্ষিণ দ্বারে। এখানে মুক্তিমণ্ডপের পাশে প্রাচীন নৃসিংহ-মন্দিরের কাছে বসে বসে আবার শুরু হলো আমাদের লীলাস্মরণ।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন কোন স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করাতে অসফল হলেন তখন স্বয়ং বিশ্বকর্মা এক বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশ ধরে সেখানে এসে মূর্তি তৈরি করে দিতে রাজি হলেন। কিন্তু শর্ত হলো—২১ দিনের মধ্যে কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না। তিনি বন্ধ ঘরে একলা মূর্তি তৈরি করবেন। এইভাবে মূর্তি তৈরি হতে

লাগল বর্তমান গুণ্ডিচাবাড়ির কোন একটি ঘরে। কিন্তু ১৫ দিনের দিন সেই ঘর থেকে হাতুড়ি-বাটালীর কোন আওয়াজ শুনতে না পেয়ে রানী গুণ্ডিচা ভয় পেয়ে ভাবলেন, এই কদিনের অনশনে শিল্পী বোধহয় মারা গিয়েছে। অধৈর্য হয়ে রানী জোর করে সেই বদ্ধ ঘর খুলে দেখলেন অদ্ভুত এক দৃশ্য! তিনটি বিচিত্রদর্শন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের দুটি হাত আছে কিন্তু তালু ও আঙুল নেই। একটির হাতও নেই। কোন মূর্তিরই পা নেই। চেহারাও অদ্ভুতপূর্ব। সেই কারিগরও সেখানে নেই। এই অবস্থায় আবার দৈববাণী হলো ঃ এই মূর্তিত্রয় ও অবশিষ্ট একখানি লম্বা কাঠ—এই চতুর্ধামূর্তিই রং করে প্রতিষ্ঠা করা হোক জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্র নামে।

রাজা সেই দৈববাণীর নির্দেশমত বর্তমান মন্দিরের জায়গায় ছোট পাহাড়ী টিলা—যেখানে নীলমাধব বিগ্রহ ছিল—সেখানেই প্রাচীন অক্ষয়বট ও রোহিণীকুণ্ডের পাশে একটি একহাজার ফুট উঁচু মন্দির করে সেই চতুর্ধামূর্তিদের যথারীতি চিত্রিত করে বেদিতে স্থাপন করলেন। জগন্নাথের রং কালো, বলরামের সাদা ও সুভদ্রার রং হলুদ। তাঁদের দেহের মাপ—বলভদ্রের উচ্চতা ৮৫ পাব অর্থাৎ ৭ ফুটের কিছু বেশি। জগন্নাথ ও সুদর্শনের ৮৪ পাব ও সুভদ্রার ৫২ পাব। এক 'পাব' এক ইঞ্চির মতো। এঁদের শরীরে কাঠের ওপরেই রং দেওয়া হয়নি। সাতপ্রস্থ পট্টবস্ত্রের সঙ্গে ধুনো-চন্দনগোলা-কর্পূর মিশিয়ে সাতবার পাক দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপরে রং দিয়ে চোখমুখ আঁকা হয়। আজও অঙ্গরাগের সময় ও নবকলেবরে বিগ্রহদের এইভাবেই তৈরি করা হয়। মূর্তি তো তৈরি হলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠার কি হবে? রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গে চললেন স্বয়ং ব্রহ্মাকে এনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাবেন বলে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, ব্রহ্মা তখন সন্ধ্যাবন্দনা করছেন। রাজা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মর্ত্যের সঙ্গে স্বর্গের দেবতাদের সময়ের হিসাবে কেটে গেল ষাট হাজার বছর।

এই দীর্ঘকালের অবসরে সমুদ্রের বালির ঝড়ে ঢাকা পড়ে গেল ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বুকে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। ওড্র দেশে তখন 'গাল' নামে একজন ভক্তিমান যযাতিবংশীয় রাজা রাজত্ব করছেন। তিনি কার্যান্তর থেকে ফেরার পথে এই মন্দিরের জায়গায় বালির ঢিপির ওপর ঘোড়াসুদ্ধ উলটে পড়েন। উঠে দেখেন, তাঁর ঘোড়া মাটির থেকে সামান্য উঠে থাকা কোন গোলাকার ধাতবপদার্থে হোঁচট খেয়েছে। একটু খোঁড়াখুঁড়ি করতেই একটি মন্দিরের চূড়ার চক্রের হদিস পাওয়ায় আশ্চর্য রাজা আরও লোকজন নিয়ে এসে খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়ে যান সেই প্রাচীন বিশাল মন্দিরকে। আনন্দে উৎফুল্ল গালরাজা এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর আরাধ্য দেবতা মাধবকে। প্রাচীন দারুবিগ্রহগুলি অন্যত্র অজ্ঞাত অবস্থায় পড়ে থাকে। এর মধ্যে স্বর্গে ব্রহ্মার সন্ধ্যাবন্দনার অন্তে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় সম্মত হয়ে তিনি রাজার সঙ্গে মর্ত্যে নেমে আসেন অভিনব দেবতাদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে। মর্ত্যে এসে সেই প্রাচীন মন্দিরের জায়গায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন রাজ্য, নতুন বিগ্রহ ইত্যাদি দেখে রাজা বিভ্রান্ত হয়ে যান। তবুও তিনি গালকে বলেন, এই মন্দির তাঁরই সৃষ্ট। এখন এখানে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে। গালরাজা সব ব্যাপার শুনে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলেন ঃ "এসব গাঁজাখুরি গল্প চলবে না। এ মন্দির যে তোমার তৈরি, তার কোন প্রমাণ দিতে পার? ষাট হাজার বছর আগের এই গল্প কি মানা যায়! কে তোমার সাক্ষী?" দৈবক্রমে এই মন্দিরের পাশে প্রাচীন রোহিণীকুণ্ডের কাছে এক অতিবৃদ্ধ কাক ছিল, সে 'কা-কা' করে বলল ঃ "হ্যাঁ, আমি সাক্ষী। তিনকালের সব ঘটনা আমার জানা। ইনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, সত্যযুগে এই মন্দির করেছিলেন। আমার নাম ভুশণ্ডিকাক।" কাকের এই সাক্ষ্য পেয়ে রাজা গাল মেনে নিলেন ইন্দ্রদ্যুম্নকে এবং তাঁর ইচ্ছামত প্রাচীন বিগ্রহদেরও বালির স্তূপ থেকে খুঁজে বের করে আবার শ্রীমন্দিরের গর্ভগৃহে রত্নবেদিতে, যা লক্ষ শালগ্রামশিলার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্থাপন করে ব্রহ্মার দ্বারা উৎসর্গক্রিয়া সম্পন্ন করালেন। এই পুণ্য ক্রিয়ার পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার সঙ্গেই স্বর্গলোকে চলে গেলেন। মর্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হলো এই অভিনব চেহারার চতুর্ধাবিগ্রহ—শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, শ্রীভদ্রাদেবী ও শ্রীসুদর্শন চক্র। যে-কাক এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল সেই ভুশণ্ডিকাক আজও—এই আমরা যেখানে বসে আছি তারই একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ১০-১২ হাত গভীর চৌবাচ্চার মতো রোহিণীকুণ্ডের মধ্যে পাথরের আকৃতি নিয়ে বিরাজ করছেন। কিছু কচ্ছপও সেই ঘটনার সাক্ষী ছিল। দীর্ঘজীবী এই কচ্ছপদের সেই ঘটনার সাক্ষীর প্রতীক হিসাবে এই রোহিণীকুণ্ডের পাশে একটি পাথরের কচ্ছপমূর্তিও দেখা যায়। আজও তীর্থযাত্রীরা মন্দির-পরিক্রমার পথে এই পবিত্র রোহিণীকুণ্ডের জলস্পর্শ করে এবং ভুশণ্ডিকাক ও কচ্ছপদের দর্শন করে। এইভাবে জগন্নাথ-বিগ্রহদের প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করে তারা আনন্দ পায়। আমরাও ঐ পবিত্রবারি স্পর্শ করে এবং অক্ষয়বটকে প্রণাম করে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

[ক্রমশঃ]

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'

'উদ্বোধন' আমার কাছে একটা বিরাট ভোজের মতো। অতুলনীয় 'কথাপ্রসঙ্গ' দিয়ে সূচনা, অবয়বে তার বিপুল বৈচিত্র্য। প্রায় শতাব্দীব্যাপী অনলসভাবে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে 'উদ্বোধন' এগিয়ে চলেছে। রচনাগুলির বিষয়বৈচিত্র্যে এবং গভীরতায় মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। বর্তমানে পত্রিকাটির মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার ঘটেছে।

পত্রিকাটি আমি কেবল নিজে পড়ি না, বেশ কয়েকজনকে প্রতি মাসে শুনিয়ে ও পড়িয়ে থাকি। কোন কোন লেখা অসাধারণ চিন্তার খোরাক জোগায়।

গত শারদীয়া ১৪০২ সংখ্যায় রাধারমণ রায়ের 'কলকাতার দুর্গোৎসব' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। আমার চিন্তাধারার সঙ্গে অনেক বিষয়েই মিলে গেছে। দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিকরা যাই বলুন, আমার কিন্তু 'বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে' পরিণত হওয়া এত সহজ ব্যাপার বলে মনে হয় না।

ভারত-আত্মা দীর্ঘকাল যাবৎ গুমরে যাচ্ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, তখন ঐ ইংরেজ বণিকদের মাধ্যমেই তাঁর অন্তর্নিহিত বেদনা প্রকাশিত হয়েছিল। যেন ভারত-আত্মা নিজেই এই ইংরেজ বণিকদের হাতে তাঁর সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধির দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন।

প্রবন্ধ-লেখক রাধারমণ রায়ও সেই ইঙ্গিতই করেছেন। শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের বিজয়-উৎসবরূপে। পরে তা পরিণত হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের স্মারক-উৎসবে।

আমি ভাবি; এমন কী অবস্থা হয়েছিল যে, কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ এবং নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভের হাতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে সবচেয়ে বেশি উল্লসিত হয়েছিলেন? এই উল্লাস কী ব্যক্তিগত উল্লাস, না সমগ্র ভারত-আত্মার উল্লাস? এই বিষয়টি নিয়ে 'উদ্বোধন'-এ বিশদ আলোচনা আশা করছি।

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, বাঁকুড়া-৭২২২০৩

গত পৌষ ১৪০২ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর 'কথাপ্রসঙ্গে' পাঠ করে আনন্দে মন ভরে গেল। কী চমৎকার বর্ণনা! প্রতিটি বাক্যই অপূর্ব, অতি রমণীয়।

এরকম রচনা প্রতি মাসে থাকলে খুব ভাল হয়। আশা করি, পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ 'উদ্বোধন'-এ শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে এরূপ মনোজ্ঞ সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে সাধারণ গৃহী ভক্তদের পুনরায় আনন্দবর্ধন করবেন।

নিবন্ধটিতে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যারূপিণী সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীর সাথে শ্রীশ্রীমায়ের তুলনা অতি সুন্দর ও উপযুক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই তুলনা সাধারণ যৌক্তিকতা পেরিয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজের কথায়ও আছে—"ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে!"

তাই মনে হয়, মায়ের আগমন যেন পূর্ব-নির্ধারিত। দীর্ঘ গ্রাম্য পথ অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বরে যখন তিনি প্রথম আগমন করেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি যেন বেদোক্ত বাণী। এ বাণীর ব্যঞ্জনা হিমালয়ের গিরিগুহা ছাড়িয়ে যেন দাক্ষিণাত্যের কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ভক্তগণের কাছে এ এক গভীর উপলব্ধির বিষয়। এ ব্যঞ্জনা বিশ্বের অধ্যাত্মজগতে অপূর্ব। এর রেশ প্রতিটি গৃহী ভক্ত-পরিবারে আনয়ন করবে এক প্রশান্তি, সৃষ্টি করবে এক সুন্দর পবিত্র পরিবেশ।

লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী
নবনিকেতন, বর্ধমান-৩

আমি 'উদ্বোধন'-এর একজন আজীবন গ্রাহক। নিজেকে মনে হয় এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী। কারণ, 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি তথ্যনির্ভর এবং বস্তুনিষ্ঠ রচনা পড়ে যেমন অনেক কিছু জানতে পারি তেমনই এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে মন প্রশান্ত ও সতেজ হয়। দৈনন্দিন জীবনের অনেক সমস্যাই যেন সহজ হয়ে যায়।

গত শারদীয়া (১৪০২) সংখ্যাটি দারুণ সুন্দর হয়েছে। যেমন প্রচ্ছদ, তেমন প্রতিটি রচনাই অপূর্ব, বিশেষ করে 'ডাইনোসরের বিলুপ্তি-রহস্য' রচনাটি। এই রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর বিষয়-পরিধিকে ব্যাপক করেছে। সম্পাদকের বক্তব্য—"স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে 'উদ্বোধন' নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়" বারবার সত্য প্রমাণ করেছে। এছাড়া সম্পাদকের আরেকটি কথা—"স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে 'উদ্বোধন' যেন থাকে। সুতরাং আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা"—আমাকে অত্যন্ত প্রেরণা দিয়েছে এবং স্বামীজীর আশীর্বাদে এই সুদূর প্রবাসে ৫১জন বাঙালীকে 'উদ্বোধন'-এর ৯৮তম বর্ষের গ্রাহক করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমেদাবাদে নিশ্চয়ই আরও বহু বাঙালী আছেন যাঁরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক, কিন্তু আমি নিজে এবছর ৫১ জনকে গ্রাহক করিয়েছি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, স্বামীজীর প্রত্যাশা অনুসারে দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম এই অসাধারণ সাময়িক পত্রিকাটি ভবিষ্যতে দেশ ও বিদেশের সর্বত্র বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছাবে।

অনিলচন্দ্র ঘোষ
ও.এন.জি.সি. কলোনী
আমেদাবাদ-৩৮০০০৫, গুজরাট

লেখকের সংযোজন

গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ সংখ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটী' নিবন্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদের কয়েকটি বিষয়ে (পৃঃ ২৪০) পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত উদ্ধৃতাংশটি শুরু হয়েছে ঃ "হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রাম এই ম্যালেরিয়া বৎসরে দানবের লীলাভূমি হইয়াছিল।" উদ্ধৃতাংশে সময়ের উল্লেখ না থাকায় পাঠকদের বিভ্রান্তি নিরসনে বিশেষ তথ্য সংযোজিত করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলকুলের বংশধর রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মানবচিত্র', 'সংসারচিত্র' ও 'জীবনসংগ্রাম' গ্রন্থে ম্যালেরিয়া রোগের মহামারী রূপ এবং সারাটী-মায়াপুর গ্রামের জনশূন্যতার কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন গ্রন্থেই নির্দিষ্টভাবে সময়ের উল্লেখ নেই। তবে 'জীবনসংগ্রাম' গ্রন্থে তিনি ঐ বিবরণের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ-আবির্ভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন (পৃঃ ১২৯) এবং তাতে দুর্ভিক্ষের সময় হিসাবে ১২৭২ বঙ্গাব্দ (১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন। কাজেই অনুমিত হয় যে, লেখক তাঁর উদ্ধৃতিতে উনিশ শতকের ছয়ের দশককেই 'ম্যালেরিয়া বৎসর' হিসাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। লেখকের এই বিবরণের যাথার্থ্য লক্ষিত হয় সরকারি নথিতেও। সমকালীন হুগলী জেলার প্রশাসক ও'ম্যালীর বর্ণিত বিবরণও অনুরূপ সাক্ষ্য দেয় ঃ "During the third quarter of the 19th century the district was devastated by a peculiar type of malignant malaria fever... The total duration of the epidemic fever in the Hooghly district may be said to have been twenty years, viz., from 1857 to 1877.... The morbidity was enormous, being estimated by various observers from one-third of the whole population up to nine-tenths in severely affected places." [Bengal District Gazetteers: Hooghly—L. S. S. O'Malley, Logos Press, New Delhi, 1912 (First Print), pp. 127-128]

চতুর্থ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ঃ "হুগলী জেলার অন্তর্গত সারাবাটী গ্রামখানি অতি বৃহৎ। এত বড় বৃহৎগ্রাম সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।" লেখক যে-সময়ের বিবরণ গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করেছেন সেটি আঠার শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরু। সমকালে সারাটী (সারাবাটী) ও মায়াপুর মৌজার পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। লোকশ্রুতি অনুযায়ী লেখক তাঁর গ্রন্থে ঐ গ্রামদুটিকে একক গ্রাম হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অধিনিয়ম-বলে হুগলী জেলার প্রথম সেটেলমেন্ট জরিপে ঐ গ্রামদুটি পৃথক মৌজারূপে সরকারি নথিভুক্ত হয়েছে। সারাটী মৌজার জে. এল. নম্বর ৮৩ এবং এর পরিসর ৮৫.০৯ বর্গ কিলোমিটার। মায়াপুর মৌজার জে. এল. নম্বর ৮৪ এবং পরিসর ৮০৮.৩৭ বর্গ কিলোমিটার। দুটি গ্রাম একত্রে পরিসরটি দাঁড়ায় ৮৯৩.৪৬ বর্গ কিলোমিটার। এরূপ পরিসরের গ্রাম সত্যই বিরল। [দ্রঃ District Census Hand Book: Hooghly District, 1981, Controller of Census, Govt. Printing, West Bengal, 1981, p. 58]

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়া
জেলা—হুগলী, পিন—৭১২২৫৮

হল্যান্ডে কয়েকদিন

কয়েক মাস আগে হল্যান্ডের আয়েনহোভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে গিয়ে বেজায় বিস্মিত হয়েছিলাম। দেখলাম, ইংল্যান্ডে 'অবজার্ভার' ও 'টাইম' পত্রিকা হিন্দুধর্মের কয়েক দেবতার অস্বাভাবিক দুগ্ধপ্রীতির ওপর বিশাল বড় রিপোর্ট লিখেছে। এতে ভারতে ও বিদেশে নাকি দুধ-বিক্রেতাদের রমরমা। পূজা-পার্বণের লড়াইয়ে তাহলে এই রাউন্ডে এই সম্প্রদায়ই এগিয়ে থাকল! অন্য সব ব্যাপারে তেমন নাম না রাখতে পারলেও আমার দেশ এইসব অলৌকিক (!) বিষয়ে সাহেবদের চিন্তায় স্থান করে নিতে পেরেছে।

ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসময় ছাত্র ভর্তি ও আগামী বছরের ক্লাস শুরুর তোড়জোড় চলে। মধ্যের কয়েকদিন তাই আমাদের নিজের কাজে মন দেওয়া সম্ভব। হল্যান্ডে Ph. D-র জন্য তথ্য সংগ্রহ করে আবার ইংল্যান্ডে ফিরেছি। এরপরের দিন থেকেই বেজায় কাজের চাপ। সামনের তিন মাস তিনটে কোর্সে পড়াতে হবে।

আমার কাজের জন্য হল্যান্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরতে হয়েছে। অথচ খুঁটিয়ে ঐতিহাসিক স্থান দেখার সময় করে উঠতে পারিনি। রোটারডাম—যে-শহরটাকে কেন্দ্র করে অন্য সব জায়গায় ঘুরেছি—এক অসাধারণ শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বোমার আঘাতে দুটো বাড়ি ছাড়া আর কিছুই আস্ত ছিল না। আজ সেখানে আধুনিক স্থাপত্যের এক চোখ-ধাঁধানো নিদর্শন। ঝলমলে শহরের মানুষগুলি অতি অমায়িক ও সরল। ইংল্যান্ড, আমেরিকার তুলনায় সাদা-কালো চামড়ার বিচার এখানে তেমন নেই। সাধারণতঃ ইংরেজী বলতে এরা লজ্জা পায়, কারণ এতে আমার দেশের লোকদের মতো বিস্তর ভুল করে। যাই হোক, অল্প কয়েক দিনের ভ্রমণে হল্যান্ড আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। চিঠির এই স্বল্প পরিসরে আমার অভিজ্ঞতা বলা সম্ভব নয় জানি তবু প্রিয় 'উদ্বোধন'-এর পাঠকদের জন্য কিছুটা বলে এখানেই শেষ করছি।

অমিত মিত্র
লণ্ড লীয়াসো, সেলী ওক, বার্মিংহাম, ইংল্যান্ড

আগে বিশ্বাস তারপর কর্ম

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

এই আমার ঠাকুর, বিশ্ব-বেপরোয়া। কারো তোয়াক্কা করেন না। মনোরঞ্জনের কোন ব্যাপার নেই। বড়লোক দেখলে তোয়াজ করব, দরিদ্রকে দেখলে মুখ ফেরাব। না, ওসব নেই। উদ্দেশ্য তো একটাই, ভাল আধার দেখলে চৈতন্য ভরে দেব। আছ কোথায়! যাচ্ছটা কোথায়! কি নিয়ে যাচ্ছ সঞ্চয়! আবার যে আসতে হবে খেয়াল আছে সেটা? এবারের পাওনা আগামীবার পাবে। মনে রাখলে ভাল, না রাখলে আমার কাঁচকলা। যদি তোমার আঁকুপাঁকু থাকে এস আমার কাছে, না থাকে আমার সময় নষ্ট করো না। আমার কাছে আসার একটিমাত্র গেটপাস—বিশ্বাস। প্রশ্ন আমার একটাই —ঈশ্বর আছেন এইটা কী জেনেছ? যদি উত্তর হয়—জেনেছি, তাহলে বলব তুমি জ্ঞানী, তখন তোমাকে আমি বিজ্ঞানী করার জন্য উঠেপড়ে লাগব।

কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সে জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর কী হবে! অষ্টপাশ খুলে যাবে—কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"।

কিরকম জান! একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লোহালক্কড়, পেরেক, ইস্ক্রুপ উপড়ে যেতে লাগল। কেন? না, কাছে একটা চুম্বকের পাহাড় ছিল তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল। আমার ঈশ্বর হলেন ভয়ঙ্কর এক আকর্ষণী শক্তি। তোমার সব কূট-কচালে বন্ধন সেই আকর্ষণী শক্তিতে খুলে আলগা হয়ে যাবে। তোমাকে আমি ঠেলতে ঠেলতে সংসার-বন্ধনের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ফেলে দেব। তখন তুমি হয়তো আমার মতো বেপরোয়া বলতে পারবে:

"আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খুশি পান খাব—আরশিতে মুখ দেখব...! কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগল—বললে, তুমি কারে কি বল? রামকৃষ্ণকে কি বলছ?"

এই অবস্থায় তুমি পৌঁছাতে চাও? তাহলে জ্ঞানের পথ ধরে বিজ্ঞানে এস। 'ঈশ্বর আছেন' বলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে হবে না। তরোয়াল খাপে আছে। আছে তো আছে। ব্যবহার না করলে মরচে ধরে ভোঁতা হয়ে যাবে। জ্ঞানখড়্গকে বলির কাজে লাগাতে হবে। কী রকম! রামপ্রসাদের গানে আছে—

"ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি
(যদি) না মানে নিষেধ তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥"

সেই বিরাট এত বিরাট, তাঁকে পেলে কাম-ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। ভিতরে একটা ওলটপালট। শরীরের কিছু হয় না; অন্য লোকের শরীরের মতো দেখতে সব—কিন্তু ভিতর ফাঁকা আর নির্মল।

তুমি কি সত্যিই চাও অমন একটা অনুভূতিতে পৌঁছাতে! না, সবটাই তোমার একধরনের শৌখিনতা! অ্যাডভেঞ্চার! দায়টা যেন একা ঈশ্বরেরই, তোমার কোন কসরত নেই। পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো। তাঁকে এসে প্রমাণ করতে হবে, তিনি আছেন। তখন তুমি চোখ উলটে গদগদ হয়ে বসবে। নয়তো ধর্মসভায় গিয়ে হাই তুলবে, আর মনে মনে ভাববে, এ কী গেরো! ওদিকে বক্তা আপ্রাণ বোঝাবার চেষ্টা করবেন—

শুকদেবের কী উচ্চ অবস্থা! অনিন্দ্যসুন্দর, ষোড়শবর্ষীয় বালক শুকদেব ভাগবতে প্রবেশ করছেন। মৃত্যুপথযাত্রী রাজা পরীক্ষিতকে কৃষ্ণকথা শোনাবেন। মায়ের কাছে তাঁর কথা শুনেছেন। মাতৃগর্ভে একবার মাত্র তাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, তাঁর সেই জীবনদাতার। ব্যাসদেবের কী বর্ণনা! যেন জীবন্ত ছবি! কামনা-বাসনা-শূন্য, দেহবোধবর্জিত শুকদেব আসছেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তেমনি রূপবান। ভ্রূক্ষেপ নেই কোন। ছেলেরা পাগল ভেবে ঢিল ছুঁড়ছে, মেয়েরা সেই রূপের আকর্ষণে পিছন পিছন ছুটে আসছে, আলোর আকর্ষণে পতঙ্গের মতো। শুকদেবের কোন দৃক্‌পাত নেই। তিনি আসছেন। প্রবীণ

ঋষিরা বসে আছেন রাজাকে ঘিরে। সাতদিন মাত্র সময়। জীবনের মেয়াদ। রাজা পরপারের পাথেয় সংগ্রহে অভিলাষী। শুকদেব প্রবেশ করে কোন নির্দেশের অপেক্ষা না করে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন। সেই বিশিষ্ট আসনটি যে তাঁরই জন্য চিহ্নিত, এ যেন তিনি জানতেন। ঋষিরা পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে বন্দনা করলেন। কী অপূর্ব দৃশ্য! —কে এই শুকদেব! আজন্ম তপস্বী—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি"। "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু"। বক্তা বোঝাতে চাইছেন, কলিহত সংসারী জীবের জন্য এ এক স্বাদু, স্বাদু, সুস্বাদু বার্তা—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব সর্বেষাং যথা কাশী হ্যনুত্তমা।
তথা পুরাণব্রাতানাং শ্রীমদ্ভাগবতং দ্বিজাঃ॥"

—নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবদের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবতও সেইরকম সর্বোত্তম।

তুমি ডাকতে জান না, তোমার বাসনাজড়িত ক্ষীণকণ্ঠে তাঁর গোলকের আসন পর্যন্ত পৌঁছায় না। থাক, তোমাকে আর ডাকতে হবে না। তুমি শুধু কান পেতে শোন, তিনিই তোমাকে ডাকছেন। জীবকে 'আকর্ষণ' করেন বলেই তিনি 'কৃষ্ণ'। "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।" তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই তিনি মানুষের রূপে এসেছিলেন।

দুটো কান। এদিকে ঢুকল, ওদিকে বেরিয়ে গেল। সে কতকাল আগের কথা, মন ছটফট করছে 'চুনাও কা পরিণাম' জানার জন্য। নেক্সট পি. এম. কে! এরই মাঝে দত্তমশাইয়ের আমেরিকা-প্রবাসী বহুমূল্য ছেলেটির সঙ্গে নিজের আদুরী মেয়েটির বিয়ে পাকা হয়ে গেল। এরই মাঝে একজন ভাল বাতের ডাক্তারের ঠিকানা লেখা হয়ে গেল।

তুমি বৌ-ছেলের জন্য ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলবে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য একফোঁটাও নয়! এ তো মজা মন্দ নয়! তাঁর অদর্শন-ব্যথায় যার ভিতরটা গামছা নিঙড়াবার মতো নিঙড়ায় তারই হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ

"কথাটা এই, সচ্চিদানন্দে প্রেম।

"কিরূপ প্রেম? ঈশ্বরকে কিরূপ ভালবাসতে হবে? গৌরী বলত, রামকে জানতে গেলে সীতার মতো হতে হয়, ভগবানকে জানতে ভগবতীর মতো হতে হয়—ভগবতী যেমন শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, সেইরূপ তপস্যা করতে হয়। পুরুষকে জানতে গেলে প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়—সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব। আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলাম। দেখলাম, সব মনটাই রামেতে রয়েছে। হাত, পা, বসনভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই। যেন জীবনটা রামময়—রাম না থাকলে, রামকে না পেলে প্রাণে বাঁচবে না।"

মণি ঃ আজ্ঞা হাঁ, যেন পাগলিনী।

ঠাকুর ঃ উন্মাদিনী! ইয়া। ঈশ্বরকে লাভ করতে গেলে পাগল হতে হয়। কাম-কাঞ্চনে মন থাকলে হয় না। রমণ? তাতে কি সুখ! ঈশ্বরদর্শন হলে রমণসুখের কোটীগুণ আনন্দ হয়। গৌরী বলত, মহাভাব হলে শরীরের সব ছিদ্র-লোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। এক-একটি ছিদ্রে আত্মার সহিত রমণসুখ বোধ হয়!

তাহলে কথাটা তুমি প্রেমিকের গানেই শোন ঃ

পাবি না ক্ষেপা-মায়েরে ক্ষেপার মতো না ক্ষেপিলে,
সেয়ানপাগল বুঁচকিবগল, কাজ হবে না ওরূপ হলে॥
শুনিসনে তুই ভবের কথা, এ যে বন্ধ্যার প্রসবব্যথা,
সার করে শ্রীনাথের কথা চোখের ঠুলি দে না খুলে॥
মায়া-মোহ ভোগতৃষ্ণা দেবে তোরে যতই তাড়া
বোবার মতো থাকবি বসে, সে-কথায় না দিয়ে সাড়া;
নিবৃত্তিরে লয়ে সাথে ভ্রমণ কর তত্ত্বপথে,
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী বলে।
মজা আছে এ পাগলে জানবি আসল পাগল হলে,
'আয়রে পাগল ছেলে' বলে ঐ পাগলী মায়ে নেবে কোলে;
ফুরাবে পাগলের মেলা ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা,
শান্তিধামে করবি লীলা এ যুক্তি প্রেমিক বলে॥

শোন, আগে বিশ্বাস তারপর কর্ম। যাঁকে পেতে চাইছ, তাঁকে পেলে এই পৃথিবীর সব ক্ষণস্থায়ী মায়া ঐশ্বর্য ধুর হয়ে যায়। পেয়ে দেখ। পরীক্ষা করে নাও। আমি মিথ্যা বলছি না। বলে লাভ? কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিসটি মনে করে আনন্দ হয় তবে সে-ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক ঘড়া মোহর আছে—এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। ঘড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়—তারপর খোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর ঘড়ার কানা দেখা যায়। তখন আনন্দ আরও বাড়ে। এইরকম ক্রমে ক্রমে আনন্দ বাড়তে থাকে। দাঁড়িয়ে দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ।

এখন বাবা নিজেকে বোঝাও, কোন্‌টা বাড়াবে? টাকার সুদ, না জীবনের আনন্দ! □

হার্পিসের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

স্বামী শ্রদ্ধাময়ানন্দ

অসুখটির নাম 'হার্পিস জস্টার' (Herpes Zoster)। 'হার্পিস' একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ সুড়সুড় করা। আর 'জস্টার' কথাটির অর্থ বন্ধনী (band)। নামের দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে, এটি বন্ধনীর ন্যায় আকার নিয়ে প্রকাশ পায় এবং আক্রান্ত স্থানটিতে যেন কোন পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অনুভব হয়। হার্পিস রোগের নামটি শুনেই অনেকে আতঙ্কিত হয় পীড়াজনিত কষ্টের কথা ভেবে। কিন্তু এই রোগও উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা সহজেই নিরাময় করা যায় এবং আতঙ্কেরও কোন কারণ নেই।

রোগের কারণ

হার্পিস জস্টারের কারণ সুপ্ত ভেরিসেলা ভাইরাস, যা চিকেন পক্স বা জলবসন্তের কারণ। সাধারণতঃ জলবসন্তে রোগপ্রতিরোধক্ষমতা (immunity) যদি পূর্ণ বিকশিত না হয় তাহলে ঐ রোগ থেকে আরোগ্যলাভের পর জীবাণুগুলি সুপ্ত (latent) অবস্থায় স্নায়ুগ্রন্থিতে (sensory ganglion) বহু বছর যাবৎ অবস্থান করে। যখনই ঐ জীবাণুগুলি বৃদ্ধির (বংশবিস্তারের) অনুকূল পরিবেশ পায় অর্থাৎ অন্য কোন কঠিন পীড়াজনিত কারণে বা কোন আঘাতজনিত কারণে ঐ ব্যক্তির (যার দেহে জীবাণুগুলি সুপ্ত অবস্থায় আছে) জীবনীশক্তি (vitality) কমে যায় তখনই জীবাণুগুলি এই অসুখ সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, জীবাণুগুলি প্রথমে ঐ স্নায়ুগ্রন্থিতে বংশবৃদ্ধি করে; পরে ঐ স্নায়ুগ্রন্থি থেকে যেসব স্নায়ুশিরা (peripheral nerves) বেরিয়েছে সেগুলির মাধ্যমে রোগপ্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঐ নার্ভগুলির সরবরাহ-এলাকায় গুটি বার হয়। সাধারণতঃ যুবা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। শিশুদের মধ্যে এই রোগ বিরল।

রোগের প্রকাশ ও লক্ষণসমূহ

প্রথমে আক্রান্ত স্থানে অসহ্য ব্যথা ও জ্বালা অনুভূত হয়। যেহেতু ব্যথা ও জ্বালা ছাড়া অন্য কোন লক্ষণ প্রথমে থাকে না, তাই এটি হার্পিস ছাড়া অন্য কোন রোগের লক্ষণ বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু ১-২ দিন অপেক্ষা করলেই অর্থাৎ ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রোগের চিত্রটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আক্রান্ত স্থানটি লালবর্ণ ও ফোলা ফোলা দেখায়, সেইসঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে। তার ওপরে একে একে কতগুলি গুটি বের হয়। আবার কখনো অনেকগুলি গুটি গায়ে গায়ে লেগে এক হয়ে যায়। দেহের যেকোন অংশেই এই রোগ প্রকাশ পেতে পারে তবে স্কন্ধে, পৃষ্ঠে, বক্ষঃস্থলে, তলপেটে ও বাহুতেই সাধারণতঃ দেখা যায়। গুটি বার হওয়ার সাথে জ্বর-জ্বর ভাব বা জ্বর, মাথাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ থাকে। গুটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই স্বচ্ছ জলের মতো পদার্থের দ্বারা পূর্ণ হয় ও ফুস্কুড়ির (vesicular) মতো দেখায়। ৭২ ঘণ্টা পর এটি ঘোলাটে হতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে গুটিগুলি শুকোতে আরম্ভ করে। ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে মামড়িগুলি খসে পড়ে ও রোগী রোগমুক্ত হয়।

রোগ চেনার সহজ উপায়

(১) গুটিগুলি কোন একটি স্নায়ুশিরার গতিপথ ধরে বার হয়। (২) আক্রান্ত স্থানটিতে প্রচণ্ড জ্বালা-যন্ত্রণা ও ব্যথা অনুভূত হয়। (৩) মৃদু জ্বর ও মাথা ব্যথা হয়।

চিকিৎসা

প্রচলিত ধারণা এই যে, যেহেতু এটি ভাইরাসজনিত পীড়া তাই এর কোন কার্যকরী ওষুধ (যেমন অ্যান্টি-বায়োটিক) নেই এবং সাধারণ নিয়মে আরোগ্য হতে ২-৩ সপ্তাহ লাগবে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। হোমিও-প্যাথি-মতে এই রোগের সুচিকিৎসা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এক সপ্তাহে রোগী রোগমুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, তীব্র স্নায়ুপীড়া ও জ্বালা—যা রোগীকে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং দিনের পর দিন তাকে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে হয়—কোন ঘুমের ওষুধ ব্যতিরেকে ঐ একই ওষুধে তারও উপশম হয়। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার পরও স্নায়ুপীড়া বা যন্ত্রণা চলতে থাকে, যাকে আমরা 'হার্পিস হবার পর নার্ভে ব্যথা' (post

herpetic neuralgia) বলি, তার সম্ভাবনা কমে এবং হলেও এর সুচিকিৎসা হোমিওপ্যাথিতে আছে।

ওষুধ ও ব্যবহারবিধি

বেশ কয়েকটি ওষুধ এই রোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন, রাস টক্স (Rhus Tox), হেপার সাল্ফ (Heper Sulf.), আর্সেনিক অ্যালব (Arsenic Alb.), এপিস মেল (Apis Mell.) ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ ওষুধটি কোন্ সময়ে কোন্ রোগীর ক্ষেত্রে উপযোগী তা কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকই নির্ণয় করতে পারেন। তাই কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

তবে যেখানে কাছাকাছি কোন ডাক্তার নেই বা চিকিৎসকের নিকট যাওয়া সময়সাপেক্ষ, সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে কয়েকটি ওষুধের ব্যবহারবিধি এখানে বলা হচ্ছে—

রোগের প্রারম্ভে : রাস টক্স-২০০, ১ ঘণ্টা অন্তর দুই মাত্রা খাওয়াবেন। ব্যথা শুরুর সাথে সাথে এই ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগের ব্যাপ্তিকাল কমে যায়।

জ্বালা ও যন্ত্রণায় : আর্সেনিক অ্যালব ও এপিস মেল খুব উপযোগী। কোন্‌টি কখন দরকার কি করে পার্থক্য করা হবে? যদি জ্বালা বা যন্ত্রণা গরমে উপশম হয়— আর্সেনিক অ্যালব-৩০ দিনে দুবার করে ব্যবহার করা শ্রেয়; আর ঠাণ্ডায় উপশম হলে ও সূচ ফোটানোর মতো ব্যথায় এপিস মেল-৩০। আক্রান্ত স্থানে মেন্থা পিপ:θ (Mentha pip.-θ) তুলোতে ভিজিয়ে লাগালে আরামবোধ হয়। এসকিউলাস হিপ:θ (Aesculus Hip.-θ) লাগানোর বিধানও দেখা যায়।

অনেকগুলি ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ক্রমে ভাল ফল লক্ষিত হয়েছে :

রাস টক্স-২০০—দুই মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর, ২ দিন। [২ দিন পর] আর্সেনিক অ্যালব-৩০/এপিস মেল-৩০—যেটি যার ক্ষেত্রে উপযোগী, এক মাত্রা সকালে ও এক মাত্রা বিকালে, ২-৩ দিন। [তারপরে] হেপার সালফ-২০০— দুই মাত্রা ১ ঘণ্টা অন্তর, ২ দিন।

বলা বাহুল্য, এই ক্রম সকলের ক্ষেত্রে উপযোগী নাও হতে পারে। তার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই প্রয়োজন।□

গ্রন্থ-পরিচয়

সারদাকথা অমৃতসমান

সচ্চিদানন্দ ধর

শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল—শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য। প্রকাশক—কথামৃত প্রকাশনী, ৫৭সি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। পৃষ্ঠা ঃ ১২২। মূল্য ঃ ১৫ টাকা।

আ কাব্যজীবনী মঙ্গলকাব্যটি 'পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ'। গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপরিমণ্ডলে সুপরিচিত। বিলম্বিত হলেও গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ সশ্রদ্ধ অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থকার (ব্রহ্মচারী) শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য মহারাজ শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য, তাঁর স্নেহধারায় অভিস্নাত এবং আজীবন মাতৃধ্যানে নিমগ্ন। শ্রীমার দিব্যভাবাশ্রয়ী মানবীয় লীলাকাহিনীকে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজই সর্বপ্রথম গদ্যে 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' নামে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেন। সমসাময়িক কালে, প্রত্যক্ষ-দর্শীর পক্ষে এই জাতীয় দেব-নর-লীলাসমন্বিত জীবনকে রূপদান করা খুবই অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক সাধনার অপেক্ষা রাখে। শ্রীমা সারদাদেবীর কাব্যজীবনীকার শ্রীমা সারদাদেবীর দর্শনলাভে ধন্য। বর্তমান গ্রন্থটি শ্রীশ্রীমায়ের বহু মন্ত্রশিষ্য ও শিষ্যাদের অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ করায় তার ঐতিহাসিকতা দৃঢ়তম ভিত্তির ওপরে স্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য অবতারে এরকম ঐতিহাসিকতার সঙ্গে অবতারজীবনীর অবতারণা দুর্লভ। এখানেই গ্রন্থকারের ব্যাসধর্মিতা!

মঙ্গলকাব্যের ছন্দে, সুরে ও আঙ্গিকে রচিত শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল একখানি ধর্মীয় মঙ্গলকাব্য—যার আবেদন রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল অপেক্ষা ন্যূন নয়। মুখ্যতঃ, পয়ার ছন্দে রচিত, ঐতিহাসিকতার দৃঢ়বন্ধনে সম্বদ্ধ এবং মানবীয় ও দৈবলীলাশ্রয়ী এই কাব্যগ্রন্থখানি কালে গৃহে গৃহে পঠিত এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত হবে নিঃসন্দেহ। ছন্দোবদ্ধ এই কাব্য সাধারণ পাঠকের 'কানের ভিতর দিয়া' সহজেই 'মরমে' প্রবেশ করবে এবং আধ্যাত্মিক রসসিক্ত বলে তা 'প্রাণ'কে আকুলও করবে। শ্রীশ্রীসারদামঙ্গলের মহাকবি ও প্রকাশক অভিনন্দনযোগ্য।

মননে বিবেকানন্দ

সচ্চিদানন্দ ধর

বর্তমান পৃথিবী ও স্বামী বিবেকানন্দ—হরিপদ মজুমদার। প্রকাশক—সমতা প্রকাশন, ৩৫/৭বি রতনবাবু রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২। পৃষ্ঠা ঃ ১০+৬২। মূল্য ঃ ১০ টাকা।

গ্রন্থটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধের সঙ্কলন—(১) বর্তমান পৃথিবী ও স্বামী বিবেকানন্দ, (২) নারীজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, (৩) স্বামীজীর সাম্যচিন্তার উৎস এবং (৪) ধর্মের প্রয়োজনীয়তা। এই প্রবন্ধ চতুষ্টয়ে লেখক স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তভিত্তিক, মানবকল্যাণকর এবং ধর্মীয় সমাজচিন্তার প্রতিফলন করবার প্রয়াসী হয়েছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই লেখক স্বামীজীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ বক্তব্যকে দৃঢ় করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুভূত এবং প্রচারিত বেদান্তভিত্তিক সাম্যবাদকে লেখক মার্ক্স এবং তদনুগামী সাম্যবাদীদের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি ও অর্থনীতিভিত্তিক সাম্যবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে স্থাপন করেই যেন তার আলোচনার ক্ষেত্রকে বিস্তার করেছেন। মার্ক্সকে আলোচনায় একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই মার্ক্সবাদী প্রত্যয়ের অসারতা প্রমাণ করে, বর্তমান পৃথিবীর শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিবেকানন্দীয় নববেদান্তের ধারণারই প্রয়োজন তা দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি বলেছেন।

'নারী জাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে নব্বই বছর পূর্বে নারীপ্রগতি সম্পর্কে স্বামীজী যেসব উক্তি করেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃতি আছে। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধে অতিসাম্প্রতিক কালের (১৯৮৬-১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ) রাশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, ব্রাজিল, পোল্যান্ড এবং ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মচিন্তা ও সেবামূলক কার্যাদির কথা স্থান পেয়েছে।

'বর্তমান পৃথিবী স্বামীজীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক'—দেশপ্রেমিক, প্রবীণ স্বাধীনতা-সংগ্রামী লেখকের এই আকুতি গ্রন্থের সর্বত্র ফুটে উঠেছে। গ্রন্থকারের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। গ্রন্থটির মলাটে এবং নামপত্রে গ্রন্থনামের বিপর্যয় কি ছাপার ভুল?

ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন-প্রসঙ্গ

পলাশ মিত্র

Religion in Socio-Economic Life of India—Dr. Satchidananda Dhar. Publisher—Chatterjee Publisher, 49/A Banerjee Para Road, Calcutta-700 041. Pages: 8+162. Rs. 125.00.

প্রসঙ্গ এলেই বহু মানুষ ধর্মকে এমন সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজের ভাবনা-চিন্তা তার সঙ্গে যুক্ত করে তাকে এমন এক চেহারায় নিয়ে আসেন, পরিণামে যা অনেক অশান্তি ডেকে আনে। ধর্মের মূল সত্যের দিকে না গিয়ে বাহ্য কিছু আচার-অনুষ্ঠানের কৃত্যকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করেন—এমন মানুষেরও অভাব নেই। সাধারণতঃ 'ধর্ম' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: "প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম—শাস্ত্রাদি পাঠ ধর্ম নয়। বুদ্ধিতে সায় দেওয়া ধর্ম নয়। ধর্ম মতবাদ বিশেষ নয়, সাম্প্রদায়িকতা নয়।" ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজী যেসব অবিস্মরণীয় উক্তি করেছেন, তার গুরুত্ব কোনসময়ে ম্লান হওয়ার নয়। বরঞ্চ আজকের হানাহানি ও ধর্মোন্মত্ততার তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে ধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর বাণীর গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন সর্বাধিক। ধর্ম নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থা আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করছি; তা যে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতা, মতলববাজ ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের কারসাজি—লেখকের এই আলোচনা ও মতামতের সঙ্গে বর্তমান সমালোচকও ঐকমত্য পোষণ করে।

মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যে বিরাট কর্মযজ্ঞের আয়োজনে প্রাণপাত পরিশ্রম করছে, এই গ্রন্থে সেইসব সংস্থা সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা আছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ-সহ আরও উনিশটি বৃহৎ সেবামূলক ধর্মীয় সংস্থার কাজের কথা এখানে পাওয়া যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোটখাট সংস্থার কথাও এখানে অনুক্ত থাকেনি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তা ভারতে সর্ববৃহৎ মানবকল্যাণমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য গ্রন্থে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যধারা ও মহান কর্মযজ্ঞের অনেক কথাই পাওয়া যাবে। পাঠক বুঝতে পারবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ এখানে কিভাবে রূপায়িত হচ্ছে।

দশটি অধ্যায়ের দেড় শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ সুরসিক পাঠককে এক নতুন অভিজ্ঞতা ও আনন্দের খোরাক জোগাবে। ভারতীয় সমাজের রূপরেখার সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ-শাসন, খ্রীস্টধর্মের প্রসঙ্গ, ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যমে সংস্কার আন্দোলনের বিষয়, স্বাধীনতা-সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা, ধর্ম ও জাতীয় সংহতি, ধর্ম ও মানবসেবা—এইরকম নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। এই জাতীয় গ্রন্থ মানুষকে অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি দেবে, ধর্ম সম্পর্কে উদ্ধত অবৈজ্ঞানিক উক্তিকে চিন্তায় ও শাসনে সংযমী করবে এবং ধার্মিক ব্যক্তিকে নতুন আশায় উদ্দীপ্ত করবে। স্বামীজী বলেছেন: "আমরা চাই—আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যতক্ষণ না কারো সত্য উপলব্ধি হচ্ছে, প্রত্যক্ষ হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে ধার্মিক বলা যায় না; বলা যায়, সে ধার্মিক হবার চেষ্টা করছে মাত্র।"

সমালোচ্য গ্রন্থটি পড়বার সময় স্বামীজীর এইসব কথা মনে না এসে পারে না। ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে ধর্মের ভূমিকা ও তাৎপর্য এই গ্রন্থে লেখক আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন, ধর্ম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা কোন্ স্তরে নামতে পারে। আবার এখানে এমন মানুষেরও অভাব নেই যাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষে শুধুমাত্র একটিই ধর্ম আছে। আসলে এখানে বিভিন্ন ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান ও মতামতের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের যে স্বর্গীয় সুষমা প্রতিভাত হয়, লেখক সে-সম্পর্কেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যেই যে প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম সক্রিয়, লেখক তা যথার্থই বলেছেন।

ধর্ম সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ আছে, ধর্মই নাকি যত হানাহানি ও অশান্তির মূল। কিন্তু যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি বা তাঁর ধর্ম যে কখনোই অন্য ধর্মে আঘাত করে না—লেখক এই মতামত জোরালো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও জাতীয় অশান্তি প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার মাধ্যমেই দূর হতে পারে। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটছে, লেখকের মতে তারও সমাধান হতে পারে যদি মানুষ যথার্থভাবে ধর্মের তাৎপর্য অনুধাবন করে মানবসেবায় ব্রতী হয়। শোভন ও সুমুদ্রিত এই মূল্যবান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য। □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১ মে '৯৬ বাগবাজার বলরাম মন্দিরে (কলকাতা-৭০০ ০০৩) সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে বিকালে বলরাম মন্দিরের দোতলার হলঘরটিতে সন্ন্যাসী ও গৃহি-ভক্ত সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই উপলক্ষে গত ১ মে '৯৬ সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, সরোদবাদন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪টায় দোতলার সেই স্মৃতিবিজড়িত হলঘরটিতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দান করেন বলরাম মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পূতানন্দ। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন দীপঙ্কর চৌধুরী এবং শেষে সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যারতির পর ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। সারাদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়।

পুরী মঠ (উড়িষ্যা) গত ২৪ মার্চ এক আন্তঃকলেজ বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

হায়দ্রাবাদ আশ্রমে (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ১৫ এপ্রিল ৮ থেকে ১৫ বছর বয়স্কদের জন্য ৪০ দিনের এক গ্রীষ্মকালীন শিবিরের উদ্বোধন হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। শিবিরে ২৫০ জন যোগদান করেছিল।

ছাত্রকৃতিত্ব

১৯৯৫ খ্রীস্টাব্দের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক কলেজের (জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) ছাত্ররা ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম স্থান অধিকার করেছে।

দন্তচিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ পুরী জেলার সদর ব্লকের দুটি গ্রামে গত ২৯ ও ৩০ মার্চ দুটি দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবির-দুটিতে মোট ২৯২ জনের চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

সারগাছি আশ্রমের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার চড়দৌলতপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১৯টি পরিবারকে ৩০টি ধুতি, ৩০টি শাড়ি, ৩০টি চাদর, ৪০ সেট শিশুদের পোশাক, ৮২টি বয়স্কদের পোশাক, ২৪টি তুলার কম্বল, ২৩টি স্টীলের থালা, ২০ সেট অ্যালুমিনিয়ামের বাসন (প্রতি সেটে ৮টি করে জিনিস) বিতরণ করা হয়েছে।

গুজরাট খরাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে রাজকোট শহরের শহরতলী এলাকায় খরাপীড়িত ১২০টি পরিবারকে একমাস ধরে প্রত্যহ ১০ হাজার লিটার পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছে।

রাজকোট আশ্রম পঞ্চমহল জেলার আদিবাসি-অধ্যুষিত তিনটি গ্রামে ৭০০ শাড়ি বিতরণ করেছে। তাছাড়া ঐ তিনটি গ্রামের ১২০০ গ্রামবাসীকে দুদিন রান্না করা খাবার বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ বন্যাত্রাণ

ঢাকা ও দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে সাতখিরা, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ-সহ আরও পাঁচটি জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮২৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৫৫০ কিলোঃ চাল, ৩৫০ কিলোঃ কলাই, ২১০০ শাড়ি, ৫৭৫টি ধুতি, ১৩০০ লুঙ্গি, ৩৫০টি পোশাক-পরিচ্ছদ, ১৩০০ কম্বল এবং ৮ ফুট লম্বা সি. জি. আই. শিট বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (অন্টারিও, কানাডা) ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গত ৩ মে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে পূজা, ভক্তিগীতি, ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ মে ভজন ও রামনামসঙ্কীর্তন পরিবেশিত হয়েছে। এই দিন নৈতিক মূল্যবোধের ওপর শিশুদের জন্য একটি ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১১ মে স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ এবং 'বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল'-এ রাজযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ৯ মে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ উপনিষদ্ এবং ১৮ মে সোসাইটিতে কঠ উপনিষদের ক্লাস হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে গত ৩ মে ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। গত ২৫ মে এই আশ্রমে পূজা, বক্তৃতা, স্লাইড শো প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ গত মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রতি মঙ্গলবার বেদান্ত বিষয়ক আলোচনা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচিত হয়েছে। ৯ মে শ্রীশ্রীমায়ের ওপর একটি স্লাইড শো দেখিয়েছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (স্যান

ফ্রান্সিস্কো) ঃ গত মে মাসের প্রতি বুধ ও রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ৪ এবং ১১ মে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওলেমায় (মেরিন কাউন্টি) এই আশ্রমের শাখাকেন্দ্রে গত ২৫-২৯ মে একটি বেদান্ত-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্তবপাঠ, পূজা, ধ্যান, ভক্তিগীতি, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি ছিল পাঁচদিনব্যাপী এই শিবিরের অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অঙ্গ।

দ্য বেদান্ত সোসাইটি অব নিউ ইয়র্ক ঃ গত এপ্রিল ও মে মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার যথাক্রমে 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর আলোচনা হয়েছে। প্রতি শনি ও রবিবার সন্ধ্যায় সমবেত ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টার অব নিউ ইয়র্ক ঃ গত মে মাসের প্রতি সোমবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম সোমবার ৫ মে ভগবান বুদ্ধের জীবন নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮টায় যথাক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী তারানন্দ (প্রতাপ) গত ১ এপ্রিল সকাল ১০.৪৫ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি বহুমূত্র ও হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন। স্বামী তারানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদানকেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে দেওঘর, বরানগর, রাজকোট, উদ্বোধন, মালদা ও কাশীপুর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। দেহত্যাগের মাসখানেক আগে তিনি অবসর জীবনযাপনের জন্য বারাণসী সেবাশ্রমে এসেছিলেন। সহজ-সরল জীবনযাপন, অমায়িক ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি অনেকেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান **স্বামী প্রভাকরানন্দ (রঞ্জিত)** গত ৭ এপ্রিল রাত ৭.৪৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি অগ্ন্যাশয় ও পিত্তকোষ-সংক্রান্ত অসুখে ভুগছিলেন। স্বামী প্রভাকরানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাগবাজার (উদ্বোধন) কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসলাভ করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান। জলপাইগুড়ি আশ্রমের দায়িত্বগ্রহণের আগে প্রায় চার বছর তিনি গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ইনস্টিটিউট অব কালচার (কলকাতা), লখনৌ, কানপুর ও পুরুলিয়া কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। হাসিখুশি, কর্মচঞ্চল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী স্বামী প্রভাকরানন্দ তাঁর প্রত্যেক কর্মস্থলেই দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সঙ্ঘ একজন কর্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে হারাল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের উদ্বোধনে পদার্পণ-স্মরণোৎসব

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী উদ্বোধনে (বাগবাজার 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে) শুভ পদার্পণ করেছিলেন। এই দিনটির স্মরণে গত ২৩ মে '৯৬ 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে এবং উদ্বোধনের 'নতুন বাড়ি'তে এবছরই প্রথম সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর থেকেই 'মায়ের বাড়ী'তে ভক্তসমাগম আরম্ভ হয়। সকাল ৬টায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এবং উত্তর কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় বাগবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ৩০০ ছাত্রী-সহ কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল। সকাল থেকে 'মায়ের বাড়ী'তে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সাধুভাণ্ডারায় বেলুড় মঠ ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ সাধু-ব্রহ্মচারী যোগদান করেছিলেন। সারাদিনে পাঁচ সহস্রাধিক ভক্তকে প্যাকেটে প্রসাদ দেওয়া হয়। উদ্বোধনের 'নতুন বাড়ি'তে সকাল ৯টায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমা ও শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের শতবর্ষ উপলক্ষে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' সঙ্কলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়' গ্রন্থদুটিও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দজী। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন স্বামী নির্জরানন্দজী। স্বাগত ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী ত্যাগাত্মানন্দ, সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকাল ৪টায় 'হাওড়া সমাজ' 'নদের নিমাই' যাত্রা পরিবেশন করেন।□

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে (রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি জাতীয় যুবদিবস ও স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম পুণ্য আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে দুদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম দিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পার্শ্ববর্তী গ্রাম জামালপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘের শোভাযাত্রার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থানীয় অঞ্চল পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে টিফিন প্যাকেট দেওয়া হয়। পরদিন বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ও ভজন-কীর্তনের মাধ্যমে স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি পালিত হয়। ঐদিন দুপুরে বসে আঁক, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দেড়শর বেশি ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। বৈকালিক জনসভায় সফল প্রতিযোগীদের সার্টিফিকেট ও স্বামীজীর বই পুরস্কার দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণকান্ত দত্ত ও প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক বলাই ঘোষ।

গত ২০ জানুয়ারি '৯৬ চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (চন্দননগর, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম জন্মোৎসব ও তাদের পাঠচক্রের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। ঐদিন সান্ধ্যানুষ্ঠানে শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে সেবাই পরম ধর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্রায় ৫০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এরপর স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করে ও স্বামীজীর রচনা থেকে পাঠ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে 'প্রবর্তক সেবা নিকেতন'কে কানে শোনার যন্ত্র ও শীতবস্ত্রাদি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ, পিকনিক গার্ডেন (কলকাতা-৭০০ ০৩৯)-আয়োজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল আলোচনা-সভা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পদাবলী কীর্তন, ভক্তিগীতি পরিবেশন ইত্যাদি। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। বক্তব্য রাখেন কবিতা সিংহ ও ডঃ তাপস বসু। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সারদা সংঘ, বিষ্ণুপুর (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ)-আয়োজিত শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন অডিটোরিয়ামে গত ২৬ জানুয়ারি বিকালে এক আলোচনা-সভায় 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী' নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। আলোচনা-সভায় বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন মথুরচন্দ্র নাগ।

বিবেকবাণী স্টাডি সার্কেল, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ (কলকাতা-৭০০ ০৩৯) : গত ২০ জানুয়ারি 'দক্ষিণী পরমার্থ নিলয়ে' স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন মণি চক্রবর্তী ও জয়দেব বর্মন। দেবাশিস দত্ত ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানান্তে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসংঘ (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৩ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ও সেবাসংঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা। উপনিষদ্ পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দ এবং স্বামীজীর জীবনের ওপরে এক সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শশাঙ্কানন্দ এবং বক্তা ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উৎসবের দিনটি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন হওয়ায় বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর অনুরাগের কথা উল্লেখ করেন।

ঘাটাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৪ জানুয়ারি '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিওতে স্বামীজী-সম্পর্কিত ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং প্রায় ১০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ২১ জানুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সংঘে (নিমতা, কলকাতা-৭০০ ০৪৯) শ্রীমা সারদাদেবীর ১৪৩তম জন্ম-মহোৎসব পালন করা হয়। ঐদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের কর্মসচিব স্বামী অমলানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় কথকতা ও সঙ্গীতে 'ঠাকুর ও মা' পরিবেশিত হয়। তাছাড়া স্থানীয় শিল্পীরাও ভক্তিগীতি পরিবেশন করে।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ স্মরণোৎসব সমিতি (কলকাতা-৭০০ ০৩৩) স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উপলক্ষে গত ২৮ জানুয়ারি '৯৬ ত্রয়োদশ বার্ষিক শোভাযাত্রা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। শোভাযাত্রায় বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন)-এর অধ্যক্ষ-সহ কয়েকজন সন্ন্যাসী যোগদান করেছিলেন। স্বামীজীর বাণী-সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, স্বামীজী-বিষয়ক

সঙ্গীত-সহ শোভাযাত্রাটি টালিগঞ্জের বিভিন্ন পল্লী পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার শেষে যোগদানকারী সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। তারপর বালক-বালিকাদের মধ্যে বসে আঁক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃতী বালক-বালিকাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

গত ১৯ জানুয়ারি হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী দক্ষিণাকালীমাতার মন্দিরের ১৬৬তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দুইদিনব্যাপী এই উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে মাতৃপূজার সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। তিনি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি হুগলীর জেলা-ন্যায়াধীশ দীপক চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ সুধীন ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী শিবনাথ ভট্টাচার্য মাতৃসাধনার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পূজা-অর্চনার পর ভোগপ্রসাদ বিতরণ এবং দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন আশিস মজুমদার, দীপঙ্কর চৌধুরী, অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও 'শিবপুর সারথী' সম্প্রদায়। উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৭০০ ০০৬)ঃ গত ১৩ জানুয়ারি '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম আবির্ভাব-তিথি সারাদিনব্যাপী পূজা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যায় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দ। ১৯ জানুয়ারি '৯৬ লোকেন্দ্রনাথ ঘোষ স্মারক বক্তৃতায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ সংঘ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী গোপেশানন্দ। ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৬ সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন স্বামী নির্জরানন্দ। স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে পাঠ করেন সোসাইটির সম্পাদক দীপ্তিকুমার শীল। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও ভাবাদর্শ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী মুমুক্ষানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহিত মুখোপাধ্যায়। ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব-তিথি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। সন্ধ্যায় দীপ্তিকুমার শীল 'কল্যাণ-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। পরে 'কমলা সাঙ্গিতীক' 'মানস চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে।

ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলন

গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি '৯৬ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন উত্তর ২৪-পরগনা, বর্ধমান ও বীরভূম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক সম্মেলন মুর্শিদাবাদ জেলার তেঁতুলিয়া নরনারায়ণ সেবা সমিতিতে (বিবেকানন্দ পাঠচক্র) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দ ও স্বামী দেবরাজানন্দ। সম্মেলনে প্রতিনিধি-সভা ছাড়াও একটি কর্মশালা, ভিডিও শো এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। মোট ২৮টি আশ্রমের ১৫৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

গত ২৭-২৯ জানুয়ারি উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘে। সম্মেলনে ২০টি আশ্রমের মোট ১৪৫ জন সদস্য যোগদান করেছিলেন। উক্ত পরিষদের সভাপতি স্বামী মঙ্গলানন্দ, বেলুড় মঠ থেকে স্বামী স্মরণানন্দ প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সভা ছাড়াও ধর্মসভা এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

পরলোকে

বাগবাজার দত্ত পরিবারের প্রয়াত কালীকৃষ্ণ দত্তের সহধর্মিণী শান্তিলতা দত্ত গত ৭ জানুয়ারি '৯৬ পরলোকগমন করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন কেবলমাত্র তাঁরই দীক্ষালাভ হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ব্যাঙ্গালোর-প্রবাসী নবেন্দু চৌধুরী গত ১ জানুয়ারি '৯৬ বিকাল ৪.১৫ মিনিটে ৮৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে কর্মোপলক্ষে তিনি ব্যাঙ্গালোরে আসেন এবং তখন থেকে সেখানেই স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। ব্যাঙ্গালোরের বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকালে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালীর মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ঐ সংস্থার আজীবন সদস্য ছিলেন। উক্ত সংস্থার উন্নতিতে এবং স্থানীয় বাঙালীদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। এজন্য ব্যাঙ্গালোরের বহু বাঙালী এবং অবাঙালীর তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। আজীবন রামকৃষ্ণভাবানুরাগী প্রয়াত চৌধুরী মহাশয়ের ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই আশ্রমের অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীর তিনি স্নেহলাভ করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা সতী রায়চৌধুরী গত ৭ জানুয়ারি '৯৬ ভোর ৫.৫৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বছর কানাডায় ছিলেন। বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টোর (কানাডা) সঙ্গে তিনি গত ১২ বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহিকা এবং আগ্রহী পাঠিকা ছিলেন। গদাধর আশ্রম, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ভুবনেশ্বর মঠ এবং জলপাইগুড়ি আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ও অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গোপনে অর্থসাহায্য করতেন। □

মনুষ্যদেহে জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপন সাফল্যের পথে

শিরোনামে উল্লিখিত বিষয়ের দুজন বিশেষজ্ঞের (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক স্যার রয় ক্যালনে ও পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর টমাস স্টারজেল) মতে, মানুষের দেহে জন্তুদেহাংশ সংস্থাপন (Xeno transplantation) বিষয়টি কিছুকাল গবেষণার পর্যায়ে থাকবে। আমেদাবাদে বৃক্কের অসুখ সম্বন্ধে আলোচনাচক্রে তাঁরা জানালেন যে, মানুষের দেহাংশ অকেজো হয়ে গেলে (organ failure) তার চিকিৎসায় জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেবে, তবে এর গবেষণায় বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। কেউ কেউ যে বিদ্রূপ করে বলেনঃ "জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপন অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে শেষকথা এবং চিরকাল এটা শেষকথা হয়েই থাকবে।"—স্যার রয় তাঁদের সঙ্গে একমত নন।

সারা পৃথিবীতে দেহাংশদানকারী লোকের (organ donor) অভাব হওয়ার জন্যই জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারটা এসেছে। যেসব দেশে দেহাংশ প্রতিস্থাপন চালু হয়েছে, তার সব জায়গাতেই সরবরাহ প্রয়োজনকে মেটাতে পারছে না। আমেরিকায় ২৮০০০ রোগী বৃক্ক পাওয়ার আশায়, ৪৫০০ রোগী যকৃতের আশায় এবং ৩০০০ রোগী হৃৎপিণ্ড পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এদের অনেকেই দেহাংশ-দাতা পাওয়ার আগেই মারা যাবেন। মৃত লোকের দেহাংশ নিয়ে অন্যের দেহে প্রতিস্থাপনের নানা অসুবিধা থাকায় ঔষধ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি (Pharmaceutical Companies) মনুষ্যদেহে জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে বহু অর্থ বিনিয়োগ করেছে।

কেম্ব্রিজ ও পিটসবার্গ—দুজায়গার বৈজ্ঞানিক দলেরই সমস্যা হলো, মানুষ ও জন্তুর মধ্যে বংশানুগতিক নিয়ন্ত্রণবাধা (genetic barrier) কিভাবে অতিক্রম করা যায়। কেম্ব্রিজে ১৯৬০ সাল থেকে শ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ীদের (primates) মধ্যে শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে এবং বেবুন ও মানুষের মধ্যে দেহাঙ্গ প্রতিস্থাপন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। স্যার রয় জানালেন যে, প্রথমদিকে শুয়োরের যকৃত বেবুনের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং বেবুনরা কয়েকদিন (সর্বাধিক ছয়দিন) পরেই মারা যায়। গোড়ার দিকে সব গবেষণাতেই লেজহীন ও লেজওয়ালা বানরই (apes and monkeys) ব্যবহৃত হতো। মানুষের সঙ্গে জাতিগতভাবে নিকট সম্পর্ক হওয়ায় বানররা দেহাংশদাতা হবার আদর্শ জন্তু নয়। তাছাড়া আদর্শ দাতা না হবার অন্য কারণগুলি হলো—বেবুনরা আকারে অনেক ছোট, শিম্পাঞ্জির সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে এবং এদের দেহে লুকিয়ে থাকা ভাইরাসগুলি (বিশেষতঃ রোটা ভাইরাস) সক্রিয় হয়ে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। শুয়োরের দেহাংশ কয়েকটি কারণে দেহাংশ সংস্থাপনের ব্যাপারে আকর্ষণীয় বলে গণ্য হতে পারে—(১) শল্যচিকিৎসার দিক থেকে, (২) এদের তাড়াতাড়ি বংশ বাড়ে এবং (৩) এদের মধ্যে কোন জানা অসুখ নেই। জন্তু থেকে মানুষে দেহাংশ প্রতিস্থাপন ব্যাপারে এখন ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় শুয়োরের ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। স্যার রয় বলেন যে, ক্রমবিকাশের হিসাবে মানুষ ও শুয়োর পৃথক হয়েছে ৪০ কোটি বছর আগে। এতকাল পৃথক থাকায় এদের দুজনের মধ্যে শুধু রোগ-অনাক্রম্যতার (immunological) দিক থেকে নয়, জীবদেহের রাসায়নিক রূপান্তরেও (metabolic) বিভিন্নতা এসে গেছে, যার ফলে শুয়োর ও মানুষের দেহে প্রোটীনের বিভিন্নতা রয়েছে। স্যার রয়ের মতে, এই বাধা দূর করা সম্ভব যদি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটীনগুলি শুয়োরের ভ্রূণাবস্থায় তার শরীরে বারেবারে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এতে সাফল্য আসা সহজ নয়, তবে এই ব্যাপারে এত কৌতূহল জেগেছে এবং এত অর্থ ঢালা হচ্ছে যে, এই প্রচেষ্টা সফল হবেই।

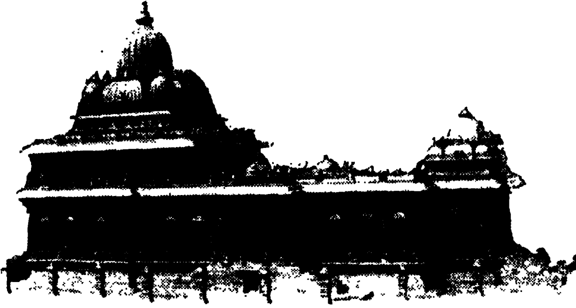
ডঃ স্টারজেল বললেন, মানুষের দেহে জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপন সফল হবে। তিনি আরও বললেন, যখন প্রথমে মানুষের দেহে অন্য মানুষের দেহাংশ প্রতিস্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে, জীববিজ্ঞানের দিক থেকে (biologically) এটা কোনদিনই সম্ভব হবে না। জন্তুর দেহাংশ মানুষের দেহে প্রতিস্থাপনের ব্যাপারেও ঐরকম অসম্ভব সম্ভব হবে। তবে তিনি স্যার রয়-এর মতো শুয়োর ও মানুষের মধ্যে প্রোটীনের সমতা আনার ওপর গুরুত্ব দেন না, যদিও উভয়েই শরীরের কৃত্রিম সহনীয়তা সৃষ্টির (acquired tolerance) ওপর জোর দেন। [Medical Times, January 1996, pp. 1 & 6] □

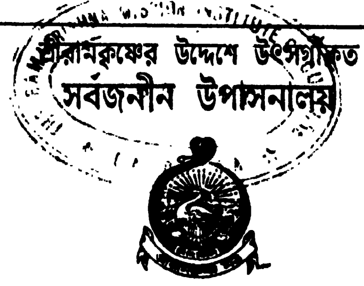


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯ ; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯



আবেদন

সুধী,

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় মঠে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে জগজ্জননী সারদাদেবীর সম্মতিক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ মালদায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁরই প্রেরণায় এই অঞ্চলে এক মহৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, যার ফলস্বরূপ ১৯২৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মালদা বেলুড় মঠের এক শাখাকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেসময় থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মালদা শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবামূলক কাজে নিরলসভাবে ব্রতী।

বিগত কয়েক বছরের বন্যায় মালদা মঠের পুরনো মন্দির ভগ্নদশায় পরিণত। ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে নতুন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৩ রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আনন্দের বিষয়, এই মন্দিরের বাস্তব রূপায়ণের শুভারম্ভ হয় ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার পুণ্যদিনে। ঠাকুরের অসীম কৃপায় এবং সাধু-সন্ত, ভক্তবৃন্দ ও সহৃদয় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় মন্দির-নির্মাণের কাজ ঠিকমত চলছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা মন্দিরের কাজ ত্বরান্বিত করতে ইচ্ছুক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি (১৯৯৭-১৯৯৮) উদ্‌যাপনের শুভ অবসরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ভক্তচিত্তে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

এই মহৎ ও শুভ কর্মযজ্ঞে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই। অনুগ্রহ করে আপনার দান নগদে, মনি অর্ডারে, ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে RAMAKRISHNA MATH, MALDA—TEMPLE CONSTRUCTION—এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করি। আপনার সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।

সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

ইতি
বিনীত

স্বামী মঙ্গলানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ
মালদা-৭৩২১০১

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ শ্রাবণ ১৪০৩ ১৯৯৬ ৭ম সংখ্যা

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস ঃ বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□৩০০০ টাকা□কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য কিস্তিতেও প্রদেয়□বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য□ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ□ ৫৬ টাকা□সডাক□৬৬ টাকা□আলাদাভাবে কিনলে□বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা



উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি
উদ্বোধন ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৩ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **সংখ্যাটির মূল্য ঃ ছত্রিশ টাকা।**

☐ 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি সাতাশ টাকায় পাবেন ; ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে যে-কেউ প্রতি কপি পঁচিশ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি ডাকে নিলে ডাকখরচ বাবদ দশ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করা যাবে।

☐ সাধারণ ডাকে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ৩১ জুলাই '৯৬-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ৩১ জুলাই ৯৬-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা সর্বতোভাবে পাব।

☐ অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

☐ সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বা ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।

☐ গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি পাঠানোর কোন ব্যবস্থা থাকছে না। গত কয়েক বছর গ্রাহকেরা 'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া সংখ্যা ইচ্ছা করলে সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারতেন। সংখ্যাটির মূল্য ও চাহিদা বেশি থাকায় তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, সাধারণ ডাকে পাঠানো শারদীয়া সংখ্যাগুলি বরং অনেক গ্রাহক ঠিকমত পেয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো সংখ্যাগুলির চেয়ে সেগুলি আগে পৌঁছেছে। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা দেড় মাস বা দু-মাস পরে গ্রাহকরা পেয়েছেন। এমন খবরও পেয়েছি যে, রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা বহুদিন পরেও পৌঁছায়নি। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যেসব গ্রাহককে রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের হয়রানির চূড়ান্ত হয়েছিল। এবিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রাহকরা যাতে যথাসময়ে ও নিশ্চিতভাবে সংখ্যাটি পান সেজন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা আমরা কয়েক বছর ধরে করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বেশি ডাকমাশুল দিয়েও তাঁরা কোন সুবিধা তো পানইনি বরং তাঁদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং বিলম্ব বেড়েই চলেছিল—এমনকি অপ্রাপ্তির ঘটনাও ঘটেছিল। যাঁরা বিলম্বে পত্রিকাটি পেয়েছিলেন তাঁরা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানিয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে আর শারদীয়া সংখ্যা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে না। যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা এই সংখ্যাটি সাধারণ ডাকেই নিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করলে বা সুবিধা থাকলে আমাদের দপ্তর থেকে ব্যক্তিগতভাবেও (By Hand) সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) নিলে, আগেই বলা হয়েছে, ৩১ জুলাই ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে সেই সংবাদ অবশ্যই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।

☐ যাঁরা প্রতিমাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন, তাঁদের এবং যাঁরা শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁদের সকলকেই ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত কার্যালয় থেকে আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যাটি দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২৯ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ। অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। ১৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ('৯৬) পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।

দিব্য বাণী

শ্রাবণ ১৪০৩ জুলাই ১৯৯৬

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২-৪

(হে স্তবকারিগণ/পুরোহিতগণ!) তোমরা সংযুক্ত হও। একবিধ বাক্য প্রয়োগ কর; তোমাদের মনসমূহ সমানরূপে জ্ঞাত হোক। পূর্ববর্তী দেবগণ যেরূপ ঐকমত্য প্রাপ্ত হয়ে হবির্ভাগ গ্রহণ করেছিলেন, তোমরাও সেরূপ (ধনাদি গ্রহণ কর)।

এদের (স্তবকারিগণের/পুরোহিতগণের) স্তুতি একরূপ, প্রাপ্তি একবিধ, অন্তঃকরণ একরূপ, বিচারজ জ্ঞান একবিষয়ে একীভূত হোক; আমিও তোমাদের তুল্যরূপ মন্ত্রকে ঐক্যবিধানের জন্য সংস্কার করি; তোমাদের সকলের সাধারণ হবির দ্বারা আহুতি প্রদান করি।

তোমাদের সঙ্কল্প সমান, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান ও তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয়, তাই হোক।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সংহতি

সংস্কৃত 'সংহতি' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে এইভাবেঃ সম্—হন্+ক্তিন্। 'সম্' পূর্বক 'হন্' ধাতুর অর্থ সংযোগ করা, সম্যক্ মিলন করা, সুদৃঢ় সন্ধি করা। সুতরাং 'সংহতি' শব্দের অর্থ সংযোগ, সম্যক্ মিলন, দৃঢ়সন্ধি। বিভেদমূলক শক্তি সম্যক্‌রূপে ধ্বংস না হইলে যথার্থ সংযোগ বা মিলন বা সন্ধি সম্ভব নহে। জগৎ এমনই যে, এখানে বিভেদমূলক শক্তি সক্রিয় থাকিবেই—কম আর বেশি। বিভেদমূলক শক্তির মূলোচ্ছেদ সম্ভবতঃ সম্ভব নহে, যাহা সম্ভব তাহা হইল বিভেদমূলক শক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস। সে-কাজটি কেমন করিয়া করা যাইবে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, নেতিবাচক চিন্তা ও প্রয়াসের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা ও প্রয়াস প্রবেশ করাইয়া। বস্তুতঃ, আমাদের দর্শনও সেই শিক্ষা দেয়। অবিমিশ্র শুভ নিছকই কল্পনা, আবার অবিমিশ্র অশুভও তাহাই। শুভ এবং অশুভ, ভাল এবং মন্দ নিত্যসম্বন্ধ—যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একটিকে লইলে অপরটিকেও লইতে হয়। অন্য প্রসঙ্গে উক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসাধারণ বাক্যটি এখানেও একইভাবে প্রযোজ্য—"নইলে যে ওজনে কম পড়ে!" স্বামীজী বলিতেছেনঃ "আমাদের দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেয়—ভাল ও মন্দ নিত্যসংযুক্ত, এক জিনিসেরই এপিঠ ওপিঠ। একটি লইলে অন্যটিকে লইতেই হইবে। সমুদ্রে একটা ঢেউ উঠিল—বুঝিতে হইবে কোথাও না কোথাও জল খানিকটা নামিয়াছে। শুধু তাই নয়, সমুদয় জীবনই দুঃখময়। কাহারও প্রাণনাশ না করিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ পর্যন্ত অসম্ভব [নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু আমাদের অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতসারে প্রতিমুহূর্তে বিনষ্ট হয়।]; এক টুকরা খাবার খাইতে হইলেও কাহাকে না কাহাকে বঞ্চিত করিতে হয়। ইহাই প্রকৃতির বিধান, ইহাই জীবনদর্শন।" ('বাণী ও রচনা', ৫ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১০২)

বিভেদের মূলোচ্ছেদ বাস্তবে সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু বিভেদের অনিষ্টকর ক্ষমতা হ্রাস সম্ভব। উহার জন্য প্রয়োজন মিলনের শক্তিকে সক্রিয় করা, সংহতির তরঙ্গকে প্রবাহিত করা। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে ঋগ্বেদের ঋষি উচ্চারণ করিয়াছিলেন সংহতির সেই অপূর্ব মন্ত্রঃ "সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।..." (ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২ ৪)—তোমরা সংযুক্ত হও। তোমাদের বাক্য এক হউক। তোমাদের মনের ইচ্ছা এক হউক। দেবতারা যেমন ঐকমত্যের প্রেরণায় ও ভিত্তিতে হবির্ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তোমরাও সেইরকম সম্পদকে নিজেদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া লহ। তোমাদের মন্ত্রণা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হউক। তোমাদের প্রাপ্তিও হউক একরূপ। তোমাদের মন এবং চিত্ত এক উদ্দেশ্যে অভিগমন করুক।... তোমাদের সঙ্কল্প এক হউক। তোমাদের হৃদয় এক হউক। তোমাদের অন্তঃকরণ এক হউক। তোমাদের ঐক্য যেন সর্বোত্তম হয়।

ঋষির প্রার্থনা ছিল সর্বোত্তম ঐক্যের। ইহা কি বুঝায় না যে, ঋষিদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ছিল, অনৈক্য ছিল? জগতের নিয়মেই বিরোধ থাকে। অনৈক্য থাকে। বৈচিত্র্য তো জগতের পরিকল্পনারই অঙ্গ। সুতরাং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণের মধ্যে বিরোধ ছিল, অনৈক্য ছিল, কিন্তু তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বিরোধের অবসান হউক। বিরোধ যেন তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেয়, দুর্বল করিয়া না দেয়। মানুষ যেহেতু মানুষ—প্রকৃতির নিয়মেই সেইজন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য থাকিবেই এবং মানুষের প্রতি মানুষের অসহিষ্ণুতাও অনিবার্য। অসহিষ্ণুতার মূলে থাকে মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক স্বার্থপরতা, লোভ, ঈর্ষা। সেই প্রাচীনকালেই আমাদের পূর্বপুরুষগণ মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৃত্তিকে শনাক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। যদি সেই যুগে বিরোধ এবং অনৈক্য না থাকিত তাহা হইলে ঐ "সং গচ্ছধ্বম্ সং বদধ্বম্" মন্ত্র উচ্চারণ করিবার, ঐভাবে প্রার্থনা করিবার, ঐভাবে সঙ্কল্প গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সকলে একভাবে কথা বলেন না, একভাবে চিন্তা করেন না, এক উদ্দেশ্যে সমবেত হন না। তাঁহাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা আছে, মতান্তর আছে, মনান্তর আছে এবং সংঘর্ষও আছে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, এই বিরোধের মধ্যে, অসহিষ্ণুতার মধ্যে, বিপরীত ও বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি সমান-ভূমি খুঁজিতে হইবে। বিরোধকে তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই, অসহিষ্ণুতাকে তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন নাই; কিন্তু বিরোধিতা ও অসহিষ্ণুতার তীব্রতা হ্রাস করিতে না পারিলে যে সামগ্রিকভাবে সকলেরই অনিষ্ট—সমষ্টির ক্ষতি, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ অঙ্গীকার-মন্ত্রকে নিজেদের জীবনবেদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বৈদিক যুগ হইতে পৌরাণিক যুগে আসিয়া আমরা দেখি, তখনও ঐ প্রয়াস অব্যাহত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন ঃ "সূত্রে মণিগণা ইব"—মালার মধ্যে বিভিন্ন রত্ন-মাণিক্য যেন। অর্থাৎ তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, মালার মধ্যে নানা বর্ণের, নানা ধরনের রত্ন থাকে, কিন্তু যখন তাহাদের গাঁথা সম্পূর্ণ হয় তখন সব রত্ন মিলিয়া একটি রত্নমালার আকার গ্রহণ করে এবং সকলের আনন্দের কারণ হয়। নানা তো থাকিবেই, কিন্তু নানার মধ্যে এক-কে খোঁজা এবং দেখার মধ্যেই নিহিত যথার্থ সুখ, যথার্থ আনন্দ। ভারতবর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্য এবং সাধনা ঐ সংহতির সন্ধান ও রূপায়ণের ঐতিহ্য ও সাধনা।

পৌরাণিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগে, উহার পরবর্তী যুগে এবং আধুনিক যুগে মানুষ সংঘর্ষের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে জটিল হইতে জটিলতর-ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে। কী জাতীয় জীবনে, কী সমাজজীবনে, কী পরিবারজীবনে সর্বত্রই ঐ জটিলতা ছায়া বিস্তার করিয়াছে। আধুনিক কালে বিরোধ এবং বিসংবাদের প্রকাশ ভয়াবহ রূপ ও মাত্রা লাভ করিয়াছে। অসহিষ্ণুতা এবং অনৈক্য আজ সর্বব্যাপী—দেশে দেশান্তরে। এই সমস্যা আজ শুধু একটি দেশের সমস্যা নহে, গোটা পৃথিবীর সমস্যা। ব্যক্তিজীবন বিপর্যস্ত, পরিবারজীবন বিধ্বস্ত। সমাজজীবন, জাতীয় জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন—সর্বত্র ঐ বিপর্যয় বিপজ্জনকভাবে প্রতিফলিত। ফলে সংহতির সমস্যা আজ যুগসমস্যা ও বিশ্বসমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন, সংহতির চেতনা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ। ব্যক্তিমানুষ যদি এই মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত না হয়, ব্যক্তিমানুষ যদি এই মূল্যবোধের অনুশীলন না করে তাহা হইলে তাহার প্রভাব পড়ে পরিবারে। পরিবার হইতে উহা সংক্রামিত হয় সমাজে এবং সেখান হইতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে। তখন পরিবার, সমাজ, দেশ, পৃথিবী তাহাদের বাসযোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। সেজন্য ভবিষ্যতে যাঁহারা ত্যাগের আদর্শে জীবন উৎসর্গ করিবেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগত সেই যুবকবৃন্দকে তিনি সংহতির আদর্শে উজ্জীবিত করিতেন। তিনি তাঁহাদের একসূত্রে বাঁধিয়া দিবার জন্য দিবারাত্র সচেষ্ট থাকিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার ব্যগ্রতার অন্ত ছিল না। তিরোধানের পূর্বে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ব্যাকুলভাবে বলিয়াছিলেন ঃ "ওদের বেঁধে এক করতে পারতাম!" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৬২)। পরবর্তী কালে যে-রামকৃষ্ণ সংঘকে পৃথিবী দেখিয়াছে তাহার পিছনে ছিল তাঁহার ঐ সংহতির প্রেরণা এবং প্রয়াস। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যবৃন্দের পরস্পরের মধ্যে যে-আত্মীয়তা এবং প্রীতির বন্ধন দেখা গিয়াছিল তাহা জগতে অতুলনীয়। এই অপূর্ব সংহতিকে বাস্তবে রূপদানের মূল দায়িত্ব তিনি অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রধান ত্যাগি-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের উপর। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মে কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন ঃ "আমার উপর তাঁহার [শ্রীরামকৃষ্ণের] নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।" ('বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৩২৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের আকুতি এবং নির্দেশের কথা শ্রীশ্রীমা জানিতেন। সেকথা তিনি সংঘের সকল স্থপতি এবং বিশেষতঃ প্রধান স্থপতি নরেন্দ্রনাথকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরণা এবং পথনির্দেশ তাঁহাদের সংঘবদ্ধ রাখিয়াছিল। তাঁহার সেই ভূমিকার কথা স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার 'মাই লাইফ অ্যান্ড মিশন' শীর্ষক বিখ্যাত ভাষণে আবেগময় ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার ত্যাগি-সন্তানেরা যখন তপস্যা ও বৈরাগ্যের প্রেরণায় তীর্থাদি পরিক্রমা করিতেছেন তখন শ্রীশ্রীমা উদ্বেগে বিনিদ্ররাত্রি যাপন করিতেছেন। তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগি-শিষ্যগণ কী ঐভাবে সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীর মতো ছন্নছাড়া পরিব্রাজকের জীবনকেই বাছিয়া লইবেন? তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকল্পিত সংঘের কী হইবে? তাঁহাদের পারস্পরিক সংহতির কী হইবে? পরবর্তী কালে তিনি নিজেই বলিয়াছেন ঃ "আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যাকিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিনকতক একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল।... তারপর... একে একে সকলে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। তখন আমার মনে খুব দুঃখ হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর অত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায় আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো অভাব নেই।... আমার প্রার্থনা, তোমার নামে, তোমাকে আশ্রয় করে যারা বেরুবে... তারা সব তোমাকে আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একস্থানে একসঙ্গে থাকবে। আর এইসব সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যেই তো [তোমার] আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে দেখি নরেন

আমার ধীরে ধীরে এইসব [মঠ-টঠ] করলে।" (মাতৃসান্নিধ্যে —স্বামী ঈশানানন্দ, ৫ম সং, পৃঃ ১১১-১১২)

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে এই কথাগুলি শুনিয়াছিলেন তাঁহার অন্যতম সেবক স্বামী ঈশানানন্দ। তিনি লিখিয়াছেন, মা 'এইসব সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা' বলিবার সময় "হস্ত প্রসারিত করিয়া অনন্ত সংসারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এক ঐক্যবদ্ধ পরিবারে সামিল করিবার জন্য নিয়োজিত। সেই কোন্ সুদূর অতীতে ভারতীয় ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছিলেন—"যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।১।৩)—যেখানে বিশ্ব হইবে সকলের একটি সাধারণ-গৃহ।

অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তাঁহার ত্যাগি-শিষ্যদের মধ্যে সংহতির কথা ভাবেন নাই, তিনি ভাবিয়াছিলেন ত্যাগি-গৃহী সকলের সংহতির জন্য। পরিবার হইতেই সেই সংহতির সূচনা করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি তাঁহার কাছে আগত সকল গৃহি-ভক্তকেই পরিবারের সংহতির দিকে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন। বর্তমান কালের স্বামি-স্ত্রী কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁহার নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত অনুধাবনযোগ্য ঃ

"ঠাকুরের কাছে দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাস্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। আজ ৯ আগস্ট ১৮৮৫ খ্রীঃ।...

"শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর পিতার প্রতি)—ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিন্তু তফাৎ নয়। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ।... বাপ কত বড় বস্তু!... মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের [অর্থাৎ স্ত্রীর] সম্বন্ধেও ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে।... আমি মার জন্য বৃন্দাবনে থাকতে পারলাম না। যাই মনে পড়ল মা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে আছেন, অমনি আর বৃন্দাবনেও মন টিকল না।" ('কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬,পৃঃ ১০০১-১০০২)

শ্রীম-র সঙ্গে তাঁহার পিতার বনিবনা ছিল না। স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া তিনি আলাদা বাসা করিয়া থাকিতেন। ইহা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের খুব অপছন্দ। শ্রীম নিজেই সেকথা লিখিতেছেন ঃ

"মাস্টারের বাড়ি কলিকাতায়। তিনি গৃহে অশান্তি হওয়াতে শ্যামপুকুরে বাড়ি ভাড়া করিয়া আছেন। সেই বাড়ির কাছেই কর্মস্থল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটীতে তাঁহার পিতা ও ভাইয়েরা থাকিতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা যে, তিনি নিজ বাটীতে গিয়া থাকেন, কেননা, একান্নভুক্ত পরিবার মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা করিবার অনেক সুবিধা।... আজ ঠাকুর সেই বাড়ির কথা আবার তুলিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কেমন, এইবার তুমি বাড়ি যাবে।" (ঐ, পৃঃ ৫০৩-৫০৪)

একদিন বলিলেন ঃ "বাপের সঙ্গে প্রীত কর।" (ঐ, পৃঃ ৪৫০)

আরেকদিন শ্রীমকে তীব্র তিরস্কার করিতেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি, তিরস্কার করিতে করিতে)—আর তোমায় বলি, বাপ-মা মানুষ করলে, এখন কত ছেলেপুলেও হলো, স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে আসা! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে, বাউল বৈষ্ণবী সেজে বেরয়। তোমার বাপের অভাব নাই বলে, তা না হলে আমি বলতুম, ধিক্! (সভাসুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ)"(ঐ, পৃঃ ৫১০)

যুবকভক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিতেন। তিনিও বাড়িতে বনিবনা না হওয়াতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া আলাদা বাসা করিয়া ছিলেন। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীমও উপস্থিত। উভয়কে দেখিয়া তীব্র বিদ্রূপ ঝলসাইয়া উঠিল শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ঃ

"(মাস্টারকে দেখাইয়া—সহাস্যে) ইনিও আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না 'আমি বিদেশিনী'; আর তুমি কে, না 'আমি বিরহিণী'! (সকলের হাস্য) বেশ মিল হবে!" (ঐ, পৃঃ ৫২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ গৃহি-ভক্ত রামচন্দ্র দত্তেরও পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না বিমাতার জন্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ চাহিতেন, রামচন্দ্র যেন নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও পিতা ও বিমাতার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন। (ঐ, পৃঃ ৫০১)

তাঁহার কাছে আগত অল্পবয়সী দুই জাকে সতর্ক করিতেছেন যেন কোনভাবে "হীনবুদ্ধি, রাগ, হিংসা" না আসে। (ঐ, পৃঃ ৫১১)

'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাপালায় এক যুবক বিদ্যার ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। তিনি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁহাকে উপদেশ দিলেন ঃ

"ভাইদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। মিল থাকলেই দেখতে শুনতে সব ভাল। যাত্রাতে দেখ নাই? চারজন গান গাইছে, কিন্তু প্রত্যেকে যদি ভিন্ন সুর ধরে, তাহলে যাত্রা ভেঙে যায়।" (ঐ, পৃঃ ৫১৪)

গৃহি-ত্যাগী সকলের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ঃ সংহতি। কারণ, সংহতিই যে শক্তি। তাঁহার সঙ্ঘ উভয়কে লইয়া। তিনি বলিতেন ঃ "আমার পাঁচফুলের সাজি।" ('যুগনায়ক', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২) বিশ্বব্যাপী এই সঙ্ঘ। সঙ্ঘের সকল সদস্যকে প্রেমের সূত্রে—সংহতির সূত্রে গাঁথিবার মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং অন্যান্য রামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ সেই সূত্রকে শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ তাঁহাদের আচার্যের আদর্শ—সংহতি। তাঁহাদের সকলের লক্ষ্য এক, পথ এক এবং সঙ্কল্প এক। সেই এক-এর পতাকা উড়িতেছে সঙ্ঘে। সঙ্ঘের ভিত্তি পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা-প্রীতি, আর তাহার ফলশ্রুতি এক অপূর্ব সংহতি। শ্রীশ্রীমা বলিতেন ঃ "ভালবাসাই তো আমাদের আসল। এই ভালবাসা-তেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে।" (মাতৃসান্নিধ্যে, পৃঃ ১১১)□

ভাষণ

শিক্ষার আদর্শ

স্বামী ভূতেশানন্দ

সাম্প্রতিক কালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে গ্রামে নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতবর্ষের জনগণের একটি বৃহত্তর অংশ এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা যে আজও তাদের নাগালের বাইরে এটা খুবই দুঃখজনক। দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই যাতে শিক্ষালাভের অধিকারী হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সকলের অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষার প্রসার না হলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হতে বাধ্য। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাবিস্তারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিক্ষার বিকাশের ওপরই দেশের অগ্রগতি নির্ভর করে। যদি আমরা জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তবে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু এই শিক্ষা কি ধরনের হবে, তার আদর্শ কি—স্বামীজী সে-সম্বন্ধে অবহিত থাকতে বলেছেন। আদর্শ স্থির থাকলে তবেই শিক্ষাবিস্তারের সঠিক পথটি আমরা ধরতে পারব। শিক্ষায় বঞ্চিত হওয়ার থেকে বিপথগামী শিক্ষার ফল অনেক বেশি মারাত্মক। তাই শিক্ষার মাধ্যমে কোন্ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে চাই স্বামীজী সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, "মানুষের ভিতর যে-পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশসাধনই হলো শিক্ষা।" কিন্তু 'অন্তর্নিহিত পূর্ণতা'র অর্থ কি তা না বুঝতে পারলে শিক্ষার সংজ্ঞাটি অস্পষ্ট থেকে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তবাদী, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বৈদান্তিক। তাই যা নেই, অসৎ তার থেকে কোন বস্তুর উৎপত্তি তিনি স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁর মতে, সম্পূর্ণতার বীজ মানবজীবনে সুপ্ত থাকতে বাধ্য। তাই মানুষের ভিতর জ্ঞান ও শক্তির যে অনন্ত উৎস আছে তার বিকাশসাধনের পদ্ধতিই হলো শিক্ষা। স্কুল-কলেজে যে গতানুগতিক শিক্ষা প্রচলিত আছে, স্বামীজীর শিক্ষার সংজ্ঞা স্বভাবতই তার থেকে ব্যাপক। দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ শক্তির পূর্ণ বিকাশের সহায় হবে এমন একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থাই ছিল তাঁর আদর্শ। এ শিক্ষার দ্বারা আসবে সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা। স্বামীজীর মতে, বাইরে থেকে কতকগুলি ভাবধারা শিশুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দেওয়াকে শিক্ষা বলা যায় না। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই রয়েছে এক মহামানবের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রকাশের অন্তরায়গুলি অপসারণ করে তাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত বা ভাবধারা, যা ছাত্রের ব্যক্তিত্বের অনুকূল নয়, ছাত্রের ওপর যদি চাপিয়ে দেন তাহলে ছাত্রের পক্ষে তা কল্যাণকর না হয়ে ক্ষতিকারক হয়। শিক্ষক জানবেন, তাঁর কাজ শুধু ছাত্রকে স্ব স্ব ভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকশিত হতে সাহায্য করা, তার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশিত হবার সুযোগ করে দেওয়া। তাঁর এই বোধটি থাকা দরকার যে, তিনি ছাত্রকে নতুন কিছু দিচ্ছেন না বরং যা তার নিজেরই মধ্যে আছে, তারই অভিব্যক্তিতে তিনি সাহায্য করছেন। শিক্ষা হবে এই বৈদান্তিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন উঠবে, মানব শিশুর মধ্যে কোন্ পূর্ণতার ইঙ্গিত করছেন স্বামীজী? এর উত্তর বেদান্তেই আছে। বেদান্ত বলে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, নিত্য শুদ্ধ দিব্য সত্তা। অজ্ঞানের আবরণে তার স্বরূপ আবৃত হয়ে আছে। পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির অর্থ নতুন কোন বস্তু প্রাপ্তি নয়, সর্ববিধ অসম্পূর্ণতার অপসারণ মাত্র।

নিজেদের এই স্বরূপ আমরা বিস্মৃত হয়ে থাকি। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের বিবিধ সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করবে, এই-ই স্বামীজীর অভিমত। বাইরে থেকে কেউ এই সমস্যা সমাধান করতে পারে না। নিজের ভিতর থেকেই এর সমাধান খুঁজে নিতে হবে। শিক্ষক হবেন পথপ্রদর্শক মাত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছি, এখনো বেড়াচ্ছি। বহু বছর পূর্বে স্বামীজী শিক্ষার যে-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, সম্প্রতি সেদিকে বহু জ্ঞানিগুণী ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষা যেন সামঞ্জস্যবিহীন না হয়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে শিক্ষার শক্তিকে সঞ্চারিত ও কার্যকরী করতে হবে। শিক্ষার অর্থ কতকগুলি তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা নয়। স্বামীজীর সরস মন্তব্য, তাহলে তো গ্রন্থাগারগুলিই সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত বলে গণ্য হবে, জগতের যত তথ্য সবই তো পুঁথিগত হয়ে আছে সেখানে। শিক্ষার অর্থ সেই তত্ত্ব ও তথ্যগুলিকে আত্মসাৎ করে নিয়ে জীবনে তার রূপায়ণ। আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক জানে, অনেক পড়াশুনাও তাদের আছে, কিন্তু সেই বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ তারা জানে না। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার বড় ত্রুটি এই যে, এই শিক্ষা ছেলেমেয়েদের শুধু কতকগুলি তত্ত্ব শিখিয়েছে, কিন্তু জীবনে কিভাবে তাদের

প্রয়োগ করতে হবে সেই ব্যবহারিক দিকটা, জীবন গঠনের দিকটা শেখায়নি।. বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রির অধিকারীও জানে না অধীত বিদ্যার প্রকৃত সার্থকতা কোথায় এবং কিভাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চাকুরিপ্রার্থী হয়ে একটি ছেলে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়। কি তার যোগ্যতা—এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, সে এম. এসসি. পাশ। কিন্তু যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি করতে পার? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। এইখানেই আমাদের দুর্দৈব। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের তুলনায় আমাদের ছাত্ররা বহুক্ষেত্রেই হয়তো অনেক মেধাবী, কিন্তু সবটাই তাঁদের পুঁথিগত দিক, কর্মক্ষেত্রে যাকে বলি "কার্যকালে সমুৎপন্নে", সে-বিদ্যা তাদের কাজে লাগে না। এর কারণ, বিদ্যাকে জীবনমুখী করে তোলার চেষ্টা হয়নি। কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আহরণকেই আমরা 'শিক্ষা' বলে ভুল করেছি। সেই বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানকে জীবনে প্রয়োগ করে কিভাবে লাভবান হওয়া যায়, জীবনটাকে গড়ে তোলা যায় সে-কথা ভাবিনি।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষিত এক ভক্ত আমায় বলেছিলেন, জ্ঞান ও মেধার দিক দিয়ে বিচার করলে পশ্চিম দুনিয়ার ছেলেরা আমাদের থেকে নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে সেই জ্ঞানের ব্যবহার কিভাবে করতে হয় তা তারা আমাদের থেকে শতগুণে ভাল জানে। আমরা যেন বিদ্যা অর্জন ও বিদ্যার ব্যবহার—এ-দুটির মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলে দিয়েছি এবং এই কারণেই আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় পশ্চাৎপদ। শিক্ষা আমাদের বাস্তব ফল দিচ্ছে না, পুঁথিগত হয়ে থাকছে। তাই শিক্ষাকে সেই স্তরে নিয়ে যেতে হবে যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষালাভের দ্বারা দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হয়ে নিজের তথা সমাজের কল্যাণে, দেশের ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারে। মনে রাখা দরকার, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত সমস্যা দূর করার চাবিকাঠিই প্রকৃত শিক্ষার ওপর নির্ভর করে।

কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই যে শিক্ষা নয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। তিনি তো নিজের নামটিও লিখতে পারতেন না। কিছু লেখাপড়া শিখতে তিনি আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া তো দূরের কথা—বাড়িতেও পড়াশুনার চর্চা করতে গেলে নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয় ছিল। ফলে আমাদের জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের সম্বন্ধে বলেছিলেন: "ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে নির্দেশ করেছিলেন। পড়তে লিখতে না জানলেও মা ছিলেন জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। সুতরাং তথাকথিত লেখাপড়ার সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নেই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েও মানুষ শিক্ষিত বলে গণ্য হতে পারে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষাও গ্রাম্য পাঠশালায় মাত্র কিছুদিনের জন্য। সামান্যই পড়তে ও লিখতে তিনি শিখেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বড় বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, বাগ্মী, আইনজীবী, চিকিৎসক, সমাজসংস্কারক ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পদপ্রান্তে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর উপদেশামৃত শুনেছেন এবং সেই জ্ঞানগর্ভ বাণীর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। এরপরও কি বলব যে, তিনি শিক্ষিত ছিলেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।" প্রকৃত শিক্ষা সত্যই জীবনব্যাপী। স্কুল-কলেজ থেকে তা আহরণ করা যায় না। সে-শিক্ষার উৎস পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাবলীর যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা। প্রকৃতি তথা জীবজগতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ যে কিভাবে লক্ষ্য করতেন তার পরিচয় 'কথামৃতে' আছে। নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ সব উপমার সাহায্যে কত গভীর তত্ত্বই না তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আর একান্ত বাস্তব বলে সেইসব ব্যাখ্যা হয়েছে এত হৃদয়গ্রাহী। শিক্ষিত ব্যক্তিদের তো কথাই নেই কিন্তু একেবারে শিক্ষাহীন আপামর জনসাধারণ সকলেই বুঝতে পারে যে, তিনি কি বলতে চেয়েছেন—এত সহজ, সরল, মর্মস্পর্শী ছিল তাঁর উপদেশ। এর ফলে নিজ নিজ আধার ও শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকেই তাঁর উপদেশ অনুসারে জীবনগঠনে প্রয়াসী হয়েছে, নিজেদের জীবনের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেছে এবং করছে।

এই-ই হলো প্রকৃত শিক্ষা যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করে জীবনকে সামগ্রিকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জীবনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখলে সে-দেখা সম্পূর্ণ হয় না। নিজেকে জানতে হবে সেই অখণ্ডেরই অভিব্যক্তি-স্বরূপ এক অখণ্ড সত্তারূপে। আর সে-জানা তখনই সম্ভব যখন আমাদের আত্মার পূর্ণ বিকাশ হয়। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক—সকল দিক

থেকেই জাগ্রত সচেতনতা আমাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন এবং সেই সচেতনতা আনাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার অর্থ তথ্যসংগ্রহ নয়, প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান এবং জীবনে তার প্রয়োগক্ষমতা। এই প্রয়োগ তখনই সম্ভব যখন আমরা তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নিতে পারব যা আর বহিরঙ্গ থাকবে না, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে।

এইভাবে শিক্ষা আমাদের মানুষ করে তুলবে। এতে আমরা তো উপকৃত হবই, জগৎও উপকৃত হবে। তবেই আমাদের জীবনে শিক্ষা সার্থক হবে। যদি শিক্ষার এই আদর্শ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন না থাকি তবে শিক্ষা হবে সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় মাত্র, উপরন্তু ক্ষতিকরও। পুঁথিগত বিদ্যার বোঝা আমাদের করে তুলবে অহঙ্কারী, প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দেবে না। শিক্ষার সার্থকতা জীবনের সকল সমস্যার যথাযথ সমাধান করার মধ্যে, সমস্যা থেকে সহজে উত্তরণের পথ দেখানোতে।

স্বামীজী নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও পুরুষদের শিক্ষার মতো সমান ভাবেই স্বীকার করেছেন। নারীশিক্ষার লক্ষ্য মহীয়সী নারী ও মহীয়সী জননীরূপে যাতে নারীর জীবন গড়ে ওঠে। নারীরা যেন সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর আদর্শে নিজেদের চরিত্র গঠন করে—এই ছিল স্বামীজীর ইচ্ছা। এই আদর্শ আজও অনুসরণীয়। কারণ, ভবিষ্যৎ ভারতীয় নাগরিক গঠনের জন্য আজকের নারীর দায়িত্ব সর্বাধিক। মায়ের কাছে শিশু যে-শিক্ষা পায় অন্য সর্ববিধ শিক্ষা থেকে তার গুরুত্ব অনেক অনেক বেশি। উপনিষদে বলা হয়েছেঃ "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব।" মাতাপিতা ও আচার্যকে দেবতার তুল্য মান্য করবে। এখানে লক্ষণীয় যে, মাতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব অপরিসীম। কারণ, সদুপদেশ ও সৎদৃষ্টান্তের দ্বারা তিনিই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করে দিতে পারবেন, যার ওপর তার শিক্ষাদীক্ষার বনিয়াদ গড়ে উঠবে। এশিক্ষা শিশু লাভ করে মাতৃগর্ভ থেকে বহির্গত হবার পর থেকেই। তখন থেকেই মায়ের ভাবনা ও আচরণ অজ্ঞাতসারে শিশুকে প্রভাবিত করে। নারীর দায়িত্ব এত বেশি বলেই তার নিজের চরিত্রকে শিক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে গঠন করা প্রয়োজন যাতে সে নিজের সংসারে তো বটেই উপরন্তু তাকেও ছাপিয়ে সমাজজীবনে এবং বৃহত্তর জগতে আদর্শ জননী, আদর্শ জায়া ও আদর্শ ভগিনীরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা যে, তাঁর কৃপায় এক গরিমাময় ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের জন্য দেশের সর্বত্র আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক।★ □

★ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখে প্রদত্ত পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

অনুষ্ঠান-সূচী (শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪০৩)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

গুরুপূর্ণিমা	আষাঢ় পূর্ণিমা	১৪ শ্রাবণ	মঙ্গলবার	৩০ জুলাই ১৯৯৬
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৭ শ্রাবণ	সোমবার	১২ আগস্ট ১৯৯৬
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১২ ভাদ্র	বুধবার	২৮ আগস্ট ১৯৯৬
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৯ ভাদ্র	বুধবার	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৬ ভাদ্র	বুধবার	১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

১১, ২৪ শ্রাবণ	শনিবার, শুক্রবার	২৭ জুলাই, ৯ আগস্ট ১৯৯৬
৯, ২৩ ভাদ্র	রবিবার, রবিবার	২৫ আগস্ট, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

অনুধ্যান

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের কাছে বারংবার শুনেছিঃ "ভগবানই একমাত্র আপনার জন। সর্বাবস্থায় তাঁর ওপর নির্ভর করে চলতে হবে। অভ্যাস ও শরণাগতি—এদুটি ধর্মজীবনের আবশ্যিক শর্ত।"

মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টি ছিল লক্ষ্য করার মতো। মেয়েদের মধ্যে তাঁরা জগজ্জননীকে দেখতেন। মেয়েদের দুঃখ-কষ্ট, মেয়েদের মুখে নিরানন্দ ভাব দেখলে তাঁরা খুব ব্যথিত হতেন। মেয়েদের বলতেনঃ "তোমরা হলে আনন্দময়ীর সন্তান। তোমাদের বিষণ্ণ দেখলে আমাদের মনে লাগে। সবসময় আনন্দে থাকবে।" তাঁরা বলতেনঃ "যে-জাত, যে-দেশ, যে-সমাজ মেয়েদের সম্মান করে না—সেই জাত, সেই দেশ, সেই সমাজ অধঃপাতে যায়। ঠাকুর চেয়েছিলেন মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। সেজন্য গৌরী-মাকে মেয়েদের জন্য কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মেয়েদের সমস্যা, মেয়েদের দুর্বলতা, মেয়েদের শক্তি মেয়েরাই বুঝবে ভাল। সেজন্য গৌরী-মায়ের ওপর মেয়েদের তোলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। স্বামীজী যে মেয়েদের উন্নতির জন্য এত ভেবেছেন, এত বলেছেন, এত করেছেন—তার মূলে ছিল ঠাকুরেরই প্রেরণা। ঠাকুরের কাছ থেকেই স্বামীজী মেয়েদের তোলার মূলনীতিটি শিখেছিলেন—মেয়েদের দিয়েই মেয়েদের তুলতে হবে।"

অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি ভাল বুঝেছে এবং নিয়েছে। গৌরী-মা, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গোপালের মা ঠাকুরকে যেমন বুঝেছেন, ঠাকুরের গৃহী পুরুষভক্তের মধ্যে তেমনভাবে কয়জন বুঝেছেন ঠাকুরকে—কয়জন ঐভাবে নিজেদের জীবন ঠাকুরের কাজে দিয়েছেন? স্বামীজীর ভক্তদের মধ্যে নিবেদিতা, ম্যাকলাউড, ক্রিস্টিন ও ওলি বুলের কোন তুলনা আছে? তাঁর কয়জন গৃহী পুরুষভক্ত তাঁদের মতো ঠাকুরের সেবায় প্রাণ ঢেলেছেন?

একবার বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) রথের মেলায় বেগুনী, পাঁপড়ভাজা কিনে খাওয়ার জন্য আমাদের পয়সা দিয়েছিলেন। আমরা তিন-চারজন পায়ে হেঁটে মাহেশে রথ দেখতে গিয়েছিলাম এবং বাবুরাম মহারাজের নির্দেশমত রথের মেলায় বেগুনী, পাঁপড়ভাজা কিনে খেয়েছিলাম। মঠে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ভোর চারটায় মঠ থেকে রওনা হয়েছিলাম। আমাদের চেয়ে বাবুরাম মহারাজেরই যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ ছিল বেশি। বাবুরাম মহারাজ ঐভাবে আমাদের অনেক সময় এখানে-ওখানে পাঠাতেন। তিনি বলতেনঃ "ঠাকুর আমাদের রথের মেলায় বা এখানে-ওখানে পাঠাতেন। বলতেন, 'মেলায় গেলে কিছু কিনতে হয়। ছোটখাট দোকানদাররা অল্প-স্বল্প জিনিস নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে। তোরা সবাই কিছু কিছু কিনলে তবে তো তাদের দু-পয়সা হবে।' রথের মেলায় বেগুনী, পাঁপড়ভাজা কিনে খাওয়ার জন্য ঠাকুরই আমাদের মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিতে বলতেন। মাকেও বলে রাখতেন আমাদের পয়সা দেওয়ার জন্য।" বেগুনী, পাঁপড়ভাজা আমরা আর কতটুকুই বা কিনে খেতাম, কিন্তু এথেকে আমরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিচয় পাই। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁদের কত দরদ ও ভালবাসা ছিল তার কিছুটা আভাস পাই।

মাহেশে আরও একবার আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম রথ দেখতে। সেবার মহারাজের সঙ্গে। সে কী আনন্দ! মাহেশে দিন দুয়েক ছিলাম। গাড়িতে করে গিয়েছিলাম। জগন্নাথদেবের অন্নপ্রসাদও পেয়েছিলাম।

একবার বাবুরাম মহারাজ আমাদের কয়েকজনকে বালিতে একটি উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভায় যোগদান করতে পাঠিয়েছিলেন। সভার কাজ শেষ হলে আমরা ফেরার জন্য উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের একটু বসতে বললেন মিষ্টিমুখ করার জন্য। আমরা বসে রয়েছি। এইসময় একটা অদ্ভুত ঘটনা আমাদের চোখে পড়ল। দেখলাম, এক বৃদ্ধা সভার এক কোণে বসে আছেন আমাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে। তাঁর চোখের পাতা নড়ছে না। তাঁর দুচোখ বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ঐভাবে কাঁদছেন কেন? তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ "বাবা, আমার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল সেই দেবতাকে দর্শন করবার—দক্ষিণেশ্বরে সেই পতিতপাবন ঠাকুরকে এই চর্মচক্ষে দেখবার। কিন্তু বাবা, তোমরা তাঁকে দেখনি, সেই ভাগ্য তোমাদের হয়নি। তোমরা শুধু তাঁর নাম শুনেছ। তাতেই তোমরা ঘরবাড়ি সব ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁকে আশ্রয় করেছ, একমাত্র তাঁরই শরণ নিয়েছ।

তাই ভাবছি, তোমরা কত ভাগ্যবান! আমি তো তাঁকে এই চোখ দিয়েই দেখেছি, কিন্তু দেখেও তো আমার কিছু হলো না!" ঠাকুরের নামেতে দুই গণ্ড বেয়ে যেভাবে বৃদ্ধার অশ্রুধারা বইছিল তা দেখে আমাদের কিন্তু মনে হয়েছিল, ঠাকুরের কৃপায় বৃদ্ধার নিশ্চয়ই কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ হয়েছে। আমরা তো ঠাকুরের সন্তানদের দেখেছি, তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেছি, তাঁদের ভালবাসা পেয়েছি। সেজন্য মঠে থেকে গিয়েছি, সাধুজীবনকে আশ্রয় করেছি। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা তো তাঁদের দেখেনি, তাঁদের সান্নিধ্য পায়নি, তাঁদের অতুলনীয় ভালবাসার আস্বাদ পায়নি। তবু তো তারা আসছে। শুধু তাঁর নাম শুনে তাঁর শরণ নিতে আসছে। আহা, তারা কতই না ভাগ্যবান! তবে একথাও এইসঙ্গে মনে হয়—আহা, এরা যদি তাঁদের দেখত, তাঁদের সান্নিধ্যলাভ করত, তাঁদের ভালবাসার স্বাদ পেত!

ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানরা প্রত্যেকেই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। ফল হলো এই যে, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁদের নজর ছিল না। বলা হয়, জ্ঞানী ব্যক্তিরা জাগতিক সুখ ভোগ করতে পারেন না। কারণ, জাগতিক সুখ ত্যাগ করে করে তাঁরা এজীবন গঠন করেছেন। অপরিগ্রহ হতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়েও মন-মুখ এক করতে হবে। ঠাকুর বারবার বলতেন: "মন মুখ এক করতে হবে।" ঠাকুরের কোন জিনিসের অপচয় করার বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে। পরিবেশনের সময় ভাত পড়লে বাবুরাম মহারাজ বকতেন। বলতেন: "প্রথমতঃ, ঠাকুরের জিনিস অপচয় হচ্ছে; দ্বিতীয়তঃ পরিবেশক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাবে। যাকে পরিবেশন করছ তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা উচিত। কাজ দেখে লোক বুঝবে, তোমার মনের গতি কোন্‌দিকে। লোকের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকলে কাজের বিকাশও তেমনি সুন্দর হবে।" মহারাজ বলতেন: "সব কাজের ভেতর একটা সুষ্ঠুতা আছে যার তার জপ জমবে।"

ঠাকুরের সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে যে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক দেখেছি, তা ভোলবার নয়। একটা মজার ঘটনা বলি। সেদিন ছিল স্বামীজীর জন্মতিথি। স্বামীজীর বাড়ির একতলায় গঙ্গার দিকে যে-বারান্দা আছে সেখানে সকালবেলা মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) আর বাবুরাম মহারাজ বেঞ্চে বসে কথা বলছেন। হঠাৎ সেখানে মহারাজ এসে মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন: "তারক-দা, আজ একটা মজা করতে হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ বললেন: "কী?" মহারাজ বললেন: "কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক ভক্ত এসে যাবে। আপনাকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে হাতে একটা ছড়ি নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে স্বামীজীর মন্দির পর্যন্ত গিয়ে এখানে ফিরে আসতে হবে। বেশ মজা হবে।" ব্যাপারটি মজার হলেও কাজটা কঠিনই ছিল, কিন্তু মহারাজকে খুশি করার জন্য তাঁর সব গুরুভাইরা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ফলে মহাপুরুষ মহারাজের মতো গম্ভীর ও রাশভারি মানুষও মহারাজের ঐ কঠিন আদেশ সানন্দে মেনে নিলেন। মহারাজের নির্দেশে সবকিছু আগে থেকেই রেডি ছিল—গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, সুন্দরভাবে কোঁচানো ধুতি, সোনার বোতাম, তখনকার দিনের রীতি অনুসারে পকেট-ওয়াচ এবং ছড়ি। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, বোতাম, পকেট-ওয়াচ যথাস্থানে লাগিয়ে হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে মহাপুরুষ মহারাজ আস্তে আস্তে মঠবাড়ি থেকে স্বামীজীর মন্দির পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। আবার ঐভাবে ফিরে এসে মহারাজের কাছে রিপোর্ট দিচ্ছেন—"কেউ চিনতেই পারল না। অমুক (একজন বিশিষ্ট ভক্ত) তাকাল, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিল।" এভাবে রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করছেন মহাপুরুষ মহারাজ, আর মহারাজ এবং ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানরা ও অন্য সাধুরা তা শুনে হোহো করে হাসছেন।

মহারাজের মজা করার আরও অনেক ঘটনা মনে পড়ছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) এবং গঙ্গাধর মহারাজকে (স্বামী অখণ্ডানন্দ) নিয়ে দুটি ঘটনা এখন বলব। বিজ্ঞান মহারাজ তখন মঠে স্বামীজীর মন্দিরের কাজ দেখছিলেন। মঠে তখন স্বামী অভেদানন্দও আছেন। শীতের সকাল। মহারাজ মঠবাড়ির দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। বিজ্ঞান মহারাজের জন্য কলকাতা থেকে একটি গরম পাঞ্জাবী তৈরি করিয়ে আনা হয়েছে। পাঞ্জাবী দেখে মহারাজ খুব খুশি। আমাকে বললেন: "দেখ সুয্যি, পেসনকে[১] নিয়ে একটু মজা করতে হবে। তুই গঙ্গাজলের পাত্রটা ঠিক করে রাখ। পেসনকে জামাটা 'সম্প্রদান' করতে হবে।" হঠাৎ দেখা গেল, রামলাল-দাদা[২] মঠের ঘাটে নৌকা থেকে নামছেন। রামলাল-দাদাকে দেখে মহারাজ খুব খুশি। বললেন:

---

১ এই নামে স্বামীজী, মহারাজ এবং মহাপুরুষ মহারাজ বিজ্ঞান মহারাজকে ডাকতেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল 'হরিপ্রসন্ন'। 'হরিপ্রসন্ন'-র 'প্রসন্ন' থেকে 'পেসন'।—সম্পাদক, উদ্বোধন

২ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়।—সম্পাদক, উদ্বোধন

"ভাল হয়েছে, রামলাল-দাই সম্প্রদান করবেন।" রামলাল-দাদা দোতলায় এসে পৌঁছালেন। দু-একটি কথার পরই মহারাজ তাঁকে কিভাবে সম্প্রদান করা হবে তার পদ্ধতি বোঝাতে লাগলেন। এর মধ্যে বিজ্ঞান মহারাজও এসে গিয়েছেন। তিনি দেখলেন, মহারাজ রামলাল-দাদার সঙ্গে আস্তে আস্তে কি কথা বলছেন। মহারাজকে তো তিনি জানতেন আর মহারাজের সঙ্গে রামলাল-দাদার রসিকতার সম্পর্কটিও তিনি জানতেন। তাঁর আশঙ্কা হলো, তাঁকে নিয়েই বোধহয় উভয়ের কোন ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি সোজা মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন : "আমাকে নিয়ে কি সব মতলব হচ্ছে?" মহারাজ ভাল মানুষের মতো বললেন : "তোমার জন্য একটা জামা আনিয়েছি, সেটা তোমায় দেব। মতলব আবার কী?" বিজ্ঞান মহারাজ নতুন জামা কিছুতেই নেবেন না, আর মহারাজও ছাড়বেন না। তাঁর ভয়, জামার পিছনে মহারাজের কোন দুষ্টুমির মতলব আছেই। শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে মহারাজ তাঁকে রাজি করালেন। মহারাজের আদেশে বিজ্ঞান মহারাজ টুপি, গলাবন্ধ কোট ইত্যাদি খুলে নতুন গরম পাঞ্জাবীটি পরলেন। মহারাজ রামলাল-দাদাকে চোখের ইশারা করলেন। মুখে বললেন : "তবে দাদা, এবার হোক।" রামলাল-দাদা কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মহারাজের রচিত কি সব উদ্ভট মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। বিপদগ্রস্ত বিজ্ঞান মহারাজ ব্যাপার-স্যাপার দেখে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। মহারাজও চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর পিছনে ধাওয়া করলেন। উলটো দিক থেকে অভেদানন্দ মহারাজ তখন সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। দুজনের মধ্যে পড়ে বিজ্ঞান মহারাজের ছোট ছেলের মতো সে কী হাত-পা ছোঁড়া! তা দেখে উপস্থিত সকলে হেসে কুটিকুটি।

গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে মহারাজের কৌতুক জমত ভাল। একবার গঙ্গাধর মহারাজ সারগাছি থেকে মহারাজের নির্দেশে বলরাম মন্দিরে এসেছেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য মহারাজ তাঁকে কলকাতায় আনিয়েছেন। কয়েক মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হলে গঙ্গাধর মহারাজ সারগাছিতে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যেদিনই যাত্রার দিন স্থির হয়, মহারাজ সেদিনই কোন-না-কোন কৌশল করে গঙ্গাধর মহারাজের যাত্রা বন্ধ করে দেন। একদিন গঙ্গাধর মহারাজ ভোরবেলায় বেরতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখছেন বসুবাড়ির একটি ছোট ছেলে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে তাঁকে এক চোখ দেখাচ্ছে। গঙ্গাধর মহারাজের আর যাওয়া হলো না। আরেক দিন রওনা হবেন, এমন সময় একজন তাঁর সামনে একটা ছবি তুলে ধরল। ছবিটি ছিল কাঁকড়ার। এইসব জিনিস অমঙ্গলসূচক। গঙ্গাধর মহারাজ এগুলোকে খুব বিশ্বাস করতেন। মহারাজ তা জানতেন, তাই তাঁরই বুদ্ধিতে এসব কাণ্ড ঘটত।

তবে সবথেকে মজা হয়েছিল আরেকবার। মহারাজ তখন বলরামবাবুদের জমিদারি উড়িষ্যার কোঠারে আছেন। মহারাজের আহ্বানে গঙ্গাধর মহারাজ কয়েক দিনের জন্য সেখানে এসেছেন। গঙ্গাধর মহারাজ সারগাছি ফিরে যাওয়ার আগের দিন মহারাজকে বললেন। গুরুভাইকে কাছে পেয়ে মহারাজ খুব খুশি। তাই বললেন আরও কয়টা দিন থেকে যেতে। কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ বললেন যে, তাঁকে ঐদিন ফিরে যেতেই হবে। মহারাজ বারবার তাঁর ফেরার দিনটিকে পিছোতে বললেও তিনি রাজি হলেন না। নির্দিষ্ট দিনে মহারাজের কাছে বিদায় নিয়ে তিনি পালকিতে স্টেশনের দিকে রওনা হলেন। রাত্রিবেলা। কোঠার থেকে ভদ্রক রেলস্টেশন কয়েক মাইল দূর। বেহারারা পালকি নিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর গঙ্গাধর মহারাজ ঘুমিয়ে পড়লেন। বেহারাদের মহারাজ বলে রেখেছিলেন, পালকির মধ্যে গঙ্গাধর মহারাজ ঘুমিয়ে পড়লে তারা যেন কোঠারের বাড়িতে পালকি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেইমত বেহারারা কোঠারের কাছারিবাড়িতে পালকি নিয়ে এসে রাখল। গঙ্গাধর মহারাজ ভাবলেন, পালকি স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। পালকি থেকে বেরিয়ে এসেই দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজ। মুখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে বললেন : "কি ভাই, ফিরে এলে যে!" গঙ্গাধর মহারাজ বুঝলেন, এ সমস্ত মহারাজের ষড়যন্ত্র। সেদিন আর গঙ্গাধর মহারাজের সারগাছি যাওয়া হলো না। এরকম ঘটনা আরও অনেক আছে।

বস্তুতঃ, 'রাখালরাজ'-এর রসের শেষ ছিল না। তিনি ছিলেন সবদিক থেকেই এক রসময় পুরুষ। এই রস যেমন হাসি-মস্করা, রঙ্গ-কৌতুকে প্রকাশ পেত, তেমনি প্রকাশ পেত তাঁর গম্ভীর অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতাতেও। ঠাকুরের মতো তাঁর মনও সবসময় ভাবরাজ্যেই বিচরণ করত। সেই ভাবের রাজ্য থেকে আমাদের রাজ্যে তিনি মনকে নামিয়ে রাখতেন ঐসব হাসি-মস্করা, রঙ্গ-কৌতুকের ভিতর দিয়ে। শুধু মহারাজই বা কেন, ঠাকুরের সব সন্তানই ছিলেন ঐরকম। একহাতে জগতের রস, অন্য হাতে ঈশ্বররস নিয়ে এই জগৎকে 'ধোঁকার টাটি' থেকে 'মজার কুটি'তে পরিণত করার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন তাঁরা।

ঠাকুরের পার্ষদ্‌দের সাধারণ আচার-ব্যবহার দেখলে তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকটা সবসময় বোঝা যেত না। কিন্তু তাঁদের জীবনটা আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে ভরা। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন। বলরাম মন্দিরের হলঘরে দুটো খাট ছিল—একটি বড় খাট, একটি ছোট খাট। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেমন আছে। মহারাজ বড় খাটটিতে আর আমি নিচে মেঝেতে শুয়ে আছি। রাত কত জানি না, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। দেখলাম, মহারাজ বড় খাট থেকে ছোট খাটের ওপর এসে বসে আছেন। কি ব্যাপার বুঝতে পারলাম না। একটু চুপ করে থেকে কাছে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু মহারাজ কোন কথাই বলছেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তামাক খাবেন কিনা। কিন্তু মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। একটু পরে মহারাজ নিজেই বলছেন: "কি হলো বুঝতে পারছি না। খানিকক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে গেল। পরিষ্কার দেখলাম, ঠাকুর ছোট খাটটির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। ঠাকুরের মুখ গম্ভীর। ঠাকুর চলে গেলেন। তখন থেকে আমি ভাবছি, এটা কি হলো? ঠাকুর এলেন আর কিছু না বলে চলে গেলেন! এমন তো কখনো হয়নি। এটা কেন হলো?" একথা বলে মহারাজ আবার চুপ করে গেলেন। মহারাজের ঐকথা শুনে আমার মনে হলো, ঠাকুরকে দেখতে পাইনি ঠিকই, কিন্তু তিনি যখন এই ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তাঁর গায়ের হাওয়াটুকু অন্ততঃ আমার গায়ে লেগেছে!

শ্রীশ্রীমায়ের যখন শরীর যায় (২১ জুলাই ১৯২০, রাত দেড়টা) মহারাজ তখন ভুবনেশ্বরে। কিন্তু মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন। সেদিন মধ্যরাত্রে দেখলাম, মহারাজ বিছানা থেকে উঠে এসে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "এভাবে বসে আছেন কেন? কোন কষ্ট হচ্ছে?" মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: "রাত এখন কত? কেন জানি না, মাঠাকরুণের জন্য মনটা কেমন করছে। তিনি কেমন আছেন কে জানে!" মহারাজকে গম্ভীর দেখলেই আমরা ভয় পেতাম। তখন আর কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হতো না। তবু তখন তাঁর মন হালকা করার জন্য বললাম: "তামাক সেজে নিয়ে আসব মহারাজ?" মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। আস্তে আস্তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সারারাত ইজিচেয়ারে ঐভাবেই বসে রইলেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—সবসময় তিনি ভোরে উঠে বেড়াতেন। এটি ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। সেদিন কিন্তু ভোরে বেড়াতে গেলেন না। একটু বেলা হতেই কলকাতা থেকে শরৎ মহারাজের টেলিগ্রাম এল—শ্রীশ্রীমা মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করেছেন। মহারাজ আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখ গভীর বেদনায় থমথম করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বললেন: "আমি হবিষ্যি করব।" তিনদিন তিনি কোন কথা বলেননি। বারদিন তিনি হবিষ্যান্ন খেয়েছিলেন, জুতো ব্যবহার করেননি। একদিন বললেন: "এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম!"

ঠাকুর বলেছিলেন: "প্রত্যেক অবতারে রাখাল লীলা-সহচর হয়ে এসেছে। ও নিত্যসিদ্ধ। ভগবানের নিত্যলীলা-সহচর। তার সম্বন্ধে মা কত কী [আমাকে] দেখিয়েছেন। তার সব কথা বলা নিষেধ আছে।" একবার একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলেরা কে কতদূর এগিয়েছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে বসেছিলেন। ওখানে মাটিতে একটা কাঠি দিয়ে প্রথমে একটা দাগ দিলেন। বললেন: "এটা এর [নিজের] অবস্থা।" ঐ দাগের নিচে আরেকটি দাগ দিলেন। প্রথম দাগের থেকে কিছুটা ছোট। বললেন: "এটা নরেন্দ্রের।" এভাবে আরও কয়েকটি দাগ দিলেন। দাগগুলি দ্বিতীয় দাগের থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট। এক-এক করে বলে গেলেন কোনটি কার—বাবুরামের, তারকের, লাটুর, শরতের, শশীর ইত্যাদি। কিন্তু মহারাজের নামে কোন দাগ দিলেন না। ভক্তটি বললেন: "আর রাখালের?" ঠাকুর হেসে সব শেষে একটি দাগ দিলেন। সে-দাগটি সব দাগের চেয়ে বড়, এমনকি প্রথম দাগটির চেয়েও। বললেন: "এটি রাখালের।" ঘটনাটি পরবর্তী কালে ভক্তটি শ্রীশ্রীমাকে বলেন। মা শুনে বলেন: "তা-ই তো! রাখাল যে ছেলে!" স্বামীজী বলতেন: "আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের সকলের চেয়ে বড়।" তাঁদের কথার অর্থ তাঁরাই জানেন, আমরা কি করে বুঝব!

বেলুড় মঠ, ভুবনেশ্বর মঠ, কাশী অদ্বৈত আশ্রম, সেবাশ্রম, কনখল সেবাশ্রম, মাদ্রাজ মঠ, বলরাম মন্দির—প্রতিটি জায়গা এযুগের মহাতীর্থ। হবেই তো! সেখানে ভগবানের মানসপুত্র বাস করেছেন, লীলা করেছেন, পদচারণা করেছেন। আর বেলুড় মঠ! শিবাবতার স্বামীজী-সহ ঠাকুরের সব পার্ষদের পদধূলিপূত—জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলিপূত। তার চেয়ে বড় তীর্থ আর কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে সেখানেই তো দেবলোক! [সমাপ্ত] ★

★ বিভিন্ন সাধুভক্তের সূত্রে প্রাপ্ত পূজ্যপাদ মহারাজজীর কথা সঙ্কলন ও গ্রন্থনা করেছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।—সম্পাদক, উদ্বোধন

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা

প্রথম পাঁচ বছরে মঠবাসিগণের দিনচর্যা বরানগর মঠের মতো শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবা-পূজাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। পূজক ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। নেহাৎ শারীরিক অসুস্থতার জন্য অপারক না হলে তিনি মাদ্রাজ যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা করেছেন। যেমন, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।[৫৮] কদাচিৎ অপর কোন মঠবাসী বিশেষ পূজাদি করেছেন। যেমন, আলমবাজার মঠে প্রথম শিবরাত্রির পূজা করেছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। পরদিন স্বামী অভেদানন্দ জনৈক ভক্তকে বলেছিলেন: "দেখেছ! লাটু কেমন শিবরাত্রি করেছে।"[৫৯] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। তিনি সাধারণতঃ নিজেই ঠাকুরঘরের যাবতীয় কাজ করতেন। কখনো স্বামী শিবানন্দ, কখনো স্বামী নির্মলানন্দ,[৬০] কখনো বা ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ (পরবর্তী কালে স্বামী বিরজানন্দ) তাঁকে সাহায্য করেছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সেবা-পূজায় যেমন ছিল নিষ্ঠাকাষ্ঠা, তেমনি ভাবগাম্ভীর্যের ওপর গুরুত্ব। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবন্তজ্ঞানে সেবা করতেন। একদিন দুদিন নয়, প্রায় এগার বছর শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা করে তিনি মঠজীবনে এবিষয়ে একটি আদর্শ-পরম্পরা সৃষ্টি করেছিলেন।

মঠ আলমবাজারে থাকাকালীন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের উৎসাহে শ্রীশ্রীঠাকুরের সিংহাসন, শয়নের খাট ও বিছানাপত্র তৈরি হয়েছিল। শ্যামবাজার স্ট্রীটের একজন কাঠের মিস্ত্রিকে দিয়ে তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে গঙ সংগৃহীত হয়েছিল।[৬১] সন্ধ্যারতির সময় বাজাবার জন্য স্বামী শিবানন্দ কাশী থেকে ডমরু যোগাড় করেছিলেন। পূজক ও সেবকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার গুণে ঠাকুরঘর ভাবে গমগম করত, সেখানে উপস্থিত যেকোন ব্যক্তিরই মনে হতো, প্রাণবন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সেবা-পূজা গ্রহণ করে প্রীত।

এবিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথার একাংশ উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন: "শশী মহারাজই তখন মঠকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সেবা দর্শনে লেখক কখনো বিস্মিত হতো, কখনো-বা মনে করত, তাঁর মাথায় একটু ছিট আছে। কারণ, এক ছিলিম তামাক সেজে জোগাতে আধঘণ্টা পর্যন্ত ঠাকুরের ছবির কাছে ধরে থাকা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে লেখকের মনে হতো। ক্রমে... সে বুঝতে পারে, সেবা ও নিষ্ঠা এরূপ ঐকান্তিকতাতেই পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার ঠাকুরঘরে আরাত্রিক দর্শনও উপভোগের জিনিস ছিল। কয়েকজন বালসন্ন্যাসী, যাঁদের সম্বল বলতে কিছুই ছিল না... তাঁরা যখন 'জয় জয় গুরুদেব' রবে মঠ ও পল্লী মুখরিত করতেন তখন লেখকের মনে হতো, এরা দেবতা—মানবাকারে, এঁদের সঙ্গ, দর্শন ও স্পর্শনে সত্য সত্যই মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সত্য সত্যই ঈশ্বরানুরাগে হৃদয় উদ্বেলিত হয়।"[৬২]

ঠাকুরের জীবিতকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁকে যেমন সেবা করতেন, তাঁর দেহের ভস্মাবশেষকেও তিনি ঠিক সেইরূপে সেবা করতেন। ঠাকুরের পুণ্য দেহাবশেষের সংরক্ষণ ও সেবাই ছিল তাঁর মুখ্য দায়দায়িত্ব। আলমবাজার মঠে তাঁর পূজা ও সন্ধ্যারতি সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত লিখেছেন: "তাঁহার পূজাপদ্ধতি অতি অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক। দর্শক স্বতই অনুভব করিতেন যে, পূজারী জীবন্ত ভগবানের জাগ্রত উপস্থিতি সন্দর্শন করিতেছেন। আরতির সময় যখন তিনি 'জয় গুরু', 'জয় গুরু' এই ধ্বনি উচ্চারণপূর্বক ঊর্ধ্বে প্রদীপ দোলাইতেন তখন যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন তাঁহারা সকলেই

৫৮ হরিমোহনকে লেখা স্বামী তুরীয়ানন্দের ৪।১।১৮৯৬ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য

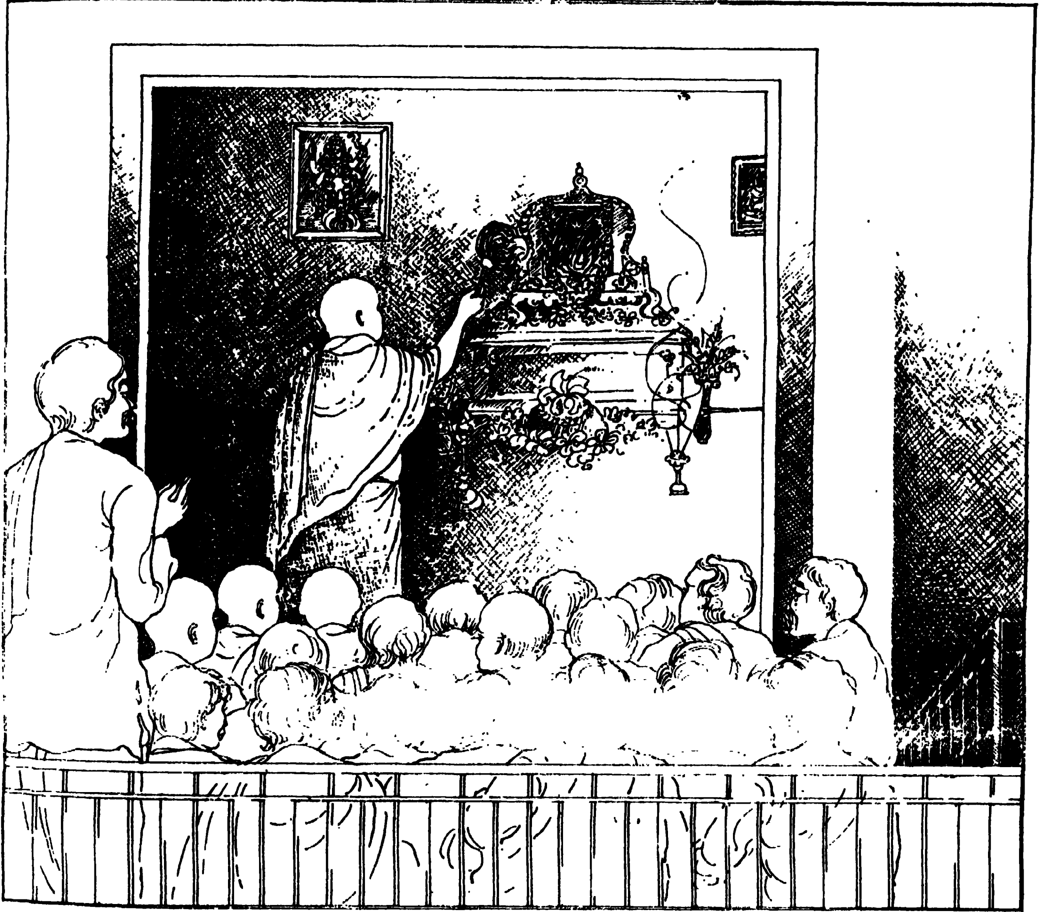
৫৯ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, ২য় সং, পৃঃ ২৯৯

৬০ আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭২

৬১ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬-৭

৬২ উদ্বোধন, ২৯ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃঃ ৩৯২

ভক্তিভাবে বিমোহিত হইতেন।"[৬৩] একদিন নিকটবর্তী এক ধনীর বাগানে পূজার ফুল তুলতে গিয়ে তিনি খুবই অপমানিত হন। মঠে ফিরে তিনি ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেন, মঠের নিজস্ব একটি জমি হোক, সেখানে তিনি নিত্যপূজার জন্য ফুলগাছ লাগাবেন। ভাগে শশী মহারাজকে ঠাকুরঘরের কাজে সাহায্য করেছিলেন। তিনি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির বাগান থেকে জুঁইফুলের ফুটন্ত কুঁড়ি তুলে এনে ঠাকুরের জন্য মোটা গোড়ের মালা গাঁথতেন এবং ঠাকুরকে পরাতেন। তাঁর লিপিবদ্ধ স্মৃতিকথাতে



আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভাবময় পূজারতি : শিল্পী : সুভাষ বোস

পূজক শশী মহারাজের একটি মনোজ্ঞ চিত্র উপহার দিয়েছেন স্বামী বিরজানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ)। কালীকৃষ্ণ আলমবাজার মঠের প্রথম ভাগে এবং শেষ রয়েছে : "আমি ঠাকুরের ঘরের ও ঠাকুরের ভাঁড়ারের সব কাজ করিতাম। শশী মহারাজ পূজা করিতেন। তাছাড়া ঠাকুরের ভোগের বাসন খিড়কির পুকুরঘাটে

৬৩ দ্রঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৫৫, পৃঃ ৮০-৮১

লইয়া যাইয়া মাজিতাম। সব মঠ ঝাঁট দিতাম, মুখ হাত পা ধোবার জল পুকুর থেকে তুলিতাম। পান সাজতুম। সুবিধা হলে তামাক সাজতুম ও রাত্রে সকলের মশারি খাটিয়ে দিতাম।... শশী মহারাজ... তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনন্য ও অভ্রান্তভাবে ঠাকুরের পূজাদি ও মঠের সকলের চটপটে ছিলেন, নিমেষের মধ্যে গাদাখানেক কাজ করতে পারতেন। তবে ধমকাতেও যেমন ভালবাসতেও তেমন। ঠাকুরের প্রসাদ বেরুলে 'খা' বলে সন্দেশ আমার মুখে গুঁজে দিতেন এবং অন্য হাতে আমার মুখে বা গায়ে হাত বুলুতেন।"[৬৪]



আলমবাজার মঠ : দোতলায় ঠাকুরঘর আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী

সেবা করিতেন। অসুরের মতো খাটিতে পারিতেন ও সর্বদাই একটা গদগদভাবে ভরপুর থাকিতেন। পূজায় কী নিষ্ঠা, ভক্তিভাব ও উন্মত্ততা ছিল! সে যে না দেখেছে ধারণা করতে পারবে না। সেবার যোগাড়ে অণুমাত্র ত্রুটি ও বিলম্ব সহ্য করিতেন না। সব কাজ prompt ও নিখুঁত হওয়া চাই। আমি তো প্রাণ ও শক্তি দিয়া ঠাকুর-ভাঁড়ারের সব কাজ যত ভাল করে পারি তার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তবুও এমন একটা দিন যেত না যেদিন তাঁর ধমকে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আড়াল করিয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে বা কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে কাজ না করে গেছি। যদিও দৌড়ে দৌড়ে কাজ করতুম তবুও একটু নিড়বিড়ে ছিলুম। আর তিনি বেজায়

ঠাকুরঘর ও শশী মহারাজ প্রসঙ্গে এক টুকরো সংবাদ পরিবেশন করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশেষ দিনে ঠাকুরকে যা ভোগ দেওয়া হতো, তা থেকে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা তিনি সন্ধ্যার পূর্বেই পাড়া-প্রতিবেশীদের বা ভক্তদের বাড়ির লোকজনদের জন্য বিতরণ করে দিতেন এবং ঘর ধুয়ে ফেলতেন।[৬৫]

শশী মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর সূক্ষ্ম শরীরে নিত্য বর্তমান; বিশেষতঃ, ঠাকুরঘরে তাঁর বিদ্যমানতা ছিল সহজেই অনুভবগম্য। এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি রামকৃষ্ণ-পূজার প্রচারে গুরুত্ব দিতেন। পূজার মন্ত্র ও পদ্ধতি তন্ত্রাদি শাস্ত্র থেকে সঙ্কলন

৬৪ স্বামী বিরজানন্দের খাতা, পৃঃ ৮০-৮৩।

৬৫ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৭৪, পৃঃ ৮৬

করে তিনি স্বহস্তে লিখে রেখে গেছেন। এই পদ্ধতিতে ভক্তি, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনের অপূর্ব কৌশল একত্রে সন্নিবিষ্ট।[৬৬]

শ্রীগুরুদেবের প্রতি মঠবাসীদের অনুপম অনুরাগ এবং গুরুভাইদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির গাঢ়তা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে। ঠাকুরের একটি বিশেষ পছন্দের ফুল ছিল নাগেশ্বর চাঁপা। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আকাঙ্ক্ষা হয়, তিনি সেই ফুল ঠাকুরকে নিবেদন করবেন। শুনতে পেয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ ফুলের সন্ধানে প্রথমে যান ঘুঘুডাঙ্গায় ডি. গুপ্তের বাগানে। তাঁরা জানতে পারেন, বর্তমান খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সরণির উত্তরে সাতপুকুরের বাগানে এ-ফুল পাওয়ার সম্ভাবনা। সেই বাগানের মালিক শ্যাম মল্লিক। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে একাই যান। মালীদের কাছে জানা যায় যে, সতের-আঠার দিন পর ফুল ফুটবে। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্কল্প—নাগেশ্বর চাঁপা ফুল না নিয়ে মঠে ফিরবেন না। এই অবসরে তিনি বারাসাত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। আঠার দিনের দিন সাতপুকুরের বাগানে গিয়ে দেখেন "সুন্দর সুবাসিত ফুলভারে নত নাগেশ্বর চাঁপার গাছটি মৃদুমন্দ ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত"। বড় একটি কলাপাতার ঠোঙায় বিস্তর ফুল নিয়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ মঠে ফিরলেন। ফুল দেখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের আনন্দ যেন আর ধরে না! প্রাণভরে ঠাকুরকে ঐ ফুল দিয়ে সাজান।[৬৭]



আলমবাজার মঠ : অন্দরমহলের ভিতরের দিক আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়োগী

ঠাকুরঘর সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ও রামকৃষ্ণানন্দজীর ধ্যানধারণার মধ্যে গুণগত বিভেদ সামান্যই ছিল; যদিও প্রচলিত ধারণা এই যে, এবিষয়ে তাঁদের অভিমত দুই মেরুতে অবস্থিত। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমার মহাভয় শশীর ঐ ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all করে সেই পুরানো ফ্যাসনের non-sense করে ফেলবার একটা tendency শশীর ভিতর আছে, আমার তাই ভয়।" তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে, "ঐ ঘণ্টাপত্র লইয়া রামকৃষ্ণ-অবতারের দল বাঁধিবে এবং তাঁহার শিক্ষায় ধূলি নিক্ষেপ হইবে।" তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন এই

৬৬ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পৃঃ ৬১৬

৬৭ দ্রঃ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১৪৩-১৪৮

বলে যে, এই মঠ কোনমতেই বাবাজীদের ঠাকুরবাড়িতে যেন পরিণত না হয়, কারণ ঠাকুরবাড়ি দ্বারা দু-চারজনের উপকার হয় বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠের দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধিত হবে। অবশ্য স্বামীজী একটি চিঠিতে স্বীকার করেছিলেন যে, শশী মহারাজ নিজে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরঘরেই তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় না করে ঠাকুরের ভাবাদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিলেন। একবার মাদ্রাজে অবস্থানকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্তব্য করেছিলেন ঃ "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মতো এদেশে জ্বলজ্বল করছে।"[৬৮]

মাদ্রাজে মঠস্থাপনের জন্য ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষভাগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যাত্রা করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন স্বামী প্রেমানন্দ। কয়েকদিন পর তিনি শশী মহারাজকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ "আমি প্রত্যুষেই স্নান করিয়া পূজাদি করিতেছি। ভাই, ঠাকুরপূজা বড় কঠিন কাজ দেখিতেছি।" ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭ তারিখে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শশী মহারাজকে লেখেন ঃ "এখানে তোমার post-এ যিনি permanent হইয়াছেন তিনি ঠাকুরসেবা বেশ সুচারুভাবে চালাইতেছেন। তবে তাঁহার শরীরটা একটু delicate। সেইজন্য তোমার মতো energetically হয় না।" অবশ্য স্বামী প্রেমানন্দের ঠাকুরপূজাও ছিল উচ্চমানের এবং ভাবগম্ভীর। তিনি কিরূপ তন্ময়চিত্তে 'শ্রীজী' বা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা করতেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী তুরীয়ানন্দ। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "মনে পড়ে মঠের একদিনের কথা। সেসময় মঠ আলমবাজারে ছিল। তুমি কথাচ্ছলে সেদিন সকল দৃষ্ট পদার্থ হইতেই প্রভুর স্মৃতি জাগরিত করিতে লাগিলে। সেদিন দেখিয়াছিলাম 'যথা যথা দৃষ্টি যায় তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে' বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। এমন বস্তুটি দেখিলে না যাহা হইতে প্রভুকে স্মরণ না করিলে। তোমার মনে আছে কিনা জানি না। আমার কিন্তু উহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ইহারই নাম তাঁহাতে 'ডাইলিউট' (মগ্ন) হইয়া যাওয়া। ঠাকুর ইহা কৃপা করিয়া দেখাইয়াছেন।"[৬৯]

অবশ্য আলমবাজার মঠে শশী মহারাজের অবর্তমানতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বিভিন্নভাবে। যেমন, সেবার অন্যান্য বছরের মতো সারারাত ধরে কালীপূজা হয়নি। স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ "কাল কালীপূজা। এবার মঠে রাত্রে গুরুপূজা হইবে স্থির হইয়াছে—নিয়মপূর্বক কালীপূজা হইয়া উঠিবে না।"[৭০] স্বামী প্রেমানন্দ পূজা ও হোম করেন। ভজন-কীর্তন, বাজি-পোড়ানো ও ৩০ জন ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসব জমজমাট হয়ে ওঠে।

ঐবছর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অন্যান্য বারের মতো পটে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ যথাক্রমে পূজক ও তন্ত্রধারকের দায়িত্ব পালন করেন। আর স্বামী তুরীয়ানন্দ নয়দিন ধরে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করেন। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ৫০ জন ভক্ত ভজন-কীর্তনে যোগদান করেন, প্রসাদধারণ করেন।

তাছাড়াও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠানাদির ছাঁটকাটও করা হয়েছিল। নীলাম্বর-বাগানে মঠ স্থানান্তরের কয়েকদিন পর স্বামীজী ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৮৯৮) মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন ঃ "আমরা পূজার কাজটাকে অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিয়াছি। তোমার 'ক্লীং-ফট্' ঝাঁজ ও ঘণ্টার যেভাবে কাটছাঁট করা হইয়াছে, তাহাতে মূর্ছা যাইবে। জন্মতিথি-পূজা শুধু দিনের বেলায় হইয়াছে এবং রাত্রে সকলে আরামে ঘুমাইয়াছে।" স্বামীজীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এপ্রিল মাসে (১৮৯৭) মাদ্রাজে শশী মহারাজকে লেখা চিঠিতে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ "পূজা-অর্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মাদ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশমাত্র যেন না থাকে।... পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সেসময়টা পাঠাদি ও লেকচার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়।"[৭১] অন্য একটি চিঠিতে তিনি শশী মহারাজকে পূজা-সেবার মূল ভাবটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন ঃ "অর্থাৎ materialism যত কম হয় এবং spirituality যত বাড়ে, এই কথা আর কি!"[৭২]

আলমবাজার মঠে পূজা-অর্চায় অনুষ্ঠানাদির সংক্ষিপ্তকরণ ও ভাবের গভীরতার ওপর স্বামীজী গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে নতুন পূজানুষ্ঠান যুক্ত হয়েছিল। মঠে সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আলমবাজার মঠে। সেদিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৭, ২ পৌষ ১৩০৪। স্বামী প্রকাশানন্দ পূজা ও হোম করেছিলেন। তন্ত্রধারক

৬৮ ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৮৮
৬৯ ২০।১১।১৯১৫ তারিখে স্বামী প্রেমানন্দকে লেখা চিঠি
৭০ ২৪।১০।১৮৯৭ তারিখে ভূষণকে লেখা চিঠি
৭১ পত্রাবলী, পৃঃ ৫২৭ ৭২ ঐ, পৃঃ ৪১৯

ছিলেন ব্রহ্মচারী বিমল।[৭৩] স্বামী যোগানন্দের উৎসাহে ও উপস্থিতিতে এই পূজানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছিল মনে হয়। দশ জন গৃহিভক্ত সেদিন প্রসাদধারণ করেছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, স্বামী বিবেকানন্দ নিজে ঠাকুরঘরে পূজা করেছিলেন কিনা? তিনি একাধিকবার পূজা করেছিলেন। একদিনের বর্ণনা পাই প্রত্যক্ষদর্শী হরিপদর (পরবর্তী কালে স্বামী বোধানন্দ) স্মৃতিচারণ থেকে। একদিন বেলা তখন সাড়ে দশটা। স্বামী প্রেমানন্দের বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী পূজা করবার জন্য ঠাকুরঘরে ঢুকে গম্ভীরভাবে পূজার আসনে গিয়ে বসলেন। আসনে বসতে না বসতেই তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি পুষ্পপাত্রের ফুল বেলপাতা ইত্যাদিতে চন্দন ছিটিয়ে দিলেন। অঞ্জলি ভরে ভরে তিনি সেই ফুল শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদিতে, পাদুকায় ও আত্মারামের কৌটায় দিলেন। তারপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট। অবশিষ্ট ফুল তিনি উপবিষ্ট গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের মস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। এই ঘটনা থেকে হরিপদর ধারণা হয়, স্বামীজী তাঁর গুরুভাই ও শিষ্যদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। পূজার পর সাধু ও ব্রহ্মচারী সকলেই স্বামীজীকে প্রণাম করেন।[৭৪]



গুরুগতপ্রাণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এই আলোকচিত্রটি সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের। স্থান: আলমবাজার মঠ

স্বামীজীর পূজাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য মনোরমভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামী শিবানন্দ। তাঁর মুখের ভাষায় সেই বর্ণনা: "তিনি তো ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রথমে আসনে বসেই অনেকক্ষণ ধ্যান লাগাতেন— খুব জোর ধ্যান। একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা বেশ ধ্যান করে তবে পূজাদি আরম্ভ করতেন। ধ্যানের দ্বারাই সব হয়ে গেল। তারপর ঠাকুরকে স্নান করিয়ে, সমস্ত ফুল চন্দন মাখিয়ে দু-হাতে নিয়ে বারবার তাঁর শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতেন। সে এক দেখবার পূজা ছিল। তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে আসতেন।"[৭৫]

স্বামীজী তাঁর নিজের জীবন ও আচরণ দিয়ে যে-ভাবাদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেটিই তিনি ভাষার বাঁধনে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন সংঘের অঙ্গগণের অনুসরণের জন্য। তিনি বলেছিলেন: "প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মূর্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন।" [ক্রমশঃ]

৭৩ স্বামীজীর নিকট ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক ১৯।১২।১৮৯৭ তারিখে প্রেরিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন।

৭৪ স্বামীজীর পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৬৮। অনুরূপ একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তিনি বলেছিলেন: "একবার লোরেনভাই ঠাকুরের তিথিপূজা করতে বসে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে দিল। শশীভাই তো পূজা দেখে অবাক হয়ে গেল। শুনেছি, লোরেনভাই ধ্যানে বসে সেদিন মানসপূজা করেছিল।"(শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, পৃঃ ২৮৭)

৭৫ শিবানন্দবাণী, ১ম ভাগ, ১৩ সং, পৃঃ ১৮৩

প্রার্থনা

দেবব্রত ঘোষ

চাই না প্রভু তোমায় আমি
সহজ করে পেতে
কঠিন হয়ে, গোপন হয়ে
থাক হৃদয়েতে।
সাধন করে ভাঙব তোমার
কঠিন কঠোরতা,
মনের আলোয় প্রকাশ পাবে
তোমার গোপনতা।
সেই তো আমার হবে বিজয়
ভাঙবে আমার সকলই ভয়।
সহজ করে পেলে তোমায়
জমবে অহং মন-আঙিনায়।
ব্যর্থ হবে তোমার লীলা
আমার এ জীবনে
কঠিন হয়ে থেকো প্রভু
মনেরই গোপনে।

তোমার আসন

বিজয়কুমার দাস

তুমি আলো দিলে, তবেই আলো
তোমার আশিসে ঘোচে সকল কালো।

তোমার জন্যে রোজ সূর্য ওঠে
তোমার জন্যে রোজ ফুল ফোটে

তুমি বাসলে ভাল, হৃদয় খুশি
তোমার কৃপায় আমার কান্না-হাসি।

তোমার জন্যে রোজ পাখির গান
তোমার জন্যে রোজ আকুল প্রাণ

তুমি জড়িয়ে আছ সকল কাজে
তোমার আসন তাই বুকের মাঝে।

ঈর্ষা

অমলকান্তি ঘোষ

না ডাকতেই যাকে সঙ্গী পেলাম
সে বলল:
'অনায়াসে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি
আশ্চর্য শহরে।'

'আমার নাম?'—
লোকটা দাঁত বের করে হেসে
আশ্বাস দিয়ে বলল—
'তোমার খুব কাছেই থাকি বরাবর।'

বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে...

যেতে যেতে
দৃশ্যের রূপ গেল বদলে
যাকিছু ছিল আমার
হাসতে হাসতে কেড়ে নিতে থাকল
সেই মুখোশ-খোলা তস্কর

পালাবার আগে গলা নিচু করে বলে গেল—
'তোমার খুব কাছেই থাকব বরাবর,
আমার নাম ঈর্ষা।'

উজান বয়ে যায়

রমেশ মুখোপাধ্যায়

জীবননদীর অপর পারে কে কে যাবি আয়,
চাস যদি কেউ পার হতে ভাই
(তবে) তরণীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শক্ত করে হালটি ধরে
আঁধার বুকে চেপে বসা চাই।
নদীর ঐ কুলকুলে ভয় না করে
যেতে হবে অপর পারে
যাবি যদি আয়
উজান বয়ে যায়।

অন্ধকারে একা

দীপালি সেনগুপ্তা

মাগো তুমি তখন আমায়
দাওনি কেন দেখা
যখন আমি ব্রহ্মমাঝে
ঘুরতেছিলেম একা?
জানি না কোন্ পাহাড়চূড়ায়,
কোন্ সে মধুর স্বপ্নমায়ার
পাহাড়ী বাপমায়ের কোলে
জন্মেছিলেম কবে!
সেথায়, দিন কেটেছে হেসেখেলে,
মানুষ ছিলেম যবে।
আবার কখন দিন ফুরোলে,
আঁধার পথে ফিরতেছিলেম একা
তখন তুমি কেন মাগো
দাওনি আমায় দেখা?
জানি না কোন্ সাগরমাঝে
সাগরকন্যা সাজে,
আপনমনে খেলতেছিলেম
অতল জলের মাঝে।
আবার কখন খেলার শেষে
ব্রহ্মাণ্ডের স্তরে স্তরে
পথ চলেছি অশরীরী একা।
তখন তুমি কেন মাগো
দাওনি আমায় দেখা?
এই ধরণীর পথের ধারে
ঠিক জানা নেই জন্মেছিলাম
কোন্ সে প্রাণীর ঘরে!
জনম মরণ দুয়ের খেলা
বিধির বিধান মেনেই চলা,
কর্মফলের কুম্ভীপাকে
শুধুই ঘুরে চলা।
মাগো তুমি তখন আমায়
দাওনি কেন দেখা,
অমোর ঘোরে যখন আমি
ঘুরতেছিলেম একা?
তোমার পূজার মন্ত্র আমার
হয়নি যে গো বলা,
হয়নি তোমার চরণতলে
ভক্তির ফুল ঢালা।
আকুল পরাণ তোমায় খোঁজে
কোথায় পাব দেখা,
বিশ্বমাঝে আর কতকাল
থাকব মাগো একা?
হাজার বছর আঁধার ঘরে
হঠাৎ আলোর ঝলক পড়ে
আঁধার ঘুচায় যেমন
তেমনি করে হঠাৎ আজি
পড়লে মনে এখন!
মাগো আমার শেষকথাটি
যাও গো তুমি শুনে
কবে আমার ঘুচবে বাঁধন
মুক্তি পাব কবে?
কবে তোমার চরণতলে
এই 'আমি' লয় হবে?
মা সারদা সরস্বতী,
হৃদে জ্বালাও জ্ঞানের জ্যোতি,
(আমার) অন্ধকারে পথ চলাতে
দাও টেনে দাও যতি!

☆☆☆

হৃদয়

নিমাই ঘোষ

এক একজন প্রেমিকের হৃদয় এক এক রকম।
এক একজন এক এক রকম ভাবে
ভালবাসতে চায়
বাগিচার মালি ফুল খুঁজে বেড়ায়,
এক একজন সুরকার এক এক রকম
সুরের জন্য ব্যাকুল হয়
ঘাতক অস্ত্রহাতে হত্যার জন্য ঘুরে বেড়ায়।
এক একজনের এক এক রকমের ভালবাসা,
কারোর কারোর ভালবাসা শরীরের মধ্যে—
হৃদয়ে নয়।
ভক্তের হৃদয় দেবতার মন্দিরে
দেববিগ্রহকে দেখে তৃপ্ত হয়।

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]



পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের (শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল বংশের) তিনি জীবিত প্রবীণতম উত্তরসূরী। তাঁর প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহ নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর মাতামহ অর্থাৎ চন্দ্রমণি দেবীর পিতা।

অভ্রান্ত তথ্য দিলেন দেওঘরের নিকটবর্তী কুণ্ডা-নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল বংশের জীবিত অধস্তন প্রবীণতম সদস্য অকৃতদার পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ "ঠাকুরের মাতুল বংশের আমিই জীবিত প্রবীণতম অধস্তন পুরুষ। ম্যালেরিয়া এবং মুণ্ডেশ্বরীর বন্যার জন্য আমার বাবা রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কাকা হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে সারাটী থেকে চারের দশকে এখানে অর্থাৎ কুণ্ডায় চলে আসেন। কুণ্ডার কুণ্ডেশ্বরী বা জগদ্ধাত্রী মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন আমার বাবা। বছর তিরিশ আগে কাশী থেকে রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহারাজ [স্বামী ঈশানানন্দ] এসেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত; তাঁর পূর্বাশ্রমও জয়রামবাটীর কাছেই। সেই মহারাজের সঙ্গে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীও ছিলেন। তিনি কুণ্ডেশ্বরী-মন্দির দর্শনে এসেছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'এঁরা ঠাকুরের মাতুলকুলের বংশধর।' তিনি আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করেছিলেন।"৩০

সরকারি নথিও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। বিশ শতকের আগে জমির খতিয়ান ও দাগ নম্বর-ভিত্তিক মালিকানা ব্যবস্থা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জোরে নির্দিষ্ট খাজনা সাপেক্ষে জমিদার ও পত্তনীদারের দখলী স্বত্বই প্রযোজ্য ছিল। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অধিনিয়ম (Bengal Tenancy Act VIII of 1885) চালু হলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় সমস্ত কৃষি ও অকৃষি জমির জরিপ হয় এবং সেইসঙ্গে মালিকানা-ভিত্তিক ভূমির দাগ ও খতিয়ান নম্বর আরোপ হয়। দাগবণ্টনে ভিটা বা বাস্তু (বসতবাটী), শালি (কৃষিজমি), ডোবা বা পুকুর (জলাশয়), জঙ্গল (অরণ্যভূমি) ইত্যাদি নামে দাগের বিবরণ বর্ণিত হয়।৩১ ১৮৮৫ সালের আইনভিত্তিক প্রজার ভূমির মালিকানা চিহ্নিতকরণের বক্তব্য ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এইভাবে বর্ণিত ঃ "The Bengal Tenancy Act of 1885 legislated for the first time not only in favour of the permanent tenants but other classes

---

৩০ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে দেওঘরের নিকটবর্তী কুণ্ডার বাসিন্দা। তাঁর বাবা রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ('জীবনসংগ্রাম', 'মানবচিত্র', 'সংসারচিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক) সারাটী থেকে কুণ্ডায় সপরিবারে উঠে গিয়েছিলেন এই শতাব্দীর চারের দশকে। পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ—১২ বৈশাখ ১৩২৫ (বুদ্ধপূর্ণিমা তিথি)। বর্তমানে বয়স ৭৮ বছর।

৩১ পশ্চিমবাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব—তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃঃ ৩২-৬৩



দেওঘরের নিকটস্থ কুণ্ডায় সারাটীর রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কুণ্ডেশ্বরী-মন্দির। এখানে সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উত্তরসূরীদের পরিচালনায় দেবী কুণ্ডেশ্বরী (জগদ্ধাত্রী) আজও পূজিত হচ্ছেন।

of cultivators and share-croppers."৩২ হুগলী জেলায় এই জরিপের কাজ শুরু হয় বিশ শতকের প্রথমেই এবং তা মুদ্রিতরূপে প্রকাশ হয় ১৯৩৬ সালে।

প্রথম জরিপের সরকারি নথি অনুযায়ী সারাটী মৌজার (জে. এল. নং ৮৩) খতিয়ান গ্রন্থে বাস্তু (ভিটা) সম্বলিত [যাঁরা এই গ্রামের স্থায়ী ও প্রাচীন বাসিন্দা] ব্রাহ্মণ-পরিবারবর্গের গৃহকর্তার নামের তালিকায়৩৩ লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চক্রবর্তী পদবীধারী। ঐ গ্রন্থে বাস্তুভূমি-সংশ্লিষ্ট অপর কোন ব্রাহ্মণ পদবীর উল্লেখ নেই। লক্ষ্য করা যায়, পূজনীয় স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী বর্ণিত ভূমিখণ্ডটি (যেখানে প্রস্তরফলক প্রোথিত ছিল। সংশ্লিষ্ট বাস্তুভিটা ও ভগ্ন প্রস্তরফলকের আলোকচিত্র গত সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে।) ঐ তালিকায় বর্তমান এবং ঐ ভূমিটি বাস্তুভূমি (ভিটা)। তার খতিয়ান নম্বর ২১২, দাগ নম্বর ১৩৯, পরিমাণ ৫২ শতক, স্বত্বাধিকারিগণ হলেন হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফকির বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঐ ভূমিখণ্ড বর্ধমান-মহারাজের নিকট থেকে নিষ্কর শর্তে প্রাপ্ত।

ভূমির এই পরিচিতি ব্যক্ত করে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই গ্রামের স্থায়ী ও প্রাচীন বাসিন্দা। এযাবৎ সন্নিবিষ্ট তথ্যের আলোকে সারাটী গ্রামের 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বংশের ঐ পতিত বাস্তু-ভূমিটিই (জে. এল. নং ৮৩, খতিয়ান নং ২১২,

৩২ Gazetteer of India: West bengal: Hooghly—Amiya Kumar Banerjee, 1972, p. 450

৩৩ Bengal Tenancy Act VIII of 1885; Finally Published Record: Settlement Record of Burdwan, Hooghly, Howrah, 1936. Mouza—Sarati (J. L. No. 83), pp. 1-230

[এই খতিয়ান-গ্রন্থে যেসমস্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারবর্গের ভূমি-দাগের সঙ্গে ভিটা/বাস্তু সংশ্লিষ্ট আছে তাঁদের তালিকা প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	পিতার নাম	নিবাস	খতিয়ান নং
(১)	ললিতমোহন চক্রবর্তী	রাজকুমার চক্রবর্তী	সারাটী	১০৬
(২)	ফণীন্দ্র চক্রবর্তী	নবকুমার চক্রবর্তী	বর্তমানে শ্রীরামপুর	১১২
(৩)	পঞ্চানন চক্রবর্তী	যতীন্দ্র চক্রবর্তী	ঐ	১১২
(৪)	হরিপদ চক্রবর্তী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তী	যথাক্রমে শীতল চক্রবর্তী ও নবকুমার চক্রবর্তী	সারাটী	১১৩
(৫)	হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ফকির বন্দ্যোপাধ্যায়	যথাক্রমে রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	সারাটী	২১২

এই তালিকা দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এই গ্রামের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত পরিবার।]

দাগ নং ১৩৯) যে চন্দ্রমণি দেবীর পৈত্রিক বাসস্থান ও ঠাকুরের মাতুলালয় সেবিষয়ে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহ।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এত নৈকট্যের মধ্যেও কেন এত ব্যবধান? শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলনমুখর উনিশ ও বিশ শতকের দীর্ঘ সময়েও সেই বিস্মৃত অধ্যায় উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়নি। হয়তো ঠাকুরেরও অভিপ্রেত সেটাই।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে স্বাভাবিক কৌতূহল আসে যে, ঠাকুরের মাতুল বংশের কেউ কেন যোগাযোগ করলেন না রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে?

এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় দেড়শ বছর পিছনে। অনুসন্ধান করে দেখতে হবে কোন্ জটিলতর অধ্যায় সেখানে উপস্থিত হয়েছিল, যেকারণে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল বংশের এই কঠোর নীরবতা!

সমকালীন হিন্দুসমাজে জাতিভেদ সংস্কার বড়ই মর্মন্তুদ ছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণের ঘরে খাদ্য গ্রহণ করতেন না, অব্রাহ্মণদের ছোঁয়াছুঁয়ি থেকে যতটা সম্ভব নিজেদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতেন। ব্রাহ্মণের বাড়িতে শূদ্রের প্রবেশ ছিল অসম্ভব। ব্রাহ্মণের পূজার্চনায় তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সমকালীন সমাজে কোন ব্রাহ্মণ এজাতীয় সমাজবহির্ভূত কাজ করলে তাঁকে সমাজপতিরা একঘরে করতেন অর্থাৎ জাতিচ্যুত হওয়াই ছিল তাঁর অনিবার্য ভবিতব্য।[৩৪]

এহেন জাতিকৌলীন্যের এক ভুলবোঝাবুঝি রামকুমার-গদাধর ও তাঁদের মাতুলকুলের মাঝে গড়ে তুলেছিল ব্যবধানের প্রাচীর। বস্তুতঃ, সেটি ছিল এক 'আদর্শ'-এর সংঘাত। এবিষয়ে একটি সাক্ষাৎকারে আলোকপাত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল বংশের জীবিত প্রবীণতম বংশধর পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ

"সময় ১৮৫৫ সাল। রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণের সন্ধানে নানা স্থানে লোক পাঠিয়েছেন। ঠিক সেই সময় পণ্ডিতপ্রবর শাস্ত্রজ্ঞ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তীর্থভ্রমণ সেরে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হয়েছেন মন্দিরদর্শনের কৌতূহলে। রানী রাসমণি ভক্তিগদগদ চিত্তে অভ্যর্থনা জানালেন—আভূমিপ্রণতঃ হয়ে প্রণাম নিবেদন করে কাতর আবেদন জানালেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য। কৃষ্ণমোহন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। সমাজকুলতিলক। তাঁর পক্ষে শূদ্রাণীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব? তিনি তাঁর অসম্মতির কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন। রানী রাসমণি পুনরায় আবেদন জানালেন। রানীর কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণমোহন জানালেন, মন্দিরে প্রবেশ করতে তিনি পারেন না। তবে রানীমার প্রার্থনায় অভিভূত হয়ে তিনি মন্দির-চত্বর সংলগ্ন গঙ্গাতীরে গীতাপাঠে সম্মত হন। তিনি সেদিন গীতাপাঠ করেও ছিলেন। রানী রাসমণি প্রণামীস্বরূপ তাঁকে মোহর, মুদ্রা, বস্ত্র ও আরও উপঢৌকন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন কোন কিছুই গ্রহণ করেননি; তিনি কেবল গঙ্গাজল পান করে সেদিন গীতাপাঠকর্ম সম্পাদন করে সারাটীতে ফিরেছিলেন।

এদিকে বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রমে রানী রাসমণি রামকুমারের সম্মতি পেয়েছেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার। সে-সংবাদ কৃষ্ণমোহনের নিকট পৌঁছাতে বিলম্ব হলো না। তিনি কামারপুকুরে ভগিনীর বাড়িতে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁর ভাগিনেয় (রামকুমার) যেন কোন শর্তেই শূদ্রাণীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত না হয়। হলে তাদের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু রামকুমার রানীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখান থেকে তিনি আর ফিরতে পারবেন না। সেকথা তিনি মাতুলকে জানিয়ে দিলেন। কথা কানে হাঁটে। সারাটীর ব্রাহ্মণ-সমাজে সে-সংবাদ প্রচার হতে বিলম্ব হলো না। সমাজপতিরা কৃষ্ণমোহনকে জানালেন যে, তাঁর ভাগিনেয় রামকুমার অর্থের প্রলোভনে শূদ্রগৃহে পৌরোহিত্যে ব্রতী হতে চলেছে। এই সংবাদ কৃষ্ণমোহনের হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ করল। তিনি আর অপেক্ষা না করে ঝামাপুকুরে ভাগিনেয়র নিকট হাজির হলেন রটনাবাক্যের সত্যতা যাচাই করতে। ভাগিনেয়কে প্রশ্ন করলেন—'তুমি কি রাসমণির মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতে চলেছ?' রামকুমারের সহজ উত্তর, 'হ্যাঁ'।

কৃষ্ণমোহন—তোমার এই সিদ্ধান্তের পরিণতি কি জান?

রামকুমার—আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ব্যাপারটি একটু বুঝুন। এর কি কোন বিধান শাস্ত্রে নেই?

কৃষ্ণমোহন—এ প্রশ্ন অবান্তর। তুমি এখনো সিদ্ধান্ত

৩৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৮

পরিবর্তন কর।

রামকুমার—মাপ করবেন। আমার পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া সম্ভব হবে না। আমি কথা দিয়েছি।

কৃষ্ণমোহন—ঠিক আছে। আর কখনো মাতুলকুলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করলাম।

"জাত্যভিমানী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন সমাজপ্রভাবে স্নেহের ভগিনী ও ভাগিনেয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। কিন্তু মনোকষ্ট শরীরপীড়াকে টেনে আনল। সেই কষ্ট ও অভিমানেই শেষপর্যন্ত তিনি ধরাধাম ত্যাগ করলেন।

প্রসঙ্গতঃ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ সারাটী থেকে বেশি দূর নয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি অবশ্য বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে ছিলেন প্রবীণতর। ঈশ্বরচন্দ্র 'বিধবা-বিবাহ' সংশ্লিষ্ট আন্দোলনকালে বীরসিংহের নিকটবর্তী গ্রামগুলি থেকে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সারাটী এসেছিলেন। তিনি সেবার কৃষ্ণমোহনের গৃহেও এসেছিলেন। অবশ্য তার আগেও তিনি কয়েকবার কৃষ্ণমোহনের গৃহে এসেছেন। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল ভীষণ। কৃষ্ণমোহন স্বীয় সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়—এই ছিল তাঁর অভিমত।[৩৫]

ইতিহাসের এ বড় পরিহাস! কোন্ ছিদ্রপথে ধর্মাত্মক অভিমান গড়ে তুলেছিল ঘরের মধ্যেই ঘর, একই আঙিনায় বিচ্ছেদের প্রাচীর—যা শতবর্ষ অতিক্রমেও অপসৃত হতে কত কুণ্ঠা, কত দ্বিধা! [ক্রমশঃ]

৩৫ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃত বিবরণ

কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর কয়েকটি নতুন গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

ত্রিপুরা ☐ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
আসাম ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
গুজরাট ☐ সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী, আমেদাবাদ-৩৮০০০৫

পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা

বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল
১৩১, মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস,
কলকাতা-৭০০০৩৯

মলয় ভৌমিক
৪/১, বেনেপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০১৪

মিডিয়া সেন্টার
১/১০, কমার্সিয়াল কমপ্লেক্স
৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কলকাতা-৭০০০৩৪

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ
সংঘ মন্দির
১১, তারামণিঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি
কলকাতা-৭০০০৪১

হাওড়া

গোবিন্দলাল চ্যাটার্জী
প্রযত্নে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
৪, নস্কর পাড়া লেন, হাওড়া-১

বর্ধমান

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১

নদীয়া

বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন
চাকদহ, জেলা : নদীয়া, পিন-৭৪১২২২

হুগলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সংঘ
গ্রাঃ+পোঃ পুইনান
জেলা : হুগলী, পিন-৭১২৩০৫

তপন চট্টোপাধ্যায়
পুরোহিত
হংসেশ্বরী-মন্দির, বাঁশবেড়িয়া, পিন-৭১২৫০২

মোহিতকুমার বর্মণ
সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, হুগলী
পিন-৭১২৪০৯

"নিজেরে হারায়ে খুঁজি"

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দুঃসহ পরিবেশ-দূষণে ক্লান্তক্লিষ্ট, একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মনন-চিন্তন পুরু প্রলেপে ঢাকা, সৃজনশীলতায় বিমুখ বিষণ্ণ মন, ধর্মের নামে ছলনা-প্রতারণা, দেশসেবকের মুখোশের আড়ালে আত্মসেবায় আত্মোৎসর্গিত মানুষের ছড়াছড়ি, পৃথিবী গভীরতর অসুখে মুহ্যমান, বিপন্ন বিবেক। শান্তি পেতে মন খুঁজে ফেরে শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, যার বিশালতায় ও ক্ষণিকের সান্নিধ্যে মন-শরীর শীতল হয়ে যায়, জাগে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের শক্তি ও সঙ্কল্প। সেই পরশপাথরের খোঁজে ফিরি আমরা।

বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ গিরিরাজ হিমালয়। তাই ঘর করিনু বাহির, পথ করিনু গিরিরাজমুখী। সংরক্ষিত আসন ব্যতীত ট্রেনে দূরভ্রমণ অসম্ভব। আমার বন্ধু অরিন্দম আমার অতি প্রিয়। আমার চেয়ে বেশি সাহসী, কম আয়েসী, সেবাপরায়ণ। তারই ব্যবস্থায় আসন সংরক্ষণ পাকা হয়ে গেল।

১৯৯৫-এর ১৮ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত সময়ে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছাই। কালকা মেলে নির্ধারিত আসনে গুছিয়ে বসলাম। মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের ব্যাঙ্ককর্মচারী গোপাল চ্যাটার্জী আমাদেরই কামরায় বৃদ্ধা মা-সহ সপরিবারে চলেছেন স্থানীয় ট্র্যাভেল এজেন্সীর মাধ্যমে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, হরিদ্বার ভ্রমণে। আলাপ হলো। ভাল লাগল।

অরিন্দমের দ্রুত পরিবর্তন দেখে আমি তো থ। গাড়ির চাকা বিহারের মাটি স্পর্শ করতেই ভাল হিন্দী জানার সুবাদে সে পুরোপুরি হিন্দুস্তানী হয়ে গেল। আমার সহজ সরল মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্রভাষাতেই শুনতে হচ্ছে।

কালকা মেল বিহার পার হয়ে মোগলসরাইয়ে নির্দিষ্ট বিরতির পর বারাণসীকে ডানপাশে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে প্রয়াগের পথে। সবে স্নিগ্ধ সকাল। পবিত্র প্রত্যুষে কামরার এককোণে আপন মনে গীতা পাঠ করে চলেছেন একজন যাত্রী। আমরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যেই।

এলাহাবাদ, কানপুর পিছনে ফেলে সূর্যের সঙ্গে ছুটে চলেছি পশ্চিমে। অতি বর্ষণে যমুনার জল নাকি পুরনো সেতুর উচ্চতাকে ছুঁই ছুঁই করছে। সংবাদপত্র, বেতার ও দূরদর্শন প্লাবনের সংবাদে পূর্ণ। বহু ট্রেন হচ্ছে বাতিল, অনেকের পথ হচ্ছে বদল, নব নব গুজবের হচ্ছে জন্মলাভ। পরিবার-পরিজন-সহ ভ্রমণবিলাসীরা বিচলিত। কিন্তু ঘুরপথে যাত্রায় পূর্বস্থিরিকৃত মানচিত্রের বাইরে দর্শনীয় বস্তুর সংযোজনে আমরা আনন্দিত। সামনের দুটি বার্থে এক দাদা-বৌদি সিমলা হয়ে চলেছেন কুলু-মানালীর পথে। নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন প্রায় পুরোটা পথ।

কালকা মেল ছুটছে টাইম টেবিলের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনেই। বহু-প্রচারিত পুরনো যমুনাসেতু সামনেই ডুবুডুবু। তাই বাইপাশের ব্যবস্থা। দেরি হলো মাত্র ঘণ্টা খানেক। নতুন দিল্লী স্টেশন হয়ে পুরনো দিল্লী এসে থামাতে বিরক্তিকর অপেক্ষার সময় হলো হ্রাস। ফলে লাভেই চলেছি।

রাজধানী ছেড়ে ট্রেন চলেছে উত্তরে। রাত্রে খাওয়ার পর্ব শেষ করে সুবোধ বালকের মতো দুই বন্ধু নিজ নিজ সংরক্ষিত বার্থে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসছিল না। ভাবছিলাম, আমরা খেলাম এখন ঘুমোব। কিন্তু বিনিদ্র চোখে রেলকর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছি। সুকান্তর 'রানার' কবিতার রানারের কথা মনে পড়ছিল। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। গাড়ির একটানা সুর আর দোলনে নিজের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখলাম আকাশে সূর্যোদয়ের আভাস। ট্রেনটি দীর্ঘপথ পরিক্রমায় যেন পরিশ্রান্ত, তাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সশব্দে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আমাদের ছোটাছুটি, কুলির কোলাহল, হকারদের গুরুগম্ভীর আহ্বান কালকা স্টেশনটিকে মুখরিত করে রেখেছে। আমরা ছুটে গিয়ে টয়ট্রেনের দুটি জানলা দখল করে বসি। অরিন্দম দুটি সিমলার টিকিট নিয়ে এসেছে। পাশের সহযাত্রীটি সিমলার বাসিন্দা, বৃদ্ধ। সিমলার মাটিতে যখন পা রাখি তখন দুপুর বারটা। ভদ্রলোক সোজা পথে ওপরে নিয়ে গিয়ে লোক্যাল বাসে উঠিয়ে লক্কড়বাজার বাস ডিপোতে পৌঁছে দিলেন। সময় ও অর্থের সাশ্রয় হলো। ভদ্রলোকের আন্তরিকতা, সাহায্যের মানসিকতা আমাদের মতো বঙ্গবাসীদের মাথা হেঁট করে দেয়। বাসে লক্কড়বাজার থেকে এগিয়ে চলেছি কিন্নরের পথে। ছোট ধস পেরিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন নারকাণ্ডাতে পৌঁছে পাতলা জ্যাকেট গায়ে দিতেই আরাম বোধ করি। পি. ডব্লিউ. ফরেস্ট হাউসে ঠাঁই নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বাড়বে তাই ভাবনা বাড়ছে। হোটেল 'স্নো ভিউ'তে রাতে আশ্রয় নিই।

চারিদিকে কুয়াশা দিয়ে প্রকৃতির নিজের সৌন্দর্যকে আড়াল করার চেষ্টা। পাশের পাহাড়ী গ্রামগুলিতে আলো টিমটিম করে জ্বলছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাকি এখানেই ঐশ্বরিক উপলব্ধি হয়েছিল।

সকালে একটা ধাবায় খেয়ে ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হলো। রামপুরে ধস নেমে পথ আগলেছে। কিন্তু স্থানীয় লোকের তৎপরতায় পথ পরিষ্কার হলো। মাঝে মাঝে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছেন। বুশাহারের মহারাজ বীরভদ্র সিং এখন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ওঁদের পুরনো রাজধানী রামপুর, তাই রাজধানীর ছাপ সর্বাঙ্গে। পাশে খরস্রোতা শতদ্রু, স্থানীয় মানুষের আদরের 'সাটলুজ'। সরকারি অতিথিশালায় নদীর দিকের দুই শয্যাবিশিষ্ট একটি কক্ষ পেলাম। বর্ষার পরে সবুজের প্লাবন চারিদিকে। খরস্রোতার ঝরঝর, ছলাৎ ছলাৎ শব্দে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছিল। গরম জলের ব্যবস্থা-সহ সমস্ত ব্যবস্থাই এখানে আছে। কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা নেই। বহু কষ্টে খাবার মিলল, কিন্তু অত্যন্ত নিম্নমানের। অবশ্য খিদের জ্বালায় তাতেই পরম তৃপ্তি লাভ করি। বিকেলে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে দেখা করি রাজপ্রাসাদে। রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত, স্থানীয় উৎসব সম্বন্ধে জেনে শহর দেখতে যাই। পথে কিন্নরের বাস-বন্ধের বার্তা বাতাসে ভেসে আসে। তবে টাপরী পর্যন্ত এগনো যাবে।

পরদিন অতি প্রত্যুষের প্রথম বাসে টাপরী রওনা হই। হিমালয়ের অপূর্ব সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে থাকব যে তার উপায় নেই। বাস প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকুনি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে, 'তুমি আছ, আমি আছি'। জিওরী, ঝাকরী পিছনে ফেলে টাপরী যখন পৌঁছাই তখন সূর্য আকাশের ঠিক মাঝখানে। সবুজ টুপি পরা কিন্নর-কিন্নরীর ভিড়। খরস্রোতা শতদ্রু মানুষের তৈরি পথের রেখাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। কেবল একটি ক্ষীণ রেখা অতীতের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতে মাটি কামড়ে পড়ে আছে। তাই মালপত্র বয়ে চলি পরবর্তী বাস স্ট্যান্ড। পথে আপেলের ছড়াছড়ি। পেটিভর্তি হয়ে লরিতে চড়ে দেশে-বিদেশে চলেছে। ধসের জন্য যাত্রা মাঝেমাঝেই স্তব্ধ হচ্ছে। বাস বন্ধ। আর এগনো আপাততঃ বন্ধ। অরিন্দম সিমলা ফিরে হাজার মানুষের সঙ্গে চিরপরিচিত কুলু-মানালী যেতে চাইল। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়িয়ে হিন্দী জানার সুবাদে অল্পক্ষণের মধ্যে সে শুভ সংবাদ আনল। মিনিবাস! মিনিবাস চলেছে কিন্নরের প্রধান শহর রী-কোং-পিও পর্যন্ত। কিন্তু এত ভিড় যে, পাদানীতেও পা রাখা গেল না। আমাদের পিছনে রেখে সশব্দে বাস চলে গেল। এবার শুধুই প্রতীক্ষার পালা। পরে অবশ্য একটি বাসে বসার জায়গা পেলাম। কারছম, পোয়ারী পার হয়ে



শতদ্রু নদী

রাজধানী। সমস্ত পথই সুন্দর। ডেপুটি কমিশনারের অনুমতিতে রী-কোং-পিওতে থাকার ব্যবস্থা হলো সরকারি অতিথিশালা 'কল্পা'য়। চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্বতমালা। পথিপার্শ্বে আপেলের বাগিচা। ছোট-বড় নানা ধরনের ঝুলন্ত আপেল গাছে গাছে। দেখে একটা অদ্ভুত আনন্দ হলো। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কারে সাহায্য করা পতনশীল আপেলের দর্শন কখনো করিনি। আজ স্বচক্ষে দেখলাম ধরাশায়ী অজস্র আপেল। ভরপেট আপেল খেয়ে চিনিগাঁও-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। কিছুটা হেঁটে এসে পাহাড়ী গ্রামগুলি দেখছি। আঁকাবাঁকা পথ উঠে আসছে যেন আমন্ত্রণ জানাতে। সবকিছু মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। বিভোর হয়ে আছি দুজনে রাস্তার বাঁকে গাছের ছায়ায়। হঠাৎ স্থানীয় বাসিন্দা অমর সিং নেগী আমাদের সামনে এসে হাজির। বেশ সহৃদয় আলাপী মানুষ। হঠাৎ একটা বাড়ি থেকে কেউ বলে উঠলেন ঃ "ইয়ে মেরা মকান হ্যায়, আইয়ে, জেরাসা চায় পীক যাইয়েগা।" দ্বিতীয়বার বলার দরকার হলো না। সুন্দর প্রশস্ত বাড়ি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নিচে গোয়াল। ওঁরা থাকেন ওপরে। কিন্তু গবাদি পশুগুলির সারা দেহে আদরের ছাপ। একই কম্পাউন্ডে ওঁর ভাইয়ের বাড়ি। সমস্ত বাগান আপেল, আঙুর আর বেমিরে ভর্তি। ওঁর স্ত্রী আলাপ করলেন আপেল আর বেমির খেতে দিয়ে। কলকাতার অনেক গল্প হলো। মেট্রো রেলের কথা শুনে দেখতে আসার আগ্রহ দেখালেন তাঁরা। আমাদের অতিথি হওয়ার নিমন্ত্রণ জানালাম। পরে রাস্তায় খাওয়ার জন্য কিছু আপেল, আঙুর আর বেমির দিলেন পরমাত্মীয়ের মতো। ওখানে সোনালী ও লাল দুই ধরনের আপেলের প্রাচুর্য। লাল রঙের আপেলগুলি নানা প্রজাতির। রঙ ও আকার বিভিন্ন। ধীরে ধীরে চিনিগাঁও-এর মধ্য দিয়ে হাঁটছি। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। একটু উঁচুতে একটি বুদ্ধমন্দির। পাশে নারায়ণজীর মন্দির। সহাবস্থান—নাকি প্রতিযোগিতার চিহ্ন! জুতো অচ্ছুৎ নয়। খুশি হই। মন্দির-চাতালে হাঁটা সহজ হলো। গ্রামের শেষপ্রান্তে একজন চিকিৎসক বসেন। টুকটাক ওষুধও পাওয়া যায়। ব্যাধিও কম তাই আধিও অল্প। বাসায় ফিরে দেখি, সূর্যদেব তখনো আকাশে বিদ্যমান। তাই পাশের একটা পাড়ায় বেড়াতে যাই। নিচের দিকে একটি গ্রামের নাম শুনলাম দূরীগাঁও।



হিমালয় ঃ বাসপা অতিথিশালার জানলা থেকে

রাত্রিতে আহার ও বিশ্রামের পর পরদিন সকালে জলে হাত দিতে গিয়ে ঠাণ্ডা টের পাই। বরফঠাণ্ডা জল। হাতের চেটোগুলো ব্যথায় টনটন করছে। সকালে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ১৮ কিলোমিটার দূরের রোঘীগাঁও-এর উদ্দেশে। আগে বাস যাতায়াত করত। এখন রাস্তা খারাপ, তাই বাস

চলে না। রোঘীগাঁও-এর দিকে কিছুটা এগলেই হিমালয়ের আরেকটি বিস্তৃত অঞ্চল চোখে পড়ে। দূরে অনেক নিচে চুলের মতো সরু সাটলুজ হিমালয়ের বরফাবৃত মস্তক থেকে যেন নেমেছে। সারি সারি গাছে ঢাকা আলোছায়ায় আলপনা আঁকা রাস্তা, পাশে খাড়া পাহাড়। দেখে অভূতপূর্ব আনন্দ, অদ্ভুত অনুভূতি। রোঘীগাঁও দেখে মনে হলো চিনিগাঁও-এর মতো সমৃদ্ধ নয়। আপেল, আঙুর, বেমিরের ক্ষেত জীবিকায় সহায়তা করে। একটি প্রাইমারী স্কুল ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব পালনে রত। অধিবাসীদের ব্যবহারও আন্তরিক। একাধিক বাড়ি থেকে চা-পানের নিমন্ত্রণ এল। সাদা ছাগলের পাল সাদা বরফের প্রেক্ষাপটে একাকার। একটি কুকুর ওদের রক্ষক, পথপ্রদর্শক। অদ্ভুত লাগল। চিনিগাঁও ফিরতে বেলা তিনটে বাজল।

পরদিন প্রিয়জনের বিচ্ছেদের ব্যথা বুকে নিয়েই ছাড়তে হলো চিনিগাঁও। সহজেই গ্রামবাসীরা আপন করে নিয়েছিল। সাংলার পথে যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ ধরে গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রী-কোং-পিওর পথে টাপরীর রাস্তা খোলেনি। তেলের সঙ্কটে বাস কম। দুজন বাঙালী ট্রেকারের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁদের কষ্টসাধ্য পথ-পরিক্রমার বর্ণনা আমাদের উদ্দীপ্ত করল। বাসের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি এমন সময় বাস এল। গিয়ে দেখি দাঁড়ানোর মাত্র স্থান আছে। অরিন্দম দীর্ঘদেহী। ছোটবাসের ছাদে ওর মাথা শক্তভাবে ঠেকে গেছে। দুপুর দেড়টায় ছেড়ে কারছমে এসে বসতে পেলাম। এখানেই শতদ্রু-বাসপার সঙ্গম। বাস বাসপার তীর ধরে চলেছে। খারাপ রাস্তার প্রবল প্রতিবাদ, ঝাঁকুনি বাসের গতিকে সংযত করতে পারেনি। একটা ছোট লরি চোখ রাঙিয়ে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে পেরিয়ে গেল। সামনে ধস। সরানোর গাড়ি এসে গেছে। কিছুটা পরিষ্কার হওয়ার পর খাদের পাশ ঘেঁষে বাস বেরিয়ে গেল। একচুল এদিক-ওদিক হলেই বাস হাজার ফুট নিচে বাসপায় সলিল সমাধি। অভ্যস্ত চালকের অতি পরিচিত নিত্যদিনের সঙ্গী এই পথ। তবে আশপাশের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য, শান্ত-নির্জন পরিবেশে ভয় মনে আসে না। মৃত্যুর চিন্তাটা যেন বড়ই তুচ্ছ। সামনে বিচিত্র বর্ণের বিস্তৃত সাংলা ভ্যালি। স্বচ্ছ সবুজ ও নীল রঙের বাসপার আকৃতি মোহিত করে, মুগ্ধ করে। পথের পাশে রঙ-বেরঙের তাঁবু খাটানো বানজারা ক্যাম্প। একটু এগোলেই রকছম। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ছে। রোজের মতো সন্ধ্যা নামতেই পৌঁছালাম ছিটকুলে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। এখানে উপত্যকা অনেক সরু কিন্তু গভীর। দুপাশে পাহাড়ের প্রাচীর। উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট। লোডশেডিং-এ সমস্ত গ্রামের ছবি আড়াল হয়ে গেছে। পি. ডব্লিউ. ডি. রেস্ট হাউসে অন্ধকার হাতড়ে চৌকিদারের ছেলের সঙ্গে দেখা। আমরা ঘাবড়ে গেলাম যখন শুনলাম কারছম থেকে অনুমতি না আনলে সেখানে থাকা অসম্ভব। তবে সে তার পিতাজীকে খুঁজে নিয়ে এল আমাদের সামনে। নারকাণ্ডাতে দেখা লন্ডনের উকিল জেমসও আমাদের মতো আশ্রয়প্রার্থী। ইন্দো-টিবেট বর্ডার। অতন্দ্র প্রহরীরা অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। সমতল থেকে অনেক উঁচুতে বাস, তাই উচ্চমনের অধিকারী। আমাদের অসহায় অবস্থা ও এক জওয়ানের অনুরোধ বৃদ্ধকে বিচলিত করল। সাহেবের জন্য একটি ও আমাদের দুই বন্ধুর জন্য আরেকটি ঘরে ব্যবস্থা হলো। রাত্রে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, গভীর অন্ধকার পথঘাট, তাই খাদ্য জুটবে না। ক্যাম্পে হয়তো পেতেও পারি। এক কি.মি. হেঁটে টি. এল. টি. ক্যাম্পে জানা গেল, ক্যাম্প-অধিবাসী ব্যতীত খাবার পাওয়ার অধিকারী কেউ নয়। তবে নিজেদের খাবার ভাগ করে খেতে পারে। অচেনা বন্ধুদের সহৃদয়তায় অভিভূত হলাম। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিস্কুট, কাজু খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

হঠাৎ দেখি লম্বা কোট গায়ে চড়িয়ে অন্ধকারে গভীর রাত্রে জেমস বেরিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম: "কোথায় যাচ্ছেন?" "দূরে পূজার বাজনা বাজছে চৌকিদারের ছেলে বলেছে, তাই দেখতে যাচ্ছি।" মেঘ জল হয়ে নিচে নেমেছে অনেকক্ষণ। তাই আকাশে এখন তারার মালা। আমরাও তৈরি হয়ে চৌকিদারের ছেলেকে গাইড করে এগিয়ে চলি। অন্ধকার পথ, বন্ধুর, তাই মাথা নিচু করে পথের হদিশের চেষ্টা করে হোঁচট বাঁচিয়ে সন্তর্পণে এগোচ্ছি। একটু পরেই মন্দিরের প্রশস্ত চাতালের মাঝখানে হাজির। হ্যাজাক লাইটের আলো-আঁধারের মাঝে একটি মূর্তি দুটি কাঠের ওপর রাখা আছে। সেটিকে নাচাচ্ছে কিছু লোক। সঙ্গে সাহেব, আমরা অপরিচিত, অতএব অপাঙ্‌ক্তেয়। দূর থেকে দর্শনের পর ফেরার পথে দেখলাম বলির রক্ত। শুনলাম মানসিকের জন্য এই বিশেষ পূজা ও বলির ব্যবস্থা। নিয়মিত উৎসব হয় অক্টোবরের ৫ তারিখ। পাথর ডিঙিয়ে বাসায় ফিরলাম।

বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে। তাই সকালেই আমাদের ছুটি দিতে বললাম দারোয়ানজীকে। খাবারের ব্যবস্থা না করতে পারায় মরমে মরে আছেন বৃদ্ধ। তাই থাকার অনুরোধ করছিলেন বারে বারে। চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতের মাঝখানে ঐ বৃদ্ধের পরমাত্মীয়ের মতো

ব্যবহার, সরলতা ও আন্তরিকতায় আমরা অভিভূত। বাস থামিয়ে সমস্ত জিনিস ভালভাবে গুছিয়ে বাসে তুলে দিয়ে গেলেন। বাস ছেড়ে যাওয়ায় তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়নি বলে অস্বস্তি হচ্ছিল। আলো ভাল করে ফোটেনি। বাস চলছে। কুয়াশা ছেয়ে রেখেছে চারদিক। বাসযাত্রীরা ছিটকলের অধিবাসী। চেহারা, ভাষায় কিন্নরের অন্য অংশ থেকে আলাদা, বোধহয় তিব্বতের প্রভাবে। তাই কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। রকছম ছাড়িয়ে একটু পরেই পথের ওপর বিরাট পাথরের চাঁই পড়ায় রাস্তা বন্ধ। সুতরাং বাসও বন্ধ। শুনলাম পাথর ভেঙে রাস্তা ঠিক হতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে পারে। সমস্ত বাসের মানুষের সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে হাঁটতে আরম্ভ করি। পথ কাটল দুজন স্থানীয় যুবকের সঙ্গে গল্প করতে করতে। রাত্রে ওদের দেশে অতিথি হয়ে প্রায় উপবাস করেছি জেনে খুব কষ্ট পেল। আগে আলাপ হলে ওদের বাড়িতে ভোজনে কোন অসুবিধা ছিল না। আন্তরিকতার অভাব নেই আচরণে। সমতলের মানুষের মতো পঙ্কিল মানসিকতার শিকার হয়নি ওরা। বাসপার স্বচ্ছ জলের মতোই স্বচ্ছ মনের অধিকারী তারা। সরল, সুন্দর, বন্ধুর পথে প্রকৃত বন্ধু।

অবশেষে সাংলায় এসে পৌঁছালাম। থাকার ব্যবস্থা এখানেই সেরা। দেড়শ টাকায় রাস্তার ধারে দোতলায় বারান্দা-সহ অতি সুন্দর দুই শয্যার কক্ষ। নিচে খাবারের বন্দোবস্ত। প্রয়োজনে এক বালতি গরম জল চার টাকায়, সহজলভ্য। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে দুদিন থেকে যাওয়া মনস্থ করলাম। জেমস আমাদের আগেই হাঁটা শুরু করেছিল, তাই এসে দেখি ডিম আর পাউরুটি দিয়ে প্রাতরাশ সেরে ফেলছে। কেবল মুচকি হাসিতে পরিচিতের স্বীকৃতি। আমরা ওপর থেকে নেমে এসে দেখি, বাস বন্ধের বার্তায় নিজের পায়ের ভরসায় এগিয়ে গেছে। আর এই যাত্রায় ওকে ছুঁতে পারিনি।



বাসপা নদী

অতি প্রচলিত প্রাতরাশ আলু-পরোটার পরই বাসপার অববাহিকার টানে ছুটেছি—পাঁচিলের পাশ দিয়ে, শস্য-খেতের মাঝখান হয়ে 'পাঁচ মিনিট'-এর পথে। পঁয়ত্রিশ মিনিট ছোটার পর সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ ভ্রমণ'-এর সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করে বুঝলাম, এখনো 'পাঁচ মিনিট'-এর পথ! অববাহিকা ধরা গেল প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। স্বচ্ছ, সবুজ বাসপার অগভীর জল সশব্দে বয়ে চলেছে। শিলা ভেঙে নুড়ি দিয়ে তলদেশ সাজানো। পাশে মসৃণ নুড়ির ওপরে হাঁটতে ভাল লাগছিল। কিন্তু ক্ষণিকের জলস্পর্শেই পা-দুটি শরীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের অনুভূতি এনে দিল। বরফঠাণ্ডা জল। দুপুর রোদ্দুরের আদরের পরশ, সামনে কলস্রোতা বাসপা, ওপারে সবুজ হিমালয়, পিছনে

চিত্রিত সাংলা উপত্যকায় ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে স্বর্গীয় সুখের অনুভূতি। কল্পায় দেখেছি, দিগন্তবিস্তৃত হিমালয় মাথায় সাদা বরফের বোঝা নিয়ে মৌন, ধ্যানমগ্ন। রঙবেরঙের আপেল যেন মেখলা। কিন্তু সাংলায় এখন বরফের প্রাচুর্য নেই। হিমালয় বিস্তৃত আঁচল দিয়ে শিশুকন্যা বাসপার কলধ্বনি, নেচে নেচে ছোটাছুটি উপভোগ করছে পরম তৃপ্তিতে। প্রকৃতির এই প্রাণোচ্ছল রূপই সাংলাকে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।

বেলা বাড়ছে, খাবার না পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরলাম। গেস্ট হাউসে এসে দু-বালতি গরম জল দিতে বলি। ঘরে বসে জানালা দিয়ে প্রিয় বাসপার সৌন্দর্য দেখছি তো দেখছিই। জল আর আসে না। একবার খবর নেওয়ার পরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে জল এল। আসলে বরফঠাণ্ডা জলকে উত্তপ্ত করতে গিয়ে বেচারাদের দফারফা হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বালতির আগমনের মুহূর্ত সহজেই অনুমেয়। দুজনে স্নান সেরে নিচে এসে খেলাম গরম ভাত, বাঁধাকপির তরকারি আর পেঁয়াজ। অপূর্ব লাগল। কিন্নরে এসে অবধি আমাদের মতো মহানগরীর পেটরোগা নাগরিকের চোঁচোঁ করে খিদে বাড়ছে। হাঁটাহাঁটি গায়ে লাগছে না। প্রথম দিকের ক্লান্তি কেটেছে। পরিশ্রমের ক্ষমতাও বেড়েছে।

সকালে চলেছি বাসপা পেরিয়ে শান্ত নির্জন ছায়াঘেরা পথ ধরে। পথে দূষণমুক্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তবে পলিপ্যাক এনেছে দূষণের আগমনবার্তা। নির্জন, নিঝুম পাইন বনের মাঝ দিয়ে হাঁটাপথ আর পাশে পাশে সবুজ, নীল, সাদা পোশাকে অপরূপা, কল্লোলিনী বাসপা আমাদের সঙ্গিনী। দুপাশে ঝরনার হার। বিকেলে কামরু-কী-কিল্লা দেখতে বেরিয়েছি স্বল্প বিশ্রামের পরই। পথে ছোট ছেলেরা দিল আপেল, আমরা বিনিময়ে দিলাম চকোলেট। মহানন্দে লাফাতে লাফাতে কিছুদূর এগিয়ে দিল। পাথর কেটে সিঁড়ি তৈরি, তাই অল্প আয়াসে ওপরে উঠি। সামনে প্রথম ফটক। গায়ে চিত্রকলায় চীনা সংস্কৃতির প্রভাব। একটু এগিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় তোরণ। এরপর একই চত্বরে দুটি মন্দির—একটি বদরীনারায়ণজীর, অপরটি বুদ্ধের। আশপাশের বাড়িগুলি পূজারী, তত্ত্বাবধায়কদের। চাতালে কিছু শিশু খেলা করছিল। বয়স্কদের নিকট জেনে আরও ওপরে সিংহদরজায় পৌঁছাই। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে গেলাম। কিন্তু ভিতরের দরজা বন্ধ। পাশের সরু পথ দিয়ে একটি বাড়ির ছাদ থেকে মন্দিরের ভিতরটা দেখলাম প্রশস্ত। মন্দিরটা কাঠের তৈরি। অতীতে বুশাহারের রাজাদের কেল্লা ছিল। এখন মন্দির। সকাল-সন্ধ্যা আরতির জন্য পূজারী মন্দির খোলেন। এখানেই দীপক নেগীর নিকট থেকে একশ বাইশ জন রাজার রাজত্ব করার কথা জানলাম। বর্তমানের রাজা বীরভদ্র সিং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মাঝে মাঝে আসেন দেবতার আশিস নিতে। এখানে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেশি থাকলেও লোকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধ —উভয় ধর্মকেই সমানভাবে সম্মান করে। বৌদ্ধধর্মের প্রতীক সাদা পতাকা প্রায় সব বাড়িতেই। ঐ পতাকা দিয়ে বুদ্ধের আশিস বর্ষিত হয়ে শান্তি আনে বলে সকলের বিশ্বাস। এবার ফিরছি। পথের ধারে বাড়ির ছাদে এক ভদ্রমহিলা ফল শুকোতে দিচ্ছিলেন। আপেল, বেমির ও চুলা। চুলার বীজ থেকে তেল হয়। ফলটি বলবর্ধক।

সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ সাংলা উপত্যকা দেখেছিলাম পরের দিনই ছেড়ে আসতে হবে বলে। হঠাৎ প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারকে খানখান করে, বাসপার সুমধুর কলধ্বনিকে চাপা দিয়ে সশব্দে সারি সারি লরি এগিয়ে চলেছে আস্তানায়। টাপরীর রাস্তা মুক্ত—লরির মিছিলে তারই সঙ্কেত।

সকাল সাতটায় বাস সচল হলো। টাপরী গিয়ে বাস বদল। ঘণ্টা দুয়েক পর আবার বাস চলতে শুরু করল। সহযাত্রী এক স্থানীয় ভদ্রলোকের কাছে ভ্রমণকাহিনীতে পড়া বহুপতি প্রথা সম্পর্কে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলাম স্বল্প পরিচয়ের পর। আমাদের প্রশ্নে তিনি বিরক্ত না বিস্মিত হলেন বুঝলাম না। "আপনি কি করে জানলেন?" আমতা আমতা করে বললাম: "বইয়ের মাধ্যমে।" মনে হলো উনি সহজ হলেন। বললেন: "কাজের সন্ধানে পুরুষদের বহুদূরে যেতে হয়। সামাজিক কারণে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তনে এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত। রাহুলজীর (রাহুল সাংকৃত্যায়নের) বইতে কিন্নরের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা আছে।" ভদ্রলোক ওয়াংটুতে নেমে গেলেন। ভাবনগরের কাছে দেখি, বিরাট ক্রেন পথ বন্ধ করে শিশুর মতো করে নিচে পড়ে যাওয়া ট্রাক তুলছে। প্রায় দেড় ঘণ্টার পর বাস চলল। রামপুরে পৌঁছে 'বুশাহার সদনে' আশ্রয় নিলাম। স্নান সেরে বাজারের পথ ধরি। এখানে বিকেলে জিলিপি ভাজে। দুজনে গরম জিলিপি খেলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ে সরাহনের।

জিওরী হয়ে সরাহন পৌঁছাই বেলা একটায়। একটি ঝুপড়িতে ভাত আর জল খেয়ে ভীমাকালী-মন্দিরের দিকে যাই। এখানে ভীম কালীর আরাধনা করেছিলেন। পাশেই নরসিংহজীর মন্দির। দুটিরই সংস্কারের কাজ দুজনেরই পা যেন দেহবহন করার অনীহা প্রকাশ করছে। পরদিনের বাসের খোঁজ নিয়ে এইচ. পি. টি. ডি. সি.-র 'সাটলেজ কাফে'তে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি। অনেক পরে ঘুম এল।



ভীমাকালী মন্দির

চলছে। দেবদর্শনের পর রাজপ্রাসাদ-দর্শনে এগিয়ে চলি। গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে বীরভদ্র সিং ইদানীং কালেভদ্রে আসেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা সিমলায় মানুষ, তাই এখানে মানিয়ে নিতে পারে না। একটু দূরে পক্ষী আলয়। নানা ধরনের পাখির স্বল্পতা। 'মোনাল' বা কালী মুরগীই বেশি। একটু দেখেই বাস স্ট্যান্ডের পথ ধরি। চারটায় শেষ বাস। কিন্তু এসে দেখি সেটি নেই। পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙে সংক্ষিপ্ত পথে চার কি.মি. দূরের ঘরাটে যাই বাসের আশায়। প্রায় ছুটে এসে শুনি, শেষ সম্বল শেষ বাসটি কিনু গ্রাম থেকেই ফিরে গেছে। এরপর পা ভরসা।

জিওরীতে বাস ধরে রামপুরে পৌঁছাই সূর্যাস্তের প্রায় দুঘণ্টা পর। অনভ্যস্ত পায়ে অতখানি পাহাড়ী পথ হাঁটায়

সকাল আটটায় রামপুর ছেড়ে কিঙ্গল, কুমারসৈন, নারকাণ্ডা, মাতিয়ানা, খিয়োগ হয়ে বাস সিমলায় পৌঁছাল। সময় তখন বিকেল তিনটা। কালীবাড়িতে আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় উঁচুতে উঠি। অবিবাহিত হওয়ার অপরাধে 'ডরমেটারী' ছাড়া আলাদা কামরা নিষিদ্ধ। একটু নিচে নেমে এসে বাস স্ট্যান্ডের কাছে 'হোটেল ঠাকুর' ঠিক হলো। একটি দ্বিশয্যাবিশিষ্ট কামরা, সংলগ্ন স্নানাগার।

পরদিন টয় ট্রেনে কালকা পৌঁছে বড় গাড়িতে দিল্লী হয়ে ফের কলকাতার পথে। কামরায় দুই প্রান্তে দুই বন্ধু। এই বিস্তর ব্যবধানে পথের কষ্ট বোধ হলো অনেক বেশি। মন? সে তো পড়ে আছে হিমালয়ের আনাচে কানাচে।□

☐ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ☐

চিরন্তনী

ধ্রুবের উপাখ্যান ১

কথা : ভগিনী নিবেদিতা ☐ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত



আশ্চর্য দেশ এই ভারতবর্ষে ধ্রুবের জন্ম। তার পিতা ছিলেন এক রাজা, মা সুনীতি ছিলেন পাটরানী। সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে জন্ম হলেও শৈশব থেকেই ধ্রুবের জীবনে দুর্ভাগ্যের ছায়া নেমে এল।

ধ্রুবের জন্মের অনেক আগে থেকেই রাজা তাঁর এক কনিষ্ঠা রানীর পুত্রকে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। যেহেতু পাটরানীর পুত্রই রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাই এই শিশুর আগমন কনিষ্ঠা রানীকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। তাঁর এই মনোভাব তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন।





অবশেষে রাজা শিশু ও তার মায়ের বিপদ আশঙ্কা করে রাজধানী থেকে তাঁদের নির্বাসিত করলেন দূরে বিশাল এক অরণ্যে।

[ক্রমশঃ]

মাতৃস্মৃতি

স্বামী অম্বানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী অম্বানন্দের পূর্বাশ্রম কেরলের ত্রিবাঙ্কুরে। তাঁর পূর্বনাম সি. মধুরম পিল্লাই। স্মৃতিকথায় উল্লিখিত তাঁর ভাইয়ের নাম সি. দামোদরম পিল্লাই।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

দিনটা ছিল ১৯১৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার, অমাবস্যা। সেদিনই শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয়। আগের দিন বিকেলে স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠের যে-ঘরে আমি এবং আমার ভাই দামোদরম ছিলাম, সেই ঘরে এলেন এবং বললেন: "আগামীকাল শ্রীশ্রীমাকে তোমাদের দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করার পক্ষে শুভদিন। প্রত্যূষে স্নান সেরে নেবে, কিন্তু প্রাতরাশ করবে না। কিছু ফুল নিয়ে ব্রহ্মচারী গোবিন্দের (তিনি মঠের ডিস্পেনসারিতে কাজ করতেন) সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কাছে যাবে। সেখানে দুপুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করে দক্ষিণেশ্বরে যেতে পার। সেখানে দেবীদর্শন ইত্যাদি করে সন্ধ্যার মধ্যে মঠে ফিরে আসবে।" সেইমত, আমরা শনিবার ভোরে স্নান সেরে কিছু ফুল তুলে নিয়ে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর ও স্বামীজীর চরণে নিবেদন করি। তারপর স্বামী প্রেমানন্দজীকে প্রণাম করে ব্রহ্মচারী গোবিন্দের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধনে যাই। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রবেশের আগেই গোবিন্দজী রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিচের তলার দেওয়ালের সামনে নিচু হয়ে মাথা ঠেকালেন। তাঁর এই সুগভীর ভক্তির প্রকাশ দেখে অনুরূপভাবে আমরাও দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের ভক্তি নিবেদন করলাম। মায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করে বাঁদিকের ঘরে গেলাম। সেখানে স্বামী সারদানন্দজী বসেছিলেন। তাঁকে আমরা প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। ইতিমধ্যে উদ্বোধনের ম্যানেজার বললেন: "মা এখন পূজা করছেন। পূজা শেষ হলে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হবে।" আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সকাল ৯টার পর শ্রীশ্রীমায়ের পূজা শেষ হলো এবং আমাদের ডাকা হলো। আমাকেই প্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর পূজার ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, পূর্বমুখী হয়ে সিংহাসনে ঠাকুরের ফটো বসানো আছে। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে সেখানে প্রণাম করলাম। তারপর মাকে প্রণাম করলাম, তিনি আমাকে তাঁর বাঁদিকে বসতে আজ্ঞা করলেন। তিনি উত্তরমুখী হয়ে পূজার আসনে বসেছিলেন। আমার হাতে গঙ্গাজল দিলেন। আমি জানতাম না, ঐজল একটু মুখে দিতে হয়। আমার বাবার শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিতের দেওয়া জল আমি আমার মাথায় এবং চোখে ছিটিয়েছিলাম। মায়ের দেওয়া এই পুণ্যবারি নিয়েও আমি সেরকম মাথায় ও চোখে ছিটালাম। মা পুনরায় একটু জল আমার হাতে দিয়ে জিভে ছিটাতে বললেন। তারপর শ্রীশ্রীমা আমাকে রামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। কিভাবে ডানহাতের আঙুল দিয়ে জপ করতে হয়, তিনি আমাকে তা তিনবার দেখিয়ে দেন। এইভাবে একবারে দশবার নাম জপ করা যায়। তারপর তিনি আমাকে মা কালীর মন্ত্রও দিলেন। অতঃপর তিনি আমার কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলেন। যখন আমি কাপড়ের খুঁট থেকে এক টাকার একটি মুদ্রা তাঁকে দিতে গেলাম, তখনি আমার মনে একটি ভাবনার উদয় হলো—কিভাবে আমি তাঁর হাতে মুদ্রাটি দেব? কারণ, তিনি এমন একজনের সহধর্মিণী ছিলেন, যিনি নিজে কখনো মুদ্রা স্পর্শ করতেন না বা স্পর্শ করতে পারতেন না। সেই কারণে, আমি মুদ্রাটি শ্রীশ্রীমায়ের বাঁপায়ের কাছে রাখলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন এবং পরম করুণায় মুদ্রাটি তুলে নিয়ে একপাশে রাখলেন—এইভাবে আমাকে দেখালেন যে, মুদ্রাটি তিনি গ্রহণ করেছেন। তখন আমি পরম শ্রদ্ধায় মায়ের সামনে ভূমিষ্ঠ হলাম এবং মনে মনে বললাম: "মা, তুমি যদি দয়া করে তোমার পাদপদ্ম একটু তোল তাহলে আমি আমার মাথার ওপর তা রাখতে পেরে কৃতার্থ হতে পারি।" তিনি তৎক্ষণাৎ আমার মনের ভাব বুঝে তাই করলেন। আমি তখন সেই পাদপদ্মযুগল আমার মাথার ওপর রাখলাম এবং এক দিব্য আনন্দের অনুভূতি পেলাম। সেই অবস্থায় আমি তাঁকে বললাম: "মা, দয়া করে আমাকে পবিত্রতা ও ভক্তি দিন।" পূর্বরাত্রে এক আনন্দের অস্থিরতায় একটুও ঘুমাতে পারিনি। মনের মধ্যে অসংখ্যবার প্রশ্ন জেগেছিল যে, মায়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি কি প্রার্থনা করব এবং অবশেষে স্থির করি, এই প্রার্থনাটিই মায়ের কাছে রাখব। মা তৎক্ষণাৎ একটি ফুল নিলেন এবং সেটি আমার মাথায় রেখে বললেন: "তুমি যা চাইছ, শ্রীগুরু মহারাজ তোমাকে তাই দেবেন।" মায়ের এই কথায় আমি পরম

সান্ত্বনা পেলাম এবং পরমানন্দে ফুলটি নিয়ে সযত্নে আমার কাছে রাখলাম। এই ফুলটি আমি দু-তিনদিনে অল্প অল্প করে সবটুকু খেয়ে নিয়েছিলাম।

তারপর শ্রীশ্রীমা আমাকে কিছুক্ষণের জন্য জপ করতে বললেন। আমি আনন্দে আত্মবিস্মৃত হয়ে জোরে জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। মা তখন তাঁর হাত নিজের ওষ্ঠাধরের ওপর রেখে বললেন ঃ "মুখে নয়, মনে মনে জপ কর।" তাঁর আজ্ঞামত আমি সেইভাবে জপ করে পুনরায় তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ "বাইরে গিয়ে তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দাও।" আমি বাইরে এসে ভাইকে পাঠালাম।

আমার ভাই ফিরে এলে আমরা দুজনে নিচে ম্যানেজারের ঘরে গেলাম এবং সেখানে বসে নীরবে জপ করতে লাগলাম। দুপুরে আমরা স্বামী সারদানন্দজী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে একটি ঘরে আহারে বসলাম। ঐ ঘরে শ্রীশ্রীমায়ের একটি অপূর্ব প্রতিকৃতি রাখা ছিল। খাবার দেওয়ার পর অন্যান্য সকলে আহার শুরু করলেন। কিন্তু আমরা দুজন—আমি এবং আমার ভাই—চেয়েছিলাম যে, মায়ের প্রসাদ পাওয়ার পর আহার গ্রহণ করব এবং সেই কারণে আমরা চুপ করে বসেছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইঝি লক্ষ্মী-দিদি খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরে বললেন ঃ "বাবা, মা এখনো খেতে শুরু করেননি। তাঁকে খাবার দেওয়া হয়েছে। তিনি তোমাদের খাবার দিতে আমাদের বলেছেন। তিনি খেতে শুরু করলে আমি তোমাদের প্রসাদ এনে দেব। ইতিমধ্যে তোমরা তোমাদের খাওয়া শুরু করতে পার।" কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাদের মায়ের প্রসাদ এনে দিলেন। ঘি এবং ডাল দিয়ে মাখা দু-মুঠো ভাত। আমরা ভক্তিভরে সেই প্রসাদ ভাগ করে খেলাম। শেষ বিকালে আমরা মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করলাম।

দশদিন পর অর্থাৎ দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীর দিনে সকালে স্নান সেরে আমরা আবার উদ্বোধনে গেলাম। সেখানে রাসবিহারী মহারাজকে (স্বামী অরূপানন্দজী) মায়ের জন্য কিছু ভাল মিষ্টি আনিয়ে দেবার জন্য টাকা দিলাম। আমরা ম্যানেজারের ঘরে বসলাম। মায়ের পূজা সম্পন্ন হলে আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মধ্যাহ্নে সেখানেই আমরা প্রসাদ পেলাম। সেদিনও বিকেলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সেখানে সন্ধ্যারতি দেখে বেলুড় মঠে ফিরে এলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা কয়েকজন লোকের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। সেইদিন তিনি আমাদের সঙ্গে কোন কথা বললেন না। আমি মনে খুব দুঃখ পেলাম। কিন্তু তখনি মা আমার দিকে স্নেহভরে তাকালেন এবং পরম করুণায় আমার প্রতি মৃদু হাসলেন।

আমাদের বারাণসী যাত্রার আগে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সঙ্গে প্রায় পনের মিনিট ধরে কথা বললেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আগে কখনো কাশীধাম গিয়েছ? তোমাদের সঙ্গে কারা যাচ্ছেন? ওখানে কতদিন থাকবে? তোমরা কি এখানে ফিরে আসবে, নাকি সেখান থেকে সরাসরি তোমাদের নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে? তীর্থযাত্রার জন্য যথেষ্ট টাকাকড়ি তোমাদের সঙ্গে আছে তো? না থাকলে আমি তোমাদের দেব। আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না। যদি ফেরৎ দিতে চাও তো সুবিধানুযায়ী দিলেই যথেষ্ট হবে। ওখানে রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আছে। রাখালকে আমার আশীর্বাদ জানিও। যদি কাশী থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আস তাহলে দেরি না করে এখানে চলে আসবে।" এইভাবে পরম স্নেহভরে তিনি আমাদের সঙ্গে নানা কথা বললেন। আমাদের মন গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হলো। আমি আমার নিজের মাকে হারানোর দুঃখ ভুলে গেলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মুখ আমার নিজের মায়ের মুখ মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ভাবলাম, যদি প্রত্যেক মায়ের স্নেহ শ্রীশ্রীমায়ের মতন হতো তাহলে পৃথিবী নিশ্চিতই আনন্দের অট্টালিকা হয়ে উঠত।

আমরা কাশীধামে পৌঁছে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। মা আমাকে যে-বার্তা দিয়েছিলেন তা তাঁকে জানাবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। দু-তিন দিন পর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে একা পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললাম ঃ "মহারাজ, আপনার প্রতি আমার কিছু নিবেদন করার আছে। আমি জানি না আমি কিভাবে তা করব! আমি ঠিকমত তা না করতে পারলে দয়া করে আমাকে মার্জনা করবেন।" তিনি বললেন ঃ "যথেষ্ট ক্ষমাভিক্ষা করেছ, তোমার কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বল।" আমি তখন মা যে-বার্তা দিয়েছিলেন তা তাঁকে জানালাম। পরম ভক্তির সঙ্গে মায়ের সেই আশীর্বাদ গ্রহণের নিদর্শনস্বরূপ পরম শ্রদ্ধায়

তিনি তখন মাথা নত করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন ঃ "শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কি আবার তোমার দেখা হবে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ, হবে।" মহারাজ বললেন ঃ "তাঁকে বলবে যে, আমি তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। তুমি আমার হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ প্রণামও করবে।" শ্রীশ্রীমায়েরই করুণায় তাঁরই অর্পণ করা দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবেই সম্পন্ন হলো।

আরেকদিন মায়ের কাছ থেকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা পাওয়ার বাসনা নিয়ে তাঁর কাছে যাই। মাকে সেদিন একা পেয়েছিলাম। মায়ের কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করতে মা আমাকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দেন। আমি মালয়ালম ভাষায় মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম ঃ "মা, এই মালা আমি আপনার গলায় পরাতে চাই।" মা তৎক্ষণাৎ তাঁর মাথাটা সামনে নিচু করলেন এবং আমি মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিই। তিনি তখনি আমাকে মালাটি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছেন দেখে আমি আবার মালয়ালম ভাষাতেই বললাম ঃ "মা, মালাটি কিছু সময় আপনার গলাতেই থাকুক।" এরপর আমার ভাই তাঁকে করজপের বিষয়ে মালয়ালম ভাষায় একটি প্রশ্ন করল। আমার ভাইয়ের প্রশ্নের ব্যাখ্যা করে তাকে সন্তুষ্ট করা পর্যন্ত তিনি মালাটি গলাতেই পরে থাকলেন। এরপর তিনি মালাটি খুলে আমাকে দিতে গেলে আমি বললাম ঃ "মা, দয়া করে ঐ মালাটাতে কিছুক্ষণ জপ করে তারপর আপনার আশীর্বাদ হিসাবে মালাটি আমাকে দেবেন।" মা মালাটি নিয়ে কিছুক্ষণ জপ করলেন এবং তারপর আমাকে মালাটি দিলেন। আমি ঐ মালাটি নিলাম এবং নিজের গলায় পরলাম। মা তখন বললেন ঃ "ওটি তোমার হাতে নাও এবং ওটিতে কিছুক্ষণ জপ কর।" আমি মনে মনে মালাটিতে মায়ের দেওয়া মহামন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করতে লাগলাম। আমার যখন প্রায় কুড়িবার নাম-জপ করা হয়ে গিয়েছে, তখন মা বাঙলায় বলে উঠলেন ঃ "না, না, ঐ মন্ত্র নয়, আরেকটি যে মন্ত্র আছে সেটি জপ কর।" তিনি কি আজ্ঞা করছেন তা যে আমি উপলব্ধি করেছি সেটি বোঝাবার জন্য আমি মাথা নাড়ালাম। কিন্তু তবুও আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নামই জপ করে যেতে লাগলাম। যাহোক, তিনি অবশ্য আর কিছু আপত্তি করলেন না। সুতরাং আমি অনুমান করলাম যে, মায়ের এতে সম্মতি আছে। একপ্রস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম জপ করার পর দেবীর যে-মন্ত্র দিয়েছিলেন সেটি জপ করলাম। জপ করা শেষ হলে মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম। এই ঘটনাটি থেকে আমি অনুভব করলাম যে, কেউ কিছু তাঁকে বলার আগেই তিনি সবকিছুই জেনে যান।

একদিন হঠাৎ মনে এক অভিপ্রায় জাগল, আমি মায়ের কাছে তাঁর চরণামৃতের জন্য প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রার্থনায় সম্মত হলে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে মনে করব। তিনি আমাকে যে তীর্থবারি দিয়েছিলেন তা পান না করার দুঃখ সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে বরং আমি আরও অনেক ভক্তকে তাঁর চরণামৃত দিতে পারব। এটা আমার এবং তাদের সকলের কাছেই আশীর্বাদস্বরূপ হবে। এই উদ্দেশ্যে কিছুটা গঙ্গাজল নিয়ে খুব যত্ন করে তা পরিশ্রুত করি, যাতে ঐ জল পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হয়। আমি সেই জল একটি দু-আউন্সের বোতলে ভরে এরপর একদিন সকালে উদ্বোধনে গেলাম এবং ম্যানেজারকে বললাম ঃ "আমার একটি পরিষ্কার চ্যাপ্টা পাত্র প্রয়োজন। কিজন্য প্রয়োজন তা আপনাকে পরে জানাব।" তিনি অনুগ্রহ করে সেইরকম একটি পাত্র আমাকে দিলেন। সেই পাত্রটি নিয়ে আমি এবং আমার ভাই ম্যানেজারের সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কাছে গেলাম। তখন আমি ম্যানেজারকে বললাম, শ্রীশ্রীমাকে জানাতে যে, আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে। তৎক্ষণাৎ ম্যানেজার আমার কথাগুলি অনুবাদ করে শ্রীশ্রীমাকে বলার আগেই মা তাঁর শ্রীচরণযুগল বাড়িয়ে দিলেন। আমি পাত্রটি তাঁর শ্রীচরণের নিচে রাখলাম। পাত্র থেকে গঙ্গাজলটুকু তাঁর শ্রীচরণে ঢেলে দিলাম। আমি মনে মনে বললাম ঃ "মা, আমি এইমাত্রই করতে পারি।" তিনি তখন পরম স্নেহভরে আমার দিকে তাকালেন। কিছুটা গঙ্গাজল তাঁর হাতে নিলেন এবং সেই নিয়ে কিছুক্ষণ জপ করে সেই পূতবারি নিজের শ্রীচরণে ঢেলে দিলেন। এইভাবে তিনবার তিনি জপ করলেন এবং এরপরে সেই জল আমাকে নিতে আজ্ঞা করলেন। নিজেকে আমার পরম সৌভাগ্যবান এবং পরম পবিত্র বলে বোধ হলো। মায়ের শ্রীচরণতল থেকে পাত্রটি সরিয়ে নিলাম এবং তাঁর শ্রীচরণদুটি একটি গোলাপী রঙের তোয়ালে দিয়ে সযত্নে মুছিয়ে দিলাম। এরপর আমি মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম এবং অনুভব করলাম যে, মা পরম করুণায় আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। পরে আমার ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে, ম্যানেজারকে তিনি অনুচ্চস্বরে বলেছিলেন ঃ "দেখ, কত ভক্তিভরে ছেলেটি এসব কি

করছে!" ভাবলাম, সেও তো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই আশীর্বাদ। এরপর সেই চরণামৃত পান করার জন্য আমার ভাইকে কিছুটা দিলাম এবং নিজেও কিছুটা পান করলাম। অবশিষ্ট চরণামৃত আমি সযত্নে বোতলে রাখলাম। সন্ধ্যা হলে মাকে আবার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আমরা বেলুড় মঠে ফিরে এলাম। সেই চরণামৃত এখনো আমার কাছে আছে এবং তা থেকে বিন্দু বিন্দু আমি বহু ভক্তকে দিয়েছি। বাস্তবিক, এই চরণামৃত মায়ের একটি প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ, যার অংশ আমি অপরকেও দিতে পারি।

কলকাতা থেকে আমাদের দেশে ফেরার দিন স্থির হওয়ার পর মায়ের কাছে বিদায় নিতে আমরা বেলুড় মঠ থেকে উদ্বোধনে গেলাম। নানা কথার মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আমাকে দেখতে তোমরা আর আসবে না?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য আমার ছিল না। আমি কপর্দকশূন্য ছিলাম। অনেক কষ্টে আমি এখানে আসতে সমর্থ হয়েছিলাম। এই সুযোগ কি আবার আসবে? কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমি মাকে করজোড়ে বললাম ঃ "হ্যাঁ মা, আবার আসব।" আমি অনুভব করলাম যে, মা আমার মনের ভাবনা বুঝতে পেরেছেন এবং আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

পরদিন অর্থাৎ আমাদের দেশে ফেরার দিন আমরা কলকাতায় গেলাম আমার এক কাকার আমন্ত্রণে। আমার এই ভক্ত-কাকার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করার।

আমাদের হাতে তিনঘণ্টার মতো সময় ছিল, সেই সুযোগে আমরা আরও একবার শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে যাই এবং তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। আমাদের দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। যখন বিদায় নিচ্ছি মা তখন কিন্তু সেই প্রশ্নটি আর করলেন না ঃ "তোমরা কি আর আসবে না?"

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক বছর পর একদিন মনে ভাবলাম যে, আমি যদি দেড়টাকা পাঠিয়ে রাসবিহারী মহারাজকে অনুরোধ করি এক টাকার মিছরি কিনে শ্রীশ্রীমাকে দিয়ে তার অল্প কিছু প্রসাদ আমাকে পাঠিয়ে দিতে, তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু আমি যখন বেতন পেলাম, তখন একথা একেবারে ভুলে গেলাম এবং শীঘ্রই বেতনের সব টাকা খরচ হয়ে গেল। এইভাবে ছয়মাস কেটে গেল, আমার ইচ্ছাপূর্ণ আর হলো না।

এক বিশেষ পুণ্যদিনে পূজা শেষ করে উঠে আমি দুটি চিঠি পেলাম। হাতের লেখা দেখে বুঝতে পারলাম, চিঠিগুলি স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর পাঠানো। একটি চিঠি পড়লাম। অপরটি খুলে দেখি, সেটি একটি প্যাকেট। প্যাকেটটির মোড়কের ওপর লেখা—"শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ"। প্যাকেটের ভিতরে কতকগুলি মিছরি ছিল। আমার বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রইল না। এই ঘটনাটি নিশ্চিতভাবেই শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্যামিত্ব শক্তির পরিচায়ক, যে-দৃষ্টি এবং শক্তি ভক্তের একান্ত আকাঙ্ক্ষা জানতে পেরে তা পূর্ণ করে। তাঁর ঐশ্বরিক করুণা অপূর্ব—তুলনাহীন এবং আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য।□

ভাষান্তর ঃ সন্দীপকুমার দাঁ; সৌজন্য ঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রাসঙ্গিকী *প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।*
—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ ঃ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'

'উদ্বোধন'-এর জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ (৫ম) সংখ্যার ২৪৭ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডু 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' শব্দগুচ্ছের উৎস জানতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে এই চিঠি। শ্রীকুণ্ডু যথার্থই বলেছেন, উপনিষদের কোথাও 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' শব্দগুচ্ছের উল্লেখ নেই।

আমার হাতের কাছে ফরাসী দর্শনের কোন আকরগ্রন্থ নেই। সেজন্য স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই লিখছি। পরম সত্তার বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর কুজ্যাঁ (Victor Cousin 1792-1867) বলেন, ওটি হলো Truth, Beauty ও Goodness-এর সমন্বয়। অবশ্য তিনি এই প্রসঙ্গে ফরাসী ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন, বোধহয় Vérité, Beauté, Biln। বাঙলা সাহিত্যে এই শব্দগুচ্ছ —'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' প্রথম ব্যবহার করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)। তারপরে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাহিত্যিকগণ এই শব্দগুচ্ছের বহুল ব্যবহার করেছেন।

অমিয়কুমার মজুমদার
এশিয়াটিক সোসাইটি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬

বর্তমান বর্ষের 'উদ্বোধন'-এর ৫ম সংখ্যায় 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' প্রসঙ্গে শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে নিচের তথ্যটুকু জানাতে চাই।

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর মূল ভাব প্লেটোর। ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছিল ঃ 'The true, the good, the beautiful'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেন—'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শিবকুমার মিশ্রের লেখা 'হিন্দী প্রবন্ধ' শীর্ষক বই থেকে ওপরের তথ্য পেয়েছি। প্লেটোর রচনার ইংরেজী অনুবাদ এবং মহর্ষির লেখা থেকে বিষয়টি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সুবলচন্দ্র মণ্ডল
লালপুর, চাকদহ, জেলা—নদীয়া

'উদ্বোধন'-এর জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' শীর্ষক পত্রটির জন্য ধন্যবাদ। শ্রীকুণ্ডু বলেছেন, এই শব্দগুচ্ছ কোন ঔপনিষদিক মন্ত্রের অংশ নয়। আমি এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'—এই শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষগণ সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি তাঁদের আকর্ষণকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি ভারতবর্ষের মানুষের আকর্ষণ আবহমান কাল থেকেই। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার মূলে রয়েছে মূলতঃ আমাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার প্রেরণা। আমরা যদি এক-এক করে সত্য, শিব ও সুন্দরের ব্যাখ্যা করি তাহলে দেখব—'সত্য' শব্দের অর্থ যা শাশ্বত, যা শুদ্ধতম, যা অনন্ত। 'শিব' কথাটির অর্থ মঙ্গল। পৌরাণিক দেবতা শিবের ধারণা এর মধ্যে মিশে রয়েছে। দেবাদিদেব শিব শান্ত, সৌম্য, ধীর—সর্বদা ভক্তের কল্যাণে তৎপর। শিবের অবয়বের যে-কল্পনা আমাদের পুরাণে রয়েছে তাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের শিল্প ও সৌন্দর্য-চেতনার এক অপূর্ব নিদর্শন আমরা পাই। অপরূপ তাঁর দেবকান্তি, অপরূপ তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সৌন্দর্যের সর্বসার্থক মূর্তি শিবমূর্তি। সম্ভবতঃ এই মূর্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যানলব্ধ। আমার মনে হয়, সৌন্দর্যবিগ্রহ শিবকে নিরীক্ষণ করেই 'সুন্দর' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। শিব নটরাজ। শিব আমাদের কৃষ্টিভাবনায় সঙ্গীতগুরু, নৃত্যগুরু। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের যে-বর্ণনা অথবা ছবি আমরা পাই, তাতে তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি বা মুদ্রা আমাদের অভিভূত করে। যখন এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখেন ঃ "প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে..." তখন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমাদের কল্পনা ও ধ্যানের সুন্দরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ দেবাদিদেব শিবের অপরূপ মূর্তি। অর্থাৎ 'শিব' থেকেই 'সুন্দর'-এর উৎপত্তি। আসলে সত্য, শিব এবং সুন্দর একই তত্ত্বের তিনটি মুখ। যা সত্য, তাই শিব, তাই সুন্দর। আজ 'সত্য', 'শিব' ও 'সুন্দর' শব্দগুচ্ছ স্লোগানে পরিণত হয়েছে। 'স্লোগান' শব্দটি সাধারণতঃ ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু স্লোগানের মধ্যে নিহিত থাকে মানুষের কাছে প্রিয়তার মর্মধ্বনি। সত্য, শিব ও সুন্দরকে আমরা যে সবাই ভালবাসি এবং সত্য, শিব ও সুন্দরের ধারণা যে আবহমান কাল থেকে আমাদের কাছে জনপ্রিয় তা 'সত্য', 'শিব', 'সুন্দর'-এর স্লোগানে পরিণত হওয়াতেই সুস্পষ্ট।

সুধাংশুশেখর সরকার
শ্রীনিবাসপুরী, নয়াদিল্লী-১১০০৬৫

দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভ অবহেলিত

কিছুদিন আগে আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে দার্জিলিঙে মাসখানেক অবস্থান করতে হয়েছিল। সেই সময় দার্জিলিঙে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান দেখার সৌভাগ্য হয় আমার। এই স্থানগুলির মধ্যে দার্জিলিঙ শহরের শ্মশানঘাট অন্যতম। অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভের সঙ্গে এখানে ভারতভগিনী নিবেদিতা এবং প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ্ রাহুল সাংকৃত্যায়নের স্মৃতিস্তম্ভও রয়েছে। প্রধানতঃ ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভের জন্যই দার্জিলিঙের

শ্মশানঘাট আমাদের কাছে একটি দর্শনীয় স্থান। দার্জিলিঙে চকবাজার অঞ্চল থেকে ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত রাস্তা দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ঘুরতে ঘুরতে এক অপরাহ্ণে সেখানে পৌঁছালাম। সব স্মৃতিস্তম্ভই অনাদর, অবহেলা ও উপেক্ষায় যেন অশ্রুবিসর্জন করে চলেছে। স্মৃতিস্তম্ভগুলি যেন বলছে: দেশের মানুষের আমাদের ওপর যখন এত উপেক্ষা, এত অবহেলা তখন আমাদের নির্মাণ করে আমাদের এত দুঃখ দেওয়া কেন? অন্যান্যদের মতো কালের অতলতলে বিলীন হবার অধিকারটুকুও কি আমাদের নেই? সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছি ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে। ভারতবর্ষকে ভালবেসে, গুরু বিবেকানন্দের নির্দেশে ভারতের উন্নতিকল্পে, ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য জন্মসূত্রে বিদেশিনী এই ভারতপ্রাণা মনস্বিনী তিল তিল করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু যাঁদের জন্য তিনি তাঁর সব দিয়েছিলেন, সেই ভারতবাসী তাঁর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে তাকে কালের প্রহরিরূপে বসিয়ে রেখে নিজেরা যা খুশি তাই করে চলেছে। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখাশুনার ন্যূনতম যে দায়দায়িত্ব সেটুকুও তারা স্বীকার করে না। এই মহীয়সীর স্মৃতিস্তম্ভটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করে না যে-দেশের মানুষ, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অকারণ বিলাসিতার প্রয়োজন কি?

রাস্তাঘাট উন্নত করে যে-স্থানটি দার্জিলিঙের অন্যতম আকর্ষণ ও পর্যটনকেন্দ্র হতে পারত, স্থানীয় প্রশাসন, পার্বত্য পরিষদ্ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঔদাসীন্যে সেই জাতীয় তীর্থক্ষেত্র আজ যথার্থই শ্মশানচারিদের বিচরণভূমি! কী দুর্ভাগ্য ইতিহাসবিস্মৃত এই জাতির! কী অকৃতজ্ঞতা!

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রত্যেকের কাছে এবং সমগ্র দেশবাসীর কাছে স্থানটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
ড্রাইভারটোলা, কাটিহার-৮৫৪১০৫, বিহার

প্রসঙ্গ: 'উদ্বোধন'

গত একবছর থেকে আমাদের গ্রন্থাগারে আমরা 'উদ্বোধন' রাখছি। গত একবছরের অভিজ্ঞতায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই—অন্য কোন পত্রিকা 'উদ্বোধন'-এর তুল্য হতে পারে না। 'উদ্বোধন' যত প্রসারলাভ করবে ততই গণচেতনা বাঞ্ছিত পরিপূর্ণতা লাভ করবে। আমি নিজে একটি পত্রিকা বের করব অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম। কিন্তু এখন স্থির করেছি, বাংলাদেশে অসংখ্য পত্রিকার মধ্যে আরেকটি স্বল্পায়ু পত্রিকার জন্ম না দিয়ে বরং 'উদ্বোধন'-এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে নিজেকে নিবেদন করব। আমার মনে হয়েছে, এই কাজ শুধু একটি পত্রিকার কাজ নয়—একটি সুমহান আদর্শের প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার। আমি উত্তরবঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর জন্য গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে তৎপর হতে চাই। শিলিগুড়িতে আমাদের একটি কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা কাজ শুরু করতে চাই। এইভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যদি অন্যরা এগিয়ে আসেন তাহলে মনে হয়, 'উদ্বোধন'কে কেন্দ্র করে অদূর ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী ভাবান্দোলন গড়ে উঠতে পারে, যা আমাদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে আত্মস্থ হতে সাহায্য করবে।

বিজয় চক্রবর্তী
ডিরেক্টর-কাম-কনভেনার
অর্গানাইজিং কমিটি (অ্যাড হক)
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পুলিশ-পাবলিক
ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড সোস্যাল এডুকেশন
শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙ-৭৩৪৪০১

আমি 'উদ্বোধন'-এর একজন সামান্য গ্রাহক। প্রবাসে গত সাত বছর ধরে চাকরিজীবনে একা রয়েছি। আমার এই নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবনে 'উদ্বোধন' আমার একমাত্র বিশ্বস্ত ও একান্ত সঙ্গী। 'উদ্বোধন' পাঠ করে আমার বুদ্ধি শাণিত হয়েছে, মনের শান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমস্যা ও সঙ্কটে মানসিক শক্তি ও সাহস বেড়েছে। কথাগুলি আমি এমনি বলছি না, এ আমার মনের গভীর বিশ্বাস ও অনুভূতির কথা। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে'র এক-একটি বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা এত বলিষ্ঠ এবং এত সুন্দর যা আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করে। আমার মনে হয়, আমার মতো এই অনুভূতি 'উদ্বোধন'-এর অন্যান্য পাঠক-পাঠিকারও। প্রতিটি 'কথাপ্রসঙ্গে' আমার অন্তরে গভীরভাবে দাগ কেটে দেয়। আমার মনে হয়, 'কথাপ্রসঙ্গে' স্তম্ভটি যিনি লেখেন, তাঁর ওপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা আছে।

গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রঙ্গাপিল্লাই রোড, পণ্ডিচেরী-৬০৫০০১

'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যা পড়ে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেছি। প্রতিটি লেখাই আকর্ষণীয়। তবে আমার মনকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে 'স্মৃতিকথা' বিভাগের রচনাগুলি। গত ১৯৯৫ সালের শারদীয়া সংখ্যাটি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। সেখানে লাবণ্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের 'মাতৃস্মৃতি' পড়ে যে-তৃপ্তি লাভ করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তিনি মাতৃসান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য। তাঁর সুলিখিত মাতৃসান্নিধ্যের স্মৃতি এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনা পড়ে আমরাও ধন্য। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, পূজ্যপাদ সারদানন্দজী মহারাজের মুখের 'ধন্য' কথাটি যেন স্পষ্ট শুনছি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য

পার্ষদবৃন্দকে যাঁরা সাক্ষাৎ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতি যত প্রকাশিত হয় ততই আমাদের পক্ষে কল্যাণ। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যায় এই ধরনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি প্রকাশ করার জন্য 'উদ্বোধন'-এর প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গে একটি অনুরোধ জানাই। পরবর্তী কোন সংখ্যায় যদি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকচিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা থাকে তবে কৃতজ্ঞ থাকব। *

ইদানীং ডাকে 'উদ্বোধন' পাওয়ার ব্যাপারে গোলমাল দেখা যাচ্ছে। এই প্রবাসে 'উদ্বোধন' পড়ে যেন মা, ঠাকুর ও স্বামীজীর সান্নিধ্য পাই এবং তাতে মানসিক শান্তি ও শক্তি লাভ করি। সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যা নিয়মিত পাওয়ার জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করে থাকি এবং না পাওয়া ও না পড়া পর্যন্ত মনে খুব অশান্তি ভোগ করি। বুঝতে পারি, সাম্প্রতিক ডাকের গোলমালেই এই অনিয়মিত প্রাপ্তি হচ্ছে। তবুও আপনাদের কাছে আমার অনুভূতির কথা না জানিয়ে পারলাম না।

নমিতা চট্টোপাধ্যায়
টঙ্ক রোড, মহাবীর নগর
জয়পুর, রাজস্থান-৩০২০১৮

[*রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতীক নিয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে 'উদ্বোধন'-এর ৯৬তম বর্ষের ৫ম সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, মে ১৯৯৪) ২২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

—সম্পাদক, উদ্বোধন]

লেখকের কাছে জিজ্ঞাসা

'উদ্বোধন'-এর গত ৯৭তম বর্ষের ১০ম সংখ্যার (কার্তিক ১৪০২) ৫৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীতাপস বসু লিখিত 'সুন্দরের কবি কীটস' প্রবন্ধের প্রথম কলামের ১২-১৫ লাইনের বাক্যগুলির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বিনীত বক্তব্য রাখছি।

শ্রীবসু লিখেছেন: "শুধু নিত্য সৎ কাজ করে গেলাম, শুদ্ধ জীবনযাপন করে গেলাম, সততাকে অনুশীলন করে গেলাম—তাহলেই জীবন পূর্ণ হয়ে গেল? না!"

আমার ধারণা, যিনি এই তিনটি কাজ করে যেতে পারেন তাঁর জীবনে আর কিছু করণীয় থাকে না। আমরা পড়েছি, শ্রীভগবান শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। যিনি শুদ্ধ জীবনযাপন করতে পারেন, সততার অনুশীলন করে যেতে পারেন তাঁর চেতন বা অবচেতন মনেও কখনো তদ্বিপরীত ভাব বা চিন্তা আসে না। অবচেতন মনে কখনো অশুদ্ধ ভাব বা চিন্তা এলে গোটা জীবনব্যাপী শুদ্ধ চিন্তা করা যায় না। কখনো না কখনো অবচেতন মনের প্রভাবে অজানিতভাবেও অশুদ্ধ ভাব বা অশুদ্ধ চিন্তা আসবেই। এই প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন'-এর ঐ সংখ্যারই ৫৬৮ পৃষ্ঠায় প্রথম কলামের কথাগুলি দেখা যেতে পারে। সেখানে 'অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী নির্বাণানন্দজী বলছেন ঐ কথা স্বামী প্রেমানন্দজীর একটি উপদেশকে উদ্ধৃত করে।

যে-মানুষটি সারাজীবন সততার অনুশীলন করে গেলেন, জীবনের কোন অবস্থাতেও এমনকি বিপর্যয়ের মধ্যেও কখনো সততার পথ থেকে সরে গেলেন না বা সে-চিন্তাও এল না—না চেতন মনে না অবচেতন মনে—তাঁর আর বাকি কী রইল? যিনি সৎকাজ সতত করে গেলেন, যাঁর ব্যবহারে বা মনে বা চিন্তায় অসৎ কাজ বা অসৎ কাজের চিন্তাও জাগল না—তিনি তো ঋষিকল্প ব্যক্তি। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী এইরকম মানুষই চেয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়। অবশ্য শ্রীবসু উপরিউদ্ধৃত বাক্যগুলির পর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মতে সত্য ও সততার সাধনা বলতে যা বুঝিয়েছেন তাও ব্যাখ্যা করেছেন। তবু এই কথাগুলি আমার মনে হলো। শ্রীবসুকেও 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী' মারফত তাঁর বক্তব্য জানানোর এবং আমার ভুলত্রুটি থাকলে তা শোধরাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মদনমোহন সাহু
পদ্মনাথ লেন
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রসঙ্গ: 'অমৃতাভ'

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সঙ্গে পরিচয় আমার জীবনের এক শুভ ঘটনা। এই বুদ্ধিদীপ্ত ও মধুরবাক্ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের প্রেরণায় নবীন বয়সে গৃহসুখ ছেড়ে অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশ করেছেন। মানবতাবাদী কর্মযোগী মানুষটির স্বার্থবর্জিত জীবনচর্চার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাঁর দীপ্ত ও তন্ময় ভাবুকতাযুক্ত, শব্দশ্রীমণ্ডিত প্রবন্ধগুলির আমি ছিলাম মুগ্ধ পাঠক, কিন্তু তিনি যে একজন মরমী কবিও তা আমার জানা ছিল না। 'উদ্বোধন'-এর মাঘ ১৪০২ সংখ্যায় তাঁর 'অমৃতাভ' কবিতাটি আমার কাছে এক মধুর বিস্ময়রূপেই এসেছে। "সর্পচক্ষু জুডাসের দল/বিশ্বজুড়ে করিতেছে বিষাক্ত মন্ত্রণা", "মর্ত্যের কস্তুরী-মৃগ মাথা কুটে মরে/নিষ্ফল আক্রোশে" এসব পঙ্‌ক্তির অনুরণন মর্মের মধ্যে থেকে যায়! হিংসামত্ত পৃথিবীকে শান্ত করার জন্য, পবিত্র করার জন্য, বাসযোগ্য করার জন্য একজন খ্রীস্টের আজ বড়ই প্রয়োজন। 'অমৃতাভ' পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার কোন কোন পঙ্‌ক্তি মনে পড়ছিল—সেখানে মাথায় কাঁটার মুকুটপরা এক মানবপুত্রের কথা ছিল। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীই বলেছেন মানুষকে ভালবাসাই একমাত্র মুক্তিমন্ত্র। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কবিতাটি 'উদ্বোধন'-এর পাঠকদের কাছে এক সেরা উপহার—আবেগে রোমান্টিক, শব্দপ্রয়োগে ক্লাসিক। কবিতা তিনি আরও লিখুন।

মঞ্জুভাষ মিত্র
করুণাময়ী, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১

বিশেষ রচনা

শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

জগন্নাথ-মন্দিরের চারটি অংশ। গর্ভমন্দির ও জগমোহন—এই দুটি প্রাচীনকালের বলে মনে হয়। উড়িষ্যার মন্দির সংক্রান্ত প্রাচীন পুঁথি 'মাদলাপাঞ্জী'র হিসাব অনুযায়ী সোমবংশীয় রাজা যযাতি কেশরী দ্বিতীয় মন্দির করেন সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক সময়ে। ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রথম ও প্রাচীনতম মন্দির তার বহু আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে দ্বিতীয় মন্দিরও ধ্বংস হয়। গঙ্গবংশীয় রাজা চোড়গঙ্গদেব এই তৃতীয় ও বর্তমান মন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ করেন। তবে এটি সম্পূর্ণ হয় ১১৩৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা অনঙ্গভীমদেবের আমলে। কারো কারো মতে এটি দ্বাদশতম মন্দির। এর আগে এগারবার এই মন্দির নষ্ট হয়েছে ও পুনঃসংস্কৃত হয়েছে। দ্বাদশ শতকের তৈরি এই মন্দিরের বিমান বা গর্ভগৃহ ও জগমোহনটি প্রায় ৮০০ বছরের পুরনো। মূল মন্দিরের উচ্চতা রাস্তা থেকে ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি। উড়িষ্যায় সবচেয়ে উঁচু মন্দির এটি। এর পরেই ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লিঙ্গরাজের মন্দির। উড়িষ্যায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-রীতির এটি অনবদ্য নিদর্শন। এই মন্দিরে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয় ১২৩০ খ্রীস্টাব্দে। পঞ্চরথ প্রথায় নির্মিত এই মন্দির তৈরি করতে সেকালে খরচ হয়েছিল আজকের হিসাবে ৯২৫০ কিলোগ্রাম সোনার দাম যত হয় তত টাকা। এরপরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যথাক্রমে নাটমন্দির (৬৯ × ৬৭ ফুট) ও ভোগমণ্ডপ (৫৮ × ৫৬ ফুট) কোন রাজা তৈরি করিয়ে দেন। মূল মন্দিরের শীর্ষে ২১৪ ফুট উঁচুতে অষ্টধাতুর তৈরি একটি ৩৬ ফুট ব্যাসের চক্র প্রোথিত আছে। চক্রটি 'নীলচক্র' নামে প্রসিদ্ধ। চক্রটি ২ ফুট পুরু। এই চক্রটির সঙ্গে ৩০০ ফুট লম্বা ও ৪ ইঞ্চি চওড়া একটি ধাতুর পাত বজ্রনিরোধক হিসাবেও কাজে লাগে। তখনকার কারিগরদেরও কতখানি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ছিল তা আমরা ধারণা করতে পারি। এই চক্রের মাথার ওপর একটি বিশাল পতাকা টাঙানো হয়, যার দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট। এই পতাকার নাম 'পতিতপাবনবানা'। বহুদূর থেকে ভক্তেরা 'নীলচক্র' ও 'পতিতপাবনবানা' দর্শন করে করজোড়ে প্রণাম জানায় নীলাদ্রিবিহারী শ্রীজগন্নাথকে।

এই মন্দিরে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার আগে ১১৩৫ থেকে ১২৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন সম্ভবতঃ মুক্তিমণ্ডপ-সংলগ্ন প্রাচীন নৃসিংহ-মন্দিরে। নৃসিংহ-মন্দিরের দরজার চৌকাঠের দুপাশে বেশ কয়েকটি শিলালিপিতে এই রকমই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মূল মন্দির ও তার আশপাশে ৩০টি ছোট-বড় প্রাচীন মন্দির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা-রানীরা তৈরি করে দেন। এছাড়া এই মন্দিরমণ্ডলী বেষ্টন করে পাথরের দুটি বিশাল প্রাচীর দুর্গপ্রাকারের মতো ঘিরে রেখেছে বিগ্রহদের। রাস্তা থেকে সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকতেই প্রথম যে-প্রাচীর তার নাম 'মেঘনাদবেড়' আর তারপরে ভিতরের দিকে দ্বিতীয়টির নাম 'কূর্মবেড়'—দুটির উচ্চতা ২০ থেকে ২৪ ফুট। রাজা কপিলেন্দ্রদেব (১৪০৫-১৪৬৭) এবং রাজা পুরুষোত্তমদেবের (১৪৬৭-১৪৯৭) আমলে এই প্রাচীর তৈরি হয়েছিল। পুরো মন্দির-চত্বরটি ১০.৭ একর জায়গা জুড়ে। এই প্রাচীর-দুটির পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে যাতায়াতের জন্য চারটি 'দ্বার' আছে—সিংহদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, হস্তিদ্বার ও অশ্বদ্বার। যাত্রীদের প্রধান প্রবেশপথ সিংহদ্বার পূর্বদুয়ারী।

ব্রহ্মচারীকে এবারে আমি প্রশ্ন করলাম : "এবার তো শুনছি 'নবকলেবর' হচ্ছে। এই 'নবকলেবর' সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বল—তুমি তো এই দেশে বেশ কিছুদিন আছ। এখানকার বিশিষ্ট পাণ্ডা, পুরোহিত, গবেষক ও লেখকরা এবিষয়ে কি বলেন তুমি কি জান?" লাজুক ব্রহ্মচারী অনেক ওজর-আপত্তি করে অবশেষে আমাকে শোনাতে লাগল এক অদ্ভুত কাহিনী, যা আমার জানা ছিল না।

সে বলে চলল : "উড়িষ্যার ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ ও দুঃখজনক অধ্যায় হচ্ছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ। বিশেষ করে আফগান ও মোগল আমলে বারবার উড়িষ্যা আক্রান্ত হয়েছে। এখানকার বিখ্যাত সব দেবদেউল ধ্বংস হয়েছে। দেববিগ্রহ হয়েছে কলুষিত। লুণ্ঠিত হয়েছে ধনরত্ন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচারিত হয়েছে বহুবার। আর সেই অত্যাচারের আমলে স্বয়ং

নীলাচলাধিপতি শ্রীজগন্নাথদেবকেও কখনো কখনো নির্বাসিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে। কখনো পাণ্ডারা বহিঃশত্রুর আগমন-সংবাদ আগেই জানতে পেরে তাঁকে দূরে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, কখনো কোন গভীর অরণ্যে, কখনো সমুদ্রের তীরে বা চিল্কাহ্রদের তীরে কোন গোপন স্থানে। উড়িষ্যার বহু শিলালিপিতে এর প্রমাণ আছে। বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীতে সুলেমান কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচার সবকিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পূর্বে নিষ্ঠাবান হিন্দু—পরে ধর্মান্তরিত কালাপাহাড়ের প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা-স্পৃহা ছিল অকল্পনীয়। উড়িষ্যায় প্রাচীন বিধিনির্দেশক 'মাদলাপাঞ্জী'র মতানুসারে, কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ করে জগন্নাথ-মন্দিরের সামনে এসে তোপের সাহায্যে মন্দিরের প্রাচীরের কিছু অংশ ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখে মন্দির বিগ্রহশূন্য। কালাপাহাড়ী তাণ্ডবের আগেই আঁচ পেয়ে পাণ্ডা ও পুরোহিতরা বিগ্রহদের সরিয়ে চিল্কাহ্রদের কাছে পরিকুডাগড়ের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।

"কালাপাহাড় তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে কোনভাবে সে-খবর জানতে পেরে সেখানে ছুটে যায় ও বিগ্রহের সন্ধান পায়। হিংস্রক্রোধে উন্মত্ত কালাপাহাড় সেখান থেকে বিগ্রহগুলিকে তুলে এনে হাতির পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সীমানায় হুগলী নদীর তীরে। এখানে এসে আক্রোশে ক্ষিপ্ত কালাপাহাড় অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তাতে বিগ্রহগুলি নিক্ষেপ করে।

"এদিকে চিল্কার তীর থেকে যখন জগন্নাথ-বিগ্রহদের হাতির পিঠে তুলে আনা হয়, সেইসময় থেকেই বিশরা মোহান্তী নামে একজন ভক্তিমান বৈষ্ণব অত্যন্ত গোপনে কালাপাহাড়ের বাহিনীকে অনুসরণ করে গঙ্গাতীর পর্যন্ত চলে আসেন। বিগ্রহদের অগ্নিতে নিক্ষেপ করে দস্যুদের চলে যাওয়ার পরে বিশরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই অর্ধদগ্ধ বিগ্রহদের কাছে গিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করে তাদের অভ্যন্তরস্থ 'ব্রহ্মবস্তু'গুলি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। বাকি অংশ গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে সেই পবিত্র 'ব্রহ্মবস্তু'গুলি একত্র করে একটি মৃদঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে সেটিকে গলায় ঝুলিয়ে পুরীর দিকে রওনা দেন। দীর্ঘপথ ভগবানের নামকীর্তন করতে করতে উড়িষ্যায় সমুদ্রতীরে বনজঙ্গলে ঘেরা সান্ধারাজাদের প্রায় পরিত্যক্ত দুর্গ কুজঙ্গগড়ে এসে তিনি আশ্রয় নেন। এটি কটক জেলার অন্তর্গত। এখানে শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর ও গণেশের একটি প্রাচীন মন্দিরে সেই 'দেহাবশেষ ব্রহ্ম'কে রেখে তিনি সুদিনের অপেক্ষা করতে থাকেন।

"এই ঘটনাটি ঘটে সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি। গভীর অরণ্যকুঞ্জে দারুব্রহ্মের অবস্থানের জন্য তাঁর নাম এই অঞ্চলে 'কুঞ্জবিহারী' বলে প্রচার হয়। ক্রমে কুজঙ্গগড়ের রাজা মল্লিক সান্ধা নরেন্দ্র বাহাদুর জানতে পারেন বিশরা মোহান্তী কিভাবে দারুব্রহ্মের পূত দেহাবশেষ নিয়ে ক্রমে এখানে গুপ্তভাবে সেবা করছেন। অন্য মতে, রাজা স্বপ্নাদেশে এই কথা জানতে পেরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভক্তির সঙ্গে সেই 'ব্রহ্মবস্তু'কে এনে মন্দির করে প্রতিষ্ঠা করেন।

"কুজঙ্গগড়ের কাছে এখনো একটি পাড়া আছে যার নাম 'গুণ্ডিচাপাড়া'। তাতে মনে হয়, ব্রহ্মবস্তুর সেখানে অবস্থানকালে তাঁদের নিয়ে রথযাত্রাও হতো আর তিনটি রথে ব্রহ্মবস্তুগুলি গুণ্ডিচাপাড়া পর্যন্ত নিয়েও যাওয়া হতো। যাইহোক উড়িষ্যার মধ্যযুগের রাজবংশের পতনের পর ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাতবছর পুরী মুসলমান শাসনাধীন ছিল। এই সময় দেববিগ্রহগুলি না থাকায় পুরীতে রথযাত্রাও বন্ধ ছিল।

"এরপরে প্রবল প্রতাপ রাজা গজপতি রামচন্দ্রদেব উড়িষ্যার শাসনকর্তৃত্ব ফিরে পেলে নতুন করে মন্দির সংস্কার করিয়ে বিগ্রহদের খোঁজ করতে শুরু করেন। কেউ বলে স্বপ্নাদেশ পেয়ে, কেউ বলে লোকমুখে সংবাদ পেয়ে পদ্মনাভ পট্টনায়েক নামে একজন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীকে তিনি কুজঙ্গগড়ে পাঠান সঠিক সংবাদ আনতে। এইভাবে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বিগ্রহগুলিকে তাঁর রাজধানী খুরদায় ফিরিয়ে আনা হয়। বিশরা মোহান্তীকে তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য বিশেষ রাজকীয় উপাধি দেওয়া হয়। আর রাজা রামচন্দ্রদেব এই নতুনভাবে মন্দির সংস্কার ও বিগ্রহদের আনার জন্য উড়িষ্যাবাসীর কাছে 'অভিনব ইন্দ্রদ্যুম্ন' নামে খ্যাত হন। কারণ, তিনিই আবার নতুন করে এই শ্রীবিগ্রহদের প্রতিষ্ঠা করেন।

"সেই ১৫৭৫ থেকে আবার যথাবিধি দারু সংগ্রহ করে শাস্ত্রোক্ত সব নিয়ম মেনে তিনটি নতুন বিগ্রহ তৈরি করিয়ে তাতে এই ব্রহ্মবস্তু স্থাপন করে পুরীর সংস্কৃত মন্দিরে ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জুলাই তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইভাবেই শ্রীজগন্নাথদেবের 'নবকলেবর' উৎসব শুরু হয় ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এটাই 'মাদলাপাঞ্জী'র অভিমত।

"এরপরে প্রায় তিনশ বছর 'নবকলেবর' সংক্রান্ত কোন

সংবাদ 'মাদলাপাঞ্জী'তে পাওয়া যায় না। একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'নবকলেবর'-এর খবর দেখা যায়—১৮৬৩ এবং ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে দুবার। আর এই শতাব্দীতে এপর্যন্ত ১৯৩১, ১৯৫০, ১৯৬৯ ও ১৯৭৭-এ চারবার 'নবকলেবর' হয়েছে। এবছর (গত ১৪ জুন ১৯৯৬—গত সংখ্যায় ভুলক্রমে '১৪ জুলাই' বলে মুদ্রিত) এই শতাব্দীর শেষ 'নবকলেবর' অনুষ্ঠিত হলো।

"'নবকলেবর' পুরীর জগন্নাথদেবের উৎসবাদির মধ্যে একটি অতি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। সাধারণতঃ কোন বছর আষাঢ় মাসে যদি দুটি অমাবস্যা পড়ে তবে সেই 'মল' আষাঢ় মাসকে 'অধিমাস' বা 'পুরুষোত্তম মাস' বলে। এইরকম জোড়া অমাবস্যা-যুক্ত আষাঢ় মাস সাধারণতঃ ১২/১৫ বছর অন্তর পড়ে, কখনো তার বেশিও হয়। এই 'পুরুষোত্তম মাসে'ই শ্রীচতুর্দারুমূর্তির পুরনো বিগ্রহ থেকে 'ব্রহ্মবস্তু' বের করে এনে নতুন বিগ্রহে স্থাপন করা হয়। তাই একে বলে 'নবকলেবর'। এই নবকলেবর অনুষ্ঠানে অনেক বিধি আছে, যা একেবারে শাস্ত্র মেনে অক্ষরে অক্ষরে আজও পালন করা হয়।"

এই প্রসঙ্গ যখন চলছে সেই সময় আমাদের সামনে একটি ২০/২২ বছরের সুদর্শন যুবক এসে দাঁড়াতেই আমার সঙ্গী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল: "আরে মেঘ না চাইতেই জল; এই তো রাজা এসে গিয়েছে। এবার এবছরের এই বিশেষ অনুষ্ঠান 'নবকলেবর' সম্পর্কে সেই আপনাকে সব বিস্তারিত বলতে পারবে। রাজা হচ্ছে পুরীর মন্দিরের প্রধান দয়িতাপতি, যিনি শ্রীজগন্নাথের দারুর খোঁজ করতে গিয়েছেন—সেই বাড়গ্রাহী শ্রীজগন্নাথ সাঁই মহাপাত্র বা জগুনীবাবুর ছেলে। রাজা আমাদের মিশন লাইব্রেরির সদস্য ও আমাদের নানা কাজের উৎসাহী কর্মী। সে একেবারে ঠিক ঠিক সংবাদ দিতে পারবে।"

সপ্রতিভ রাজা আমাকে এর আগে দেখেছে এখানে। চেনেও, তাই নমস্কার করে বলল: "যতটা জানি, সবই বলব।" তাদের পরিচয়-প্রসঙ্গে প্রথমেই সে বলল: "এই দয়িতাপতিরা হচ্ছেন শবররাজ বিশ্বাবসুর বংশধর। এঁদের আদিপুরুষের কাছে নীলমাধব প্রথম ধরা দিয়েছিলেন। বিশ্বাবসু হচ্ছেন দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যে জরাব্যাধের শরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন সেই ব্যাধেরই পরবর্তী জন্মের শরীর। শ্রীকৃষ্ণের সেই পবিত্র শরীর প্রভাসের সমুদ্রসঙ্গমে পাণ্ডবেরা দাহ করার পরে তাঁর নাভিকুণ্ডলী যা সঙ্গমে বিসর্জন করা হয়েছিল সেটি ভাসতে ভাসতে বহুকাল পরে এই উড়িষ্যার বাঁকীনদীর মোহনার কাছে আসে। দৈবক্রমে জরাব্যাধেরই নতুন শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করা বিশ্বাবসু শবর সেই দিব্য দেহাবশেষ সমুদ্র থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে গোপনে পূজা শুরু করেন নীলগিরির অরণ্যগুহায়। সেটি নীলমাধব। বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির বিবাহের পরে যে-সন্তানাদি হয় তারাই 'দয়িতাপতি' বলে পরিচিত। 'শবর' বলে এঁরা 'দৈত্য', তা থেকে 'দয়িত' এবং বিদ্যাপতির বংশ বলে তার 'পতি' অংশ জুড়ে এঁরা হলেন 'দয়িতাপতি'। জগন্নাথের সেবায় এই দয়িতাপতিদের বিশেষ ভূমিকা আছে। বিশেষ করে রথযাত্রাকালে ও নবকলেবরের সময় তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মে অংশগ্রহণ করেন।

"এখন এই নবকলেবরের অনুষ্ঠানাদির কথা বলি। পুরুষোত্তম মাস যে-বছর পড়বে তার আগের চৈত্রমাসের শুক্লা দশমীর দিন পুরীর গজপতি রাজা একটি নির্দেশনামা জারি করেন, যাতে পুরীর বৈদিক ক্রিয়াদিতে দক্ষ ব্রাহ্মণদের এবং দয়িতাপতিদের বলা হয়—তাঁরা যেন যথাবিধি সব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহ-চতুষ্টয়ের জন্য 'নিম্ব' গাছ খুঁজতে বের হতে তৈরি হন। এটি প্রাথমিক বিধি। রাজা সুপারী এবং নারকেল, সোনা, রূপা এবং লোহার কুঠার দেন রাজগুরুকে, রাজগুরু সেগুলি দেন বিশ্বাবসুর বংশধরদের। এবছর এই অনুষ্ঠান হয়েছে রামনবমীর পরদিন ১৫ চৈত্র, ২৯ মার্চ। রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এই দলটি যায় আনন্দবাজারের পথে মূল মন্দিরে। সেখানে মন্দিরের মুখ্য সেবায়েত ভিতরছু মহাপাত্র শ্রীমধুসূদন শৃঙ্গারী, যিনি আবার রামকৃষ্ণ মঠেরও পাণ্ডা—তিন বিগ্রহের অনুমতি হিসাবে তিনটি প্রসাদী 'আজ্ঞামালা' এনে দয়িতাপতিদের হাতে সমর্পণ করেন। সেখান থেকে এসে এই দলটি গর্ভমন্দিরের কাছে 'অনবসর পিঁড়ি'তে প্রার্থনা করে। মন্দিরের পক্ষ থেকে এঁদের নতুন পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় দেওয়া হয় এই শুভকাজে যাত্রাকালে ব্যবহার করবার জন্য।

শ্রীবিগ্রহগণের দ্বিপ্রহরের ভোগ শেষ হওয়ার পর তাঁদের প্রণাম জানিয়ে ও আশীর্বাদ নিয়ে প্রায় ১৫০ যাত্রীর একটি দল রওনা হয়েছিল 'দারু'র সন্ধানে।

[ক্রমশঃ]

সব ফেলে দাও, সব ছেড়ে দাও, উঠে এস

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সব ফেলে দাও।

ঘর-সংসার, বিষয়-সম্পত্তি, টাকাপয়সা—আসক্তির যাবতীয় খেলনা। দুহাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলে যা যা। যেসব জিনিসের পাওয়া আর না পাওয়ায় তোমার আকাঙ্ক্ষা টাপুরটুপুর করত মাছধরার ফাতনার মতো। সব ফেলে দাও।

সব ছেড়ে দাও।

পরিবার-পরিজন, প্রিয়-অপ্রিয়, অভ্যাস, সংস্কার। যাদের নিয়ে বাঁচার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়েছিলে, সব ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও তোমার সব পছন্দ, সব অপছন্দ। ফিরে তাকিও না।

উঠে এস!

পরিকীর্ণ জীবন থেকে উঠে এস। তোমার সময় হয়ে গেছে। বন্দরের বন্ধনকাল শেষ হয়ে গেছে। এসেছে আদেশ। খেয়া প্রস্তুত জীবনপারাবারের তীরে। উঠে এস। প্রবাসে ছিলে স্ববাসে চল।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই মানসিক ব্যায়ামটি আমাদের রোজ একবার করে করতে বলেছেন। মৃত্যুরূপী মা যেন এসে বলছেন: 'সব ফেলে দাও।' শিশুর হাত থেকে সব পড়ে গেল। ধুলোবালি, পুতুল, নুড়ি। উঠে দাঁড়াল সে। 'সব ছেড়ে দাও।' সঙ্গিসাথীদের দিকে করুণ চোখে তাকানো। মা ডাকছেন। যাচ্ছি ভাই। 'উঠে এস।' তোমার ঐ মোহের খেলাঘর থেকে উঠে এস। চেতনায় উঠে এস। তলা দিয়ে বয়ে যাক সংসারের ফেনিল স্রোত।

আরবের অজ্ঞাত এক জ্ঞানী সন্ন্যাসী বলেছেন: "This world and the other world are like the two wives of one and the same husband—if you please one, you make the other envious." (এপার আর ওপার, জীবন ও মৃত্যু একই স্বামীর দুই স্ত্রী। জীবনকে তুষ্ট করলে মৃত্যু অসন্তুষ্ট। দুটিকেই সমান খাতির করতে হবে।)

মারোয়াড়ী ভক্ত প্রশ্ন করছেন: 'মহারাজ, মরলে কি হয়?'

ঠাকুর মরতে বলছেন না। মরলে তো মরেই গেলে। তাহলে আর পেলে কী! মৃত্যু তো তোমাকে শেখাবে। জীবন শেখাবে। আষ্টেপৃষ্ঠে সংসার জড়িয়ে, 'বাবা রে, মা রে, গেল গেল রে, উঃ রে, আঃ রে' করতে করতে হয় অম্বলে, নয় ক্যানসারে অথবা সেরিব্র্যালে, শেষে পোড়াই যন্ত্রে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেড় কেজি ছাইয়ের একটি পলিপ্যাক! ওরই মধ্যে যত পরিচয়, বংশলতিকা, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা, স্ট্যাটাস, অফিসের উচ্চপদ, যাবতীয় লব্বাই-চব্বাই। ফুঃ, উড়ে গেলেন ঘোষ, বোস, মিত্তির, লাহিড়ী, সান্যাল। খুব বড় কেউকেটা হলে কোথাও একটা স্মরণসভা। সাতটা লোক, সত্তরটা চেয়ার। ঘণ্টাখানেক কথার মারপ্যাঁচ। এক মিনিট নীরবতা। কোন এক স্মরণসভায় নবিস এক সভাপতি দশ মিনিট নীরবতা ঘোষণা করলেন। সভায় গুঞ্জন—এ নিশ্চয় স্কুলমাস্টার। ছাত্র ভেবে পড়া না পারার শাস্তি দিলেন। কানে কানে কথা। 'অ্যামেন্ড' করে এক মিনিট হলো। কত বড় লোক হে! দশ মিনিট দাঁড়াতে হবে! গান্ধী, নেহরুও তো এক মিনিট। স্ট্যান্ডার্ড রেট। ভগবান মারা গেলে দশ মিনিট ভাবা যেতে পারে। তবে দয়ালু তিনি, মরে আমাদের মারবেন না।

সংসারে যতদিন থাকা, আখ-মাড়াই কলে ছিবড়ে হওয়া। মরে গেলে সকলের একটু দুঃখ হলো। কেউ বললে, সাধু ছিল; কেউ বললে শয়তান। পরিবারের ঘণ্টাখানেক ফ্যাঁসফোঁস। মাসখানেক আনমনা। ঠাকুর বলছেন, অতঃপর! শোক মসৃণ। চুলে তেল, আয়নার সামনে উপবেশন, নিবিষ্ট হয়ে চুল ফেরানো, তাম্বুল চর্বণেও আপত্তি নেই। সেজেগুজে বড় পুত্তুরের বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে ছুটলেন। দেনা-পাওনার ফিরিস্তি।

মৃত্যুচিন্তার বিশুদ্ধ আগুনে 'কাঁচা আমি'টাকে রোজ পোড়াও। বিবেক-বৈরাগ্যের হাতুড়ি দিয়ে পেটাও। 'পাকা আমি' তৈরি কর। 'বদ্ধ আমি'কে 'মুক্ত' কর। রোজ খাঁচা খুলে তাকে একবার উড়তে দাও অনন্ত আকাশে। আমার বউ, আমার ছেলে, আমার নাতি, আমার নাতনি। আহা! কামিনী-কাঞ্চনে কত সুখ! সংসার কত ভরসার জায়গা! তিলে তিলে মারছে, তাও কত আনন্দ! কত নির্ভয়ের জায়গা! And the clock strikes twelve. তারার আকাশ, ছায়াপথ, শিয়রে ছায়া ছায়া মানুষ, ঝাপসা একটা বোতল, ধমনীতে বিন্দু বিন্দু নুনজল, ডুকরে কেঁদে উঠল প্রাণের কুসুম পরিবার—"ওগো! তুমি তো চললে, আমার কি করে গেলে?" সে-কথার উত্তর পরে, এ কি অপচয়ের দৃশ্য! দেউলে করে দেবে নাকি! প্রদীপটাতে বেশি সলতে, "তেল পুড়ে যাবে যে, সলতে কমিয়ে দাও।"

একালে প্রদীপ নেই, বিদ্যুৎ। খাবি খাচ্ছে, আর বলছে : "এত আলো কেন জ্বলছে! গত মাসে সাতশ টাকার বিল এসেছিল।" এইটাই হয়তো হলো শেষ কথা! আত্মা 'সাতশ, সাতশ' করতে করতে উড়ে গেল আকাশে।

মরতে হবেই। সব ফেলতে হবে, ছাড়তে হবে। অনিত্য থেকে নিত্যতে যেতে হবে। কোথায় যাব, কি আছে সেখানে সেসব পরের কথা। আগের কথা, আমি আজ আছি, কাল নেই। ঠাকুর বলছেন, জীবন একটা বিকার। ভিতরে বিকার। গান গেয়ে বলছেন—"এ কি বিকার শঙ্করী! কৃপা চরণতরী পেলে ধন্বন্তরি।" আরেকটু স্পষ্ট করছেন—"বিকার বইকি। দেখ না, সংসারীরা কোঁদল করে। কি লয়ে যে কোঁদল করে তার ঠিক নাই। কোঁদল কেমন! তোর অমুক হোক, তোর অমুক করি। কত চেঁচামেচি, কত গালাগাল!"

মহেন্দ্রনাথ আরেকটি কথা যোগ করলেন—"অবিদ্যার সংসার দাবানলতুল্য।"

লোকে টাকা টাকা করে মরে। হাওলা, গাওলা, শেষপর্যন্ত তিহার জেলে পাকাপাকি বসবাস। এটা একালের। সেকালের চিত্র ঠাকুর দেখাচ্ছেন—"দেখ না, টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন [ঠাকুরের ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে জয়গোপাল সেন ছিলেন অন্যতম। কলকাতার মাথাঘষা গলিতে তাঁর গৃহে ঠাকুর মাঝেমধ্যে যেতেন, ধর্মালোচনা হতো।], অত টাকা আছে, কিন্তু দুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে না।"

কিছু পাওয়া, কিছু না পাওয়া, অনেক পাওয়া অথচ একটা এমন কিছু না পাওয়া যার ফলে সমস্তটাই না পাওয়া—এই হলো সংসারচক্র। কেউ ঢোকে, কেউ ঢোকে না। বাইরে থেকে মজা দেখে চলে যায়। ঠাকুর বলছেন, তাদের শুদ্ধ সংস্কার। বলছেন : "এখানে অনেক ছোকরা আসে, কিন্তু কেউ কেউ ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল। তারা সংস্কার নিয়ে এসেছে। সেসব ছোকরা বিবাহের কথায় অ্যাঁ, অ্যাঁ করে! বিবাহের কথা মনেই করে না।" আবার অন্যরকমও আছে। ঠাকুর মজা করে বলছেন : "অন্য ছোকরারা কি করে বেড়াচ্ছে! কিসে টাকা হয়—বাড়ি, গাড়ি, পোশাক, তারপর বিবাহ—এইজন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়ায়। বিবাহ করবে—আগে কেমন মেয়ে খোঁজ নেয়। আবার সুন্দর কিনা, নিজে দেখতে যায়।"

ঠাকুর যে উভয় ধরনের জন্যই এসেছিলেন। কলের বাইরে যারা, তাদের জন্য অকুণ্ঠ অকৃত্রিম ভালবাসা। বলছেন : "একজন আমায় বড় নিন্দে করে। কেবল বলে, ছোকরাদের ভালবাসি। যাদের সংস্কার আছে—শুদ্ধ আত্মা, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, টাকা, শরীরের সুখ এসবের দিকে মন নাই—তাদেরই আমি ভালবাসি। আর যারা সংস্কারদোষে সাধ করে কলে পড়ে গেছে, তাদের পরিণতির কথা ভেবে পথ বলে দি।"

একদিন হাজরা মশাইকে বলছেন : "তুমি যখন জপ একদিন কচ্ছিলে—বাহ্যে থেকে এসে বললাম, মা, একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে!—যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপ অত করতে হবে না। তুমি কলকাতায় যাও না—দেখবে হাজার হাজার মালা জপ করছে—খানকী পর্যন্ত।"

মালা জপ আর নোট গোনা—দুইই এক হয়ে যায় যদি ভাব না আসে। এমনি না আসে, রোজ একবার করে মৃত্যুকে শিয়রে বসাও। চিতার আগুন হলো জ্ঞানাগ্নি। মানুষের মোহভঞ্জনের কড়া দাওয়াই। ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন, সংসার অনিত্য; আর সর্বদা মৃত্যুস্মরণ করা উচিত। পরের কথা গানে প্রকাশ করছেন—

"ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুল না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে॥"

বলছেন : "ডুব দাও, উপরে ভাসলে কি হবে? দিন কতক নির্জনে, সব ছেড়ে, ষোল আনা মন দিয়ে তাঁকে ডাক।"

জীবনের জন্য মৃত্যুসাধনা, আবার মৃত্যুর জন্যও মৃত্যুসাধনা। বৌদ্ধরা এই দর্শনেই বিশ্বাসী। এইটাই তাঁদের ধর্ম—মিলারেপা বললেন—"My religion is to live—and die—without regret." বৌদ্ধরা দেখছেন এইভাবে—"Life and death are seen as one whole, where death is the beginning of another chapter of life. Death is a mirror in which the entire meaning of life is reflected." বৌদ্ধদের আক্ষেপ—"Most people die unprepared for death, as they have lived, unprepared for life."

ঠাকুরেরও সেই একই শিক্ষা—মৃত্যুর দর্পণে জীবন দেখ, জীবনযন্ত্রণা থাকবে না। আবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, পরের বার তো আসতে হবে। ভরতরাজা মৃত্যুর সময় হরিণ ভেবেছিলেন, জন্মালেন হরিণ হয়ে। যদু মল্লিকের মাকে বলছেন : "যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসারচিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলেমেয়ের চিন্তা—উইল করবার চিন্তা—এইসব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নামজপ, নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে, মৃত্যুসময় তাঁরই নাম মুখে আসবে।" □

বিজ্ঞান

অন্ধরাও চক্ষুদান করতে পারেন

চোখ আমাদের এক অতি মূল্যবান অঙ্গ। এই চোখের সাহায্যেই আমরা বৈচিত্র্যময় বিশ্বে রূপ দর্শন করি। চক্ষুহীন অর্থাৎ দৃষ্টিহীন ব্যক্তির নিকট এই বৈচিত্র্যময় সুন্দর জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়ে তাদের অন্ধকারজগৎ থেকে আলোর জগতে নিয়ে আসতে অনেকাংশে সফল হয়েছে। চোখের কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে চক্ষু-শল্যচিকিৎসকগণ বর্তমানে অনেককেই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, অন্ধত্বের নানা কারণ থাকলেও আমাদের দেশে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা।

চোখের গঠন ঃ

আমাদের চোখ প্রায় গোলাকারই বলা যায়। চোখ-দুটো হাড়ের দুটো কোটরে বসানো থাকে। দুটো শক্ত পেশী চোখ-দুটিকে এই কোটরের মধ্যে ধরে রাখে। কারো চোখের দিকে তাকালে আমরা দেখি, মধ্যে গোল কালো অংশ এবং তার চারধারে সাদা অংশ। সাদা অংশের নাম স্ক্লেরা (sclera), এর ওপর সংলগ্ন হয়ে রয়েছে একটি স্বচ্ছ পরদা কনজাংটিভা (conjunctiva), যার প্রদাহ হলে বলা হয় 'কনজাংটিভাইটিস'। কালো গোল অংশের নাম কর্নিয়া (cornea); এটি স্বচ্ছ, তবে এর পিছনে কালো 'আইরিশ' থাকে বলে এটিকে কালো দেখায়। আইরিশের মধ্যখানে ছিদ্র বা ফুটো আছে, তাকে বলে পিউপিল (pupil)। এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে লেন্সে এসে পড়ে। এই লেন্সই আলোর তরঙ্গকে প্রতিসৃত (refracted) করে চোখের পিছনের পর্দা রেটিনায় ফেলে। রেটিনাতে আলোক অনুভূতি সৃষ্টি করলে তা অপটিক নার্ভ-বাহিত হয়ে চলে যায় মস্তিষ্কের পিছনের অংশে অবস্থিত দর্শন অঞ্চলে। এই অঞ্চলের নির্দেশেই আমরা বস্তুটি দেখি। যদি কর্নিয়া কোন কারণে অস্বচ্ছ হয়ে যায় তবে দর্শনক্রিয়া ব্যাহত হয়। তখন অস্বচ্ছ কর্নিয়া বাদ দিয়ে তার স্থলে অন্যের স্বচ্ছ কর্নিয়া স্থাপন করলেই রোগী পুনরায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

কর্নিয়া বদল ঃ

১৭৭১ সালে ফরাসী দেশের পেলিয়ের ডিকোয়েংসি নামে একজন হাতুড়ে ডাক্তার প্রথম কর্নিয়া পালটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৮১৮ সালে জার্মানিতে খরগোশের চোখের কর্নিয়া বদল করা হয় সাফল্যের সঙ্গে। চেষ্টা শুরু হয় বিভিন্ন জীবজন্তুর কর্নিয়া তুলে নিয়ে মানুষের চোখে বসানোর। সাফল্য আসে না কিছুতেই। অবশেষে ১৯০৫ সালে মোরাবিয়ার ডাঃ জারম প্রথম কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করেন সাফল্যের সঙ্গে। তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তির ভাল কর্নিয়া এক যুবকের চোখে বসিয়ে দেন। যুবক ফিরে পায় তার দৃষ্টি। এভাবেই এগিয়ে চলে কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের অগ্রগতি।

কিভাবে কর্নিয়া পাওয়া যেতে পারে

যদি কোন মানুষ মৃত্যুর আগে অঙ্গীকার করে যান যে, মৃত্যুর পর তাঁর কর্নিয়া-দুটো অপরকে দেওয়া যাবে তবেই কর্নিয়া পাওয়া সম্ভব। মৃত্যুর ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই কর্নিয়া সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে হবে কর্নিয়া রক্ষণস্থানে বা আই ব্যাঙ্কে।

আই ব্যাঙ্ক ঃ

১৯৪৫ সালে নিউ ইয়র্কে ডাঃ আর. প্যাটন বিশ্বের প্রথম আই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদেশে ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে প্রথম আই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কর্নিয়া গ্রাফটিং আইন পাশ হয় ১৯৬৫ সালে। এ রাজ্যে প্রথম আই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয় ১৯৬৬ সালে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে। বর্তমানে ভারতে আই ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় ১১০টি, যার মধ্যে প্রায় ৯৫টি সরকারি।

আই ব্যাঙ্কের কাজ হলো—১) মানুষের মধ্যে চক্ষু-দানের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা, ২) খবর পেলে মৃত্যুর ৪/৫ ঘণ্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির চোখ সংগ্রহ করা, ৩) সেই চোখকে ভাল করে পরীক্ষার পর সংরক্ষণ করা এবং ৪) সঠিক রোগী নির্বাচন করে তার অসুস্থ কর্নিয়ার স্থলে সংগৃহীত কর্নিয়া স্থাপন করা।

দাতা ও গ্রহীতা ঃ

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, আমাদের পুরো চোখটা কখনোই পালটানো সম্ভব নয়। পালটানো সম্ভব শুধু অকেজো কর্নিয়াকেই। কর্নিয়ার অসুখ ছাড়া অন্য অনেক কারণেই মানুষ অন্ধ হতে পারে। সেইসব কারণে অন্ধ হওয়া ব্যক্তি কিন্তু কর্নিয়া পালটালে দৃষ্টি ফিরে পাবেন না। কাজেই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির কর্নিয়ার অস্বচ্ছতাই যে দৃষ্টিহীনতার কারণ—এইটি আগে ভাল করে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর তার নাম

প্রতীক্ষা-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেকোন আই ব্যাঙ্কে।

তারপর হলো দাতার প্রশ্ন। আবেগের বশে অনেকেই চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর এই ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর তাঁর তো আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ইচ্ছাই এখানে শেষ কথা। কর্নিয়াদানে আগ্রহী ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের তাঁর এই শেষ ইচ্ছার কথাটি ভালভাবে বোঝানো এবং কতক্ষণের মধ্যে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে সেবিষয়ে তাঁদের অবহিত করা। জনসচেতনতা না বাড়লে শুধু আইন করে চক্ষুদানে সাড়া পাওয়া যাবে না। পারিবারিক ও সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অনীহা—এসব বিষয় বহুক্ষেত্রেই চক্ষুদানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির চক্ষুদানের অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকরী হয় না।

কিভাবে চোখ তোলা হয়

চোখ তোলার ব্যাপারটি কোন জটিল পদ্ধতি নয়। একাজে অভ্যস্ত যেকোন সার্জেন অল্প সময়ের মধ্যেই চোখ-দুটো তুলে নিতে পারেন। স্থানীয় ডাক্তারও পারেন। নেওয়ার পর বরফপাত্রে চোখ-দুটো রেখে জমা দেওয়া হয় আই ব্যাঙ্কে। এখানে ভালভাবে পরীক্ষার পর কর্নিয়া ও তার চারপাশের কিছুটা অংশ তুলে নিয়ে তা ঠাণ্ডায় জমিয়ে রেখে দেওয়া হয়। আজকাল ১২% ডাইমিথাইল সালফক্সাইড দ্রবণে −৮০° সেন্টিগ্রেডে প্রথমে রেখে পরে তরল নাইট্রোজেনে ফ্রিজ করে −১৯৭° সেন্টিগ্রেড তাপে কর্নিয়াকে দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যায়। এরপর প্রতীক্ষা-তালিকার ক্রমানুসারে রোগীর অস্বচ্ছ কর্নিয়া অপারেশন করে বাদ দিয়ে সংগৃহীত কর্নিয়া বসানো হয়। অবশ্য সবক্ষেত্রেই এই অপারেশন সফল নাও হতে পারে। তবে বর্তমানে সাফল্যের হার সন্তোষজনক।

কারা কর্নিয়া দান করতে পারেন

১) যাঁদের কর্নিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, তাঁরাই চোখ দান করতে পারেন। এমনকি অন্ধ ব্যক্তিও তাঁর চোখ দান করতে পারেন যদি তাঁর অন্ধত্ব কর্নিয়ার অসুখ ছাড়া অন্য কোন কারণে হয়, অর্থাৎ কর্নিয়াটি সুস্থ এবং স্বচ্ছ থাকলে অন্ধত্ব চক্ষুদানের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। ২) কোন সংক্রামক রোগ বা ক্যানসার, সিফিলিস, কুষ্ঠ, এইডস্ প্রভৃতি রোগে যাঁরা আক্রান্ত হননি তাঁরা কর্নিয়া দান করতে পারেন।

আমাদের দেশে কর্নিয়ার অস্বচ্ছতাজনিত কারণে লক্ষ লক্ষ লোক দৃষ্টিহীনতায় ভুগছে। এর মধ্যে অনেককেই কর্নিয়া বদলের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব।□

গ্রন্থ-পরিচয়

সার্থক অনুবাদ এমনই হওয়া উচিত

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অধ্যাত্ম রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ) ঃ অনুবাদক—শ্রীরামদাস (স্বামী ধীরেশানন্দ)। প্রকাশক—অশোককুমার বারিক, ভারতী বুক স্টল, ৬বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃষ্ঠা ঃ ২৪+৩০৪। মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

রঘুকুলতিলক, 'মর্যাদাপুরুষোত্তম' শ্রীরামচন্দ্র কোটি কোটি হিন্দুর হৃদয়ে সহস্র সহস্র বছর ধরে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাদের হৃদয়ের ভক্তি এবং আবেগ সহস্র সহস্র বছর ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। কত কবি, কত সাহিত্যিক, কত সাধক, কত ভক্ত যে তাঁর সম্পর্কে কতভাবে ভেবেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সম্পর্কে আদিকবি বাল্মীকি রচিত মূল সংস্কৃত 'রামায়ণ' অবশ্য প্রথম এবং প্রধান আকরগ্রন্থ। তবে ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এমন কোন দেশীয় ভাষা নেই, যাতে 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর অনুবাদ বা ভাবানুবাদ হয়নি। উত্তর ও মধ্য ভারতে ভক্তসাধক গোস্বামী তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গদেশে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও আমরা সম্যক্ অবহিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রামচন্দ্র যে-মহিমায় বর্ণিত হয়েছেন তাতে বোঝা যায়, রামচন্দ্র কবিগুরুর হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীকে স্পর্শ করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ এবং মহর্ষি বাল্মীকির কথোপকথনের মধ্যে রামচন্দ্রের যে-চরিত্রচিত্রণ তাঁর কবিতায় আমরা পাই, তার সামনে কার না মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়? কবিগুরুর লেখনীতে দেবর্ষি ও মহর্ষির সেই অপূর্ব বার্তালাপের অপরূপ বর্ণনায় উঠে এসেছেন নরকেশরী রামচন্দ্র। কিন্তু তিনি কোন্ রামচন্দ্র? তিনি কী 'ইতিহাস'-এর রামচন্দ্র? রবীন্দ্রনাথ অপূর্বভাবে বলেছেন ঃ

"নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো'।"

রবীন্দ্রনাথ 'ইতিহাস'-এর রামচন্দ্রকে নয়, কল্পনার রামচন্দ্রকে—ভাবের রামচন্দ্রকে—তত্ত্বের রামচন্দ্রকে অধিকতর সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। বাল্মীকির রামচন্দ্র অবশ্য 'ইতিহাস'-এর রামচন্দ্র, কিন্তু তুলসীদাসের রামচন্দ্র অথবা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র যতখানি 'ইতিহাস'-এর, তার থেকে অনেক বেশি কল্পনার এবং ভাবের। আবার সংস্কৃত 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' এবং 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অনেক বেশি তত্ত্বের—অনেক বেশি দর্শনের এবং অনেক বেশি আধ্যাত্মিক বিচারের। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এ অযোধ্যার দশরথপুত্র রামচন্দ্রের চেয়ে পরম ব্রহ্মের মায়াশ্রিত, নরদেহধারী অবতার রামচন্দ্রের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভক্তি, জ্ঞান, সদাচার, ন্যায়-নীতির মূর্ত বিগ্রহ রামচন্দ্র যে-রাবণ, কুম্ভকর্ণাদির নিধনকর্তা সে-রাবণ, কুম্ভকর্ণাদি মানুষের আসুরিক বৃত্তি ও অবস্থার এক-একটি রূপ। মূল ঘটনাংশে বাল্মীকিকে অনুসরণ করলেও অধ্যাত্ম রামায়ণকার রামচন্দ্রের মধ্যে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিকতার এক কল্পবিগ্রহ ও ভাববিগ্রহকে রূপদান করেছেন। 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'—এই নামকরণের মধ্যেও যে এই তাৎপর্যই নিহিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর অনেক অনুবাদ পাওয়া যায়, তবে সেই সমস্ত অনুবাদের অধিকাংশই আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ মাত্র। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অতি প্রবীণ ও সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ তাঁর গভীর সংস্কৃতজ্ঞান এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে পাঠক ও ভক্ত সাধারণের কাছে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ পরিবেশন করেছেন।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয়। 'কথামৃত'-র মধ্যে বারংবার শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' প্রসঙ্গ আমরা পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শ্রীরামচন্দ্র-কথার মূল তাৎপর্য মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার পরিপুষ্টির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ। ভক্তি এবং জ্ঞান, যোগ এবং কর্মের এমন অপূর্ব সমন্বয়াত্মক ধর্মগ্রন্থ হিন্দুধর্মগ্রন্থাবলীর মধ্যে বড় বেশি নেই। সেই শাস্ত্রচূড়ামণি 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর একটি প্রাঞ্জল ও মনোজ্ঞ অথচ আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ উপহার দিয়ে নবতিপর প্রজ্ঞাবান সন্ন্যাসী স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ ভক্তসাধারণের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। আমরা আশা করি, পূজ্যপাদ মহারাজজীর এই অনুবাদ-কর্মটি শুধু অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসুদের জিজ্ঞাসা ও পিপাসাকেই চরিতার্থ করবে না, তাঁদের জীবনপদ্ধতিতেও এক নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। অনুবাদকে যথাসম্ভব মূলানুগ করতে চেষ্টা করলেও স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ কখনো তাঁর অনুবাদকে মূলকন্টকিত হতে দেননি। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং প্রকাশভঙ্গির প্রসাদগুণে অনুবাদ-কর্মটির প্রতিটি অংশ পাঠকের মনকে অধিকার করে রাখে। মাঝে মাঝে তাঁর

প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যাও খুব সাবলীল। সম্ভবতঃ বাঙলাভাষায় 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর এই ধরনের অনুবাদ আর নেই। অধ্যাত্ম-পিপাসু পাঠকসাধারণ এই অনুবাদ-গ্রন্থটি পাঠ করলে শুধু যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-পাঠের আনন্দ পাবেন তা-ই নয়, তাঁদের স্মরণ-মননের ক্ষেত্রেও প্রভূত সাহায্য পাবেন, পাবেন গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণাও। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সার্থক অনুবাদ এইরকমই হওয়া উচিত।□

টি. এস. এলিয়ট ও আমরা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

টি. এস এলিয়ট : বাঙালী মন ও মননে। সম্পাদনা—তাপস বসু। প্রকাশক—জীবনানন্দ অ্যাকাডেমী, ব্লক-আই/বি, ফ্ল্যাট নং ১, অবন্তিকা সরকারি আবাসন, কলকাতা-৭০০০৩৯। পৃষ্ঠা : ৮+২৮০। মূল্য : ৫০ টাকা।

টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫)-এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিদেশের মতো আমাদের দেশেও অনেক গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে; যেগুলি বাঙলা ভাষায় তার মধ্যে তাপস বসু সম্পাদিত গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিদগ্ধজনের লেখা ১৮টি প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে 'বাঙালীর এলিয়ট-চর্চা'র কিছু তথ্য এবং 'টি. এস. এলিয়টের জীবনের কালক্রম এবং গ্রন্থপঞ্জী'।

সম্পাদক লিখেছেন : "সাম্প্রতিক কালে এলিয়ট-চর্চা চলেছে নানাভাবে। সব মিলিয়ে এলিয়টের রূপচ্ছবিটি বাঙালী মন ও মননে কতটা উজ্জ্বলভাবে বিধৃত তা তুলে ধরার জন্যেই প্রকাশিত হলো এলিয়টের নানা দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধের সঙ্কলন...।" লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, গবেষক এবং সমালোচকেরা রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যত্ন নিয়ে লেখেননি, ফলে লেখাগুলিতে ত্রুটি রয়েছে। সীমিত পরিসরে বিশদ্ভাবে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়; তবে একথা সানন্দে স্বীকার করব যে, অধিকাংশ প্রবন্ধই সারগর্ভ ও সুলিখিত (যদি সবসময়ে সুখপাঠ্য নাও হয়)। তাই ত্রুটি যা আছে তা গ্রন্থটির মহত্ত্বকে খুব একটা ক্ষুণ্ণ করে না।

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে এলিয়টের যে-পঙ্ক্তিগুলি অনুবাদ করে দিয়েছেন সেগুলি তাঁর পাঠকদের উপরি পাওনা। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে-স্মৃতিচারণ করেছেন তা উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু এখানে তিনি ইংরেজ কবির কোন পঙ্ক্তির অনুবাদ আমাদের উপহার দেননি। গ্রন্থের দীর্ঘতম ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটিতে বৈদগ্ধ্যের ছাপ রয়েছে, কিন্তু এর প্রথমেই সুমিতা চক্রবর্তী যে-উক্তিটি করেছেন তা কি এলিয়টের জন্মের একশ বছর পরে আজও করা চলে?—"টি. এস. এলিয়ট ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে 'মেজর' কবি না 'মাইনর' অথবা 'মাইনর'দের মধ্যে 'মেজর'—এ নিয়ে বিতর্ক আছে।"

এ-বিতর্কের ঝড় একদিন উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সে তো বহু দিন হলো। এখন তো 'প্রভঞ্জনের পরে প্রশান্তি' অনেক দিন ধরেই চলছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে কবি রাম বসু এলিয়টের কাব্যনাটক 'এল্ডার স্টেটসম্যান'-এর উৎসর্গ-পত্র থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করেছেন। 'অকপট স্বীকারোক্তি' তো বটেই; তাছাড়া এইসব পঙ্ক্তিতে এলিয়ট এত রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছেন (সেই এলিয়ট, যিনি সবসময়ে সদর্পে তাঁর রোম্যান্টিকতা-বিরোধিতার ঘোষণা করতেন) যে, শেলির মতো জন্ম-রোম্যান্টিক কবিও এগুলি লিখতে হয়তো দ্বিধা করতেন। সম্পাদক তাঁর 'প্রসঙ্গতঃ' লেখার সময়ে আরেকটু সতর্ক হতে পারতেন; 'রোদ্দুরে' কি আমরা 'ভর' দিতে পারি? আর তিনি যে-মন্ত্র উচ্চারণের কথা বলেছেন সেই 'সংকাষং' শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দ এবং এর অর্থই বা কি?

'বাঙালীর এলিয়ট-চর্চা' স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। ইংরেজী রচনাদির মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি ডঃ সুভাষ সরকারের বহু বছর আগে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-গ্রন্থ 'T. S. Eliot: The Dramatist' এবং এলিয়ট শতবার্ষিকীতে প্রকাশিত অধ্যাপিকা সতী চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ গবেষণা-গ্রন্থ 'T. S. Eliot: Encounters with Reality'। এঁদের এবং বর্তমান সমালোচকের বেশ কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ গ্রন্থের সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। এছাড়া রয়েছে অন্য ধরনের প্রমাদ, যেমন অনেক সময়েই এলিয়টের প্রখ্যাত প্রবন্ধের নাম 'Tradition and the Individual Talent' থেকে 'the' শব্দটি বাদ গেছে। বাঙলা প্রবন্ধে অজস্র ইংরেজী শব্দ ও শব্দাংশের ব্যবহার (যেক্ষেত্রে সহজেই বাঙলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায়) পাণ্ডিত্যগন্ধী এবং বর্জনীয়। আশা করা যায়, দ্বিতীয় সংস্করণের সময়ে সম্পাদক এদিকে দৃষ্টি দেবেন। যাই হোক, তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন এবং এজন্য তিনি আমাদের অভিনন্দনীয়।□

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৩ মে '৯৬ ভুবনেশ্বর মঠে (উড়িষ্যা) নবনির্মিত মন্দির ও শ্রীরামকৃষ্ণের মার্বেল-মূর্তির উৎসর্গ উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির ও মূর্তি উৎসর্গ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উৎসবে রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী যোগদান করেছিলেন। বহু ভক্তও এতে যোগদান করেছিলেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ৩০ এপ্রিল ও ১ মে যথাক্রমে এই আশ্রমের নবনির্মিত 'ব্রহ্মানন্দ সাধুনিবাস' এবং প্রকাশন ও বিপণন কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন।

গত ২৭ মে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে অনেক সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, ছাত্র-শিক্ষক, ভক্তবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগর (ত্রিপুরা)-এর নতুন এডুকেশন্যাল কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। এ উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ। সভায় তিনি উদ্বোধন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা নাগরিক সমিতির সভাপতি পূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মা। সভায় এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিন্‌হা, খাদ্যমন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওয়াই. ডি. পাণ্ডে ও ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভূতপূর্ব বিশেষ সচিব পি. পি. শ্রীবাস্তব। ঐদিন সকালে বিশেষ পূজা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ও তার আগের দিন ২৬ মে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উপজাতি ছাত্রদের নৃত্য ও নাটক, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিগীতি ও পূর্ণদাস বাউলের বাউল সঙ্গীত ছিল আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোট ৩৭ জন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী যোগদান করেছিলেন।

কালাডি আশ্রম (কেরালা) গত ২২ এপ্রিল আশ্রমের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে ধর্মীয় প্রবচন, জনসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন হীরক জয়ন্তী স্মারক গৃহের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করা হয়।

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) পঞ্চমহল জেলার খরাপীড়িত শুক নিমচ গ্রামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজ মন্দির' নামে একটি মন্দিরসংযুক্ত সমাজগৃহ নির্মাণ করে। উক্ত গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯ ও ২০ মে দুদিন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। দুদিনে ৪০০০ গ্রামবাসীকে ভাত, খিচুড়ি, তরকারি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়ানো হয়েছে। তাছাড়া ৪০০ শাড়িও বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূজা, ভজন, উপজাতি নৃত্য, জনসভা প্রভৃতি। উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। গত ৩ ও ৪ মে এই আশ্রম যুব ও শিক্ষকদের জন্য দুটি সাধনশিবির পরিচালনা করে। শিবির দুটিতে যথাক্রমে ৫৩০ জন যুবপ্রতিনিধি ও ৪০০ শিক্ষক যোগদান করেছিলেন।

নরেন্দ্রপুর আশ্রম (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), কৃষি-উন্নতিতে স্বল্পব্যয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গত ১২ ও ১৩ এপ্রিল দুদিনের এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিবিশেষজ্ঞ-সহ মোট ৫০ জন কর্মশালায় যোগদান করেছিল।

দন্তচিকিৎসা-শিবির

পুরী মিশন আশ্রম (উড়িষ্যা) গত ২৫ এপ্রিল খুরদা জেলার একটি গ্রামে এক দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১৯০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

গুজরাট খরাত্রাণ

রাজকোট আশ্রম রাজকোট শহরতলীর গান্ধীগ্রাম অঞ্চলে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার পানীয় জল ১২০টি খরাপীড়িত পরিবারের মধ্যে বিতরণ করছে।

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার দুটি গ্রামের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারের মধ্যে ২০০ শাড়ি, ২০০ লুঙ্গি, ২০০ কম্বল, ২১০০টি বাসনপত্র, ৩০০ বালতি ও ৩০০ লণ্ঠন বিতরণ করা হয়।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্র

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লাতুর জেলার কাওয়ালী গ্রামে পুনর্বাসনের পর 'বিবেকানন্দ গ্রামবিকাশ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে খরিফ শস্য ও শাকসবজি উৎপাদন বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া সহ নানা গ্রামোন্নয়নমূলক কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড : গত জুন মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১১টা থেকে ধ্যান, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৮ জুন ব্যতীত অন্যান্য মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস : গত জুন মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১০.৩০ মিঃ থেকে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়েছে। এছাড়া প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার রাত ৮টা থেকে যথাক্রমে বেদান্ত-প্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (হলিউড) ঃ এই কেন্দ্রে গত জুন মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১১টা থেকে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী বিপ্রানন্দ, স্বামী আত্মবিদ্যানন্দ, স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দ এবং স্বামী বেদরূপানন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার যথাক্রমে প্রব্রাজিকা বিবেকপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা এবং শেষ দুটি বৃহস্পতিবার স্বামী বেদরূপানন্দ বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। শেষেরটি বাদে প্রতি শুক্র ও শনিবার যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ এবং প্রব্রাজিকা বিবেকপ্রাণার বেদান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ১ জুন সন্ধ্যায় রামনামসঙ্কীর্তন পরিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এই কেন্দ্রের বিভিন্ন উপকেন্দ্রগুলিতেও জুন মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (স্যান ফ্রান্সিস্কো) ঃ গত জুন মাসের শেষ রবিবার ছাড়া অন্যান্য রবিবার এবং শেষ বুধবার ছাড়া অন্যান্য বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। এর মধ্যে দ্বিতীয় রবিবার ভগবান বুদ্ধের জীবনী আলোচিত হয়েছে। মাসের প্রথম তিনটি শনিবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চতুর্থ শনিবার পরিবেশিত হয়েছে ভক্তিগীতি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক ঃ গত জুন মাসের শেষ রবিবার ছাড়া অন্যান্য রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মাসের প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার যথাক্রমে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (ক্যালিফোর্নিয়া) ঃ গত জুন মাসের প্রতি রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পঞ্চম রবিবার স্বামী গণেশানন্দ এবং অন্যান্য রবিবারগুলিতে স্বামী প্রপন্নানন্দ আলোচনা করেছেন। প্রতি বুধবার ঈশ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের ওপর আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। এছাড়া তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ শনিবার এবং আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী তৃতীয় ও চতুর্থ শনিবার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত বছর (১৯৯৫) আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী অসুস্থ থাকার দরুন আশ্রমের সাপ্তাহিক আলোচনাগুলি প্রধানতঃ সহাধ্যক্ষ স্বামী প্রপন্নানন্দই পরিচালনা করেছিলেন। তিনি আশ্রমের বাইরে ডেভিস, ফ্রেস্নো ও অন্যান্য শহরে বক্তৃতাদিও দিয়েছেন। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসব পালন ছাড়াও আশ্রমে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, ক্রিসমাস ইত্ত প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি আনন্দ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী প্রতিভানন্দ (জীবেন্দ্র) গত ১৭ মে সকাল ৬ টায় কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

স্বামী প্রতিভানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিলেট (অধুনা বাংলাদেশ) আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান কেন্দ্র ছাড়াও তিনি করিমগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি আশ্রমের কর্মী ছিলেন। গত ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ (পার্বতী মহারাজ) গত ৩১ মে ২০ মিনিট সময়ে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে লখনৌ রামকৃষ্ণ মঠে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বয়স অনুপাতে তাঁর শরীর ভালই যাচ্ছিল। শরীরত্যাগের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আনন্দে এবং সজ্ঞানে ছিলেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন কলকাতা স্টুডেন্টস হোমে যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গুরুর নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ মহীশূর স্টাডি সার্কেলে দুবছর থাকার পর তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত রেঙ্গুন কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম ও তার কলকাতার শাখাকেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্যান ফ্রান্সিস্কোতে প্রেরিত হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটিতে থাকার সময় এই কেন্দ্রের বার্কলে শাখার ভারপ্রাপ্ত হিসাবে সেখানে প্রায় ২০ বছর অতিবাহিত করেন। শেষের দিকে তিনি প্রায় এক বছর স্যান ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর তিনি লখনৌ আশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। অত্যন্ত দয়ালু ও মধুর স্বভাবের এই প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে অনেকেই জীবনে সান্ত্বনা ও শান্তি পেয়েছেন। তিনি সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ প্রতি বৃহস্পতিবার, শুক্র ও রবিবার যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, কল্যাণী (জেলা—নদীয়া) ঃ গত ৮-১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। চারদিনব্যাপী এই উৎসবে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজার্চনা ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৮ তারিখ বিকালে প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা 'শ্রীমায়ের কথা' আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন বিকালে যোগব্যায়াম-প্রদর্শন করে সেবাসঙ্ঘের যোগব্যায়াম কেন্দ্রের ছাত্রীরা। শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ডঃ নমিতা দত্ত। সন্ধ্যায় ছায়াছবি 'দেবীতীর্থ কামাখ্যা' পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন বিকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। চতুর্থ দিন প্রাতে নগর-পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে পাঁচ সহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকালে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দ। সন্ধ্যায় বাউলগান পরিবেশন করেন সুকুমার বাউল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ৪ ফেব্রুয়ারি আশ্রমের নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ঐদিন তিনি একটি রাস্তার নামফলকও উন্মোচন করেন। গ্রামের প্রবেশমুখ থেকে আশ্রম পর্যন্ত পঞ্চায়েতের তৈরি রাস্তাটির নতুন নামকরণ করা হয় 'স্বামী বিবেকানন্দ সরণি'। উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ, বাউল গান, মূকাভিনয় ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গহনানন্দজী। বক্তা ছিলেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী মহেশানন্দ। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র থেকে কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং (জেলা—হুগলী) ঃ গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিকালে শোভাযাত্রা সহকারে নগর পরিক্রমা করা হয়। দ্বিতীয় দিন সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ২৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পুরাণানন্দ ও বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ জয় ভট্টাচার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, সাণ্ডেলের বিল (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব তথা অত্র আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবের অঙ্গ ছিল পূজা, পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার-বিতরণী সভা, ধর্মসভা প্রভৃতি। মধ্যাহ্নে প্রায় ৪০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার, মৌলবী মোঃ দীনেশচন্দ্র বৈদ্য ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে স্বামী যোগস্বরূপানন্দ ও স্বামী দিব্যানন্দ। উল্লেখ্য, গত ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ধর্ম ও সংস্কৃতি পরীক্ষার ফলও ঐ দিনে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্বের অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতির (জেলা—বাঁকুড়া) উদ্যোগে গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম জন্মোৎসব ও সমিতির দ্বাদশ বাৎসরিক উৎসব প্রতিপালিত হয়। ১০ তারিখ বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। দুপুরে প্রায় ২০০০ লোকের মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার-বিতরণ, কিছু দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্রবিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী ওঁকারাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন। অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য ও কয়েকজন বক্তা স্বামীজীর ওপর ভাষণ দেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (৭ ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলকাতা-৬) ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ ভগবান রামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মতিথি উপলক্ষে সকালে বিশেষ পূজা ও দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আরতির পর 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন নির্মাল্য বসু, ঠাকুরের জীবনী পাঠ করেন দেবাশিস মান্না। পরে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে সঙ্ঘের কোচিংয়ের ছাত্রীবৃন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৪তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে গত ৪ ফেব্রুয়ারি **দত্তপুকুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা)**-এর উদ্যোগে ৬০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পোশাক ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, পোশাক ও শীতবস্ত্রগুলি নবব্যারাকপুর সারদা সঙ্ঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, চকপাড়া (লিলুয়া, জেলা—হাওড়া) গত ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতি। দুপুরে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভানেত্রী ছিলেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তিনি ১১ জন শিশুবিদ্যার্থীকে খাতা ও কলম বিতরণ করেন।

রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (জেলা—বর্ধমান)-এর উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সেবাকেন্দ্রের বার্ষিক উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। যুবসম্মেলনে

২০০ জন যুবপ্রতিনিধি এবং ১০০ জন দর্শক যোগদান করেছিলেন। সম্মেলনে ১৫ জন যুবপ্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে এবং বৈকালিক ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ধ্রুবরূপানন্দ, স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। ঐদিন বিশেষ পূজা-পাঠাদিও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন (অরুণাচলপ্রদেশ) গত ১৭, ১৮ ও ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপন করেছে। উৎসবের প্রথম দিন উৎসবের সূচনা করেন স্বামী প্রথমানন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্বামী অমরাত্মানন্দ ও ভজন পরিবেশন করেন স্বামী প্রথমানন্দ। শেষদিন বিশেষ পূজা, হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল-বিতরণ, প্রসাদ-বিতরণ, প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণ ও গীতি-আলেখ্য পরিচালনা করেন স্বামী দিব্যরূপানন্দ।

হালিসহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি এই সংঘের ৮ম বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রথম দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোককুমার ঘোষ। বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা বন্দনা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী অমলানন্দ। পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল স্থানীয় শিল্পিবৃন্দের ভক্তিগীতি ও 'শিবপুর প্রফুল্লতীর্থ'-এর নাট্যাভিনয়।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ মঙ্গলবার, সেবাশ্রমের উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম শুভ আবির্ভাব-তিথি উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল পাঠ, ভজন, শোভাযাত্রা-সহ নগরকীর্তন, পূজা, হোম প্রভৃতি। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ননীগোপাল কুশারী। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভক্তগণকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীসারদা সংঘ (দিল্লী শাখা) কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক উৎসব দেড় সহস্রাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভক্তিসঙ্গীত, পূজা, হোম ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব স্বামী গোকুলানন্দ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

আগরতলা শ্রীসারদা সংঘ (সর্বভারতীয় শ্রীসারদা সংঘের শাখা) গত ১১ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব পালিত হয়। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দুপুরে সমবেত ভক্তদের মধ্যে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয় ও ১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে শাড়ি বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দ। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা করেন।

নবব্যারাকপুর শ্রীসারদা সংঘ (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) ঃ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে সংঘের ষোড়শ বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হলো। ১৪২ জন মহিলা ভক্ত শিবিরে যোগদান করেন। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ভজন, গীতাপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ থেকে পাঠ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত-ভাবনার ওপর একটি গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম অধিবেশনে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ওপর আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা।

দেহত্যাগ

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিনয়ানন্দ গত ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৬ সন্ধ্যা ৬টায় বহরমপুরে ৯৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনি কলকাতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। বহরমপুরের গোরাবাজার শ্মশানে তিনি একসময় তপস্যা করেছিলেন। ৮/৯ বছর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাসদীক্ষাও লাভ করেন। ভারতের নানা তীর্থে এবং ভারতের বাইরে নেপাল, তিব্বতে তিনি তপস্যা করেন প্রায় ৩৫ বছর। তিনি 'নেপালবাবা' নামে অনেকস্থানে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিনয় ও সারল্যের জন্য বহু ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে তিনি প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, যাদবপুরের অন্তর্গত রাজাপুর-নিবাসী হরি আনন্দ শর্মা গত ১৭ জানুয়ারি বেলা ১২.৪০ মিনিটে ৬৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। স্বামী ব্রহ্মেশ্বরানন্দ মহারাজ (সতীশ মহারাজ) গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সেখানকার লাইব্রেরির কাজে তিনি কিছুদিন স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেন। এছাড়া বলরাম মন্দির, মায়ের বাড়ী ও বারাসাত মঠের বিভিন্ন কাজে বিশেষভাবে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বিরাটী মন্দিরপাড়া (কলকাতা-৫১)-নিবাসী সুধাংশু চক্রবর্তী গত ১৬ জানুয়ারি '৯৬ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন গ্রাহক ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।□

প্রস্রাব-চিকিৎসা

ভারতের নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অ্যাডমিরাল এল. রামদাস প্রস্রাব পান করেন। জাপানের রুচি নাকো প্রতিদিন সকালে প্রস্রাব দিয়ে কুলকুচি করেন। নেদারল্যান্ডসের কোয়েন ভ্যান ডের ক্রুন বলেন : "দাড়ি কামানোর পরে প্রস্রাব লাগাতে ভালই লাগে।" এছাড়া লক্ষ লক্ষ লোক প্রস্রাব থেকে উপকৃত হচ্ছেন। এঁদের মতে, অন্ততঃ লাভের জন্য ওষুধ তৈরির কারখানাগুলির এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। পশ্চিম জার্মানির এক বেতার-সাংবাদিক কারমেল টমাস-এর মতে, "প্রস্রাবে অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিহিত আছে।" তিনি প্রস্রাব-চিকিৎসার ওপর তিনখানি বই লিখেছেন, যার মধ্যে একটি, 'এ ভেরি স্পেশাল জুস'-এর সাড়ে সাত লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। 'নিজের প্রস্রাব দিয়ে চিকিৎসা' (Auto Urine Therapy)-র ওপর সাম্প্রতিক প্রথম বিশ্ব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঞ্জিম-এ, যাতে ৬০০ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক যোগ দিয়েছিলেন। যোগদানকারীরা ভারতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। তিনি প্রতিদিন এক গ্লাস নিজের প্রস্রাব পান করতেন এবং সম্প্রতি ৯৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। এই অধিবেশনে উৎসাহীদের মধ্যে প্রধান জি. কে. ঠক্কর বলেন : "প্রস্রাব-চিকিৎসায় আমার অ্যামিবিক আমাশয় ও একজিমা (চর্মরোগ) ভাল হয়েছে এবং এরই দ্বারা আমি তাড়াতাড়ি বড় বাগ্মী হয়ে গেছি।" তিনি প্রস্রাবকে 'অমৃত ঔষধ' (nectar medicine) বলেন এবং তাঁর মতে এর দ্বারা বহু অসুখ, এমনকি এইডস্‌ও ভাল হয়। অস্ট্রেলিয়ার টারা এইচ. বলেন যে, তাঁর শেষসীমায় পৌঁছানো ক্যানসার রোগ প্রস্রাব পান করে ভাল হয়ে গেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান ; আমেরিকার প্রস্রাব-চিকিৎসক (Urine Therapist) জন উইনহসেনের মতে, "এটা দেহের দিক থেকে স্বাস্থ্যকর হতে পারে, তবে বিশ্বমতে, রুচির দিক থেকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।" মুম্বাইয়ের যশলোক হাসপাতালে ডাঃ আর. ডি. লেলে বলেন যে, প্রস্রাব-চিকিৎসাপদ্ধতির পিছনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাব রয়েছে ; কিন্তু "যেখানে সম্মেলনে ৬০০ ব্যক্তি জমায়েত হয়েছেন, সেখানে কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, এ ব্যাপারে নিশ্চয় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে।" ভ্যান ডের ক্রুন তাঁর 'গোল্ডেন ফাউন্টেন : দ্য কমপ্লিট গাইড টু ইউরিন থেরাপি' পুস্তকে বলেন যে, মাতৃগর্ভে শিশু জরায়ুর মধ্যে যে অ্যাম্নিয়োটিক ফ্লুয়িড-এ ভাসে, সেটার বেশির ভাগই প্রস্রাব।

১৭৪৭ সালে লেখা একটি জার্মান বইয়ে দেখা যায়—"চোখের ক্ষত সারাতে সামান্য ফোটানো প্রস্রাবের সঙ্গে মধু মিশিয়ে লাগানো খুব ভাল ঔষধ।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও জার্মানিতে চিকিৎসকগণ জন্ডিস, রিউম্যাটিক বাত, সায়াটিকা, গাউট ও হাঁপানিতে প্রস্রাব দিয়ে চিকিৎসা করতেন। গোলন্দাজরা এক বালতি প্রস্রাব কাছে রেখে দিত ; কামানদাগার সময় হাত পুড়ে গেলে প্রস্রাবে হাত ডুবালেই যন্ত্রণা কমে যেত। গত চল্লিশের দশকের জার্মান চিকিৎসকগণ শিশুদের হাম বা বসন্ত হলে প্রস্রাব দিয়ে এনেমা (enema) দিতেন। ভ্যান ডের ক্রুন বললেন যে, এস্কিমো নারীরা প্রস্রাব দিয়ে চুল স্যাম্পু করে। ৫০ লক্ষ জার্মান প্রস্রাব-চিকিৎসা নেন, কেউ কেউ প্রস্রাব ইঞ্জেকশনও নেন। ডাঃ জোহান অ্যাল্লবেলে বললেন : "এই চিকিৎসাপদ্ধতি বিরাট ঢেউয়ের মতো জার্মানিতে বিস্তারলাভ করেছে।

অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল রামদাস, যিনি ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন, এবং তাঁর স্ত্রীর (তাঁদের অসুখ না থাকলেও) এক বান্ধবীর প্রস্রাব-চিকিৎসায় বৃক্কের ও যকৃতের অসুখ ভাল হয়ে যাওয়া শুনে খানিকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাঁরা প্রতিদিন এক গ্লাস করে প্রস্রাব পান করে যাচ্ছেন। তাঁরা নৌবাহিনীর কয়েকজন সহকর্মীকে ব্যাপারটি বলেন। সহকর্মীরা প্রস্রাব-চিকিৎসার ওপর একসময় অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু "তাঁদের অনেকেই প্রস্রাব পান শুরু করেছেন।" রামদাস-দম্পতির কন্যাও নিজের প্রস্রাব পান করেন এবং একেই তাঁর সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়ার মূল হেতু বলে মনে করেন। [Express Pharma Pulse, March 28, 1996, p. 12]□

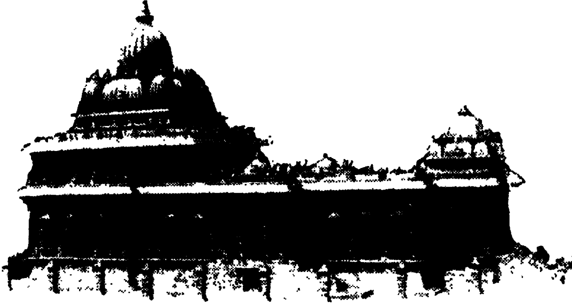


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।… ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।… এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
সর্বজনীন উপাসনালয়





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। **এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।**

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

আবেদন



সুধী,

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় মঠে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে জগজ্জননী সারদাদেবীর সম্মতিক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ মালদায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁরই প্রেরণায় এই অঞ্চলে এক মহৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, যার ফলস্বরূপ ১৯২৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মালদা বেলুড় মঠের এক শাখাকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেসময় থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মালদা শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবামূলক কাজে নিরলসভাবে ব্রতী।

বিগত কয়েক বছরের বন্যায় মালদা মঠের পুরনো মন্দির ভগ্নদশায় পরিণত। ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে নতুন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৩ রামকৃষ্ণ সংঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আনন্দের বিষয়, এই মন্দিরের বাস্তব রূপায়ণের শুভারম্ভ হয় ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার পুণ্যদিনে। ঠাকুরের অসীম কৃপায় এবং সাধু-সন্ত, ভক্তবৃন্দ ও সহৃদয় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় মন্দির-নির্মাণের কাজ ঠিকমত চলছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা মন্দিরের কাজ ত্বরান্বিত করতে ইচ্ছুক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি (১৯৯৭-১৯৯৮) উদ্‌যাপনের শুভ অবসরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ভক্তচিত্তে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

এই মহৎ ও শুভ কর্মযজ্ঞে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই। অনুগ্রহ করে আপনার দান নগদে, মনি অর্ডারে, ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে RAMAKRISHNA MATH, MALDA -TEMPLE CONSTRUCTION -এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করি। **আপনার সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।**

সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

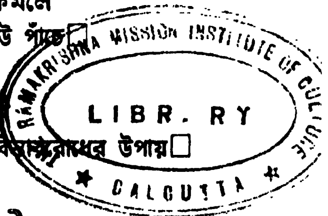
ইতি
বিনীত

স্বামী মঙ্গলানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ
মালদা-৭৩২১০১

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।

সূচীপত্র   ৯৮তম বর্ষ   ভাদ্র ১৪০৩   আগস্ট ১৯৯৬   ৮ম সংখ্যা





ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□৩০০০ টাকা□কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়□বর্তমান বর্ষের (১৪০২-১৪০৩/১৯৯৬) সাধারণ গ্রাহকমূল্য□ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ□৫৬ টাকা□সডাক□৬৬ টাকা□আলাদাভাবে কিনলে□বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা



উদ্বোধন-এর গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

উদ্বোধন ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৩ সংখ্যা

☐ যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **সংখ্যাটির মূল্য ঃ ছত্রিশ টাকা।**

☐ **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** তাঁরা নিজের কপি ছাড়া অতিরিক্ত প্রতি কপি সাতাশ টাকায় পাবেন ; ৩১ আগস্ট '৯৬-এর মধ্যে **অগ্রিম টাকা জমা দিলে যে-কেউ প্রতি কপি পঁচিশ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত** কপি ডাকে নিলে ডাকখরচ বাবদ দশ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ থেকে ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করা যাবে।

☐ **সাধারণ ডাকে (By Post)** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ৩১ আগস্ট '৯৬-এর মধ্যে **সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন।** ৩১ আগস্ট ৯৬-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে **না পৌঁছালে পত্রিকা সাধারণ ডাকেই** যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

☐ প্রতি বছরই **জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া সত্ত্বেও **অনেক গ্রাহক** নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ** এলে **আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা সর্বতোভাবে পাব।

☐ অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক।

☐ **সাধারণ ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি না পেলে আমাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বা ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।**

☐ **গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে শারদীয়া সংখ্যাটি** পাঠানোর কোন ব্যবস্থা থাকছে না। গত কয়েক বছর গ্রাহকেরা **'উদ্বোধন'**-এর শারদীয়া সংখ্যা ইচ্ছা করলে **সাধারণ ডাকে না নিয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে** নিতে পারতেন। সংখ্যাটির মূল্য ও চাহিদা বেশি থাকায় তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা ভেবে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি, **সাধারণ ডাকে পাঠানো শারদীয়া সংখ্যাগুলি** বরং অনেক গ্রাহক ঠিকমত পেয়েছেন এবং রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো সংখ্যাগুলির চেয়ে সেগুলি আগে পৌঁছেছে। রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা দেড় মাস বা দু-মাস পরে গ্রাহকরা পেয়েছেন। এমন খবরও পেয়েছি যে, রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানো পত্রিকা বহুদিন পরেও পৌঁছায়নি। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত যেসব গ্রাহককে রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়েছিল তাঁদের হয়রানির চূড়ান্ত হয়েছিল। এবিষয়ে আমরা ডাকবিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কিন্তু তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। গ্রাহকরা যাতে যথাসময়ে ও নিশ্চিতভাবে সংখ্যাটি পান সেজন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা আমরা কয়েক বছর ধরে করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বেশি ডাকমাশুল দিয়েও তাঁরা কোন সুবিধা তো পানইনি বরং তাঁদের উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা এবং বিলম্ব বেড়েই চলেছিল—এমনকি অপ্রাপ্তির ঘটনাও ঘটেছিল। যাঁরা বিলম্বে পত্রিকাটি পেয়েছিলেন তাঁরা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলেন বলে আমাদের জানিয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে গত বছরের মতো এবারেও রেজিস্ট্রি ডাকে আর শারদীয়া সংখ্যা পাঠানোর ব্যবস্থা থাকবে না। যাঁরা সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁরা এই সংখ্যাটি **সাধারণ ডাকেই** নিতে পারেন অথবা **ইচ্ছা করলে বা সুবিধা থাকলে** আমাদের দপ্তর থেকে **ব্যক্তিগতভাবেও (By Hand)** সংগ্রহ করতে পারেন। **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** নিলে, আগেই বলা হয়েছে, **৩১ আগস্ট ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে সেই সংবাদ অবশ্যই আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।**

☐ যাঁরা প্রতিমাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন, তাঁদের এবং **যাঁরা শুধুমাত্র এই সংখ্যাটি** ব্যক্তিগতভাবে **সংগ্রহ করবেন** তাঁদের সকলকেই **২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ১৯৯৬ পর্যন্ত** কার্যালয় থেকে **আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যাটি** দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন **এই সময়ের মধ্যে** তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে **২৯ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য ১৬ নভেম্বরের ('৯৬) পর সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।** আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।

☐ **কার্যালয় শনিবার বেলা ১-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে, রবিবার বন্ধ।** অন্যান্য দিন সকাল ৯-৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা। **১৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ('৯৬) পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে পত্রিকা বিভাগ বন্ধ থাকবে।**

উদ্বোধন

ভাদ্র ১৪০৩ আগস্ট ১৯৯৬

দিব্য বাণী

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

পরম দেবতা এক, ঋষিগণ তাঁকে বহু বলেন—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে তাঁকে বর্ণনা করেন।

ঋগ্বেদ

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

বেদ (ত্রয়ী—ঋক্, সাম, যজুঃ), সাংখ্য, যোগ, পাশুপত (শৈবশাস্ত্র), বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে কেউ একটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ, কেউ অপরটিকে শুভকর বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সরল ও বক্র নানা পথে প্রবাহিত হলেও সমুদ্র যেমন সমস্ত নদ-নদীর একমাত্র গন্তব্য, তেমনি রুচিভেদে নানা পথ ও মত অবলম্বন করলেও হে ঈশ্বর, সকল মানুষের তুমিই একমাত্র গতি।

শিবমহিম্নঃস্তোত্র

যত মত তত পথ।
অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ।
অনন্ত মত অনন্ত পথ।
এক রাম তাঁর হাজার নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ

৯৮তম বর্ষ—৮ম সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সমন্বয়

'সমন্বয়' শব্দের অর্থ সম্যক্ অন্বয় বা সার্থক সামঞ্জস্য। 'অন্বয়' শব্দটির মধ্যেই সামঞ্জস্যের বা ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'এগ্রীমেন্ট' (agreement), তাহার ভাবটি নিহিত। সংহতি বা মিলনের ভাব পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার স্থায়িত্বের একটি মৌল শর্ত অবশ্যই, কিন্তু সেই সংহতির ভিত্তির মৌল উপাদান কী হইবে? অর্থাৎ সংহতির আদর্শকে প্রায়োগিক রূপ দিতে হইলে কোন্ বস্তুটি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন? ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন —সমন্বয়। তিনি বলিতেনঃ "যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৫৯৩)। 'সমন্বয়' বলিতে আমরা সাধারণতঃ মিলনকেই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে আমরা সমন্বয়ের গভীরতর ও ব্যাপকতর তাৎপর্যের সন্ধান পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনায় সামঞ্জস্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই সারদাদেবী শিখিয়াছিলেন সামঞ্জস্যের পরম কথাটি: "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন।" বস্তুতঃ, সামঞ্জস্য বা 'অ্যাডজাস্টমেন্ট' বা 'এগ্রীমেন্ট' বা 'কো-অর্ডিনেশন' বা 'ব্যালান্স' ভিন্ন আমরা আমাদের জীবনে বেশিদূর আগাইতে পারি না। সামঞ্জস্য বা 'ব্যালান্স' প্রকৃতির পরিকল্পনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে জীবন রসহীন, বর্ণহীন হইয়া যাইতে বাধ্য। 'সামঞ্জস্য' মানে রক্ষণ ও বর্জনের মধ্যে সমন্বয়। 'সামঞ্জস্য' মানে কিছু ত্যাগ এবং সেই সঙ্গে কিছু গ্রহণ বা স্বীকার। 'ত্যাগ' এমন কিছুকে যাহা আমার প্রিয়, যাহা আমার পছন্দের, যাহা আমার কামনার। 'গ্রহণ' বা 'স্বীকার' তাহাকে যাহা আমি পাইতে চাহি না, যাহা আমি পছন্দ করি না, যাহার সম্পর্কে আমার আন্তরিক বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের কাছে এই সামঞ্জস্যের কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহাতে সংসারে আনন্দ ও শান্তির এক সার্থক আবহ রচিত হয়। সেই শিক্ষা ছিল পরিবারের সকলকে লইয়া, ছোট-বড় প্রত্যেকের মতকে, বিশ্বাসকে, নীতিকে উপযুক্ত সম্মান দিয়া একসঙ্গে চলিবার শিক্ষা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কী সংসারী ছিলেন? অবশ্যই ছিলেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার কাছেই থাকিতেন। শুধু জীবনকালেই নহে, তাঁহার অবর্তমানেও যাহাতে তাঁহার ভরণ-পোষণের কোন অসুবিধা না হয় সে-ব্যবস্থাও তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভধারিণী শেষবয়সে তাঁহারই কাছে, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বাস করিতেন। একসময় তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পুরোহিতের কর্ম করিতেন এবং কর্মে নিয়োজিত না থাকিলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পুরা বেতন বাবদ মাসিক সাত টাকা করিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইত। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে ইহাকে তিনি 'পেন্সিল' (পেনসন) পাওয়া বলিতেন। ভাইপো রামলালের কালীবাড়িতে পুরোহিতের চাকরি তাঁহার সৌজন্যে হইয়াছিল। ভাগিনেয় হৃদয় এবং জ্ঞাতিভাই হলধারীও কালীবাড়িতে পৌরোহিত্য-কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্কের সুবাদে। তাঁহাদের সহিত তাঁহার পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি কখনও অস্বীকার করেন নাই। অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে, আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয় তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন এবং তদনুসারে স্বয়ং আচরণ করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণীকে লোকব্যবহারই শুধু নহে, সাংসারিক অন্যান্য কর্তব্য-কর্মও তিনি নিখুঁতভাবে শিক্ষা দিতেন। জন্মভূমি কামারপুকুর এবং কামারপুকুরের মানুষের সঙ্গে, ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক আজীবন ছিল। এই সমস্ত বিষয় তাঁহার সংসারী জীবনেরই পরিচয় বহন করে।

তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে এবং তাঁহার অবর্তমানে সুদীর্ঘকাল সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারীদের কাছে সমন্বয় তথা সামঞ্জস্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও প্রত্যাশার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। এক বিচিত্র সংসারে তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সংসার ছিল এক অর্থে বিচিত্র জগদ্রূপ সংসারেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। তাঁহার সেই সংসারে একদিকে ছিলেন প্রথম যৌবনে বৈধব্যগ্রস্ততার জন্য বিকৃতমস্তিষ্ক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ—ভক্তমহলে 'পাগলী মামী' নামে সবিশেষ পরিচিত—এবং তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধু, স্বভাবে যিনি ছিলেন প্রচণ্ড অভিমানী, খেয়ালী এবং একগুঁয়ে। জন্মের পূর্বে পিতৃহারা এবং জন্মের পরে প্রায়-মাতৃহারা এই রাধুকে সারদাদেবী পরম স্নেহে মানুষ করিয়াছিলেন। রাধুর আবদার ও বাহানার অন্ত ছিল না এবং কখনও কখনও সেই আবদার ও বাহানা মাত্রা ছাড়াইয়া অপর সকলের চরম বিরক্তি উৎপাদন করিত। ছিলেন তাঁহার আরও দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্রী। মাতৃহীন এই দুই ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও সারদাদেবী পরম মমতায় কাছে রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা নলিনী ছিলেন অত্যন্ত মুখরা, সঙ্কীর্ণমনা, হিংসুটে এবং শুচিবায়ুগ্রস্তা।

অপরজন মাকু ছিলেন অভিমানী এবং অবুঝ। রাধুকে শ্রীশ্রীমা অধিক ভালবাসেন ভাবিয়া তাঁহারা পদে পদে মায়ের জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন। আবার পাগলী মামীর সঙ্গে নলিনীর ছিল অহি-নকুল সম্বন্ধ—একজন অপরজনকে সহ্য করিতে পারিতেন না। নলিনী ও পাগলী মামীর ঝগড়ায় মা ভিন্ন সকলেই অতিষ্ঠ হইতেন। পাগলী মামী তো একাই একশ, তাহার উপর নলিনীর সঙ্কীর্ণতা, মুখঝামটা এবং শুচিবাইয়ের প্রাবল্যে মায়ের সংসার উত্তপ্ত হইয়াই থাকিত। ইহার উপর ছিলেন মায়ের লোভী, স্বার্থপর এবং কলহপরায়ণ সহোদরগণ। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে এবং ঈর্ষার বশে মায়ের জীবনকে মাঝে মাঝেই তাঁহারা দুর্বিষহ করিয়া তুলিতেন। আবার সঙ্কীর্ণমনা ও অসূয়াপরায়ণ জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীদের অসহযোগিতার তরঙ্গও মায়ের সংসারকে মাঝে মাঝেই সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত।

ইহাই সব নহে। মায়ের সংসারে ছিল বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ, অকস্মাৎ উপস্থিত পাগলাটে লালু জেলের উৎপাত, মুসলমান মুনিষ-মজুরের দল, যাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ছিল চুরি-ডাকাতি ও হাজতবাসের দুর্নাম। ছিল গৃহপালিত গরু, বিড়াল এবং টিয়া-পাখি। ছিলেন সাধারণ ও অসাধারণ অতিথি-অভ্যাগতবৃন্দ, শহর এবং মফস্বলের সাধারণ ও বিশিষ্ট ভক্ত নরনারী। ছিলেন যোগীন-মার মতো স্থির শান্ত সঙ্গিনী, গোলাপ-মার মতো মুখরা ও কটুভাষিণী অভিভাবিকা। ছিলেন সাধু-ব্রহ্মচারীরা। ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান কর্ম-পরিচালক স্বামী সারদানন্দ। এই অদ্ভুত সংমিশ্রণে গঠিত ছিল শ্রীশ্রীমায়ের বিচিত্র গৃহস্থালী। কিন্তু এক অসাধারণ কুশলতায় মা এই বিচিত্র পরিবেশে সকলকে লইয়া সুচারুভাবে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কেহ কখনও তাঁহাকে স্থৈর্য ও ধৈর্য হারাইতে দেখে নাই, নিরানন্দ ও হতাশ হইতে দেখে নাই। তাঁহার এই অতুলনীয় কৃতিত্বের রহস্য কী, সেই সম্পর্কে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ "যাকিছু কর না কেন, সকলকে নিয়ে একটু মান দিয়ে পরামর্শ শুনতে হয় বই কি। একটু আলগা দিয়ে সব দিক দূরে দূরে লক্ষ্য রাখতে হয়—যাতে বেশি কিছু খারাপ না হয়।... দেখ, সব লোককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজেকে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।... ভাবি, তাঁর সংসার, তিনিই দেখছেন।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭)

একাত্মতা ও নির্লিপ্ততার—সংযুক্তি ও বিযুক্তির কী অসাধারণ সামঞ্জস্য, কী অপূর্ব সমন্বয়! বস্তুতঃ, গৃহস্থাশ্রমে কেমনভাবে সমন্বয় বা 'ব্যালান্স' করিতে হয় তাহার সার্থক রূপচ্ছবিটি আমরা পাই শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে। তাঁহার জীবন হইতে উঠিয়া আসা এই দৃষ্টান্তই শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত ও নির্দেশিত সমন্বয়-কৌশল।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই কৌশল শুধু গৃহী বা সংসারীদের জন্যই নহে, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক—সকল ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। প্রযোজ্য সন্ন্যাসীর জন্যও। কারণ, তিনি ছিলেন সন্ন্যাসীও। সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবেই। আবার তাঁহার আদর্শ সমগ্র জগতের জন্যও। সেই আদর্শকে সন্ন্যাসি-সংঘের সামনে এবং জগতের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁহার প্রথম ভাষণেই তিনি বলিয়াছিলেন, সমন্বয় ভারতবর্ষের চিরায়ত ঐতিহ্য। সেই সমন্বয় 'টলার‍্যান্স' ও 'অ্যাক্সেপট্যান্স'-এর সমন্বয়। সহন এবং গ্রহণের ভিত্তিতে গড়িতে হয় সমন্বয়ের ইমারত। সহিষ্ণুতা এবং গ্রহিষ্ণুতার যেখানে অভাব, যেখানে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব প্রধান, স্ব-স্ব মতের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় প্রবল বিক্রমে উদ্যোগী সেখানে শান্তি আসিতে পারে না। সে গৃহীর সংসারেই হউক অথবা সন্ন্যাসীর সংঘই হউক অথবা সমাজ বা রাষ্ট্রই হউক। নিজের মতকে কেন্দ্র করিয়া যে গোঁড়ামি, যে সঙ্কীর্ণতা, যে মৌলবাদী মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, ইহাকে একটি অপূর্ব শব্দে চিহ্নিত করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি ইহাকে বলিতেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'। কথামৃত-কার ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'ডগম্যাটিজম'।

শ্রীরামকৃষ্ণ তীব্রভাষায় মতুয়ার বুদ্ধি বা মানসিকতার নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়াছিলেন যে, মতুয়ার বুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মত কখনও গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না, কারণ উহা খণ্ডিত বা আংশিক হইতে বাধ্য। তিনি এই প্রসঙ্গে অন্ধের হস্তিদর্শনের উপমা দিতেন ঃ

"কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ-জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, হাতিটা কিরকম? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, 'হাতি একটা থামের মতো!' সে-কানাটি কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। আর-একজন বললে, 'হাতিটা একটা কুলোর মতো!' সে কেবল একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। এইরকম যারা শুঁড়ে কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানাপ্রকার বলতে লাগল।" (কথামৃত, পৃঃ ১৭৫) 'থামের মতো', 'কুলোর মতো', 'দড়ির মতো', 'জালার মতো'—এগুলি হাতি সম্বন্ধে এক-একজন অন্ধের চূড়ান্ত ধারণা, কিন্তু বস্তুতপক্ষে উহাদের কোনটিই তো এককভাবে সত্য নহে। আবার উহাদের সবগুলি মিলাইয়া লইলেও হাতির সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা নাও হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের ধারণাকে চূড়ান্ত বলিয়া ভাবা হাস্যকর। এখানেই আসিতেছে অপরের মত ও ধারণাকে সহ্য করার এবং স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা। ইহাই 'সমন্বয়'। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সব মতকে ঐভাবে দেখার

মাধ্যমে সত্যদৃষ্টি আসে। বৈচিত্র্যের মধ্যে এক-কে দেখার এই বিশ্বাস ও দৃষ্টিই তাঁহার মতে 'সমন্বয়'। (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩১৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রবাণীঃ "যত মত তত পথ।" তাঁহার সর্বমত ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের এই উপদেশ ও ভাব সর্বজনবিদিত এবং বহু-আলোচিত। বর্তমান পৃথিবীতে মানবসভ্যতার উহাই যে রক্ষাকবচ সে-কথা চিন্তাশীল সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং মতান্ধতাই মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের প্রাচীর তুলিয়া দেয়। উহার মূলে থাকে মানুষের নিজের মত সম্পর্কে, নিজের বিশ্বাসের প্রাধান্য সম্পর্কে আত্মম্ভরিতার ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাইয়াছিলেন, অপরের মতের প্রতি, অপরের বিশ্বাসের প্রতি, অপরের ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভাব না আনিতে পারিলে আখেরে নিজেরই ক্ষতি। তাঁহার ভাব হইল—অপরকে প্রেমে, সহিষ্ণুতায়, ভ্রাতৃভাবে ছাড়াইয়া যাও, কিন্তু দম্ভে, অসহিষ্ণুতায়, উপেক্ষায় কাহাকেও মাড়াইয়া যাইও না। জগতে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়তো প্রাকৃতিক নিয়মেই থাকিবে, মানবিক স্বভাবের বশেই থাকিবে, কিন্তু সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের ভাবও তো প্রকৃতির ভাব, মানুষের ভাব। আর যদি প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকেই তবে উহাকে সহযোগিতা প্রসারের জন্য, সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য, সমন্বয়ের বিকাশের জন্য নিয়োজিত করি না কেন! প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হউক শান্তির জন্য, সমন্বয়ের জন্য! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেনঃ সাবধান! দ্বেষবুদ্ধি, বিদ্বেষ-ভাব, ঘৃণা যেন মনে না থাকে। প্রতিটি স্তরে ভালবাসা যেন উহার ভিত্তি হয়।

বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে একটি গৃহে, নিখিল মানবসমাজকে একটি পরিবারে পরিণত করার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 'নানা'র অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া নানার মধ্যে পরম 'এক'কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই স্বপ্ন কি তাহা হইলে স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে? সেই অভূতপূর্ব আবিষ্কারের ফল কি জগতের কোন কাজেই আসিবে না? এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে একটি ভাব দিয়া যাইলেন। উহা হইল এইঃ আমরা 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র ('unity in diversity') কথা শুনিয়াছি। উহা যথার্থ উপলব্ধি অবশ্যই, কিন্তু 'ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য'-ও ('diversity in unity') তো একইভাবে সত্য। এক ঈশ্বর যদি সত্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য বিচিত্র পথের বিদ্যমানতাও তো একইভাবে সত্য হইতে বাধ্য। সুতরাং পথের বিভিন্নতা থাকুক না, মতের বৈচিত্র্য থাকুক না। পৃথিবীর যতগুলি মানুষ, ততগুলি ধর্মমত থাকিলেই বা ক্ষতি কী! উহাতে তো ঈশ্বরকে ধরিবার, সন্ধান করিবার জন্য মানুষের ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইতেছে। উহা তো মানুষের মানসিক ও আত্মিক সুস্থতা ও সজীবতারই প্রকাশ। শুধু বুঝিতে হইবে, এই বৈচিত্র্যের উৎস ও গতি এক-এ। ইহাতে মৌলবাদ মাথা তুলিতে পারিবে না। সহস্র সম্প্রদায় সত্ত্বেও কাহারও মনে সাম্প্রদায়িকতা শিকড় গাড়িতে পারিবে না।

এই দৃষ্টির ভিত্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন, ঐহিকে এবং পারত্রিকে কোন ব্যবধান নাই। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈতে কোন বিরোধিতা নাই। জড় ও চৈতন্যে কোন পার্থক্য নাই। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান মতে কোন বিভেদ নাই। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মতে কোন ভেদ নাই। ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, যোগের মধ্যে কোন ভিন্নতা নাই। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মধ্যে, মানুষ ও দেবতার মধ্যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে, ভোগবাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে, অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যার মধ্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রকৃত কোন দূরত্ব নাই। আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত বা বিরুদ্ধ মনে হইলেও প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির পরিপূরক। উহাদের চূড়ান্ত সমন্বয়-দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন।

এই দৃষ্টি জগতের চিন্তাজগতে, ধর্মজগতে এবং ভাবজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনব অবদান। স্বামী বিবেকানন্দ সেজন্য বলিয়াছেনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমন্বয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা—"সমন্বয়াচার্য"। তাঁহার জীবনটিই ছিল সমন্বয়ের সাকার চেতন প্রকাশ। সেই সমন্বয়ের মহাবাণীকে জগতের রক্ষামন্ত্ররূপে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন শিকাগোর ধর্মমহাসভার সমাপ্তি ভাষণেঃ "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

'সমন্বয়' মানে স্বাতন্ত্র্যের অবলুপ্তি নহে, স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ধান নহে। 'সমন্বয়' মানে কোনভাবেই সুবিধাবাদ নহে। সমন্বয় মানে নিজের নীতিতে শতকরা একশভাগ স্থির থাকিয়া—"বৈঠিয়া আপনা ঠাম"—অপর ব্যক্তি বা বিষয়কে সশ্রদ্ধ ও সানন্দ স্বীকৃতিদান। স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিয়া, বৈশিষ্ট্যকে অটুট রাখিয়া এক ঐকতান বা 'অর্কেস্ট্রা' বা 'কনকর্ড' বা 'সীম্ফনী'র সৃষ্টিই সমন্বয়ের উদ্দেশ্য। উহা দেখাইতে এবং বুঝাইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাই শ্রীশ্রীমায়ের কথায়—"আমাদের ঠাকুরের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না।... সাধুপুরুষরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকল গুলিকেই আমরা পাখির বোল বলি। একটিই পাখির বোল আর অন্যগুলি পাখির বোল নয়—এরূপ বলি না।" (মায়ের কথা, ১ম ভাগ, ৯ম সং, ১৩৭৬, পৃঃ ৪৭) এই ঐক্য ও সামঞ্জস্য-দৃষ্টিই শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-ভাবনার মূলকথা এবং জগতের উদ্দেশে উচ্চারিত এক মহাবাণী।□

অনুধ্যান

সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনে ধর্মের স্থান

স্বামী ভূতেশানন্দ

ক্তিকে নিয়ে সমাজ। তাই ব্যক্তির অকল্যাণে সমাজের অকল্যাণ। অতএব সমাজব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে আগে ব্যক্তিজীবনকে উন্নত করতে হবে। আমরা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির উন্নতি চাই। মানুষ যাতে অন্যায় না করতে পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা দূর করে মানুষ যাতে শান্তিতে থাকতে পারে সেবিষয়ে সাহায্য করবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। 'লীগ অব নেশনস' গঠন করা হয়েছিল, যা অচিরে বাতিল হয়ে গেল। এখন আছে 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বা 'U.N.O.'। এজাতীয় আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু ভেদবৈষম্য থেকেই যাচ্ছে যার ফলে মানুষের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এইসব সংস্থা গঠিত হয়েছে, কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে চিন্তাধারার বৈষম্য থেকেই গিয়েছে।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? প্রায়শই যে বিক্ষোভ ও সংঘাত মাথা তুলছে তার কারণ আমরা নিজেদের সমাজের অঙ্গ হিসাবে মনে না করে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবি এবং নিজস্ব ধ্যান-ধারণামত চলি। এককথায় নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, যার ফলে সমাজের শান্তি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তাই সবচেয়ে বেশি দরকার ব্যক্তির উন্নতি। সমাজভুক্ত ব্যক্তিকে ঠিকমত চালিত না করতে পারলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্ত প্রয়াসই ব্যর্থ হবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সে যে-গোষ্ঠীভুক্ত সেই গোষ্ঠীর ওপর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করে। সমাজে গোষ্ঠী অসংখ্য, ফলে প্রত্যেক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নানারকম পার্থক্য থাকে। তাই ব্যক্তির চরিত্রের উন্নতি না হলে সমষ্টিগত জীবন নিরাপদ হয় না। যতই নতুন নতুন আইন করি না কেন তার সফল কার্যকারিতা নির্ভর করে ব্যক্তিরই ওপর।

তাহলে আমাদের করণীয় কি? চিন্তাশীল মনীষীরা অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ধর্মের আশ্রয় নিতে বলেছেন। তাঁরা বলেন, একমাত্র ধর্মই জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করতে পারে। কেন? না, ধর্ম আমাদের সমগ্র সত্তার সঙ্গে জড়িত। ধর্ম ওপর ওপর একটা রফা বা মিটমাট কিংবা সাময়িক শান্তি বা বোঝাপড়া নয়। ধর্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তির সামগ্রিক চরিত্রের উন্নতিসাধন। অন্যান্য সংগঠন চায় সমষ্টিগত উন্নতি আর ধর্ম চায় ব্যক্তিগত উন্নতি। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা ধর্মকেই সকলে ভুল বোঝে। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের অর্থ কতকগুলি যুক্তিহীন মতবাদ, অন্ধবিশ্বাস, ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের আচার-অনুষ্ঠান মাত্র। এমনকি ধার্মিক লোকেরাও ধর্মকে মনে করে কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টি। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং সেসব ধর্মের নানা বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান আছে; তার ফলেই গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িকতা মাথা তোলে, যার পরিণামে ধর্ম থেকে বিরোধ এবং বিবাদের উদ্ভব হয়। ধর্মের কাজ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা বিভেদ বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে। আবহমান কাল থেকে এই চলে আসছে।

আমরা সর্বজনীন ধর্মকে আদর্শ বলি। কিন্তু ধর্ম বলতে যদি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, মতবাদ আর অন্ধ-বিশ্বাস বুঝি তাহলে তা সর্বজনীন ধর্ম হতে পারে না। সেইজন্য কেউ কেউ বলেন, সর্বজনীন ধর্ম কথাটা অর্থহীন। যদি তা ধর্ম হয় তাহলে সর্বজনীন হতে পারে না আর যদি সর্বজনীন হয় তাহলে তা ধর্ম নয়। তাঁদের মতে শব্দদুটি পরস্পরবিরোধী।

তাই ধর্ম এখন লজ্জার কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রগুলি ধর্মের সমর্থক বলে স্বীকার করতে লজ্জা পায়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ধর্মের বিরোধিতা বোঝায় না, ধর্ম সম্পর্কে উদাসীনতা বোঝায়। দেশের আইন এবং নীতি কোন ধর্মকেই স্পর্শ করে না। ফলে জড়বাদ প্রাধান্য পাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা এইরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। ফলে বলা হচ্ছে, মানবকল্যাণের জন্য ধর্মকে যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। ধর্মের নামে কত বিদ্বেষ, কত রক্তপাত হয়েছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ধর্মের অশুভ প্রতিক্রিয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করবার কোন পথ আছে কি?

ধর্মকে যাচাই করবার আগে আমাদের জানা উচিত, ধর্ম বলতে কী বোঝায় এবং ধর্ম মানুষের কী কল্যাণ করতে পারে। ধর্ম মানে শুষ্ক মতবাদ আর আচার-অনুষ্ঠান পালন নয়। ধর্ম মানুষের মধ্যে যাকিছু ভাল তাকে বিকশিত করে। আদর্শ মানুষে পরিণত হতে ধর্ম

সাহায্য করে। আচার-অনুষ্ঠানে যতই পার্থক্য থাক সব ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে আদর্শ মানুষ হতে সাহায্য করা।

সব ধর্মই এই আদর্শকে স্বীকার করে। সব ধর্মেরই বিশ্বাস সমস্ত অবগুণ থেকে মুক্ত হয়ে সদ্‌গুণে ভূষিত হওয়া। শুদ্ধ হওয়াই ধর্মপালনের উদ্দেশ্য। ধর্ম বলতে মূলতঃ যে এই-ই বোঝায় তা সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলিও স্বীকার করে। ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অবশ্য ভগবান সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় প্রভেদ আছে। দুটি একটি ধর্ম আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। সে যাই হোক, ভগবান সম্পর্কে সর্বোত্তম ধারণা যে, তিনি 'অশেষ কল্যাণগুণসম্পন্ন' বা যিনি সমস্ত সদ্‌গুণ-সমন্বিত এবং 'নিখিলহেয়গুণ-বর্জিত' বা সমস্ত দোষবিবর্জিত। ভগবানের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা এই। পবিত্রতা, সত্য ও অসীমত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই যে-ধারণা আছে ভগবান তার চরম ও মূর্ত প্রতীক এবং আরও মহৎ গুণের সর্বোত্তম বিকাশ তাঁর মধ্যে।

সুতরাং যেকোন ধর্মেরই মহৎ কাজ হলো তার অনুগামীদের আরও সহিষ্ণু, সহানুভূতিসম্পন্ন, উদার হতে শিক্ষা দেওয়া। তাহলে কি মতবাদ এবং আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্মের আওতা থেকে বাদ দিতে হবে? তা কখনই নয়। বাহ্য আচার, চিরাচরিত প্রথা এবং মতবাদ—এগুলি সব ধর্মের বহিরাবরণ বা খোলস মাত্র। সেই আবরণ ভেদ করে সারবস্তুকে নিতে হবে। খোসাটা ছাড়িয়ে শাঁসটা পেতে হবে। সত্যকে লাভ করবার জন্য বাহ্য অনুষ্ঠান, বিধি-নিয়ম পালন করতে হবে। এগুলি ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা, যা না পেলে আমরা ধর্মের সারসত্যে পৌঁছাতে পারব না। তাই প্রথা-নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সব ধর্মেরই অপরিহার্য অংশ।

ধরা যাক, একটি ছোট ছেলেকে বিশ্বজনীন ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চাই। সে কী প্রথমেই তা ধারণা করতে পারবে? এর জন্য সময় লাগবে। তার আগে চিরাচরিত রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাকে পরিচিত হতে হবে। তাহলে ধর্মকে বিশ্বজনীন হতে হলে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে কী অনাবশ্যক বলে বাদ দিতে হবে? দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তা সম্ভব নয়। মানুষের স্বভাব হলো—সে কেবল তত্ত্বকথায় তৃপ্ত হয় না। যেমন, যদি বলা যায় ভগবান মহৎ গুণের আধার, কিন্তু তা-ই আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়। আমাদের কল্পনাকে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করতে কোন মূর্তি বা প্রতীক বা আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করি। তাঁর উপাসনার জন্য মসজিদ বা মন্দির বা গির্জার দরকার আছে। যদিও এগুলি আবশ্যক নয়, তবু বিভিন্ন মানসিকতার জন্য এগুলি আবশ্যক। সাধারণ মানুষ এই বাহ্য আচারগুলিকে যখন ধর্মের সঙ্গে একাত্ম করে দেখে তখনই বিরোধের সৃষ্টি হয়।

আজ এমন একটা সময় এসেছে যখন সমস্ত বিশ্ববাসী কাছাকাছি এসেছে, বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি একত্র হয়ে পরস্পর মত বিনিময় করছে। আমাদেরও চোখ বন্ধ করে থাকলে হবে না। আমরা অন্যান্যদের সঙ্গে মিলেমিশে পরস্পরের মত বিনিময় করব। সত্য মনে হলে অপরের মত গ্রহণ করব।

পৃথিবীর সব ধর্মেই বড় বড় মহামানবের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মহান চরিত্র প্রেমপ্রীতি, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থতায় পূর্ণ। অর্থাৎ সব ধর্মেই এইরকম বিস্ময়কর মানব-মানবীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। এটা যখন আমরা ভুলে যাই তখনই ধর্মের মহান গুণ ও সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করে কেবল আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাকে আঁকড়ে পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকি। এখন কিছু মানুষ অনাবশ্যক আড়ম্বরের বিরুদ্ধাচারণ করছেন। আসল প্রয়োজন হচ্ছে সার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া। যেগুলিকে অসার মনে করছি তার মধ্য থেকেও ভাল গুণগুলিকে গ্রহণ করা।

যেমন কেউ পশ্চিমদিকে মুখ করে উপাসনা করে, কেউ পূর্বদিকে মুখ করে। তাতে কি এসে যায়? প্রার্থনা ভগবানের উদ্দেশ্যে। যিনি পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই বিরাজিত এবং তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। কেউ ওপরের দিকে তাকায়, কেউ নিজ অন্তঃকরণের দিকে। এ সবই প্রথা। ভগবান কোন বিশেষ অঞ্চলে ও রূপে সীমিত নন। একথাও সত্য নয় যে, বিশেষ কতকগুলি ধর্মীয় বিধিনিয়ম পালন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। মোট কথা হলো, ভ্রান্ত দিক্‌গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। নাহলে ধর্মকে গ্রহণ বা বর্জন করে আমরা চলতে পারি কিনা—এ প্রশ্নই আসে না। ধর্মকে আশ্রয় করতেই হবে। ধর্ম আমাদের সত্তার মধ্যেই আছে। এমনকি নাস্তিকও কি চায় না যে, তার মধ্যে মহৎ গুণগুলির বিকাশ হোক? এই মহৎ গুণের বিকাশ করাই ধর্ম।

আমাদের জানতে হবে আমরা কী জাতীয় ধর্ম পালন করছি। এই ধর্ম কি সকলকে আপন করে নেয়, না প্রতি পদক্ষেপে বিরোধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে? ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর সর্বোত্তম বিকাশ-সাধন। যে-ভগবান সকল গুণের আধার, তাঁর চিন্তা করে, তাঁর ধ্যান করে নিজেদের দেবত্বে উন্নীত করি। যতই

আমরা রূপান্তরিত হব ততই পরিপূর্ণ আনন্দ, জ্ঞান ও শান্তির দিকে এগিয়ে যাব। মানুষ যে-ধর্মাবলম্বীই হোক, সে যদি নিজের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম, ভালবাসা, সমব্যথিত্ব, নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারে তাহলে সে কি সকলের কাছে সমভাবে সমাদৃত হবে না? মহৎ লোকের সংখ্যা যত বাড়বে সমাজ আপনিই তত উন্নত ও শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

ভগবানের দুটি, চারটি কি দশটি হাত তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এগুলি অবান্তর। বড় কথা হলো এই জানা যে, ভগবান দয়াময়, অনন্ত আনন্দ ও জ্ঞান-স্বরূপ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির ওপর দৃষ্টি দিলে, পরস্পরের ধর্মের সারমর্মের প্রতি গুরুত্ব দিলে সব ধর্মের মধ্যেই ঐক্য স্থাপন হবে।

ধর্ম হলো 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' অথবা 'সত্যম্ শিবম্ অনন্তম্'। অন্তরের অন্তস্তলে আমরা সকলেই সৎ, সত্যপরায়ণ, অনন্ত ও মহান হতে চাই। আমরা জ্ঞান ও সৌন্দর্যও চাই। নিজেদের মধ্যে অপূর্ণতা চাই না। এই হলো দেবত্ব। ধর্মের এটাই লক্ষ্য।

ধর্মের এই সর্বব্যাপী রূপ ক্রমশঃ মানুষকে আকৃষ্ট করুক। আমরা যেন সব ভেদাভেদ ভুলে উদার হতে পারি। তাহলে জগৎ আরও শান্তিপূর্ণ ও সুখের হয়ে উঠবে।□

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট কালীমূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে দ্বিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে এটি চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান : হৃদয়, চক্র : অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির নৃসিংহদেবের পূর্বপুরুষ বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হংসেশ্বরী-মন্দিরের একটি আত্মিক সম্পর্কের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দূর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন : "ঐ চতুর্ভুজা শান্তা কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"

—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র : ডাঃ স্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা : ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ : ত্রিনিটি শিল্পিগোষ্ঠী

সৌজন্য : বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসব

মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজার চরিতার্থতা প্রকটিত হতো বাৎসরিক শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব উৎসবে। আলমবাজার অধ্যায়ে এই বাৎসরিক আনন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হতো দুটি পর্যায়ে। জন্মতিথির দিন মঠে পূজা-ভোগরাগাদি হতো; মুখ্যতঃ ভক্তগণ পাঠ, ভজনকীর্তন, নর্তনে অংশগ্রহণ করতেন, প্রসাদ ধারণ করতেন। আলমবাজার মঠে ঠাকুরের তিথিপূজায় উপস্থিত সুধীর (পরবর্তী কালে স্বামী শুদ্ধানন্দ) বলেছিলেন: "ঠাকুরের তিথিপূজার দিন একরাত্রি আলমবাজার মঠে কাটাইয়াছিলাম। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজা করিয়াছিলেন।"[৭৬] শুধু ঐ বছরই না, প্রতিবছর ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে আলমবাজার মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অষ্টপ্রহর পূজানুষ্ঠান করতেন। আর পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব স্মরণার্থ সাধারণ উৎসবের আয়োজন হতো। এর পশ্চাতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের ভক্ত মনোমোহন, সুরেশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রমুখের উদ্যোগে ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল। স্থূলদেহে ঠাকুরের উপস্থিতিতে এই উৎসব ভাববৈচিত্র্যে ও আধ্যাত্মিক পরিমাপে হতো অতুলনীয়। চিরস্মরণীয় ও প্রেরণাদায়ক সেসব কাহিনী ভক্তদের দুর্লভ সম্পদ।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথির কয়েকদিন আগে আলমবাজার মঠের আরম্ভ। সেবার জন্মতিথি পড়েছিল সোমবার, ২৯ ফেব্রুয়ারি। পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাধারণ উৎসবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় স্বামী শিবানন্দের লেখা একটি চিঠিতে।[৭৭] তিনি লিখেছিলেন: "শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব এবার মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ প্রায় ১৫০০ সুশিক্ষিত ভদ্রলোকসকল আসিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্য হইতেই প্রায় ৫/৬ সম্প্রদায় ভদ্রলোক হরিকীর্তন করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায় তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত পাঠ করিয়া প্রায় সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়াছিল। যে-কুটিরে তিনি অবস্থিতি করিতেন এবং যে-স্থানে তিনি তপশ্চর্যা ইত্যাদি করিয়াছিলেন, বহুতর লোক সেই সেই স্থানে যাইয়া অতি আনন্দে হরিকীর্তন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত লোক অধুনা বঙ্গদেশে যে এমন ভক্তি[-পরায়ণ] হইতেছেন, 'এ কেবল ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা।' " পরিতৃপ্তির সুখস্মৃতি নিয়ে ভক্তগণ বাড়ি ফিরে যান।

পরবর্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩। মহোৎসবের জন্য প্রেরিত অর্থের প্রাপ্তিসংবাদ দিয়ে স্বামী সারদানন্দ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লিখেছিলেন: "মহোৎসব পরশ্ব হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫/৭ হাজার লোক সমাগম হয়। সকলের মুখেই উৎসাহ, ভক্তি ও আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল।"

এই দুটি মহোৎসবে যোগদানকারী ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণের স্মৃতিকথা থেকে উৎসবের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন: "তখন ঠাকুরের জন্মোৎসব ভক্তদের লইয়া সামান্যভাবেই হইত। খুব বেশি ভিড় হইত না। সেজন্য কুঠিবাড়ির পিছনে রান্নাবাড়ির দালানে ও চত্বরে ভোগ রান্না হইত ও কুঠিবাড়ির একটি ঘরে খিচুড়ি, তরকারি ও অম্বলের গামলাগুলি রাখা হইত ও অন্য ঘরে লুচি, হালুয়া, দই, বোঁদের ভাঁড়ার হইত। অতিথি ও ভক্তেরা বারান্দাতেই বারে বারে বসিয়া প্রসাদ পাইত। ২/৩টি সঙ্কীর্তন দল আসিত। তাহারা ও ভক্তমণ্ডলী ঠাকুরের ঘরে সঙ্কীর্তনে খুব মাতামাতি করিত ও পরে পঞ্চবটী, বেলতলা ও মন্দির-প্রাঙ্গণে ভজনগান করিয়া বেড়াইত। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁর ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় চাদা শতরঞ্চি পাতা স্থানে বসিয়া ঠাকুরের বিষয় আলাপ-আলোচনা করিত। কেহ কেহ বা পঞ্চবটীতে অথবা বেলতলায় বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিত। ৯/১০টার সময় সকলকে শালপাতার ঠোঙ্গায় একহাতা হালুয়া ও দুখানি

৭৬ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পৃঃ ১৯৭

৭৭ আলমবাজার মঠ থেকে ৬।৫।১৮৯২ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখা চিঠি

লুচি প্রসাদ দেওয়া হইত ও মধ্যাহ্নে সকলে বসিয়া খিচুড়ি ভোগ পাইত।"[৭৮]

আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্যের বিজয়দুন্দুভি বেজে ওঠার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। বিবেকানন্দের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর সংগঠিত মঠ ইত্যাদির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে থাকে। এই পটভূমিকায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে। আলমবাজার মঠে জন্মতিথির দিন পূজা-হোম ইত্যাদি হয়। সেদিন ছিল শুক্রবার, ৯ মার্চ। পরবর্তী রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ উৎসবে লোকজন অধিক সংখ্যায় যোগদান করে। লাটু মহারাজের স্মৃতিচয়ন থেকে জানা যায়, উৎসব-প্রাঙ্গণে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত লাটু মহারাজ ভাবোন্মত্ত হয়ে অনেকক্ষণ নৃত্য করেছিলেন। ঠাকুরের গৃহিভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য ভক্তগণ প্রচুর আয়োজন করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও যোগদান করেছিলেন। ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করতে করতে তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য করেছিলেন। অপূর্ব ভাবমণ্ডিত পরিবেশ রচিত হয়েছিল। ভক্তগণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গৃহী গুরুভাইদের দেখে মহানন্দে প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন করেছিলেন।[৭৯]

পরের বছর দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসবের আয়োজনে নতুন ও প্রবল এক প্রেরণা যুক্ত হয়েছিল। সুদূর আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ও নির্দেশ মঠবাসীদের প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখে পাঠালেন ঃ "এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। আমি একটা 'পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত' লিখে পাঠাব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জমা করে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম লইবে। হজুকের শেষ !!!... এই তো কলির সন্ধ্যা।... দাদা, একবার গর্জে গর্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি।"[৮০] কলকাতার টাউন হল-এ স্বামী বিবেকানন্দের অত্যাশ্চর্য সাফল্যের স্বীকৃতিদানের জন্য বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর সংগঠনের জন্য স্বামী অভেদানন্দ বেশ পরিশ্রম করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে লিখলেন ঃ "অদ্ভুত কর্মক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ।... ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। হৈরৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর ! সাবাস্ !"[৮১] স্বামী বিবেকানন্দ চাইছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাদর্শের অধিক প্রচার এবং স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহ। স্বামীজী ২২ অক্টোবর (১৮৯৪) তারিখে মঠে গুরুভাইদের লিখলেন ঃ "এবারকার উৎসব এমন করিবে যে, ভারতে পূর্বে আর হয় নাই। এখন হইতেই উদ্যোগ কর এবং উক্ত উৎসবের মধ্যে অনেকেই হয়তো কিছু কিছু সহায়তা করিলে আমাদের একটা স্থান হইয়া যাইবে।... এবারকার জন্মোৎসবে বোধ হয় আমি যোগদান করিতে পারিব।... যদি অধিক লোক হয়, তাহা হইলে দাঁড়া-প্রসাদ অর্থাৎ একটা সরাতে লুচি প্রভৃতি হাতে হাতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। যদি ২০ হাজার লোকে চারি আনা করিয়া দেয় তো ৫ হাজার টাকা উঠিয়া যায়। পরমহংসদেবের জীবন এবং তাঁহার শিক্ষা এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে উপদেশ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৮২]

এবছর অর্থাৎ ১৮৯৫-এর জন্মতিথি ও সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে মঙ্গলবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ও রবিবার, ৩ মার্চ। সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত তিথিপূজাতে মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত, মাস্টারমশায়, মনোমোহন মিত্র প্রভৃতি পুরনো ভক্তগণ। দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে লোকসমাগম বেশি হয়েছিল। এবছরই অক্ষয়কুমার সেন তাঁর রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। শ্রোতাদের অন্যতম স্বামী অদ্ভুতানন্দ পুঁথি-রচয়িতাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "অক্ষয়বাবু ! এমন সুন্দর করে তাঁর কথা লিখেছেন যে, মেইয়া লোকেরাও তাঁকে বুঝতে পারবে।" স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও অন্যান্যদের চিঠি থেকে স্বামীজী জানতে পারেন যে, মহোৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে হয়ে গেছে। কিন্তু উৎসবের বিবরণী পড়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ; তাঁর ১১ এপ্রিল (১৮৯৫) তারিখে রামকৃষ্ণানন্দজীকে লেখা চিঠিতে দুটি বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ঃ (ক) পরের বার এক লাখ লোক যাতে হয় তার চেষ্টা করতে হবে এবং (খ) শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ সুন্দর ও সুবোধ্য করে

---

৭৮ My Life and Reminiscences (বাঙলা রচনা—অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত)—Swami Virajananda, pp. 38 & 99

৭৯ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, পৃঃ ৮২

৮০ পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৬৩

৮১ ঐ, পৃঃ ২৫১-২৫২

৮২ ঐ, পৃঃ ২০৫-২০৬

পরিবেশন করতে হবে। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে রামকৃষ্ণানন্দজীকে লিখেছেন: "তোমরা মহোৎসবে তো লুচি সন্দেশ বাঁটলে, আর কতকগুলো নিষ্কর্মার দল গান করলে,... তোমরা কি spiritual food দিলে, তা তো শুনলাম না?"

ঠাকুরের জন্মমহোৎসব সম্বন্ধে স্বামীজীর ধ্যান-ধারণা ছিল অনেক উঁচু মাত্রার, তাঁর প্রত্যাশা ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর মনোভাবনা কিছুটা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর গুরুভাইদের লেখা একটি চিঠির মধ্যে। তিনি সেই চিঠিতে লিখেছিলেন: "Not only this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines."[৮৩] অর্থাৎ এই মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শুধুমাত্র একটি স্মারক হবে না, এই মহোৎসব হবে একটি কেন্দ্রীয় প্রচারকেন্দ্র, যার মাধ্যমে তাঁর চিরকল্যাণকামী ধর্মমতসমূহ বহুল প্রচারিত হতে পারে। উপরন্তু স্বামীজী চেয়েছিলেন মহোৎসব সংগঠনের দ্বারা গণমানসে তাঁর ভবিষ্য-পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে। তিনি তাঁর মহোদ্যমী গুরুভাই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখেছিলেন: "মোচ্ছব (মহোৎসব) এমন মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়।... লেগে যা, যত পারিস। পরে আমি ইন্ডিয়ায় এসে তোলপাড় করে তুলব।"[৮৪]

স্বামীজীর এসব ভাবনার ছাপ পড়েছিল পরবর্তী মহোৎসবে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসব ও সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে শনিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ও রবিবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি। উৎসব সংগঠনের নেতৃত্ব আলমবাজারের সন্ন্যাসিগণ গ্রহণ করেন। সুদূর পাশ্চাত্যদেশ থেকে স্বামীজী মঠধারীদের উদ্দেশে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন: "এবারকার মহোৎসবে খুব ধুম মাতাইবে। খাওয়া-দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়াপ্রসাদ ইতি। পরমহংসদেবের জীবনচরিত-পাঠ। বেদবেদান্ত পুঁথি একত্র করে আরতি করবে এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পেল্লা আদায় করিবে। পুরনো ঢৌলে নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিবে।"[৮৫] তিনি নিমন্ত্রণপত্রের খসড়া লিখে দেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন: "যদি যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ হয়, কিয়দংশ খরচ করে বাকি একটা ফান্ড করে রাখবে এবং তোমাদের খরচ তা হতে চালাবে।" তাছাড়াও স্বামীজী শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা 'কেবল্' পাঠান।

এবছরের উৎসব অধিকতর জনসমাগম ছাড়াও দুটি ঘটনার জন্য স্মরণীয়। মহোৎসবে প্রসাদ-বিতরণ সম্বন্ধে বলরামভবনে একটি আলোচনাসভা হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দের উপস্থিতিতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উদ্যোগী ভক্তগণ সিদ্ধান্ত করেন, দুধরনের খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হবে—দরিদ্র-নারায়ণের জন্য কলায়ের ডালের খিচুড়ি ও ভদ্রলোকদের জন্য সোনামুগের ডাল ও বাঁকতুলসী চালের ভুনী খিচুড়ি। গণতান্ত্রিক স্বামী অখণ্ডানন্দ পরদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট গিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। সিদ্ধান্ত পাল্টানো হয়। সকলের জন্য একই রকমের ভুনী খিচুড়ির ব্যবস্থা হয়।[৮৬] দ্বিতীয় ঘটনাটি যথেষ্ট রঙ্গরসের কারণ হয়েছিল। উৎসব-প্রাঙ্গণে নানাশ্রেণীর মহিলার সমাগম দেখে অতীতে কোন কোন মহল থেকে কটূক্তি বর্ষিত হয়েছিল। এর প্রতিকারের জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ কয়েকজন সেবককে নিয়ে এগিয়ে যান। চিৎপুর রোডের ওপর জোড়াসাঁকো পর্যন্ত কিছুদূর অন্তর লাল সালুতে লেখা নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তাতে লেখা ছিল—দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে স্ত্রীলোকমাত্রেরই যোগদান নিষিদ্ধ। শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও প্ল্যাকার্ডে এ নিষেধ ঘোষিত হলো। উৎসবের দিন দলে দলে স্ত্রীলোকদের আসতে দেখে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দক্ষিণেশ্বরের প্রধান ফটক বন্ধ করবার আদেশ দেন। এদিকে হোরমিলার কোম্পানীর[৮৭] স্টীমারে দলে দলে মেয়েরা এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে থাকল। গিরিশবাবুর অনুরোধে ফটক খুলে দিতেই বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতো মেয়েরা আসতে থাকল। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন: "অনেকেই বলিল, বাধা দেওয়ার ফলে এবৎসর অন্যান্য বৎসরের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব বেশি হইয়াছে।"[৮৮]

কলঙ্কিত চরিত্রের নারীদের উপস্থিতিতে যাঁরা বিব্রত

৮৩ পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩১১ ৮৪ ঐ, পৃঃ ৪২৪ ৮৫ ঐ, পৃঃ ৪১৭ ৮৬ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১৫০

৮৭ রামদয়াল চক্রবর্তী হোরমিলার কোম্পানীর একজন ঠিকাদার ছিলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে মহোৎসবে কোম্পানীর কয়েকখানি স্টীমার সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত হাটখোলা ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলাচল করেছিল।

৮৮ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১৫২

বোধ করছিলেন তাঁদের অন্যতম রামদয়াল চক্রবর্তী স্বামীজীর নিকট অভিযোগ পেশ করেন। এবিষয়টি উত্থাপন করে স্বামীজী ২৩ আগস্ট ১৮৯৬ তারিখে লিখেন: "বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে যাইতে না পারে তো কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।" তিনি আরও লিখেন: "আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।"৮৯

মন্দির-প্রাঙ্গণে দক্ষিণের ঘরগুলি উৎসবের ভাণ্ডারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। আগের দিন ভিয়েন চেপেছিল। আন্দুলের গৈরিকবসন-পরিহিত ভস্মাচ্ছাদিত জটাধারী কালীকীর্তনের দল নাটমন্দিরে আসর জমিয়েছিল। ঠাকুরের ঘরে প্রণাম করে কীর্তনীয়া দলগুলি বাইরে এসে জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন করতে থাকল। কীর্তনীয়াদের মধ্যে বৈষ্ণবচরণ ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। মহাবোধি সোসাইটির শ্রীধর্মপাল, যশোরের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক যদুনাথ মজুমদার, শ্রী এন. ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখে স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি চিঠিতে মন্তব্য করেছেন: "অন্যূন ৩০ হাজার নরনারী সমবেত হইয়া উৎসাহ ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার সঙ্কীর্তন ও জয়ঘোষণা করিয়া সমস্ত দিন দক্ষিণেশ্বর মন্দির আনন্দে প্লাবিত করিয়াছিল। এবারকার উৎসব অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।"৯০ অবশ্য পরবর্তী জন্মোৎসবের তুলনায় এবছরের উৎসবের সাফল্যও ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব কয়েকটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয়। প্রধান কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের উৎসবে যোগদান।৯১ ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদান্তধর্ম সগৌরবে বিদেশে প্রচার করে প্রত্যাবৃত্ত নরেন্দ্রনাথ তথা স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বর-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসবে এই প্রথম ও শেষ যোগদান। তাঁর অনুসরণকারী দেশ-বিদেশের বহু ভক্তের সমাগমে সেদিন দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক মহাতীর্থের রূপ ধারণ করেছিল। এমন জমকালো শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পূর্বে বা পরে কখনো হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত থাকবেন—এখবর রাষ্ট্র হয়েছিল। রাস্তায় বড় বড় প্ল্যাকার্ডে এই বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী আহিরীটোলা থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি পর্যন্ত যাত্রী বহনের জন্য ঐদিন স্টীমার ভাড়া নিয়েছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে যেসব সারি সারি ঘরে খাজাঞ্চির অফিস ও কর্মচারীদের বাসস্থান ছিল সেখানে রান্নার ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোগরান্নার ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ সারিবদ্ধ ঘরগুলির পিছনে দরমা-ঘেরা স্থানে। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসছিল। হেঁটে, ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায়, স্টীমারে চেপে লোকে উৎসবে যোগদান করছিল। বহু সঙ্কীর্তনের দল নৃত্য ও গানে মাতোয়ারা হয়ে উৎসবক্ষেত্রে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। বৃহৎ কালীবাড়ির সর্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।

সকাল নয়টা-দশটা আন্দাজ স্বামীজী আলমবাজার মঠ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কয়েকজন গুরুভাই ও অন্যান্য অনুরাগিবৃন্দ। স্বামীজীর খালি পা, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। স্বামীজীকে দেখে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—'জয় রামকৃষ্ণের জয়', 'জয় বিবেকানন্দের জয়'। সকলেই তাঁর দর্শন-স্পর্শনের জন্য উন্মুখ। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে অনুগমন করছিল। প্রথমে মা কালীর মন্দিরে, পরে রাধাকান্তের মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্বামীজী ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হলেন। সেখানে লোকের ভিড়, কিন্তু ভাবের বন্যা। স্বামীজী তাঁর ইংরেজ শিষ্যা মিস মুলার ও মিসেস সেভিয়ার এবং শিষ্য মিস্টার

৮৯ একই চিঠিতে স্বামীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কয়েকজন কর্মী সেদিন ছড়িদারের কাজ করবেন। কদাচার বা কুকথায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের তাঁরা উদ্যান থেকে বের করে দেবেন। তিনি কর্মকর্তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: "যতক্ষণ তারা ভাল মানুষের মতো ব্যবহার করে ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক, গৃহস্থ হোক বা অসতী হোক।"

৯০ ১৮।২।১৮৯৬ তারিখে হরিমোহনকে লেখা চিঠি।

৯১ ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা ৭ মার্চ (১৮৯৭) সংখ্যায় ঘোষণা করে: "This year the celebration is likely to be on a grandeur scale than ever, in honour of Vivekananda."

গুডউইনকে ঠাকুরের সাধনার স্থান পঞ্চবটী, বেলতলা ইত্যাদি দেখাতে নিয়ে গেলেন। পথে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা। পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম ও অভিবাদনপূর্বক কুশলাদি প্রশ্ন করলেন।

পঞ্চবটীমূলে সমাসীন ভক্তগণের মধ্যে বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বললেন: "ঘোষজ, সেই একদিন আর এই একদিন।" গিরিশচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন: "তা বটে, তবু এখনো সাধ যায় আরও দেখি।"৯২

বেলা বাড়তেই দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য।৯৩ জনসমুদ্র স্বামীজীর কণ্ঠে ভাষণ শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব। চারদিক থেকে অনুরোধ, উপরোধ আসতে থাকল। স্বামীজী দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর অপরের শ্রুতিগম্য করতে ব্যর্থ হলেন। ক্রমবর্ধমান লোকের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি অবশেষে দুটা-তিনটা নাগাদ একটা ছ্যাকরা গাড়ি করে মঠে ফিরলেন।৯৪

ফেরার পথে স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পথে স্বামীজী বলতে থাকলেন: "কেবল abstract idea নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এসব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে তো mass-এর ভিতর এসকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে।... যারা ধর্ম কি, আত্মা কি—এসব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে।"৯৫

মঠ আলমবাজারে থাকাকালীন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব, যা ওপরে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা গেছে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব প্রবর্তিত হলেও এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে। প্রায় ঐ বছর থেকেই উৎসব সংগঠনে মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারিগণের ওপর অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠানের সাফল্যের মূলে ছিল ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের যৌথ প্রচেষ্টা এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির-কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা। উৎসব সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব বহন করতেন মুখ্যতঃ গৃহী ভক্তগণ, কিন্তু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় মঠবাসীদের তত্ত্বাবধান ছিল যথেষ্ট পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং সর্বজনসমাদৃত। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে উৎসবের সংগঠনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। সুদূর আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নতুন নতুন ভাবনা, অফুরন্ত উৎসাহ ও তেজী প্রেরণা দ্বারা মঠবাসীদের সঞ্জীবিত করতে থাকেন। সেই সঞ্জীবনী সুধায় বলীয়ান হয়ে মঠবাসিগণ এবং বয়সে নবীন ভক্তগণ উৎসব-অনুষ্ঠানে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই বার্ষিক অনুষ্ঠান ধনী-দরিদ্র, মূর্খ-বিদ্বান, পাপী-পুণ্যাত্মা, পুরুষ-নারী সকলের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠে। জনসাধারণের মধ্যে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফলতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মমহোৎসব রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পুষ্টিসাধন করে।

কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জন্মমহোৎসবের পর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অছি পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস বিদেশ-প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।৯৬ পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ পড়ে যায়। অবশ্য ঐ বছরের উৎসবে যোগদানকারী স্বামী বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির বা অন্য কোন মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে কেউই সাহস করেনি। পরের বছর মঠ স্থানান্তরিত হয় গঙ্গার অপরতীরে বেলুড় গ্রামে এবং সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য মঠের নিকটবর্তী উত্তরদিকে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একবছরের জন্যই ঐ ভূমিখণ্ডে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর প্রতিবছর ঠাকুরের

৯২ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৮।

৯৩ ফেরার পথে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ বলেন: "এমন ভিড় উৎসবে আর কখনো হয়নি। যেন কলকাতাটা ভেঙে এসেছিল।" (ঐ, পৃঃ ২৬)

৯৪ My Life and Reminiscences, pp. 91-92

৯৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২৪-২৫

৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন (১৮৯৭) দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রবেশ সম্বন্ধে কালীবাড়ি কর্তৃপক্ষ

জন্মমহোৎসব সম্পাদিত হয় বেলুড়ে মঠের নিজস্ব জমিতে।

আলমবাজার মঠের আয়ুষ্কাল ছয় বছর। এ-সময়ের মধ্যে সংঘটিত মঠজীবনের সাধারণ কয়েকটি বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। এরপর কালপর্যায়ক্রমে সংঘটিত অন্যান্য ঘটনাপুঞ্জের আলোচনা করব। বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য আমরা দৃষ্টি দেব আধুনিক সমাজবিজ্ঞানিদের কয়েকটি দিগ্‌দর্শনের প্রতি। সমাজবিজ্ঞানিগণ লক্ষ্য করেছেন যে, ভাবাদর্শের বাস্তবায়নকালে ভাবাদর্শের ক্যারিসমার (charisma) কিছুটা রূপান্তর অপরিহার্য। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, চিন্তাভাবনা, অনুশীলন ও সংগঠন স্তরে ভাবাদর্শের ক্যারিসমার সুস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রূপান্তরের ওপর নির্ভর করে সংঘের ভাবাদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও স্থায়িত্ব। এবিষয়ে সচেতন ধর্মসংঘমাত্রই সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে এবং দ্রুত নবাগতদের গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত করার জন্য সুচিন্তিত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এধরনের নিয়মানুবর্তী প্রশিক্ষণ ছাড়াও নবাগতদের সংঘের পুরনো ও স্থায়ী অঙ্গদের সান্নিধ্যে বসবাস, তাঁদের সঙ্গে সহজ মেলামেশা ইত্যাদি যথানিয়মের ধারাবর্জিত পদ্ধতিও আশ্রয় করে। এভাবেই গোষ্ঠীর সংহতি সুদৃঢ় হয়। গোষ্ঠী শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়।

সমাজবিজ্ঞানিগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, নবাগত কোন ব্যক্তির কোন ধর্মসংঘে অঙ্গীভূত হওয়ার কয়েকটি দিক রয়েছে এবং এক-এক দিকে অঙ্গীভূত হওয়ার মাত্রাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, এবিষয়ে পাঁচটি দিক বিশেষ বিবেচ্য। প্রথম, ঐ ব্যক্তির জীবনে অলৌকিক শক্তির সঙ্গে তার অনুভূতির অনুষঙ্গ। দ্বিতীয়, সংঘের বিধিবদ্ধ কর্মসূচীতে সংঘের অঙ্গগণের অংশগ্রহণ। এ-ধরনের অংশগ্রহণের থাকে দুটি পক্ষ : (১) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অঙ্গগণের যোগদান ও সহযোগিতা করা এবং (খ) ভক্তি-বিমিশ্রিত ক্রিয়ানুষ্ঠান, যেমন প্রার্থনা, উপাসনা, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। তৃতীয়, সংঘের মতাদর্শে অঙ্গগণের আনুগত্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। চতুর্থ, পরিণতিতে অঙ্গগণের দিনচর্যায় ঐসব বিষয়ের, বিশেষতঃ সংঘের মতাদর্শের এবং সংঘজীবনে তাদের সাঙ্গীকরণের প্রভাব। পঞ্চম, সংঘের ভাবাদর্শ সম্পর্কে প্রতিভাধর অঙ্গগণের জ্ঞানবিচারের গভীরতা। বলা বাহুল্য, এধরনের গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রশিক্ষণের দ্বারা গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির মধ্যে মুকুলিত হয় সংঘের আদর্শ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, গাঢ় বিশ্বাস, দৃঢ় নিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে নীতিবোধ সম্বন্ধে সদা-সচেতনতা। চার্লস গ্লক (Charles Glock) ও রোডনি স্টার্ক (Rodney Stark)-এর উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত মোটামুটি গ্রহণ করেও অঙ্গগণের গোষ্ঠীবদ্ধতা ও স্বাত্মীকরণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বাড়তি অভিমত প্রকাশ করেছেন রোনাল্ড এল. জনস্টোন। তিনি লিখেছেন : "Thus, although psychological processes are involved, what we observe is not something internal to the individual that 'comes out', so to speak. Rather, we see something created and induced from 'without' through socialization."[৯৭] জনস্টোনের এই অভিমত পাশ্চাত্যে প্রচলিত ধর্মসংঘের ওপর প্রযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল বৈ তো নয়। প্রাচ্যের হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্মসংঘের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ধরনের। প্রাচ্যের ধর্মসেবীদের নিকট ধর্মের প্রাণ হচ্ছে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি বা ঈশ্বরলাভ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। এ-ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করতে সাহায্য করাই ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্লক ও স্টার্ক নির্দেশিত অলৌকিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অনুভূতির অনুষঙ্গ ধর্মসাধকের চলার পথে একটি অভিজ্ঞতামাত্র, কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক সুপ্ত দৈবসত্তার বিকাশই ধর্মসাধনের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গগণের গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সংঘে স্বাত্মীকরণের প্রক্রিয়াদির মধ্যে অঙ্গগণের আধ্যাত্মিক পরিপুষ্টি বা আত্মশক্তির বিকাশই প্রধান লক্ষ্য। অন্য সবকিছু উপলক্ষমাত্র।

[পরবর্তী অংশ আগামী কার্তিক সংখ্যায়]

নীরব ছিল। ২১ মার্চ রবিবার খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ, মিস্টার হ্যারিসন ও কয়েকজন সাধুভক্তের সঙ্গে স্বামীজী দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যান। খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখার্জি অতিথিদের সযত্নে সব স্থান পরিদর্শন করান। মঠের একজন সন্ন্যাসী ও মিস্টার হ্যারিসন ইতিপূর্বে মন্দিরের সেবাইত ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসকে তাঁর জানবাজারের বাড়িতে জানিয়েও এসেছিলেন। নির্বিঘ্নে এই পরিভ্রমণ শেষ হবার পর ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণকে জানান যে, স্বামী বিবেকানন্দের কালীমন্দিরে গমন মন্দির-কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত ছিল।

৯৭ Religion in Society, p. 54

কবিতা

অতিমানস আলো

সাগরিকা শর্মা

বিপ্লবী সেই বীর
গীতার ভাব মর্মে নিয়ে
ধর্মাদর্শ ছড়িয়ে দিয়ে
কর্মে ধীর স্থির।

তরুণ দলের অনুশীলন
স্বাধীনতায় মহামিলন
লক্ষ্য ছিল তাঁর,
বিপদ-বাধার কাছে
মনটি মগন মরণ-নাচে,
মানেননিকো হার।

দুর্জয় সেই বীর
নোয়াননিকো শির
ভয়হীন চিত্ত তাঁর
অভয়-মন্ত্রে বারম্বার
মৃত্যুরে যায় দলি,
শাসনের সেই মারণযন্ত্রে
স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে
অনেক হলো বলি।

আসক্তিহীন ভাবেন তিনি
রয়ে গেলাম ঋণী
দেশমায়ের কাছে,
তবুও বাকি আছে
অনেক কাজ, অনেক কাজ,
কারাগারের অন্তরালে
জ্যোতির টিকা পরেন ভালে
এবার নতুন সাজ।

বসে থাকেন অন্ধকারে
লৌহকপাট বন্ধ দ্বারে
উতল বারম্বার
অন্ধ কারাগার।
নামল মনে আলোছায়
সাধনাতে শীর্ণকায়
আলোর হলো জয়
ঘুচল সংশয়।
পণ্ডিচেরীর ছায়ায়
সাধনপীঠ ঐশীবলে
বঙ্গ থেকে গিয়ে চলে
গড়েন অনেক মায়ায়।

মেধা তাঁরি প্রজ্ঞা তাঁরি
পুণ্যভরা তীর্থবারি
নিল সাগরতীর
সাহসী সেই বীর।
তবে বিপ্লব আর নয়,
অরবিন্দ যোগাসনে
পরম ধ্যানে মগ্ন মনে
হলেন হিরণ্ময়।

নেই তো আর কালো
জ্যোতির দেশে
দীপ্তি এসে
ছড়িয়ে দিল
মিলিয়ে নিল
অতিমানস আলো॥

দীক্ষা

প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী

রেশমের সুতো টেনে এনে
বাঁধেন গুরু হৃদয়তন্ত্রীতে;
স্পর্শযোগ ঘটে ইষ্টের সাথে,
হয়তো সে-অনুভব এক পলকের,
তবু চিরন্তন।

□ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য □

ধ্রুবের উপাখ্যান ২

কথা ঃ ভগিনী নিবেদিতা □ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত।



অরণ্যের প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা হলো। গেরুয়া রঙের মাটির তৈরি ও তাল-পাতায় ছাওয়া একটি সাধারণ কুটির, কিন্তু মাধুর্যে ভরা। কুটিরের সঙ্গে একটি প্রশস্ত বারান্দা, যেখানে রানী বিশ্রাম করতেন এবং পল্লীসখীদের সঙ্গে আলাপ করতেন। সামনেই সূচীভেদ্য অরণ্যের বেষ্টনী। সেখানে রাত্রে বন্যপশুর গর্জন শোনা যায়।

দিন কাটতে লাগল। তীর্থযাত্রী সাধু-সন্ন্যাসীর দল অরণ্যপথে যাওয়ার সময় তাঁদের কুটিরে আসতেন। তাঁদের নিস্তরঙ্গ জীবনে তা-ই ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সবুজ অরণ্যের বৃক্ষশাখার দোলা মনে ভগবানের চিন্তা আনত। ধীরে ধীরে রানী সুনীতির মনে এক গভীর শান্তি নেমে এল।





শিশু ধ্রুব সেই শান্ত পরিবেশে কখনো কখনো সূর্যাস্তের সময় পদ্মশোভিত জলাশয়ের পাশে এসে দাঁড়াত। বড় বড় সবুজ পাতার পটভূমিতে বাতাসে মৃদুমন্দ আন্দোলিত লাল ও সাদা পদ্মগুলি তার কাছে শুদ্ধি, পবিত্রতা ও কোমলতার প্রতীক বলে মনে হতো।

[পরবর্তী অংশ আগামী কার্তিক সংখ্যায়

নিবন্ধ

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী তথাগতানন্দ

মহাভারতের আদিপর্বেই বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যপুরুষ ও ভগবান বাসুদেব বলে চিহ্নিত করেছেন। [আদিপর্ব, ১।২৫৬]। আবার অন্যত্র বেদব্যাস তাঁকে ভগবান বলে ঘোষণা করে তাঁর মহিমাকীর্তনে সদা উন্মুখ ঃ "পুরুষ স বিভুঃ কর্তা সর্বভূতপিতামহঃ ।।" [ঐ, ৬৩।৯৯-১০৩]। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় বলরামের সঙ্গে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম দেখি। তিনি অর্জুনের সমবয়স্ক। দ্রৌপদীকে অর্জুন লাভ করার পর ক্ষত্রিয়কুল দ্রৌপদীর পিতাকে বধ করে ক্ষত্রিয়দের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নিতে চান। ভীমার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আক্রমণকারী ক্ষত্রিয়গণ পরাজিত হন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় শান্ত হয়ে ক্ষত্রিয়কুল স্থানত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এরপর কুম্ভকার গৃহে এসে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করেন এবং যুধিষ্ঠির ও পিসিমা কুন্তীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। পাণ্ডবদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অত্যন্ত আনন্দিত হন ; কারণ তাঁরা জানলেন যে, জতুগৃহদাহে তাঁদের মৃত্যু হয়নি। এই দৃশ্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয়প্রীতি ও সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাই।

অর্জুনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁরা আসলে নর ও নারায়ণ। পূর্বজন্মে বদরিকা আশ্রমে দীর্ঘকাল তাঁরা তপস্যা করেন। তাঁদের আত্মীয়তা দীর্ঘকালের। বনপর্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ "তুমি ও আমি অভিন্ন। আমাদের পারস্পরিক ভেদ অসম্ভব।" (বনপর্ব, ১২।৪৭)। সুভদ্রাহরণে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অকুণ্ঠ সহায়তা পান। এমনকি বলরাম ও যাদবগণ অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে তাঁরা নিবৃত্ত হন।

রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ চাইলেন যুধিষ্ঠির। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ভারতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা জরাসন্ধকে পরাজিত করতে না পারলে রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকারী হবেন না যুধিষ্ঠির। জরাসন্ধের অধীনে ছিল তেইশ অক্ষৌহিনী সৈন্য। তিনি ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। একশ জন পূর্ণ হলেই মহাদেবের নিকট তিনি তাঁদের বলি দিতেন। এসব অত্যাচারের প্রতিকার করার মতো শক্তিশালী কোন বীরপুরুষ তখন ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেন এবং ছিয়াশি জন রাজাকে মুক্তি দেন। মুক্তিপ্রাপ্ত রাজারা সকলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করেন। তাঁরা কিন্তু যজ্ঞস্থলে শিশুপালের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি। ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই তাঁরা অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহসী হননি।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও তাঁর দূরদৃষ্টিকে জানতে হলে মহাভারতের সভাপর্বে [১৩।১৪] এ সম্পর্কে কী বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের জানতে হবে। বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবৃন্দ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মত্ত থেকে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যপ্রয়াসকে করেছিলেন সুদূরপরাহত। সার্বভৌম সর্বভারতীয় এক রাষ্ট্রগঠনের মনোভাব বা দূরদর্শিতা তাঁদের ছিল না। ভারতে একটা দৃঢ় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কোন ধার্মিক রাজার অধীনে তিনি এই রাষ্ট্র গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে যুধিষ্ঠিরই হলেন সেই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার পক্ষে সবদিক থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি। দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ।

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। "চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।" [সভাপর্ব, ৩৫।১০]। স্বীয় মর্যাদাবোধের অহমিকায় আচ্ছন্ন না থেকে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা সামাজিক কর্তব্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

ভীষ্মের উপদেশে রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করেছেন। ভীষ্ম বলেছিলেন ঃ "এই সভাতে তেজ, বীর্য ও পরাক্রমে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ। ইনি জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্যসদৃশ। এঁর উপস্থিতিতে এই সভা গৌরবান্বিত হয়েছে।" চেদিরাজ শিশুপাল এর প্রতিবাদ করেন। অন্যান্য অনেক রাজাও তাঁকে সমর্থন করেন। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় তিরস্কার করেন শিশুপাল। এছাড়া, শ্রীকৃষ্ণকেও অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করে শিশুপাল আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অন্যদিকে ভীষ্ম প্রকাশ্য সভায় শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপেই বর্ণনা করেছেন। ভীষ্মের নিকট শ্রীকৃষ্ণ শুধু একজন ভারতবিখ্যাত যোদ্ধারূপেই প্রতিভাত হননি বরং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মনুষ্যদেহে ঈশ্বরের আবির্ভাবকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঃ

"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
অয়ন্তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেব প্রভাষতে॥

[সভাপর্ব, ৩৮ অধ্যায়]

শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চলভাবে শুনছিলেন শিশুপালের তিরস্কার। ভীষ্ম যখন বললেন, শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ শৃগালমাত্র তখন শিশুপালের ক্রোধের সীমা রইল না। শিশুপাল তখন শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, শিশুপালের জননীর কাছে তিনি শিশুপালের একশ অপরাধ ক্ষমা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সভায় শিশুপাল সেই সীমাকে অতিক্রম করলেন। তাই সমবেত নৃপতিগণের সাক্ষাতেই সুদর্শন চক্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেন। স্পষ্টতই, সমবেত রাজন্যবর্গ শ্রীকৃষ্ণের শৌর্যবীর্য দেখে ভীত হয়ে পড়েন। একথাও সকলে স্বীকার করেন যে, তিনি বেদ-বেদাঙ্গবিদ্ ও তপস্বী। মহাভারতে এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণের হাতে দুষ্কৃতীর বিনাশ বর্ণিত হলো।

রাজসূয় যজ্ঞের পর দ্বারকা যাবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা সাবধানে থাকার পরামর্শ দিলেন। তাঁর এই সাবধানবাণী অত্যন্ত নাটকীয়। বেদব্যাসের মতে, রাজসূয় যজ্ঞের জন্যই দুর্যোধনের ঈর্ষানল উদ্দীপিত হলো। [সভাপর্ব, ৪৫ অধ্যায়]। বিদুর সেটা বুঝেছিলেন এবং সেজন্য ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছিলেনঃ "এই দ্যূতক্রীড়া নরকের দ্বারস্বরূপ।" [সভাপর্ব, ৬৩ অধ্যায়]। মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয় ঋষি পরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেনঃ "দ্যূতসভায় যা ঘটেছে সেটা নিতান্ত দস্যুবৃত্তি।"

বঞ্চিত, লাঞ্ছিত পাণ্ডবগণ বনে গেছেন। মহাভারতের এই বনপর্ব একটা বৃহৎ পর্ব [১১৬৬৪টি শ্লোক]। শুধু শান্তিপর্ব (১৪৭৩২টি শ্লোক) থেকে এটি আয়তনে কিছু কম। বিষ অনেক সময় অমৃত হয়ে কাজ করে, অমৃত বিষে পরিণত হয়। অভিশাপ হয় আশীর্বাদ। আশীর্বাদ আবার অভিশাপে পরিণত হয়। দুর্যোধনের দুর্ব্যবহারের জন্যই মৈত্রেয় ঋষির অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিলঃ "তোমার অহঙ্কারের জন্য মহাযুদ্ধে ভীম তোমার ঐ উরু ভঙ্গ করবে।" (বনপর্ব, ১০ অধ্যায়)। দেবর্ষি নারদ দ্যূতসভামধ্যে অকস্মাৎ দৈববাণীর মতো ঘোষণা করলেনঃ "আজ থেকে চতুর্দশ বৎসরের মধ্যে দুর্যোধনের অপরাধে কুরুকুল ধ্বংস হবে।" এই বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। দর্প, অহঙ্কার ও পরশ্রীকাতরতা মানুষের জীবনকে চিরদিনই ধ্বংস করে। সেজন্য দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগেই কৌরবদের পরাজয় ঘটেছে। গীতায় পরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেনঃ "নিহতাঃ পূর্বমেব।"

বনবাসে অতিদুঃখে পাণ্ডবদের জীবন কাটছে। কিন্তু সর্বদা তাঁরা পেয়েছেন ঋষিদের আশীর্বাদ আর তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জীবনের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁরা হয়েছেন প্রাজ্ঞ, দৃঢ় ও সমৃদ্ধ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে বলেছিলেনঃ "পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্র জয় করে বীরোচিত সুখে নিরত রয়েছেন। তাঁরা ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন।" (উদ্যোগপর্ব, ৮৯ অধ্যায়)। বন্ধু-বান্ধবহীন হয়ে রাজপুত্রেরা শুধু ধর্মের জন্য আজ অনাথের জীবনযাপন করছেন। মা পরের অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একবার আবেগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেনঃ "আমাদের মাতা বিবাহের পর থেকে জীবনে একদিনও শান্তি পাননি, সুখী হননি।" [উদ্যোগপর্ব, ৮৩ অধ্যায়]। এমনকি দুর্যোধনও স্বীকার করে বলেছেনঃ "তোমাদের মাতা বহুদিন ধরে অশেষ কষ্ট সহ্য করেছেন।" [ঐ, ১৬০।৪৬]। যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য থেকে বনবাসের দুঃসহ ক্লেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বলছেনঃ "কৃষ্ণ, আমাদের এই দুঃসহ দারিদ্র্য তো মৃত্যুতুল্য। কালকের আহারের সংস্থান নেই। আজ কি খাব তারও ঠিক নেই। আমাদের মতো দারিদ্র্যদশায় পড়ে মানুষ গ্রাম ছেড়ে যায়, বনে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, ক্রীতদাস হয়, পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে।" (ঐ, ৭২ অধ্যায়)

পাণ্ডবদের বনবাস জীবনের বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। বনপর্বের সুদীর্ঘ এগারটি অধ্যায়ে তার বর্ণনা রয়েছে। কাম্যক বনে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য আত্মীয়রা এসেছেন। যুধিষ্ঠিরকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ "ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমি দুরাত্মা দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের অনুগামীদের আমরা বধ করব। অধর্মের অনুগামীদের বধ করা সনাতন ধর্ম। আমরা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে অভিষিক্ত করব।" (বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)। পাণ্ডবগণের দুর্গতি দেখে শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে যেন সর্বগ্রাসী কালানল বের হতে লাগল। অর্জুন তাঁকে স্তব করে শান্ত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব এই স্তবের বিষয়বস্তু। আগেই বলা হয়েছে, অর্জুন পূর্বজন্মে ছিলেন নর ঋষি আর শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নারায়ণ ঋষি।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সত্যই দুর্জ্ঞেয় পুরুষ। তাই বেদব্যাস তাঁকে বলেছেন "অপ্রমেয়"। ভীষ্ম ও অর্জুন তাঁকে স্বয়ং ঈশ্বর বলেই জানতেন।

দ্যূতসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী নারীর সেই মর্মান্তিক অপমান বুকে ধরে রেখেছেন। এতদিন বুকফাটা অসহ্য যন্ত্রণাকে মুখ ফুটে কাউকে একবারও বলেননি। নীরবে হৃদয়ের গোপন অন্তস্তলে এই বেদনাকে অতি দুঃখে তিনি বহন করে চলেছেন। দীর্ঘদিন পর শ্রীকৃষ্ণ কাম্যক বনে এলেন পাণ্ডবদের দেখতে। অন্যান্য আত্মীয়রাও এলেন সেখানে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে দ্রৌপদীর এতদিনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। চোখের জল আর বাধা মানল না। দ্রৌপদী কেঁদে বললেন শ্রীকৃষ্ণকে: "হৃষীকেশ! ব্যাসদেব বলেছেন, তুমি দেবগণেরও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর। তাই আমি তোমাকে আমার মনের দুঃখ জানাচ্ছি। আমি পাণ্ডবদের ভার্যা, তোমার সখী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী। তবে কেন আমায় দুঃশাসন কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমি ছিলাম একবস্ত্রা, রজস্বলা। আমাকে তাঁরা লাঞ্ছিত করল। ধিক পঞ্চপাণ্ডবদের, ধিক ভীমসেনের বাহুবলে, ধিক অর্জুনের গাণ্ডীবে। কতকগুলি নীচব্যক্তি তাঁদের ধর্মপত্নীকে পীড়ন করছে আর তাঁরা তা নীরবে দেখেছেন। পাণ্ডবেরা শরণাগতকে ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমাকে তাঁরা রক্ষা করেননি। কৃষ্ণ, আমি অনেক কষ্ট সহ্য করে আর্যা কুন্তীকে ছেড়ে এই বনে পুরোহিত ধৌম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আমি যে-নির্যাতন সহ্য করেছি তা আমার সিংহবিক্রম পতিগণ কেন উপেক্ষা করলেন? মহৎ কুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডবদের প্রিয় ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, তবু পঞ্চপাণ্ডবের সমক্ষে দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করল!"

বনপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখি দ্রৌপদীর আর্তি-নিবেদন তাঁর ব্যথাতুর হৃদয়ের গোপন মর্মবেদনার বহিঃপ্রকাশ—"মধুসূদন, আমার পতি নেই, পুত্র নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, পিতা নেই, এমনকি তুমিও নেই।"—

"নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ মে পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন॥"

ব্যাসদেবের কী অপূর্ব বর্ণনা! দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন: "ভাবিনী, তুমি যাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ তারা অর্জুনের শরাঘাতে রক্তাক্ত দেহে ভূমিতে লুটিয়ে পড়বে, তুমি যেমন রোদন করেছ বা করছ তাদের স্ত্রীগণও একদিন এইরকম রোদন করবে। পাণ্ডবদের জন্য যা সম্ভবপর আমি তা করব। তুমি শোক করো না। কৃষ্ণা, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি—তুমি আবার রাজরানী হবে। যদি আকাশ পতিত হয়, হিমালয় শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয় তথাপি আমার বাক্য ব্যর্থ হবে না।" (বনপর্ব, ১২ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ পাণ্ডবদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বনবাসের এগার বছর কেটে গেছে। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের নিশিদিন চিন্তা—কিভাবে পাণ্ডবদের ধ্বংস করা যায়। নানাভাবে এঁরা সর্বদা সেই চেষ্টাই করে চলেছেন। অযুত শিষ্য-সহ দুর্বাসা মুনি এঁদের অনুরোধে অসময়ে পাণ্ডবদের অতিথিরূপে উপস্থিত হলে বিপন্না দ্রৌপদী কাতর হয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে অতিথিসৎকার করে পাণ্ডবদের দুর্বাসার ক্রোধ থেকে বাঁচান।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তির পর উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিবাহ স্থির হয় বিরাটনগরে। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি প্রভৃতি যাদবগণ অভিমন্যুকে নিয়ে বিরাটনগরে আসেন। বিবাহ-উৎসব শেষ হয়ে গেছে। সবাই ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যতিক্রম শুধু শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বেশ একটু চিন্তিত। আসন্ন দুর্দিনের বেদনামুখর প্রতিচ্ছবি দেখা দিয়েছে এই আনন্দবাসরে। বহুদিন আগে পরশুরাম বলেছিলেন, কুরুপাণ্ডবের কলহকে কেন্দ্র করে কুরুক্ষেত্রে ঘটবে এক ভীষণ সংগ্রাম। এই আসন্ন বীরশূন্য পৃথিবীর ব্যথাতুর প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ বেদনাহত।

কুরুপাণ্ডবের পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে তৎকালীন ভারতের রাজন্যবর্গ নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার খেলায় মত্ত হয়েছিলেন। কুরুকুলের প্রাচীন শত্রু মৎস্যদেশ। মৎস্যদেশের রাজা বিরাট। আবার মৎস্যদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী মদ্রদেশের চিরশত্রুতা। পাণ্ডবদের মাতুল শল্য মদ্রাধিপতি। সেজন্যই বোধ হয় শল্য যুদ্ধে কৌরবপক্ষে যোগ দেন। কৌরবদের আধিপত্যকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদও কোনদিন স্বীকার করেননি। যাদবগণও চিন্তিত। কেননা দ্রুপদ অতীতে জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়ে মথুরা আক্রমণ করেছেন আঠার বার। এইসব রাজনৈতিক জটিলতা ছিল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীকৃষ্ণ আসন্ন যুদ্ধ নিবারণ করতে চান, চান শান্তি। বিরাটনগরে সন্ধির জন্য তিনি রাজন্যবর্গের নিকট আকুলভাবে আবেদন জানালেন।

ন্যায়সঙ্গত অর্ধরাজ্য তিনি চান না, পাণ্ডবদের জন্য তিনি চাইলেন মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রাম। (উদ্যোগপর্ব, ১।১৫)। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব অবগত হয়েই পরে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের দূত সঞ্জয়কে পাঁচটি গ্রাম দেবার জন্য আবেদন করেন।

বিরাটনগরে ঘটল বিরাট পট পরিবর্তন। বলরাম, যিনি কাম্যক বনে পাণ্ডবদের হিতৈষী ছিলেন তিনি বর্তমানে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পোষণ করে বললেন ঃ "দুর্যোধনের কোন দোষ নেই। যুধিষ্ঠির নিজের হঠকারিতার জন্য রাজ্য হারিয়েছেন। অতএব দুর্যোধনকে সন্ধি ও সামনীতির দ্বারা আপ্যায়িত করা দরকার।" প্রকাশ্য সভায় আত্মীয়স্বজনদের সামনেই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করে দুর্যোধন ও শকুনির প্রশংসা করলেন দেখে সবাই বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন ঃ "শকুনির কি দোষ?" আসলে দুর্যোধন তলে তলে বলরামকে নিজের দলে টেনেছেন। প্রথমতঃ, দুর্যোধনের কন্যা লক্ষণার প্রতি আকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব দুর্যোধনের হাতে বন্দী হন। বলরামের পুত্রতুল্য ও শিষ্য শাম্বকে মুক্ত করতে বলরাম দুর্যোধনকে ভীতি প্রদর্শন করেন। দুর্যোধন বিবাহ প্রস্তাব মেনে বলরামের প্রিয় হয়ে ওঠেন। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৬২ অধ্যায়)। দুর্যোধন নিজেও বলরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গদাযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। শাম্বের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডবপক্ষ থেকে নিজের দিকে আনার জন্য দুর্যোধন চেষ্টা করেন। পরে দেখি, যুদ্ধের প্রাক্কালে বলরাম এসেছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ছোটভাই গদ, শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন এবং অক্রুর ও উদ্ধব। বলরাম কুরুবংশের ধ্বংস চোখে দেখতে পারবেন না বলে তীর্থভ্রমণে যাবেন। বস্তুতঃ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবপ্রীতিকে ভাল চোখে দেখেননি। শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাণ্ডবরা জয়ী হবেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় তাই তীর্থভ্রমণ। আশ্চর্য কথা, মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলতে দুর্যোধনের তুলনা নেই। বনপর্বে পাণ্ডবদের দুঃখে বলরাম কৌরবদের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "মহাত্মা যুধিষ্ঠির জটা ও কৌপিন ধারণ করে বনবাসী হয়ে কষ্টভোগ করছেন আর দুরাত্মা দুর্যোধন পৃথিবী শাসন করছে—তার পতন হচ্ছে না? এদেখে অল্পবুদ্ধি লোক মনে করবে, ধর্ম অপেক্ষা অধর্ম অনুষ্ঠানই ভাল।" (বনপর্ব, ১১৯।৫-৬)। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, শ্রীকৃষ্ণের দুই পুত্র শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন, যাদবদের প্রধান অমাত্য অক্রুর, উদ্ধব, গদ—এঁরাও বলরামের সঙ্গে চলে গেলেন। চতুর দুর্যোধনও অনেক চেষ্টা করেছে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ দলে টানতে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ "কুন্তীনন্দন, দুর্যোধন আমার মনে বিভেদ সৃষ্টি করতে বারবার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার সেই অপচেষ্টা সফল হয়নি।" (উদ্যোগপর্ব, ৭৯ অধ্যায়)

বিরাটনগরে বলরামের দুর্যোধন-প্রীতি বিশেষভাবে প্রকাশিত হলো। উপস্থিত সকলেই শুনেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বক্তব্য। বিস্ময়ে স্তম্ভিত সবাই বলরামের এহেন মন্তব্যে। সাত্যকি উত্তেজিত হয়ে বলরামকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন ঃ "একই বংশে অনেক সময় দুইরকম সন্তান জন্মে, কেউ মহাবলী, কেউ নপুংসক ("একস্মিন্নেব জায়েতে কুলে ক্লীব-মহাবলৌ")। আমি ভাবতেও পারি না, এমন মানুষ কে আছেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সামান্যতম দোষও দেখতে পান এবং তা জনসমক্ষে বলতে পারেন। দুর্যোধন যদি পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে না দেয় তাহলে যুদ্ধে মরবে। শত্রুকে বধ করলে অধর্ম হয় না।" সাত্যকির বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্রুপদ বললেন, যুদ্ধের জন্য অন্য রাজাদের কাছে দূত প্রেরিত হোক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ধীর, স্থির। এই উত্তপ্ত আবহাওয়াতে দুই পক্ষকে মিষ্টবাক্য বলে শান্তির জন্য হস্তিনাপুরে দ্রুপদকে দূতরূপে পাঠাতে অনুরোধ করে শ্রীকৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় চলে গেলেন। হস্তিনাপুরে দ্রুপদের দৌত্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। কুরু ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। দুর্যোধন অবশ্য অনেক আগেই সৈন্য ও অর্থাদি বেশ ভালভাবে সংগ্রহ করেছেন। একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য তাঁর পক্ষে। কৌরব পক্ষে যোগ দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের শত্রুরা। একই কালে দুর্যোধন ও অর্জুন গেছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকায়। উভয়ের প্রত্যেকেই চান শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত দেখে দুর্যোধন তাঁর শিয়রের কাছে উৎকৃষ্ট আসনে বসে আছেন। একটু পরে অর্জুন এসে জোড়হাতে তাঁর পায়ের দিকে বসে অপেক্ষা করছেন। নিদ্রাভঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই আপ্যায়ন করে তাঁদের উদ্দেশ্য জানতে চান। তিনি বললেন ঃ "আমি নিরস্ত্র হয়ে এক পক্ষে যাব, আর আমার এক অক্ষৌহিনী নারায়ণী সৈন্য যারা বিক্রমে প্রত্যেকে আমার সমতুল, তারা অপর পক্ষে যুদ্ধ করবে।" অর্জুনকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করায় অর্জুন শস্ত্রহীন, অযুধ্যমান শ্রীকৃষ্ণকেই স্বপক্ষে বরণ করেন। আর দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন সৈন্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে। দুর্যোধন এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে বলেন ঃ "আপনি সমস্ত সৎ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সকলেরই সম্মানীয়।" (উদ্যোগপর্ব, ৭।১২-১৪)। শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে হস্তিনাপুরে আসার পূর্বেও

ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধন বলেন : "কৃষ্ণ কেবল এই মনুষ্যলোকেরই নয়, তিন লোকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে পরম পূজনীয়—একথা আমার জানা আছে।" দুর্যোধন মুখে শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যের বর্ণনা দিলেও কাজের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কোন প্রকাশ আমরা দেখতে পাই না। সৈন্য পেয়ে দুর্যোধন গেলেন বলরামের কাছে। তারপর কৃতবর্মার কাছে। তিনি এক অক্ষৌহিনী সৈন্য দিলেন।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথির কর্ম কোনদিন গৌরবজনক নয়, এমনকি হীন বৃত্তি বলে গণ্য। অথচ শ্রীকৃষ্ণ সেই কর্মই স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে! যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যিনি নিজের গৌরব বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণদের পদধৌত করার কাজ স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন তিনি প্রিয় সখা অর্জুনের রথে সারথি হবেন না কেন? বস্তুতঃ, তাঁর দিব্যজীবনে কোন মানুষী দুর্বলতার স্থান ছিল না।

সঞ্জয় দূত হিসাবে এসেছেন পাণ্ডবশিবিরে। মাত্র পাঁচটি গ্রামের বিনিময়ে যুধিষ্ঠির শান্তি কামনা করেছেন। সঞ্জয় ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের রক্ষা করতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন : "আমি তোমাদের উভয় পক্ষের কল্যাণার্থে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে যাব। কৃতকার্য হলে আমার মহৎ পুণ্য হবে এবং পৃথিবী মহামৃত্যুর নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে।" এই যাত্রাতে যুধিষ্ঠিরের আশঙ্কা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধন অপমান করবেন। কিন্তু একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাবেন বলে স্থির করলেন। যাত্রার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত। যুধিষ্ঠিরাদি চার পাণ্ডব শান্তির পক্ষে কথা বলেছেন, শুধু সহদেব ও দ্রৌপদী চেয়েছেন যুদ্ধ। যুদ্ধ ছাড়া মর্মান্তিক লাঞ্ছনার প্রতিশোধ হবে না। এবিষয়ে সাত্যকিও একমত হন সহদেব ও দ্রৌপদীর সঙ্গে।

সঞ্জয়ের মুখে কৌরবরা শুনেছেন, মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দিলেই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে। দুর্যোধন এই প্রস্তাবকে পাণ্ডবদের দুর্বলতা ও ভয়ের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। [উদ্যোগপর্ব, ৫৫।৩০]। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে জানতেন। তিনি বললেন : "দুর্যোধন পাপমতি, ক্রূর, হৃদয়হীন।" (উদ্যোগপর্ব, ১২৪।৬)। সংবাদ এসেছে—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করতে চান। তাহলে পাণ্ডবদের বলবীর্য চিরতরে নষ্ট হবে। (উদ্যোগপর্ব, ৮৮।১৪)। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এই অশুভ পরিকল্পনা অনুমোদন করেননি। ভীষ্ম বলেছেন : "ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করলে তোমাদের সব নষ্ট হবে। আমি এখানে বসে এই পাপকথা শুনতে চাই না।" ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। কৃষ্ণ জানতেন দুর্যোধনের হীন ষড়যন্ত্রের কথা। প্রতিহিংসার সুযোগ নেবার জন্য ভারতের অসংখ্য রাজা যোগ দিয়েছেন কৌরব শিবিরে। পূর্বে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়েছেন তাঁরা চান প্রতিশোধ। পাণ্ডবদের একমাত্র সহায় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে চান এই যুদ্ধে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এসেছেন সাত্যকি। যাদববীর কৃতবর্মা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেন। তবু তিনি যাদববংশ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ এলেন কৌরব রাজসভায়। দুর্যোধন ছাড়া অন্যান্যরা অর্থাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুঃশাসনাদি শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানালেন। সৌজন্য বিনিময়ের পর শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে এবং ভীষ্ম ও দ্রোণের আতিথ্য ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে পরিজন-সহ এলেন ধর্মাত্মা বিদুরের গৃহে। (উদ্যোগপর্ব, ৫৯-৮৯ অধ্যায়)। বিদুরভবনে পিসিমা কুন্তীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুত্রদের ও দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্যের জন্য কাতরভাবে রোদন করতে করতে ওজস্বিনী ভাষায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁর পুত্রগণ ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার করেন।

আহারের পর বিদুর ও শ্রীকৃষ্ণ অধিক রাত্রি অবধি পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিদুর তাঁকে বললেন : "বাসুদেব, আপনার আগমন ঠিক হয়নি, কারণ এটা শত্রুপুরী। এখানে আপনার বিপদের আশঙ্কা করি। অসংখ্য রাজা দুর্যোধনের পক্ষে এসেছেন। তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য। তাঁদের রাগ আপনার ওপর। আপনাকে দুর্যোধন অপমান করতে পারে। আপনার দৌত্য ব্যর্থ হবে।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন : "আপনার কথা ঠিক। আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি, যদি এদের আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যায়। লোকে জানবে, আমি নিজেও বুঝব—আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।" সত্যিই, সর্বান্তঃকরণে আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের হাত থেকে ভারতবর্ষকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

[পরবর্তী অংশ আগামী কার্তিক সংখ্যায়]

বিশেষ রচনা

শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

"যাত্রীদের দলে ছিলেন দয়িতাপতি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেউল-পুরোহিত, রাজ-পুরোহিত, বিশ্বকর্মা (সূত্রধর), মন্দির-পুলিস ও সরকারি পুলিস-দের নিয়ে প্রায় ১৫০ জনের বিশাল এক বাহিনী। এই দলটি প্রথমে যায় জগন্নাথবল্লভ-মঠে। সেখানে ৩০ মার্চ সারাদিন বিশ্রাম করে ৩১ মার্চ কোনারকের রাস্তায় হাঁটাপথে পুরী জেলার কাকটপুরে যাত্রা করে। জগন্নাথ-মন্দির থেকে এর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। মাঝপথে তাদের দেউলীমঠে অবস্থান করার কথা। কিন্তু এবারে দেউলীমঠের অবস্থা খুব জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেখানে যাওয়ার আগে তারা রোহিণী আশ্রমে ওঠে। এটি কাকটপুরের মা মঙ্গলার মন্দির থেকে ২ কিলোমিটার দূরে। এরপরে তাঁরা সবাই শোভাযাত্রা করে গত ১ এপ্রিল মা মঙ্গলার মন্দিরে গিয়েছিলেন যথাবিধি ঘণ্টা-ছত্রী সব নিয়ে। মায়ের মন্দিরে পৌঁছে মন্দিরের সেবকদের আদেশ দেওয়া হয় ঠাকুরানীর কাছে 'মাজনা' (মার্জনা) করতে যে, পুরী থেকে ভক্তেরা এসেছে দারু-অন্বেষণে; মা যেন কৃপা করে পথনির্দেশ করেন। এই সময় দেবীকে সমাগত ভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে চুয়া-চন্দন-অগুরু-ধূপ-দীপ-নববস্ত্র-পঞ্চামৃত-পঞ্চগব্য ও ভোগসামগ্রী নিবেদন করা হয়। ১০৮ ঘড়া জলে মাকে স্নান করানো হয়। তারপরে পুরশ্চরণ-হোম হয়। নিয়মমত দয়িতাপতিরা এই সময় কেউ ক্ষৌরকর্ম করেন না। সকলেই হবিষ্যান্ন আহার করে কায়িক, বাচিক ও মানসিকভাবে শুদ্ধ থাকার চেষ্টা করেন। মা মঙ্গলা কৃপা করে তাঁদের দারুর খোঁজ জানিয়ে দেন। ঠাকুরানীর আজ্ঞামালার ফুল যেদিকে পড়ে সেই দিকে দারু পাওয়া যায়—এই বিশ্বাস। এবছর মা মঙ্গলার মন্দিরের কাছে লতাপাতার সাহায্যে একটি 'শবরপল্লী' নির্মাণ করে সেখানে দয়িতাপতিরা হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন।"

রাজা এই সব কথা বলার পর ব্রহ্মচারী শোনাল তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা: "এবছর যাঁরা দারুর খোঁজে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুখ্য দয়িতাপতি চারজন—সুদর্শনের খোঁজে গেছেন বাড়গ্রাহী মদনমোহন মহাপাত্র, বলভদ্রের খোঁজে বাড়গ্রাহী হলধর দাস মহাপাত্র, সুভদ্রার খোঁজে বাড়গ্রাহী দুর্গাপ্রসাদ দাস মহাপাত্র আর জগন্নাথের খোঁজে বাড়গ্রাহী জগন্নাথ সাঁই মহাপাত্র।" এই জগন্নাথ সাঁই মহাপাত্রের কাছে ব্রহ্মচারী নিজে শুনেছে—ঐ চারজন যখন মা মঙ্গলার মন্দিরের কিছু দূরে শবরপল্লীতে রাত্রে হত্যা দিয়ে পড়েছিলেন, তখন গভীর রাত্রে কেউ যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তুলে দিয়ে বলছেন, 'দধিমাছগড়িয়া গ্রামে দারু পাওয়া যাবে।' এই বলে তিনি দারুকে দেখিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী বলে: "এই দয়িতাপতি জগুনীবাবু খুব দুর্ধর্ষ মানুষ—চেহারাও বিশাল। অথচ তিনি তাঁর স্বপ্নদর্শনের কথা বলতে বলতে একেবারে ভাবে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেললেন। তাঁর মতো লোকের এই অবস্থা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।" যাই হোক, চারজনই প্রত্যাদেশ পেয়ে মা মঙ্গলার মন্দির থেকে নিজের নিজের স্বপ্নদৃষ্ট পথে বেরিয়ে পড়েন।



যে চারজন দয়িতাপতি চারটি দারু খুঁজতে যাওয়ার স্বপ্ন পেয়েছিলেন। বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় জন জগন্নাথ সাঁই।

এই দারু কেমন হবে তাও শাস্ত্রনির্দিষ্ট। দারুকে দশ রকমের লক্ষণসংযুক্ত হতে হবে। প্রথম—গাছটি হবে নিমগাছ। তার প্রধান চারটি শাখা থাকবে, আর সেগুলি



জগন্নাথের দারুর গুঁড়ির কাছে উইটিপি

হবে, দারু মিলেছে। আরও একটি অতি বিশেষ ব্যাপার আছে এদের রং নিয়ে। জগন্নাথের দারু হবে সামান্য কালো রঙের। বলরামের দারু সাদাটে আর সুভদ্রার দারু হবে লালচে। গাছগুলির স্বাদ হবে সামান্য মধুর। এই সমস্ত দারু-লক্ষণগুলি 'সুতসংহিতা' থেকে 'মাদলা-পাঞ্জী'তে তোলা হয়েছে।

নিয়ম আছে, দারু না পাওয়া গেলে দয়িতাপতিরা আর ঘরে ফিরবে না, নীলচক্র দর্শনও করতে পাবে না এবং প্রাচী নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাঁদের প্রাণত্যাগ করতে হবে। এবারে সব কটি দারুই দৈবকৃপায় যথানির্দেশমত পাওয়া গিয়েছে। খুরদার কাছে জগন্নাথ-মন্দির থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে 'দধিমাছ-আখিয়া' বা 'দধিমাছগড়িয়া' গ্রামে প্রসন্ন পট্টনায়েকের বাগানে পূর্বোক্ত সব সুলক্ষণযুক্ত জগন্নাথের গাছটি জগন্নাথ সাঁই খুঁজে পান। জগন্নাথের দারুতে সাপও দেখা গেল। ৬ এপ্রিল তিনি স্বপ্নে এই গাছই দেখেছিলেন। জগৎসিংহপুরের কাছে সুভদ্রা ও সুদর্শনের এবং কিছু দূরে বলরামের সর্বচিহ্নযুক্ত দারু পাওয়া গেছে।

রাজা বলল: "এখন সমস্ত দারু-গুলির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে প্রতিটি দারুর তলায় বেদি করে তার

থাকবে মাটি থেকে বার ফুট ওপরে। গাছটি হবে শ্মশান ও নদীতীরের কাছে। পাশে বরুণগাছ ও কোন মন্দির বা আশ্রম থাকবে। গাছে কোন পাখির বাসা থাকবে না, কোন লতা বা পরগাছা থাকবে না। গাছের গুঁড়ির কাছে উইঢিপি এবং গাছের কোটরে সাপ থাকবে। গাছটিতে কোন ক্ষতচিহ্ন থাকবে না। আর জগন্নাথের দারুবৃক্ষে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের ছাপ থাকবে। সুদর্শনের দারুতে চক্রচিহ্ন, বলভদ্রের দারুতে শঙ্খচিহ্ন এবং সুভদ্রার দারুতে পদ্ম ও চক্রচিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলি সব মিলে গেলে তখনই গাছটি নির্দিষ্ট হবে এবং মা মঙ্গলা ও জগন্নাথ-মন্দির থেকে নিয়ে আসা আজ্ঞামালা এই সব দারুতে নিবেদন করা হবে। চারিদিকে জানিয়ে দেওয়া

চারপাশে সুগন্ধি-গঙ্গাজল ছড়িয়ে বেদিতে 'বনযাগ' চলছে। ১ বৈশাখ থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এর কিছুদূরে লতাপাতা দিয়ে ছোট ঘর করে শবরপল্লী করা হয়েছে। সেখানে স্বপ্নপ্রাপ্ত দয়িতাপতিরা থাকছেন। সমস্ত গ্রামে মেলা বসে গিয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে লোকেরা আসছে এই দারু ও যাগযজ্ঞ দর্শন করতে।

"এই বনযাগে চারজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আচার্য হন—ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, হোতা ও উদ্গাতা। এই সময় বিদ্যাপতি, দয়িতাপতি ও বিশ্বকর্মা (সূত্রধর) তিনদিন এখানে ধ্যান-পূজাদি করেন। এই সব অনুষ্ঠান-শেষে বিদ্যাপতি রাজার প্রদত্ত স্বর্ণকুঠার দিয়ে ও দয়িতাপতি রূপার কুঠার দিয়ে গাছের গায়ে আঘাত করে গাছ কাটার আনুষ্ঠানিক



দারুর গায়ে গদাচিহ্ন

হস্তিদ্বার দিয়ে মন্দির-চত্বরের মধ্যে আনা হবে। গাছ কাটার আগে বনযাগের সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়—'পাতালনৃসিংহমন্ত্রে' যজ্ঞাহুতি হয়। চার বেদের নিয়মেই হোম হয়। যজ্ঞে বিশ্বাবসু, দয়িতাপতি ও বিদ্যাপতির বংশধর এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বরণ করা হয় যজমান হিসাবে। এঁরা তিনদিন ধরে হোম চলাকালীন 'পাতালনৃসিংহমন্ত্র' সর্বক্ষণ জপ করেন।

"এবারে এসবই যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে। দারুগুলি উত্তরদ্বার দিয়ে এনে রাখা হবে মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমের পুষ্পোদ্যানের পিছনে 'কৈলিবৈকুণ্ঠে'। নবকলেবরের সমস্ত ক্রিয়াবিধি এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিবারই এইরকম হয়। পুরনো বিগ্রহদের বিসর্জনও এখানেই হয়। এটি জগন্নাথের শ্মশান-তন্ত্রপীঠ। এটি কৈবল্যধাম বা মুক্তিক্ষেত্র বৈকুণ্ঠপীঠ বলে সবাই এই স্থানটিকে অন্যসময়েও ভক্তিভরে দর্শন করতে আসে। এই কৈলিবৈকুণ্ঠে দারুঘর বলে একটি একতলা বেশ বড় বারান্দা দেওয়া ঘর আছে—সেইখানে স্নানের পর দারুগুলিকে রাখা হয়। তাঁদের নির্মাণ-কাজ শুরু হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

"এর পরের পর্ব শুরু হয় স্নানপূর্ণিমা (স্নানযাত্রা) থেকে। এবছর স্নানপূর্ণিমা ১ জুন (১৮ জ্যৈষ্ঠ)। অন্যবছর স্নানযাত্রার পরে অমাবস্যায় বিগ্রহদের 'নবযৌবন' বেশ হয়ে 'নবকলেবর' হয়। দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হয়। এবছর মলমাসের জন্য স্নানযাত্রার দেড় মাস পরে ১৭ জুলাই (১ শ্রাবণ) হবে নতুন বিগ্রহদের নিয়ে রথযাত্রা।

"স্নানযাত্রার দিন সমস্ত বিগ্রহদের যখন স্নানবেদিতে এনে সোনাকুয়ার ১০৮ কলসী জলে স্নান করানো হয় তখন এই দারুগুলিকেও তার সঙ্গে স্নান করানো হবে। স্নানের পরে বিগ্রহগুলি মন্দিরে ফিরে গেলেও আর 'রত্নবেদি'তে উঠবেন না। তাঁরা গর্ভমন্দিরের সামনের দরজার বাইরে 'অনবসর-বেদি'তে অবস্থান করবেন।

সূচনা করে দিলে 'বিশ্বকর্মা' লোহার কুঠার দিয়ে গাছ কাটতে আরম্ভ করে দেন। বড় বড় গুঁড়ির অংশগুলি একত্র করে কাঠবহনের উদ্দেশ্যে তৈরি নতুন ঠেলা-গাড়িতে তোলা হয়। এই গাড়িও কাঠের তৈরি এবং তাতে কোন লোহার পেরেক থাকে না, সবই কাঠের কাজ হতে হবে। তারপরে ঐখানেই গর্ত করে অবশিষ্ট ডালপালা সব পুঁতে ফেলা হয়। এরপরে দারুগুলিকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে, মালা-চন্দনে সাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে মানুষে টেনে পুরীতে নিয়ে আসে।

"ইতিমধ্যে সব দারুগুলিকে নিয়ে মন্দিরের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। মন্দিরের কাছে এনে দারুগুলিকে উত্তরের

দর্শনাদি যথারীতি বন্ধ থাকবে। তাঁদের 'জ্বর' হবে, পাঁচন ভোগ ইত্যাদি যেমন প্রতিবার এই সময় হয় তাই হবে। কিন্তু এবারে এই দেড়মাস সাধারণের দর্শন বন্ধ।

"যাই হোক, দারুঘরে বিশ্বকর্মা (সূত্রধর) নির্মাণকাজ আরম্ভ করবার আগে ১০৮ জন ব্রাহ্মণ সেখানে যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের তৃতীয় দিনে শোলমাছ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। এটা বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে অনার্য বা তান্ত্রিক ক্রিয়ার সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। এই যজ্ঞ চলবে দ্বাদশী পর্যন্ত। এদিন ব্রাহ্মণদের গোদান করা হয়। ত্রয়োদশীর দিন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হবে। এদিনে কৈলিবৈকুণ্ঠের বাগানে প্রাচীন বিগ্রহদের 'অবশেষ' সমাধি দেওয়ার জন্য গর্ত খোঁড়া হবে। এটি ভগবান জগন্নাথদেবের পুরনো দেহের দাহস্থান—সমাধিক্ষেত্র 'শ্মশান'। এই সমাধির গর্তটি হবে ৯ হাত (প্রায় ৪½ মিটার) গভীর ও ৬ হাত ব্যাসের। এই গর্তটি লাল সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

"ওদিকে নতুন বিগ্রহ তৈরির কাজও আরম্ভ হয়ে যাবে। এই কাজ করবেন পুরুষানুক্রমে করে আসছেন এমন একদল সূত্রধর। আগেই বলা হয়েছে, এঁদের উপাধি 'বিশ্বকর্মা'। এঁরা দারু কাটা থেকে আরম্ভ করে এখানে বিগ্রহ তৈরি পর্যন্ত কাজ করেন। এই সময় এঁরা খুব শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে থাকেন। ধ্যান-পূজা করে এঁরা নিত্য মূর্তিতৈরির কাজ করেন। এর জন্য এঁদের রাজকীয় দপ্তর থেকে কিছু নিষ্কর জমিও দান করা আছে। বিগ্রহ তৈরির পরে আসেন চিত্রকরগণ। এঁরা শুধু কাঠের ওপর রং দেন না, কাঠের শরীরের ওপর সাতপ্রস্থ সিল্কের কাপড়ের আস্তরণ এবং তার সঙ্গে শ্বেতচন্দন গোলা, কস্তুরী, ধুনা প্রভৃতির প্রলেপ দিয়ে দারুকে ঢেকে দেন। এর ওপর বিভিন্ন রং দিয়ে চোখমুখ আঁকা হয়। চিত্রকররাও হবিষ্যান্নাদি করে, পবিত্রভাবে থেকে এই সৃষ্টিক্রিয়াদি করেন। কাঠ খোদাই ও বস্ত্রের আবরণ দেওয়ার সময় বিগ্রহদের নাভির কাছে ১২ যব পরিমিত স্থান গর্ত করে রাখা হয়। প্রায় ১ বিঘতের মতো লম্বা-চওড়া ও গভীর এই 'রন্ধ্র'। ঘট পরিবর্তনের সময় এখানেই 'ব্রহ্মবস্তু' পুনঃস্থাপন করা হয়। এই মূর্তি তৈরি করার সময় বাইরে থেকে



দারুর গায়ে শঙ্খচিহ্ন

ঘণ্টাধ্বনি ও নানান বাজনা বাজানো হয়, যাতে মূর্তি তৈরির কোন আওয়াজ বাইরে না আসে। কোন লোককে সেই স্থানে যেতেও দেওয়া হয় না।

"কৃষ্ণা চতুর্দশীর মধ্যে সব কাজ সমাপ্ত করা হয়। সেইদিন গভীর রাত্রে নতুন বিগ্রহদের উত্তরদ্বার দিয়ে মূল মন্দিরের অনবসর পিঁড়ির কাছে আনা হয় আগের কাঠের ঠেলাগাড়িতে করে, যেখানে আগে থেকেই পুরনো বিগ্রহদের রাখা থাকে ভক্তদের দৃষ্টির অগোচরে।

"কৃষ্ণা চতুর্দশীর মধ্যরাত্রে সকলের অগোচরে এই অনবসর পিঁড়ির কাছে এনে নতুন বিগ্রহদের তিনবার স্নানের মতো করে গা-হাত-মুখ মন্ত্রঃপূত জল দিয়ে মুছিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে মন্দিরের পুরোহিতগণের মধ্যে

নমস্য ও অভিজ্ঞ পতিমহাপাত্রদের মধ্যে একজনকে মনোনীত করা হয়। তিনি মন্দিরের অনবসর পিঁড়ির কাছে গিয়ে প্রাথমিক পূজার পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, দেহশুদ্ধি প্রভৃতির পরে জীবন্যাস-প্রাণায়ামাদি করে অত্যন্ত পবিত্রচিত্তে ও ভক্তিভাবের সঙ্গে নিজের চোখ ও দুই হাতের তালু পট্টবস্ত্রে আবৃত করে স্পর্শানুভূতির সাহায্যে প্রাচীন মূর্তিদের নাভিদেশ থেকে 'ব্রহ্মবস্তু' বার করে এনে নতুন বিগ্রহদের নাভির দ্বাদশ-যবপরিমিত রন্ধ্রে স্থাপন করেন। তারপর তিনি সেই পট্টবস্ত্রের আবরণ টেনে দেন যাতে রন্ধ্রমুখ বন্ধ হয়ে যায়।

"নতুন বিগ্রহদের 'ঘট' পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পুরনো দেববিগ্রহদের দেহ 'শবদেহে' পরিণত হয়। অতঃপর এই পুরনো বিগ্রহদের ঐ কাঠের গাড়িতে করেই মন্দিরের পশ্চিমদ্বার দিয়ে বার করে নিয়ে এসে কৈলিবৈকুণ্ঠের শ্মশানে রাখা হয়। সেখানে কিছু শাস্ত্রীয় ক্রিয়ার পর এই বিগ্রহদের আগে থেকে খুঁড়ে রাখা গর্তে সমাধি দেওয়া হয়। মতান্তরে, দেহগুলি ঐখানে দাহ করে দেহাবশেষ ঐ গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহৃত গদি ইত্যাদি এবং পূর্বের রথের পার্শ্বদেবতা ও অপসরাদের কাঠের মূর্তিগুলিও সমাহিত



দারুর নিচে বনযাগ হচ্ছে। দয়িতাপতিরা জপ করছেন। ডানদিকে উপবিষ্ট রাজপুরোহিত।

"এই 'ব্রহ্মবস্তু'টি প্রকৃতপক্ষে ঠিক কি তা কেউ বলতে পারেন না। পতিমহাপাত্র বহু অর্থের প্রলোভনেও তাঁর অনুভব কেমন তা বলতে অস্বীকার করেন। কারো কারো মতে এটি তথাগত বুদ্ধের দাঁত অথবা শালগ্রাম শিলা বা ধাতুনির্মিত চন্দন ও কর্পূর-সুবাসিত কোন কোমল পদার্থ। এসম্পর্কে নানা মত প্রচলিত। এই ব্রহ্মবস্তু পরিবর্তনের সময় উড়িষ্যার মানুষ দৈব-দুর্বিপাকের ভয়ে খুব সন্ত্রস্ত থাকে। সেজন্য ঐ গভীর রাত্রে মন্দিরের বাইরে সকলেই ভগবানের নামকীর্তন করে।

করা হয়। দাহাদি শ্মশানকার্য করেন বিশ্বাবসু-বংশীয় দয়িতাপতিরা। তাঁরা নিজেদের জগন্নাথ বা নীলমাধবের বংশের লোক বলেন। সেজন্য এই সমাধি বা দাহক্রিয়ার সময় দয়িতাপতিরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন। আত্মীয় মৃত্যুর শোক হিসাবে তাঁরা দশদিন অশৌচ পালন করে ক্ষৌরকর্ম করেন না। তেতো-ভাত খান, গলায় কাছা ধারণ করে থাকেন। এগার দিনে মন্দিরের মুক্তিমণ্ডপের কাছে গায়ে তেল মেখে মার্কণ্ডেয় সরোবরে স্নান করে তাঁরা শুদ্ধ হন। অশৌচের কয়দিন তাঁরা অরুণস্তম্ভের কাছে হলুদ জলে পা ধুয়ে তার পরে মন্দিরে প্রবেশ করেন। ১২



জগন্নাথের দারুর গায়ে বৃত্ত অঙ্কিত চারটি অংশে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

দিন পরে শুক্লা দশমীর দিন নিজেদের খরচায় মন্দিরের অন্য সেবায়েতদের 'মৃত্যুভোজ' মহাপ্রসাদ ভোগ দেন। তাঁরা জগন্নাথের উত্তরাধিকারী বলে পূর্বতন বিগ্রহদের সম্পত্তির ভাগ দাবি করেন। এইজন্য মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের কয়েক হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া পুরনো বিগ্রহদের ব্যবহৃত প্রসাদী কাপড়-উত্তরীয়-চন্দন ইত্যাদি স্মারক হিসাবে তাঁরা নিয়ে যান। এগুলি তাঁরা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করেন, যার বিনিময়ে তাঁদের ভাল অর্থোপার্জনও হয়।"

রাজা ও ব্রহ্মচারীর মুখে এই নবকলেবরের দীর্ঘ কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা এর মধ্যে কৈলিবৈকুণ্ঠ ঘুরে দারু-ঘরের পাশ দিয়ে উত্তরদ্বার দিয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের নাটমন্দির ঘুরে একেবারে গর্ভমন্দিরের মধ্যে এসে গিয়েছি। মন্দিরে রাজার খুবই প্রতাপ। সে আমাকে ভিড় ঠেলে একেবারে রত্নবেদির কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। আর কয়েকদিন পরেই স্নানযাত্রার পর এই বিগ্রহ অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাঁদের লীলা সাঙ্গ করে নতুনদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নবকলেবরে আবার চলবে তাঁদের নতুন যাত্রা। কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রির অবসানে একদিকে পুরনো বিগ্রহ সমাহিত হবেন, অন্যদিকে অমাবস্যার দিনে নতুন চতুর্ধাবিগ্রহ অনবসর পিঁড়ি আলো করে দুহাত বাড়িয়ে ভক্ত সন্তানদের আলিঙ্গন দেওয়ার জন্য আকুল আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকবেন। দেশ-দেশান্তরের ব্যাকুল ভক্তের দল এই নবকলেবরের নতুন বিগ্রহদের দর্শনলাভের জন্য ছুটে এসে আত্ম-সমর্পণ করবেন তাঁদের চরণে।

আমরাও রত্নবেদিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণভরে প্রণাম জানালাম—

"মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।"

হে জগন্নাথপ্রভু, ঐ অপরূপ রূপের আড়ালে তোমার স্বরূপটি আমার কাছে প্রকাশ করে ধন্য কর। কৃতকৃতার্থ কর আমার জীবন। [সমাপ্ত]□

নিবন্ধ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটী

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

কৃষ্ণমোহনের ওজস্বিতা ও পুরুষকার প্রসঙ্গে বোধহয় মন্তব্য করা যায়—আধুনিক যুগেও 'ভীষ্ম' হয়, যিনি ধর্মাদর্শের বেদিমূলে আত্মীয়-পরিজন বিসর্জনে এতটুকু বিহ্বল হন না। পরোপকারী, সেবাব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, পণ্ডিতচূড়ামণি কিন্তু সংস্কার-বিষয়ে কঠোরভাবে সনাতনপন্থী। প্রচলিত অনুশাসন ভাঙতে এতটুকুও আগ্রহী নন। আমরা পাঠকের কাছে কৃষ্ণমোহনের দৈনন্দিন কর্মসূচীর কিছু উল্লেখ করছি যাতে তাঁর জীবনধারার একটি ছবি আমরা পাব ঃ

"কৃষ্ণমোহন রাত্রি একপ্রহর থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং শয্যাত্যাগের পর গৃহের বাহিরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া উর্ধ্বে আকাশপানে চাহিয়া ঈশ্বরের নামগান করিতেন। নামগান করিতে করিতে এতই বিভোর হইতেন যে, এক-একদিন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া ফেলিতেন। জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া যেদিন তিনি আপনমনে বিভোর হইয়া ভগবানের গুণগান করিতে বসিতেন, পূর্বদিক ফর্সা হইয়া যাইত, তত্রাচ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। এইরূপে কৃষ্ণমোহন ভগবানের নামগান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গৃহদেবতা রামচন্দ্র, শালগ্রামশিলার জন্য পুষ্পচয়নে বহির্গত হইতেন।... স্নানান্তে তিনি দেবগৃহে প্রবেশ করিতেন। প্রায় বেলা একপ্রহর পর্যন্ত তিনি পূজাগৃহে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রথমতঃ তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পুষ্প, দূর্বা ও বিল্বপত্রাদি দ্বারা দেবপূজা করিতেন। দেবপূজা সমাধা হইলে বহুক্ষণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া থাকিতেন। এই সময়কাল তাঁহার প্রাণায়ামে অতীত হইত। প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ভগবৎপ্রেমে আত্মহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীত করিতেন। সঙ্গীত সাঙ্গ হইলে কোনদিন শ্রীমদ্ভাগবত বা গীতা, কোনদিন বা বেদ লইয়া একাগ্র চিত্তে অধ্যয়ন করিতেন।... সন্ধ্যায়... হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া দেবালয়ে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতে রাত্রি প্রায় একপ্রহর অতীত হইত!..."৩৬

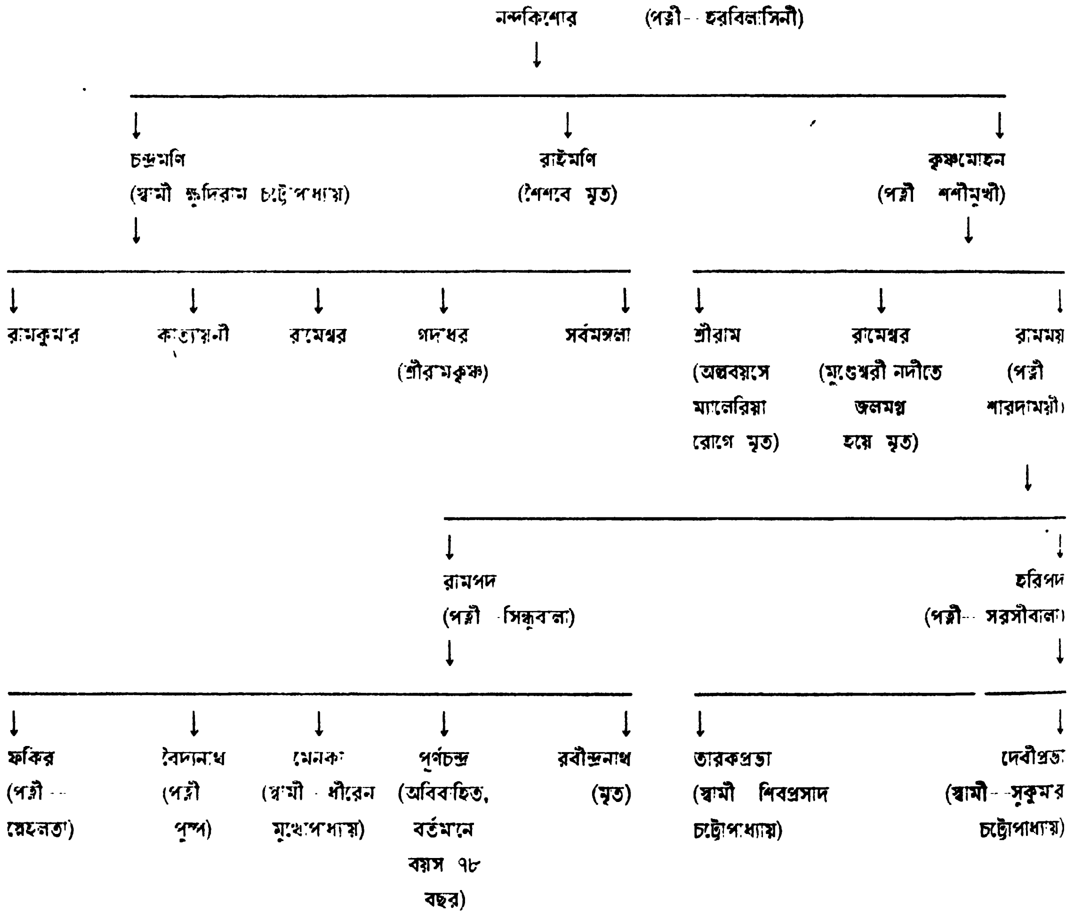
কৃষ্ণমোহনের বংশধরগণ অধুনা সারাটীতে থাকেন না। চল্লিশের দশকে তাঁরা দেওঘরের নিকটস্থ কুণ্ডায় সপরিবারে চলে গিয়েছেন। তাঁদের স্থানান্তরণের ইতিবৃত্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'জীবনসংগ্রাম' গ্রন্থে বিবৃত করেছেন ঃ "কৃষ্ণমোহনের বাসভবন এখন ভীষণ ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে শৃগাল-কুক্কুরের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণমোহনের বংশধরগণ জীবিত আছেন, কিন্তু ভীষণ ম্যালেরিয়ার আশঙ্কায় ও দামোদরের বন্যার অত্যাচারে কেহই পৈত্রিক বাসভূমিতে বাস করিতে সাহসী হন না। যে-দুর্ভিক্ষসময়ে কৃষ্ণমোহনের বংশধর [পুত্র] স্বর্গীয় রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় অন্নদানে অসংখ্য নরনারীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া অশেষ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জানি না তাঁহাদের বাসভবন আজ শৃগাল-কুক্কুরের বাসভবনে পরিণত হইল কেন? যদি কখনো ম্যালেরিয়া রাক্ষসী এই দেশ ও সারাবাটী গ্রাম পরিত্যাগ করে, যদি কখনো দামোদরের ভীষণ বন্যাস্রোত ভগবানের ইচ্ছায় অপর নদনদীর অঙ্গে মিশাইয়া দেয়, যদি কখনো কৃষ্ণমোহনের বংশে ধার্মিক ও পিতৃপিতামহের কীর্তিকলাপ ও পৈত্রিক ভদ্রাসনের সম্মানরক্ষার উপযুক্ত বংশধরের উৎপত্তি হয়, তবে হয়তো সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষদের যে-ভদ্রাসনে পদরেণুর ক্ষুদ্রকণা পড়িয়া আছে, সেই স্থল আবার একদিন উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইবে।"৩৭

কৃষ্ণমোহনের প্রপৌত্র পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে যে-বংশলতিকা পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণমোহনের সহোদরা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জননী। পিতা ছিলেন পণ্ডিত নন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা হরবিলাসিনী দেবী। চন্দ্রমণি ছিলেন নন্দকিশোরের প্রথম সন্তান। কৃষ্ণমোহন ছিলেন আয়ুর্বেদে সবিশেষ পারদর্শী।

৩৬ জীবনসংগ্রাম, পৃঃ ১২৯-১৩০ ৩৭ ঐ

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলকুলের বংশলতিকা[৩৮]

আদিপুরুষ দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়



৩৮ নিম্নলিখিত সূত্র থেকে সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশলতিকা তৈরি করা হয়েছে :

(ক) সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের জীবিত প্রবীণতম (বর্তমানে বয়স ৭৮ বছর) বংশধর পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃত তথ্য, (খ) সারাটীর 'বন্দ্যো' বংশের কুলপুরোহিত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বিবৃত তথ্য, (গ) কালীদাসী দেবী বিবৃত তথ্য (কালীদাসী দেবী বাঁকুড়ায় তাঁর দিদিমার কাছে প্রতিপালিতা ; তাঁর দিদিমা সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কন্যা) এবং (ঘ) কুণ্ডায় কুণ্ডেশ্বরী-মন্দির-গাত্রের প্রস্তরলিপি।

সারাটীর দেবদেউল

সারাটী-মায়াপুরের দেবদেউলের সংখ্যা অল্প নয়। সেই সমস্ত দেবদেউলের সঙ্গে মাতুলালয়ে গমনকারী বালক গদাধরের নিবিড় সান্নিধ্য ঘটত। সারাটী-মায়াপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে তারই বিস্তৃততর বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সারাটী-মায়াপুরের প্রধান দেবদেউলগুলি হলো পীরের দরগা, ঈদগা, শিবমন্দির, বিশালাক্ষীমন্দির, শীতলামন্দির, কালীমন্দির, ধর্মরাজের থান, মায়াচণ্ডীর মন্দির, রামশিলা (সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায়দের গৃহদেবতা) থাকলেও তাঁর ভগ্ন মূর্তি বহু প্রাচীন ইতিহাসকে ধারণ করে রয়েছে। মায়াপুর গ্রামের একপ্রান্তে ভগ্ন মন্দিরের কালোপাথরের ভগ্ন মূর্তিতে আজও দেবী বিদ্যমানা। কথিত আছে যে, মায়াচণ্ডীর নাম থেকেই এই গ্রামের নাম 'মায়াপুর' হয়েছে। মায়াপুরের শিবমন্দিরটিও প্রাচীন। এটি মায়াপুর ও সারাটী গ্রামদুটির সংযোগস্থলে বিলুপ্তপ্রায় দারকেশ্বর নদীর (শাখা) পূর্বতীরে অবস্থিত। শিবের নিত্যপূজা অব্যাহত থাকলেও শিবচতুর্দশীতে বিশেষ পূজা ও গাজন আজও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

সারাটীতে শীতলা, বিশালাক্ষী ও কালীপূজা সংশ্লিষ্ট



সারাটী-মায়াপুরের পীরের দরগা

ও জগদ্ধাত্রীর মন্দির। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হলো পীরের দরগা, মায়াচণ্ডী, কালী ও শিবের মন্দির। পীরের দরগা ও ঈদগা বাদশাহী আমলের। পীরের দরগা ছিল বালক গদাধরের ভাব-উদ্দীপনার অন্যতম ক্ষেত্র। দরগায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। আগেই বলা হয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে (১ম খণ্ড) তার উল্লেখ রয়েছে। পীরের দরগার নিকটেই ঈদগা যেখানে মুসলমানরা ঈদ-উৎসবে সমবেত হন, প্রার্থনা করেন। এই স্থানের প্রতি ছিল বালক গদাধরের বিশেষ প্রীতি। মায়াচণ্ডী সারাটী-মায়াপুরের প্রাচীনা দেবীবিগ্রহ। পূর্ণাঙ্গরূপে না মন্দিরগুলিতে সমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে কালীপূজা হয়ে থাকে বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে। ধর্মরাজের পূজাও হয় খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে। রামশিলা সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুলদেবতা। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের অপর গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রী। পূর্বে সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের জগদ্ধাত্রীপূজা ছিল এই অঞ্চলের বিশেষ উৎসব। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রদ্বয় রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সারাটী ত্যাগ করে দেওঘরের নিকটস্থ কুণ্ডা গ্রামে নতুন করে বসবাস শুরু করলে তাঁরা বংশের কুলদেবতা রামশিলার বিগ্রহ কুণ্ডায় স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানে আজও

অষ্টধাতুর দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গলারতি, নিত্যপূজা, সন্ধ্যারতির মাধ্যমে দেবী আজও সেখানে আরাধিতা হচ্ছেন।

'সারাটী শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রমণি সেবাশ্রমে'র ইতিবৃত্ত

দীর্ঘদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতুলবংশ প্রসঙ্গটি বিস্মৃতির অন্ধকারে ছিল। বছর পাঁচেক আগে সারাটী যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় সে-সংবাদ কোনভাবে গ্রামের তরুণ ও যুবকবৃন্দ জানতে পারেন। ঐ গ্রামের সন্তান এবং নিকটস্থ গ্রাম রসুলপুর কালীবাড়ির পুরোহিত ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাসের কাছে তাঁরা সেকথা ব্যক্ত করেন। তারপরই সমবেত উদ্যোগে প্রথমে শুরু হয় চন্দ্রমণি-স্মরণোৎসব। এই উৎসব প্রথম হয় ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি। উদ্যোক্তারা গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তের একটি পতিত ভূখণ্ডেই একটি মাটির গৃহ নির্মাণ করে সেখানে উৎসবের আয়োজন করেন। এই উদ্যোগের একটি বিশেষ উদ্দীপনাময় ঘটনা তরুণদের সেবাশ্রম গড়ে তোলার মানসিকতাকে জোরদার করে। যে পতিত ভূখণ্ডে তরুণরা গৃহনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন সে-ভূখণ্ডের উঁচু জায়গা সমতল করতে গিয়ে তাঁরা একটি শিবলিঙ্গ, ভগ্ন নারায়ণশিলা, একটি থালা ও কিছু কড়ির সন্ধান পান। এতে তাঁদের বিশ্বাস হয়, হয়তো এখানেই ছিল স্থানীয় (সারাটীর) বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বাস্তুভিটা।[৩৯] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে চন্দ্রমণিদেবীর পিতৃবংশের পরিচয় ও প্রকৃত বাস্তুভিটার শনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে।



সারাটী-মায়াপুরের প্রাচীন দেবী মায়াচণ্ডীর ভগ্নমূর্তি

সে-বিগ্রহের নিত্যপূজা অব্যাহত। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উত্তরসূরিগণ কুণ্ডায় বসবাস করা শুরু করলেও বেশ কিছুকাল সারাটীতে এসে দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা সমারোহে সুসম্পন্ন করতেন। পরবর্তী কালে তাঁরা জগদ্ধাত্রীর নিত্যপূজা সম্পাদনের জন্য কুণ্ডায় মন্দির নির্মাণ করে

৩৯ সারাটী গ্রামের যে ভূমিখণ্ডে চন্দ্রমণিদেবীর স্মরণোৎসব শুরু হয়েছে তার খতিয়ান নং ২২২; দাগ নং ১৬৩ ও ১৬৪। এদেশে প্রথম সার্ভে সেটেলমেন্ট রিপোর্টে (১৮৮৫-১৯৩৬) প্রকাশ যে, সারাটী মৌজার (জে. এল. নং ৮৩) ১৬৩ দাগ নম্বরটি ডোবা এবং ১৬৪ দাগ নম্বরটি জঙ্গল। দাগ নম্বর দুটির স্বত্বাধিকারিণী হিসাবে হরিবালা দেবী ও গিরিবালা দেবীর নাম উল্লেখ আছে। ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন বলে ভূমি জরিপ ও ভূমি প্রকৃতি নির্ধারণ তত্ত্ব মতে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ দুটি দাগ বাস্তু ভিটা নয় এবং সঙ্গতভাবেই সেখানে পূর্বে কেউ কখনো বসবাস করেনি। ঐ দাগদুটি বস্তুতঃ স্বত্বাধিকারিণীদের ভূসম্পত্তির (ডোবা ও জঙ্গল) অংশমাত্র। তাঁদের বাস্তু ও বাসস্থান অন্যত্র অর্থাৎ অন্য মৌজায় (অবশ্যই সারাটীতে নয়) ছিল। পরবর্তী কালে ঐ দাগ নম্বর দুটি হস্তান্তরিত হয় পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও দ্বারিকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং সেই অনুযায়ী বর্তমান শতকের সাতের দশকের জরিপে এবং নতুন খতিয়ানে ঐ দাগদুটির মালিকানা তাঁদের নামে বর্তায়। বিগত সেটেলমেন্টে (সাত ও আটের দশকে) ঐ দাগ নম্বর দুটি 'ডোবা' (১৬৩ দাগ) ও 'ডাঙা' (১৬৪ দাগ) নামে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ এখনো ঐ দাগগুলি

প্রথম বর্ষের উৎসবের উদ্যোগপর্বে ছিলেন ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস এবং স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে সারাটী-মায়াপুর গ্রামের উৎসাহী নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই উৎসবে যোগ দেন। ক্রমে তাঁরা চন্দ্রমণিদেবীর নামে স্থায়ী সেবাশ্রম গঠনে উদ্যোগী হন এবং পূর্ববর্ণিত ভূখণ্ডটি অধিগ্রহণে তৎপর হন। সে-কাজ সুসম্পন্ন হলে 'চন্দ্রমণি সেবাশ্রম'-এর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সেবাশ্রমের কাজ, সমাজসেবার কাজ এবং বাৎসরিক উৎসবের আয়োজন ভালভাবেই শুরু হয়েছে।



সারাটী-মায়াপুরের কালীমন্দির

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সেবাশ্রম হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়। সরকারি রেজিস্ট্রিকরণ-পর্বও সমাধা হয়েছে ১৯৯৫ সালে (নম্বর এস/৮১০২৫ তাং ১৩.৮.১৯৯৫)। রেজিস্ট্রিকরণের পর প্রতিষ্ঠানের নাম হয়—'সারাটী শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রমণি সেবাশ্রম' (গ্রাম—সারাটী, পোঃ— মায়াপুর, জেলা—হুগলী)। নিবন্ধীকৃত হওয়াকালে প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ কর্মসম্পাদনের অঙ্গীকার পেশ করে ঃ

(১) দরিদ্রদের সেবা করা, (২) জাতিধর্মনির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীর প্রচার, (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো, (৪) পাঠাগার স্থাপন, (৫) বিবিধ জাতীয় উৎসব প্রতিপালন ও শ্রদ্ধেয় মনীষীদের জীবন ও বাণী অনুধ্যান, (৬) খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা, (৭) অবৈতনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, (৮) রাস্তা মেরামত, পুকুর সংস্কার, জলসরবরাহ প্রভৃতি গ্রামোন্নয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ, (৯) বেকার যুবকদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রকল্প গ্রহণ এবং (১০) কৃষিকার্যে উন্নয়নের উদ্যোগে স্থানীয় চাষীদের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে সচেতন করার প্রকল্প গ্রহণ।

রেজিস্ট্রিকরণের সময় সেবাশ্রমের পরিচালন সমিতি ছিল এইরকম ঃ সভাপতি—ব্রহ্মচারী চণ্ডীদাস (সারাটী),

'ভিটি'তে অর্থাৎ বাস্তরূপে চিহ্নিত হয়নি। কাজেই ঐ ভূমিখণ্ডকে চন্দ্রমণিদেবীর বাসস্থান ভাবা অমূলক। [দ্রঃ Settlement Record of Hooghly District during 1936 : Mouza—Sarati (J. L. No. 83); সংশ্লিষ্ট ভূমিখণ্ডের কাঁচা পড়চা ; ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অধিনিয়ম বৃত্তান্ত সম্বলিত গ্রন্থ · পশ্চিমবাংলার ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি রাজস্ব, পৃঃ ৩২-৬৩]



সারাটী-মায়াপুরের মায়াচণ্ডীর মন্দির

সহ-সভাপতি—সমর চট্টোপাধ্যায় (মায়াপুর) ও নীলরতন সরকার (সারাটী), সম্পাদক—ধূর্জটিপ্রসাদ মিত্র (বিরাটী), সহ-সম্পাদক—সীতারাম চ্যাটার্জী (রসুলপুর) ও ব্রজগোপাল চক্রবর্তী (ডিহি বাগনান), কোষাধ্যক্ষ—নারায়ণচন্দ্র নন্দী (সারাটী), হিসাবরক্ষক—কাশীনাথ ভাণ্ডারী (মায়াপুর), সদস্য—সন্তোষকুমার সরকার (মায়াপুর) ও গদাধর পাল (সারাটী)।

প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমি সেবাশ্রম ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছে। দানমাধ্যমে কিছু জমি সংগৃহীত হলেও অর্ধেকের বেশি জমি কিনতে হয়েছে।

সেবাশ্রমের অবস্থান কলকাতা থেকে বেশি দূরে নয়। তারকেশ্বর থেকে পশ্চিমদিকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার এবং আরামবাগ থেকে পূর্বদিকে প্রায় ১০ কিলোমিটার। এখানে গমনাগমনও কষ্টসাধ্য নয়। কলকাতা থেকে প্রতিদিন বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার বাস মায়াপুরের ওপর দিয়েই ছুটে যাচ্ছে। সব বাসেরই মায়াপুর স্টপেজ আছে। তাছাড়া তারকেশ্বর স্টেশন থেকে বাসে এক ঘণ্টার মধ্যে মায়াপুরে পৌঁছানো যায়। মায়াপুর বাসস্টপেজ থেকে এক কিলোমিটার উত্তরেই এই সারাটীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ-চন্দ্রমণি সেবাশ্রম'।

শ্রীরামকৃষ্ণের জনক-জননীর পদধূলিধন্য যে-ভূখণ্ড, যে-ভূখণ্ড স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য-লীলার স্মৃতিবিজড়িত সেই ভূখণ্ড তো তীর্থভূমিই! 'উদ্বোধন'-এর সৌজন্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় শ্রীধাম সারাটীর দিকে আজ দেশ-দেশান্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। [সমাপ্ত] □

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুলালয় তথা চন্দ্রমণিদেবীর পিত্রালয় সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ সম্পর্কে আমাকে গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রথম নির্দেশ দেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে কিছু তথ্য আমার বাবা পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বেই রামকৃষ্ণ সংঘের তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসী (বর্তমানে প্রয়াত) এবং শ্রীশ্রীমায়ের তিন প্রিয় সেবক ও মন্ত্রশিষ্য কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ), রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) এবং বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দ) প্রেরণা ও সক্রিয় সহায়তায় সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। পরবর্তী তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণায় আমি উদ্যোগী হই স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের নির্দেশে এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদে। তারই ফসল বর্তমান নিবন্ধটি যা বিস্মৃতির গর্ভ থেকে সারাটীর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ইতিবৃত্তকে সকলের কাছে উন্মোচন করল। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সাম্প্রতিক নির্দেশ—শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষের নিবাস দেরে গ্রাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

—লেখক (তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের। —সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ ঃ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'

'উদ্বোধন'-এর জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' বিষয়ে শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর চিঠিখানা চোখে পড়ল। শব্দগুচ্ছটি উপনিষদের অংশ নয়—লেখকের এধারণা যথার্থ। দুঃখের বিষয়, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এ একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, উপনিষদের ঋষি ঘোষণা করলেনঃ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। এটি নিশ্চিতই ভ্রমপ্রসূত। দশটি বা বারটি প্রধান উপনিষদ্ এবং যে-সকল অপ্রধান উপনিষদ্ পাওয়া যায়, সেগুলির কোথাও ঐ শব্দগুচ্ছটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে যেসব রচনাকে মূল্যবৃদ্ধির আশায় 'উপনিষদ্' নামে চালানো হয়েছে, যেমন অকব্বর উপনিষদ্, আল্লাহ্ উপনিষদ্ ইত্যাদি, তাতে কোথাও কেউ 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' প্রবেশ করিয়ে দিলেও কোনমতেই একে শ্রুতিবাক্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। এটি উপনিষদের কথা কিনা সেবিষয়ে সংশয় নিরত্তি করে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট লিখেছেন, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' ঠাকুর-পরিবার থেকেই প্রচলিত হয়।

অরুণেশবাবুর অনুমান, 'সুন্দর' শব্দটি কোন পরম তত্ত্বের বাচক নয়। খুবই ঠিক। 'সত্য' ও 'শিব' ভারতীয় শাস্ত্রে চিরকাল উচ্চরবে ঘোষিত। 'সুন্দর'টি পাশ্চাত্য মননের অবদান। পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চ আদর্শত্রয়—'Truth, Beauty and Goodness' অনূদিত হলে দাঁড়ায় 'সত্যম্ সুন্দরম্ শিবম্'। ব্রাহ্ম-আন্দোলনে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবমিলনের এটি একটি উদাহরণ হতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে 'সুন্দর' বোঝাতে পরম তত্ত্বের প্রতীক ইন্দ্র সম্বন্ধে 'শোভিষ্ঠ' (শ্রেষ্ঠ শোভাযুক্ত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। লৌকিক সুন্দর বস্তু সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ—'বাম' ('বামানি ধীমহি')। 'সুন্দর' শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হয়নি।

এ তো গেল (অবিভক্ত) বাংলাদেশে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর কথা। আর কথা, উত্তরভারতে 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্' আরও অনেকদিন আগে থেকে প্রচলিত। আশ্চর্যের বিষয়, বহু মালবাহী ট্রাকের মাথায় দেবনাগরী অক্ষরে লেখা থাকে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা অঞ্চলেও অনেক ট্রাকের মাথায় বাঙলায় শব্দগুচ্ছটি দেখা যায়। উত্তর ভারতে এর প্রচলন, যতদূর জানা যায়, তুলসীদাসের কাল থেকে। প্রায় চারশ কুড়ি বছর পূর্বে গোস্বামী তুলসীদাস সাত কাণ্ডে 'রামচরিতমানস' রচনা শেষ করেন। কিন্তু তখন হিন্দীতে কোন গভীর বা গম্ভীর রচনা অথবা উপভাষায় বিদ্বৎ-সংসদে আলোচনা হেয় ছিল। এমনকি একশ বছর আগেও যখন স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়াতে বেদ সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় একটি বক্তৃতা দেন, পণ্ডিতেরা মন্তব্য করেছিলেন—ভাবা যায় না যে, হিন্দীভাষায় এমন গম্ভীর বিষয়ে বলা সম্ভব। যা হোক, 'রামচরিতমানস' যতই ভাবপুষ্ট ও শ্রুতিসুখকর হোক, কাশীর পণ্ডিতেরা তার প্রচার বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। কোনভাবে সমর্থ না হয়ে তুলসীদাসের উচ্চ প্রশংসা করে তাঁরা বোঝালেন, তাঁর অনবদ্য রামকথা রামগুরু শিবকেই নিবেদন করা উচিত। এই বলে তাঁরা গ্রন্থটি বিশ্বনাথের মন্দিরে বেদাদি গ্রন্থের ওপরে স্থাপন করলেন। প্রচলিত কাহিনী আছে, একদিন দেখা গেল, শিব তুলসীদাসের রামকথা পাঠে আনন্দিত হয়ে তদুপরি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন—'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। অর্থাৎ তাতে সত্য ও শিব তো আছেই, সুন্দরও রয়েছে।

পণ্ডিতদের তা দেখে ভয় হলো, কি জানি শিবের কী ইচ্ছা! তখন কাশীতে বাংলার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও বেদান্তী মধুসূদন সরস্বতী রয়েছেন, যাঁর সম্বন্ধে কথা আছে—"মধুসূদন-সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী"। পণ্ডিতেরা 'রামচরিতমানস' গ্রন্থখানি বিশ্বনাথের মন্দির থেকে নিয়ে মধুসূদন সরস্বতীকে অর্পণ করে ঐ গ্রন্থবিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইলেন। মধুসূদন সরস্বতী গ্রন্থটি দেখে আনন্দ ও পুলকে সেই বিখ্যাত শ্লোকটি লিখে দেন ঃ

"পরমানন্দপত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥"

'রামচরিতমানস' প্রচলিত হলো ও লৌকিক ভাষায় অপূর্ব কাব্যবিষয়ে শিববাক্য 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হলো।

নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়
বলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ
জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ঃ ৭৪৩১২১

'উদ্বোধন'-এর জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, ৫ম সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে শ্রীঅরুণেশ কুণ্ডুর উপরি উক্ত বিষয়ে একটি প্রশ্ন দেখলাম। তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নে উত্তর দেবার প্রয়াস।

কথিত আছে, সন্ত তুলসীদাস মোক্ষতীর্থ অযোধ্যায় ১৬৩৩ সংবতে অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে রাম-বিবাহ দিবসে সাতকাণ্ড 'শ্রীরামচরিতমানস' রচনা শেষ করেন। অতঃপর ভাগবত-ইঙ্গিতে তুলসীদাস সেখান থেকে কাশীধামে গমন করেন। কাশীতে গিয়ে তুলসীদাস বাবা বিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণাকে সদ্যরচিত 'রামচরিতমানস' পড়ে শোনালেন। অনন্তর রাত্রিতে গ্রন্থটি মন্দিরমধ্যে বিশ্বনাথজীর লিঙ্গমূর্তির পাশে রেখে দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বহু বিদ্বান, সন্ন্যাসী ও মহাত্মা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন, পুস্তকে দিব্য

অক্ষরে লেখা আছে—'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। লেখার নিচে ভগবান শঙ্করের নাকি স্বাক্ষরও ছিল। এই শুভসংবাদ চারিদিকে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হলো। ঈর্ষান্বিত পণ্ডিতগণ ঐ গ্রন্থ চুরি করে নষ্ট করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভগবৎ-কৃপায় তাঁরা সফল হতে পারেননি।

উপরি উক্ত কথিকাটি স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত 'হিন্দুধর্ম' থেকে গৃহীত হয়েছে।

তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
বড়বাগান লেন, পোঃ শ্রীরামপুর
জেলা—হুগলী, পিন : ৭১২২০৩

প্রসঙ্গ : 'উদ্বোধন'

বিষাদসিন্ধুতে ডুবে আছি। তবু 'উদ্বোধন' পড়া অভ্যাস। গত চৈত্র ১৪০২ এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৪০৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় 'কথাপ্রসঙ্গে' আমাকে বিমোহিত করেছে। 'উদ্বোধন'-এর প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি লেখাই অনন্য। বিজ্ঞাপনগুলিতেও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কথা থাকে। সৎকথার পুনরাবৃত্তি কখনো 'পুনরাবৃত্তি' বলে মনে হয় না। সুতরাং বিজ্ঞাপনগুলিতে উদ্ধৃত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর বাণীগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গেই পড়ি। পড়ে আনন্দ পাই। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেও 'উদ্বোধন' কী সুন্দরভাবে 'ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবপ্রচার করে চলেছে!

যে-ঘরে থাকি, সব 'মায়ার ছবি' সেখান থেকে সরিয়ে ঠাকুর-মায়ের বড় বড় দুটি ছবির নিচে শুয়ে বসে মৃত্যুর শুভক্ষণের প্রত্যাশায় আছি। কয়েক বছর আগে 'কথাপ্রসঙ্গে'তেই পড়েছিলাম, মায়ের সাক্ষাতে এক পুণ্যবান বালক অন্তর্জলিতে যাওয়ার আগে সর্বাঙ্গে অন্য ঠাকুর-দেবতার নাম মুছে দিয়ে কপালে শুধু 'সারদা' নাম লিখে দিতে বলেছিল। ভবপারের তরণী! অভাজন আমিও যদি ঠাকুর-মায়ের ছবি দেখতে দেখতে জ্ঞান হারাতে পারতাম!

যে পুণ্যের ঘরে গোল্লা, নইলে ছাত্রাবস্থা থেকে মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও এদশা আমার হলো কেন? বাঁকুড়ায় বি. এ. পড়ার সময় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে বৈকুণ্ঠ মহারাজের হাত থেকে বৃত্তি পেয়েছি। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায় আমার শিক্ষাগুরু অনাথনাথ বসুর প্রেরণায় তদানীন্তন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর দর্শনলাভে ধন্য হই। জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়া মঠের স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ), গদাধর মহারাজ—এঁদের পুণ্য সান্নিধ্যের বিরল সুযোগ পাই। বর্তমানে সংঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর রবিবাসরীয় গীতাপাঠ দিল্লীর 'স্কুল অব ইকনমিক্স' ভবনে নিয়মিত শুনতাম। তবু শেষরক্ষা হলো না। পেয়েছিলাম অনেক। দুহাতে ঈশ্বর দিয়েছিলেন। 'নিত্যাভিযুক্ত' তো নই, তাই 'যোগ' হয়েও 'ক্ষেম' হলো না!

আবার বলি, আশ্চর্য উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ বর্তমান চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলিতে বিধৃত। সাগ্রহে অপেক্ষা করছি পরবর্তী সংখ্যাগুলির। ঠাকুরের 'কথাসরিৎসাগর'কে ভগবান বুদ্ধের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর মতো আট ভাগে শ্রেণীবিভাগ করছেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক মহারাজ। চারটি মার্গ পেলাম। সত্যই অপরূপ বিশ্লেষণ! 'কথামৃত'কে এই ভাগগুলোতে ভরে ফেললে অন্ততঃ 'আট কলস' হবে! কী সুন্দর!!

দেওপাড়া চম্পামণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুধীরচন্দ্র সামুই (গত ১৯৯৪ সালে ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত) আমার সমসাময়িক ছিলেন। (একসময় আমিও বাঁকুড়া জেলার একটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলাম।) সুধীর-দা দু-তিন বছর আগে পূজা সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ মায়ের স্মৃতিচারণা করেছিলেন। নিরক্ষর চাষীর ছেলে। বাবা বেগুন বিক্রি করে পয়সা বুঝে নিতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ সুধীর-দার মা জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। প্রসাদের লোভে বালক সুধীরও তার মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে যেত। শ্রীশ্রীমা তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন : "চাষী-বউ, তোর ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবি। ওর লেখাপড়া হবে।" সুধীর-দার স্মৃতিচারণা বহু লোকের ভাল লেগেছিল। তিনি আমাকে বলতেন : "মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। আমার সদ্গতি নিশ্চিত।" এই বিশ্বাস নিয়ে সুধীর-দা গেছেন।

মঠের তখন তেমন পরিচিতি ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী সুধীর-দার কাছে শুনেছি, মা একটু কুমড়ো কি দুটি আলুর সন্ধানে ("অন্নপূর্ণা ভিক্ষা মাগে!") সুধীর-দাদের বাড়িতে যেতেন এই আকুতি নিয়ে : "চাষী-বউ, কলকাতা থেকে এত বেলায় দুটি ছেলে এসেছে। কিছু নেই। কিছু দে ভাই!"

এসব কথা ভাবি, আর ভাবি অন্নপূর্ণার আশীর্বাদে আমারও কি সদ্গতি হবে না? ঐ চরণযুগলের দিকেই তো চেয়ে রয়েছি।

ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়
গ্রাম ও পোঃ—গেলিয়া
জেলা—বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৫৪

স্মৃতিকথা

মায়ের কথা

রসন আলী খাঁ

জয়রামবাটীর সন্নিকটস্থ শিরোমণিপুর গ্রামের বাসিন্দা রসন আলী খাঁর কাছ থেকে এই বিবরণটি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ মে ১৯৯৩। তখন রসন আলী খাঁর বয়স ছিল প্রায় ৯১ বছর।—সম্পাদক, উদ্বোধন

আমি যখন শ্রীমাকে দর্শন করি তখন আমার বয়স তের-চৌদ্দ বছর হবে। জয়রামবাটীতে আমাকে মায়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল মফেতি শেখ ও হামেদি শেখ। তারা সম্পর্কে আমার চাচা। আমাদের বাড়ি শিহড়ের পাশে শিরোমণিপুরে এবং তাদের বাড়ি শিরোমণিপুরের পাশের গ্রাম পরমানন্দপুরে। এই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের অনেক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গেই শ্রীমার বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। শিরোমণিপুরের আমজাদ, আমজাদের স্ত্রী মতিজান বিবি ও আমজাদের মা ফতেমা বিবিকে তো মা খুব স্নেহ করতেন। মা-ই তো প্রায় ওদের সংসার চালিয়ে দিতেন। আমজাদ প্রায়ই গাঁয়ে থাকত না। তখন সংসারের অভাব-অনটন পড়লে আমজাদের মা ও তার বউ জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়িতে হাজির হতো। মা ওদের কষ্ট-দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। ওদের পেটভরে গুড়-মুড়ি খেতে তো দিতেনই, সেইসঙ্গে মাথায় মাখার তেল, চাল, কাপড়, জিনিসপত্র—অনেক কিছুই দিতেন।

শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরে তখন তুঁতের চাষ হতো। ইংরেজরা জমিদারদের মাধ্যমে দাদন দিয়ে চাষীদের তুঁতচাষে বাধ্য করত। জমিতে অন্য ফসল ফলানোর সুযোগ তারা পেত না। জমিদার আর ইংরেজদের ভয়ে এই দুই গ্রামের লোকেদের দিন কাটাতে হতো। দুটি গ্রামেই মুসলমানদের বাসই ছিল বেশি। চাষবাস ঠিকমত করতে না পারায় তাদের অভাব লেগেই থাকত। শিহড়, জিবটা, জয়রামবাটী, ফুলুই, শ্যামবাজার এলাকার ধনী, মধ্যবিত্ত—কারোর মনেই মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা রেখাপাত করেনি। কেবল মা-ই পরম মমতায় আমাদের দুঃখে সমব্যথী হতেন। জাতপাত, ধর্মটর্মের ভেদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আমাদের জন্যও তাঁর কোল পেতে দিয়েছিলেন।

হামেদি শেখ, মফেতি শেখ, রমজান পাঠান গরুর গাড়ির ব্যবসা করত। তারা গরুর গাড়ি করে যাত্রীদের বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দিত। আমি দেখেছি, অনেকবারই তারা শ্রীমা ও তাঁর ভাইঝিদের কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী পৌঁছে দিয়েছে অথবা জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়ায় নিয়ে গেছে। কখনো জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুরে পৌঁছে দিয়েছে কলকাতার পথে। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসাবে যোগাযোগ ছাড়াও তাদের সঙ্গে মায়ের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মায়ের নতুন বাড়ি যখন তৈরি হয়, তখন মাটির দেওয়াল দেওয়ার মজুরদের বেশির ভাগ ছিল শিরোমণিপুর আর পরমানন্দপুরের লোক। শিহড়ের কাছে মায়ের ভাইদের কিছু জমি চাষ করত মফেতি শেখ। হামেদি শেখের স্ত্রী নফিজান বিবি ও মফেতি শেখের স্ত্রী মজিরন বিবির সঙ্গেও মায়ের বিশেষ স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তারা মাঝে মাঝেই মায়ের বাড়ি যেত। মা তাদের বলতেন 'বিবি বউ'। তাদের পেটভরে খাওয়াতেন, সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন।

মায়ের যখন নতুন বাড়ি হয় তখন শরৎ মহারাজ জয়রামবাটী এসেছিলেন।[১] ঐসময় তিনি শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরেও এসেছিলেন। আমি তাঁকে দেখেছি। বিশেষ করে মায়ের নতুন বাড়িই শিরোমণিপুর ও পরমানন্দপুরের লোকেদের মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। তখন জাতপাত নিয়ে খুব সঙ্কীর্ণতা ছিল ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের মধ্যে। হিন্দুরা মুসলমানদের ঘরে ঢুকতে দিত না। মায়ের নতুন বাড়ি হওয়ার সময় মুসলমান মজুরদের কাজে লাগানোর জন্য জয়রামবাটীর গোঁড়া বামুনরা অনেক কথা বলেছিল। ওরা মাকে 'ম্লেচ্ছ' বলতেও দ্বিধা করেনি। মায়ের আত্মীয়রাও মাকে বাড়ি তৈরির কাজে আমাদের লাগাতে নিষেধ করেছিল। মা লোকের সামনে মাথায় কাপড় ঢাকা না দিয়ে বেরুতেন না। খুবই আস্তে আস্তে কথা বলতেন, কিন্তু যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেন। এব্যাপারে কোন আপসের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। পাড়ার লোকেদের চাপে দু-একদিন মায়ের ঘরের কাজ বন্ধ ছিল। পরে শুনেছি—মা বলেছিলেন, কেবল আমাদের দিয়েই কাজ

১ জয়রামবাটীতে মায়ের নতুন বাড়ির প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায়। সেবার তিনি একমাস জয়রামবাটীতে ছিলেন। নতুন বাড়িতে মা গৃহপ্রবেশ করেন ১৫ মে ১৯১৬। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে মাকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য স্বামী সারদানন্দ জয়রামবাটী পৌঁছান এবং ৮ জুলাই মাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরে আসেন।—সম্পাদক, উদ্বোধন

করাবেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের জেদ ও সঙ্কল্পের কাছে গ্রামের গোঁড়াদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। তারপর থেকে মায়ের বাড়িতে আমাদের খুব যাতায়াত হতে লাগল।

তখন জয়রামবাটীতে কিছু পাওয়া যেত না। বড় হাট বলতে বদনগঞ্জ আর কোতুলপুর। শিরোমণিপুরে একটি ছোট হাট বসত। গ্রামের সব ঘরেই কিছু আনাজের চাষ হতো। মফেতি-চাচা তার সবজিখেত থেকে প্রায়ই লাউ, কুমড়ো, সজনে ডাঁটা, কচু প্রভৃতি আনাজপাতি নিয়ে মায়ের বাড়ি যেত। তার মুখে একটা ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম। সে বলত ঃ "মা মানুষ নন। বড় পীর-দরবেশ হবেন। আমি একবার লাউ নিয়ে মায়ের বাড়ি গেছি। গিয়ে দেখি, নতুন বাড়িতে মা পূজায় বসেছেন। আমি মায়ের বাড়িতে হামেশাই যাতায়াত করতাম বলে আমার কোন আড়ষ্টতা ছিল না। আমি গিয়ে ডাক দিলাম ঃ "মা! লাউ এনেছি।" আমার ডাক শুনে একজন মেয়েলোক এসে বলল ঃ "একটু বস, মা পূজায় বসেছেন।" আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম যে, মা পূজার আসনে বসে আছেন। আমি উঠোনের এককোণে লাউ ও লাউশাক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ মায়ের পূজার আসনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মা সে-আসনে নেই, আর মায়ের বসে থাকা দেহটা যেন আসন থেকে প্রায় দুহাত ওপরে। মা ঠিক সেইভাবেই বসে আছেন, আসনটা নিচে পড়ে রয়েছে। মা শূন্যে বসে জপ করছেন! আমি মনে মনে ভাবছি, ভুল দেখছি না তো! চোখ মুছে আবার তাকিয়ে দেখি সেই দৃশ্য! বোকার মতো তাড়াতাড়ি মহারাজদের যেই ডাকতে যাচ্ছি, দেখি আর কিছু নেই। তারপর মা আসন থেকে উঠে আসতে তাঁকে প্রণাম করলাম। কিন্তু প্রণাম করতে ভয় হচ্ছিল খুব। মা আমাকে মুড়ি-গুড়, মাথার তেল দিতে বললেন একজন মহিলাকে। সেসব নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না।"

মুসলমান পুরুষরাও যেমন মায়ের বাড়ি যেত, মুসলমান মেয়েরাও যেত। শিরোমণিপুরের কয়েকজন বিবি ফল ও সবজি বিক্রি করতে জয়রামবাটী যেত। প্রৌঢ়া সাবিনা বিবি ছিল তাদের মধ্যে একজন। সে প্রায়ই মায়ের বাড়িতে যেত। আম-কাঁঠালের সময় সে কোতুলপুর থেকে আম-কাঁঠাল এনে জয়রামবাটীতে বিক্রি করতে যেত। মায়ের মা-ও তাকে খুব ভালবাসতেন। মা তাকে বলতেন 'খুড়ি'।

আগে শিরোমণিপুর-শিহড় অঞ্চলে খুব খেজুরগাছ ছিল। তখনকার লোকেরা খেজুরগাছের মাথা চেঁচে খেজুররসের ভাঁড় ঝুলিয়ে দিত। প্রায় শখানেক খেজুরগাছ থেকে রোজ খেজুররস নামত। সেই রস থেকে খেজুরগুড় তৈরি হতো। শাজাহান খাঁ, মজির খাঁ, সাদেক আলি, রফি মিঞা—এমন অনেকেরই খেজুররসের ব্যবসা ছিল। কোতুলপুর, বদনগঞ্জ, কামারপুকুর চটি, গোঘাট ইত্যাদি জায়গায় তারা খেজুরগুড় বিক্রি করত। তাদের অনেকের সেটিই ছিল জীবিকা। খেজুরগুড় তৈরির কাজ খুব পরিশ্রমসাধ্য। আমাদেরও খেজুররসের ব্যবসা ছিল। আমি অনেকবার খেজুররস ও খেজুরগুড় নিয়ে মায়ের বাড়ি গেছি। মা খেজুরের জিরেন রস ও খেজুরগুড় খেতে খুব ভালবাসতেন। আমি খেজুরগুড় নিয়ে গেলে মা পয়সা দিতেন। পয়সা নিতে না চাইলে মা বলতেন ঃ "বাবা, পয়সা নিতে হয়, ওটা যে পরিশ্রমের জিনিস।" পয়সা দিয়ে তার ওপর মা প্রচুর প্রসাদ, মুড়ি, মুড়কি দিতেন।

শিরোমণিপুরের দুদু ফকির ও সেলিম ফকিরও মায়ের বাড়িতে যেত। নবান্নের সময় তারা চামর দুলিয়ে ভিক্ষে করত। শ্রীমা তাদের খুব ভালবাসতেন ও ভক্তি করতেন। শিরোমণিপুরের পীরের দরগায় তিনি ঘোড়া ও সিন্নি মানত করতেন। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচা বলত ঃ "মায়ের কী ভক্তি! আমাদের পাল-পরবে মা সিন্নি মানত করে, বাতাসা দেয়।" মফেতি-চাচা মাকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "মা, মুসলমানদের পরবে আপনি সিন্নি-বাতাসা পাঠান কেন? আপনারা তো হিন্দু?"

মা বলতেন ঃ "বাবা! ঠাকুর কী আলাদা হয়? সবই এক। তোমরা তো জান বাবা, তোমাদের ঠাকুর ইসলামধর্মও সাধনা করেছিলেন। সেসময় নামাজ পড়তেন মুসলমানের মতোই। সবই এক বাবা! নামেই শুধু ভিন্ন।" মফেতি-চাচাকে এবং আমাদের সবাইকে মা যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনই ভালবাসতেন।

অনেক আগে একবার মায়ের মন্দিরে বাজ পড়ে। কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) মফেতি-চাচাকে বলেছিলেন ঃ "হ্যাঁরে মফেতি, মায়ের মন্দিরে যে বাজ পড়ল! একবার আজান দিস তো!" মফেতি-চাচা মহারাজের কথামত মন্দিরের কাছে আজানও দিয়েছিল। কিশোরী মহারাজ মায়ের কাছেই মানুষ। সত্যি! মায়ের শিক্ষায় ওঁরাও ছিলেন সব ধর্মেরই লোক। আমরা ঠাকুর-মাকে পীর-পয়গম্বররূপেই দেখি। হামেদি-চাচা ও মফেতি-চাচাকে দেখেছি, ওরা মনে-প্রাণে ঠাকুর আর মাকে তা-ই ভাবত। ওঁদের মতো মানুষ কি আর আসবে? ওঁরা তো আল্লার দূত—বেহেস্তের ফেরেশতা! □

রহস্যাবৃত রূপকুণ্ড

তুঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়

! ঐ নামেই কী জাদু আছে জানি না, তবে প্রতি বছরই এক অদ্ভুত আকর্ষণে ছুটে যাই হিমালয়ের কোন-না-কোন অংশে। হিমালয়ের সৌন্দর্যের এক ঝলক দেখেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার সময়। দূরে ঐ পর্বতশৃঙ্গের রং কখন যেন আমার মনেও এসে পড়েছিল, তাই জানতেও পারিনি কখন হিমালয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছি। এই প্রেমই বারবার টেনে নিয়ে যায় হিমালয়ের কাছে। প্রতিবছর বর্ষা যখন তার দায়িত্ব প্রায় শেষ করে আনে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাস এলেই মন আনচান করে, হিমালয় ডাক পাঠায়। হিমালয় শুধু তার অপার সৌন্দর্য দিয়েই মন ভোলায়, তা নয়—তার রহস্যময়তাও মানুষকে ভাবিয়েছে যুগে যুগে। হিমালয়ের এমনই এক রহস্যময় স্থান হলো রূপকুণ্ড। কিছুদিন আগে ডাক এসেছিল গাড়োয়াল হিমালয়ের রূপকুণ্ডের কাছ থেকে।

যাওয়ার দিন হাওড়া স্টেশন থেকে অমৃতসর মেল ছাড়বার একটু আগে চারটি ছেলে রুকস্যাক ইত্যাদি নিয়ে আমাদের পাশে এসে বসল। শুনলাম, ওরাও যাবে রূপকুণ্ড। তখনো জানতাম না যে, ওরা এবং আমরা একই দলভুক্ত হয়ে যাব। লখনৌ থেকে মিটারগেজ রেলপথের হলদোয়ানী স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডে এলাম। কিন্তু গোয়ালদাম যাওয়ার বাস থাকা সত্ত্বেও ঐ বাসে যেতে পারলাম না এক অদ্ভুত নিয়মের জন্য। এখানে যাত্রীকেই তার পছন্দসই সিট নম্বর বলতে হয়। আমরা যখন এই নিয়মের কথা জানলাম তখন আর সিট নেই। সিট না পাওয়ার দলে আগে পরিচয় হওয়া ঐ চারজনও ছিল। কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়াই ওদের সঙ্গে একই দলভুক্ত হয়ে গেলাম, হিমালয়ে এসে নতুন বন্ধু পেয়ে গেলাম। গোয়ালদাম যাওয়ার বাসে জায়গা না পেয়ে অন্য বাসে আমরা বাগেশ্বরে এলাম। উত্তর প্রদেশ ট্যুরিজমের বাংলোয় রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালের বাসে এলাম গরুড়। বাস থেকে নামবার সময় লক্ষ্য করলাম, নতুন বন্ধু পাপ্পুর ক্যামেরার ব্যাগটি উধাও। পাহাড়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতা কোনদিন হয়নি। হয়তো সমতলের মানুষদের সাথে যত যোগাযোগ বেড়েছে, ততই কমেছে পাহাড়ীদের সরলতা, বেড়েছে লোভ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গরুড় থেকে দেবল যাওয়ার বাস সকালে না থাকায় একটা মারুতি ভাড়া করে দেবল গ্রামে এলাম। এই গ্রামেই আমাদের গাইড গঙ্গা সিং থাকেন। গঙ্গা এই অঞ্চলের বিখ্যাত গাইড—বীর সিং-এর ছেলে। এখানে আসার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম, গঙ্গা সপ্তকুণ্ড গেছে এবং আজই ফিরবে। দেবলের গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (GMVN) বাংলোয় বসে আছি, এমন সময় একটি ছেলে এসে একটা চিঠি দিল। চিঠির বিষয়বস্তু হলোঃ গঙ্গা জানাচ্ছে যে, সে নিজে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। তাই পত্রবাহককে সঙ্গে করে আমরা যেন রওনা দিই। চিঠিটা পড়ে গঙ্গার ওপর খুব রাগ হলো। কিন্তু উপায়ন্তর না দেখে ঐ ছেলেটিকেই বললাম বিকালে একবার আসতে, তাহলে ওকে সঙ্গে করেই দেবল বাজার থেকে দরকারী জিনিসপত্র কেনা যাবে। কিন্তু বিকালে সে এল না, তবে স্বয়ং গঙ্গা সিং এসে দেখা করল। ট্যুরিস্ট লজের কেয়ারটেকারও বললেন, এর নামই গঙ্গা সিং। পর পর দুটো ঘটনা আমাদের বিশ্বাসের ভিতে আঘাত দিয়েছে। যাইহোক, গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে দেবল বাজার থেকে আগামী কয়েকদিনের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি কেনা হলো।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ করে শুরু করলাম হাঁটা। যদিও বর্তমানে দেবল থেকে মান্দোলী অবধি জীপ চলার রাস্তা তৈরি হয়েছে, তবুও ধস নামার জন্য আমাদের হাঁটতে হলো। অবশ্য আমাদের ভাগ্য ভালই বলতে হবে, কারণ ধস অঞ্চলটি পার হয়েই দেখি একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। জীপ-ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। বেচারী ধসের জন্য দেবলে আসতে পারছে না। ঐ জীপে চড়েই এলাম মান্দোলী গ্রামে। এখান থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে এলাম লোহাজং। এখানে উত্তর প্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগের একটি বাংলো আছে। আমাদের ইচ্ছে হলো, ঐ বাংলোতেই আজ থাকি। এখানে নন্দাদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। লোহাজং থেকে আশপাশে হিমালয়ের অপূর্ব শোভা দেখা যায়। অবশ্য আকাশ পরিষ্কার না থাকায় আমাদের ভাগ্যে সেই দর্শনসুখ লাভ হয়নি।

পরদিন সকালে গঙ্গা সিং-এর ডাকে ঘুম ভাঙল। চা ও সামান্য জলখাবার খেয়ে সকাল ছটার সময় লোহাজং ট্যুরিস্ট লজ থেকে বের হলাম। প্রথমে শুধু উতরাই, নেমেই চলেছি, কোথায় যাবরে বাবা! মহা আনন্দে নেমে চললাম বেশ কয়েক মাইল। তারপরই শুরু হলো চড়াই। একসময় চলে এলাম এই পথের শেষ গ্রাম ওয়ানে। গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে একটু চড়াই ভেঙে ওপরে ছবির মতো

সাজানো ওয়ানের ট্যুরিস্ট বাংলোতেই আজ থাকার ব্যবস্থা হলো। সুন্দর ঝকঝকে রোদে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। পাইন গাছে ঘেরা এই বাংলোটি সত্যিই অপূর্ব। এই সময়ই মনে হলো সুখ-দুঃখ জীবনে অবিচ্ছিন্ন। সুখের ভিতরেই দুঃখের বীজ, দুঃখের মধ্যেই সুখের সূচনা।

পরদিন আমাদের গন্তব্য ওয়ান থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বৈদিনি বুগিয়ালে। প্রায় সমস্ত রাস্তাটাই চড়াই ভাঙতে হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তার কোন চিহ্ন নেই, আছে পাতা পচে থকথকে কাদা। তার ওপর বৃষ্টি হওয়ায় হাঁটতে খুব কষ্ট হয়েছিল। সারাটা দিন প্রকৃতি মুখ ভার করে থাকায় তার সৌন্দর্য ভালভাবে উপভোগ করতে পারিনি। 'বুগিয়াল'-এর অর্থ চারণভূমি। বৈদিনি বুগিয়ালে দেখি একই রকম সবুজ ঘাসে ঢাকা তৃণভূমি। এখানে ওয়ান গ্রামের এক বাসিন্দা ছোট ছোট ঘর তৈরি করেছে। ঐ ঘরগুলিকে যাত্রীদের ভাড়া দেয়। এছাড়া গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের একটি টিনের চাল দেওয়া বাংলো আছে। বিকালে বুগিয়ালের আশপাশে ঘুরে বেড়ালাম। এখানে ছোট্ট একটি কুণ্ড আছে—নাম বৈদিনি কুণ্ড।

পরের দিন ভোরবেলায় পার্থর ডাকে বাইরে বের হয়ে দেখি সামনে চৌখাম্বা শৃঙ্গ; আলো একটু পরিষ্কার হতেই ত্রিশূল, বন্দরপুঞ্জ এবং নীলকণ্ঠ শৃঙ্গ দেখতে পেলাম। আনন্দে মন ভরে গেল। ঘরে অন্য সঙ্গীরা আছে, এই আনন্দে ওদেরও সামিল হওয়ার জন্য ডাকাডাকি করলাম, কিন্তু ওদের দেখলাম স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে থাকাই পছন্দ। ফলে এই নয়নসুখকর অভিজ্ঞতা থেকে ওরা বঞ্চিত হলো। একটু বাদেই মেঘ ঢেকে দিল সব শৃঙ্গ। আমরা এখান থেকে বের হওয়ার জন্য তোড়জোড় করার সময়ই বৃষ্টি এল। পাপ্পু, ভোলা তখনো স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে বের হয়নি। স্লিপিং ব্যাগের ভিতর থেকেই পাপ্পু বলল: "তুঙ্গদা, আজকের দিনটা এখানেই থেকে যাও না।" সত্যি বলতে কি, সকালে ঐ দৃশ্য দেখার পর আমারও একটু লোভ হয়েছিল এখানে আরেকদিন থাকার জন্য। এখন পাপ্পুর কথায় বল পেলাম। বললাম: "ঠিক আছে, তাই হবে।"

কিন্তু পরের দিন সকালেও বৃষ্টি না থামায় সবাইকে বললাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরি থাকতে, বৃষ্টি কমলে গঙ্গার মত নিয়ে বের হওয়া যাবে। পাহাড়ে গাইডের কথা অমান্য করা উচিত নয়। অনেক সময় মনে হয় লোকটা ভুল করছে, কিন্তু আবহাওয়ার ব্যাপারে এদের পূর্বানুমান-শক্তি প্রখর। প্রায় ৮টার সময় বৃষ্টি একটু কমতে গঙ্গা বলল: "বাবুজী চলুন।" আজকের গন্তব্য বগুয়াবাসা। বৈদিনি থেকে বগুয়াবাসা ১০-১১ কিলোমিটার। সমুদ্রতল থেকে বগুয়াবাসার উচ্চতা ১৪,৫০০ ফুট। সারাটা পথই চড়াই ভাঙতে হবে। প্রথমে আসে পাথরনাচুনি বলে একটা জায়গা। এই জায়গাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক দুঃখজনক উপাখ্যান। শোনা যায়, কোন এক রাজা নন্দাতীর্থে এসে নন্দাদেবীর কথা ভুলে নর্তকীদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্নাদেশে সম্বিত ফেরে এবং যত রাগ গিয়ে পড়ে বেচারী নর্তকীদের ওপর। রাজাদেশে নর্তকীদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। দূরের পাথরগুলি ঐ নারকীয় ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। পাথরনাচুনি থেকে শুরু হয় আরও চড়াই। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একসময় শুনতে পেলাম ঘণ্টাধ্বনি। এই পাহাড়ের মাঝে কোথায় বাজে ঐ ঘণ্টা? কৌতূহল বেড়ে চলে, দেখতেই হবে কোথায় বাজছে। একসময় পৌঁছেও যাই। দেখি গঙ্গা সিঙের হাসিমুখ। জায়গাটির নাম শুনি কৈলুবিনায়ক। এখানে একটি কষ্টিপাথরের সুন্দর গণেশ-মূর্তি আছে। ভাবি, এই দুর্গম পাহাড়ে কে স্থাপন করেছিল এই মূর্তি? মূর্তিটি একসময় খোলা আকাশের নিচেই থাকত। তবে বর্তমানে পাথর সাজিয়ে একটি আড়াল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এখানকার কুলি এবং গাইডেরা। এই কৈলুবিনায়কে পুজো দেওয়ার প্রথা আছে। আমরাও সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো খাবার ও সামান্য কিছু টাকা দিয়ে পুজো দিলাম। কৈলুবিনায়ক থেকে বগুয়াবাসা অবধি রাস্তায় চড়াই নেই। পথের ধারে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল। বগুয়াবাসায় যখন পৌঁছালাম তখন শরীরের শক্তি প্রায় শেষ। কোনমতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চললাম আজকের আশ্রয় পাথর দিয়ে তৈরি ছোট্ট ঘরে। এর মধ্যে গঙ্গা কাঠ জ্বালিয়েছে। আগুনের কাছে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। ঐখানে বসেই চা খেলাম, তবে একটু চাঙ্গা হলাম।

বগুয়াবাসায় এসেছি বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে। পরের দিনও বৃষ্টি না থামায় বাধ্য হয়েই থেকে গেলাম এখানে। গঙ্গা সিং একটা পাথর-ঘেরা জায়গা দেখিয়ে আমাদের বলল: "ওটা কি জানেন?" আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল: "ঐটি হলো রানী কা সুলেরা (রানীর আঁতুর-ঘর)।" এই সম্পর্কেও একটা গল্প প্রচলিত আছে। নন্দাতীর্থের আকর্ষণে কনৌজের রাজা যশোদয়াল সিং পাত্র-মিত্র, লোক-লস্কর এবং রাজমহিষী বল্লভাকে নিয়ে চলেছেন হোমকুণ্ডের উদ্দেশে। রানী ছিলেন সন্তান-

সম্ভবা। পাহাড়ে অপরিমিত পথশ্রমে অকালেই রানী প্রসববেদনা অনুভব করলেন। তখনই লোকজন পাথর দিয়ে তৈরি করে দিলেন রানীর আঁতুরঘর। গভীর রাতে রানী সন্তান প্রসব করলেন। তারপরই শুরু হয় মহা-প্রলয়। এই প্রলয়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে কি আজকের রূপকুণ্ড, তার তীরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মানুষের দেহাবশেষ নিয়ে?

বগুয়াবাসা থেকে রূপকুণ্ডের দূরত্ব মাত্র ৫-৬ মাইল। প্রথমে রাস্তা বেশ সুন্দর। পথের দুধারে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল, ফেনকমল, হলুদ ও নীল রঙের কত ফুল। হালকা সুগন্ধে ভরে আছে প্রকৃতি। অদ্ভুত পরিবেশ। ঘোর নাস্তিকও বোধহয় এই পরিবেশে তাঁর মত বদলে ফেলবেন। এখানে হঠাৎই দেখলাম একটা নীল রঙের পাখি। কিছুদূর যাওয়ার পর গঙ্গা সিং বলল: "ঐ দেখুন দূরে ডানদিকে ত্রিশূল শৃঙ্গ এবং বাঁদিকে নন্দাঘুণ্টি শৃঙ্গ।" দুই শৃঙ্গের মাঝে একটা নিচু জায়গা দেখিয়ে বলল: "ঐখানেই আছে রূপকুণ্ড।" রূপকুণ্ডের আগে কিছুটা রাস্তা বেশ কষ্টকর, পথের চিহ্নমাত্র নেই। ঝুরো পাথরে ভরা পথে পা রাখতে হচ্ছে খুব সাবধানে। এতেও রেহাই নেই, সঙ্গে চলছে তুষারপাত, পথ হয়ে উঠেছে আরও কষ্টকর। অতি সাবধানে অবশেষে এলাম রূপকুণ্ডের তীরে। অনেকদিনের সাধ পূরণ হলো।

দেখলাম, রূপকুণ্ডের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। একটু খুঁচিয়ে দিতেই তলার জল দেখতে পেলাম। ঐ জল একটু মাথায় দিলাম। আনন্দে বলে উঠলাম: "জয় নন্দামাতা!" কিন্তু এই উচ্ছ্বাস হঠাৎই কমে গেল যখন দেখতে পেলাম চারিদিকে মানুষের কঙ্কাল। কিছু কিছু হাড়ে এখনো লেগে আছে কালো হয়ে যাওয়া মাংস। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে দাঁতসমেত চোয়াল, মাথার খুলি, হাত ও পায়ের হাড়। এরা কারা? কোথা থেকে এসেছিল? কেনই বা এসেছিল? কিভাবে এই মৃত্যু হলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর আজও খোঁজা চলছে। এটা আজও রহস্য। সম্ভবতঃ এরা তীর্থযাত্রায় এসে সমুদ্রতল থেকে ১৬,৩০০ ফুট উঁচু রূপকুণ্ডে চিরনিদ্রামগ্ন হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জানা গেছে, দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় ৭০০ বছর আগে।

এখানে পুজো দেওয়ার প্রথা আছে। আমরা সঙ্গে নিয়ে আসা কাজু, কিশমিশ, চকোলেট ইত্যাদি দিয়েই রূপকুণ্ডের তীরে নন্দাদেবীর উদ্দেশে আমাদের অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। আর ঐ হতভাগ্য পুণ্যার্থীদের উদ্দেশে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে নেমে চললাম বগুয়াবাসার দিকে।□

কেউ দশে, কেউ ছয়ে, কেউ পাঁচে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটানো, দোর-বাক্স চাবি দিয়ে বন্ধ করা—এসব বারণ করেছিলেন। কেন বারণ করেছিলেন ঠাকুর! যে ত্যাগ করবে, তার এইসব সাধন করতে হয়।

ঠাকুর সাধনের কথা বলছেন। যাঁরা সংসারে থাকবেন আধা বিষয়ী হয়ে তাদের জন্য একরকম ব্যবস্থা। অত কঠোর করতে পারবে না। রাখতে পারবে না। বারে বারে ভাঙবে। করবে আবার করবে না। সে বড় সাংঘাতিক। না ঘরকা, না ঘাটকা। তখন এও যাবে, ওও যাবে। হয়ে যাবে ভণ্ড। বকধার্মিক। এঁদের জন্য ঠাকুরের চালাও নির্দেশ—"না গো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসেবসে বেশ আছ! সা-রে-মা-তে। তোমরা বেশ আছ, নক্স খেলা জান? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছ, কেউ ছয়ে আছ, কেউ পাঁচে আছ। বেশি কাটাও নাই। তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে—এ তো বেশ। সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"

যাঁরা সংসারে ঢুকে পড়েছেন তাঁদের সংখ্যাই বেশি, তাঁদের জন্য ঠাকুরের নরম প্রেসক্রিপশন। আধা ছানার মণ্ডা। সংসারে তোমার কর্তব্য আছে। ফেলে পালালে চলবে না। আমি অমন কাজ সমর্থন করি না। নদের হাট বসিয়ে এখানে এসে মাদুর বিছিয়ে নাক ডাকাবে! বলবে, সমাধি প্র্যাকটিস করছি! অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দেব। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, ছেলেকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছ, স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেছ, সংসার তোমাকে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিয়েছে, তাহলে এস, তোমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করি।

মৃত্যুর জন্য আবার প্রস্তুতি কি! পড়ব আর মরব।

তাই নাকি? বৎস, পুনর্জন্মের কথা ভাব। মৃত্যুর সময় যা ভাববে তাই হবে পরের জন্মে। ভরতরাজা হরিণের কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন, পরের বার এলেন হরিণ হয়ে।

সাধু মরণে সাবধান!

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সাধুর আস্তানা। ভক্ত-পরিবৃত। উপদেশাদি। রোজ কোথা থেকে এক পাগলী আসে, হাসতে হাসতে শুধু একটি কথাই বলে যায়—বাবা, মরণে হুঁশিয়ার! সাধু বুঝতে না পেরে রেগে যান। অবশেষে অন্তিমকাল এল। চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। নজর গেল চালের বাতার দিকে। এক জোড়া নতুন চপ্পল গোঁজা রয়েছে। কোন এক ভক্তের উপহার। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। নাভিশ্বাস উঠছে। ক্ষণিক চিন্তায় ঘুরে গেল—আহা! জুতোটা আর পরা হলো না। সাধু চলে গেলেন।

অনেক দিন পরে। সেই দশাশ্বমেধ। একটি মুচি একপাশে বসে জুতোয় পেরেক ঠুকছে টুকটুক করে। সেই পাগলী—কি গো সাধু, কি বলেছিলাম, মরণে হুঁশিয়ার! শুনেছিলে?

জন্ম জন্ম ধরে সংস্কার তৈরি করতে হয়। কে জন্মায়? জন্মায় সংস্কার। বিজ্ঞানে তার নাম হয়েছে জিন। ঠাকুর বারেবারে বহুভাবে বলেছেন—হুঁশিয়ার! সংস্কার তৈরি কর। সংস্কার-দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

সংস্কার সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। ঠাকুর আরও দৃঢ়ভাবে বলছেন: কেউ সুস্থ-সবল মনের অধিকারী, কেউ দুর্বল-রুগ্ন মনের অধিকারী। কেন? কেউ উদার, কেউ সঙ্কীর্ণ, কেউ স্বভাব-সাধু, কেউ খল, কেউ জন্মবিষয়ী, হিসেবী, সন্দেহপ্রবণ, কেউ মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অপ্রমত্ত। কেন?

রুগ্ন মনের চারটি লক্ষণ: ১) উপাসনার আনন্দ পায় না, ২) ঈশ্বরকে ভালবাসে না, ৩) শিক্ষার নয়নে বস্তু দেখে না এবং ৪) জ্ঞানের কথা যা শ্রবণ করে তার মর্ম ধারণা করতে পারে না।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে, বলছে—কি ব্যাজোর ব্যাজোর করছে! তত্ত্বকথা হচ্ছে ঠাকুরের ঘরে! বন্ধু তন্ময় হয়ে শুনছে, আর একজন খোঁচাচ্ছে—চল না, চল না। শেষে বলছে—আমরা তাহলে যাই। মানুষ দেখলেই ঠাকুর চিনতে পারতেন—ভিতরে কি আছে, কে আছে। যেই বুঝতেন অক্কট বক্কট, সহজে হবে না, জল এত ঘোলা যে

নির্মলি ফেললেও থিতোবে না, তখন তাদের জন্য ব্যবস্থাপত্র—যাও, রাসমণির টেম্পল দেখ, গার্ডেন দেখ।

ঠাকুর কি তাহলে নির্দয়! না। হবে, সকলেরই হবে! তবে কত জন্ম পরে হবে নির্ভর করছে আকাঙ্ক্ষার ওপর। ইচ্ছা চাই। অহেতুকী কৃপা কারো কারো ভাগ্যে জুটতে পারে, তাঁরা হলেন কৃপাসিদ্ধ। তাঁদের কথা ভিন্ন। মাস্টার মশাইকে বোঝাচ্ছেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের উদাহরণ দিয়ে—চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দোমেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ করছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না। অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।

ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছাই হলো উপায়। কি আছে অন্তরে জানতে হবে। ঠাকুর মাস্টার মশাইকে বলছেন ঃ অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একটু সাধন চাই। গুচ্ছের পড়লে কি হবে! অনেক জানার নাম অজ্ঞান। এক জানার নাম জ্ঞান। অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য সর্বভূতে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।

কেম্পিস বলছেন ঃ "Give up this passionate desire for knowledge, because it distracts you and leads you astray." ঠাকুরের কথা—অনেক জানার নাম অজ্ঞান। কেম্পিস বলছেন ঃ "The soul is not satisfied by words in their thousands, whereas a good life sets the mind at rest, and a pure conscience gives assurance before God."

মাস্টার মশাইয়ের প্রশ্ন হলো ঃ সাধন কি বরাবর করতে হয়?

ঠাকুর বলছেন ঃ না, প্রথমটা একটু উঠেপড়ে লাগতে হয়। তারপর আর বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয় ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়—সেইটুকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হলো আর অনুকূল হাওয়া বইল তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,—তারপর পাল টাঙাবার বন্দোবস্ত করে তামাক সাজতে বসে। কাম-কাঞ্চনের ঝড়-তুফানগুলো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

যদি প্রশ্ন করি ঃ ঠাকুর! এই ঘোরতর প্রতিযোগিতার যুগে ঈশ্বর অনুধ্যানের সময় কোথায়! কুঁজারা তো সবসময় কু বোঝাচ্ছে, রাই পক্ষে কেউ নেই।

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে কড়া উত্তর দেবেন ঃ তোমার যদি তাই মনে হয় তাহলে আমার কাছে এসে পাকামো করো না। তোমার সার্কেলে যাও। তুমি ঈশ্বরচিন্তা করবে কি করবে না, সেটা তোমার হাতে নেই। তিনি যদি মনে করেন, তোমার বাপ করবে। জাত সাপে ধরলে তিন ডাকেই শেষ।

জগতের ছয়শ কোটি মানুষ কি তোমার কথায় চলবে? যারা আত্মচিন্তা, মোক্ষচিন্তা করবে তারা সবকালেই করবে। যুগনির্ভর নয়, জীবননির্ভর। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দুর্যোধন, দুঃশাসনও ছিল। হিটলার আর আইনস্টাইন একই ঘড়ি দেখতেন। শ্রীচৈতন্যের অদূরেই জগাই-মাধাই। তেলোভেলোর মাঠে জননী সারদা ও দস্যু সাগর সর্দার। দেবী দুর্গা ও মহিষাসুর একই মঞ্চে। একই ছুরি—সার্জেনের হাতে জীবন, দস্যুর হাতে মরণ।

ঠাকুর বলছেন ঃ তাঁর লীলা। অন্ধকার না থাকলে আলোর মহিমা বোঝা যায় না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় না। 'মন্দজ্ঞান' থাকলে তবে 'ভালজ্ঞান' হয়। আবার খোসাটি আছে বলে তবে আমটি বাড়ে ও পাকে। আমটি তয়ের হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়। মায়ারূপ ছালটি থাকলে তবেই ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া আমের খোসার মতো। দুই-ই দরকার।

এই জগতে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে। তাঁর ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। জগতের দুই খণ্ড—সৎখণ্ড, অসৎখণ্ড। দুই মেরু। যে যে-খণ্ডে থাকে। এস্কিমোকে মরুভূমিতে আনা যায় না, মরুভূমিকে ইগলুতে ঢোকানো যায় না।

যেমন, একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিল।

বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা বিচি শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে।

প্রথমে খোলা নয়, বিচি নয়—শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে—যে-বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বিচি। আগে 'নেতি নেতি' করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি—এইরূপ বিচার করতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যার শাঁস তারই খোলা-বিচি, যা থেকে ব্রহ্ম বলছ তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন, জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

আধার দেখে, 'নাউয়ের ডোল'টি দেখে যেই মনে হতো ভাল বাদ্যযন্ত্র হবে, তখনই কাছে ডেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিতেন: গেরো দিয়ো না, সেলাই করো না, পরদা গুটিয়ো না, দোর-বাক্স চাবি দিয়ে বন্ধ করো না। কাকে তুমি বাঁধতে চাও! বিষয় অথবা সম্পর্ক! সেলাই করে পরবে! কেন কৃপণতা! দুখচেটে সংসারীর প্রতি অসীম ঘৃণা ছিল তাঁর। পরদা ঝুলেই থাক। মনকে কেন গুটোতে চাইছ? প্রসারিত করো। পর্দার ওপাশে জগৎ-সংসারের কিচিরমিচির, এপাশে তোমার নিভৃত মনের সাধনা। আর তালাচাবি! সে কি—সঞ্চয়, সম্পদ, বিষয়ভাবনা, ভয়, গোপনীয়তা, সন্দেহ, সঙ্কীর্ণতা, অহঙ্কার, তামসিকতা, ব্যাঙের আধুলি। নিজের ভার নিজে নিলে তোমার ভার তিনি নেন কি করে!

কেম্পিস বললেন: "Feed me, for I come hungry to your door; melt my coldness with the fire of your love, and with the brightness of your presence make my darkness light... for you are my only food and drink, my love and joy, my sweetness and all my good."□

জলবাহিত রোগ ও তার বিস্তাররোধের উপায়

অরুণকুমার লাহা

আমাদের দেশের মানুষ নিজের গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু গৃহের বাইরে যে পরিবেশ তা পরিচ্ছন্ন রাখার কথা মনেও আনে না। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, গৃহের নিকটেই আবর্জনা ফেলে রাখা, যে-পুকুরের জল পান করা হয় সেই পুকুরেই বাসনমাজা, কাপড়কাচা ও শৌচাদি কর্ম সারা, অনেক গ্রাম বা আধা শহরে দেখা যায় সেপ্টিক ট্যাঙ্কের জল সরাসরি পুকুরে পড়ছে, আবার সেই পুকুরের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে—এসবই হচ্ছে জলবাহিত রোগের উৎস।

আমাদের দেশের অধিকাংশ বাড়িতে জল, বিশেষ করে পানীয় জল কিভাবে রাখা উচিত সে-সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। আমার চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি কি শহরে, কি গ্রামে, কি শিক্ষিত লোকের বাড়িতে, কি অশিক্ষিত লোকের বাড়িতে পানীয় জলের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে লোকে ভীষণ উদাসীন। অধিকাংশ বাড়িতে জল থাকে ধাতব বা প্লাস্টিকের বালতিতে অথবা মাটির বড় মুখওয়ালা জালাতে। বালতি বা জালার মুখ ঢাকা থাকে একটা থালা দিয়ে। জল তোলার জন্য সেই থালার ওপর থাকে একটা মগ কিংবা গ্লাস।

ধরা যাক ঐ বালতিতে টিউবওয়েল থেকে আনা বিশুদ্ধ জল কিংবা নদীর পরিশ্রুত, ক্লোরিন দ্বারা জীবাণুমুক্ত জল রাখা আছে। এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু ঐ জলে যদি মানুষের মল মিশে যায় তবে সে-জল স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চয়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। অবশ্য সরাসরি কেউই পানীয় জলে মল মেশায় না। তবে কিভাবে মেশে তা দেখা যাক।

আমাদের দেশের লোকেরা যত্রতত্র মলত্যাগ করে, মল মাটি চাপা দেয় না। বাড়ির নিকটে খোলা নর্দমায় শিশুরা মলত্যাগ করে, সেই মল শুকিয়ে ধুলোর সাথে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। সেই মলযুক্ত ধুলো আঢাকা খাদ্যে পড়ে, গ্লাস বা অন্য পাত্রে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত সেসকল পাত্রের মাধ্যমে পানীয় জলের সাথে মেশে। মাছি মলে বসে। মাছির শরীরে মল লেগে যায়। সেই মাছি খাবারে বসলে বা জল তোলার মগ বা গ্লাসে বসলে তাতে মল লেগে যায়। শৌচাদি করার পর অনেকে ভাল করে হাত ধোয় না। হাতের নখের মধ্যে মল থাকে। সেই নোংরা হাতে গ্লাস বা মগ ধরে যখন হাত ডুবিয়ে বালতি বা জালা থেকে জল তোলা হয় তখন সমগ্র জল মলমিশ্রিত হয়ে যায়।

যারা পুকুরের জল পান করে তাদের ক্ষেত্রে মলকে এত ঘুরপথে পানীয় জলে যেতে হয় না। পুকুরের একই ঘাটে একজন মলত্যাগের পর জলশৌচ করছে এবং অন্য একজন বাসন মাজছে অথবা পানীয় জল নিয়ে যাচ্ছে—এরকম দৃশ্য গ্রামে প্রায়শই দেখা যায়।

এখন এই মলভক্ষণে কি ক্ষতি হচ্ছে দেখা যাক। আমাদের দেশের যেসকল সাধারণ রোগব্যাধি তার অধিকাংশ হয় এই মলভক্ষণের জন্য। একে ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে Spread of diseases by faeco-oral route অর্থাৎ মলযুক্ত খাদ্যপানীয়ের দ্বারা রোগ-বিস্তার। (Faeces-এর অর্থ মল এবং Oral-এর অর্থ মুখগহ্বর)। এই সব রোগে সারাবছর ভুগে আমাদের জাতি দুর্বল শরীর, উদ্যমহীন, নির্বীর্য হয়ে যাচ্ছে এবং ওষুধ কোম্পানিরা সারাবছর কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। আমাদের সর্বনাশ আর তাদের পৌষমাস!

এবার দেখা যাক, কি কি রোগ এইভাবে হয়। দেখা যাবে এই রোগগুলির কোন-না-কোন একটায় মানুষ বছরে কোন-না-কোন সময়ে অসুস্থ হচ্ছে।

(১) কলেরা—কোন সভ্য দেশে একজনের কলেরা হওয়া সে-দেশের পুরবিভাগ এবং স্বাস্থ্যদপ্তরের লজ্জা। আমাদের দেশে কিন্তু প্রতিবছরই কোন-না-কোন স্থানে এই রোগ হয়।

(২) ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রী—যাকে কাগজের লোকেরা নাম দিয়েছে 'আন্ত্রিক'। Intestine-এর বাঙলা প্রতিশব্দ অন্ত্র, তার থেকে বিশেষণ করে হয় আন্ত্রিক। (একটি বিশেষণ শব্দ কিভাবে একটি রোগের নাম হয়?)

(৩) টাইফয়েড।

(৪) আমাশয়—'এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা' নামক এককোষী প্রাণী দ্বারা হয় এবং এই রোগের ব্যাপ্তি আমাদের দেশে প্রবল। গোটা দেশের স্বাস্থ্যহানিতে এর বিরাট ভূমিকা আছে।

(৫) বড় কৃমি (Round Worm)—গ্রামে পেটমোটা সরু সরু হাত-পাওয়ালা শিশুগুলি এই রাক্ষসের উচ্ছিষ্ট।

(৬) জিয়ার্ডিয়াসিস—এককোষী প্রাণী দ্বারা হয়। খুবই ব্যাপক ব্যাধি।

(৭) ভাইর‍্যাল হেপাটাইটিস—প্রায়শই প্রাণঘাতী হয়।

(৮) পোলিওমায়ালাইটিস—সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে দেয়।

এছাড়াও আরও নানারকম কৃমিজাতীয় রোগ এবং অন্যান্য রোগ মলভক্ষণের ফলে হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে মলভক্ষণ করে এইসব রোগে সারাবছর ভুগে মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলবাহিত হয়েই মল মানুষের পেটে যাচ্ছে। এজন্য কি করণীয়, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

(ক) বালতি বা জালায় পানীয় জল রাখা চলবে না, রাখতে হবে ছোট মুখওয়ালা পাত্রে যাতে প্রয়োজনে জল গড়িয়ে নেওয়া যায়। হাত এবং পাত্র জলে ডুবিয়ে জল যেন না তোলা হয়। খাদ্য যেন আঢাকা না রাখা হয়। বাড়ির চারিদিক আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে যাতে মাছি বংশবৃদ্ধি না করতে পারে।

(খ) টিউবওয়েলের জল অথবা নদী বা হ্রদের পরিস্রুত জল ক্লোরিন দ্বারা জীবাণুমুক্ত করে তা পান করতে হবে।

(গ) কুয়োর মুখ ঢাকা দিতে হবে। পুকুর বা খোলামুখ কুয়োর জল কাপড়ে ছেঁকে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ছোট মুখওয়ালা কুঁজো বা বোতলে রাখতে হবে।

(ঘ) যত্রতত্র মলত্যাগ বন্ধ করতে হবে। মাঠে মলত্যাগ করলে মাটিচাপা দিতে হবে। শিশুদেরও এটা শেখাতে হবে। মলত্যাগের পর পুকুরে জলশৌচ করা নিষিদ্ধ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে নোংরা জল, নর্দমার জল যাতে পুকুরে না পড়ে। পানীয় জলের কুয়োর পঞ্চাশ ফুট ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন কাঁচা নর্দমা যেন না থাকে।

উপরি উক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে জলবাহিত রোগের প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

এপ্রসঙ্গে অন্য একটা সমস্যার কথা আলোচনা করব। এখন মফস্বল শহরগুলিতে এবং গ্রামে গ্রামে সেপ্টিক ট্যাঙ্কের প্রচলন হচ্ছে, যাতে মলকে জীবাণুশূন্য করা যায়। এই ব্যবস্থা খাটা পায়খানার থেকে ভাল। কিন্তু এর ফলে একটা সমস্যা বিরাটভাবে দেখা দিয়েছে। সেপ্টিক ট্যাঙ্কের মধ্যে কোটি কোটি মশার জন্ম হয়। মফস্বল শহরগুলিতে মশার জ্বালায় প্রাত্যহিক জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিকরা মশার শুককীটঘাতী (Larvicidal) জীবাণুর সন্ধান পেয়েছেন। স্বাস্থ্যদপ্তর এবং পুরসভাগুলির উচিত এই জীবাণুর বাণিজ্যিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং মাঝে মাঝে এই জীবাণু সেপ্টিক ট্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়ে মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা।□

অনুষ্ঠান-সূচী (ভাদ্র-আশ্বিন ১৪০৩)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১২ ভাদ্র	বুধবার	২৮ আগস্ট	১৯৯৬
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৯ ভাদ্র	বুধবার	৪ সেপ্টেম্বর	১৯৯৬
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৬ ভাদ্র	বুধবার	১১ সেপ্টেম্বর	১৯৯৬
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২০ আশ্বিন	রবিবার	৬ অক্টোবর	১৯৯৬
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৬ আশ্বিন	শনিবার	১২ অক্টোবর	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৯, ২৩ ভাদ্র	রবিবার, রবিবার	২৫ আগস্ট,	৮ সেপ্টেম্বর	১৯৯৬
৭, ২২ আশ্বিন	সোমবার, মঙ্গলবার	২৩ সেপ্টেম্বর,	৮ অক্টোবর	১৯৯৬

গ্রন্থ-পরিচয়

যুগপ্রবর্তকদের পদপ্রান্তে

জীবন মুখোপাধ্যায়

Great Masters of the World—Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, South 24 Parganas, West Bengal. Page : 4 + 184. Price : Rs. 20·00

ভারতীয় সাধনার অন্যতম মূল কথাই হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ঋষির ধ্যান, দার্শনিকের চিন্তা ও মনীষীর সাধনায় বিবিধের মাঝে মহামিলনের এই আদর্শই প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবাসী বিশ্বাস করেঃ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—সত্য এক, মানুষ তাঁকে নানাভাবে দেখে। বেদ-উপনিষদ্-মহাভারত-গীতা থেকে শুরু করে শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর, দাদূ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব—সকলেই এই একই আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। নবভারতের 'আনন্দমঠ' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধনায় এই আদর্শের সর্বোত্তম ও বলিষ্ঠতম প্রকাশ দেখা যায়। তিনি বলছেনঃ "অমৃতসাগরে যাবার অনন্ত পথ।" "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার, বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার।" এই সমন্বয়ের আদর্শ নিয়েই ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শিক্ষার মূল কথাই হলো সর্বধর্মসমন্বয় ও মানবপ্রেম।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়েও ছাত্রদের 'ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্পর্কে পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাস করতে হয় এবং তা বাধ্যতামূলক। বেদ-উপনিষদ্-গীতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্রদের বাইবেল ও কোরানের পাঠও নিতে হয়। মহাবীর-বুদ্ধ-জরথুস্ট্র-কনফুসিয়াস-মহম্মদ-খ্রীস্ট—সকলের জীবন ও সাধনা সমান গুরুত্বসহ তুলে ধরা হয়। বর্তমান গ্রন্থটি বিদ্যালয়ের ইংরেজী মাধ্যমে পাঠরত ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে অতি সহজ, সরল ও সুন্দরভাবে ইংরেজীর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষদের জীবনসাধনা ও শিক্ষার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জরথুস্ট্র, মহাবীর, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস, খ্রীস্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ—এই তেরজন যুগপ্রবর্তকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের তেরজন কৃতী অধ্যাপক। কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীরাই নয়—সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থটি দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হবেন। প্রাচীন তৈলচিত্র ও ভাস্কর্য থেকে বেশ কয়েকটি চিত্রও গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম অঙ্কিত রামচন্দ্র ও নন্দলাল বসু অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চিত্রও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। মৃণালকান্তি দাস অঙ্কিত প্রচ্ছদটিও যথেষ্ট সুন্দর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এককথায়, গ্রন্থটি সুন্দর ও কাজে লাগার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান

রমা চক্রবর্তী

পরমহংস ও প্রসঙ্গত—সুকুমার দত্ত সম্পাদিত। প্রকাশক : লাকী দত্ত। সেঁজুতি, ৩১।১।১ডি শ্রীকিষেণ ভকৎ লেন, হাওড়া-৭১১১০১। পৃষ্ঠা : ৮+১২০। মূল্য : ২০ টাকা।

'পরমহংস ও প্রসঙ্গত' বইখানিতে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ব্যঞ্জনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র। তাঁদের ব্যক্তি-মানসিকতার ছাঁচে এঁকেছেন এই মহামানবকে। রচনাগুলি বাহ্যতঃ পৃথক হলেও মূলতঃ তাঁদের সমবেত বন্দনায় একটিমাত্র ঐকতানের সুরমূর্ছনাই প্রতিধ্বনিত হয়—শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃপদে আত্মনিবেদনের আর্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দী সার্বিকভাবেই ভারতে নবজাগরণের যুগ। সেইসময় শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে, যা মুহূর্তে উন্মোচিত করেছিল শত শতাব্দীর অজ্ঞানতার কুসংস্কারের অন্ধকার। উচ্চকণ্ঠে তিনি নবযুগের মহামন্ত্র ঘোষণা করলেন "যত মত তত পথ"। এই বাণীর মাধ্যমে

সর্বধর্মের মাঝে তিনি গাঁথলেন মিলনের যোগসূত্র। বর্তমান দিনের সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিও সমাধান করেছিলেন তিনি অতি সহজভাবে—ভক্তিভাবের কবচধারণের নির্দেশদানে। তিনি জানতেন, সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের মন হয়ে উঠেছে ক্রমশই যুক্তিবাদী। তাই প্রাণপ্রিয় 'নরেন'কে দাঁড় করিয়েছেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যুক্তিবাদী মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাঁর প্রতিটি জ্ঞানগর্ভ প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন অতি সহজ, সাবলীলভাবে। তিনি একাধারে খাঁটি ভক্ত, চিন্তাশীল বিজ্ঞানী, আদর্শ শিক্ষক। তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি আমরা দেখতে পাই বইখানির খণ্ড-রচনাগুলিতে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাল্য বসু, স্বপন মিত্র, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ভাবব্যঞ্জনা অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আরও একটি খণ্ড-রচনায় (গৌতম ঘোষ দস্তিদার লিখিত) কথামৃতকারের কথা পাই। রামকৃষ্ণ-ভাবগঙ্গার যোগ্য ভগীরথ শ্রীমর প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কবিতাগুলি আপাতদৃষ্টিতে ভাল হলেও তেমন হৃদয়গ্রাহী হতে পারেনি। স্বদেশ বসু লিখিত 'মনে মনে বলা' কবিতাটি অনবদ্য। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বলে অপূর্ণ থাকে আলোচনা। বইখানির প্রথমেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিটি কিন্তু একেবারেই হৃদয়গ্রাহী হয়নি। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, তিনি অনাদি অনন্ত ভাবময় পুরুষ। তাঁকে মুখে বলা বা ধ্যানে আনা সহজ ব্যাপার নয়। বইটির প্রচ্ছদ এবং বাঁধাই ভাল।

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে বইটির সংযোজন পাঠকবর্গকে খুশি করবে আশা করি।

সাধকের জীবন ও সঙ্কল্প

রমা চক্রবর্তী

পথের দিশারী—অমিয়া দেবী। প্রকাশক: জিতেন্দ্রনাথ সরকার। নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির, সি ২৭, বাঘা যতীন পল্লী, কলকাতা-৭০০০৩২। পৃষ্ঠা: ৮+১৩৮। মূল্য: ৪ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি এক আদর্শ ভক্তের জীবনচরিত। ভক্ত নগেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে ভাবিত এক মহাজীবন। তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির সম্পূর্ণ মোহমুক্ত ছিলেন। স্বামীজীর প্রতি কী গভীর ভালবাসা ও নির্ভরতা তাঁর! এমনকি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাও তিনি করতেন স্বামীজীর দিক থেকেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের আশীর্বাদে ধন্য এই ভক্ত নগেন্দ্রনাথের পূত জীবন। প্রথম জীবনে তাঁর অনুশীলন সমিতি ও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পরে তাদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয়। এসময়ে তাঁর মনে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—মাতৃভূমি না ঈশ্বর? কোন্ পথ তিনি জীবনে অবলম্বন করবেন? দুদিকেই দুর্নিবার আকর্ষণ। কিন্তু তিনি যেটা সত্য বলে বুঝেছিলেন তা ত্যাগ করতে পারেননি। অবশেষে আধ্যাত্মিক জীবনেই মন সমর্পণ করলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীশ্রীমায়েরও দর্শনলাভ করেছিলেন তিনি। প্রখর স্মৃতিশক্তি, চিন্তার মৌলিকত্ব, বাগ্মিতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা প্রভৃতি বহু চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। জীবনে দুটি ভালবাসার বস্তু ছিল তাঁর। এসম্পর্কে নিজমুখে বলতেন, জীবনে তিনি দুটি জিনিস ভালবেসেছিলেন—এক, বিবেকানন্দ—দুই, ফুটবল। তবে প্রথমটিকেই তিনি জীবনের আদর্শ করেছিলেন।

এই গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি—'পথের দিশারী' ও দ্বিতীয় অংশটি—'পথের সন্ধান'। 'পথের দিশারী' অংশে লেখিকা এই সাধকের মহাজীবন ও বাণীর বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ 'পথের সন্ধান'-এ আমরা পাই আধ্যাত্মিক জীবনে চলার পথে অনেক নির্দেশ ও তাঁর কিছু দিব্য অনুভূতি। লেখিকা একটি মহৎ প্রাণ ব্যক্তির জীবন আমাদের সম্মুখে আদর্শরূপে তুলে ধরে তাঁর দিব্য অনুভূতি ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে।

লেখিকা শ্রীমতী অমিয়া দেবী দীর্ঘকাল এই মহাতাপসের সান্নিধ্যলাভে ধন্য করেছিলেন নিজের জীবনকে। নগেন্দ্রনাথের জীবন, বাণী ও সাধারণ মানুষের প্রতি অধ্যাত্মজীবনের নির্দেশ লেখিকা অতি সুন্দর ও সহজভাবে এই গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের অনেককে বলতে শোনা গিয়েছে: "বাপ, মা, ভাই, বন্ধু বা স্ত্রীর কাছেও এত ভালবাসা পাইনি।" □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ছাত্র-কৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক পরিচালিত ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ফল খুবই সন্তোষজনক। নরেন্দ্রপুর, পুরুলিয়া এবং রহড়ার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরেন্দ্রপুরের সব পরীক্ষার্থীই (১২১ জন) প্রথম বিভাগে এবং রহড়ার ২১৪ জনে ২১৩ জন ও পুরুলিয়ার ৯৮ জনে ৯৭ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রের সংখ্যাই বেশি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের স্টার মার্কস (মোট নম্বরের শতকরা ৭৫ ও তার ওপরের নম্বর) প্রাপকদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

আসানসোল—১১৩ জনে ৫৩ জন; **বরানগর**—১৭৩ জনে ৭৩ জন; **কামারপুকুর**—৮১ জনে ২৬ জন; **কাটিহার**—৩৮ জনে ৩ জন; **মালদা**—১৫৩ জনে ৪০ জন; **মনসাদ্বীপ**—৭২ জনে ৭ জন; **মেদিনীপুর**—৬৬ জনে ১৩ জন; **নরেন্দ্রপুর**—১২১ জনে ১০৪ জন; **পুরুলিয়া**—৯৮ জনে ৮৩ জন; **রহড়া**—২১৪ জনে ১৩৭ জন; **রামহরিপুর**—৪৯ জনে ৭ জন; **সারগাছি**—৮০ জনে ১৭ জন; **সরিষা (২টি বিদ্যালয়)**—২১৬ জনে ৩১ জন; **টাকী**—৪৭ জনে ১৩ জন।

দন্তচিকিৎসা-শিবির

পুরী মিশন আশ্রম গত ৬ জুন খুরদা জেলার আসারালা গ্রামে এক দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১২৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

ত্রাণ

গুজরাট বন্যাত্রাণ

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে পঞ্চমহল জেলার নিমচ গ্রামে ৬০০ বন্যাক্লিষ্ট মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়েছে।

রাজস্থান বন্যাত্রাণ

জয়পুর আশ্রম যোধপুর জেলার জলবন্দী গ্রামগুলিতে ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে।

তামিলনাড়ু বন্যাত্রাণ

মাদ্রাজ মঠ মাদ্রাজ শহরের বস্তি এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫০০ জন বস্তিবাসীর মধ্যে ৫০০০ পাউরুটি বিতরণ করেছে।

কেরালা দুঃস্থত্রাণ

কুইল্যান্ডী আশ্রম এই আশ্রমের পার্শ্ববর্তী দুঃস্থ জেলেদের মধ্যে ত্রাণকার্য আরম্ভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

বাঁকুড়া আশ্রমের মাধ্যমে বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের পতিতডাঙা গ্রামের অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি পরিবারকে ২০০ কিলোঃ চাল, ৮৩ কিলোঃ অন্যান্য খাদ্য ও ২২টি কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

উৎসব-অনুষ্ঠান

ময়মনসিংহ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি '৯৬ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপন করে। পূজাপাঠাদি ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বাউল-সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, রামায়ণগান, যাত্রা, নাটক, ব্যায়াম-প্রদর্শন প্রভৃতি। প্রতিদিন আলোচনা-সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনায় স্বামী অক্ষরানন্দজী-সহ বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন প্রায় ৬০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, উৎসব উপলক্ষে ২৬ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজ ইউনিটের সহযোগিতায় আশ্রমে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান-শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে মোট ৩৫ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ গত জুলাই মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় মঙ্গলবার ব্যতীত অন্যান্য মঙ্গলবারগুলিতে 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ'-এর ওপর আলোচনা হয়েছে। ২৭ জুলাই পূজা, বক্তৃতা, স্লাইড শো প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সাধনশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩০ জুলাই যথাযোগ্য মর্যাদায় গুরুপূর্ণিমা পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা, অন্টারিও) ঃ গত জুন মাসের প্রতি রবিবার সকাল ১১টায় বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মাসের দ্বিতীয় ও শেষ শনিবার সন্ধ্যা ৭-৩০টা থেকে যথাক্রমে কঠ-উপনিষদ্ ও স্বামীজীর পত্রাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল) ঃ গত জুলাই মাসের প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ। এছাড়া প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম মঙ্গলবার ভারতীয় দর্শন এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার 'দ্য গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' আলোচিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো ঃ গত জুলাই মাসের প্রথম তিনটি রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন স্বামী গণেশানন্দ, স্বামী প্রপন্নানন্দ এবং সেন্ট লুইস কেন্দ্রের প্রধান স্বামী চেতনানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ২০ জুলাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করেছেন। গত ৬ ও ১৩ জুলাই একই বিষয়ে আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। এছাড়া তিনি এ মাসের প্রথম তিনটি বুধবার সন্ধ্যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ওপর আলোচনা

করেছেন। গত ৩০ জুলাই পুষ্পাঞ্জলি, ভক্তিগীতি, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দান ক্যালিফোর্নিয়া (স্যান ফ্রান্সিস্কো): গত ৩০ জুলাই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা পালন করা হয়। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ক্লাস বন্ধ আছে।

দেহত্যাগ

স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দ (পূর্ণ মহারাজ) গত ৮ জুন ৭টা ৫২ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ঐদিন সকালে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। উপযুক্ত চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে শিলং কেন্দ্রের কর্মী এবং কাটিহার, কিশানপুর ও আলমোড়া আশ্রমের প্রধান ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবসরগ্রহণের পর তিনি রাঁচির মোরাবাদী আশ্রম ও বারাণসী সেবাশ্রমে বেশির ভাগ সময় থাকতেন। সহজ-সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স্বামী মুক্তানন্দ (বনবিহারী মহারাজ) গত ১৫ জুন সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রমে ৯৩ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত একবছর ধরে তিনি বাতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু দেহত্যাগের দু-তিন মাস পূর্ব থেকে মোটামুটি ভালই ছিলেন। দেহত্যাগের দিন সকাল সাড়ে আটটার পর তাঁর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয় এবং কয়েক মিনিট পরেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন।

স্বামী মুক্তানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাঁথি আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি ১৯২৭ থেকে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মেদিনীপুর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন এবং ১৯২৯ থেকে আমৃত্যু তিনি বারাণসী সেবাশ্রমেই ছিলেন। এক বছর আগে অক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে সেবাশ্রম-হাসপাতালের বহির্বিভাগে সেবাকর্মে রত ছিলেন। হাজার হাজার রোগীর ক্ষতস্থান তিনি নিজহাতে ড্রেসিং করেছেন। দয়ালু, নিরহঙ্কার এই প্রবীণ সন্ন্যাসী সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

স্বামী দ্বারকেশানন্দ (জগদীশ) গত ১৫ জুন সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বারাসত জেলা হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। দুর্ঘটনার দিন সকাল ৭-৩০ নাগাদ যখন তিনি সাইকেলে করে বাজারে যাচ্ছিলেন তখন একটি চলন্ত মেটাডোর ভ্যানের সঙ্গে তাঁর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনি গুরুতর আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তাঁর দেহাবসান ঘটে।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য স্বামী দ্বারকেশানন্দ ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে কামারপুকুর আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোম, বেলুড় মঠ, বারাণসী অদ্বৈতাশ্রম ও বারাসত আশ্রমের কর্মী ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিহার ও জলপাইগুড়িতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরলতা ও স্নেহশীলতা ছিল এই তরুণ সন্ন্যাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

স্বামী শ্রীদানন্দ (শ্রীধরণ) গত ১৫ জুন রাত ১টা ৪৫ মিনিটে ত্রিচুর হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। তিনি যকৃতের রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

স্বামী শ্রীদানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ব্যাঙ্গালোর বেদান্ত কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাজ মঠ, কালাডি, মহীশূর, উটি (উতকামণ্ড) কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পোন্নামপেট (কর্ণাটক) কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। তারপর কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ত্রিচুর আশ্রমে অবসর জীবনযাপন করছিলেন। তামিল এবং মালয়ালম ভাষায় তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এই উভয় ভাষাতেই তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সদাপ্রফুল্ল শান্তশিষ্ট প্রকৃতি তাঁকে সকলের নিকট প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ গত ৮ ও ৯ জুলাই 'সারদানন্দ হল'-এ বিকাল ৫-৩০টায় মুণ্ডক উপনিষদের ওপর বিশেষ আলোচনা করেন। দুদিনই প্রচুর শ্রোতার সমাগম হয়েছিল।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।□

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ (কলকাতা-৪) গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারি তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা। ধর্মসভায় আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু, অধ্যাপক দীপক গুপ্ত ও সংঘের সদস্যবৃন্দ। ভক্তিগীতি নিবেদন করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ। 'নির্মাল্য' কর্তৃক পরিবেশিত হয় গীতি-আলেখ্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। তাছাড়া কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ ও রামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ করা হয়।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (কলকাতা-৭০০ ০৩৬) : গত ২০ ফেব্রুয়ারি এই সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকালে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় ও দুপুরে প্রায় ৪০০ জন ভক্ত প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর স্বামী গোকুলেশানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর আলোচনা করেন। এরপর বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর লোকসমাগম হয়।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার **কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—নদীয়া)** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়েছে। সকালে বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ, ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ধর্মসভায় লীলাপ্রসঙ্গপাঠ ও আলোচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী প্রসঙ্গে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন। ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পিগণ।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (জেলা—নদীয়া) : গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারি এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাবোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তিনদিনের অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল গ্রাম-পরিক্রমা, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, কবিগান, রামায়ণগান, ভক্তিগীতি প্রভৃতি। প্রথম দিন দুপুরে চার সহস্রাধিক ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন হাবিবপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সচ্চিদানন্দ। বক্তা ছিলেন বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী সর্ববিদানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দ।

খড়্গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি (জেলা—মেদিনীপুর) গত ২০ এবং ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, কমল ঘোষ ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দের সঙ্গীতাঞ্জলি, গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি। ২৪, ২৫ ও ২৭ ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন স্বামী সারদাত্মানন্দ, স্বামী পরব্রহ্মানন্দ, স্বামী শান্তিদানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। ২৪ ও ২৫ তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে খড়্গপুর শাখার ডিভিশন্যাল রেলওয়ে ম্যানেজার এ. আর. দেশমুখ ও অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী দে।

রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম (জেলা—নদীয়া) : গত ১১ ও ২০ ফেব্রুয়ারি দুদিন এই সেবাসংঘের বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণধন্য কলাইঘাটা গ্রামে। ঐদিন অনুষ্ঠান-সূচীর মধ্যে ছিল সংঘের সদস্যাদের দ্বারা পরিবেশিত সঙ্গীতাঞ্জলি, নাটিকা, হাওড়ার ডোমজুর 'ভক্তদল'-এর কীর্তন এবং আলোচনা-সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী শশাঙ্কানন্দ ও ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। ঐদিন প্রায় ২০০০ গ্রামবাসীকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির দিন সেবাসংঘে সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে দুঃস্থদের মধ্যে ৭০টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। আশ্রমের পক্ষে বস্ত্রগুলি বিতরণ করেন শিখা মাইতি ও দেবী দত্ত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কাঁচড়াপাড়া (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) : গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ এই পাঠচক্রের উদ্যোগে স্থানীয় হরিসভা-প্রাঙ্গণে দুদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কণ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা, গীতাপাঠ, গীতি-আলেখ্য, প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের কাগজ-বিতরণ প্রভৃতি। দ্বিতীয় দিন দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। উভয় দিনই ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের ওপর বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা সোমপ্রাণা ও ডাঃ নমিতা দত্ত। দ্বিতীয় দিন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ ও স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (শরৎ কলোনী, কলকাতা-৭০০ ০৮১) গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ তারিখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। দুইদিনের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ছিল

পূজা, ছাত্রছাত্রীগণের প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং ধর্মসভা। ধর্মসভায় সারদাদেবী সম্বন্ধে প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ আলোচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, ঘাটশিলা (জেলা—সিংভূম, বিহার) ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা ও হোম এবং ভজন-কীর্তনে সারাদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। কয়েকজন জার্মান ভক্ত-সহ স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ও বিহার সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই উৎসবে যোগদান করেছিলেন। দুপুরে প্রায় ১৫০০ ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি (জেলা—বর্ধমান) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে। ঐদিন সকালে ৫০০ ছাত্রছাত্রী, যুবক-যুবতী ও ভক্তবৃন্দের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। অংশগ্রহণকারীদের টিফিন দেওয়া হয়। দ্বিপ্রহরে ১২টা থেকে ৪-৩০ পর্যন্ত ৬০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে যোগদান করেছে এবং প্রসাদ গ্রহণ করেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, নবগ্রাম (জেলা—হুগলী) ঃ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব-উৎসব স্থানীয় সত্যভারতী-প্রাঙ্গণে পালিত হয়েছে। পূর্বদিন বিকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নবগ্রাম পরিক্রমা করে। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সকালে মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম প্রভৃতি। দুপুরে প্রায় দেড়সহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ। দিলীপ দে ভক্তিগীতি এবং শিবপুর 'প্রফুল্লতীর্থ' গীতিনাট্য পরিবেশন করে। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। বক্তব্য রাখেন পাঠমন্দিরের সম্পাদক অজিত ঘোষাল, সাহিত্যিক হর্ষ দত্ত এবং স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ। ঐদিন বার্ষিক স্মারক পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি আশ্রম, খেপুত (জেলা—মেদিনীপুর) ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৬১তম শুভ আবির্ভাবতিথিতে আশ্রমে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সীমিতসংখ্যক ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় কীর্তন পরিবেশন করেন অমরেন্দ্রনাথ বেরা ও সম্প্রদায়। এ উপলক্ষে ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বামী শান্তিদানন্দ বিকালে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ '৯৬ **সাঁত্রাগাছি (জেলা—হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের** উদ্যোগে যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ও সংঘের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ। দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্তের মধ্যে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। ২ মার্চ সংঘের বার্ষিক উৎসবের দিন বিকালে ধর্মসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তা ছিলেন স্বামী যোগস্বরূপানন্দ। সভার শেষে স্বামী ক্ষেমানন্দের পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' পরিবেশিত হয়।

বলরামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মঠ (জেলা—মেদিনীপুর) গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম শুভ জন্মতিথি নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি ছাড়াও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাগত ভক্তদের সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর ভজন-সঙ্গীতের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

তিলজলা শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৩৯) ঃ বিগত ৩ মার্চ সারাদিন ধরে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে প্রচুর ভক্তসমাগম হয়েছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় ১০০০ ভক্তকে বসিয়ে অন্নপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে একখানি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। কথামৃতপাঠ এবং কথায় ও গানে শ্রীমদ্ভাগবত পরিবেশন করেন দীপক গুপ্ত ও নবব্রত ব্রহ্মচারী। সায়াহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর আলোচনা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ এবং স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। 'সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন নিতারঞ্জন মণ্ডল।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম শুভ আবির্ভাব-তিথি গত ৩ মার্চ '৯৬ উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে বালকভোজন ও দুপুরে আনুমানিক ১০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও চন্দননগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সাধনানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ওপর আলোচনা করেন। আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং পুতুণ্ডা নিম্ন-বুনিয়াদী স্কুলের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ, ভাঙড় ঃ গত ২৪ মাঘ ১৪০২ সংঘের উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে পূজা, হোম, পাঠ, লীলাকীর্তন ছাড়াও আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ৭৪ জন ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন সংঘের সভাপতি জয়দেব সাধুখাঁ, বিশিষ্ট অতিথি ও বিশেষ বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে ডাঃ সুধীরকুমার রায়

এবং **কৃষ্ণকান্ত দত্ত**। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠায় শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই দিন তিনি বেলুড় মঠের অনুমোদিত সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রামসেবা সংস্থার পরিচালনায় সংঘ কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪৯ জন শিক্ষার্থীকে অভিজ্ঞানপত্র প্রদান করেন।

ভাবপ্রচার পরিষদের সম্মেলন

উত্তর ২৪ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ গত ২৬ মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ন্যাশনাল মিশনে (বনগাঁ) পরিষদের ৪র্থ ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮টি আশ্রমের মোট ৮৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিনিধি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সকল আশ্রমের সাথে সমন্বয় ও যোগসূত্র স্থাপন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ভাষণ দেন। সভায় কয়েকটি আশ্রমকে পূর্ণাঙ্গ সদস্য ও পর্যবেক্ষক সদস্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে ভাষণ দেন পরিষদের সভাপতি স্বামী অমলানন্দ, স্বামী মহেশানন্দ ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ।

রক্তদান-শিবির

বিবেকানন্দ যুব পরিষদ্ (টালীগঞ্জ, কলকাতা-৩৩) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় পুরনো কলাবাগান বাজারে এক স্বেচ্ছা রক্তদান-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে মোট ২৯ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করে। শিবিরটি উদ্বোধন করেন পরিষদের সভাপতি প্রণবেশ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৮৪নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌরপিতা প্রণব মুখার্জী।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টারের (লন্ডন) উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ঐদিন বিভিন্ন শাস্ত্র এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে পাঠ, ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। তাছাড়া উপস্থিত অনেক ভক্ত স্বামীজীর ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ স্বামীজীর ১৩৩তম জন্মোৎসব পালিত হয় ইস্ট লন্ডন ডাভেনান্ট সেন্টারে। এই উপলক্ষে আলোচনা-সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দ অ্যান্ড ইউনিভার্স্যাল হিউম্যানিটি' শীর্ষক আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ন এন্ড (বাকিংহামশায়ার) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী দয়াত্মানন্দ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য সাইমন হিউজেস, লন্ডন বিশপের অ্যাডভাইসার রেভারেন্ড জন ওয়েবার, টাওয়ার হ্যামলেটস-এর মেয়র গুলাম মুর্তাজা, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার-এর স্টীফেন ওয়াটস এবং অ্যান্ড্রু ওয়ারহ্যাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক গান, আবৃত্তি-সহ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং যীশুখ্রীস্ট বিষয়ে নাটিকা অভিনীত হয়। গত ৩১ মার্চ ও ২০ এপ্রিল মাসিক অনুষ্ঠান হয়। মাসিক অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র পাঠ, গীতাপাঠ, কথামৃত, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাণী থেকে পাঠ, ভক্তিমূলক গান ও আরতি হয়। এছাড়া স্বামী দয়াত্মানন্দও মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান-শেষে ভক্তদের আনা রান্নাকরা প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি মাসেই সেন্টারে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়।

[সংবাদদাতা : রামচন্দ্র সাহা, লন্ডন]

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা নববারাকপুর-নিবাসিনী **স্নেহময়ী মজুমদার** গত ২৫ জানুয়ারি '৯৬ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। গুরু-নির্দেশিত পথে পরম নিষ্ঠা ও আদর্শের এক অসাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন তিনি। জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজো তিনি নিজের হাতে করেছেন। তিনি নববারাকপুর শ্রীসারদা সংঘের সভানেত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **জ্যোৎস্না বসু** গত ১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ সকাল ৯টা ১০ মিনিটে কলিকাতাস্থ শ্যামবাজারের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। পিতৃবংশের সম্পর্কে বলরাম বসুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বলরাম মন্দির ও মায়ের বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়** গত ২৩ জানুয়ারি '৯৬ সন্ধ্যা ৭টায় করজপরত অবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। তিনি আমৃত্যু 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন। বহু সাধু-সন্ন্যাসীর তিনি স্নেহভাজন ছিলেন।

গত ২৯ জানুয়ারি দুপুর ১টা ২০ মিনিটে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **রঞ্জিত কর** তাঁর ঠাকুরপুকুরের বাসভবনে সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বাল্যকাল থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠায় তিনি আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ছিলেন। নিঃসন্তান প্রয়াত কর ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পাকস্থলীতে ঘা বন্ধ করার টিকা

আমেরিকার কর্তৃপক্ষের হিসাবমত, সেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের পাকস্থলীতে সক্রিয় (active) ঘা (পেপটিক আলসার—পাকস্থলী ও তার সংলগ্ন ডিয়োডিনাম অংশে ক্ষত) আছে এবং প্রতিবছর সাড়ে তিন লক্ষ লোকের এই ঘা ধরা পড়ে। প্রতিবছর ছয় লক্ষের বেশি লোক এই ঘায়ের বাড়াবাড়ি অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়—অনেকের অন্ত্রনালী বন্ধ হওয়ার জন্য, কারো ঘা থেকে রক্তপাত হওয়ার জন্য, কারো বা ঘায়ের জায়গায় ফুটো হওয়ার জন্য। জনসংখ্যার মোটামুটি দশ শতাংশের জীবনে কোন সময়ে এই অসুখ দেখা যায়। সমগ্র জনসংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশের পাকস্থলী হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি বা এইচ. পাইলোরি (H. Pilori) নামক জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। অন্যান্য দেশে সংক্রামিতের সংখ্যা আরও বেশি। জাপান, জার্মানি এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই জীবাণু-সংক্রামিতের সংখ্যা আমেরিকার সংখ্যার দ্বিগুণ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় প্রত্যেক লোকই কম বয়সে এই জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। শেষোক্তদের পেপটিক ঘা এবং পাকস্থলীতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। উদাহরণস্বরূপ জাপানে পাকস্থলীতে ক্যানসারজনিত মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা ৮ জনের, যেখানে আমেরিকায় এই সম্ভাবনা শতকরা ০.৮ জনের।

আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্থ (এন. আই. এইচ.), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং সারা বিশ্বের চিকিৎসক সম্প্রদায় মেনে নিয়েছেন যে, পেপটিক আলসারের প্রধান কারণ হলো এই এইচ. পাইলোরি জীবাণু। সাধারণ লোকের চেয়ে এই জীবাণু-সংক্রামিতদের পেপটিক ঘা হওয়ার সম্ভাবনা বারগুণ। হিসাবমত ধরা হয় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক লোক এই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। যদিও এইচ. পাইলোরি সংক্রান্ত অসুখ অধিক বয়সে প্রকাশ পায়, বেশির ভাগ লোকেরই এই জীবাণুর সংক্রমণ হয় শৈশবে। সেজন্য এই জীবাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি (immunisation) এখন একটা বিরাট কাজ বলে পরিগণিত হবে। হিসাবে বলা হয় যে, কেবল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পেপটিক আলসার চিকিৎসায় খরচ হয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার এবং সারাজগতে খরচ হয় দশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি জীবাণুর সংক্রমণ হলে তার চিকিৎসার জন্য, একবার সংক্রমণ হলে তার পুনঃসংক্রমণ বন্ধ করার জন্য এবং যাদের সংক্রমণ হয়নি তাদের শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য একটি খাওয়ার টিকা (oral vaccine) তৈরির ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি হয়েছে এবং এই প্রচেষ্টায় যৌথভাবে আছে 'ওরা ভ্যাক্স ইনকরপোরেটেড (কেমব্রিজ এম. এ.)' এবং পৃথিবীর বৃহত্তম টিকা তৈরির সংস্থা হচ্ছে ফ্রান্সের 'প্যাস্তুর-মেরিয়াস সিরাম অ্যান্ড ভ্যাকসিন'। এই দুই সংস্থার মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে, তারা এইচ. পাইলোরি জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা তৈরি করবে; এই জীবাণু আলসার, গ্যাসট্রাইটিস এবং পাকস্থলীতে ক্যানসারের প্রধান কারণ বলে সকলে সহমত হয়েছে। রোগীর দেহে পরীক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা (clinical trial) হিসাবে ১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে সুইজারল্যান্ডের লুসেন-এ প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা (Phase I) শেষ হয়েছে; দ্বিতীয় পর্যায়ের (Phase II) পরীক্ষা একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে সুইজারল্যান্ড ও ইউনাইটেড স্টেটস-এ ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে।

এইচ. পাইলোরি পাকস্থলীর নালীর চারিধারে সামান্য ভিতরদিকে জীবকোষে (gastric epithelium) বাসা বাঁধে এবং একবার বাসা বাঁধলে তারা রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকে। ঘা না হলেও সামান্য গ্যাসট্রাইটিস-এ এইসব রোগী ভোগে, যদিও এদের হয়তো ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। যাদের এসব জীবকোষগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তাদের মধ্যে ১০-২০ শতাংশের ঘা দেখা দেয়। এদের চিকিৎসায় সাময়িক উপকার হয়, তবে চিকিৎসা বন্ধ করলেই রোগ-লক্ষণ দেখা দেয়। ঘা হলেই যে ক্যানসার হবে তা নয়, তবে অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, ক্যানসারের সঙ্গে এইচ. পাইলোরি জীবাণুর সম্পর্ক আছে। অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে জীবাণুগুলিকে সাময়িকভাবে মেরে ফেলা যায়, তবে টিকার সাহায্যে রোগীর শরীরে রোগপ্রতিহত করার ক্ষমতা তৈরি হবে। তাছাড়া এই জীবাণুকে অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে মেরে ফেলার পরে ভবিষ্যতে আবার এই জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। টিকার অনেক গুণ ঃ খাওয়ান সহজ, এতে অ্যান্টিবায়োটিককে প্রতিহত (antibiotic resistance) করার কথা ওঠে না এবং অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেমন হয়, সেরূপ অন্য কোন কুফল শরীরে সৃষ্টি হয় না। এই টিকা তৈরি হলে শুধু যে বিশ্বের লোক একটা জীবাণু-সংক্রমণ থেকে মুক্ত হবে তা নয়, একটা বড় ধরনের ক্যানসার—পাকস্থলীর ক্যানসার থেকেও মুক্ত হবে। **[Express Pharma Pulse, 18 April 1996, p. 2]**□

শারদীয়া সংখ্যা

উদ্বোধন

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধ





বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১



আবেদন

সুধী,

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই মহামন্ত্রকে আলোকবর্তিকার মতো সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয় বেলুড় মঠে অবস্থিত। ১৯১৪ সালে জগজ্জননী সারদাদেবীর সম্মতিক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ মালদায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁরই প্রেরণায় এই অঞ্চলে এক মহৎ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, যার ফলস্বরূপ ১৯২৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মালদা বেলুড় মঠের এক শাখাকেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেসময় থেকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, মালদা শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবামূলক কাজে নিরলসভাবে ব্রতী।

বিগত কয়েক বছরের বন্যায় মালদা মঠের পুরনো মন্দির ভগ্নদশায় পরিণত। ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে নতুন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী ১ জুলাই ১৯৯৩ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আনন্দের বিষয়, এই মন্দিরের বাস্তব রূপায়ণের শুভারম্ভ হয় ১১ নভেম্বর ১৯৯৪ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার পুণ্যদিনে। ঠাকুরের অসীম কৃপায় এবং সাধু-সন্ত, ভক্তবৃন্দ ও সহৃদয় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় মন্দির-নির্মাণের কাজ ঠিকমত চলছে। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে আমরা মন্দিরের কাজ ত্বরান্বিত করতে ইচ্ছুক। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তি (১৯৯৭-১৯৯৮) উদ্‌যাপনের শুভ অবসরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ভক্তচিত্তে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।

এই মহৎ ও শুভ কর্মযজ্ঞে সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই। অনুগ্রহ করে আপনার দান নগদে, মনি অর্ডারে, ড্রাফট/চেকের মাধ্যমে RAMAKRISHNA MATH, MALDA -TEMPLE CONSTRUCTION -এই নামে পাঠাতে অনুরোধ করি। **আপনার সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।**

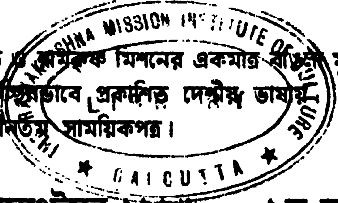
সকলের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

ইতি
বিনীত

স্বামী মঙ্গলানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ
মালদা-৭৩২১০১

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।



সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ আশ্বিন ১৪০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ ৯ম সংখ্যা

[পরপৃষ্ঠায়]



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেসারে অক্ষরবিন্যাস ও অলঙ্করণে ঃ বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) সাধারণ গ্রাহকমূল্য ঃ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬০ টাকা ; সডাক—৭০ টাকা □ আলাদাভাবে কিনলে—বর্তমান সংখ্যার মূল্য □ ৩৬ টাকা □ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □ ৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)

প্রচ্ছদ

কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির বড় তরফের ঠাকুরদালানে পূজিতা মহিষাসুরমর্দিনী। এই পূজা ২৩৯ বছরের প্রাচীন। আলোকচিত্রটি গতবারের (১৯৯৫) দুর্গাপূজার। ১৭৫৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণ দেব শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম এই একচাল-বিশিষ্ট দুর্গাপ্রতিমার পূজা প্রবর্তন করেন। রাজবাড়ির ঠাকুরদালানটি এই উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। লর্ড ক্লাইভ সপারিষদ এই পূজায় যোগদান করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ বিকাল ৪টায় শিকাগো ধর্মমহাসভা প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দকে কলকাতায় প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল শোভাবাজার রাজবাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সেই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার শতবর্ষ পূর্ণ হচ্ছে।—সম্পাদক, উদ্বোধন

আলোকচিত্র—দাসানুদাস সাহা (১এ, কুমারটুলি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৫। ফোন ঃ ৫৫৪-১১২৫)



প্রায় দু'শো বছরের প্রাচীন শ্রীনাথ দাসের বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা। সেকালের প্রখ্যাত আইনজীবী, গণিতজ্ঞ ও ধনাঢ্য জমিদার শ্রীনাথ দাসের বউবাজারের সুবৃহৎ বাসভবনে (১০, শ্রীনাথ দাস লেন, কলকাতা-৭০০০১২) এসেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাস্টিস স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রমুখ।



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র
বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৯তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৩—পৌষ ১৪০৪/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৭

☐ মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে আগামী বর্ষের (৯৯তম বর্ষ ঃ ১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর মধ্যে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। টাকা দেরিতে জমা পড়লে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ ঃ ৬০ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ ঃ ৭০ টাকা

☐ বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩২৫ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬৫০ টাকা (বিমানডাক) ☐ বাংলাদেশ—১৩০ টাকা

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ঐবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। একমাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ডাকে দেওয়ার অন্ততপক্ষে একমাস আগে পিন কোড-সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে।

☐ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেই তবে ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

☐ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।

☐ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

উদ্বোধন

আশ্বিন ১৪০৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

দিব্য বাণী



(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, (তারে) জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

রামপ্রসাদ

আজু মন্দিরে ওমা! শঙ্করী শঙ্কর পেয়ে।
পূজয়ে ভকতবৃন্দ, জবা সচন্দন দিয়ে॥
আনন্দিত নর-নারী সবে পুলকিত হিয়ে।
মগন ভকতগণ, সদা ডাকে মা বলিয়ে॥
সুরাসুর নাগ্ন নর, নাচে উল্লসিত হয়ে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, তব মুখ নিরখিয়ে॥
মহাপাপী দুরাচারী, নিস্তারিল নাম লয়ে।
পতিত কমলাকান্ত রহিল চরণ চেয়ে।

কমলাকান্ত

৯৮তম বর্ষ—৯ম সংখ্যা





আনন্দময়ী

"আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে!" পূজা আসিয়া গেল। চারিদিকে টগর ও শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস। খাল-বিলের ধারে, রেললাইনের দুপাশে মাঠ জুড়িয়া শুভ্র কাশের উদার সমারোহ। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের দিগন্তবিস্তার অপরূপ শোভা। নির্মেঘ সুনীল আকাশ। কখনো-বা ঐ নীলাকাশের এখানে-ওখানে শুভ্র মেঘখণ্ডের কিঞ্চিৎ সমাবেশ। বাড়ির গায়ে, গাছের পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের বুকে সকালের রোদের অদ্ভুত এক সোনা রঙ। বাতাসে হালকা শীতের মিষ্টি আমেজ। পথঘাটমাঠ বর্ষার একঘেয়ে বৃষ্টি-বাদলের ক্লান্তি-বিরক্তিকর আক্রমণ হইতে প্রায় মুক্ত। কখনো-সখনো মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশ হইতে অকস্মাৎ এক পশলা লঘু বর্ষণ। আকাশ-বাতাস দূষণের ভারমুক্ত। বুক ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতে নির্বাধ স্বাচ্ছন্দ্য। বৃষ্টিধোয়া প্রকৃতির সর্বাঙ্গে যেন সদ্যস্নানের শান্ত শ্রী ও স্নিগ্ধতা। সদ্যস্নানের পর পূজারিণীর মতো শান্তভাবে শুদ্ধবস্ত্রে প্রকৃতি যেন অপেক্ষমাণা। দোয়েল, শ্যামা, ফিঙের কণ্ঠে বুঝি আগমনী-গান।

শারদ শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা

বাঙালীর পরম আকাঙ্ক্ষিত শারদ উৎসব সমাগত। এই শুভলগ্নে আমরা 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে যুক্ত সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা—উৎসবের দিনগুলি যেন আমরা শান্তি ও আনন্দে, প্রীতি ও শ্রদ্ধায়, সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ে অতিবাহিত করিতে পারি। আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে পারি। আমাদের মনুষ্যত্বকে যেন জাগ্রত রাখিতে পারি। মা আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আবহমান কাল ধরিয়া প্রকৃতির এই প্রস্তুতিতে কোন হেরফের নাই। প্রকৃতির এই পরিবেশ, এই সজ্জা, এই প্রস্তুতি মায়ের আবাহনের জন্য। সম্বৎসর পরে আবার মা আসিতেছেন। তিনি আমাদের পূজা লইবেন। আমাদের গৃহাঙ্গনে পড়িবে তাঁহার আলতা-রাঙানো চরণের আলপনা। শিবগৃহিণী, হিমালয়-মেনকার আদরের কন্যা উমা যে আমাদের সকলের মা। মায়ের সঙ্গে আসিবেন তাঁহার দুই কন্যা এবং দুই পুত্র। সিংহবাহনা মহিষমর্দিনী শঙ্করপ্রিয়া আসিবেন পিতৃগৃহে। মায়ের পিতৃগৃহ তো হিমালয়ে। হিমালয়-মেনকার রাজপ্রাসাদে। কিন্তু হিমালয় হইতে এত দূরে এই শস্য-শ্যামলা বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহার আগমনে কেন এত উন্মাদনা? কেন এখানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এত উদ্দীপনা? কেন সকলের এত আকুলতা? কেন বাংলার ঘরে ঘরে মায়েদের মনে শ্বশুরবাড়ি হইতে বিবাহিতা কন্যার আগমনের আনন্দের অনুভূতি? কেন বাংলার ঘরে ঘরে কন্যাবিরহী পিতৃহৃদয়ের গভীরে বাৎসল্যের উৎসমুখটি এমন রসোধারায় উদ্বেল? কেন এখানকার যুবক-যুবতীর প্রাণে, কিশোর-কিশোরীর মনে মাকে দেখিবার জন্য, মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিবার জন্য এত অধীর ব্যগ্রতা? কেন এখানকার ধনীর গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে মায়ের আগমন উপলক্ষে এত স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস? কেন পটুয়া ও কারিগরের মুখে, বায়েন-বাজনদারের মুখে, পসারি-দোকানদারের মুখে, সবজি-ওয়ালা ও মাছওয়ালার মুখে, হালুইকরের মুখে, কর্মকারের মুখে, এমনকি ভিক্ষুকের মুখে আনন্দের এত বর্ণচ্ছটা?

এই 'কেন'-র উত্তর আমরা জানি না। কিভাবে ইহা হইল তাহাও জানি না। শুধু জানি ইহা হইয়াছে—ইহা ঘটনা। প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উৎসব অবশ্যই আছে। কিন্তু দুর্গাপূজার—শুধু 'পূজা' বলিয়াই যাহার প্রসিদ্ধি এবং পরিচিতি—মতো এমন অন্তরস্পর্শী উৎসব, এমন স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব আর কোন সম্প্রদায়ের আছে কী? 'পূজা'—এই শব্দটি চিন্তা অথবা উচ্চারণ মাত্র আমাদের হৃদয়ে যেমন ধ্বনি ওঠে অন্য কোন সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তম উৎসবে সেই সম্প্রদায়ের মানুষের অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয় কী? হয়তো হয়—নাকি হয় না?

মা হয়তো হিমালয়-দুহিতা, লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের মা। কিন্তু তিনিই আবার আমাদের সকলের ঘরের মেয়ে, সকলের বাড়ির মা। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"মা বলিতে

প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।" কথাগুলি যে এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা আমরা সকলে মায়ের পূজার সময় অন্তরে অন্তরে অনুভব করি। জমিদারের চক্রান্তে বাস্তুচ্যুত উপেনের জন্মপল্লী সম্পর্কে অনুভূতিকে রবীন্দ্রনাথ ঐভাবে লিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু মায়ের আগমনের প্রাক্কালে আমাদের সকলের অনুভূতি সম্পর্কেই যেন কথাগুলি বেশি প্রযোজ্য। 'মা আসিতেছেন', 'মা আসিবেন', 'মা আসিয়াছেন'—এই চিন্তা যে কী অবর্ণনীয় এক অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চার করে তাহা শুধু আমরাই জানি।

'চণ্ডী'তে মায়ের যে-বর্ণনা, মায়ের যে-কীর্তিকাহিনীর কথা আমরা পাই তাহাতে মায়ের সঙ্গে তো আমাদের এইরকম সম্পর্ক হওয়ার কথা নহে। উপরন্তু দেবতা এবং মানুষের মধ্যে যে সম্ভ্রম, ভীতিজনিত ব্যবধান থাকে সেই ব্যবধানই তো থাকার কথা। আবার মা শুধু সাধারণ দেবতা নহেন—সমস্ত দেবতার তেজোসম্ভূতা, সমস্ত দেবতার শক্তিসমন্বিতা, সর্বশক্তির অধীশ্বরী তিনি। মহাশক্তিধর পুরুষ দেবতারা যাহাদের দমন করিতে পারেন নাই, বরং যাহাদের কাছে তাঁহারা যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াছেন, সেই ত্রিভুবনত্রাস ত্রিভুবনবিজয়ী মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর দানব-অধিপতিদের সম্মুখ-সমরে তিনি পর্যুদস্ত ও বিনাশ করিয়াছেন। রণচণ্ডী সেই মহাদেবী কেমন করিয়া কখন আমাদের ঘরের মা-টি হইয়া পড়িলেন তাহা সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ঘটনা হইল এই যে, স্বর্গের অধরা দেবী, অসুরনাশিনী দেবী দুর্গা মর্তে বাঙালীর ঘরে ঘরে আপন মা হইয়া ধরা দিয়াছেন। ধরা পড়িয়াছেন। দেবী এবং জননীর এই সম্মিলন—এই মাখামাখি হইয়া যাওয়া, ইহা কেবলমাত্র বাংলার এবং বাঙালীর নিজস্ব ঐতিহ্য। ভারতের কোথাও, পৃথিবীর কোথাও দেবতা ও মানুষের এরূপ আটপৌরে ঘরোয়া মধুর সম্পর্ক আছে কী? সম্ভবতঃ নাই।

মা একা আসেন না, তাঁহার সঙ্গে আসেন তাঁহার বাহন সিংহও। আসেন সবাহন তাঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যাও। অর্থাৎ একেবারে সপরিবারে মায়ের আগমন। সাক্ষাৎভাবে শিব এযাত্রায় মায়ের সঙ্গী হন না ঠিকই, কিন্তু শিবকেও আমরা ভুলি নাই। তিনি আছেন মায়ের পিছনে চালচিত্রের কেন্দ্রস্থলে। অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে মায়ের সঙ্গে বাবাও রহিয়াছেন। আর রহিয়াছেন 'তেত্রিশ কোটি' সশক্তিক দেবতা। অর্থাৎ মায়ের সঙ্গে আমরা আমাদের ধূলির ধরণীতে সমস্ত স্বর্গটাকেই আনিতে চাহিয়াছি। মায়ের আগমনে স্বর্গই তো আসিয়া নামে আমাদের এই পৃথিবীতে। যেখানে মায়ের অবস্থান সেখানেই তো স্বর্গ। সেখানেই দেবতার লীলাভূমি। সেখানেই সমন্বিত সমগ্র দেবশক্তি। মহিষাসুরকেও মা সঙ্গে রাখিয়াছেন। মায়ের পদতলে শরণাগত মহিষাসুর। মায়ের পাদস্পর্শে তাহার অসুরত্ব বিনষ্ট হইয়া দেবত্ব জাগ্রত হইয়াছে। অর্থাৎ মহিষাসুরও দেবতা হইয়া গিয়াছে। মায়ের সঙ্গে তাই সেও পূজিত হয়।

'দেবতা' শব্দের অর্থ জ্যোতিষ্মান। কিসের জ্যোতি? অন্তর্জ্যোতি। অন্তরের জ্যোতি। অন্তরের আলো। এই আলো যখন জ্বলে তখন মনে হয় জগতের সবকিছু আলোয় আলোময়। কোথাও অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। বস্তুতঃ, আলোর যেখানে অবস্থান সেখানে অন্ধকার তো থাকিতে পারে না। আলোর অর্থই হইল অন্ধকারের বিনাশ। আলো মানুষকে আনন্দ দেয়। অন্ধকারকে আমরা কেহই ভালবাসি না। অন্ধকারকে আমরা ভয় পাই। অন্ধকারকে আমরা ঘৃণা করি। যে বা যাহারা মানুষের জীবনকে দুঃখময় করিয়া তোলে, যন্ত্রণাময় করিয়া তোলে, রক্তাক্ত করিয়া তোলে তাহাকে বা তাহাদের আমরা বলি "অন্ধকারের জীব"—বলি "অন্ধকার জগতের অধিবাসী"। মা আমাদের সকলের অন্তরের আলোকসত্তা, আর মহিষাসুরাদি দানব আমাদের অন্তরের অন্ধকারময়তা। আলোর গর্ভে অন্ধকারের অন্তর্ধান। অন্ধকারের অন্তর্ধানে আনন্দের আবির্ভাব।

আলো আর আনন্দ সমার্থক বলিয়াই তো আনন্দে আমাদের মুখ আলো হইয়া যায়। আনন্দ আমাদের ভিতরের তমিস্রাকে দূর করিয়া আমাদের উদ্ভাসিত করে। আমরা জ্বলিয়া উঠি অন্তর্জ্যোতিতে। এই আনন্দের সন্ধান জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মানুষের চিরন্তন আকুতি। মায়ের আগমনে, মায়ের আগমন-প্রতীক্ষায় আমরা সেই আনন্দকেই খুঁজি। আনন্দের শেষ নাই। স্থান কাল মানুষে তাহা সীমাবদ্ধ নহে। মাকে লইয়া আমাদের আনন্দ সেইজন্যই তো বাঁধভাঙা। সেইজন্যই তো এই আনন্দের অনুভূতি সকলের হৃদয়ে শিহরণ তুলে। কারণ, মা-ই তো আনন্দের উৎস। মা তাই আনন্দময়ী। আমাদের মনের সকল আবিলতা দূর করিতে, সকল দুঃখ ঘুচাইতেই যে তাঁহার আগমন। দুঃসহ দুঃখকে হরণ করেন বলিয়াই তো মায়ের নাম 'দুর্গা'।

আজ আমাদের চারিদিকে গভীর নৈরাশ্যের জমাট বাতাবরণ। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অশ্রদ্ধা, অসত্য, দুষ্কর্ম আজ আমাদের ঐতিহ্যকে গ্রাস করিতে চলিয়াছে। এই সমস্তই আজ আমাদের 'জাতীয় সংস্কৃতি'তে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা ও হিংসার অবাধ বিস্তার আজ আমাদের মধ্যে। মানুষের কোমল ও সুকুমার বৃত্তি দ্রুত অবলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। নীতি ও মূল্যবোধের অনুশীলন আজ

চূড়ান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। গোটা সমাজ ক্রমশই চরম অবক্ষয়ের গভীর তলে নিমজ্জিত হইতেছে।

অবশ্য এই সমাজেও মায়ের পূজা বন্ধ হয় নাই। বরং পূজায় এখন আড়ম্বর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলোর রোশনাইয়ে, মণ্ডপসজ্জার জাঁকজমকে চোখ ধাঁধাইয়া যাইতেছে। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া নিত্য-নূতন বৈচিত্র্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া চলিয়াছে। তাহার খেসারত দিতে চাঁদার জুলুমে নাগরিকবৃন্দের নাভিশ্বাস উঠিতেছে। শব্দদূষণের সরকারি সতর্কতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, পুরনিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষের সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নকে উপেক্ষা করিয়া যত্রতত্র মণ্ডপ বাঁধিয়া, মাইকে উচ্চরবে চটুল গান বাজাইয়া পূজার নামে কুৎসিত রুচি ও কদর্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ হইতেছে। রাজনীতি, অশ্লীলতা, অসভ্যতা আজ বহু পূজা-প্রাঙ্গণের পরিবেশকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। বহু সর্বজনীন পূজাপ্রাঙ্গণেই এই ছবি আজ প্রায় সর্বজনীন। শহরের আবাসনগুলির পূজায় শ্রদ্ধা, সুরুচি ও নিষ্ঠার ভাব কিছুটা থাকিলেও সেখানে উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পুরুষদের দর্শন পাওয়া যায় শুধু সমবেত আহার (এই উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কারণ, আবাসনের সকল বাড়িতে যে তখন অরন্ধন!) এবং নৈশ বিনোদনের আসরে। দুঃখের বিষয়, মুষ্টিমেয় পারিবারিক পূজাগুলিতেও সেই শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ ক্রমেই হারাইয়া যাইতেছে।

আনন্দময়ীর আগমনকে উপলক্ষ করিয়া এ কোন্ নিরানন্দের পঙ্কে সমাজকে ডুবাইবার অপচেষ্টা? মায়ের আগমন আমাদের উত্তোলন করিবার জন্য। কিন্তু মাকে সম্মুখে রাখিয়া এ কোন্ অবক্ষয়ের গর্ভে আমরা তলাইয়া যাইতেছি? মায়ের পূজার আদি, মধ্য ও অন্ত জুড়িয়া যে গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অন্তর্লীন তাহা আমরা বিস্মৃত হইতেছি। পূজা যে আমাদের মহান সংস্কৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহাও আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। নূতন প্রজন্ম এবং বিদেশীরা পূজার নামে এই অপসংস্কৃতিকেই আমাদের সংস্কৃতি বলিয়া ভাবিতেছে। ইহা কি আমাদের পক্ষে চরম লজ্জা ও অগৌরবের বিষয় নহে?

লক্ষ লক্ষ টাকা মণ্ডপসজ্জায়, আলোকসজ্জায় এবং তথাকথিত বিনোদনে অকুণ্ঠভাবে ব্যয়িত (অপব্যয়িত) হইতেছে, কিন্তু পুরোহিতের দক্ষিণা ও প্রণামী হিসাবে বরাদ্দ নামমাত্র কয়েকটি টাকা। বাজেটে উহার অন্তর্ভুক্তি শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই। যে-বস্ত্র ও গামছাটি মাকে নিবেদন করা হয় অথবা পুরোহিতকে দেওয়া হয় উহা ব্যবহারের অযোগ্য বলিলেও কম বলা হয়। উদ্যোক্তারা একথাটি ভুলিয়া যান অথবা বিষয়টি বুঝিবার বুদ্ধি তাঁহাদের নাই যে, মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও বিনোদন উদ্দেশ্য নহে, উদ্দেশ্য মাতৃবন্দনা। সেই উপলক্ষে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা ও বিনোদন। উদ্যোক্তারা ভুলিয়া যান যে, পুরোহিতই মায়ের 'বোধন' করেন, মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমায় 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করেন। অর্থাৎ মায়ের পূজায় তাঁহারই ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক। শহরের পূজায় গ্রাম হইতে দরিদ্র ঢাকী ও বাজনদারেরা আসেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিকের বেলায় উদ্যোক্তাদের অর্থে টান পড়িয়া যায়। অথচ উৎসব-প্রাঙ্গণকে পূজার পরিবেশে পরিণত করেন ঐ পুরোহিত, ঢাকী এবং বাজনদারেরাই। উৎসব-প্রাঙ্গণ আলোর রোশনাইয়ে ভরা, সকলের মুখে হাসি, কিন্তু মায়ের পূজার প্রধান হোতাদের মুখে হাসি ফুটাইবার কথা কী আমরা মনে রাখিব না? আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপের আশপাশে দরিদ্রদের কথা, ঝুপড়িবাসীদের কথা, ফুটপাতবাসীদের কথা কী মনে রাখিব না? বন্যাদুর্গতদের কথা, হাসপাতালে অসুস্থ, পীড়িত বা মুমূর্ষু মা-ভাই-বোনদের কথা আমরা কী মনে রাখিব না? সংবাদমাধ্যমে নামপ্রচারের জন্য কিছু টাকা বন্যাত্রাণের জন্য 'দান', দরিদ্রদের কয়েকখানি 'বস্ত্র-বিতরণ' করিয়া বাহবা কুড়াইবার জন্য অনেকেরই উদগ্র ব্যগ্রতা! এই ব্যগ্রতা কী চূড়ান্ত স্বার্থপরতা অথবা নির্লজ্জতা নহে? উৎসবের দিনগুলিতে নিজেদের মুখে পরমান্ন তুলিবার মুহূর্তে যদি আমাদের মনে না হয়—সকলের মুখে অন্ততঃ সাধারণ অন্ন তুলিবার ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের অন্নগ্রহণের কোন অধিকার নাই, তাহা হইলে কিসের আনন্দময়ীর সন্তান আমরা! যদি সবাই সানন্দে সামিল না হয় তাহা হইলে উহা কিসের উৎসব?

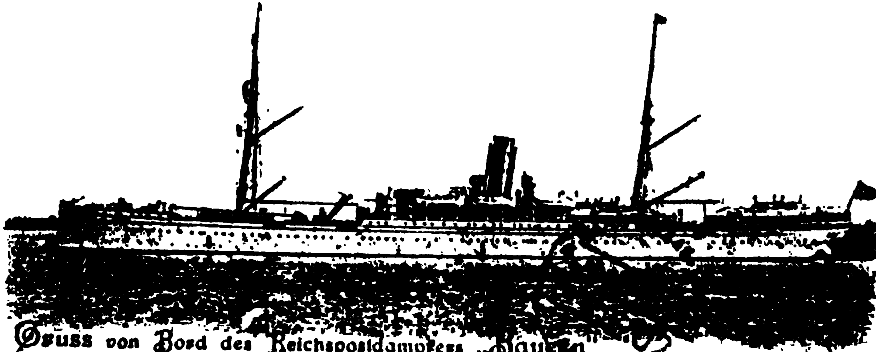
মা আসিতেছেন। আনন্দময়ী আসিতেছেন। সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত। প্রকৃতির প্রস্তুতিতে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন নাই। যত পরিবর্তন শুধু মানুষের চিন্তায় ও আচরণে। যে-পরিবর্তনে শ্রী নাই, সুষমা নাই, ছন্দ নাই, নম্রতা নাই, শুভ নাই, সে-পরিবর্তন কখনো বাঞ্ছিত নহে। উৎসবের উদ্দেশ্য—সকলকে লইয়াই আনন্দ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, একের আনন্দ যেন অপরের পীড়ার কারণ না হয়। উৎসবের পরিবেশ যেন সত্যিকারের উৎসবের পরিবেশ হয়। আনন্দময়ীর আগমনকে যেন আমরা সর্ব অর্থে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি। আমাদের সকলের মন যেন আনন্দে পূর্ণ হয়। সকলের গৃহ যেন সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ হয়। এই বোধ ও বুদ্ধি যেন আমাদের সকলকে এই শুভলগ্নে অনুপ্রাণিত করে। মাকে কেন্দ্র করিয়া আমরা সকলে উদ্বুদ্ধ হই মহৎ প্রেরণায়, উদার ভ্রাতৃত্ববোধে, অনাবিল আনন্দে। আনন্দময়ীর আগমন আমাদের জীবনে আনন্দযজ্ঞে রূপান্তরিত হউক। আনন্দের পুণ্যপ্রবাহে আমরা সবাই অভিস্নাত হই।□

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

4

Norddeutscher Lloyd, Bremen.

Sanghai 30.11.02



My dear Purna Babu:- The above is the S.S. Bayern – a Imperial German Mail Steamer, on board of wh. I went. The Chinese Sea was very rough & I had to be bed-ridden owing to awful seasickness for 6 days. Now better. With my best wishes to you all – Yours in God Trigunatita

Postkarte Weltpostverein

Carte postale — Union postale universelle

Nur für die Adresse.

TUTICORIN 9 DE 02

DEUTSCHES REICH 10 10

Purna Chandra Seth Esq
3 Banstola Street
Barhabazar
Calcutta
India

VICTORIA

[চিঠিটির বঙ্গানুবাদ পরের পৃষ্ঠায়]

॥ ১ ॥

Sanghai
30. 11. (19)02

My Dear Purna Babu,

The above is the S. S. Bayern — an Imperial German mail steamer, on board of which I am now. The Chinese sea was very rough & I had to be bedridden owing to awful sea-sickness for 6 days. Now better.

With my best wishes to you all —

Purna Chandra Sett Esq.
3 Banstola Street, Barhabazar, Calcutta

Yours in God
Trigunatita

[বঙ্গানুবাদ]

সাংহাই
৩০. ১১. (১৯)০২

প্রিয় পূর্ণবাবু,

ওপরের ছবিটি রাজকীয় জার্মান ডাক-স্টীমার এস. এস. বেয়ার্নের—এই জাহাজেই আমি যাচ্ছি। চীন সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল ছিল এবং ভয়ানক সমুদ্র-পীড়ার কারণে ৬ দিন আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম। এখন আগের চেয়ে ভাল আছি।

আপনারা সকলে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি
প্রভুপদাশ্রিত
ত্রিগুণাতীত

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শেঠ
৩ বাঁশতলা স্ট্রীট
বড়বাজার, কলকাতা

॥ ২ ॥

Vedanta Society
40. Steiner St. San Francisco
California. U. S. A
The 8th Sep. 1903

প্রিয় পূর্ণবাবু,

বহু দিবস হইল আপনার কোনও খবর পাই নাই। আপনারা কে কেমন আছেন অনুগ্রহপূর্বক লিখবেন। আমি মধ্যে অত্যন্ত খারাপ ছিলাম। এক্ষণে কথঞ্চিৎ ভাল আছি। ডাক্তাররা বলে আমার ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ হয়েছে। প্রস্রাবে অতিরিক্ত কাস্‌ট্ বাহির হইতেছে। হার্টের একটা ভল্‌ভ্ একটু খারাপ হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করি নাই। তবে, যখন বুকে, পিঠে ও পেটে অতিরিক্ত বেদনা চাগায়, তখন শয্যাগত হয়ে ক্ষণিক থাকতে হয়। কোনও ঔষধপত্রে কিছুই হয় নাই। উপস্থিত সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে "স্বভাবের" ওপর নির্ভর করে আছি। খাটুনি পূর্ববৎ খাটছি। মধ্যে কেবল চিঠি লেখা মাস খানেক বন্ধ করতে হয়েছিল। এখানকার প্রচার কার্যাদি বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে।

সম্প্রতি স্বামীজীর ও আমার একটি বন্ধু (মিসেস বেট্‌স্ নামক) তাঁর নিজের এক বন্ধুর জন্য একখানি introduction letter আমার নিকট হইতে চাহিয়াছেন। এই বন্ধুর নাম মিসেস টেলার। ইনি Indiaতে যাবেন। কলকাতায় কোনও পরিচিত লোক পাইলে ইনি সব দেখতে শুনতে ভাল করে পারবেন এই ধারণায় আমার নিকট স্বামীজীর উক্ত বন্ধু মিসেস বেট্‌সের সমভিব্যাহারে আসেন। আমি যতদূর অনুসন্ধান করলুম, তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে মিসেস টেলার একজন খুব ভাল লোক। সেইজন্য তাঁহার জন্য একখানি সুপারিশপত্র আপনার নামের উপর দিয়াছি।

Vedanta Society
10 STEINER ST. SAN FRANCISCO
CALIFORNIA, U. S. A.

Th. 8th Sept., 1963

প্রিয় পূর্ণচন্দ্র –

বহুদিন হইল আপনার কোনও খবর পাই নাই। আপনারা যে কেমন আছেন অনুগ্রহপূর্বক লিখবেন। আমি মধ্যে অত্যন্ত খারাপ ছিলাম। এখানে কথঞ্চিৎ ভাল আছি। ডাক্তারের মতে আমার ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ হয়েছে। প্রস্রাবে অতিরিক্ত অ্যালবুমেন বাহির হইতেছে। হার্টের একটা ভাল্‌ভ্ একটু খারাপ হয়েছে। ইত্যাদি ২। আমি কিন্তু কিছুই চিন্তা করি নাই। তবে, যখন বুকে পীড়া ও পেটে অতিরিক্ত বেদনা পাই, তখন শয্যাগত হয়ে খানিক থাকতে হয়। কোনও ঔষধপত্র কিছুই হয় নাই। চিকিৎসা সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের উপর নির্ভর করে আছি। খাটুনি পূর্ববৎ যাচ্ছি। মধ্যে একবার তিনটি লেকচার সাপ্তাহিক বন্ধ করতে হয়েছিল। এখন আবার প্রায় সাপ্তাহিক সব পূর্বের কাজ চালাচ্ছি।

সম্প্রতি স্বামীজির ও আমার একটি বন্ধু (মিসেস হেইস্ নামক) তাঁর নিজের একজন বন্ধুর জন্য একখানি Introduction letter আমার নিকট হতে চাহিয়াছেন। এই বন্ধুর নাম মিসেস মেলার। ইনি India তে যাবেন। কলিকাতায় কোনও পরিচিত লোক পাইলে ইনি সব দেখতে শুনতে ভাল পারে

পারবেন এই খবরটা আমার। কিন্তু ~~[illegible]~~ স্বামীজির
উক্ত বন্ধু মিসেস্ টেইলর সম্ভবতঃ আসবেন।
আমি যতদূর অনুসন্ধান করলুম, তাহাতে এক্ষণ
বুঝিলাম যে মিসেস টেলার একজন খুব ভাল
লোক। সেই জন্য তাঁহার জন্য একখানি সুপারিশ-
পত্র আপনার নামে উপর দিলাম। যেপত্র
খানি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। যতদিন তিনি
হোটেলে বা অন্যত্র থাকবেন। নিজের খরচপত্র
সমস্তই নিজে করবেন। আপনি কেবল অনুগ্রহপূর্ব্বক
উঁহাকে সঙ্গে করে নিয়ে কলিকাতার দর্শনীয়
স্থান সকল দেখাইয়া দিবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন,
মিউজিয়ম, পরেশনাথ, দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির
কালীবাটী, মঠ, প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান দেখাইয়া
দিলেই হইবে। আরও যদি কিছু দেখতে শুনতে চান
ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবেন। আপনি
যদি ব্যস্ত থাকেন কি বা কলিকাতায় না থাকেন
ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার অপর কোনও ভাইকে
একটু সুপারিশ করিয়া দিবেন, তিনি যেন উক্ত
মিসেস টেলারকে উক্তপ্রকারে সাহায্য করেন।
বিবিটী দেখতে আমার অপেক্ষাও ঢের সুন্দর!!
সুরেন বাবু ও সতীশ বাবুকে আমার ভালবাসা
দিবেন এবং আপনিও জানিবেন। ইতি

বিঃ দ্রঃ পুনঃ
নাম হইতেছে—
– Mrs Najah Taylor

[illegible]

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ।

সে-পত্রখানি তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। অবশ্য তিনি হোটেলে বা অন্যত্র থাকবেন। নিজের খরচপত্র সমস্তই নিজে করবেন। আপনি কেবল অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে কলকাতার কতিপয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখাইয়া দিবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়াম, পরেশনাথ, দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির কালীবাটী, মঠ প্রভৃতি কতিপয় স্থান দেখাইয়া দিলেই হইবে। আরও যদি কিছু দেখতে শুনতে চায় তো, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া শুনাইয়া দিবেন। আপনি যদি ব্যস্ত থাকেন বা কলিকাতায় না থাকেন তো, অনুগ্রহপূর্বক আপনার অপর কোনও ভাইকে একটু সুপারিশ করিয়া দিবেন, তিনি যেন উক্ত মিসেস টেলারকে উক্তপ্রকারে সাহায্য করেন। বিবিটি দেখতে আমার অপেক্ষা ডবল স্থূলকায় !!

সুরেনবাবু ও সতীশবাবুকে আমার ভালবাসা দিবেন এবং আপনিও জানিবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
ত্রিগুণাতীত

বিবির পুরা নাম হইতেছে—
Mrs. Najah Taylor

ইংরাজীর জন্য কিছুমাত্র ভাববেন না, অমনি তানা নানা করে বুঝিয়ে দিলেই হবে।

☆

পত্রপ্রাপক-পরিচিতি

পূর্ণচন্দ্র শেঠ (১৮৭৪-১৯৩৬) স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক স্বামী শিবানন্দের আশ্রিত ছিলেন। তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে। 'উদ্বোধন' যখন মাখাঘষা গলি থেকে মুদ্রিত হতো তখন কাছাকাছি বড়বাজারে ৩, বাঁশতলা স্ট্রীটে (বর্তমানে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রীট) পূর্ণবাবুর বাড়িতে আহার ও বিশ্রামের জন্য আসতেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। ১৯০২ সালের নভেম্বরের প্রথমে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আমেরিকা-যাত্রা করেন। সেই যাত্রার সময় জাহাজ থেকে এই চিঠিটি তিনি পূর্ণবাবুকে লিখেছিলেন। পূর্ণবাবুকে লেখা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের ৩৭টি পত্র পূর্ণবাবুর পরিবারে সযত্নে সংরক্ষিত ছিল। চিঠিগুলি পরবর্তী কালে বেলুড় মঠের 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এ অর্পণ করা হয়েছে। প্রকাশিত পত্রদুটি 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম' থেকেই সংগৃহীত।

শ্রীরামকৃষ্ণের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ নিতাইচরণ হালদার ছিলেন পূর্ণবাবুর শ্বশুরমশায়। ডাঃ হালদার আদিযুগে মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ডাঃ হালদারের সঙ্গে পূর্ণবাবু প্রায়ই আলমবাজার মঠে যাতায়াত করতেন এবং নানাভাবে মঠের সেবা করতেন। পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় প্রথম পদার্পণের পর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে স্বামীজীকে যে ফিটন গাড়িতে বাগবাজারের পশুপতি বসুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই গাড়িটি ছিল পূর্ণচন্দ্র শেঠের। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রতিষ্ঠিত স্যান ফ্রান্সিস্কোর 'হিন্দু মন্দির'-এর জন্য পূজার বাসনপত্র পূর্ণবাবুই পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মধুপুরের বাড়ি 'শেঠ ভিলা'য় স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং স্বামী শিবানন্দ বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের যে কয়েকটি পোর্সিলিনের পট বিদেশ থেকে করিয়ে এনেছিলেন তার একটি স্বামীজী নিজে ডাঃ নিতাইচরণ হালদারকে উপহার দিয়েছিলেন। পটটি ডাঃ হালদারের মৃত্যুর পর পূর্ণবাবুর হাতে আসে এবং ঠাকুরঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে পটটি পূর্ণবাবুর পৌত্রী [পূর্ণবাবুর পুত্র ব্যারিস্টার প্রভাতকুমার শেঠের সন্তান] সন্ধ্যা শেঠের বরানগরের পৈত্রিক বাসভবনে [১৪, রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৩৬] সযত্নে রক্ষিত এবং নিত্যপূজিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সন্ধ্যা শেঠ জানিয়েছেন : "প্রায় একশ বছর পার হয়ে গেলেও পটটিতে এখনো কোন অস্পষ্টতা আসেনি। তার এখনো একই রকম উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ছবিটি যখন স্বামীজী দিয়েছিলেন তখন তা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো ছিল এবং কাঠের ফ্রেমের ওপর ক্রিমসন ভেলভেট মাউন্ট করা ছিল। পরে ভেলভেটে উই লাগায় বাবা ভেলভেট-যুক্ত ফ্রেম খুলে কাঠের ফ্রেমে ছবিটি বাঁধিয়ে রাখেন।"

পূর্ণচন্দ্র শেঠের সঙ্গে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের তথা মঠের কী ধরনের ঘনিষ্ঠতা ছিল তা প্রকাশিত পত্রদুটি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

বিশেষ রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন কি নিছকই একটি আন্দোলন? নাকি এর একটি গভীরতর তাৎপর্যও আছে? এক দরিদ্র নিরক্ষর মন্দির-পুরোহিত তাঁর নিভৃত সাধনপীঠে কয়েকজন মানুষকে নিয়ে, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন তরুণ ও যুবক, যে-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, তা তাঁর দেহান্তের সাত বছরের মধ্যে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল নিখিল বিশ্বে। সেই রম্য কাহিনীর অসাধারণ সুচারু বিশ্লেষণ করেছেন পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

শিরোনামে 'আন্দোলন' শব্দটি থাকলেও তার অর্থকে কিন্তু একটু গভীরতর অর্থে নিতে হবে। 'আন্দোলন' কথাটির মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব থাকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় উদ্দীপনা থাকলেও উত্তেজনা নেই। তাঁর আদর্শ এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী যাঁরা জীবনযাপন করছেন বা করতে ইচ্ছুক তাঁদের জীবনচর্যার আলোকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার গতিবেগ পর্যালোচনা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গে সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। সুতরাং সেসমস্ত ঘটনার পুনরুক্তি না করে তিনি কোন্ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও পালিত হয়েছিলেন এবং সেই সময় দেশের পরিস্থিতি কিরকম ছিল প্রথমে সেটাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব, যাতে তাঁকে কেন্দ্র করে এই যে একটি ভাবধারা জগতে প্রসারিত হয়ে চলেছে, উত্তর-দক্ষিণ দুই গোলার্ধেই ছড়িয়ে পড়ছে তার সূত্রটি ধরতে পারি।

আধুনিক সংস্কৃতির আভাসও যেখানে পৌঁছায়নি এমনই এক নগণ্য গ্রামে তাঁর জন্ম। যদিও আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি কলকাতা থেকে সেই গ্রামের দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয়, কিন্তু তখন যাতায়াতের অসুবিধা এত বেশি ছিল যে, শহরের সঙ্গে ঐ গ্রামের প্রায় কোন যোগাযোগই ছিল না। কিছু পথ ছোট রেলগাড়িতে গিয়ে বাকি সাতাশ মাইল পদব্রজে কে যাবে সেই নগণ্য গ্রামে? তাছাড়া সেখানে তখন তেমন পরিচিতিও তাঁর ছিল না। এমনকি আমরাও যখন গিয়েছি তখন 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ি কোথায়'—এ-প্রশ্নের উত্তরে গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। কথায় আছে—প্রদীপের নিচে অন্ধকার। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে যখন তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত তখন তাঁর স্বগ্রামবাসীরা তাঁর কোন সংবাদই রাখতেন না। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম করায় প্রতিবেশীরা একটি কুটির দেখিয়ে দিলেন। ১৮৩৬ সালে ঐ কুটিরেই তাঁর জন্ম হয়েছিল।

সেই নগণ্য গ্রামের প্রায়-নিরক্ষর ব্যক্তিটির জীবনব্যাপী কর্মভূমি কিন্তু নির্দিষ্ট ছিল কলকাতায়, যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং আধুনিক ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি কৃষ্টি বা সংস্কৃতি আবহমান কাল থেকেই ছিল। তারপর বারবার বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে। তবে ঐসব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ কখনো হয়নি। ভারতবর্ষের বিশেষত্বই হলো, সে বিদেশী শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বারবার আত্মসাৎ করে নিয়েছে, নিজত্ব বিসর্জন না দিয়ে বিদেশী সম্পদের দ্বারা তাকে আরও সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। বিদেশীরাও নিজেদের দূরে সরিয়ে না রেখে ভারতবাসীর সঙ্গে এক হয়ে মিশেছেন। কিন্তু ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে এর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তারা ভারতকে আপন করে না নিয়ে নিয়েছিল শাসক ও শোষকের ভূমিকা। ফলে ভারতের জনসাধারণ দূর থেকে ভয় ও সংশয়ের সঙ্গে এই শ্বেতাঙ্গদের নিরীক্ষণ করছিল। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণও করতে পারছিল না,

পরিপূর্ণ বর্জনও করতে পারেনি। এইভাবে জনসাধারণের একাংশ ব্রিটিশ সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হলেও একটি বিরাট অংশ নানাবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে দিশা হারিয়ে ফেলেছিল। ধর্ম-কর্ম সকল ক্ষেত্রেই একজন উপযুক্ত দিশারী বা পথপ্রদর্শকের অভাব ভারতের, বিশেষতঃ কলকাতার যুবসমাজ অনুভব করেছিল। আবার এই ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতার পরিণাম এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে একটি নতুন সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল—'ব্রাহ্মসমাজ'। তার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই নব্য ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তৎকালীন বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রচারে ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করছিল ও দিশাহারা শিক্ষিত উৎসাহী যুবকদের দলে দলে আকৃষ্ট করছিল।

দেশের এইরকম পরিস্থিতিতে কামারপুকুরের অনাড়ম্বর গ্রাম্যজীবনে লালিত-পালিত যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতায় পদার্পণ। কিছুদিন শহর কলকাতায় অতিবাহিত করার পরই তিনি চলে এলেন দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী-মন্দিরে। সেখানেই কিছুদিন পরে তিনি বৃত হলেন পূজকের পদে। তারপরই বিশেষ একদিকে ঘুরে গেল তাঁর জীবনের মোড়, যার মধ্যে ছিল ভারতের, তথা বিশ্বের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজীবনের বীজ। সেই সময় তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা এত প্রবল ছিল যে, সমকালের নানারকম আদর্শ নিয়ে সংঘাতের কোন সংবাদই তিনি রাখতেন না। শহরের কোলাহল থেকে দূরে গঙ্গাতীরে বা পঞ্চবটীতে বসে নিজের সাধনে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। চার বছরের কঠোর সাধনার পরে যখন তাঁর সিদ্ধিলাভ হলো তখন থেকেই তাঁকে কেন্দ্র করে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠতে আরম্ভ করল একটি বিশেষ ভাবধারা, যা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। তাঁর ভাবধারা জগৎকে উদ্বেল করে তুলেছে। সনাতন ধর্মের যাকিছু অন্ধতা, জীর্ণতা; যাকিছু মালিন্য তাকে দূর করে সেই ধর্মকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এই ভাবধারা। তাই আমরা তাকে 'আন্দোলন' এবং আরও সঠিকভাবে 'ভাবান্দোলন' বলে আখ্যা দিতে চাই।

কিভাবে এর শুরু তা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ঘরটিতে, যেটি আজ মহাতীর্থরূপে পরিগণিত। পদ্ম প্রস্ফুটিত হলে ভ্রমরের দলকে যেমন খবর দিতে হয় না, তারা আপনিই ছুটে আসে, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের পরিস্ফুট রূপের বিকাশের পর থেকে তেমনি করেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত জ্ঞানিগুণী, দার্শনিক, পণ্ডিত, যোগী ও সাধকই না তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলেন! তাঁদের সঙ্গে অবিরাম ঈশ্বরপ্রসঙ্গ আলোচনা ও বিচারে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ও তাঁর সেই ছোট ঘরটি সর্বদাই মুখরিত থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কাছ থেকে নিজেও পেলেন কিছু, কিন্তু দিলেন তার অনেক গুণ বেশি। তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বিভিন্ন পথে সাধনায় সাহায্য করেছেন তেমনি নিজ নিজ ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী নির্দেশ ও অমূল্য সাহায্য পেয়ে চরিতার্থও হয়েছেন। তাঁরা এলেন, তাঁরা চলে গেলেন ব্যক্তিগত জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়ে।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ তো সেটুকু মাত্র নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য তিনি আসেননি। যুগাবতার আসেন একটি নবযুগ সৃষ্টির জন্য। তাঁর প্রকৃত কাজ আরম্ভ হলো দেশের তৎকালীন শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন সনাতন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাঁর কাছে এলেন নব্যবঙ্গের সংস্কৃতিমান, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক সভ্যতা ও ভাবধারার প্রতিনিধি কিন্তু লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত যুবগোষ্ঠী। তাঁরা চাইছিলেন অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হতে, কিন্তু পথের সন্ধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নানাভাবে বাহ্যতঃ কলুষিত হয়েছিল যে সনাতন ধর্ম তার প্রতি তাঁরা সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেননি, আবার নতুন দিকটিকেও মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপরিসীম স্নেহে তাঁদের আপন করে নিলেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ভাব নিজের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি করে প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োজনানুযায়ী পথের নির্দেশ দিলেন। অন্ধভাবে মেনে নেওয়া নয়, বিচারের দ্বারা যাতে তাঁদের সব সংশয় দূর হয় সেইভাবে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। এইভাবে সেই উদ্দীপ্ত, প্রাণবন্ত যুবকদের যন্ত্র করে তাঁদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তির নতুন বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য তাঁদের গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন অত্যন্ত সাবধানে ও পরম স্নেহ-মমতায়। এঁরাই [illegible]।

তখনো কিন্তু তাঁকে বিশেষ কেউই চিনত না। কারো কাছে তিনি দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা বামুন', কেউবা তাঁকে জানে রাসমণির বাগানের এক 'সাধু' বা 'পরমহংস' বলে। অন্যান্য অবতারদের ক্ষেত্রে যেমন, এবারও তেমনি অতি স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তিই তাঁর ধর্মজীবনের বিশাল ব্যাপকতা, তাঁর বিশ্বজনীন প্রেম, উদারতা এবং তিনি যে মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য এক গভীর বার্তা বহন করে এনেছেন—একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নবীন

যুবকগোষ্ঠীও যে প্রথমেই তাঁকে বুঝেছিলেন এমন নয়, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তাঁর কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁরা তাঁর কাছে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁর পরম মমতাপূর্ণ ব্যবহার প্রথম দর্শনের মুহূর্ত থেকেই তাঁদের হৃদয়কে সম্পূর্ণ আকৃষ্ট করেছিল।

বস্তুতঃ, আমাদের সনাতন ধর্মের তুলনা নেই। অতি উদার ও সমৃদ্ধ আমাদের ধর্ম। কিন্তু কালের প্রভাবে তার মধ্যেও অনেক গ্লানি প্রবেশ করেছিল। অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি, কোন নতুন ভাবধারাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার মানসিকতা, পরস্পরের দোষদর্শন ইত্যাদির জন্য অনেক বিচারশীল মন সনাতন ধর্মের প্রতি কিছুটা আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান কাজ ছিল এই সনাতন ধর্মের আধুনিকীকরণ। তিনি প্রত্যেক বস্তুরই ভাল মন্দ দুটি দিকই দেখতে পেতেন এবং ঔদার্য তাঁর স্বভাবগত ছিল বলেই মন্দটিকে পরিত্যাগ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। সবকিছুর মধ্যে যা সার, যা সত্য তাই তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। সেইজন্য তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তিনি তাঁদের সেই পথেরই নির্দেশ দিতেন যা সর্বতোভাবে গোঁড়ামিবর্জিত, 'মতুয়ার বুদ্ধি'-বিরহিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের কারো বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর উদার হৃদয়ে সকল মানুষের এবং সকল ধর্মের স্থান ছিল। তিনি যে শুধু অতীতের ও বর্তমানকালের ধর্মসম্প্রদায়গুলিকেই শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, অনাগত ভবিষ্যতে যেসব ধর্মসম্প্রদায় গড়ে উঠবে তাদের উদ্দেশেও তিনি আগে থেকেই শ্রদ্ধা জানিয়ে রেখেছেন। তিনি জানতেন যে, নতুন নতুন সম্প্রদায় গড়ে উঠতে বাধ্য, কারণ ধর্মের গতি সচল, তা রুদ্ধ হওয়ার অর্থই তো মৃত্যু। যুগ ও দেশের প্রয়োজনে একই ধর্মের নব নব রূপায়ণ। এই সত্যটি জানা ছিল বলেই ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে মতানৈক্য তা কোনদিন তাঁকে বিচলিত করেনি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মতানৈক্য নিতান্তই বাহ্য ব্যাপার, সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য নিহিত। পার্থক্য আচরণে, ব্যবহারে, কে কোন্ মার্গের অধিকারী সেইখানে। কোন যুক্তি দিয়ে তাঁকে এই সত্যে উপনীত হতে হয়নি। তিনি স্বয়ং সকল ধর্মমতের সাধন করেছেন, সমস্ত পথ দিয়ে গিয়েছেন। শুধু বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা নয়, খ্রীস্টান মুসলমান ধর্মের লোকেরা কিভাবে ঈশ্বরারাধনা করে তাও জানতে তাঁর কৌতূহল হয়েছিল এবং সেইসব পদ্ধতিতে সাধন করে তিনি সেই পরমতত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। চরম অনুভূতি লাভ করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। যুক্তিজাল বিস্তার করে বোঝানোর থেকে উপলব্ধ সত্যের মূল্য অনেক কার্যকর, অনেকগুণ অধিক মর্মস্পর্শী। সেইজন্যই তাঁর বাণী সেদিন দেশের বরেণ্য শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনবিদ্, সমাজসংস্কারক এবং তাঁর যন্ত্রস্বরূপ এই নবীন প্রাণোচ্ছল শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে এমনভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। একথা সত্য যে, সর্বধর্মসমন্বয়ের ভাবনা একেবারে নতুন একটি তত্ত্ব নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে এটি ছিল তত্ত্বমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ 'আপনি আচরি' সেই তত্ত্বকে জগতের সামনে তুলে ধরলেন। এটিই হলো জগতে তাঁর নতুন সংযোজন। এই তত্ত্বের ব্যবহারিক রূপ লোকের অজানা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্যই প্রত্যেকটির সাধন নিজে করে প্রতি পথেই অনুভূতির চরম শিখরে উঠে আবার নেমে এসে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে প্রদীপ্ত স্বরে ঘোষণা করলেন তাঁর অপূর্ব সিদ্ধান্ত—"যত মত তত পথ"।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুদূরপ্রসারী কর্মধারার সূচনা হয়েছিল এই স্বল্পসংখ্যক যুবককে দিয়েই। প্রথমেই তিনি তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরলাভের জন্য এক অদম্য স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁর সান্নিধ্যে সেই যুবকেরা পেয়েছিলেন তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণু উদার বিশ্বজনীন যে-মনোভাব তিনি এঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন তা শুধু পরমতসহিষ্ণুতা নয়, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভগবানলাভের পথরূপে প্রতিটি ধর্মমতের সুস্পষ্ট স্বীকৃতিও। তিনি নিজে কখনো কারো ভাব ভঙ্গ করেননি। তিনি চাইতেন যে, তাঁর অনুগামীরাও যেন অপরের ধর্মে শ্রদ্ধাহীন না হয়। তিনি বলতেন, ধর্মপথে সকলকে সাহায্য করার জন্য তোমার হাতটি প্রসারিত করে রাখ। যে যে-দিক দিয়ে অগ্রসর হতে চায় তাকে সেই দিক দিয়ে এবং সেখান থেকেই যথাশক্তি সাহায্য করাই কর্তব্য। কোন মতদ্বৈধতা বা বিরূপতার প্রশ্ন নেই। কারণ, যার যার পথ নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করলে সে লক্ষ্যে পৌঁছাবেই।

যখন 'ধর্ম' বলতে আমরা কতকগুলি বিধিনিষেধ পালন বা আচার-আচরণকেই মূল্য দিই, শুধু মূল্য দিই না, তার কোন ব্যতিক্রম দেখলে অসহিষ্ণুও হয়ে উঠি, তখনই ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ ও বিরূপতা আসে, সংঘর্ষ ও হানাহানি ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের আচরণের দ্বারা "যত মত তত পথ"—এই যুগবাণী প্রচার করে সেই অন্ধ ধর্মবিদ্বেষের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার মন্ত্র দিয়েছেন।

জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ এবং "যত মত তত পথ"—এই মতবাদকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ-ভাবধারা যে বিশ্বের

বিভিন্ন প্রান্তে আজ প্রসারিত হয়েছে তা সম্ভব হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মাধ্যমে। এই সংঘ সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বা সংস্থা। এটিকে 'সম্প্রদায়' বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, এই মতবাদের বহু অনুগামী আছেন ; আবার 'অসাম্প্রদায়িক' এই অর্থে যে, এঁরা নিজেদের কখনো একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে বিশেষ কোন বহিরঙ্গ সাধনের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না। এঁদের সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ এবং একটিই আদর্শ যা কোন ব্যক্তি বা ধর্মমত সম্বন্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না, কোন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। এই উদার ভাবধারা যে অতি অনায়াসেই সর্বত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে তার মূল কারণ—প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং সর্ব-ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এই ভাবধারার প্রাণস্বরূপ। 'সর্বধর্মসমন্বয়'-এর অর্থ এই নয় যে, সর্বধর্মকে এক বিশেষ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর অর্থ—প্রত্যেকটি ধর্ম তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন আছে তেমনই থাকবে। ভগবানের 'ইতি' করা যায় না। সুতরাং স্ব-স্ব ধর্মপথে থেকে যেকোন নিষ্ঠাপরায়ণ, ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ঈশ্বরলাভ করবে, কিন্তু সে যেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকে। পরস্পরের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হবার পথে তারা একে অন্যের সহযাত্রী—এই বোধ যেন তাদের মধ্যে জাগ্রত থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে এই সাম্যবাদ গড়ে উঠলে বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হবে।

আরেকটি প্রসঙ্গও এইখানে আলোচ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে মানুষের ঐহিক জীবনযাত্রা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই জীবনের লক্ষ্য ; দৈহিক, মানসিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক —সবকিছু নিয়েই তার পূর্ণত্ব। ঈশ্বর অখণ্ড সত্তা। মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সুতরাং প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির কর্তব্য মানবজাতিকে নানাভাবে সেবা করা। মানুষের উপরি উক্ত যেকোন দিকের বিকাশসাধনে সাহায্য করাই তাঁর সেবা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা সমস্তই মানুষের প্রয়োজন এবং যে যেভাবে পারে এই সেবাকার্যে সে নিজেকে নিযুক্ত করবে। এই জীবসেবা বা জীবপ্রেমই ঈশ্বরের আরাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এগুলি অবশ্যই প্রাথমিক প্রয়োজন। সেইসঙ্গে একথাটি মনে রাখতে হবে, ধর্মাচরণের সুবিধার জন্য এই প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানো অপরিহার্য। এই সেবাকার্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ধর্মভাব সঞ্চারিত করে দেওয়াও যে কর্তব্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদরা তাঁদের নিজেদের আচরণে ও উপদেশে সেকথাও বারবার বলেছেন।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। এর অর্থ পরমাত্মার সঙ্গে নিজের ঐক্যবোধ—তাদাত্ম্য বোধ। পরমাত্মা সর্বব্যাপী, সর্বভূতে স্থিত। তাই তাঁর সঙ্গে যখন নিজের ঐক্যবোধ সত্য বলে প্রতিভাত হয় তখন সমস্ত জগতের সঙ্গেই একাত্মতা হয়, "মমাত্মা সর্বভূতাত্মা"—এই উপলব্ধি ঘটে। এই উপলব্ধিই আমাদের লক্ষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন 'জীবসেবা'র কথা বলেছেন তখন এই অর্থেই বলেছেন। ঈশ্বর যখন সর্বভূতে অবস্থিত তখন যে-কোন প্রাণীর সেবা করার অর্থ তাঁরই সেবা। এই মনোভাব নিয়েই রামকৃষ্ণ সংঘের সেবাকার্য, মানবকল্যাণমূলক সকল কাজকর্ম। এই সেবাকার্য আর দশরকম সামাজিক কল্যাণ-কর্ম বা 'সোস্যাল ওয়েলফেয়ার' (social welfare) নয়—এটি সাধনপথেরই অঙ্গ। সামাজিক কল্যাণকর্মে যাঁরা নিযুক্ত এই ভাবটি তাঁদেরও মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের শক্তি সীমিত, সামর্থ্যও অপ্রতুল। কাজের তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কম। তবুও আন্দোলনের অগ্রগতি সমানেই চলেছে। যেখানেই যাই দেখি, ক্ষেত্র যেন প্রস্তুত হয়েই থাকে। জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃত পরম আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সঙ্গে গ্রহণ করে। এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহযবনিকা যখন উত্তোলিত হলো তখন দেখা গেল, ইতিপূর্বেই সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রসারিত হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে সেখানকার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' স্থাপন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁরা আমাদের সন্ন্যাসীদের চাইলেন সেইসব সোসাইটির কার্য-ভার গ্রহণের জন্য। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের লোকবল এত সীমিত যে, কিভাবে তাঁদের চাহিদা পূর্ণ করব জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা ও আদর্শ আজ আর ছোট গণ্ডির মধ্যে না থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সম্ভবতঃ যতদিন না অন্য কোন যুগাবতারের বা নব্য ভাবধারার আবির্ভাব হয়, ততদিন এই ভাবধারা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলবে। হয়তো আমাদের অনেকেই এখন দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এই প্রজন্মের মানব-জাতি গড়ে তোলার পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর ভাবধারার যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা অবশ্যস্বীকার্য।□

ভাষণ

দেবলোকের কথা

স্বামী নির্বাণানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রয়াত সহাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ ঘরোয়া আলোচনায় যে-পরিমণ্ডলের কথা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তা ছিল সর্ব অর্থেই 'দেবলোক'। ভক্ত ও সাধুদের কাছে এই স্মৃতিচারণ তিনি করেছিলেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে ৪ জুন ১৯৫৬। মূল বাঙলায় তাঁর স্মৃতিচারণটি শ্রোতাদের কাছে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন সোসাইটির তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজী মহারাজ। মূল বাঙলা ক্যাসেটটি আমরা হলিউড বেদান্ত সোসাইটির (সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া) স্বামী সর্বদেবানন্দের সৌজন্যে পেয়েছি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

মহারাজের ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) বলতেন: "মহারাজ যেখানে থাকেন সেখানে উনি একটা atmosphere create করে বসেন এবং সেখানে যদি কেউ যায়, তার মনে যেভাবই থাক না কেন, তা ভুলে গিয়ে সে মহারাজের ভাবে ভাবিত হবেই। এটা মহারাজের একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল।" দেখেছি অনেকে মনে অনেক অশান্তি নিয়ে মহারাজের কাছে গেছে। অনেকে হয়তো মনে করেছে—একটু ভগবানকে ডাকি, কিন্তু মনকে ঠিক করতে পারছে না, মন চঞ্চল; তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেছে, কিন্তু গিয়ে কোন প্রশ্ন করতে আর সাহস পাচ্ছে না। এমনভাবে চুপ করে তিনি বসে আছেন যে, প্রশ্ন করবার সাহস হচ্ছে না, অথচ তাঁর কাছেই বসে রয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে—মহারাজও চুপ করে বসে আছেন। হয়তো একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা, দুঘণ্টা বসবার পর তারা প্রণাম করে চলে গেল। যাবার সময় তারা অনুভব করছে, যে-ভাব বা মানসিক অশান্তি নিয়ে তারা এসেছিল, তা ধীরে ধীরে চলে গিয়েছে। তাদের মন শান্ত হয়ে গিয়েছে। যাদের মন চঞ্চল হচ্ছিল, ভগবানকে ডাকতে পারছিল না, তাদের মন স্থির হয়ে এল। এইরকমই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। এধরনের ঘটনা আমরা অজস্রবার দেখেছি।

১৯২১ সাল। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রমে রয়েছেন মহারাজ। ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসব (১১ মার্চ)। মহারাজ ঠাকুরের পুরনো ফটো পালটে নতুন ফটো স্থাপন করলেন। ষোড়শোপচারে পূজা শেষ হলে আরতি হলো। আরতির পর স্তবপাঠ হলো। তারপর মহারাজ একটি ভজন গাইতে বললেন। সবাই মিলে ভজন গাওয়া হচ্ছে। হঠাৎ মহারাজ উঠে পড়লেন। উঠে গাইতে গাইতে ভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। সেখানে তখন হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ছিলেন। সকলেই উঠে দাঁড়ালেন। আমি একপাশে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলাম। তখন সেখানে প্রায় ৬০-৭০ জন সাধু ছিলেন এবং ২০০-৩০০ জন ভক্ত। ভক্তদের মধ্যে ছোট-বড়, বালক-বালিকা, মেয়ে-পুরুষ সবরকম ছিল। ঐভাবে নৃত্য করতে করতে মহারাজ অন্য একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন যে, সাময়িকভাবে প্রত্যেকে অন্য একটা জগতে চলে গেল, এই জগৎটার কথা সবাই ভুলে গেল। এমনকি ৭-৮ বছরের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত যেন জগৎ ভুলে গেল। এমন একটা atmosphere হয়েছে যেন সকলের কাছেই এই জগৎটা নেই। তারপর একটা ঘটনা ঘটল। একজন ভক্ত হঠাৎ মহারাজের সামনে এসে হরি মহারাজকে বলল: "মহারাজ, দেরি হয়ে গেলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" তাতে হরি মহারাজ এবং ভক্তরা তাকে খুব ধমক দিলেন। হরি মহারাজ পরে বলেছিলেন: "মহারাজ তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতি চেপে রাখেন, এরকম বড় একটা হয় না। অল্প সময়েই মহারাজকে এইভাবে পাওয়া যায়—আজ এমন একটা আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন আমাদের সকলের মনকে কত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন!"[১]

১ স্বামী নির্বাণানন্দ প্রদত্ত এই ঘটনাটির বিস্তৃততর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ২য় সং, ১৯৯৫, পৃঃ ২১৪।—সম্পাদক, উদ্বোধন

অনেক সময় দেখেছি—মহারাজ ইচ্ছে করলে, স্পর্শ করে মানুষের মনের পরিবর্তন করে দিতে পারতেন। একটা ঘটনা বলছি। দেবেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। উনি কাশীপুরে যাতায়াত করতেন। ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে আলাপ ছিল, যদিও গঙ্গাধর মহারাজের (স্বামী অখণ্ডানন্দের) সঙ্গেই তাঁর খুব বেশি বন্ধুত্ব ছিল। ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর কাশিমবাজারের মহারাজের বাড়িতে তিনি চীফ ম্যানেজারের কাজ করতেন। কাজের জন্যই হোক আর যে-কারণেই হোক এদিকে আর আসা-যাওয়া হতো না। গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে তাঁর অনেকদিন দেখা হয়নি। হঠাৎ ১৯১৮ সালে গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। দেখা হতে গঙ্গাধর মহারাজ তাঁকে মঠে ধরে নিয়ে এসেছেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করাতে। মঠে আনতেই তাঁকে প্রসাদ ইত্যাদি দেওয়া হলো। তিনি আনন্দ করে, গল্পগুজব করে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে বললেন: "তোমার দেবেনবাবুকে দেখে কিরকম যেন মনে হলো। আমাদের একেবারে ভুলেই গেছেন। তার ওপর যে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে রয়েছেন, একেবারে ফিটফাট বাবু হয়ে গেছেন। আমাদের কথা একেবারে ভুলেই গেছেন।" কিছুদিন পরে গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে আবার দেবেনবাবুর দেখা হতে তাঁকে গঙ্গাধর মহারাজ মহারাজের কথা বলেন। তিনি তখন কিছু বললেন না, চুপ করে শুনলেন শুধু। কদিন পর দেবেনবাবু আবার মঠে এসেছেন। বেলা সাড়ে তিনটে কি পৌনে চারটে হবে। আমি বারান্দায় বসে আছি। উনি এসে বলছেন: "মহারাজ কোথায়?" আমি বললাম: "ঘরে আছেন, এক্ষুনি বেরোবেন। আপনি বসুন।" আমি মহারাজকে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেবেনবাবুর আসার কথা বললাম। মহারাজ বললেন: "তুমি ওঁকে বসাও। আমি এক্ষুনি আসছি।" আমি ওঁকে বসতে বললাম। দেখলাম উনি খুব চঞ্চল—মনে যেন একটা অশান্তি। মনে হয়, ঐ যে-কথাটা বলেছেন গঙ্গাধর মহারাজ সেটা তাঁর মনে তোলপাড় করছে। কথাটা ওঁর মনে খুব লেগেছে। আমি অবশ্য ওঁকে জিজ্ঞেস করিনি, আমার মনে হলো। দেখলাম মহারাজের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি খুব অস্থির। কিছুতেই ওখানে বসতে পারছেন না। দু-এক মিনিট বসেই করলেন কি—মহারাজের ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। উনি ঘরে ঢুকতেই মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে ওঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর মুখ দেখেই মহারাজ বুঝেছেন কি হয়েছে না হয়েছে। তিনি তাঁর বুকে হাত দিয়ে বললেন: "কী হয়েছে, অত ভাবছেন কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে, অত ভাববেন না।" একথা বলতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ভদ্রলোকের মুখের আগের ভাব বদলে গেল, চাউনি বদলে গেল। ওঁরা দুজন এসে বারান্দায় বসলেন, আমি ওঁকে চা-খাবার দিলাম। উনি খেয়ে মহারাজকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে মহারাজের যে 'সংক্ষিপ্ত পরিচয়' রয়েছে তার লেখক দেবেন্দ্রনাথ বসু। তিনি সেখানে লিখেছেন: "বিদ্যুৎবাহী তার দেখিতে নির্জীব, কিন্তু স্পর্শ করিলে জানা যায় কী অমোঘ শক্তি তাহাতে নিহিত!" তিনি আমাদের বলেছিলেন: "তোমরা যে-মহারাজকে দেখছ তিনি তো 'ভাগবতের চাঁদের' মতো তোমাদের সঙ্গে মাছের মতো খেলা করছেন। তিনি যে বিরাট শক্তিমান পুরুষ তা তাঁর স্পর্শমাত্রেই খানিকটা অনুভব করা যায়। আমি যে সেদিন মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম, তখন যে আমার কী নিদারুণ কষ্ট ছিল তাতো তুমি জান না। আমি তোমাকে তা বলিওনি। কিন্তু তিনি যখন আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন, আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেল—আমি অন্যরকম মানুষ হয়ে গেলাম, আমার সমস্ত মনটা শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ এক ঝটকায় আমার অতীতের কথা মনে পড়ে গেল। ঠাকুরের অতুলনীয় ভালবাসার কথা মনে পড়ল। ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি আবার মনে জেগে উঠল।"[২]

মহারাজ নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা কখনো কিছু বলতেন না, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও কিছু বলতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে এড়িয়ে যেতেন। বলতেন: "ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই জানিয়ে দেবেন তাঁর কথা।" স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কখনো কখনো বলতেন। 'ইটারন্যাল কম্প্যানিয়ন' ('Eternal Companion')-এ মহারাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঠাকুরের 'spiritual son' (আধ্যাত্মিক মানসপুত্র)। কিন্তু ঠিক তা নয়—মহারাজ তার চেয়েও বেশি ছিলেন। 'Spiritual son' বললে যেন 'শিষ্য' ('Disciple') এবং 'গুরু' ('Master')—এটাই হয়ে

২ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে 'ব্রহ্মানন্দচরিত' গ্রন্থেও (পৃঃ ২১২-২১৩)।—সম্পাদক, উদ্বোধন

যাচ্ছে। কিন্তু মহারাজ যখন ঠাকুরের কাছে আসেন তার আগে মহারাজ সম্পর্কে ঠাকুরের কয়েকটি দর্শন হয়। প্রথম—ঠাকুর দেখেছিলেন গঙ্গার ওপর প্রস্ফুটিত পদ্ম, তার ওপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একটি বালক নৃত্য করছেন। এই দর্শনের পর মহারাজ আসেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বুঝেছিলেন তিনিই ঐ কৃষ্ণসখা বালক। দ্বিতীয়—ঠাকুর মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমাকে একজন সঙ্গী দাও। একটি শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী ভক্ত ছেলে যেন আমার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে।' একদিন ঠাকুর দেখলেন, মা তাঁর কোলে একটি ছেলেকে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন: "এইটি তোমার ছেলে।" ঠাকুর 'ছেলে' দেখে শিউরে উঠলেন। তখন মা বললেন: "সাধারণ সংসারী ভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।" মহারাজ ঠাকুরের কাছে আসতেই ঠাকুর বুঝলেন—এই সেই 'ছেলে'। সুতরাং মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের শুধু যে একটা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ তা নয়, তারও অনেক বেশি।

১৯১২ সাল। দুর্গাপূজার সময়। মা তখন কাশীতে। মা সবাইকে এইরকম উৎসবে নতুন কাপড় দিতেন। শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) প্রমুখের জন্য মা কাপড় এনেছেন। কিন্তু তাঁদের জন্য একরকম কাপড় আর মহারাজের জন্য অন্য রকম —সিল্কের। তখন রাসবিহারী মহারাজ মাকে বললেন: "মা, এরকম কেন? একি তোমার ছেলের?" মা বললেন: "হ্যাঁ, এটা আমার ছেলের।"

আরেকটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। খুব interesting ঘটনা। আমি আসলে ঠাকুর ও মহারাজের সম্বন্ধটা কিরকম ছিল তা দেখাতে চাইছি। ১৯১৮ সাল। আমি তখন মহারাজের সঙ্গে বলরাম মন্দিরে রয়েছি। মহারাজ দোতলার ছোট ঘরটিতে (এখন যেখানে ঠাকুরঘর) আছেন, আমি বারান্দায় বেঞ্চে বসে রয়েছি। দুপুর সাড়ে বারটা হবে, মহারাজ খেয়ে সবে একটু বিশ্রাম করতে যাবেন। এমন সময় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে দিয়ে একটি মেয়েকে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি এসে আমাকে বলল: "মহারাজকে প্রণাম করতে চাই।" ব্রহ্মচারীটি বলল, শরৎ মহারাজ মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন। প্রথমটা আমি একটু ভুল করলাম। আমি চাইছিলাম না, তখন মহারাজকে বিরক্ত করা হোক। কারণ, মহারাজ সবে বিশ্রাম করতে গেছেন। আমি ঘরে গিয়ে মহারাজকে বললাম: "একটি মেয়ে এসেছে, ছেলেমানুষ, আপনাকে প্রণাম করতে চায়।" কিন্তু শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন তা বললাম না। মহারাজ বললেন: "এখন নয়। এই বুড়ো বয়সে খাওয়ার পর কথা বলতে কষ্ট হয়। মেয়েটিকে চারটের সময় আসতে বল।" আমি এসে মেয়েটিকে বললাম: "দেখ, এখন তো হবে না, চারটের সময় এসো।" তখন সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল: "আমি শুধু প্রণাম করেই চলে যাব। একটু ব্যবস্থা করে দিন।" সে এমন কাঁদতে লাগল যে, আমি তখন ভাবলাম কী করা যায় এখন? তখন আমি আবার মহারাজের কাছে গেলাম। মেয়েটিকে শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন তা বললাম এবং বললাম যে, সে শুধু প্রণাম করেই চলে যাবে। শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন শুনেই মহারাজ বললেন: "নিয়ে এস।" শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছেন—এটা বলা আমার প্রথমেই উচিত ছিল। যাই হোক, মেয়েটিকে মহারাজের কাছে নিয়ে গেলাম। সে মহারাজকে প্রণাম করছে—আমি পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। প্রণাম করতে গিয়ে মেয়েটি কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ভীষণ কাঁদছে। আমি দেখলাম, মহারাজ একদম স্থির হয়ে গেলেন। ঐভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

মেয়েটি কেঁদেই চলেছে। মহারাজ শান্তভাবে মেয়েটিকে বললেন: "তুমি কাঁদছ কেন? বল—তোমার কী হয়েছে বল। তোমার কী কষ্ট বল।" মহারাজের ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরের একখানা ছবি ছিল। মেয়েটি ঐ ছবির দিকে তাকিয়ে বলল: "উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।" এই সময় আমি ঘর থেকে চলে এলাম। কারণ, আমার আর থাকাটা উচিত নয়, সব কথা আমার শোনা ঠিক নয়। পরে মহারাজের কাছে সব শুনেছিলাম। মেয়েটি ছিল বাল্যবিধবা, ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হবার মাত্র দু-সপ্তাহ পরে স্বামী মারা গিয়েছিল। সেসময় বিধবাদের যন্ত্রণা ছিল ভয়ানক। স্বামী মারা যাবার একবছর পরে সে মহারাজের কাছে এসেছিল। এই একবছর সে ভগবানের কাছে ক্রমাগত প্রার্থনা করেছে যে, "প্রভু আমি নিরাশ্রয়। আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। আমি কি করে বাকি জীবন কাটাব? তুমি আমাকে পথ দেখাও।" সে মহারাজকে বলেছিল: "এইরকম করে প্রায় একবছর ধরে ভগবানের কাছে কেবল প্রার্থনা করেছি। একদিন রাত্রিবেলা দেখি, সেটা স্বপ্ন নয় (মহারাজের ঘরে ঠাকুরের ছবিটা দেখিয়ে)—উনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুই কাঁদিসনি, কিছু ভাবিসনি—আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারে আছে, তুই সেখানে যা।' তারপর শ্বশুরবাড়িতে বলে আমার মায়ের কাছে কলকাতাতে—টালিগঞ্জে—আসি। মাকে স্বপ্নের কথা বলি। মা ওঁর কথা

জানতেন। তারপর ভাইকে নিয়ে খুঁজে খুঁজে সেখান থেকে বাগবাজারে এসেছি। কোথায় উদ্বোধন, কোথায় কি আমি তা কিছুই জানি না।—ঠাকুরের ছবিও কখনো দেখিনি। এইভাবে বাগবাজারে এসে জিজ্ঞেস করতে করতে উদ্বোধনে এলাম। সেখানে শরৎ মহারাজের কাছে একটুখানি বলতেই শরৎ মহারাজ আমাকে তক্ষুণি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" মেয়েটির সঙ্গে মহারাজের কথা হয়ে যাবার পর মহারাজ যখন আমাকে ডাকলেন তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। গিয়ে দেখি মেয়েটি হাসিমুখে বসে রয়েছে। তার দীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। মহারাজ আমাকে বললেন: "দেখ, এ খায়নি, এর আর ওর ভায়ের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দে।" আমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে বললাম। ওঁরা বললেন: "হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।" মেয়েটি ও তার ভাই ভিতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল। তারপর থেকে মেয়েটি মহারাজের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করত।[৩]

মহারাজের শরীর চলে যাবার পর মেয়েটির সঙ্গে আমার দু-একবার মাত্র দেখা হয়েছে। তারপর বহু বছর পর ১৯৪২-এ আমার সঙ্গে তার দেখা বেলুড় মঠে। এর মধ্যে সে আর মঠে আসেনি। আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল: "আমাকে চিনতে পারছেন?" আমি বললাম: "না।" অনেক বছর হয়ে গেছে, আমি চিনতে পারিনি। তখন সে আমাকে তার ঘটনাটা বলল। তখন আমার সব মনে পড়ে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: "তুমি এখন কোথায় থাক?" সে বলল: "টালিগঞ্জে।" ওর সঙ্গে আরও কয়েকটি মেয়ে ছিল। মেয়েগুলি তার সঙ্গে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: "তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" সে বলল: "আমি বৃন্দাবনে অনেক বছর কাটিয়েছি। তপস্যা করেছি। হরিদ্বারেও কয়েক বছর কাটিয়েছি—এখন আমি কলকাতায় থাকি।" ওকে দেখে তখন আমার মনে হলো, বেশ আনন্দে আছে সে। তার কথাবার্তা, চালচলন, মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে একটা কিছু পেয়েছে। আমি বললাম: "আবার এস।" কিন্তু আর আসেনি। তার সঙ্গের একটি মেয়ে বলল, সে ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেক গান লিখেছে। আমি বললাম: "আমায় দিয়ে যেও তো।" তারপর সেই মেয়েটি আমায় তার লেখা কয়েকটি গান দিয়ে গিয়েছিল। আমি সেগুলি পড়লাম। আমার কাছে রেখে দিলাম। ১৯৪৫-এ যে-মেয়েটি ঐ গানগুলো দিয়েছিল সে মঠে এসে একদিন আমাকে বলল, মেয়েটি মারা গেছে। তখন ওর কত বয়স হবে? ৪১-৪২ বছর। মেয়েটি বলল, মারা যাবার আগে সে তার মারা যাবার দিন, তারিখ, এমনকি সময়ও বলে দিয়েছিল। তারপরে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজ সবাইকে প্রণাম করতে করতে ঠিক ঐদিনে ঐসময় সে চলে গেল।

স্বামীজীর সঙ্গে ঠাকুরের একটা বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। দেশ-দেশান্তরে তাঁর ভাবপ্রচার এবং সংঘ-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীজীকে তিনি যন্ত্রস্বরূপ করেছিলেন। সেটা করবার জন্য স্বামীজীকে তিনি শক্তি দিয়েছিলেন। তাঁরই শক্তি তো! স্বামীজী বলছেন: "ঠাকুরের শক্তি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না।" আমেরিকাতে স্বামীজী তাঁর পাশে ঠাকুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। ঘুমের মধ্যে এসে তাঁর বক্তৃতার বক্তব্য বলে দিয়ে যাচ্ছেন। এটা আরেকটা স্তর। আর মহারাজকে ঠাকুর এই সংঘ চালাবার শক্তি দিয়েছিলেন। স্বামীজী একজায়গাতে বলছেন: "এমন একটা জিনিস তৈরি করে দেব, যেন সেটি মেশিনের মতো চলতে থাকে।" স্বামীজীর শরীর যাবার পর মহারাজকে এই সংঘ চালাতে হয়েছে। এই সংঘটিকে পরিচালনা করার জন্য যেন তিনি নির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তাঁর ধৈর্য, তাঁর নিঃস্বার্থপরতা সংঘকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিকতাটাই ছিল সবকিছুর মধ্যে প্রধান ও প্রথম। ঠাকুর বলতেন: "রাখাল একটা রাজ্য চালাতে পারে।" স্বামীজীর বাইরের প্রকাশটা দেখে আমরা চমকে যাই। মনে হয়, সমস্ত জগৎটাকে যেন তিনি গ্রাস করে ফেলবেন। আর মহারাজ? স্বামীজী বলছেন: "রাখাল সমস্ত আধ্যাত্মিকতা ভিতরে নিয়ে বসে আছে। সমস্ত মনটা তাঁতে দিয়ে বসে আছে।" এই হচ্ছে এঁদের কথা—এঁদের সঙ্গে, ঠাকুরের সন্তানদের সঙ্গে কারো তুলনা করা যাবে না।

মহারাজ খুব মজা করতে ভালবাসতেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব মজা করতেন। বলরাম বসুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের খেলার সাথীর মতো মিশতেন। তাদের খুব ভালবাসতেন। তাদের নিয়ে খেলা করতেন। মজা হচ্ছে, বাচ্চারাও তাঁকে তাদেরই একজন ভাবত। দিনরাত তাঁর কাছে পড়ে থাকত। তিনিও তাদের জন্য সন্দেশ, ফলটল সব রাখতেন। একদিন দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে উঠে বলছেন, বাচ্চাগুলোকে ভয় দেখাবেন। তাঁর ঘরে একটা বাঘের মুখোশ ছিল। আমাকে বললেন: "দরজা-জানলাগুলো সব বন্ধ করে দে তো—ঘরটা

৩ ঘটনাটি 'ব্রহ্মানন্দচরিত'-এও (পৃঃ ২০৯-২১০) উল্লিখিত হয়েছে।

অন্ধকার হয়ে যাবে, আর আমি বাঘের মুখোশটা পরে অন্ধকারে বসে থাকব। বাচ্চাগুলো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলে 'হুম' করে উঠব আর ওরা ভয় পেয়ে যাবে। বেশ মজা হবে।" কথামত উনি ঘরের ভিতরে গিয়ে বাঘের মুখোশ পরে বসলেন। তখন বেশ গরম। আমি ১০-১৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেছি। তারা তো হঠাৎ বাঘ দেখে চিৎকার করে একেবারে বাড়ির ভিতরে ছুটেছে। একজন তো ঘরের মধ্যে প্রায় জ্ঞান হারিয়েই ফেলল। তারপরে তাদেরকে আবার সব ধরেটরে নিয়ে আসা হলো। উনি তখন বাঘের মুখোশ ছেড়ে বসে আছেন আর হাসছেন। ওরা এলে জিজ্ঞেস করছেন: "কী হয়েছে?" মহারাজ এইভাবে তাঁর মনটাকে নিচে সাধারণ স্তরে নামিয়ে রাখতেন।

মহারাজ সম্বন্ধে ঠাকুরের যে-দর্শনের কথা আছে সেই 'কমলে কৃষ্ণ'র কথা মহারাজকে ঠাকুর কখনো বলেননি। ঠাকুরের অন্য সব সন্তানেরাই অবশ্য জানতেন, কিন্তু ঠাকুর তাঁর কাছে সেকথা বলতে তাঁদের বারণ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁকে না বললেও তিনি নিশ্চয় জানতেন। আমাদের বলতেন: "দ্যাখ, আমি সব জানি, সব বুঝতে পারি।" তবে তাঁর মুখে আমরা কখনো ঠাকুরের ঐ 'কমলে কৃষ্ণ' দর্শনের কথা শুনিনি। ঠাকুর তাঁর কাছে ঐ দর্শনের কথা আড়াল করেছিলেন, কারণ তাতে তাঁর স্বরূপের উদ্দীপনা হয়ে শরীর চলে যেত। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলছি। একদিন মঠে (বেলুড়ে) মহারাজ গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে আছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) সেখানে ছিলেন। মহারাজ বললেন: "দ্যাখ শুকুল, আমার সামনে একটা fine কাঁচের পর্দার ব্যবধান রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি ওদিকে যাবার উপায়। কিন্তু ঠাকুর যেতে দিচ্ছেন না।"

শিষ্যদের মহারাজ খুব ভালবাসতেন। তবে তিনি তো ভালবাসা দেখাবার জন্য শিষ্য করতেন না, তাই তাঁর ভালবাসার প্রকাশ দেখা যেত না। তাঁর ভালবাসা ছিল অনুভবের বিষয়। সে-ভালবাসার প্রকাশ ছিল এত সূক্ষ্ম যে, তাকে ঠিক বোঝা বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে এটুকু বলতে পারি, যেকেউ তাঁর ভালবাসা পেলে তার মধ্যে একটা change—একটা পরিবর্তন আসত। এই পরিবর্তন ঘটাটাই মহারাজের ভালবাসা পাবার লক্ষণ ছিল।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের। তবে বাগবাজারে মা থাকলেও তাঁর সঙ্গে প্রায়ই যে দেখা করতাম, তা নয়। অবশ্য যখন কোথাও যেতাম তখন মাকে আগে প্রণাম করে তবে যেতাম। মাকে বিশেষ প্রশ্ন করিনি। মনের এই ভাব ছিল—মা আছেন। মনে হতো যে, মার কাছে এসেছি, ব্যস—আর কোন প্রশ্নই আসত না মনে। কেন আসত না জানি না, তবে মায়ের কাছে গেলেই মনে সবসময় একটা পরিতৃপ্তির ভাব আসত। একটা চরম satisfaction আমাদের মধ্যে জাগত। মাকে কিছু প্রশ্ন করতে কেমন যেন একটা সম্ভ্রম মনে আসত। মায়ের ব্যবহারে, মায়ের কথায় এমন একটা অপার্থিব ভালবাসা ছিল যে, সত্যি সত্যি 'মা' বলে মনে হতো। একটা ঘটনা বলি। একবার তপস্যা করতে যাবার খুব ইচ্ছা হয়েছে। বাবুরাম মহারাজকে বলতে তিনি তো রেগে আগুন। তারপর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে রাজি করালাম। মহাপুরুষ মহারাজকে আগেই রাজি করিয়েছি। বাবুরাম মহারাজ বললেন: "মার কাছে গিয়ে বলগে যা।" মঠ থেকে মার কাছে গেলাম বিকেলবেলা। গিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। বললেন: "কী ব্যাপার?" তখন বললাম: "আমি তপস্যা করতে উত্তরাখণ্ডে যেতে চাই।" মা বললেন: "বস।" তারপর আমাকে প্রসাদ দিলেন। আমি খাচ্ছি আর মা আমাকে বোঝাচ্ছেন তপস্যায় না যেতে।

আমি চুপ করে আছি। কারণ, মায়ের কথাটি ঠিক মনে ধরছে না। মা তখন বললেন: "আমাকে কথা দাও, কোন কঠোরতা করবে না।" মনে ভয়—যদি কথা না রাখতে পারি? কিন্তু মা প্রায় আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ঐ একই কথা বলে যাচ্ছেন: "কঠোরতা করবে না।" তখন আমি দেখলাম, মা বারবার বলছেন, আমার চুপ করে থাকাটা ঠিক নয়। আমি বললাম: "না, মা, কঠোরতা করব না।" তখন বললেন: "যাও, কিচ্ছু ভয় নেই। ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি প্রার্থনা করছি। কিন্তু মনে রেখো, ইচ্ছে করে কঠোরতা করবে না। আমি বলছি, ঠাকুর তোমার কোন অভাব রাখবেন না।" মজা হচ্ছে, আমি কথা না দেওয়া পর্যন্ত মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষে বললেন: "বাবা, তপস্যার জন্য যখন তোমার এত আগ্রহ তখন পদব্রজে কাশী যাও। সেখানে অদ্বৈত আশ্রমে থাকবে। কখনো কঠোর করো না। মাধুকরী করে খাবে। তোমাদের অভাব হবে না। ঠাকুর তোমার সঙ্গে থাকবেন। তবে জেন, তপস্যাদি আলাদা করে তোমাদের কিছু করবার প্রয়োজন নেই।"

শশী মহারাজ, শুধু শশী মহারাজই বা কেন, ঠাকুরের সব পার্ষদই মহারাজকে ঠিক ঠাকুরের মতোই দেখতেন। তবে শশী মহারাজের ব্যাপারটি সত্যিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার

ছিল। একবার কোন একটা ব্যাপারে মহারাজ তাঁর ওপর দুঃখিত হয়েছেন। একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। তখন শশী মহারাজ মহারাজের কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর পায়ে ধরে বলছেন: "মহারাজ, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? আমার কাজে দুঃখ পেয়েছ? আমার মতো কত শশী তুমি মুহূর্তে সৃষ্টি করতে পার, আর তুমি আমার ওপর রাগ করেছ? আমার কাজে দুঃখ পেয়েছ?" এমনি ছিল মহারাজের প্রতি তাঁর বা তাঁদের ভক্তি।

মহারাজ চারটের আগে ঘুম থেকে উঠতেন। নিজে উঠে তারপর বলতেন: "সবাইকে তোল।" তখন সবাইকে ডেকে ঘুম থেকে তোলা হতো। কাশীতে থাকতেও মহারাজ এইরকম করতেন, তবে সেখানে সবাইকে ডাকতে বলতেন না। কারণ, অনেকে আবার রোগীদের সেবা-টেবা করতেন তো। মঠে তো স্বামীজীর সময় থেকেই নিয়ম করে দিলেন—চারটের সময় ঘণ্টা দিয়ে সবাইকে ঘুম থেকে তোলবার জন্য। তিনি বিছানা থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে এসে বসতেন। সব সাধুরাও ওঁর ঘরে এসে বসতেন। ঘরে ধরত না—বারান্দায়, এঘরে ওঘরে সাধুরা সব বসতেন। সকাল ছয়টা পর্যন্ত ঐরকম জপধ্যান চলত। তারপর গান হতো। তারপর সাধুরা চলে যেতেন। যে যার কাজকর্ম করতেন। কাজ সব ভাগ করা ছিল—কে কী করবেন। দেখতাম, উনি সবসময় সতর্ক থাকতেন। হয়তো ঝাঁট দিচ্ছি অথবা কোন জায়গা মুছছি—উনি দেখতেন সবটা ঠিক হচ্ছে কিনা, মানে each and every corner ঠিক ঠিক ঝাঁট দেওয়া ও মোছা হচ্ছে কিনা। কেউ হয়তো বাগানে কাজ করছেন, উনি দেখতেন নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজ ঠিক ঠিক করছেন কিনা। তারপর জলখাবার খেয়ে ঠাকুরঘরে যেতেন। ঠাকুরের ভোগ হবে, কী কুটনো কুটছে, ডিস্পেনসারির কাজ—সব দেখতেন। তারপরে বেলা হলে ভক্তরা আসত। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। বিশ্রামের পর তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আমাকে 'কথামৃত' বা অন্য কোন ধর্মপুস্তক থেকে পড়ে শোনাতে বলতেন। বিকেলবেলা ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। শীতকালে বেলা পাঁচটা আর গরমকালে ছটা বাজলে—যখন সন্ধ্যা হয়ে আসত—জপে বসতেন। সাধু-ব্রহ্মচারীরাও এসে মেঝেতে বসতেন, আমরাও বসতাম। যাঁরা আরতিতে যেতেন তাঁরা আরতির পর তাঁর ঘরে বা বারান্দায় এসে বসতেন। যে যার জপধ্যান করতেন। মন্দিরে ভোগ ওঠা পর্যন্ত ঐরকম চলত। ভোগ নামার পর রাত্রের আহার। সমস্ত পরিবেশ এক অপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যে পূর্ণ হয়ে থাকত। একপাশে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা, মাথার ওপর তারাভরা কালো আকাশ, মঠের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ। অন্যদিকে মহারাজের ঘরে, সংলগ্ন বারান্দায় সাধু-ব্রহ্মচারীরা ধ্যানরত। সত্যিই সে যেন পৃথিবীর বাইরে কোন স্থান—যেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে অনাবিল আনন্দ, মাধুর্য আর শান্তি। সে-ই তো দেবলোক। সাক্ষাৎ দেবরাজের মতো সেখানে অবস্থান করছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' এবং অগ্নি, বরুণ, সূর্যের মতো তাঁর গুরুভাইগণ।

রাত দশটার পর মহারাজ ঘুমোতে যেতেন। চারটের আগে ঘুম থেকে উঠতেন। যখন নিজে কিছু পড়তেন তখন গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে কোন বইয়ের দু-এক লাইন পড়েই বই বন্ধ করে দিতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন। তবে আধ্যাত্মিক উপদেশ সবসময়েই ব্যক্তিগত এবং প্রশ্নকর্তার আধ্যাত্মিক স্তর ও ব্যাকুলতার ওপর নির্ভর করত। এমনও হতো যে, একটি প্রশ্ন করবার কয়েক মাস পরে উনি উত্তর দিতেন। 'Spiritual Talks'-এ তাঁর উপদেশ এইভাবে বহু লোকের কাছে বহু জায়গায় বহু বছরের সংগ্রহের ফল।

মহারাজের ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে সম্ভ্রম আনত, ভয় নয়। গালাগালি খেয়েছি, বসে গল্প করেছি একসঙ্গে। আমাদের কিছু মনে হতো না। আসলে শুধু মহারাজ নন, ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের—যাঁদের আমি দেখেছি—সকলের সম্পর্কেই একথা বলা যায়। বাবুরাম মহারাজ একদিন মহারাজকে বলেছিলেন: "এরা আমাকে মানে না, এদের গালাগালি দিই, কিন্তু তবু এরা মানে না। এরা ধরে ফেলেছে যে, ওটা একটা বাইরের 'শো' (show)!" মহারাজ যখন রাগ করতেন আমাদের কিছুই মনে হতো না। মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন: "আমাদের রাগ জলের দাগ, বুঝলি!"

একবার মহারাজ একটা ব্যাপারে আমার ওপর খুব রাগ করেছেন। তারপরে বাবুরাম মহারাজ মহারাজকে গিয়ে বলছেন: "ওর কোন দোষ নেই।" তখন মহারাজ আমাকে ডেকেছেন। বলছেন: "হ্যাঁরে আমার কথায় তোর মনে কোন কষ্ট হয়েছে?" উনি এমন করে বলছেন যে, তখন আমারই মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি তখন বলছি: "না মহারাজ, আমার কিচ্ছু মনে হয়নি!" এরকম ঘটনা আরও বহুবার ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনায় তাঁর এবং তাঁর গুরুভাইদের গভীর ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি। সে-ভালবাসা এই জগতের নয়। তা দেবলোকের। তাঁদের কথা এই জগতের কথা নয়। দেবলোকের কথা।□

ক্যাসেট থেকে অনুলিখন: ডাঃ স্বয়ম্ভু মুখোপাধ্যায়
সংগ্রহ: স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

ক
বি
তা

শ্রীচণ্ডীসপ্তশতীস্তোত্রম্

রামপ্রসন্নভট্টাচার্য-নিবেদিতম্

প্রলয়জলধিতোয়ে কেশবে সুপ্তিমগ্নে
শ্রুতিমলভবদৈত্যৌ ব্রহ্মহত্যাপ্রবৃত্তৌ।
সভয়বিধিবচোভিঃ সংস্তুতা বিষ্ণুমায়া
মধুরিপুরবধীত্তৌ সংযুগে তৎপ্রভাবাৎ॥ ১॥
সকলকরণবৃত্তৌ জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
প্রকৃতিরহিতপুংসঃ কর্মতাবিদ্যতেন।
সকলসুরনরাস্তৎ সঙ্কটাৎ ত্রাতুকামা
অগতিশরণদাত্রীং বৈষ্ণবীং প্রার্থয়ন্তে॥২॥
মহিষবিজিতদেবা মর্ত্যবৎ প্রাণভীতা
বিপদি নিপতিতাস্তে স্থাপয়িত্বাঽগ্রভাগে।
কমলজননদেবং দেবমুখ্যৌ শরণ্যৌ
বৃষভবিহগযানৌ সংগতা জ্ঞাপয়িতুম্॥ ৩॥
অমররিপুকৃতাস্তা দুর্দশাভুক্তপূর্বা
নিকৃতমলিনবক্ত্রাস্তেঽব্রুবন্নানুপূর্ব্যম্।
নলিননয়ন ঈশো নাভিজন্মা চ দেবাঃ
কুটিলকুপিতনেত্রা ভীষণাস্যা বভূবঃ॥৪॥

মৃগপতিধৃতপাদা দেবতেজোঽংশজাতা
দনুজদলপতিং তং নাশয়িত্বা সসৈন্যম্।
ত্রিদশভবনরাজ্যং দেবতাভ্যঃ প্রদায়
সুরগণভয়হন্ত্রী সুস্থিরাং স্থানকার্ষীৎ॥ ৫॥
দিতিজযুগল দর্পাৎ পীড়িতা নির্জরাস্তে।
ভুবিবিচরণশীলাঃ শৈলকন্যাং প্রপন্নাঃ।
বিগলিতকরুণাদ্রিঃ সংস্মৃতা আর্তদেবান্
সপদি সদয়মূর্তিং দর্শয়ামাস দেবী॥ ৬॥
ধূম্রাক্ষং চণ্ডমুণ্ডৌ চ রক্তবীজমহংস্ততঃ।
নিশুম্ভং চ তথা শুম্ভং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥ ৭॥
দেবা রাজ্যং পুনঃ প্রাপুরুদ্ধৃতে দৈত্যকণ্টকে।
ত্রিলোকী চাঽভবচ্ শান্তা মহামায়াপ্রসাদতঃ॥ ৮॥
দেবি দেবান্ যথা পূর্বমরক্ষঃ পরমাপদঃ।
তথেদানীন্তনানার্তান্ অভয়ে নির্ভয়ান্ কুরু॥ ৯॥
দানবোত্থা মহাবাধা সমুৎপন্না ক্ষিতৌ পুনঃ।
অবতীর্য তথা মাতঃ করিষ্যস্যরিসংক্ষয়ম্॥ ১০॥

প্রলয়সমুদ্র সলিলে কেশব সুপ্তিমগ্ন হইলে তাঁহার কর্ণমল হইতে উৎপন্ন দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ভীত ব্রহ্মার স্তববাক্যের দ্বারা বিষ্ণুমায়া স্তুত হইয়াছিলেন। মধুরিপু বিষ্ণুমায়ার প্রভাবেই যুদ্ধে সেই দৈত্যদ্বয়কে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ১॥

জাগরিত বা নিদ্রিত যেকোন অবস্থাতেই সর্বপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ে প্রকৃতি-রহিত পুরুষের কোন কর্মক্ষমতা থাকে না। তাই সুর ও নরগণ সঙ্কট হইতে ত্রাণকামনায় অগতির আশ্রয়দাত্রী বৈষ্ণবীর নিকট প্রার্থনা করেন॥ ২॥

মহিষাসুরের দ্বারা পরাজিত হইয়া বিপদে পতিত দেবগণ মানুষের মতো প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া দুঃখবার্তা নিবেদন করিতে প্রসিদ্ধদেবতাদ্বয় বৃষবাহন মহাদেব ও গরুড়বাহন বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন॥৩॥

অপমানে মলিনবদন দেবগণ শত্রুকৃত সকল দুর্দশার বিবরণ আনুপূর্বিক প্রকাশ করিলে কমলনেত্র বিষ্ণু, শিব এবং নাভিজন্মা ব্রহ্মার মুখমণ্ডল কোপে কুটিল নেত্রযুক্ত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল॥ ৪॥

দেবগণের তেজের অংশ হইতে উৎপন্না দেবী সিংহাধিরূঢ়া হইয়া দৈত্যদলপতিকে হত্যা করিলেন এবং দেবগণের ভয় দূর করিয়া স্বর্গরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে সুস্থির করিলেন॥ ৫॥

দেবগণ পুনরায় দৈত্যযুগল কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে শৈলকন্যার শরণাপন্ন হইলেন। স্মরণ করামাত্র করুণাদ্রি দেবী বিগলিতা হইয়া আর্ত দেবগণের সম্মুখে সদয়মূর্তিতে আবির্ভূতা হইলেন॥ ৬॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড ও রক্তবীজ-সহ শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিলেন॥ ৭॥

মহামায়ার অনুগ্রহে দৈত্যরূপ কণ্টক উদ্ধৃত হইল, দেবগণ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং ত্রিভুবন শান্ত হইল॥ ৮॥

দেবি! তুমি দেবগণকে পূর্বকালে যেভাবে পরম আপৎ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, হে অভয়ে! বর্তমান কালের আর্তগণকে সেইভাবে নির্ভয় কর॥ ৯॥

দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ পুনরায় পৃথিবীতে মহাবাধা উপস্থিত হইয়াছে। মা, পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া শত্রুক্ষয় করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

দুদিকে দুই পাখি

ব্রত চক্রবর্তী

দুদিকে দুই পাখি
আমায় ডাকাডাকি
সারাদিনই করে,
বাইরে এবং ঘরে
সাদার পাশে কালো
আঁধার এবং আলো
কিচিরমিচির করে
বাহিরে অন্তরে
একটি পাখি সুখ
দুঃখ অপরজনা
একটি যদি পাওয়া
তৃষা অন্যজনা
দুদিকে দুই পাখি
মধ্যিখানে আঁকি
নিখিল চরাচর
আমার নিজের ঘর
দুতীরে দুই পাখি
করুক ডাকাডাকি
আমি ওদের মাঝে
নদী সকাল সাঁঝে...।

মাতৃরূপে

সনৎকুমার মিত্র

শক্তিকে দেখতে পাই না
তাকে অন্তরে অনুভব করি,
তাকে পাওয়ার জন্যে
মাতৃরূপে বন্দনা করি।

কখনো ইচ্ছাময়ী মা
কখনো লীলাময়ী মা
কখনো কালভয়হারিণী মা
কখনো করুণাময়ী মা।

তবু মায়ের রূপ দেখা অপূর্ণ থাকে
শক্তি ফিরে পেতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে
দেখতে চাই মাকে,
তাই যখন যেরূপে মাকে চাই
সেই মাতৃরূপে তাঁকে পূজা করে
শক্তিকে ফিরে পাই।

জাগরণ

শচীন দত্ত

দুর্গতিনাশিনী মাতা অসুরদলনী
অবতীর্ণা পৃথিবীতে দুঃখ-বিনাশিনী।
ক্লিষ্ট আর্ত জনগণ কাতর উচ্ছ্বাসে
তোমাকে আহ্বান করে প্রসন্ন বিশ্বাসে।

অধর্ম ও অনাচারে ভরে গেছে দেশ
ধর্ম আজ পরিত্যক্ত, সত্য, নিষ্ঠা শেষ
ধর্মনিরপেক্ষতার চাতুর্য-আড়ালে
তোষণ, পেষণ চলে স্বার্থ-অন্তরালে।

সাধুবেশী অমাত্যরা খেলে সতরঞ্চ
ভাষণ-বিলাসী সব শোভা করে মঞ্চ
নামাবলী গায়ে কেউ বিচিত্র মুখোশ
নির্লজ্জ শকুনি সব কৌশলে চৌকস।

অভীষ্টসিদ্ধিতে নামে জঘন্য পর্যায়ে
হিংসায়, সংঘর্ষে আর মাতে রক্তক্ষয়ে
প্রচ্ছন্ন মদতে কারো ঘটে সর্বনাশ
লালসার অগ্নিজিহ্বা সব করে গ্রাস।

অশান্ত পৃথিবী আজ, কলঙ্কিত দেশ
ন্যায়, নীতি অন্তর্হিত, সততা নিঃশেষ।
এ ঘোর দুর্দিনে মাতা ধর রুদ্র রূপ
সংহারের অসি তুলে দেখাও স্বরূপ।

মানুষের পশুত্বেরে কর মা বিনাশ
সকলের মনে আন সত্যের বিকাশ!
সুকঠোর হস্তে কর অসুরদলন
নবরূপে হোক আজ তব জাগরণ।

আসছে উমা ঘরের মেয়ে

শেখ সদরউদ্দীন

সোনা রোদের চাদর গায়ে আজ ধরণী হাসেরে—
সবুজ মনের নীলাকাশে খুশির ভেলা ভাসেরে।

গান উঠেছে আগমনীর, শিউলি বকুল তাই ফোটে—
খুশির খবর নিয়ে বাতাস দিকে দিকে আজ ছোটে।
প্রেমের ফুলে মৌমাছি-মন গেয়ে চলে গুঞ্জনে—
গাইছে দোয়েল শালিক শ্যামা, নাচে ফিঙে খঞ্জনে!
মায়ের হাসি যায় ছড়িয়ে দন্তশুভ্র কাশেরে—
সোনা রোদের চাদর গায়ে আজ ধরণী হাসেরে!

আসছে উমা, ঘরের মেয়ে, তাই ভরেছে মায়ের মন,
বাংলাদেশের মেনকাদের ঝরে হর্ষ-প্রস্রবণ!
কৃপাময়ী যিনি মাতা, দনুজ দলন তাঁরই পায়—
বিশ্বময়ী অন্নপূর্ণার তাই তো গীতি বিশ্ব গায়!

দুর্গতি নাশ করেন তিনি, দুর্গা-মা তাঁর নামটি তাই—
মা-ভবানী, শিব-ঘরণী, মা-শিবানী আসছে ভাই!
দশভুজা দশ হাতেতে দানব-দৈত্য নাশেরে—
সোনা রোদের চাদর গায়ে আজ ধরণী হাসেরে!

আজ পৃথিবীর বুকে দেখি, বড় বেশি পাপের ভার—
চারদিকেতে কান্না ওঠে, ওঠে মরণ-হাহাকার!
হানাহানি দ্বন্দ্ব নিয়ে মাতামাতি করছে সব—
কেমন করে পালব বল, আজ জাতীয় মহোৎসব?
হিংসা ঘৃণা ভুললে তবে ভালবাসার ফুটবে ফুল—
মানুষ-জনে ভালবেসে ভুলতে হবে সকল ভুল!
প্রীতি-প্রেমের সুবাস দিয়ে সবারে নাও পাশেরে—
সোনা রোদের চাদর গায়ে আজ ধরণী হাসেরে!

বেনো জল ও সবুজ জীবনের গল্প

সন্দীপন বিশ্বাস

নদীর সঙ্গে গল্প আমার ফুরোয় না,
কাঁটা বেঁধার ক্ষত আমার জুড়োয় না—
আমিই আমার মতো।

হারাই যে পথ সকাল এবং সাঁঝে।
স্বপ্ন বুনি চুমকি নীলের মাঝে,
হাজার অযুত শত।

এখন ঘরের দুয়ার খুলে কেউ—
ঢুকিয়ে দেয় নোনা জলের ঢেউ!
শুধুই অথৈ বেনো—

ফুল ফোটানোর মন্ত্র বেড়াই খুঁজে,
সবুজ বরণ জীবন নেব বুঝে—
জিতেই যাব জেনো।

তুমি ভালবেসে যাচ্ছ

উত্থানপদ বিজলী

যে বিত্তহীন মানুষটা ঝুলবারান্দার নিচে
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা
নিষ্প্রভ দিন কাটিয়ে গেল
তাকে তুমি অবহেলা করলে না।
যে চর্মকার সারাদিন দীনভাবে
অজস্র জুতোর ধুলোয় মেঘ গড়ে দিল
তুমি তার প্রতি ঘৃণা ঢেলে দিলে না।
যে নিরক্ষর মানুষ
পাথরের ওপর পাথর রেখে ভেঙে গেল দিন
তার বুকেও তুমি ঝরনা ডেকে দিলে।

তুমি কৃপণ নও।
এই রোদের মতো, এই হুহু বাতাসের মতো
তুমি ভালবেসে যাচ্ছ
সকলকেই।

আবির আবির আলিম্পন

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

দাও না আমায় একটি সকাল
রোদ ঝিলমিল
আকাশ নীল

দাও না আমায় একটি সকাল
পদ্ম-ফোটা
মেঘনা বিল

দাও না আমায় একটি সকাল
ফড়িং-ওড়া
সবুজ ধান

দাও না আমায় একটি সকাল
একতারাতে
বাউল গান

দাও না আমায় একটি সকাল
বউ কথা কও
লজ্জাবতী

দাও না আমায় একটি সকাল
ইচ্ছামতী
সরস্বতী

দাও না আমায় একটি সকাল
শিউলি সুবাস
কাশের বন
দাও না আমায় সেই সে সকাল
আবির আবির
আলিম্পন।...

এবার কি শুরু দেবারতি

শান্তিকুমার ঘোষ

সন্ধ্যার ধূসরিমা এখনো ঢাকেনি সাধের বাগান ঃ
জলে ভাসছে পদ্মের পাতা...
একে-একে ফুটল কমল।
দেবদারু মিনারে শেষ রশ্মি ;
যার যা ডাল তুলে ধরে জেগে আছে
তরুলতার ফুলগুলি।
এবার কি শুরু দেবারতি নক্ষত্র-নিখিলে ঃ
দুলবে প্রদীপ, ঘুরবে চামর মন্দিরার তালে।
কোথায় শূন্যের ভার, বিফলতা গরিমা পায়
মুকুট-মন্দিরে॥

শুধু এইটুকু প্রার্থনা

বিজয়কুমার দাস

সূর্যের কাছে বারবার নতজানু হয়ে বলেছি,
আলো দাও ; আলোয় ভরিয়ে দাও ভুবন
দূরে যাক সকল অন্ধকার।

আকাশের কাছে প্রতিদিনের প্রার্থনা ঃ
থাক, কাছে থাক, হৃদয়ের কাছাকাছি
ভুলিয়ে দাও সব অহঙ্কার।

সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে কামনা করেছি-
ধুয়ে দাও, সমস্ত কলুষ ধুয়ে দাও অন্তর হতে
এই হৃদয় শুদ্ধ কর বারবার।

পাহাড়ের কাছে গিয়ে মিনতি করেছি,
সব নীচতা তুচ্ছ করে মাথা তুলে দাঁড়াতে দাও
ভোলাও জীবনের তীব্র হাহাকার।

বৃক্ষের পায়ের কাছে বসে করেছি উচ্চারণ ঃ
ছায়া দাও, জুড়িয়ে দাও অস্থির হৃদয়
মন্ত্র শেখাও ভালবাসার।

আর কিছু নয়, শুধু এইটুকু প্রার্থনা আমার।

অস্তিত্ব

নিমাই মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।
ঘুমচোখে দরজা খুললাম।
কেউ কোথাও নেই।
আবার শুয়ে পড়লাম।
আবার করাঘাত
দরজা খুললাম।
কেউ কোথাও নেই
এসে শুয়ে পড়লাম।
আবার করাঘাতের শব্দ—
দেখলাম আমার বুকের ভিতরের দরজায়
করাঘাতের শব্দ।
চোখ বুজে শুনতে লাগলাম।
প্রশ্ন করলাম—তুমি কে ?
উত্তর পেলাম—আমি তোমার অস্তিত্ব।

প্রশ্ন

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

হয়তো আছ সেথায় তুমি
নিত্য যেথায় থাক,
মন-গহনের গোপন হতে
অলক্ষ্যেতে নামটি ধরে ডাক,
নয়তো তুমি কোনখানেই নেই;
জানাজানির সীমার শেষে
ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে
আছ মাত্র অলীক কল্পনাতেই।

বেশ তো আছ,
স্বপ্নলোকের স্বপ্ন হয়েই থাক,
কাজ কি আমার তোমায় জেনে,
সামনে এনে
বুঝতে পারি নাকো।

জাগরণের এই যে আকাশ
যেখানে তার শেষ,
হয়তো তাহার অন্য পারে
স্তব্ধতার ঐ বুকের তারে
তোমার ধ্বনি বাজছে অনিমেষ।

বিশ্বরূপের পদ্মদলে
হয়তো তোমার প্রভাই জ্বলে,
ঐ বিশেষেই আছ মিশে
নিরূপ, নির্বিশেষ।

তোমায় ঘিরে চক্রব্যূহের
এ কি বিষম ধাঁধা!
তন্ত্রে মন্ত্রে জট-পাকানো
চোখ-ধাঁধানো
এ কোন্ গোলকধাঁধা!

গণ্ডিকাটা ঘরের মাঝেই
কেবল ঘুরে মরি;
হাতড়ে বেড়াই ছকের মাঝে,
লুকোচুরির এই খেলা যে
কেবল বসে
কানামাছির কান্না দিয়েই ভরি!

অকূল যদি কূলের বাহু—
বন্ধনেতেই ধাঁধা,
সে-বাঁধনটি ছেঁড়ার তরে
এমন করে
ফের কেন তার কাঁদা?

জানি না কান্না দিয়ে
কিসের বোধন হবে!

মুক্ত যদি রয় সুখেতে
নিজেই গড়া বন্ধনেতে
বাঁধন কাটার বায়না কেন তবে?
কেন এমন বাইরে আসার
অবোধ লীলা-কল্পনা তার?
অঙ্গহারা অনঙ্গে কি
এই সুধা-স্বাদ রবে?

বিপুল তুমি, মোর দুকূলে
সীমার ছোট ঘরে
যদিই তোমার অন্ত-আদির,
নিরুপাধির
রূপ-ছায়া না ধরে,
কি দিয়ে বা ধরব তোমায় আর?
ভূমিতে যার খোঁজ পাওয়া দায়,
কি লাভ তারে খুঁজে ভূমায়?
স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন গাঁথাই সার।

অলীক আশার ইন্দ্রজালে
তবু এ কোন্ মায়া!
শূন্যভরে স্বপ্ন ছোঁড়ার,
মুগ্ধ লীলার ছলাকলার
কুহক আলো-ছায়া?
আলোয় কালোয় এ কোন্ স্বয়ম্বর?
প্রত্যহের এই ক্ষুদ্র দীপে
কূলহারা সেই দূর তমসার
কূল খোঁজা তো
ভুলেরই নামান্তর।

কেমন করে বল তবে
মনের কাঁটা ধন্য হবে,
অরূপ মুকুল ফুটবে রূপের
বৃন্তখানির পর?

প্রশ্ন যত মৃণের মতো
দিলাম তোমার হাতে,
হয়তো তুমি সত্যি আছ,
নয় তো কল্পনাতে।

থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে স্বামী বিবেকানন্দ

মঞ্জুভাষ মিত্র

নান্দীপাঠ—পয়ারের ছন্দে

১৮ জুন ১৮৯৫, শুভ মঙ্গলবারের ভোরবেলা
নিউহ্যাম্পশায়ারের হোয়াইট মাউন্টেন থেকে স্বামীজী যাচ্ছেন ট্রেনযোগে
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রী, দুশ মাইলের মতো পথ পাড়ি দিয়ে পশ্চিমী উজানে—
সেন্ট লরেন্স স্টীমার আসছে রূপসী নদীপথে—ধন্য মিস মেরি এলিজাবেথ ডাচার
তাঁর দ্বিতল কুটিরে আজ এক সুজন অতিথি—তারি জন্য যোজিত নূতন অংশ সেজেছে বাটিকা
হে চিৎকারমুখর বিশ্ব স্তব্ধ হও, বন্ধ কর লোভ যশ অর্থ বিত্ত আকাঙ্ক্ষার ভ্রান্ত কপাটিকা;
সে ছিল মিলনলগ্ন মানুষ প্রকৃতি ঈশ্বরের, সুন্দরকে ডেকেছিল সময়ের সুচারু ইঙ্গিত
অভ্যর্থনা-পতাকায় তাঁর নাম লেখা ছিল—দূরে ছিল মায়া নদী, পালতোলা তরণীসমূহ
মাত্র কুড়িটি বছর হলো এ স্থান নির্মিত, এমন মানুষ এখানে আসেনি কেউ আগে
বিবেকানন্দের পদ্মপলাশ নয়নদুটি একদিন এইখানে ফুটে উঠেছিল দীপ্ত অনুরাগে।

আরোহণ—গীতিছন্দে

ধ্যানের ভিতর মগ্নমানস পেয়েছে শান্ত গভীর নীড়
কোলাহলময় শহরের কাজকর্ম এবং উত্তেজনার হাজার অসুখ
দূরে ফেলে রেখে এইখানে এস, যদি পেতে চাও মুক্ত সুখ
শিশুর মতন; দেহমন হোক আকাশপ্লাবিনী গভীর ঘুমের অধিগত
প্রকৃতিদৃশ্য চোখের পাতায় কোমল আঙুল বুলিয়ে যায়
ফল আর দুধ খেয়ে দিন কাটে, দিন কেটে যায় প্রিয়তম কিছু বই পড়ে পড়ে
কিংবা হয়তো লেখায় মগ্ন; গভীর শান্তি আত্মাকে এসে ছুঁয়ে যায়
নেই কোন কাজ, কর্তব্যও দূর অপগত—একি ভারহীন আমি আজ
অনন্ত এক বিশ্রামসুখ প্রিয় অলসতা উপভোগ করে আমি হয়ে গেছি রাজাধিরাজ
মহাসময়ের; প্রকৃতির যিনি অধিপতি সেই প্রভুর নাম
মধুজিহ্বায় স্ফুরিত হচ্ছে, মাথায় তাঁহার সবুজ লতা ও পাতার মুকুট
হাতে ফুলফল; পাখি প্রজাপতি বৃষ্টি বাতাস সবকিছু করে তাঁহাকে প্রণাম
আবেদন আর নিবেদনে ভরা বোঝাটিকে বয়ে 'চাই চাই' করে হাটে মাঠে ঘোরা
আজ আর নয়; আজ এইখানে যা চেয়েছি আমি সে প্রিয়জীবন ধরা দিল এসে।

আত্মবিশ্লেষণ—গদ্যছন্দে

অল্প কয়েকজন আপনমনের সঙ্গী মানবমানবীকে নবীন সন্ন্যাসী শেখাচ্ছেন জ্ঞান, শেখাচ্ছেন ধ্যান। পূর্ণ হবে কি তাঁর বাঞ্ছা? প্রাণের উষ্ণতা দিয়ে অন্ততঃ একটি পদ্মও কি তিনি ফোটাবেন, অন্ততঃ একজনের মনেও কি তিনি পারবেন মুক্তিবীজ বপন করতে? থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে সারাদিন নিজের ভিতর অনন্ত শক্তির উপস্থিতি অনুভব করা যায়; এই শক্তি উপড়ে ফেলতে পারে বর্বরের ঈর্ষা হিংসা শক্তির অভিমানকে, থামিয়ে দিতে পারে দুর্জনের মুখবিকার ও ব্যঙ্গকে মুহূর্তে। কিন্তু এই স্থান থেকে চলে যেতে হবে স্থানান্তরে। সুন্দরের চলমান ডানা কখনো একস্থানে বেশিদিন আবদ্ধ হয়ে থাকে না। তবু ক্রিস্টিনের মতো চিরন্তনী ভগিনীকে এখানেই পাওয়া গেল। আমার সৌভাগ্যপাশার দান সঠিক পড়েছে—। আমিই সেই আমিই সেই—এই মন্ত্র নিরন্তর জপ কর। দুর্বল, এভাবেই শক্তিমান হও। সহস্রদ্বীপ উদ্যানে শতবর্ষ আগে রোপিত প্রেমবীজ ঐ দেখ পুনশ্চ অঙ্কুরিত হচ্ছে...

ভাব-অনুকম্পন—ছড়ার ছন্দে

গাছপালার ভিতর থাক ত্রিদশ ঈশ্বর
শান্ত সময় শান্ত সাগর অনন্তেরই পদচিহ্ন আঁকা
বোধিমূলে বোধিসত্ত্ব: ওকগাছটির তলায় ধ্যান
আসবে যে ঝড় ঝরবে যে জল পানরত পাখির ডানা
মনে পড়বে কলকাতাতে বাগানজুড়ে বৃষ্টি পড়ে

চেতনাকে খুঁজে পেলাম জীবনদেবের স্পর্শ পেয়ে
পথিক তো সেই যাবেই চলে, থাকবে তাহার মধুস্মৃতি
অনুকম্পন বিশ্ব ভরল, সন্ন্যাসিস্বর ডেকে বলে—
বিদায় দাও হে সবুজভূমি, তোমাকে আমি ভালবাসি
প্রিয় উদ্যান, নারীপুরুষ, তোমাদের আমি ভালবাসি।

মানুষের মিছিল

প্রবীর মিত্র

জগৎ, দেশ, স্থান, কাল নিয়ে
জীবনের জয়গান গাইতে
সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকি।
বারে বারে সুর কেটে যায়
ছন্দপতন ঘটে
মানুষ হারিয়ে যায় মানুষের মিছিলে
মনুষ্যত্বের অভাববোধের দায় নিয়ে।
ঘন ঘন দেওয়াল উঠতে দেখি
মানুষের মনে, জগতের ডালে
সমুদ্রের জলে, দেশের মাটিতে।
বুদ্ধির ব্যাপ্তি নিয়ে
যখন আকাশের দিকে চোখ মেলি
তখন সমস্ত দেওয়াল ভাঙার তাগিদে
ভালবাসার প্লাবনে
মনের সব মালিন্য ভেসে যায়।
সুর ঘোরে ফেরে অবচেতনে।
স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে
আদর্শ চোখ মেলে
মর্তের অন্ধকারে।
অমর্তের আনন্দের স্রোত
হোঁচট খেয়ে হঠাৎ থামে।
দিগন্তবিস্তৃত কালোর মাঝে
আলো কোথায় আছে?
মূল্যবোধের অবক্ষয়
রাজনীতির সুযোগসন্ধানী পদক্ষেপ
ক্ষমতার লোভে ক্ষুদ্র স্বার্থের তাগিদে
মানুষকে পদদলিত করা
মনের সঙ্গে মুখের ভেদে
নিজের সত্তাকে হত্যা
মনের গহনে মহা আপনের
সঙ্গে ক্ষণিকের হঠাৎ মিলনে
বিদ্যুৎ চমকে ওঠে!
উপলব্ধির স্তরে
অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে
উষার আলোর তীব্র আকাঙ্ক্ষা
মানুষকে 'সত্যে'র একাকীত্বে
পবিত্র হতে বলে।
কালোর মাঝে আলোর প্রকাশ
শাশ্বত 'সত্যে'র মধুরিমায়।
সত্য কি?
মানুষের চলার সুখে বলার মুখে,
ব্যথা-বেদনার রাগে
সহানুভূতির স্পর্শে, সহমর্মিতার স্বতঃস্ফূর্ততায়
চিরন্তন সত্যের রূপকল্প
উপলব্ধির দরজায় করাঘাত করে।
মানুষের মিছিলে মানুষকে দেখি
নব নব রূপে।
এগিয়ে-চলা মানুষ
পিছিয়ে-পড়া মানুষ
ক্ষুর রৌদ্রের মাঝে দেখি
সংগ্রামী প্রত্যয়।
প্রকৃতির প্রশান্ত সবুজে
দেখি আত্মিক বিহ্বলতা
দেখি আত্মমুখী স্খলন
দেখি অন্তর্মুখী স্ফুরণ।
বিবেকহীন নির্মমতায়
অবিশ্বাসীর আত্মার আর্তনাদ
শ্রবণকে ব্যথিত করে
চেতনার গভীরে
সজাগ করে বেদনার প্রহরীকে।
মানুষের মিছিলে মানুষের
পাশে চলতে চলতে
এই চলা ব্যাপ্ত হয়
মর্মে, কর্মে, অন্তরে, অন্তরীক্ষে।
'জন্ম' থেকে 'মৃত্যু'র মাঝে
যে 'শুরু' এবং 'শেষ'-এর ইঙ্গিত
তার অলীকত্বের উপলব্ধি
অসীম আনন্দের সুর বহন করে।
সৃষ্টির বৈচিত্র্যের ব্যাপকতার মধ্যে
'আছি' এবং 'নেই' হারিয়ে যায়
সময়হীন, নিমেষহীন
এক মহানিমেষের মহাসমুদ্রে।
মানুষের মিছিলে মানুষের চিরচলার
সাময়িক ছেদ
মৃত্যুর অন্ধকার উত্তরণ করে
কর্মের ব্যঞ্জনায়, উপলব্ধির মূর্ছনায়
চিরন্তন মহামিছিলে ভাস্বর হয়
দেহ থেকে দেহান্তরে
পিছনের মানুষের জন্য
আলোর মশাল হাতে।

ভোর

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

অনেকদিন কেটেছে এলোমেলো
এবার আমি ঘরে ফিরতে চাই
সুখের আঠা জড়িয়ে সারা গায়
অনেক হলো এবার ফিরে যাই।

গাছের পাতা হারান সতেজতা
মক্ষিকার ডানাও হলো ভারী,
এবার আন, এবার চাল জল,
কনকচাঁপা ফুলের বলিহারি।

জানি বলেই বলেছি সখা শোন
বহুদিনের হারানো কথা বল,
যাবার আগে কারুর পিছু ডাকে
চক্ষু-দুটি হোক না ছলছল।

সুখের আঠা অনেক মেখেছি গো
এবার দুঃখ আসুক প্রিয় হয়ে,
শুভাকাঙ্ক্ষী নদীর জলধারা
বসুন্ধরা আমায় নিও সয়ে।

কাজ করিনি অকাজে দিন গেছে
শীতের হাওয়া নিঃস্ব করে গেল
এবার বনে ভাঙুক নীরবতা
ঘুমের শেষে কুসুমভোর এল।

মন্ত্র

হিমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়

এবার তোমার নামে পতাকা ওড়াব পথে পথে
অমল আলোকে বর্ণবিচ্ছুরণে বিজয়ী তোমাকে
সরব বন্দনা করি গম্ভীর সামের মন্ত্রে, ঋকে।

তুমি বাক্যাতীত, তুমি শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণের ওপারে
অপার মহিমা তুমি বিশ্বাসের স্বচ্ছতোয়া নদী
তোমার চরণ ধুয়ে মিশে যায় ভোগবতী স্রোতে।

ব্রহ্ম থেকে স্তম্ব সব বৃক্ষ গুল্ম লতা পশু পাখি
তোমার বিচিত্র রূপ ইচ্ছা হয় ছন্দে ধরে রাখি।

জীবনসন্ধি

স্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের নায়ক তিনি,
বদলে দিয়েছেন মানুষের অভ্যস্ত চলার পথ
মানুষের চেতনায় ঘটিয়েছেন বিপ্লব

অনায়াসে সময়-সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে
ভূগোল ইতিহাস লঙ্ঘন করে
বারে বারে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন
তাঁর চলার পথে।

একই আকাশে দুই ভ্রাতৃসূর্যের ক্ষমতার লড়াই চলেছে
সভ্যতার শুরুরও আগে থেকে
অজানা কোন শেষের সন্ধানে
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে।

দুই পক্ষে সৈন্যরা যুদ্ধের অপেক্ষায়,
শ্লোগান উঠছে অথবা আহ্বান
বিপ্লবের জয়ধ্বনি দিয়ে—ইনকিলাব চরৈবেতি!
এদিকে ধর্ম ওদিকে ধর্মহীনতা
এদিকে সখারূপে সারথি-নারায়ণ
ওদিকে নারায়ণী সেনার কদমতালে নারায়ণ-বিস্মরণ
এদিকে জড়ের কেতন ওড়ে
বিপ্লবের পথে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে
ঘৃণায় শাণিত অস্ত্র রক্ত ঝরায়।
অনেক মানুষকে লাশ হতে হয়
তাদের কবরে গড়া হয় মিথ্যা সুখের
রোবটকল্প কীর্তি-অভিমানী সৌধ।

অপরদিকে ঘোষিত হয় চৈতন্যের জয়গান
বিপ্লব এগিয়ে যায়, আগুন নিভে যায়
ভালবাসার ঋণ শোধ হয় বুকের রক্ত দিয়ে।

আমরা যারা পদাতিক
অথবা রথী-মহারথী অশ্ব-গজপতি
নিজেদের মতো বেছে নিই চলার পথের নায়ক
এদলে অথবা ওদলে
নারায়ণ অথবা নারায়ণী সেনাকে
রক্তদান অথবা রক্তপানকে ঃ
আর সেই জীবনসন্ধ্যায় স্থির হয়
জীবন কী হারিয়ে যাবে চেতনাহীন যান্ত্রিকতার মাঝে
জড়ের পতাকার নিচে? নাকি অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে
আসবে সে "মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে"
অমৃতপরশে কল্মষ অপনীত হবে
ব্যক্ত হবে মৃত্যুর মাঝে জীবনের জয়গান।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ

লেখক নারায়ণচন্দ্র ঘোষ আলমবাজারে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যধন্য সিঁথির মহেন্দ্রনাথ পালের তিনি বড় শ্যালক। তাঁর স্বহস্তে লেখা বর্তমান স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটি আমরা পেয়েছি তাঁর পৌত্র চিন্তামণি ঘোষের সৌজন্যে। চিন্তামণি ঘোষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন বাগবাজারের অমিতা গঙ্গোপাধ্যায়।—সম্পাদক, উদ্বোধন

ছয় বছর বয়সে আমি [আলমবাজারে] তিনকড়ি পণ্ডিত মশাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি হই। তিনি আমাকে বড় ভালবাসতেন। পাঠশালায় তালপাতার ওপরে লেখা শেখানো হতো। একবছর পর কাগজে লেখা শুরু হলো। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ এবং বোধোদয় পড়তে লাগলাম। ক্রমে কথাসার, ভূগোলসূত্র, ব্যাকরণসেতু, প্রাণিবৃত্তান্ত ইত্যাদি শেষ করে প্রথম শ্রেণীতে উঠলাম। তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীতে সীতার বনবাস, ইংরেজী ফাস্ট বুক ইত্যাদি পড়ানো হতো। অঙ্কের খাতায় আমার অঙ্ক কমই থাকত, বেশির ভাগই ছবি এঁকে পাতা ভর্তি করতাম। পণ্ডিত মশাই খুব রাগ করতেন। ক্রমে ঐকথা আমার বাবার কানে ওঠে। তিনিও খুব বিরক্ত হন। কিন্তু আমার ছবি আঁকার রোগ সারল না, বরং বাড়তেই লাগল। অবশেষে প্রথম শ্রেণীতে পড়তে পড়তে আমাব ঐ পাঠশালায় পড়া শেষ হলো। বাবা আমাকে বরানগর কুঠিঘাটায় শিবু গুহ মহাশয়ের হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (তখনকার অষ্টম শ্রেণীতে) ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলে আমাদের শিক্ষক ছিলেন আগরপাড়া-নিবাসী নবীনচন্দ্র দাশ। বাবা তাঁকে রোজ বিকাল চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত আমার গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করে দেন। কিন্তু অঙ্কের খাতায় আমার ছবি আঁকা বন্ধ না হওয়ায় কিছুদিন পর বাবা আমাকে স্কুলে যেতে নিষেধ করলেন এবং বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করলেন। যদুনাথ ব্রহ্ম নামে এক ভদ্রলোককে তিনি দশ টাকা বেতনে আমার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি বেলা এগারটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত আমাকে এসে পড়াতেন। পড়াশোনা চলল, ছবি আঁকাও চলল। যদুবাবু সেকথা বাবাকে জানালে বাবা রাগ করে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কয়েকদিন পরে বাবার রাগ পড়লে আমার আগ্রহের জন্য বউবাজার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিলেন।

আর্ট স্কুলে আমার শিক্ষা চলতে থাকল। সেখানে নবীন নামে যশোরের একটি ছাত্র ছিল। সে একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমাদের বরানগর থেকে রাসমণির কালীবাড়ি কতদূর ?" আমি বললাম ঃ "কাছেই।" নবীন বলল ঃ "চল, আজকে ক্লাস করব না, তোমাদের বাড়ি যাব।" আমি বললাম ঃ "চল।" উভয়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে বারটার ট্রেনে বেলঘরিয়ায় নামলাম। বেলঘরিয়া থেকে মাঠের পথ ধরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকে রাসমণির কালীমন্দির দেখে নবীন বলল ঃ "আগে কালীদর্শন করে তোমার বাড়ি যাব।" কালীবাড়িতে এলাম, কিন্তু কালীদর্শন হলো না। কারণ, মন্দির বন্ধ ছিল। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল ঃ "বিকাল চারটেয় মন্দিরের দরজা খোলা হবে।" অগত্যা আমরা পঞ্চবটীতে এসে বসলাম। বেলা তখন আন্দাজ তিনটা। নবীন ও আমি দুজনেই গান গাইতে পারতাম। পঞ্চবটীতে বসে নবীন গান[১] ধরল ঃ

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' (১ম খণ্ড, ১৩৫৩, পৃঃ ১৮২) অনুসারে এই গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবের সময় (জানুয়ারি ১৮৮৭)। বর্তমান লেখকের বক্তব্য ঠিক হলে গানটি অন্ততঃ ১৮৮২-১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে রচিত হওয়ার কথা। কবির নিজের কথাতেও এমনটি হওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, মাঘোৎসবে (মাঘ ১২৯৩) গানটি তিনি 'তৈরি' করেছিলেন। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, আখরযুক্তভাবে বা কীর্তনাঙ্গে গানটি তিনি কয়েকবছর আগেই রচনা করেছিলেন। [দ্রঃ গীতবিতান (অখণ্ড)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৪ সং, পৃঃ ৯৯৮-৯৯৯]—সম্পাদক, উদ্বোধন

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।..."

নবীনের গান শেষ হতে আমি গান ধরলাম ঃ

"তোমা বিনা কে বল সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে?"

ঠিক ঐসময়ে পঞ্চবটীর পূর্বদিকে পুষ্করিণীর দিক থেকে একটি লোক বলল ঃ "কেরে—কেরে?" তাকিয়ে দেখলাম, লোকটি আমাদের দিকে আসছে। দেখে খুব একটা স্বাভাবিক মনে হলো না—মনে হলো, লোকটি পাগল। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল ঃ " 'কে সহায় ভব-অন্ধকারে'! বাঃ বাঃ! খুব সত্যি—'কে সহায় ভব-অন্ধকারে'! সে বিনা কে সহায় বল? গা, আবার গা।" আমাদের খুব কাছে এসে লোকটি জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোরা থাকিস কোথা? তোদের নাম কি?" লোকটির কথার ভঙ্গিতে আমরা নিশ্চিত হলাম—সে পাগলই। কালীবাড়িতে বোধহয় প্রসাদ পেতে এসেছে। নবীন জিজ্ঞাসা করল ঃ "তোমার বাড়ি কোথায়?" পাগল বলল ঃ "আমার বাড়ি?—অ-নে-ক দূর। কিন্তু এখানেই থাকি। মাকে ডাকি আর দুবেলাই দেখি। গা, গা, আবার গা। 'তোমা বিনা কে বল সঙ্কট নিবারে/কে সহায় ভব-অন্ধকারে'!" নবীন আমাকে আস্তে আস্তে বলল ঃ "মাথা খারাপ!" আমি বললাম ঃ "তাই মনে হচ্ছে।" পাগল আমাদের সেসব কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না, বলল ঃ "মাকে দেখতে এসেছিস—চ, চ, দেখবি চ।"

পাগলের কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা উঠে দাঁড়ালাম। পাগল আমাদের নিয়ে মন্দিরের দিকে চলল। ইতিমধ্যে মন্দিরের দরজা খুলেছে। মন্দিরের দরজার সামনে গিয়ে পাগল বলল ঃ "আয়, দেখবি আয়।" মায়ের দর্শন হলে পাগল বলল ঃ "এখানে বস।" আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেখানে বসলাম। পাগল মায়ের পদতল থেকে ফুল এবং তাম্রকুশীতে চরণামৃত নিয়ে আমাদের দিল। তারপর বলল ঃ "চল, আমার ঘরে চল।" আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং পোষা কুকুরের মতো তাঁর পিছু পিছু চললাম। আমাদের মনে বড় ধোঁকা লাগল। ভাবলাম, এ পাগল কে?—একি সত্যিই পাগল? ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ঘরে সে আমাদের নিয়ে এল। আমাদের হাতে শশা, পেঁপে ও সন্দেশ দিয়ে বলল ঃ "খা—মার প্রসাদ খা।" আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রসাদ খেলাম। পশ্চিমদিকের বারান্দায় হাতে জল দিয়ে আমাদের হাত ধোয়ালে। বললে ঃ "বড় ভাল গেয়েছিস—'তোমা বিনা কে বল সঙ্কট নিবারে'। যা, এবার বাড়ি যা।" আমরা বাড়ির পথ ধরলাম, কিন্তু লোকটি কে তা বুঝতে পারলাম না। তবে ততক্ষণে দুজনেই নিঃসংশয় হয়েছি যে, সে পাগল কখনোই নয়। দুজনের মনেই এই প্রবল প্রশ্ন উঠল—"তবে সে কে?" যাই হোক, নবীন কলকাতায় গেল, আমি বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু ঘুম হলো না। মনের মধ্যে খালি একটা ধাক্কা মারতে লাগল—লোকটি কে? অবশেষে রাত শেষ হয়ে গেল। ভোর হতে কালীবাড়ি ছুটলাম। এবার সোজা লোকটির ঘরে। দেখলাম, সে ঘরে খাটের ওপর বসে আছে। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে পদধূলি নিলাম। পরম স্নেহে আমার হাত ধরে তিনি তুললেন। বললেন ঃ "তোর নাম কি?" আমি বললাম ঃ "নারায়ণচন্দ্র ঘোষ।" শুনেই তাঁর মুখটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন ঃ "নারায়ণ! বেশ বেশ। কাল যে-গানটি গেয়েছিলি, ঐ গানের কথাগুলি সবসময় মনে রাখবি—'তোমা বিনা কে বল সঙ্কট নিবারে/কে সহায় ভব-অন্ধকারে'। কখনো ভুলিসনি। সময় পেলেই এখানে আসিস।" পুনরায় প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু জানা হলো না, কে তিনি। তিনি চেনা দিলেনও না। তবে তখন থেকে প্রায়ই আমি তাঁকে দর্শন করতে যেতাম। যখনই যেতাম, ফল, সন্দেশ প্রসাদ পেতাম। তিনি গান গাইতে বলতেন। আমি গাইতাম। একদিন ভাণ্ডারী মশাইয়ের [পীতাম্বর ভাণ্ডারী?] কাছে শুনলাম, তিনিই রামকৃষ্ণ পরমহংস।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এগিয়ে চলল। আমি আর্ট স্কুলে যেতাম, ছবিও আঁকতাম, কিন্তু মন পড়ে থাকত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে। আর্ট স্কুল থেকে প্রতি শুক্রবার বিকাল পাঁচটার ট্রেনে বেলঘরিয়ায় নেমে ঠাকুরের কাছে আসতাম। রাত্রে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। শনি ও রবিবার স্কুলের ছুটি। শনিবার দুপুরে আহার করেই কালীবাড়িতে চলে যেতাম। রবিবার অবশ্য যেতাম না, কারণ রবিবার তাঁর কাছে বড় ভিড় হতো। তাঁকে আলাদাভাবে পাওয়া যেত না, কথাবার্তাও হতো না। রবিবার কলকাতা থেকে বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর কাছে আসতেন।

আষাঢ় মাসের একদিনের কথা। মায়ের সন্ধ্যারতি কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। আটটার পর ঠাকুর মন্দির থেকে এসে পীতাম্বর ভাণ্ডারী মশাইকে বললেন ঃ

"ওগো, আজ ঝিমঝিমে বৃষ্টি হচ্ছে। এরকম বৃষ্টির সময় দেশে আমি মুড়ি খেতাম, তুমি চারটি মুড়ি আনতে পারবে?" ভাণ্ডারী মশাই একটি লোককে ডেকে বললেন: "আমার বাড়ি থেকে চারটি মুড়ি শিগ্‌গির নিয়ে আয়।" অল্পক্ষণের মধ্যেই মুড়ি এসে গেল। আমরা প্রায় পাঁচ-ছয় জন তাঁর ঘরে বসেছিলাম। আমি ও ভাণ্ডারী মশাই ঠাকুরের খুব কাছেই বসতাম। আমার বসার কারণ, আমি জানতাম, ঠাকুর আমার। ভাণ্ডারী মশাইও বোধহয় তাই মনে করতেন। বস্তুতঃ, আমরা যারা তাঁর কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতাম, সকলেই মনে করতাম তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের সবচেয়ে নিকট সম্বন্ধ। ঠাকুর একটি চাঙারিতে মুড়ি ঢেলে নিজের হাতে প্রত্যেককে দিলেন। আমাকে দেবার সময় বললেন: "নারায়ণ, প্রসাদ নে।" আমি বললাম: "প্রসাদ না হলে প্রসাদ নেব না।" করুণাময় ঠাকুর তাঁর হাতে ধরা মুড়িতে জিভ দিয়ে একটু ছুঁয়ে ভাবস্থ হয়ে আমাকে বললেন: "খা, প্রসাদ খা!" আমি দুহাত পেতে তাঁর হাত থেকে মুড়ি প্রসাদ নিলাম এবং পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম। দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেল। আমি আর্ট স্কুল ছেড়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে সিন-পেইন্টারের কাজে নিযুক্ত হলাম, কিন্তু ঠাকুরকে কখনো ভুলিনি। প্রায়ই বিকাল পাঁচটার পর তাঁকে দর্শন করতে কালীবাড়িতে আসতাম এবং রাত নয়টার পর বাড়ি ফিরতাম। এইভাবে আট-নয় মাস চলে গেল। আমি সিন-পেইন্টারের কাজ ছেড়ে অর্ধেন্দু মুস্তাফির কাছে অভিনয় শিক্ষা করতে লাগলাম এবং রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত বেতনভোগী অভিনেতার কাজে নিযুক্ত হলাম। কিন্তু এতে আমার প্রভুদর্শনে বিঘ্ন ঘটল। সময় অভাবে আর বড় আসতে পারি না, কিন্তু প্রভুকে ভুলিনি। সময় পেলেই দক্ষিণেশ্বরে এসে প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করি। ঠাকুর গিরিশবাবুকে আমার কথা বলেছিলেন যাতে তিনি আমাকে অভিনয় শিক্ষা দেন। এইভাবে আরও একবছর চলে গেল।

একদিনের কথা। জ্যৈষ্ঠ মাস। সেদিন ছিল শনিবার। রাত্রে কালীবাড়িতে ছিলাম। রাত নয়টার পর আমি, ভাণ্ডারী মশাই, সিঁথির মহেন্দ্র পাল (কবিরাজ), মহেন্দ্র মাস্টার (শ্রীম) এবং আরও দু-তিনজন ঠাকুরের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি। হঠাৎ ঠাকুর আমাকে বললেন: "নারাণ ঠাকুর, থিয়েটার করছ—একটা গান গাও শুনি।" আমি চুপ করে রয়েছি দেখে আবার বললেন: "ভয় কি, গাও।" আমি গান ধরলাম—

"কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর এ ভব-সংসারে।"

এটুকু গাইতেই ঠাকুর পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: "অত 'দীনহীন' ভাব কেন? তিনি তো কাছেই রেখেছেন!" এই কথা বলে পাগল ঠাকুর হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমি কী হতভাগ্য! তাঁর ঐকথার অর্থ আমি তখন বুঝতে পারলাম না। তার দুবছর পরেও—যখন তাঁর তিরোধান হলো—বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন বেশ বুঝছি, আমি কাছে পেয়েও ভগবানকে ধরতে পারিনি—পাগল ঠাকুর ভেবে হেলায় হারিয়েছি। এই জন্মে আর এই দেহবৃক্ষে ফল ধরবে না। হায় বিধিলিপি!

"এটুকু গাইতেই ঠাকুর পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: "অত 'দীনহীন' ভাব কেন? তিনি তো কাছেই রেখেছেন!" এই কথা বলে পাগল ঠাকুর হাসতে লাগলেন। কিন্তু আমি কী হতভাগ্য! তাঁর ঐকথার অর্থ আমি তখন বুঝতে পারলাম না!"

আরও অনেক কথাই মনে পড়ছে। পরে কখনো লিখব।★ □

সংগ্রহ: স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

★ রচনাটি এখানেই শেষ হয়েছে। পরে লেখক কিছু লিখে থাকলে তার হদিশ আমরা পাইনি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রবন্ধ

দ্বৈত ও অদ্বৈত

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দ্বৈত ও অদ্বৈত ভারতীয় দর্শনের দুই প্রধান ভাব। সাধারণের বিশ্বাস, দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুটি বিরুদ্ধ ভাব। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নেই; বরং একে অপরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, দ্বৈত অদ্বৈতে দাঁড়িয়ে আছে এবং অদ্বৈত দ্বৈত থেকে প্রাণরস গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ সংঘের প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজ বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং মনোজ্ঞভাবে তুলে ধরেছেন।

'শ্রীমদ্‌ভাগবত' মহাগ্রন্থ দ্বৈত এবং অদ্বৈত—দুই ভাবেরই নির্ণয় অতি সহজ এবং সরস ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতের প্রথম শ্লোকের শেষ লাইনে আমরা পড়ি "সত্যং পরং ধীমহি"—আমরা সেই পরম সত্যের ধ্যান করি। সেই পরম সত্য কি তাহা প্রথম শ্লোকের বাকি অংশে বলা হইয়াছে। যাহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় জন্মগ্রহণ করে, যাহাতে অবস্থান করে এবং অবশেষে যাহাতে লীন হয়, যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁহার শাসন সর্বব্যাপী, যিনি প্রথম দেবতা ব্রহ্মাকে নিজের সঙ্কল্প হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার মহিমা বুঝিতে সুরগণ অক্ষম—যেমন অগ্নি, জল এবং পৃথিবী ভুল করিয়া অন্য বস্তু বলিয়া ধারণা করা হয় তেমনি যাঁহাতে ত্রিভুবন বাস্তবিকই নাই, যাঁহাতে কখনও কোন আবরণ আসিতে পারে না, তিনি আমাদের সর্বদা নমস্য—"সত্যং পরং ধীমহি"।

'ভাগবত'-এর এই প্রথম শ্লোকটি পড়িলে পরম সত্য যে অদ্বৈত তাহা স্বতই আমাদের মনে হয়। পরম সত্যকে আমরা হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করিতে পারি। কিন্তু এই ধ্যানে দ্বৈতের কোন স্থান নাই। শ্রীভগবানকে উপাসনা করিতে গেলে ভক্তির প্রয়োজন হয়। দ্বৈত বিনা ভালবাসা সম্ভবপর নয়, কিন্তু 'ভাগবত' মহাগ্রন্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসা দিয়া ভরিয়া রাখিয়াছেন। যিনি দ্বৈতভাবে ভক্তের হৃদয়ের সব আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিয়া রাখেন, যিনি নানাভাবে নানা বিলাস প্রকাশ করিয়া ভক্তকে আনন্দিত করেন তাঁহাকে আমরা সর্বদা কাছেকাছে পাইতে চাই। তাঁহাকে গভীর ধ্যানে ডুবাইয়া অদৃশ্য করিতে চাই না। এইটিই যেন 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর প্রথম বাণী। দ্বৈতে এবং অদ্বৈতে বাস্তবিক কোন ব্যবধান নাই, যিনি দ্বৈত তিনিই অদ্বৈত—এই সমন্বয় ভাব কাহারও কাহারও অনুভূতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অদ্বৈতকেও ভালবাসা যায়, অদ্বৈতকে লইয়াও সংসার করা যায়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শ্রীভগবান যে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মিলনভূমি তাহা তাঁহার নিজের অনুভূতি দিয়া নানা সময়ে তিনি বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীভগবানই সত্য, তিনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত শুধু নয়, তাহারও পারে যাহা আছে, যাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তিনি তাহাও। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নানা আচরণ দ্বারা এইটি ব্যক্ত করিতেন। নানা দেবদেবী দর্শন করিয়া তিনি অন্যান্য সকলের সহিত ভজন, পূজা, কীর্তন, নৃত্য প্রভৃতির মধ্যে যেমন ডুবিতে পারিতেন তেমনই ঐ সকল আচরণের মধ্যে তাঁহার মন গভীর সমাধিতে ডুবিয়া যাইত। ঠাকুরকে দ্বৈত অদ্বৈত লইয়া কখনও ব্যবধান করিতে দেখা যায় না। দ্বৈত যেন স্বাভাবিকভাবে অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করে। আবার অদ্বৈত এক হইতে নামিয়া আসিয়া নানাভাবে দ্বৈতের সহিত খেলা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই সমন্বয় তাঁহার একটি আশ্চর্য গৌরব। তাঁহার পূজিত কালী যে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মিলনস্থল, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ নানা গানের ভিতর অনুভব করিতেন। ঐসব গানের লেখকরা, যেমন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সিদ্ধ সাধক-গণ নিশ্চয়ই তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইসকল গানের কথা ও ভাব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-প্রেরণা তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন ভক্ত লেখক তাঁহাদের রচিত সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর নানা স্থানে আমরা দেখিতে পাই, ঠাকুর এইসব গান শুনিয়া গভীর ভাবস্থ হইতেন। ভক্তসমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে গীত

অথবা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক গীত এই গানগুলি যেন ভগবানের সান্নিধ্য স্পষ্টভাবে আনিয়া দিত।

★

শিশু বিবেকানন্দ সীতারামের মূর্তি লইয়া খেলা করিতেন। ঐ মূর্তিটি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু একদিন যখন শুনিলেন যে, সীতারাম বিবাহিত তখন ঐ মূর্তিটি আর ভাল লাগিত না। আসিল শিবের মূর্তি। সর্বত্যাগী মহাদেবকে তিনি ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। পরবর্তী কালে স্বামীজী শিবের যে-স্তবটি লিখিয়াছিলেন তাহা যেমন ভাবগভীর তেমনি শ্রুতিমধুর। তরুণ নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করিয়া ভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তখন নরেন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। ঠাকুরের স্পর্শ নরেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিয়া উঠিয়াছিলেন ঃ "তুমি আমার এ কি করছ? আমার যে বাপ-মা আছে।" ঠাকুর হাসিয়াছিলেন। নিত্য-পরিচিত সংসারটি যে পরম সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা স্বামীজীর সহজাত জ্ঞানের মধ্যে আসিয়াছিল। যুবক বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজে যেসব গান গাহিতেন তাহা অবশ্যই ভক্তিমূলক। কিন্তু পরবর্তী কালে ঠাকুরের নিকট যেসব গান গাহিতেন তাহা অদ্বৈতভাবের ব্যঞ্জনান্বিত। ঠাকুর কখনও কখনও বলিতেন, "প্রেমের গান গা।" তখন নরেন্দ্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সঙ্গীত গাহিয়া মাতিয়া যাইতেন। স্বামীজীর বক্তৃতামালায় শ্রীভগবানের দ্বৈতভাবের অনেক প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার প্রধান বিষয় যেন অদ্বৈতভাব। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আমি জীবনে উপনিষদ্ ছাড়া আর কিছু বলি নাই।" দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মিলন যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাই তেমনি স্বামীজীও দ্বৈত-অদ্বৈতের সুস্পষ্ট সম্মিলন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর শিক্ষা যে এক তাহাতে সংশয় করিবার কারণ নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী যেসব বিষয়ে আলোচনা করিতেন (যেমন জনসেবা, শিক্ষাপ্রসার, স্ত্রীজাতির উন্নতি প্রভৃতি) তাহাতে স্বামীজীর কোন কোন গুরুভাই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ঠাকুরের শিক্ষা হইতে পৃথক কিছুর উপর ঝোঁক দিতেছেন। স্বামীজী অবশ্য পরে তাঁহাদের ভ্রম বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, ও বিবেকানন্দ দুটি আলাদা প্রকাশ নয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আমরা বারবার ঠাকুরের ও স্বামীজীর একাত্মভাব ঠাকুরের আচরণে দেখিতে পাই। তাঁহাদের এই একাত্মভাব অন্যান্য ভক্তদিগের নিকট বিস্ময় আনিত। যুবক নরেন্দ্রের বহু গুণ সকলে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করিলেও ঠাকুরের সহিত তাঁহার অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিতে দেরি হয়। আজ আমরা ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে এক বলিয়া দেখিতে পাই।

প্রধান উপনিষদ্গুলিতে আমরা প্রধানতঃ অদ্বৈতভাবের প্রসঙ্গ দেখি। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা ব্রহ্ম। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—সংসারে নানা বলিয়া কিছু নাই। এই প্রকার বাক্য উপনিষদে ভূরি ভূরি দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ। সেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ জ্ঞান লাভ করিলে তাহার সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। মায়া অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানের জন্য মানুষ তাহার স্বরূপকে ভুলিয়া থাকে। এই ভুলকে যেভাবে হউক দূর করিতে পারিলে অদ্বৈতজ্ঞান স্বভাবতই প্রতিভাত হয়। 'শ্রীমদ্ভাগবত' বা অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে যে উপাসনা প্রভৃতি সাধনার কথা আছে তাহা উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উপনিষদের যে সমন্বয়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সত্যই অনুপম। আচার্য গৌড়পাদ এবং আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ উপনিষদের অদ্বৈতভাব সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের রচিত ভাষ্য প্রভৃতির মধ্যে আমরা দ্বৈতভাবের কোন সন্ধান পাই না।

ভগবৎসাধনার বহু স্তর, বহু ধাপ স্বীকার করিলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের মিলন ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ দেখিতে পাই—কোন কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানমার্গের প্রতি অত্যন্ত উৎসাহী দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে, জ্ঞান যেমন সত্য ভক্তিও তেমনি সত্য। জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলন যে ঘটাইতে পারে সে ধন্য।

দ্বৈত অদ্বৈতে দাঁড়াইয়া আছে। অদ্বৈত দ্বৈতদ্বারা সমৃদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক আদর্শ আমরা যত অনুসরণ করিব ততই মানুষের ও সমাজের পরম মঙ্গল। সংসারের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদিগকে ঐক্য দেখিতে হইবে। বহু-জ্ঞান সংসারে প্রয়োজন সাংসারিক দিক দিয়া; কিন্তু বহু-জ্ঞানের ঊর্ধ্বে যে সমতা বিদ্যমান তাহা ধরিতে পারিলে মানুষের সকল দ্বন্দ্ব, ভয় এবং দুঃখের অবসান হয়। মানুষের জীবনে সর্বস্তরে যে বিভেদ আছে তাহা দূর করা আধ্যাত্মিক জ্ঞান দ্বারাই সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এই নূতন যুগের অভিনব সাধনা সত্য করিবার জন্য সকল মানুষকে আহ্বান করিতেছেন। এইজন্যই তাঁহারা যুগাবতার—সকল মানুষের বন্ধু।□

নিবন্ধ

থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড-এ 'বিবেকানন্দ কটেজ'-এর ইতিবৃত্ত

ম্যালকম উইলস
ভাষান্তর ঃ স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-পাঠকগণ আমেরিকার 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক' বা 'সহস্রদ্বীপোদ্যান'-এর সঙ্গে সুপরিচিত। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে কয়েক সপ্তাহ স্বামী বিবেকানন্দ এখানে দ্বাদশজন শিষ্য-শিষ্যাকে নিয়ে ধ্যান, তপস্যা ও সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় অতিবাহিত করেছিলেন। সুবিখ্যাত 'ইন্সপায়ার্ড টকস' বা 'দেববাণী' এবং 'সন্ন্যাসীর গীতি'র জন্মস্থান এখানে। 'বিবেকানন্দ কটেজ' আজ বিবেকানন্দ-অনুরাগিমণ্ডলীর কাছে মহাতীর্থক্ষেত্র। সে-কুটিরের কাহিনী ভাষান্তরে আমাদের উপহার দিয়েছেন আমেরিকার সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ, গবেষক ও সুলেখক প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ।



থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড-এ 'বিবেকানন্দ কটেজ'

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অন্তর্গত 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে' স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এখানে তিনি তাঁর একজন প্রধান আমেরিকান শিষ্যা সিস্টার ক্রিস্টিনকে দীক্ষা ও শিক্ষা দেন। এখানেই তাঁর মনে ভারতীয় কর্মপদ্ধতি রূপ নেয়। কাশীপুরের মতো এখানকার সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে তিনি নির্বিকল্প সমাধি অনুভব করেন। এই স্থানে তিনি 'সন্ন্যাসীর গীতি' ('The Song of the Sannyasin') রচনা করেন এবং যেসব মূল্যবান শিক্ষা দেন তা 'দেববাণী' ('Inspired Talks') আকারে প্রকাশিত হয়।

থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড

থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড (প্রকৃতপক্ষে ১৭০০ দ্বীপপুঞ্জ) সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর একটি দ্বীপ। সেন্ট লরেন্স উত্তরবাহিনী, গ্রেট লেক থেকে কুইবেক হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে মিশেছে। এই নদী প্রাচীন হিমপ্রবাহ থেকে সৃষ্ট। এই নদীর স্রোত পৃথিবীর মাটি ধুয়ে বড় বড় পাথরকে জাগিয়ে তুলেছে। 'বিবেকানন্দ কটেজ' এইরকম একটি বড় পাথরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনাহীন। স্মরণাতীত কাল থেকে রেড ইন্ডিয়ানরা মৃতদের শরীর এখানে কবর দিত। তারা এস্থানকে বলত 'মহাশক্তির উদ্যান' ('The Garden of the Great Spirit')।

১৫৩৫ সালে জ্যাকুইস কার্টিয়ার (Jacques Cartier) নামে জনৈক ফরাসী সেন্ট লরেন্স নদী আবিষ্কার করেন। ১৬১৫ সালে দুটি রেড ইন্ডিয়ান উপজাতির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়; একটি অপরটিকে নির্মূল করে এবং তারপর ফরাসীদের সঙ্গে বিজয়ীদের যুদ্ধ হয়। ১৭৭৮ সালে আরেকটি রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি এ স্থান দখল করে এবং পরে নিউ ইয়র্ক স্টেটের নিকট সমর্পণ করে। এই দ্বীপের প্রথম শ্বেত বাসিন্দাদের বলা হতো 'কাঠ চোর' ('Lumber thieves')। তারা ইচ্ছামত গাছ কেটে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করত। ১৮০১ সাল থেকে এখানে পশুচর্ম-ব্যবসায়ী, জেলে ও শিকারীরা বসবাস আরম্ভ করে। ১৮০৬ সালে স্থায়ী বাসিন্দারা দ্বীপটি পরিষ্কার করে চাষ শুরু করে। ১৮১২ সালের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেন্ট লরেন্স নদী ও তার দ্বীপপুঞ্জ চোরাচালানকারীদের দখলে ছিল। তারা কানাডা থেকে মদ ও অন্যান্য বস্তু আমদানি এবং পটাশ রপ্তানী করে ধনী হয়। ১৮০৮ সালে লায়ন ফল (Lyons Fall) থেকে ক্লেটন (Clayton) পর্যন্ত ফরাসী সড়ক তৈরি হয় এবং এতে বে-আইনী ব্যবসায়ের সুবিধা হয়। গ্রীষ্মে তারা নৌকাযোগে নদী পার হতো এবং শীতকালে নদী যখন বরফে জমে যেত তখন তার ওপর দিয়ে হেঁটে যেত।

১৮১২ সালের যুদ্ধের পর নতুন দ্বীপবাসীরা আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বাস করতে শুরু করে এবং তারা কাঠ ব্যবসায়ে মন দেয়। কাঠের গুঁড়ির ভেলা নদী দিয়ে ভেসে যেত কানাডার মন্ট্রিল পর্যন্ত। ১৮৩২ সালে জাহাজ-নির্মাণ শিল্প শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর অপরার্ধে কয়েকটি খ্রীস্টান সম্প্রদায় নিয়মিতভাবে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড-এ 'পুনর্জাগরণের সভা' ('Revival Meeting') শুরু করে। জনৈক ব্যক্তি ঠাট্টা করে বলে: "প্রতি সম্প্রদায়ের অধিকারে একটি দ্বীপ এবং প্রতিটি দ্বীপই একটি সম্প্রদায়।" লোকেরা এখানে এসে কয়েক মাস ধরে ক্যাম্প করে থাকত। তারা গান গাইত, প্রার্থনা করত ও বক্তৃতা শুনত। তাদের জীবন এত গভীরভাবে মগ্ন থাকত যে, তারা সম্পূর্ণভাবে জানত না কোথায় ধর্মের শেষ এবং কোথায় চিত্তবিনোদনের আরম্ভ।

ওয়েলেসলি আইল্যান্ড হলো থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ—৯ মাইল লম্বা, 4 মাইল চওড়া। দ্বীপটি মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল। এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে 'থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক' ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মিস এলিজাবেথ ডাচার একটি কটেজ তৈরি করান এবং ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে আগমন করেন।

মিস মেরি এলিজাবেথ ডাচার

মিস মেরি এলিজাবেথ ডাচার ১৮৩২ সালে নিউ ইয়র্কের নিকট অসওয়েগো-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন এক গরিব চাষী। যদিও মিস ডাচার ছিলেন গ্রাম্য চাষীর মেয়ে, তবুও পেইন্টিং-এ তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল। যাহোক, পরবর্তী কালে নিউ ইয়র্ক শহরে 'আর্ট স্টুডেন্টস লীগ' (Art Students' League)-এ তিনি আর্ট শেখার জন্য যান। তিনি 'অ্যাকাডেমি অব ডিজাইন' (Academy of Design)-এরও ছাত্রী ছিলেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি রোচেস্টারে আর্ট শেখাতে শুরু করেন।

তাঁর দুখানি পেইন্টিং এখনো থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড কটেজ-এ আছে, যাতে ফ্রেঞ্চ ইম্প্রেশনিজম (French Impressionism)-এর প্রভাব দেখা যায়। তখন ইম্প্রেশনিজম ছিল মডার্ন আর্টের অঙ্গ। আধুনিক আর্ট ও চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকাতে অনুমিত হয়, মিস ডাচার স্বামী বিবেকানন্দের বিপ্লবাত্মক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৩ সালে 'রোচেস্টার আর্ট ক্লাব' (Rochester Art Club)-এ তাঁর অঙ্কিত ছবির একটি প্রদর্শনী হয়। মনে হয়, তিনি কখনো নিউ ইয়র্কে ও কখনো রোচেস্টারে বাস করতেন। ১৮৯৪-১৮৯৫-এর শীতকালে তিনি নিশ্চিতই নিউ ইয়র্কে ছিলেন এবং এখানেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎলাভ করেন ও বক্তৃতা শোনেন।

মিস ডাচারের ছিল এক অদ্ভুত বর্ণময় চরিত্র। থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের এক বৃদ্ধ ছুতোর মিস্ত্রি টম মিচেল (ইনি যৌবনে মিস ডাচারের কটেজের পার্শ্বদেশ স্বামীজীর জন্য নির্মাণ করেছিলেন) বলেন: "মিস ডাচারের মাছি ধরবার একটা জাল ছিল; সারাদিনে যেসব মাছি জালে ধরা পড়ত, তিনি সন্ধ্যায় সেগুলিকে জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে দিতেন।" পূর্বের পোস্টমিস্ট্রেস মিসেস কুপারনাল বলেন: "মিস ডাচারের টুপিতে সুন্দর ফুল গোঁজা থাকত এবং তিনি ছিলেন একটু খামখেয়ালী, কিন্তু সজ্জন মহিলা।" শোনা যায় যে, মিস ডাচার তাঁর কটেজ রং করবার জন্য মাতাল ব্যক্তি পছন্দ করতেন, যাতে তিনি ঐ মাতালের জীবন পালটাতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ, ঐ মাতালের জীবন কোনদিনই পরিবর্তন হয়নি এবং মিস ডাচারের মৃত্যুর পর সে ঐ কটেজের নিচের ঘরে একরকম অবধায়ক হিসাবে থাকত।

স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শ মিস ডাচারের জীবনের মূলে একটা দারুণ ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মের এক সকালের ক্লাসে স্বামীজী মানুষের কর্তব্যবুদ্ধিকে আক্রমণ করে বোঝাতে চাইছিলেন, মানবাত্মা সব কর্তব্যের ঊর্ধ্বে। মিস ডাচার বলেন: "কিন্তু স্বামীজী, এটা কি আমাদের কর্তব্য নয়..."; আর কিছু বলবার আগেই স্বামীজী তাঁর কর্তব্যবুদ্ধিকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। মিস ওয়াল্ডো বলেন, এরপর মিস ডাচারকে কয়েকদিন দেখা গেল না। কিন্তু শেষে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁকে উদার খ্রীস্টানমত গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তিনি গোঁড়া মেথডিস্ট ছিলেন, পরে তিনি খ্রীস্টান সায়েন্টিস্ট হন। তাঁর শরীরে একটি টিউমার হয়; একজন খ্রীস্টান সায়ন্টিস্ট বলে: "আমি যদি তোমাকে সারাতে পারি, তুমি কি খ্রীস্টান সায়েন্টিস্ট হবে?" মিস ডাচার "হ্যাঁ" বলেন। তিনি রোগমুক্ত হয়ে তাঁর কথা রাখেন। এঘটনাটি খুব অদ্ভুত বলে মনে হলেও সিস্টার ক্রিস্টিন বলেন যে, মিস ডাচারের সামাজিক রীতি ও ব্যক্তিগত কুসংস্কারের প্রতি অনুরাগ স্বামীজীর প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা অধিক ছিল।

খ্রীস্টান সায়েন্টিস্ট হওয়ার পর মিস ডাচার তাঁর কটেজ বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য আরোগ্যনিকেতন-রূপে ব্যবহার করতেন। তিনি তাদের জন্য রান্না করতেন ও মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করতেন। এভাবে তাঁর সঙ্গে মিস মার্গারেট ওটিসের দেখা হয়। মিস ডাচারের মৃত্যুর পর মিস ওটিস ঐ কটেজ ক্রয় করেন এবং পরবর্তী কালে সেটি নিউ ইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ক্রয় করে।

'বিবেকানন্দ কটেজ'

প্রথমতঃ, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক ছিল ক্যাম্পের স্থান; ক্রমশঃ তা বহু কুটির-সম্মিলিত একটা গ্রামে পরিণত হয়। প্রতিটি কুটিরে সাধারণতঃ একতলায় দুটি ঘর, দোতলায় দুটি ঘর ও প্রতিতলার সঙ্গে সংযুক্ত বারান্দা ছিল। ছাদ দুদিক থেকে খাড়া হয়ে চূড়ায় মিশেছে। প্রয়োজনমত বা পরিবার বৃদ্ধির ফলে এসব কুটিরে ঘর যুক্ত করা হতো।

মিস ডাচার পার্কের পূর্ব প্রান্তে একটা পাহাড়ের উচ্চ স্থানে একখণ্ড বিরাট পাথরের ওপর তাঁর কুটির নির্মাণ করান। নিঃসন্দেহে তিনি বাইবেলে বর্ণিত উত্তম গৃহস্থল স্মরণ করে এই স্থান পছন্দ করেছিলেন। ১৮৮৫ সালে এই কুটির নির্মিত হয়। তাঁর মা ও বোন তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর কটেজে চারটি ঘর—ওপরের ঘরদুটিকে কাঠের পাঁচিল দিয়ে কয়েকটা ছোট ঘর করা হয়, যাতে অতিথিরা এসে থাকতে পারে। বারান্দা-দুটিকে বাড়িয়ে দক্ষিণদিকে তিনি তৃতীয় বারান্দা তৈরি করান এবং পরে রান্নাঘর যুক্ত হয়।

দশ বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দের সুবিধার্থে তিনি কুটিরের পশ্চিমদিকে একটা অংশ তৈরি করান। কুটিরটি উঁচু পাথরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পশ্চিমদিকে ঢালুস্থানে তিনতলা করা মোটেই কষ্টকর ছিল না। যাহোক, তিনতলায় স্বামীজীর ঘর নির্দিষ্ট হলো এবং পূর্বদিকের দরজার সামনের বারান্দায় তিনি সন্ধ্যায় ক্লাস নিতেন। তাঁর শয়নঘরের নিচে দোতলার ঘর ছিল পাঠকক্ষ, যেখানে তিনি সকালের ক্লাস নিতেন। এই সকালের বক্তৃতাগুলি মিস ওয়াল্ডো লিপিবদ্ধ করেন—যা পরে 'দেববাণী' বা 'Inspired Talks'-রূপে প্রকাশিত হয়। পাঠকক্ষের নিচে ছিল আরেকটি শয়নঘর। ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মে স্বামীজীর কোন ছাত্র সেই ঘরে ছিলেন। মিস ডাচার বাইরের দিক থেকে স্বামীজীর ঘরে যাওয়ার জন্য একটা সিঁড়ি তৈরি করান, যাতে তিনি ইচ্ছামত যাতায়াত করতে পারেন। পরবর্তী কালে মিস ডাচার দোতলায় পাঠকক্ষের পাশে আরেকটি স্টুডিও তৈরি করান এবং তার নিচে আরেকটি শয়নঘর।

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্ম

১৮৯৫ সালের ১৯ জুন থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এ ছিলেন। এই সময় তিনি খুব উচ্চ ভাবে ছিলেন এবং কয়েকটি আগ্রহী আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের খুশি মনে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখন তাঁর মনে বৈরাগ্যের বন্যা বয়ে চলেছিল। এর প্রমাণ তাঁর রচিত 'সন্ন্যাসীর গীতি'।

মিস ওয়াল্ডো 'দেববাণী'র ভূমিকায় লিখেছেন, ১২ জন শিষ্য নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামীজীকে অনুসরণ করেছিলেন। বর্তমানে ঐ ১২ জনকে নিশানা করা প্রায় অসম্ভব। যাঁদের বিষয়ে জানা যায়, তাঁদের নামঃ মিস ডাচার, মিস ওয়াল্ডো, মিসেস ফাঙ্কি, মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল, মিস রুথ এলিস, ডাঃ ওয়াইট, মিঃ লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ, স্টেলা নামে এক বৃদ্ধা অভিনেত্রী এবং মেরি লুইস নামে এক ফরাসী মহিলা।

মিস ওয়াল্ডো ও মিসেস ফাঙ্কি 'দেববাণী'র প্রারম্ভে আমাদের জন্য দুটি সুন্দর জীবন্ত ভূমিকা লিখে গেছেন। আমরা সিস্টার ক্রিস্টিনকে জানি তাঁর স্মৃতিকথার মাধ্যমে। কেউ কেউ মিস ডাচারকে জেনেছে অপরের কাছ থেকে শুনে। সিস্টার ক্রিস্টিন কয়েকজনের বিষয়ে লিখেছেন। তাছাড়া বাকি সব বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত। ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল হয়েছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন, লিয়ন ল্যান্ডসব্যার্গ—স্বামী কৃপানন্দ, মেরি লুইস—স্বামী অভয়ানন্দ। শেষের দুজন পরে স্বামীজীকে ত্যাগ করে চলে যান; যদিও স্বামী অভয়ানন্দ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দুটি বেদান্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এ ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতা 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে লিখেছেনঃ স্বামীজী বিন্দুতে সিন্ধু দেখতেন। তিনি প্রতিটি মানুষকে—সে যা নয়, তার চেয়ে বিরাট আকারে দেখতেন। কারণ, তিনি তাদের মধ্যে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা দেখতেন, যা বহু জন্মের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আসবে। এসব ব্যক্তিদের বিচার করবার আগে আমরা খুব সাবধান হব, কারণ কে জানে এদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণার কি পরিণতি হবে।

স্বামী বিবেকানন্দকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে মিস ডাচার একটা বড় কাগজে সুন্দর রঙে লিখেছিলেনঃ 'Welcome to Swami Vivekananda'—'স্বাগত স্বামী বিবেকানন্দ'। এ স্থান ত্যাগ করবার আগে স্বামীজী বলেনঃ "এই সহস্র দ্বীপকে আমি আশীর্বাদ করি।" এভাবে তিনি আমেরিকাতে একটা পবিত্র স্থান সৃষ্টি করেন।

অন্তর্বর্তী কাল

১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মের পর মিস ডাচার তাঁর কটেজকে স্টুডিও ও বোর্ডিং হাউস-রূপে ব্যবহার করেন। প্রতি গ্রীষ্মে তিনি তাঁর শিল্পকর্মের একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। দ্বীপবাসীরা প্রদর্শনী ত্যাগ করবার কালে মিস ডাচারের স্বল্প মূল্যের পেইন্টিং কিনত, কারণ তারা বুঝেছিল মহিলাটি খুবই গরিব।

১৯০২ সালে স্বামীজীর মৃত্যুর পর মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক-এর কটেজে তীর্থের উদ্দেশ্যে আসেন। (তিনি ১৮৯৫ সালে স্বামীজীর ক্লাসে ছিলেন না।) তিনি ভারাক্রান্ত মনে স্বামীজীর ঘরে যান এবং ক্রমাগত কাঁদেন। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও এই কটেজে এসেছেন।

১৯২২ সালে মিস ডাচারের মৃত্যুর পর বিভিন্ন শিল্পী এই কটেজের তদানীন্তন মালিক মিস মার্গারেট ওটিসের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে থাকত। মিস ওটিস অসাধারণ সম্মোহক ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন; তিনি সংস্কৃত জানতেন। তাঁর সংগৃহীত ঋগ্বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ 'বিবেকানন্দ কটেজে' রক্ষিত ছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকালগুলি তিনি এই কটেজে ছিলেন। মিস ওটিস বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কটেজে হাজির হয় এবং খাবারঘরে একখানি লাঠি ঝোলানো দেখে বলেঃ "এটি স্বামী বিবেকানন্দের লাঠি। আমি কি এটা পেতে পারি?" মিস ওটিস তাকে লাঠিটি দেন এবং ঐ ব্যক্তি অন্তর্হিত হয়। ঐ ব্যক্তি লিয়ন ল্যান্ডসবার্গ হতে পারে। ১৯৩৩ সালে মিস ওটিস এই কটেজ ত্যাগ করেন। তিনি বলেন যে, কটেজটি ভুতুড়ে। তারপর তিনি ৫০ গজ দূরে তাঁর ভাই ও বোনের কটেজে বাস করেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কটেজটি খালি ছিল; কেবল নিচের তলায় ডান ইগার নামে এক মাতাল বাস করত। সে রঙের মিস্ত্রি ছিল।

পুনরাবিষ্কার

১৯৪৭ সালের জুন বা জুলাই মাসে স্বামী নিখিলানন্দ,

মিসেস ডেভিডসন ও দুজন ভক্ত 'বিবেকানন্দ কটেজ' পরিদর্শন করেন। তাঁরা মিস ম্যাকলাউডের কাছ থেকে স্থানটির অবস্থান জানেন এবং তিনি মিস ডাচারের শৈশবকালীন অভিভাবক মিসেস এমার্সন কক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। মিসেস কক্সের পুত্র জর্জ কক্স স্বামী নিখিলানন্দ এবং তাঁর সঙ্গীদের কটেজে নিয়ে যান।

তাঁরা দেখলেন 'বিবেকানন্দ কটেজ'-এর ভয়াবহ জীর্ণাবস্থা। বারান্দার তক্তাগুলি খসে পড়ছে। ওপরের বারান্দাও ধসে পড়ছে এবং সিঁড়িটি নড়বড়ে। ভিতরটা ভাঙাচোরা, পুরনো রঙ ঝুরঝুর করে পড়ছে; এবং সব কিছুই বিশ্রী। ভিতর দিকের ছাদ থেকে বড় বড় ওয়াল পেপার (দেওয়াল ঢাকার কাগজ)-এর লম্বা সরু ফালিগুলি ঝুলছে। যে বড় খুঁটিটি বাড়িটিকে ধরে রয়েছে, তার গোড়া পচে যাওয়ায় বাড়িটির এক পাশ নিচে বসে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের ঘর অভ্যাগতদের পদভারে কম্পমান। সর্বত্র ময়লা-জঞ্জাল। কেবল ভিতর নয়, বাইরেও একই রকম অবস্থা। বাড়ির চারিদিক আগাছা, ঝোপঝাড়, ছোট ও বড় গাছে ভর্তি।

স্বামী নিখিলানন্দ বুঝেছিলেন যে, কটেজটি নিঃসন্দেহে দর্শনীয় বস্তু কিন্তু রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। যাহোক, তিনি এই কটেজের বিষয়টি তখনকার রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী বিরজানন্দকে লেখেন; পত্রোত্তরে তিনি স্বামী নিখিলানন্দকে কটেজটি কিনবার জন্য লেখেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ওটি আমেরিকার একটি তীর্থস্থান; যদি নিউ ইয়র্ক কেন্দ্র এটি কিনতে সমর্থ না হয় তবে ভারতবর্ষ থেকে টাকা পাঠানো হবে। স্বামী বিরজানন্দ আরও বলেন যে, স্বামীজীর স্মৃতিপূত থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের কটেজ তিনি স্থূলশরীরে না দেখলেও মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীরে দেখবেন। মিসেস ডেভিডসন বলেন, স্বামী নিখিলানন্দ কটেজটি না কিনলে তিনি কিনবেন।

ঐ একই বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী ঘনানন্দ, মিস্টার গুড্রিজ (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট), মিসেস ডেভিডসন ও জনৈক ভক্ত কটেজটি দর্শন করে ক্রয় করবার সিদ্ধান্ত নেন। মিস ওটিসের কাছে প্রস্তাব করায় তিনি বলেন যে, কটেজটি ৫০০ ডলারে জ্বালানী কাঠরূপে বিক্রি হয়ে গেছে। অবশেষে ক্রেতাকে ৫০০ ডলার ও মিস ওটিসকে অতিরিক্ত ৫০০ ডলার দিয়ে কটেজটির দখল নেওয়া হয়। [স্মরণ রাখতে হবে যে, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কের কটেজগুলির মালিক জমির মালিক নয়, তাদের মালিকানা স্বত্ব ৯৯ বছরের লিজের অন্তর্ভুক্ত।] কটেজ সংস্কারের অর্থ স্বামী নিখিলানন্দের শিষ্যেরা ও স্বামীজীর অনুরাগী ভক্তেরা দেন।

১৯৪৮ সালের বসন্তকালে কটেজ সংস্কার শুরু হয় এবং জনৈক ভক্ত তদারকি করবার জন্য নিউ ইয়র্ক থেকে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে আসেন। একজন ভক্ত ও তাঁর ছেলে ইলেকট্রিকের সব কাজ করেন। জুন মাসে একদল ভক্তমহিলা এসে জানালার পর্দা লাগান, পুরনো ফার্নিচার রঙ করেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করেন, বাগানে ফুলের চারা লাগান। রান্নাঘরে ছিল স্বামীজীর সময়কার সেই পুরনো স্টোভ—তা আধুনিকীকরণ করা হয়। নতুন জল সরবরাহের পাইপ বসানো হয়। মিস ডাচারের স্টুডিও শয়নঘরে রূপান্তরিত হয়। টম মিচেল (সিনিয়র), যিনি মিস ডাচারের আদেশে স্বামীজীর থাকবার অংশটা তৈরি করেন, কটেজের বহির্দেশে আদি খাতকাটা যে গোলাকার সাজগুলি ছিল তা রক্ষা করেন। ১৯৫০ সালের গ্রীষ্মে পাঠকক্ষে ও তার নিচের শয়নঘরে ফায়ার প্লেস বসানো হয়।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কটেজটি বাসোপযোগী হয়। স্বামী নিখিলানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ও স্বামী অশেষানন্দ সেখানে গ্রীষ্মকাল কাটান। ভারতের বিভিন্ন তীর্থের মাটি সংগ্রহ করে 'বিবেকানন্দ কটেজ'-এর পাদদেশে প্রোথিত হয়। সেন্ট লরেন্স নদীতে গঙ্গাজল ঢালা হয়। বাগানে পূজা ও হোম করা হয়।

স্বামীজীর ঘরকে ভজনালয় করা হয়। ঘরটির মেঝেতে যে-কার্পেট রয়েছে তা স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়ির মহারাজের দ্বারা মিস্টার ও মিসেস লেগেটের বিবাহ উপলক্ষে উপহার দেন। লেগেট-দম্পতির মৃত্যুর পর কার্পেটটি রিজলি ম্যানরে ছিল। তাঁদের কন্যা ফ্রান্সেস লেগেট স্বামীজীর ঘরে ব্যবহারের জন্য কার্পেটটি দেন। এই ঘরে স্বামীজীর ছবি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার ছবি এবং আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্কর মেলভিনা হফম্যানের তৈরি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি আছে। [মেলভিনা হফম্যান স্বামীজীকে ১৮৯৫ সালে নিউ ইয়র্কে দর্শন করেন।]

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'The Song of the

Sannyasin'-এর পাণ্ডুলিপির আবিষ্কার। 'বিবেকানন্দ কটেজে'র নবরূপদানকালে মিস্ত্রিরা সেটি আবর্জনা ফেলবার পাত্রে ফেলে দেয়। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির ছেলে সেটি তুলে নেয় এবং সাত বছর নিজের কাছে রাখে, পরে সেটি স্বামী নিখিলানন্দকে দেয়। যখন স্বামী নিখিলানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কেন এত বছর এটি নিজের কাছে রেখেছিল, তখন তার কারণ বলতে সে অপারক হয়।

থেকে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় 'দেববাণী' পাঠ হতো এবং স্বামীজীরা ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ্যবিষয়ে আলোচনা করতেন। ১৯৫৫-এর পর থেকে রীতিমত ক্লাস শুরু হয়। সন্ধ্যার পরিবর্তে সকালে স্বামী নিখিলানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা শুরু করেন। ১৯৬২ সালের গ্রীষ্মে তিনি 'ছান্দোগ্য উপনিষদ্'-এর ষষ্ঠ অধ্যায় পড়ান। ক্লাস দুসপ্তাহকাল চলে এবং উৎসাহী ছাত্রেরা একদিনের জন্যও



থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড-এর বিখ্যাত ওকগাছ, যার সংলগ্ন শিলায় স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

পাহাড়ের সানুদেশে মিসেস ডেভিডসন ও আরেকজন ভক্ত দুটি কটেজ স্বামী নিখিলানন্দকে দেন। মিসেস ডেভিডসন তাঁর কটেজের নাম রাখেন 'শ্রীসারদা কুটির'। এখানে মহিলা-ভক্তদের গ্রীষ্মে থাকবার ব্যবস্থা হয়। অপর কটেজটির নাম 'বেদান্ত কটেজ', যেখানে স্বামী নিখিলানন্দ থাকতেন এবং গ্রন্থ লিখতেন।

পুনরাবিষ্কারের পর গ্রীষ্মঋতুগুলি

প্রথমদিকে 'বিবেকানন্দ কটেজে' গ্রীষ্মগুলি সাধারণভাবে উদ্‌যাপিত হতো। স্বামী নিখিলানন্দ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রীষ্মে পুরো বা আংশিক সময় কটেজে থাকবার আমন্ত্রণ করতেন। কেউ কেউ স্থানীয় হোটেলে থাকত; আবার কোন কোন আগন্তুক স্বামীজীর স্মৃতিপূত কটেজ দেখতে আসত। প্রতি গ্রীষ্মে আমেরিকার বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রের ভক্তেরা তীর্থের উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকেন।

প্রথম থেকেই বিকালে আরতির অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধরতে গেলে এটাই ছিল সারাদিনের বিশেষ আকর্ষণ। শুরু

ক্লাস ছেড়ে যায়নি।

এই গ্রীষ্মগুলিতে হাসিঠাট্টার অভাব ছিল না। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকান শিষ্যদের জন্য রান্না করতেন, তেমনি এখনকার স্বামীজীরাও ভারতীয় খাবার রান্না করে বনভোজনের ব্যবস্থা করেন বা ছাত্রদের নিয়ে আমোদভ্রমণে যান।

'বিবেকানন্দ শিলা'

বিবেকানন্দ কটেজের পুনরাবিষ্কারকালে কয়েকজন ভক্ত একটি শিলা দেখতে পান কটেজের পিছনে প্রায় আধ মাইল দূরে—যেখানে খুব সম্ভব স্বামী বিবেকানন্দ সমাধি অনুভব করেন। একটি বিরাট ওকগাছের নিচে এটি একখণ্ড সমতল শিলা, এর সম্মুখে এক তৃণবহুল বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং অদূরে সুন্দর দৃশ্যসমন্বিত সেন্ট লরেন্স নদী। বছরের পর বছর ধরে বহু ভক্ত এসে এই শিলাকে তীর্থস্থান করে তুলেছে। এখন এটি 'বিবেকানন্দ শিলা' নামে খ্যাত।□

প্রবন্ধ

বিজ্ঞান মহারাজের 'পরমহংস-চরিত'

অরুণকুমার বিশ্বাস

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। ঘনিষ্ঠ সাধু ও ভক্তমহলে তিনি 'বিজ্ঞান মহারাজ' নামে সুপরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য দ্বারা হিন্দীতে লিখিত সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন, এমনকি গ্রন্থটি আদৌ একটি মৌলিক রচনা কিনা সেই নিয়েও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তৃত, তথ্যনির্ভর এবং মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন সম্পর্কে খ্যাতিমান গবেষক অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার বিশ্বাস।

কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটি পুস্তকের[১] বিষয়বস্তু বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৮৬৮-১৯৩৮), যাঁকে ভক্তেরা 'বিজ্ঞান মহারাজ' বলে অভিহিত করেছেন, রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট মালী, তাঁর শিষ্যেরা এক-একজন উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষস্বরূপ। বিজ্ঞান মহারাজের চরিত্র-সৌরভে সত্যই রামকৃষ্ণ-কানন আমোদিত।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের কয়েকটি জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে[২], কিন্তু "উপাদানের অভাবে এখনো অনেক ফাঁক, শূন্য স্থান" রয়ে গিয়েছে। বিজ্ঞান মহারাজের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনাবলীর উপযুক্ত আলোচনা এবং অনুশীলন হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে তাঁর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ—হিন্দী 'পরমহংস-চরিত' তো একরকম অনাদৃত—রামায়ণের উর্মিলা চরিত্রের মতো 'কাব্যে উপেক্ষিতা'।

গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে ; ১৯৬৪ সালের চতুর্থ সংস্করণের 'প্রকাশক কা নিবেদন'-এ স্বামী ধীরাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ "পরমহংস-চরিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব কে সন্ন্যাসী শিষ্য দ্বারা লিখিত সবসে প্রথম রামকৃষ্ণ-জীবনী হৈ।" স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে'র প্রথম খণ্ড ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় ; অতএব শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী প্রণয়নে এবং উপদেশ সঙ্কলনে সন্ন্যাসি-শিষ্যদের মধ্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সর্বপ্রথম। এই বিষয়ে হিন্দী সাহিত্যে বিজ্ঞান মহারাজেরই একমাত্র রচনা। উপদেশ-সঙ্কলনেও মহারাজের নৈপুণ্য বিশেষ লক্ষণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থনা করেন।

বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বামী ধীরাত্মানন্দ ব্যতিরেকে আর কেউই ১৯৬৪ সালের আগে উপরি উক্ত তথ্যগুলির অনুধাবন করেননি। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছিলেন যে, পরমহংস-চরিত "সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ'-এর হিন্দী অনুবাদ।" এই ধারণাই ভক্তমণ্ডলীতে বলবৎ রয়েছে। ফলতঃ, বর্তমান লেখকের কাছে কয়েকজন প্রাচীন সন্ন্যাসী সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং

১ Swami Vijnanananda and His Paramahamsa Carita, Translated and Annotated by Arun Kumar Biswas, July 1994, Sujan Publications, 7B Lake Place, Calcutta-700 029

২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় ভাগ, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৬০ ; সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ১৩৬৬ ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঃ জীবন ও বাণী—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, ১৩৭৭ ; প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—সুরেশচন্দ্র দাস এবং জ্যোতির্ময় বসুরায় (সম্পাদিত), ১৩৮৪ ; শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ্ বিজ্ঞানানন্দ—জ্যোতির্ময় বসুরায়, ১৩৯৯।

জিজ্ঞাসা করেছেন 'পরমহংস-চরিত' মৌলিক রচনা কিনা!

হিন্দী গ্রন্থটিতে সুরেশচন্দ্র দত্তের বইয়ের অন্তর্ভুক্ত যথেষ্ট তথ্য নিঃসন্দেহে রয়েছে, আবার অনেক তথ্য আছে যা সুরেশবাবুর উক্ত গ্রন্থে নেই। 'পরমহংস-চরিত' বইটির প্রথম সংস্করণের (১৯০৪) ভূমিকায় বিজ্ঞানানন্দজী নিজেই বলেছেন যে, সুরেশবাবুর বই ছাড়া বাঙলা ভাষায় রচিত আরও অন্যান্য গ্রন্থের সহায়তায় এই পুস্তকের সঙ্কলনকর্ম করা হয়েছে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাও কিয়দংশে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, অথচ একথা বিজ্ঞান মহারাজ ভূমিকায় লেখেননি, নিজেকে সংগোপন করে রেখেছেন। উত্তরকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে তিনি অনেক স্মৃতিচারণা করেছেন উৎসুক ভক্তগণের কাছে। বিজ্ঞান মহারাজ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে 'পরমহংস-চরিত' বর্ধিত কলেবরে লিখিত হবে। কিন্তু সতীর্থ এবং গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' প্রকাশিত হলে বিজ্ঞান মহারাজ তাঁর ইচ্ছা সংবরণ করেন।

১৯৮৫ সালে যখন হিন্দী গ্রন্থটির ইংরেজীতে অনুবাদকার্যের সূত্রপাত হয় তখন কয়েকজন শ্রদ্ধেয় প্রাচীন সন্ন্যাসী সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, একটি 'অনুবাদগ্রন্থের' (!) অনুবাদকার্যের কোন সার্থকতা আছে কিনা। ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদ আশ্রম, বেলুড় মঠ, উদ্বোধন এবং অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃপক্ষ বর্তমান লেখককে উৎসাহিত করেন। অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে ইংরেজী পাণ্ডুলিপিটির আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দেওয়া হয়। প্রকাশের পর বইটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

'পরমহংস-চরিত' রচনার ভূমিকা

রামকৃষ্ণ মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট (১৯৩৭-১৯৩৮) স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সুবিখ্যাত ফাদার লার্ফঁ-র কাছে বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছিলেন (১৮৮৩-১৮৮৫) এবং উত্তরকালে কুশলী ইঞ্জিনীয়াররূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপালাভ করেন এবং অতি সংগোপনে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। তাঁর সতীর্থ এবং গুরুভ্রাতা সারদানন্দজী লিখেছেন, ২৬ নভেম্বর ১৮৮৩ তারিখের কথা, যেদিন তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে সিঁদুরিয়াপটির মণিলাল মল্লিকের বাসায় গিয়েছিলেন ব্রাহ্মোৎসবে যোগদান করতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে (এই তারিখের আগেই বিজ্ঞান মহারাজ কয়েকবার শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পান)। 'কথামৃত'তে কিন্তু হরিপ্রসন্ন-প্রসঙ্গ নেই। ১৮৮৫ সালে হরিপ্রসন্ন কলকাতা ছেড়ে পাটনা চলে যান; শ্রীশ্রীঠাকুরের গলার অসুখের তখন সবেমাত্র সূত্রপাত। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর মরজীবনের শেষ এক বছর হরিপ্রসন্ন অনুপস্থিত।

অথচ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমের বাঁশি হরিপ্রসন্নের হৃদয়ে সদাই বেজেছে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন: "আমরা ভেবেছিলাম—হরিপ্রসন্ন হয়তো ঠাকুরকে ভুলে গেছে; এখন (বঙ্গাব্দ ১৩৪৩) তাঁর কীর্তিকলাপ শুনে হুঁশ হলো—প্রভু যাকে কৃপা করেছেন, সে কি তাঁকে ভুলতে পারে?... তাই দেখি, কত কালের পর সর্বত্যাগী হয়ে বেলুড় মঠে উপস্থিত।"[৩] হরিপ্রসন্ন আলমবাজার মঠে যোগদান করেন ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে। ১৮৯৯ সালের ৯ আগস্ট তিনি বেলুড় মঠে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি পরিচিত হন 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' নামে। ১৯০০ সালে তিনি পরিব্রাজকরূপে এলাহাবাদে উপস্থিত হন এবং এখানেই তিনি সাধুজীবনের সুদীর্ঘ ৩৮ বছর অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদে তাঁর কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত হয় 'পরমহংস-চরিত' রচনাকার্য দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই সুরেশচন্দ্র দত্তের 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৪)। শ্রীশ্রীঠাকুর নিষেধ করেছিলেন, তাঁর জীবনী যেন লেখা না হয় যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। মানযশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না; তিনি চাইতেন তাঁর অশরীরী বাণীই প্রাধান্য লাভ করুক। স্বামীজীর মতও ছিল অনুরূপ; রামচন্দ্র দত্তের লেখা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী (১৮৯০) এবং সুরেশচন্দ্র দত্তের লেখা জীবনী (১৮৯৪) স্বামীজীর মনঃপূত হয়নি। সিদ্ধাই নিয়ে মাতামাতি, অলৌকিক বর্ণনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি ছিল স্বামীজীর তীব্র সমালোচনার বস্তু। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে যখন স্বামীজী দেখলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী গ্রহণ করতে চলেছে তখন তিনি 'অবতারবরিষ্ঠের'

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৭

উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করতে আরম্ভ করলেন।

তবুও স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী রচনা করতে সঙ্কোচবোধ করেছেন। বোধ করি গুরুভ্রাতাদের জন্যই তিনি এই গুরুভার রেখে গিয়েছিলেন। হিন্দীভাষার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বাণীর প্রচার সম্বন্ধে স্বামীজী অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা করেছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন: "একটা খবরের কাগজ edit করতে হবে, অর্ধেক বাঙলা, অর্ধেক হিন্দী, গুপ্ত (সদানন্দ) হিন্দী দিকটা লিখুক।" ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ তারিখে তিনি আলাসিঙ্গাকে বলছেন কলকাতা, মাদ্রাজ আর আলমোড়া ছাড়া বোম্বাই এবং এলাহাবাদেও কেন্দ্র খুলতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখের পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ করছেন: "তুলসী (স্বামী নির্মলানন্দ) 'রাজযোগ' বইটির একটা হিন্দী তর্জমা করুক।" স্বামী নির্মলানন্দ এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বারাণসীতে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছেন; দুজনেই হিন্দী-ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সম্ভবতঃ স্বামীজীই স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে অনুরোধ করেন এলাহাবাদে মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপনা করতে এবং হিন্দীভাষায় 'পরমহংস-চরিত' প্রণয়ন করতে। এই প্রসঙ্গে স্বামী অপূর্বানন্দ বর্তমান লেখককে জানান (১৮ মে ১৯৮৬ তারিখের পত্রে) যে, স্বামী শিবানন্দ ১৯০২ সালে বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের স্থাপনা করে স্বামীজীর 'চিকাগো-বক্তৃতা' এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে'র প্রথম ভাগের হিন্দী অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া ঝাবরমল শর্মার সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, স্বামীজীর শিষ্য খেতড়ির মহারাজার কন্যা সূর্যকুমারী স্বামীজীর রচনার বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর বদান্যতায় এবং পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্মা গুলেরীর সম্পাদনায় স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগে'র হিন্দী অনুবাদ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল।[4]

অবশ্য হিন্দীভাষায় রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মৌলিক গ্রন্থ বিজ্ঞান মহারাজের 'পরমহংস-চরিত'। ১৯০০ সালে এলাহাবাদে এই পুস্তকটির বাঙলা খসড়া করা হয়। বাঙলা থেকে হিন্দীতে ভাষান্তর-কার্যে সহায়তা করেছিলেন এলাহাবাদের আদিত্যরাম ভট্টাচার্য ও সরযূপ্রসাদ মিশ্র এবং আলিগড়ের মুন্নালাল ভকীল। ১৯০২ সালের প্রারম্ভে একবার বিজ্ঞান মহারাজ বইটির কাজে আলিগড় গিয়েছিলেন; তখন স্বামীজীর অসুস্থতার খবর শুনে দ্রুত বেলুড় মঠের উদ্দেশে যাত্রা করেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পরে 'পরমহংস-চরিত' প্রকাশিত হয় (১৯০৪)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ৫৯০টি বাণী বিজ্ঞান মহারাজ উক্ত গ্রন্থে ১১৯টি বিষয়ে বিভক্ত করেন। এক বছর পরে প্রকাশিত স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাঙলা সঙ্কলনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ২৪৮টি বাণী ২৫টি অংশে বিভক্ত হয়েছিল। অতএব রামকৃষ্ণ-বাণীগুলিকে সুচারুরূপে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে বিজ্ঞান মহারাজকেই পথিকৃৎ বলা যায়। অবশ্য মূল ভাব স্বামীজীরই। ২৪ জুন ১৮৯৬ তারিখে তিনি শশী মহারাজকে লিখেছিলেন ম্যাক্সমূলারকে সমগ্র 'রামকৃষ্ণ-বাণী' পাঠাতে: "সব উক্তিগুলি সাজিয়ে তাঁকে পাঠাও—অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে সব এক জায়গায়, বৈরাগ্য সম্বন্ধে অন্যত্র, ঐরূপ ভক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে।" শশী মহারাজ উক্তিগুলি সাজিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে ম্যাক্সমূলারের ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখি ৩৯৫টি উক্তি মুদ্রিত কোনরকম শ্রেণীবিভাগ ছাড়াই। সুরেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থেও শ্রেণীবিভাগ নেই। অতএব বিজ্ঞান মহারাজই সর্বপ্রথম স্বামীজীর চিন্তা অনুযায়ী উক্তিগুলির শ্রেণীবিভাগ করেন। তাছাড়া তিনি অনেক জায়গায় মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং হিন্দী ভক্তিশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি পাদটীকা হিসাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

'পরমহংস-চরিতে' বিজ্ঞানচেতনা

বিজ্ঞান মহারাজের গ্রন্থটির সম্পূর্ণ অনুবাদ (ইংরেজীতে) এবং বিস্তৃত আলোচনা উল্লিখিত গ্রন্থে করা হয়েছে, যার পুনরুক্তি বর্তমান স্বল্পকলেবর প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। আমরা শুধুমাত্র কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: (১) আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং বিজ্ঞান মহারাজের সচেতনতা, (২) হিন্দী ভক্তিসাহিত্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-মানসের নিবিড় সংযোগ এবং (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি।

ভূমিকায় বিজ্ঞান মহারাজ লিখেছেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম অবদান জড়বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মবিদ্যার সমন্বয় সাধন: "ভূতাত্মবাদ কা উনহোঁনে নিরাকরণ নহীঁ কিয়া, বলকি উসকো অপনী শান্তিময় অঙ্কমেঁ লেকর পবিত্র ঔর ঈশ্বরভক্ত বনা দিয়া—অর্থাৎ ভূত কো আত্মা কা সাধক

4 দ্রঃ খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ—ঝাবরমল শর্মা, পৃঃ ১২-১৩

বনাকর দিখলায়া।" শ্রীরামকৃষ্ণ ভূতাত্মবাদ বা জড়জগৎকে তাত্ত্বিকরূপে বিসর্জন দেননি, ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে পবিত্র করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, ভূত আত্মার উপাসক, অর্থাৎ জড়শাস্ত্র অধ্যাত্মবিদ্যার উপাসক। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'জলসরবরাহের কারখানা' শীর্ষক বাঙলা গ্রন্থে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আরও পরিষ্কার করে রামকৃষ্ণ-মানস বর্ণনা করেছেন ঃ "ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কলকারখানার আভ্যন্তরিক শক্তি অনুভব করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতেন ও শিল্পাদি বিদ্যার বড়ই আদর করিতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল; বালক ও সাধক সেই নবাগতকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'পরমহংস-চরিতে'র উপদেশাবলীতে উক্ত সমন্বয়চিন্তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে, যথা ঃ

রেলওয়ে ইঞ্জিন যেমন অনায়াসে ভারী মালগাড়ি টেনে নিয়ে চলে, বড় জাহাজ (steamship) যেমন অনেক ছোট ছোট নৌকাকে টেনে নিয়ে চলে, তেমনিই অবতারপুরুষ বহু পাপিতাপীকে অধ্যাত্মজগতে নিয়ে যান অক্লেশে (উক্তি নং ১২৪, ১৩১, ৪৬১ ইত্যাদি)। ইলেকট্রিক বা বিজলী পাখা চললে আর হাতপাখার প্রয়োজন কি? শ্রীভগবানের কৃপালাভ করলে আর সাধনভজনের প্রয়োজন নেই (৪৭৪)। জ্বালানী গ্যাস এক জায়গায় তৈরি হয়ে নলের মধ্য দিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত হয়; সেইরকম একই ভগবানের প্রেরণায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে (১৫৭)।

কুম্ভকার এবং কর্মকারদের ভালভাবে লক্ষ্য করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কামারপুকুরে লালিত-পালিত তিনি; তাই কামারশালার খুঁটিনাটি বিষয়ও 'পরমহংস-চরিত'-এর বাণীতে বিধৃত (১৬৫-১৬৬, ২৫৬, ৪৬৩ ইত্যাদি)। ধাতুবিদ্যাও বাদ যায়নি। কষ্টিপাথরে যেমন সোনা ও পিতলের পার্থক্য বোঝা যায় তেমনিই শ্রীভগবানই বিচার করবেন সাধুতা আন্তরিক কিনা, কারণ তিনিই একমাত্র কষ্টিপাথর (৩৪৫)। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীতে পাচ্ছি দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার (২৪৭, ২৮৭), ওজনের ভারে স্প্রিং-এর প্রকৃতি (২৫৫), সূর্যরশ্মি থেকে বর্ণালী-উৎপাদক প্রিজম (৩৯৮), মুক্তার জন্মকথা (১৭১), প্রজাপতি, গুটিপোকা ও রেশম (২৮৯), সমুদ্রের নিচে মহাদেশ, পর্বত ও উপত্যকা (৫০৯) এবং আরও কত কি! শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকশিখার বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করেছেন (৫০১)। তিনি চালুনি/চালনী এবং কুলো বা শূর্পের ব্যবহারের প্রকৃতির পার্থক্য বুঝিয়েছেন এবং এই পার্থক্য উপমারূপে কাজে লাগিয়েছেন সাধু ও অসাধু প্রকৃতির বর্ণনায় (২৬৬-২৬৭)। চালুনি অসাধু লোকের মতন স্থূল বস্তু রেখে দেয় সূক্ষ্মবস্তু পরিত্যাগ করে। সাধুর কাজ বিপরীত, যেমন কুলোর ঝাঁকুনিতে (winnowing) সূক্ষ্ম জিনিস (ওপরে) থেকে যায় এবং স্থূল বস্তু (নিচে) পরিত্যক্ত হয়। এই উক্তিতে বৈজ্ঞানিক এবং অধ্যাত্ম-চেতনার অপূর্ব সমন্বয় দেখতে পাই।

স্বামীজীর যেমন ইতিহাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরেরও তাই। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। 'পরমহংস-চরিত'-এর ১২৬ নং উক্তিতে পাই ঃ "শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা সম্পর্কে শাস্ত্রের বিভিন্ন উক্তির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে যদিও তাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত অনেক ঘটনা ইতিহাসের দিক থেকে সত্য নাও হতে পারে।" এটি সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্কলিত উক্তির (৫৩৫) পরিপূরক (অনুবাদ নয়!)। *শ্রীকৃষ্ণকথায় যে কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই*—একথা শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীকার করতেন না। বলা বাহুল্য, এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে তথ্য ও তত্ত্ব সমান মর্যাদা পেয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে আধুনিক বিজ্ঞানের সব বক্তব্য নির্বিবাদে মেনে নিতেন—এমন বলা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অ্যামিনো অ্যাসিড, আর. এন. এ., ডি. এন. এ. ইত্যাদির সংমিশ্রণে জীবন এবং চৈতন্যের উৎপত্তি হয়েছে। 'পরমহংস-চরিত'-এর ১৯০ নং উক্তিতে পাই যে, ব্রহ্মশক্তিই জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। অতএব এখানে সমন্বয় হলো না। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যত্র কটাক্ষপাত করেছেন—"সায়েন্স-এর খবরের কাগজে অবতারদের কথা লেখা নেই, অতএব কি করে ওরা বিশ্বাস করবে!" এটুকু বাদ দিলে আমরা বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে একমত যে, শ্রীশ্রীঠাকুর আধুনিক বিজ্ঞানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন[৫] এবং বিজ্ঞানচিন্তাকে পরমার্থ-উপাসনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন।

৫ দ্রঃ 'রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সুবর্ণযুগে বিজ্ঞানচেতনার কিছু স্বল্পজ্ঞাত তথ্য'— অরুণকুমার বিশ্বাস, উদ্বোধন, ৯২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৯৭, পৃঃ ২১৫-২১৮, ২৪৯-২৫৬

হিন্দী ভক্তিসাহিত্য ও রামকৃষ্ণ-মানস

'পরমহংস-চরিত'-এর কয়েক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি (উক্তি নং ২৬৫, ৩৪৪, ৩৫০, ৪৪০, ৫১৭ ইত্যাদি), শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দী ভক্তিসাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। মনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, এগুলি কি বিজ্ঞান মহারাজের উদ্ধৃতি, না শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত; তিনি কি হিন্দী জানতেন? আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, জটাধারী, তোতাপুরী, নারায়ণ শাস্ত্রী, শিখ এবং মাড়োয়ারি ভক্তদের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভালই হিন্দী শিখেছিলেন এবং উদ্ধৃতিগুলি তাঁরই মুখনিঃসৃত।

৩৫০ নং উক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনপ্রকার অসাধু ব্যক্তির কথা বলছেন: নেশাখোর, সাধুর ভানকারী গৃহস্থ এবং কামার্ত যোগী। এটি তুলসীদাসের পদ, সুরেশচন্দ্র দত্তও উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তাঁর সঙ্কলনে ২৪৪ নং), তবে শেষ দুটি লাইনে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তুলসীদাসের দোঁহা উদ্ধৃত করেছেন এবং সম্ভবতঃ দুইভাবে ঐ দোঁহাটি জানতেন। যতই সেয়ানা হোক, কাজলের ঘরে থাকলে কালি লাগবে—'পরমহংস-চরিতে' এই উক্তিটিও (নং ৩২২) দোঁহার বস্তু। মূল হিন্দীটি সুরেশচন্দ্রের সঙ্কলনে (নং ২০৬) পাই।

'পরমহংস-চরিত'-এর ৫১৭ নং উক্তিতে আছে যে, প্রকৃত ভক্তি এবং প্রাণমন দিয়ে প্রার্থনা করলে পাপীরাও মুক্তি পাবে। এই প্রসঙ্গে মীরাবাঈয়ের যে-ভজনটি লিপিবদ্ধ আছে —"অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে... তারো মীরাবাঈ... হরিসে লাগি রহোরে ভাই"—সেটি শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গাইতেন একথা স্বামী অখণ্ডানন্দের সাক্ষ্যেও পাওয়া যায়।[৬] শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া আরেকটি ভজনের কথা স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন:

> "দিল রাম কো নহীঁ জানা হৈ
> তো জো জানা হৈ সো ক্যা রে?"[৭]

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে শ্রুত আরেকটি দোঁহার কথা:

> "জো রাম দশরথ কা বেটা
> ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা।"[৮]

কথ্য হিন্দীভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন শ্রীম। ২০ অক্টোবর ১৮৮৪ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম বড়বাজারে মাড়োয়ারি ভক্তমন্দিরে গিয়েছিলেন। এক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়:

"পণ্ডিতজী হিন্দীতে বরাবর কথা কহিতেছেন। ঠাকুরও তাঁহার সহিত অতি মধুর হিন্দীতে কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতজী ঠাকুরের প্রশ্নের ('প্রেম কাকে বলে?') উত্তরে প্রেমের অর্থ একরকম বুঝাইয়া দিলেন।... পণ্ডিতজী হিন্দীতে এ-সমস্ত বলিতেছেন। ঠাকুর মাস্টারের দিকে ফিরিয়া এই কথাগুলির অর্থ বলিয়া দিতেছেন।"[৯]

অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দী ভক্তিসাহিত্য ভালভাবেই জানতেন এবং 'পরমহংস-চরিত'-এ উদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাগুলি তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তদের কাছে বলতেন।

মৌলিক রচনা ও নিজস্ব অনুভূতি

'পরমহংস-চরিত' যে বিজ্ঞান মহারাজের মৌলিক রচনা, সুরেশবাবুর গ্রন্থের অনুবাদ নয়—এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের (১৯০৪) পর গ্রন্থটির আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে—১৯২১, ১৯৩৬ (মহারাজের জীবদ্দশায়) এবং ১৯৬৪ সালে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু উক্তি প্রসঙ্গে (যথা নং ১, ১৮১, ১৮৪, ১৮৭, ২১৬, ২৪৯, ২৫৯, ২৭৪, ৩৬১ ইত্যাদি) বিজ্ঞান মহারাজ পাদটীকা *সন্নিবিষ্ট করেছেন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। এত প্রচেষ্টা* সত্ত্বেও গ্রন্থটি উপযুক্ত সমাদর পায়নি, তার কয়েকটি কারণ দেখানো যেতে পারে: (১) বাঙালী এবং দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তগণের হিন্দীভাষায় অনভিজ্ঞতা এবং অনুবাদের অভাব এবং (২) 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃত' গ্রন্থ-দুটির জনপ্রিয়তা। তাছাড়া স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রচারবিমুখতা এবং নিজেকে সংগোপন করে রাখার প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তিনি উত্তরকালে ভক্তবৃন্দকে জানিয়েছেন, যা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধও হয়েছে এবং 'পরমহংস-চরিত'-এর 'Reminiscences of the Master' শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সঙ্কলিত হয়েছে; কিন্তু স্বলিখিত 'পরমহংস-চরিত'-এ তিনি উক্ত অভিজ্ঞতার অনেকটাই লিখে যাননি আত্মগোপন করবার প্রবল তাগিদে।

তবুও দেখি গ্রন্থটিতে অনেক বিষয় ও মন্তব্য রয়েছে যা রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায়

৬ দ্রঃ স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, ১৩৫৭, পৃঃ ৩৫-৩৭ ৭ ঐ, পৃঃ ৩৭

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ১৩৫৮ (সাধকভাব, জটাধারী ও বাৎসল্যভাব-সাধন) পৃঃ ২৩০

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (২০ অক্টোবর ১৮৮৪), প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৬ সং, পৃঃ ৭৮৮

না। সেইরূপ কয়েকটি বিষয় ও উক্তির উল্লেখ করে বর্তমান প্রবন্ধটির পরিসমাপ্তি টানব।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনজীবনের এক পর্বে সূর্যের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে শ্রীভগবানের আরাধনা করতেন —একথা বিজ্ঞান মহারাজ লিখেছেন এবং ১৯৩৬ সালে কানপুর আশ্রম উদ্বোধন করবার সময় বক্তৃতায় বলেছেন। উক্ত সাধনা বিশেষ বিপজ্জনক এবং সম্ভবতঃ সেই কারণে অন্যান্য গ্রন্থকারেরা বিষয়টি বর্জন করে গেছেন। একদিন সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বার কাছে অনুযোগ করেন, কেন মা তাঁকে মূর্খ করে রেখেছেন। তখনই তাঁর দর্শন হলো যে, মা জ্ঞানের পাহাড় এনেছেন আর জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "কিতনি বিদ্যা লোগে?"—কত বিদ্যা নেবে? তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞানপিপাসা মিটে যায়! এই প্রসঙ্গটিও অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান মহারাজ আনন্দময় রসিক শ্রীরামকৃষ্ণের এক অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন ঃ

"শ্রীশ্রীঠাকুর মেয়েদের হাবভাব নকল করে দেখাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন তিনি বউ সেজে আমাদের কাছে অভিনয় করে দেখান কেমন করে স্ত্রীরা স্বামীদের বশ করে। মধুর কটাক্ষপাত করে স্ত্রী স্বামীকে বলছে, 'আরও কিছু খাও না! আরেকটা সন্দেশ কি জিলিপি?' আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোমটা টেনে অভিনয় করে চলেছেন 'অমুক ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ কেমন একটা সাতনরী গলার হার কিনেছে, আমি যদি ঐরকম একটা পেতুম!' "[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণ আগত ভক্তগণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতেন এবং সবাইকে, বিশেষ করে বালক ও যুবকগণকে অল্প কিছু প্রসাদ দেবার চেষ্টা করতেন 'অন্ততঃ একখণ্ড মিছরি'। আবার এও বলতেন যে, সাধুদর্শন করতে গেলে সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে হয় 'অন্ততঃ একটি ছোট হরীতকী'। এইপ্রসঙ্গে বিজ্ঞান মহারাজ পাদটীকায় লিখেছেন যে, ভক্তগণের উচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে বা অন্য মন্দিরে গিয়ে দর্শন করা এবং উৎসবের খরচ বহন করা।

'পরমহংস-চরিত'-এ আমরা বিশেষভাবে পাই বালক হরিপ্রসন্নের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা—বর্ণপ্রথা, জাতিভেদ, রাম ও কৃষ্ণাদি অবতারপ্রসঙ্গ, ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার এবং "আরও কত কিছু"—ইত্যাদি। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবতার বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজার ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেন। এই গোপনীয় তথ্য বালক হরিপ্রসন্ন শোনেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে।

'পরমহংস-চরিত'-এ ৫৯০টি উক্তি/প্রসঙ্গ তো আছেই, তবে কয়েকটি উক্তি বিশেষ মূল্যবান, যা রামকৃষ্ণ-জীবনীর শেষে সন্নিবিষ্ট করেছেন বিজ্ঞান মহারাজ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে—"যেমন রাজা গুপ্তবেশে রাজ্য পরিদর্শনে আসেন, সেইরকমই এইবারের (আমার) আসা। মাত্র কয়েকজনই চিনতে পারছে।"

অনেককে বলেছেন ঃ "এখানে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো। এখানে বিশ্বাস রাখতে পারলে আর ভয় নাই।" বিজ্ঞান মহারাজের মন্তব্য ঃ "পরমেশ্বরকে বিনা ভলা কৌন অ্যায়সা কহ সকতা হৈ?"—স্বয়ং পরমেশ্বর ছাড়া আর কে এই ধরনের উক্তি করতে পারে?

পরমহংসদেব একজনকে বলেছিলেন ঃ "প্রাতঃকালে আমার মন সর্বত্র বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে; তখন আমায় স্মরণ করো।"

তিনি বলেছেন ঃ "আমি ছাঁচ বানিয়ে গেলাম। তোমরা সেই ছাঁচে জীবন গড়ে তোল। আমার মন সর্বদাই সমাধিতে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আমি জোর করে মনকে নিচের দিকে নামিয়ে রাখি।"

একবার শ্রীশ্রীঠাকুর কালীমাতার সিংহাসনে উপবেশন করেছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন যে, মামার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জন্য আরও ভাল একটি সিংহাসন বানানো যেতে পারে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর দেন ঃ

"বেটা হৃদয়! তু ইসসে উত্তম আসন কৈসে বনা সকতা হৈ? এক আসন বনানে কো ক্যা কহতা হৈ? মাতা কহতী হৈঁ কি গাঁও গাঁও ঘর ঘর মেরা আসন হোগা। ঘর ঘর লোক মেরি প্রতিমা পুজেঙ্গে।" (ভাষা বিজ্ঞান মহারাজের)

জগজ্জননী বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আসন গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পাতা হবে। সত্যই তা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন বিশ্বজোড়া প্রতিটি ভক্তহৃদয়ে। সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই শুভসংবাদ গ্রন্থরূপে গেঁথে দিলেন বিজ্ঞান মহারাজ।□

১০ উত্তরকালে রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই ধরনের মজার গল্প রেঙ্গুনের মহিলা ভক্তমণ্ডলীর কাছে করেন। (দ্রঃ দিব্যপ্রসঙ্গে—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭২ সং, পৃঃ ১৪৭)

মাতৃকাবৃন্দ ঃ সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুর ধর্মভাবনায় মাতৃকাদেবী বা মাতৃকাদেবীদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। কখন এবং কিভাবে এই মাতৃকাদেবী-ভাবনার উদ্ভব এবং কিভাবে সেই ভাবনার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে তার মনোজ্ঞ এবং তথ্যাগ্রয়ী বিশ্লেষণ করেছেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বর্তমান প্রবন্ধে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও শিল্পে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মাতৃকাদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতাদের থেকে তাঁদের পার্থক্য এই যে, তাঁরা প্রধানতঃ ভয়ঙ্করী, রক্তমাংসলোলুপা, যুদ্ধনিপুণা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুসন্তান-ভোজনপ্রিয়ারূপে বর্ণিত হয়েছেন। তবুও তাঁদের উদ্দেশে ভক্তি ও পূজা নিবেদন করতে আমাদের সমাজ দ্বিধা করেনি। এই মাতৃকাদেবীদের শিবের পরিবারভুক্ত বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, বায়ু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণগুলিতে (রচনাকাল ৩০০-৬০০ খ্রীস্টাব্দ) এই মাতৃকাদেবীদের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে তাঁদের উৎপত্তি, সংখ্যা ও কার্যকলাপ বিষয়ে সবসময় মতৈক্য দেখা যায় না। সাধারণভাবে সাত, আট বা ষোলজন মাতৃকাদেবী আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ঠিক কোন্ সময়ে আমাদের সাহিত্যে বা শিল্পে এই মাতৃকাদেবীদের প্রথম রূপ-কল্পনা হয়েছিল, তা এখনো ঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি।

মহেঞ্জোদেড়োতে আবিষ্কৃত কিছু নারীমূর্তিকে কেউ কেউ মাতৃকাদেবী-কল্পনার প্রথম সূচনা বলে অভিহিত করেন। তবে এঁরা যে দেবী, মানবী নন—এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। ঋগ্বেদে সপ্তচ্ছন্দ (১।১৬৪।২৪), সপ্তনদী (৩।৭।১) প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কয়েকটি স্থানে 'দেবীগণের বা কুমারীগণের' উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের প্রায়ই তিন, সাত বা দশ সংখ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একত্রে মাতৃগণ ("মাতরঃ") বা ভগিনীবৃন্দ বা কুমারীবৃন্দ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে গণদেবতারূপেই তাঁদের উল্লেখ দেখা যায় এবং তাঁদের স্বতন্ত্র কোন পরিচয়, কার্যকলাপ, এমনকি পৃথক্ পৃথক্ নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে অনেক সময় অগ্নির ভগিনী বা মাতা-রূপে তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁদের সংখ্যা 'সাত'।

ঋগ্বেদে অগ্নিকে কখনো কখনো তিন মায়ের সন্তান ("ত্রিমাতা"—৩।৫৬।৫)-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'তিন মাতা' বলতে সম্ভবতঃ ইলা, সরস্বতী এবং ভারতী —এই দেবীত্রয়কে বোঝায়। অগ্নির দুই মায়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে দুটি অরণিকাঠের ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদনের ব্যাপারটিকেই বোঝানো হয়েছে মনে হয়। অগ্নির 'দশ মাতা' বা 'দশ ভগিনী'র উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে অগ্নিপ্রজ্বালনের সময় যে দশ অঙ্গুলির ব্যবহার হয় তাকেই বোঝায়। তবে দেবীগণের উল্লেখ করতে গিয়ে 'সাত' সংখ্যাটিরই উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায়। আর 'ভগিনী' বা 'মাতা' শব্দদুটি বিশেষ কারোর ভগিনী বা বিশেষ কারোর মাতা—এইরকম অর্থের দ্যোতক নয়, বরং একত্র-সম্পর্কযুক্ত কয়েকজন নারী বোঝাতেই শব্দদুটি (ভগিনী ও মাতা) প্রয়োগ করা হতো।

অগ্নির রক্তবর্ণ সপ্তভগিনীর উল্লেখ ঋগ্বেদে একবার পাওয়া যায় (১০।৫।৫)। সায়নের মতে, এর দ্বারা অগ্নির 'সপ্তজিহ্বা' বা 'সপ্তশিখা'র কথা বলা হয়েছে। অন্যত্র (১।১৪১।২) অগ্নির জিহ্বা বা শিখাকে 'শুভকরী সপ্তমাতৃকা' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব ঋগ্বেদীয় ভাবধারা উত্তরযুগের সপ্তমাতৃকার পরিকল্পনায়

অলক্ষ্যে সাহায্য করেছিল মনে করলে বোধহয় ভুল হবে না।

মুণ্ডক উপনিষদে (১।২।৪) অগ্নির সাতটি জিহ্বার উল্লেখ আছে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরুচী। কেউ কেউ মনে করেন, এই সাতটি জিহ্বা মাতৃকাদেবীদের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট। আবার, বৌদ্ধধর্মের তারা, হারীতী প্রভৃতি মাতৃদেবতার আদলে আমাদের শাস্ত্রে মাতৃকাদেবীরা রূপ পরিগ্রহ করেছেন বলে কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেন। আরেকটি মতানুসারে, প্রাচীন মিশরে যে সাতজন মাতৃদেবীর অস্তিত্ব ছিল, তাঁদেরই সাদৃশ্যে ভারতবর্ষেও মাতৃকাদেবীদের উদ্ভব হয়েছিল। যাহোক, সপ্তমাতৃকার উৎপত্তিবিষয়ে যত মতই প্রচলিত থাকুক না কেন, এই সপ্তমাতৃকার পরিকল্পনা যে ভারতীয় ঋষিদের দ্বারা মহাভারতে সূচিত হয়ে পুরাণসাহিত্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল, সেবিষয়ে এখন আর মতানৈক্য নেই। মহাভারতে অসংখ্য মাতৃকাদেবীর নাম ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা আছে। পুরাণেও বহু মাতৃকাদেবীর নাম আছে বটে, তবে সেখানে যে সাত বা আট বা ষোলজন মাতৃকাদেবীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাঁরাই পরবর্তী কালে স্বীকৃত হয়ে দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। মাতৃকাদেবীদের কল্পনায় অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাবকেও কেউ কেউ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

মহাভারতের বনপর্বে (২২৫ অধ্যায়) যে-পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃকাদেবীরা আবির্ভূতা হয়েছিলেন তা প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিদেবের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং অগ্নির তেজ নিজ দেহে গ্রহণ করে গরুড়ী পাখির রূপ ধারণ করে শরবন-সমাবৃত শ্বেতপর্বতে উড়ে আসেন। সেখানে তিনি ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ পরিগ্রহ করে, অগ্নির বীর্যকে ছয়খণ্ড করে ছয়বার শরবনের মধ্যস্থিত একটি কুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। পরে ঐ অগ্নিবীর্যখণ্ডগুলি একত্রিত হয়ে একটি পুত্রের জন্ম হলো—যার নাম 'স্কন্দ'। এই নবজাত পুত্রের ছয়টি মাথা, বারটি কান, বারটি চোখ এবং বারটি হাত উৎপন্ন হলো। কিন্তু তার গ্রীবা ও জঠর-দেশ একটি করেই ছিল (বনপর্ব, ২২৫।২৭)। এই পুত্র মহা-পরাক্রমশালী হলেন। এই স্কন্দেরই অপর নাম কার্ত্তিকেয় ও মহাসেন। মহাসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চারিদিকে নানারকম ভয়ানক মহোৎপাত দেখা দিল (বনপর্ব, ২২৬।১) এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বিপরীত লক্ষণ দেখা দিল (ঐ, ২২৬।২)। ঋষিরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতে লাগলেন।

এদিকে গরুড়ীরূপধারিণী স্বাহা স্কন্দের কাছে এসে বললেন: আমিই তোমার জননী (ঐ, ২২৬।৭)। অন্যদিকে মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণের মধ্যে ছয়জন ঋষি যখন শুনলেন, তাঁদের পত্নীরা অগ্নির বীর্য নিজ নিজ শরীরে ধারণ করেছিলেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে পত্নীদের ত্যাগ করলেন (ঐ, ২২৬।৮)। বিশ্বামিত্র ঋষিদের বোঝালেন, দক্ষকন্যা স্বাহাই তাঁদের পত্নীদের রূপ ধারণ করে অগ্নির খণ্ডিত বীর্য এক-একবার শরবনে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং এব্যাপারে তাঁদের পত্নীদের কোন দোষ নেই। কিন্তু ঋষিরা বিশ্বামিত্রের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁদের সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকলেন এবং পত্নীদের পরিত্যাগ করলেন। এদিকে স্কন্দের অসহ্য বিক্রম সহ্য করতে না পেরে দেবতারা ঐ ছয়জন ঋষিপত্নীকে লোকমাতারূপে সম্বোধন করে তাঁদের অনুরোধ করলেন স্কন্দকে বধ করতে। মাতৃকাবৃন্দ (ঋষিপত্নীরা স্কন্দের প্রকৃত মাতা ছিলেন না, কিন্তু পরোক্ষভাবে মাতা ছিলেন; তাই তাঁদের 'মাতৃকা' বলা হয়েছে) সম্মত হয়ে স্কন্দের কাছে গেলেন, কিন্তু স্কন্দকে অত্যন্ত বলশালী ও অপ্রতিরোধ্য দেখে এবং তাঁকে বধ করা অসম্ভব বুঝতে পেরে নিজেরাই স্কন্দের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা স্কন্দকে বললেন—হে মহাশক্তিধর, তুমি আমাদের সকলের পুত্র হও (ঐ, ২২৬।২৩)। মাতৃকাগণের এই প্রস্তাবে স্কন্দ সম্মত হলেন। এই সময় অগ্নিদেবও সেখানে উপস্থিত হয়ে মাতৃকাগণের সাথে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন। এই ছয়জন ঋষিপত্নী 'কৃত্তিকা' নামে পরিচিতা ছিলেন। এঁদের দ্বারা রক্ষিত হওয়ার জন্য স্কন্দের অন্য নাম হয়েছিল 'কার্ত্তিকেয়'। এই ছয়জন মাতৃকাদেবীর ক্রোধ থেকে রক্তপায়িনী ও শূলহস্তা এক নারীর জন্ম হয়েছিল। ইনিও ধাত্রীর মতো পুত্রতুল্য স্কন্দকে রক্ষা করেছিলেন (ঐ, ২২৬।২৭-২৮)। এইভাবে সাতজন মাতৃকাদেবী স্কন্দকে পালন করেছিলেন। স্কন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ঐ মাতৃকাগণ স্কন্দকে অনুরোধ করেছিলেন, স্কন্দ যেন তাঁদের ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি পূর্ব থেকে প্রসিদ্ধ লোকমাতাদের স্থান প্রাপ্ত করিয়ে দেন। স্কন্দ তাতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা বলেন, স্কন্দ যেন ঐসব লোকমাতাদের পুত্র ও পিতাদের তাঁদের ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করে দেন। স্কন্দ এই প্রস্তাবেও রাজি না হয়ে বলেন, তিনি বহুখ্যাত লোকমাতাদের সন্তানগণকে কৃত্তিকাদের হাতে দেবেন, কিন্তু ভক্ষ্য হিসাবে

নয়—তাদের পুত্রের মতো পালন করার জন্য (ঐ, ২৩০।২০।২১)। তারপর স্কন্দ কৃত্তিকাদের বর দিলেন, পৃথিবীতে মানবসন্তানগণ ষোল বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কৃত্তিকারা তাদের পীড়ন করতে পারেন, কিন্তু তারপর কৃত্তিকাদের এই ক্ষমতা থাকবে না (ঐ, ২৩০।২২)। এখানে লক্ষণীয়, আগে শিশুসন্তানদের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করতে বলে, পরে আবার ষোল বছরের অনূর্ধ্ব বালকদের পীড়া দিতে সম্মতি প্রদর্শনের দ্বারা স্কন্দের ব্যবহারে কিছুটা অসামঞ্জস্য এসেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বৌদ্ধধর্মে হারীতী নামে যে-দেবী আছেন, তিনিও মূলতঃ ধ্বংসকারিণী রাক্ষসী।

বনপর্বের অন্যত্র (২২৮।১।১০) আমরা দেখি, দেবতাদের সাথে স্কন্দের প্রবল যুদ্ধের সময় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে স্কন্দের ক্ষতবিক্ষত শরীর থেকে অসংখ্য ভয়ঙ্করী ও মহাবলা কন্যার জন্ম হয়েছিল। তাদের স্বভাব ছিল গর্ভ থেকে সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ শিশুদের হরণ করা। এই কুমারীগণ স্কন্দকে বলল, আমরা তোমার প্রসাদে সকল লোকের মাতা ও পূজ্যা হতে চাই। স্কন্দ সম্মত হয়ে বললেন : তোমরা শিবা ও অশিবারূপিণী হয়ে মাতৃত্বলাভ করবে। এইভাবে স্কন্দের অনুগ্রহে মাতৃকা-পদ লাভ করে কুমারীগণ স্কন্দকে আশীর্বাদ করে সন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বনপর্বে আবার একসাথে সাতজন মাতৃকার নাম পাওয়া যায়—কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহতা, আর্যা, পলালা ও বৈমিত্রা। মাতৃকাদের এই নামগুলি দেখে অনুমান হয়, এঁরা অনার্য দেবী এবং পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্তমাতৃকা থেকে এঁরা ভিন্ন। কাকী প্রভৃতি সাতজনকে 'শিশুমাতা' বলা হয়, কারণ স্কন্দের প্রসাদে এঁরা সম্মিলিতভাবে 'শিশু' নামক অতিভয়ঙ্কর, রক্তচক্ষু, বীর্যসম্পন্ন একটি পুত্র লাভ করেছিলেন (২২৮।১৩।১৪)।

বনপর্বে আরও কয়েকজন উগ্রস্বভাবা, মানুষের অহিতকারিণী মাতৃকাদেবীর উল্লেখ করা যায়। যেমন, মহারুদ্রস্বভাবা 'বিনতা', যিনি 'শকুনিগ্রহ' নামে পরিচিত (২৩০।২৬); 'পূতনা' নামক রাক্ষসী, যাঁর অপর নাম 'পূতনাগ্রহ' এবং যিনি ভয়ঙ্কর রূপধারিণী ও বালকদের কষ্টদাত্রী (২৩০।২৭); 'শীতপূতনা' একজন ভীষণদর্শনা রাক্ষসী, যিনি মানুষীদের গর্ভ থেকে সন্তানগণকে হরণ করেন (২৩০।২৮); 'অদিতিদেবী' একজন মাতৃকা, যাঁর অপর নাম 'রেবতী', ইনি হলেন 'রৈবতগ্রহ'; মহাভয়ঙ্কর এই গ্রহও বালকদের পীড়া দেয় (২৩০।২৯)। দৈত্যদের মাতা দিতির অপর নাম 'মুখমণ্ডিকা'; এই দুর্ধর্ষা রাক্ষসী শিশুদের মাংস ভক্ষ্যরূপে পেলে খুবই আহ্লাদিতা হন (২৩০।৩০)। কুকুরদের জননী 'সরমাদেবী' সর্বদাই নারীদের গর্ভস্থিত শিশুদের হরণ করেন (২৩০।৩৪)। নাগমাতা 'কদ্রু', গন্ধর্বদের মাতা ও অপ্সরাদের মাতারাও মাতৃকাদেবীরূপে পরিচিতা এবং এঁরা গর্ভস্থ সন্তানের অকল্যাণকারিণী। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'সুশ্রুতসংহিতা'য় শিশুনিপীড়নকারিণী ছয়জন নারীশক্তিকে (মাতৃকা) 'বালগ্রহা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হলেন—শকুনি, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা এবং মুখমণ্ডিকা। স্কন্দকে এঁদের নেতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনজন মাতাকে মঙ্গলদায়িকা, অনুকম্পাপরায়ণা ও সৌম্যমূর্তি বলে বনপর্বে বর্ণনা করা হয়েছে; এঁদের একজন হলেন করঞ্জবৃক্ষে বাসকারিণী বৃক্ষগণের মাতা (২৩০।৩৫); দ্বিতীয়জন হলেন লোহিত-সমুদ্রের কন্যা লোহিতায়নি, স্কন্দের ধাত্রীরূপে প্রসিদ্ধা (২৩০।৪১); তৃতীয়জন আর্যা, স্কন্দের জননীরূপে প্রসিদ্ধা; নিজেদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য মানুষ অন্যান্য গ্রহ থেকে পৃথক্‌ভাবে এঁর পূজা করে (২৩০।৪২)। উপরি উক্ত মাতৃকাদেবীদের কোপ প্রশমনের জন্য ধূপ, অঞ্জন, বলিদান ও নানা উপহার প্রভৃতির দ্বারা স্কন্দের পূজা করার বিধান দেওয়া হয়েছে (২৩০।৪৪)।

মহাভারতের শল্যপর্বের ৪৬ অধ্যায়ে স্কন্দের অনুগামিনী ও শত্রুনাশিনী ১৮০ জন মাতৃকার নাম পাওয়া যায় এবং বলা হয়েছে এঁরা ছাড়া আরও সহস্রসংখ্যক নানারূপধারিণী মাতৃকাগণ স্কন্দের অনুগমন করতেন। এই পর্বে যেসব মাতৃকার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা বনপর্বে বর্ণিত মাতৃকাগণের অতিরিক্ত। কয়েকজন মাতৃকার নাম—প্রভাবতী, গোস্তনী, বৃহদম্বালিকা, একচূড়া, মহাচূড়া, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, রুদ্ররোমা, মেঘস্বনা, বিদ্যুজ্জিহ্বা, শতঘণ্টা, চন্দ্রসীতা, জলেশ্বরী, এড়ী, ভেড়ী, বেতালজননী, চিত্রসেনা, মহাবেগা, কঙ্কণা, কণ্টকিণী, কেশযন্ত্রী, তড়িৎপ্রভা, মুণ্ডী, লম্বিনী, তাম্রচূড়া, বিভীষণা, চতুষ্পথনিকেতা, একত্বচা, কৃষ্ণকর্ণী, শঙ্খশ্রবা, নৌকর্ণা, ভূতিতীর্থা প্রভৃতি। এইসব মাতৃকার যে শারীরিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এঁদের মধ্যে অনেকেই ভয়ঙ্কররূপা, ভীতিপ্রদা এবং

অমঙ্গলদায়িকা। এঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, এঁরা দীর্ঘনখ, দীর্ঘদন্ত ও বিশালমুখ-বিশিষ্টা। এঁরা মহিষবাহনা ও যথেচ্ছ-রূপধারিণী। কোন কোন মাতৃকার দেহ মাংসহীন অস্থিনির্মিত। কেউ কেউ শ্বেতবর্ণা, কেউবা স্বর্ণতুল্য অঙ্গকান্তিবিশিষ্টা, কেউ আবার ঘন মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা, কোন মাতৃকার দেহ ধূম্রবর্ণা (মহাভারত, শল্যপর্ব, ৪৬৷৩৩)। এই মাতৃকাদের কেশ দীর্ঘ, বেণী উর্ধ্বদিকে বদ্ধ ও নয়ন পিঙ্গলবর্ণ। কোন কোন মাতৃকার চোখ তাম্রবর্ণ, কারো বা হরিদ্বর্ণ। এই মাতৃকাগণ বরদানে সমর্থা এবং স্বেচ্ছাবিহারিণী। এই মাতৃকাদের মধ্যে কেউ হলেন যমের শক্তি, কেউবা রুদ্রের, কেউ কেউ আবার সোম ও কুবেরের শক্তি। এইরকম বরুণের, ইন্দ্রের, অগ্নির, বায়ুর, ব্রহ্মার, বিষ্ণুর ও সূর্যের শক্তিরূপিণী মাতৃকাদেরও উল্লেখ দেখা যায়। এইসব দেবতাদের শক্তিস্বরূপা মাতৃকাগণের মধ্যে কারোর কারোর বৈশিষ্ট্য হলো—এঁদের শরীর অপ্সরাদের মতো মনোহারিণী, কণ্ঠস্বর কোকিলের মতো, পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য, তেজ অগ্নির মতো; এঁরা শত্রুদের ভয়প্রদায়িনী এবং বায়ুর মতো বেগগামিনী। মাতৃকাদের বাসস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—এঁরা ইচ্ছানুসারে বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান, পর্বত ও প্রস্রবণে বাস করেন।

এইসব মাতৃকাদের নাম ও চেহারার বর্ণনা থেকে যদিও কিছুটা বীভৎসতার চিত্র ফুটে ওঠে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে শল্যপর্বে তিন ভুবনে ব্যাপ্তা এই মাতৃকাগণকে যশস্বিনী ও কল্যাণকারিণী-রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে (শল্যপর্ব, ৪৬৷২)।

বনপর্বে বর্ণিত মাতৃকাদের থেকে শল্যপর্বের মাতৃকাদের পার্থক্য এই যে, এঁরা বালক ও গর্ভস্থ শিশুদের প্রতি দ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। শিশুভোজনকারিণী ও গর্ভস্থিত শিশুদের হরণকারিণী মাতৃকাদের অনেককেই 'গ্রহ' বলা হয়েছে। কোন নারীর সন্তান-প্রসবকালে মৃত্যু হলে বা গর্ভাবস্থায় কোন সন্তান নষ্ট হলে—এই সব অঘটনের পিছনে দুষ্ট গ্রহের প্রভাব কল্পনা করে তাকে তুষ্ট করার রীতি থেকেই সম্ভবতঃ এই মাতৃকাগণের কল্পনা করা হয়েছিল। শিশুলোভী মাতৃকাদের কবল থেকে নিজের সন্তানদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই বোধহয় আমাদের সমাজে একটা প্রথা চালু হয়েছিল যে, মায়েরা তাঁদের শিশুসন্তানদের ওপর কোন অশুভ গ্রহের (মাতৃকার) 'নজর লাগা'র ভয়ে কারোর দ্বারা প্রকাশ্যে ঐ শিশুদেরকে সুন্দর বলে ঘোষণা করা পছন্দ করেন না এবং তাদের চোখে বা কপালে কাজল দিয়ে তার স্বাভাবিক রূপকে আড়াল করতে চান। মহাভারতের বন ও শল্য-পর্বে মাতৃকাদেবীদের যে ভয়ঙ্কর, শিশু ও গর্ভদ্বেষী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে, এঁদের রূপকল্পনায় অনার্য বা অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অল্পবিস্তর মিশ্রণ ঘটেছে। তাছাড়া কেউ কেউ বলেন, যে স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয়ের সাথে মাতৃকাদেবীদের সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে, তিনিও মূলতঃ অনার্যদেবতা; মহাভারতের যুগে তিনি কোনভাবে আর্যদেবতাদের মধ্যে স্থানলাভ করে নিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, স্কন্দ-কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্তের মতো অন্য কোন আর্যদেবতার জন্মকাহিনী আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। কার্ত্তিকেয়ের জন্মকাহিনীর মধ্যে অভিনবত্বও লক্ষ্য করা যায়। বনপর্বে কার্ত্তিকেয়কে অগ্নি ও স্বাহা থেকে উৎপন্ন এবং কৃত্তিকাদের দ্বারা পালিত বলা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের কাছে তিনি মহাদেব ও দুর্গার পুত্ররূপে সমধিক পরিচিত। বনপর্বেই (২৩১৷৮৷৯) দেখি, ব্রহ্মা মহাসেনকে (কার্ত্তিকেয়কে) বলছেনঃ এখন তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরাসুরনিধনকারী মহাদেবের সাথে মিলিত হও —"অভিগচ্ছ মহাদেবং পিতরং ত্রিপুরার্দনম্"। তারপর, ব্রহ্মা কার্ত্তিকেয়কে বুঝিয়ে বললেন, কেন তিনি অগ্নি ও স্বাহা থেকে উৎপন্ন হলেও তাঁর প্রকৃত পিতা ও মাতা হলেন রুদ্র ও উমা। রুদ্র অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হয়ে তাঁরা দুজনে সকল লোকের হিতসাধনের জন্য স্কন্দকে অপরাজিত করে সৃষ্টি করেছেন।

মহাভারতে বর্ণিত স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত যদিও কিছুটা বোধগম্য, সেখানে যেসব অসংখ্য মাতৃকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁদের ভয়ঙ্কর রূপটাই বেশি করে চোখে পড়ে, কিন্তু এঁদের উৎপত্তি, ক্রিয়াকলাপ ও সংখ্যা সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে গোষ্ঠীবদ্ধ স্ত্রী-দেবতারূপে মাতৃকাগণের উল্লেখ সম্ভবতঃ মহাভারতেই প্রথম স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

পুরাণের যুগে মাতৃকাদেবীদের ভীতিসঞ্চারী রূপ ও অহিতকারী চরিত্র অনেকখানি পরিবর্তিত করে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের কিছুটা কাছাকাছি আনা হয়েছে। এখানে তাঁরা দেবতাদের সহায়করূপে দৈত্যনিধনে নিজেদের নিয়োগ করেছেন। পুরাণে বহু মাতৃকাদেবীর নামের

উল্লেখ থাকলেও সাত বা আটজনের নামই প্রাধান্যলাভ করেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য'-এ যে-মাতৃকাদের বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁরাই বর্তমানে হিন্দুদের কাছে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই পুরাণে (৮৮ অধ্যায়) শুম্ভ ও নিশুম্ভের সাথে দেবী দুর্গার (ইনি 'অম্বিকা' নামেও অভিহিত হয়েছেন) যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, দেবীর অংশোদ্ভূতা কালীর দ্বারা চণ্ড ও মুণ্ড নামে অসুরদ্বয় নিহত হলে অসুরপতি শুম্ভের নির্দেশে যখন বহু সহস্র অসুরসৈন্য দেবীর সামনে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হলো তখন অসুরদের বিনাশের জন্য এবং দেবতাদের মঙ্গলসাধনের জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাদের শরীর থেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বল ও বীর্যযুক্ত শক্তি নির্গত হলো; যে-দেবতার যেমন রূপ, বেশভূষা ও বাহন, তাঁদের দেহ থেকে নির্গত শক্তিগুলিও সেইরকম রূপ পরিগ্রহ করে এবং অনুরূপ বেশ ও বাহনে অলঙ্কৃত হয়ে অসুরদের সাথে যুদ্ধে দেবী দুর্গাকে সাহায্য করতে উপস্থিত হলেন। (৮৮।১৩)

হংসযুক্ত বিমানের ওপর আসীন হয়ে হাতে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করে ব্রহ্মার যে-শক্তি আবির্ভূতা হলেন, তাঁর নাম 'ব্রাহ্মী' বা 'ব্রহ্মাণী' (৮৮।১৪)। বৃষারূঢ়া, উত্তম ত্রিশূলধারিণী, বিশাল সর্পবলয়যুক্তা ও অর্ধচন্দ্র-বিভূষণা হয়ে 'মাহেশ্বরী'-শক্তি ভগবান মহাদেবের শরীর থেকে নির্গতা হলেন (৮৮।১৫)। 'শক্তি' নামক একটি বিশিষ্ট অস্ত্র ধারণ করে উত্তম ময়ূরে আরোহণ করে 'কৌমারী'-শক্তি কুমার কার্তিকেয়ের দেহ থেকে নির্গতা হয়ে দৈত্যদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যতা হলেন (৮৮।১৬)। গরুড়ে আরোহণ করে চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে 'বৈষ্ণবী'-শক্তি বিষ্ণুর দেহ থেকে প্রকাশিতা হলেন (৮৮।১৭)। যজ্ঞবরাহরূপধারী ভগবান বিষ্ণুর শরীর থেকে বরাহরূপধারিণী 'বারাহী'-শক্তি আবির্ভূতা হলেন (৮৮।১৮)। নৃসিংহরূপধারী বিষ্ণুর দেহ থেকে নৃসিংহরূপধারিণী 'নারসিংহী' শক্তি নির্গতা হলেন (৮৮।১৯) এবং ইন্দ্রের দেহ থেকে গজরাজের ওপর আসীনা, সহস্রনয়না, বজ্রহস্তা ও ইন্দ্রের মতো আকৃতিবিশিষ্টা 'ঐন্দ্রী'-শক্তি প্রকাশিতা হলেন (৮৮।২০)।

এই সাতটি 'শক্তি' (ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী) কালক্রমে 'সপ্তমাতৃকা'রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এই সাতটি শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহাদেব চণ্ডিকা (দুর্গা)-কে আদেশ করলেন তাঁর প্রীতির জন্য যত শীঘ্র সম্ভব অসুরদের হত্যা করতে। তখন দেবী চণ্ডিকার নিজ শরীর থেকে অতি উগ্রা, ভীষণস্বভাবা আরেকটি 'চণ্ডিকা'-শক্তি শত শত শৃগালীর মতো নিনাদ করতে করতে নিষ্ক্রান্তা হলেন। এই চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হয়েই শিবকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের কাছে দূতরূপে প্রেরণ করলেন দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাদের আহ্বান জানানোর জন্য (৮৮।২১-২২)। যেহেতু সেই দেবী চণ্ডিকার দ্বারা শিব দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেকারণে এই শক্তি 'শিবদূতী' নামে প্রসিদ্ধা হন। (৮৮।২৭)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (৮৭।৪-১০) বর্ণিত হয়েছে, চণ্ড ও মুণ্ড বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হলে দেবী দুর্গার (অম্বিকার) ললাটফলক থেকে করালবদনা 'কালী' বা 'চামুণ্ডা' নির্গতা হয়েছিলেন। এখানে দেবতাদের দেহ থেকে 'সপ্তমাতৃকা'র উৎপত্তি বর্ণনার পাশাপাশি শিবদূতী ও কালীকে দেবী দুর্গার শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নয়জন শক্তিরই যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা বোঝা যায় আলোচ্য পুরাণের 'নারায়ণীস্তুতি' (৯১।১১-১৮) থেকে, যেখানে ঐ নয়জনকেই 'নারায়ণি' বলে সম্বোধন করে স্তুতি করা হয়েছে।

দেবতাদের দেহ থেকে 'সপ্তমাতৃকা' আবির্ভূতা হয়ে অসুরদের সাথে যুদ্ধে দেবী দুর্গার সহায়তাকর্মে নিযুক্তা হলেন। ইতস্ততঃ ধাবমান অসুরসৈন্যের ওপর কমণ্ডলুর জল বর্ষণ করে ব্রহ্মাণী তাদের বীর্য ও তেজ নষ্ট করে দিলেন (৮৮।৩২)। মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা, বৈষ্ণবী চক্র দ্বারা এবং কৌমারী 'শক্তি' নামক অস্ত্র দ্বারা বহু অসুরকে নিহত করলেন (৮৮।৩৩)। ঐন্দ্রী বজ্রের দ্বারা, বারাহী দণ্ডাঘাতে এবং নারসিংহী নখপ্রহারে শত শত অসুরকে বিদারিত করলেন (৮৮।৩৪।৩৬)। মাতৃদেবতাদের দ্বারা পীড়িত দৈত্যরা যখন চেতনাশূন্য অবস্থায় দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করছিল, তখন রক্তবীজ নামক মহাসুর ক্রোধান্বিত হয়ে দেবী দুর্গার সাথে যুদ্ধ করতে এল। মাতৃকাগণ নিজ নিজ অস্ত্রের দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করলে তার দেহনির্গত রক্তবিন্দু থেকে অসংখ্য ভয়ঙ্কর অসুরের জন্ম হলো। এইসময় চণ্ডিকা-শক্তি ও কালীর (চামুণ্ডার) সক্রিয় প্রয়াসে দেবী দুর্গা রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও অসংখ্য অসুরকে পরাজিত ও বিদলিত করলেন। রক্তবীজকে ধ্বংস করার ব্যাপারে কালীর কৃতিত্ব ছিল বেশি। রক্তবীজ নিহত হলে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃকাগণ উল্লসিত হয়ে অসুরদের রক্তপান করলেন এবং মদোদ্ধত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

"তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্-মদোদ্ধতঃ" (৮৮।৬২)। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে সাতজন মাতৃকার পৃথক অস্তিত্ব ছিল।

শুম্ভের তেজ দমন করার জন্য দেবী দুর্গার দেহ থেকে 'মহোল্কা' নামে আরেকটি শক্তি আবির্ভূতা হয়েছিলেন। প্রাণসম ভ্রাতা নিশুম্ভের নিধন-সংবাদ শুনে এবং অন্যান্য অসুরদের হত্যা করতে উদ্যতা দেখে দেবী অম্বিকাকে ব্যঙ্গ করে অতিক্রুদ্ধ শুম্ভ বলল: তুমি যে-শক্তির অহঙ্কারে গর্বিত হয়েছ, সে-গর্ব তোমার সাজে না। কারণ, তুমি অন্যান্য দেবতাদের শক্তিকে আশ্রয় করেই যুদ্ধ করেছ (৯০।২)। শুম্ভের এই ভর্ৎসনা শুনে দেবী বললেন: রে দুষ্ট, এই জগতে একা আমিই বিদ্যমানা। আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? যেসব শক্তি (বিভূতি) বিভিন্ন দেবতা থেকে নির্গত হয়েছে, তারা আসলে আমারই শক্তি। দেখ, তারা সকলে আমার শরীরে প্রবেশ করছে—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥" (৯০।৩)

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার শক্তিসমূহ দেবী অম্বিকার (দুর্গার) দেহে বিলীন হয়ে গেল। দেবী তখন একাকিনীই অবস্থান করতে লাগলেন।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥"
(৯০।৪)

বামনপুরাণে (৫৬ অধ্যায়) রক্তবীজের সঙ্গে দেবী চণ্ডিকার যুদ্ধ প্রসঙ্গে সাতজন মাতৃকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায়, মাতৃকাগণ দেবীর দেহাংশ থেকেই আবির্ভূতা হয়েছিলেন। কোটি কোটি সৈন্য পরিবৃত হয়ে রক্তবীজকে আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা সিংহনাদ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী ও কৌমারী জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রহ্মাণী অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু হাতে নিয়ে হংসবাহনে আরোহিতা ছিলেন। মাহেশ্বরী ছিলেন ত্রিনয়না, ত্রিশূল ও কুণ্ডলধারিণী, বৃষারূঢ়া; ভয়ঙ্করী এই দেবী বিশাল সর্পবলয় পরিধান করেছিলেন। কৌমারী ছিলেন বর্হিপত্র-শোভিনী, 'শক্তি' নামক অস্ত্রশোভিতা এবং ময়ূরবাহনা। চণ্ডিকার দুই বাহু থেকে শঙ্খ-চক্র-গদা-অসি-ধারিণী, গরুড়ারূঢ়া, বাণহস্তা ও রূপযৌবন-সমন্বিতা বৈষ্ণবী আবির্ভূতা হলেন। দংষ্ট্রা দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করতে করতে বিশাল মুষল হাতে নিয়ে শেষনাগে আরোহণ করে ভয়ানক-প্রকৃতি বারাহী দেবী চণ্ডিকার পৃষ্ঠদেশ থেকে অবতরণ করলেন। তারপর কেশরসমূহ বিক্ষিপ্ত করতে করতে, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদের চারিদিকে প্রক্ষিপ্ত করতে করতে বিরাট নখযুক্তা, অতিদারুণ-প্রকৃতি নারসিংহী দেবী চণ্ডিকার হৃদয় থেকে আবির্ভূতা হলেন। এরপর দেবীর দেহ থেকে শিবা সমুদ্ভূতা হলেন; ইনি ভগবান শিবকে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন, তাদের দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলার জন্য। এই কারণেই শিবার অপর নাম 'শিবদূতী'। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতো বামন পুরাণেও মাতৃকাগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করে অসুরদের নিহত করেছেন। এই দুই পুরাণে মাতৃকা-বর্ণনায় পার্থক্য এই যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে যেখানে মাতৃকাগণ বিভিন্ন পুরুষদেবতার অংশ থেকে ও তাঁদের অস্ত্রবাহনাদি নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন, বামনপুরাণের বর্ণনায় এঁরা সকলেই দেবী চণ্ডিকার দেহ থেকে জাত। কিন্তু তাঁদের অস্ত্র ও বাহন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের কাছ থেকে গৃহীত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শিবদূতীকে সপ্তমাতৃকার মধ্যে বর্ণনা করা হয়নি, কিন্তু বামনপুরাণে তাঁকে ঐন্দ্রীর পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্যপুরাণে (১৮৯ অধ্যায়) মাতৃকাগণের উৎপত্তি ও চরিত্র কিছুটা ভিন্ন প্রকারের। অন্ধক নামে এক দৈত্য উগ্রতপস্যার দ্বারা দেবতাদেরও অবধ্য হয়েছিল। সে একদিন মহাদেবের কাছে ক্রীড়ারতা পার্বতীকে হরণ করতে উদ্যত হলে মহাদেবের সাথে তার দারুণ যুদ্ধ বাধে। অন্ধকাসুরের দ্বারা বিশেষভাবে নিপীড়িত হয়ে মহাদেব পাশুপত নামে একটি শক্তিশালী বাণ সৃষ্টি করলেন। সেই বাণের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত অন্ধকের দেহ থেকে ক্ষরিত রক্তধারায় হাজার হাজার অন্ধকাসুরের আবির্ভাব হলো। (এই প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের রক্তবীজ-উপাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে।) সেই অন্ধকাসুরগণ তীরবিদ্ধ হলে তাদের রক্ত থেকে আবার বহু সহস্র অসুরের জন্ম হলো এবং তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। অসুরদের এইরকম মায়াচারী দেখে মহাদেব তাদের শোণিত পান করার জন্য বহুসংখ্যক মাতৃকাদেবী সৃষ্টি করলেন। এই পুরাণে ১৯৮ জন মাতৃকার নামের উল্লেখ করা হয়েছে। মাহেশ্বরী, কৌমারী, ব্রাহ্মী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী ও শাক্রী (ঐন্দ্রীর অপর নাম 'শক্র', তাঁর শক্তি)—এই সপ্তমাতৃকা ছাড়া আর যেসব মাতৃকার নামোল্লেখ আছে তাঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলেন—চলজ্জিহ্বা, ভগানন্দা, পিচ্ছিলা, বিড়ালী, শকুনী, মহারক্তা, করালী, মারী, পিশাচী, রাক্ষসী, খেটা, মহানাসা, লাঙ্গলাবতী, হুঙ্কারী, ভূতডামরী, মহোদরী, জ্বালামুখী প্রভৃতি। ভীতি-উৎপাদক আকৃতি-বিশিষ্টা এই সব মাতৃকা আবির্ভূতা হয়েই অন্ধকদের রক্তপান করতে লাগলেন—"অন্ধকানাং মহাঘোরাঃ পপুস্তদ্ রুধিরং তদা" (১৭৯।৩৩)। রক্তপান করে মাতৃকাগণ তৃপ্তি লাভ করলে মায়াবী অন্ধকাসুরেরা আবার আবির্ভূত হয়ে শূল ও মুদ্গর নিয়ে মহাদেবকে আক্রমণ করল। মহাদেব ব্যাকুল হয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। ভগবান বাসুদেব তখন 'শুষ্করেবতী' নামে এক দেবীমূর্তি সৃষ্টি করলেন—যিনি সৃষ্টা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহত অসুরদের সমস্ত রক্ত এত তাড়াতাড়ি পান করলেন যে, ঐ রক্ত থেকে নতুন অসুরেরা জন্মগ্রহণের সুযোগ পেল না। এই দেবীর চেষ্টাতেই মহাদেব অন্ধকদের সংহার করতে সমর্থ হলেন। প্রধান অন্ধকাসুর অনন্যোপায় হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন।

অন্ধকাসুর হতবল হলে মহাদেবের সৃষ্ট পূর্বোক্ত মাতৃকাগণ মহাদেবকে বললেন—ভগবন্! আমরা আপনার অনুগ্রহে সমস্ত দেবতা, মানুষ, অসুর এবং এই সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করতে চাই। আপনি আমাদের আদেশ দিন (১৭৯।৪১)। মহাদেব এই হীনকর্ম থেকে তাঁদের নিবৃত্ত হতে এবং সমগ্র প্রজারন্দকে রক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু মাতৃকাগণ মহাদেবের কথায় কর্ণপাত না করে ভীষণ মূর্তি ধারণ করলেন এবং চরাচরসমেত তিন ভুবনকে গ্রাস করতে প্রবৃত্ত হলেন। তখন ভগবান শঙ্কর নৃসিংহমূর্তিধারী নারায়ণকে ধ্যান করে তাঁকে মাতৃকাগণের কবল থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। মহাদেবের কথা শুনে নৃসিংহরূপী নারায়ণ জিহ্বা থেকে দেবী বাণীশ্বরী, হৃদয় থেকে মায়া, গুহ্য থেকে ভবমালিনী এবং অস্থি থেকে কালী নামে চারজন মাতৃকা সৃষ্টি করলেন। তারপর আরও বত্রিশ জন মাতৃকা নারায়ণের শরীর থেকে আবির্ভূতা হলেন। এঁদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণী, ত্রৈলোক্য-মোহিনী, চক্রহৃদয়া, ব্যোমচারিণী প্রভৃতি আটজন মাতৃকা বাণীশ্বরীর অনুচরী হলেন। সঙ্কর্ষণী, অশ্বত্থা, বীজভাবা, মধুদংষ্ট্রী প্রভৃতি আটজন মাতৃকা মায়ার অনুচরী হলেন। ভবমালিনীর সঙ্গে থাকলেন অজিতা, সূক্ষ্মহৃদয়া, বৃদ্ধা, নৃসিংহভৈরবা, জয়া প্রভৃতি অষ্টমাতৃকা। আকর্ষণী, সম্ভটা, জ্বালামুখী, ভীষণিকা, কামধেনু প্রভৃতি অষ্টমাতৃকা কালীর অনুচরী হলেন। নারায়ণ-সৃষ্টা এই নবীন মাতৃকাসমূহ ক্রোধকষায়িত নেত্রে জগৎসংহারে প্রবৃত্ত মাতৃকাগণের প্রতি ধাবিত হলে তাঁরা সকলে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণও তাঁদের নানাভাবে উপদেশ দিয়ে জগতের সকল প্রজাকে পালন করতে এবং বিশেষভাবে মহাদেবের ভক্তদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করতে বললেন। মহাদেব মাতৃকাগণকে বর দিলেন, তাঁরা দেবীরূপে জগতে পূজিতা হবেন। তারপর নৃসিংহদেব মাতৃকাগণের সঙ্গে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। যেস্থান থেকে তাঁরা অন্তর্ধান করলেন পরবর্তী কালে তার নাম হলো—'কৃতশৌচ'। কথিত আছে, সেখানে ভগবান অর্ধনারীশ্বররূপ ধারণ করে সপ্তমাতৃকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৎস্যপুরাণে বহুসংখ্যক মাতৃকার উল্লেখ থাকলেও এবং তাঁরা ভীষণ-প্রকৃতি ও নরমাংসলোলুপারূপে বর্ণিতা হলেও অর্ধনারীশ্বররূপী মহাদেবসৃষ্ট সপ্তমাতৃকার মূর্তির উল্লেখ ছাড়া আর বেশি কিছু সেখানে বলা হয়নি। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত সপ্তমাতৃকা মৎস্যপুরাণোক্ত মাতৃকাদের নামের বিরাট তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। মহাদেব-প্রতিষ্ঠিত সপ্তমাতৃকার মূর্তির উল্লেখ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, বহু মাতৃকার সাথে পরিচিত থাকলেও মৎস্যপুরাণকার সাতজন মাতৃকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এখানে উল্লেখনীয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তমাতৃকা বিভিন্ন পুরুষদেবতার শক্তি থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দেবী দুর্গার অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মৎস্যপুরাণে সপ্তমাতৃকাকে অর্ধনারীশ্বররূপধারী মহাদেব কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাঁরই অংশরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

বরাহপুরাণে মাতৃকা-পরিকল্পনায় কিছুটা নতুনত্ব দেখা যায়। এখানে মাতৃকাদের রূপকের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শিব ও অন্ধকাসুরের যুদ্ধকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অজ্ঞতার মধ্যে দ্বন্দ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এখানে আটজন মাতৃকার উল্লেখ আছে এবং তাঁদের আটটি মনোজাত দুষ্টপ্রকৃতির প্রতিনিধিস্থানীয়রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এঁরা হলেন—যোগেশ্বরী (কাম), মাহেশ্বরী (ক্রোধ), বৈষ্ণবী (লোভ), ব্রহ্মাণী (অহঙ্কার), কৌমারী (মোহ), ইন্দ্রাণী (মাৎসর্য), যমী বা চামুণ্ডা (পৈশুন বা কুটিলতা) এবং বারাহী (অসূয়া)। আমরা দেখেছি, মার্কণ্ডেয় পুরাণে যমী বা চামুণ্ডাকে সপ্তমাতৃকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং চামুণ্ডাকে পৃথগ্‌ভাবে একজন

মাতৃকারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আটটি অনিষ্ট-কারক প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট না করলে অন্ধকাসুর বা অজ্ঞানান্ধকারকে বিদূরিত করা যায় না—এই ভাবটি বরাহপুরাণে অভিব্যক্ত করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দে (১১শ অধ্যায়) বর্ণিত হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এসে পিতামাতার গৃহে প্রবেশ করলে দেবকী প্রমুখ সাতজন মাতা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন—

"প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকী-প্রমুখাস্তদা॥" (১১।২৯)

এখানে দেবকীর উল্লেখ দেখে মনে হয়, এঁরা মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা বামনপুরাণ-বর্ণিত সপ্তমাতৃকা থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই পুরাণেরই দ্বিতীয় স্কন্দে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, উন্মাদ, বেতাল প্রভৃতির সাথে মাতৃকাগণের উল্লেখ দেখে মনে হয়, এখানে ভীষণপ্রকৃতি ও প্রজা-অনিষ্টকারী মাতৃকাগণেরই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। আবার দশম স্কন্ধের ৬৩ অধ্যায়ে ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতির সাথে মাতৃকাগণেরও নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এঁরা সকলেই শিবের সৈন্য। এথেকেও অনুমিত হয়, ভাগবতপ্রণেতা মাতৃকাগণকে ভয়ঙ্কররূপিণী দেবতারূপে চিত্রিত করেছেন।

মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে যদিও বহুসংখ্যক মাতৃকার উল্লেখ আছে, কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবীমাহাত্ম্যে' ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি যে সাতজন মাতৃকার নাম পাওয়া যায় তাঁরাই সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের সংস্কৃত কাব্য-নাটকে ও ভাস্কর্যশিল্পে পূজ্যা দেবীরূপে উপস্থাপিত হয়েছেন। শূদ্রক-বিরচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের (২য়-৩য় শতক) প্রথম অঙ্কে নায়ক চারুদত্ত তাঁর বয়স্য বিদূষককে চতুষ্পথের সংযোগস্থলে মাতৃকাদেবীদের মন্দিরে পূজোপহার নিয়ে যেতে অনুরোধ করছেন—"গচ্ছ চতুষ্পথে মাতৃভ্যো বলিমুপহর"। শূদ্রকের পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাসের 'চারুদত্ত' নাটকেও এইরকম বর্ণনা পাওয়া যায়। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে দেখা যায়, চারুদত্তের অনুরোধে বিদূষক মন্দিরে পূজা দিতে চাইলেন না, কারণরূপে তিনি বললেন—এই পূজোপহারে কোন লাভ নেই, যেহেতু এই পূজা দেওয়া সত্ত্বেও চারুদত্তের দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না। চারুদত্ত তখন বিদূষককে এইরকম কথা বলতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, মাতৃদেবতাদের উদ্দেশে পূজোপহার নিবেদন করা গৃহস্থের নিত্যকরণীয় বিধি—"বয়স্য! মা মৈবম্। গৃহস্থস্য নিত্যোঽয়ং বিধিঃ"।

কালিদাসের (পঞ্চম শতক) 'কুমারসম্ভব' কাব্যে (৭ম সর্গ, শ্লোক ৩৮-৩৯) মহাদেবের বিবাহযাত্রার বর্ণনাপ্রসঙ্গে মাতৃকাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাদেব যখন বিবাহের জন্য বৃষভপৃষ্ঠে যাত্রা করলেন, তখন সপ্তমাতৃকাও নিজ নিজ বাহনে তাঁর অনুগমন করেছিলেন। তাঁদের দেহ কনককান্তি এবং মুখের প্রভা অত্যন্ত নির্মল। এই মাতৃকাদের পিছনে চলেছিলেন নরকপালধারিণী ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণা কালী। বাণভট্টের (সপ্তম শতক) 'হর্ষচরিত' কাব্যে (৩য় উচ্ছ্বাস) একটি পুরনো মাতৃকা-মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়, যার উত্তরদিকে একটি বিল্ববাটিকায় ভৈরবাচার্য নামে একজন সন্ন্যাসী বাস করতেন। ঐ কাব্যের অন্যত্র (৫ম উচ্ছ্বাস) দেখা যায়, হর্ষবর্ধন ধবলগৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পিতাকে দেখতে এসে সেখানে দেখলেন—উচ্চবংশজাত কয়েকজন যুবক মাতৃকা-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য (অর্থাৎ যাতে তাঁরা পীড়িত প্রভাকরবর্ধনকে রোগমুক্ত করেন) প্রদীপের অগ্নিশিখায় নিজেদের দেহ দগ্ধ করছেন। মাতৃকাদেবীদের কৃপা লাভ করার জন্য শরীর-নির্যাতনের এইরকম প্রথা সম্ভবতঃ বাণভট্টের সময় প্রচলিত ছিল। আবার বাণভট্টের 'কাদম্বরী' কাব্যে দেখি, রানী বিলাসবতী পুত্রলাভ বাসনায় রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ মাতৃকাদেবীদের মন্দিরে গিয়েছিলেন। কারণ, এই মাতৃকাগণ অভীষ্ট ফল দান করেন বলে লোকের বিশ্বাস ছিল।

এথেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, খ্রীস্টাব্দের সূচনা থেকেই মাতৃকাদেবীদের পূজা ও মন্দিরনির্মাণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং সমকালীন কবি-সাহিত্যিকরা মাতৃকাদেবীদের উদ্দেশে পূজানিবেদন ও তৎসম্পর্কিত আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য এই সময় সর্বত্র মাতৃকাদেবীদের সংখ্যা সাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

★

প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাসুদেব শরণ আগরওয়াল 'এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া' জার্নালের (৪র্থ সংখ্যা, ১৯৪৭-১৯৪৮) মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শতকের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে জানা গেছে যে, এই সময় প্রায় বহু গ্রামের কাছাকাছি একটি করে 'মাতৃভবন' ছিল এবং তার মধ্যে বহু মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অহিচ্ছত্রা অঞ্চলে খননকার্যের সময় এইরকম

একটি মন্দির এবং প্রায় পঞ্চাশটি একত্রীকৃত মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আগরওয়ালের মতে, এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ৫৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় নির্মিত হয়েছিল।

সমাজে সকল শ্রেণীর মানুষই যে ভয়ে বা ভক্তিতে মাতৃকাদেবীদের পূজা করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় কয়েকটি অভিলেখ থেকে। রাজস্থানের ঝালওয়ার জেলার গঙ্গার নামক স্থানে (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) ৪২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত একটি অভিলেখে দেখি, প্রথম কুমারগুপ্তের এক সামন্ত রাজার মন্ত্রী মাতৃকাদেবীদের জন্য একটি ভয়ঙ্করদর্শন বাসস্থান বা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরে ডাকিনীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মাতৃকাগণ বিকট নিনাদ করতেন। এই বর্ণনার দ্বারা মাতৃকাদেবীদের ভয়ঙ্কর স্বভাবের কথাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। ময়ূরাক্ষক নামে ঐ মন্ত্রী একটি অত্যুচ্চ বিষ্ণুমন্দিরও নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐ অভিলেখে উল্লিখিত হয়েছে। এই মন্দিরটি মাতৃকামন্দিরের সন্নিকটেই ছিল। ময়ূরাক্ষক নিজে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তাই বিষ্ণুমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু এই মন্দিরের অনতিদূরে মাতৃকামন্দির নির্মাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অঞ্চলে মাতৃকাদেবীরা পূর্ব থেকেই জনপ্রিয় ছিলেন এবং সম্ভবতঃ জনসাধারণের অনুরোধেই ঐ মাতৃকামন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে যে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতো তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় উপরি উক্ত অভিলেখ থেকে।

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে বিহারশরিফে আবিষ্কৃত একটি প্রস্তরলেখ থেকে জানা যায় যে, এখানে স্কন্দ-কার্ত্তিকেয় ও মাতৃকাগণের উদ্দেশে কয়েকটি সারিবদ্ধ অনুপম মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের ললিতপুর জেলার অন্তর্গত দেবগড়ে জনৈক স্বামিভট্ট তাঁর একটি শিলালেখে বলেছেন—তিনি তাঁর প্রিয়জনদের অনুরোধে ঐ অঞ্চলে পাহাড়ের ওপরে মাতৃকাদেবীদের একটি মন্দির বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের কোন এক সময় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। এই শিলালেখের সূচনায় প্রার্থনা করা হয়েছে—জগতের জননীস্বরূপা, জগৎরক্ষায় সমর্থা ও বীর্যশালিনী মাতৃকাদের মণ্ডল ('মণ্ডল' শব্দের অর্থ 'পূজা' বা 'সমষ্টি') সকলের মঙ্গলসাধন করুন।

দেবগড়ে প্রাপ্ত উক্ত শিলালেখের কাছে একটি প্রস্তরফলকে খোদিত সপ্তমাতৃকার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এঁরা হলেন যথাক্রমে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা। এঁরা নিজ নিজ বাহনে আসীনা। এঁদের মধ্যে চামুণ্ডার বারটি হাত। এই মাতৃকাদের একদিকে বীণাহস্ত বীরভদ্র বা বীরেশ্বর এবং অন্যদিকে গণেশের মূর্তি খোদিত আছে। ষষ্ঠ শতকে নির্মিত মাতৃকাদেবীদের এই মূর্তিশিল্পের সাথে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের অন্তর্গত সপ্তমাতৃকার অনেকখানি সাদৃশ্য থাকায় মনে হয় এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে সাতজন মাতৃকাদেবীর রূপায়ণের পরিপূর্ণতা এসেছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে (৩৮০-৪১৫ খ্রীস্টাব্দ) মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরির গুহাশ্রেণীতে কয়েকটি খোদিত মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এঁদের সংখ্যা ও পরিচয় আমাদের পরিচিত মাতৃকাদেবীদের সাথে ঠিকমত মেলে না। দেবগড়ের সপ্তমাতৃকামূর্তির প্রথমেই যে বীরভদ্রমূর্তি আছে, তাঁকে ভগবান মহাদেবের একটি রূপ বলে স্বীকার করা হয়। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে ভগবান শঙ্কর এই বীরভদ্ররূপেই দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন। সপ্ত-মাতৃকামূর্তির দুপাশে বীরভদ্র (বা বীরেশ্বর) ও গণেশমূর্তি নির্মাণ করা প্রসঙ্গে 'রূপমণ্ডণ' নামে শিল্পগ্রন্থে বলা হয়েছে—সপ্তমাতৃকামূর্তির প্রথমে বীরেশ্বরমূর্তি, মধ্যে মাতৃকাদেবীদের মূর্তি এবং সর্বশেষে গণেশমূর্তি রূপায়িত করতে হবে—"বীরেশ্বরশ্চ... মাতৃণামগ্রতো ভবেৎ। মধ্যেচ মাতরঃ কার্যা অন্তে তেষাং বিনায়কঃ"।

বরাহমিহির (ষষ্ঠ শতক) তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে (৬০।১৬) বিষ্ণু, শিব, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদের সাথে মাতৃকাদেবীদের মূর্তিপ্রতিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মাতৃকাদেবীদের পূজা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁদের সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিধান অনুসারে ঐসব মাতৃদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

বৃহৎসংহিতার টীকাকার উৎপল বলেছেন, ব্রাহ্মী (ব্রহ্মাণী) প্রভৃতি সাতজন মাতৃকাদেবীর ("সপ্ত-মাতৃকাঃ") পূজাকর্ম যাঁরা জানেন তাঁরাই কেবল নিজ সম্প্রদায়ের বিধিবিধান অনুসারে ঐ সব দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায়, বরাহমিহিরের সময়ে এমন এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত লোকেরা মাতৃকাদেবীদের পূজার বিধিনিয়ম জানতেন, সেবিষয়ে চর্চা করতেন এবং প্রচলিত

নিয়মানুসারে মাতৃকাগণের জন্য নির্দিষ্ট মন্দিরে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেন। টীকাকার উৎপল সাতজন মাতৃকার কথা বলে আবার বলেছেন: ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী (মাহেশ্বরী), কৌমারী, ঐন্দ্রী, যমী, বারুণী, কৌবেরী—এঁরা প্রসিদ্ধ মাতৃকাদেবী হলেও (এখানে আটজন মাতৃকার নাম আছে) এঁদের সংখ্যা আরও অনেক বেশি; যেমন, নারসিংহী, বারাহী এবং বৈনায়কী। অতএব দেখা যাচ্ছে, মাতৃকাদেবীরা পরিমিত সংখ্যার মধ্যে কখনোই আবদ্ধ ছিলেন না। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানগ্রন্থে গৌরী প্রভৃতি ষোলজন মাতৃকার উল্লেখ আছে। ষোড়শ-মাতৃকা হলেন—গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, মেধা, স্বাহা, স্বধা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা এবং মূলদেবতা। সপ্ত বা অষ্ট-মাতৃকারূপে পরিচিত দেবতারা কেউই এই ষোড়শ-মাতৃকাদের মধ্যে স্থান পাননি। তবে ভক্তদের পূজা-নিবেদন ও শিল্পীদের মূর্তিপরিকল্পনার সুবিধার্থে সাতজন মাতৃকাই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যদিও সাতজন মাতৃকার নাম সব জায়গায় ঠিক একরকম নয়।

প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পে বিভিন্ন সময়ে মাতৃকাদেবীদের রূপকল্পনার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলিতে মহাভারত-পুরাণ-বর্ণিত মাতৃকাদের প্রতিচ্ছবি যেমন আছে, তেমনি শিল্পীদের নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি ও স্থানীয় প্রভাবও অনেক সময় কার্যকর হয়েছে। কুষাণযুগে যেসব মাতৃকামূর্তি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলিতে তাঁদের কোন পরিচায়ক চিহ্ন বা বাহন দেখা যায় না; তাঁরা প্রধানতঃ দণ্ডায়মান বা আসীন অবস্থায় সাধারণ নারীমূর্তি। তাঁদের ডানহাতে অভয়মুদ্রা দেখানো হয়েছে এবং কোন মূর্তির বামহাতে কমণ্ডলু এবং কারোর বামহাত কটিদেশে ন্যস্ত। সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানা মাতৃকাদেবীদের মূর্তির দুইপাশে দুইজন আয়ুধপুরুষের মূর্তি দেখা যায়। আয়ুধপুরুষের বামহাতে বর্শাজাতীয় অস্ত্র এবং ডানহাতে অভয়মুদ্রার ভঙ্গি। কুষাণযুগের মাতৃকামূর্তিগুলি প্রধানতঃ মথুরা অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। মথুরায় এই সময়কার কোন কোন মাতৃকামূর্তি পশুর মুখযুক্ত করে নির্মিত হয়েছিল। যে যে মাতৃকার জন্য যেসব পশু বা পাখি বাহনরূপে নির্দিষ্ট ছিল, সেইসব পশুপাখিদের মুখ মাতৃকামূর্তির দেহের উপরিভাগে স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণযুগের কোন কোন মাতৃকামূর্তির ক্রোড়দেশে বা জানুর ওপর বা পাশে দণ্ডায়মান শিশুসন্তান দেখা যায়। এর দ্বারা এঁদের মাতৃকাসত্তা বোঝানো হয়েছে। শিশু-সমন্বিত মাতৃকামূর্তিদের দুইপাশেও আয়ুধপুরুষের মূর্তি লক্ষ্য করা যায়।

গুপ্তযুগের (চতুর্থ-ষষ্ঠ শতক) মাতৃকামূর্তিদের দুইপাশে আয়ুধপুরুষের পরিবর্তে বীরভদ্র ও গণেশের মূর্তি স্থান পেয়েছে (যেমন পূর্বে উল্লিখিত দেবগড়ের মাতৃকামূর্তি-সমন্বিত ফলক)। এই মাতৃকামূর্তিদের সাথে কখনো কখনো তাঁদের বাহনদেরও দেখা যায়। এই সময় কোন কোন স্থাপত্যে খোদিত মাতৃকামূর্তির রূপবৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। যেমন—ব্রাহ্মী চতুর্মুখবিশিষ্টা, বারাহী শূকরমুখী এবং নারসিংহীর মুখ সিংহীর মতো। কয়েকটি মাতৃকামূর্তি গোয়ালিয়রের দুর্গসংলগ্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই মূর্তিগুলি বেসনগর ও শিবপুরী জেলার কোটা থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। কোটা থেকে প্রাপ্ত মাতৃকামূর্তিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মীর তিনটি মস্তক; কৌমারীর পশ্চাতে ময়ূর ও হাতে 'শক্তি' নামক অস্ত্র; ইন্দ্রাণীর পশ্চাতে হস্তী এবং হাতে বজ্র; চামুণ্ডা লম্বিতস্তনী, মুণ্ডমালাধারিণী এবং অষ্টভুজবিশিষ্টা; মাহেশ্বরী জটামুকুটধারিণী এবং বৈষ্ণবী ও বারাহী উভয়েই দুইহাতে অক্ষমালা ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। এখানকার, বিশেষ করে বেসনগর থেকে সংগৃহীত মাতৃকাদের মুখাকৃতি মানুষের মুখের মতো—পশুদের মতো নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গোয়ালিয়র থেকে দশ মাইল দূরে নলেসর নামক স্থানে দ্বাদশ শতকে একটি মাতৃকামন্দির অবস্থিত ছিল এবং এর মধ্যে চব্বিশটি মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলির মধ্যে পরিচিত মাতৃকাদেবীরা আছেন, কিন্তু বেশির ভাগই হলেন অপরিচিত। এখান থেকে চোদ্দটি মাতৃকামূর্তিকে এখন গোয়ালিয়র মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গুপ্তোত্তর যুগে উড়িষ্যার খণ্ডগিরির একটি গুহায় সাতজন জৈন তীর্থঙ্করের খোদিত মূর্তির নিচে সাতটি নারীমূর্তি দেখা যায় এবং এদের সপ্তমাতৃকারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁদের একদিকের একটি মূর্তিকে গণেশের মূর্তিরূপে ধরা হয়েছে। এইভাবে মাতৃকাদেবীরা যেমন জৈন ভাস্কর্যে স্থান পেয়েছেন, তেমনি বৌদ্ধদের দ্বারাও তাঁরা গৃহীত হয়েছিলেন। নালন্দায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধনিদর্শনগুলির মধ্যে মাতৃকামূর্তিগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর (৬৫০ খ্রীস্টাব্দ), বৈতাল (৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ) এবং মুক্তেশ্বর-মন্দিরে (৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ) সপ্তমাতৃকার মূর্তি খোদাই করা আছে। মুক্তেশ্বর-মন্দিরের শিশুদের হাত ধরে অবস্থিত মাতৃকা-

মূর্তিগুলি বিশেষত্বের দাবি রাখে।

উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরের কাছে একটি মন্দির-বারান্দার গায়ে আলাদা আলাদাভাবে খোদিত কয়েকটি মাতৃকামূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মধ্যে চতুর্মুখ ও চতুর্বাহুবিশিষ্টা ব্রহ্মাণী অর্ধপর্যঙ্ক-ভঙ্গিতে আসীনা; নিচে বাহন হংস এবং বাম-ক্রোড়ে একটি শিশু। এই মূর্তির দেহে কোন অলঙ্কার নেই, কিন্তু ইনি যজ্ঞোপবীত ও জটামুকুট-শোভিতা। মাহেশ্বরীও একই ভঙ্গিতে আসীনা; নিচে বাহন বৃষ। ইনি বহু অলঙ্কারমণ্ডিতা। এঁরও চারটি হাত, পিছনের হাত-দুটি ভেঙে গিয়েছে; সামনের ডানহাতটি অভয়মুদ্রা-ভঙ্গিতে উত্তোলিত এবং বামহাত দিয়ে একটি শিশুকে ধরে আছেন—যে-শিশুটি তাঁর বামক্রোড়ের ওপর উপবিষ্ট ছিল। এখন অবশ্য শিশুমূর্তিটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চতুর্বাহুবিশিষ্টা কৌমারীও একই অর্ধপর্যঙ্ক-ভঙ্গিতে আসীনা, নিচে বাহন ময়ূর এবং বামক্রোড়ে শিশু। এই মাতৃকামূর্তির ডানদিকের হাত-দুটি ভগ্ন; ইনি বহু অলঙ্কারে ভূষিতা। বারাহী মূর্তির মাথার দুইপাশে কুঞ্চিত কেশ ঊর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত; বামক্রোড়ে শিশু এবং নিচে বাহন মহিষ। এই মূর্তির আকৃতি থেকে এঁর ভয়ঙ্কর স্বভাব প্রকটিত হচ্ছে। ইন্দ্রাণী মূর্তির চারটি হাত, তবে সামনের ডানহাত এবং পিছনের বামহাত এখন আর অবশিষ্ট নেই, নিচে বাহন হাতি; সামনের বামহাত দিয়ে বামক্রোড়ে উপবিষ্ট শিশুকে এবং পিছনের ডানহাতে বজ্র ধারণ করে আছেন।

উড়িষ্যার খিচিং-এ চতুর্বাহুবিশিষ্টা বৈষ্ণবী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটি একটি উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে চিহ্নিত হয়েছে। মূর্তির নিচে বাহন গরুড়, পিছনের দুটি হাতে সুন্দর ভঙ্গিমায় চক্র ও শঙ্খ ধৃত; সামনের ডানহাতে অভয়মুদ্রার ভঙ্গি এবং বামহাত একটি শিশুর দেহের ওপর স্থাপিত। দেহের অলঙ্কার ও মাথার মুকুট ঠিকমত সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত। চোখের প্রসন্ন দৃষ্টি মূর্তিটিতে রমণীয়তা এনেছে। উড়িষ্যার তন্ত্রসাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জাজপুর (অপর নাম বজ্রক্ষেত্র) থেকে একটি চতুর্বাহু চামুণ্ডা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভয়ঙ্করী এই মূর্তির দেহ কৃশ, উদর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট, দেহস্থ অস্থি ও শিরাগুলি দৃশ্যমান, গলায় মুণ্ডমালা, দাঁতগুলি মুখের বহির্ভাগে প্রকটিত, চোখ-দুটি কোটর-প্রবিষ্ট। ইনি একটি মৃতদেহের ওপর আসীনা। চারহাতে খাঁড়া, শূল, নরকপাল ও মুণ্ড। চোখের মণি-দুটি গোলাকার, মস্তক মুণ্ডিত এবং দুহাতের বলয়ের সাথে নরমুণ্ড যুক্ত। তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত এই মূর্তিকল্পনায় শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত উপরি উক্ত মূর্তিগুলি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর-মন্দিরের সম্মুখস্থ জগ-মোহনের তিনদিকের দেওয়ালে অনেকগুলি মূর্তি খোদিত আছে। এগুলির মধ্যে একটি ফলকে মাতৃকা-সমন্বিত নয়জন দেবতামূর্তি খোদিত দেখা যায়। এঁরা হলেন যথাক্রমে গণেশ, চামুণ্ডা, বারাহী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, শিবানী, ব্রাহ্মী এবং বীরেশ্বর বা বীরভদ্র। এই মূর্তিগুলির বাহন, হস্তধৃত বস্তু ও হস্তসংখ্যা মার্কণ্ডেয় সরোবরের কাছে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, এখানে ইন্দ্রাণী মূর্তি দ্বিবাহু—বামহাতে বজ্র এবং ডানহাতে একটি পাত্র। বারাহী মূর্তির চারটি হাতের মধ্যে ডানদিকের দুটি হাতে মাছ ও পদ্ম এবং বামদিকের হাত-দুটিতে কুঠার ও একটি পাত্র; এই মূর্তির নিচে বাহনের পরিবর্তে ভূমিতে হস্ত-স্থাপিত অবস্থায় একটি নরমূর্তি খোদিত আছে। চামুণ্ডা মূর্তির ডানদিকের দুটি হাতে ফুলের কুঁড়ি ও বীজপূরক, আর বামদিকের হাতে ত্রিশূল ও একটি পাত্র; নিচে পেঁচার মূর্তি খোদিত। কৌমারী দ্বিবাহু, ডানহাতে বীজপূরক এবং বামহাতে বিশালাকার একটি অস্ত্র। এঁর বাহনটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মীর চারটি হাতের মধ্যে ডানদিকের হাতে অক্ষমালা ও বীজপূরক এবং বামদিকের দুটি হাতে কেতকীফুল ও একটি পাত্র; এঁর বাহন হাঁস। বৈষ্ণবী মূর্তির চারটি হাতের তিনটি অক্ষত, বামদিকের ওপরের হাতটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে; তিনটি হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র ও একটি পাত্র। শিবানী মূর্তির চারটি হাতের মধ্যে ডানদিকের দুটি হাতে অক্ষমালা ও বীজপূরক এবং বামহাতে গদা ও ত্রিশূল। বৈষ্ণবী মূর্তির মতো এঁর বাহনটিও এখন নষ্ট।

ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর-মন্দিরের ছাদের নিচের পিঠে (ceiling) আটটি পাপড়িযুক্ত পদ্মের ওপর বীরেশ্বর ও সপ্তমাতৃকার মূর্তি খোদিত আছে। স্থানাভাবে অর্থাৎ আটটি পাপড়ি থাকার জন্য সম্ভবতঃ গণেশের মূর্তি খোদিত হয়নি। পরশুরামেশ্বর ও বৈতাল-মন্দিরে খোদিত মাতৃকামূর্তিদের থেকে মুক্তেশ্বর-মন্দিরের মাতৃকামূর্তিদের পার্থক্য হলো, এখানে চামুণ্ডা ছাড়া অন্য ছয়টি মূর্তি

এক-একজন শিশুসন্তানের হাত-ধরা অবস্থায় খোদিত। তাছাড়া অন্য দুটি মন্দিরে যেখানে বীরেশ্বরের হাতে ত্রিশূল, মুক্তেশ্বরের বীরেশ্বর খড়্গ ধারণ করে আছেন। এইসব পার্থক্য থেকে অনুমিত হয়, মাতৃকাদেবীদের মূর্তি সম্পর্কে শিল্পীদের চিন্তাধারা কালক্রমে ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা, উড়িষ্যার সোমবংশী (কেশরী) রাজাদের রাজত্বকালে (দশম-একাদশ খ্রীস্টীয় শতক) মাতৃকাপূজার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এই সময়েই সম্ভবতঃ মাতৃকামূর্তিদের সাথে শিশুমূর্তি সংযোজনের প্রবণতা এসেছিল। জবলপুরের ভেড়াঘাটে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে যোগিনীদের আটজনকে মাতৃকাদেবীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। গুজরাট, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর প্রভৃতি স্থানে মন্দিরের গায়ে মাতৃকামূর্তি-সংলগ্ন ফলক থেকে অনুমান হয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সময়ে মাতৃকাদেবীদের পূজা প্রচলিত ছিল। মহারাষ্ট্রের ইলোরা ও এলিফ্যান্টা গুহা এবং দক্ষিণ ভারতের আইহোল মন্দিরগাত্রের (ষষ্ঠ-সপ্তম শতক) প্রত্যেকটিতে সাত বা আটজন মাতৃকা-মূর্তি খোদিত আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই গুহা বা মন্দিরগুলি ভগবান মহাদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত।

কদম্ব, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশের নানা অভিলেখে ও স্থাপত্যে কার্তিকেয় ও মাতৃকাদেবীদের প্রশস্তি ও মূর্তি থেকে মাতৃকাপূজার ব্যাপক প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কদম্বরাজ কৃষ্ণবর্মার (৪৩৮ খ্রীস্টাব্দ) পুত্র দেববর্মা যে স্বামি-মহাসেন (কার্তিকেয়) ও মাতৃকাদেবীদের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় কর্ণাটকের ধারওয়ার জেলার একটি অভিলেখ থেকে। এই রাজার রাজ্যাভিষেকও ঐ দেবতাদের কৃপায় হয়েছিল বলে তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন। ঐ একই স্থানে প্রাপ্ত আরেকটি অভিলেখে কদম্ববংশীয় রাজা মৃগেশবর্মা রাজ্যাভিষেক-কালে কার্তিকেয় ও মাতৃকাদেবীদের উদ্দেশে ঠিক একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। আবার বাদামীর চালুক্য বংশের রাজা বিষ্ণুবর্ধনের সময়কার (৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ) একটি অভিলেখ থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি কুমার (কার্তিকেয়), নারায়ণ ও মাতৃকাদেবীদের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুপ্তোত্তর যুগের চালুক্যবংশীয় রাজা জয়সিংহবল্লভ (৬৬০ খ্রীস্টাব্দ) একজন ব্রাহ্মণকে গ্রাম দান করার সময় একটি অভিলেখে বলেছেন, তাঁদের এই চালুক্যরাজবংশ মহাসেন বা কার্তিকেয় এবং সাত ভুবনের জননীস্বরূপা সপ্তমাতৃকার অনুগ্রহে উন্নতিলাভ করেছিল। এইসব অভিলেখ থেকে দেখা যায়, খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকেও মহাভারতের যুগের স্কন্দের সাথে মাতৃকাদের সম্পর্কের কথা লোকে মনে রেখেছিল এবং এই সময়ে কার্তিকেয় ও সপ্তমাতৃকার একত্রে পূজাও স্থানবিশেষে প্রচলিত ছিল। মাতৃকাগণ নানাভাবে ও বিচিত্র পদ্ধতিতে পরিকল্পিত হয়েছেন। মাতৃকাদেবীরা মুখ্যতঃ শাক্তধর্মাবলম্বীদেরই উপাস্য দেবতা। কিন্তু তাসত্ত্বেও সমগ্র ভারতীয় হিন্দুদের কাছে এঁরা নমস্য ছিলেন এবং অঞ্চলবিশেষে এখনো আছেন।

অখণ্ড বাংলাদেশেও কয়েকটি মাতৃকাদেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং সেগুলি কলকাতা, ঢাকা ও রাজশাহীর নানা সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। এইসব স্থানের মাতৃকাদেবীদের মধ্যে চামুণ্ডাদেবীর মূর্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চামুণ্ডাদেবীর যেসব প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—দেবীর রূপবিদ্যা, সিদ্ধ যোগেশ্বরী ও দন্তুরা মূর্তি। ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি চামুণ্ডামূর্তি গণদের মধ্যে নৃত্যরতা। এই মূর্তি দ্বাদশহস্ত-সমন্বিতা; হাতগুলির দ্বারা তরবারি, জলপাত্র, হাতির চামড়া, তীর, খড়্গ, নরমস্তক, ত্রিশূল, মৃতদেহ প্রভৃতি ধৃত। রাজশাহী মিউজিয়ামে একটি নৃত্যরতা ও দ্বাদশহস্তা চামুণ্ডামূর্তির পাশাপাশি উপবিষ্টা দ্বাদশহস্তা চামুণ্ডামূর্তিও রক্ষিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের অট্টহাস গ্রামে (যাকে একান্ন শক্তিপীঠের একটি বলে মনে করা হয়) দ্বিভুজা চামুণ্ডার দন্তুরামূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি ভয়ঙ্কর দাঁতের জন্য দন্তুরা নামে খ্যাতা; এঁর চোখ গোলাকার, মুখে পৈশাচিক হাসি, শরীর ক্ষীণ, উদর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট এবং উপবেশনের ভঙ্গি অস্বাভাবিক। রাজশাহী মিউজিয়ামে চামুণ্ডার যে দুটি মূর্তি রক্ষিত আছে, তার একটি গাধার পিঠে আসীনা এবং অপরটি একটি শবের ওপর আরূঢ়া। নদীয়ার দেবগ্রাম থেকে আবিষ্কৃত একটি ব্রহ্মাণীমূর্তি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আনীত হয়েছিল। এই মাতৃকার বামদিকে নিচে একটি হাঁস ও ডানদিকে একটি সিংহমূর্তি রয়েছে। রাজশাহী মিউজিয়ামে কয়েকটি বারাহী ও একটি ইন্দ্রাণী মূর্তি রক্ষিত আছে। এই মূর্তিগুলিতে অবশ্য চামুণ্ডার ভয়ঙ্কর রূপ অনুপস্থিত।□

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

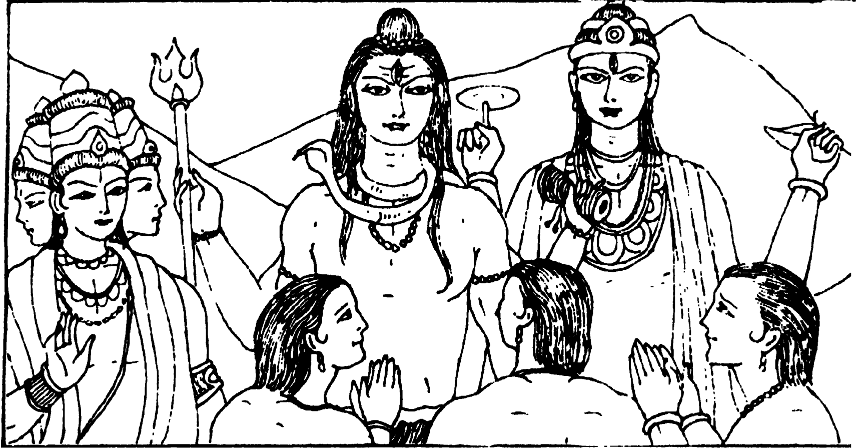
চিরন্তনী

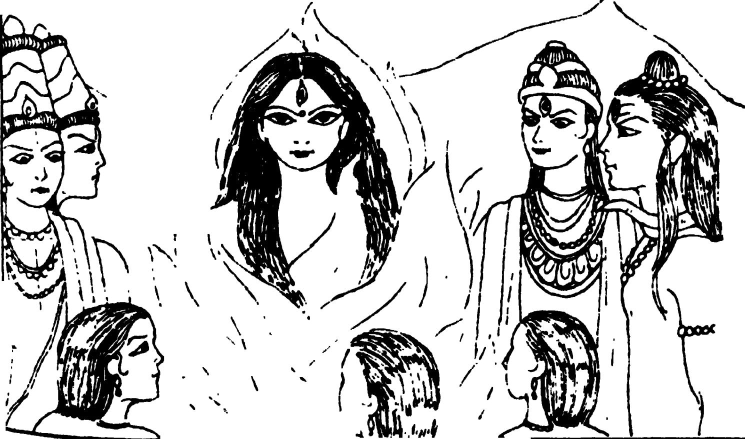
শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী

কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত



পরাজিত ও স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতারা ব্রহ্মাকে সামনে রেখে শিব ও বিষ্ণুর কাছে গিয়ে অসুরদের দৌরাত্ম্যের কথা বর্ণনা করলেন এবং মহিষাসুরের বিনাশের উপায় করে দেবার জন্য তাঁদের শরণাপন্ন হলেন।





অসুরদের দৌরাত্ম্যের কথা শুনে শিব ও বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের মুখমণ্ডল থেকে মহাতেজ নির্গত হলো। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও তেজোরাশি নির্গত হলো। এই সমস্ত তেজোরাশি একত্রিত হয়ে এক অনুপমা দেবীমূর্তি ধারণ করল। তিনিই দেবী দুর্গা।



দেবতারা এই মহাদেবীকে নানা অস্ত্র ও অলঙ্কারাদিতে সাজিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, যম দিলেন দণ্ড, হিমালয় দিলেন সিংহ। অন্যান্য দেবতারাও নানাবিধ অস্ত্র ও অলঙ্কার দিলেন। দিব্য অস্ত্রে ও দিব্য অলঙ্কারে সুসজ্জিতা দেবী দুর্গা রণরঙ্গিণী মূর্তিতে অসুরদের হৃদয়ে ত্রাস সঞ্চার করে হুঙ্কার দিতে লাগলেন।

দেবীর ঘোর গর্জনে ত্রিলোক বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হলো। মহিষাসুর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে তার অসুর সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলল। অবশেষে দশদিক পরিব্যাপ্ত করে, অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত করে, গগনস্পর্শী মুকুট পরে অবস্থান করছেন যে দেবী—জগন্মাতা সিংহবাহিনী, তাঁকে মহিষাসুর দর্শন করল।





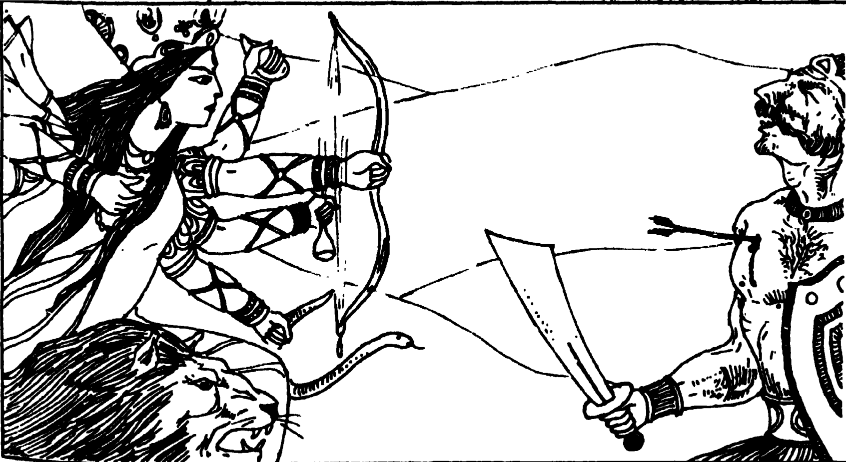
সিংহবাহনা দেবীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হলো। মহিষাসুরের প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতিরা—চিক্ষুর, চামর, করাল, বিড়াল, উদগ্র, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য, দুর্ধর, দুর্মুখ এবং আরও অনেকে চতুরঙ্গ সেনা ও নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।



সেনাপতিবৃন্দ সমেত মহিষাসুরের সমস্ত সৈন্য নিহত হলো। তখন সে নিজে মহিষ-রূপ ধারণ করে দেবীর সৈন্যদের সঙ্গে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তাদের বধ করে ফেলল। তারপর দেবীর বাহন সিংহকে বিনাশ করতে ছুটল।



ক্রুদ্ধা দেবী মহিষাসুরকে পাশবদ্ধ করলেন। অসুররাজ মহিষাকৃতি ত্যাগ করে সিংহের রূপ ধারণ করল। দেবী তার মস্তক ছেদন করলেন।



অমনি মহিষাসুর খড়্গধারী পুরুষমূর্তি ধারণ করল। দেবী সেই খড়্গধারী পুরুষকে বাণবিদ্ধ করলেন।



তখন সে এক বিশাল হাতির আকার ধারণ করল। তার লম্বা শুঁড় দিয়ে সে দেবীর বাহন সিংহকে জড়াতে গেল। তৎক্ষণাৎ দেবী খড়্গ দিয়ে তার শুঁড় কেটে ফেললেন।

আবার সে পূর্বের মহিষ-রূপ ধারণ করে প্রবল প্রতাপে দেবীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। দেবী তাকে ভর্ৎসনা করে লাফ দিয়ে তার ওপর চড়ে, পা দিয়ে গলা চেপে ধরে তার বুকে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করলেন।







দেবীর পায়ে নিষ্পেষিত মহিষাসুরের মুখ থেকে অন্য এক মহাসুরের শরীর অর্ধেকমাত্র বেরিয়ে এল। সেই অবস্থায় সে যুদ্ধ করতে লাগল। কিন্তু অবিলম্বে দেবী খড়্গের আঘাতে তার মাথা দেহ থেকে ছিন্ন করলেন। ত্রিভুবনের ত্রাস মহিষাসুর বধ হলো। □

ধর্ম

"সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি"

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

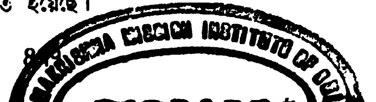
বর্তমান রচনাটি 'উদ্বোধন'-এ অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপ্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা 'হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনার' পুনশ্চ' অংশ। প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ লেখক এখানে হিন্দু সাধনার একটি মূল দিক আলোচনা করেছেন। উদ্ঘাটন করেছেন অনেক রহস্যাংশও। সন্ধ্যাবন্দনার মূল লক্ষ্য কী সেবিষয়ে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা পাঠকরা পাবেন সুলিখিত এই রচনাটিতে। রামপ্রসাদের 'এবার আমি ভাল ভেবেছি' গানের একটি সুপরিচিত ছত্রাংশকে রচনাটির শিরোনামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

সন্ধ্যাবন্দনার প্রক্রিয়া 'উদ্বোধন'-এ কয়েক সংখ্যা ধরে বলেছি,[১] সেখানে মন্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য পাঠকগণ লক্ষ্য করেছেন। এখন আমরা এত বেশি সভ্য ও সুসংস্কৃত হয়েছি, educated and cultured হয়েছি যে, সংস্কৃতভাষাকে নির্বাসন দিয়েছি 'মৃতভাষা'—'dead language' বলে। কিন্তু সেই মৃতভাষার মধ্যেও যে এমন আগুনের ছোঁয়াচ, প্রাণের স্পর্শ আছে এখন তা আমরা নিশ্চয়ই বুঝেছি। সন্ধ্যার মন্ত্র তো মরার নয়, বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র। 'উদ্বোধন'-এর অনেক পাঠক তাই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, বিশেষ করে যাঁরা পরপারের যাত্রী, অশীতিপর বৃদ্ধ, কাশীবাসী হয়ে দিন গুনছেন ওপারে যাওয়ার। এপারে যাঁরা আছেন শক্ত, সমর্থ, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত, আধুনিক যুগের মানুষ, তাঁরা সন্ধ্যাবন্দনার কুসংস্কার থেকে অনায়াসে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন কলিযুগের প্রভাবে ও মহিমায়। শাস্ত্রও তাই অনেক আগেই একথা জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, "কলৌ বেদান্তিনঃ সর্বে ফাল্গুনে বালকা ইব"—কলিকালে সবাই বেদান্তী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ! যেমন ফাল্গুন মাসে সবাই দোললীলায়—হোলিখেলায় মাতে, বালক হয়ে যায় বয়স বা পদমর্যাদার কথা ভুলে। ফাল্গুন বা বসন্ত ঋতুর যেমন মহিমা বা প্রভাব সর্বব্যাপী—সব মানুষের ওপর, তেমনি কলিকালেরও!

সন্ধ্যাবন্দনা হলো সাধনার ধারা এবং সে-সাধনার অবশ্যই অবসান আছে। কতদিন এ সন্ধ্যাবন্দনা করতে হবে? শাস্ত্রের অবশ্যনির্দেশঃ "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—অর্থাৎ অহরহঃ সন্ধ্যার উপাসনা করবে, দিনের পর দিন করে যাবে, নিত্যকর্মরূপে এর অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবে। অ-করণে অর্থাৎ না করলে প্রত্যবায় হবে অর্থাৎ পাপভাগী হতে হবে। মালিন্য বা অন্ধকার থেকে মুক্তি এবং জ্যোতিঃ বা আলোর সঙ্গে যুক্তি বা যোগ—এই হলো সন্ধ্যাবন্দনার লক্ষ্য। আমরা এ-ও লক্ষ্য করলাম যে, এই দুটি প্রক্রিয়াই চতুর্ভূমিক বা চারটি স্তরে বা ধাপে বিন্যস্ত। শোধনের চারটি ধাপ যথাক্রমে আচমন, প্রাণায়াম, মার্জন ও অঘমর্ষণ। তেমনি বোধনেরও চারটি ভূমি, চারটি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত—সূর্যোপস্থান, গায়ত্রী-উপস্থান, জাতবেদস্ বা অগ্নি-উপস্থান এবং শেষ রুদ্রোপস্থান। আলোর সূচনা থেকে, উদয়ন থেকে বিলয়ন বা বিলয় পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি এই চারটি উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। তাই আর যাতে অন্ধকার না ঘিরে ধরে, আর যাতে মালিন্য বা আবর্জনা জমতে না পারে, তাই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এই মার্জন-প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়।

প্রাচীন কালে যজ্ঞরূপ উপাসনা যখন হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল, তখনো বিধান ছিল নিত্য অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানের—যাতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে ত্রি-সবনের অবশ্য করণীয়ত্ব নির্দিষ্ট ছিল এবং "যাবজ্জীবং

১ 'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০১ সংখ্যা থেকে আষাঢ় ১৪০২ সংখ্যা পর্যন্ত 'ধর্ম' বিভাগে ধারাবাহিকভাবে 'হিন্দুর সন্ধ্যাবন্দনা' শিরোনামে আমার উল্লিখিত রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে।



অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করে যেতে হবে, তারও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল। জীবনাবসানে যখন দেহটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হতো—এখনো নিয়ে যাওয়া হয়, যদিও তার তাৎপর্য আমরা সবাই ভুলে বসে আছি—তখন সেটি অগ্নিতে যে সমর্পণ করা হতো, তার নাম হলো 'অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া'—অন্ত্য-ইষ্টি-ক্রিয়া—শেষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান অর্থাৎ দেহটিকে পর্যন্ত অগ্নিতেই আহুতি দিয়ে দেওয়া। পুত্র বা নিকটতম উত্তরাধিকারী মুখে আগুনটি ধরিয়ে দেয়, যার নাম 'মুখাগ্নি', কারণ এই অগ্নির স্থান বা অধিষ্ঠান এই দেহের মধ্যে ঐ মুখেই। "অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"—অগ্নিই বাক্ হয়ে এই মুখে প্রবেশ করেছিলেন, যখন এই দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এখন তিনিই দেহ ছেড়ে চললেন, তাই তাঁর হাতেই নিজেকে সমর্পণ করে, শেষ আহুতি দিয়ে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা হয়ঃ "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে।"—হে অগ্নি! নিয়ে চল সুপথে সমৃদ্ধির দিকে, লোক থেকে লোকান্তরে।

কিন্তু যাঁরা নিত্য অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে জীবনেই অগ্নিস্বরূপ হয়ে যান, তাঁদের আর অগ্নিতে সমর্পণ করা হয় না। তাঁদের আর কোথাও 'নয়ন' বা গমনের জন্য অগ্নির দ্বারস্থ হতে হয় না, কারণ কোথায়ই বা তাঁরা যাবেন? সর্বব্যাপক সেই প্রকাশের মধ্যেই তো তাঁরা নিত্য আসীন। তাই এখানে গতির অবসান, এখানে শুধু নিত্য স্থিতি। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি"—তাঁদের প্রাণ উৎক্রান্ত বা ঊর্ধ্বে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোথাও যায় না। "ইহৈব সমবলীয়ন্তে"—এখানেই তারা সম্যক্‌রূপে লীন হয়ে যায়, সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয়। তাঁরা তাই 'নিরগ্নি' ও 'অক্রিয়', তাঁদের আর আগুনের সঙ্গে কোন কারবার নেই। ক্রিয়া বা কর্মের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক বা যোগ নেই।

এই হলো যথার্থ 'সন্ন্যাস'-এর অবস্থা, যখন সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত বা অর্পিত সেই এক আত্মাতে বা পরমাত্মায়। এখানেই যজ্ঞের অবসান, সন্ধ্যাবন্দনাদির উপসংহার। সেই সন্ন্যাসীদের জন্য গায়ত্রীর একটি চতুর্থ পাদ আছে, যদিও অন্য সকলের কাছে—সর্বসাধারণের জন্য তিনি 'ত্রিপদা' অর্থাৎ তিন পাদেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। এই তুরীয় বা চতুর্থ পাদটি তাই অতি গুহ্য—গভীরতম। সেটি হলোঃ "পরো রজসে সাবদোম্।"

এখানে সমস্ত 'রজস্' বা লোকের 'পরো' বা পারে, যাকে শুধু 'অসৌ' বা 'অদঃ'—'ঐ' বলে নির্দেশ মাত্র করা চলে, যার সম্বন্ধে আর কিছুই বলা চলে না। তাই এই চতুর্থ পাদটির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে, ইঙ্গিতে বা ইশারায় মাত্র বোঝানো হয়েছে সেই পরম ব্রহ্মকে, সেই পরম পুরুষকে, সেই পরমাত্মাকে। তাই বলা হয়েছেঃ "তুরীয়য়া মায়য়াঽন্ত্যয়া নির্দিষ্টং পরমং ব্রহ্মেতি। পরমপুরুষং চিদ্রূপং পরমাত্মেতি।"

এখানে পৌঁছালেই সন্ধ্যা 'বন্ধ্যা' হয়ে যায়, তার আর শুদ্ধিরূপ কোন ফল প্রসব করা বা উৎপাদন করার কিছু থাকে না। গুণের রাজ্যে যতদিন মানুষ আছে, ততদিন একবার শুদ্ধ আবার অশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই নিরন্তর সজাগ থেকে শুদ্ধি সম্পাদন করে যেতে হয়। আর গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছালে, প্রকাশের পারাবারে গিয়ে নিমজ্জিত হলে আর কোন অন্ধকার বা মালিন্যের আশঙ্কামাত্রও থাকে না। এই হলো 'সহজ' অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা, স্বভাবশুদ্ধ অবস্থা। কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত শুদ্ধ অবস্থা নয়। যতদিন এই ভূমিতে আরোহণে ইচ্ছুক থাকে সাধক, সেই 'আরুরুক্ষু' মননশীল মুনির জন্যই কর্মের, যজ্ঞের, সন্ধ্যাবন্দনার বিধান। আর সে-ই আবার যখন হয়ে যায় 'যোগারূঢ়' অর্থাৎ সিদ্ধ, তখন তার একমাত্র অবলম্বন হয় 'শম' বা শান্তি বা বিরাম সব কর্ম থেকে।

বড় রহস্য করে তাই বলা হয়েছেঃ

"হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসতি ভাসতে।
নাস্তমেতি ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥"

এখন আর কি করে সন্ধ্যাহ্নিক করি বল! সূর্যের উদয়কালে ও সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যাবন্দনা করার বিধান। আমার হৃদয়াকাশে চৈতন্যরূপী আদিত্য যে সবসময় ভাসমান, প্রকাশমান—তিনি তো অস্তও যান না, উদয়ও হন না। তাহলে কেমন করে, কখন সন্ধ্যা করি বলো তো?

আরও এক বিপদ ঘটেছেঃ

"মৃতা মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সুতঃ।
সূতকদ্বয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥"

আমার মোহরূপিণী এক মা ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন। আবার এদিকে বোধরূপী অর্থাৎ জ্ঞানরূপী এক ছেলে জন্মেছে। তাই একসঙ্গে আমার মরণাশৌচ ও জননাশৌচ—দুই অশৌচ লেগেছে। আর অশৌচকালে তো সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা-পাঠ সব বন্ধ রাখতে হয়। তোমাদের শাস্ত্রেরই বিধান। তাই কেমন করে সন্ধ্যাবন্দনা করি বল

তো? তাই মোহ বা অজ্ঞানের মরণ বা বিনাশ এবং বোধ বা জ্ঞানের জনন বা উৎপত্তি—এই দুটি যদি যুগপৎ ঘটে তাহলে আর সন্ধ্যাবন্দনার অবকাশ কোথায়? গীতারও তো উপসংহার দেখি ঘটল তখনই, যখন অর্জুন বলে উঠলেন: "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা।"—মোহ বিনষ্ট এবং স্মৃতি বা বোধ আবার লব্ধ বা ফিরে পাওয়া। তারই জন্য দীর্ঘ অষ্টাদশ অধ্যায় ধরে শ্রীভগবানের উপদেশ এবং তারই জন্য সন্ধ্যাবন্দনার এই আপাতজটিল প্রক্রিয়া। জ্ঞানের আলো ফুটলে আর কোথায় সন্ধ্যাবন্দনা, কোথায় পূজার্চনা! তখন যে 'সকৃদ্‌দিবা'—শুধু একটাই দিন, যে-দিনের পরে আর কোন রাত নেই। "যেদেশে রজনী নাই"—এ হলো সেখানকার কথা। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজায় বসে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন পূজার কোথায় পরিসমাপ্তি, যেখানে কোশাকুশি, ফুল-চন্দন, ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য, প্রতিমা ও তার পূজক—সবই একাকার। এক চৈতন্যের আলোকে উদ্ভাসিত। হিন্দুর উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের এই রহস্য, পরস্পরের সঠিক সম্পর্ক যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারলেই সন্ধ্যাবন্দনার সুদীর্ঘ আলোচনা সার্থক হবে। তখনই সন্ধ্যাবন্দনার যথার্থ স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হবে, যার বর্ণনা আমরা শাস্ত্রে পাই এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনে প্রত্যক্ষ করি:

"শিবশক্তিসমাযোগো যস্মিন্ কালে প্রজায়তে।
সা সন্ধ্যা কুলনিষ্ঠানাং সমাধিস্থৈঃ প্রতীয়তে॥"

এখানেই সন্ধ্যা 'বন্ধ্যা' হয়ে যায়, পূজা বন্ধ হয়ে যায়, যজ্ঞ সমাপন হয়। তখনই সাধক গেয়ে ওঠেন:

"পূজা আমার সাঙ্গ হলো, হৃদয়-মাঝে তোমায় পেয়ে
ফুরিয়ে গেছে সাধন-সাধা
আকুলতার কাঁদন কাঁদা
এখন শুধু পরম পাওয়ার সুর আছে মোর কণ্ঠ ছেয়ে।"

এই হৃদয়-মাঝে তাঁকে পাওয়াই সব সাধনার, সন্ধ্যা-বন্দনার, পূজা-অর্চনার পরম লক্ষ্য, কারণ সাধক জানেন:

"হৃদয়ে আমার উদয় না হতে যদি মা!
মাটি রয়ে যেত মাটি, সে হতো না তোমার প্রতিমা।"

'উদ্বোধন' তো এই হৃদয়ে তাঁকে জাগানো।□



অনুষ্ঠান-সূচী (আশ্বিন-কার্তিক ১৪০৩)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২০ আশ্বিন	রবিবার	৬ অক্টোবর	১৯৯৬
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৬ আশ্বিন	শনিবার	১২ অক্টোবর	১৯৯৬

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২ কার্তিক	শনিবার	১৯ অক্টোবর	১৯৯৬
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৪ কার্তিক	রবিবার	১০ নভেম্বর	১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৭, ২২ আশ্বিন	সোমবার,	মঙ্গলবার	২৩ সেপ্টেম্বর, ৮ অক্টোবর	১৯৯৬
৬, ২১ কার্তিক	বুধবার,	বৃহস্পতিবার	২৩ অক্টোবর, ৭ নভেম্বর	১৯৯৬

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপূজা কোন-না-কোনভাবে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও বাঙালীর দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ বাঙালী ঘরানায় ও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। বাংলায় মাতৃবন্দনার এই ধারা চলেছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই। তাই দুর্গার মূর্তি ভাবময়ী মূর্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা। এই ভাবারাধনাকেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন সেকালের বিখ্যাত লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় এই রচনাটি প্রকাশিত হয়।



টেরাকোটার দুর্গা। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
আলোকচিত্র : দীপক ভট্টাচার্য

শ্রুতি বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ।" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতিগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদগত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টি রকমের আছে এবং মানুষের হৃদয়ের একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান্ ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনও বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনও বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই; চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকূলরূপে সাধকের হৃদয়মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃন্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাঙ্গালার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের

সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এই পূজায় মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপ তপে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে যন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এই দেশে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধতন্ত্রে মাতৃপূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমানধর্ম্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্ত্তিপূজাকে "বোধ্‌পরসত্" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালাদেশেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এমন সাধারণভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্ত্তিপূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, যন্ত্রোদ্ভূত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা এদেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্ত্তি ভাবময়ী মূর্ত্তি ও দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে—ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণে কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খ্রীষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়াছি; ইংরাজী শিক্ষিত আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান্ আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সেই দেবতা ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরাজীনবীস মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা-তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবারাধনার ইহা মূলতত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে সদাপ্রমত্ত। এই অহং—মমেতি ভাবের জন্য শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্র ভাবের জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবদারাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতির জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে।

এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্ত্তনা; জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে; প্রথম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে—নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রবৃত্তিমূলা—সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আবার সন্ন্যাস-সংযম, সর্ব্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্ব্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তিমার্গে ভোগ নাই, প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জ্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নাই। আমার যাহা কিছু, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থালী—সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই; আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য, —আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের মূলে এই সর্ব্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রসময়—ভাবময়—গুণময়। আমি ভাবসাগরের বুদ্‌বুদ মাত্র। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাহাতে মিশিতে হইলে আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি

ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব;
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব!"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তি-সূত্রকার বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরতুষ্টেঃ একোঽপি বলী।"—ঈশ্বর-তুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোপপত্তির উদ্দেশ্যই সাধনা। অহঙ্কারজন্যই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি আমার আত্মজ। আসক্তিজন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্রপ্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এ সকল সম্বন্ধই ত আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই ত তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্ত্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-বর্ণ-ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংবদ্ধ হইলে তিনি আমারই হইয়া থাকেন, আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহ-পূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এই মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া বাঙ্গালায় দেবতার পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মা-ই সর্ব্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর গৃহস্থালী। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ী আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ-দুঃখ আছে, অভাব-অভিযোগ আছে, জ্বালা-যন্ত্রণা আছে; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ী আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি এসেন মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না॥"

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙ্গালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা; যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার ভুলী, পুটী, বুড়ী যেমন আমার মেয়ে—উমা, গৌরী, পার্ব্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তখন ঠিক ভাবের মত রূপই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময়রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বোঝা যায়। যে ভাবের যে বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শবসাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে সকলই মানস, প্রকৃতি নহে। ইংরাজীতে তাহাকে hallucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী, যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সামলাইতে পারিলে পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয়; অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার প্রভাব, কাম ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এই সকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে তবে ঐশ্বর্য্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কোন্ শক্তির প্রভাবে ঘটে, তাহা জানি না; কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, যন্ত্রমন্ত্রধারিণী, সর্বশক্তিময়ী, সর্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী, জগন্ময়ী অপূর্ব্ব রূপে হৃদয়

আকাশে স্থির দামিনীর ন্যায় কোটি সূর্য্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্য্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্ত্তির পূজা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এই সমাচার পান। বিরূপাক্ষের শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাঙ্গালায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়া আগমবাগীশই এই দশভুজার পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্য্যন্ত দশভুজা মূর্ত্তির সর্ব্বভাবের দ্যোতনা আছে। সে ভাব, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষ্ণা, নিদ্রা মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এই ভাবের ভাবুক হইলে তবে ত ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এই মা কেমন—এই মা কিসের? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে সেই মজিয়াছে, তাহা ত ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রে খামখেয়ালের কথা নাই। কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম্ম করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সেই কর্ম্ম মিথ্যা, সেই গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম্ম—কর্ম্মীর ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভুজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝান যায় না, তাহা করিয়া কর্ম্মিয়া দেখাইতে হয়। বাঙ্গালায় কর্ম্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্ম্মও লোপ পাইতেছে। কর্ম্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাঙ্গালার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক—সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল; অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আখিয়া চুখিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সংসার-দাবদাহের জ্বালা বার আনা কমিয়া গিয়াছিল। একদিকে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসী—পুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্যদিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুর রসের অপূর্ব্ব মদিরা ধারা পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস উপহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্বহারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃন্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর একজন ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"জান রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রের—উপনিষদ্ শাস্ত্রের—উপনিষদ্‌রাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী, ভাবময়ী—একথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানিতেন, তাই ভাবুক কবি গাহিতেছেন: "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্মময়—ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাঙ্গালা মর্ত্তের স্বর্গ ছিল—সুখময়, স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কয়টা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলাম; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে তত্ত্ব কথা কহিব।★ □

★ 'সাহিত্য', আশ্বিন (শারদীয়া) সংখ্যা, ১৩১৮, পৃঃ ২১০-২১৭। সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
সংগ্রহ□তাপস বসু। রচনাটির বানান আমরা অপরিবর্তিত রেখেছি।—সম্পাদক, উদ্বোধন

দুর্গা ঃ মহাশক্তি ও মহামাধুর্যের প্রতীক

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

পরমা শক্তিকে হিন্দুরা নানা নামে অভিহিত করেছে। নানা রূপে কল্পনা করেছে। নাম এবং রূপের এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও হিন্দুর মাতৃদর্শন কিন্তু আসলে অদ্বৈতদর্শনই। হিন্দুর সেই অসাধারণ মাতৃদর্শনের মূল কথা হলো বিশ্বের সকল রহস্য ও সকল লীলার মধ্যে জননীকে অন্বেষণ। সেই জননীকে 'দুর্গা' নামে, 'উমা' নামে, 'পার্বতী' নামে—আরও বহু নামে ডেকে সে আসলে খুঁজেছে মহাশক্তিকে, মহামাধুর্যকে। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ বর্তমান নিবন্ধে সে-কথাই আলোচনা করেছেন।

দুর্গাপূজাকে বলা হয় মহাপূজা। কিন্তু মূলতঃ এই পূজা শক্তিদেবতারই আরাধনা। 'চণ্ডী'তে আছে, দেবীর সঙ্গে যুদ্ধরত শুম্ভাসুর ঠাট্টা করে বলছেন ঃ

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী॥"
(১০।৩)

—বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গে! তুমি গর্ব করো না। কারণ, অন্যান্য দেবীর শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে অতি গর্বভরে তুমি যুদ্ধ করছ।

শুম্ভাসুরের এই উক্তিতে দেবী বললেন ঃ

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥"
(১০।৫)

—দুষ্ট! জগতে আমিই এক ও অদ্বিতীয়া। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ আমারই বিভূতি-রূপিণী সমস্ত দেবী আমাতেই লয় হয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর দেবী বললেন ঃ

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥"
(১০।৮)

—আমারই বিভূতিতে আমি যে নানা রূপে বর্তমান ছিলাম। দেখ, সেইসমস্ত রূপ আমি আবার আমার শরীরে প্রত্যাহার করে নিয়েছি। আমি এখন একাই রয়েছি। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

চণ্ডীর মতে, সব দেবতার শরীর থেকে বিকীর্ণ পুঞ্জীভূত অতুলনীয় তেজোরাশি একত্র হয়ে যে-নারীমূর্তি রূপ পরিগ্রহ করে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত করেন তিনিই দেবী। কিন্তু নারীরূপে কেন? কারণ, নারী শক্তির প্রতীক। সকল দেবতার শক্তিই নারীরূপে প্রকাশিতা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন ঃ "দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁহার শক্তি। তাঁহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বহন-শক্তির নাম পবনানানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।"[১]

মহিষাসুরমর্দিনীর নারীরূপ দেবতাদের সম্মিলিত শক্তিরই প্রতীক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক ও অদ্বিতীয় এই শক্তিই বর্তমান। বেদের ব্রহ্ম ও শক্তি, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) তত্ত্বের দিক থেকে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তন্ত্রের শিব ও কালী-ভাবনায় সেই এক তত্ত্বেরই আভাস। অলৌকিক দেব-দেবী ও লৌকিক পুরুষ-স্ত্রী, পতি-পত্নী সবই এই তত্ত্বের মধ্যে পড়ে। রাধাকৃষ্ণলীলাও সেই এক তত্ত্ব। নারীর মোহিনীরূপ, স্ত্রীত্ব, মাতৃত্ব সবই সেই 'দেবাত্মশক্তি'র বহিঃপ্রকাশ। স্বর্গরাজ্য পুনরধিকারের পরে অহঙ্কৃত দেবতাদের দর্প চূর্ণ করেন স্বয়ং ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপরিচয় না দিয়ে 'উমা হৈমবতী'র মাধ্যমে তা ব্যক্ত করেন।

১ বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৩৯২, পৃঃ ৭৯০

মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরনিধনে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তিই মহাশক্তি দুর্গারূপে প্রকটিতা। 'চণ্ডী'তে বর্ণিত দুর্গা প্রধানতঃ শক্তির মাতৃরূপ। সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ বা প্রলয়-তত্ত্বেও এই মাতৃরূপ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যেমন সৃজন, পালন ও রক্ষা করেন, নিধনকারিণী শক্তিও তাঁরই। বাংলার শাক্ত পদাবলীগুলিতে এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী দেবী সম্পর্কিত অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; যেখানে মা কালীর পদতলে শায়িত শিবকে 'শিব'রূপে নয়, অনেক ক্ষেত্রে 'শব'রূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুর্গা অসুরকে পদতলে পিষ্ট করেছেন, নিহত অসুর দেবীর পাদস্পর্শে শিবত্ব-প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ তাঁর দেবত্বের বিকাশ হয়েছে—শুভবুদ্ধি জ্ঞান ও চৈতন্যের উদয় হয়েছে। একটি প্রচলিত রামপ্রসাদী গানে আছে ঃ

"শিব নয় মায়ের পদতলে
ওটা মিথ্যা লোকে বলে॥
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপরে।
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে॥"[২]

এই সাত্ত্বিক দৃষ্টিটি বড়ই সুন্দর ও তাৎপর্যময়। অর্থাৎ শক্তিরূপিণী মায়ের কৃপায় অতি দুর্জন বা আসুরিক প্রকৃতির লোকও শিবত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন। আবার দেবাসুরের যুদ্ধ তো কেবল বাইরে নয়, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতেও চলছে অবিরাম এই সুরাসুরের সংগ্রাম। মানুষ বা দৈত্য বা দানব সকলের মধ্যেই দেবত্ব বা শিবত্ব সবসময়ই বিরাজ করছে এবং স্বরূপতঃ সে শিবই। কিন্তু তাঁর ভিতরের আসুরিক ভাব এই শিবত্বকে ঢেকে রেখেছে। শক্তিরূপিণী এই মায়ের কৃপা হলে ভিতরের আসুরিক ভাব চলে গিয়ে আবার তার 'শিবত্ব'প্রাপ্তি হবে। তখন মানুষ বা অসুর—যে-নামেই আখ্যাত হোক না কেন, সে তার স্বরূপ দেবত্ব লাভ করবে। জীবের অন্তঃকরণে সুরাসুরের এই সংগ্রাম ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক লুই স্টিভেনসন সৃষ্ট দুটি চরিত্র ডঃ জেকিল ও মিঃ হাইড-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুটি দ্বান্দ্বিক চরিত্রের অন্তরালে মানুষের অন্তঃকরণে সুরাসুর বা দেবত্ব ও পশুত্বের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

জীব স্বরূপতঃ শিবই। জীবের অন্তর্নিহিত পশুত্বের বিনাশের পর দেবতার জাগরণ হয়। সুতরাং দেবতা বিরাজ করেন বহির্জগতে নয়—অন্তর্জগতেই। সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশের জন্য মানুষই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী দেবতা সৃষ্টি করে। প্রাচীন পুরাণে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা বলা হয়েছে। এই সংখ্যা যে সমকালের পৃথিবীর জনসংখ্যা নয়, তা কি কেউ জোর করে বলতে পারে?

শিব, দুর্গা ও কালী নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার সুন্দর ধ্যান-ধারণার কথা আমাদের জানা আছে। একবার তিনি তাঁর এক প্রিয় বান্ধবীকে লেখেন ঃ "কালী সম্বন্ধে একটা নতুন ভাব মনে জেগেছে। মায়ের পদতলে শায়িত শিবের ঢুলুঢুলু চোখ দুটি মায়ের দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছে কি করে তাই দেখছিলাম। কালী ঐ সদাশিবের দৃষ্টির সৃষ্টি। নিজেকে আড়াল রেখে সাক্ষিরূপে তিনি দেখছেন দেবাত্মশক্তিকে। শিবই কালী, কালীই শিব। মানুষের মনে বিপুল শক্তির আলোড়ন চলছে, তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে দেবতার এই রূপে—এই কি সত্য? অর্থাৎ মানুষই কি দেবতাকে সৃষ্টি করে? তাই ভাবি। বিশ্বের রহস্য কোন্ লাস্যময়ীর লীলাচাতুরীর হালকা ওড়নায় ঢাকা।"[৩]

কে এই 'লাস্যময়ী' নারী? দুর্গা, কালী প্রভৃতি যে-নামেই তাঁকে ডাকা হোক না কেন, ইনিই সেই মহাশক্তির প্রতীক। নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ মহা বৈদান্তিক হয়েও ঈশ্বরের এই শক্তিরূপিণী অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি বলতেন ঃ "দেখ, আমি বিশ্বাস না করে পারি না, কোথাও একটা মহাশক্তি আছে যা নিজেকে নারীপ্রকৃতি বলে অনুভব করে—'কালী' বা 'মা' নামে নিজেকে আখ্যাত করে।—আবার আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাসী—ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই—বুঝতেই পারছ সর্বদা এমনই হয়...।"[৪]

কালী-ব্রহ্মের এই ধন্দে পড়েই বোধহয় সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন ঃ "আমি কালী-ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

এই দ্বন্দ্বের নিরসন আছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ঃ

২ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৭, পৃঃ ৭০

৩ নিবেদিতা—লিজেল রেমঁ (অনুবাদ—নারায়ণী দেবী), ১ম সং, ১৩৬২, পৃঃ ২৮৭-২৮৮

৪ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব, ১৩৯৮, পৃঃ ৩৩৫

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আরেকটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি; অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।...

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম-রূপ ভেদ।"[৫]

তন্ত্র ও পুরাণে দুর্গা ও কালীকে আদ্যাশক্তির দুই রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে 'চণ্ডী'তে একটি সুন্দর শ্লোক বলা হয়েছে: "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।" (৫।৮০) এই শ্লোকের দ্বারা দেবীকে পরব্রহ্মেরই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। দেবী পরমাপ্রকৃতি এবং পরব্রহ্মের সহিত অভিন্না। তাই তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। তবে যে মা দুর্গাকে 'হৈমবতী', 'উমা', 'পার্বতী' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়, এরই বা তাৎপর্য কী? দেবী দুর্গা স্বয়ংসিদ্ধা, কাজেই তিনি হিমালয়কন্যা 'হৈমবতী', 'উমা' বা 'পার্বতী' হবেন কী করে? এর তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, শুম্ভনিশুম্ভকে বধের জন্য দেবতারা হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করলে তাঁদেরই ইচ্ছাশক্তি বা তপঃপ্রভাবে দেবী রূপ পরিগ্রহ করেন এবং সেই অর্থেই হয়তো অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারিণী সেই দেবীকে হিমালয়-কন্যা বা 'হৈমবতী', 'উমা' বা 'পার্বতী' আখ্যা দেওয়া হয়।

তবে ভারতীয় জনমানসে দেবীর উমা-রূপটি বিশেষ প্রিয়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন: "কবি কালিদাস পর্বত-দুহিতা উমাকে কন্যারূপে, পত্নীরূপে এবং জননীরূপে সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর অন্তরের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।"[৬]

আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদে দুর্গার বিশেষ উল্লেখ নেই, তবে রুদ্র বা শিবের কথা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে যজুর্বেদে অম্বিকা নামটি পাওয়া যায়। এই অম্বিকা কিন্তু রুদ্রের পত্নী নন, ভগিনী। পরবর্তী কালে অবশ্য 'দুর্গ' কথার অনেক অর্থ দেখতে পাই। সেইসব অর্থের সাহায্যেই পুরাণাদিতে 'দুর্গা'র ব্যাখ্যা হয়েছে দেখা যায়। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ 'দুর্গা' শব্দের অর্থ এই:

"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥"

—দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ শব্দ হন্তৃবাচক। এই সকলকে হনন করেন যে-দেবী তিনিই 'দুর্গা' নামে পরিকীর্তিতা।

আবার দেবী স্বয়ং 'চণ্ডী'তে বলছেন:

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"
(১১।৪৯)

—'দুর্গম' নামে এক ভয়ঙ্কর অসুরকে বধ করে আমি দেবী 'দুর্গা' নামে বিখ্যাত হব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দেবী একাধারে 'উমা', 'হৈমবতী' নামে যেমন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতীক, তেমনি 'দুর্গা' নামে আবার অশুভ ও অসুখ-নাশিনী মহাশক্তিরও প্রতীক। আসলে দেবী স্বয়ংসিদ্ধা (শিবকে পতিরূপে বরণ করে স্বয়ংবরাও বটেন)। তাই তাঁর পক্ষে অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মহাশক্তির অধিকারিণী হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। তিনি যেমন স্বয়ংসিদ্ধা বা স্বয়ংপ্রকাশিতা, শিবও তেমনি স্বয়ম্ভু। সেই অর্থেই শিব ও পরমাপ্রকৃতি দেবী দুর্গা এক অভিন্ন সত্তা। তন্ত্রমতেও শিব ও শক্তি অভেদ। শিবরূপী পরমাত্মা নিশ্চেষ্ট, তাঁর সকল ক্রিয়া ও প্রচেষ্টা দেবীরূপিণী মহাশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এখানে 'শক্তি' অর্থে ব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই বুঝতে হবে, যা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব। তাই 'চণ্ডী'র মতে দেবীও স্বয়ং পূর্ণসত্তা, ব্রহ্মেরই ন্যায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। দেবী স্বমুখে সে-কথাই ঘোষণা করেছিলেন: "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা॥" (১০।৫) □

৫ কথামৃত, উদ্বোধন সং, ১৯৯৩, পৃঃ ৯৫-৯৬

৬ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ৪১

ঈশ্বরের মাতৃভাব ঃ দুর্গাপূজা ও পাশ্চাত্য ভক্তবৃন্দ

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

ঈশ্বরের মাতৃভাব ভারতের নিজস্ব অধ্যাত্ম-ভাবনা। পাশ্চাত্যের ধর্মভাবনায় ঈশ্বরের মাতৃভাব অকল্পনীয় এবং অগ্রহণীয় ছিল এতকাল। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইদের প্রয়াস এবং প্রচারের ফলে আজ পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব সাদরে এবং শ্রদ্ধায় গৃহীত। সেই অসাধারণ ইতিবৃত্ত এবং পরবর্তী কালে বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ সংঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় পাশ্চাত্য ভক্তবৃন্দের সানন্দ অংশগ্রহণের বিবরণ বর্তমান নিবন্ধে মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করেছেন স্বামী বিমলাত্মানন্দ।

পণ্ডিতদের মতে বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়েছিল দশম বা একাদশ শতাব্দীতে।[১] রাজা, জমিদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই দুর্গাপূজা করতেন। বারোয়ারি পূজার সূত্রপাত হয় ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায়। বারজন ব্রাহ্মণ মিলিত হয়ে পূজা করেছিলেন বলে নাম হয় 'বারোয়ারি' পূজা। তবে তা ছিল জগদ্ধাত্রী পূজা। উদ্দেশ্য—"শাস্ত্র-নিরপেক্ষ পূজা-অনুষ্ঠান" ("The celebration of a Puja independently of the rules of the Shastras")। সংগৃহীত চাঁদায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল পূজা। পূজার আনুষঙ্গিক ছিল সঙ, পুতুলনাচ, যাত্রাভিনয়, গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ। গুপ্তিপাড়ার পূজার সাফল্যে বারোয়ারি পূজা বিস্তৃতি লাভ করে সারা বাংলায়। বারোয়ারি পূজা রূপান্তরিত হয় সর্বজনীন পূজায়। বাংলায় প্রথম রেজিস্ট্রিকৃত সর্বজনীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতার বাগবাজারে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে।[২] এরপর বিভিন্ন স্থানে সর্বজনীন দুর্গাপূজা ব্যাপকভাবে হচ্ছে।

সর্বজনীন দুর্গাপূজায় সকলের জন্য অবারিত দ্বার; শুধু বাংলায় নয়—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও পৃথিবীর নানা দেশে। আজকাল দুর্গাপূজায় বিদেশীদের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। তাঁরাও আমাদের মতো শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দুর্গাপূজার আনন্দে মেতে ওঠেন। কিন্তু প্রায় একশ বছর পূর্বে চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, বিদেশীরা ছিলেন 'ম্লেচ্ছ', হিন্দুসমাজে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয়, তাঁদের স্পর্শে জাত যেত। তাছাড়া, ঈশ্বরের মাতৃরূপ ছিল বিদেশীদের কাছে অকল্পনীয় ও অগ্রহণীয়। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। বিদেশীরা ঈশ্বরের মাতৃরূপ স্বীকার ও গ্রহণ করেছিলেন। শক্তিপূজার তাৎপর্য তাঁরা বুঝেছিলেন। দুর্গাপূজায় তাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে। এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের কয়েকজন সন্ন্যাসী। তাঁরা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ্। অবশ্য সে-কালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে দুর্গাপূজায় বিদেশীদের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায়। শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বাবুদের পূজায় ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হতেন। এঁরা ইংরেজদের ডাকতেন নিজেদের আভিজাত্য প্রদর্শন ও অনুকম্পালাভের জন্য। এঁরা ব্যবস্থা করতেন বাইজীনাচ সহ নানান বিনোদনের। সেখানে বিদেশীদের মধ্যে ভক্তিভাব বা শুচিতাবোধের বালাই ছিল না, ছিল না দুর্গাপূজার দার্শনিক তত্ত্ব জানার স্পৃহাও। বিদেশীদের কাছে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচার ও প্রসার, শক্তিপূজার গভীর গূঢ় তাৎপর্য এবং দুর্গাপূজার পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা। সেই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে বেলুড় মঠে এবং তার দেশ-বিদেশের শাখাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায়। প্রধানতঃ বেলুড় মঠে

১ দ্রঃ শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ২৮

২ সাপ্তাহিক বর্তমান, ৮ম বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ঃ অতুল সুরের প্রবন্ধ 'বারোয়ারি পূজার সেকাল একাল', পৃঃ ৮-১০

দুর্গাপূজা-অনুষ্ঠানের সূত্রেই বিদেশীরা ঈশ্বরের মাতৃভাবের অপূর্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেন। মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচার এবং তৎকালীন ও পরবর্তী কালের বিদেশী ভক্তদের আন্তরিকতা ও গভীরতার সঙ্গে তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ বিষয়ে এই প্রবন্ধে আমরা কিছু আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করব।

॥ ২ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে পাশ্চাত্যে আর কেউ ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রচার করেছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। স্বামীজীই প্রথম ঈশ্বরের মাতৃভাবের তত্ত্ব ঈশ্বরের পিতৃ-উপাসনার কেন্দ্র পাশ্চাত্যে প্রচার করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ। শিকাগোর হেল পরিবারে স্বামীজী আছেন। ওখানে থাকার সময়ে বক্তৃতা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পেনসিলে স্বামীজী কিছু নোট করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ "God as father, God as mother, God as the lover" (ঈশ্বর পিতৃরূপে, ঈশ্বর মাতৃরূপে, ঈশ্বর প্রেমিকরূপে)।[৩] এছাড়া দুটি সংবাদপত্রে ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল—মিনিয়াপোলিস জার্নাল ও ডেট্রয়েট ট্রিবিউন-এ। কাল ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর এবং পরের বছর ২১ ফেব্রুয়ারি। 'জার্নাল'-এ প্রকাশিত স্বামীজীর বক্তৃতার অংশ ঃ "হিন্দুরা ঈশ্বরের মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব স্বীকার করে। কারণ, প্রথমটি প্রেমাদর্শের অপেক্ষাকৃত পরিপূর্ণ রূপ।" ("The Hindu faith recognized the motherhood of God as well as the fatherhood, because the former was a better fulfilment of the idea of love.")।[৪] 'ট্রিবিউন'-এ স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণ ঃ "ঈশ্বরকে বুঝবার তিনটি ভিন্ন পথ। প্রথমতঃ, তাঁকে দেখা হয় শৌর্যশালী ব্যক্তিরূপে। তাঁর নিকট নতজানু হও ও শৌর্যের পূজা কর। অন্য আরেকটি পথ—তাঁকে পিতৃরূপে উপাসনা কর। ভারতে পিতা সর্বদাই পুত্রদের শাস্তি দেন। [তাই] পিতার সঙ্গে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক। আরও একটি পথ—ঈশ্বরকে মাতৃরূপে চিন্তা করা। ভারতে সর্বদাই মাতা প্রকৃত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। এটি হলো ভারতীয় দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে দেখা।"[৫] ("There were three different ways of looking at God. One was to look upon Him as a mighty personage and fall down and worship His might. Another was to worship Him as a father. In India the father always punished the children and an element of fear was mixed with the regard and love for a father. Still another way to think of God was as a mother. In India a mother was always truly loved and reverenced. That was the Indians' way of looking at their God.")

এছাড়া স্বামীজী আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে (জুলাই-আগস্ট ১৮৯৫) বেশ কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যার[৬] কাছে ঈশ্বরের মাতৃভাবের ব্যাখ্যা করেছিলেন ঃ "সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া—সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী।"[৭] "বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা কর্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে।"[৮]

স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে 'ঈশ্বরের মাতৃত্ব' ('Motherhood of God') বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি। এই বক্তৃতা উপস্থিত শ্রোতাদের এত ভাল লেগেছিল যে, তাঁদের অনুরোধে এটি পুস্তিকাকারে ছাপতে হয়েছিল।[৯] স্বামীজীও এখানেই 'জগন্মাতার পূজা' ('The Worship of the Divine Mother') সম্বন্ধে অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছিলেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে।[১০]

৩ দ্রঃ নিবেদিতা লোকমাতা— শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড, ১ম পর্ব, আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, কলকাতা, ৪র্থ সং, ১৩৯৮, পৃঃ ২৭৫-২৭৬

৪ ঐ, পৃঃ ২৭৫ ৫ ঐ

৬ শিষ্য-শিষ্যারা ছিলেন ঃ মিস সারা ওয়াল্ডো, লিয়ঁ ল্যান্ডসবার্গ, মিসেস মেরী ফাঙ্কি, ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল, ডাঃ এল. এল. ওয়াইট, মিস রুথ এলিস, মিস স্টেলা ক্যাম্পবেল, মেরী লুই, মিস এলিজাবেথ ডাচার এবং মিস্টার ও মিসেস গুডইয়ার।

৭ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭৯, পৃঃ ২৩০ ৮ ঐ, পৃঃ ৩১৬

৯ আমার জীবনকথা— স্বামী অভেদানন্দ, ২য় ভাগ, ১৯৮৪, পৃঃ ৯১

১০ The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VIII, 1977, pp. 252-253

স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ায় 'শান্তি আশ্রম' স্থাপন করে একদল ছাত্রছাত্রীকে বেদান্ত সাধন ও যোগ-শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের এক বিকালে ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। সামনে এক উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় পাইন গাছ। স্বামী তুরীয়ানন্দ যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে উৎসুক অধ্যাত্মপিপাসুর দল। চতুর্দিকে শান্তির নীরবতা। কথাপ্রসঙ্গে জগন্মাতার প্রসঙ্গ এল। তিনি বললেন ঃ "জগন্মাতা অতি গর্বিতা এবং অতি বিশুদ্ধা। তিনি আবৃত থাকেন একটি মোটা আবরণে, যা তাঁর সন্তানগণ ব্যতীত কেউ উত্তোলন করতে পারেন না। যখন সন্তানগণ পর্দা তুলে তাঁকে দর্শন করেন তখন তিনি সুখী ও হাস্যমুখী হন।" এক যুবক ছাত্র জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা কে এবং কোথায় থাকেন?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "তিনিই এইসব হয়েছেন এবং সর্বত্র আছেন। তিনি প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্তা। তিনিই প্রকৃতি। কিন্তু কথায় কিছু হয় না। পর্দা উত্তোলন কর।" ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কিরূপে স্বামীজী?" স্বামী তুরীয়ানন্দ বললেন ঃ "ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল ছিন্ন হয়।" তারপর জোরের সঙ্গে তিনি বারবার বললেন ঃ "ধ্যান কর, ধ্যান কর, ধ্যান কর। তোমরা কি করছ? তোমরা জীবন বৃথা ব্যয় করছ। গভীরভাবে মায়ের চিন্তা কর। মায়ের কাছে সদা প্রার্থনা কর।... তুমি যুবক, এই সময়। এ সুযোগ হারিও না। তরুণ সরল উদ্যোগীরাই সিদ্ধিলাভ করতে পারে। জগন্মাতাকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর।"[১১] অপূর্ব নিস্তব্ধতা! যেন সকলেরই অনুভব হচ্ছিল জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব।

স্বামী সারদানন্দের আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার, সেখানকার দার্শনিক, পণ্ডিত ও সাধারণ ভক্তদের প্রভাবিত করেছিল। যেমন মন্টক্লেয়ারের মিসেস বি. ব্রাউনের অন্তরে ঈশ্বরের মাতৃভাব এত দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করেছিল যে, স্বামী সারদানন্দ তাঁকে লিখেছিলেন (৩ এপ্রিল ১৯০২) ঃ "আমি উদ্বেগ সহকারে লক্ষ্য করছিলাম তোমার আন্তর উপলব্ধিসকল। জেনে রাখ, তোমার বেশ উন্নতি হচ্ছে। অবশেষে জগন্মাতা তোমাকে ধরেছেন দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে। জগন্মাতার পথনির্দেশে প্রশ্নশূন্য বিশ্বাস নিয়ে আত্মসমর্পণ কর। তোমার যথাসর্বস্ব তাঁকে দিয়ে দাও। তিনিই জীবন, তিনিই আলো, তিনিই শক্তি, তিনিই ভাল-মন্দের সৃষ্টিকারিণী, তিনিই মানুষকে অন্ধকার অজ্ঞতার বন্ধনে যুগ যুগ ধরে রেখে দেন আবার তিনিই মুক্ত করেন; তিনি ঘৃণ্যদের মধ্যে ঘৃণ্যতম, আবার সুন্দরগণের মধ্যে সুন্দরতম। আমার প্রার্থনা তিনি তোমাকে কণ্টকময় জীবনের পথের মধ্য দিয়ে নিরাপদ-ভাবে নিয়ে যান সেই রাজ্যে যেখানে কাল ও মৃত্যুর প্রবেশ নিষিদ্ধ, যেখানে মানুষ সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে..."[১২]

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্যান ফ্রান্সিস্কোতে প্রথম হিন্দু-মন্দির (১৯০৭) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই মন্দিরে শিব-কালীর পূজা প্রচলন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

পূর্বোক্ত পাঁচজন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের গভীর আধ্যাত্মি-কতার সঞ্জীবনী স্পর্শে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বীজ বিদেশীদের মনে প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কুরিত হয়েছিল। পিতৃ উপাসক বিদেশীরা ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মূর্তিপূজার ঘোরতর বিরোধী—একথা সর্বজনবিদিত। এরূপ বিপরীত ভাবধারায় লালিত-পালিত বিদেশীদের মনে এসকল চিন্তাধারা প্রবেশ করানো সেসময়ে ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কিন্তু এই দুরূহ অথচ জটিল কাজটি অকুতোভয়ে সমাধা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর চার গুরুভাই। তাঁদের সান্নিধ্য এবং ব্যাখ্যান মিসেস সারা বুল, মিসেস বেট্টী লেগেট, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেট, মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল, মিস ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল, মিস লরা এফ. গ্লেন প্রমুখকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ওদেশে অথবা এদেশে ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতি প্রচারে নিজেদের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা ঈশ্বরের মাতৃভাবকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় অংশগ্রহণ করে আপ্লুত হয়েছিলেন। সেকালে আমাদের দেশের গোঁড়া পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণরা বিদেশীদের 'ম্লেচ্ছ' বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। দুর্গাপূজায় তাঁদের অংশগ্রহণের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন তাঁরা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের দুর্গাপূজায় বিদেশীদের অংশগ্রহণে অনুমতি ও অধিকার দান ছিল নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক।

॥ ৩ ॥

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে (১৮-২০) বেলুড় মঠে প্রথম

১১ স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৯৮৬, পৃঃ ১০২
১২ সারদানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৯৫, পৃঃ ২৬১

প্রতিমায় দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই পূজায় কোন বিদেশী ভক্ত উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু অন্তরঙ্গ দুজন বিদেশী ভক্তকে স্বামীজী পূজার সংবাদ দিয়েছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী নিবেদিতাকে মঠের দুর্গাপূজার খবর জানিয়েছিলেন স্বামীজী।[১৩] ভগিনী ক্রিস্টিনকে তিনি লিখেছিলেন: "দশপ্রহরণধারিণী মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি (মঠে) এনেছিলাম। তাঁর এক চরণ সিংহোপরি—অপরখানি অসুরের ওপর। মায়ের দুপাশে তাঁর দুই কন্যা—ধন-ঐশ্বর্যের দেবী (লক্ষ্মী) এবং বিদ্যা-সঙ্গীতের দেবী (সরস্বতী)—তাঁরা কমলদলের ওপর দণ্ডায়মান। তাঁর দুদিকে দুই পুত্র—যুদ্ধদেবতা (কার্তিক) এবং জ্ঞানের দেবতা (গণেশ)।... হাজার হাজার ভক্ত আনন্দ করেছিল।" ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী লিখেছিলেন: "দুর্গাপূজার সময় থেকে আমি অসুস্থ। এজন্য তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। আমরা চারদিন মা দুর্গার পূজা মহাসমারোহে করেছিলাম। কিন্তু হায়! আমি হয়ে গেলাম জ্বরে শয্যাগত। মায়ের মূর্তি ছিল অপরূপ এবং পূজাও হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নিবেদিতা কলকাতায় কালীঘাট এবং অ্যালবার্ট হল-এ কালী ও কালীপূজার ওপর দুটি অসাধারণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিবেদিতার সেই বক্তৃতা-দুটি 'কালী দ্য মাদার' নামে পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৪]

নিবেদিতা তাঁর বিদেশী বন্ধু-বান্ধবদের দুর্গাপূজার ইতিহাস জানাতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এমনই এক চিঠিতে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: "রামকে বলা হয় পদ্মপলাশলোচন। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম মায়ের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু রাবণও মাতৃভক্ত। রাম দেখলেন—মায়ের পক্ষপুটের আশ্রয়ে রাবণ। সুতরাং রাবণ অঘটন ঘটাবে নিশ্চয়। রাম সিদ্ধান্ত নিলেন—১০০১ (?) নীলপদ্ম দিয়ে মায়ের পূজা করবেন, যাতে মা প্রসন্না হয়ে তাঁকে সহায়তা করেন। মানস সরোবর থেকে লক্ষ্মণ (?) সংগ্রহ করেছিলেন পদ্ম। রাম 'মা এস' বলে পূজা শুরু করলেন। রাম মায়ের চরণে ১০০০ (?) পদ্মফুলের অঞ্জলি দিলেন। রাম দেখলেন—একটি পদ্ম কম। কিন্তু তিনি পূজা করবেনই। তিনি তখন ছুরি দিয়ে নিজের একটি চোখ উৎপাটন করতে উদ্যত হলেন, যাতে নীলপদ্মের সংখ্যা পূরণ হয়। তৎক্ষণাৎ মা দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করলেন বীর রামকে।"[১৫]

মিস ম্যাকলাউড মঠের এক দুর্গাপূজায় উপস্থিত ছিলেন (অক্টোবর ১৯২৩)। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ্ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও কথামৃতকার শ্রীম-র পুণ্য সঙ্গ করে এবং মঠের ভাব-গম্ভীর পূজার পরিবেশ লক্ষ্য করে তিনি অভিভূত হন। মায়ের মূর্তি দেখে তাঁর অনুভব হয়েছিল—সপরিবারে মা সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে, তাঁর পদতলে মহিষাসুর; পশ্চাতের ধনুকাকৃতি চালচিত্রে নানা দেবদেবী চিত্রিত। পূজক ব্রহ্মচারী ক্ষুদিরাম ও তন্ত্রধারক স্বামী প্রণবানন্দের পূজার মন্ত্রোচ্চারণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।[১৬]

বস্টনের লরা এফ. গ্লেন—রামকৃষ্ণ সংঘে ভগিনী দেবমাতা নামে পরিচিতা। দেবমাতা মাদ্রাজ মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আয়োজিত দুর্গাপূজা দেখেছিলেন। প্রতিমায় নয়, ঘটে-পটে। তন্ত্রধারক ছিলেন স্বয়ং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। দেবমাতার মন আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল সেবারের দুর্গাপূজায়। সমগ্র দক্ষিণ ভারতেও দুর্গাপূজা এক সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়—পূজার তিনদিন সকলেই নতুন সাজে সজ্জিত হয়। সকল শ্রেণীর মানুষ পরস্পরের বিবাদ-বিসংবাদ, শত্রু-মিত্র ভুলে আলিঙ্গন ও উপহার বিনিময় করেন। বাড়িতে বাড়িতে মণ্ডপ তৈরি হয়; সর্বোৎকৃষ্ট সর্বপ্রকার জিনিসপত্র নিবেদিত হয়। দেবমাতা তাঁর অভিজ্ঞতা তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৭]

১৩ উভয় চিঠির তারিখ—১২ নভেম্বর ১৯০১। (দ্রঃ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, Vol. II, 1981, p. 609)

১৪ নিবেদিতার বক্তৃতার তারিখ—(১) কালীঘাটে ২৮ মে ১৮৯৯, (২) অ্যালবার্ট হল-এ—১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯।

১৫ চিঠির তারিখ ২৭ অক্টোবর ১৮৯৯। নিবেদিতা সেসময়ে আমেরিকায় লেগেট দম্পতির বাড়ি রিজলী ম্যানরে ছিলেন। (দ্রঃ Letters of Sister Nivedita—(Ed.) Sankari Prasad Basu, Vol. I, Nababharat Publishers, Calcutta, 1982, pp. 221-222)

১৬ Tantine—Pravrajika Prabuddhaprana, Sri Sarada Math, Dakshineswar, 1990, pp. 167-169

১৭ দ্রঃ Days in Indian Monastery—Sister Devamata, Ramakrishna Math, Madras, 1927, pp. 191-193

হল্যান্ডের অধিবাসী কর্নেনিয়াস জে. হেইজশলম। আমেরিকার নাগরিক। শান্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের বেদান্ত-ক্লাসের প্রিয় ছাত্র। বেলুড় মঠে আগমন ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। সন্ন্যাসনাম—স্বামী অতুলানন্দ, গুরুদাস মহারাজ নামে সংঘে সমধিক পরিচিত। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পার্ষদের পুণ্য সান্নিধ্যে এসেছিলেন গুরুদাস মহারাজ। ভারতে প্রায় চুয়ান্ন বছর কাটিয়েছিলেন তিনি। বেলুড় মঠ, আলমোড়া, কনখল সেবাশ্রম ও বার্লোগঞ্জে ছিলেন। বহুবার তিনি ভারতে দুর্গাপূজা দেখেছেন। পূজার দিনগুলিতে তিনি ভাবে বিভোর থাকতেন। শুভ বিজয়ার চিঠি লিখতেন আমেরিকাতে পরিচিত বেদান্ত-ভক্তদের। তাতে থাকত দুর্গাপূজার বর্ণনা। এরূপ একটি চিঠিতে গুরুদাস মহারাজ লিখেছিলেন ঃ "আজ দুর্গাপূজার প্রথম দিন। বাঙালীদের দুর্গাপূজা আমাদের ক্রিসমাসের মতন... পুণ্যদিন। তোমাদের জন্য মা দুর্গার কাছে কিছু ভোগ দিচ্ছি। আমি প্রার্থনা করি, তিনি (মা দুর্গা) তোমাদের উভয়ের মনে শান্তি প্রদান করুন।"[১৮] গুরুদাস মহারাজ শুভ বিজয়ার যথোচিত সম্ভাষণও জানাতেন অনেককেই।

॥ ৪ ॥

বিগত একশ বছরে মিসিসিপি-টেমস-রাইন নদী দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে। ঈশ্বরের পিতৃভাবের পীঠস্থান পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্রগুলিতে পাশ্চাত্যের মানুষেরা তাঁদের চিরাচরিত ঈশ্বরের পিতৃভাবের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সাদরে বরণ করেছেন ভারতের ঈশ্বরের মাতৃভাবকে। বেদান্ত সোসাইটিগুলিতে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা, কালীপূজা অনুষ্ঠিত হওয়া আজ আর কোন ব্যাপারই নয়। কোথাও মা দুর্গা পূজিত হন ছোট মূর্তিতে, কোথাও পটে, কোথাও আবার বড় প্রতিমায়। কোথাও পূজা হয় তিন দিন, কোথাও বা একদিন—মহাষ্টমীতে। বিজয়ার দিন শান্তিজল নিতে চল নামে বিদেশী ভক্তদের।

আরও লক্ষ্য করার বিষয়—আজকাল বিদেশে বসবাসকারী বাঙালীরা মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করছেন। সোনার প্রতিমা কলকাতা থেকে যাচ্ছে সেখানে। বাংলাদেশের মতো সেখানে পূজা হয়, প্রসাদ-বিতরণও হয়। অনেক বিদেশীও যোগ দেন পূজায়। অঞ্জলি দেন, সানন্দে প্রসাদ গ্রহণও করেন।

আজ এদেশে দুর্গাপূজার মণ্ডপে বিদেশীদের প্রবেশ অবাধ। তাই দেখি সুইজারল্যান্ডের জেরাল্ড বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় সারাদিন কাটিয়ে যান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন দুর্গাপূজার তত্ত্ব ও দার্শনিক চিন্তাধারা। জাপানী, রাশিয়ান, জার্মান, ইংরেজ ও আমেরিকান ভক্তেরা মণ্ডপে সকলের সঙ্গে বসে মঠের পূজা উপভোগ করেন, চোখ বুজে ধ্যান করেন, সারাক্ষণ চুপচাপ পূজার ক্রিয়াদি লক্ষ্য করেন। মনে ধরেছে নিশ্চয়, হৃদয়ে আনন্দ পেয়েছেন নিশ্চয়—না হলে তাঁরা এভাবে এসব করেন কেন?

বিদেশী ভক্তেরাও আমাদের মতো বিজয়ার কোলাকুলি, প্রণাম, ভালবাসা চিঠির মাধ্যমে একে অপরকে জানান। আমেরিকার জয়ন্তী (ভারতীয় নাম) বিজয়ার চিঠিতে লিখেছেন ঃ "মা আপনাকে আনন্দে রেখেছেন বিশ্বাস করি। তিনি সর্বদা আমায় আশার মধ্যে রাখেন। মা তাঁর এই কন্যার (জয়ন্তীর) প্রতি সর্বদা সদয়া। কে জানে কতদিন তিনি এমনিভাবে রাখবেন! আমি ভাল আছি এবং নিশ্চিন্ত। মাকে ছাড়া সন্তান আর কী চায়! আনন্দময়ী মায়ের মঙ্গলময় হস্ত যেন সর্বদা অনুভব করি। সর্বশক্তিময়ী মা তাঁর কাজের জন্য আমাদের শক্তি দিন।"[১৯] জন্মসূত্রে ইংরেজ, বর্তমানে ইংল্যান্ডের বেদান্ত কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত স্বামী ত্রিপুরানন্দ বিজয়ার চিঠিতে লিখেছেন ঃ "জগতের ব্যস্ত হাটে বিক্রি করেছি আমার দেহ। আর সেইসঙ্গে কিনে এনেছি আমি শ্রীদুর্গার নাম।"[২০]

এ অনুভব শুধু জয়ন্তী বা স্বামী ত্রিপুরানন্দের নয়, অনেক বিদেশী ভক্তেরও। মনে রাখা প্রয়োজন, পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রচারের মূল হোতা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর চার গুরুভাই। পরবর্তী কালে বিদেশে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী প্রচারকবৃন্দ সেই বার্তাই বহন করে চলেছেন। □

১৮ With the Swamis in America and India—Swami Atulananda (Ed. Pravrajika Brahmaprana), Advaita Ashrama, Calcutta, 1988, p. 123

১৯ বেলুড় মঠে এক প্রাচীন সন্ন্যাসীকে লেখা জয়ন্তীর চিঠির তারিখ—'বিজয়া ১৯৯৪'। ইংরেজীতে লেখা চিঠির শেষে আছে—"Yours in Vedanta, Jayanti."

২০ বাকিংহামশায়ারের বোর্ন এন্ড বেদান্ত কেন্দ্রের স্বামী ত্রিপুরানন্দ বিজয়ার চিঠি লিখেছিলেন বেলুড় মঠের জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসীকে। তারিখ—১০।১০।১৯৯৫।

মায়ের পূজা

■ পিনাকীরঞ্জন কর্মকার ■

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে যে মহিষাসুরমর্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভনাশিনী, রক্তবীজবিনাশিনী, চণ্ড-মুণ্ডবিঘাতিনী দেবাত্মশক্তি মহাদেবীদের কথা পাই, নামে ভিন্ন হলেও তাঁরা সকলেই এক পরমা শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেই মহাশক্তি প্রয়োজনে ভীষণা হন ঠিকই, কিন্তু আসলে তিনি কল্যাণী, শুভঙ্করী জগজ্জননী। সুপ্রাচীন কাল থেকে আমরা তাঁর ভয়ঙ্কর রূপকে যেমন পূজা করেছি, তেমনি তাঁর কল্যাণী জননী-রূপকেও প্রাণভরে আস্বাদ করেছি। বস্তুতঃ, তাঁর জননী-রূপই আমাদের আকর্ষণ করেছে সর্বাধিক। সেকথাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আলোচনা করেছেন পিনাকীরঞ্জন কর্মকার।

"শক্" ধাতু "ক্তিন্" প্রত্যয়যোগে 'শক্তি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ এই যে, আমাদের কায়িক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ কার্য করতে ও জীবনের সমস্ত প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করতে যা আমাদের সক্ষম করে তাকেই বলে 'শক্তি'। এই শক্তি অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী। এই শক্তি কখনো অব্যক্ত, কখনো ব্যক্ত। অব্যক্ত অবস্থায় তা নিজের সমস্ত ক্রিয়াকে আবদ্ধ রাখে। ব্যক্তাবস্থায় জীবজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করে। এই শক্তি সমগ্র জীবজগতের উৎপত্তির হেতু। এইজন্যই শক্তিকে 'জগজ্জননী' বলা হয়। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতে' বলা হচ্ছে ঃ

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥"

(১১।৫)

ইনিই আমাদের সকল কল্যাণ ও শক্তির উৎস। জগজ্জননীরূপা এই শক্তি উপাসনার দ্বারা প্রসন্না হলে মানুষ বা সাধক শক্তি ও মুক্তির অধিকারী হয়। সাধকের হৃদয়মধ্যে জাগ্রত জগজ্জননীর দিব্য তেজই মৃন্ময়ী প্রতিমাতে প্রাণসঞ্চার করে। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে আছে, দেবতাদের সমবেত আবাহনে দুর্গামূর্তিতে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। যে অসীম শক্তির বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তার সাকার রূপ দুর্গা মূর্তিতে প্রকাশিত।

সর্বভূতে সংস্থিতা যে-শক্তি—তা-ই শ্রীশ্রীদুর্গা বা মহাশক্তি। আর্যঋষিরা দেবীকে কল্পনা করেছেন সকল গুণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে—সকল শক্তির আধাররূপে। বিশ্বের শক্তির বিকাশ রূপায়িত হয়েছে দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তিতে। সৌন্দর্যের সঙ্গে ভীষণতার সংমিশ্রণ কী অপূর্বভাবেই না কল্পিত হয়েছে! বিনাশের সকল উপকরণই তাঁর হস্তে, অথচ মুখে কী মধুর হাসি এবং হস্তে সর্ব প্রাণীর প্রতি কী অভয় আশ্বাস!

অশুভ শক্তির প্রতিভূ মহিষাসুর। তার ভয়ে দেবতাগণ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। দেবতাদের উদ্ধারের জন্য হলো দশপ্রহরণধারিণী শ্রীশ্রীদুর্গার আবির্ভাব। সকল দেবতার শক্তি ও তেজ সংহত হয়ে দেবীর সৃষ্টি হলো। মহাদেবের তেজ থেকে মুখ, বিষ্ণুর তেজ থেকে বাহু, ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, অগ্নির তেজ থেকে ত্রিনয়ন, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয়, যমের তেজে কৃষ্ণকেশদাম। অন্যান্য দেবতার তেজ থেকে জঙ্ঘা, উরু প্রভৃতি দেবীর সকল অঙ্গ নির্মিত হলো। সকল দেবতা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে দেবীমূর্তিকে সৃজন করলেন। সকল দেবতার সর্বশক্তি-সমন্বিতা দেবী অসুর নাশ করে দেবতাদের রক্ষা করলেন। আসলে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের সংগ্রাম পাপের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম। ঐশ্বরিক শুভশক্তির কাছে অসুরদের অশুভশক্তি পরাজিত হয়েছিল। প্রকৃতির যাবতীয় শক্তির মূলে একই শক্তির বিচিত্র লীলাখেলা। পুরাণের মতে, নারায়ণের শক্তি ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী এবং বাগ্‌দেবী সরস্বতী। ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী।

শঙ্করের শক্তি দুর্গা বা কালী। এই মহাশক্তির প্রভাবেই ধ্বংসের ভৈরবলীলা চলে। আবার এই প্রলয়াগ্নির ওপর ঐ মহাশক্তির প্রভাবেই গড়ে ওঠে নতুন সৃষ্টি—বিশ্বের অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হয় মহাশক্তির মাতৃ-মাধুরী রস। এই রসধারায় সিক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নবজীবনের ঐশ্বর্য।

দেবীর বামে বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, দক্ষিণে অন্ন ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। একপার্শ্বে বীর্যের দেবতা কার্তিকেয় এবং অন্য পার্শ্বে কর্ম ও সিদ্ধিদাতা গণেশ। পৌরুষ ও বীর্যের প্রতীক পশুরাজ সিংহ দেবীর বাহন। দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা অসুরনাশিনী দশভুজারূপে।

দেবীর পূজা সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা খুব জনপ্রিয় বঙ্গদেশে। রাবণের অত্যাচারে ত্রিভুবন কম্পিত। রাবণের বিনাশহেতু রামচন্দ্র দেবীর আরাধনা করেন শরৎকালে—'অকালে'। শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজাই 'অকালবোধন' নামে বিখ্যাত। দেবীর আরাধনা সর্বপ্রথম রাজা সুরথ করেছিলেন—বসন্তকালে। সেই পূজা 'কালের পূজা' —বাসন্তীপূজা নামে খ্যাত। রামচন্দ্রের মহাশক্তির আরাধনা 'অকালবোধন' থেকেই নাকি শরৎকালে শারদীয়া পূজার প্রচলন। দেবীর বোধনমন্ত্রে বলা হয়েছে ঃ

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।

—রাবণকে বধের জন্য এবং রামকে অনুগ্রহ করার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন করেছিলেন।

শরৎকালে প্রকৃতি থাকে অপরূপ সাজে সজ্জিতা। সোনালী রোদের জোয়ার ঢেউ খেলে যায়। নির্মল নীলাকাশ। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের শোভা দিকে দিকে আনন্দের হিল্লোল এনে দেয়। তাই দেবীর আরাধনায় নবপত্রিকা-পূজাও এক বিশেষ অঙ্গ। এই নবপত্রিকা নয়টি গাছের উপকরণ-সমন্বিত ঃ কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, বেল, অশোক, জয়ন্তী ও মানকচু। নতুন লালপাড় শাড়ি দ্বারা নবপত্রিকাকে সজ্জিত করা হয়। নবপত্রিকা মাতা বসুন্ধরার প্রতীক। নবপত্রিকার সাধারণ পরিচয় 'কলাবউ' নামে। গণেশের পাশেই তাঁকে রাখা হয় বলে অজ্ঞতাবশতঃ অনেকে তাঁকে 'গণেশের বউ' বলে থাকে। আসলে নবপত্রিকা দেবী দুর্গারই প্রতীক। সুতরাং তিনি গণেশের জননী।

বাংলার শক্তিপূজা বা দুর্গাপূজা তার নিজস্ব। তাই আমরা দেবী দুর্গাকে বাড়ির কন্যাস্বরূপ মনে করি। তিনি থাকেন কৈলাসে তাঁর পতিগৃহে। দুর্গা (উমা) গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা। তিনি বৎসরান্তে মাত্র একবার তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে আসেন। বাকি সময় তিনি স্বামিগৃহেই থাকেন। মেয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় মা মেনকা অপেক্ষা করেন, তাঁর আদরের উমা কখন তাঁর গৃহে পুত্রকন্যাসহ পদার্পণ করবেন। সংবৎসর ধরে তাঁর উমার পথ চেয়ে তিনি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করেন। হৃদয়ের প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে ভক্তরাও বেঁধে রাখতে চায় মাকে। তিনদিন মহানন্দে পার হয়ে যায়। কিন্তু মিলনের আনন্দ যে অচিরেই স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায়। চতুর্থ দিনে আসে বিজয়ার লগ্ন। উমা চলে যাবেন স্বামী শিবের আবাসে। বিরহের করুণ সুর বাংলার ঘরে ঘরে বেজে ওঠে। বাংলার ঘরে ঘরে এ যেন কন্যার স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের ক্ষণ। দেবী প্রতিমাকে যখন বিসর্জন দেওয়া হয় তখন মেয়েরা কাতর অশ্রুজলে বিদায় দেয় তাঁকে—যেমন করে মা তাঁর কন্যাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে থাকেন।

বাৎসল্য রসের ভিতর দিয়ে এ কিন্তু শক্তিরই সাধনা। বিশ্বমাতৃত্বের অনাদি স্নিগ্ধরসমূর্তির অভিব্যক্তি ধরা পড়ে বাঙালীর পূজায়। এই পূজা রূপের মাধ্যমে অরূপের পূজা। তাই এই পূজা ভাব ও রসের দিক দিয়ে এত অনুপম, এত স্নিগ্ধ, এত মাধুর্যময়।

দুর্গাপূজা বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, বৃদ্ধ-শিশু, পুরুষ-নারী—সকলেই এই পূজায় এক অভূতপূর্ব চেতনায় এবং উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। অভাব-অনটন, ব্যর্থতা-অক্ষমতা, শোক-দুঃখ সবকিছুকে ঝেড়ে ফেলে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। পূজার তিনদিনের আনন্দ-উৎসাহ চতুর্থ দিনে ম্লান হয়ে আসে, কিন্তু সেই ম্লান হয়ে যাওয়ার মুহূর্তকে তারা 'বিজয়া'র শুভলগ্নে রূপান্তরিত করে এক অপূর্ব কৌশলে। শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সব ভেদ মুছে গিয়ে মিলনের এক অপূর্ব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পরস্পরকে স্নেহে, প্রেমে, শ্রদ্ধায় আবদ্ধ করে।

সুতরাং দুর্গাপূজা একটি সাধারণ পূজা নয়। দুর্গাপূজা বাঙালীর মহাপূজা। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দুর্গা জগজ্জননী। এ পূজা আমাদের মায়ের পূজা।□

দেবী-আরাধনা ও সুভাষচন্দ্র

প্রণবেশ চক্রবর্তী

ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের চিরস্মরণীয় নায়ক সুভাষচন্দ্র ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস মূলতঃ আবর্তিত হয়েছিল সগুণ ও সাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে। ঈশ্বরের নানা রূপের মধ্যে তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত কালী বা দুর্গার মূর্তি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন মূলতঃ শক্তির উপাসক। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্রের কারাগারে দুর্গাপূজার কথা এযুগের অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত। সেই কাহিনী এবং একটি সরস্বতী-পূজাকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ একসময় সারা বঙ্গদেশে ব্যাপক আলোচনার বিষয় হয়েছিল। ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চকর পর্বকে অতীতের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনেছেন বিখ্যাত সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী।

ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেল। ইংরেজের চোখে "মারাত্মক বিপজ্জনক" সুভাষচন্দ্র বসুকে সেই জেলে এনে রাখল শঙ্কিত ব্রিটিশরাজ। সুভাষের সঙ্গে এসেছেন আরও কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী, বন্দি হয়ে এসেছেন 'মহারাজ'। বীরবিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী—সবাই জানে তাঁকে 'মহারাজ' নামে। কথায় কথায় একদিন মহারাজ সুভাষকে বললেন ঃ "আপনি কত বড় ঘরের ছেলে, কত সুখেই না বাড়িতে দিন কাটিয়েছেন, জেলের এত কষ্ট সহ্য করছেন কিভাবে?" সৌম্যদর্শন সুভাষচন্দ্রের মুখে প্রসন্ন হাসি। বললেন ঃ "আপনারা যেভাবে সহ্য করছেন, আমারও সেই এক ভাব। আমরা যে সবাই দেশের জন্য 'বলিপ্রদত্ত'।

জেলের এক প্রকোষ্ঠে সুভাষ তৈরি করেছেন তাঁর ঠাকুরঘর। সেখানে ধ্যানাসনে বসে তিনি পূর্ণ করে তুলছেন তাঁর প্রাণশক্তির আধার। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল অক্টোবর মাস। ১৯২৫ সাল। সামনেই দুর্গাপূজা। মহাশক্তির পূজা। একদিন সুভাষচন্দ্র তাঁর সহবন্দিদের বললেন ঃ "দেশকে স্বাধীন করার জন্য আজ মহাশক্তির আরাধনা চাই। আসুন, আমরা এবার অসুরদলনী দেবী দুর্গার পূজা করি।" অন্যান্য বন্দিরা অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন সুভাষের দিব্য মুখমণ্ডলের দিকে। সুভাষ জোর দিয়ে বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমরা পূজা করব এখানেই। এই জেলের মধ্যেই।"

১৯০১ সালে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। সেদিন তিনিও পরাধীন ভারতের মহাশক্তির বোধন ঘটিয়ে অসুরবিনাশের সঙ্কল্প করেছিলেন। তাঁরই একান্ত অনুগামী ও ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র সেদিন মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজার উদ্যোগ গ্রহণ করে স্বামীজীর সঙ্কল্পকেই যেন পূর্ণঘোষণা করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিতনয়, "চরৈবেতি" মন্ত্রের সাধক সুভাষচন্দ্র "লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত" থামতে জানেন না। এক্ষেত্রেও তাই হলো। বন্দিদের উদ্যোগ ও আয়োজনে মান্দালয় জেলের অভ্যন্তরে শুরু হলো দেবীপূজা। মাতৃপূজা। শক্তিপূজা। সুভাষের সঙ্গে এই পূজাকে কেন্দ্র করে মেতে উঠলেন জেলের সমস্ত কয়েদি।

মান্দালয় জেলের এই দুর্গাপূজার বিবরণ দিয়ে দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবীকে (মাত্র কিছুদিন আগেই দেশবন্ধু দেহত্যাগ করেছেন) এক পত্র লিখলেন সুভাষ। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে, নির্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটিবে জানি না। তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে দেখা দিয়ে যান, তবে—কারাবাস দুর্বিষহ হইবে না ভরসা করি।" (সুভাষস্মৃতি, সাহিত্যম্, পৃঃ ১৭৯-১৮০)

মান্দালয় জেলে সেইসময় (১৯২৫) দুর্গাপূজা করতে রাজবন্দিদের খরচ হয়েছিল মোট আটশ টাকা। কিন্তু এত টাকা সুদূর মান্দালয় জেলে আটক বন্দিরা পেলেন কোথা থেকে? নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তাঁরা মোট ১৪০ টাকা

সংগ্রহ করতে পারলেন। বাকি ৬৬০ টাকার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে পূজা-অনুদান দাবি করলেন। মান্দালয় জেল কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ঐ টাকা অগ্রিম হিসেবে মঞ্জুর করেন। অর্থাৎ জেল কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন, টাকাটা সরকার মঞ্জুর করেই দেবেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট : খ্রীস্টান বন্দিদের জেলখানায় অবাধ ধর্মাচরণে কোন বিধিনিষেধ নেই, হিন্দু বন্দিরাই বা সে-সুযোগ পাবে না কেন? জেলসুপার মেজর ফিন্ডলে ছিলেন এব্যাপারে বন্দিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই তিনি টাকাটা অনুমোদনের প্রত্যাশা নিয়েই সরকারের কাছে বন্দিদের আবেদন পাঠালেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মেজর ফিন্ডলের অনুমান মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। ব্রিটিশ সরকার সেই আবেদনকে নাকচ করে ফিরিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ সরকার এক কঠোর নির্দেশ দিয়ে বলল, ঐ ৬৬০ টাকা রাজবন্দিদের ভাতা থেকে কেটে সরকারি তহবিলে ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ, জেল কর্তৃপক্ষ আগাম যে-টাকাটা মঞ্জুর করেছিল, সেই টাকাটা এখন কয়েদি-দেরই প্রাপ্য টাকা থেকে কেটে নেওয়া হবে। (সুভাষচন্দ্র—পবিত্রকুমার ঘোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৯-১৯১)

এই সংবাদে রাজবন্দিদের ক্ষোভ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। আপসহীন সুভাষচন্দ্র এই অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। মান্দালয় জেলের অভ্যন্তরে সেদিন একটি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে যে বিক্ষোভ-বহ্নি দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল, তার পরিণাম জানার আগে আমরা একবার ঘটনার প্রেক্ষাপটটি স্মরণ করে নিতে পারি।

॥ ২ ॥

১৯২১ সাল। সে-বছর বড়দিনের সময় ইংল্যান্ডের যুবরাজ কলকাতায় এলেন। তাঁর এই আগমন-বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো : ভারত পরিদর্শনে যুবরাজ যখন আসবেন, তখন তাঁকে কোনরকম সম্বর্ধনা জানানো হবে না। কলকাতায় তাঁকে বয়কট করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন দেশের তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্র। ঠিক এই সময়েই (ডিসেম্বর ১৯২১) ব্রিটিশ সরকার সংশোধিত ফৌজদারি আইন জারি করল। অর্থাৎ বিনা বিচারে দমন-পীড়ন করার মধ্যযুগীয় পন্থাটাই ইংরেজরা গ্রহণ করল এবং স্বদেশীদের ওপর সরকারি দমননীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনি ঘোষিত হলো। স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত সাধারণ মানুষের মনোবলকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্রকে সংশোধিত ফৌজদারি আইনেই গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তার করল অনেক কংগ্রেস-কর্মীকেও।

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের ছয়মাস জেল হয়। সুভাষচন্দ্রের সেই প্রথম কারাদণ্ড। 'অভীঃ' মন্ত্রের উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন : "এস আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর জেনেই আলিঙ্গন করি,... দুঃখকে দুঃখের জন্যই বরণ করি।" স্বামীজীর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্রও তাঁর গুরুর আদর্শে ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর জেনেই আলিঙ্গন করলেন, দুঃখকে দুঃখ জেনেই করলেন বরণ।

পরবর্তী ইতিহাসের গতি ছিল দুরন্ত। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং আইনসভায় প্রবেশ করার প্রশ্নে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দেখা দিল মতভেদ। তিনি গঠন করলেন 'স্বরাজ্য দল'। মতিলাল নেহরু এই নতুন দলের সভাপতি হলেন। তারপরই বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে স্বরাজ্য দল আশাতীতভাবে জয়লাভ করল। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল কলকাতা পৌরসভা দখল করল। দেশবন্ধু কলকাতা পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন এবং চিফ এক্সিকিউটিভ নিযুক্ত হলেন সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রকে জেলের বাইরে রেখে বিদেশী শাসকরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। ফলে ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের সূত্র ধরে অন্যান্য কংগ্রেস-কর্মীদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হলো সুভাষচন্দ্রকে। তাঁকে রাখা হলো আলিপুর জেলে।

এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সেদিন সারা বাংলাদেশ এবং সারা ভারতবর্ষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। ১ নভেম্বর (১৯২৪) শনিবার সারা বাংলায় পালিত হলো সর্বাত্মক হরতাল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও সুভাষের গ্রেপ্তার নিয়ে ঝড় উঠল। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বহরমপুর জেলে। সেখান থেকে জানুয়ারি (১৯২৫) মাসের শেষদিকে তাঁকে আনা হয়েছিল মান্দালয়ের পথে কলকাতায়। কলকাতা থেকে চারদিন সমুদ্রযাত্রার পরে বার্মা বা ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মায়ানমারের) রাজধানী রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গনে) পৌঁছেছিল তাঁর জাহাজ। সেখান থেকে মান্দালয়—ঠিক ২০ ঘণ্টার পথ। মান্দালয় জেলে বসেই সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন দেশবন্ধুর আকস্মিক দেহত্যাগের দুঃসংবাদ।

॥ ৩ ॥

ইরাবতী নদী মায়ানমারকে দুটি ভাগে ভাগ করে রেখেছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকাতেই রচিত হয়েছে পাঁচ হাজার বছরের এক প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসক এই পর্বতঘেরা দেশটিকে ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করার পর ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি সেকালের বার্মাকে ব্রিটিশ-ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত করে। তখন কলকাতা ছিল ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী। বর্মীরা এই ব্যবস্থাকে কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা দীর্ঘদিন আন্দোলন করে ১৯৩৭ সালে নিজেদের দেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীন স্বতন্ত্র একটি দেশরূপে নিজেদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামপ্রধান ব্রহ্মদেশে সামান্য কয়েকটি বড় শহরের মধ্যে রাজধানী রেঙ্গুন বা বর্তমান ইয়াঙ্গন সবথেকে বড় এবং মান্দালয় দ্বিতীয়। ইরাবতীর তীরে অবস্থিত মান্দালয় শহরটি ছিল বার্মার শেষ স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। দেশের সকল প্রান্তের সঙ্গে বিমান, রেল, সড়ক ও নদীপথে যুক্ত থাকার ফলে বৌদ্ধপ্রধান এই শহরটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

ইংরেজরা তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক বিপ্লবীদের ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে, বহুদূরে মান্দালয় বা রেঙ্গুনের জেলখানায় এনে আটক করে রাখত। ১৯৩৭ সালের আগে পর্যন্ত অর্থাৎ বার্মা যতদিন ভারতের অঙ্গীভূত ছিল ততদিন এভাবেই রাজনৈতিক বন্দিদের বিচ্ছিন্ন করার পন্থা ব্রিটিশরাজ অনুসরণ করত।

মান্দালয় জেলে ছয়বছর বন্দিজীবন যাপন করে গেছেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। এখানেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর গীতাভাষ্য। লালা লাজপত রায়ও এক বছরের জন্য বন্দি ছিলেন এখানে। একটা দুর্গের ভিতর ছিল কারাগারটি। মান্দালয় স্টেশন থেকে একটা গাড়িতে করে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়া হলো কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি এই কারাগারে। তাঁর মহান পূর্বসূরীদের স্মৃতিপূত এই কারাগারে এসে আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের মন।

এই কারাগারেই মাতৃপূজার অধিকার অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্র শুরু করলেন এক আপসহীন সংগ্রাম। সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন, সরকারি নির্দেশ অনুসারে তাঁরা টাকা ফেরত দেবেন না। বন্দিরা তাঁদের দাবিপত্রে বললেন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ইউরোপীয় কয়েদিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য সরকার বছরে ১২০০ টাকা দেয়। বাংলার অন্যান্য জেলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাবদ সরকার টাকা মঞ্জুর করে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা 'ইন্ডিয়ান জেল কমিটি রিপোর্ট ঃ ১৯১৯-১৯২০', তৃতীয় খণ্ড, ৭৪৪ পৃষ্ঠার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

১৯২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বার্মা সরকারের মুখ্যসচিবের কাছে প্রদত্ত দাবিপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাছাড়া ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এর আগে ১৬ জানুয়ারি মুখ্যসচিবকে সুভাষচন্দ্র একটি পত্র দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই দাবিপত্রকে ব্রিটিশ সরকার উপেক্ষা করল। অর্থাৎ হিন্দু-কয়েদিদের স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারকে মেনে নেওয়ার মতো কোন সদিচ্ছাই ব্রিটিশ সরকার দেখাল না। তারপরই অকস্মাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি খবর বেরোয়, মান্দালয় জেলে রাজবন্দিরা অনশন শুরু করেছেন। নিজেদের ধর্মপালনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই এই অনশন।

শুধু দুর্গাপূজাই নয়, মান্দালয় জেলের রাজবন্দিরা জেলের মধ্যে সরস্বতীপূজাও করেছিলেন। সেজন্যও তাঁরা সরকারের কাছে ৬০ টাকা দাবি করলেন। রাজবন্দিরা স্পষ্ট করেই ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দেন যে, বছরে তাঁরা তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই পালন করবেন। এই তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলো—দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা এবং দোল-উৎসব। এই তিনটি উৎসব পালনের জন্যই সরকারকে টাকা দিতে হবে বলে বন্দিরা দাবি করেন।

মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র অনশন করছেন—এই সংবাদ তড়িৎগতিতে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সবার প্রিয় সুভাষের জন্য দিকে দিকে জ্বলে উঠতে থাকে প্রতিবাদের আগুন। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। একটানা পনের দিন পরে সুভাষ ও তাঁর সহযাত্রীরা অনশন ভঙ্গ করলেন। সুভাষ এক চিঠিতে অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখলেন ঃ "আমাদের অনশনব্রত একেবারে বিফল হয়নি। গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এরপর বাংলাদেশের রাজবন্দিরা পূজার খরচ বাবদ বছরে তিরিশ টাকা 'অ্যালাওয়্যান্স' পাবে... যে প্রিন্সিপল গভর্নমেন্ট এতদিন স্বীকার করতে চায়নি, তা যে এখন মেনে নিয়েছে এই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ।"

॥ ৪ ॥

মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র সরস্বতীপূজা করার

অধিকারও আদায় করেছিলেন। আরেকটি সরস্বতী-পূজাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক বিতর্কের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সেই বিতর্কের একদিকে ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং অন্যদিকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

ঘটনাটা ১৯২৮ সালের। সে-বছর কলকাতার সিটি কলেজের রামমোহন হোস্টেলের ছাত্ররা বরাবরের প্রথা ভেঙে হোস্টেলের মধ্যেই সরস্বতীপূজার আয়োজন করেছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে, সিটি কলেজটি যেহেতু ব্রাহ্মসমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত, সেই হেতু মূর্তিপূজাবিরোধী ব্রাহ্ম কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে সিটি কলেজের ছাত্ররা যেমন কলেজে সরস্বতীপূজা করতে পারত না, তেমনি সরস্বতীপূজা করতে পারত না কলেজের হোস্টেলেও। সে-বছর রামমোহন হোস্টেলে একজন মাত্র ব্রাহ্ম ছাত্র ছিল, বাকি সকলেই ছিল হিন্দু। হিন্দু ছাত্ররাই সরস্বতীপূজা করতে উদ্যোগী হয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ জোর করে সেই পূজা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। কারণ, কলেজ কর্তৃপক্ষ এই পূজাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের সামিল বলে মনে করেন। আর সেইজন্যই কয়েকজন ছাত্রকে আর্থিক জরিমানা করেন। কর্তৃপক্ষের মতে, রামমোহন হোস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতীপূজা করার অধিকার নেই।

এরই ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিল প্রচণ্ড সংঘাত এবং সেই সময়কার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে এই সংঘাত থেকেই জন্ম নিয়েছিল এক প্রবল ছাত্র-আন্দোলন। আর সেই আন্দোলন প্রবলতর হয়ে উঠেছিল যখন সেকালের অবিসংবাদী যুবনেতা সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন।

ঘটনাটিকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমরা সেই সময়কার 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার একটি খবরের কথা স্মরণ করতে পারি। ১৯২৮ সালের ২ মার্চ ফরওয়ার্ড পত্রিকায় 'সিটি কলেজ স্ক্যান্ডাল' শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হয়। খবরে দেওয়া হয়েছিল ১ মার্চ কলকাতার অ্যালবার্ট হল-এ (বর্তমানে 'কফি হাউস') অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদসভার বিস্তৃত বিবরণ। খবরের মূল বিষয় হলো ঃ সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু সংখ্যক ছাত্রের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তারই প্রতিবাদে ১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রধানতঃ ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই খবরে সরস্বতীপূজার ব্যাপারে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের মনোভাবকে "হাস্যকর ধর্মীয় অন্ধত্ব" বলে উল্লেখ করা হয়।

'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রতিবাদসভার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐ সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী অভেদানন্দ। উক্ত সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখতেও পারেননি। কর্তৃপক্ষ যেভাবে হিন্দু ছাত্রদের জরিমানা করেছেন, তার নিন্দা করে অবিলম্বে জরিমানা তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

ঐ সভায় সুভাষচন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ "সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদের ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করে যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তারই ফলে সিটি কলেজের ক্ষুব্ধ ছাত্রদের বর্তমান আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতি আমার উষ্ণ ও অকুণ্ঠ সমর্থন আছে।" (সুভাষ রচনাবলী, ১ম পর্ব) সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জী। তিনি বলেন, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদের স্বাধীনভাবে উপাসনা করার অধিকার হরণ করতে পারেন না।

তারপরই ছাত্ররা ধর্মঘট করেছিল, কলকাতা হয়ে উঠেছিল অস্থির। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি ঘোষণা করে ছাত্রদের হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি এমন ভয়ও দেখালেন যে, তাঁর নির্দেশ না মানলে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসাই বন্ধ করে দেবেন। (সুভাষচন্দ্র—পবিত্রকুমার ঘোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮)

ছাত্র আন্দোলন যতই তীব্র হয়ে উঠুক না কেন, তবু সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন সরস্বতীপূজার ব্যাপারে একটা সম্মানজনক মীমাংসা। তাই ১৯২৮ সালের ১৮ মে এক ভাষণে তিনি খোলাখুলি বললেন ঃ "সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের মধ্যে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে দেখে আমি সুখী হয়েছি।... পৌত্তলিক হিন্দুই হোক আর ব্রাহ্মই হোক—কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়। আমি বরং জোর দিয়েই বলতে চাই, উপাসনার অধিকার উভয়কেই দেওয়া হোক।... আমি ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের একটা অংশ বলে মনে করি।... এখন একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে যে, ব্রাহ্মরা তাঁদের ব্রাহ্ম-হিন্দু বলে পরিচয় দেন। বিখ্যাত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকেরা হিন্দু মহাসভায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।" (সুভাষ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৬)

পরিস্থিতিটা হয়তো আস্তে আস্তে সহজ হয়ে যেত, কিন্তু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মতো গোঁড়া ব্রাহ্মদের চাপে 'ব্রাহ্ম' রবীন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ায় গোটা বিষয়টি ব্যাপক ও জটিলতর হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ কেন ঐ সরস্বতীপূজার ব্যাপারে লেখনী ধারণ করলেন—এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যের মধ্যে। প্রভাতকুমার লিখেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম নন, একথা সহস্রবার বলিলেও তাঁহার অন্তরে অন্তরে যে ব্রাহ্ম সাধনা রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১)

এই সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "এই ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সত্যাগ্রহ, অনাহার প্রভৃতি রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছাত্ররা শহরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী লোকের অভাব নেই, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদের পক্ষ লইয়া বিষয়টাকে জটিল ও কদাকার করিয়া তুলিলেন। কোন কোন রাজনৈতিক নেতাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন মাইনরিটির ধর্মাধি-কারের বুলি তুলিয়া। ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষও সর্বদা যে সুবিবেচনার পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। হিন্দু-সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের উদারতার অভাবকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।" (ঐ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১)

বিষয়টিকে অধিকতর জটিল করে তুলল 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার মে ১৯২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ। কবিগুরুর প্রবন্ধটি ছিল দীর্ঘ এবং আক্রমণাত্মক। তিনি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখলেন ঃ "ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, তবে সে-স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হোস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা পাইবে, এমন তো নহে, মুসলমান ছাত্ররাও পাইবে। মুসলমানের পক্ষে গো-কোরবানি ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং কর্তৃপক্ষ হোস্টেলে তাহাদের তাহাও করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলে না, একটা প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলিকে ভাঙিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্ম প্রতিমাপূজক নহেন, একথা প্রত্যেক ছাত্রই জানে। কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৮১) পঞ্চাশ বৎসর পরে হঠাৎ সেখানে প্রতিমাপূজা করিবার জন্য জিদ অশোভন।"

ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এরকম মতামত আশা করেনি। তাঁর প্রবন্ধটি ছাত্র আন্দোলনের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে যেন ঘৃতাহুতির কাজ করল। এর অনিবার্য পরিণামে ব্যাপারটা তখন আর ছাত্র বা কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল আক্রমণ আর পাল্টা আক্রমণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

১৯ জুন ১৯২৮। অ্যালবার্ট হল-এ আয়োজিত হলো আবার প্রতিবাদসভা। এই সভায় সুভাষচন্দ্র দৃপ্তকণ্ঠে বললেন ঃ "রবিবাবু (রবীন্দ্রনাথ)... এব্যাপারে এসে পড়েছেন দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিরপেক্ষ থাকাই সঙ্গত ছিল। কিছুদিন পূর্বে যখন আমরা তাঁকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছিলাম, তখন তিনি অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এখন কেন এই ব্যাপারে তাঁকে ডাকা হলো এবং কেনই বা তিনি এলেন, বুঝি না। তাঁর প্রবন্ধে তিনি সিটি কলেজের ব্যাপার সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন এনেছেন। ধৃষ্টতা হলেও বলব, তাঁর এই যুক্তি অসার। সিটি কলেজের ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা ঠিক শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের ন্যায়। আরেকটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেখানে এতদিন ছাত্ররা এই পূজা করেনি, সেখানে এবার কেন এত জোরের সঙ্গে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে? তবে কি দেড়শ বছর পরাধীন থাকার জন্য আমাদের এখনো স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েই থাকতে হবে?"

এই প্রতিবাদসভায় মূর্তিপূজার পক্ষে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমরা মূর্তির মধ্যে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি। সসীমের মধ্যে অসীমকে আরোপ করে আমরা পূজা করি। কাজেই বিরোধের কিছুই নেই। হিন্দুরা মূর্তিপূজা করলে তাতে ব্রাহ্মদের ধর্মমত কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ যে পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে বললেন ঃ " 'সহিষ্ণুতা'র অর্থ এই নয় যে, নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুযায়ী ধর্মপালন করতে পারলে সেটাই প্রকৃত সহিষ্ণুতা। আমার মতে, ছাত্রদের পূজা করতে না দিয়ে ব্রাহ্মরাই বেশি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন।"

একদিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ছাত্রসমাজ এবং সুভাষচন্দ্র। সুতরাং সরস্বতীপূজাকে কেন্দ্র করে বিরোধের ক্ষেত্রটি হলো বিস্তৃততর। কেউ কেউ সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখিয়ে এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পেলেন, কেউ কেউ ছাত্রদের দমন করার জন্য বিদেশী

শাসকদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হলেন, আবার কেউ কেউ সুভাষচন্দ্রকে নরম করার জন্য সোজা গিয়ে দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবীর শরণাপন্ন হলেন।

সুভাষচন্দ্র এই বিরোধের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বললেন ঃ "কংগ্রেস এব্যাপারে কোন সাহায্য করেনি, আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের সাহায্য করেছি।... সরকার ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দু কয়েদিদের (সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের ফলেই) জেলখানায় পূজা করার যে-অধিকার দান করেছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ সে-অধিকার দিতে অস্বীকার করেছেন।... বর্তমান বিরোধের সাথে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই। এটা পারিবারিক কলহ।... দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ মীমাংসার সোজা পথে যাননি।" (সুভাষ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮-২৩০)

শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে নরম করার জন্য এব্যাপারে বাসন্তী দেবীকেও টেনে আনা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচার চালাতেও ব্রাহ্মসমাজ কুণ্ঠা বোধ করেনি। এই বিরোধের জের দীর্ঘকাল ধরে চলে। তারপরই, সিটি কলেজের দরজা সুভাষচন্দ্রের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

এই ঘটনার দশ বছর পরে এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে জয়ী হয়ে সুভাষচন্দ্র যখন "দেশের রাষ্ট্রপতি" (কংগ্রেস সভাপতি) নির্বাচিত হলেন তখন সুভাষ-সমর্থক সমগ্র দেশের প্রবল জনতরঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষও ছাত্রদের প্রবল চাপে মত ও পথ বদল করে তাঁকে কলেজে সম্বর্ধনা জানাতে আমন্ত্রণ জানান। তবে সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কাছে যেমন ভারতবর্ষ শুধুমাত্র মৃন্ময়ী মাতৃভূমি ছিল না—ছিল তাঁর আরাধ্যা দেবী, তেমনি তাঁর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্রের কাছেও ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক ভূখণ্ড মাত্র ছিল না—ছিল দেবভূমি। ভারতপথিক নেতাজী ছিলেন যথার্থই এক আধ্যাত্মিক তীর্থপথিক। আর মাতৃসাধনা ও মাতৃ-আরাধনা ছিল তাঁর পরম প্রিয়। "একটি জপের মালা ও একখানি পকেট-গীতা ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে প্রতিদিনই কিছুক্ষণ তিনি গীতা ও চণ্ডী পাঠ করতেন। হিন্দু পূজা-অর্চনাতেও তাঁর খুব নিষ্ঠা ছিল।... জেলে তিনি রোজ কালীর ধ্যান করতেন।... ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি জেলেও তিনি দুর্গাপূজা করেছিলেন। তাছাড়া জেলের মধ্যে নিত্য পূজা, পাঠ, জপধ্যানাদি তো ছিলই। বিশ্বাসী হিন্দুর মতো সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপবিশেষ।... সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, '...একটি পত্রে ও আমাকে লিখেছিল যে, ওকে টানত কখনো কালী, কখনো কৃষ্ণ, কখনো শিব।'" (চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৮৯৫-৮৯৬—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রবন্ধ 'যুগনায়ক ও দেশনায়ক')

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার যুবশক্তিকে উদ্দীপিত করার জন্যই নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেবী দুর্গার আরাধনাকে দেশজননীর আরাধনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, সর্বজনীন দুর্গাপূজার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে। লোকমান্য তিলক যেমন গণপতি উৎসবকে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রও তেমনি দুর্গোৎসবের মাধ্যমে যুবশক্তিকে স্বদেশমন্ত্রের দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে 'যুগান্তর' দলের নেতা অতীন্দ্রনাথ বসু উত্তর কলকাতায় সিমলা ব্যায়াম সমিতির দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন। মহাষ্টমীর দিন এখানে বিরাট অন্নকূট উৎসব হতো। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অন্নকূট উৎসবে প্রসাদ পেতে এখানে আসতেন সুভাষচন্দ্র। ফলে ইংরেজ শাসকরা এই পূজাকে নিছক ধর্মীয় উৎসব বলে মেনে নিতে পারেনি। এর মধ্যে তারা বারুদের গন্ধ পেয়েছিল। তাই ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে এই পূজাকে অবৈধ বলে ইংরেজরা ঘোষণা করেছিল। বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গেও জড়িত ছিল স্বদেশী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস। নেতাজী সুভাষচন্দ্র একসময় এই পূজা কমিটির সভাপতি ছিলেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জগজ্জননী দুর্গাকেই দেশজননীর আসনে বসিয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি আমাদের জীবনমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। আর ভারতের মুক্তিসাধনার প্রধান ঋত্বিক স্বামী বিবেকানন্দ দেশজননীকে "একমাত্র আরাধ্যা" দেবী বলে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য সুভাষ তাঁর আচার্যের নির্দেশকে শিরোধার্য করে সেই "একমাত্র আরাধ্যা" দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামের বেদিমূলে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং দুর্গাপূজার মাধ্যমে সুভাষচন্দ্র যে তাঁর একমাত্র আরাধ্যা দেশজননীর পূজাই করতে চেয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।□

পার্বতীদেবীর মন্দিরে

তাপস বসু

দুর্গার একটি নাম পার্বতী। কারণ, তিনি পর্বতকন্যা। পুরাণের মতে, গিরিরাজ হিমালয় তাঁর পিতা, হিমালয়-পত্নী মেনকা তাঁর মাতা। ভারতবর্ষে দুর্গামন্দির বহু আছে, কিন্তু পার্বতীর মন্দির আছে সম্ভবতঃ একটি জায়গায়। হিমালয়ের বুকে বৈজনাথে। সেই মন্দিরের কিছু কথা এবং তার পটভূমিতে 'দুর্গা' নামের কিছু ব্যাখ্যা আমাদের শুনিয়েছেন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু।



কেদারনাথের অনুকরণে নির্মিত বৈজনাথে পার্বতীদেবীর মন্দির

ঋগ্বেদের দেবী সূক্তের দশম মহামণ্ডলে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্-এর নিজেকে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের অধিশ্বরী দেবীরূপে চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়েই আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপটি উন্মোচিত হয়ে গেছে। এই আদ্যাশক্তি মহামায়া বৈদিক সাহিত্যে পরবর্তী স্তরে নানা নামে বিভূষিতা। আরও পরবর্তী স্তরে তিনি দুর্গা, চণ্ডী, কালী,

পার্বতী নামে সবিশেষ জনপ্রিয় হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় গ্রন্থ সম্ভবতঃ 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত।

এই প্রসঙ্গে দেবীর নানা নাম ও রূপের সঙ্গে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে পরিচয় করে নিতে পারি। আমরা জানি, যিনি দেবতেজঃসম্ভবা দুর্গা, তিনিই কাত্যায়নী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিতা। দেবী চামুণ্ডা রূপে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেছেন। দুর্গা রূপে বধ করেছেন দুর্গমকে। কালী রূপে পান করেছেন রক্তবীজের রক্ত। একই আদ্যাশক্তির যেমন বিচিত্র নাম, তেমনই তাঁর বিচিত্র রূপ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী, দুর্গা, কৌশিকী, বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, ভ্রামরী প্রভৃতির বর্ণনায় দেবীর বিচিত্র নাম ও রূপের সমন্বয় ঘটেছে। আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ কেন? এই রূপবৈচিত্র্য সাধকের রুচিভেদে। হিন্দুর মাতৃদর্শনের সমন্বয়ী ভাবনার জন্যও এই বৈচিত্র্য। আমাদের 'তেত্রিশ কোটি' দেব-দেবী সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে নয়—বৈদিক তেত্রিশ জন দেব-দেবীর 'কোটি' অর্থাৎ অবস্থানকেই আমরা বুঝে থাকি। আদ্যাশক্তি মহামায়ার নানা রূপ ও নামের মধ্যেও একই সত্য বিরাজমান। বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে তিনি অভিহিতা হলেও তিনি আসলে একজনই। তিনি মহিষাসুর বধ করেছেন বলে মহিষাসুরমর্দিনী রূপে ও নামে আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিতা এবং জনপ্রিয়া। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবী চণ্ডীর এই মহিষাসুরমর্দিনী স্বরূপের মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে শরৎকালে দেবীর পূজার উল্লেখ আছে—"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।" শরৎকালে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গাপূজা আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। 'শারদোৎসব' নামেও এই উৎসব সর্বস্তরে বহুল প্রচলিত। এ উৎসব বাঙালীর একান্ত আপন উৎসব।

দুর্গা 'পার্বতী' নামেও বিশেষ পরিচিতা। 'দুর্গা' শব্দের নানা অর্থ বিদ্যমান। 'দুর্গ' শব্দের একটি অর্থ দুঃখ বা দুর্গতি; যিনি সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন তিনিই 'দুর্গা'। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হয়েছেঃ "দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।"[১]—তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগর পারের একমাত্র তরণী। "দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।"[২]—হে দুর্গে, তুমি স্মরণ মাত্রেই প্রাণিবর্গের অশেষ ভয় হরণ কর। মহাভারতে বলা হয়েছেঃ

"দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে॥
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমাং নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ॥
যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।"[৩]

—হে দুর্গে, তুমি দুর্গতি নাশ কর বলেই লোকে তোমায় 'দুর্গা' বলে স্মরণ করে। কান্তার-মধ্যে যারা অবসন্ন হয়ে পড়ে, মহাসমুদ্রে যারা মগ্ন হয়, দস্যুর দ্বারা যারা বন্দি হয়, সেই মনুষ্যগণের তুমিই পরমা গতি। জল (নদী বা সমুদ্র) পার হওয়ার সময়ে কান্তারে এবং অরণ্যে, হে মহাদেবি, যারা তোমাকে স্মরণ করে তারা কখনো বিপন্ন হয় না বা বিপদে পড়ে না।

দুর্গার একটি পরিচয়—তিনি হিমালয়-মেনকার কন্যা উমা। তাঁর অন্য নামগুলি হলো—পার্বতী, হৈমবতী ও গৌরী। হিমালয়-কন্যা বলে তাঁর একটি নাম হৈমবতী, আরেকটি নাম পার্বতী। 'গৌরী' নামটির পিছনে আছে একটি কাহিনী। পার্বতীর গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ। তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'কালী'। পরে তপস্যার মধ্য দিয়ে গৌরবর্ণ লাভ করায় তাঁর নাম হয় 'গৌরী'। অবশ্য দেবীপুরাণের মতে, পার্বতী সূর্য ও চন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি 'গৌরী' নামে প্রসিদ্ধা—"পূর্ণসূর্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।"[৪]

পার্বতী বা উমা বা হৈমবতী শিবপত্নী। তাই তিনি শিবানী। পার্বতী জন্মান্তরে ছিলেন দক্ষরাজ-কন্যা সতী। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যাগ করে সতী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'পার্বতী' নাম প্রসঙ্গে দুটি তথ্য আমরা পাচ্ছি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেঃ

"তিথিভেদে পর্বভেদে কল্পভেদে প্রভেদতঃ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্বতী তেন কীর্তিতা॥
মহোৎসববিশেষে চ পর্বয়িতি প্রকীর্তিতা।
তস্যাধিদেবী যা সা চ পার্বতী পরিকীর্তিতা॥
পর্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্বতে।
পর্বতাধিষ্ঠাত্রীদেবী পার্বতী তেন কীর্তিতা॥"[৫]

১ মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮৪।১০; ২ ঐ, ৮৪।১৬ ৩ মহাভারত, বিরাট পর্ব, ৬।২০-২২; ৪ দেবীপুরাণ, ৩৭।৭ ৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭।২৪-২৬

—তিথিভেদে পর্বভেদে কল্পভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিতা হন, সেইজন্যই তিনি পার্বতী নামে খ্যাতা। মহোৎসবের শেষাংশ পর্ব নামে পরিচিত, সেই পর্বের অধিষ্ঠাত্রী বলে দেবীকে পার্বতী বলা হয়। শেষাংশে পর্বত কন্যা এবং পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী বলে 'পার্বতী' নামে তিনি আখ্যাত হন।

॥ ২ ॥

দুর্গা বা কালী-মূর্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কিন্তু গৌরী, উমা, হৈমবতী বা পার্বতীর মূর্তির দেখা কিন্তু আমরা সাধারণতঃ পাই না। পার্বতীদেবীর মূর্তি বোধহয় একমাত্র বৈজনাথ-মন্দিরেই আছে। কষ্টিপাথরের অপূর্ব এই মূর্তিটির উচ্চতা ৫ ফুট। একটি ছোট পাথরের বেদির ওপর দেবীর দণ্ডায়মান মূর্তি। মন্দিরটি অবিকল কেদারনাথের মন্দিরের অনুকরণে তৈরি। হিমালয় থেকে সংগৃহীত পাথর দিয়েই পুরো মন্দিরটি নির্মিত। কেদারনাথের মন্দিরের তুলনায় এই মন্দিরটি অপ্রশস্ত। মন্দিরের অভ্যন্তরে এখনো কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই। দেবীর মূর্তির সামনে একটি বড়মাপের প্রদীপ আছে। তার শিখা অনির্বাণ। গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারটিও ছোট। প্রবেশের মুহূর্তে মনে হবে যেন কোন অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করছি। প্রদীপের শিখায় কষ্টিপাথরের মূর্তিটির বর্ণ উজ্জ্বল দেখায়। দেবীর মুখে স্মিত হাসি। দেবীর দিকে তাকালে চোখে যেন পলক পড়ে না। জনশ্রুতি, পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন তখন তাঁরা এই মন্দির ও দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজন এবং মন্দিরের পুরোহিতের দাবি, সারা ভারতে পার্বতীদেবীর মূর্তি ও মন্দির এই একটিই। দেবীর পূজা হয় মধ্যাহ্নে। পূজার উপচার ফল, ফুল ও শুকনো মিষ্টি। মন্দিরের সামনের চত্বরটি পাথর দিয়ে বাঁধানো এবং বেশ প্রশস্ত। এটি যে অল্পদিন আগে নির্মিত তা দেখেই বোঝা যায়। চত্বরের সামনে দিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বয়ে চলেছে গোমতী নদী। জনশ্রুতি, এই নদীতে পাণ্ডবেরা স্নান করতেন। এই নদীতে স্নান করলে নাকি পাপমুক্তি ঘটে। এই নদীর জল দিয়েই দেবীর পূজার কাজ সম্পন্ন হয়। নদীতে প্রচুর বড় বড় মাছ। হাত বাড়ালেই ধরা যেতে পারে। তবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ দেবীর ফটো তোলাও।

মন্দিরগাত্রের পাথর, মন্দিরের আভ্যন্তরীণ এবং সার্বিক অবস্থান দেখে এটি যে বহু প্রাচীন মন্দির তা সহজেই বোঝা যায়। চারপাশেই তুষারমৌলি হিমালয়, কোথাও কোথাও অরণ্যবেষ্টিত। চারদিকেই গভীর নির্জনতা বিদ্যমান।

এই মন্দিরের ভৌগোলিক অবস্থানটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিমালয় পর্বতমালার কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল অংশ এই স্থানে এসে সম্মিলিত হয়েছে। বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে কেদারনাথ পৌঁছানো যায় সহজেই। বৈজনাথ এবং কেদারনাথের দূরত্ব খুব বেশি নয়। শিবক্ষেত্র কেদারনাথের কাছেই শক্তিক্ষেত্র পার্বতীদেবীর অবস্থান স্বাভাবিক। কেদারনাথ ও বৈজনাথের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি হলে ২০০ কিলোমিটার।

বৈজনাথে যাওয়া যায় নানাভাবে, নানাপথে। নৈনীতাল থেকে আলমোড়া হয়ে কৌশানি আর কৌশানি থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরে এই বৈজনাথ-মন্দির। নৈনীতাল থেকে রানীখেত হয়েও কৌশানি পৌঁছানো যায়। আবার কৌশানি থেকে বৈজনাথ-মন্দির। বৈজনাথ-মন্দিরের গা ছুঁয়েই চলে গেছে কর্ণপ্রয়াগের রাস্তা। কর্ণপ্রয়াগ থেকে বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ যাওয়া যায়। নৈনীতাল থেকে কৌশানির দূরত্ব ১৭১ কিলোমিটার; রানীখেত বা আলমোড়া হয়ে যে-পথেই যাওয়া যাক না কেন সময় লাগে কমবেশি ৭।৮ ঘণ্টা। বৈজনাথে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। অধুনা বৈজনাথে পার্বতীদেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে স্বল্পদূরে গড়ে উঠেছে একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বাস। নিকটবর্তী বড় জায়গা কৌশানি। কৌশানি একটি আধা শহর। সেখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য দু-তিনটি হোটেল আছে। আর আছে গান্ধী আশ্রম। এছাড়া উত্তরপ্রদেশ সরকারের পি. ডবলিউ. ডি.-এর বাংলো, জেলা পরিষদের বাংলো এবং বনবিভাগের বাংলোও আছে। হিমালয়ের কুমায়ুন অংশে এই কৌশানিকে অবশ্যই রূপবতী বলে চিহ্নিত করা যায়। পাইন গাছে ছাওয়া এই কৌশানি সমতল থেকে ৬,২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খনি যেন কৌশানি। বৈজনাথের উচ্চতাও এই কৌশানির সমতুল। তবে কৌশানি থেকে বৈজনাথে যাওয়ার পথটি বন্ধুর অর্থাৎ চড়াই-উতরাই বড় বেশি। দুধারেই পাহাড় এবং পাইন ও অন্যান্য গাছের বিস্তৃত বনাঞ্চল। হিমালয়ের বুক চিরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে রাস্তা চলে

গেছে কৌশানি ছুঁয়ে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত। হৃষীকেশ থেকে যে-রাস্তা কর্ণপ্রয়াগে এসেছে সেখানে এই রাস্তা মিলিত হয়েছে। গান্ধীজী কৌশানিকে 'ইন্ডিয়ান সুইজারল্যান্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। গান্ধী আশ্রমের চত্বর থেকে যায়। গান্ধীজী বোধহয় এই কারণেই কৌশানিকে 'ইন্ডিয়ান সুইজারল্যান্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন।

কৌশানি থেকে স্বল্পদূরে বৈজনাথে পার্বতীদেবীর মন্দির ও মূর্তিটি ভ্রমণবিলাসী পর্যটকদের কাছে যেমন দৃষ্টিনন্দন



অধুনা বৈজনাথ-মন্দিরকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে ছোট্ট একটি গ্রাম

উত্তরদিকে দৃষ্টি ফেরালে তুষারাবৃত হিমালয়ের নন্দাদেবী, নন্দঘুণ্টি, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, চৌখাম্বা, মীরাঘুণ্টি, নন্দাকোট, দেবীদর্শন ইত্যাদি পর্বতশৃঙ্গগুলি খুব কাছ থেকে দেখা যায়। যখন প্রভাতে সূর্য ওঠে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায় তখন তার কিরণ এই তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গগুলিতে ছড়িয়ে দেয় স্বর্ণবিভা। সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করে প্রাণ জুড়িয়ে তেমনি ধর্মপ্রাণ মানুষদের কাছেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। আর ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে এই স্থানটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। বৈজনাথের নির্জনতা, নৈসর্গিক পরিবেশ এবং তুষারমৌলি হিমালয়ের পরিবেষ্টনে দেবী পার্বতীর অবস্থান পৌরাণিক এবং আধুনিক কালকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।□







'জ্যান্ত' উপনিষদ্

স্বামী গোপেশানন্দ

উপনিষদের মর্মকথা সর্বভূতে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যেখানে ইচ্ছা যাও।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ এবং বেদান্ত বা উপনিষদের বাণীর জীবন্ত ও উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অপূর্ব জীবন। তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে তিনি বেদান্ত তথা উপনিষদের শিক্ষাকে রূপায়ণ করে গিয়েছেন। বর্তমান রচনায় স্বামী গোপেশানন্দ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে পাঠকবর্গের কাছে সেই 'জ্যান্ত' উপনিষদ্-এর কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীমার জীবন ও বাণী আজকের প্রসঙ্গ। উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক শক্তিবর্ধন। উদ্দেশ্য মহৎ, কাজটি কঠিন। আমাদের মূলধন সামান্য কয়েকটি বই ও কিছু শোনা কথা। পড়ার থেকে শোনা ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল—ঠাকুর বলে গেছেন। এর জন্য সমবয়সী দুই-একজনকে খেদ করতে দেখেছি—"আহা, যদি কিছুদিন আগে জন্মাতাম তাহলে মাকে দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘোচাতাম!" মাকে দেখিনি বলে খেদ থাকতে পারে, মাকে দেখতেই তো চাই, তবে এর জন্য হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ার কারণ নেই। দেখা ভাল, খুব ভাল, কিন্তু ঠাকুর এমন বলেননি যে, মাকে দেখলেই মাকে বুঝতে পারতাম। অবতারকল্প গুরুভাইকে স্বামীজী লিখছেন : "মাঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে।" বুঝুন তবে আমাদের অবস্থা! যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর বাস করছি তাদেরকেই তো বুঝি না, আর মাকে, যাঁর ইতি করা যায় না!

শুনেছি, মার কৃপা ভিন্ন মাকে জানবার কোন উপায় নেই। কৃপা, কৃপা! নান্যঃ পন্থা। তবে এও শোনা কথা, এখনো এটি উপলব্ধ নয়। সুতরাং মাকে জানবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আপাততঃ এছাড়া উপায় নেই; চেষ্টার সঙ্গে মনে রাখতে হবে ঠাকুরের সেই সাবধানী গল্প—'অন্ধের হস্তিদর্শন'। অর্থাৎ মার সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে মা এমনই, আর কিছু নয়। এই যুগে এমন হলে চলবে না, তবে যার পেটে যা সয় তা লক্ষ্য রেখে ধীরে সুস্থে দৃঢ় পদে এগোতে হবে, ব্যাকুল হতে হবে, অধৈর্য হওয়া নৈব নৈব চ। যেমন ধরুন ঠাকুর বললেন : "ও সারদা—সরস্বতী! জ্ঞান দিতে এসেছে।" একথা নিয়ে আলোচনা করবই না, কারণ 'সরস্বতী' কাকে বলে তা-ই জানি না। মোটাবুদ্ধিতে অনেক সময় মনে হয়, স্বামীজী বোধহয় ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী বললেন : মা হচ্ছেন "জ্যান্ত দুর্গা"। কে এর ব্যাখ্যা করবে? আর কেই বা বুঝবে? প্রতিমাতে দুর্গাঠাকুরকে দেখলেই কি মা দুর্গাকে জানা যায়? দুর্গাকেই বুঝি না, তা আবার জ্যান্ত দুর্গা! এর জন্য হয়তো সশরীরে মা দুর্গার আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সেটিও বুঝবার জন্য চাই স্বামীজীর চক্ষু। সে-চক্ষু আমাদের এখনো ফোটেনি, সুতরাং জ্যান্ত দুর্গা নিয়ে আলোচনার কাল এখনো আসেনি। এখনো আমাদের হাতে কালি, মুখে কালি, সর্বাঙ্গে কালিমাখা। আগে শুদ্ধ হই, তারপর "জ্যান্ত দুর্গা"!

আমরা মোটাবুদ্ধি, সাধারণ আটপৌরে মানুষ, আমাদের শ্রীশ্রীমার ব্যবহারিক জীবনযাত্রা প্রণালী নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করতে হবে। "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" (গীতা, ১৮।৪৮) —আগুন যেমন ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে তেমনি সমস্ত কর্মই কম-বেশি দোষযুক্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মাকেও মায়ায় বদ্ধ মনে হতে পারে। তাই মনে রাখতে হবে, মার সম্বন্ধে যেমনই ভাবি না কেন, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়। কাঠুরিয়া এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। অজ্ঞানকে জ্ঞান-কুঠারে কাটতে কাটতে সবকিছু ত্যাগ করে জ্ঞান অজ্ঞানের পারে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। কি ঠাকুর, কি মা—দেখতে মানুষের মতো হলেও তাঁদের চাল-চলন, কথাবার্তা সম্পূর্ণ

অন্যরকম। এর জন্য তাঁদেরকে নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগলেও ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা ও বিপদ অনেক। ব্যাসদেব স্বয়ং যদি এই সভায় যোগ দিতেন তাহলে হয়তো ঘণ্টাকয়েক ধরে ক্ষমা চাইতেন। 'হয়তো' বলছি কারণ, আসল মার কাছে কি কেউ ক্ষমা চায়?—এটা একটা প্রশ্ন। সময়মত আপনারা এর উত্তর খুঁজবেন।

মার আবির্ভাব পূর্বভারতের এক কোণে, এক গণ্ডগ্রামে —সেই ঢেঁকির যুগে। ঢেঁকিকেও যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমি নাচার। এখন অভিধান দেখুন, না হয় বেলুড় মঠের 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এ খোঁজ করুন। এই নারদ-বাহন ঢেঁকি মার চরণস্পর্শে ধন্য। কি স্বর্গে, কি মর্তে—এর স্বভাব কস্মিন কালেও পালটায় না। তাই না ঢেঁকিশাল অবতারবরিষ্ঠের পছন্দমত আবির্ভাব-স্থান! ধন্য ঢেঁকি, তুমি ধন্য; নারদের কান্না থেকে বিতরিছ অন্ন। সুতরাং ঢেঁকিকে আমাদের জানতেই হবে। "ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই; তবে কেন পর্বতে যাই"—"অর্কে চেৎ মধু বিদ্যতে কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ?" আরে, আমি এ কী করছি! মার কথা বলতে গিয়ে ঢেঁকির গুণ গাইছি। হা হতোঽস্মি! হা দগ্ধোঽস্মি! হে আমার সদাক্ষমাশীল শ্রোতৃবর্গ! এই বুদ্ধির ঢেঁকিকে আপনারা ক্ষমা করে দিন।

এবার মায়ের কথা বলি।

মায়ের সংসারে তথা গ্রামে নানারকম হাঙ্গামা, দুঃখ-কষ্ট নিত্য লেগেই ছিল। শিশুকাল থেকেই মা এসব দেখছেন, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আশ্চর্য লাগে, গ্রামের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য যখন আমাদের দাদু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর গোলা খুলে মুক্তহস্তে ত্রাণকার্যে ব্যস্ত, তখন মা তাঁর ছোট ছোট হাতে হাতপাখাতে খিচুড়ি ঠাণ্ডায় নিরত। দেখুন, সেই শৈশবকালেই ত্রাণকার্যে মায়ের কী আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতা! এবং একথা কী বলা যায় যে, রামকৃষ্ণ সংঘের ত্রাণকার্যের সূচনা করলেন মা স্বয়ং—এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বহু আগেই? আবার এই বিষয়ে কিছু গবেষণাও করা যেতে পারে যে, দেওঘরের কাছে ঠাকুরের 'ত্রাণকার্যে'র কত আগে এই ঘটনা ঘটেছিল? এখন গোগ্রাসে যত ইচ্ছা খিচুড়ি ভক্ষণ করুন, ভয় নেই, বাধা নেই। এই খিচুড়ি কে না চায়! ভক্তরা কি বলেন? চলুন জয়রামবাটী। শুধু গ্রামের লোক নয়, দূর-দূরান্তের কত জন কত ভাবে এলেন, শান্তি পেলেন, রক্ষা পেলেন। মা যেন 'লাইফ-বোট'—"সংসার-পাঁকে ঘোর বিপাকে যখন দেখবি অন্ধকার।"

মা জপ করছেন। নিজের জন্য নয়। তাঁর তো নিজের জন্য জপধ্যান করার কোন দরকার ছিল না। নিজে নির্বাসনার মূর্ত বিগ্রহ হয়েও সর্বমঙ্গলমঙ্গলা শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের মঙ্গলার্থে অহর্নিশ জপ করছেন। এমন তো হবেই, সন্তানের মঙ্গল সদাসর্বদা মাকে চাইতে হবেই। তিনি যে মা, প্রকৃত মার যে এটি স্বভাব, এটি ধর্ম। এর জন্য দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই, অসময় নেই, শয়নে স্বপনে জাগরণে "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা"—মা আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। এমন মার ওপর ভক্তি-ভালবাসা যার নেই তার "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম।"

মা সংসারেই ছিলেন। ঠাকুরের আদরের হোমাপাখির মতো সংসার দেখে চোঁচাঁ দৌড় মারেননি। অবশ্য মা পালাবেনই বা কোথায়? সংসার তো তাঁরই। মা হচ্ছেন সেই পাখি, মেঘের কোলে যাকে দেখে শৈশবেই ঠাকুর আত্মহারা হয়ে একেবারে সমাহিত। এ সেই পাখি যে আকাশে ওড়ে, মাটিতে হাঁটে, জলে ডোবে; কিন্তু যেমন পাখি তেমন থাকে, জলে ভেজে না।

জাতবিচারসর্বস্ব, সঙ্কীর্ণমনা গ্রামপঞ্চায়েত-গ্রাসিত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েসয়ে অতি সহজে হেসে খেলে মা আপন আত্মীয়ের মতো নীচ জাতের, অন্য ধর্মের মানুষের এঁটো কুড়োলেন। বাগবাজারে জাতপাতের ভস্ফাইয়ের দুর্গে বসে 'ম্লেচ্ছ' মেমসাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেলেন, খাওয়ালেন! এ এক চরম বিস্ময়। আমরা তো ছাড়, এ দেখে স্বয়ং স্বামীজীরও বিস্ময়বিস্ফারিত নয়ন। শুধু মেলামেশা নয়, শ্রীশ্রীমা বলেছেন: "ওরাও আমার সন্তান।" মা আমাদের এমন মা যে, তিনি একসঙ্গে খাঁটি ভারতীয় এবং সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন। এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবেন নাকো।

আঁধারে সহযাত্রিহারা, অজানা প্রান্তরে বিজন পথে একলা চলতে চলতে ডাকাতের সম্মুখীন হলে যেখানে সাহসী ও শক্তিশালী যুবকেরও হৃৎকম্প হয়, সেখানে দেখি ডাকাত সস্ত্রীক মার আন্তরিক সেবক, 'বডিগার্ড' এবং 'এস্কর্ট'ও। বুঝুন এবারে, কারে কয় ডাকাতে কালী আর কারে কয় নরলীলা! শুনেছি, দুই-এক ঘা খাওয়ার পর মহাপ্রভু পালটাতে পেরেছিলেন জগাই-মাধাইকে, এমন সহজে দপ্ করে নয়। মায়ের কৃপা হলে এমনই হয়। মা-ই কৃপা করেন, অন্যেরা বোধহয় একটু হিসাব করে চলেন। সুতরাং তাঁদের কৃপা শুদ্ধকৃপা কিনা তা পণ্ডিতদের বিচার্য। আমরা চাই শুদ্ধকৃপা, তা না হলে

আমাদের উপায় কে? জয় মা কৃপাময়ী, তুমিই ভরসা।

এবার আলোচনা মার বাণী নিয়ে।

যেমন মা, তেমন তাঁর বাণী—সরল ও কোমল। মা অনুকরণ করতেন না। সব বক্তব্যই তাঁর নিজের, মুনি ঋষি বা অন্যের মুখে মা ঝাল খাননি। এর জন্য মার কথায় যেমন জোর তেমনই অভিনবত্ব আছে যা পাষণ্ডের হৃদয়কেও উদ্বেলিত করে, সাক্ষী ডাকাত-বাবা, কিন্তু মার সবকিছুর ভিত বেদান্তের অন্তরে। মা নিজমুখে বললেন: "মনে রেখ, তোমাদের একজন মা আছেন।" এটি একটি মন্ত্র, ধ্যান করবার বিষয়। আমার মা রাজরাজেশ্বরী, সাক্ষাৎ জগদম্বা। এখন আমার থেকে বড় লোক কে আছে? আমি সর্বতোভাবে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ। টাকা-পয়সা, কাম-কাঞ্চন, মান-যশ ইত্যাদি ইত্যাদি এজগতের সবকিছু এখন আমার কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। এখন আমায় পায় কে! আর আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, অভীঃ অভীঃ। আমি অ-মৃত। এখন "ধোকার টাটি" এই সংসার আমার "মজার কুটি"। মায়ের কৃপায় এখানে "খাই দাই আর মজা লুটি"। এটি 'জীবন্মুক্ত' অবস্থা কিনা ভাববার বিষয়। যাই হোক, আমার কেল্লা ফতে। আমি 'অমৃতের সন্তান'। এখন যত ইচ্ছা চেঁচান—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"... এখন চেঁচালে কাজ হবে। তাই অনেকে বলেন, যদি উপনিষদের বিমূর্ত বাণী ধ্যান করে শক্তি পেতে চাও তাহলে মাকে ধর। মা 'জ্যান্ত' উপনিষদ্। মায়ের ধ্যান করা সহজ, সরল এবং বাস্তবধর্মী।

আবার দেখুন, মা বললেন না—গরিবকে দয়া কর, শত্রুকে ক্ষমা কর, বেড়ালকে ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন দেখাও। মা বললেন: "সকলকে আপনার করে নাও।" অর্থাৎ সকলকে আপনার মতো করে দেখ, যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে—সকলের মধ্যে নিজেকে দেখ অর্থাৎ ভেদের অন্ত কিনা ভেদান্ত ('Vedanta'), অর্থাৎ কিনা বেদান্ত। মার এক পরম ভক্ত, যিনি মাকে খুবই ভক্তি করেন অথচ মাঠাকরুন প্রকৃতপক্ষে কি তা জানেন না, তাঁকে মা হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন: "জানবে, বিড়ালের মধ্যেও আমি রয়েছি।" শ্রীশ্রীঠাকুরও দেখেছেন—"মা আমার সারা জগৎ জুড়ে।" এবার তো মার্কণ্ডেয়-পুরাণের 'চণ্ডী'র কথা মানতেই হয়, সে-পুরাণ যতই পুরনো হোক না কেন।

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

জয় মা! জয় মা! জয় মহামাঈ কী জয়!☐

☐ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ☐

কার্তিক ১৪০৩ সংখ্যা

☐ এবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে কার্যালয় বন্ধ থাকবে আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। পূজাবকাশের পর কার্যালয় আগামী ২৯ অক্টোবর খুলবে। ২৩/২৪ অক্টোবর তারিখটি পূজাবকাশের মধ্যে পড়ায় ঐদিন পত্রিকা ডাকে দেওয়া সম্ভব হবে না। ডাকঘর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে স্থির হয়েছে, আগামী ২ নভেম্বর ১৯৯৬ কার্তিক ১৪০৩ সংখ্যা ডাকে দেওয়া হবে।

☐ পত্রিকা যাঁরা প্রতিমাসে ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন তাঁদের নির্ধারিত তারিখ (২৭ অক্টোবর) পূজাবকাশের মধ্যে পড়ায় ঐদিন থেকে তাঁরাও কার্তিক সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করতে পারবেন না। স্থির হয়েছে, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পত্রিকা সংগ্রহ করেন তাঁরা তাঁদের কার্তিক ১৪০৩ সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারবেন আগামী ৭ নভেম্বর থেকে।

★

আগামী বছরের গ্রাহকমূল্য: গ্রাহকভুক্তি ও নবীকরণ

ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ: ৬০ টাকা; ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ: ৭০ টাকা
বিদেশে ☐ বিমান-ডাক: ৬৫০ টাকা; সমুদ্র-ডাক: ৩২৫ টাকা; বাংলাদেশ: ১৩০ টাকা
[আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ☐ ৩০০০ টাকা]

সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
সম্পাদক, উদ্বোধন

প্রসঙ্গ ঃ বঙ্গাব্দ

'উদ্বোধন'-এর বৈশাখ ১৪০৩ সংখ্যায় 'বিশেষ নিবন্ধ'-রূপে প্রকাশিত 'বঙ্গাব্দ প্রসঙ্গ' শীর্ষক আমার লেখাটিতে (পৃঃ ১৮১-১৮৫) কাল ও স্থানগত কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে যা অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন। ১৮২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩য় অনুচ্ছেদের শেষাংশে হুসেন শাহর সঙ্গে বঙ্গদেশের প্রথম সম্পর্ক স্থাপনকাল প্রসঙ্গে (পঙ্ক্তি ৩২) '৯০৫ বঙ্গাব্দ (১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ) থেকে' স্থলে হবে '৯০০ বঙ্গাব্দ (১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ) থেকে' এবং ১৮৩ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ-র অবস্থান প্রসঙ্গে (পঙ্ক্তি ২০-২১) 'বর্তমান মালদহ জেলার কর্ণসুবর্ণে ছিল তাঁর রাজধানী' অংশটি হবে 'বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে ছিল তাঁর রাজধানী'।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তুর্কিস্থানের তরমুজ শহর থেকে অতি অল্প বয়সে পিতা সৈয়দ আসরাফল হুসেনীর সঙ্গে এদেশে আসেন ও নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। ভাগ্যগুণে ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি গৌড়ের সিংহাসনে বসেন ও ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বকাল।

১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান অনিশ্চিত ছিল—একথা সুধীররঞ্জন দাস প্রণীত ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্ (কলকাতা) থেকে ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'কর্ণসুবর্ণ মহানগরী' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার বহরমপুর থানার অধীন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রক্তমৃত্তিকা > লালমাটি > রাঙামাটি-চিরুটি-যদুপুর অঞ্চলেই কানসোনা বা কর্ণসুবর্ণর অবস্থান। সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণর অতীত স্মৃতির স্মরণেই চিরুটি রেলস্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'কর্ণসুবর্ণ' রাখা হয়েছে।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গড়পাড়া, গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রসঙ্গ ঃ শুকদেব

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'আগে বিশ্বাস তারপর ধর্ম' নিবন্ধে (উদ্বোধন, আষাঢ় ১৪০৩, 'পরমপদকমলে' বিভাগ) পরীক্ষিতের সভায় শুকদেবের আগমন প্রসঙ্গটি যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। সেখানে আছে—শুকদেবকে দেখে মুনিরা নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন—"প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্যঃ" (১।১২৮)। রাজা পরীক্ষিৎ মাথায় পূজাসামগ্রী বহন করে নবাগত অতিথিকে পূজা করলেন—"স বিষ্ণুরাতোঽতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপর্য্যাং শিরসাজহার" (১।১২৯) এবং শুকদেব পূজিত হয়ে একটি মহাসনে উপবিষ্ট হলেন—"মহাসনে সোপবিবেশ পূজিতঃ"(ঐ)।

আরেকটা কথা প্রসঙ্গতঃ বলি। শুকদেবকে আমরা চিরকুমার ব্রহ্মজ্ঞ হিসাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু কিছু কিছু পুরাণে শুকদেবকে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি পুত্রকন্যার জনকত্বও তাঁর ওপর আরোপ করা হয়েছে। মৎস্যপুরাণে রয়েছে—"পুলস্ত্যনন্দনগণের স্বর্গে যে পিবরী নামে প্রসিদ্ধা মানসকন্যা আছেন, তিনি পরম যোগিনী এবং যোগজননী। ভগবান্ শ্রীহরির নিকট তিনি জিতেন্দ্রিয় যোগী পতি প্রার্থনা করিলে শ্রীহরি কহিলেন: 'হে সুব্রতে, ব্যাসপুত্র শুকদেব যখন জন্মগ্রহণ করিবেন তখন তুমি সেই যোগাচার্য শুকদেবের ভার্যা হইবে। ঐ সময় কৃত্বী নাম্নী তোমার এক যোগিনী কন্যা জন্মিবে। তুমি ঐ কন্যাকে পাঞ্চালাধিপতির হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তিনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও যোগসিদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। তোমার গর্ভে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু ও শম্ভু নামে চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইবে।... বিভ্রাজের পুত্র বীর্যবান অণুহ। মহাযশ অণুহ শুকনন্দিনী কৃত্বীর পাণিগ্রহণ করেন। মহামতি ব্রহ্মদত্ত অণুহের পুত্র।' "

বায়ুপুরাণে আছে—"কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অরণি মন্থন করে গুণবান পুত্র শুকদেবকে পেলেন। পিবরীতে শুকদেবের ছয়টি সন্তান জন্মে। তাদের নাম ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ ও গৌর। শুকদেবের মেয়ের নাম কীর্তিমতী। এই কীর্তিমতী যোগজননী ও দৃঢ়ব্রতা এবং ইনি ব্রহ্মদত্তের মা ও সাত্বগুহের পত্নী ছিলেন।"

পুরাণগুলি পড়তে গিয়ে দেখেছি, একই চরিত্র ও ঘটনা বিভিন্ন পুরাণকার বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, শুকদেবকে আমরা ভাগবতের দৃষ্টিতেই দেখতে চাই আকুমার পরমহংস পরিব্রাজক ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠরূপে।

ডাঃ ভূপেশ দাস
ব্যানার্জীপাড়া রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৭০০০৪১

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ এপ্রিল দিনাঙ্কের বর্ণনায় পাচ্ছি: "শ্রীরামকৃষ্ণ—সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়।... একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল।" (দ্রঃ উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৯১৫)—সম্পাদক, উদ্বোধন]

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'

কলকাতা থেকে বহুদূরে থাকি। বাংলা তথা কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যম আমাদের কাছে 'উদ্বোধন'। 'উদ্বোধন' শুধু ঐ মাধ্যম মাত্রই নয়, 'উদ্বোধন' আমাদের সঙ্গে

ঠাকুর, মা, স্বামীজীর সেতুও। এই সেতুবন্ধন আমাদের ধর্মবন্ধন, আমাদের হৃদয়বন্ধন। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ভাষণ, অনুধ্যান, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ, স্মৃতিকথা, কবিতা, বিজ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিকী পড়ে মনে গভীর আনন্দ পাই। 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদকীয় আমাদের অনেক জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করে, আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সঞ্চার করে।

আজকাল নামী-দামী বাঙলা পত্রিকায় 'কবিতা'র নামে যা প্রকাশিত হয় তা আমাদের কাছে এককথায় দুর্বোধ্য। না আছে ছন্দ, না আছে প্রাণ। ভাব নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, কিন্তু সে যে কী বস্তু তা যিনি বা যাঁরা লেখেন, তিনি বা তাঁরা ছাড়া আর কেউ বোঝেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'উদ্বোধন'-এর 'কবিতা' বিভাগে যেসমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলিতে আমি প্রাণের সাড়া পাই যেন। যেমন ছন্দ, তেমনি ভাব, তেমনি প্রাণবন্ততা। এগুলি সাধারণ কবিতা নয়, এগুলি যেন আমাদের প্রাণেরই কথা বলে। কয়েক মাস আগে 'উদ্বোধন'-এ একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির নাম 'অমৃতাভ'। আমার মনে হয়, 'উদ্বোধন'-এর সকল পাঠক-পাঠিকারই কবিতাটি ভাল লেগেছে। 'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমি যখন কথামৃত পড়ি' কবিতাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। মনে হলো, আমারই মনের অব্যক্ত কথা ছন্দোবদ্ধভাবে আমার কোন পরম আত্মীয় আমার সামনে তুলে ধরেছে!

অনেক কথা লিখে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু না লিখেও যে পারলাম না। আমার মনে হয়, 'উদ্বোধন' সম্পর্কে আমার এই কয়েকটি কথা যেমন আমার অন্তরের কথা, তেমনি অন্তরের কথা আমার প্রিয় 'উদ্বোধন'-এর আমার মতো অগণিত পাঠক-পাঠিকারও।

সুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
রাজকৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, এয়ারপোর্ট রোড
রাজকোট, গুজরাট-৩৬০০০১

বড় ভাল লাগছে 'উদ্বোধন'। বস্তুতঃ, কী আনন্দ যে 'উদ্বোধন' দেয় তা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অসমর্থ। যে মন দিয়ে পড়ে কেবল সে-ই তা অনুভব করতে পারে। 'কথাপ্রসঙ্গে' বিভাগে 'শ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টাঙ্গিক মার্গ' প্রসঙ্গটি গত কয়েকটি সংখ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও মনোজ্ঞ ভাষায় যেভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তাতে আমার মনে হয়, 'উদ্বোধন'-এর প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবন, অভূতপূর্ব সাধনা এবং অপূর্ব জীবনদর্শনের এমন মনোগ্রাহী ব্যাখ্যা এবং এমন অসাধারণ বিশ্লেষণ আমাদের চোখে খুব কম পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি আচরণের যে এমন গভীর তাৎপর্য রয়েছে, তা আগে তো ভেবে দেখিনি। গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া এভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরকে উপস্থাপন করা অসম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, সমাজজীবনে এবং জাতীয় জীবনে তাঁর প্রতিটি চিন্তা এবং আচরণ যে এতটা নিখুঁতভাবে প্রাসঙ্গিক সে-বিষয়ে এমনভাবে আমাদের অবহিত করার জন্য 'উদ্বোধন'-এর কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। স্বামীজী বলেছিলেন, 'উদ্বোধন' মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য নির্দিষ্ট। অকুণ্ঠভাবে জানাচ্ছি, 'উদ্বোধন'-এর সেই সেবাব্রত সার্থক হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। 'উদ্বোধন' সহস্র বর্ষ সগৌরবে বেঁচে থাকুক—শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা। আশাকরি, একথা যখন আমি লিখছি তখন আমি 'উদ্বোধন'-এর সহস্র সহস্র পাঠক-পাঠিকার মনের কথারই প্রতিধ্বনি করছি। 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে সংযুক্ত সকল সেবাব্রতীকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 'উদ্বোধন' আমাদের সকলের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটিয়ে চলুক—এই প্রার্থনা।

চিত্রা সেন
সফদরজঙ্গ এনক্লেভ, নিউ দিল্লী-১১০০২৯

প্রসঙ্গ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিক বিশ্বধর্মসম্মেলন

কিছুদিন আগে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে জেনেছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবর্ষপূর্তিতে কলকাতায় আহূত বিশ্বধর্মসম্মেলনের তৃতীয় দিবসের পঞ্চম অধিবেশনে (৩ মার্চ ১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জানতে ইচ্ছা করি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সেই অধিবেশনেই তাঁর সুবিখ্যাত কবিতাগুলিটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশে নিবেদন করেছিলেন?—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে
দেশ-বিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি॥"

আরও দুটি প্রশ্ন। এই অপূর্ব ও অনবদ্য কবিতাটির শিরোনাম কি? কবিতাটি এই ছয়টি ছত্রেই শেষ, না আরও দীর্ঘ? অধীর আগ্রহে, গভীর ব্যাকুলতায় আমরা এর জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করব।

স্বপনকুমার আইচ
বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, জেলা—কুচবিহার
পিন-৭৩৬১৬০

১. না, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঐ অধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদন করেননি। তিনি কবিতাটি শান্তিনিকেতনে

লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। কবিতাটি 'উদ্বোধন'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৪২, পৃঃ ৫৭) প্রকাশিত হয়েছিল। ২. কবিতাটির শিরোনাম রবীন্দ্রনাথ নিজে দিয়েছিলেন 'পরমহংস রামকৃষ্ণদেব'। এই শিরোনাম-সহ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত লিখিত কবিতাটির ফটোকপি 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ৩. কবিতাটিতে ঐ ছয়টি ছত্রই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ কবিতাটির একটি ইংরেজী অনুবাদ কবি স্বয়ং করেছিলেন এবং সেটিরও ফটোকপি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্র 'Prabuddha Bharata' পত্রিকার শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় (February 1936, p. 53) প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্পাদক, উদ্বোধন

'উদ্বোধন'-এর আষাঢ় ১৪০২ সংখ্যায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে স্বামী রামানন্দের এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিক বিশ্বধর্মসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বিশদভাবে তথ্য পরিবেশন করেছেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন এই সম্মেলন হয়, তখন আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এই প্রসঙ্গে সামান্য স্মৃতিচারণ করতে চাই। ঐ উৎসব উপলক্ষে গঠিত সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের পরিচালনায় কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত অ্যালবার্ট হল-এ (পরে সেখানে জনপ্রিয় 'কফি হাউস' গড়ে উঠেছে) একটি অস্থায়ী দপ্তর খোলা হয়। স্বামী অপূর্বানন্দ-সহ বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত সেখানে কাজ করতেন। আমারও ঐ দপ্তরে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের অধীনে এক মাস (সকাল ও সন্ধ্যায়) নানাবিধ কাজ করবার সুযোগ হয়। এই সম্মেলনের পূর্বে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে অ্যালবার্ট হল-এ এক সঙ্গীত-সম্মেলনের আয়োজন হয়। ঐ সম্মেলনে সে-আমলের সেরা গায়ক ও গায়িকারা অংশগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেববর্মন, পাহাড়ী সান্যাল, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যূথিকা রায় প্রমুখ। লখনৌ ম্যারিস (বর্তমান ভাতখণ্ড) মিউজিক কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজঙ্কারও এক সন্ধ্যায় খেয়াল পরিবেশন করেন। ১ মার্চ ১৯৩৭ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত আট দিন কলকাতার টাউন হল-এর দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বধর্মসম্মেলনের যে আয়োজন হয়, সেখানেও আমার সকাল ও সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করবার সৌভাগ্য হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু মনস্বী ও মনস্বিনী এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। ১ মার্চ সন্ধ্যায় টাউন হল-এ অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন হয় এবং উদ্বোধন করেন স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ও বিখ্যাত দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি তখন অতিবৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন ছিলেন, ফলে টাউন হল-এর একতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত তাঁকে একখানা চেয়ারে বসিয়ে (তখন লিফটের ব্যবস্থা ছিল না) স্বেচ্ছাসেবকরা কাঁধে তুলে নিয়ে আসে এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী পবিত্রানন্দ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রমুখ তাঁকে মঞ্চের ওপর রক্ষিত লাল মখমলের চেয়ারটিতে বসিয়ে দেন। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পড়ে শোনানো হয়। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ক্ষীণকণ্ঠে (তখন মাইকের জন্ম হয়নি) যখন ঘোষণা করেন : "I declare the World Parliament of Religions open", সঙ্গে সঙ্গে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়িয়ে (standing ovation) জয়ধ্বনি করেন। এরপর অধ্যাপক বিনয় সরকার ইংরেজী ভাষায় লিখিত সভাপতির অভিভাষণটি ফরাসি ও জার্মান ভাষায় তরজমা করে উপস্থিত দেশ ও বিদেশের প্রতিনিধিদের শুনিয়ে দেন। শরীর অপটু ছিল বলে আচার্য শীল কিছুক্ষণ পরেই সভাগৃহ ত্যাগ করে চলে যান, কিন্তু চলে যাওয়ার আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী পার্ষদ্ স্বামী অভেদানন্দকে অধিবেশনের অবশিষ্ট অংশের জন্য সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। আচার্য শীলের অনুরোধে সে-সন্ধ্যার অধিবেশনের অবশিষ্ট পর্যায়ে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অভেদানন্দ। তিনি অবশ্য পুনরায় ২ মার্চের সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আট দিনে মোট পনেরটি অধিবেশনের মধ্যে চোদ্দটি সম্পন্ন হয় টাউন হল-এ আর একটিমাত্র সান্ধ্য অনুষ্ঠান হয় কলেজ স্কোয়ারে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট হল-এ। সিঁড়ি ভেঙে টাউন হল-এর দোতলায় উঠতে কষ্ট হবে বলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্য ৩ মার্চের সান্ধ্য অধিবেশনটির ব্যবস্থা হয় ঐ হল-এ। ঐদিন সকালে টাউন হল-এ যে-অধিবেশন হয় তার সভাপতিত্ব করেন কাকা কালেলকার। ঐ অধিবেশনের শেষে আমি একটি গ্রুপফটো তুলেছিলাম। দীর্ঘ ৫৯ বছর সেটি সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত আছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার বর্তমান পাঠক ও পাঠিকাদের জন্য ফটোটি পাঠালাম। এই ফটোতে দেখা যায় (বাঁদিক থেকে উপবিষ্ট) স্বামী পরমানন্দ (বস্টন), মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া (মুম্বাই), অধ্যাপক তান ইয়ান সান (চীন ও শান্তিনিকেতন), কাকা কালেলকার (ওয়ার্ধা), অধ্যাপিকা হেলেনা ডি. উইলিয়াম (পোল্যান্ড), স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড (ইংল্যান্ড) ও মঙ আয়ে মঙ (ব্রহ্মদেশ)। পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে (বাঁদিক থেকে) স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (৬ষ্ঠ), স্বামী পবিত্রানন্দ (৮ম), অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারকে (১০ম) সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত বহু প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও ভক্ত এসেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা,

ভক্তি ও প্রণাম জানাতে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ্ স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য ও শিষ্যা যথাক্রমে স্বামী পরমানন্দ ও জোসেফিন ম্যাকলাউড, আর্জেন্টিনা থেকে আগত স্বামী বিজয়ানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ও বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীকে একাধিকবার দর্শন ও প্রণাম করবার সৌভাগ্য হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পক্ষ থেকে সঙ্ঘের তদানীন্তন সম্পাদক (এখন পদটি 'সাধারণ সম্পাদক') স্বামী বিরজানন্দের ভাষণটি এই সম্মেলনে পঠিত হয়। যেসব সম্মানিত প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জীন হার্বার্ট, হের্মন গোয়েটজ, ডঃ পিটার বোইকে প্রমুখ। তাঁদেরও দেখবার সুযোগ হয়। পৃথিবীবিখ্যাত বৈমানিক চার্লস এ. লিন্ডবার্গও এই সম্মেলনে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন। এসব মধুর স্মৃতি এখনো মনে গেঁথে আছে।



টাউন হল, কলকাতা ঃ ৩.৩.১৯৩৭ আলোকচিত্র ঃ পীযূষকান্তি রায়

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী-১১০০১৯

এর ব্যাখ্যা কী?

থাইল্যান্ডের বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র 'Bangkok Post'-এ প্রকাশিত অ্যান ল্যান্ডার্সকে লেখা মেক্সিকো সিটির একজন ছাত্রের একটি চিঠি দেখেছিলাম গত জুন ১৯৯৫-এ। ঠিক তারিখটি আমার মনে নেই। পৃথিবীবিখ্যাত দুজন ব্যক্তির জীবনের সাদৃশ্যগুলি দেখে অবাক হয়েছিলাম। তাই কাগজের 'কাটিং'টা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। তারিখটা লিখে রাখিনি। মূল চিঠিটির ফটোকপি এইসঙ্গে পাঠালাম এবং সেইসঙ্গে তার বাঙলা অনুবাদও করে দিলাম। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক যদি প্রাসঙ্গিক মনে করেন তাহলে 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী'র পৃষ্ঠায় অনুগ্রহ করে প্রকাশ করলে বাধিত হব। আমার অনুভূতি আমি 'উদ্বোধন'-এর প্রকাশ করলে বাধিত হব। আমার অনুভূতি আমি 'উদ্বোধন'-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

The world is full of coincidences

DEAR Ann : A friend sent me something in the mail that stopped me dead in my tracks. I don't know what to make of it, so I'm sending it to you for comment. How much of it was coincidence? The similarities are eerie, I refer to the assassinations of Abraham Lincoln and John F. Kennedy. What follows are documented facts :

Both Lincoln and Kennedy were concerned with civil rights.

Lincoln was elected president in 1860, Kennedy in 1960.

Both were slain on a Friday, in the presence of their wives.

Both were shot from behind and in the head.

They were both succeeded by Southern Democrats named Johnson, who held seats in the US Senate.

Andrew Johnson was born in 1808, Lyndon

Johnson in 1908.

John Wilkes Booth was born in 1839. Lee Harvey Oswald was born in 1939.

Booth and Oswald were Southerners favouring unpopular ideas.

Both presidents lost children through death while in the White House.

President Lincoln's secretary, whose name was Kennedy, advised him not to go to the theatre.

Kennedy's secretary, whose name was Lincoln (Evelyn) advised him not to make the trip to Dallas.

John Wilkes Booth shot Lincoln in the theatre and ran to a warehouse.

Lee Harvey Oswald shot Kennedy from a warehouse and ran to a theatre.

The names Lincoln and Kennedy each contain seven letters.

The names Andrew Johnson and Lyndon Johnson each contain 13 letters.

Both Johnsons were opposed for re-election by men whose names start with "G".

Both assassins were killed before they could be brought to trial.

Can all the above be coincidental? It doesn't seem possible. Please let me know what you think.

Thanks.

A Student in Mexico City

Dear Student in Mexico City: I can offer no explanation. Mighty strange is all I can say.

[Ann Landers]

জগৎটা সদৃশ ঘটনায় পূর্ণ

প্রিয় অ্যান,

আমার এক বন্ধু আমায় এমন একটি জিনিস পাঠিয়েছে যা আমাকে একেবারে হতবাক্ করে দিয়েছে। আমি কিছুতেই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, তাই আপনাকে আপনার মতামতের জন্য এটা পাঠাচ্ছি। একে কি কেবল অনুরূপ ঘটনা বলে ছেড়ে দেওয়া যায়? সাদৃশ্যগুলি সত্যি অদ্ভুত। আমি এখানে আব্রাহাম লিঙ্কন আর জন. এফ. কেনেডির হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি। নিচে যা দেওয়া হলো তা প্রামাণিক তথ্য।

লিঙ্কন আর কেনেডি দুজনেই 'নাগরিক অধিকারে'র (Civil rights) সাথে যুক্ত ছিলেন। লিঙ্কন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, কেনেডি হয়েছিলেন ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে।

দুজনকেই শুক্রবারে হত্যা করা হয়—তাঁদের স্ত্রীদের উপস্থিতিতে।

দুজনকেই পিছন থেকে মাথায় গুলি করা হয়।

দুজনেরই পরবর্তী প্রেসিডেন্টের নাম ছিল জনসন। তাঁরা ছিলেন সাদার্ন ডেমোক্র্যাট এবং যুক্তরাষ্ট্র (U.S.) সেনেটের মেম্বার।

অ্যান্ড্রু জনসনের (Andrew Johnson) জন্ম ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে। লিনডন জনসনের (Lyndon Johnson) জন্ম ১৯০৮-এ।

(লিঙ্কনের হত্যাকারী) জন উইলকিস বুথের (John Wilkes Booth) জন্ম ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে। (কেনেডির হত্যাকারী) লী হারভী অসওয়াল্ডের (Lee Harvey Oswald) জন্ম ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে।

বুথ আর অসওয়াল্ড দুজনেই দক্ষিণ দেশীয় জনসাধারণ (southerner) যেসব চিন্তাকে অপছন্দ করে, সেগুলিই ছিল তাঁদের পছন্দ।

দুই প্রেসিডেন্টেরই হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন সন্তানবিয়োগ হয়।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের সেক্রেটারীর নাম ছিল কেনেডি। তিনি লিঙ্কনকে থিয়েটারে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কেনেডির সেক্রেটারীর নাম ছিল লিঙ্কন (ইভলীন)। তিনিও কেনেডিকে ডালাস যেতে নিষেধ করেছিলেন।

জন উইলকিস বুথ লিঙ্কনকে থিয়েটারের মধ্যে গুলি করে পালিয়ে গিয়ে একটা গুদামঘরে আশ্রয় নেয়। আর লী হারভী অসওয়াল্ড কেনেডিকে গুদামঘর থেকে গুলি করে দৌড়ে একটা থিয়েটারে পালায়।

'Lincoln' আর 'Kennedy' দুটো নামেই সাতটা করে অক্ষর। 'Andrew Johnson' আর 'Lyndon Johnson' দুটো নামেই তেরটা করে অক্ষর।

দুই জনসনেরই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নামের আদ্যাক্ষর ছিল 'G'।

উভয় হত্যাকারীই বিচার হওয়ার আগেই নিহত হয়।

ওপরের সবগুলিই কি কেবলমাত্র সদৃশ ঘটনা? অনুগ্রহ করে আপনার মতামত জানাবেন। ধন্যবাদ। ইতি

মেক্সিকো সিটির একজন ছাত্র

প্রিয় মেক্সিকো সিটির ছাত্র,

আমি এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, খুবই আশ্চর্য। [অ্যান ল্যান্ডার্স]

কৃষ্ণা বর্মা
ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ
মালকাগঞ্জ, দিল্লী-১১০০০৭

পরমপদকমলে

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভক্তির সমাপ্তি শরণাগতিতে। গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেকথা বলছেন। খ্রীস্টান সাধকরা, সুফী সাধকরা, হিন্দু সাধকরা সেকথা বলেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সরল ভাষায় ও সহজ উপমায় শরণাগতির আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। বস্তুতঃ, সাধনার শেষ স্তরই হলো সমর্পণ। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব ভাবে ও ভঙ্গিতে বর্তমান নিবন্ধে সেকথা শুনিয়েছেন।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দিনের পাখি এইবার ডানা মুড়ে রাতের কোলে বসতে চলেছে। গঙ্গার পশ্চিম আকাশে দিনের সাধনার হোমকুণ্ডের নির্বাপিত শেষ আভা। সৌম্য একটি নৌকার মন্থর কালো ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সব কোলাহল ক্রমে স্তব্ধ হয়ে আসছে। একটি-দুটি আলোর বিন্দু লাফিয়ে উঠছে এখানে ওখানে। পুবের আকাশে দীপ-হাতে এসেছেন বৃহস্পতি। চিংচিং ছোট ঘণ্টার শব্দ। শিবমন্দিরে মহাদেবের আরতি শুরু হলো। মা ভবতারিণী সন্ধ্যার সাজে সাজছেন। রাসমণির মন্দির-প্রাঙ্গণে ব্যস্ত কর্মচারিরা সেজ-হাতে আসা-যাওয়া করছেন। ঝাড়ের প্রদীপ একে একে জ্বলছে। দীপমালায় আরতি শুরু হবে ক্ষণপরেই।

দক্ষিণের বারান্দায় ফরাশ আলো জ্বালা শেষ করে পশ্চিমের গোলবারান্দায় আলোটি জ্বেলে দিল। ঠাকুরের ঘরের প্রদীপটি জ্বালা হলো। ধুনুচির টিকেয় ফুঁ পড়ল। আগুনের হাসি। ধুনোর ধোঁয়া ধূমাবতীর এলোচুলের মতো উড়ছে।

দেওয়ালে দীর্ঘ হয়ে আছে উপবিষ্ট এক মহামানবের ছায়া। সেই ছায়া আজও আছে। যদিও সময় চলে গেছে শতাধিক বর্ষ অতীতে। ছায়ার নশ্বর কায়াটি লীন হয়ে গেছে মহাকালের মহানিলয়ে। তবু ভক্ত যদি ভক্তির ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, ছায়া আবার কায়া হবে। সময় আবার ফিরে আসবে। ফিরে আসবেন সব চরিত্র, ধ্বনি, দীপের আলো, আলুলায়িত ধুনোর ধোঁয়া।

ঐ তো খাটো ধুতি-পরা ফরাশ দক্ষিণের দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী বেয়ে নেমে চলেছে রাধাগোবিন্দের মন্দিরের দিকে। সেরেস্তার দিক থেকে আসছেন হৃদয়। হাজরা মশাই পুজোয় বসেছেন।

দীপের শিখা মৃদুমৃদু কাঁপছে। আসনে সোনার বরণ এক সাধক। দৃষ্টি অর্ধনিমিলিত, নাসিকাগ্রে নিবিষ্ট। মৃদুস্বরে মায়ের নাম করছেন, মাতৃচিন্তায় বিভোর। অদূরে স্থাণু হয়ে আছেন আরও কয়েকটি মূর্তি— মাস্টারমশাই, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর আত্মীয় যুবক হরি। একপাশে আমিও না হয় বসলাম।

কালের ছবি মহাকালে ভেসে গেলেও মনের ছবির কালাকাল নেই।

ঠাকুর এই মুহূর্তেই মুখ তুলে তাকালেন। আলো দেখলেন। অনুমান করে নিলেন, ভবতারিণীর মন্দিরে আরতির এখনো কিছু বিলম্ব আছে। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। আমার মনে হচ্ছে, আসনে বসে আছেন শীতল এক মহাদেব। মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন: "যে নিশিদিন তাঁর চিন্তা করছে, তার সন্ধ্যার কি দরকার!"

বাতাসে যেন বাঁশির সুর—

"ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা-সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥
দয়া ব্রত, দান আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায়॥"

সেই সঙ্গীতে ধুনোর ধোঁয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। গঙ্গার অবিরল স্রোতোধারা সেই সঙ্গীতে নিস্তরঙ্গ হয়েছে। গান

শেষ করে অল্পক্ষণ ভাবস্থ রইলেন ঠাকুর। ঘর এতটাই নিস্তব্ধ যে, গঙ্গার স্রোতোধারার শব্দ কানে আসছে। কানে আসছে ধুনুচিতে টিকে পোড়ার পুটপুট শব্দ। বাতাসে আগুনের আভা বাড়ছে কমছে। ঘরে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা যেন ভাবসমুদ্রের গভীরে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছেন।

ঠাকুর বলছেন : "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।"

উত্তরণের কথা, সাধকের ক্রমপ্রবেশের কথা। এগিয়ে যাও কাঠুরে। প্রয়াস। একটি আর একটিতে মিশে যাবে। সন্ধ্যা নিয়ে এগোও, গায়ত্রীকে পাবে। তিনি হাত ধরে ওঁকারে তুলে দেবেন।

ঠাকুর পরক্ষণেই বলছেন : "একবার ওঁ বললে যখন সমাধি হয়, তখন পাকা।" ('কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৭২৫)

নিমেষে এঘর থেকে ওঘর। প্রণবের এক ঝঙ্কারে আরোহণ। তখন পথ খুলে গেছে। সংসারের অভ্যাসে মরচে-ধরা তালায় তেল পড়েছে। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো ধ্যানে, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল মনে একটিমাত্র অনুরণনে মহাসংযোগ।

এ তো মুণ্ডক উপনিষদ্-এর তত্ত্ব। একালের উন্নাসিক বুদ্ধিজীবীরা ঠাকুর সম্পর্কে কোন প্রসঙ্গ করার সময় অবশ্যই একটি গৌরচন্দ্রিকা করবেন—'কামারপুকুরের সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ', যা শুনলে গাত্রদাহ হয়। ঠাকুর কি জ্ঞানী? জ্ঞান তো অতি নিচের তলার অবস্থা। ঠাকুর যে বিজ্ঞানী। টমাস আর. কেম্পিস তাঁর 'দ্য ইমিটেশান অব ক্রাইস্ট'-এ সারকথাটি বলেছেন, যা আমাদের ঠাকুর সম্পর্কে প্রযোজ্য—"How happy a man is when the Truth teaches him directly, not through symbols and words that are soon forgotten, but by contact with itself." কেম্পিস আরও বলছেন : "As a man grows in inward unity and simplicity, he finds that more and more deep truths are made plain to him without any effort, because a heaven-sent light brings him understanding."

কলেজে পড়া বিপুল শিক্ষিতদের বৃথা অহঙ্কার ঠাকুর নিমেষে চূর্ণ করে দিতেন তাদের মঙ্গলের জন্যই। শ্রীমর কলেজী জ্ঞানের অহঙ্কার দর্শনের দ্বিতীয় দিনেই চুরমার করে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন করলেন : "তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?"

মাস্টারমশাই বললেন : "আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।"

ঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন : "আর তুমি জ্ঞানী?"

মাস্টারমশাই ধন্দে পড়ে গেলেন—"তিনি (নিজে) জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখনও পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি কি জ্ঞানী'! মাস্টারের অহঙ্কারে আবার আঘাত লাগিল।"

এই যে সত্য, যার অপর নাম বিশেষ জ্ঞান, তা যুগে যুগে সব দেশের সব মানুষের কাছেই সত্য। সূর্য স্পেনেও সূর্য, ঘুঘুডাঙাতেও সূর্য! দ্যাট ওয়ান ওয়ার্ড—ওঁ! কেম্পিস তা না হলে কেমন করে ঠাকুরের কথারই প্রতিধ্বনি করেন : "If the eternal Word speaks to a man he is delivered from many conjectures. That one Word is the source of all things and all things speak of that Word. That Word is the Beginning, and that Word speaks to us."

ঠাকুর বসে আছেন তাঁর ছোট্ট তক্তপোশে। ভক্তদের বোঝাচ্ছেন : "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।"

এ তো সেই উপনিষদের দর্শন, অনুভূতি, সত্য, পথ, লয়, বিলয় :

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"

(মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৪)

ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ এবং ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে সেই লক্ষ্যকে ভেদ করতে হবে। লক্ষ্যবেধের পর শরের মতোই তন্ময় হবে অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হবে। ব্রহ্মের অনুভূতি, ব্রাহ্মীস্থিতি হলে কি হবে! দুটো শিং বেরোবে কি! না। দুটো নতুন চোখ হবে—প্রেমের চোখ, একটা নতুন হৃদয় হবে—প্রেমের হৃদয়, একটা নতুন শরীর হবে—আনন্দের শরীর। বিশ্বের সঙ্গে যোগ হবে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি, অনন্ত আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে উদার মুক্তিতে। তখন আমি বুঝতে পারব, আনন্দই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আনন্দ।

তখন রবীন্দ্রনাথ ঃ

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্তগগনে ॥"

ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন ভক্তদের ঃ "হৃষীকেশে একজন সাধু সকালবেলায় উঠে ভারী একটা ঝরনা তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত দিন সেই ঝরনা দেখে আর ঈশ্বরকে বলে—'বাঃ বেশ করেছ! বাঃ বেশ করেছ! কি আশ্চর্য!' তার অন্য জপতপ নাই। আবার রাত্রি হলে কুটিরে ফিরে যায়।" ('কথামৃত', ঐ)

ঠাকুর এইবার উপনিষদের জগৎ থেকে ভক্তির ঘরে ফিরছেন। সেখানে যোগ নেই, আছে ভক্তির অশ্রুজল। তোমাদের একটা কথা বলি ঃ "তিনি নিরাকার কি সাকার সেসব কথা ভাববারই বা কি দরকার? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বললেই হয়—হে ঈশ্বর, তুমি যে কেমন, তাই আমায় দেখা দাও!" (ঐ)

ভক্তি এলে বিশ্বাস আসবে, বিশ্বাস এলে ভক্তি আসবে। এ এক অদ্ভুত বৃত্ত! অতীত থেকে একটি সুন্দর কথা চয়ন করি—"In faith Columbus found a path across untried waters." কথাটি মার্টিন ফারকুহার টাপারের।

সেই বিশ্বাসকে আজ সন্ধ্যায় জোরদার করতে চাইছেন ঠাকুর। কারণ, "Faith lights us through the dark to deity." ঠাকুর বলছেন ঃ "তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন।"

সে কেমন? বাতাসের মতো! নাকি জলে বসানো পাত্রের মতো! বাইরেও জল ভিতরেও জল। ভক্তি ও বেদান্ত মিশিয়ে ঠাকুর অনবদ্য এক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ঃ "অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে 'তত্ত্বমসি' (সেই তুমি)। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে, নানা রূপ ; কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।" (ঐ, পৃঃ ৭২৬)

কি রকম জ্ঞান! ঠাকুর তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন ঃ

"একটি বেদান্তবাদী সাধু এসেছিল। মেঘ দেখে নাচত, ঝড়বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যেত। আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারী বিরক্ত। সর্বদাই বিচার করত, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, তাই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রঙ দেখা যায় ; —বস্তুতঃ কোন রঙ নাই।—তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে নানা বস্তু দেখাচ্ছে।" (ঐ, পৃঃ ৩২৬-৩২৭)

"তাই সব নাম রূপ বর্ণনা করবার আগে, বলতে হয় ওঁ তৎ সৎ।" (ঐ, পৃঃ ৭২৬)

ঠাকুর এইবার কঠিন ছেড়ে সহজে আসছেন। মায়াকে না হয় সত্যই ধরলাম, কিন্তু সেই মায়া থেকে আমাকে ব্রহ্মে যেতেই হবে। সেইটাই জীবের শেষ আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। তা না হলে আমি মারের পর মার খাব। সংসার আমাকে খাবলে খুবলে শেষ করে দেবে। ঘরে যাঁরা বসে আছেন, সকলেই পড়াশোনা-করা যুবক। ঠাকুর জানেন সে-কথা ; আবার এও জানেন, কলকাতার লোক তর্ক করতে ভালবাসে। মৃদু হেসে সকলের দিকে তাকিয়ে বলছেন ঃ "দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়ে আরেকরকম। শাস্ত্রে আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন প্রয়োজন নাই। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল।" (ঐ)

কি কি চাই! পাহাড়ে উঠতে গেলে সাজসরঞ্জাম চাই। সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে জাহাজ চাই। শুধু জাহাজে হবে না, সামুদ্রিক ম্যাপ চাই, কম্পাস চাই। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে পেতে হলে কিচ্ছু চাই না, চাই ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। ব্যাকুলতা আসবে কি করে! সাধুসঙ্গে। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। যেমন বাড়িতে কারো অসুখ হলে সর্বদাই মন ব্যাকুল হয়ে থাকে—কিসে রোগী ভাল হয়। আবার কারো যদি কর্ম যায়, সে-ব্যক্তি যেমন অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল হতে হয়—সেইরূপ। যদি কোন অফিসে বলে—কর্ম খালি নেই, আবার তার পরদিন এসে জিজ্ঞাসা করে—আজ কি কর্ম খালি হয়েছে?

আরেকটি উপায় আছে—ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা।

"I do not ask for any crown
But that which all may win;
Nor try to conquer any world
Except the one within.
Be thy my guide until I find
Led by a tender hand.
The happy kingdom in myself
And dare to take command."
[Louisa May Alcott]

ডাকতে হবে। আঁকুপাঁকু করে ডাকতে হবে। ভিতরে

যেন গামছা নিঙড়ায়।

কী সুন্দরভাবে ঠাকুর বলছেন : "তিনি যে আপনার লোক, তাঁকে বলতে হয়—তুমি কেমন, দেখা দাও। দেখা দিতেই হবে—তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন? শিখরা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'; আমি তাঁদের বলেছিলাম, দয়াময় কেন বলব? তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমাদের মঙ্গল হয় তা যদি করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে পালন করবে, সে আবার দয়া কি? সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর করে প্রার্থনা করতে হয়। তিনি যে আপনার মা, আপনার বাপ! ছেলে যদি খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ-মা তিন বৎসর আগেই হিস্যা ফেলে দেয়। আবার যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পুনঃপুনঃ বলে, 'মা, তোর দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে দুটি পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হয়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়।" (ঐ, পৃঃ ৩৮)

তৃতীয় পথ, তৃতীয় অস্ত্র কি? সাধুসঙ্গ। তাঁর দিকে যেতে হলে, তাঁকে পেতে হলে অস্ত্র-শস্ত্র বিশেষ কিছুরই প্রয়োজন নেই; কিন্তু ভয়ঙ্কর তিনটি সূক্ষ্ম অস্ত্রের প্রয়োজন, সেই অস্ত্রের অস্ত্রাগার আমাদের অন্তরেই আছে। প্রকোষ্ঠটির নাম ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার লৌহকপাট কে খুলবে! নিজেকেই খুলতে হবে। চাবি যার যার নিজের কাছেই আছে। সমস্যা একটাই, ইচ্ছার দিকে ইচ্ছাই যেতে দেবে না। ইচ্ছাই করবে না ইচ্ছা করতে। পারস্যের সুফী কবি রুমি যা বলেছেন : "You are the unconditioned spirit trapped in conditions, like the Sun in eclipse."

কেম্পিস বলছেন : "We must lay the axe to the root of the Tree. So that we may be cleansed from our passions and possess a mind at peace." তিনি আরও বলছেন : "If we were utterly dead to self, and if our hearts were stripped of encumbrance, then we could get a glimpse of the things of God, and experience something of heavenly contemplation."

রাজা যেখানে যায়, রাজছত্রটিও সেখানে যায়। আদর্শ বাইরে না-ই বা রইল, নিজেকে আদর্শ করে তোলাই তো মূলকথা। আমার ছাতার তলায় আমি আছি। কলের মুখে ফিল্টার লাগাই পরিশ্রুত জল পাব বলে। মনেও তেমনি সদসৎ বিচারের ফিল্টার লাগাই। পাব কোথায়? সাধুসঙ্গে।

ঠাকুর বলছেন : "সাধুসঙ্গ করলে আরেকটি উপকার হয়। সদসৎ বিচার। সৎ—নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর। অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। অসৎ পথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খেতে শুঁড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙশ মারে।"

জেনে রাখ—"তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন, দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, সদ্‌বুদ্ধি তিনিই দেন, অসদ্‌বুদ্ধিও তিনিই দেন।" (ঐ)

"Help yourself and Heaven will help you. Everyone should sweep before his own door."

এইবার মা ভবতারিণীর মন্দিরে শুরু হবে আরতি। বাইরে অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে। পঞ্চবটী, বেলতলা আঁধারে রহস্যময় হয়েছে। গঙ্গার জল আর দেখা যাচ্ছে না, শুধু স্রোতের শব্দ। দূরে কার উদাত্ত আহ্বান—মা!

ঠাকুর উঠছেন, উঠতে উঠতে বলছেন : "গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার গীতা গীতা বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা।" (ঐ, পৃঃ ৭২৬)

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে॥"
(গীতা, ১৮।৬৫)

—আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজনশীল হও, আমাকেই নমস্কার কর। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তাহলে তুমি আমাকেই পাবে, কেননা তুমি আমার প্রিয়।

উঠানের পথ ধরে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর চলেছেন মন্দিরে। আরতি দর্শন করবেন। ধাপে ধাপে উঠছেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-বাদ্য-বাজনার ঐকতান। পঞ্চপ্রদীপ মহাদেবের মতো মায়ের সামনে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। ধূপ আর ধুনোর সৌরভ। মায়ের সামনে জোড়হস্তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। সাপের ফণার মতো ঈষৎ দুলছেন। সুরা নয়, সুধা। মাতাল হয়েছেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম আর সম্ভব নয়। ভক্তদের ওপর দেহভার রেখে নামছেন। কোথায় পা পড়ছে দিশা নেই। যেন বলছেন—তোমার বিশ্বাসের পাথরটি যেন এত ভারী হয় যে, তুমি শ্রদ্ধার সমুদ্রে একেবারে তলিয়ে যাও।

ঐ যে চলে যাচ্ছেন তিনি সপার্ষদ্ নিজের ছোট্ট ঘরটির দিকে। কে বলেছে তিনি নেই। এই টালমাটালের বিপন্ন সময়ে তিনি আরও নিবিড় হয়ে আছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।"□

ইতিহাস

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ ও তাঁদের অভিনব দুর্গাপূজা

শান্তি সিংহ

বাংলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও কিংবদন্তীতে বিষ্ণুপুর মল্লরাজবংশ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। মল্লরাজবংশের কুলদেবী মৃন্ময়ীর কথা বলতেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। দেবী মৃন্ময়ী আসলে দেবী দুর্গা। শারদীয় উৎসবের সময় অভিনব রীতি ও আচারে এবং অবশ্যই গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে পূজিতা মৃন্ময়ী-সহ রাজপরিবারের অন্যান্য দেবীদের পূজার অনুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত বিবৃত করেছেন গবেষক লেখক ডঃ শান্তি সিংহ।

একদা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমের ছোটনাগপুর অঞ্চলে 'ভূম' নামযুক্ত জনপদের বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাই লোকমুখে মল্লভূম, মানভূম, ধলভূম, তুঙ্গভূম, শিখরভূম, বরাহভূম প্রভৃতি নাম শোনা যেত। আধুনিক মানচিত্রে এইসব 'ভূম' নামযুক্ত জনপদ মুছে গেছে, তবু ঐসব অঞ্চলের মানুষের মনোচিত্রে, স্মৃতিপ্রিয়তায় তাদের অস্তিত্ব বুঝি এখনো জেগে আছে!

বাংলার ইতিহাসে মল্লভূমের মল্লরাজদের মহিমা বিশেষভাবে কীর্তিত। মল্লরাজদের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর। শৌর্য-বীর্যে, শিল্পসংস্কৃতি-প্রিয়তায় মল্লরাজদের কৃতিত্বের কথা গুণিগণ এখনো স্মরণ করেন। সমাজতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক ডঃ অতুল সুর বলেছেন: "যদিও বাংলার বিষ্ণুপুরে তাঁদের রাজধানী অবস্থিত ছিল, তথাপি তাঁদের রাজশক্তি উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কো থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ধমানের অংশবিশেষ ও পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অংশবিশেষও তাঁদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[১]

আধুনিক নরনারীরা রসিকতার সুরে বাঁকুড়াকে 'খরার দেশ' বললেও তাঁদের চোখে 'বিষ্ণুপুর' মানেই লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, যমুনাবাঁধ, পোকাবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ প্রভৃতি জলাশয়শোভিত; মল্লেশ্বর, শ্যামরায়, জোড়বাংলা, কালাচাঁদ, রাসমঞ্চ, লালজি, মদনমোহন, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, রাধামাধব প্রভৃতি মন্দিরের অপরূপ শিল্প-অলঙ্করণসমৃদ্ধ এবং অবশ্যই বিষ্ণুপুর-ঘরানার ঐতিহ্যমণ্ডিত সুরতীর্থ! বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতজগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব।

মল্লভূমের অন্তর্গত জয়রামবাটী গ্রামে মা সারদা, যিনি বিশ্বজননীরূপে সর্বজনবন্দিতা, ১৮৫৩ সালে আবির্ভূত হন। জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অথবা পরবর্তী কালে কলকাতায় যাওয়ার জন্য বিষ্ণুপুর স্টেশনে এসে তিনি ট্রেন ধরতেন। কলকাতা যাওয়া-আসার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে যে-কাঁঠালগাছের তলায় তিনি ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিতেন, সেই পবিত্র স্থানটি দক্ষিণ-পূর্ব রেল-কর্তৃপক্ষ স্মৃতিপূত স্থানরূপে যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ করছেন। এখনো ঐ স্থানে পরবর্তী কালের একটি কাঁঠালগাছ পুণ্যস্মৃতিতে সজীব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তিরিশ বছর আগে ১৮০৬ সালে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের সময় ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষ্ণুপুর দেনার দায়ে নিলামে ওঠে। ২,১৫,০০০ টাকায় তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ বিষ্ণুপুর জমিদারি কেনেন। বিষ্ণুপুরের গৌরবসূর্য অস্তমিত হলেও তার সাংস্কৃতিক-আভার লোকমান্যতা বৃহত্তর মল্লভূমে এবং পাশাপাশি জেলাগুলিতে বহুদিন ব্যাপ্ত ছিল। তাই গাঙ্গেয় বাতাসে স্নিগ্ধ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৩ সালের ৫ জুন সহাস্যভঙ্গিতে হুগলীর গোঘাট অপেক্ষা বিষ্ণুপুরের গুরুত্ব যে বেশি—সে-প্রসঙ্গে বলেন:

১ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—অতুল সুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬ পৃঃ ৩৯

"বিষ্ণুপুরে রেজিস্টারির বড় আফিস, সেখানে রেজিস্টারি করতে পাল্লে আর গোঘাটে গোল থাকে না।"[২]

গাঙ্গেয় সরসতায় শ্যামশ্রীমণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরের সাধনপীঠে ভক্তসঙ্গে 'রসেবসে' তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর অতিবাহিত করেছেন। ১৮৮৩ সালের ১৯ আগস্ট স্মৃতিপ্রিয়তায় শ্রীরামকৃষ্ণ মল্লরাজদের কুলদেবী মৃন্ময়ীর কথা বলেছেন: "আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথা ঘষার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ী দর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হলো, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হলো—কোমর পর্যন্ত।"[৩]

॥ ২ ॥

বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের কুলদেবী মৃন্ময়ী আসলে দুর্গা। তিনি শরৎকালে উনিশ দিনব্যাপী অভিনব রীতিতে শ্রদ্ধাভক্তি-সহ পূজিতা হন। এদেশে দুর্গাপূজার শুরু হয় শরৎকালে দেবীপক্ষের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। আর বিষ্ণুপুর রাজবাড়ির দুর্গাপূজা শুরু হয় জিতাষ্টমীর পরদিন নবমী তিথিতে। কিন্তু 'নবম্যাদি কল্পারম্ভ'-এর আগের দিন, অর্থাৎ জিতাষ্টমীর দিন হয় এখানে বিল্ববরণ বা দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। তার পরদিন পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে হয় দেবীর বোধন। পটে আঁকা মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা এবং রুপোর পাতে মহিষমর্দিনী-মূর্তি 'বড় ঠাকরুন'-এর ঘট-সহ মন্দিরে আগমন। 'বড়ঠাকরুন' রাজবাড়িতেই থাকেন। নবমীর দিন কৃষ্ণবাঁধে 'স্নানপর্ব' শেষে নবপত্রিকা-সহ যথাবিধি পূজা করে মৃন্ময়ীর মন্দিরের সামনে শিরিষগাছের তলায় প্রথমে 'পাটপূজা' করা হয়। তারপর দুর্গা-মেলার মধ্যে পূজা হয়। নিত্যপূজা প্রতিদিন চলে।

দেবীপক্ষের চতুর্থ তিথির দিন আরেকটি 'ঘট' ও 'পট' মন্দিরে আসে। 'ঘট-ভরা' পর্ব রাজপুরোহিত করেন গোপালসায়রের জল নিয়ে। দেবীর নাম 'মেজঠাকরুন'। চতুর্থীর দিনরাত্রি মন্দিরে অবস্থানের পরদিন ভোরে হয় তাঁর সাময়িক বিদায়।

দেবীপক্ষের ষষ্ঠীর দিন পুনরায় হয় 'বিল্ববরণ' বা 'আমন্ত্রণ ও অধিবাস'। পরদিন মহাসপ্তমী। ঐদিন রাজবাড়ির অন্দর থেকে দশভুজা-মূর্তির 'স্বর্ণপট' বাইরে আনা হয়। তাঁকে বলা হয় 'পটেশ্বরী' বা 'ছোটঠাকরুন'। নবপত্রিকা ও 'পটেশ্বরী'কে কৃষ্ণবাঁধের ঘাটে নিয়ে গিয়ে যথাসমারোহে পূজা করা হয়। তারপর দুর্গামন্দিরে আসেন 'ছোটঠাকরুন'। তাঁর সঙ্গে 'মেজঠাকরুন'-এরও হয় পুনরাগমন। একই সঙ্গে চলে পটে আঁকা তিন 'ঠাকরুন'-এর পূজা ও মৃন্ময়ীর পূজা। এই পূজায় 'ছোটঠাকরুন'-এর প্রাধান্য বেশি। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার বংশের শিল্পীরা মন্দিরের দুর্গাপট আঁকেন।

মহাষ্টমী তিথি। এদিন সকালে রাজবাড়ির অন্দর থেকে মন্দিরে আসেন অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী। অষ্টধাতুর তৈরি এই উগ্রচণ্ডীদেবীর হয় 'মহাস্নান'-অনুষ্ঠান। মৃন্ময়ীর সম্মুখস্থ একটি স্থায়ী পাকা বেদির ওপর উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবীকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'মহাস্নান' করানো হয়। তারপর দেবী সিংহাসনে উপবেশন করেন। দেবীর পূজার আগে মল্লরাজবংশের প্রতিনিধিরা ভক্তিনম্র অন্তরে ও তলোয়ার-হাতে বীরবেশে পূজাস্থলে উপস্থিত থাকেন। দেবীর পুষ্পাঞ্জলি-পর্ব রাজপুরোহিত যথোচিত ভাবগাম্ভীর্যে সম্পন্ন করেন।

মহাষ্টমী ও মহানবমীর 'সন্ধিক্ষণ' মল্লভূমে এখনো বিশেষ স্মরণীয়। বিষ্ণুপুর রাজদরবার মহল্লায় অবস্থিত মূর্চার পাড়ের ওপর স্থাপিত এক কামানে অগ্নিসংযোগ করে বিশাল ব্যাপ্ত তোপধ্বনির মাধ্যমে 'সন্ধিপূজা'র মাহেন্দ্রক্ষণ সূচিত হয়। রাজাদেশে মাদোড়রা বংশানুক্রমে তোপধ্বনি করে, অর্থাৎ কামান দাগে। তার জন্য বংশানুক্রমে তারা রাজবৃত্তি পায়।

একদা 'তামি'র সঙ্কেতে রাজা তোপধ্বনি করার নির্দেশ দিতেন। বিশাল একটি জলপূর্ণ পাত্রে তামার একটি 'কুড়ি' অর্থাৎ ছোট পাত্র বিশেষ পদ্ধতিতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। তামার কুড়িটি যখনই বিশাল জলপূর্ণ পাত্রে ডুবে যেত, তখনই সূচিত হতো সন্ধিপূজার মাহেন্দ্রক্ষণ। তখনই রাজা তোপধ্বনি করার আদেশ দিতেন। বিষ্ণুপুরের সেই তোপধ্বনি শুনে সারা মল্লভূমে একদা সন্ধিপূজার মাহেন্দ্রক্ষণ সূচিত হতো। এই বিশ্বাসের কথা বাঁকুড়া শহরের তথা বাঁকুড়া জেলার নানা গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। বর্তমানে ঘড়ি দেখে সন্ধিপূজার সময় নির্ধারিত হয়। মল্লরাজদের দুর্গোৎসব দেখতে, বিশেষতঃ 'সন্ধিপূজা' দেখতে একদা

২ কথামৃত, ২।৭।২ ৩ ঐ, ১।৭।২

দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে এক বিশাল জনসমাগম হতো, এখনো হয়ে থাকে।

মহানবমীর দুর্গাপূজাও অভিনব এবং স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। মহানবমীর মহানিশায়, রাত্রি বারটার পর—মহামারীর দেবী খচ্চরবাহিনীর পূজা শুরু। পটে আঁকা সেই দেবীমূর্তি থাকে বিষ্ণুপুর রাজঅন্তঃপুরের 'লক্ষ্মীঘর' নামক দেবগৃহে। সংবৎসরে মাত্র ঐ একদিনই অর্থাৎ মহানিশায় তাঁর পট পূজা হয়। ঘটে-পটে খচ্চরবাহিনীর পূজা হয় দেবী দুর্গার ধ্যানমন্ত্রেই। ঘট ও পটের দিকে মুখোমুখি পূজা নয়, পশ্চাদ্‌মুখী হয়ে রাজপুরোহিত মহানিশাযোগে পূজা করেন। সবিশেষ উল্লেখ্য, পূজারী ব্রাহ্মণ এবং রাজপরিবারের কোন সদস্য ব্যতীত পূজাস্থলে অন্য কারোর উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বিজয়াদশমীর দিন সকালে রাজপরিবারের প্রতিনিধিরা মৃন্ময়ীদেবীর মন্দিরে আসেন। তাঁরা দেবী মৃন্ময়ী ব্যতীত অন্যান্য পট, ঘট এবং নবপত্রিকাকে রাজদরবারের মধ্যবর্তী গোপালসায়র নামক সরোবরে যথারীতি বিসর্জন দেন। বিজয়াদশমীর বিকেলে হয় বিচিত্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। রাজপরিবারের সবাই শুভযাত্রার প্রতীক 'ট্যাসকনা পাখি' দর্শন করেন। 'নীলকণ্ঠ পাখি' নামেই তা সমধিক পরিচিত। তারই আঞ্চলিক নাম 'ট্যাসকনা পাখি'। অন্যান্য শুভ কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দইয়ে জ্যান্ত কৈ মাছ ছেড়ে দিয়ে তার বিচিত্র রূপ দর্শনও পুণ্যকর্ম বিশেষ।

কালের কুটিল নির্মমতায় বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের দুর্গোৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ রীতিনীতির অনেক কিছুই যুগোপযোগী হয়েছে। রাজবংশের প্রতিনিধিরা অনেক কিছু অনুষ্ঠান এখন শিথিলযোগ্য হিসেবে দেখেন। একদা বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যায়, মল্লরাজরা রাজপোশাকে সুসজ্জিত হয়ে সুরম্য পালকিতে চড়ে 'ইন্দ্রপূজা'র জন্য ইঁদতলায় যেতেন। যেমন, মহাষষ্ঠীর দিনে রাজবাড়ির পিছনে ক্ষীরকুলগাছের তলায় যেতেন। এই ক্ষীরকুলগাছের তলায় বিষ্ণুপুর মল্লরাজদের একদা 'অভিষেক-পর্ব' সমাধা হতো। সেখানে রাজপুরোহিত 'দুর্গাপট' দেখাতেন। ঘরের ভিতর থেকে ছোট্ট জানলা বা খুপরির ফাঁক দিয়ে রানী দেখতেন দুর্গাপট। রাজাও তাঁর কাছ থেকে এসে অনুরূপভাবে দুর্গাপট দেখতেন। তারপর রাজপুরোহিত ঢাক-ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাজনা-যোগে দুর্গাপটকে ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্যামকুণ্ড পেরিয়ে দুর্গা-মন্দিরের বেলতলায় এনে 'বোধন-পর্ব' সমাধা করতেন।

একদা বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় 'ইন্দ্রপূজা'র জন্য ইঁদতলায় কলাগাছ দিয়ে তোরণ নির্মাণ করা হতো। তাকে বলা হতো 'সড়ক-দরজা'। সেখানে স্থাপিত হতো অনন্তদেবের পাষাণমূর্তি। 'দরজা'র একদিকে রাজা, অন্যদিকে রাজপুরোহিত দাঁড়াতেন। রাজা পুণ্যতাসূচক এঁড়েগরু, উত্থান থালা, তলোয়ার, ঢাল ইত্যাদি একাদিক্রমে সেই দরজা দিয়ে পার করাতেন। অন্যপাশে দাঁড়ানো পুরোহতি তা গ্রহণ করতেন। তারপর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে, পালকি চড়ে মল্লরাজ যেতেন বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারিবাজারে বুড়ো ধর্মরাজের 'থানে'। 'বৃহৎ-অক্ষ' বা 'বুড়ো ধর্মরাজ' মল্লভূমের সুপ্রাচীন ধর্মদেবতা। সেখানে প্রণাম-পর্ব সমাধা করে রাজা দরবারে ফিরে যেতেন। বিজয়াদশমীর দিনে শৌর্যব্যঞ্জক ঢাল-তরোয়াল নিয়ে রাজ-সেনাপতি ও রাজ্যের ফৌজদারদের সঙ্গে 'শূরক্রীড়া' করতেন। রাজবাড়ির বহির্ভাগে দশমীর দিন 'কুম্ভকর্ণ-বধ' উৎসব পালন করাই রীতি। একাদশীর দিন 'ইন্দ্রজিৎ-বধ' উৎসব। দ্বাদশীর দিন 'রাবণ-কাটা' উৎসব। মল্লরাজরা 'বলী নারায়ণ' মতানুসারী হয়ে দেবীপক্ষের দ্বাদশী তিথি অবধি উনিশ দিনব্যাপী শারদীয়া দুর্গোৎসব পালন করেন।

॥ ৩ ॥

বন-বিষ্ণুপুরে মৃন্ময়ীর পূজায় একদা দুর্ধর্ষ মল্লরাজারা নরবলি দিতেন—এরকম জনশ্রুতির পিছনে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা সহজেই পাওয়া যায়। কারণ, একদা মল্লরাজগণ ছিলেন গভীরভাবে শাক্ত এবং শৈবপন্থী। শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁরা ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত। তাই মল্লভূমে এখনো শোনা যায় সেই বিখ্যাত প্রবাদ—

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃ পানং চিপিটকঞ্চ চর্বণম্।
শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লরাজস্য লক্ষণম্।।"

—সদা যুদ্ধরত মল্লরাজগণ লোহার চালে জল পান করতেন, চিঁড়ে চিবিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন (চিঁড়ে চিবানো অপেক্ষাকৃত কষ্টকর) আর ঘোড়ার পিঠেই ঘুমিয়ে দৈহিক ক্লান্তিটুকু দূর করতেন।

বিষ্ণুপুর রাজপরিবারে রক্ষিত কুলপঞ্জী থেকে জানা যায়—আদি মল্লের জন্ম ৬৯৫ সালে। তিনি কুড়ি বছর বয়সে রাজা হন। তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। মল্লরাজবংশের চতুর্থ পুরুষের নাম কালু মল্ল। ষষ্ঠ পুরুষের নাম কাউ মল্ল। সপ্তম পুরুষ ঝাউ মল্ল। অষ্টম পুরুষ সুর মল্ল। ডব্লিউ. বি. ওল্ডহ্যাম 'Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District' (1894, Calcutta) অনুসরণে 'বাঁকুড়া গেজেটিয়ার'-এ বিধৃত: "The name Malla is a title of the

Rajas of Bishnupur, the acknowledged Kings of the Bāgdis, and the present Māls who are their neighbours, around whom are centred the most concrete legends which refer to the connection between the two tribes. The Hindu genealogists of the house of Bishnupur assert that this hereditary title Malla means the wrestlers, just as Mānbhum should be Mallabhum the land of the wrestlers."[8]

অরণ্যসঙ্কুল মল্লভূমে মল্লরাজগণ একদা শুধুমাত্র শক্তির উপাসক ছিলেন না, তামসিক শক্তিপ্রিয় ডাকাতদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে তাঁরই আশ্রয়পুষ্ট কিছু দস্যু বিষ্ণুপুরের কাছে গোপালপুরে একাধিক প্রহরী-বেষ্টিত মালপত্রবোঝাই গরুর গাড়ি থেকে দামী ধনরত্নের লোভে গাড়ির যাবতীয় সম্পদ লুঠ করে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ঐ গরুর গাড়িতে অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠাচ্ছিলেন গৌড়দেশে। লুণ্ঠিত বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থাদির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' মহাগ্রন্থটিও ছিল। এই তথ্য অনেকেরই জানা। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "গ্রন্থাপহারক বীর হাম্বীর ১৫৮৭—১৬১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বন-বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।"[৫] 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "রাজা বীর হাম্বীরের শাসনকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি বলে নির্ণীত হয়েছে।"[৬]

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে শাক্ত-শৈবপন্থী বীর হাম্বীর বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। অনেকের মতে, বন-বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের পূজা তিনিই প্রবর্তন করেন। (বর্তমান মদনমোহন-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মল্লরাজ দুর্জন সিংহ। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকে মন্দিরনির্মাণের কাল '১০০০ মল্লাব্দ' উল্লিখিত। আমরা জানি, মল্লাব্দ + ৬৯৪ = খ্রীস্টাব্দ। সেই সূত্রে মদনমোহন-মন্দিরের নির্মাণকাল হলো ১০০০ + ৬৯৪ = ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ।) দীক্ষান্তে বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবীয় নামের কথাও জানা যায়। 'প্রেমবিলাস' এবং 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে রাজার নতুন নাম যথাক্রমে হরিচরণ দাস ও শ্রীচৈতন্য দাস। দোর্দণ্ডপ্রতাপ বীর হাম্বীরের শাক্ত-শৈব মন বৈষ্ণবীয় ভাবরসে গভীরভাবে আপ্লুত হয়, যার ফলে যথার্থ বৈষ্ণব কবির অনুভবে তিনি কান্তকোমল বৈষ্ণবপদও রচনা করেন—

"শুন গো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পারি পানি।
অগুরু-চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না-নিভায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থির॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥"[৭]

কার্তিকী রাসপূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় রূপ বৈষ্ণবদের পরম প্রিয়। তাই বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরে শিল্পস্থাপত্যের এক অভিনব নিদর্শন রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন। তেইশটি স্তম্ভের গায়ে পিরামিড ধরনের ছাদ। ঝামা পাথরের বিশাল বেদি। লম্বা-চওড়ায় চব্বিশ মিটার। উচ্চতায় দেড় মিটার। তাই অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন: "বস্তুতঃ, 'স্টেপ-পিরামিড' বলতে যা বোঝায় বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটি তার উত্তম নিদর্শন, তবে চালের সংখ্যা তিন না হয়ে এখানে চারটি।"[৮] দেওয়াল খিলানযুক্ত ও থামগুলি আটকোণা। টেরাকোটার উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ। কিন্তু এটি কোন মন্দির নয়। এখানে কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ রাসপূর্ণিমায় বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দির থেকে যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এখানে এনে মহা আড়ম্বরে রাসোৎসব পালন করা হতো। বিষ্ণুপুরকে 'গুপ্তবৃন্দাবন' হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য

8 West Bengal District Gazetteers: Bankura—A. K. Banerji, 1968, p. 90
৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১৯৬২, পৃঃ ৪১৯
৬ বাঁকুড়ার মন্দির—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬৪, পৃঃ ১৬৫
৭ পাঁচশত বৎসরের পদাবলী—বিমানবিহারী মজুমদার, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭৩, পৃঃ ১৩৩
৮ বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ ১৮৫

ব্রজমণ্ডলের অনুকরণে স্থানীয় গ্রামগুলির নামকরণ হয়েছিল—দ্বারকা, মথুরা, অবন্তী, অযোধ্যা, রামসাগর ইত্যাদি।

মল্লরাজবংশে 'সিংহ' পদবি প্রথম গ্রহণ করেন রঘুনাথ সিংহ। কিংবদন্তী আছে—অশ্বপৃষ্ঠে যে-পথ অন্ততঃ আটদিনে অতিক্রম করা যায়, সে-ই পথ মাত্র নয় ঘণ্টায় অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ নবাবের কাছে তিনি শৌর্যসূচক 'সিংহ' পদবি লাভ করেন। অথচ মল্লরাজ গোপাল সিংহের সময় ক্ষাত্র শৌর্য-বীর্য ভুলে সমস্ত বিষ্ণুপুর হরিনাম-সঙ্কীর্তনে মেতে ওঠে। বিষ্ণুপুরবাসীকে রাজাদেশে প্রতিদিন হরিনাম জপতে বাধ্য করা হয়, যা 'গোপাল সিং-এর বেগার' লোকপ্রবচনে আজও প্রচলিত। এমনকি একাদশীর উপবাসও ব্যাপকভাবে পালন করা হতো। তার সরস চিত্র রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বিধৃত :

"রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী।
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী॥
চারা মানা হাথিকে, ঘোড়াকে মানা ঘাস।
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস॥"

১৭৪১ সালে মারাঠা অধিনায়ক রঘুজি ভোঁসলে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যা পেরিয়ে পঞ্চকোট তছনছ করে বিষ্ণুপুর আক্রমণ চালান। দুর্ধর্ষ মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের 'বর্গী' বলা হয়।

১৭৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার বর্গী আক্রমণ হয়। সেবার কাটোয়াতে ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজা করছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত। মহানবমীর দিন আলিবর্দি খাঁ হঠাৎ আক্রমণ চালান। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত বর্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়। বর্গী-নেতা ভাস্কর পণ্ডিত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পুনরায় বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ দুয়ারে বিশাল দলবল-সহ উপস্থিত হন। বিষ্ণুপুরবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গড়খাই ও প্রাকারবেষ্টিত মল্লরাজপুরীর ভিতরে বর্গীরা যেতে পারল না। মল্লরাজ গোপাল সিংহ দুর্গতোরণ বন্ধ করে প্রবল হরিনাম-সঙ্কীর্তন শুরু করেন। তখন বর্গীদল চন্দ্রকোণার পথ দিয়ে মেদিনীপুরে লুণ্ঠন শুরু করে। বাংলার জনজীবনে সেই ভয়ঙ্কর বর্গী-হামলার দুঃসহ স্মৃতি শিশুভোলানো ছড়ায় রূপ পেয়েছে—"ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে/বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করলে বিশাল দলমর্দন (যা 'দলমাদল' নামে পরিচিত) কামান গর্জে ওঠে। তার পিছনে অবশ্যই বিষ্ণুপুর সেনাধ্যক্ষের জরুরি নির্দেশ ছিল প্রতিরক্ষাবাহিনীর শিক্ষণপ্রাপ্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের প্রতি। এরকম ভাবনা যেকোন যুক্তিবাদী মানুষ ভাবতে পারেন। প্রবল কামানগর্জনের জন্যই বর্গীদল ভয়ার্ত, হতবুদ্ধি হয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে চন্দ্রকোণার পথে পালিয়ে যায়। অথচ পরম ভক্ত রাজা গোপাল সিংহের মনে ধারণা জন্মায়—মদনমোহন ঠাকুরই কামানে অগ্নিসংযোগ করে বর্গীদলকে তাড়িয়েছেন। তাঁর 'ভাবনা' ক্রমে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি হিসেবে প্রচারিত।

এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়—শাক্ত-শৈবধর্মাবলম্বী মল্লরাজরা কালক্রমে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী হওয়ায় তাঁদের কুলদেবী মৃন্ময়ীর আরাধনায় তথা দুর্গাপূজায় নরবলি তো দূর অস্ত—পশুবলিও নিষিদ্ধ করেছেন। একদা প্রবল পরাক্রান্ত মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপূজা কালের বিবর্তনে 'লৌকিক দেবতা-সমন্বিত' বৈষ্ণব উৎসবে পরিণত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার বিশেষ গুরুত্ব আছে। দুর্গাদেবীর ডানদিকে গণেশের পাশে নবপত্রিকাকে গণেশের 'কলাবউ' হিসেবে পূজা করা হয়। নতুন লাল-পাড় শাড়িতে ঢাকা ও ঘোমটা-টানা, সিঁদুর-চর্চিত কলাবউ বা নবপত্রিকা নয়টি গাছের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় (কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু এবং ধান)। নবপত্রিকাকে আসলে "উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।"[৯] দুর্গাপূজার বিধিমতে নবপত্রিকার নয়টি উদ্ভিদ যথাক্রমে ব্রাহ্মণী, কালিকা, দুর্গা, কার্তিকী (কৌমারী), শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং মহালক্ষ্মীর প্রতীক। নবপত্রিকা প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়পুরাণের শস্যদাত্রী মহাদেবী শাকম্ভরী রূপের কথা মনে জাগে।

মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—'কৃষি'র সঙ্গে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র যোগ আছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "Culture শব্দের মূলে আছে লাতিনের cultura ('কুলতুরা') শব্দ; এই শব্দ লাতিনের Col ('কোল্') ধাতু থেকে হয়েছে, Col অর্থে 'কৃষ্, চাষ করা' আবার 'যত্ন করা', 'পূজা করা'-ও

৯ পঞ্চোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৬০, পৃঃ ২৮২

হয়। Culture-এর অনুরূপ প্রতিশব্দে 'উৎকর্ষসাধন' বেশ হতে পারে, খালি 'উৎকর্ষ' শব্দও চলতে পারে। 'টানা' ও পরে 'লাঙল টানা' বা 'চাষ করা' অর্থে 'কৃষ্' ধাতু থেকে জাত 'কৃষ্টি' শব্দটিকে অর্থের দিক থেকে Culture-এর প্রতিরূপ মনে করে বাঙলায় ব্যবহার করা হতে থাকে বোধহয় গত তিরিশ বছরের ভিতরে। বঙ্কিমচন্দ্র culture অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।... 'কৃষ্টি'-র মূলগত 'কর্ষণকার্য', তা থেকে 'চাষ করা ক্ষেত', তা থেকে 'ক্ষেত্র, ভূমি, দেশ' এবং তারপরে 'দেশের মানুষ, জাতি'। বৈদিক ভাষায় 'কৃষ্টি' মানে 'জাতি'; যেমন, 'পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ' মানে 'পাঁচ জাতি'—প্রথম প্রথম আর্যজাতির পাঁচটি প্রধান শাখা—অনু, দ্রুহ্য, তুর্বশ, যদু আর পুরু বংশের লোকেদের সম্বন্ধে এই 'পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ' শব্দ প্রযুক্ত হতো, পরে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের অর্থ-প্রসার ঘটে। 'চাষ' অর্থেই 'কৃষ্টি' শব্দ পরবর্তী সংস্কৃতে মেলে—culture অর্থে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' শব্দটি সম্বন্ধে একটু অস্বস্তিতে ছিলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হন।... 'সংস্কৃতি' শব্দ ঋগ্বেদে নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থে আছে; আর এবিষয়ে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' থেকে উদ্ধৃত... 'আত্মসংস্কৃতি বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে'—এই শিল্পসমূহই হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।"[১০]

আচার্য সুনীতিকুমারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা অনুসরণে বলা যায়: 'কৃষ্' ধাতু নিষ্পন্ন 'কৃষ্টি' শুধুমাত্র মাঠে 'চাষ করা' অর্থেই নয়—'মনের কর্ষণ', 'চিৎপ্রকর্ষের উন্নতি' এবং তা থেকেই 'সংস্কৃতি' অর্থেও প্রযোজ্য। ফলতঃ, পৃথিবীর সবদেশেই culture-এর মূলে বা পিছনে আছে agriculture; তাই দুর্গাপূজায় নবপত্রিকাতে প্রাগুক্ত "উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে"—এই মন্তব্যের একটি কৃষিভিত্তিক সাংস্কৃতিক ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবাড়ির দুর্গাপূজাতে অভিনবত্ব থাকলেও নবপত্রিকার অর্চনা যথারীতি আছে। সবিশেষ উল্লেখ্য, মহানবমীর মহানিশায় মহামারী খচ্চরবাহিনীর অভিনব পূজায় লৌকিক দেবীর প্রভাব সুস্পষ্ট। এই লৌকিক দেবতার সঙ্গে আছেন মহাষ্টমী তিথিতে পূজিতা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী। তিনিও প্রকৃত অর্থে লৌকিক দেবতা। এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়: "বৈদিক দেবদেবীর মধ্যে 'চণ্ডী' নামক কোন দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণে এই দেবতার উল্লেখ মাত্র নাই। প্রাচীনতর সংস্কৃত অভিধানেও এই নামটির সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। কিন্তু দুর্গা, উমা, কালী, করালী, কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী, হৈমবতী, সতী, অদ্রিজা, গৌরী ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। এমনকি, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শক্তিদেবতার নামের তালিকার মধ্যেও চণ্ডী নামটির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও দুর্গা, নারায়ণী ইত্যাদি নামের সঙ্গে 'চণ্ডী' নামটি স্থান পায় নাই। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালে রচিত কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণ, যেমন 'দেবী-ভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীর নাম উল্লিখিত আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুরাণ একেবারে অর্বাচীন না হইলেও ইহাদের যেসকল অংশে চণ্ডী কিংবা চণ্ডিকার উল্লেখ আছে, তাহা যে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা হইতেই মনে হয়, আদিবাসী সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াই এই দেবী কালক্রমে উচ্চতর হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। তারপর বৈদিক দেবী দুর্গা, উমা ইত্যাদির দ্বারা কালক্রমে প্রভাবিত হইয়া ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন।...

"চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত, অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হইতে পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থানলাভ করিয়াছে। 'চণ্ডী' শব্দটি সম্ভবতঃ অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। দ্রাবিড় ভাষাভাষী দৃশ্যতঃ আদি-অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওঁরাও নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় লাভ করা যায়।"[১১] এইসঙ্গে ইঁদতলায় ইন্দ্রপূজা, অনন্তদেবের পাষাণমূর্তি, বুড়ো ধর্মরাজপূজা ইত্যাদি সবই লৌকিক দেবতার অন্তর্ভুক্ত। □

১০ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৭-৮

১১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪র্থ সং, ১৯৬৪, পৃঃ ৩৩২, ৩৩৬

সমাজবিজ্ঞান

বিকল্প সমাজের সন্ধানে

হোসেনুর রহমান

ধর্মের লক্ষ্য কী? সমাজ ও ধর্মের, মানুষ ও ধর্মের সম্পর্ক কী? বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার তুঙ্গমুহূর্তে বিংশ শতাব্দীর শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে এবং একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে সমাজের যে-চেহারা আমরা দেখছি এবং আগামী দিনে দেখতে যাচ্ছি তার একটি গভীর বিশ্লেষণ করেছেন ইতিহাসবিদ্ অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান। বর্তমান রচনায় আমরা শুধু গভীর বিশ্লেষণই পাচ্ছি না, সেইসঙ্গে পাচ্ছি জীবনমুখী এবং জীবনোত্তরী এক সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশিকাও।

এই শতাব্দী ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজাতি একটা মহৎ অনুভূতিতে চঞ্চল কিংবা উত্তেজিত, একথা বোধহয় বলা যায়। মানুষ এই জীবনটাকে নিয়ে ইতিপূর্বে এত বেশি চাঞ্চল্যবোধ করেনি। এই ধারণা মানুষকে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে সজাগ করেছে। এই সচেতন মানুষ বুঝেছে, এতদিন যে-ব্যবস্থা, যে-সমাজসংস্কার, যে-ধ্যানধারণা নিয়ে এই পৃথিবী চলছিল সে-চলা আর চলছে না। নতুন বিশ্বব্যবস্থা চাই। নতুন সামাজিক বিধান চাই। চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। কেমনতর সেইসব পরিবর্তন-চিন্তা, সেটা ভেবে দেখবার চেষ্টাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

আসলে মানুষ ইতিমধ্যেই একবিংশ শতাব্দীতে বাস করতে আরম্ভ করেছে। কেবলমাত্র অঙ্কের হিসেবে আর তিন-সাড়ে তিন বছর বাকি। এই মানুষ বৈজ্ঞানিক আর প্রাযুক্তিক কৌশলে এমন এক নবতর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তার এখন ভাবতে ভাল লাগে, মৃত্যুকে সে প্রচুর পরিমাণে বিলম্বিত করতে পারে। সেই অর্থে তার জীবনীশক্তিকে বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে সে ধরে রাখতে পারে মাত্র বিগত দুই-তিন প্রজন্মের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। আর কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, ই-মেল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স-এর সৌজন্যে নিজের ঘরে বসে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে সে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারে। এইসব দুর্লভ মূলধন আর একটা শব্দ প্রয়োগ পৃথিবীর দেশগুলিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। তাকে বলা হচ্ছে 'বিশ্বায়ন' ('Globalization')। বিশ্বদৃষ্টি ছিল এতদিন আমাদের মূলধন। এই অপরিণত বিশ্বে আমাদের কপালগুণে কখনো কখনো বিশ্বমানবের দেখা পেয়েছি আমরা। তাঁরাও বলে গেছেন "এহ বাহ্য"। আরও চাই। আরও বেশি করে মানুষ হওয়া চাই। অর্থাৎ আরও চেতনা, আরও বেদনা চাই। তবেই তো পূর্ণতার স্বাদ এই জীবনে পেতে পারব।

আজ মানুষ অন্য কথায় মত্ত হয়েছে। ঐসঙ্গে অন্যতর জিজ্ঞাসাও তাকে নতুন জগতের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করছে। এই অধিকতর সুখী, সম্ভোগী, সর্বত্রগামী মানুষ দেখতে পাচ্ছে—জীবন দীর্ঘ হচ্ছে, পৃথিবী ছোট হচ্ছে, হাতের কাজ যন্ত্র-একনিমেষে সম্পন্ন করছে। দেহের বিকল্প অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছে। শিশুর জন্মের অনেক আগে ধনী বাবা-মা কেমন শিশু চান, তাও স্থির করতে পারছেন। যাকে চান না, তাকে বোধনের আগে বিসর্জন দিতেও পারছেন। এই মানুষ 'টিভি' নামক নতুন দেবতার কাছে বাধা পড়েছে। সংস্কৃতি আর মানব-সংহতির চাবিকাঠি এখন টিভি নামক দেবতার হাতে। ইতিমধ্যে মার্কিন মুলুকে তাবড় তাবড় একাধিক টিভি কোম্পানি মিলেমিশে একটা টিভি কোম্পানি গড়ে উঠেছে। Disney এবং ABC, Time Warner এবং CNN—এই হলো পৃথিবীর একক বৃহত্তম মিডিয়া—"একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"। একে বলা হচ্ছে - "globally homogenized 'Mc World'"। এই মিকিমাউস কালচার পৃথিবীর সংস্কৃতিকে সংস্কার করে চলেছে। এই সংবাদ এবং স্বাদ আমাদের টিভিও দিচ্ছে। আমরা এতদিন বলেছিলাম, এখনো বলছি—"বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"। এখন এক রং, এক সং, এক ঢং।

পৃথিবীটা কেমন রঙহীন হয়ে পড়ছে। কায়রো থেকে কলকাতা, করাচি থেকে দিল্লী সর্বত্র এক ডিজাইন—এক গাড়ি, এক বাড়ি, এক রেস্তরাঁ, এক হোটেল, এমনকি এক নির্যাস। আর সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক এবং চীনের সর্বাত্মক ক্ষমতাভুক্ত হওয়ার আগের মুহূর্তের হংকং। আজকাল কী সত্যি সত্যি পশ্চিম পশ্চিমেই আছে? পশ্চিম আর পশ্চিমে নেই। একদা যেখানে তারা সাম্রাজ্য করেছিল সেসব জগতে এখন পশ্চিমী কালচারের প্রতিপত্তি। সিঙ্গাপুর আর হংকং তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এদিকে জার্মানি আর ফরাসী দেশ রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের মধ্যে জীবনের গভীর অর্থসন্ধানে স্বতঃপ্রবৃত্ত। একাজে মার্কিন মুলুক কিংবা ক্ষতবিক্ষত রাশিয়া পিছিয়ে নেই। কারণ কী? এরা বিকল্পের সন্ধানে ব্যস্ত। ব্যস্ততাটা থেকেই গেল। একদিন ব্যস্ত ছিল এরা যন্ত্রদানব প্রতিষ্ঠায়। আজ সে-কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। আজ এরা জানতে চাইছে, যন্ত্র কী চিন্তা করতে পারে। আত্মা নিয়ে চিন্তা না করলেও যন্ত্রের বিবেক আছে কী—এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। মানুষের মন যে বিশ্বজোড়া, দেহ যতই বাদ সাধুক। এ দুয়ের সমবন্টন, সংযোজন, সংযুক্তিকরণ কি করে হবে? এসব জটিল প্রশ্ন জটিল মানুষকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আরও বেশি করে সজাগ করছে। পঞ্চাশ বছর আগে মানুষকে এত সজাগ হতে হয়নি। জীবন সম্বন্ধে এত ব্যাকুল হতে হয়নি। জন্মেছি, বেশ করেছি। সমাজসংস্কার, স্কুল-কলেজ করে ভদ্রলোক বিনত বশংবদ হয়ে একদিন সংসার করে, প্রত্যহ একটু একটু করে জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে রচনা করে একদিন হঠাৎ প্রস্থান করেছে। তাই মৃত্যু তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। এই হলো সাধারণের জীবনের পাঁচালী। আর অসাধারণ? তাঁরা বিশ্বায়নের অনেক আগেই বিশ্বচেতনার কথা বলেছেন। ভারতবর্ষের মানুষ রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচেতনা বলতে যেমন উদগ্র ছিলেন, তেমন কি আধুনিক সভ্যতার তুঙ্গলগ্নে অন্য কোন দেশ, অন্য কোন বিশ্বমানব এমন করে বলতে পেরেছেন অথবা পারছেন? একটি বৈদিক প্রার্থনা (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ শতক) এরকম ঃ

"ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তঃ মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।১)

—ঈশ্বর আমাদের সমভাবে রক্ষা করুন, সমভাবে বিদ্যাফল দান করুন। আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের লব্ধ বিদ্যা যেন সফল হয়। আমাদের মধ্যে যেন কোন বিদ্বেষভাব না থাকে। শান্তি শান্তি শান্তি।

অপূর্ব একটি প্রার্থনা আছে (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ শতক) অথর্ববেদের 'পৃথিবীসূক্তে' (১২।১।৩৫) ঃ

"যৎ তে ভূমে বিখনামি ক্ষিপ্রং তদপি রোহতু।
মা তে মর্ম বিমৃগ্বরি মা তে হৃদয়মর্পিপম্ ॥"

—(হে পৃথিবী!) তোমার ভূমি যতটুকু আমি খনন করি ততটুকু যেন শীঘ্রই উৎপন্ন হয়। আমরা যেন তোমার হৃদয় অথবা প্রাণশক্তিতে আঘাত না করি। সর্বংসহা ধরিত্রীকে প্রণাম করতে হয়, প্রাণের চেয়েও বেশি করে ভালবাসতে হয় অতিসন্তর্পণে, সে যে কেবল গাছপালা বনস্পতির আধার নয়, সে যে মানুষের মনের মতোই স্পর্শকাতর। সে মৃন্ময়ী, সে যে চিন্ময়ী, সে যে ভুবনমনোমোহিনী। "তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।"

আজ বিজ্ঞানী আর প্রাযুক্তিকের মনে হচ্ছে, এই বসুন্ধরা মায়ের প্রতি নিত্য অবিচার আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। কেবলমাত্র নিউ ইয়র্ক শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে আরেকটা শহর কিনতে হবে মার্কিন প্রশাসনকে, যেখানে তার সব জঞ্জাল নিয়ে গিয়ে ফেলা যায়। ইতিমধ্যে এই কাজ সমৃদ্ধ ইউরোপের একটি দেশ আক্ষরিক অর্থে করেই বসেছে। আফ্রিকায় একটি ভূখণ্ড তারা অর্থের বিনিময়ে কিনেই ফেলেছে নিজেদের দেশের জঞ্জাল গচ্ছিত করবে বলে। আহা, একেই তো 'বিশ্বায়ন' বলে! যন্ত্রচর্চা করতে করতে একদা সোভিয়েত দেশ মানুষের অন্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা ভুলেই গিয়েছিল। মানুষ যে এখনো ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি ছাড়া অন্য কিছু খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে না! এই মর্মান্তিক সত্যভ্রষ্ট হয়ে সেদিনের সোভিয়েত দেশ বিপথগামী হলো। এতটাই হলো যে, খাদ্যে সে আজ তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত।

এমন কেন হলো? মানুষের সমাজে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির চেয়েও বড় হলো প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক সংস্থা। প্রাযুক্তিক সমাজ কেবল দক্ষ বিশ্বকর্মা চাইল, চাইল অস্ত্রাগার নির্মাণের জন্য ভয়াবহ সব পণ্ডিতপ্রবরদের। ফলে হারিয়ে গেল 'মানুষ'। প্রাধান্য পেল প্রতিষ্ঠান, দল, রাজনৈতিক কর্মসূচী, তত্ত্বপ্রধান অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠান? নিশ্চয়ই থাকবে। দল কিংবা ধর্মপ্রতিষ্ঠান? নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু মানুষ আগে। এরা সব পরে। এই চাহিদা থেকেই জন্ম নিল

বিকল্প সমাজের চিন্তা। প্রশ্নর হলো বহু সাংস্কৃতিক, বহুমতবিশিষ্ট, বহুত্ববাদী মুক্ত সমাজের চিন্তা। আমার চোখের সামনে এজগতে যদি গত দু-দশকে এত পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে তাহলে এই বিপুল পরিবর্তনের কোন ভাব কী আমার ব্যক্তিজীবন, পরিবারজীবন, সমাজজীবনকে উচ্ছ্বসিত করে তুলবে না? এই গভীর আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই একটা সম্মিলিত প্রস্তাব সরবে উচ্চারিত হচ্ছে: 'এই মলিন বস্ত্র এবার ছাড়িতে হবে যে!'

হ্যাঁ, মানুষের মনের চাহিদা এই: একটা মৌলিক পরিবর্তন চাই। অর্থনীতি এবং রাজনীতি? প্রচলিত ট্র্যাডিশন্যাল মানদণ্ড দিয়ে এই দুই বিশেষ বিষয়বস্তুকে আর বোঝা যাবে না। এদের বোঝার জন্য চাই নতুন মূল্যবোধ। এবং মূল্যবোধবর্জিত প্রচলিত ধ্যান-ধারণা দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। নতুন সচেতনতা, নতুন প্রেরণা, নতুন উপলব্ধি আমাদের জীবনকে প্রতিদিন উচ্ছ্বসিত করছে। এই বিকল্প সমাজের কথা সবার আগে উচ্চারণ করলেন পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্ ডঃ ই. এফ. সুমাকার। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শেষ করে গেলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A Guide for the Perplexed'। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির ছবি আছে এই গ্রন্থে। তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন যে, ভবিষ্যতের যন্ত্রসর্বস্ব পৃথিবী সঙ্কটাপন্ন। এই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন হার্দিক সম্পর্ক, সংসর্গ সম্ভব নয়।

কেবল বাজারের লেনদেনের ব্যবসায়িক সম্পর্কে মানব-বসুন্ধরা শুকিয়ে এল। মানুষই যে সবকিছুর প্রাণবিন্দুতে, মানুষই যে শেষকথা, মানুষই যে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ মূলধন—একথাটি সুমাকার বলছেন বারবার। তাই দাবি করছেন—মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে হলে চাই নতুন পন্থা, চাই নতুন উপায়। 'প্রাযুক্তিক সমাজ' হচ্ছে খণ্ডছিন্ন, অবসাদগ্রস্ত, বিষণ্ণ মানুষের সৃজনশক্তির প্রলাপমাত্র। সহজ স্বাভাবিক সুন্দর মানুষ পাথরে গড়া মহানগরে বাস করতে পারছে না। চিন্তাশীল মানুষ প্রতিদিন আবিষ্কার করছে এই সত্য যে, একটা 'মধ্যপন্থা' চাই। এই মধ্যপন্থা হবে পশ্চিমের অত্যাধুনিক জটিল টেকনোলজি এবং অন্যদিকে পূর্বদেশের মরচে ধরা অতি পুরাতন যন্ত্রপাতির মধ্যদেশে বিরাজমান সহজ এক যন্ত্রদেবতা। জল তোলার সবল পাম্প, উন্নত ঘরবাড়ি তৈরির সরঞ্জাম—যা সব গ্রামের কর্মকার, কুমোর, স্যাকরা সহজেই সুসম্পন্ন করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে সেসব সহজ টেকনোলজির মহিমা বিস্মৃত হয়েছি। এখন শিশু তার ধনবাদী পিতাকে বলতেই পারে: আমার মোবাইল টেলিফোন চাই। পোড়া কপাল! 'পথের পাঁচালী'র টেলিফোনের তার এবার বাতিল হলো বলে। জীবনটা যে যথেষ্ট রহস্যঘন, একেবারে সবটা অঙ্কের ক্রীতদাসত্ব করে ফুরিয়ে যেতে চায় না—এসব এখন বড় বেশি কাব্যনাট্য বলে মনে হতে পারে। তবু আমাদের গরিব দেশে একটা লিস্ট বানানো যেতেই পারে, কী কী 'tools' আমরা এখনো গ্রামে তৈরি করতে পারি। এখনো বলতে পারি, কিছু কিছু ব্যাপারে 'Hi-tech' দরকার নেই।

খাদ্যের কথা ধরা যাক। মাছ-মাংস (শুয়োর, গরু, ছাগল) ইতিমধ্যে ফুরিয়ে আসছে। সুমাকারের মতো চিন্তাবিদ্ বিশ্বাস করেন, ২000 সালে আমাদের শিশুদের খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়বে। এই সমস্যার সমাধান তিনি করে দিতে পারলেন। বললেন: 'Three dimensional protein production with solar energy." এর অর্থ—উন্নত ও বহুজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করা, সুনিয়ন্ত্রিত শস্যভাণ্ডার মজুত করা এবং দিকে দিকে বীজবপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতের খাদ্যসঙ্কট এড়ানো সম্ভব, ঘোষণা করলেন সুমাকার। কারণ, প্রচলিত খাদ্যসামগ্রীতে আগামী কালের পৃথিবীর সব শিশুদের পেট ভরবে না।

বহুজাতিক সংস্থা, অস্ত্রবাজার, রাজনৈতিক শীর্ষসম্মেলন মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে পারছে না। রক্ষাকবচ আছে নতুন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নতুন মানুষের হাতে। এই মানুষ ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতে তাদের কথা শোনাতে আরম্ভ করেছে। এদের প্রধান বক্তব্য—ভিয়েৎনাম, সাম্প্রতিক উপসাগরীয় যুদ্ধ, রাউন্ডার গণহত্যা, উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রাত্যহিক শিশু-নর-নারী নিধনযজ্ঞ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম-ইহুদিদের মধ্যে হিংসা, সন্ত্রাস, মৃত্যু আর কাশ্মীর-করাচিতে ধর্ম, অঞ্চল, জাতির নামে মানবহত্যা কী প্রমাণ করে না যে, এই বিশ্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই? কেবল হিংসার বিস্তৃতিকরণ কী প্রমাণ করে না যে, এই জর্জরিত জগতের নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত অপরিহার্য?

এই সেদিন গান্ধী, সুমাকার, তার আগে রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ স্ব-স্ব পথে বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন বৈকি। একটু আধটু পরিবর্তনে হওয়ার

নয়—একথা স্বামীজী বারবার বলেছেন। কেবল পরিবর্তন ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এও ভারতীয় মনীষীরা বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন অনেক মূল্য দিয়েই এই জীবনের সার্থকতা। অনেক কষ্ট করে বুঝতে হয় মানুষকে যে, সে এই জীবজগতে জন্মেছিল প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম স্বীকার করে। তারপর অনেক তপস্যা, অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে তাকে 'মানুষ' হয়ে উঠতে হয়। তখন বোঝা যায়, পশুপক্ষী পশুপক্ষী, তরুলতা তরুলতা। এই মানুষ যে কী অসীম শক্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী—এই সত্য ভারতীয় মুনিঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে পর্বতের গুহায়, হিমালয়ের পাদদেশে তপস্যা করে জগৎকে জানিয়েছিলেন। শাস্ত্র নয় মানুষ, ধর্ম নয় মানুষ, দেশ নয় মানুষ—এই পরম উপলব্ধি আমরা অর্জন করেছিলাম। কারণ, আমরা বিশ্বাস করেছি মানুষের অমৃতত্বে, বিশ্বাস করেছি—মানুষই সত্য, সত্যই ঈশ্বর; বিশ্বাস করেছি—এই সুন্দর পৃথিবী মানুষের হাতে গড়া স্বর্গ। অতএব, মানুষ আর এই মনুষ্যলোকের মঙ্গলের জন্য চাই পরিবর্তন।

প্রথম পরিবর্তনের চাহিদা মানুষের মনে জন্ম নিল সেদিন, যেদিন সে অপর মানুষের তপ্ত সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। এখন পড়ুয়ারা শ্রেণীকক্ষে বসতে না পেরে বাইরে এসে বসে অধ্যাপকের বক্তৃতা টিভি মনিটরে দেখছে। অর্থাৎ বহু ছাত্রেরই কোন ব্যক্তিগত অনুভূতি কোনপ্রকার সৃজনশীল উদ্যমে পরিণত হতে পারছে না। সুশীল পাঠক, আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ক্ষমা করবেন। বহু বক্তৃতা করতে হয়। বক্তৃতা করতে অনেক সময় ভাল লাগে। যদি বিষয় আমার মনের মতো হয়। আর মনের মতো বিষয় না হলে বেশির ভাগ সময়ই দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু যাদের চোখে দেখছি, যাদের তপ্ত অনুভূতি আমি যেন প্রায় স্পর্শ করতে পারছি, তাদের এবং আমার মাঝখানে একটা কাঁচের পর্দা টেনে দিলে আমি একেবারেই বলতে পারব না। সেইজন্যই তো যত দিন যাচ্ছে, বক্তা-শ্রোতার নৈকট্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বক্তৃতার স্টাইলও দ্রুত পালটে যাচ্ছে। আমরা সবাই যেন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলে চলেছি। বক্তৃতা যখন করি তখন দু-একজন শ্রোতার দিকে বারবার চোখ চলে যায়। কারণ, তাঁরা কথা না বলে কত যে কথা বলে যান! মনে হয়, আমি তাঁর কিংবা তাঁদের না-বলা কথা সব বলে চলেছি। সেটা কী কম আনন্দ! আমরা সৃষ্টি করি মনের আনন্দে।

এখন আমাদের নিজেদের বড় বেশি 'বহিরাগত' ('outsider') মনে হয়। কিন্তু সভ্যতার একটা বড় অনুশাসন হলো—আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে কোন এক সৃষ্টিকর্মে ফুটিয়ে তুলতে পারি যেন। এখন সভ্য মানুষের মনে হয়, সে বড় বেশি পরাজিত। বড় অসহায়। প্রায় মুমূর্ষু এক সৈনিক। এক বিশাল জনস্রোতে নামহীন এক সভ্য। জনৈক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী চমৎকার করে মানুষের এই অন্তিম সমস্যার কথা বলতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, আমরা বড় বেশি অসুস্থ মানুষের অসুখ নিয়ে ভাবি। কেবল তাদের অসুখের কথা শুনে চলেছি। আসলে সুস্থ-সবল মানুষদের সুস্থতা নিয়ে অনুধ্যান করলে আমরা অনেক বেশি লাভবান হতাম। অর্থাৎ প্রশ্নটা এরকম : 'আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন কে সবচেয়ে সুস্থ মানুষ?'—এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর সহজে পাওয়া যায়নি। যাবেও না। কিন্তু এর উত্তর আমাদের সকলের দরকার। আমি উত্তরটা দিতে চেষ্টা করছি।

কলকাতায় কোন এক সকালবেলার নিষ্প্রাণ এক মুহূর্তের কথা। আমি বিশাল একটি পার্কের সামনে বাস করি। কোনদিন প্রাতঃভ্রমণে যাই না। বিশেষ প্রয়োজনে পার্কের বাইরের ফুটপাত দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন সকাল সাড়ে ছয়টা। একটি নবীনা স্কুলে চলেছে। মুখে একরাশ ব্যথা মাখানো। যেন স্কুলে না গেলেই ভাল ছিল। মনে মনে বললাম, কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে! যেখানে খুশি বেড়িয়ে যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন এমন কী মন্দ জিনিস! এমন সময় হঠাৎ দেখি, সব নিয়ম ভেঙে একটি যুবক উলটো দিক থেকে সাইকেল চালিয়ে নবীনার কাছাকাছি এল। হঠাৎ মনে হলো, সূর্য তার সব কিরণটুকু এই মেয়েটির মুখে ঢেলে দিল। কয়েক মুহূর্তের বাক্যবিনিময়। ব্যস! সাইকেল নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মেয়েটি 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'র মতো দপ করে জ্বলে উঠল। যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল। এই বুঝি তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন, সুস্থ, সুন্দর মুহূর্ত। শিল্পীর ভাষায়—'Peak experience'।

আমরা সবাই এমন একটি মুহূর্তের জন্য বেঁচে থাকি। সত্যি কী তাই? আমরা আসলে আজকের এই ভোগ্য-পণ্যবাদী সমাজে, প্রাণহীন প্রতিযোগিতার বাজারে, নিষ্ঠাশূন্য, প্রেমশূন্য আচার-অনুষ্ঠানাদির ভিড়ে ভালবাসতে ভুলে যেতে চেয়েছি। একপ্রকার সুখ, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির

জন্য জীবনে মহাজীবনের দাবিকে অস্বীকার করেছি বিবেকশূন্য হৃদয়ে। সবটাই সুখের কাছে গচ্ছিত রেখেছি। আমরা সবাই বহিরাগত। সমাজ বিদায় নিয়েছে। সে আছে কেবলই কুৎসা, চরিত্রহনন, দুঃশাসনতন্ত্র নিয়ে। জীবনের সঙ্গে জীবনের ঐকতানে তার যত আপত্তি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' আজও ভারতবর্ষে বর্তমান, অপ্রতিহত। কিন্তু বর্তমান টেকনোলজি পল্লীগ্রামকে গ্রাস করতে চলেছে। গ্রামে শহরে দূরত্ব কমেছে, কিন্তু গ্রামের গ্রাম্যতা ঘোচেনি। কর্ডলেস, মোবাইল টেলিফোন, রঙিন টিভি বৈচিত্র্যহীন মনকে রাঙিয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু মানুষ আজও—কোন কোন মানুষ আজও—মানুষকে ভালবাসতে পেরে হাতের মুঠোয় পৃথিবীটাকে পেয়েছে মনে করতে পারে। আজও তেমন মানুষ উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারে ঃ

"যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যাজিতে মোরে করো না আহ্বান।"
(কর্ণ-কুন্তী সংবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই মানুষ বিকল্প সমাজের সন্ধানে জীবনের আকণ্ঠ প্রেম, অশেষ জিজ্ঞাসা আর তপ্ত সম্পর্ক (তাকে স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক, মরমী বলার কোন হেতু নেই) রক্ষা করবার জন্য আর একটু ঘনিষ্ঠ জীবন প্রার্থনা করে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নইলে জীবন বিফলে গেল মনে করে; এই মানুষ টাকার পাহাড়ে বসে এজীবনের রামধনু রচনা করতে চায় না। মানুষের মুখোমুখি, 'শিশু ভোলানাথ'দের জগতে বসে 'জগৎ পারাবারের' রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সঙ্কল্প করে, বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার একটা অর্থ বুঝবেই সে একদিন—এই তার একান্ত প্রার্থনা।

এবার হয়তো-বা বোঝা গেল, বিকল্প সমাজে সেই মানুষ সুস্থ, সেই মানুষ আনন্দিত, সংবর্ধিত—যে কিছু সৃষ্টি করে, ভালবাসে, জীবনের জন্য নিজেকে ক্ষয় করে। সেই মানুষ প্রতিদিন রূপান্তরিত, যা আজ তাকে ধরে, কাল সেই মানুষ অধরা। সেই মানুষ ক্রমবর্ধমান, প্রতিদিন তাকে প্রগতির চিহ্ন বহন করতে হয়। যা পেয়েছে আর যা পাবে বলে সে জীবনসর্বস্ব পণ করে বসে আছে—তার জন্য তার প্রস্তুতির শেষ নেই। দুঃখ আর আনন্দের মালা গেঁথে সে অমরাবতীর তীরে মানুষের জন্য বারমাস্যা রচনা করে। মালা গাঁথে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবনের প্রতীক্ষার প্রহরগুলিকে ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে অতীব মূল্যবান জ্ঞান করে সে আনন্দে বিভোর হয়।

চিন্তাশীল মানুষ, বেদনার্ত মানুষ, কান্নার সরোবরে নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ কোনমতেই নিঃশ্বাস নিতে পারে না এই কৃত্রিম, হৃদয়হীন, মানবতন্ত্রহীন জগতে। কারণ, সেই মানুষই আসলে সবচেয়ে সুস্থ মানুষ (healthy person)। জলুস তাকে মুগ্ধ করে না, অর্থ তাকে বিশ্লিষ্ট করে না, খ্যাতি তাকে দুর্বল করে না। মানুষ কেবলই তাকে টানে। এই মানুষ সুমাকারের "Small is beautiful" বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে, আনন্দ দিয়ে গ্রহণ করে। সভ্যতা টিকে আছে আজও এই চিন্তার মধ্যে। বিউটি পার্লারে, টারমিনেটার দুই-এ, ক্লোনিং অব বেবিতে মানুষের পণ্যবাদী, ঐশ্বর্যশূন্য, চিন্তাশূন্য অহঙ্কার টিকে থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির মৃত্যু হবেই হবে। এই ব্যক্তিকে নিয়ে যত বিপত্তি। যত বিপদ। এই বিপুল সমাজ, এই স্যাটেলাইট-সর্বস্ব জীবন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারছে না। এই ব্যক্তিমানুষ কোন অবস্থাতেই ধর্মশূন্য থাকতে পারছে না। আর মানুষ 'টয়োটা-সুজুকি'কে ঈশ্বরে রূপান্তরিত করতে পারছে না। জর্জ বার্নাড শ বোধ করি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঘোষণা করলেন ঃ "Modern man cannot live without a religion." আর্নল্ড টয়েনবির 'A Study of History' শিরোনামে গবেষণা-গ্রন্থগুলির প্রধানতম বিষয়ও এই যে, আধুনিক মানুষের একটি ধর্ম চাই। আর তৃতীয় ব্যক্তি ইউরোপে সুমাকার, যিনি ঐ একই চাওয়ার কথা বললেন।

এই ধর্ম এই বিশাল পৃথিবীর সব ধর্মপ্রতিষ্ঠানে নেই। হোয়াইটহেড যথার্থই বলেছিলেন ঃ "Religion is what a man does with his solitude." (ধর্ম তা-ই যা মানুষ তার নির্জন মুহূর্তকে নিয়ে করে।) কিন্তু আধুনিক মানুষের 'নির্জনতা' কোথায়! অবশ্য ধর্ম শুধু তা-ই নয়, ধর্ম আরও কিছু। মানুষ তার গভীর, একান্ত অন্তরতম শান্তিকে নিয়ে যা করে তাই তার ধর্ম। ধর্মের পিছনে থাকে তার সুদূরের পিয়াসী মন, তার জীবনদেবতা। আসলে এই এমন সব কংক্রিটে তৈরি সভ্যতায় মানুষ সন্তোষশূন্য, অন্তঃসারশূন্য, সম্পর্কশূন্য, বিরহের এক-একটি দীপ যেন। বেঁচে থাকবার জন্য যে উদগ্র জীবনীশক্তি অপরিহার্য, সেই শক্তির অভাব মানুষকে ক্লীবে পরিণত করেছে। সে ধার-করা আলোয় জীবনের ঔজ্জ্বল্যকে অনুভব করে অহঙ্কারবোধে উচ্ছল হয়ে উঠতে চায়। মার্কিন পৃথিবীতে যখন তখন শোনা

যায়, জনৈক ব্যক্তি 'কর্নার কাবার্ড' থেকে রিভলবার বের করে (টেলিফোনে) কথা বলতে বলতে নিজেকে হত্যা করলেন। তিনি নিজেকে নিজের কাছে ধরা দিলেন এই প্রথম। এই তাঁর এতদিনে নিজের কাছে আসতে পারা। আহা, আজ যদি কোন ওয়ার্ডসওয়ার্থ বেঁচে থাকতেন!

মানুষ কী করে তার স্থৈর্য ফিরে পাবে, ফিরে পাবে শান্তি? কী করে সে আত্মপরিচয় থেকে আত্মোপলব্ধি পর্যন্ত যাত্রা করবে? জীবন এক নিরন্তর সংগ্রাম। তাই তো মানুষ শেষ পর্যন্ত 'biological' নয়, 'biographical'; জীব থেকে শিবে উন্নীত তাকে হতেই হবে। এই মননহীন, মমত্বহীন জগতে মানুষের মুক্তি কোথায়? তাকে যে আবার নিজেকে হারিয়ে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করা চাই। তবেই তার শান্তি, তার মুক্তি। হাক্সলী, কামু, কলিন ও উইলসন প্রমুখ ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মানুষেরা এই সমস্যার কথা ভেবেছেন, লিখেছেন। কিন্তু শেষকথা কেউ বলতে পারেননি। বর্তমান পৃথিবী আর টেকনোলজি মানুষের এই সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলেছে। আমরা সবাই আধুনিক অভিমন্যু। প্রবেশপন্থাটি কোনমতে আয়ত্ত করতে পেরেছি হয়তো-বা, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ কোনমতেই আবিষ্কার করতে শিখিনি। তবু মুক্তি মানুষের চাই। মানুষকেই 'evolve' করতে হয়, 'transcend' করতে হয়। অতীন্দ্রিয় সত্তা (কিংবা আত্মা)-র কথা দার্শনিকরা বলেন। হাক্সলীর মতো দার্শনিক কোন একটা কিছুতে ডুবে যেতে চান। তা এল. এস. ডি.-ও দিতে পারে। নিজেকে সম্পূর্ণ দিতে পারা চাই। "আমার যে সব দিতে হবে।" আসলে ধর্ম হলো নিজেকে দিতে পারার, উজাড় করে দিতে পারার এক মানবশিল্প। একটু একটু করে জীবনটা আত্ম-সমর্পণের একটা প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। তবেই ধর্ম হলো। ধর্ম কী হাটে-মাঠে সভা-সমিতি করার জিনিস? আমরা যে প্রতিদিন জীবনযজ্ঞে নিমজ্জিত হয়ে আছি, জড়িয়ে আছি আচারে বিচারে, সাদায় কালোয়, ভালয় মন্দে—এ তারই মধ্য দিয়ে অকস্মাৎ একদিন সত্যের ইঙ্গিত হয়ে ওঠা, জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করা। এই হলো আধুনিক মানুষের ধর্ম।

এক প্রেমিক মদন বাউলের কথা দিয়ে শেষ করা যেতে পারে। সে জন্মসূত্রে মুসলমান। গোঁড়া মুসলমানেরা তার নিন্দা করল। কিন্তু মদনের প্রাণে যে সুর লেগেছে! সে গাইল :

"যদি করছ মানা ওগো বন্ধু এমন সাধ্য নাই।
আমার নামাজ আমার পূজা গানে গানে চলছে তাই।
কোন ফুলের নামাজ রংবাহারে
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
আবার বীণায় নামাজ তারে তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

এবার মানববন্ধু কবীর শেষকথা বলেন: "বহতা পানী নির্মলা বন্ধা গনধিলা হোয়।"—"যে-জল বহিয়া চলে তাহা নির্মল থাকে। বদ্ধজল উঠে পচিয়া।"

এই জগতে এর চেয়ে বেশি ধর্মের আর কী ধারণা সভ্য মানুষ করতে পারে? এই ধারণায় ফিরে আসবার জন্য অন্য এক বিকল্প সমাজ চাই। সে-সমাজে টেকনোলজির এত প্রতাপ থাকবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংসর্গের ঐশ্বর্যচ্ছটা থাকবে। মানুষের প্রাণে গান থাকবে। হৃদয়ে থাকবে প্রেম। তবেই মানুষ মানুষের জন্য বাঁচবে।

কথাটা যত সহজে বলা সম্ভব হলো, কাজটা তত সহজসাধ্য নয়—একথা আমরা জানি। তবু তো পাথরে ফুল ফোটে, মানুষ বেঁচে থাকে। শেষকথাটা শেষ করতে করতেও শেষ করা যায় না। আসলে একালের ঋষিতুল্য মানুষ যাঁরা, তাঁরা এই কথাটাই বলতে চাইলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতি মানুষের ধ্যান-ধারণাকে বড় বেশি চালনা করেছে, প্রভাবিত করেছে। এবার মানুষ অর্থনীতিকে চালনা করুক, প্রভাবিত করুক। অর্থনৈতিক উন্নতি পৃথিবীর মানুষের বেকারত্ব, ক্লীবত্ব, হিংসায় উন্মত্ততা এতটুকু হ্রাস করতে পারল না। কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে: "Adequate economic standard has been established." (উপযুক্ত আর্থনীতিক মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।) এসবের অর্থ অপ্রতিহত বৃহৎ শক্তির আরাধনা, আর এর মধ্যেই আছে মানুষের নিত্য অবমাননা। মানুষের এই দেহ, জগতের এই শক্তিপুঞ্জ—এসব কিছুর পুনর্জাগরণ হচ্ছে, পুনর্বিন্যাস ঘটছে। এসবই অপেক্ষা করছে পুনর্জন্মের জন্য, নবজীবনের জন্য, নতুন এক পৃথিবীর জন্য।

এই নতুন পৃথিবী দাবি করছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির। দাবি করছে নতুন এক দীপ্ত শিখার—যা দিয়ে মানুষ তার বুদ্ধি, তার শুদ্ধি, তার চেতনাকে সুসংহত করবে; শক্তিকে, রাষ্ট্রদানবকে করবে বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার অন্তর্গত। অপ্রতিহত ক্ষমতামদমত্ত রাষ্ট্রপ্রতিরা প্রলুব্ধ হবেন সেই বিকল্প সমাজব্যবস্থার প্রতি। কারণ, সেই সমাজে প্রার্থনা মানুষের সঙ্গীতে বিমূর্ত হবে, সন্ত কবীরের বাণীপ্রবাহ মানুষকে সুন্দর করে তুলবে। আমরা সেই সমাজের জন্য অপেক্ষা করে আছি।□



মালদা যাদুঘরের দুর্গা কি রুদ্রাংশদুর্গা ?

বলরাম মণ্ডল

দুর্গার পূজা কতদিনের পুরনো সেনিয়ে এখনো তর্কের শেষ নেই। বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত দুর্গামূর্তি দেখে একথা এখন নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অন্ততঃ বারশ বছর আগেও বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। গবেষক বলরাম মণ্ডলের অনুসন্ধান সেবিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছে।

টি. এ. গোপীনাথ রাও তাঁর 'Elements of Hindu Iconography' গ্রন্থে লিখেছেন, দেবী দুর্গা ভিন্ন ভিন্ন নাম ও বিবিধ রূপে কল্পিত হয়েছেন। কখনো তিনি চতুর্ভুজা, কখনো অষ্টভুজা, আবার কখনো দশভুজা বা তারও অধিক। তাঁর মতে, চতুর্ভুজা মূর্তিতে কখনো দেখা যায় দেবীর কণ্ঠে হার, আর বাহুতে শোভিত হয় কেয়ূর। তিনি ডানহাতের একটিতে অভয়দান করছেন, অপরটিতে করছেন চক্রধারণ। বামহাতের একটিতে বরমুদ্রা, অন্যটিতে থাকে শঙ্খ। কিন্তু মালদার যাদুঘরে রক্ষিত চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তির সঙ্গে এই বর্ণনা মেলে না। মালদা শহর থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে ছোটখাট শহর গাজোল। গাজোল থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রাম। সেখানে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দে। কালোপাথরের ওপর খোদিত মূর্তি। খুবই বিরল এই দুর্গামূর্তি। দেবীর দুটি চোখ, মাথায় সুচারু মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল। তাঁর চারটি হাত— সম্মুখভাগের বামহাতে কেয়ূর, পশ্চাতের বামহাতে ত্রিশূল, সম্মুখভাগের ডানহাতের কিয়দংশ ভগ্ন, অপর আরেকটি হাতে ধারণ করে আছেন চক্র। নিচে বাহন সিংহ শায়িত এবং দেবী তার পিঠের ওপর দণ্ডায়মানা। দেবীর পায়ের দুপাশে দুটি ভগ্ন মূর্তি।

গোপীনাথ রাও দুর্গার আলোচনাক্রমে নবদুর্গার উল্লেখ করেছেন, যথা—নীলকণ্ঠী, ক্ষেমঙ্করী, হরসিদ্ধি, রুদ্রাংশদুর্গা, বনদুর্গা, অগ্নিদুর্গা, জয়দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনীদুর্গা, রিপুমারিদুর্গা। নবদুর্গামূর্তির পৃথক পৃথক বর্ণনাও তিনি গ্রন্থমধ্যে দিয়েছেন। তার মধ্যে রুদ্রাংশদুর্গার বর্ণনাতে তিনি বলেছেন ঃ এই দুর্গার দুটি চোখ, মাথায় মুকুট, চারটি হাত, একটি হাতে শূল, অন্যটিতে চক্র এবং অপর দুটি হাতের একটিতে খড়্গ ও অন্যটিতে শঙ্খ। দুর্গার বাহন সিংহ। দুর্গার দুপাশে চন্দ্র ও সূর্য। এই বর্ণনার সঙ্গে মালদার যাদুঘরে সংরক্ষিত দুর্গামূর্তির বিশেষ মিল লক্ষ্য করা যায়। সে-কারণে আমরা এই মূর্তিটিকে 'রুদ্রাংশ-দুর্গা' নামে অভিহিত করতে পারি। মূর্তিটির গঠন-পদ্ধতি ও শৈলী-বিচারে এটি ৮০০-৯০০ খ্রীস্টাব্দের অর্থাৎ পাল আমলে নির্মিত ভাস্কর্য বলেই মনে করা হয়।□



মালদা জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত ৮ম-৯ম শতকের রুদ্রাংশদুর্গার এই মূর্তিটি সংরক্ষিত রয়েছে মালদা যাদুঘরে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মালদা যাদুঘর (তত্ত্বাবধায়ক ঃ সাধনচন্দ্র দেব)

দুই সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র ঃ পাথরচাপুড়ী

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষের সামনে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে তার সুমহান ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন মানবতাবাদী সেইসব মহান সাধক-সাধিকাদের, যাঁরা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তরুণ লেখক গীতিকণ্ঠ মজুমদার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বলেছেন মরমী সাধক মহবুব শা-র কথা।

লাল মাটির বীরভূম মূলতঃ শান্ত। এখানে "শান্তির ললিত বাণী" কণ্ঠে নিয়ে জীবনের জয়গান গেয়েছেন কত সাধক, বাউল, দরবেশ। সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম সকলেই জানে, কিন্তু জানে না মহবুব শা-র কথা। মহবুব শা-র সাধনক্ষেত্র বীরভূমের পাথরচাপুড়ী। তিনি 'দাতাবাবা' নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত। তিনি যে-ধর্মে বিশ্বাস করতেন তা হলো মানবধর্ম। তিনি বিশ্বাস করতেন সর্বধর্মের সমন্বয়ে। তাঁর সাধনভূমি পাথরচাপুড়ী তাই সর্বধর্মের এক পীঠভূমি।

মহবুব শা-র কাছে মানুষই ছিল আল্লা। তিনি যে কোথা থেকে এসেছিলেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। সংসারের প্রচণ্ড অভাবে তিনি গৃহ ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকেন। তারপর ফকিরের বেশে একদিন উপস্থিত হন বীরভূমের ঘন জঙ্গলে আবৃত পাথরচাপুড়ী অঞ্চলে। জায়গাটা তাঁর ভাল লাগে। তিনি দেখেন, ঐ অঞ্চলে সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাই বেশি। তাদের মধ্যে গণশিক্ষা প্রচারে তিনি উদ্যোগী হন। তাদের কাছে তিনি তাঁর সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীপ্রচারে ব্রতী হন। তাঁর প্রয়াসে গণমানুষের অজ্ঞানের অন্ধকার কিছুটা দূর হয়। আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা বিস্তারে সমন্বয়বাদীদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের প্ররোচনায় মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, যার ভয়াবহ রূপ মানুষকেই দেখতে হয়। কিন্তু মহবুব শা-র প্রভাবে পাথরচাপুড়ীর মানুষেরা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসতা মানুষ দেখতে চায় না—পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে তারা বাঁচতে চায়। এখানে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ নেই। প্রতিবছর এখানে ১০-১২ চৈত্র মেলা বসে। মেলায় আগত কয়েক লক্ষ মানুষ ভুলে যায় তাদের জাতপাত।

এই সমন্বয়ের সাধক মহবুব শাকে কিন্তু বীরভূমের মানুষ প্রথমে চিনতে পারেনি। তিনি এই অঞ্চলে 'দাদাসাহেব' নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর জীবনে এসেছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। সবই তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তিনি কখনো শিক্ষক হয়ে ছাত্র পড়াতেন, কখনো রাখাল হয়ে গরু চরাতেন। দাদাসাহেব ছাত্র পড়ান অথবা গরু চরান—সবসময়েই তিনি মানুষের জয়গান করেছেন। তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠত সাম্যের কথা। ভগবান-আল্লা সবই এক। তবে একথা প্রচার করার মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে অনেক। তবুও তিনি কখনো দমে যাননি। তাঁর মধ্যে কোন রাগ ছিল না। ছিল না কোন প্রতিহিংসার আগুন। যখন কোন মানুষ তাঁকে কষ্ট দিত, তিনি বলতেন ঃ "সে ভুল করছে।" এই সহনশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বড় গুণ। তবে মাঝে মধ্যে তিনি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতেন, যার ফলে মানুষের ভিড় উপচে পড়ত তাঁর কাছে। অনেক গোঁড়া মানুষ এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিত। তিনি তাদের অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতেন ঈশ্বর বা আল্লার অভিন্নতার কথা। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাবের কথা। সাম্যের কথা। প্রেমের কথা। দেখা যেত, তার্কিকরাও মুগ্ধ হয়ে গেছে।

আজ দেশের চারিদিকে যখন সাম্প্রদায়িক অশান্তির দামামা বেজে উঠছে, সৃষ্টি হচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, তখন দাদাসাহেবের আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরা একান্ত

কোন মানুষ তাঁর কাছে এলেই তিনি তার মনের কথা বুঝতে পারতেন এবং মুচকি হাসতেন। তারপর দর্শনার্থীর সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনতেন। দুঃখী, অশান্ত মানুষকে বোঝাতেন। তাদের অনেক সমস্যাও সমাধান করে দিতেন। একবার হায়দ্রাবাদের নিজামের এক বংশধর এসেছিলেন দাদাসাহেবের কাছে। দাদাসাহেবকে তিনি ভুল বুঝেছিলেন। তাঁকে গাঁজার কলকে হাতে এবং নারী-পরিবেষ্টিত থাকতে দেখে মনে করেছিলেন, তিনি ভণ্ড। ভদ্রলোকের মনের কথা দাদাসাহেব বুঝতে পারলেন। তাঁর কিছু বলার আগেই দাদাসাহেব বললেনঃ "তুই আমাকে ভুল বুঝনি।" পরে দাদাসাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর ভুল ভাঙে এবং তিনি দাদাসাহেবের একজন অনুরাগীতে পরিণত হন। দাদাসাহেব কোনদিনই শাস্ত্র-শরিয়ত মেনে চলতেন না, হৃদয়ের নির্দেশকেই বিশ্বাস করতেন। তিনি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র দেহ রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাথরচাপুড়ীতে তাঁর মাজারটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ১৯১৮ সালে। তৎকালীন জেলাশাসক জি. সি. দত্তের উদ্যোগে কমিটির সভাপতি হন জমিদার খান বাহাদুর। তাঁরই নেতৃত্বে মেলা শুরু হয়। এই মেলা চলে প্রতিবছর ১০ চৈত্র থেকে ১২ চৈত্র পর্যন্ত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আসে এই মেলায়। মেলায় প্রায় দুই থেকে তিন লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। সমস্ত রুটের অধিকাংশ বাস চলে যায় পাথরচাপুড়ীর যাত্রীদের নিয়ে। গঙ্গাসাগর মেলা ছাড়া এত লোকসমাগম পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন মেলাতে হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে এই মেলাটিকে অধিগ্রহণ করেছে। ফলে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনেই মেলা চলে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রিপলের অস্থায়ী তাঁবুতে তিনদিন কাটায়। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পাথরচাপুড়ীর প্রাঙ্গণ। অগণিত মানুষ দাদাসাহেবের মাজারে চাদর চাপায়। এই চাদর চাপানো দাদাসাহেবের মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বহু হিন্দু পরিবার থেকেও প্রতিবছর চাদর যায়। এটা অনেক পরিবারের একটা প্রথার মতো। এই মেলা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে দেয় এবং সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকায় শৃঙ্খলাবোধেরও অভাব ঘটে না। বীরভূমের পাথরচাপুড়ী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে-ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছে তা সত্যই উল্লেখযোগ্য। আজকের চূড়ান্ত ধর্মান্ধতার যুগে পাথরচাপুড়ী একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের বীরভূম, বামাক্ষ্যাপার বীরভূম, দাদাসাহেবের বীরভূম—সমন্বয়ের বীরভূম। এই সমন্বয়ের অন্যতম পীঠস্থান পাথরচাপুড়ী। এই সমন্বয়ের সব কৃতিত্ব দাদাসাহেব মহবুব শা-র। □



আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, তাঁদের পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আনন্দের বিষয় যে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

একটি ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ক্যাসেটে (PAL কিন্তু NTSC-তে পরিবর্তনযোগ্য) বর্তমান মিউজিয়াম, প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ও সংরক্ষণশালার মডেল এবং বর্তমান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাসেটটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে এবং দেশ ও বিদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে কিনতে পাওয়া যাবে।

স্বামী আত্মস্থানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া

জগন্নাথ-শক্তি দেবী বিমলা

স্বামী অচ্যুতানন্দ

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শোকোন্মত্ত মহাদেব সতীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন বলে পুরাণে বলা হয়েছে। বিষ্ণু ত্রিভুবনকে রক্ষা এবং মহাদেবকে শান্ত করার জন্য সতীর দেহকে চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করেন। সতীদেহের খণ্ডিত অংশগুলি ভারতবর্ষের একান্নটি স্থানে পতিত হয় এবং সেই একান্নটি স্থান 'মহাপীঠ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। পুরীতে দেবীর নাভি পড়েছিল। সেই সতীক্ষেত্র বিমলা-পীঠের কথা বলেছেন স্বামী অচ্যুতানন্দ।



শ্রীক্ষেত্র-রাজেশ্বরী বিমলার একটি পটচিত্র। বিগ্রহের আলোকচিত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ।
চিত্রশিল্পী : রথশর্মা(নীলাদ্রি সংসদ, জগন্নাথ-মন্দির, পুরী)

দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে কৈলাসে শিব শোকে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে ছুটে এলেন কনখলে দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে। সতীর শরীর নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে 'হা সতী' বলে বিলাপ করতে করতে তাণ্ডব নৃত্যে শিব স্বর্গ মর্ত পাতালে বিচরণ করতে লাগলেন। তাঁর এই প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ব্রহ্মাদি দেবতারা বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু তাঁর চক্রের দ্বারা সতী-অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করতে লাগলেন। শোকাচ্ছন্ন শিব প্রথমে তা টেরও পেলেন না। সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেখানে যেখানে পড়ল, সেখানে সেখানে হলো এক-একটি পীঠ। এইভাবে একান্নটি শক্তিপীঠ অবিভক্ত ভারতের নানা স্থানে আত্মপ্রকাশ করল। এই পীঠগুলি দর্শন করলে মানুষ সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয় বলে শোনা যায়। একান্নটি পীঠের অন্যতম হলো পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। এখানে দেবীর নাম বিমলা—"বিমলা পুরুষোত্তমে"। পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রের ক্ষেত্রাধীশ্বরী, পীঠেশ্বরী 'বিমলা'। এখানে দেবীর 'নাভি' পড়েছিল।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে : "প্রধানা সর্বশক্তীনাং বলা বলবতী পরা/ সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী/ কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা, বিক্রমৈর্গুণৈঃ/ কৃষ্ণভাবনয়া শাশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী।" (দেবীভাগবত, ৯।১।৮৯-৯১) —এই দেবী সমস্ত শক্তির মধ্যে প্রধান বলস্বরূপা ও পরম বলবতী এবং সর্বসিদ্ধিদাত্রী সকল যোগের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি কৃষ্ণভক্তা। তেজে, গুণে ও পরাক্রমে কৃষ্ণতুল্যা। সেই সনাতনী আদ্যাশক্তি নিত্য কৃষ্ণ-ভাবনায় কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। "তত্তৎ স্থানেষু তত্রাসীৎ নানামূর্তিধরো হরঃ ॥"

একান্নটি পীঠের মধ্যে পঞ্চাশটি পীঠে দেবীর সঙ্গে 'ভৈরব' হিসাবে নানা নামে শিবও আছেন। ব্যতিক্রম শুধু এই একটি ক্ষেত্রে—এখানে ভৈরব শিব নন, নারায়ণ। "বিমলা ভৈরবী যত্র জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।" এ এক অদ্ভুত ব্যাপার![১] দেবীভাগবতে সতীর একান্ন পীঠের কথা আছে।

আবার প্রাচীন পুরাণগুলির অন্যতম মৎস্যপুরাণেও (১৩।২৩-৫২) আছে, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর শিব দক্ষকে শাস্তি দিলে অনুতাপানলে দগ্ধ দক্ষ কাতর হয়ে সতীর কাছেই প্রার্থনা করেন ঃ "হে পূতচরিত্রে, কোন্ কোন্ তীর্থে তোমার দর্শন পাওয়া যাবে—আর কি নামেই বা সেখানে তোমার স্তব করতে হবে?" উত্তরে দেবী বললেন ঃ "জগতে আমি সর্বজীবে দ্রষ্টব্যা, সর্বভূতে সর্বদা বিরাজমানা। আমি বিনা জগতে কোথাও কিছু নেই। তবুও সিদ্ধিকামী সাধু ও ঐশ্বর্যকামী মনুষ্যগণ যে যে স্থানে আমাকে দেখতে পাবেন বা স্মরণ করবেন সেই সেই স্থানের নাম আমি বলছি।" তারপর তিনি একান্ন পীঠের নাম বললেন, যার মধ্যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র এবং তার পীঠাধিষ্ঠাত্রী বিমলার নাম ছিল।

জগন্নাথ-মন্দিরের সমগ্র চত্বরটি দুটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, বাইরের সিংহদ্বার-সংলগ্ন প্রাচীরের নাম 'মেঘনাদ বেড়' ও তারপর বাইশটি সিঁড়ি পার হয়ে ভিতরের প্রাচীরের নাম 'কূর্মবেড়'। এই প্রাচীর ২০ থেকে ২৪ ফুট উঁচু। এই 'কূর্মবেড়'-ঘেরা অঞ্চলের মধ্যস্থলেই জগন্নাথ-মন্দির। জগন্নাথ-মন্দিরের দক্ষিণে মুক্তিমণ্ডপ, যেখানে মন্দিরের পূজাবিধি ও নানান নীতি নির্ধারিত হয়। জগন্নাথ-মন্দিরকে ডানদিকে রেখে মুক্তিমণ্ডপের পাশ দিয়ে কিছুটা দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলাম। প্রথমেই বাঁদিকে পড়ল একটি ছোট চৌবাচ্চার মতো জলাধার। তার নাম 'রোহিণীকুণ্ড'। এটি পুরীর পঞ্চতীর্থের অন্যতম। এখানে কাকভূশণ্ডি দর্শন করে রোহিণীকুণ্ডের জল মাথায় নিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলাম দক্ষিণ-পশ্চিমে। বাঁদিকে দেবীর বাহন—পাথরের তৈরি বিরাট সিংহমূর্তি। অজ্ঞানরূপী গজের ওপর বসে জ্ঞানময়ী দেবীকে নিত্য দর্শন করছেন। সিংহকে প্রণাম জানিয়ে আমাকে দেবী বিমলার মন্দিরের সামনে নিয়ে এলেন মুক্তিমণ্ডপের জনৈক পুরোহিত। তিনি বললেন, বিমলা-মন্দির বর্তমান জগন্নাথ-মন্দিরের চেয়েও পুরনো। কারণ, মৎস্যপুরাণে মন্দিরের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু জগন্নাথ-মন্দিরের উল্লেখ নেই। পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীক্ষেত্রে দেবী বিমলা ও জগন্নাথের উল্লেখ দেখা যায়।

মন্দিরটি দেখেই বোঝা যায়, উড়িষ্যার প্রাচীন দেউলের ধারাতেই এটি তৈরি। এই মন্দির পূর্বমুখী। মন্দিরের তিনটি স্তর। প্রথম স্তর নাটমন্দির, দ্বিতীয় স্তর জগমোহন, তৃতীয় স্তর বিমান বা গর্ভগৃহ। মূল গর্ভগৃহ ও জগমোহন শৈলীর দিক থেকে ৬ষ্ঠ শতকের সোমবংশীয় রাজাদের তৈরি বলে শোনা যায়। অন্যমতে অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গদেবের দ্বারা ১১৩৫ খ্রীস্টাব্দের আগে এটি তৈরি হয়েছিল। তাতেও প্রমাণিত যে, বিমলার মন্দির জগন্নাথ-মন্দিরের আগেই নির্মিত হয়েছে।

নাটমন্দিরের ছাদ ত্রিকোণাকৃতি দেবীর মূলমন্দিরের সামনের অংশটুকুও ছাদের সংলগ্ন ত্রিকোণ। তার ওপরে সিলিঙের কাছে ও নিচের দেওয়ালে বহুবর্ণে চিত্রিত সব দেবদেবীদের মূর্তি আছে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের দক্ষিণদিকে কাত্যায়নী বা শূলীদুর্গা অষ্টভুজা, চণ্ডঘাতিনী। পশ্চিমদিকের পার্শ্বদেবী নৃত্যকালী অতি শীর্ণকায়া, কৌপিনধারিণী—এঁর নাম নাটচামুণ্ডা। পুরোহিত বললেন ঃ "এই রকম মূর্তি অন্য কোথাও দেখা যায় না।" উত্তর দেওয়ালে গৌরীর মূর্তি ছিল। এখন নেই। সেটি চুরি হয়েছে। উড়িষ্যার মন্দিরের বিধিনির্দেশক মাদলাপাঞ্জীতে আছে ঃ "দক্ষিণে শূলীদুর্গাশ্চ, পশ্চিমে ঘোররূপিণী, উত্তরে গৌরী সা নিত্যা মধ্যে বাগেশ্বরী তথা।" এই 'বাগেশ্বরী'ই বিমলা। দক্ষিণে রজোগুণাত্মিকা কাত্যায়নী। পশ্চিমে তামসী চণ্ডরূপা কালী ও উত্তরে সাত্ত্বিকাত্মিকা গৌরী মূলদেবীর দেহরক্ষী হিসাবে মন্দির রক্ষা করছেন।

মুখ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে দুপাশে দেখা যায় দুই দেবীর প্রাচীন মূর্তি—দ্বারপালিকারূপে তাঁরা বিরাজ করছেন। এঁদের নাম জয়া ও ভদ্রা। স্থানীয় নাম অদ্ভুত—'দুধখাই' ও 'সরখাই'। জগমোহন পার হয়ে মুখ্যদ্বারের দ্বারবন্ধে লক্ষ্মী ও নিচে দুপাশে দ্বারপাল প্রচণ্ডভৈরব ও চণ্ডভৈরব।

গর্ভমন্দিরটি প্রায় অন্ধকার এবং ছোট। মধ্যস্থলে দেবী বিমলার প্রমাণ আকারের কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি। চতুর্ভুজা দেবীর চার হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, খর্পর ও রুদ্রাক্ষমালা। দেবীকে নানা অলঙ্কার ও সুন্দর বস্ত্রাদি দ্বারা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। চোখ তিনটি সোনার। গলায় নানা ফুলের মালা ও মাথায় মুকুট। অপূর্ব সুন্দর মূর্তি! দেবীর দুই পাশে দুটি ছোট পাথরের মূর্তি—ছায়া ও মায়া। গর্ভমন্দিরের দরজায় উঁচু টেবিল দিয়ে পথ বন্ধ করা হয়েছে। আমার খুব আগ্রহ—আরও কাছ থেকে মাকে

১ শ্রীশ্রীমার একটি দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন জগন্নাথ শিবমূর্তি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দর্শন করব। এমনিতে সাধারণের ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। টেবিলের বাইরে থেকেই দর্শন করতে হয়। আমি পূজারীর কাছে আবেদন জানালাম ঃ "একটু কাছে গিয়ে দর্শন করা যায়?" কি ভেবে জানি না, তরুণ পূজারী টেবিল সরিয়ে ভিতরে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিলেন। খুব কাছ থেকে মাকে দর্শন করলাম। পূজারী মায়ের সিঁদুর আমার কপালে পরিয়ে দিলেন।

পূজারী বললেন ঃ "এই ক্ষেত্র তন্ত্রের সিদ্ধপীঠগুলির অন্যতম।" জ্বালামুখী, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী ও বিমলা—দেবীর চতুর্ব্যূহ শক্তিদের মধ্যে বিমলা শ্রেষ্ঠ। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে একথা। দেবীর পূজা তন্ত্রমতে হয়। ধ্যানমন্ত্র হিসাবে চণ্ডীর ধ্যানই করা হয়। 'পঞ্চ-মকার'-এর অনুকল্প পূজায় ব্যবহৃত হয়। মৎস্যের বদলে হিং দিয়ে রান্না করা শাক, মাংসের বদলে আদাকুচি, মদ্য—কাংস্যপাত্রে ডাবের জল, মুদ্রা—চিনি দিয়ে ময়দা গুলে একরকম সিন্নি এবং 'পঞ্চম তত্ত্ব' মৈথুনের বিকল্প রক্তচন্দন দিয়ে অপরাজিতা ফুল দেওয়া হয়। আরও বিশেষত্ব হচ্ছে—জগন্নাথের বিশেষ পূজাতেও এই 'পঞ্চ-মকার'-এর অনুকল্প ব্যবহার করা হয়। দেবীর ভোগে জগন্নাথের সবরকম প্রসাদ সোনার থালায় দেওয়া হয়। সেই প্রসাদ দেবীকে নিবেদন করার পর তা 'মহাপ্রসাদ' হয়ে আনন্দবাজারে যায়। এটি নিত্যপ্রচলিত বিধি।

এছাড়া শারদীয় উৎসবের সময় দেবী বিমলার ষোল দিনব্যাপী বিশেষ পূজা বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় নরসিংহপুরের রথসামন্তরা পূজক ও রোড়ঙ্গের বক্সীদের প্রাচীনরা 'পরিচ্ছক' বা তন্ত্রধারক হিসাবে পূজা পরিচালনার জন্য আসেন। ঐ কয়দিন জগন্নাথ-মন্দির থেকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে 'দুর্গামাধব' নামে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি বিগ্রহ দেবীর দক্ষিণ পাশে অধিষ্ঠিত থাকেন। দেবীর ভৈরব হিসাবে ঐ কয়দিন তাঁরও ষোড়শোপচারে পূজা হয়। ঐ সময় সহস্র কুম্ভাভিষেক করেন দেবীর পৃথক সেবক-গোষ্ঠী। ঐ কয়দিন দেবীর পূজার সময় জগন্নাথ-মন্দিরের ছত্র, কাহাল্ল, ঘণ্টাদি বাসন দেবীর পূজায় ব্যবহারের বিধি আছে। ঐ ষোল দিন দেবীর নানারকম 'বেশ' হয়। প্রথম ও শেষ চার দিন দেবীর স্বাভাবিক সাজ থাকে। দ্বিতীয় দিনে ভুবনেশ্বরী, তৃতীয় দিনে বনদুর্গা, চতুর্থ দিনে রাজরাজেশ্বরী, পঞ্চম দিনে উগ্রতারা, ষষ্ঠ দিনে মাতঙ্গিনী, সপ্তম দিনে বগলা, অষ্টম দিনে নারায়ণী, নবম দিনে সিংহবাহিনী, দশম দিনে জয়দুর্গা, একাদশ দিনে শূলীদুর্গা ও দ্বাদশ দিনে হরচণ্ডীর বেশ হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো—শারদীয়া পূজায় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর মধ্যরাত্রে দেবীর মন্দিরে রহস্যপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি করে মেষ বলিদান হয়। শাক্ত আচারের পূজায় দেবীকে এই কয়দিন মাছও ভোগ দেওয়া হয়। রাত্রে বলির জন্য মেষকে প্রধান দরজা দিয়ে আনা হয় না—প্রাচীর টপকে নিয়ে আসা হয় এবং বলি-দানের পর সমস্ত মন্দির ধুয়েমুছে মাংস-মুণ্ড সব ঐ ভাবেই মই বেয়ে প্রাচীরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আর প্রসাদী মুণ্ডটি পুরীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই বলির মধ্যে একদিনের মেষ আসে রাজবাড়ি থেকে। আর এইসব তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী থাকেন ঐ দুর্গামাধব।

বিজয়া দশমীর দিনে বিমলাদেবীর মন্দিরের সামনে পাণ্ডারা রাবণবধ ও লঙ্কাবিজয়ের অভিনয় করেন। এই প্রথা অন্ততঃ চৈতন্যদেবের সময় থেকে চলে আসছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে ঃ "বিজয়া দশমীর লঙ্কা বিজয়ের দিনে/বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে।" ঐদিন দুর্গামাধবকে পালকিতে চাপিয়ে কাছেই 'জগন্নাথবল্লভ' বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে উৎসব করা হয়।

দীপান্বিতা অমাবস্যাতেও দেবী বিমলার বিশেষ পূজা হয়। এছাড়াও রুক্মিণীহরণ উৎসব যখন হয় তখন লক্ষ্মীর মন্দির থেকে তাঁর প্রতিনিধি বিমলা মায়ের মন্দিরে আসেন আর জগন্নাথের বিগ্রহ এসে লুকিয়ে থাকেন। লক্ষ্মীর প্রতিনিধি-বিগ্রহ মন্দির থেকে বেরলেই জগন্নাথ-প্রতিনিধি মদনমোহন ও তাঁর সেবকেরা রুক্মিণীহরণ করেন। এইসব হয় পাণ্ডা ও পূজারীদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ঐসময় দেবী বিমলা কালো রঙের শাড়ি পরে থাকেন। এই অভিনয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়।

দেবী বিমলা ও জগন্নাথদেবের পূজায় বৈদিক ও তন্ত্রমতের মিশ্রিত পূজাবিধি প্রচলন করেছেন আদি শঙ্করাচার্য। জগন্নাথ সর্বদেবদেবীময়। তাঁর মধ্যে পঞ্চদেবতার একত্র সমাবেশ। তিনি যখন তাঁর মন্দিরে রত্নপীঠে আসীন থাকেন তখন নারায়ণ, নবকলেবরের সময় হন রুদ্র, স্নানযাত্রার সময় গণেশ, রথযাত্রার সময় সূর্য আর নিত্য শয়নযাত্রার সময় তিনি দুর্গা।

প্রাচীনকালে দেবীর মন্দিরে বিশেষ পূজার রাত্রে মালসী রাগের গানের সঙ্গে দেবদাসীদের নৃত্যের প্রচলন ছিল। এখন তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারাতন্ত্রের মতে এই পীঠ অত্যন্ত পবিত্র, সর্বসিদ্ধির ক্ষেত্র ঃ

"মোক্ষকামী লভতে ভক্তিং দর্শনাৎ বিমলেশ্বরীম্।
যশোজ্ঞানবলাকাঙ্ক্ষী লভতে সিদ্ধি-নিশ্চিতম্॥
উগ্রসিদ্ধিং লভতে কামী সর্বেষাং সিদ্ধিদায়িকে।
যথাভক্তিস্তথাসিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥" □

খেলাধুলায় ডোপিং

অমিতাভ ভট্টাচার্য

মানুষ খেলে প্রাণের আনন্দে। খেলার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তার চিত্তের স্ফূর্তি, বন্ধনহীন জীবনের আস্বাদ। কিন্তু যখন তার লোভ ও অনিয়ন্ত্রিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার সবুজ মনকে কলুষিত করে তখন খেলার আনন্দ ও সুন্দর পরিবেশটাই যায় হারিয়ে। হারিয়ে যায় সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতাও। অনৈতিকভাবে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে 'সেরা' হওয়ার আশায় খেলোয়াড়রা যখন নিষিদ্ধ 'ড্রাগ' নেয় অর্থাৎ 'ডোপিং' করে, তখন সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্রীড়াঙ্গন। এর পরিণাম কী ভয়ানক হতে পারে, সে-সম্পর্কে সচেতন করতেই প্রয়াসী হয়েছেন চিকিৎসক-লেখক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য।

'ডোপ' কিংবা 'ডোপিং' শব্দটা মাত্র এক দশক আগেও অনেকের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'ড্রাগ' কথাটি থাকলেও 'ডোপ' কথাটি বিশেষ ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু ১৯৮৮-তে সিওল অলিম্পিকে কানাডার দৌড়বীর বেন জনসন ১০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতার পর যখন ডোপ-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে বিশ্বজয়ের খেতাব হারালেন এবং 'হিরো' থেকে রাতারাতি কলঙ্কিত তালিকায় চলে গেলেন, তখনই বিশ্ববাসী ডোপ শব্দটির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হলেন। এরপর ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবলে এফিড্রিন নামক সর্দিকাশির ওষুধ গ্রহণ করে বিশ্ববন্দিত ফুটবল-শিল্পী মারাদোনা যখন ডোপিং-এর দায়ে অভিযুক্ত হলেন, তখন থেকেই নানা সংবাদসংস্থার দৌলতে ডোপ বা ডোপিং শব্দটি ঘরোয়া কথার পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

কাকে বলে ডোপিং

ডোপিং ব্যাপারটা আসলে কি? এটি ড্রাগ কথাটির প্রতিশব্দ। ক্রীড়াজগতে ডোপিং হলো নানাধরনের ড্রাগ বা ওষুধ গ্রহণ করে নিজের শারীরিক এবং মানসিক দক্ষতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করার চেষ্টা। ডোপ শব্দটি কিন্তু আফ্রিকা থেকে এসেছে। অতিরিক্ত কাজ করানোর জন্য উত্তেজক পানীয় হিসাবে সেদেশের ক্রীতদাসদের একসময় 'ডোপ' নামক পানীয় পান করানো হতো। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকেও খেলাধুলায় নানা উত্তেজক পদার্থের ব্যবহারের কথা জানা গেছে। গ্রীক অ্যাথলিটরা একধরনের ব্যাঙের ছাতা খেতেন পারফরম্যান্স বা দক্ষতা বাড়ানোর জন্য।

ডোপিং-এর ইতিহাস

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানাধরনের ওষুধ ডোপিং-এর জন্য ব্যবহার করা হতে লাগল। যতদূর জানা যায়, ১৮৬৫ সালে আমস্টারডামে একজন সাঁতারু প্রথম ডোপ করেছিলেন ওষুধ খেয়ে। এই শতকের গোড়াতে ভিয়েনায় রেসের বাজি জেতার জন্য ঘোড়াকে ডোপ করানো হতো নানা ওষুধ খাইয়ে। ১৯০৪ সালে অলিম্পিক ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন টমাস হিক্স, যিনি দৌড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে জল পানের নাম করে কাঁচা ডিম, ব্র্যান্ডি আর উত্তেজক ড্রাগ স্ট্রিকনিন-এর ককটেল খেয়েছিলেন। তখন ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা ছিল না বলে হিক্স ডোপিং করেও ধরা পড়েননি, সোনাও জিতেছিলেন।

ডোপ টেস্ট নিয়ে প্রথম ভাবনাচিন্তা শুরু হয় ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ডেনমার্কের এক সাইক্লিস্ট জনসনের মৃত্যুর পর। ১৭৫.৩৮ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন, মারাও যান। প্রথমে সবাই একে 'সান স্ট্রোক' ভাবলেও পরে জানা যায়, জনসন 'রনিকাল' ড্রাগ নিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থা আই. ও. সি. ১৯৬০ সালে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে নিষিদ্ধ ওষুধের একটি তালিকা প্রকাশ করলেন, যেগুলি গ্রহণ করলে খেলোয়াড়রা ডোপিং করার অপরাধে অপরাধী হবে। ১৯৭২-এ মিউনিখ অলিম্পিকে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। দিন যত এগোতে থাকে তত বাড়তে থাকে নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকা। শুরুতে যার সংখ্যা ছিল ৩৫, এখন তা প্রায়

১০৬-এ এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানি একই ওষুধ বিভিন্ন নামে বাজারে ছাড়ছেন, তাতেও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য আই. ও. সি.-র প্রকাশিত তালিকায় ওষুধের রাসায়নিক বা জেনেরিক নাম লেখা থাকছে।

কত ধরনের ওষুধ

প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ডোপিং-এর ওষুধগুলিকে।

(ক) স্টিমুল্যান্ট বা উত্তেজক ওষুধ ঃ এর সংখ্যা প্রায় ৪০। কয়েকটি নাম আমাদের খুব পরিচিত। যেমন— অ্যামফিটামিন, কোকেন, এফিড্রিন, কেফিন, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি। এদের প্রধান কাজ মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করা। কেফিন আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিনই কমবেশি খেয়ে থাকি চা ও কফি পানের মাধ্যমে। এক কাপ চায়ে থাকে ৩০ থেকে ৭৫ মিলিগ্রাম কেফিন, এক কাপ কফিতে তার পরিমাণ ১০০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম। দিনে ২।৩ কাপ চা বা কফি পানে শারীরিক ক্ষতি কিছুই হয় না, বরং শরীরে বেশ একটা চনমনে ভাব আসে, ক্লান্তি বা অবসাদ দূর হয়, কাজকর্মে উৎসাহ বাড়ে। বিপত্তি হয় বেশি খেলেই। ইন্টার-ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি কেফিন গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ঠিক করে দিয়েছেন। যদি কারও মূত্রে প্রতি মিলিলিটারে ১২ মিউগ্রামের বেশি কেফিন পাওয়া যায়, তবে সে ডোপিং-এর দায়ে অভিযুক্ত হবে।

মাদকদ্রব্য কোকেনের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় আছে। মারাদোনা এই কোকেন সেবনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে গত বিশ্বকাপে যে-ড্রাগ নিয়ে সবচেয়ে বেশি হইচই হয়েছিল সেটি ছিল এফিড্রিন নামক এক মামুলি সর্দিকাশির ওষুধ। নাক বন্ধ হয়ে গেলে আমরা এফিড্রিন ড্রপ ব্যবহার করে নাক খুলি। কাশির ওষুধে এফিড্রিন থাকে ১ চামচে বা প্রতি ৫ মিলিলিটারে ১১ থেকে ২০ মিলিগ্রাম। হাঁপানি এবং সর্দির জন্য ২০ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম এফিড্রিন ব্যবহার করা হয়। এফিড্রিন অনেক আগে হার্টশক, মানসিক অবসাদ ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হতো। এর বিকল্প ভাল ভাল ওষুধ বের হওয়ায় এফিড্রিন আর ঐসব রোগে আজকাল ব্যবহৃত হয় না। গত বিশ্বকাপে নাইজেরিয়া বনাম আর্জেন্টিনা ম্যাচের পর ডোপ টেস্টে মারাদোনার মূত্রে এফিড্রিন পাওয়া যায়। মারাদোনা বলেন, ব্যক্তিগত ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শে তিনি ম্যাচের দিন সকালে সর্দির ওষুধ খেয়েছিলেন, তার ভিতর এফিড্রিন আছে না জেনেই। তারপরের ঘটনা সবারই জানা। বিশ্বকাপ তথা সমগ্র ফুটবলজগৎ থেকে মারাদোনার নির্বাসন।

এইসব উত্তেজক ওষুধ বারবার ব্যবহার করলে শরীরে নানা অস্বস্তি দেখা দেয়, ঘুম আসতে চায় না, খিদে হয় না, অহেতুক অস্থিরতা বোধ হয়, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, গলা শুকিয়ে আসে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলে যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে, রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, নানা ধরনের স্নায়ুরোগ দেখা দিতে পারে।

(খ) নার্কোটিক বা ব্যথা কমাবার ওষুধ ঃ মরফিন এবং তার সহযোগী বিভিন্ন অ্যালকালয়েড যৌগ যেমন —হেরোইন, কোডিন আজকাল ডোপিং-এ খুব ব্যবহার হচ্ছে। এগুলি গ্রহণ করলে সাময়িক একটা ভাললাগার ভাব সৃষ্টি হয়। অকারণে জেদ জাগে, হঠাৎ আনন্দ উচ্ছ্বাস হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর অবসাদ নেমে আসে, ঘুম পায়, বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়, দিবাস্বপ্ন দেখা যায়। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ পড়ে, সবসময় হাই ওঠে, হাত-পা কাঁপে, খিদে পায় না, ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে, পেটব্যথা হয়, শ্বাসকষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে হাতের কাছে ওষুধ না পেলে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একে বলে 'উইথড্রয়্যাল সিনড্রোম'। মরফিন বা হেরোইনের মতো ড্রাগের নেশার শেষ পরিণতি মৃত্যুতে।

(গ) অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ঃ ১৯৩০ সাল থেকেই খেলাধুলার জগতে এই ম্যাজিক ড্রাগটির অনুপ্রবেশ ঘটে, তবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয় ৫০-এর দশকের গোড়া থেকে। কারণ, দিন যত এগিয়েছে তত সমৃদ্ধ হয়েছে অ্যানাবলিক স্টেরয়েড নিয়ে গবেষণা। বাজারে এসেছে নিত্যনতুন ড্রাগ। মোটা হওয়ার জন্য আমরা অনেকে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ডুরাবলিন ইনজেকশন নিয়ে থাকি। এটিও কিন্তু অ্যানাবলিক স্টেরয়েড।

পুরুষের শুক্রাশয় বা টেসটিস থেকে টেস্টোস্টেরন নামে একধরনের হরমোন তৈরি হয়, যার কাজ পুরুষের যৌনাঙ্গ গঠন ও শুক্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা। পুরুষমানুষ শৈশব থেকে কৈশোরের পথ ধরে যৌবনে পা দেয় এই হরমোনটির হাত ধরেই। এর থেকেই সংশ্লেষিত নানা ধরনের ওষুধ বাজারে এসেছে, ডোপিং-এর জন্য আকছার ব্যবহারও হচ্ছে। এর ব্যবহারে দেহের ওজন বাড়ে, শরীরের গঠনগত পরিবর্তনও হয়, বেশ পুরুষালি চেহারা হয়। অবশ্য সঙ্গে চাই নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু

একটানা ব্যবহার করলে লিভারের অসুখ, হার্ট ও কিডনিতে গণ্ডগোল, শুক্রহীনতা, যৌনাঙ্গের গঠনের পরিবর্তন, অকালে টাক পড়া, চর্মরোগ, মেয়েদের মতো স্তন বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা উপসর্গ জীবনসংশয়ের কারণ হয়ে ওঠে। অনেক মেয়ে অ্যাথলিটও এগুলি ব্যবহার করে থাকে। ফলে তাদের গলার স্বর হয় পুরুষালি, দাড়ি-গোঁফ গজায়, ঋতুস্রাবে গণ্ডগোল দেখা দেয়, স্তনের আকার ছোট হয়ে যায়, যৌনাঙ্গের আকারের পরিবর্তন ঘটে, যৌনাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন অ্যানাবলিক স্টেরয়েড নিলে মাংসপেশীতে জল এবং খনিজ পদার্থ অতিরিক্ত মাত্রায় জমে গিয়ে দৈত্যাকৃতি চেহারাও হতে পারে, ঘন ঘন মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, অপরাধ-প্রবণতাও বাড়তে পারে।

প্রসঙ্গতঃ জানাই, বেন জনসন ডোপিং-এর জন্য যে-ওষুধটি ব্যবহার করেছিলেন সেই স্ট্যানোজোলল এক ধরনের জলে দ্রবণীয় অ্যানাবলিক স্টেরয়েড। মুখে খেলে এটা দেহে ৬ সপ্তাহের মতো থাকে। প্রধানতঃ বডি বিল্ডাররা তাদের দৈহিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ ধরনের অ্যানিমিয়া ছাড়া অন্য কোন রোগে এর প্রয়োগ হয় না। কারণ, এর অনেক ক্ষতিকর দিক আছে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে লিভারে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এই মন্তব্য করেছিলেন কানাডা-নিবাসী ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সভ্য ডাঃ রবার্ট ডুভাল। তাঁর মতে, কোন অ্যাথলিটই একটানা এসব ওষুধ ব্যবহার করে না, করে টানা ২।৩ সপ্তাহের পর ২।১ সপ্তাহ বাদ দিয়ে দিয়ে এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই।

১৯৮৪ সালের আগে পর্যন্ত টেস্টোস্টেরন কিন্তু নিষিদ্ধ তালিকায় ছিল না। ডোপিং টেস্টে এটাকে ধরাও ছিল মুশকিল। কিন্তু গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফি এবং মাস স্পেকটোমেট্রি চালু হওয়ার পর অ্যানাবলিক স্টেরয়েড এবং টেস্টোস্টেরন ধরা বেশ সহজ হয়ে গেছে।

(ঘ) বিটা ব্লকার : মাইগ্রেন বা আধকপালে রোগে, উচ্চ রক্তচাপে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তীরন্দাজি, স্যুটিং, গলফ-জাতীয় খেলায় মানসিক স্থিরতা আনার জন্য অনেক খেলোয়াড় বিটা ব্লকার ওষুধ খেয়ে ডোপিং করে। প্রোপানোলল, সোটালল, মেটাপ্রোমল ইত্যাদি নানা নামে এগুলি পাওয়া যায়। বিটা ব্লকার ব্যবহারের ফলে হঠাৎ রক্তচাপ কমে যেতে পারে, হৃদ্‌স্পন্দন কমে গিয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(ঙ) ডাই ইউরেটিক : 'ল্যাসিক্স' নামের ট্যাবলেটটি যার রাসায়নিক নাম ফুরোসেমাইড, তার সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। মূত্রের পরিমাণ কমে গেলে, হাত-পা ফুলে গেলে বা রক্তচাপ খুব বেড়ে গেলে এই ল্যাসিক্স-জাতীয় ওষুধ দিয়ে মূত্রের পরিমাণ বাড়ানো হয়। দেহ থেকে অতিরিক্ত খনিজ লবণ মূত্রের সঙ্গে বের হয়ে যায়। ওয়েট লিফটার, বক্সার, কুস্তিগীর এবং জুডো খেলোয়াড়রা ওজন কমিয়ে নিচের গ্রুপে প্রতিযোগী হওয়ার জন্য ডাই ইউরেটিক ওষুধ খেয়ে ডোপ করে। অনেক সময় অ্যানাবলিক স্টেরয়েড দীর্ঘদিন ধরে খেয়ে শারীরিক ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে প্রতিযোগিতার ২।৩ সপ্তাহ আগে ডাই ইউরেটিক খেয়ে ওজন কমায় অনেক খেলোয়াড়।

এর ফলে দেহের নানা ক্ষতি হয়। পটাসিয়াম লবণ দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাংসপেশীতে খিঁচ ধরে, পেশী নির্জীব হয়ে পড়ে, হৃদ্‌স্পন্দন অনিয়মিত হয়, মাথা ঘোরে, ক্লান্তি বাড়ে। অতিরিক্ত ব্যবহারে লিভার, হার্ট, কিডনি সবকিছুরই ক্ষতি হতে পারে।

(চ) অন্যান্য : কিছু ওষুধপত্র শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে, অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে।

কর্টিকোস্টেরয়েড : ড্রপ বা মলম হিসেবে চোখে, ত্বকে, নাকে ও কানে ব্যবহার করা যাবে। ইনহেলার হিসেবেও চলবে। কিন্তু মুখে খাওয়া যাবে না, ইনজেকশনও নেওয়া যাবে না। আগে থেকে যদি ডাক্তারের নির্দেশানুযায়ী কোন খেলোয়াড় হাড়ের কোন জয়েন্টে এই ইনজেকশন নিয়ে থাকে বা অলিম্পিক চলাকালীনও তাকে নিতে হয়, তাকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম লিখিত অনুমতি নিতে হবে। দেহের কোথাও ব্যথা, ফোলা, শ্বাসকষ্ট এবং অ্যালার্জি-ঘটিত গণ্ডগোল থাকলে কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। দেহত্বকের নানা ঘায়ে এই মলম ব্যবহৃত হয়। বাজার-চলতি কয়েকটি কর্টিকো-স্টেরয়েড হলো—ডেকাড্রন (ডেক্সামেথাসোন), বেটনিসল (বেটামেথাসন), বেটনিলান ইত্যাদি।

অ্যালকোহল : নিষিদ্ধ তালিকায় অ্যালকোহলের নাম নেই। তবে নিঃশ্বাসে ও রক্তে অ্যালকোহলের উপস্থিতি বিশ্লেষণ করে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

লোকাল অ্যানালজেসিক : ব্যথা কমানোর ওষুধের মধ্যে রয়েছে—জাইলোকেইন, প্রোকেটন, কার্বকেইন ইত্যাদি। এগুলি মলম হিসেবে দেহের কোথাও লাগানো চলে, প্রয়োজনে হাড়ের জয়েন্টে ইনজেকশনও করা যেতে

পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নামার আগেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এগুলি ব্যবহারের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিসহ আবেদন করতে হবে, সঙ্গে অবশ্যই থাকবে ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

ব্লাড ডোপিং : রক্তে সরাসরি উত্তেজক ওষুধ প্রয়োগ করে অনেকে পারফরম্যান্স বাড়াচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিকের আসরে। দৌড়বীর লাসভিরেনের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছিল। এখনো পর্যন্ত ডোপ টেস্ট হয় শুধু ইউরিন স্যাম্পেল নিয়েই, ব্লাড স্যাম্পেল নেওয়া হয় না। অনেক সময় ব্লাড ডোপিং করেও পার পেয়ে যায় খেলোয়াড়রা।

প্রেগনেন্সি ডোপিং : অনেক মহিলা অ্যাথলিট গর্ভাবস্থার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন হর্মোন ব্যবহার করেন শারীরিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। ডোপিং-এর এ এক নয়া কৌশল।

কিভাবে হয় ডোপ টেস্ট?

ডোপ টেস্টের জন্য আজকাল উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজন হয় নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের। এখনো পর্যন্ত শুধু মূত্রের নমুনা নিয়েই পরীক্ষা করা হয়। খেলার শেষে খেলোয়াড়দের বিশেষ প্রহরায় পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। দুটি পাত্রে সংগ্রহ করা হয় মূত্রের নমুনা। প্রথম নমুনা খেলোয়াড়ের সামনেই পরীক্ষা করা হয়। যদি কোন নিষিদ্ধ ওষুধের উপস্থিতি প্রথম নমুনায় পাওয়া যায় তখন দ্বিতীয় নমুনাটিতে প্রতিযোগী অথবা তাঁর স্বীকৃত প্রতিনিধি, সে-দেশের ফেডারেশন বা শেফ দ্য মিশনের সই করে ডোপিং কমিশনে 'সিল' করে রেখে দেওয়া হয়। এই সিল খোলা হয় প্রতিযোগী, তার ফেডারেশন, সংগঠক এবং ডোপিং কমিশনের সদস্যদের সামনে। এইবার ঐ মূত্রের নমুনা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় তাতে কী ধরনের নিষিদ্ধ ওষুধ আছে, তার মাত্রাই বা কতটা? এতসব কিছুর পরেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মারাদোনার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম নমুনায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতেই তাঁর কপালে কলঙ্কের টিকা এঁকে দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতা ময়দানে কি ডোপিং-এর ব্যবহার হয়?

অলিম্পিকে বা আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে যে-ধরনের বৈজ্ঞানিক ডোপিং আজকাল চলছে তার পাশে কলকাতার ময়দানে যে-উত্তেজকের ব্যবহার হয় তা সেই মান্ধাতা আমলের। একে 'ডোপিং' বলাটাও ঠিক হবে না। তবে উত্তেজক পানীয় খেয়ে শরীরে চনমনে ভাব আনার চেষ্টা কলকাতা ময়দানে সেই সত্তর দশকের গোড়া থেকেই ছিল। পানীয়তে মেশানো হতো ডেক্সিড্রিন নামে একটি উত্তেজক ট্যাবলেট এবং মধু, ব্র্যান্ডি, ফস্ফোমিন, কাফ সিরাপ ইত্যাদি। ব্যস, ঐ পর্যন্তই। অ্যাম্ফিটামিন, কোকেন বা অ্যানাবলিক স্টেরয়েড নিয়ে পারফরম্যান্স বাড়ানোর কথা কলকাতার ময়দানের কোচ বা খেলোয়াড়রা কোনদিন ভাবেননি, আজও ভাবেন না। এখানকার দুজন নামী প্রাক্তন খেলোয়াড়ের লেখা পড়ে জেনেছি, কলকাতা ময়দানে খেলোয়াড়দের তাতানোর জন্য ব্যাপকভাবে ডেক্সিড্রিন ট্যাবলেট খাওয়ানোর রেওয়াজ শুরু করেছিলেন কিংবদন্তিসম এক কোচ। খেলোয়াড়-দের ওপর তিনি জোরও খাটাতেন। এই ওষুধের খারাপ প্রতিক্রিয়া জেনে যাওয়ার পর অনেক খেলোয়াড়ই কোচের অলক্ষ্যে মুখ থেকে ফেলে দিত ঐ ট্যাবলেট।

শেষকথা

খেলাধুলার জগতে ডোপিং যে শেষপর্যন্ত বিপর্যয়ই ডেকে আনে সে-ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা একমত। বহু খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়ী জীবনে অকালে যবনিকাপাত ঘটিয়েছে এই ডোপিং। পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া অপরাধ কিছু নয়, বিশেষ করে স্পোর্টস মেডিসিনের এই দ্রুত উন্নতির যুগে। কী ধরনের ব্যায়াম করে, কী ধরনের খাবার খেয়ে এবং কী কী ওষুধ খেয়ে শারীরিক ক্ষতি না করে খেলোয়াড়ী দক্ষতা আরও বাড়ানো যায়—সে-ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন বিশেষজ্ঞরাই। এর পাশাপাশি খেলোয়াড়কেও জানতে হবে, কোন্ ওষুধ নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত, কী তার বাজারে নাম, খেলে কী ক্ষতি হয় ইত্যাদি। চারপাশে আজকাল বড় দুষ্টলোকের ভীড়। কে যে কোন্ খাবারে কোন্ ওষুধ মিশিয়ে আপনার সর্বনাশ করে দেবে, আপনি জানতেও পারবেন না। আমাদের দেশে ক্রীড়া-চিকিৎসাবিজ্ঞান খাতা-কলমে এগোলেও প্রয়োগের দিক থেকে এগিয়েছে বড় কম। কোচ, ক্রীড়া-সংগঠক, কর্মকর্তা, খেলোয়াড় প্রত্যেকেরই এ-ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞান থাকাটা খুব জরুরী। সতর্ক না থাকলে ঠকতে হবে খেলোয়াড়কেই, ডোপিং-এর কলঙ্কটিকা ললাটে পরে ফিরতে হবে প্রতিযোগিতার আসর থেকে।□

গ্রন্থ-পরিচয়

ভাব ও রূপের দেবতা বিবেকানন্দের চিত্রমালা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

Vivekananda : East Meets West (A Pictorial Biography)—Swami Chetanananda. Vedanta Society of St. Louis, Missouri, U. S. A. Pages : 12+164. Price : Not mentioned.

এখানে মিলেছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য।

সে কোথায়? কোন্ মহামানবের জীবন-সাগরে?

স্বামী চেতনানন্দ তার উত্তর দিয়েছেন—বলা উচিত, আমাদের চোখের সামনে উত্তরটি মেলে ধরেছেন তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থে। গ্রন্থটির নাম—বিবেকানন্দঃ ইস্ট মিটস ওয়েস্ট।

বইটি হাতে নেওয়ার আগে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল, এমন একটি বই সত্যিই হতে পারে—এমন রূপের দ্যুতিবিকীর্ণ, এমন সত্তার গভীর স্বরধ্বনিত!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে—বইটি স্বামী বিবেকানন্দের আলোকচিত্রাবলীর মুদ্রণ, সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি-চিত্র ও স্থান-চিত্র। এককথায়, স্বামী বিবেকানন্দের একটি নতুন অ্যালবাম। বইয়ের পৃষ্ঠা ওলটাবার পরে সে-ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। যদি এটি নিছক অ্যালবাম হতো তাহলে হুস্টন স্মিথের মতো দার্শনিক-লেখক বইটির মুখবন্ধ লিখতেন না এবং বিবেকানন্দের জীবনচিত্র রচনা করে দিতেন না সাহিত্যিক ক্রিস্টোফার ইশারউড।

হুস্টন স্মিথ বলতে চেয়েছেনঃ বিবেকানন্দ যে বলেছেন, তাঁর গুরুর স্পর্শে তাঁর মনে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল, তিনি উপলব্ধি করলেন বিশ্বজগৎ বলে আর কিছু নেই, আছেন শুধু ঈশ্বর—পাশ্চাত্যজগতে বসে মনে হবে, ওকথাটা কেবল দূর দেশের একজন মানুষের উচ্চারণ নয়, ওটি দূরকালের মানুষের কথাও। অর্থাৎ বিজ্ঞানের জগতে ওকথাকে মূল্য দেওয়া যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান কী জীবনের গভীরতর প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে? সে শুধু বলেছে মানবের কথা—চিরমানবের কথা নয়। এখানেই আসছেন বিবেকানন্দ, যিনি এশিয়ার আধ্যাত্মিকতা এনেছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকায়, যা স্থায়িভাবে বদলে দিয়েছিল দুই মহাদেশের ধর্মবোধ। তিনিই পুরোধা—বেদান্তই পুরোধা। তার পরে এসেছে বৌদ্ধধর্ম, সুফীধর্ম, শিখধর্ম, বাহাইধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম। "ব্যক্তিগতভাবে আমি বিবেকানন্দকে বার্তাদূত হিসাবে অভ্যর্থনা জানাই, যিনি কেবল ভিন্ন দেশ থেকে আসেননি, এসেছিলেন ভিন্ন কালে—যে-কাল অনন্তের শ্বাসগ্রহণে অধিক উন্মোচিত ছিল।" হুস্টন স্মিথ স্বীকার করেছেন, স্বামী চেতনানন্দ "সেই মানুষটির জীবন ও বাণীকে রূপায়িত করেছেন সজীব বর্ণে"।

বিবেকানন্দ কি প্রাচ্যের? বিবেকানন্দ কি পাশ্চাত্যের? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে স্বামী চেতনানন্দের গ্রন্থে, যে-উত্তর বিবেকানন্দের দেহান্তের অল্প পরে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেনঃ

"অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ... পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।... তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।" পুনশ্চ স্মরণ করিয়ে দেব, স্বামী চেতনানন্দের গ্রন্থ-নাম—'বিবেকানন্দঃ প্রাচ্য মিলিত হলো পাশ্চাত্যে'।

কাদের জন্য স্বামী চেতনানন্দ বইটি প্রস্তুত করেছেন? অবশ্যই পাশ্চাত্যের মানুষের জন্য। সে-পাশ্চাত্য একদা বিবেকানন্দের দ্বারা শিহরিত হয়েছিল, কিন্তু দ্রুত ধাবমান কালের যাত্রী হয়ে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে বিবেকানন্দের রত্নপেটিকাকে। সেজন্য বিবেকানন্দের এক ইংরেজ জীবনীকার তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন—'গিফট্ আনওপন্ড'। স্বামী চেতনানন্দের বই রচিত হয়েছে ভারতবর্ষের জন্যও, যে-ভারতবর্ষ বিবেকানন্দকে নামতঃ স্মরণ করেও বস্তুতঃ ভোলার জন্য অস্থির।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-গমনের শতবার্ষিকীকে স্মরণ করে আলোচ্য বইটি প্রস্তুত হয়েছে। দামী আর্ট পেপারে ছাপা। ২৭৫টি চিত্র-সম্বলিত এই বইয়ে পূর্ব-প্রকাশিত স্বামীজীর সকল ছবি আছে, নব-আবিষ্কৃত দু-একটি ছবিও যুক্ত হয়েছে। স্বামী চেতনানন্দ তাঁর ভূমিকায় বলেছেনঃ একথা ঠিক, স্মৃতি অমর; বুদ্ধ খ্রীস্ট চলে গেছেন, কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে বাহিত হয়ে তাঁরা যুগের পর যুগ ধরে মানুষের সন্নিধানে উপস্থিত। ওঁদের বিষয়ে পড়লে ওঁদের চাক্ষুষ করতে ইচ্ছা হয়,

কেননা তাতে ওঁরা আমাদের কাছে বাস্তব সত্য হয়ে ওঠেন। চাক্ষুষ করা যায় প্রত্যক্ষ দর্শনে, কিংবা অধ্যাত্মদর্শনে; দুইয়ের কোনটাই যখন কারো পক্ষে সম্ভব নয় তখন দর্শনের উপায় চিত্রদর্শন, ততোধিক ফটোদর্শন। সভ্যতার বিরল ভাগ্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ফটোচিত্র মেলে। চীনা প্রবাদে আছে—"দশ হাজার কথার থেকে একটি ছবির দাম বেশি।"

সুতরাং স্বামী চেতনানন্দ নিরলস প্রযত্নে বিবেকানন্দের রূপান্বিত আকার আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'রূপ'! হ্যাঁ, স্বামী চেতনানন্দ রূপের পূজারী, তবে সে-রূপ হওয়া চাই রূপের দেবতার। আর মানবকুলে সেই দেবতাকে তিনি একজনের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন—ক্লাসিক দেবতার মতো যাঁর মুখ আর অবয়ব, তারকা-বিচ্ছুরিত নেত্র, ঘন মেঘপুঞ্জের মতো কেশরাশি। আর যখন মুণ্ডিত মস্তক তখন তিনি বুদ্ধ—নব বুদ্ধ। ঈশ্বর যে পরম রূপময়, তা তাঁর আদলে নির্মিত কয়েকটি মানব-বিগ্রহ না থাকলে বিশ্বাস করা যেত কি করে? সুতরাং স্বামী চেতনানন্দের বিবেকানন্দ-সাধনা বিবেকানন্দ-রূপের সাধনাও বটে—দৃষ্টিপ্রদীপে যাঁর নিরন্তর আরতি।

স্বামী চেতনানন্দ রূপে নিহিত বিবেকানন্দকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি দেখিয়েছেন রূপের অতীত তীরে অবস্থিত বিবেকানন্দকে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, দ্বিতীয় বিবেকানন্দেই তাঁর অধিক মনোযোগ। নচেৎ মনে হতে পারত, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের সাজানো রাজার মতো তিনি—সেই 'সুন্দর'-নামা যুবকটি যেন—'ননীর মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, প্রজাপতির মতো সুন্দর'। না, বিবেকানন্দ সেই রঙিন ফানুসের প্রতারণা নন; তাঁর আসল রূপ—সে বড় ভয়ঙ্কর, 'ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো'। বস্তুতঃ, অনন্তের বর্ণে অঙ্কিত বর্ণহারা সেই বিবেকানন্দ। গহন গভীরের সেই তাঁকে এই গ্রন্থে স্বামী চেতনানন্দ দেখতে চেয়েছেন। তাঁকে দেখা সহজ নয়। উপায়কে সহজ করার জন্য তিনি সহজ পথ নিয়েছেন—উপস্থিত করেছেন বিবেকানন্দের আত্মদর্শনের রচনা-খণ্ডগুলিকে। বিবেকানন্দের আত্ম-উন্মোচন মানে হিরণ্ময়পাত্রকে সরিয়ে সত্যকে অবারিত করে দেওয়া।

বইটির মধ্যে তাই স্বামীজীর জীবনী ও আত্মজীবনীর সহাবস্থান। স্বামী চেতনানন্দ কাহিনীর ধারাসূত্র রচনা করে (তাঁর ভাষা সরল স্বচ্ছ সুন্দর, গভীরের রেখাটানা) তার মধ্যে নিপুণভাবে বসিয়ে দিয়েছেন স্বামীজীর আত্মকথনের নানা অংশকে—সেইসঙ্গে বিবেকানন্দের বাণীও, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যে কথিত তাঁর বাণীখণ্ডগুলি। বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন: "পাশ্চাত্যের জন্য আমার বিশেষ বাণী আছে"—সে-বাণীর রূপ কি, এই বইয়ে তার সুচারু বিন্যাস। দীর্ঘদিন বিবেকানন্দ-ভাবনায় নিমগ্ন থাকলে তবে তাঁর বিশ্বচিন্তার ওহেন গ্রন্থন সম্ভব। বইটিকে সেদিক থেকে বিবেকানন্দের বাণী-জীবনীও বলা চলে। বাণীতে জীবনে একাকার।

ইতিহাস মুছে দেওয়ার স্থূল প্রয়াস ভারতবর্ষের সর্বত্র চলেছে। স্বামীজীর সনিঃশ্বাস সোৎকণ্ঠ অনুরোধ মনে পড়ে—কলকাতা-সংলগ্ন অঞ্চলে গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য বর্ণনার পরে যা করেছিলেন: "হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নামবেন ইট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!"

সুতরাং প্রয়োজন বিবেকানন্দের কালের সচিত্র ইতিহাসের পুনরুদ্ধার। সে-চেষ্টায় অনেকেই নিয়োজিত, তার মধ্যে এক প্রধান কর্মী স্বামী চেতনানন্দ। ফলে তাঁর বইটি থেকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের পট যেমন পাই (বুদ্ধ-শঙ্কর-চৈতন্যের ধারায় যিনি ভারতপথিক), সেইসঙ্গে সামনে খুলে যায় ধর্মভারত, শিল্পভারতের ছবি। সেই পরিব্রাজককে পাই—যিনি চলেছিলেন ভারতের পথে পথে ঐতিহাসিক কীর্তির ধ্বংসস্তূপের ওপর দিয়ে, দরিদ্র কিন্তু আত্মানন্দময় মানুষে ভরা ভূখণ্ড মাড়িয়ে, অদূর ও সুদূর যাঁর দৃষ্টি, যিনি দেখেন বাইরের চোখে, উপলব্ধি করেন ভিতরের চোখে, যাঁর চোখের ওপর দিয়ে সরে যায় ইতিহাসের চলচ্চিত্র এবং মহাকালের পটে ফুটে ওঠে একটি আশ্চর্য চৈতন্যময় ভূমি, যার নাম ভারতবর্ষ। কী বিচিত্র সে-যাত্রা, কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও দর্শনের অমেয় ঐশ্বর্যভাণ্ডার!

তারপর বিবেকানন্দ উত্তীর্ণ হলেন পাশ্চাত্যে—ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে। পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধতম দেশ আমেরিকায় নিত্যভারত কথা বলেছিল কোন্ ভাষায়,

কিভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল পৃথিবীর মানুষকে—সে-ইতিহাস স্বামী চেতনানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর বইয়ের বিবরণ অংশে। সেই পাশ্চাত্যের অনেক ছবি তিনি দিয়েছেন। তার একটি—পাতাজোড়া ছবি নাগরদোলার, কলম্বিয়া একজিবিশনের একাংশে যা স্থাপিত হয়েছিল। একটা নাগরদোলার এত বড় ছবি তিনি দিলেন কেন? একটা উত্তর ঃ শিকাগোর ধর্মমহাসভা কেবল কয়েক হাজার মানুষের সামনে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের বেশ কয়েকদিন ধরে বক্তৃতা করার আয়োজন ছিল না—তা স্থাপিত ছিল একটি নতুন সভ্যতার আত্মঘোষণার পটভূমিকার ওপরে। সে-সভ্যতা বিজ্ঞানে আবর্তিত। ঐ নাগরদোলাটি, যার নাম ফেরিস হুইল, এক প্রকাণ্ড কাণ্ড। সেটি ২৬৪ ফুট উঁচু দণ্ডের ওপর স্থাপিত, ৪৫ ফুট দীর্ঘ তার অক্ষ। চক্রনেমিতে ৩৬টি উপবেশনের খাঁচা, প্রত্যেকটি খাঁচায় ৬০ জন বসতে পারে। প্রতিটি আবর্তনের জন্য ২০ মিনিট সময় লাগে। বিবেকানন্দ মোহিত হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ঘূর্ণগতির প্রতীক যেন ঐ ফেরিস হুইল। কিন্তু বিবেকানন্দের দর্শন সেখানেই থেমে যায়নি। জড়বিজ্ঞান বিপুল সৃষ্টিতে বিস্ফোরিত হচ্ছিল দেখে নমস্কার করেছিলেন তিনি, কারণ তাঁর কাছে 'বিজ্ঞান'ও 'জ্ঞানে'র অন্তর্গত। কিন্তু বহির্বিজ্ঞানের অন্তরালে রয়েছে অপরিমেয় অন্তর্বিজ্ঞান—সেই রাজ্যের পথিক তিনি। ঐ বিশাল নাগরদোলাটি তাঁর মনে সৃষ্টিরহস্যের রূপচ্ছবি এনে দিয়েছিল। নাগরদোলায় মানুষ উঠছে, সেটি ঘুরছে, চক্রযাত্রার শেষে বেরিয়ে আসছে, উঠে পড়ছে অন্য যাত্রীরা। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, খাঁচাগুলিতে যারা প্রবেশ করছে, আর আবর্তনের শেষে যারা বেরিয়ে আসছে—তারা একই জীব নয়। আবর্তন তাদের জীবনে এনে দিচ্ছে বিবর্তন। সকলকেই প্রবেশ করতে হবে এই চক্রযাত্রায়। যাত্রা তখনই শেষ হবে যখন বিশ্বজীবন প্রবেশ করবে বিশ্বচৈতন্যে, যার সাধারণ নাম—ঈশ্বর। বিবেকানন্দের বিশ্বমনে জড়বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয়েছিল অধ্যাত্মবিজ্ঞানে। হয়তো তিনি স্বয়ং ফেরিস হুইল-এর খাঁচায় বসেছিলেন, যখন আবর্তিত হচ্ছিলেন তখন গতিশীল পথিক, কিন্তু আসলে তিনি অবস্থিত ছিলেন হুইলের কেন্দ্রে—তীব্র গতির কারণে যাকে বাহ্যতঃ স্থির বলে মনে হয়। 'ডাইন্যামিক' বিবেকানন্দ এবং 'লিবারেটেড' বিবেকানন্দ। চলিষ্ণু বিবেকানন্দ এবং সমাধিস্থ বিবেকানন্দ।

স্বামী চেতনানন্দের সুপরিণত পরিকল্পনায় বিন্যস্ত আরও একটি ছবির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক।

স্বামীজী আত্মকথায় বলেছেন, তিনি বাল্য-কৈশোরে ঘুমোবার আগে ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্বিন্দু দেখতেন, যা ক্রমে স্ফীত হয়ে বিস্ফোরিত হতো, আর তাঁকে ঢেকে ফেলত অপরূপ আলোকে। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। এই বর্ণনার সঙ্গে স্বামী চেতনানন্দ যুক্ত করেছেন একটি ফটোচিত্র—কলকাতায় গঙ্গার সূর্যাস্তের। দূর দিগন্তে সূর্য বিদায় নিচ্ছেন, তাঁর প্রতিবিম্ব পড়েছে গঙ্গার কম্পমান জলে। তিনি কি বলতে চেয়েছেন—বিদায়ী সূর্যের সেই আলোকের অংশ নরেন্দ্রের ললাটভূত হয়েছিল, যখন তিনি দিনের কর্মচাঞ্চল্য থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করছেন নিত্যজ্যোতির মধ্যে? এই চিত্রবিন্যাসের মধ্যে তাঁর মনোভাব কী ছিল জানি না, তবে তিনি মিস ম্যাকলাউডের বান্ধবী, রহস্যবাদিনী মিস রোয়েথলিসবার্জারের একটি স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যা নরেন্দ্রের জীবনসত্য কোন বৃহত্তর জীবনসত্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত—তা দেখিয়ে দেয়। মিস ম্যাকলাউড লিখেছেন ঃ

"স্বামীজীর বিষয়ে অবহিত হওয়ার বেশ কিছু বছর আগে থেকেই বেটী [মিসেস স্টার্জেস, পরে যিনি মিসেস লেগেট হন], ডোরা [রোয়েথলিসবার্জার] এবং আমি—কেবল এই তিনজন ঐ ঘরটিতে [নিউ ইয়র্কের থার্টি-ফোর্থ স্ট্রীটের তিনতলার পিছনের ব্লকে] ধ্যান করতাম। ডোরা আমাদের বলেছিল, তিনি শ্বেতবসন একটি মানুষকে দেখেছেন, যাঁর মুখ তিনি যেকোন স্থানে দেখলেই চিনতে পারবেন। তিনি আমাদের ওপর অপূর্ব সুন্দর নীল বৈদ্যুতিক আলোক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।... পরবর্তী কালে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তিনি যখন রামকৃষ্ণের ছবি দেখালেন, তখন ডোরা তাঁর দর্শনলব্ধ মানুষটিকে রামকৃষ্ণ বলে চিনতে পারেন।"

স্বামী চেতনানন্দের চিত্রবিন্যাসের পিছনে সক্রিয় রূপবোধ ও মননের বিষয়ে আরও অনেক কিছু লিখে যাওয়া যায়। কিন্তু এবার থামার প্রয়োজন আছে। তবে গ্রন্থ-প্রচ্ছদের কথা না বললেই নয়। প্রচ্ছদে রয়েছে আমেরিকার বিখ্যাত ভাস্কর রঁদ্যার ছাত্রী মালভিনা হফম্যানের করা স্বামীজীর ধ্যানমূর্তির ছবি। (মালভিনা হফম্যান শৈশবে স্বামীজীকে দেখেছেন।) ব্রোঞ্জমূর্তিটি ক্যালিফোর্নিয়ার ট্রাবুকো মনাস্টারিতে পত্রপুষ্পচ্ছায়ে স্থাপিত। সবুজাভ পটভূমির সেই বিবেকানন্দ—চিরসবুজ।

বিবেকানন্দের জ্বলন্ত গৈরিক কখনো তাঁর সঘন সবুজকে ভস্মীভূত করতে পারেনি।□

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ১৭ জুলাই '৯৬ বাগবাজারের বলরাম মন্দিরে (কলকাতা-৩)সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, পরে বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে মূল অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী রথরজ্জু আকর্ষণে রথযাত্রার সূচনা করেন। বেলুড় মঠ এবং অন্যান্য শাখাকেন্দ্র থেকে আগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের কীর্তন-সহযোগে রথরজ্জু আকর্ষণের পর কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী সারিবদ্ধভাবে (মহিলা ও পুরুষরা পৃথগ্‌ভাবে) রথরজ্জু আকর্ষণ করেন। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৫ জুলাই পুনর্যাত্রা উৎসব পালিত হয়। ঐদিন বিকালে কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের (উদ্যানবাটী) অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী রথরজ্জু আকর্ষণ করে পুনর্যাত্রার সূচনা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের শতাধিকবার পদার্পণে ধন্য বলরাম মন্দিরে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে পুনর্যাত্রার দিনই ঠাকুর প্রথম দোতলার বারান্দায় কীর্তন-সহযোগে নৃত্য করতে করতে ভক্তদের সাথে রথরজ্জু আকর্ষণ করেছিলেন। পরের বছর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রথযাত্রার দিনেও তিনি রথরজ্জু আকর্ষণ করেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে বলরাম মন্দিরে প্রতিবছর রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং প্রতি বছরই ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৮ জুলাই '৯৬ বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দের স্বাগত ভাষণের পর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে সকলকে আনন্দদান করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী সনাতনানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আদর্শে তরুণ ছাত্ররা জীবন গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হতে পারবে এবং বড় হয়ে নিজেদের স্বভাব, গুণ ও আচরণে মানুষকে আনন্দ দান করে সুখী করবে। সভাপতি স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ বলেন, বিদ্যালয় শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। তাই জীবনে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুসরণের মধ্য দিয়ে সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে তোলাই ছাত্রদের তপস্যা। প্রধান শিক্ষক স্বামী সুমনসানন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কৃতিত্বের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। অভিনয়, সমাজসেবা, পরীক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য মোট ১৫২ জন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ১৩ ও ১৪ জুলাই '৯৬ নরোত্তম নগর আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ) দুদিনব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে। আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসবের উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল মাতা প্রসাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী। অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি. এল. রাজকুমার-সহ বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং বহু সন্ন্যাসী, ভক্ত ও ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নানাবিধ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের আকর্ষণীয় অঙ্গ।

জামতাড়া মঠে (বিহার) গত ২৬ জুন থেকে ২ জুলাই '৯৬ সাতদিন ধরে গ্রামীণ যুব-নেতৃত্ব শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৬টি গ্রাম থেকে মোট ৪০ জন যুবক অংশগ্রহণ করেছিল।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের (জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) ছাত্ররা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ১০ম ও ১৪শ স্থান অধিকার করেছে। ইকোনমিক্সে ৩ জন ছাত্র-সহ মোট ৩০ জন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র এবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী লাভ করেছে। তাছাড়া স্ট্যাটিসটিকসে ১ম ও ৪র্থ স্থান, কেমিস্ট্রিতে ১ম ও ২য় স্থান, ফিজিক্সে ৪র্থ স্থান এবং ম্যাথামেটিকসে ২য় স্থান অধিকার করেছে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর আবাসিক বিদ্যালয়ের ৬ জন অন্ধ ছাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৫ জন 'স্টার' মার্কস (৭৫% এবং তারও অধিক) পেয়েছে।

মাদ্রাজ সারদা বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এস. এস. এল. সি. পরীক্ষায় ৭ম স্থান অধিকার করেছে।

মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্ররা ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২ জন উপজাতি ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উপজাতি মেধা-তালিকায় ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান পেয়েছে।

চিকিৎসা-শিবির

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (উড়িষ্যা) একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে বিনামূল্যে ৫৮২ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া আশ্রম খুরদা জেলার অসরলা গ্রামে দন্ত-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। এই শিবিরে ১২৪ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। সকল রোগীকেই বিনামূল্যে ঔষধপত্র প্রদান করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

ওডলাবাড়ি অঞ্চলে ৯টি অস্থায়ী শিবিরে **জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম** ১২০০ বন্যাপীড়িত পরিবারকে ৫ দিন রান্না-করা খাবার বিতরণ করেছে। তাছাড়া বেলুড় মঠ থেকে প্রেরিত হয়েছে বহু ধুতি, কম্বল ও বাসনপত্রাদি।

রাজস্থান বন্যাত্রাণ

যোধপুর জেলার রিদমালসর গ্রামে **জয়পুর রামকৃষ্ণ মিশন** বন্যাকবলিত পরিবারগুলিকে ১৫০টি অস্থায়ী কুটির নির্মাণ করে দিয়েছে।

কেরালা দুঃস্থত্রাণ

কুইল্যান্ডি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের মাধ্যমে চিনামঙ্গদ ছাড়া আরও দুটি কলোনীর মোট ৫১৮টি দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে ২৭৯৫ কিলোঃ চাল এবং ৩৫ কিলোঃ গম বিতরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ঝঞ্ঝাত্রাণ

ঢাকা রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল গ্রামে ঝঞ্ঝাগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ২৬০০ শাড়ি, ১৮০০ লুঙ্গি, ৭০০ ধুতি এবং ১২০০ সি. জি. আই. সিট বিতরিত হয়েছে।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্র

লাতুরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের পুনর্বাসনের পর 'বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ প্রকল্পে'র মাধ্যমে কাওলি গ্রাম ছাড়াও জাওয়ালগাঁওয়াড়ী ও হরেগাঁও গ্রামদুটিতে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে খরিফ শস্য ও উদ্যান পরিচর্যা প্রশিক্ষণ, গবাদি পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, ২৫০০টি ফলের চারা বিতরণ, দশদিনব্যাপী যুবশিক্ষণ শিবির, সবজিচাষ শিক্ষণ প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড ঃ গত আগস্ট মাসের প্রতি রবিবার সকালে বিশেষ বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় 'দ্যা গস্‌পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং ১২ ও ২৮ তারিখ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ও শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। তাছাড়া প্রশ্নোত্তর, সৎপ্রসঙ্গাদি এবং ৩১ তারিখে একদিনের একটি সাধন-শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস ঃ গত জুলাই মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ হয়েছে। ৪ তারিখ স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের 'সনাতন ধর্ম' বক্তৃতা এবং ধর্মীয় প্রসঙ্গাদি শোনাবার ব্যবস্থাদিও হয়েছিল।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়াশিংটন (সিয়াটল) ঃ গত আগস্ট মাসের রবিবারগুলিতে সকালের দিকে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। ১৮ তারিখ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের 'শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আদর্শ' বক্তৃতাটি ভি. ডি. ও.-তে প্রদর্শিত হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞানন্দ (শোভনলাল) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ জুন রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে দেহত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর দেহে বিশেষ কোন অসুখের লক্ষণ ছিল না এবং শেষদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। দেহত্যাগের দিন নৈশ আহারের পর রাত ১০টার দিকে তিনি শ্বাসকষ্ট অনুভব করতে থাকেন এবং তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণ তাঁর চিকিৎসা শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞানন্দ ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি লখনৌ কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই কেন্দ্রেরই কর্মী ছিলেন। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস লাভ করেন। সদাপ্রফুল্ল, কঠোর পরিশ্রমী এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী (বিমল মহারাজ) গত ১৯ জুলাই '৯৬ রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রে দেহত্যাগ করেন। হৃদ্‌যন্ত্র ও বৃক্কের অনিয়মিত ক্রিয়া তাঁর দেহত্যাগের কারণ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন ভুবনেশ্বর, কলকাতা স্টুডেন্টস হোম ও মহীশূর কেন্দ্রে তিনি কর্মী হিসেবে ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর (১৯৩৯-১৯৫১) তিনি তাঁর সচিব-সেবকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-১৯৫৬ চার বছর তিনি 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্যান ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রে পাঠান। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। পূজনীয় মহারাজ ছিলেন একজন বিদ্বান সন্ন্যাসী। বাঙলা ও ইংরেজীতে সুলিখিত কয়েকটি গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রেমময়, মধুর ও সুরসিক স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সকলের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন।

'উদ্বোধন'-সম্পাদকের সংযোজন ঃ পূজনীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মহারাজের চার বছরের 'উদ্বোধন'-সম্পাদনা কাল এখনো অনেক

পুরনো গ্রাহক ও পাঠক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি শুধু একজন উচ্চকোটির প্রাবন্ধিকই ছিলেন না, ছিলেন উচ্চকোটির কবিও। 'উদ্বোধন'-এ তাঁর সম্পাদনা-পরবর্তিকালে তাঁর বহু সুলিখিত প্রবন্ধের পাশাপাশি অনেক সুন্দর কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রণীত 'অতীতের স্মৃতি' রামকৃষ্ণ সংঘের প্রায়-আদিপর্বের এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। এই গ্রন্থটির জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন'-এর অত্যন্ত অনুরাগী এবং আগ্রহী এক বিদগ্ধ পাঠকও। প্রায়ই চিঠি লিখে তিনি আমাদের উৎসাহিত করতেন। দেহত্যাগের কিছুদিন আগে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ "শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে 'উদ্বোধন'-এর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে তাজ্জব বনে যাচ্ছি ভায়া! চরৈবেতি! খুব ভাল লাগছে 'উদ্বোধন'। খু-উ-ব!" শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে এবারের শারদীয়া সংখ্যার জন্য যথারীতি লেখা পাঠিয়েছিলেন তিনি। লেখাটি মুদ্রিত হবার পর সংবাদ এল—তিনি দেহত্যাগ করেছেন। নির্ভীক সন্ন্যাসী শান্তভাবে মাত্র সেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু কয়েক বছর আগেই 'উদ্বোধন'-এ একটি কবিতায় তিনি স্বচ্ছন্দে লিখে গিয়েছিলেন তাঁর বিদায়বেলার অনুভূতি ঃ

বিদায়বেলায়
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

॥ ১ ॥

আসিবে যখন বিদায়ের ক্ষণ পৃথিবীর বুক হতে
কিছুই তখন রবে না পড়িয়া পশ্চাতে কোনমতে।
যাহা কিছু প্রিয় যাহা অপ্রিয় সকলি চলিবে সাথে—
অপরূপ আলো উঠিবে জ্বলিয়া কৃষ্ণা মরণ-রাতে।
এক শুধু আছে নাই তো দ্বিতীয় বিচ্ছেদ হবে কিসে?
এই পারে যাহা তাহাই ওপারে এক রহে একে মিশে।

॥ ২ ॥

দুন্দুভিধ্বনি ছাইলে গগন সকল শব্দ ঢাকে
বীণাঝঙ্কারে ডুবিলে পরাণ কিছু নাহি মনে থাকে।
লবণ যখন জলে গিয়া পড়ে জলেই মিশিয়া যায়
সাগরে মিলিয়া যত নদনদী সাগর-সত্তা পায়।
বিদায়ের বাঁশী যদি বেজে ওঠে মহামিলনের সুরে
সকলি তখন হবে আপনার কি আর রহিবে দূরে?

॥ ৩ ॥

এক খেলা চলে সব নামরূপে—কালের প্রবাহ ধরি
একই মুক্তি আসিছে বহুল বন্ধন বেশ পরি।
বাঁধিয়াছে বাসা একই অমর সকল মৃত্যু মাঝে
স্বচ্ছ শুভ্র এক মহাসুখ নাচিছে দুঃখ-সাজে।
বিদায় বেলায় সেই সে সত্য যদি বুকে জেগে রয়
কোন্ সন্তাপ তাপিবে হৃদয়, কোন্ শোক, কোন্ ভয়?

(৯০তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৪)

স্বামী পূজানন্দ (পীযূষ) গত ৩০ জুলাই '৯৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। তিনি ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর কেন্দ্রে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি প্রায় ৪১ বছর যাবৎ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে কর্মী হিসেবে ছিলেন এবং ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর সহজ সরল স্বভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।□

'কনজাঙ্কটিভাইটিস' ('জয় বাংলা') প্রতিরোধে করণীয়

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এক গ্লাস গরম জলে সিকি চামচ লবণ ও ৫/৬ ফোঁটা স্যাভলন বা ডেটল বা ঐ জাতীয় কিছু মিশিয়ে গার্গল (গলাকে অন্তর্ভুক্ত করে কুলকুচি) করুন। রোগীর কথাবার্তার সময়ে কাছে থাকলে যত শীঘ্র সম্ভব আরেকবার গার্গল করা ভাল।

এই রোগের ভাইরাস-জীবাণু হাঁচি, কাশি বা কথা বলার সময় রোগীর থুতুকণার মাধ্যমে বাইরে এসে হাওয়ায় ভাসে; শ্বাস নেওয়ার সময় অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে এবং অল্পসময়ে গলায় বংশবৃদ্ধি করে চোখে গিয়ে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগসৃষ্টি করে।

ডাঃ জলধিকুমার সরকার
পিএইচ. ডি., এফ. এন. এ.
ডিপ্লোমা ইন ব্যাক্টিরিয়োলজি (লন্ডন)
বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ, 'উদ্বোধন'
প্রাক্তন প্রফেসর অব ভাইরোলজি ও ডিরেক্টর
স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা
এবং
বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভাইরাস রোগবিষয়ক
বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা কমিটির প্রাক্তন সদস্য।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রম, দাসপুর (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে গীতা, চণ্ডী, কথামৃত, ভাগবত পাঠ এবং দুপুরে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নানাবিধ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথম দিনে ৪২ জন ছাত্রছাত্রী আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ধর্মপ্রসঙ্গ ও চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ধর্মপ্রসঙ্গ করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ। তৃতীয় দিন নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, দুপুরে প্রায় ৭০০০ ভক্তকে প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকালে ৯১৪ জন দুঃস্থদের মধ্যে শাড়ি, ধুতি ও কম্বল বিতরণ করা হয়। তারপর অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় বক্তব্য রাখেন গড়বেতা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দ, প্রহ্লাদ মান্না এবং আরও অনেকে।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯৬ নিজস্ব জমিতে কেন্দ্রের ভিত্তিস্থাপন করে। এই উপলক্ষে প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা হয় এবং পরে বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মহেশানন্দ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এদিন সকাল ১০টা থেকে ২-৩০ পর্যন্ত বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী মহেশানন্দের পৌরোহিত্যে উক্ত সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

প্রসাদচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর, পঃ বঙ্গ) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বার্ষিক জন্মোৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরির পর প্রায় ২৫০ এবং দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ ধারণ করেন। বিকালে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতি ইছাপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্লিপ্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ সংঘের ভাবধারা বিষয়ে আলোচনা করেন। আরও কয়েকজন বক্তা ভাষণ দেন। পরে আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যোগব্যায়াম প্রদর্শিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সংঘ, সম্বলপুর (উড়িষ্যা) গত ৩ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত-পাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসব পালিত হয়। দুপুরে স্থানীয় বালকাশ্রমের প্রায় ৮০ জন বালক-বালিকা ও ১৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে পুরী রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নিগমানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপদেশাবলী নিয়ে আলোচনা এবং উক্ত আশ্রমের ২১ জন বালক-বালিকার মধ্যে চশমা বিতরণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ (গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬) গত ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নিয়ে গীতবাদ্যাদি সহকারে নগর-পরিক্রমা হয়। দ্বিতীয় দিন উপনিষদ্ ও চণ্ডী পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সভায় অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী বোধসারানন্দ সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, চিত্তরঞ্জন (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ২-৩ মার্চ '৯৬ দুদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রথম দিন প্রায় ২০০ জন যুব ছাত্রছাত্রী 'বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করে। সকালে রক্তদান-শিবির ও বিকালে বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। জামতাড়া মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অধ্যাত্মানন্দের সভাপতিত্বে স্বামীজীর ওপর ভাষণ দেন ডঃ পলাশ মিত্র, স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী গিরিশানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। দ্বিতীয় দিন দুপুরে প্রায় ৭০০০ নর-নারায়ণকে সেবা ও বহু ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে স্বামী শিবময়ানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও হর্ষ দত্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘ' গীতিনাট্য পরিবেশন করে।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম (তেলোভেলোর চটি, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ)ঃ গত ১৪-১৬ মার্চ '৯৬ তিনদিনব্যাপী বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও হোম, নর-নারায়ণ সেবা, ধর্মসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষদিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন সারদাপীঠের সন্ন্যাসী স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। শতাধিক ছাত্রছাত্রী আবৃত্তি, বক্তৃতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সেবাশ্রম কর্তৃক আরামবাগের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বহু কৃতী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কার ও মানপত্র প্রদত্ত হয়।

আঙুরা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (জেলা—মেদিনীপুর)ঃ গত ৯ ও ১০ মার্চ এই পাঠচক্রের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন সকালে গ্রাম-পরিক্রমা, বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা ও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত

হয়। বিকালে ভাগবত পাঠ করেন অনন্তচরণ ষড়্‌শাস্ত্রী। কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ। পরে গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে তমলুকের 'গৈরিক' সম্প্রদায়। ১০ মার্চ সকালে বিশেষ পূজা, হোম, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যোগব্যায়াম প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। যোগব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে বেলদা (মেদিনীপুর) শিবানন্দ যোগাশ্রমের ব্রহ্মচারী উজ্জ্বল ভাষণ দেন এবং প্রবাল মাইতি ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক গ্রামবাসীকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বক্তব্য রাখেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিবেকাত্মানন্দ, স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ, অধ্যাপক বি. কে. দে ও প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী। তারপর 'কথায় ও গানে রামকৃষ্ণ-কথা' পরিবেশন করেন কমল ঘোষ এবং কীর্তন পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ মান্না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে, গাঁতী (দেউলী, জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) : গত ৩ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব পালিত হয়। ঐদিন পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পদাবলী কীর্তন, ভাগবত ও কথামৃত পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। কথামৃত পাঠ করেন কুমারেশ দাসশর্মা। বিকালে স্বামী দিব্যজ্ঞানানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ পরিবেশন করা হয়।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, রানিয়া কুলটুকারী (জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ১৭ মার্চ '৯৬ এই আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল কথামৃত পাঠ, লীলাগীতি প্রভৃতি। দুপুরে ২০০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান। তারপর মনসাদ্বীপ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিকাশানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভক্তসংঘ, জামালপুর (বিহার) : গত ২-৩ মার্চ '৯৬ দুদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। প্রথম দিন যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী প্রায় ৫০ জনকে পুরস্কৃত করেন পাটনা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরাশরানন্দ। তিনি একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করেন এবং প্রায় ৩০০ প্রতিযোগীর মধ্যে একটি করে বই ও টিফিন প্যাকেট বিতরণ করেন। দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা-হোমাদি এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী পরাশরানন্দ। পরে ভজনাদি ও রামায়ণগান অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁশকুড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (জেলা—মেদিনীপুর) গত ২৪ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষে সকালে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা ও হোম, কথামৃত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩৫০০ জন ভক্ত অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করে। বিকালে তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সংঘ, বোকারো (বিহার) : গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি দুদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উক্ত মন্দিরটি—যেটি আলমোড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল—আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দ। পরের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও দুপুরে প্রায় ৮০০ জন ভক্তের মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম দুর্গাপুর (জেলা—বর্ধমান) : গত ১০-১৩ মার্চ চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ, হস্তশিল্পজাত বিভিন্ন দ্রব্যের প্রদর্শন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এর পর প্রায় ৩০০০ ভক্তকে প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। প্রথম তিনদিন সন্ধ্যায় কলকাতার গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় স্বামী শশাঙ্কানন্দ রামচরিতমানস পাঠ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সমিতি, শ্রীগৌরী (আসাম) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী উদ্‌গীতানন্দের সভাপতিত্বে বারাণসী রামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্যামাপ্রসাদ দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন।

রামকৃষ্ণ আশ্রম, বারদ্রোণ (জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : গত ৩১ জানুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির ও প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাধু ও বহু ভক্তের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ মন্দির ও প্রার্থনাগৃহটি উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বৈদিক স্তোত্রপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং বক্তা ছিলেন স্বামী বিকাশানন্দ। দুপুরে প্রায় ২৫০০ নর-নারায়ণকে সেবা ও ১৫১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। বিকালের ধর্মসভায় সরিষা আশ্রমের স্বামী শিবনাথানন্দ সভাপতিত্ব করেন এবং ডঃ হোসেনুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন।

উদয়পুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব উৎসব গত ১৯ এপ্রিল থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপন করেছে। ১৯ এপ্রিল সারাদিনব্যাপী ভক্ত সম্মেলনে ১৫০ জন ভক্ত-প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুশান্তকুমার চৌধুরী। ২০ এপ্রিল সকালে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৫টায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ওপর একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যারতির পর অনুষ্ঠিত ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রাসঙ্গিকতা'। সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন সুশান্তকুমার চৌধুরী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তৃতীয় দিন ২১ এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি-সহ শহর-পরিক্রমা এবং দুপুরে নরনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০০ ভক্ত নরনারী বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন সুশান্তকুমার চৌধুরী এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উভয়দিনেই সভায় প্রচুর ভক্তসমাবেশ হয়েছিল। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আশ্রমের সচিব বিমল চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সভাপতি বিমান ধর।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মননসভা (জেলা—হুগলী) গত ১৭ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম আবির্ভাব উৎসব পালন করে। মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। সকাল এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা সকালের ধর্মসভা পরিচালনা করেন। দুপুরে প্রায় ২০০ জন ভক্তকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ এবং 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উভয় ধর্মসভার পর হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়।

বহির্ভারত

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পিরোজপুর (বাংলাদেশ) গত ২০ ফেব্রুয়ারি '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬১তম জন্মোৎসব পালন করে। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গীতা, চণ্ডী ও কথামৃত পাঠ এবং পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে সমাগত ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে মণীন্দ্র সাহা, পঙ্কজ কর্মকার ও সহশিল্পিবৃন্দ ভজন-কীর্তন পরিবেশন করেন। তারপর অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায়ের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা ছিলেন চণ্ডীচরণ পাল, বলরামচন্দ্র রায়, প্রেমানন্দ হালদার, ধীরেন্দ্রভূষণ শীল, গৌরাঙ্গলাল সাহা এবং অধ্যাপক সন্তোষ কুমার।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা রমা মজুমদার গত ৩ ফেব্রুয়ারি '৯৬ নদীয়া জেলার কল্যাণীতে নিজ বাসভবনে বেলা ১২টা ১২ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। দীর্ঘ ২৬ বছর তিনি কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ভক্তিমতী রমা দেবী দিনের অধিকাংশ সময় জপ-ধ্যান-পাঠে অতিবাহিত করতেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৬ মাধুরী দত্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ৭৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। বহরমপুর ও মোক্তাপুরে থাকাকালীন সময়ে যথাক্রমে সারগাছি ও মেদিনীপুর আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং নিয়মিতভাবে সেখানে যাতায়াত করতেন। সহজ-সরল জীবনযাত্রা ও ভক্তিপরায়ণতার জন্য তিনি মঠ-মিশনের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্নেহের পাত্রী ছিলেন। ভক্তিমতী এই মহিলা 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, ৫নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার (কলকাতা-৩)-নিবাসী সুনীলকুমার বাগচী গত ২৪ মাঘ ১৪০২ (৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬) রাত ১টা ১০ মিনিটে ৭৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে রাত ১০টা নাগাদ শ্যামবাজারে ড্রিমল্যান্ড নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে টাটা এয়ারক্রাফটে তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন। অকৃতদার সুনীলবাবু দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিভাগে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বসে স্মরণ-মনন করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আক্ষরিকভাবেই তিনি তাঁর এই নিত্যসূচী পালন করেছেন, শুধু ঐদিন বিকেলের পর বিশেষ অসুস্থবোধ করায় সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যেতে পারেননি। মৃত্যুর দুদিন আগে অদ্ভুত যোগাযোগে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে দুপুরে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামীজীর শিষ্য ভক্তরাজ মহারাজ (স্বামী সদাশিবানন্দ) প্রমুখ অনেক প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্নেহ ও সান্নিধ্য-ধন্য, 'উদ্বোধন'-এর সুদীর্ঘকালের একান্ত আগ্রহী ও বিদগ্ধ পাঠক এবং পরম শুভানুধ্যায়ী প্রয়াত সুনীলবাবুর মরদেহে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী নির্মাল্য অর্পণ করা হয়।□

সারদাদেবী-গবেষণায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ফিলজফি' ('পিএইচ. ডি.') ডিগ্রি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন যে, এবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব ফিলজফি' বা 'পিএইচ. ডি.' ডিগ্রির অন্যতম প্রাপক হবেন শ্রীমতী সুস্মিতা সেন (ঘোষ)। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে নারীভাবনার প্রকাশ : সারদাদেবী ও তাঁর পারিপার্শ্বিকের একটি নিরীক্ষা'। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ পাপিয়া চক্রবর্তীর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে শ্রীমতী সুস্মিতা সেন (ঘোষ) তাঁর গবেষণা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ, শ্রীমতী সেন (ঘোষ) ভারতীয় বিদ্যাভবনের কলকাতাস্থ সল্টলেক কেন্দ্রের শিক্ষিকা। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন আজীবন গ্রাহিকা এবং বিশেষ সক্রিয় শুভানুধ্যায়ী। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের তিনি মন্ত্রশিষ্যা। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে যে, শ্রীমতী সেনের (ঘোষ) গবেষণাপত্রটি বিশেষজ্ঞ-পরীক্ষকদের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ওপরে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম 'পিএইচ. ডি.' ডিগ্রি দিচ্ছেন।

রামকৃষ্ণ-গবেষণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ফিলজফি' ('পিএইচ. ডি.') ডিগ্রি

গত ২৭ জুলাই ১৯৯৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট নারীজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব ও ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যে সেই নারীদের দান' বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সূত্রে 'ডক্টরেট অব ফিলজফি' ('পিএইচ. ডি.') উপাধি পেলেন শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণন, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু। শ্রীনারায়ণন সমাবর্তন-ভাষণ প্রদান করেন এবং শ্রীরেড্ডী সমাবর্তন-সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রয়াত ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের গবেষণায় যেসব বিশিষ্ট নারীদের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব আলোচিত হয়েছে তাঁরা হলেন রানী রাসমণি, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, গোপালের মা, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, গৌরী-মা, লক্ষ্মী-দিদি এবং ভগিনী নিবেদিতা।

শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মী ছিলেন। অবসরগ্রহণের পর কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতাল ও বি. কে. রায় রিসার্চ সেন্টারের সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত আছেন। প্রসঙ্গতঃ, শ্রীমতী ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত সহ-সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। শ্রীমতী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁর এই গবেষণার পিছনে পূজ্যপাদ মহারাজজীর প্রেরণা ছিল সর্বাধিক।

মালদহে মিলেছে নবম শতকের বৌদ্ধবিহারের সন্ধান

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার হবিবপুর থানার জগজীবনপুর গ্রামের বাসিন্দা জগদীশ পাইন গত ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ তাঁর বাড়ি তৈরির জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি তাম্রপত্র পান। তারই সূত্র ধরে রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে। দীর্ঘকাল খননের পর সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে নিদর্শনগুলি নবম শতকের এবং সেগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ সময়ে সেখানে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। বস্তুতঃ, স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই প্রথম এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেল। কারণ, এর আগে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানকার কোন শিলমোহরে বিহারের প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখা ছিল না। কিন্তু জগজ্জীবনপুরে পাওয়া শিলমোহরগুলিতে দেবনাগরিতে লেখা রয়েছে—'শ্রীবজ্রদেব কারিত নন্দদিঘি বিহারীয় আর্য ভিক্ষু সংঘ'। অর্থাৎ ঐ বৌদ্ধবিহারটির নাম ছিল—'নন্দদিঘি বিহার'। পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের অনুমান, জগজ্জীবনপুরের কাছেই 'নন্দগড়ের বিল' নামে যে-জলাশয় রয়েছে, সেটি সেই কালেও ছিল এবং তার নাম অনুসারেই বিহারটির নামকরণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিহারের নির্মাণকর্তা 'শ্রীবজ্রদেব'-এর নামও শিলমোহরগুলিতে পাওয়া গিয়েছে। শিলমোহর ছাড়া পাওয়া গিয়েছে 'মহাবিহারে'র খোলা বারান্দা, ইঁট-বাঁধানো রাস্তা, ভিক্ষুদের থাকার দুটি ঘর, কুলুঙ্গি, লম্বা বারান্দা এবং টেরাকোটা, পাথর ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত ৪০টিরও বেশি মূর্তি। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের অনুমান, বিহারটি রীতিমত বড় আকারের ছিল।□

ধূমপান 'অভ্যাস' না 'নেশা'

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে কোকেন নেওয়ার সাদৃশ্য কোথায়? খুব বেশি নয়—অন্ততঃ অধিকাংশ মানুষ এইরকম বলতে চায়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বব ডোল এই অভিমতের এবং সিগারেট-ব্যবসায়ীদের সুরে সুর মিলিয়ে সারা আমেরিকার যেখানেই প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনী বক্তৃতা করতে যাচ্ছেন সেখানেই বলছেন যে, সিগারেট খাওয়া 'অভ্যাস' এনে দেয় সত্য, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ধূমপানকারীদের 'নেশাখোর' করে দেয়। অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা অন্যরকম বলছেন। গত সপ্তাহে 'নেচার' পত্রিকায় ইটালীর একদল গবেষক অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, নিকোটিনের নেশাকে ড্রাগের পর্যায়ে ফেলা উচিত।

বড় ইঁদুরের (rat) রক্তশিরায় একটা সিগারেটে যতটা নিকোটিন থাকে ততটা ইঞ্জেকশন দেন তাঁরা। ক্যাগলিয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুশিরাবিজ্ঞানী গিটানো ডি. চিয়ারা-র অধীনে একদল গবেষক মস্তিষ্কের একটি অংশে (nucleus accumbens) কি জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন (biochemical changes) হয় তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। কারণ, এই অংশই নেশার প্রবণতাকে পরিচালনা করে বলে মনে হয়। তাঁরা এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করলেন; মস্তিষ্কের ঐ অঞ্চলে শক্তিশালী রাসায়নিক বস্তু 'ডোপামিন'-এর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। আবার এই অংশই মস্তিষ্কের সবচেয়ে আবেগবহুল অঞ্চল অ্যামিগডালার (amygdala) সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত। ব্যাপারটি এত তাৎপর্যপূর্ণ কেন? এর আগেই ডি. চিয়ারা-র দল প্রমাণ করেছিলেন যে, কোকেন, অ্যামফিটামাইন এবং মরফিন ইঞ্জেকশনের পরে ঠিক এইরকমই ঘটনা ঘটে। অন্যভাবে বলতে গেলে, নেশার ড্রাগ এবং ধূমপানকারীরা যাকে বদভ্যাসের বস্তু বলে মনে করে—মস্তিষ্ক কিন্তু তাদের মধ্যে কোন তফাৎ করে না।

[Time International, 29 July 1996, p. 47]

ঔষধ আবিষ্কারের জন্য কেরালার উপজাতিকে রাজ্য-অনুদান

পরিশ্রমজনিত চাপ (stress) নিরসনে একরকম ঔষধির অংশবিশেষ ব্যবহার করার জন্য কেরালার একটি উপজাতিকে বুদ্ধিগত সম্পত্তির অধিকারস্বত্ব (intellectual property rights) দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারস্বত্ব-দানে সরকার মনে করেন যে, দেশী ও বিদেশী ঔষধপ্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির পক্ষে জ্ঞান অপহরণ করা ('piracy of tribal knowledge') বন্ধ হবে।

উপরি উক্ত ঔষধি থেকে তৈরি হয়েছে 'জীবনী' নামক ওষুধ, যা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মশক্তি বেড়ে যায়। গাছটির নাম 'ট্রাইকোপাস জেনিকাস' ('Trichopus Zeynicus')। কেরালার তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত সরকারি সংস্থা 'ট্রপিক্যাল গার্ডেন ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (TBGRI) ওষুধটি তৈরি করেছে। মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এই সংস্থা আয়ুর্বেদীয় ওষুধপ্রস্তুতকারক সংস্থা 'আর্য বৈদ্য ফার্মেসি' নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে ৫০,০০০ ডলারের বিনিময়ে ওষুধ প্রস্তুতপ্রণালী (manufacturing know-how) জানিয়ে দিয়েছে। কেরালার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত আগাস্থিয়ার পাহাড়ে বসবাসকারী কানি উপজাতির লোকেরা ঐ অর্থের অর্ধেক পাবে। এছাড়া তারা ওষুধ বিক্রির ২ শতাংশ রাজ্য অনুদান (royalty) হিসাবে পেতে থাকবে। এই উপজাতির ২৫০০ পরিবার চাষ করে এই গাছ দেবে তিরুবনন্তপুরমের উপরি উক্ত সংস্থা (TBGRI)-কে এবং তার মূল্যও ঠিক করা হয়ে গেছে। এই সংস্থার ডাইরেক্টর বলেছেন: "কানি উপজাতির লোকেরা না জানালে সারা পৃথিবী এই গাছের কথা জানতে পারত না।" বৈজ্ঞানিকরা আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, উপজাতি-লোকেরা খুব পরিশ্রমের কাজ আরম্ভ করার আগে ঐ গাছের কাঁচা বীজ খেয়ে নিত। তারপর তাঁরা সাত বছর ধরে এর গবেষণায় কাজ করেছেন। তাঁদের মতে, এই গাছে এমন কোন জিনিস আছে যা দেহের অনাক্রম্যতা-শক্তি (immune system) বাড়িয়ে দেয়। তাঁরা আরও বলেন: "আমাদের 'জীবনী' ওষুধ চীনাদের জিনসেং (ginseng)-এর চেয়ে ভাল, কারণ এতে স্টেরয়েড নেই।" ওষুধটি বাজারে ছাড়বার আগে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এটি অনেকবার পরীক্ষিত হয়েছে। যে-ওষুধসংস্থা জিনসেং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এটি আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়বে, তার ধারণা যে এটি "প্রচুর অর্থ আনবে"।

[Science Information Notes, Indian National Science Academy, July 1996, p. 12 (Source: Nature, Vol. 381, 16 May 1996)]☐

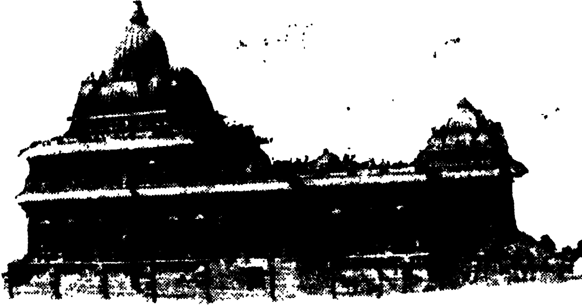


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। ... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। ...এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
সর্বজনীন উপাসনালয়





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

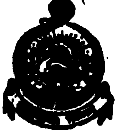
মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯





● একটি আবেদন ●

● ভোজনগৃহ ও সাধুনিবাস নির্মাণ ●

পবিত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্র পুরীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র। এই কেন্দ্র আদিবাসী ও হরিজন দুঃস্থ ছাত্রদের একটি ছাত্রাবাস, প্রতিদিন প্রায় দুই শতাধিক পাঠকের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, উড়িষ্যার পুরী, খুরদা-নয়াগড় জেলার দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমাণ গাড়ি-সহ চিকিৎসার সুবিধা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষাদানকেন্দ্র ও মধ্যাহ্নকালীন খাদ্যদানের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে জনকল্যাণমূলক কার্য করে আসছে। প্রতিটি কার্যক্রমই বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানের ওপর নির্ভরশীল।

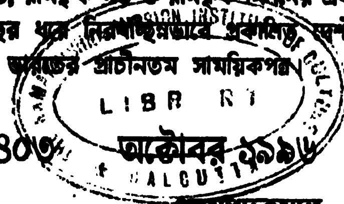
এই আশ্রম পুরীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-অভিলাষী আগত সন্ন্যাসী, অভ্যাগত ও আশ্রম-অন্তেবাসীদের জন্য একটি ভোজনগৃহ ও সাধুনিবাস তৈরি করতে চলেছে। ভোজনগৃহটি আশ্রম-অন্তেবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য এবং দোতলায় সাধুনিবাসটি আগত সন্ন্যাসীদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই কাজে আশ্রমের প্রায় ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

আমরা এই কার্যে সাহায্যের জন্য সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে যেকোন দান চেক বা ড্রাফট-এ **SECRETARY, RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, PURI** এই ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি। সমস্তপ্রকার আর্থিক দান ভারত সরকারের আয়কর নিয়মের ৮০ (জি) আয়কর ১৯৬১ ধারানুযায়ী আয়কর ছাড়ের অধীন।

২৫ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্বে যেকোন দানের জন্য দাতার নাম ফলকে উৎকীর্ণ থাকবে।

স্বামী দীনেশানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
পুরী-৭৫২০০১, উড়িষ্যা

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত, দেশীয় ভাষায়
ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ কার্তিক ১৪০৩ অক্টোবর ১৯৯৬ ১০ম সংখ্যা



ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬০ টাকা ; সডাক—৭০ টাকা□
আলাদাভাবে কিনলে—বর্তমান সংখ্যার মূল্য□৮ টাকা□আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ)□
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৯তম বর্ষ : মাঘ ১৪০৩—পৌষ ১৪০৪/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৭

☐ মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে আগামী বর্ষের (৯৯তম বর্ষ : ১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর মধ্যে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। টাকা দেরিতে জমা পড়লে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ : ৬০ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ : ৭০ টাকা

☐ বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩২৫ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬৫০ টাকা (বিমানডাক) ☐ বাংলাদেশ—১৩০ টাকা

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) : ৩০০০ টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে : বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ঐবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান না বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। একমাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ডাকে দেওয়ার অন্ততপক্ষে একমাস আগে পিন কোড-সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে।

☐ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেই তবে ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

☐ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।

☐ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

কার্তিক ১৪০৩ · অক্টোবর ১৯৯৬

দিব্য বাণী

মথুরা কাশী দ্বারিকা হরিদ্বার জগনাথ।
সাধুসঙ্গতি হরিভজন বিন কছু না আবে হাত॥

মথুরা, কাশী, দ্বারকা, হরিদ্বার, জগন্নাথ—যত তীর্থেই ভ্রমণ কর না কেন, সাধুসঙ্গ এবং হরিভজন ভিন্ন অধ্যাত্মজীবনে কোন কিছু প্রাপ্তিই ঘটবে না।

কবীর সঙ্গতি সাধু কী নিষ্ফল কভী ন হোই।
হোসী চন্দন বাসনা, নীম ন কহসী কোই॥

কবীর বলছেন, সাধুসঙ্গ কখনো নিষ্ফল হয় না। চন্দনগাছের পাশে যদি নিমগাছও থাকে সেই গাছে চন্দনেরই গন্ধ এসে যায়। তখন তাকে আর কেউ নিমগাছ বলে না। [সৎসঙ্গের এমনই গুণ।]

কবীর

আমি একবার মিউজিয়ামে গেছলুম; তা দেখালে ইঁট পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কী! তেমনি সাধুসঙ্গ করলে তা-ই হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সৎসঙ্গ : এক

সন্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন :

"তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিয় তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ ॥"

—বৎস, তুলাদণ্ডের একদিকে স্বর্গ এবং অপবর্গ বা মুক্তির আনন্দকে রাখ, আর অন্যদিকে রাখ সৎসঙ্গের আনন্দকে। দেখিবে মুহূর্তের সৎসঙ্গের যে-সুখ, স্বর্গ বা মুক্তির সুখকে একযোগ করিলেও তাহার সঙ্গে কোন তুলনা হয় না।

সংসারী মানুষের কাছে সৎসঙ্গের মূল্য এতটাই। আমাদের শাস্ত্রে, আমাদের সন্তসাধকদের বাণীতে সৎসঙ্গের সমুচ্চ মহিমার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, শুধু যে ধর্মজীবনের জন্যই সৎসঙ্গের প্রয়োজন তাহা নহে, লৌকিক জীবনকেও সার্থক করিবার জন্য সৎসঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনেকের ধারণা যে, সাংসারিক বিষয়ের সঙ্গে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম-জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। দুইটি জীবন যেন দুই বিপরীত মেরু। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র এবং সন্ত-সাধকগণ শিখাইয়াছেন, উভয়ের মধ্যে সত্যকারের কোন ভেদরেখা নাই। লৌকিক জীবনকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই ধর্মজীবনের প্রয়োজন, আবার ধর্মজীবনকে পরিণত করিবার জন্য লৌকিক জীবনে উহার ভিত্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্র ও আচার্যদের বচনে বিষয়টি উল্লিখিত হইলেও উভয় জীবনের মধ্যে এই সম্পর্কভূমিকে সুস্পষ্টভাবে মানুষের সম্মুখে উন্মোচনের প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের। সেই উন্মোচনের ফলসিদ্ধিকে প্রচার এবং কর্ম ও জীবনে উহাকে রূপায়ণের কৃতিত্ব তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এবং সহধর্মিণী সারদাদেবীর।

'সৎসঙ্গ' মানে সতের সঙ্গ। অর্থাৎ মহাজীবনের সান্নিধ্য। সহজ কথায়—সাধুসঙ্গ। আচার্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন :

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্‌দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥"

—জগতে তিনটি বস্তু দুর্লভ এবং দেবতার অনুগ্রহেই উহা লাভ করা যায়—মনুষ্যজন্ম, মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং মহাপুরুষের সান্নিধ্য।

মনুষ্যজন্ম বহুভাগ্যে লাভ হয়। কারণ, হিন্দুমতে চুরাশি লক্ষ জন্মের পর জীব মনুষ্যজীবনলাভের অধিকারী হয়। এই 'চুরাশি লক্ষ' জন্মের মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখি, সরীসৃপ প্রভৃতি রূপে জন্মের প্রবাহ বাহিয়া অবশেষে মনুষ্যজন্ম। সুতরাং মানবজন্ম যে বহু বিবর্তনের পরিণতি তাহা চার্লস ডারউইন বলিবার বহু সহস্র বছর পূর্বেই ভারতের 'আর্য' ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহাভাগ্যের মানবজন্ম লাভ করিয়াও যদি মুক্তির পিপাসা অন্তরে জাগ্রত না হয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও বুভুক্ষা জাগ্রত না হয় তাহা হইলে সেই মানবজন্মের সার্থকতা কোথায়? আধ্যাত্মিক চেতনাহীন মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য কোথায়? 'হিতোপদেশ' বলিতেছে :

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সমানমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

—আহার, নিদ্রা, ভয় ও জৈবিক বৃত্তি পশু এবং মানুষের সাধারণ লক্ষণ। একমাত্র ধর্মই (পাঠান্তরে 'জ্ঞান'ই) পশুর তুলনায় মানুষের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। ধর্মহীন (পাঠান্তরে 'জ্ঞানহীন') মানুষ তো পশুর সমান—পশুরই নামান্তর।

ভাগ্যক্রমে মনুষ্যজন্ম লাভ হইল, আবার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও জাগ্রত হইল, কিন্তু তখনও সেই ব্যক্তি জীবনের সার্থকতাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। সেই সামর্থ্যের জন্য প্রয়োজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য। মহাজীবনের সান্নিধ্যে মানুষের জাগ্রত

'শুভ বিজয়া'র প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি। এই উপলক্ষে 'উদ্বোধন'-এর সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আধ্যাত্মিক চেতনা পরিপুষ্টি লাভ করে এবং অনিবার্যভাবে জীবনের চরিতার্থতা ঈশ্বরদর্শন বা মুক্তিলাভের দিকে অগ্রসর হয়। বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র-পুরাণ, গীতা-চণ্ডী—সর্বত্র তাই মহাজীবন-সান্নিধ্যের উপর অপরিসীম গুরুত্বদান করা হইয়াছে। আমাদের আচার্য এবং সন্ত-সাধকেরাও বারংবার তাহা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : যেমন অচেনা জায়গায় যাইতে হইলে যে জানে এমন একজনের কথামত চলিতে হয়, সেইরকম ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইলে সাধুর কথামত চলিতে হয়। ধর্মজীবন যাপন করিবার জন্য, ঈশ্বর-দর্শন করিবার জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত দরকার।

আমাদের মনে হইতে পারে যে, ধর্মজীবন যাপন করিবার জন্য, ঈশ্বরদর্শনের সাধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য তো আমরা গ্রন্থ হইতেই পাইতে পারি, শাস্ত্র হইতেই পাইতে পারি। কথাটি কিছুটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণতঃ নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন : বই কী করিবে? শাস্ত্র কী করিবে? শাস্ত্র, বই—এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাইবার পথ বলিয়া দেয় মাত্র। বই-শাস্ত্র পড়িলে বুদ্ধি শাণিত হইতে পারে, বিচারশক্তি প্রখর হইতে পারে, কিন্তু ধারণা হয় না। ধারণা বুদ্ধির শক্তিতে হয় না, বিচারের কুশলতায় হয় না। ধারণা হয় জীবন দেখিলে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন : বই কত পড়িবে? শাস্ত্র কত পড়িবে? বইতে, শাস্ত্রে তো কত কথাই লেখা থাকে, তাহাতে কী হয়? পাঁজিতে লিখিয়াছে—এবছর বিশ আড়া জল হইবে, কিন্তু পাঁজি নিংড়াইলে কি জল পড়ে? একফোঁটাও পড়ে না। একফোঁটাই পড়! কিন্তু একফোঁটাও পড়ে না। 'জল'-এর জন্য অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্যাসকে ধারণা করিবার জন্য সাধুর কাছে যাইতে হয়। সাধুসঙ্গ করিতে হয়। বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরকে বুঝা যায় না। সাধুর কথায় আমাদের পরম তত্ত্বের জ্ঞান বা হুঁশ হয়। সাধুসঙ্গ হইলে তবে ঈশ্বরতত্ত্বের ধারণা হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। শুধু যে সংসারীর জন্যই সাধুসঙ্গ তাহা নহে, সন্ন্যাসীর জন্যও। সাধুসঙ্গ সকলের দরকার।—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্য 'কথামৃতে'র মধ্যে বারবার আমরা পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনরূপ চরিতার্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে। ঈশ্বরদর্শনেই মানব-জীবনের পূর্ণতা। বুদ্ধির দ্বারা এই সত্যটি স্বীকার করিয়া অনুভূতির দ্বারা ইহাকে বিকাশ করিতে হয়। বুদ্ধির বিকাশের জন্য গ্রন্থ বা শাস্ত্র সহায়ক, কিন্তু চেতনার জাগরণ ও পুষ্টির জন্য অপরিহার্য সাধুসঙ্গ বা দিশারী ব্যক্তির সান্নিধ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্যকে অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন : "আত্মার মধ্যে যে শক্তির স্ফুরণের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মা হইতে শক্তি-সঞ্চার দ্বারাই তাহা জাগ্রত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ বাহিরের সহায়তা একান্তই প্রয়োজন। বাহির হইতে প্রেরণা-শক্তি আসিয়া যখন আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরে কার্য করিতে থাকে, তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়—মানুষের ধর্মজীবন আরম্ভ হয়, উহার চরমে মানুষ পরম শুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।" ('বাণী ও রচনা', ৪র্থ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১১৫)

'বহিরাগত' এই শক্তির নাম 'সাধুসঙ্গ' বা 'সৎসঙ্গ'। গ্রন্থ বা শাস্ত্রও বহিরাগত শক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শক্তি 'অচেতন' শক্তি, সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গ হইল 'চেতন' শক্তি। গ্রন্থ বা শাস্ত্রের তুলনায় সৎসঙ্গের উৎকর্ষ কোথায় এবং কিভাবে তাহা সুন্দর-ভাবে বুঝাইয়াছেন স্বামীজী : "বাহির হইতে যে-শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কিছু হইতে নয়। আমরা সারাজীবন বই পড়িতে পারি, খুব বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিব—আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধি খুব উন্নত ও বিকশিত হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই; বরং আমরা প্রায় প্রত্যহই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছে।"(ঐ) এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বহু-পরিচিত উক্তিটি আমাদের মনে পড়িতেছে : "পণ্ডিত খুব লম্বা লম্বা কথা বলে, কিন্তু নজর কোথায়? কাম আর কাঞ্চনে, দেহের সুখ আর টাকায়। শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। কেবল খুঁজছে, কোথায় মরা জানোয়ার, কোথায় ভাগাড়, কোথায় মড়া!" ('কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ৮৯২)

আবার স্বামীজীর কথায় ফিরিয়া যাই : "বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখনও কখনও ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব—উহাতে আমাদের বুদ্ধিই কিছুটা সাহায্য পাইয়াছে মাত্র, আত্মার কিছুই হয় নাই। এইজন্যই আমরা প্রায় সকলেই ধর্ম সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারি, অথচ ধর্মানুযায়ী জীবনযাপনের সময় অনুভব করি—আমাদের শোচনীয় অক্ষমতা। ইহার কারণ—আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার জন্য বাহির হইতে যে-শক্তি প্রয়োজন, পুস্তক হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতেই শক্তি সঞ্চারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।" ('বাণী ও রচনা', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৬)

যে-আলোকিত আত্মা হইতে অনালোকিত আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে বলে 'সাধু'।

সংসারের অজস্র বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ। এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় পৃথিবীকে সে বড় ভালবাসে। বড় তীব্রভাবে ভালবাসে। যখন আঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যাধি, প্রিয়জনের মৃত্যু, আশাভঙ্গের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়, তখন সে ভাঙিয়া পড়ে। পুনরায় নূতন আশায় সে বুক বাঁধে, আবার আশাভঙ্গের পীড়ন তাহাকে সহ্য করিতে হয়। তবু সেই উটের কাঁটাঘাস খাওয়ার মতো এই সংসারের পঙ্কে সে মুখ ডুবাইয়া পড়িয়া থাকে। কাঁটাঘাস চিবাইতে চিবাইতে উটের মুখ কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়, মুখ দিয়া রক্ত ঝরে, তবু উট কাঁটাঘাস চিবাইয়া চলে। সংসারে বদ্ধ মানুষও নেশাচ্ছন্ন ব্যক্তির মতো সংসারের মায়ায় নিজেকে ঐভাবে সমর্পণ করিয়া দেয়। সাধু মানুষকে এই নেশা সম্পর্কে, এই মোহগ্রস্ততা সম্পর্কে সচেতন করেন, তাহার বিবেককে জাগ্রত করেন, তাহাকে মগ্নচৈতন্য হইতে উদ্ধার করেন, তাহাকে প্রকৃতস্থ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: সাধুসঙ্গ যেন চাল- ধোয়ানি জল। মানুষ যখন মাতাল হয় তখন তাহাকে চাল-ধোয়ানি জল খাওয়াইলে ধীরে ধীরে তাহার নেশার ঘোর কাটে। তেমনি সাধুর কথায়, সাধুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে সংসারাসক্ত মানুষের সংসার-ঘোর কাটে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব উপমাটি অবশ্য 'কথামৃতে' নাই। ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যধন্য সুরেশচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' (সংখ্যা ১৮৬) গ্রন্থে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ'-এ 'সাধনের সহায়' প্রসঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন: "সাধুসঙ্গ কেমন জান?—যেমন চাল-ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে তাকে যদি চালের জল খাওয়ানো যায় তাহলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসার-মদে যারা মত্ত হয়েছে, তাদের নেশা কাটাবার একমাত্র উপায়—সাধুসঙ্গ।" সৎসঙ্গে থাকিতে থাকিতে, সাধুর কথা শুনিতে শুনিতে অনিত্য সংসার সম্পর্কে মোহ, বিষয়-বাসনা একটু একটু করিয়া কমে এবং অবশেষে একেবারে দূর হইয়া যায়। প্রকৃত সাধু তাঁহার অগ্নিময় বাণীতে, তাঁহার ঈশ্বরময় জীবনে প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে এই জগতের এবং এই জাগতিক সুখভোগের অনিত্যতাকে জ্বলন্তভাবে উন্মোচন করিয়া দেন।

আমরা জানি, ইতিহাসের সেই চিরস্মরণীয় অমর কাহিনীর সংবাদ। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, শাক্য সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সিদ্ধার্থ, পরমা রূপবতী যুবতী পত্নী যশোধরার প্রেমময় স্বামী সিদ্ধার্থ, নবজাত সুদর্শন পুত্র রাহুলের গর্বিত পিতা সিদ্ধার্থ। এক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর দর্শন তাঁহার চেতনার ভিত্তি ধরিয়া যেন নাড়া দিয়া গেল। ক্রমে সিদ্ধার্থের রূপান্তর ঘটিল বুদ্ধে। সাধুজনের দিব্য প্রেরণায় ছুতার মিস্ত্রী যীশু রূপান্তরিত হইলেন খ্রীস্টে। সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর অগ্নিময় সান্নিধ্য অহঙ্কারী নিমাই পণ্ডিতের উত্তরণ ঘটাইল শ্রীচৈতন্যে। নিঃসম্বল মহাত্মা রামকৃষ্ণের অপ্রতিরোধ্য সঙ্গ সংশয়ী নরেন্দ্রনাথকে রূপান্তরিত করিল বিবেকানন্দে। দস্যু অঙ্গুলিমাল, পাষণ্ড জগাই-মাধাই, মদ্যপ গিরিশচন্দ্রের পরিবর্তনের কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। বারাঙ্গনা আম্রপালী, নটী বাসবদত্তা, ভ্রষ্টা মেরি ম্যাগডালিন, পতিতা লক্ষহীরা, অভিনেত্রী বিনোদিনীর বিবর্তনের ইতিবৃত্ত আমাদের সকলের জানা। তাঁহাদের সকলের জীবনে সাধুসঙ্গের অমোঘ প্রভাব কিভাবে রূপলাভ করিয়াছিল তাহা এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছে। যে-বাইজীর গান শুনিবেন না বলিয়া যুবক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ খেতড়িরাজের বিনোদন-সভা হইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন, সেই বাইজীর মর্মস্পর্শী আর্তিতে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং বাইজীর গানও শুনিয়াছিলেন, সেকথা আমরা জানি। কিন্তু আমরা কয়জন জানি সেই বাইজীর ঠিক পরের দিনের কথা? বাইজী ময়নাবাইকে আর কখনও কোন গানের আসরে দেখিতে পায় নাই কেহই। স্বামীজীর ক্ষণেক সান্নিধ্যে ময়নাবাইয়ের অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই অগ্নিশুদ্ধির ফলে বাইজী ময়নাবাইয়ের রূপান্তর হইয়াছিল তাপসী ময়নাবাইয়ে যেমন হইয়াছিল অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাধিকা বিনোদিনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে। মদ্যপ ও বারবনিতাসক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়াও মদ ও বারবনিতায় আকর্ষণ রোধ করিতে পারেন নাই। এজন্য কেহ কেহ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনুযোগও করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন: "ওকে কি ঢোঁড়া সাপে ধরেছে! এ যে জাতসাপের ছোবল!" পরবর্তী জীবনে গিরিশচন্দ্রের যে অতুলনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহা তো সকলেরই জানা।

সাধুসঙ্গ মানে তাহাই। সাধুসঙ্গের অনিবার্য ফল চেতনার অগ্নিশুদ্ধি। চেতনার মধ্যে যেখানে মগ্নচেতনার স্তূপ সেখানে অগ্নিসঞ্চার। সেই অগ্নিসঞ্চার তুলা অথবা খড়ের স্তূপে নহে—তুষের স্তূপে। ধিকিধিকি করিয়া অনিবার জ্বলিতে জ্বলিতে ক্রমে ব্যক্তির সর্বাঙ্গে, সর্বান্তঃকরণে উহা প্রসারিত হইয়া যায় এবং তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্নিশুদ্ধ করে। মাটির মানুষ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়। সাধু-সন্তের দল তাই পৃথিবীর লবণ—"salt of the earth"। তাঁহারা পৃথিবীর সম্পদ। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করিবার জন্য, জীবনকে উপভোগ্য করিবার জন্য তাঁহাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমাদের জীবনে তাঁহারা তীর্থদেবতা, সচল তীর্থবিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য বারবার বলিতেন: "সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার।" ('কথামৃত', পৃঃ ১০৪৩)□

ভাষণ

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

অবতাররা যখন আসেন তখন তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদ্দের নিয়ে অবতীর্ণ হন। একই শক্তি যেন নিজেকে বহুধা বিভক্ত করে জগতের সমক্ষে আদর্শ স্থাপন করার জন্য বহুরূপে আসেন। তিনি এক, কিন্তু তাঁর প্রকাশ বিবিধ বিভূতিরূপে। 'চণ্ডী'তে দেবী বলেছেন ঃ "একৈবাহম্ জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" (১০।৫)—জগতে এক আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন তিনিও একা। একা হলেও তিনি নিজেকে বহুধা বিভক্ত করেন যাতে সকলে তাঁর ভাব ধারণা করতে পারে। একই সূর্য বহুধা বিভক্ত হয়ে সহস্র সহস্র কিরণরূপে চারিদিকে আলো বিকিরণ করে। স্বামীজী বলেছেন, যেই সূর্য সেই কিরণ। কিরণগুলি যেমন সূর্য থেকে পৃথক নয়, অবতারের পার্ষদ্রাও অবতার থেকে পৃথক নন।

ঠাকুরের পার্ষদ্দের অন্যতম স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ বা গঙ্গাধর মহারাজের ভিতর দিয়ে ঠাকুরের কিরণ কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছিল এটি বিশেষ করে ভাববার বিষয়। ঠাকুরের ভাব অনন্ত, অনন্তরূপে তা প্রবাহিত—যার এক-একটি ধারা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তবু আমাদের সীমিত বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে যাতে ধারণা করতে পারি সেজন্য তিনি যেমন নিজেকে সীমিত করে দেহধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন তেমনি নিজেকে আরও সীমিত করে পার্ষদ্গণের ভিতর দিয়ে আমাদের আরও কাছে তিনি এসেছিলেন। তাঁর অনন্ত বিভূতির এক-একটি অংশ এক-এক পার্ষদের ভিতরে প্রকাশিত।

আমাদের মনে হয়, স্বামী অখণ্ডানন্দের ভিতরে তাঁর যে দিব্য বিভূতি বিশেষ করে প্রকাশিত হয়েছিল তা হলো "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ভাব। এই আদর্শটি স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় যে-রূপ নিয়েছিল তাতে মনে হয়, এই ভাবটিই যেন বিশেষ করে দেখাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই পার্ষদ্রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনকথা চিন্তা করলে মনে হয়, তিনি যেন অক্লান্ত অবিরাম সেবার মূর্ত প্রতীক। আমরা এখানে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করব না, কেবল সেবার ভাবটি কিভাবে তাঁর জীবনে পরিস্ফুট হয়েছিল তা স্মরণ করব।

স্বামী অখণ্ডানন্দের শ্রীমুখ থেকে কিছু কিছু শোনার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। ঠাকুরের পার্ষদ্দের মধ্যে তিনি বিশেষ করে স্বামীজীর অনুগত ছিলেন। আমরা যাকে সাদা বাঙলায় 'ন্যাওটা' বলি, তিনি ছিলেন স্বামীজীর কাছে তাই। স্বামীজীর সেবার আদর্শ গঙ্গাধর মহারাজের ভিতরে যেমন পরিস্ফুট দেখতে পাই, এমন আর কোথাও যেন দেখা যায় না। স্বামীজীর কথা তাঁর কাছে ছিল বেদবাক্য। কোন বিচার না করে স্বামীজীর আদর্শকে তিনি জীবনে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা দেখে অবাক হতে হয়। তিনি শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু স্বামীজীর কথা তাঁর কাছে ছিল সব শাস্ত্রের ওপরে। তাঁর স্বভাব ছিল শিশুর মতো সরল। কথায় কথায় এমন হাসতেন, অল্পবয়সীরাই সেরকম করে হাসতে পারে। যাঁরা তাঁকে দর্শন করেছেন তাঁরা জানেন, কী অপূর্ব আনন্দের প্রকাশ তাঁর ভিতর দিয়ে হতো! বিশেষ করে তিনি যখন বেলুড় মঠে এসে থাকতেন তখন দেখা যেত, তিনি যেন শিশুর মতো সর্বদা আনন্দে উচ্ছল। স্বামীজীর ওপরে তো বটেই, অন্যান্য গুরুভাইদের প্রতিও ছিল তাঁর অসাধারণ শ্রদ্ধা। বয়সে বড় গুরুভাইরা তাঁকে 'গঙ্গা' বলে ডাকতেন।

গঙ্গাধর মহারাজ গোড়া থেকেই যে-সেবাব্রতকে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন তার পিছনে সম্ভবতঃ ঠাকুরেরই ইঙ্গিত তাঁর অন্তরে কাজ করেছিল। প্রথম থেকেই দেখা গিয়েছিল, কোন সেবার কাজ করতে আদিষ্ট হলে তিনি প্রাণপণে তা সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে স্বামীজীর দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর অনেকেই জানেন, স্বামীজী এই সেবার আদর্শ পেয়েছিলেন স্বয়ং ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী—"জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা" থেকে। অল্প কথার ভিতরে যে মহান আদর্শ ঠাকুর ব্যক্ত করেছিলেন স্বামীজী তাকে গ্রহণ করেছিলেন এক দিব্য প্রেরণারূপে। তিনি তখনই বলেছিলেন যে, যদি ভগবান দিন দেন তাহলে এই মহান আদর্শ আমি সারা জগতে প্রচার করব। বলা বাহুল্য, তখনো স্বামীজী ভবিষ্যৎ

কর্মসূচী কিছু নির্ধারিত হয়নি, তবু দৈবাধীন হয়ে সেই সেবার ভাব স্বামীজী তাঁর সমস্ত গুরুভাই তথা তাঁর ভক্তমণ্ডলী ও সমগ্র জগতের সমক্ষে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তা এখন ইতিহাসের বিষয়।

স্বামীজীর সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত গঙ্গাধর মহারাজ সারগাছিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "এখানে ঠাকুরের কোন মন্দির হবে না। প্রত্যেক নরনারীর ভিতর তিনি রয়েছেন—ঠাকুর বা স্বামীজীর এই আদর্শ এখানে স্থাপিত হবে।" তাঁর সেই আদেশ স্মরণ করে আজ পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐ আশ্রমে কোন মন্দির নির্মাণ হয়নি। ঠাকুরের পূজা-সেবা আছে অতি সাধারণভাবে, একটি অল্পপরিসর ঘরে। সেখানে কোন আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য নেই। তিনি যা বলে গিয়েছেন সেইভাবে এখনো চলছে। বস্তুতঃ, শ্রদ্ধাই হলো পূজার মূল উপকরণ এবং তার পরিমাপ বস্তুর প্রাচুর্যে নয়—অন্তরের আকুতিতে। তিনি বলেছেন ঃ "সর্বভূতে ভগবানের সেবার জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত এবং সেভাবেই এই আশ্রম পরিচালিত হবে।" আশ্রম-পরিচালকের আসন নেওয়ার মতো মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাঁর কাছে সেবাই ছিল মুখ্য। কোন প্রচার তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা সেবার কাজ হচ্ছে —একথা প্রকাশ করতেও তিনি যেন কুণ্ঠিত হতেন। স্বামীজীর জীবৎকালেই লোকসেবক হিসাবে ঠাকুরের সন্তানদের ভিতরে গঙ্গাধর মহারাজ প্রথম নিজেকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সেবার কাজ বিশেষ কোন পরিকল্পনা অনুসারে যে হতো, তা নয়। কোথাও গিয়ে যদি দেখতেন লোকে দুঃস্থ, সাহায্যের দরকার, কিন্তু সেবা বা সাহায্য করবার কেউ নেই সেখানে তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি, তিনি যখন বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এক বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। সেই গৃহস্থের গুরু সেই বাড়িতে এসেছেন। তাঁর কলেরা হলো। গুরু হলে কি হয়! শিষ্য গৃহস্থ, গুরুসেবার চেয়ে সে নিজেকে বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী। সুতরাং গুরু বাইরের ঘরে রইলেন, ভিতরে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গঙ্গাধর মহারাজ তাঁর সেবা করলেন, যেটুকু যা জানা আছে সেইমত ব্যবস্থা করলেন। তারপর গুরুর দেহত্যাগ হলে তাঁর সৎকারাদির ব্যবস্থাও করলেন। কোন এক বাড়িতে দাসীর কলেরা হয়েছে, বাড়ির লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। মহারাজ সমস্ত রাত জেগে তার সেবা করলেন। তার মৃত্যু হলে লোকজন ডেকে নিয়ে তার সৎকারও করলেন। এইভাবে কোন পরিকল্পনা করে নয়—জীবনের ব্রতরূপে যেক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন তিনি তৎক্ষণাৎ সেইভাবে এগিয়ে এসেছেন।

দেশভ্রমণে তাঁর আগ্রহ ছিল। একবার রাজস্থানে ঘোরার সময় স্বামীজীর ভক্ত খেতড়ির রাজার বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। দেখলেন, সেখানকার পরিচারকরা বংশানুক্রমে রাজার দাসত্ব করে। তাদের লেখাপড়া শেখাবার কোন ব্যবস্থা নেই। রাজাকে বললেন ঃ "এদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করুন।" রাজা বললেন ঃ "এরা লেখাপড়া করে না।" গঙ্গাধর মহারাজ বললেন ঃ "আপনি রাজা, আপনার কর্তব্য এদের পালন করা। সুতরাং এদের জন্য স্কুল করতে হবে।" রাজা বললেন ঃ "তাই হোক।" স্কুল করা হলো, কিন্তু দেওয়ান প্রভৃতি আমলারা বললেন ঃ "রাজবাড়ির কাজকর্ম চলবে কি করে?" রাজা বললেন ঃ "তোমরা যেভাবে পার কর। মহারাজ বলেছেন, অতএব স্কুল করতেই হবে।" স্কুল হলো। তিনি ঐ কর্মীদের বুঝিয়ে স্কুলে আনানো ও পড়ানোর কাজ নিলেন এবং তাদের বইপত্র সংগ্রহ করা ইত্যাদি সব কাজে এগিয়ে এলেন। এইভাবে খেতড়িরাজ্যে দীর্ঘকাল প্রচলিত এক কুপ্রথাকে তিনি দূর করলেন।

আরেকটি ঘটনা। রাজার দরবারে গরিব প্রজারা এলে তারা রাজার কাছে পৌঁছাতে পারে না। একটা ব্যবধান নির্দিষ্ট আছে, সেখান থেকে তারা রাজাকে দর্শন করে নজরানা দেয়। এই ব্যবস্থা দেখে গঙ্গাধর মহারাজের মনে বড় কষ্ট হলো। তিনি বললেন ঃ "আমি এখানে অন্নস্পর্শ করব না।" সকলে তাঁকে অনুরোধ করলেন খেতে, কিন্তু কারো কথাতেই তিনি টললেন না। সব শুনে রাজা বললেন ঃ "আমার কি ত্রুটি হয়েছে বলুন।" মহারাজ বললেন ঃ "প্রজারা আপনার সন্তানের মতো। এত আগ্রহ করে তারা আপনার কাছে আসে, অথচ আমলাদের ভয়ে আপনার সামনে তারা আসতে পারে না। এদের অবাধে আপনার কাছে আসতে দিন।" শুনে রাজা প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ করে সমস্ত প্রজাকে দরবারে প্রবেশাধিকার দিলেন।

গঙ্গাধর মহারাজ গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। যেমন রাজা-রাজড়ার বাড়িতে তিনি অতিথি হতেন, তেমনি যারা অতি দরিদ্র, সমাজে অত্যন্ত অবজ্ঞাত—তাদের বাড়িতেও তিনি অতিথি হতেন। তাদের ওপরেই তাঁর দরদ ছিল বেশি। রাজস্থানে একবার ব্যাপক অন্নাভাব দেখা দিয়েছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে সেবাকার্য আরম্ভ

করেছিলেন। এইভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের সূচনা হয় তাঁর মাধ্যমে। এই সেবাব্রতের জন্য স্বামীজী তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন।

গুরুভাইদের সেবা থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণের সেবা—সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন অগ্রণী। ঘুরতে ঘুরতে সারগাছির কাছে তিনি গিয়েছেন, সেখানে তখন কলেরা মহামারী, তার সঙ্গে অন্নাভাব। অথচ কোন সামর্থ্য নেই, সহায়-সম্বল নেই, তবু তিনি সেখানে সেবাকাজে লেগে গেলেন। তারপর লোকপরম্পরায় মঠে খবর গেলে সেখান থেকে সাহায্য পাঠানো হলো। এইভাবে সেবাকার্য শুরু হলো। টাকাও অপ্রত্যাশিতভাবে এসে যেতে লাগল। একজন প্রস্তাব করলেন : আমাদের সম্প্রদায়ের নামে যদি সেবাকার্য হয় আমি আপনাকে প্রচুর সাহায্য করব। গঙ্গাধর মহারাজ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ঠাকুরের কৃপায় অর্থের অভাবে তাঁর সেবাকার্য ব্যাহত হয়নি।

সেখানে কলেরায় বহু লোক মারা যাওয়ার পর অনেকগুলি অনাথ শিশুকে দেখবার কেউ ছিল না। মহারাজ সেই অনাথ শিশুগুলিকে পালন করার দায়িত্ব নিলেন। এইভাবেই সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের কোন বিচার তিনি করেননি। সেখানে উচ্চ-নিম্ন বর্ণের হিন্দু শিশুরা যেমন ছিল, তেমনি মুসলমান সম্প্রদায়ের শিশুরাও ছিল। যারা মুসলমান, গঙ্গাধর মহারাজ তাদের মুসলমানের সংস্কারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাঁর কাছে সকলেই ছিল সমান। তিনি তাদের একাধারে পিতামাতার স্থান গ্রহণ করেছিলেন। ছেলেরা তাঁকে 'বাবা' বলে ডাকত এবং তিনি তাদের প্রতি কতটা স্নেহপরায়ণ ছিলেন তা যাঁরা তাঁকে সেই পরিবেশে দেখেছিলেন তাঁরা জানতেন। তাঁর জীবৎকালে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখার সুযোগ পাইনি, তবে যখন তিনি মঠে থাকতেন তখন কখনো কখনো সেই শিশুদের কেউ মঠে নিয়ে এলে তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ কত প্রগাঢ় তা দেখতে পেতাম। সকলের প্রতি তাঁর যে কত সহানুভূতি ছিল তার ছোটখাট দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি।

আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি। একবার তিনি মঠে এসেছেন। স্বামীজীর ঘরের লাগোয়া ঘরটিতে আছেন। আমাদের আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকত। একদিন আমি গিরিশ স্মৃতিভবন[১] থেকে মঠবাড়ির দিকে যাচ্ছি। তখন স্বামীজীর ঘরের কাছাকাছি একটা বেড়া থাকত, যাতে গরু-ছাগল মঠের এলাকার ভিতরে না যেতে পারে। সেই বেড়ার মাঝে একটা ঝাঁপ থাকত, যা পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে হতো। আমি সেই ঝাঁপ তুলে পার হয়ে ভিতরে এসেছি। মহারাজ তাঁর ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, একটি পাগল অনাবশ্যক কিছু জিনিসে ভর্তি একটা পুঁটলি পিঠে নিয়ে আসছে, এসে সেই ঝাঁপটা তুলে ঠিকমত ভিতরে ঢুকতে পারছে না। তিনি দেখে আমাকে ডাকলেন। বললেন : "তোমার পিছনে পিছনে যে-পাগলটি আসছিল তার পুঁটলি নিয়ে ভিতরে ঢোকার অসুবিধা হচ্ছিল, তুমি লক্ষ্য করলে না?" আমি লজ্জিত হলাম। বললাম : "মহারাজ, আমার অন্যায় হয়েছে।" আর কিছু বললেন না। এইরকম দৈনন্দিন ছোটখাট ব্যবহারে সকলের সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা যে আমাদের কর্তব্য—এটি তিনি সর্বদা নিজের জীবনে করতেন এবং আমাদেরও স্মরণ করিয়ে দিতেন।

গুরুভাইরা ওঁকে নিয়ে মজা করতেন খুব। একবার শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) কাছে এসে মহারাজ আমাকে চাইলেন। শরৎ মহারাজ বললেন : "বেশ তো নিয়ে যাও।" তিনি খুব খুশি হলেন। কোথায় আমাকে রাখবেন, কি কাজ দেবেন—সব মনে মনে কল্পনা করছেন। শরৎ মহারাজ আমায় দেখিয়ে বললেন : "কিন্তু একটা কথা আছে, একে একটু বেদান্ত পড়াতে হবে।" তাঁর উৎসাহ কমে গেল। স্বামীজীর ঘরের পাশে গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসে বলছেন : "একজন কর্মী দেবেন তার দশ গণ্ডা condition (শর্ত)—উপনিষদ্ পড়াতে হবে বলছেন! নিজে কোথায় থাকি তার ঠিক নেই, কি করে বলি যে, 'পড়াব'!" তারপর আরেকজন ব্রহ্মচারীকে দেখিয়ে শরৎ মহারাজ বললেন : "একে নেবে?" তখন উনি দমে গিয়েছেন। বললেন : "তা দিলেই তো নিই, আপনারা তো দেন না।" শরৎ মহারাজ বললেন : "একটা কথা আছে। ও কলকাতার ছেলে, ওর রাত্রে লুচি খাওয়ার অভ্যাস।" তিনি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরে বেরিয়ে এসে বললেন :

১ বর্তমানে পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ মহারাজের আবাস।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

"আমাদের সেখানে খেতে মুড়ি জোটে না, আবার লুচি খাওয়াব! তাও একদিন-আধদিন নয়, রোজ লুচি খাওয়া চাই!" গুরুভাইদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে এরকম রহস্য চলত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে নিয়ে কিরকম রঙ্গ করেছিলেন সেকথা মনে পড়ছে। কোঠারে মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে গঙ্গাধর মহারাজ আছেন। কিন্তু সারগাছিতে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি কেবলই ব্যস্ত হচ্ছেন আর মহারাজ তাঁর জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে রাখছেন। তারপর কিছুতেই যখন শুনবেন না, তখন বললেন: "আচ্ছা, তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।" সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরের পথ ভদ্রক স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। পালকির ব্যবস্থা হচ্ছে। জমিদারবাড়িতে পালকির অভাব নেই। কথা হলো, রাত্রে খেয়ে-দেয়ে পালকিতে উঠবেন, ভোর নাগাদ ট্রেন ধরবেন। তিনি খেয়ে-দেয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে পালকিতে উঠে বসলেন। সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। একসময় ঘুম ভেঙেছে—দেখেন, বেহারারা পালকি নিয়ে চলছে। আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোরবেলা দেখেন, যেখান থেকে রওনা হয়েছিলেন, পালকি সেখানেই রাখা। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মহারাজ রহস্য করে এরকম করেছেন। তিনি মহারাজকে বললেন: "মহারাজ, এ আপনার কী ব্যবহার! আমার ফিরে যাবার কি হবে?" মহারাজ বললেন: "ভাই, থাকই না। তাড়া কিসের?" বস্তুতঃ, তিনি কোঠারে খুবই আনন্দে ছিলেন, কিন্তু সারগাছিতে সেবার কার্য ব্যাহত হচ্ছে, এইজন্য ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়েছিলেন।

গঙ্গাধর মহারাজের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কাজ বুঝতেন, কিন্তু কাজের প্রচারের (publicity) অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। আমরা যেমন আশ্রমে কি কাজ হলো, কত আয়-ব্যয় হলো তা জনসাধারণকে জানাবার জন্য রিপোর্ট প্রকাশ করি, তাঁর আশ্রমে তিনি তা করতেন না। শুধু তাই নয়, মঠ-মিশনের যুগ্ম সম্পাদক (Joint Secretary) ছিলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি তাগাদা করতেন: "আপনার হিসাবপত্র সব গুছিয়ে রাখতে হবে।" তিনি রেগে যেতেন। বলতেন: "আমি সন্ন্যাসী, আমার আবার কিসের হিসাব?" তিনি জানতেন, যারা দেয়, তারা জানে যে, সেবার কাজে ঐ অর্থ ব্যয়িত হবে। তাই তার আবার অত হিসাব কিসের? হিসাব, অফিস এইসব তিনি পছন্দ করতেন না। আর প্রচারের তো অত্যন্ত বিরোধী ছিলেনই। স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগ হলে মঠে স্থির হলো যে, স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হবে। সকলে তাঁর কাছে গিয়ে এই প্রস্তাব নিবেদন করলে তিনি বললেন: "আমি যাব না, অন্য কাউকে করে ফেল।" অনেক করে বোঝাতে গেলে বললেন: "সারগাছি আশ্রমে আমি সেবাকাজ আরম্ভ করেছি। আমি এখানেই থাকব।" তখন বোঝানো হলো, সারগাছি আশ্রমে আপনার সেবাকাজ যা চলছে তা চলবে, আপনিও মাঝে মাঝে বেলুড়ে যেমন আসেন আসবেন। এইরকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানো হলে তিনি বেলুড় মঠে এলেন। পরদিন তিনি সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন—এই স্থির হয়েছে। কাগজের লোকেরা কলকাতা থেকে মঠে বারবার ফোন করছেন—নবনির্বাচিত সভাপতির জীবনবৃত্তান্ত ছাপতে চাই, কিছু লিখে পাঠান। তখন সবে শিবানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ হয়েছে, সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। কেউ সে-কাজে হাত দিতে পারছেন না। খবরের কাগজ যেমন হয়, তারাও ছাড়বে না। একজন প্রাচীন সাধু আমাকে বললেন: "তুমি একটা কিছু লিখে খবরের কাগজকে দিয়ে দাও।" আমি ভাবলাম, তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে কি করে হবে? আগে তাঁর সঙ্গে বসে একটু কথাবার্তা বলি, তারপর প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা লিখে দেব। আমি গিয়ে তাঁর কাছে বসে আছি, আরও অনেক সাধুরা আছেন। একথা-সেকথার পর আমি বললাম: "মহারাজ, আপনি যেদিন প্রথম ঠাকুরের কাছে গেলেন, ঠাকুরের সঙ্গে সেদিন কি কথাবার্তা হলো? ঠাকুর আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করলেন?" বলামাত্র আমার দিকে ফিরে বললেন: "কি হে, আজ একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? খবরের কাগজে দেবে বুঝি?" ধরা পড়ে গিয়েছি। হাতজোড় করে বললাম: "মহারাজ, আপনার আপত্তি থাকলে দেব না।" বললেন: "ঠাকুর খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না আর তোমরা সেই খবরের কাগজে ছাপাতে চাও?" খবরের কাগজকে বলে দেওয়া হলো—আমরা কিছু দিতে পারছি না। মহারাজ এইরকম প্রচারবিরোধী ছিলেন। আর খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। মনে রাখতে হবে, এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা, খবরের কাগজের সঙ্গে যদি একেবারে সংযোগ না থাকে তাহলে প্রচারকার্য ব্যাহত হবে। কিন্তু তিনি তা বুঝতেন না। তাঁর ভাব ছিল—আমি পূজারী, পূজা করছি, পূজা করবার সময়

কেউ কি বিজ্ঞাপন দিয়ে পূজা করে? যে-সেবার কাজকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন সেই সেবার কাজকে আবার খবরের কাগজে প্রচার করা হবে—এ তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

খবরের কাগজ সম্পর্কে ঠাকুরের প্রতিক্রিয়া তাঁর মনে ছিল। ঠাকুর খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না। কোথাও খবরের কাগজ থাকলে সরিয়ে গঙ্গাজল ছিটোতে বলতেন। কেননা, খবরের কাগজে অনেক মিথ্যাকথা থাকে। ফলে যেখানে খবরের কাগজ থাকে, সেই স্থান অপবিত্র হয়ে যায়। এইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনিও ঠাকুরের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়ার অল্প কিছু পরের কথা। তিনি সেসময় প্রবলভাবে ঠাকুরের ভাবে ভাবিত ও মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। সর্বদা তাঁর মন আনন্দে মগ্ন। সেই সময়ের ব্যক্তিগত কথা দু-চারটি বলছি। বাকি সব তো বইতে প্রকাশিত। আমার সেইসময় তপস্যা করতে উত্তরকাশী যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আগে থেকেই ঠিক ছিল, কিন্তু স্বামী শিবানন্দের অসুস্থতার জন্য যাওয়া স্থগিত হয়েছিল। তারপর তাঁর দেহত্যাগ হলে যখন যাওয়া ঠিক হলো, সাধুরা বললেন: "মহাপুরুষ মহারাজের ভাণ্ডারার পরে যাবে।" তার ভিতরেই গঙ্গাধর মহারাজ এসে গেলেন। তখনই যাওয়ার কথা বলা যায় না। কিছুদিন পরে তাঁকে বললাম: "মহারাজ, আমার আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে, উত্তরকাশীতে যাব। আপনার অনুমতি চাইছি।" শুনেই বললেন: "তোমরা কি শ্মশানে রাজত্ব করবার জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছ? উত্তরকাশী-টাশী যাওয়া হবে না।" চুপ করে আছি। তখন বলছেন: "দেখ, বিহারে ভূমিকম্পে অনেক লোকের প্রাণহানি হয়েছে, সম্পত্তি গিয়েছে, সেবাকাজ আরম্ভ হয়েছে, আমার সঙ্গে সেখানে সেবা করবে চল।" বললাম: "মহারাজ, বান্দা তৈয়ার হ্যায়।" আমরা অনেক সময় তাঁর সঙ্গে এভাবেই কথাবার্তা বলতাম, খুব স্বাভাবিক ভাবে। তারপর তিনি আর আমাকে যাওয়ার জন্য কিছু বলেননি।

এরপরের ঘটনা। একদিন তিনি বসে চা খাচ্ছেন। তাঁর অভ্যাস ছিল—এক পট চা টেবিলে দেওয়া হতো, আর তিনি এক-এক কাপ করে ঢেলে নিয়ে খেতেন। এরকম একদিন এক কাপ চা খাওয়া হয়ে গেলে আমি এগিয়ে গিয়ে আরেক কাপ ঢেলে দিচ্ছি। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন: "কী মতলব!" আমি বললাম: "মহারাজ, মতলব কিছু নেই, নিঃস্বার্থ সেবা।" তিনি হাসলেন, অর্থাৎ মনে রাখলেন। 'মতলব' মানে—তুমি কি সেবা করে আমার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করবে? তখন আর কিছু বললেন না। কয়েকদিন পরে বললেন: "দেখ, তোমাদের তপস্যায় গিয়ে ছত্রে ভিক্ষা করে খাওয়া, ওরকম আমরা করতাম না। আমরা নিঃসম্বল হয়ে ঘুরতাম আর ধ্যান-ভজন করতাম। তোমরা সেরকম করতে পার?"

তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথা এই প্রসঙ্গে আসে। তিনি যখন পরিব্রাজক হয়ে ঘুরতেন, তখন অর্থ স্পর্শ করতেন না। সঙ্গে যৎসামান্য জামাকাপড়, একটা আসন, আর গীতা ইত্যাদি দুই-একখানি বই থাকত। কোথায় কোন্ জায়গায় যাবেন তার স্থিরতা নেই। চলছেন তো চলছেন। এক জায়গায় দেখেন রান্না হচ্ছে, সেখানে বসলেন। তারা কিছু দিলে তিনি খেলেন, যেদিন না পেলেন সেদিন উপবাস। নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মুখেই শুনেছি। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে তাঁর ইচ্ছা হলো—ভাগবত পড়ব। ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে গেলেন। পরিব্রাজক জীবন চলেছে এইভাবে। উদ্দেশ্যবিহীন যাওয়া নয়, কোন তীর্থে যাচ্ছেন তাও নয়। যেতে যেতে তীর্থ এসে গেল তো ভাল। একবার রাজস্থানের দিকে এক মন্দিরে বাস করছেন। ভক্তরা আসছে মন্দিরে। সাধুকেও দর্শন করছেন। মন্দিরের পূজারী বললেন: "এ কিরকম সাধু, যখন কোন লোকজন বা তীর্থযাত্রীরা থাকে না সেইসময় বসে ধ্যান করছে, আর যখন লোকজন আসছে তখন বসে বসে বিচার করছে! বিচার করতে হলে রাত্রে কর, যখন লোকজন আসছে তখন ধ্যানে বস। তাহলে তো আমাদের একটু লাভ হয়।"

একসময় তিনি তিব্বতের মঠে ছিলেন। সেখানে সাধারণ গৃহস্থ অর্থাৎ গরিবদের প্রতি লামাদের শোষণ ও অত্যাচার তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল। তাঁদের স্পষ্ট বলেছিলেন: "এটি তোমাদের অত্যন্ত অন্যায়।" লামাদের রাজ্যে বসে এইভাবে তাদের সমালোচনা করার কথা ভাবাই যায় না। তারা বলল: "এইরকম বললে তোমার জিভ কেটে দেব।" তারপর তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, কে কি বলবে তার পরোয়া না করে যেখানে দরকার সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন—সে রাজাই হোক আর সাধারণ মানুষই হোক, কিংবা সাধু-সন্ন্যাসীই হোক।

যে-সেবাকার্য তাঁর জীবনের ব্রত ছিল তার ভিতরেও কোন লোক-দেখানো ভাব, কোন আতিশয্য ছিল না। আশ্রমের কাজ খুব কষ্টে চলত। নিজে যা খেতেন, ছেলেরা তাই খেত এবং আধুনিক কালে যাকে আমরা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন (disciplined life) বলি, তা তিনি জানতেন না। ছেলেরা এসে ধরল, আমরা পড়ব না। তিনি মাস্টারমশাইকে ডেকে বললেন: "ছেলেরা বলছে পড়বে না, আজ ওদের ছেড়ে দাও।" ছেলেরা বলল: "বাবা, আমরা এই জিনিসটা খেতে চাই।" তিনি বললেন: "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা হবে।" ছেলেদের বা নিজের জন্য যে খুব ভাল ব্যবস্থা হতো তাও নয়। তাঁর খাওয়ারও কোন সময়ের স্থিরতা ছিল না। দুপুরের খাওয়া কোনদিন দুটোয়, কোনদিন চারটেয়—এইভাবে চলত। কিন্তু এর মধ্যে একটি বিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। সেটি হচ্ছে—সেবার আদর্শ যেন ব্যাহত না হয়।

আমাদের হয়তো মনে হবে, তাঁর আশ্রমে শৃঙ্খলা (discipline) কম ছিল। শৃঙ্খলার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন না। আসলে তিনি দেখাতে চাইতেন না যে, যন্ত্রের মতো সব কাজ হয়ে চলেছে। এটি একটি সংসার, এখানে সকলের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ। এখানে তাঁর স্নেহ সর্বাবস্থায়। এই স্নেহ যারা পেত তারাই বুঝতে পারত। যখন তিনি বেলুড় মঠে আসতেন, আমাদের কী আনন্দে দিন কাটত তাঁর সঙ্গে! আবার এই আনন্দের ভিতরেও দরকার হলে শিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। তবে সেই শিক্ষা আমাদের কাছে কখনো কটু বোধ হতো না। সেই শাসনের ভিতরেও অপূর্ব মিষ্টতা থাকত।

আর ছিল একনিষ্ঠ ভাব। তাঁকে কেউ পছন্দ করুক আর না করুক, কারুর মনে যদি বিরুদ্ধ ভাব হতো তিনি পরোয়া করতেন না। আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকতেন। ঠাকুরের সেবার আদর্শটিকে আমরা তাঁর জীবনে মূর্তরূপে দেখেছি। তাঁর অতুলনীয় সেবাব্রত সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা আছে, তা আমরা তাঁর জীবনীতে পেয়েছি।

যখন তিনি পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছেন তখন কত সময় কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। সহায়-সম্বলহীনভাবে ঘুরে, ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে সেইসব বিপদ থেকে উত্তীর্ণও হয়েছেন। এসব তাঁর জীবনীকার লিপিবদ্ধ করেছেন। আরও অনেক কিছু ছিল, যা এখন আর আমাদের জানবার কোন উপায় নেই। যতটুকু তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন মাত্র ততটুকুই আমরা পাই। সব যেন গল্প উপন্যাসের মতো মনে হয়। তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবার কাজ চালিয়ে গিয়েছেন তা দেখে মনে হয়, ঠাকুর তাঁর ভিতর দিয়ে এটিই যেন বিশেষ করে দেখাবার জন্য তাঁর পার্ষদ্‌রূপে তাঁকে এনেছিলেন।

অনেক সময় তিনি ছেলেমানুষের মতো ব্যবহার করতেন। একদিন তিনি এবং বিজ্ঞান মহারাজ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) দোতলায় স্বামীজীর ঘরের গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। গঙ্গাধর মহারাজ বলছেন: "তোমার কটা কলম আছে?" বিজ্ঞান মহারাজ বলছেন: "আপনার কটা আছে?" তখন যার যে-কটা কলম ছিল আনা হলো। দেখা গেল, গঙ্গাধর মহারাজের আছে আটটা কলম আর বিজ্ঞান মহারাজের নয়টা কলম। গঙ্গাধর মহারাজ বললেন: "ভাই, আমি হেরে গেলাম।" বিজ্ঞান মহারাজ বললেন: "আতো হারবেনই, কারণ আপনি অপরকে দিয়ে দেন, আমি তো কাউকেই দিই না।" এইরকম তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুজনে মিলে হাসি-তামাশা করতেন।

মাঝে মাঝে সকালবেলায় সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মঠের চারদিক দেখে বেড়াতেন। মিস ম্যাকলাউড যখন মঠে আসতেন, তিনি গিরিশ স্মৃতিভবনের দোতলার ঘরে থাকতেন। অন্যসময় ঘরটা বন্ধ থাকত আর তার বাইরে যে-বারান্দা আছে তাতে আমরা অনেকে শুতাম। সকালে বিছানাগুলিকে রোল করে রেখে যে যার কাজে যেতাম। একদিন গঙ্গাধর মহারাজ বেড়াতে বেড়াতে দলবল নিয়ে সেখানে এসেছেন। এসে দেখছেন, বিছানাগুলি চারদিকে 'রোল' করে গোটানো আছে। বললেন: "বিছানাগুলিকে রোদ্দুরে দেওয়া দরকার। রোল করে রাখলে দুর্গন্ধ হয়। সব ছড়িয়ে ফেলা ভাল।" বলতে বলতেই তাঁর সঙ্গে যেসব 'দৈত্য-দানব' ছিল তারা খুব মজা করে বিছানাগুলিকে খুলে চারদিকে ওলটপালট করে দিয়ে গেল। কি আর করব, তখন সেই লণ্ডভণ্ড বিছানা আবার ঠিক করি। স্বামীজী নিজেও মাঝে মাঝে গিয়ে কোন সাধুর বিছানায় শুয়ে পড়তেন, দেখতেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা, নেই দেখলে বকুনি দিতেন।

গঙ্গাধর মহারাজ সাধারণতঃ আমাদের সঙ্গে 'পঙ্গতে' (পঙ্‌ক্তিতে) বসে খেতেন। ঠাকুরের সন্তানরা প্রথমে বসতেন, তারপর আমরা বসতাম। একসময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে তিনজন সাধু মঠে এসেছেন। 'সাধু' মানে ওদেশী মুসলমান দরবেশ। তিনি তাঁদের সম্মান করে নিজের

পাশে বসিয়ে পঙ্‌ক্তিতে খেয়েছিলেন। তিনি কাউকে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখতেন না, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন।

তিনি খুব সুন্দরভাবে স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। যেমন ছিল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ, তেমনি ছিল উচ্চারণে গাম্ভীর্য। মাঝে মাঝে 'হরগৌর্যষ্টকম্' স্তোত্র পাঠ করতেন।

মহারাজ চেয়েছিলেন যে, কর্মী হিসাবে আমি সারগাছিতে যাব এবং শরৎ মহারাজ তাঁকে সেই আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর থাকাকালে আমার যাওয়া হয়নি। একবার মালদাতে উৎসবে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে গিয়েছিলাম সারগাছিতে। শরৎ মহারাজ স্বাভাবিকভাবেই হোক বা পরিহাসচ্ছলেই হোক, আমাকে সারগাছিতে কর্মী হিসাবে পাঠাবেন বলেছিলেন, তাই অন্ততঃ তিনদিন ওখানে বাস করা উচিত মনে হওয়ায় আমি সেবার সারগাছি আশ্রমে গিয়ে তিনরাত্রি বাস করেছিলাম।

একটি কথা বলি। বুঝি না, তবু আমরা নির্বিকল্প সমাধি, ভাবসমাধির কথা উল্লেখ করি এবং ঠাকুরকে পূজা করি। কিন্তু তাঁর জীবনে যা সবচেয়ে বড় ভাব, আমাদের সকলের পক্ষে যা কল্যাণকর এবং অনুসরণীয় আদর্শ—সর্বভূতে ভগবানের সেবা করা, তা কিন্তু জীবনে আচরণ করবার তেমন চেষ্টা করি না। হয়তো তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রশংসা করি, কিন্তু জীবনে আচরণ করি না। এটি আমাদের একটি বিশেষ ত্রুটি—অক্ষমতা। ঠাকুরের লক্ষ লক্ষ ভক্তের ভিতর কয়জন ঠাকুরের এই সেবার আদর্শটি নিজের জীবনে প্রতিফলিত করতে সামান্যতমও চেষ্টা করেছেন? তাঁদের সংখ্যা কত?

ধর্ম কেবল ভাবালুতা ও সখের বস্তু নয়, ধর্মকে জীবনে পেতে হলে অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। ঠাকুর তাঁর ভাষায় বারবার বলেছেন : "ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু!" কিন্তু জীবনে কিছু ত্যাগ না করে আমরা ফাঁকি দিয়ে ধার্মিক হতে চাই। 'ত্যাগ' মানে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে বনে যাওয়া বা বিষয়-আশয় ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা নয়। 'ত্যাগ' মানে বিষয়ের প্রতি আসক্তিত্যাগ এবং বিষয়-সম্পত্তি যা আছে তার দ্বারা পাঁচজনের সেবা করা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-পরিবারভুক্ত আমরা কতটুকু এই চেষ্টা করি তা ভাববার কথা। আমরা কতখানি এইভাবে জীবনকে পরিচালিত করি, প্রত্যেককে তা চিন্তা করতে হবে। ঠাকুর স্বামীজীকে এই আদর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন এবং স্বামীজী কাজে ও কথায় যা প্রচার করেছেন সে কি কেবল পুঁথিবদ্ধ হয়ে থাকবে বলে?

একজন কৌতুক করে ঠাকুরের ভক্তদের সম্বন্ধে বলতেন : "রামকৃষ্ণের চেলা, সেকি শুধু প্রসাদ পাবার বেলা?" কথাটি রহস্য করে বলা, তবু কথাটি আমাদের ভেবে দেখতে হবে। 'ধর্ম' মানে ঘরের কোণে চোখ বুজে বসে জপ-ধ্যান করাই নয়। জপ-ধ্যানকে উপেক্ষা করার কথা বলছি না। ঠাকুর বলতেন : "চোখ বুজে ধ্যান করছিলাম, ভাল লাগল না। ভাবলাম, চোখ বুজলে তিনি আছেন চোখ চাইলে কি তিনি নেই?" স্বামীজী সেই কথাটি আরও জোর দিয়ে বলছেন : "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,/মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।" 'সর্বভূত' দূরের কথা, পাশের গরিবের দিকে কেউ দৃষ্টি দিই না, অথচ বলি আমরা 'রামকৃষ্ণের ভক্ত'! এই ভক্তিতে কী হবে? এতে কী শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণ করা হলো? বিশেষ করে দুঃখী, আর্ত, দরিদ্রের জন্য আমাদের প্রাণ কি কাঁদে? শুধু কাঁদলেই হবে না, তাদের জন্য কি কিছু করি? যদি বলি, আমরা কিছু করতে পারি না—এ ভুল কথা। স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজ জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন, যখন কিছু নেই তখন উপবাস করে নিজের অন্ন দিয়ে অপরের সেবা করে গিয়েছেন। এসব কি শুধু পুঁথিতে লেখা থাকবে? আমরা কি এর দ্বারা একটুও অনুপ্রাণিত হব না? 'সমাজসেবা' আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কোন সেবাসংস্থার মধ্য দিয়ে সমাজসেবা নয়, এটি ভগবানের সেবা এবং পূজা—এই কথা মনে রাখতে হবে।

কে কতটুকু পারি—এ প্রশ্ন নয়, এমন একজন ব্যক্তিও নেই, যে কারোর সেবা করতে সমর্থ নয়। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সামর্থ্য আছে। হাজার হাজার লোককে অন্নদান করতে হবে, সকলের সেবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে—এমন কথা বলছি না। যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, সেটুকুও না করলে 'ঠাকুরের ভক্ত' কথাটি কি অকপটভাবে বলা চলে? ধর্মজীবনে কপটতা থাকলে চলবে না। তাঁর আদর্শ জীবনে কতটুকু অনুষ্ঠান করতে পারি তা দেখতে হবে। যদি এতদিন কিছু নাও করে থাকি তাতে দোষ নেই, আজ থেকেই আরম্ভ করতে হবে। তাঁর কৃপায় সর্বভূতে তাঁর সেবা করবার প্রেরণা আমাদের জীবনে যেন সঞ্চারিত হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবন আমাদের সকলের সামনে সেই সেবার, বিরাটের পূজার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।★ □

★ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে গত ১০ অক্টোবর ১৯৮৮ তারিখে স্বামী অখণ্ডানন্দের পুণ্য জন্মতিথিতে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণের অনুলিখন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অনুধ্যান

ধর্ম এবং আজকের সমস্যা

স্বামী নির্বাণানন্দ

একদিন ভাবসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি দর্শন হয়। সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হওয়ার পরে শ্রীশ্রীমাকে সেই দর্শনের কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "দেখ, আমি ভাবে দেখতে পেলুম ধীরে ধীরে কত নদী সমুদ্র পর্বত পার হয়ে এমন একটা দেশে গেলুম যেখানকার লোকেদের সাদা সাদা চেহারা, সাদা সাদা মুখ। তারা আমার ভাষা বোঝে না, আমিও তাদের ভাষা বুঝলুম না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভাবের একটা বিনিময় হয়ে গেল।" মঠে এসে এটা আমরা যখন প্রথম শুনেছিলুম তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কোন্ দেশের কথা ঠাকুর বলেছেন। কিছু পরে আমাদের মনে হয়েছিল যে, এটা কোন পাশ্চাত্য দেশ হবে, কিন্তু কোন্ দেশ সে-সম্বন্ধে তখন আমাদের কোন ধারণা ছিল না। পরে আস্তে আস্তে বোঝা গেল। ঐ দর্শনের কিছুকাল পর ঠাকুরের শরীর চলে গেল। তার কিছুদিন পর স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সাধনভজনে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ক্রমে তিনি দক্ষিণভারতে এলেন। সেখানে একদিন তাঁর একটি দর্শন হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ইঙ্গিতে আদেশ করছেন সমুদ্র অতিক্রম করতে। আমেরিকার শিকাগোয় তখন (১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ) ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি চলছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে দর্শন দিয়ে ধর্মমহাসভায় যেতে আদেশ করলেন। শ্রীশ্রীমায়েরও জয়রামবাটীতে একই দর্শন হয়েছিল। তিনিও স্বামীজীকে আমেরিকা যেতে উৎসাহ দেন ও আশীর্বাদ করেন। তিনি স্বামীজীকে জানিয়ে দেন যে, ঠাকুর চান স্বামীজী যেন আমেরিকায় যান। তিনি আরও বলেন যে, স্বামীজীকে একথা জানাতে ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) বলেছেন। শ্রীশ্রীমা স্বামীজীকে চিঠিতে লিখেছিলেন: "ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবেক।" শ্রীশ্রীমায়ের সেই আদেশ পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো আসেন ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়ার জন্য। একথা এবং তারপরের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এটা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে, ঐ ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারত এবং ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বক্তৃতা এবং তাঁর ভাবের গভীরতার পরিচয় পেয়ে আমেরিকার নরনারী ভারতের ধর্ম ও বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যে যেভাবে তিনি আমেরিকায় বিরাট সাফল্যলাভ করেছিলেন তাতে তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আগে থেকেই সেখানে তাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছেন। আমেরিকায় একদিন তিনি বলেছিলেন: "দেখছি, ঠাকুর আমার আগেই এখানে এসেছেন।" অর্থাৎ তিনি সেখানে গিয়ে এমন কিছু আভাস পেয়েছিলেন যাতে তিনি বুঝেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর আগেই সেদেশে এসেছেন। সুতরাং আমাদের মনে হয়, ঠাকুর যে বলেছিলেন ভাবে এক দূর দেশে তিনি গিয়েছিলেন, সেটি ছিল আমেরিকাই। স্বামীজীর কথা থেকেও মনে হয়, ঠাকুর সেদিন ভাবে আমেরিকাতেই এসেছিলেন। আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারকার্য করতে করতে তাঁর গুরুভাইদের একটা চিঠিতে লিখেছিলেন: আমি দেখছি, আমেরিকাই বেদান্ত-প্রচারের ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র এবং আমেরিকাবাসীই বেদান্তগ্রহণে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে এরাই বেদান্তকে গ্রহণ করতে পারবে।

একথাটা স্বামীজী কেন বলেছিলেন? শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত দর্শন, শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ এবং স্বামীজীর উপলব্ধি থেকে আমাদের বিশ্বাস হয়েছে এবং সেই বিশ্বাসকে আমরা বরাবর লালন করে চলেছি যে, আমেরিকায় একসময়—কবে হবে জানি না—ধর্মপ্রাবল্য ঘটবে এবং আমেরিকা ধর্মবিপ্লবের এক মহান কেন্দ্র হবে। আমি এখানে এই প্রথম এসেছি এবং এখানে এসে আমার এই বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হয়েছে। হলিউডে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামী মাধবানন্দজী এবং আমি এদেশে (আমেরিকায়) এসেছি। আমরা প্রথমে যাই হলিউড, তারপর স্যান ফ্রানসিস্কো, তারপর পোর্টল্যান্ড। সেখান থেকে সিয়াটল, সেন্ট লুইস ইত্যাদি ঘুরে শিকাগো হয়ে নিউ ইয়র্কে এসেছি। বিভিন্ন জায়গা ঘুরে যা দেখলাম তাতে আমার বেশ ভাল লাগল। কেন যে ঠাকুর ঐকথা বলেছিলেন, কেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, আমেরিকার মানুষ ধর্মকে গ্রহণ করতে পারবে, তা এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমাদের চোখে ধরা পড়ছে। আমার এই কদিনের ঘোরাঘুরিতে—বেশিদিন হয়নি, মাত্র দুমাসের মতো হয়েছে—আমি এখানে যা দেখেছি, যতজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, এখানকার হাবভাব দেখে আমার যা মনে হয়েছে তাতে বলতে পারি যে, তাঁদের সেই

ভবিষ্যদ্বাণী, সেই ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অভ্রান্ত সত্য। তাঁদের কথা যে বাস্তবে পরিণত হবে সেই ধারণা আমেরিকায় এসে আমার মনে এখন আরও দৃঢ় হয়েছে। এখানে আমি যতজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছি তাতে আমার মনে হয়েছে, এখানকার লোকেদের মনে একটা আনন্দ রয়েছে। এখানে সবাই উত্তম আহার, উত্তর বিহার এবং উত্তম পরিচ্ছদের দ্বারা পার্থিব আনন্দ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করছে। এই আনন্দ থেকেই একদিন এখানে ধর্মের বিকাশ হবে এবং স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হবে।

পার্থিব সুখ-সম্ভোগ এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে, আপনারা তার সমাধানে অনেকটা সফল হয়েছেন। এগুলো করতে গিয়ে, আমি দেখছি, আপনাদের মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়েছে। অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়ে আপনাদের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের বিকাশ হয়েছে যেগুলি বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। নানা সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, কর্মশীলতা, কর্মোদ্যম জেগেছে। মনে রাখবেন, এগুলিই ধর্মজীবন লাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে এই গুণগুলি দেখেই স্বামীজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এখানকার মানুষ ধর্ম নেওয়ার উপযুক্ত। এই যে গুণগুলির কথা বললাম, এই গুণগুলি থাকলে ধর্মলাভ করা সহজ। অবশ্য সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ সহজে আনন্দ পেতে চায়। তাই সে এই পার্থিব ভোগ-সম্ভোগকে, জাগতিক ভোগসুখকে নিয়েই আনন্দ উপভোগ করবার চেষ্টা করছে। আপনাদের এখানে সাড়ে চারশ বছর হয়ে গেল একটা নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যেখানে পার্থিব ভোগসুখের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পার্থিব ভোগসুখের দ্বারা যে-আনন্দ আসছে তা কি চিরস্থায়ী হয়? না, তা চিরস্থায়ী হয় না। এজন্য আমি অবশ্য কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা দর্শনের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করছি না। আপনারা প্রত্যেকে নিজেরাই যদি একটু স্থির-ভাবে চিন্তা করেন তাহলেই দেখবেন, এই পার্থিব ভোগ, জাগতিক সম্ভোগ চিরস্থায়ী হয় না। কারণ, যে-জিনিস নিয়ে, যে-বস্তুকে নিয়ে আপনারা আনন্দ উপভোগ করছেন সেটা অনিত্য বস্তু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আজ যে-জিনিসকে নিয়ে আনন্দ করছেন কাল সে-জিনিসটা নেই। আনন্দ এখানে ভঙ্গ হয়ে যায়, তাই পার্থিব ভোগ বা বিষয়ভোগ চিরস্থায়ী হয় না, হতে পারে না।

মানুষ চায় আনন্দ। আর সেই আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে হলে একমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। একমাত্র ধর্মের মধ্যেই মানুষ শান্তি পেতে পারে। আমার বিশ্বাস, আপনাদের মধ্যে যে-সদ্‌গুণগুলি আছে তা দিয়ে যদি আপনারা ধর্মকে গ্রহণ করেন, যদি ধর্মকে অনুসরণ করেন তাহলে আপনারা সেই আনন্দের সন্ধান পাবেন —সেই অনাবিল আনন্দ যা কখনো ভঙ্গ হবে না, যা চিরস্থায়ী হবে। এখানে 'ধর্ম' বলতে আমরা কি বুঝব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ধর্ম' মানে গির্জা বা মন্দির বা মসজিদে যাওয়া নয়, কোন দার্শনিক তত্ত্ব বা অন্য কোন মতবাদকে অনুসরণ করাও নয়। তিনি বলতেন, ধর্ম হচ্ছে ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা। শাস্ত্রপাঠ নয়, মন্দির, গির্জা, মসজিদে যাওয়া নয়, তত্ত্ববিচার বা উপদেশ করা নয়—শুধু ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করাই হচ্ছে ধর্ম। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ধর্ম।

এখন প্রশ্ন, ভগবানকে কিভাবে দর্শন করব? যাঁর যেভাবে ইচ্ছা তিনি সেইভাবেই তাঁকে দর্শন করতে পারেন। ভগবান সগুণ আবার নির্গুণ। আমাদের শাস্ত্র বলছে—আপনারা যেভাবে চান, আপনাদের মনের বৃত্তি অনুসারে যেভাবে তাঁকে ভাল লাগে আপনারা সেইভাবেই তাঁর সন্ধান করতে পারেন। তিনি আমাদের ভিতরেই রয়েছেন। তাঁর সন্ধান এবং অবশেষে তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারাই আমাদের শান্তি এবং আনন্দ চিরস্থায়ী হতে পারে। এখন আপনাদের মনে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভগবানকে যদি ডাকতে চাই তাহলে আমাদের হয়তো অনেক দূরে যেতে হবে, সংসার ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হবে। আমরা কিভাবে তাঁকে খুঁজব এবং কিভাবে তাঁর সাক্ষাৎ পাব? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: "না। ভগবানকে লাভ করতে গেলে, ভগবানকে সন্ধান করতে গেলে, ভগবানকে পেতে গেলে তোমাদের যে কোথাও যেতেই হবে, কোথাও গিয়ে আলাদা থাকতেই হবে, তা নয়।" অর্থাৎ, যে যে-অবস্থায় আছে, যে যেখানে রয়েছে, যে যে-কাজ করছে সেখান থেকেই সে ভগবানকে লাভ করতে পারে। সে যেই হোক—সে দরিদ্র হোক, বড়লোক হোক, নারী হোক, পুরুষ হোক, হিন্দু হোক, খ্রীস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক, মুসলমান হোক—তাতে কিছু যায় আসে না। সকলেরই অধিকার আছে তাঁকে পাওয়ার, সকলের ভিতরেই তিনি আছেন, তাঁকে সকলেই লাভ করতে পারে।

কিন্তু এতো শুধু তত্ত্বকথা হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,

ভগবানকে কি করে লাভ করা যাবে? তাঁকে লাভ করতে গেলে তো একটা কোন উপায় আছে? উপায়টা কী?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভগবানকে যদি লাভ করতে হয় তাহলে এই কয়টি জিনিসের দরকার : (১) স্মরণ, মনন ও ধ্যান। যার যেমন ভাল লাগে—যে যেভাবে ভগবানকে ভাবে সেইভাবেই তাঁকে স্মরণ-মনন করতে পারে এবং স্মরণ-মননকে গভীর করে তাঁকে ধ্যান করতে পারে। (২) অধ্যবসায়। আন্তরিকভাবে—যান্ত্রিকভাবে নয়—অধ্যবসায়শীল হতে হবে। (৩) পবিত্রতা। কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা। (৪) তীব্র ব্যাকুলতা। যার যে-ভাবে ভাল লাগে, যে যে-রূপে ভগবানকে দেখতে চায়, সেই ভাবে সেই রূপে ভগবানের স্মরণ-মনন ও ধ্যান-ধারণা করার কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। অবশ্য ধ্যান-ধারণার আগে 'দেখা-লোক'-এর কাছে শুনতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। প্রথমে ভগবানের সম্বন্ধে শুনতে হবে—কোন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে শুনে নিতে হবে। তারপরে মনন ও ধ্যান করতে হবে। ধ্যান করতে গেলে আমাদের মনে হয় যে, কিছুদিন করলাম তাতে কিছুই তো হলো না। তাই বলে ছেড়ে দিলে চলবে না। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করতে হবে। এটাই হচ্ছে অধ্যবসায়। আপনারা সংসারে অর্থ-সামর্থ্য ইত্যাদি পাওয়ার জন্য বছরের পর বছর কত পরিশ্রম করছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই। কত পরিশ্রম করে এসব লাভ করছেন। তেমনি দু-চারদিন বা দু-একমাস বা দু-একবছর করে কিছু হচ্ছে না বলে ছেড়ে দিলাম— তা হবে না। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করতে হবে—সে একবছর, দুবছর বা পাঁচবছর হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু করতে হবে। অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে।

এরপর হলো পবিত্রতা। ভগবান পবিত্রতা-স্বরূপ। তাঁকে পেতে হলে আমাদের সম্পূর্ণভাবে অকপট ও পবিত্র হতে হবে। সন্ত তুলসীদাসের এই বিখ্যাত দোঁহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করতেন : "যহাঁ রাম তহাঁ কাম নহী। যহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।" অপবিত্রতার লেশমাত্র থাকলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে তীব্র ব্যাকুলতা। ভগবানকে চাই, ভগবানকে পেতেই হবে—এই আকাঙ্ক্ষা। আপনারা একটা বিষয় বা বস্তুকে পাওয়ার জন্য কত আকাঙ্ক্ষা করছেন, তার জন্য কত পরিশ্রম করছেন। এই পরিশ্রমটার 'মোড়' ঘুরিয়ে নিয়ে ভগবানকে পাওয়ার জন্য দিতে হবে। ভগবানকে পাওয়ার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা চাই, তাঁর জন্য তীব্র ব্যাকুলতা চাই। সরল ও ব্যাকুল-ভাবে তাঁকে ডাকতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছিলেন সেই সময়কার কথা বলছেন : "সাধনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছি আর বলছি, 'মা, আমার জীবনের একটা দিন কেটে গেল, তুমি তো এখনো আমায় দেখা দিলে না'!" এইরকমভাবে মার দেখা যখন তিনি পেলেন না তখন একদিন মায়ের মন্দিরে গিয়ে মায়ের খড়্গের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। স্থির করলেন, সেই খড়্গ দিয়ে আত্ম-বলিদান করবেন। সত্যি সত্যি তিনি যখন তাই করতে উদ্যত হলেন তখন মা আনন্দময়ী তাঁর কাছে প্রতিভাত হলেন। তিনি আনন্দময়ীর দর্শন পেয়ে ধন্য হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখনই কোন সাধনা করেছেন, তা বৈজ্ঞানিকভাবে করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে শুধু বিশ্বাস করেছেন—ভগবান আছেন বা ধর্ম আছে তা নয়, তার যেসব উপায় ও নিয়মাবলী আছে, তিনি সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ করেছেন, তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেছেন এবং শেষে ধর্মের মর্ম এবং ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন। শুধু বিশ্বাসই করেননি, অধ্যবসায়ের সঙ্গে সন্ধানও করেছেন। সম্পূর্ণভাবে অকপট ও পবিত্রভাবে তাঁর দর্শন পেতে চেয়েছেন। একান্ত ব্যাকুলভাবে চেয়েছেন। অবশেষে মা যখন তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন জীবন্তভাবে, অর্থাৎ সেই মৃন্ময়ী মূর্তি যখন চিন্ময়ী হয়ে তাঁর সামনে এসে প্রতিভাত হলেন তখন একদিন ভাবছেন, আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখি, মা ঠিক কিনা। মায়ের নাকের কাছে তুলো ধরে পরীক্ষা করে দেখলেন সত্যি সত্যি মায়ের নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। এই ব্যাকুলতা না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তাহলে আমাদের কী করতে হবে? আমাদের পবিত্র মনে তাঁর স্মরণ-মনন ও ধ্যান-ধারণা করতে হবে, অধ্যবসায় এবং তীব্র ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে সন্ধান করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ব্যাকুলতাই হচ্ছে আসল। ভগবান করুণাময়। বাস্তবিকই, তিনি ভক্তদের সবসময় কৃপা করতে চান। সুতরাং মানুষ যদি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে যায়, তিনি একশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর করুণার কোন শেষ নেই। আমার যদি ব্যাকুলতা থাকে, আমি যদি তাঁকে লাভ করতে চাই, আমি যদি তাঁর দিকে এগিয়ে যাই, তিনি সত্যি সত্যিই আমার দিকে এগিয়ে আসবেন। না এগিয়ে এসে তিনি থাকতে পারবেন না। সুতরাং এইভাবে আমাদের সাধনা করতে হবে।

আপনারা যে যা কাজ করছেন করুন, কিন্তু দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করে রাখবেন যখন আপনারা ভগবানকে ডাকবেন। সেই সময়টা আপনারা ভগবানের ধ্যান-ধারণা করবেন। সেই সময়টাতে আপনারা সমস্ত বিষয় থেকে মনটাকে গুটিয়ে এনে ভগবানের পাদপদ্মে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, ভগবানের সান্নিধ্যলাভের চেষ্টা করবেন। এইরকম করতে করতে আপনাদের মন ভগবানের দিকে যাবে।

এইভাবে ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম করতে করতে—দিনের মধ্যে যত অল্প সময়ের জন্যই হোক না কেন—দেখবেন আপনাদের মন ভগবানের নাম করতে চাইবে। ভগবানের নামের একটা মাধুর্য আছে, তাঁর নামের একটা শক্তি আছে। তার নাম করতে করতে, তাঁকে ধ্যান করতে করতে আপনাদের মনে ভগবানের ভাবের উদয় হবে। তখন দেখবেন, যে-নাম আজ পাঁচ মিনিট করছেন, কাল তা বেড়ে দশ মিনিট হবে। তারপর ক্রমশঃ একঘণ্টা-দুঘণ্টা হয়ে যাবে, অথচ তাতে আপনার কাজেরও কোন ক্ষতি হবে না, সময়ও নষ্ট হবে না। এইভাবে দিনদিন তাঁর নামে আনন্দ পাবেন। এইরকম করতে করতে যদি তিনি দয়াপরবশ হয়ে একবার দেখা দেন তাহলে দেখবেন আপনাদের ভিতরে একটা শক্তি জাগবে। এই শক্তিটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি। এখন আপনাদের মন শুধু পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করছে, আর এব্যাপারে আপনারা বেশ কৃতকার্যও হয়েছেন। কিন্তু এর ফলে যেমন আপনাদের মধ্যে কতকগুলি সদ্‌গুণ এসেছে, তেমনি তার পিছনে পিছনে কতকগুলি অসদ্‌গুণও এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভোগ ও সমৃদ্ধি আয়ত্ত করতে গিয়ে যেমন আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, কর্মশীলতা, কর্মোৎসাহ এসেছে, তেমনি এর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ, ক্ষোভ, বিদ্রূপ, ক্ষমতাপ্রিয়তা—এগুলিও এসে পড়েছে। এগুলিই আপনাদের জীবনে অনেক সময় একটা সংশয় এনে উপস্থিত করে। এই সংশয়ের সমাধান আপনারা হয়তো এক ভাবে করছেন। তা করতে গিয়ে আপনাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে বটে, কিন্তু যখন ধর্মের দ্বারা, ভগবানের চিন্তার দ্বারা আপনাদের মন শুদ্ধ হবে, যখন আপনারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করবেন, আপনাদের মন যখন ভগবানের দিকে যাবে, যখন আপনাদের ভগবানলাভ হবে তখন দেখবেন এই যে প্রতিযোগিতার ভাব, এই যে বিদ্বেষ ভাব, এই ক্ষমতাপ্রিয়তার ভাব—এগুলি সব একেবারে দূর হয়ে যাবে। তখন দূর দেশকে আর বিদেশ বলে মনে হবে না, তখন অন্য জাতিকে আর বিজাতীয় বলে মনে হবে না। তখন মনে হবে সমস্ত জগৎটা এক, আমারই দেশ। মনে হবে, সমস্ত জগৎটা একটাই পরিবার, সমস্ত জগদ্বাসী আমারই পরিবারের লোক। প্রত্যেকেই তখন প্রত্যেকের সঙ্গে ভাই অথবা বোনের মতো ব্যবহার করবে। তখন দেখবে সকলে একই ভগবানের সন্তান, একই ভগবানকে সকলে উপাসনা করছে, একই ভগবানকে সকলে ডাকছে। তখন কারো প্রতি কারোর বিদ্বেষ থাকবে না, তখন কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন উঠবে না—সকলের প্রতি একটা ভালবাসা আসবে। অন্তরে একটা প্রেম জাগবে। তখন যে-আনন্দ হবে সেই অনাবিল আনন্দ আর শেষ হবে না। আপনাদের মনে তখন একটা পরিবর্তন আসবে। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অত্যাচারিত, মৃত, অনাহারী, দারিদ্র্যপিষ্ট মানবজাতির এই নৈরাশ্যজনক রূপটা তখন মুছে যাবে। মানবসভ্যতা একটা নতুন রূপ নেবে।

আজকের পৃথিবীতে এই যে অশান্তি, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সবার প্রতি সবার একটা সন্দেহের ভাব, সবাই সবার ধনসম্পদ গ্রাস করে নিতে চায়—একমাত্র ধর্মের দ্বারা এই সমস্ত অশুভ ভাবকে দূর করা সম্ভব। একমাত্র ভগবানে বিশ্বাসের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি এবং স্থায়ী আনন্দ লাভ করা সম্ভব, এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার সম্ভাবনা নেই। মনে রাখবেন, একমাত্র ধর্মের দ্বারাই ভগবানকে মানুষ প্রত্যক্ষ করবে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যেসমস্ত গুণরাশি আপনারা লাভ করেছেন, তার সঙ্গে ভগবান ও বেদান্তকে মিশিয়ে যেন আপনারা ধর্মজীবনের পথে চলেন এবং ভগবান ও ধর্মজীবন লাভ করতে পারেন।★ □

★নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারে পূজ্যপাদ মহারাজজী ২ এপ্রিল ১৯৫৬ বাঙলায় যে ঘরোয়া আলোচনা করেছিলেন তা শ্রোতাদের কাছে ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ। মহারাজজীর আলোচনা টেপরেকর্ড থেকে অনুলিখন করেছেন ডাঃ স্বয়ম্ভু মুখোপাধ্যায়। কাশীশ্বর চক্রবর্তীর অনুরোধে টেপরেকর্ডের একটি কপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন হলিউড বেদান্ত সোসাইটির স্বামী সর্বদেবানন্দ। প্রসঙ্গতঃ, গত সংখ্যায় (আশ্বিন ১৪০৩) প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে তাঁর ঘরোয়া আলোচনার তারিখটি ভুলবশতঃ '৪ জুন' মুদ্রিত হয়েছে, হবে '৪ এপ্রিল'।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নিবন্ধ

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী তথাগতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪০৩ সংখ্যার পর]

নারদ, কণ্ব, পরশুরাম প্রভৃতি মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য আবেদন জানান। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রও শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য দুর্যোধনকে অনুরোধ জানান। দুর্যোধন অন্যান্য নৃপতিদের সঙ্গে সভা ত্যাগ করে চলে যান। গান্ধারীর আবেদনও ব্যর্থ হয়। দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার ইঙ্গিত দেন। এইসময় সকলে দেখতে পায় শ্রীকৃষ্ণের ঘোর করাল মুখচ্ছবি। উপস্থিত রাজন্যবর্গ সেই উগ্রমূর্তি দর্শনে চোখ বন্ধ করলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করে ধন্য হলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যদৃষ্টি পেয়ে তাঁর পরমরূপ দর্শন করলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূর্বরূপ পরিগ্রহ করলেন। দুর্যোধন ভাবলেন, এ এক যাদুবিদ্যা। তাঁর ওপর এই ঘটনার বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। (উদ্যোগপর্ব, ১৩০ অধ্যায়)। স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বন্ধুবৎসল, শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু কখনো কখনো কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর মধ্যে এই দিব্যভাবের আবির্ভাব ঘটত।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন বিদুর-ভবনে কুন্তীর কাছে বিদায় নিতে। কুন্তী বললেন, তাঁর পুত্রগণ যেন ক্ষত্রিয় বীরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। কুন্তীর কাছে বিদায় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নগরের বাইরে গিয়ে কর্ণকে তাঁর রথে তুলে নেন। কর্ণকে তাঁর জন্মরহস্য বলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ রাজপদে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। কর্ণ এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি। যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হবে এবং কৌরবগণ নিহত হবে তা তিনি জানতেন। কর্ণকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে আনতে পারলে হয়তো দুর্যোধন সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হতেন। তা কিন্তু হলো না।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে হস্তিনাপুরের বিবরণ দেন। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন। তাঁরা যুদ্ধে অসম্মত হলে দুর্যোধন অবশ্যই সন্ধিস্থাপনে সম্মত হতেন। শ্রীকৃষ্ণ অগত্যা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধের আয়োজন করতে বললেন। শান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও তিনি কাপুরুষতা ও ক্লীবত্বের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য হলো—দুষ্কৃতীর বিনাশ, ধার্মিকদের রক্ষণ ও পোষণ এবং অধর্ম ও অশান্তিকে যুদ্ধ দ্বারা দূর করে ধর্মের সংস্থাপন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দুর্যোধন শকুনিপুত্র উলূককে পাণ্ডব শিবিরে পাঠিয়েছেন। দুর্যোধন উলূকের মারফত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানা দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ উলূকের মারফত দুর্যোধনকে জানালেন যে, তাঁর ক্রোধানলে কৌরবগণ তৃণের ন্যায় ভস্মসাৎ হবেন। (উদ্যোগপর্ব, ১৬১।৫৪-৫৭)

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন অকস্মাৎ যুদ্ধে গুরুজন-বধ অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিকে শ্রেয়ঃ বলে গণ্য করে ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। অর্জুনের ক্লীবত্ব দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে 'গীতা'র অগ্নিবাণী শুনিয়ে মোহমুক্ত করলেন।

ভীষ্মের শরশয্যা ও দ্রোণের শিরশ্ছেদ—এই দুটি ঘটনা কৌরবগণের দুর্ভাগ্যকে ত্বরান্বিত করে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিবলেই এই দুই মহাবীরের পতন নিশ্চিত হয়। অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যু পাণ্ডবদের জীবনে এক পরম শোকাবহ ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণই সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও উত্তরাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিয়ৎপরিমাণে তাঁদের শোক প্রশমিত করেন। অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ অর্জুনের জীবনে আনে অধৈর্য ও ক্রোধ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, জয়দ্রথকে পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বধ করতে না পারলে তিনি অগ্নিকুণ্ডে আপন প্রাণ বিসর্জন দেবেন। এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত করে। শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিবল ও যোগশক্তিতেই অর্জুন তাঁর প্রতিজ্ঞাপূরণে সক্ষম হন।

ইন্দ্র কর্ণকে দিয়েছিলেন 'বৈজয়ন্তী' শক্তি। কর্ণ এই শক্তি অর্জুন-বধের জন্য সর্বপ্রযত্নে সর্বদা রক্ষা করতেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শেই ঘটোৎকচ কর্ণকে আক্রমণ করে। কর্ণের শক্তি প্রয়োগে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শোকাকুল হন, কিন্তু কৃষ্ণ আনন্দিত হন এই জন্য যে, অর্জুনকে তিনি বিপদ থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

দ্রোণাচার্যের শিরশ্ছেদের পর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্য বিনাশের জন্য ভীষণ 'নারায়ণ অস্ত্র' নিক্ষেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ অস্ত্রকে ব্যর্থ করার উপায় জানতেন, সেটা

হলো—অস্ত্রত্যাগ করে রথ থেকে নেমে যাওয়া। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সকল পাণ্ডবসৈন্য অস্ত্রহীন হয়ে রথ থেকে নেমে যাওয়ায় বেঁচে গেলেন। দ্রোণপর্বে (১৮০।২৫) একটি সুন্দর কথা বলা হয়েছে ঃ "কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।"

দুর্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন যুদ্ধবিরতির পর প্রতি রাত্রেই মিলিত হয়ে কর্ণকে পরামর্শ দিতেন যাতে কর্ণ ইন্দ্র-দত্ত শক্তির সাহায্যে অর্জুন বা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই অশুভ পরামর্শদানে ধার্মিক সঞ্জয়ও ছিলেন। (দ্রোণপর্ব, ১৮০।২১-২৩) বোধহয় মহাত্মা সঞ্জয়ের জীবনে এটাই একমাত্র কলঙ্ক।

দ্রোণবধের পর কর্ণ সেনাপতি হয়েছেন। কর্ণের হাতে চরম লাঞ্ছিত যুধিষ্ঠির যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজ শিবিরে পালিয়ে আসেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করার জন্য শিবিরে এলেন। যুধিষ্ঠির যখন জানলেন যে, কর্ণকে অর্জুন তখনো বধ করেননি তখন অত্যন্ত হতাশায়, ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, দুঃখে ও আত্মগ্লানিতে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ও তাঁর গাণ্ডীবকে ধিক্কার দেওয়ায় অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বধ করার জন্য অসিধারণ করেন। অর্জুনের গুপ্ত প্রতিজ্ঞা ছিল এই যে, কেউ তাঁর গাণ্ডীবের নিন্দা করলে তিনি তাকে বধ করবেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর এই হঠকারিতার জন্য তীব্রভাবে তিরস্কার করে 'মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন' আখ্যা দিলেন। তিনি আরও বললেন ঃ "বালকত্ব প্রযুক্ত এই ব্রত তুমি নিয়েছ এবং এখন মূর্খতার জন্য অধর্ম করতে উদ্যত হয়েছ।" (কর্ণপর্ব, ৬৯।২৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ সত্য অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই—"ন সত্যাদ্বিদাতে পরম্"। কিন্তু সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময় সত্য পর্যবসিত হয় মিথ্যায় আবার মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়। তিনি বলাক ব্যাধ ও কৌশিক ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্জুনকে বোঝালেন যে, স্থলবিশেষে হিংসাও ধর্ম হয় এবং সত্যও অধর্ম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন যে, গুরুজনকে তিরস্কার করলেই তাঁকে বধ করা হয়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে তাঁর গুপ্ত প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। আবার এই হঠকারিতার জন্য অর্জুনের মনে গ্লানি জাগে। তিনি আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মনস্থ করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেন যে, নিজমুখে নিজের গৌরব কীর্তনই আত্মহত্যার সমান। অর্জুন তখন তাই করলেন। হঠকারিতা ও হঠাৎ ক্রোধ—এই দুটি ক্ষত্রিয়সুলভ দুর্বলতাকে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন জয় করতে পারেননি। লজ্জায় ও ক্ষোভে দুজনেই অনুতপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই তাঁরা প্রকৃতিস্থ হন এবং মহা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পান।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর্ণ ও অর্জুনের। বারবার কর্ণের দুর্ব্যবহার সম্পর্কে বলে এবং বিশেষ করে অভিমন্যুর মৃত্যুতে কর্ণের উল্লাসের বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উত্তেজিত করতে থাকেন। ক্রোধে উদ্দীপ্ত অর্জুন বীরবিক্রমে কর্ণকে বধ করার সঙ্কল্প করেন। রণভূমি কর্ণের রথচক্র গ্রাস করলে কর্ণ নিরুপায় হয়ে অর্জুনকে ধর্মের নামে যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন জানান। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের সমস্ত পাপকর্মের বর্ণনা দিয়ে বলেন যে, ধর্মজ্ঞানহীন কর্ণ আজ 'ধর্ম', 'ধর্ম' বলে চিৎকার করলে ধর্ম তাঁকে রক্ষা করবে না। কর্ণ লজ্জায় কোন কথা বলতে পারেননি। তিনি অধোবদনে সব শুনলেন। (কর্ণপর্ব, ৯১।১৫)। শ্রীকৃষ্ণের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও উদ্দীপ্ত ভাষণে অর্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণকে বধ করেন।

মহাযুদ্ধের অন্তিম দিবসে সেনাপতি শল্যকে বধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন ঃ "আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবীর্য আছে তাই দিয়ে শল্যকে বধ করুন। মাতুল বলে তাঁকে দয়া করবেন না। ক্ষত্রিয়ধর্ম সামনে রেখে আপনি শল্যকে বধ করুন।" যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করেন। শল্যবধের পর ভীত দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করেন। ভীম গদাযুদ্ধে আহ্বান জানালে দুর্যোধন সম্মত হন। কিন্তু গদাযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে ভীম দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ করায় ক্রুদ্ধ বলরাম ভীমকে বধ করার জন্য উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণের হস্তক্ষেপে ভীম রক্ষা পান। মৃত্যুপথযাত্রী, সঙ্গীহীন দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়েও শান্তচিত্তে বলেন ঃ দুর্যোধন, তোমার অত্যধিক দুষ্কর্মের প্রত্যুত্তররূপে আমরাও অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছি—

"যান্যকার্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে।
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্।"

(শল্যপর্ব, ৬১।৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং সেজন্য প্রয়োজনবোধে অধর্মকে দমন করতে তিনি "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতির আশ্রয়গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। পাণ্ডবগণকে বিষাদমুক্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলেন,

ধর্মযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে অন্যায় করলেও কোন পাপ হয় না। (শল্যপর্ব, ৬১।৬৭)

যুদ্ধের শেষদিনে সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ঃ "গাণ্ডীব ও তূণীর সহ তুমি আগে রথ থেকে অবতরণ কর। আমি পরে অবতরণ করব।" শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রথের বানরধ্বজ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলো এবং রথখানি ভস্মসাৎ হলো। অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ "দ্রোণ ও কর্ণের আগ্নেয়াস্ত্রে তোমার রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হয়ে গেছে। আমি রথে উপবিষ্ট ছিলাম বলে রথখানি ভস্ম হয়নি।" যুদ্ধে জয়লাভের পর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে উপপ্লব্যনগরে বেদব্যাসের এক উক্তি স্মরণ করিয়ে দেন ঃ "ধর্ম যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে, শ্রীকৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে।"

বাইরের যুদ্ধে জয়ী হলেও যুধিষ্ঠিরের অন্তর্যুদ্ধ শেষ হতে বহু সময় লাগে। অন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য তপস্বিনী গান্ধারীর অভিশাপ-আশঙ্কায় যুধিষ্ঠির বিষাদমগ্ন। এহেন অবস্থায় পাণ্ডবগণ সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে বলেন ঃ "হে মধুসূদন, তোমার সহায়তাতেই আমাদের জয় হয়েছে। আমাদের জন্য তুমি কৌরবদের অনেক কঠোর তিরস্কার সহ্য করেছ। তুমি ছাড়া গান্ধারীর ক্রোধ শান্ত আর কে করবে? তুমি একটা উপায় স্থির কর।" যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আসেন হস্তিনাপুরে। বেদব্যাস আগেই এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেন। ধৃতরাষ্ট্রের হাতে হাত রেখে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে থাকেন। এই করুণ বিলাপে আমরা প্রত্যক্ষ করি শ্রীকৃষ্ণের এক মানবিক রূপ, বুঝতে পারি তিনি কত কোমলচিত্ত। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করে তিনি তাঁদের অন্তরের ব্যথাকে প্রশমিত করলেন দরদী হৃদয়ের প্রীতিস্নিগ্ধ কথাবার্তায়।

অশ্বত্থামা সেই রাত্রিতেই পাণ্ডব শিবিরে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অন্যান্য পাঞ্চালগণকে হত্যা করে গঙ্গার তীরে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে রথারোহণে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। অশ্বত্থামা দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করলে অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করেন। ব্যাসদেব ও নারদের অনুরোধে অর্জুন দিব্যাস্ত্র প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু অশ্বত্থামার সে-সামর্থ্য ছিল না। ফলে সেই অস্ত্র উত্তরার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হলো। ব্যাসদেবের আদেশে অশ্বত্থামা তাঁর মহামূল্য মণিটি পাণ্ডবদের দেন। বিনিময়ে পাণ্ডবগণ তাঁর প্রাণভিক্ষা দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দেন যে, তিন হাজার বছর জনহীন দেশে অসহায় অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। পরবর্তী সময়ে উত্তরার মৃত পুত্রকে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে জীবন দান করে পাণ্ডবদের বংশধারা বজায় রাখবেন। উত্তরার এই পুত্র ষাট বছর রাজত্ব করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের অগোচর কিছুই ছিল না। তিনি জানতেন, ভীমের ওপর ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধের কথা। ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে স্নেহালিঙ্গন করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ ভীমের লৌহমূর্তিকে তাঁর কাছে উপস্থিত করলেন। বলবান ধৃতরাষ্ট্র লৌহমূর্তি আলিঙ্গন করে চূর্ণ করলেন। পরে অবশ্য অনুতাপ প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণ মৃদু ভর্ৎসনা করে ধৃতরাষ্ট্রকে আসল ঘটনাটি বলেন।

কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডবগণ গান্ধারীর কাছে যান। গান্ধারী যুধিষ্ঠিরকে শাপ দিতে ইচ্ছুক জেনে ব্যাসদেব তখনই গান্ধারীর নিকট আসেন এবং গান্ধারীকে ঐ কাজ থেকে বিরত করেন। মহাশ্মশানে পুত্র-পৌত্রাদির মৃতদেহ দেখে গান্ধারী যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেই দায়ী করেন। সেজন্যই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শাপ দিয়ে বলেন ঃ "হে কেশব, তুমি অমিত বলের অধিকারী হয়েও এই লোকক্ষয় কেন উপেক্ষা করলে? আমার শাপে পঁয়ত্রিশ বছর পরে তোমার বংশধররাও এমনভাবে প্রাণত্যাগ করবে।" শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন ঃ "আমি জানি, আমার জ্ঞাতিবর্গ তাদের নিজেদের দোষেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আমিই কালরূপে তাদের সংহার করব।" শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারে গান্ধারীকেই দোষী বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন ঃ "নিজের অপরাধ আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে মুক্তির আশা করা বৃথা।" গান্ধারী কোন প্রতিবাদ করেননি।

যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা বারবার কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করেন ও যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেন। একদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে এতই নিমগ্ন যে, যুধিষ্ঠিরের কুশল প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁর ধ্যানমগ্নতার কারণ উল্লেখ করে বলেন ঃ "শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম আমার ধ্যান করছেন, সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল।" (শান্তিপর্ব,

৪৬।১১)। তিনি বলেন যে, ভীষ্মের দেহত্যাগের সময় আসন্ন এবং তাঁর অভাবে পৃথিবী একজন প্রকৃত প্রাজ্ঞ মহাত্মাকে হারিয়ে চন্দ্রবিহীন রাত্রির মতো শোচনীয় অবস্থা লাভ করবে। তাই যুধিষ্ঠির যেন সত্বর তাঁর নিকট গিয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেন।

শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব গেলেন ভীষ্মের কাছে। তখন দক্ষিণায়ন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়েছিল। ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সেসময় শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভীষ্ম অতীব আনন্দিত হলেন। অনেক মুনিঋষি ভীষ্মের চারদিকে বসেছিলেন। ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বলেন: "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার তিরোধানে পৃথিবীর মহান জ্ঞানরাশি তিরোহিত হবে। যুধিষ্ঠিরের চিত্ত জ্ঞাতিশোকে মোহাবিষ্ট। আপনি ধর্মার্থযুক্ত উপদেশে ধর্মরাজের শোকের উপশম করুন। আপনার জীবনের আর ছাপান্ন দিন অবশিষ্ট আছে। আপনি পরলোকে গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে। সে-কারণেই পাণ্ডবরা আপনার কাছে ধর্মজিজ্ঞাসা করতে এসেছেন।"

ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিনি শিষ্য হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনতেই উৎসুক। শ্রীকৃষ্ণ বলেন: "আপনার যশ বৃদ্ধি হোক—এই আমি চাই। আমার জ্ঞান আপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে বেদবাক্যের মর্যাদা লাভ করবে এবং আপনার কীর্তি চিরকাল সংসারে শ্রদ্ধা অর্জন করবে।"—"বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যতে বসুধাতলে।" (শান্তিপর্ব, ৫৪।২৯)। শান্তি ও অনুশাসন-পর্ব ভীষ্মের উপদেশকে অবলম্বন করেই প্রধানতঃ রচিত হয়েছে। ভীষ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করেছেন।

ভীষ্মের দেহত্যাগের পর অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁকে গীতার সারমর্ম বলেন। সেটি 'অনুগীতা' নামে পরিচিত। অবশ্য অর্জুনের স্মৃতিভ্রংশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হন, কারণ যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হয়ে গীতাতত্ত্ব বলেছিলেন। এই উপদেশ দিয়েই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যান। পথে তাঁর দেখা হয় উতঙ্ক মুনির সঙ্গে। উতঙ্ক শ্রীকৃষ্ণের মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা জেনে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধের জন্য দোষী ভেবে তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন: "শাপ দিয়ে আপনার তপস্যার ফল নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। আমার জীবনের লক্ষ্যই হলো ধর্মসংস্থাপন করা। সেজন্যই আমার মনুষ্যদেহধারণ। আমার কোন দোষ নেই। আমিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে ধর্মের সেতুবন্ধন করে থাকি।"—"ধর্মস্য সেতুং বধ্নামি চলিতে চলিতে যুগে।" (অশ্বমেধপর্ব, ৫৪।১৬)

উতঙ্কের বাসনা পূর্ণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করান এবং মরুভূমিতে উতঙ্কের জলের প্রয়োজন হলেই সেখানে মেঘ জলবর্ষণ করবে—এই বরদান করেন। দ্বারকায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের প্রশ্নের উত্তরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ দেন, কিন্তু অভিমন্যু বধের কথা প্রকাশ করেন না। এদিকে সুভদ্রার শোক দেখে বসুদেব অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ জানতে পারেন এবং শোকে অত্যন্ত কাতর হন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে সান্ত্বনা দেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে যোগদানের জন্য জ্ঞাতিবন্ধু-সহ শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসেন। এসময় পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুরে ছিলেন না—সেনা সংগ্রহের জন্য তাঁরা হিমালয়-যাত্রা করেছিলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুতে উত্তরা শোকে আহার ত্যাগ করেন। সেজন্য তাঁর গর্ভস্থ সন্তান ক্ষীণ হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের আগমনের পর উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য নারীদের কান্না শুনে শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকির সঙ্গে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করেন। তিনি জানতেন, উত্তরার মৃত শিশু প্রসব অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের ফল। সেই মর্মন্তুদ করুণ দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সকলের বিশেষ প্রার্থনায় করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃত বালকের দিকে চেয়ে বলেন: "যদি আমি কখনো মিথ্যা না বলে থাকি, যুদ্ধে বিমুখ না হয়ে থাকি, যদি ধর্ম ও ব্রাহ্মণগণ আমার প্রিয় হন, তবে অভিমন্যুর এই পুত্র জীবনলাভ করুক।"—

"যথা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ ময়ি নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
তথা মৃতঃ শিশুরয়ং জীবিতাদভিমন্যুজঃ॥"
(অশ্বমেধ-পর্ব, ৬৯।২২)

ক্ষীয়মাণ বংশের এই সন্তানটি একমাত্র বংশধর, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ তার নাম দেন পরীক্ষিৎ।

শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সাঙ্গ হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যান। তারপর পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে। দ্বারকায় নানা দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যাদব বংশে পাপের মাত্রাধিক্য ঘটেছে। শীলতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাদবগণ ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে ইন্দ্রিয়সুখে মজে রয়েছেন। নারীপুরুষ যৌনতৃপ্তির জন্য সবরকম পাপকর্মে লিপ্ত এবং সুরাসক্ত। ব্যভিচারের প্রবল স্রোতে

সব শীল, ধর্ম ও সদাচার ভেসে গেছে। (মৌষলপর্ব, ২য় অধ্যায়)। বলরাম আইন করে সুরা তৈরি নিষিদ্ধ করে দিলেন। নগরে সকলে জানল যে, আইনভঙ্গের শাস্তি ভয়ঙ্কর। তথাপি আইন ভঙ্গ করে সুরা তৈরি ও পান চলতেই থাকে। 'হরিবংশ'-এর বিষ্ণুপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের এক ভয়াবহ চিত্র দেখি। নারী ও সুরার প্রতি যাদবদের অত্যধিক আসক্তি চিরদিনই ছিল। কিন্তু শেষে তাদের সমাজজীবন থেকে মনুষ্যত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ নারদকে অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে বলেছিলেন ঃ "দুই ছেলে যখন জুয়া খেলে তখন জুয়াড়ীর মা এক ছেলের জয় কামনা করেও অপর ছেলের পরাজয় কামনা করে না। এরূপ অবস্থা আমার।" (শান্তিপর্ব, ৮১।১১)। এই সময়ে গান্ধারীর অভিশাপের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে পড়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাদবগণ প্রভাসতীর্থে এলেন। অত্যধিক ব্যভিচারে মত্ত যাদবকুল সুরাপানে উন্মাদ। পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করে যাদবকুল ধ্বংস হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণও ঐভাবে তাঁর চোখের সামনে মারা গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বেঁচে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এলেন এবং নারীদের রক্ষার ভার দিলেন বসুদেবের ওপর, যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্জুন এসে ওঁদের ভার নেন। তিনি দারুককে পাঠালেন হস্তিনাপুরে অর্জুনকে সংবাদ দেওয়ার জন্য, অর্জুন যেন নারীদের পাণ্ডবরাজ্যে নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণ এসে দেখেন, বলরাম যোগবলে দেহত্যাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণও যোগ অবলম্বন করে ভূমিতলে শয়ন করলেন। জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে করে তাঁর পা তীরবিদ্ধ করে এবং পরে সে যোগমগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখে অনুতপ্ত হয়। তাকে আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কলি পৃথিবীতে প্রবেশ করে। (মৌষলপর্ব, ৪।২৪)

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। তিনি সৎ গৃহস্থ, রাজনীতিজ্ঞ, দণ্ডদাতা, বীর যোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মসংস্থাপক। তিনি আবার উচ্চকোটির যোগী ও তপস্বীও। তিনি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কর্মে লিপ্ত, অথচ নির্বিকার ও আসক্তিবিহীন।□

অনুষ্ঠান-সূচী (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৩)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	২২ নভেম্বর ১৯৯৬
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	২৪ নভেম্বর ১৯৯৬

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২ কার্তিক	শনিবার	১৯ অক্টোবর ১৯৯৬
শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা	আশ্বিন পূর্ণিমা	৯ কার্তিক	শনিবার	২৬ অক্টোবর ১৯৯৬
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৪ কার্তিক	রবিবার	১০ নভেম্বর ১৯৯৬
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	৩ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	১৯ নভেম্বর ১৯৯৬

একাদশী-তিথি (রামনাম সঙ্কীর্তন)

৬, ২১ কার্তিক	বুধবার, বৃহস্পতিবার	২৩ অক্টোবর,	৭ নভেম্বর	১৯৯৬
৫, ২০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার, শুক্রবার	২১ নভেম্বর,	৬ ডিসেম্বর	১৯৯৬

চিরন্তনী

□ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য □

ধ্রুবের উপাখ্যান ৩

কথা : ভগিনী নিবেদিতা □ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত।



গভীর রাত্রে দূরে অন্ধকারে শিশু ধ্রুব তালপাতার মর্মরিত আন্দোলন ও কান্না শুনতে পেত। সে অবাক হয়ে ভাবত, কী কথা এরা বলতে চায়!

কখনো-বা বিস্তীর্ণ উদার প্রান্তরের পাশে দাঁড়িয়ে সে দেখত, দিগন্ত-বিস্তৃত ধানের খেতে কৃষকেরা কাজ করছে, বীজ বুনছে বা বর্ষায় ধোয়া মাঠে ধানের চারা রোপণ করছে।







তাঁর ছোট্ট শিশুটিকে অবলম্বন করে আনন্দেই কাটছিল মা সুনীতির দিনগুলি। অবশেষে সাত বছর বয়সে ধ্রুব তার বাবার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগল। সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল তার মায়ের কাছে। [ক্রমশঃ]

চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

অঞ্জলি ভরি করি পান শ্যামা হলিনাকো তুই তৃপ্ত,
মুণ্ডের মালা ঝুলাইয়া গলে
প্রিয় পতিদেহ দলি পদতলে
হলি তবে তুই শান্ত!
এত সুমিষ্ট—এত প্রিয় তোর তাজা সন্তানরক্ত!

রাক্ষসি, রক্তের লোভ যায়নিকো তোর শুধু নিয়ে নরমুণ্ড,
তাই ধরার কলিজা জবা হয়ে ফুটে
তোর করাল চরণে বলে মাথা কুটে,
'সম্বর তব ক্রোধ রুদ্রাণি, এনেছি হৃদয়পিণ্ড।'
হায়, বাঘিনীরও বুকে ঝরে শতধারে স্নেহের অমৃতভাণ্ড!

যুগে যুগে তবু তোরে পূজি মোরা, তুই নাকি মহাশক্তি,
শঙ্কাহারিণী, জগজ্জননী
কেন তোরে কয় কঠোর পাষাণি—
কী এর পিছনে যুক্তি,
খুঁজি নাহি পাই, ভাবি তাই শেষে ভয়ে বুঝি এই ভক্তি!

তাই যদি হয় ডাকিব না তোরে, পূজিব না তোরে আর,
ধরার মাটিতে রক্তপ্লাবন
শত রমণীর মহাক্রন্দন
কত জননীর হাহাকার,
একী করেছিস বিশ্বজননি, একী প্রশংসার!

কেন কল্যাণি, তোর শান্ত নয়নে ক্রুদ্ধ বহ্নি লেলিহান,
ত্রস্তা ধরণী থরথর কাঁপে
ভয়ে রবি শশী মেঘে মুখ চাপে
'ত্রাহি ত্রাহি' ডাকে ভগবান,
কেন স্বর্গ মর্ত পাতাল জুড়িয়া রক্তগঙ্গা বহমান?

কেন হলো তোর বিভ্রম হেন, কেন হলি উন্মত্ত,
কেন গো জননি, তোর রোষে বল ধরা হলো শোণিতাক্ত?

নিবেদিতা

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

আত্মত্যাগের রক্তে লেখা
ভালবাসার এক নাম,
বজ্রমুকুটে সুশোভিতা তুমি
নিবেদিতা, নিবেদিতা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অমিয় প্রভায়
আলোকিতা তুমি সমাহিতা
হে মহাতাপসী, পূর্ণিমা-শশী
নিবেদিতা তুমি মহাব্রতা
নিবেদিতা, নিবেদিতা।

ঝড়ের রাতে প্রাণের প্রদীপে
অন্ধকারের শেষ
ত্যাগে শিক্ষায় বিজ্ঞানে প্রেমে
জাগালে নূতন দেশ।
শিখাময়ী আজ তোমার আরতি
কর্মপ্রবাহে শান্ত মুরতি
শিল্পকলার পাগল-প্রেমিকা
মুক্তির গানে সুরভিতা
নিবেদিতা, নিবেদিতা।

দীপান্বিতা

চণ্ডী সেনগুপ্ত

মনের আলোয় সাজিয়ে দিলাম দীপান্বিতা
এলোকেশী শ্মশানবাসী হও মা প্রীতা।
খড়্গ তোমার রাতের তামস ছিন্ন করুক,
করাল হাসি আশীর্বাদের মতো ঝরুক।
হিংসা অসুর বধ করো মা, মুণ্ডমালায়
সাজিয়ে নিয়ে বিবসনা পর গলায়।
শান্ত কর তোমার খ্যাপা প্রেত-প্রেতিনী,
ভয়ঙ্করী হও মা এবার ভয়হারিণী॥

উজাড় করে চরণতলে মনের কালি
রক্তজবার সাথে মাগো দিলেম ডালি॥

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
সম্পাদক, উদ্বোধন

চলচ্চিত্র 'বিবেকানন্দ' : তথ্যবিকৃতি ও রুচিহীনতা

সাম্প্রতি শ্রী জি. ভি. আয়ার প্রযোজিত 'বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্রটি নিউ দিল্লীর 'সিরি কোর্ট অডিটোরিয়াম'-এ দেখানো হয় এবং আমাদের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ভক্ত সেটি দেখেন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, ছবিটিতে সত্য ও তথ্যকে বিকৃত করে অনেক দৃশ্য ও ঘটনাবলী দেখানো হয়েছে, যাতে ভারতবাসী—যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দকে জাতির জাগরণকারী হিসাবে শ্রদ্ধা করেন তাঁদের অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁরা পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের জীবন্ত বিগ্রহরূপে মানুষকে উন্নততর চারিত্রিক ও ব্যবহারিক স্তরে উন্নীত করেছেন, চলচ্চিত্রনির্মাতারা এখানে ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দিব্যচরিত্রকে অযথার্থভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমরা জনসাধারণকে জানাতে চাই যে, উক্ত ছবিটির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন কোনভাবেই জড়িত নয় এবং আমরা জনসাধারণের কাছে এই ছবিটির অনুমোদন করতে পারছি না। দেশের মহাপুরুষদের চরিত্র বিকৃত করাটা কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে অবসর বিনোদনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই ছবিটি তার ব্যতিক্রম নয়।

স্বামী আত্মস্থানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

'উদ্বোধন' শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রধান পত্রিকা। সেজন্যই 'উদ্বোধন'-এর জনপ্রিয় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি দিল্লীর 'সিরি কোর্ট অডিটোরিয়াম'-এ প্রদর্শিত (১৩ই আগস্ট ১৯৯৬) চলচ্চিত্র উৎসবে 'বিবেকানন্দ—পার্ট ওয়ান' চলচ্চিত্রের কয়েকটি মর্মান্তিক ভ্রান্তির প্রতি।

১) কেশবচন্দ্র সেনের সভা পণ্ড করেছেন বিবেকানন্দ। এ তথ্যের উৎস কোথায়? ২) শ্রীমায়ের প্রতি হৃদয়ের লালসাপূর্ণ দৃষ্টিকে ভর্ৎসনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এর চেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও সংবাদ আর কী হতে পারে? ৩) শ্রীমাকে দেখানো হয়েছে—সর্বসমক্ষে প্রায়ই তিনি ঠাকুরের কাছে আসছেন। এর ঔচিত্য এবং সভ্যতা কতখানি? ৪) অসুস্থ মায়ের আহ্বানে ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ঠাকুর চলেছেন মাতৃ-সন্দর্শনে। সঙ্গে রয়েছেন নরেন্দ্র! ঠাকুরের মাতৃদেবী দেহরক্ষা করেন ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আর নরেন্দ্র আসেন ঠাকুরের কাছে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। ৫) উত্তর-পশ্চিম ভারতে বালুর রাজ্যে ভ্রমণকালে তৃষ্ণার্ত বিবেকানন্দকে জলদান করেছিলেন এক মহিলা। শুধু তাই নয়, রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি তাঁর 'ওড়না' বিবেকানন্দকে দিয়েছিলেন। সেই ওড়না মাথায় বেঁধে বিবেকানন্দ বললেন, এটি শিরোভূষণরূপে সদাই তিনি বহন করবেন। এ কী বিস্ময়কর গবেষণা! ৬) চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে হাতরাসের স্টেশন-মাস্টার পরম পূজ্য শরৎচন্দ্র গুপ্তকে একটি 'কমিক' চরিত্ররূপে দেখানো হয়েছে। ৭) ঠাকুর এই চলচ্চিত্রে বিবেকানন্দের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করে চৈতন্য জাগ্রত করেছেন!

ইতিপূর্বে ঠাকুরের চরিত্রে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় চলচ্চিত্রে দেখেছি। গুরুদাসের অভিনয়ও দেখেছি। তার পাশে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় দানা বাঁধেনি। যদিও শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব-চরিত্রের পুরস্কার তিনি এজন্য পেয়েছেন!

এই চলচ্চিত্রে তিনটি রুচিহীন নৃত্য পরিবেশন করা হয়েছে। এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য বা স্ক্রিপ্ট কি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পুরোধা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেয়েছে? এই চলচ্চিত্রটি সর্বসাধারণের জন্য প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হওয়ার পূর্বেই এতে যে ভয়ানক তথ্যবিকৃতি ও চূড়ান্ত রুচিহীনতা প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগিবৃন্দ ও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে এই পত্র লিখছি।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী
ময়ূরবিহার, দিল্লী-১১০০৯১

প্রসঙ্গ : উদ্বোধন

আমি জনপ্রিয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার একজন আন্তর্দেশীয় গ্রাহক। ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে থাকি, 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে আমি যেন আমার দেশের সান্নিধ্য অনুভব করি। তাই 'উদ্বোধন' পত্রিকা আসতে দেরি হলে অস্থির হয়ে যাই। এখানে ডাকঘরে খোঁজ নিই। এখানকার ডাকঘরে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছে অনুরোধ, যাতে কলকাতার ডাকবিভাগের তৎপরতা বিষয়ে তিনি যেন অনুসন্ধান করেন। পত্রিকাটির জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করি বলেই এই অনুরোধ।

ডঃ উৎপল দে
গ্রেট নর্থ রোড, ওয়াটারভিউ, অকল্যান্ড, নিউজীল্যান্ড

রসন আলী খাঁ-এর 'মায়ের কথা' (ভাদ্র ১৪০৩) খুব ভাল লাগল। ৯১ বছরের এক বৃদ্ধের বাল্যকালের স্মৃতিচারণে স্থানীয় মুসলমান সমাজের মানুষদের প্রতি তখনকার দিনের হিন্দুদের জাতি-সংস্কারের কঠোরতা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমায়ের কত

দরদ এবং উদার মনোভাব ছিল এবং স্থানীয় দরিদ্র মুসলমানরাও শ্রীশ্রীমাকে কত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন তার একটা প্রামাণ্য বিবরণ এতে পাওয়া যায়। পূজারতা (অথবা যোগারাঢ়া ?) শ্রীশ্রীমায়ের একদিনের এক বিশেষ দুর্লভ দৃশ্যের কথাও এতে উল্লেখ আছে, যা রসন আলী খাঁ তাঁর মফেতি-চাচার মুখে শুনেছিলেন। এরূপ ঘটনা বা দৃশ্যের উল্লেখ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীগ্রন্থগুলিতেও বোধহয় কোথাও নেই।

সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা
সেক্টর ১, সল্ট লেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০২ সংখ্যায় সন্দীপন বিশ্বাসের লেখা 'অন্য নেতাজী' পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। নেতাজীর প্রাক্‌জন্মশতবর্ষে স্বামীজী প্রবর্তিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামীজীর ভাবশিষ্য নেতাজী সম্পর্কে এই ধরনের গবেষণামূলক লেখা আমাদের মনে নেতাজী সম্বন্ধে নতুন করে জানার আগ্রহ জাগিয়েছে। নেতাজী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা আজীবন গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—এরকম একটি সাধারণ ধারণা অনেকের রয়েছে, কিন্তু সেই প্রভাব এবং শ্রদ্ধার গভীরতা কতখানি সেবিষয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্মের একটি বড় অংশ দ্রুত অবক্ষয়ের মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর মতো মানুষের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব বিষয়টির তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আজ খুব বেশি। আমার বিনীত অনুরোধ, 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় নেতাজী এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য মহান জাতীয় নেতাদের জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব বিষয়ে এই ধরনের আলোচনা আরও বেশি করে প্রকাশিত হোক। আমার মনে হয়, বর্তমান যুবসমাজকে তাতে ঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আর. ডি. এস. ও. কলোনী
লখনৌ-২২৬০১১, উত্তরপ্রদেশ

প্রসঙ্গ ঃ দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভ

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৩ সংখ্যায় শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর লেখা 'দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভ অবহেলিত' পড়ে খুব দুঃখ হলো। সেই বিদেশিনী মহীয়সী নারী গুরু স্বামীজীর জন্মভূমি ভারতবর্ষের সেবার জন্য নিজের দেশ, আত্মীয়-পরিজন সবকিছু বিসর্জন দিয়ে, ভারতবর্ষকে ভালবেসে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং মনে প্রাণে ভারতবাসী হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে সেই মহীয়সী নারীর স্মৃতিস্তম্ভটি আজ অবহেলিত—এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কী হতে পারে ? তাঁর কথা মনে হলে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্লেগের সময় তাঁর নিঃশঙ্ক চিত্তে ঝাড়ুহাতে রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার করার দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। এদেশের মেয়েদের পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই বা ঘর-গৃহস্থালী সুন্দর করে গুছিয়ে রাখার শিক্ষা (আজকের পরিভাষায় যাকে আমরা বলি 'ইন্টেরিয়র ডেকরেশন'), মৌলিকতার বিকাশ, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি ছিল তাঁর শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। আবার দেশের মুক্তিপ্রয়াসী বিপ্লবীদের সহায়তা করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতেই হবে—এই তাঁর পণ ছিল। নিজের ধর্মে আস্থাশীল থেকেও তিনি ভারতের সনাতন ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে। নিজেকে 'হিন্দু' বলে, 'ভারতীয়' বলে পরিচয় দিতে তিনি গর্বিতা হতেন। ভারতের জন্য সম্পূর্ণভাবে 'নিবেদিতা', শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি' এবং সমস্ত ভারতবাসীর 'ভগিনী' সেই মহীয়সী ভারতপ্রাণা বিদেশিনীর পবিত্র স্মৃতির প্রতি কী নিদারুণ অনাদর, অবহেলা ও উপেক্ষা আমরা করে চলেছি ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

এব্যাপারে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন অবিলম্বে ভগিনীর স্মৃতিস্তম্ভটি সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর দেশ ও বিদেশের অগণিত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ প্রত্যেকের সাধ্যমত এই মহান কর্মে সংযুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন বলে আমার ধারণা। আলোচ্য চিঠিখানি প্রকাশ করে 'উদ্বোধন' আমাদের সবাইকে এবিষয়ে সচেতন করেছেন বলে 'উদ্বোধন'কে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, আমাদের সকলের আন্তরিক প্রয়াসে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটি যথোচিত মর্যাদা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে রক্ষিত হবে। Black grain stone বা Green grain stone দিয়ে এটি পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে। এইসঙ্গে সেখানে যাওয়ার রাস্তাঘাটের সংস্কার করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনেকেই দার্জিলিঙে বেড়াতে যান। যাঁরা ভবিষ্যতে যাবেন তাঁদের সকলের কাছে প্রত্যাশা যে, আপনারা অবশ্যই ভগিনীর স্মৃতিস্তম্ভটি দর্শন করে শ্রদ্ধা জানাতে ভুলবেন না। এই মহীয়সী নারীর সমাধিক্ষেত্রটিতে ফুল দিয়ে প্রণাম জানিয়ে আসবেন। মন্দিরে যেমন 'দর্শনী' দেওয়ার প্রথা আছে, তেমনি ওখানেও যদি তার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ঐ অর্থ দ্বারা স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা সহজ হবে বলে মনে করি।

লীনা সরকার
সফদরজঙ্গ এনক্লেভ, নিউ দিল্লী, পিন-১১০০২৯

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পত্রে দার্জিলিঙে ভারতবাসীর প্রিয় ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় আছে জেনে খুবই মর্মবেদনা বোধ করছি। আমার মনে হয়, 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের সকলেরই তাই বোধ হবে। এর সংস্কার-সাধনে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসেন তাহলে দেশবাসী খুবই কৃতজ্ঞ থাকবে। ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার গলফ্ গ্রীনের নিবেদিতা ব্রতী সংঘ বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁদের ঠিকানা আমার জানা নেই। তাই 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগের মাধ্যমে তাঁদের নিকট আবেদন করছি, তাঁরা যেন দার্জিলিঙে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিস্তম্ভটির সংস্কারাদির জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রনজিৎকুমার দত্ত
গোরা লাইন, লাইটাম খাড়া,
শিলং-৭৯৩০০৩, মেঘালয়

প্রসঙ্গ ঃ স্বামী অভেদানন্দকে শ্রীশ্রীমায়ের জপের মালা দান

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা'য় লিখেছেন ঃ "শ্রীমা... (১২৯৫ সালের কার্ত্তিক মাসে) বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে ছয় মাস বাস করিয়াছিলেন।... সেই সময়ে আমি বরাহনগর মঠে গিয়া তপস্যা করিতেছিলাম।... আমি তখন অবসর সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার স্তোত্র রচনা করি। শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া ঐ সময়েই আমি শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' সেই সময়ে আমি শ্রীমার হস্ত হইতে জপের মালাও (রুদ্রাক্ষের) পাইয়াছিলাম।" (১৯৬৪ সং, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, পৃঃ ১৩২-১৩৩)

পূজনীয় ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তাঁর 'শ্রীশ্রী সারদা দেবী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "বৃন্দাবনে যোগীন মহারাজের দীক্ষার পরেই মার কাছে উপস্থিত হইয়া শ্রীকালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) মন্ত্রপ্রার্থী হন, আর 'ঠাকুর তোমাকে কিছু দিয়ে যাননি?'—মার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'ঠাকুর আমার জিভে কিছু লিখে দিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন, কিন্তু কী লিখেছিলেন জানি না; আমার যাকিছু অনুভূতি হয়েছে সবই ধ্যান করে হয়েছে।' মা তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র দান করেন।" (১৩৮৫ সং, কলিকাতা, পৃঃ ১১৮-১১৯ ঃ পাদটীকা)। অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ তাঁর আত্মজীবনী 'জীবন-পরিক্রমা' গ্রন্থে লিখেছেন, ১৩৪৫ সালে রেঙ্গুনে স্বামী অভেদানন্দের শিষ্য ভুবন মহারাজের (ব্রহ্মচারী হরচৈতন্যের) কাছে তিনি ঐ তথ্য পেয়েছেন। (১৩৮২ সং, শ্রীসারদা মন্দির, খড়দহ, পৃঃ ৯৫)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে আমার মন্ত্রদীক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসারও সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যদিও আমার বয়স তখন অল্প ছিল। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে দার্জিলিঙে স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বাঙালী স্কুলে আমি প্রথমে শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক ছিলাম। মোট পাঁচ বছর ঐ স্কুলে আমি ছিলাম। তখন কার্শিয়াঙে ছিলেন ভুবন মহারাজ। তখন তাঁর নাম স্বামী দিব্যানন্দ। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের আগেই তাঁর সন্ন্যাস হয় আমার গুরুদেব অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দের কাছে। কাজেই ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তিনি 'ব্রহ্মচারী হরচৈতন্য' ছিলেন। তাহলে ১৩৪৫ সালে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে ভুবন মহারাজ 'ব্রহ্মচারী হরচৈতন্য' থাকেন কি করে? তাছাড়া ১৯৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ স্থূলদেহে বিদ্যমান। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। আমার প্রশ্ন—শ্রীশ্রীমায়ের কাছে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্ত্রদীক্ষালাভের ঘটনা ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য মহারাজ কেন ভুবন মহারাজের কাছে শোনা কথাকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন, যেখানে স্বয়ং স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তখন স্থূলদেহে আছেন? তথ্যটি সত্য কিনা সেবিষয়ে কেন তিনি পূজ্যপাদ মহারাজজীকে জিজ্ঞাসা করলেন না? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ভুবন মহারাজ পরে মধুপুরের স্বামী হরিহরানন্দজীর (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'পাতঞ্জল যোগদর্শন' গ্রন্থের সম্পাদক) অনুরক্ত হন এবং গুরুত্যাগ করেন গুরু অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ জীবিত থাকতেই।

দার্জিলিঙে থাকার সময় ভুবন মহারাজকে লেখা পূজ্যপাদ মহারাজের দুটি চিঠি পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে আমি পাই। একখানা সম্পূর্ণ, অন্যটি কিছুটা ছেঁড়া। সম্পূর্ণ চিঠিটি বেলুড় মঠকে আমার দেওয়া পূজ্যপাদ মহারাজের ৩৪খানি মূল (original) চিঠির অন্যতম। ছেঁড়া চিঠিটির কিয়দংশ এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

"এত ভূমিকম্পে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রমের কোন ক্ষতি হয় নাই—ইহা দেখিয়াও তাঁহার মহিমা ধারণা করিতে পারিস না এবং ভয়ে কাতর হইয়া 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আশ্রম বিড়ম্বনা' ইত্যাদি অবিশ্বাসীর মতো লিখিয়াছিস। তোর চঞ্চল মনের অবস্থা আমি খুব বুঝি। তোর একটু পাগলামির ছিট আছে। সেটুকু তোর মায়ের নিকট হইতে inherit করিয়াছিস জানবি। সেই কারণে তোর মনে অন্যত্র যাইবার ঢেউ ও একান্তে বসিয়া কুঁড়েমি করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা প্রবল হয়। এবং তোর কল্যাণের জন্যই ও মন স্থির করিবার জন্যই আমি [তোকে] অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিয়া থাকি জানবি।"

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পূজ্যপাদ মহারাজের জপমালা প্রাপ্তি ও মন্ত্রগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য স্বয়ং মহারাজের মুখে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাইরা শুনেছিলেন। তাঁদের কাছে আমি বহুবার সেকথা শুনেছি। সৌভাগ্যবশতঃ তা পূজ্যপাদ মহারাজের অন্যতম শিষ্য স্বামী চিৎস্বরূপানন্দের লেখা 'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত আছে ঃ

"[প্রশ্ন] মা কি আপনার সঙ্গে কথা কইতেন?

মহারাজ [স্বামী অভেদানন্দ]। হ্যাঁ। কথা কইতেন বৈকি। কত কথা কয়েছেন।... ঠাকুরের দেহান্তে স্তব ['প্রকৃতিং পরমাং...' রচনা] করে তাঁর কাছে পড়েছি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন। তিনি মালা দিয়েছিলেন। সেই মালা তো এখনো রয়েছে।...

রাসবিহারী মহারাজ [স্বামী অরূপানন্দ]। তিনি [মা] গেরুয়া দিতেন আর বোধহয় কি লিখে দিতেন।...

মহারাজ। মা গেরুয়া দিয়ে বলে দিতেন, রাখাল কি শরতের কাছে বিরজা করে নাও। তিনি কি মন্ত্র দিতেন আমি জানি—কালী-মন্ত্র। আমি তো তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলুম। ঠাকুর জিভে মন্ত্র লিখে দিয়েছিলেন। পরে মার কাছে সেটা confirm করে নিয়েছিলুম। ঠাকুরই আমার গুরু রইলেন। পরে ঠাকুরের পাদুকা সামনে রেখে বিরজা করলুম।" (১ম সং, ১৩৯৩, সোদপুর, পৃঃ ১০৬-১১০)

ঐ গ্রন্থের ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ৯ই জানুয়ারি (১৯৩৭) বলছেন ঃ "পঞ্চাশ বছর আগে মায়ের স্তব লিখি। তখন বেলুড় মঠ হয়নি। লিখে তাঁকে শোনাই। তখনই তিনি আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন—'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' আমি তাই কিছু বলবার আগে তাঁকেই স্মরণ করি।"

অভেদানন্দ মহারাজের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামী যোগানন্দ মহারাজ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মহারাজ এবং শ্রীম [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত] যেভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন ঠিক সেভাবে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পাননি। প্রথম তিনজন ঠাকুরের শিষ্য হলেও শ্রীশ্রীমায়ের 'মন্ত্রশিষ্য' ছিলেন, আর স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের কাছেই মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন—তবে তা 'confirm' করিয়েছেন মায়ের কাছে। দুই-একটি গ্রন্থে মূল ঘটনাটি বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আশা করি প্রকৃত ঘটনা কী হয়েছিল তা এখন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

নারায়ণচন্দ্র গুহরায়
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী আশ্রম
পোঃ সেবায়তন, ঝাড়গ্রাম
জেলা—মেদিনীপুর, পিন-৭২১৫১৪

অরুণাচল প্রদেশে 'উদ্বোধন'-এর ক্ত-কেন্দ্র

কবে 'উদ্বোধন' হাতে পাব—এই প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে আমরা দিন গুনি। পত্রিকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন গোগ্রাসে গিলতে থাকি। খুব তাড়াতাড়ি একটা সংখ্যা পড়া শেষ হয়ে যায়। আবার প্রতীক্ষা পরবর্তী সংখ্যার জন্য—এ ক মা স! কিন্তু এই প্রতীক্ষাতেও মজা আছে—আনন্দ আছে। 'উদ্বোধন'-সম্পাদক আমাদের স্টাডি সার্কেলকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র হিসেবে অনুমতি দিয়ে ইটানগরবাসী বাঙালীদের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

আমরা কর্মসূত্রে ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশে বাস করছি। অবশ্য আমরা যেখানে রয়েছি, সেটা অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী—ইটানগর। এখানে যে স্বল্প-সংখ্যক বাঙালী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে যোগসূত্র এখানকার কালীবাড়ি এবং রামকৃষ্ণ মিশন। কিছুদিন আগে কালীবাড়ির শাখাকেন্দ্র হিসেবে এখানে বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল গড়ে উঠেছে। নিয়মিত অধিবেশন ভিন্ন ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জন্মোৎসব এখানে সুচারুভাবে আয়োজিত হয়। সম্প্রতি স্টাডি সার্কেলের পক্ষ থেকে আমরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তির ব্যবস্থা এখানে করেছি এবং স্থানীয় বাঙালীদের কাছে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছি। এই প্রত্যন্ত প্রদেশে থেকে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কথা প্রতি মাসে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে আমরা এখন পাচ্ছি। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত বাঙলা পত্রিকা 'উদ্বোধন' ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবকে কত সহজভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে! শুধু অধ্যাত্মপিপাসু পাঠকরাই নন, এখানকার সবরকম পাঠকই 'উদ্বোধন'-এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করছেন। নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মহানন্দে নিত্যজীবনের সঙ্গে, নিত্যানন্দময় আদর্শের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে 'উদ্বোধন'।

এই অসামান্য পত্রিকার বিশেষ কোন বিভাগের উল্লেখ করে অন্য কোন বিভাগকে ছোট করব না, কারণ প্রত্যেকটি বিভাগই তার নিজস্ব আকর্ষণে তুলনাহীন। বাস্তবিক, 'উদ্বোধন' তার 'উদ্বোধক'-এর ভূমিকা খুব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে চলেছে। 'উদ্বোধন'-এর পূজনীয় সম্পাদক মহারাজের অনুপ্রেরণায় এই সুদূর অরুণাচল প্রদেশে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা আজ ক্রমবর্ধমান।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল—'উদ্বোধন' পৌঁছে যাক প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে। স্বামীজীর সেই স্বপ্নের কথা 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে আমরা জেনেছি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য অরুণাচল প্রদেশের রাজধানীতে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর।

শ্যামল সিনহা রায়
সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল
নাহারলগন, ইটানগর, অরুণাচল প্রদেশ

বিশেষ রচনা |

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪০৩ সংখ্যার পর]

রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে সংগঠিত সন্ন্যাসি-সংঘের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কয়েকটি গোষ্ঠীর কিছু বিরূপ সমালোচনার সারাংশ স্মরণ করা যেতে পারে। তাদের অভিযোগ—সন্ন্যাসিগণ আত্মকেন্দ্রিক, সমাজ সম্বন্ধে তাঁরা শুধু উদাসীন নন, সামাজিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও তাঁদের রয়েছে উপেক্ষার ভাব। সমালোচকগণ বলেন, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের উদার বিশ্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বহুজনসমাদৃত হলেও এই আন্দোলনের শিকড় হিন্দু ঐতিহ্যে প্রোথিত এবং হিন্দু শাস্ত্রাদি থেকেই এই আন্দোলন প্রাণরস আহরণ করেছে। সে-কারণে এই নবীন প্রাণবন্ত আন্দোলনটি ঐ ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। জনৈক খ্রীস্টান পণ্ডিতের ভাষায় ঃ "Whatever may be said in neo-Hindu literature regarding the legitimate place of social norms and responsibilities within the traditional Hindu ethos, the controlling stress has fallen on the need and methods of individual spiritual programmes. And whatever may be seen in the Ramakrishna-Vivekananda movement to indicate a greater awareness of social welfare as a legitimate part of Hindu aspirations, there is also evidence that the higher councils of the movement have sought to assure the pre-eminence of individual spiritual nurture in the movement's work."[১৮] আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ভাবনার দ্বারা অনুরঞ্জিত এই অভিযোগ। অবশ্য একদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এই অভিযোগের মধ্যে নিহিত রয়েছে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য। সমালোচকগণের এটা ধারণার বাইরে যে, সন্ন্যাসি-সংঘে ব্যক্তিগত নিঃশ্রেয়স মুক্তির প্রচেষ্টা বা নারায়ণ-জ্ঞানে অপর মানুষের সেবা—এসবকিছুই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের অভিমুখীন। বিবেকানন্দ-অনুসারী সন্ন্যাসিগণের দৃষ্টিতে ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেই সীমিত থাকতে পারে না। তাঁদের সামগ্রিক ও স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করছে তাঁদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিপুষ্টির ওপর। এবিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করা যাবে পরবর্তী কোন পর্যায়ে।

উপরি উক্ত পটভূমিকায় আলমবাজারে অবস্থানকালীন মঠের ইতিবৃত্ত আমরা কালানুক্রমিক তিনটি পর্যায়ে দেখবার চেষ্টা করব। মঠ আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগে। সেসময় থেকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত প্রথম পর্যায়। এপ্রিলের শেষে মঠবাসিগণ আমেরিকা থেকে দলপতি নরেন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চিঠি পেয়েছিলেন। এসময়ে তাঁদের প্রিয় নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মঠবাসিগণ কেউ কিছু জানতেন না—এধরনের ভাবনা নিছক কল্পনাপ্রসূত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাতজন শিষ্য—তাঁদের অন্যতম নরেন্দ্রনাথ—মীরাটে এক শেঠজীর বাগানে মিলিত হয়েছিলেন। কয়েকদিন পর (১৮৯১-এর জানুয়ারির শেষভাগে) নরেন্দ্রনাথ অন্যান্য গুরুভাইদের বলেন ঃ "আমার জীবনব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি একাকী থাকব। তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর।" গুরুভাইদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করে তিনি বেরিয়ে পড়েন। নিজের গতিবিধি অপরের নিকট অজ্ঞাত রাখবার জন্য তিনি কয়েকবার নাম পরিবর্তন করেন। তবুও পরিক্রমাকালে গুরুভাইদের কারো কারো সঙ্গে তাঁর আকস্মিকভাবে দেখা হয়। তিনি নিজেও কদাচিৎ মঠের ঠিকানাতে কোন কোন গুরুভাইকে চিঠি লিখেছেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। স্বামী সারদানন্দ ২৬ অক্টোবর ১৮৯২ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে লেখেন ঃ "স্বামী নরেন্দ্রনাথের সংবাদ কিছুদিন পূর্বে পাইয়াছি। বোম্বাই হইতে পত্র লিখেন।... সেখান হইতে কোথায় যাত্রা করিবেন। কোথায় যাইবেন তাহা কিছু লিখেন নাই।"

১৮ A Neo-Hindu Ashram in South India—Gerald B. Cooke, 1966, p. 47

আবার দেখা যায় স্বামী শিবানন্দ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ তারিখে প্রমদাবাবুকে লিখেছেন : "শুনিয়াছিলাম নরেন্দ্রনাথ রামেশ্বর গিয়াছেন।" স্বামী অদ্ভুতানন্দকে বলতে শোনা গিয়েছিল : "হামনে ত মায়ের মুখে জানতে পারি যে, লোরেন ভাই ওদেশে গেছে। লোরেন ভায়ের খবর শুনবার জন্য হামার মন কেমন করতো!" স্বামীজী ছিলেন মঠবাসীদের প্রত্যেকের প্রিয়, মঠে তাঁর অনুপস্থিতি সবাই অনুভব করতেন, তাঁর সম্বন্ধে কেউ কোন খবর জানতে পারলেই সেখবর সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। মঠবাসিগণ জানতেন, তাঁদের নরেন্দ্র মিছেমিছি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী পরিভ্রমণ করছেন না। তবে তাঁদের কেউ কেউ বুঝতেন না যে, নরেন্দ্র তাঁদের সঙ্গ এড়াবার জন্য এত ব্যগ্র কেন? নরেন্দ্রনাথ বলতেন : "গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ-মায়ার পাঁকে পড়লে কার্যসাধনে বহু বিঘ্ন ঘটবে।" যদিও তিনি মীরাট ত্যাগ করার আগে উপস্থিত গুরুভাইদের এবং অন্য সময়েও কোন কোন ব্যক্তিকে বলেছিলেন বা লিখেছিলেন : "তাঁকে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।" তবে সেই জীবনব্রতটি কি সেটা তাঁরা বুঝতে পারেননি। অবশ্য তাঁর ওপর গুরুভাইদের ছিল গভীর আস্থা। তাঁদের কারো কারো ধারণা হয়েছিল যে, নিশ্চিত কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্যই নরেন্দ্রনাথ হন্যে হয়ে ঘুরছেন।

যাহোক, স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী প্রমুখদের অনুপস্থিতিতে মঠ পরিচালনার দায়দায়িত্ব স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তদানীন্তন মঠজীবনের একটি বিবরণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের (পরে স্বামী বোধানন্দ) লেখা থেকে। তাঁর বর্ণনা : "[শশী মহারাজ] মঠের সমস্ত কার্য একাই করিতেন। রাঁধিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ ছিল, তবুও তিনি অনেক সময় নিজে কোন কোন তরকারি রাঁধিতেন। সমস্ত কার্যগুলি ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবে হইত। ঠাকুরঘর খোলা, প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, বৈকাল ও সন্ধ্যায় সেবা প্রভৃতি যথাসময়ে সম্পন্ন করিতেন। ঠাকুরঘর দর্শন করিলে মহাপাষণ্ডেরও মনে ভক্তির উদয় হইত। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের দিন বৈকালে ও রাত্রে একখানি বড় তালপাতার পাখা লইয়া ঠাকুরের শয্যার ওপর দুই-তিন ঘণ্টা অবিশ্রাম বাতাস করিতেন। শশী মহারাজের সেবা দেখিলে মনে হইত, ঠাকুর যেন সশরীরে সর্বদাই তাঁহার সমক্ষে বিরাজমান হইয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেছেন।... তিনি এমন উদ্যমশীল দক্ষ ও স্বাধীন লোক ছিলেন যে, কাহারও সাহায্যের আশা বা অপেক্ষা করিতেন না। এমনকি প্রয়োজন হইলে অন্য স্বামীদের সশ্রদ্ধভাবে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। তিনি নিজে কিন্তু তামাক সেবন করিতেন না।"[৯৯] অবশ্য যুবক ভক্তদের বা নবাগত ব্রহ্মচারীদের তিনি কাজকর্ম শিখিয়ে নিয়ে তাদের কিছু কিছু কাজকর্ম ভাগ করে দিতেন। ব্যবস্থাপক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা নবাগত ব্রহ্মচারীদের কাছে ছিল আদর্শস্বরূপ। প্রবীণদের মধ্যে তাঁকে সাহায্য করতেন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ[১০০] প্রমুখ। প্রথম দিকে স্বামী সারদানন্দ বেশ কিছুকাল ভুগেছিলেন। সেসময়ে তিনি মঠের জন্য বেশি কায়িক পরিশ্রম করতে পারতেন না। অক্লান্ত পরিশ্রমী স্বামী নির্মলানন্দ দোতলার পায়খানার জন্য জল তুলতেন, রান্নাঘরে রুটি সেঁকতেন, কখনো-বা বাজার করতেন, আবশ্যক হলে ঘরদোর ঝাঁট দিতেন।[১০১] অন্যান্যরা পুকুরঘাটে গিয়ে বাসন মাজতেন, কাপড় কাচতেন, ঘরদোর, বারান্দা ও উঠান ঝাঁট দিতেন। ভারী গঙ্গা থেকে ঠাকুরঘরে ব্যবহারের জন্য ও রান্নার জন্য জল তুলে দিত। সকলেই স্নানের জন্য যেতেন দু ফার্লং দূরে গঙ্গার ঘাটে।

নির্জনে গোপনে সাধনভজন করাই ছিল মঠবাসিগণের রেওয়াজ। জীবদ্দশাতেই ভগবানলাভ করতে হবে—এই সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা মঠে বা বিপিনে বা নদীতটে বা তীর্থস্থানে অশন-ভূষণে কঠোরতা করে মনপ্রাণ ঢেলে

৯৯ উদ্বোধন, ৫২তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, পৃঃ ৫৭৫

১০০ নরেন্দ্র, কালী, শশী, রাখাল প্রমুখের বিরজা হোম করে সন্ন্যাস গ্রহণের কয়েকদিন পর তুলসী বরানগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম হয়েছিল স্বামী নির্মলানন্দ (দ্রঃ স্বামী নির্মলানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৯)। গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ সংখ্যায় স্বামী নির্মলানন্দকে 'নবাগত' বলা হয়েছিল। তিনি নবাগত ছিলেন না।

১০১ দ্রঃ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২; শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, পৃঃ ৯৪-৯৫।

তপস্যা করছিলেন। মঠের সকলেই প্রাতে, স্নানের পর ও সন্ধ্যারতির পর তো বটেই, গভীর রাত্রেও জপধ্যান করতেন। অধিকাংশ মঠবাসীই কিছুটা সময় দিতেন স্বাধ্যায়ের জন্য। নিকটেই দক্ষিণেশ্বরের তপোবন, তখন ধর্মপিপাসু কিছু সংখ্যক মানুষ ভিন্ন জনসাধারণ সেখানে ভিড় করত না। তাপসদের কেউ কেউ পঞ্চবটীমূলে, কেউ বা বেলতলায় বা অন্য নির্জন স্থানে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে আসতেন। আবার কেউ বা গ্রাম থেকে ভিক্ষা-করা সিধা একটি মালসায় ফুটিয়ে দিনান্তে একবার মাত্র আহার করতেন।[১০২] ঐটুকু সময় ভিন্ন তাঁরা সারাদিন জপধ্যানেই কাটাতেন।

তদানীন্তনকালে মঠবাসিগণ মনে করতেন, লেকচার দেওয়া একটা "মহা ঘৃণার কাজ"।[১০৩] ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গুডফ্রাইডের দিন প্রবীণ ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত স্টার থিয়েটারে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা' বিষয়ে বক্তৃতা দিলে মঠের সন্ন্যাসিগণ খুবই বিরক্ত হন। উপরন্তু রামবাবু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জনসমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলে প্রচার করাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অবশ্য তাঁদের এসব মতামত অগ্রাহ্য করেই রামচন্দ্র দত্ত ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭-এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আঠারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

মঠে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, শাস্ত্রবিচার ইত্যাদির বেশ কদর ছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অবসর সময় ছিল সামান্যই। সেসময়টুকু তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে নিযুক্ত থাকতেন। গণিতের চর্চা ছিল তাঁর অবসরবিনোদনের একটি উপায়। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের ছিল গ্রন্থপাঠে গভীর অনুরাগ। প্রথমজনের স্মৃতিকথাতে পাই ঃ "অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনা ও বিচার এবং তাহার আদর্শে জীবন গঠন করাই ছিল তখন আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। শাঙ্করভাষ্যসহ গীতা পাঠ করিতাম এবং গীতার প্রতিটি শ্লোকের যথার্থ অর্থ বা মর্ম যতক্ষণ না বুঝিতাম, ততক্ষণ ধ্যান করিতাম এবং অর্থ উপলব্ধি করিলে আবার পরবর্তী শ্লোক পাঠ ও ধ্যান করিতাম। একমাত্র আহারের সময়ই বাহিরে আসিতাম, নচেৎ দিবারাত্র হয় শাস্ত্রাদি পাঠ ও বিচার করিতাম, নয় ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতাম। কোথা দিয়া সময় চলিয়া যাইত বুঝিতে পারিতাম না। মাঝে মাঝে গুরুভ্রাতৃগণের সহিত শাস্ত্রাদির বিচার হইত, কিন্তু সর্বদাই সকলের জীবনের লক্ষ্য থাকিত—কিভাবে অলৌকিক আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও নির্দেশমত জীবন গঠন করিব। শ্রীশ্রীঠাকুরই ছিলেন আমাদের সকলের ধ্যান ও জ্ঞান।"[১০৪] গ্রীষ্মকালে রাত্রে দোতলার ছাদের ওপর মাদুর বিছিয়ে অনেকে শুয়ে বা বসে থাকতেন; তাঁরা ঠাকুরের কথা, শাস্ত্রের কথা আলোচনাদি করতেন, কখনো কখনো তাঁরা স্ফূর্তি ও রঙ্গরসে মেতে উঠতেন। কখনো-বা দুটো ভজন গান গাইতেন।

মঠের অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল আদর্শস্থানীয়। একজনের বিবরণ ঃ "আলমবাজার মঠে পরস্পরের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধার ভাব ছিল! ঘরের ভিতর কেহ পড়িতেছেন, কেহ বা জপধ্যান করিতেছেন—পাছে তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয়, এইজন্য অপর সকলে সংযত পদবিক্ষেপে যাতায়াত করিতেন। মোট কথা, প্রত্যেক লোক অপরকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বা অনুরূপ মনে করিতেন এবং সেইভাবে শ্রদ্ধা ও সেবা করিতেন"।[১০৫] মঠবাসীদের উঁচুমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মঠের গোষ্ঠীজীবনের দুর্লভ ঐশ্বর্য ছিল।

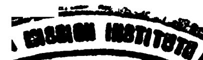
ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের অধিকাংশই ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। দীর্ঘ পর্যটন ও অত্যধিক কৃচ্ছ্রতার জন্য তাঁদের অনেকের স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরেছিল। যেমন, স্বামী যোগানন্দ প্রতিদিন ভিক্ষায় না বেরিয়ে বাসি শুকনো রুটি জলে ভিজিয়ে খেতেন এবং সারাদিন জপধ্যান করতেন। এধরনের কঠোরতার ফলে তিনি চিররুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং শেষে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছিলেন। কাশীতে তপস্যাকালীন স্বামী সারদানন্দ প্রায় ছয়মাস রক্ত-আমাশয়ে ভুগে জীর্ণদেহ নিয়ে বরানগর মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। আলমবাজারে বারংবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ সুস্থদেহে মঠে ফিরলেও কিছুদিনের মধ্যে তাঁর পায়ে গিনিওয়ার্মের ক্ষত দেখা দিলে তাঁর প্রাণসংশয় উপস্থিত হলো। তিনি চারমাস শয্যাগত থাকেন।

১০২ সারদানন্দ চরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৯৫, পৃঃ ৯৩

১০৩ স্বামী বিরজানন্দের খাতা, পৃঃ ২৮

১০৪ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৭৩

১০৫ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান, পৃঃ



এসময়ের মধ্যে সাতবার তাঁর ক্ষতের অস্ত্রোপচার করাতে হয়।[১০৬] ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী স্বামী সদানন্দও কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রতার ফলে ম্যালেরিয়ার শিকার হয়েছিলেন, তাঁর সুঠাম শরীর ভেঙে পড়লে স্বামী সারদানন্দের উপদেশ অনুসারে তিনি পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিনের জন্য চলে যান। স্বামী সচ্চিদানন্দ (দীনু) মনে হয় ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষার প্রারম্ভে পদব্রজে গঙ্গা পরিক্রমা করে আলমবাজার মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।[১০৭] তাঁর বয়স সেসময়ে ষাটের বেশি। স্বামী সারদানন্দের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সচ্চিদানন্দের ত্যাগ, বৈরাগ্য, কঠোরতা নবাগতদের বিশেষ প্রেরণাদায়ক হয়েছিল। এধরনের অত্যধিক কঠোরতা সম্পর্কে জননী শ্রীসারদাদেবীর অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ "মঠে ছেলেরা সব কষ্ট করছে —না খাওয়া, না দাওয়া, না-কিছু। ওসব আমার ভাল লাগে না। যোগীনের (স্বামী যোগানন্দের) কঠোর করে করে শেষটা এত ভুগে শরীর গেল।"[১০৮] স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও কোন কোন প্রবীণ মঠবাসী সাময়িকভাবে হতাশায় ভুগেছেন। এত সাধনভজন করেও আশানুরূপ সাফল্য-লাভ হলো না ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। বলা বাহুল্য, কিছুকাল পরেই তাঁদের নৈরাশ্যের মেঘ কেটে গিয়েছিল।

খাদ্যে অনটন, বসনে অসচ্ছলতা, শয়নে শয্যাদির অভাব, সাধনভজনে আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির অপ্রতুলতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি কর্তৃক উপেক্ষা—এসব কোনকিছুই মঠবাসীদের দমাতে পারেনি। আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া সব চরিত্র —তাঁরাও ছিলেন সদানন্দময়। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বিচ্ছুরিত হতো তাঁদের আচরণে বিচরণে, আশপাশের সকল মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ত। প্রথমেই স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভূতুড়ে বাড়ির কুখ্যাতি অর্জন করে মঠবাড়িটি ভীতি ও রঙ্গরসের একটি প্রেক্ষাপট হয়ে উঠেছিল। নানান রকমের তামাসার ঘটনা মঠবাসীদের আমোদিত করত। দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

বোধকরি ভূতের মানুষ সম্বন্ধে কোন বাছবিচার নেই। যেমন প্রতিবেশীদের, তেমনি মঠবাসীদের ভূত সমানে কৃপা করত! একদিন মঠের অতিথি মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানলার গরাদে ভিজে সাদা কাপড় বেঁধে শুকোতে দিয়েছিলেন। জ্যোৎস্না রাত। পল্লীর অনেকেই দেখতে পেল ভূতের কাণ্ডকারখানা। পরদিন এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী মঠে এসে জানালেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এসব বলে-কয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন সন্ধ্যার মুখে। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) সিঁড়ি দিয়ে তাঁর নামবার সময় লণ্ঠন ধরেছিলেন। মাঝপথে দেখা গেল, তিনি লণ্ঠন নিভিয়ে উধাও। বৃদ্ধ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সিঁড়িতে বসে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল না। প্রাণরক্ষা করতে হবে তো, তাই ভদ্রলোক আর কালক্ষেপ না করে সিঁড়ি দিয়ে কোনক্রমে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলেন।[১০৯]

অপর একদিনের ঘটনা। সেদিন মঠে স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। ভিতরে পশ্চিমের কুঠরিতে পাঁচজন ছিলেন। বাইরে বড় ঘরে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সদানন্দ। গভীর রাত। ছাদের ওপর থেকে গড়্গড় শব্দ শোনা গেল। বিকট শব্দে কয়েকজনের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন ঃ "ওহে, এ যে সেই ভূতের ভাঁটা-খেলার মতো। ও দাদা! ও রামকৃষ্ণানন্দ! বলি, ভাঁটার খেলা দেখাতে আমাদের এখানে আনলে নাকি?" স্বামী প্রেমানন্দ ভয় পেয়ে বলেন ঃ "ও দাদা! ও যোগেন!" সব দেখেশুনে মঠের কোঠারি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উত্তেজিত। তিনি একটা মস্ত লাঠি নিয়ে "তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। 'মার মার' বলতে বলতে দুপদাপ করে একেবারে ছাদে উপস্থিত। দেখেন, একজোড়া ডাম্বেল আর একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন লণ্ঠন। "আরে, ভূত হ্যারিকেন নিয়ে ভাঁটা খেলে নাকি?" একথা বলে তিনি ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়ান। তাঁর সন্দেহ হয়, এসব কোন মঠবাসীর কীর্তি। তিনি স্বামী সারদানন্দের ঘরে

১০৬ স্বামী সারদানন্দের ২৬।১০।১৮৯২ তারিখের চিঠির একাংশ ঃ "অভেদানন্দ ও যোগানন্দ স্বামী এখানে ভাল আছেন।" তাঁর ২৮।২।১৮৯৩ তারিখের চিঠির একাংশ ঃ "অভেদানন্দ এখানে। মধ্যে শরীর বড় খারাপ হইয়াছিল। এখন কতকটা ভাল।"

১০৭ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮

১০৮ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৩৫

১০৯ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৮-২৯

উপস্থিত হতেই বুঝতে পারেন, তাঁর সন্দেহ নির্ভুল। এদিকে অনর্থক ভয় পাওয়ার জন্য স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি অপ্রস্তুত বোধ করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মুখে রহস্য-উদ্ঘাটন পুরোপুরি শুনে মঠবাসিগণ ঐ গভীর রাতে হাসির রোল তোলেন।[১১০] স্বামী বিরজানন্দের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ ঐ বাড়িতে সত্যসত্যই ভূত দেখেছিলেন। যদিও স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঐ বাড়িতে কদাচিৎ বাস করেছেন, কিন্তু যখনই সেখানে থেকেছেন তিনি তাঁর শোওয়ার ঘরে সারারাত একটি হ্যারিকেন জ্বেলে রাখতেন।

আরও একটি ঘটনা। একদিন সন্ধ্যার মুখে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত মঠবাড়ির সদর দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলেন, উদ্দেশ্য—বাইরে একটু বেড়িয়ে আসবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ান, মঠবাড়ির ভিতরে আবার ঢোকেন। বিস্মিত মহেন্দ্রনাথ তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ফিরে এসে তাঁকে বলেন যে, একজন ব্যক্তি যেন বাড়ির ভিতর ঢুকেছে। তিনি মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি কি দেখনি যে, কে একজন বাড়ির ভিতর গেল?" মহেন্দ্রনাথ বাড়ির ভিতরে গিয়ে চারদিক খুঁজে কাউকে দেখতে পেলেন না। তাঁদের ধারণা হয়, "একে যে ভূতের বাড়ি বলে, তা মিথ্যা নয়।"

ভূত-ভৌতিক প্রসঙ্গ ছাড়াও মঠবাসীদের দিনচর্যার একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল নানাধরনের রঙ্গকৌতুক। জানা ঘটনাই অনেক। তা থেকে দু-তিনটি মাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা যাক। ১৮৯৩-এর প্রথমদিকের একটি ঘটনা। সেসময়ে সন্ধ্যারতিতে স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র' আবৃত্তি করা হতো। তাতে রয়েছে এই পঙ্‌ক্তিটি: "নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পা-ধৃতবিগ্রহং বৈ।/ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥" এর মধ্যে 'ঈশাবতারং' পদটি শুনে স্বামী অদ্ভুতানন্দ বিরক্ত বোধ করেন। তিনি স্বামী সারদানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: "এ শরোট! তোমরা এরই মধ্যে তাঁকে (ঠাকুরকে) ভুলে গেলে দেখছি! ঈশাকে পূজা করছো! তোমরা সব কি হলে?" নির্দ্বিধায় অনুমান করা যায়, তাঁর অভিযোগ শুনে উপস্থিত সকলে হেসে উঠেছিলেন। পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ স্তোত্র-রচয়িতা স্বামী অভেদানন্দের নিকট শ্লোকার্থ সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে শান্ত হয়েছিলেন, রচয়িতার প্রশংসা করেছিলেন।[১১১]

অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যেও কেউ কেউ হাসি-মস্করার উপকরণ জোগাতেন। আলমবাজার মঠে একদিন বেলা আড়াইটা-তিনটা নাগাদ এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে আলপাকার জামা, বুকে চেন-সমেত ঘড়ি, চোখে চশমা, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। ভদ্রলোক এসে 'কালীবেদান্তী'র ঘরের সম্মুখের বারান্দাতে বসে স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সদানন্দ ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। একসময় তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামী সদানন্দকে বললেন: "গুপ্ত, আমার জামাটা ধর, আমার সমাধি আসছে।" স্বামী সদানন্দ তাঁর জামা, ব্যাগ ইত্যাদি সব ধরলেন, আর সমাধিস্থ ঠাকুরের পিছনে হৃদয় মুখার্জী যেভাবে দাঁড়াতেন সেই ভঙ্গিতে ভদ্রলোকের পিছনে দাঁড়ালেন। অতিথির মুখে 'ব্রের' 'ব্রের' আওয়াজ! ব্যাপার-স্যাপার দেখে সবাই থ। খানিকক্ষণ পরে তাঁর সমাধিভঙ্গ হলো। বললেন: "গুপ্ত, আমার চশমাটা দাও, আমার ঘড়ির চেন ও ব্যাগটা দাও।" তিনি আবার ব্যাগটি খুলে দেখে নিলেন জিনিসপত্র সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এরপর, একটা জরুরি কাজ আছে বলে ভদ্রলোক সরে পড়লেন। লোকটি চলে যেতেই সবাই হাস্যকৌতুকে মেতে উঠলেন। বেশ কিছুদিন মঠবাসীরা কৌতুকভরে বলতেন: "গুপ্ত, আমার চশমাটা ধর, আমার ব্যাগটা ধর, আমার সমাধি আসছে।"[১১২]

ভিন্ন ধরনের রঙ্গরস জমে উঠত হৃদয় মুখার্জী উপস্থিত হলে। একদিনের ঘটনা। সকাল দশটা নাগাদ হৃদয় মুখার্জী মঠে এসেছেন। স্বামী শিবানন্দের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে বার কয়েক টান দিলেন। স্বামী শিবানন্দের অনুরোধে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের একটি সাক্ষাৎকার বর্ণনা করতে থাকেন। ঠাকুর হৃদয়কে নিয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়িতে চড়ে কেশববাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। একথা-সেকথার পর কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে বলেন: "আজকে কি মনে করে এসেছেন?" ঠাকুর বললেন: "কেশবের মন ভোলাতে এই দূতীগিরি করব বলে এসেছি।" একথা বলে ঠাকুর তাঁর পরনের

১১০ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১৫৭-১৫৮ ১১১ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, পৃঃ ৩০০
১১২ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮-২৯

লালপেড়ে ধুতিখানি মাথায় ঘোমটার মতো দিয়ে দূতী সেজে কেশবচন্দ্রের মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে দূতী-সংবাদ গাইতে থাকলেন। উল্লসিত কেশবচন্দ্র একটা খোল নিয়ে বাজাতে থাকলেন, আর ঠাকুর নেচে নেচে দূতী-সংবাদ গাইতে লাগলেন। চমৎকার ঘটনা, সরস উপস্থাপনা—উপস্থিত সবাই আনন্দে ভরপুর। এদিকে কাহিনী শেষ করে হৃদয় মুখার্জী নিজের পরিধেয় কাপড়খানির কোঁচা দিয়ে মাথা ঢেকে দূতী সাজলেন। তিনি ঠাকুরের মতো ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে দূতী-সংবাদ গাইতে থাকলেন। ঠাকুরের ভূমিকায় অভিনয়পটু নৃত্যরত হৃদয়কে দেখে মঠবাসিগণ ভাবে ও আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে উঠলেন যেন।[১১৩]

এধরনের অভিনয়, হাসি-ঠাট্টা ছাড়াও রঙ্গরসের আসরে অন্যতম আকর্ষণ ছিল খোশ গল্প। মঠবাসীদের অনেকেই ছিলেন গল্পের ভাণ্ডার। তাঁদের স্মৃতিতে সঞ্চিত গল্পের ফুলঝুরিতে সম্পদবান ছিলেন স্বভাবগম্ভীর স্বামী সারদানন্দ, কর্মতৎপর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, বিচার-নিপুণ স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ। উদাহরণস্বরূপ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রিয় একটি গল্পের উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। এক গ্রামে দুই ভাই বাস করত। খুব গরিব ঘরের ছেলে তারা। একটি ভাই এক বাবুর নজরে পড়ে। তিনি বালকটিকে কলকাতায় নিয়ে যান পড়াশুনা করাবার জন্য। পূজার সময় বাবুরা তাকে একটা সার্ট কিনে দেন। ছেলেটি গ্রামে ফিরে তার ভাই ও সম-বয়সীদের ডাকল—কলকাতা থেকে সে একটা নতুন জিনিস এনেছে দেখাবে। ঘরে ঢুকে ছেলেটি জামাটি পরে বুকের বোতামগুলি লাগিয়ে বাইরে এসে সবাইকে দেখাল। গ্রামের ছেলেরা তো দেখে অবাক। এত বড় মাথা ছোট্ট একটা গর্তের ভিতর দিয়ে কি করে বেরিয়ে এল! অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও যখন তারা বুঝতে পারল না, তখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল: "হ্যাঁ ভাই, ওর তো দরজা নেই, তুই মাথা গলালি কি করে?" সবাই বোকা বনে গেছে দেখে কলকাতা-ফেরৎ ছেলেটির খুব স্ফূর্তি হয়। সে নেচে নেচে হাততালি দিয়ে বলতে লাগল: "আমি তো বোলবুনি, বোলবুনি।" এই গল্পটি বলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বালকের মতো আনন্দ করতেন।[১১৪]

আলোচ্য কালে মঠজীবনের একটি উল্লেখ্য বিষয়—কয়েকজন মঠবাসী অপর কয়েকজন রুগ্ন মঠবাসীকে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচর্যা করেছিলেন। দীর্ঘ পরিক্রমার পর স্বামী অভেদানন্দ একটি মারাত্মক ব্যাধির শিকার হয়েছিলেন। তাঁর পায়ে গিনিওয়ার্মের ক্ষত দেখা দিয়েছিল। সংক্রামক ব্যাধি। অনেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। রোগী চারমাস শয্যাগত ছিলেন। সমস্ত শরীর ফুলে গিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ দিবারাত্র তাঁর সেবা করতেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী অদ্ভুতানন্দ তাঁকে সাহায্য করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে হাঁটাচলার শক্তি ফিরে পান। এসময়ের অভিজ্ঞতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছিলেন: "গর্ভধারিণী মায়ের মতো নির্বিকার চিত্তে শরৎ আমার সেবা করিয়াছিল।"[১১৫]

স্বামী সারদানন্দ কাশীতে ছয়মাস রক্ত-আমাশয়ে ভুগে কঙ্কালসার শরীর নিয়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। তারপর বৎসরাধিক কাল বারংবার ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। অপরের সেবা গ্রহণ করতে একান্ত অনিচ্ছুক স্বামী সারদানন্দকে ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ ও অপর দু-একজন মঠবাসী দরদ দিয়ে সেবা করেছিলেন। বলরামবাবুদের কুলগুরু বংশের ফকির (যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য) বলরাম-ভবনেই বাস করতেন। সৎস্বভাবের ফকির ছিলেন সকলের প্রিয়। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাগত হন, রোগ দ্রুত বাড়তে থাকে। বয়স ত্রিশ কি একত্রিশ। মৃত্যুপথযাত্রী ফকিরকে অক্লান্তভাবে সেবা করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ব্রহ্মচারী কালীকৃষ্ণ ও দু-একজন। নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এক ব্যক্তি বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়। সেবাকাজের অসুবিধা হওয়াতে স্বামী সদানন্দ প্রেরিত হন। তিনি রোগীকে সামলাতে পারেন না, স্বামী সারদানন্দ তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

একবার নরেন্দ্রনাথের বৃদ্ধা মাতামহীর মরমর অবস্থা হয়। এই খবর শুনে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী যোগানন্দ একজন চিকিৎসককে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের সেবাযত্নে বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাছাড়াও এসময় থেকে নরেন্দ্রনাথের মা-ভাইদের দেখাশুনার দায়িত্ব স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও বৈকুণ্ঠ সান্যাল নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভাই মহিম (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) রক্তপিত্তরোগে ভুগছিলেন।

১১৩ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫-৪৬
১১৪ ঐ, ১ম খণ্ড, ১৮৯৬, পৃঃ ১৬৬-১৬৭
১১৫ আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৭৪

তাঁকে আলমবাজার মঠে নিয়ে এসে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ মজুমদারকে দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। রোগী কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে স্বামী সারদানন্দ একটা চিঠি লিখে তাঁকে গাজীপুরে শ্রীশচন্দ্র বসুর কাছে পাঠিয়ে দেন।[১১৬]

আর দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মঠবাসী বা ঘনিষ্ঠ ভক্তপরিবারের কেউ কঠিন রোগাক্রান্ত হলে মঠবাসীদের কয়েকজন যথাসাধ্য পরিচর্যা করতেন। এবিষয়ে স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী নির্মলানন্দের ভূমিকা ছিল বিশেষ প্রেরণাপ্রদ। তাছাড়া স্বামী সদানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ (বুড়ো বাবা) ও স্বামী বিরজানন্দের সেবাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও আর্তের সেবা করার ভাব মঠবাসীদের বরাবরই ছিল। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ১৮৯৫-এর গ্রীষ্মকাল। একদিন স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান সেরে মঠে ফিরছিলেন। আলমবাজারের চৌমাথায় তাঁরা দেখতে পান—এক বুড়ি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। ওলাওঠার রোগী। সাধুরা একটা পরিষ্কার কাপড় সংগ্রহ করে বুড়িকে পরালেন এবং একটা গরুর গাড়িতে তুলে তাকে বরানগর থানায় নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে রোগীকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ মঠে ফিরতেই অতিসাবধানী স্বামী শিবানন্দ বলে ওঠেনঃ "You must be fumigated first." যাহোক, পরিধানের কাপড়-চোপড় ছাড়তেই তিনি রেহাই পান।[১১৭]

শ্রীমা সারদাদেবীর দেখাশুনার দায়িত্ব মঠবাসিগণ ক্রমে ক্রমে নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন, অবশ্য মঠের নিজস্ব অর্থাভাবের জন্য তাঁদের দেখভাল করা কায়িকশ্রমেই সীমিত ছিল। মা যখন কামারপুকুরে বা জয়রামবাটীতে থাকতেন সেসময়ে এঁদের প্রায় কিছু করতে হতো না। অনেকদিন তাঁর খবরাখবর না পেলে তাঁরা দু-একজন গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে আসতেন। আলোচ্য কালে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের পুরো ও পরের বছরের প্রথমাংশে মা জয়রামবাটীতে ছিলেন। ১৮৯২-এর এপ্রিল মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ কয়েকজন মঠবাসী কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছিলেন এবং জয়রামবাটীতে গিয়ে মায়ের কাছে কয়েকদিন থেকে তাঁর বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছিলেন। এপ্রিলের শেষভাগে মা নরেন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রার প্রস্তাব অনুমোদন করে আশীর্বাদপত্র লিখেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের জুন (আষাঢ় ১৩০০ বঙ্গাব্দ) থেকে শ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে বাস করছিলেন। সেসময়ে তিনি পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করেছিলেন। মায়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। এক পূর্ণিমার সন্ধ্যারাতে বাগানবাড়ির বাঁধানো গঙ্গাঘাটে বসে শ্রীমায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিব্যদর্শন হয়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্ময় দেহ গঙ্গাবারিতে মিশে গেল। নরেন্দ্রনাথ কোথা থেকে ছুটে এসে সেই জল চতুর্দিকে ছিটাতে থাকেন। এই অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছিলেনঃ "ঐ দেখার পর থেকে কদিন আর গঙ্গায় নামতে পারিনি।... সেই থেকে শরীর রাখব ঠিক করলুম। ঠাকুরের কথা অমনি মনে পড়ে গেল—তিনি বলেছেন, 'তোমার মরা হবে না—তোমায় থাকতে হবে। আমি আর কজনকে দেখেছি? তোমার কাছে ঢের আসবে—তাদের ভার তোমার ওপর।' এই সব মনে হতে লাগল, আর সারারাত ঘুম হলো না।"[১১৮] এই দিব্যদর্শন শ্রীমায়ের নিকট এবং মঠবাসিগণের নিকট এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। জগদ্ধাত্রীপূজার আগে মা ফিরে যান জয়রামবাটীতে।

১৮৯৪-এর প্রথম দিকে (মাঘ ১৩০০) শ্রীমা শোকাহতা কৃষ্ণভাবিনীদেবীর (বলরামবাবুর বিধবা স্ত্রী) সঙ্গে বিহারের কৈলোয়ার যান। অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ। সেখানে দুমাস থেকে তাঁরা কলকাতায় আসেন। কয়েকদিন পর আনুমানিক এপ্রিল মাসে তিনি জয়রামবাটীতে ফিরে যান।

আলোচ্য পর্যায়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা—১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন ভারতসূর্য বিবেকানন্দের কিরণে ঝলমল করে উঠেছিল, ভারতের দিগন্ত তার রশ্মিচ্ছটায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। এই ঘটনা অন্তর্মুখী মঠবাসীদের মনকেও চঞ্চল করে তুলেছিল।

বহির্বিশ্বে স্বামীজীর গমন সম্বন্ধে মঠের তাপসগণ

১১৬ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৬-১৯৮

১১৭ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১৪১

১১৮ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, ১৯৯৫, পৃঃ ২৭৬-২৭৭

বিস্তারিত না জানলেও কিছুটা যে জানতেন সেবিষয়ে আমরা আগে উল্লেখ করেছি। স্বামী অভেদানন্দের মতে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে প্রকাশিত মারউইন মেরী স্নেলের 'স্বামী বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করে মঠবাসিগণ প্রথমটায় পাশ্চাত্য-আলোড়নকারী স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁদের নরেন্দ্র বলে চিনতে পারেননি।[১১৯] কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে, ইনি মাদ্রাজের কোন এক ভদ্রলোক। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুসন্ধানের ফসল থেকে আমরা জানি, উক্ত নিবন্ধটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকা 'পায়োনীয়ার'-এ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার পূর্বেই ১৮৯৩-এর ৯ নভেম্বর ও ১১ নভেম্বর যথাক্রমে 'স্টেটসম্যান' ও 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশে অপূর্ব সাফল্যের সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, রাজধানী কলকাতা স্বামী বিবেকানন্দের জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল।

•

স্বামী বিবেকানন্দের প্রকাশিত চিঠির তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে সহজেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের পর স্বামীজী তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র, হরিদাস মিত্র প্রমুখকে এবং জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে চিঠি দিয়েছেন অথবা তাঁদের চিঠির উত্তর দিয়েছেন, অথচ এইকালে তিনি মঠের গুরুভাইদের বা তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাউকে চিঠিপত্র দেননি। এবিষয়ে মঠবাসিগণের মধ্যেও জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। অবশ্য জল্পনা-কল্পনা বেশিদূর এগোবার পূর্বেই ধর্মমহাসম্মেলনের পর স্বামীজীর প্রথম চিঠি—১৯ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে লেখা চিঠি মঠবাসীদের নিকট পৌঁছায় এপ্রিলের শেষভাগে।[১২০] চিঠির মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে দেরিতে যোগাযোগ করলেও স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের সম্বন্ধে গর্ববোধ করতেন, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রীতির কিছু কমতি ছিল না। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর নিজের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। স্বামীজী জানতেন যে, তাঁর গুরুভাইগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত সত্যের বর্ম পরিধান করে তদানীন্তন সমাজের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাতকে প্রতিহত করবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণ-প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান। স্বামীজী লিখেছেন: "ইহারা ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। আর এই তো সবে আরম্ভ! প্রভুর কৃপায় ইহারা এমন কাজ করিয়া যাইবে, যাহার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ ইহাদিগকে আশীর্বাদ করিবে।... আমি এই যুবকদলকে সংঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" একই চিঠিতে স্বামীজী তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উদ্ঘাটিত করে লিখেছেন: "ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা দুর্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্বাপেক্ষা দীন হীন ও পদদলিত—তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত।"[১২১]

•

যে বিবেকানন্দ-ঝটিকাতে আমেরিকার সুধীবৃন্দ আলোড়িত হয়েছিল, সেই ঝটিকার ঝাপটা এদেশে বিশেষতঃ আলমবাজার মঠবাসীদের চিত্তাঙ্গনেও ঝড়ো হাওয়া সৃষ্টি করেছিল। আলমবাজার মঠজীবনের প্রথম পর্যায়ের প্রত্যন্তে যে সংক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, সেটা কখনো শান্ত হয়নি বা থিতিয়ে পড়েনি, বরঞ্চ আলমবাজার-জীবনের পরবর্তী দুই পর্যায়ে তার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। বিচিত্র সেই কাহিনী। [ক্রমশঃ]

১১৯ এটা অতিশয়োক্তি মনে হয়। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এদেশে থাকাকালীন স্বামীজীর 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম স্বাক্ষরিত কয়েকখানি চিঠি বেলুড় মঠের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। বেণীশঙ্কর শর্মা রচিত 'Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter' শীর্ষক বই থেকে জানা যায় যে, ২ জুন ১৮৯৩ তারিখে মহেন্দ্রনাথ দত্ত খেতড়ির রাজাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠি থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর মা, দিদিমা প্রভৃতি স্বামীজীর বিদেশগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাছাড়াও জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে স্বামীজীর বাড়িতে ও আলমবাজার মঠে এসেছিলেন। স্বভাবতই মনে হয়, স্বামীজীর ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদানের খবর কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠদের অজ্ঞাত ছিল না।

১২০ স্বামীজীর শিষ্য স্বামী বোধানন্দের মতে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী প্রথম চিঠি লেখেন জাপান থেকে। সে-চিঠি মঠবাসীরা পেয়েছিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে। (দ্রঃ Vedanta Kesari, August 1924, p. 131)

১২১ হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে ২৯ জানুয়ারি ১৮৯৪ তারিখে লেখা স্বামীজীর চিঠি।

আমরা শ্রীশ্রীমাকে বলতাম 'পিসিমা'

গোপালচন্দ্র মণ্ডল

যে সময়ের কথা বলছি তা ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যবর্তী কাল। আমি তখন বেশ বড় হয়েছি। ১৬-১৭ বছর বয়স। সুতরাং বহু স্মৃতিই মনে আছে। মনে আছে, মায়ের নতুন বাড়ি হলো। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) এসে রয়েছেন জয়রামবাটীতে। মনে আছে, মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছেন জয়রামবাটীতে। রাধুর কথা—রাধুর স্বামীর কথা খুব মনে পড়ে। সর্বোপরি মনে পড়ে মা-সারদার অর্থাৎ আমাদের 'পিসিমা'র কথা।

আমরা শ্রীশ্রীমাকে বলতাম 'পিসিমা'। আমার মাকে তিনি বলতেন 'বউ' আর ঠাকুমাকে বলতেন 'খুড়ী'। আমার বাবা ভূষণ মণ্ডল মায়ের চেয়ে বয়সে একটু ছোট-ই ছিলেন। তিনি ও মা পিসিমাকে 'দিদি' বলে ডাকতেন। আমার ঠাকুমা সত্যভামা মণ্ডল পিসিমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন। জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুর বা শিহড় যাওয়ার সময়েও পিসিমা ঠাকুমাকে সঙ্গে নিতেন। পিসিমার নতুন বাড়ির পাশে যে পুণ্যিপুকুর, তার পাড়েই আমাদের বাড়ি। তিনি তো আমাদের কাছে ধরা দেননি, তবে পরে বুঝছি, এত সাদাসিধে থাকাও বোধ হয় কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর জীবনের সাধারণ ঘটনাও আজ ভাবলে অস্বাভাবিক মনে হয়। তিনি তো মানুষ নন। তাই হয়তো তাঁর পক্ষে এমন নিরাভরণ—অতি সহজ—অতি সরল জীবনযাপন সম্ভব হতো!

আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল খুব বেশি। খাওয়া-দাওয়ার পর বিকেলের দিকে এক-একবার আসতেন। মা-ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতেন। কখনো এমন ঘটত, হঠাৎ সন্ধ্যার সময় কলকাতা থেকে চার-পাঁচজন ভক্ত এসে গেছে। পিসিমা এসে মাকে বললেন: "ও বউ, আনাজপত্তর কিছু থাকলে দাও, চারজন ছেলে এসেছে অনেক দূর থেকে।" মা তাড়াতাড়ি আলু, ঝিঙে, কুমড়ো যা থাকত দিতেন। মনে আছে, একবার আমি সন্ধ্যার সময় একটা লাউগাছ থেকে লাউ কেটে এনে তাঁকে দিয়েছিলাম। সামান্য জিনিসকে অসামান্য করেই তিনি যেমন ভাইদের সংসার আলো করে রাখতেন তেমনি কোন ভক্তকেই বুঝতে দিতেন না যে, সংসারে অস্বাচ্ছন্দ্য আছে! পিসিমার ভাইদের সংসার তো খুব বড় ছিল। অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা। ভাইদের রোজগারও তেমন ছিল না।

তাঁর স্নেহ-মমতা যেমন মানুষের ওপর ছিল তেমনি ছিল পশু-পাখিদেরও ওপর। তাঁর টিয়াপাখি গঙ্গারামের কথা তো তাঁর জীবনীতে সবাই পড়েছেন। তাঁর অনেকগুলি বিড়ালও ছিল। পাঁচ-ছয়টা হবে। পিসিমা যখন খেতে বসতেন, বিড়ালগুলিও তাঁর কাছটিতে চুপ করে বসে থাকত। পিসিমা খাওয়ার শেষে ওদের নিজের পাতের ভাত দিতেন। তারা কী ভাগ্যবান! পিসিমার চারটি গরু ছিল—মহন্ত, মহারাজ, লক্ষ্মীকান্ত ও ইন্দ্ররাজ। পিসিমা সংসারের সব কাজের মধ্যেও গরুগুলিকে একবার আদর করে যেতেন। ভাতের ফেন খাওয়াতে আসতেন। এসে তাদের গায়ে, গলায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। কখনো তাদের শিঙে তেল মাখাতেন।

গরুগুলিকে সেবাযত্নের জন্য যে-ছেলেটি ছিল তার নাম দীনু। সে আমাদের বয়সীই ছিল। যদি সে আজ বেঁচে থাকত তবে তার কাছে সবাই পিসিমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারত। পিসিমা তাকে খুব স্নেহ করতেন। দীনুর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দীনু জলখাবার খেয়ে বেলা ৯টা নাগাদ মাঠে গরু নিয়ে চরাতে যেত। ফিরত বেলা ১টা নাগাদ। তারপর গরুগুলিকে বেঁধে চান করে খেতে বসত। পিসিমা কিন্তু সবার খাওয়া হয়ে গেলেও দীনুর জন্য অপেক্ষা করতেন। একদিন দীনুর আসতে খুব দেরি হয়েছে। দীনু মাঠে গিয়ে অন্যান্য রাখাল ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেলত। খেলতে খেলতে সেদিন ফিরতে দেরি হয়েছে। পিসিমা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে—যখন তিনটে পেরিয়ে গেছে—বাড়ির মেয়েদের অনুরোধে দীনুর খাবার বেড়ে ঢাকা দিয়ে সবে খেতে বসেছেন, তখনই দীনু ফিরল। দীনুকে দেখে পিসিমা বললেন: "কিরে বাবা, এত দেরি করলি! দেখ না, ওরা জোর করে আমায় খেতে বসাল। আমি তোর খাবার বেড়ে রেখেছি। তুই চান করে ঢাকা তুলে খাবার নিয়ে নে।" দীনু ঝটপট চান করে খেতে বসল, পিসিমাও খাচ্ছেন। দীনুর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। পিসিমা বললেন: "বাবা দীনু, আর দুটো ভাত নিবি?" দীনু ইতস্ততঃ করতে লাগল। কারণ, পিসিমা খাচ্ছেন, কাছে

কেউ নেই যে ভাত দেবে। পিসিমার তখনো খাওয়া শেষ হয়নি। বয়স হয়েছে, দাঁত নেই সব। তাই খেতে দেরি হয়। ব্যাপারটা বুঝে পিসিমা দীনুকে বললেন: "বাবা, থালাটা কাছে আনত।" দীনু থালাটা কাছে আনলে পিসিমা তাঁর থালা থেকে কিছু ভাত দীনুকে তুলে দিলেন। পরম তৃপ্তিতে দীনু তা খেল। পরের দিন পিসিমাকে আড়ালে পেয়ে দীনু জিজ্ঞাসা করল: "আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?" পিসিমা বললেন: "বল না বাবা, কি বলবি।"

দীনু। আচ্ছা মা, তোমাদের কি আলাদা করে রান্না হয়? আমাদের ভাত কি আলাদা?

পিসিমা। সে কি বাবা? ওকথা কেন বলছিস?

দীনু। তবে কাল তোমার পাতের ভাত অত সুন্দর লাগল কেন? অমন ভাত তো, মা, জীবনে কখনো খাইনি!

পিসিমা। না বাবা! একই হাঁড়িতে ভাত হয়। যে-হাঁড়ির ভাত তোকে দিয়েছি—সেই হাঁড়ির ভাত তো আমিও নিয়েছি।

পিসিমা চেপে গেলেন তাঁর দৈবী প্রকৃতির কথা। তাঁর প্রসাদী অন্ন যে অমৃতে পরিণত হয়েছে তা দীনু বুঝবে কি করে! দীনু মহাভাগ্যবান—সে পেয়েছিল তাঁর মহাপ্রসাদ!

পিসিমা যাত্রা দেখতে খুব ভালবাসতেন। তখনকার দিনে গ্রামে এখনকার মতো রেডিও বা সিনেমার প্রথা ছিল না। ফলে গ্রামে কোন পালাপার্বণকে কেন্দ্র করে বাউলগান, তরজা, যাত্রা, রামায়ণগান, চব্বিশ প্রহর, মনসার পাঁচালী প্রভৃতি হতো। চব্বিশ প্রহরে ভাগবত কথকতার জন্য গাইতে আসত নদীয়ার নারাণপুরের দল, পশ্চিমের রামডিয়ার দল ও বরণডাঙার দল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে শীতলা-মায়ের পূজা হতো। তখন হতো চব্বিশ প্রহর ও যাত্রা। আশ্বিন-কার্তিক মাসে সিংহবাহিনীতলায় রামায়ণগান ও যাত্রা হতো। রামায়ণগান গাইতে আসতেন পুকুরিয়ার বাঁকু ঘোষাল ও ভুরসুবোর সতীশ আচার্য। তাঁরা পিসিমাকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। দুরকমের যাত্রা হতো—কৃষ্ণযাত্রা আর সাধারণ যাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা গাইতে আসতেন শিহড়ের রাম ছুতোরের দল এবং বেজো সন্তোষপুরের নলিনী মণ্ডল ও অনুকূল মণ্ডলের দল। জগদ্ধাত্রীপূজার সময় অনেকবার কৃষ্ণযাত্রা হতে দেখেছি। যতদূর স্মরণ হয়, তখন সাধারণ পালাগুলি হতো প্রহ্লাদচরিত, ধ্রুবচরিত, নিমাইসন্ন্যাস, নবাব সিরাজদৌল্লা ইত্যাদি। হ্যাজাক জ্বেলে যাত্রা হতো। সাধারণ যাত্রার জন্য কুমুড়সে-কানপুরের দল, রামজীবন-পুরের দল, বগছড়ির দল জয়রামবাটীতে যাত্রা করে গেছে। বাউলগান ও তরজা হতো জগদ্ধাত্রীপূজার সময়। বাউলগান গাইতে আসতেন ক্ষুদিরাম গোদ ও সাতবেড়ের লালু জেলে। লালুকে পিসিমা খুব ভালবাসতেন। তরজা গাইতেন সাতবেড়ের পাঁচু রায়, মুইদাড়ার মৃগেন্দ্র ধাড়া প্রভৃতি। মনসাতলায় মাঝে মাঝে মনসার পাঁচালীগান ও মনসার ভাসানের গান হতো। দলের নাম মনে নেই, তবে লোকে বলত বেঙ্গাই-এর পাঁচালী-দল। পিসিমা এইসমস্ত খুব আনন্দ করে শুনতেন। ছোটবেলায় অনেকবারই পিসিমাকে যাত্রা, রামায়ণগান, বাউলগান, তরজা প্রভৃতি শুনতে দেখেছি। ঐসময় জলের ঘটি ও পানের ডিবা তাঁর সঙ্গে থাকত। গোটা অনুষ্ঠান দেখে তবে বাড়ি ফিরতেন। তখনকার দিনে ঐসমস্ত অনুষ্ঠান শুরু হতো বেশ রাতেই। শেষ হতো শেষরাতে। রাত জেগে যাত্রা দেখেও তিনি ঠিক ভোরবেলা উঠতেন, নিত্যপূজা ও সংসারের কাজ সারতেন।

আমি পিসিমার সব ভাইঝি ও তাদের স্বামীদের দেখেছি। রাধু তো পিসিমাকে জ্বালাতনের একশেষ করে ছেড়েছে। দেখে আমাদের খুব কষ্টও হতো, আবার রাগও হতো। ললিতবাবু[১], শরৎ মহারাজ, মাস্টারমশাই যখন আসতেন তখন জয়রামবাটীতে যেন আনন্দের হাট বসে যেত। কলকাতা থেকে এখন রোজ কত লোক আসে জয়রামবাটীতে। কিন্তু তখনকার ঘটনা ছিল একেবারেই অন্যরকম। প্রথমদিকে পিসিমার বাড়িতে গরু ছিল না। কলকাতা থেকে ভক্তরা এলে চা করতে হবে—দুধ চাই। পিসিমা তখন ছুটতেন গয়লাপাড়ায়। লবু নাগ, শ্রীরাম নাগ, বিহারী মাল—এরা দুধের ব্যবসা করত। গয়লাবউ আহ্লাদিনী, নয়না—এরা পিসিমাকে বলত 'মা-ঠাকরুন'।

১ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর তেজস্বী স্বভাবের জন্য ভক্তমহলে তিনি 'কাইজার' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে সেবার জন্য তিনি সর্বদা তৎপর থাকতেন। জয়রামবাটীতে তিনি শ্রীশ্রীমাকে শোনানোর জন্য প্রথম সেখানে গ্রামোফোন নিয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের বাড়িতে গ্রামোফোন শোনার জন্য গ্রামের লোকেরা ভিড় করত। —সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গয়লাবউদের সঙ্গে পিসিমার খুব ভাব ছিল। এমনিতেই কারো গরুর বাছুর হলে তারা পিসিমার বাড়িতে ঠাকুরের ভোগের জন্য দুধ দিয়ে যেত। হঠাৎ দুধের প্রয়োজন হলে পিসিমাকে কেউ ফেরাত না। পিসিমার ভাই বা ভাইঝিদের কিন্তু কেউ সহজে কিছু দিতে চাইত না। পিসিমাকে সবাই সব জিনিস দিতে চাইত। দিয়ে যেন বর্তে যেত।

আরও একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঠাকুমার মুখে শুনেছি। ঠাকুমা বলতেনঃ "ওরে, মুখুজ্যেদের সারু যে-সে নয়, পরে দেখবি। ও হলো দেবতা! একবার পর পর দুবছর খরা গেল। আকাশে বৃষ্টি নেই। মাঠের ফসল মাঠেই শুকিয়ে গেছে। কিছু জমির ধান আমোদরের পাশে কোনরকমে টিকেছিল। সেগুলিও মরে যেতে বসেছে। ভাদুরে আকাশে একটুও জল নেই। গ্রামের সব মোড়লরা (তখনকার দিনে গ্রামের মুরুব্বিরা ছিলেন—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ সামুই, কেদার ঘোষ, কৈলাস মণ্ডল, মাখন মণ্ডল, যোগীন্দ্র বিশ্বাস, নগেন্দ্র বায়েন, ভূপতি ঘোষ প্রমুখ।) একদিন আলোচনা করছিল, এখন বৃষ্টি না হলে বাচ্চা-কাচ্চারা না খেয়ে মারা যাবে। তারা সারুকে গিয়ে ধরল। সারু বলল, 'ঠাকুরকে জানাব'। পরের দিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সে-বছর ঐ জমিগুলোতে যা ফসল হয়েছিল এমন আর কখনো হয়নি। বুঝলি, দেবমাহাত্ম্য কাকে বলে!" ভানুপিসির মুখেও এই ঘটনা আমরা শুনেছি।

এখন আমার বয়স প্রায় ছিয়ানব্বই বছর। এখনো তো ভালভাবেই বেঁচে আছি। তা আছি পিসিমার আশীর্বাদেই। আমাদের ভিটেতে পিসিমার পায়ের ধুলো পড়েছে। কখনো দেখতাম তিনি রান্নাঘরের কাছে মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন, কখনো দেখতাম উঠানে ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলছেন। চোখ বন্ধ করলেই সব জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা তখন ঠিক বুঝিনি, কিন্তু সাক্ষাৎ জগজ্জননীকে তো দেখেছি, তাঁর চরণ ছুঁয়েছি। তাই তো এত বয়সেও এত ভাল আছি। কত কালের কথা, কিন্তু সব মনের মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে। আমি জানি, তাঁর কৃপা আমাদের ঘিরে রয়েছে। আমাদের সংসারে আজ যে বাড়-বাড়ন্ত তাও পিসিমার আশীর্বাদেই ঘটেছে। পরলোকে যেন পিসিমার চরণে আশ্রয় পাই। তাঁর কাছে সেই প্রার্থনাই জানাই।★ □

★ গোপালচন্দ্র মণ্ডলের বিবরণটি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তারিখঃ ১, ২ জানুয়ারি ১৯৯৫)। গোপালচন্দ্র মণ্ডল ৯৬ বছর বয়সে মারা যান ৬ জুলাই ১৯৯৫।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



আবেদনঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, তাঁদের পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আনন্দের বিষয় যে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

একটি ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ক্যাসেটে (PAL কিন্তু NTSC-তে পরিবর্তনযোগ্য) বর্তমান মিউজিয়াম, প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ও সংরক্ষণশালার মডেল এবং বর্তমান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাসেটটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে এবং দেশ ও বিদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে কিনতে পাওয়া যাবে।

স্বামী আত্মস্থানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া

শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৭ সাল, মে মাস। গরম পড়েছে খুব। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে কথামৃতকার শ্রীম-র বাড়ির নিচের তলার একটি ঘর। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বৈশাখী পূর্ণিমা। থালার মতো চাঁদ পুব আকাশে মাথা তুলছে। বাংলা ২৫ বৈশাখ। তক্তপোশের একপাশে বসে আছেন শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আরেক পাশে নরেন্দ্রনাথ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের হাট ভেঙে গেছে। প্রায় এক বছর হতে চলল, ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করেছেন। নন্দপুর চন্দ্র বিনা, বৃন্দাবন অন্ধকার। নরেন্দ্রনাথের মনে দিবাবসানের পূরবী খেলছে। পঞ্চাশ পেরল কি পেরল না, অনন্তের পথে চলে গেল আলোর শরীর। ছায়ায় বসে তাঁর নিত্যসঙ্গী সাক্ষাৎ পার্ষদের দল। অভিমান, বড় অভিমান।

লীলা সংবরণের ঠিক দুদিন আগে নরেন্দ্রনাথকে কাছে ডাকলেন, দিন তো চলে যায় নরেন! খেলা তো শেষ হয়ে এল। আমি যাই নরেন, একটা কথা, একটা অনুরোধ—

"তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ, তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।"

"আপনাতে আপনি থেকো মন
যেও নাকো কারো ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি,
খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"

যখন বাইরের লোকের সঙ্গে মিশবি, তখন সকলকে ভালবাসবি, মিশে যেন এক হয়ে যাবি। বিদ্বেষ, বিসংবাদ ফেলে দে, ফেলে দে। রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, মাঠে গিয়ে সব গরু এক হয়ে যায়। তখন সব একপালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায়, আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাক। নরেন! তুই অখণ্ডের ঘর, সপ্তর্ষির একজন, নর-নারায়ণ ঋষির নর, নিত্যসিদ্ধের থাক। তুই আগুন, তোর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে খাক হয়ে যায়। আমি শক্তি, আমি প্রকৃতি, তুই পুরুষ। তুই আমার শ্বশুরঘর। তুই আমার খাপখোলা তলোয়ার। তোর মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানের আগুন। তার তেজে জাগতিক আবর্জনা মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তুই হবি বিশাল বটবৃক্ষের মতো, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তোর বেদান্ত তোর কাছে থাক।

সমাধি, সমাধি, সমাধি। সমাধির স্বাদ তোমার মিটিয়ে দিয়েছি আমি। মা তোকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মসমাজে সেই যে তুই গাইতিস—"নিবিড় আঁধারে মা, তোর চমকে ও রূপরাশি।"

তুমি সেই বিশ্বরূপ দর্শন করেছ। "তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।" (গীতা, ১১।৩০) তীব্র তীব্র তেজোরাশি, বিশ্বচরাচর গলে গলে যাচ্ছে। তুমি তা দর্শন করেছ। অনন্তের সেই গলিত রূপ।

তুই যা চেয়েছিস আমি দেখিয়ে দিয়েছি। লয়-প্রলয়ের পারে স্তব্ধ সেই অনুভূতি।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥"

(কেন-উপনিষদ্, ১।৩)

তুমি দেখেছ—

"নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।"

নরেন! সবই তো হলো, চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে, যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার চাবি খুলব।

এই দেখ নরেন, আমার চোখে জলের ধারা। কেন জানিস? আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পরে ফিরে যাবি।

আমি এইবার যাই নরেন্দ্র। শরীর ছেড়ে যেতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট একটাই, আমার অবর্তমানে তোমরা সব রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে! নরেন তুমি রইলে, রইল আমার দায়িত্বভার।

"উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
স্বপন-রচনা শুধু ভবে—
কর্ম হেথা গাঁথে মালা যার
নাহি সূত্র, বৃন্তমূলহীন
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার,
অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যগ্রাহী, সত্যের আশ্রয়ে,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক প্রেম নিরবধি।"

তক্তপোশে মুখোমুখি দুজন—মহেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে অনেকটা উঠে পড়েছে। অনেকটা এরকম কথাবার্তা হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ বলছেন: আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা কচ্ছি, ইচ্ছা হয় এখনি উঠে যাই। প্রায়োপবেশন করব?

মহেন্দ্র। তা বেশ! ভগবানের জন্য সবই তো করা যায়।

নরেন্দ্র। যদি খিদে সামলাতে না পারি?

মহেন্দ্র। তাহলে খেয়ো, আবার লাগতে হবে।

নরেন্দ্র। ভগবান নেই বোধ হচ্ছে। যত প্রার্থনা করছি, একবারও জবাব পাইনি। কত দেখলুম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে! কত কালীরূপ, আরও অন্যান্য রূপ দেখলুম! তবু শান্তি হচ্ছে না। ছয়টা পয়সা দেবেন! শেয়ারের গাড়িতে বরানগর মঠে যাব। আমার বিষম মুশকিল। ওখানেও [বরানগর মঠে] এক মায়ার সংসারে পড়েছি।

মহেন্দ্র। জানি, ভাড়া আর ট্যাক্স এগার টাকা।

নরেন্দ্র। একজন পাচক আছেন, মাইনে ছ-টাকা।

মহেন্দ্র। সুরেন্দ্রবাবু মাসে মাসে কত দিচ্ছেন?

নরেন্দ্র। প্রথম প্রথম ত্রিশ দিচ্ছিলেন। এখন সেটা একশ হয়েছে। এখন তো সেখানে ফুল হাউস। রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, গঙ্গাধর, হরি—সবাই এসে গেছে। আঁষটে সংসারে কেউ আর ফিরবে না।

মহেন্দ্র। সেদিন মঠে গিয়েছিলুম। রাখাল বললে, আসুন সকলে সাধন করি। আমরা আর বাড়ি ফিরে গেলুম না। যদি কেউ বলে ঈশ্বরকে পেলে না, তবে আর কেন! তা নরেন্দ্র বেশ বলে, 'রামকে পেলুম না বলে কি শ্যামের সঙ্গেই ঘর করতে হবে; আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে!' তুমি বলেছ না কী?

নরেন্দ্র। হ্যাঁ, আমি বলেছি।

"This is your cup—the cup assigned to you."

"এই লহ তব পেয়ালা, বৎস!
পেয়ালা তোমার তরে
এ মহা দুর্গম ভীমপথ বাহি
পথিক চল হে তুমি
আমারই রচনা শিলা দুর্বার
তোমার প্রয়াণ-ভূমি।"

"This is your road—a painful road and drear.
I made the stones that never give you rest;
This is your task. It has no joy nor grace."

তবে মাস্টারমশাই, এইবার আমি বেরব। মাস্টারমশাই! যাই ভারতকে দেখে আসি। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

আমি নরেন্দ্রনাথ, গাজীপুর থেকে লিখছি ভাই। পওহারীবাবাকে বড় মনে ধরেছিল। কিছু মালের আশায় ধরনা দিয়ে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম, যোগের পথে ঈশ্বরকে ধরব। আবার সেই সমাধির লোভ। দীক্ষার দিনও স্থির হয়ে গিয়েছিল। তারপর আগের দিন রাতে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল, ঘুম আর আসে না কিছুতেই, বিবেক সামনে—নিজের গুরুকে ছেড়ে কোথায় যাও নরেন্দ্রনাথ! হঠাৎ অন্ধকার ঘর আলোয় উদ্ভাসিত, সেই আলোর বৃত্তে পরমহংসদেব—সেই মুদিতবদন, করুণ মূর্তির স্নেহসিক্ত নয়ন-দুইটির দৃষ্টি আমাতেই নিবদ্ধ। আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন তিনি। কোন কথা নেই, কোন নড়াচড়া নেই, স্থির দৃষ্টি। সেই মুখ, সেই প্রেম, সেই স্নেহ। আমি ঘামছি, আমার হৃদয় স্তব্ধ। না, না, আমি আর কোন মিঞার কাছে যাব না।

"এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নেই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয় তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন, অথবা বেদান্তদর্শনে যাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ—লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত—'মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা'।

"তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে 'ভগবান রক্ষা কর' বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্যামিত্ব গুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন।"

"শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,
নির্বাক আনন ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে
অমনি যে ফিরি তব পায়ে ধরি,
কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।"

"তোম জ্যায়সা রামপর, তোমসে ত্যায়সা রাম।
ডাহিনে যাও তো ডাহিনে যায়, বামে যাও তো বাম॥"

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম তটভাগ দেশটাকে চষে ফেলেছি। ধর্ম খুঁজেছি মন্দিরে নয়, মসজিদে নয়, ধর্ম খুঁজেছি মানুষের আলয়ে। ধনীর স্বার্থপর বিলাসিতা দেখেছি, বর্ণবিদ্বেষ দেখেছি, প্রাচুর্যের পাশে অনাহার দেখেছি, নরপশুর মহামিছিলে নরনারায়ণ দেখেছি। মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবে থাকুক, তাদের ধন হলে, তারা লেখাপড়া শিখলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হবে! কী অপূর্ব যুক্তি রে ভাই!

"সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশজন বড় জাত! আমার গুরু পরমহংসদেব একদিন সমাধিভঙ্গের পর নিজের মনেই বলছিলেন,' 'জীবে দয়া, জীবে দয়া? দুর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'।"

"অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

হে বীর যুবকবৃন্দ! দেশে দেশে আগে যাও। বিভিন্ন দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ—পরের চোখে নয়। তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার ওপর নিজেদের পুরাণ পুঁথিপাটা পড়। ভারতবর্ষ, দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ—খাজা আহাম্মকের চোখে নয়। সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক্‌ধক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা-ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান—এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে দিয়ে হয় তো হবে; নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

অনুভব কর, বৎসগণ, হৃদয় দিয়ে অনুভব কর; দরিদ্র, অজ্ঞান, দলিত জনগণের দুঃখ আপন হৃদয়ে অনুভব কর, তাদের দুঃখ হৃদয়ে ধারণ কর যতক্ষণ না হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসে, যতক্ষণ না চিত্ত বিকল হয়, যতক্ষণ না মনে হয় তুমি পাগল হয়ে যাবে—তারপরে ঈশ্বরের চরণে আপন আত্মাকে উৎসর্গ করে দাও। তখন পাবে শক্তি, পাবে ঈশ্বরের সহায়তা, পাবে অদম্য কর্মোৎসাহ।

রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন: "ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি বুকে হাত রেখে, দৃপ্ত ভারতীয় সন্ন্যাসী। His fascinating face, his noble stature, and the gorgeous apparel. His speech was like a tongue of flame. আগুনের শিখা জিহ্বাগ্রে, সভাস্থ মানুষের শ্রবণে বেজে উঠল একই সঙ্গে গর, সিম্ব্যাল, ঘণ্টা ও ফ্লুটের ধ্বনি। সেই বিখ্যাত সম্বোধন, "Sisters and Brothers of America"। তাণ্ডব লেগে গেল! শুধু এইটুকুতেই সে কী প্রবল উচ্ছ্বাস! করতালি, করতালি। "Hundreds arose in their seats and applauded. He wondered."—এ উচ্ছ্বাস প্রশংসার, না ব্যঙ্গের! প্রশংসা! বিবেকানন্দে তারা অভিভূত। ঐ শোন ভ্রাতৃগণ! গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। বিশ্বজুড়ে যত হানাহানি, যুদ্ধ ও ভেদাভেদের মরণঘণ্টা বাজছে। যত পতাকা উড়ছে, তার গায়ে উৎকীর্ণ হবে শীঘ্রই:

"HELP AND NOT FIGHT.
ASSIMILATION AND NOT DESTRUCTION.
HARMONY AND PEACE AND NOT DISSENSION."

সকলকে গ্রহণ কর, সকলকে বোঝার চেষ্টা কর।

"যত মত তত পথ"।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"
(শিবমহিম্নঃস্তোত্র) □

বিজ্ঞান

কোলেস্টেরল ও করোনারি ঃ আমাদের করণীয়

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

এম. ডি., এফ. আর. সি. পি., এফ. এ. সি. পি., এফ. এ. সি. সি., এফ. সি. সি. সি. (এ. এইচ. এ.)

প্রফেসর অব মিডিসিন, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক (সিরাকিউজ); চীফ অব কার্ডিয়লজি, ভি. এ. মেডিক্যাল সেন্টার, সিরাকিউজ, নিউ ইয়র্ক।

মানুষের পরমায়ু (life span) সীমাবদ্ধ। যদি কারো জীবদ্দশায় কখনো কোন অসুখ-বিসুখ না হয় তাহলে সেই মানুষের দীর্ঘতম আয়ুষ্কাল (পরমায়ু) ১২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে বলে স্বীকৃত আছে। পরমায়ু এবং আয়ুষ্কালের প্রত্যাশিত গড় (life expectancy) এক নয়। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বেশি নমনীয় (flexible)—ঐ সীমাবদ্ধ পরমায়ুর মধ্যেও। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকায় আয়ুষ্কালের প্রত্যাশিত গড় ছিল প্রায় ৫০ বছর, আর আজ তা বেড়ে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৩ বছর এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৯ বছর হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতালাভের সময় বাংলায় এই গড় ছিল প্রায় ৩০ বছর এবং তার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তা দাঁড়িয়েছে ৫৫ বছরে। অবশ্য এই সমীক্ষায় শিশুমৃত্যুর হারও ধরা হয়ে থাকে। সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে কার্যকরী হওয়া এবং খাদ্যসমস্যা বা খাদ্যাভাব বহুলাংশে দূরীভূত হওয়াই আয়ুর প্রত্যাশিত গড় বৃদ্ধির কারণ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এখনো পাশ্চাত্যের তুলনায় পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে আয়ুবৃদ্ধির প্রভূত সুযোগ আছে, যেমন—পরিবার নিয়ন্ত্রণ, দূষিত পরিবেশ দূরীকরণ, জলনিকাশের ও বিশুদ্ধ জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করা, সুখাদ্য যোগানো, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও যানবাহনের আধুনিকীকরণ এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্মপদ্ধতির দ্রুত সুপরিবর্তন প্রভৃতি। এইসব ব্যবস্থা কার্যকরী হলে লোকের আয়ু বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যেসব অসুখ তার সঙ্গে সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং উঠছেও তাদের মধ্যে অন্যতম হলো করোনারি অর্থাৎ 'করোনারি হার্ট ডিজিজ' (Coronary Heart Disease) ও ক্যান্সার। এই প্রবন্ধে করোনারি ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি; তার কারণগুলির মধ্যে বিশেষ করে কোলেস্টেরল (Cholesterol) সমস্যাই আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু।

পাশ্চাত্য দেশে মানুষের বিশ্বাস ছিল বা এখনো আছে যে, করোনারি হার্ট ডিজিজ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিশেষ হয় না। এটা উন্নত দেশগুলিরই একচেটিয়া অসুখ এবং আমাদেরও ডাক্তারি পড়ার সময় তা শিখতে হয়েছিল। আজ এইসব দেশে এবং আমাদের দেশেও গবেষকরা দেখাচ্ছেন যে, কেবল ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনাবাসিক ভারতীয়দেরই (N.R.I—non-resident Indian) নয়, খাস ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও এই রোগ বহুদিন ধরেই আছে এবং এর প্রকোপ খুবই তীব্র ও মারাত্মক। যে-বয়সে মানুষ সাফল্যের উচ্চ ধাপে পৌঁছায় ও তার কর্মক্ষমতার পূর্ণবিকাশ হয়, ঠিক তখনই করোনারি অসুখ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় তার অমোঘ আঘাত হানে। এই রোগ হলে পারিবারিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যে মর্মান্তিক, তাতে সন্দেহ নেই।

ভারতীয়দের করোনারি অসুখ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে অর্থাৎ ৩৫ বা ৪০ থেকে ৫৫ বা ৬০ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এদের অসুখটা হৃৎপিণ্ডে অনেক ব্যাপক আকারে হয়, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুটি বা তারও বেশি করোনারি আর্টারি বা ধমনী একই সঙ্গে রোগাক্রান্ত হয়। অনাবাসিক ভারতীয়, যাঁরা অকালে এই অসুখে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক, পেশাদারী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা ব্যবসায়ীরাই যে কেবল আছেন তাই নয়, গৃহিণীরাও আছেন—এমনকি সাধু-সন্ন্যাসীরাও বাদ যাননি। আমাদের দেশেও ঠিক একই ধরনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস, কোন ব্যতিক্রম নেই।

করোনারি অসুখের কতকগুলি তথ্য

আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রতিদিন গড়ে ১ লক্ষ বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় রক্তকে পাম্প করার জন্য। সেই হিসেবে একজন ৭০ বছর বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ড এপর্যন্ত ২৫ কোটি বার এইভাবে স্পন্দিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ডটি প্রতিদিন গড়ে আড়াই হাজার গ্যালন বা সাড়ে বার হাজার লিটার রক্ত সারা শরীরের প্রয়োজন মেটাতে পাম্প করে। ভেবে দেখুন, কি ধরনের পরিশ্রম করতে হয় আমাদের এই হৃৎপিণ্ডকে! এর নিজের খাদ্য ও অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত যে রক্তবাহী ধমনীগুলি কাজ করে চলেছে তারাই করোনারি আর্টারি। এই

করোনারি আর্টারিগুলির একটিও যদি তার ভিতরের দেওয়ালে জমে ওঠা কোলেস্টেরল ও তার ওপর জমাট-বাঁধা রক্ত বা clot—যাকে থ্রম্বাস (thrombus) বলে, তাই দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই ধমনীতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের যে-অংশটি ঐ ধমনীবাহিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হচ্ছিল, সেই অংশটি অকেজো হয়ে পড়ে এবং যদি তার মধ্যে রক্ত-সরবরাহ ৩ ঘণ্টার মধ্যেও শুরু না হয় তাহলে সেই অংশটির মৃত্যুও হতে পারে। একেই বলা হয় 'হার্ট অ্যাটাক' বা 'মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান' (Myocardial Infarction)।

অ্যাথেরোসক্লেরোসিস্ (Atheroscleresis) কি?

করোনারি আর্টারির ভিতরের রক্তস্নাত দেওয়ালে যে সূক্ষ্ম আস্তরণ (endothelium) আছে, তার অখণ্ডতা এবং কার্যক্রম কোন কারণে ব্যাহত হলে অ্যাথেরোস-ক্লেরোসিসের সূত্রপাত হয়। কোলেস্টেরল—যা স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও অন্যান্য একই পর্যায়ের রাসায়নিক অণু (molecules) দ্বারা গঠিত, তখন সহজভেদ্য (permeable) ঐ আস্তরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে ধমনীর দেওয়ালে জমা হয় এবং ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে ও অন্যান্য কোষ দ্বারা পুষ্ট হয়ে ফলক বা 'প্লাক' (plaque) সৃষ্টি করে, যা রক্তসঞ্চালনে বাধা দেয়। পরে এই প্লাকের ওপরের আস্তরণটি (endothelial layer) যদি দৈহিক ও মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে ছিঁড়ে যায় তাহলে প্লাকের ওপর রক্ত সরাসরি জমাট বাঁধে ও রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়; তখনই বলা হয় 'হার্ট অ্যাটাক'। এই প্রক্রিয়ার কমবেশি তারতম্যে ও ধমনীর বড়-ছোট আকারভেদে কারো হয় 'অ্যানজাইনা' (Angina) বা হার্টের ব্যথা, আবার কারো হয় মেজর বা বড় রকমের অথবা মাইনর বা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক। করোনারি ও অন্যান্য ধমনীর এই ধরনের অসুখের পিছনে যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর প্রায় ১১ হাজার কোটি ডলার খরচ হয়। এই দেশে কেবল হার্ট অ্যাটাকে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ মারা যায়; তবে ক্রমশই তার সংখ্যা কমে আসছে—এটাই আশার কথা।

বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ কারণ (Risk factors)

গত প্রায় ৫০ বছরের গবেষণায় করোনারি অসুখের বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ কারণগুলি সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং তার প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। জানা গেছে, কি কি কারণ আমরা পরিবর্তন করতে পারি বা পারি না।

যেসব কারণ আমরা পরিবর্তন করতে পারি না সেগুলি হলো: (১) অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে করোনারি অসুখের বা হার্ট অ্যাটাকের ইতিহাস থাকে। 'পরিবার' বলতে এক্ষেত্রে যেসব আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের কথা বলছি। (২) যদি কারো আগে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে, তবে পরে তা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হয়। (৩) ৪০-এর ওপর যাদের বয়স, করোনারি অসুখের সম্ভাবনা তাদের বেশি। (৪) পুরুষদের ও রজোনিবৃত্ত স্ত্রীলোকদের হার্ট অ্যাটাক বেশি হয়, এটি সর্বজনস্বীকৃত তথ্য এবং সত্য। (৫) ডায়াবেটিস বা বহুমূত্ররোগ আমাদের দেশে খুবই বেশি হয় এবং এই ধরনের রোগীদের হার্ট অ্যাটাকের হারও অনেক বেশি। তার ওপর ডায়াবিটিস-রোগীদের মধ্যে অনেকের আবার বুকের ব্যথা নাও থাকতে পারে (silent heart attack)।

যেসমস্ত বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ হেতুগুলি আমরা পরিবর্তন করতে সক্ষম: (১) রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, (২) উচ্চ রক্তচাপ, (৩) ধূমপান, (৪) মেদাধিক্য এবং (৫) শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা।

কোলেস্টেরল সমস্যা

গত কয়েক বছরের গবেষণায় এই তথ্য জানা গেছে যে, রক্তে যদি কোলেস্টেরলের পরিমাণ ১% কমানো যায় তাহলে করোনারি অসুখের সম্ভাবনা ২% কমে যায়। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন, আমরা কিভাবে তা কমাতে পারি। কোলেস্টেরলের আধিক্য ৫০% কমানো অবস্থায় রাখা সম্ভবপর হলে হয়তো করোনারি অসুখের সমস্যার সমাধান অনেকাংশেই সম্ভব হবে।

প্রথমেই জানা দরকার সত্যিই শরীরে কোলেস্টেরলের আধিক্য আছে কিনা এবং থাকলে কত বেশি ও তার পরিমাণই বা কত। পুরুষদের ৩৫-এর ওপর যাদের বয়স, রজোনিবৃত্ত স্ত্রীলোকদের বা তার কাছাকাছি বয়সের এবং যাদের এছাড়া অন্য কোন বিপদ-সম্ভাবনাপূর্ণ কারণ আছে বা থাকার সম্ভাবনা আছে, তাদের ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ অন্তর দু-তিন বার ভাল ল্যাবরেটরিতে রক্তপরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া দরকার। রক্তপরীক্ষার আগে উপবাসের দরকার হয় না, যদি কেবল মোট কোলেস্টেরল এবং 'গুড' কোলেস্টেরল বা এইচ. ডি. এল. (H. D. L.—High Density Lipoprotein) কোলেস্টেরল মাপা হয়। কোলেস্টেরলের সমস্যা নিয়ে যদি কারো ক্ষেত্রে সন্দেহ হয় তাহলে প্রাথমিক পরীক্ষা স্ক্রিনিং টেস্ট হিসেবে এই দুটি মাপাই প্রশস্ত। কিন্তু যদি লিপিড প্রোফাইল (lipid profile—সামগ্রিক স্নেহজাতীয় পদার্থের রেখাচিত্র) বা ঐ

দুটির সঙ্গে 'ব্যাড' কোলেস্টেরল বা এল. ডি. এল. (Low Density Lipoprotein) নির্ণয় করতে হয় তাহলে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা উপবাসের পর রক্তপরীক্ষার প্রয়োজন হয়। স্ক্রিনিং টেস্ট-এ যদি অস্বাভাবিক পরিমাণে মোট কোলেস্টেরল বা 'গুড' কোলেস্টেরল ধরা পড়ে তাহলেই সাধারণতঃ লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষার দরকার হয়। এর জন্য ট্রাইগ্লিসারাইডস (Triglycerides, যা খাদ্যদ্রব্য হজমের পর স্নেহপদার্থ যে রাসায়নিক অণুর আকারে রক্তে সঞ্চালিত হয়)—যাকে কেউ কেউ আবার 'আগলি' (ugly) কোলেস্টেরল নাম দিয়েছেন—তাও মাপার প্রয়োজন। খাদ্যবস্তুতে ভেষজ (carbohydrates) ও স্নেহজাত উপাদানের তারতম্যে ট্রাইগ্লিসারাইডস রক্তে খুবই বাড়ে কমে ; খোদ কোলেস্টেরলের মাত্রা কিন্তু এতটা অল্পসময়ের মধ্যে ওঠানামা করে না। তাই ট্রাইগ্লিসারাইডস মাপতে গেলে তার আগে উপবাস করতে বলা হয়।

ট্রাইগ্লিসারাইডসের পরিমাণকে ৫ দিয়ে ভাগ করে যে-ভাগফল হয় সেটা মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ থেকে বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, তার থেকে আবার এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাদ দিলে এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ জানা যায়। এর নাম 'ফ্রিদেভালদ ইকোয়েশান' (Friedewald Equation)। কিন্তু একটা সমস্যা হলো, যদি ট্রাইগ্লিসারাইডসের পরিমাণ রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ৪০০ মিলিগ্রামের বেশি হয় তাহলে এই পদ্ধতিতে এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল মাপা ভ্রান্তিমূলক হয়। তখন যদি সুযোগ থাকে (যার সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ ল্যাবরেটরিতে এখনো নেই) তাহলে সরাসরি রক্তে এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল মাপাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যা আমরা করে থাকি তা হলো চিকিৎসা করে ট্রাইগ্লিসারাইডস আগে কমিয়ে তারপর খতিয়ে দেখা—লিপিড প্রোফাইলের কি অবস্থা দাঁড়াল। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, স্বাভাবিকভাবে কোলেস্টেরল সমস্ত দেহকোষের বহিরাবরণের, মস্তিষ্ক ও শিরার এবং নানা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হরমোনের (hormone—জীবদেহজ রসবিশেষ) উপাদান। এর আধিক্য কত ক্ষতিকর তা এখন সহজেই অনুমেয়। কোলেস্টেরল বা স্নেহজাতীয় পদার্থের অণুগুলি রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে না। এর জন্য এদের এইচ. ডি. এল. এবং এল. ডি. এল. ট্রাইগ্লিসারাইডের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ প্রয়োজন হয়। এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলকে লিভারে নিয়ে আসে নিষ্ক্রমণের জন্য, কতকটা আবর্জনাদূরকারী কর্মীদের (scavengers) মতো। আর এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলকে রক্তের মধ্যে নিয়ে যায়, যা অবস্থার তারতম্যে অক্সিজেন-যুক্ত হয়ে ধমনীর দেওয়ালে পূর্বোক্ত প্লাক-এর সৃষ্টি করে। লিভার ও অন্যান্য শরীরাংশে (tissue) এই এল. ডি. এল.-কে গ্রহণ করার জন্য অনেক গ্রাহক প্রোটীন থাকে ; তারা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল জুটিকে গ্রহণ করে রক্তে এর পরিমাণ কমিয়ে রাখে। শরীরে এই এল. ডি. এল.-গ্রাহকদের সংখ্যা কম থাকলে (কোন ক্ষেত্রে বংশজাত, অনেক ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার প্রতিফলন হিসেবে) রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ (যা মোটামুটিভাবে এইচ. ডি. এল. ও এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের সংমিশ্রণ) পাশ্চাত্যের মানুষের রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ২০০ মিলিগ্রামের নিচে রাখা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয়দের পক্ষে তা মোটামুটিভাবে ১৫০ বা ১৬০ মিলিগ্রামের নিচে রাখাই মঙ্গল। এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে, যাদের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বা করোনারি অসুখের অন্যান্য লক্ষণ ধরা পড়েছে কিংবা অ্যানজিওপ্লাস্টি বা অন্য শল্যচিকিৎসা হয়ে গেছে তাদের পক্ষে প্রতি ডেসিলিটার রক্তে ১০০ মিলিগ্রাম বা তার নিচে রাখা ভাল। এবিষয়ে কেউ বলেন, ১২৫ মিলিগ্রামও চলতে পারে। আর যাদের করোনারি অসুখের কোন লক্ষণ এপর্যন্ত দেখা যায়নি, তাদের পক্ষে এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ১৩০ থেকে ১৬০ মিলিগ্রামই বাঞ্ছনীয়। পাকাপোক্তভাবে যাদের করোনারি অসুখ ধরা পড়েছে ও তার সঙ্গে এই ক্ষতিকারক 'ব্যাড' কোলেস্টেরল (L. D. L.)-ও বেশি আছে, তাদের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত কোলেস্টেরলের পরিমাণ রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের নিচে রেখে দেখা গেছে যে, তাদের ভবিষ্যতে আবার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বা এই সংক্রান্ত অন্যান্য উপসর্গ অনেক কম হয়েছে, এমনকি ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে প্লাকের অবস্থারও কিছু ক্রমোন্নতি হয়েছে অর্থাৎ কমেছে। আশার কথা, এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল কমানো চেষ্টাসাধ্য ও অপেক্ষাকৃত সহজ। পরে এবিষয়ে বিশদভাবে বলছি।

যাদের শরীরে 'গুড' কোলেস্টেরলের পরিমাণ প্রতি ডেসিলিটারে ৬৫ মিলিগ্রাম বা তারও বেশি থাকে (স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আরও প্রায় ১০ মিলিগ্রাম যোগ করুন) তাদের করোনারি অসুখের সম্ভাবনা অনেক কম হয় (a negative

risk factor)। কিন্তু শরীরে এই কোলেস্টেরল বাড়ানো মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া 'গুড' কোলেস্টেরল বাড়িয়ে পরে ঠিক ঐ ধরনের ('ব্যাড' কোলেস্টেরল কমানোর মতো) ফল পাওয়ার প্রমাণ এখন পুরোপুরি আমরা পাইনি। ট্রাইগ্লিসারাইডসের সঙ্গে 'গুড' কোলেস্টেরলের বিপরীতার্থক (reciprocal) সম্বন্ধ। যাদের প্রথমটি বেশি তাদের দ্বিতীয়টির পরিমাণ কম হয় এবং সম্ভবতঃ ট্রাইগ্লিসারাইডসের ক্ষতিকারক বদগুণ অনেকাংশে আনুষঙ্গিক অর্থাৎ 'গুড' কোলেস্টেরল কম থাকার জন্যও হতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ হয়তো খুব একটা বেশি নেই (অনেক ভারতীয় তার মধ্যে পড়ে), কিন্তু তাসত্ত্বেও করোনারি অসুখের প্রকোপ বা প্রকাশের কমতি নেই। এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত যারা, তাদের অনেকেরই রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডস বেশি (২০০ মিলিগ্রামের ওপর), পেটে মেদবৃদ্ধি, নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের রক্তে উচ্চচাপ বর্তমান এবং তার সঙ্গে রক্তে এইচ. ডি. এল-এর পরিমাণও কম। এই চারটির সমন্বয়কে রিভেন সাহেব নাম দিয়েছেন 'সিন্ড্রোম এক্স'। কেউ আবার (যেমন ক্যাপলান সাহেব) বলেছেন, মারাত্মক এই সমন্বয় (deadly quartet) যাদের মধ্যে প্রকট তাদের শরীরে হয় ডায়াবিটিস। এদের ডায়াবিটিসে ইনসুলিন কার্যকর হয় না অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' হয়ে যায়। রক্তে সুগার-এর পরিমাণ স্বাভাবিক রাখার জন্য দরকার হয় ইনসুলিন নামক হরমোন। সিন্ড্রোম এক্স-এ শরীরের নানা কোষ ইনসুলিনের প্রভাব মানতে চায় না, তাকেই বলে 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স'। এর জন্য উপরোক্ত নানা ধরনের জটিল সমস্যার সূচনা হয়। ওজন কমানো ও দৈহিক শ্রম বাড়ানো বহুলাংশে এই সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে।

এল. পি. লিটল-এ [Lp(a)] কি?

এও দেখা গেছে যে, রক্তে মোট কোলেস্টেরল, 'গুড' ও 'ব্যাড' কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডস সবই হয়তো তথাকথিত স্বাভাবিক সীমায় আছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও হার্ট অ্যাটাকের কমতি নেই! বিশেষ ধরনের ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় এই পর্যায়ের সমস্যাগ্রস্তদের অনেকের রক্তে Lp(a) নামক স্নেহজাতীয় পদার্থের (lipoprotein) পরিমাণ অনেক বেশি দেখা গেছে। এটি শুধু 'ব্যাড' কোলেস্টেরল নয়, এর সঙ্গে যুক্ত থাকে লিটল-এ (a) নামক একটি লাইপোপ্রোটীন, যার রক্তকে জমাট বাঁধানোর (thrombogenic) ক্ষমতাও আছে। কেউ কেউ তাই এটিকে বলেন 'মারাত্মক কোলেস্টেরল' ('deadly cholesterol')। ভারতীয়দের মধ্যে বংশজাত (genetic) এই কোলেস্টেরলের প্রকোপ বেশি এবং সাধারণতঃ যেসমস্ত উপায় অবলম্বন করলে কোলেস্টেরল সমস্যা আয়ত্তে আনা যায়, সেগুলির দ্বারা এর পরিমাণ বিশেষ কমে না। তবে আজও প্রমাণ হয়নি, খুব বেশি ডোজ (dose)-এ নায়াসিন (Niacin) খেয়ে এল. পি. লিটল-এ. কমানো গেলেও করোনারির অসুখে তার কিছু ফল হয় বা হয় না।

এবারে এক এক করে আলোচনা করব কিভাবে আমাদের জ্ঞানসম্মত উপায়গুলি অবলম্বন করলে কোলেস্টেরলের সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, কিভাবে 'গুড' কোলেস্টেরল বাড়ানো যেতে পারে—

কোলেস্টেরলবাহী খাদ্য কম খাওয়া, নিয়মিত পরিশ্রম করা বা জোরে হাঁটা বা সাঁতার কাটা এবং তার সঙ্গে খাদ্য-পরিমাণ কমিয়ে শারীরিক ওজন ও মেদবাহুল্য পরিমিত করা, আর ধূমপানকারীদের চিরতরে ধূমপান ত্যাগ করা 'গুড' কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে।

মোট (total) কোলেস্টেরল এবং 'ব্যাড' কোলেস্টেরল কমানোর উপায়—

(১) যেসব খাদ্যদ্রব্য পরিহার করা বা অনেক কম খাওয়া ভাল: রেড মীট (যেমন পাঁঠা, গরুর মাংস), যকৃত (liver), বৃক্ক (kidney), মস্তিষ্ক ইত্যাদি, চর্বিযুক্ত মাংস, ডিমের কুসুম, বনস্পতি-জাতীয় খাদ্য, দুধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী—বিশেষ করে মাখন, ঘি, ছানার খাবার, আইসক্রীম, পনীর ইত্যাদি। নারিকেল তেল বা পাম অয়েলে রান্না খাবারও পরিহার্য।

(২) যেসব খাদ্যদ্রব্য এই প্রসঙ্গে প্রশস্ত: মাখনতোলা দুধ ও ঐ দুধে পাতা দই, তরিতরকারি—যেমন শাকসবজি, গাজর, ছোলা-মটর, ভাত, ডাল, গম থেকে তৈরি খাবার অর্থাৎ প্রায় সবরকম নিরামিষ খাবার (ঘি বা বনস্পতি বা ঐ ধরনের তেলে রান্না খাবার নয়) গ্রহণীয়। মাছ বা মুরগির মাংস (ছাল বাদ দিয়ে) পরিমিত পরিমাণে সপ্তাহে ২।৩ দিন (উদাহরণস্বরূপ ২ দিন মাছ, ২ দিন মুরগি ও বাকি ৩ দিন নিরামিষ) খাওয়ার অনুমোদন করা হয়। পেঁয়াজ বা রসুন খাওয়া ভালই।

রান্নায় তেল-ঘি-জাতীয় জিনিসের ব্যবহার এবং ভাজা খাবার খাওয়া কমানোর প্রয়োজন—বিশেষ করে যাদের

ওজন বেশি বা যাদের পেটের গণ্ডগোল। পরিমিত পরিমাণে বাদাম তেল, রেপসিড অয়েল, অলিভ অয়েল বা ভুট্টার তেল, সূর্যমুখী ফুলের তেল, সয়াবিন তেল ব্যবহার করা চলতে পারে। আগেই বলেছি যে, ঘি, মাখন বা জমাট মার্জারীন দূরে রাখাই সমীচীন। সবরকমের ফল (বেশি পরিমাণে ঝুনো নারকেল ছাড়া) সম্ভব হলে রোজই কিছু খাওয়া ভাল। তবে যাদের ডায়াবিটিস আছে তাদের এবিষয়েও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। চিংড়ি মাছে কোলেস্টেরল থাকলেও স্যাচুরেটেড ফ্যাট কম থাকায় মাঝে মধ্যে পরিমিত খেতে বাধা নেই। ডিমের সাদা অংশ ভাল প্রোটীন এবং অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন সে-দেশের জাতীয় কোলেস্টেরল শিক্ষা প্রোগ্রামে (National Cholesterol Education Program) নির্দেশ দিয়েছে যে, রোজ মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ক্যালরির (calories) ৩০ শতাংশেরও কম স্নেহজাতীয় খাদ্যজাত হতে পারে, ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট-জাত এবং বাকিটা প্রোটীন থেকে নিতে হবে। তার মধ্যে ভেজিটেবল প্রোটীন অপেক্ষাকৃত কাম্য। কোলেস্টেরল রোজ ২০০ মিলিগ্রামের বেশি না খাওয়াই মঙ্গলজনক। আমেরিকায় সপ্তাহে ৩টির বেশি ডিম খেতে নিষেধ করা হচ্ছে।

একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে, অনেক খাবারে 'No Cholesterol' বা 'Low Cholesterol' লেখা থাকলেও যদি ওগুলিতে বেশি স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে তাহলে তারা সমান ক্ষতি করতে পারে। ঘি, মাখন, জমাটবাঁধা মার্জারীন, নারকেল বা পাম তেলের কথা আগে বলেছি; এদের মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি থাকার জন্যই এগুলি প্রায় বর্জনীয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল-গ্রাহক প্রোটীনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে কোলেস্টেরলকে রক্ত থেকে গ্রহণ করে তার পরিমাণ রক্তে কমানো সম্ভব হয় না ঐ কোলেস্টেরল-গ্রাহক প্রোটীনের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে আরও খেয়াল রাখতে হবে যে, শুধু কি কি খাওয়া ভাল বা মন্দ তাই নয়, কতটা পরিমাণে সেই খাবার খাওয়া দরকার তারও হিসেবে রাখা উচিত। এটা বিশেষ করে স্থূলাঙ্গ বা বেশি ওজনের ব্যক্তিবিশেষের ও ডায়াবিটিসে আক্রান্তদের পক্ষে প্রযোজ্য। প্রথমটির সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশি না হলেও ক্রমশঃ তা বাড়ছে, বিশেষ করে বিত্তবান পরিবারে ও দৈহিক পরিশ্রম-বিমুখদের মধ্যে। দ্বিতীয়টির অর্থাৎ ডায়াবিটিসের প্রকোপ আমাদের দেশে খুবই বেশি, এমনকি ইংল্যান্ডের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ওদেশের ভারতীয়দের মধ্যে (যার মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানুষও আছে) ডায়াবিটিসের হার ওদেশে জাত ইংরেজদের (native Englishmen) ৪ গুণ বা তারও বেশি।

যাদের রক্তে কোলেস্টেরল বেশি তাদের খাদ্যদ্রব্য পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করে, দৈহিক পরিশ্রম বা তৎপরতা বাড়িয়ে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান বর্জন ইত্যাদি পালন করে কতদূর ফল হলো তা দেখার জন্য ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে, তারপর ৩ মাস পরে এবং ক্রমশঃ বছরে দুবার বা সন্তোষজনক ক্ষেত্রে অন্ততঃ একবার করেও রক্তপরীক্ষার দরকার হয়। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সুচিকিৎসকের পরামর্শমত চলা। যদি চিকিৎসক মনে করেন যে, কেবল এইসব সুস্বাস্থ্যমূলক বিধানগুলি (hygienic measures) কোলেস্টেরলের পরিমাণ তেমন কমাতে পারছে না তখন তিনি তা আরও কমানোর জন্য বিশেষ ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। তার আগে দৈহিক পরিশ্রম-সংক্রান্ত কিছু কথা বলে নিচ্ছি।

নিয়মিত দৈহিক পরিশ্রম করা ও মেদাধিক্য নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর জন্য ডন-বৈঠক বা মুগুর ভাঁজার খুব একটা দরকার হয় না। যারা জোরে হাঁটতে পারে [জোরে জগিং (jogging) নয়, তাতে জয়েন্ট-এ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি], তারা যদি কোন পার্কে বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সপ্তাহে ৩।৪ দিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটে, তাহলেই হবে। এটার বিশেষ প্রয়োজন প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য, যাদের নিয়মিত হাঁটার প্রয়োজনই হয় না—মোটরগাড়ির দৌলতে তারা সামান্যতম দৈহিক পরিশ্রম থেকেও নিজেদের দূরে রেখেছে। বাতের প্রকোপে যারা জোরে হাঁটতে পারে না তাদের জন্য সাঁতার শেখা ও সাঁতার কাটা প্রশস্ত। তারও সুযোগ যাদের নেই, তাদের পক্ষে খাদ্যনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যোগাসন অনুশীলন করাই বিধেয়।

ছয় রকমের ওষুধ কোলেস্টেরল সমস্যার জন্য ব্যবহার করা হয়, অন্যান্য যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা আগে বলা হয়েছে তাদের সঙ্গে—তাদের পরিবর্তে নয়। একমাত্র সুচিকিৎসকের পরামর্শমত এইগুলি ব্যবহার করা উচিত। চিকিৎসকের নির্দেশ অনুযায়ী কতদিন অন্তর তাঁর কাছে 'চেক আপ'-এর জন্য আসতে হবে, কিভাবে ওষুধগুলি খেতে হবে এবং এদের কি কি কুফল হতে পারে তা পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে হবে।

ওষুধগুলির শ্রেণীর কথা সংক্ষেপে বলছি।

(১) বাইল অ্যাসিড সিকোয়েস্ট্র্যান্টস (Bile acid sequestrants)—যথা কোলেস্টাইরামিন রেজিন (Cholestyramine Resin)। এই ওষুধ পিত্ত থেকে মোট কোলেস্টেরলকে ও এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলকে অন্ত্রের পথে বের করে দেয়। ট্রাইগ্লিসারাইডস একটু বাড়তেও পারে এবং এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলের তেমন তারতম্য নাও হতে পারে।

(২) নায়াসিন (Niacin)—ভিটামিন B_3ঃ এই ওষুধটি শুধু মোট কোলেস্টেরলই নয় এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডসের পরিমাণ কমায় এবং তার সঙ্গে এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ায়। কিন্তু আনুষঙ্গিক এবং অনেক সময় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার (side effects) জন্য অনেকেই প্রয়োজনমত বেশি মাত্রায় খেতে পারে না। প্রায় ৫০% ক্ষেত্রে ওষুধ বন্ধ করে অন্য ওষুধের সাহায্য নিতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শমত খুব আস্তে আস্তে এর মাত্রা বাড়াতে হয় ও খাবারের সঙ্গে খেতে হয়।

(৩) এইচ. এম. জি.—কো এ রিডাকটেজ ইনহিবিটার্স (H. M. G.—Co A Reductase Inhibitors), যেমন—লাভাস্ট্যাটিন বা মেভাকর (Lavastatin বা Mevacor), প্র্যাভাস্ট্যাটিন বা প্র্যাভাকল (Pravastatin বা Pravachol), সিমভ্যাস্ট্যাটিন বা জোকর (Simvastatin বা Zocor) ও ফ্লুভ্যাস্ট্যাটিন বা লেস্কল (Fluvastatin বা Lescol)ঃ এরা লিভারে কোলেস্টেরল তৈরি বন্ধ করতে সাহায্য করে। তার সঙ্গে এরা এল. ডি. এল.-গ্রাহক প্রোটীনদের সংখ্যা বাড়িয়ে রক্তে মোট কোলেস্টেরল ও এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশ কমিয়ে দেয়। ফলটি মাত্রাসাপেক্ষ এবং চিকিৎসকের উপদেশমত খেয়ে প্রচুর উপকার পাওয়া যায়। এরা আবার এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরল একটু বাড়ায় এবং ট্রাই-গ্লিসারাইডসের পরিমাণও খানিকটা কমায়। এদের আনুষঙ্গিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও বেশি নয়। এদের দাম কিন্তু বেশি।

(৪) ফিব্রিক অ্যাসিডস (Fibric Acids) যথা জেমফাইব্রোজিল বা লোপিড (Gemfibrozil বা Lopid)ঃ এরা ট্রাইগ্লিসারাইডস কমায় এবং এইচ. ডি. এল. বা 'গুড' কোলেস্টেরল বাড়ায়। এল. ডি. এল. বা 'ব্যাড' কোলেস্টেরলের পরিমাণ নাও কমতে পারে।

(৫) প্রোবিউকল (Probucol) বা লোরেলকো (Lorelco)ঃ এটি এল. ডি. এল. কোলেস্টেরল কমালেও 'গুড' বা এইচ. ডি. এল. কোলেস্টেরলও কমিয়ে দেয়। এর জনপ্রিয়তা এখন অনেক কমে এসেছে।

(৬) হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা এইচ. আর. টি. (Hormone Replacement Therapy বা H. R. T.)ঃ কোন বিশেষ বাধার কারণ না থাকলে রজোনিবৃত্ত মহিলাদের চিকিৎসকের সুচিন্তিত পরামর্শমত ইস্ট্রোজেন (Estrogen) ০.৬২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রতিদিন খাওয়া মঙ্গলকর। যাদের পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস আছে তাদের পক্ষে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় এই ওষুধ ব্যবহারের আগেই। কিছু ক্ষেত্রে জরায়ুর অন্তরাস্তরণে ক্যানসারের সম্ভাবনা দেখা গেছে এই ওষুধ ব্যবহার করে। স্তনের ক্যানসার সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তাই এই সতর্কতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ওষুধটি যে কেবল 'ব্যাড' বা এল. ডি. এল. কোলেস্টেরলই কমায় তা নয়, এইচ. ডি. এল.-ও বাড়ায় এবং অস্টিওপিনিয়া বা অস্টিওপোরোসিস (Osteopenia বা Osteoporosis) যাতে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় তাতেও সাহায্য করে। রক্তচাপ ও অন্যান্য নানা ধরনের অসুবিধায় এই বয়সের মহিলাদের ক্ষেত্রে ওষুধটি শুভফল দেয়। কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

(৭) অ্যান্টি অক্সিড্যান্টস (Anti-oxidants) যেমন ভিটামিন-Eঃ এরা এল. ডি. এল.-কে অক্সিডাইজড হতে বাধা দেয়, ফলে ধমনীর অন্তর্দেওয়ালের মধ্যে কোলেস্টেরল জমা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু এরা সরাসরি কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় না।

পরিশেষে বক্তব্য হলো এই যে, যাদের পরিবারে ডায়াবিটিস বা করোনারি অসুখের ইতিহাস আছে এবং যাদের এগুলি হওয়ার মতো কারণ আছে তাদের ঐকান্তিকভাবে হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করা উচিত। এতে যাদের এখনো হার্ট অ্যাটাক হয়নি কেবল তারাই নয় (primary prevention), যাদের হয়েছে বা যাদের নানা ধরনের অ্যানজিওপ্লাসটি অথবা শল্যচিকিৎসা (যেমন বাইপাস সার্জারি—Coronary artery bypass surgery) করা হয়েছে তারাও ভবিষ্যতে যথেষ্ট উপকৃত হবে (secondary prevention), এতে সন্দেহ নেই।□

গ্রন্থ-পরিচয়

প্রসঙ্গ ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শান্তি সিংহ

গীতা-পরিচয়—রামদয়াল দেবশর্মা (মজুমদার)। প্রকাশক ঃ এইচ. রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস। ৩।৪ হেয়ার স্ট্রীট (দ্বিতল), কলকাতা-৭০০ ০০১। পৃষ্ঠা ঃ ১৪+১৪৭+৭। মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

গীতা-হৃদয়—বাণেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশিকা ঃ মণিদীপা মুখোপাধ্যায়। পি ৯১, অক্সিটাউন শিবরামপুর, কলকাতা-৭০০ ০৬১। পৃষ্ঠা ঃ ১২+৭২। মূল্য ঃ ২০ টাকা।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ-সমন্বিত গীতায় হিন্দুধর্মের সার উপদেশ বিধৃত। বেদাধ্যয়নে অপারগদের জন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস পঞ্চম বেদ মহাভারত রচনা করেছেন। মহাভারতের 'জ্ঞানকাণ্ড' গীতা। যুগে যুগে কী সন্ন্যাসী ও কী গৃহী—সকলেই গীতপাঠে নব জীবনানন্দ লাভ করেছেন। দেশবরেণ্য মনীষীরা যুগে যুগে গীতার ভাবব্যাখ্যায় এগিয়ে এসেছেন। পণ্ডিতপ্রবর রামদয়াল দেবশর্মা (মজুমদার) প্রদীপ্ত মনীষার আলোয় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে '**গীতা-পরিচয়**' রচনা করেন। সুদীর্ঘকাল পরে ঐতিহ্যঋদ্ধ প্রাচী প্রকাশন-সংস্থা ১৪০০ বঙ্গাব্দে এই মূল্যবান গ্রন্থটির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ প্রসঙ্গে 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে যথার্থই বলেছেন ঃ "যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধের সহিতই তুলনা দেওয়া হয়, যেমন সাগরের তুলনা সাগরের সহিতই দেওয়া হয়, সেইরূপ গীতার তুলনা গীতাই।"

আলোচ্য গ্রন্থে মূল আছে, সার-সংগ্রহ সংস্কৃত টীকা, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদের সঙ্গে কৃষ্ণার্জুনের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাসঙ্গিক শাস্ত্রাদির সমন্বয়সূত্রে প্রতিটি শ্লোকের তাৎপর্য আলোচনাও আছে। সংস্কৃত টীকায় শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বিদ্যাভূষণ, নীলকণ্ঠ, হনুমৎস্বামী, রামানুজাচার্যের ভাষ্য ও টীকার সার গ্রহণ করে রামদয়াল মজুমদার মহাশয় অভিনব সারস্বত নৈবেদ্য রচনা করেছেন। আলোচনার ভাষা সাবলীল অথচ মননঋদ্ধ। দশটি অধ্যায়ের ভাবব্যাখ্যান সুপরিকল্পিত। তন্মধ্যে 'শ্রীগীতার স্থান, কাল ও পাত্র', 'শ্রীগীতার বিশেষত্ব', 'শ্রীগীতার রক্ষামন্ত্র', 'শ্রীগীতার লক্ষ্যসঙ্কেত', 'শ্রীগীতার কর্মসঙ্কেত', 'শ্রীগীতায় জগতের সম্পূর্ণ ধর্ম' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে গীতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সরল ও গভীর ব্যঞ্জনা আমরা যেন মনে রাখি ঃ "গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যার ত্যাগ হয়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভক্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম বুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২১।৩) শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে কথোপকথনকালে বলেছিলেন ঃ "তাঁকে জানলে সব জানা যায়।... আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা।" (ঐ, ৫।পরিশিষ্ট-ক।৪) মজুমদার মহাশয়ও গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে অনুরূপ ভাবব্যাখ্যা করেছেন ঃ "বেদে যেমন কর্মকাণ্ড, ভক্তিকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড আছে, গীতাও সেইরূপ কাণ্ডত্রয়ভেদে 'তত্ত্বমসি'র ব্যাখ্যা মাত্র।

" 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।

"যাহা লাভ করিলে সকলই লাভ হয়, অন্য লাভ ইচ্ছা থাকে না—গীতা বলেন, মনুষ্য এই অবস্থা লাভ করুক। ইহারই জন্য মনুষ্যের সৃষ্টি। কিন্তু আরম্ভ করিতে হইবে কর্ম হইতে।

" 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥'

"সৃষ্টির প্রারম্ভে, ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন—এই কর্ম দ্বারা তোমরা ক্রমোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্টভোগপ্রদ হউক।... নিষ্কাম কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান মনুষ্যকে সীমাশূন্য সুখের অবস্থা প্রদান করে।" (পৃঃ ৭১-৭২)

গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশক সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবী বাণেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় '**গীতা-হৃদয়**' গ্রন্থে বাঙলা ও ইংরেজীতে ছন্দোবদ্ধ ভাবরূপ পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচনায় মনীষার সঙ্গে ভক্তিপ্রাণতা যেন গঙ্গা-যমুনার মিলন ঘটিয়েছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে 'লেখকের নিবেদন' অংশে ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন ঃ "আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব পণ্ডিত ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়

উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে গীতাপাঠ করতেন। মনে পড়ে, এক মেঘমেদুর শ্রাবণ সন্ধ্যার কথা। অবিরল বারিধারা ঝরে চলেছে। আমাদের বাদলপুর গ্রামের মসীযবনিকা ভেদ করে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিকের ঝলক সমস্ত অঙ্গন ও প্রাঙ্গণকে সচকিত করে যায়।... বাবার কি সুন্দর ছন্দ—মধুর কণ্ঠ!" লেখকের কবিপ্রাণতা ও অভিনব সাহিত্য- প্রয়াস প্রশংসনীয়।

বেদান্তগ্রন্থের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা

স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

বেদান্তসারঃ—সদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী। অনুবাদক ও সম্পাদক: ব্রহ্মচারী অনঘচৈতন্য। প্রকাশক: স্বামী অমৃতত্বানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংলাদেশ। মূল্য: ২০ টাকা।

বেদান্তসারঃ সদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈত বেদান্তের একটি উৎকৃষ্ট প্রকরণগ্রন্থ। প্রকরণগ্রন্থ হলো মূলশাস্ত্রের সহায়ক গ্রন্থ অর্থাৎ মূলশাস্ত্রের যে প্রতিপাদ্য বিষয়, সেই বিষয়ের মূলভাবকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য রচিত গ্রন্থ। **বেদান্তসারঃ** গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থকার সদানন্দযোগীন্দ্র অদ্বৈত বেদান্তের মূল বিষয়বস্তুকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। যাঁরা সংক্ষিপ্তভাবে অদ্বৈত বেদান্তের বিষয়ে জানতে চান তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত উপযোগী। এই গ্রন্থে বেদান্তের অধিকারী, বেদান্তের সাধন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে নির্বিকল্পসমাধি ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ পর্যন্ত অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কোন প্রকরণগ্রন্থে বেদান্তের বিষয় যত সহজভাবেই বোঝানো হোক না কেন, সেই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাঠ থেকে বিষয়বস্তুর সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুব সহজ নয়। এমনকি মূলের বঙ্গানুবাদ পড়েও পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ সাধারণ পাঠক বুঝতে পারে না। এজন্য টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। **বেদান্তসারঃ** গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এ গ্রন্থটি বুঝতেও টীকার সাহায্য আবশ্যক হয়। এই কারণে গ্রন্থটির ওপর আপোদেব বিরচিত 'বালবোধিনী', নৃসিংহ সরস্বতী বিরচিত 'সুবোধিনী' ও রামতীর্থ যতি বিরচিত 'বিদ্বন্মনোরঞ্জনী' নামে তিনটি প্রসিদ্ধ টীকা আছে। কিন্তু এই টীকাগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না তাঁদের পক্ষে এগুলি বোঝার প্রশ্নই আসে না, এমনকি যাঁরা খুব সামান্য সংস্কৃত জানেন তাঁরাও এই টীকাগুলি অনুসরণ করে মূলের অর্থ বুঝতে অসুবিধা বোধ করবেন। পাঠকবর্গের এই অসুবিধা দূর করবে ব্রহ্মচারী অনঘচৈতন্য সম্পাদিত **বেদান্তসারঃ** গ্রন্থটি। সম্পাদক প্রাঞ্জল চলতি বাঙলায় মূল (text)-এর অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের সারল্যগুণে খুব সহজেই মূলের অর্থ অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। 'অমৃতটীকা' নামে সম্পাদকের রচিত একটি বাঙলা টীকাও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। চলতি বাঙলায় রচিত টীকাটি খুবই চমৎকার হয়েছে। টীকাটি পড়লে বোঝা যায় যে, সম্পাদক অনেক পরিশ্রম করে টীকাখানি রচনা করেছেন। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকও এই টীকাসহায়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু বুঝতে পারবেন। **বেদান্তসারঃ** গ্রন্থের এরূপ একটি বাঙলা টীকার খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন ব্রহ্মচারী অনঘচৈতন্য।

গ্রন্থটির মূল (সংস্কৃত) পাঠ সাধারণের উপযোগী করতে গিয়ে সম্পাদক সমাসবদ্ধ পদগুলিকে সন্ধিবিযুক্ত করেছেন এবং কোন কোন স্থলে সমাসও বিযুক্ত করেছেন। এর ফলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মূল পাঠ পড়া সহজ হবে ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এভাবে লেখা ভুল বলেই গণ্য হবে। পাঠকে সহজ করতে গিয়ে ব্যাকরণের নিয়ম থেকে সরে আসা উচিত কি? বিশেষ করে সংস্কৃতের ক্ষেত্রে? তবু সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটির এই সম্পাদনার জন্য সম্পাদকের পরিশ্রম ও প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।☐

বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' পত্রিকায় উৎসবাদি বা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সেই সংবাদ আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো আবশ্যক। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

জলপাইগুড়ি আশ্রম ওডলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০টি গ্রামের ৪২৯টি বন্যাকবলিত পরিবারকে ৪০৬টি ধুতি, ৪১৫টি শাড়ি, ১৩৩২টি শিশুদের পোশাক, ২৬৫টি তুলোর চাদর, ৪০০টি পশমী কম্বল, ৫২৮৯টি ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, ৭১৪টি স্টিলের থালা এবং ৩১৭৬টি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রাদি বিতরণ করেছে। এছাড়া কুচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমায় ৫টি বন্যাপীড়িত গ্রামের ১৩৫টি পরিবারকে এই আশ্রমের মাধ্যমে ৮৫টি শাড়ি, ৫৪টি ধুতি, ১৩০টি লুঙ্গি, ১৩৫টি চাদর, ১৬৮টি শিশুদের পোশাক, ১৩০০টি ব্যবহৃত কাপড় এবং ৩০টি বাসনপত্রাদি বিতরিত হয়েছে।

ইছাপুর মঠের (হুগলী) মাধ্যমে কিশোরপুর ব্লকের ১৭টি গ্রামের এবং খানাকুল অঞ্চলের ৯০০০ জলবন্দী মানুষকে ১০ দিন ধরে প্রত্যহ রান্না করা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। কামারপুকুর আশ্রমের পল্লীমঙ্গলের সাহায্যে ২৩৮ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে।

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে খাসমহল, গোপালপুর এবং মানিকচক অঞ্চলে বন্যাকবলিত অধিবাসীকে রান্না করা খাবার ছাড়াও ৫০০০ লোকের মধ্যে জলশোধক বড়ি, ইলেকট্রাল গুঁড়ো, দুর্গন্ধ ও রোগজীবাণু-নাশক গুঁড়ো ওষুধ বিতরিত হয়েছে।

গুজরাট বন্যাত্রাণ

রাজকোট আশ্রম জুনাগড়ের বেরাবল অঞ্চলের ৩টি গ্রামের ১১২টি বন্যাপীড়িত পরিবারের মধ্যে ৫২৫ কিলোঃ চাল, ১০০০ কিলোঃ গম বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্র

লাতুরে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের পুনর্বাসনের পর 'বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ প্রকল্পে'র মাধ্যমে কাওলি, জাওয়াল-গাঁওয়াড়ী এবং হরেগাঁও অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর মধ্যে গত মাসে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা, মাটির গুণাগুণ বিচার করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন, সবজিবাগান বিষয়ক যেমন—বীজবপন, রোপণ, গাছের যত্ন প্রভৃতি, চিমনি ছাড়া ধোঁয়াশূন্য চুল্লি, মহিলা, পুরুষ, যুবক ও শিশুদের মধ্যে শ্রেণীগতভাবে সংগঠন করা এবং তাদেরকে উপরোক্ত কার্যভার অর্পণ প্রভৃতি গ্রামোন্নয়নমূলক কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ওপর একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ। এছাড়া ২৪ তারিখ বেদান্তসারঃ এবং ২৬ তারিখে 'দ্য গস্পেল অব হোলি মাদার' পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়েছে। ৪ তারিখ জন্মাষ্টমী এবং ১১ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। ২৮ তারিখ একটি সাধন-শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (কানাডা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। এছাড়া ৪ তারিখ জন্মাষ্টমী এবং ১১ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন, সিয়াটল (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গে আলোচনা, সন্ধ্যায় রামনামসঙ্কীর্তন এবং হিন্দি, ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে। সোসাইটিতে একটি সাধন-শিবিরও পরিচালিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের দুটি রবিবার আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১১ তারিখের বিষয় ছিল—'প্রার্থনা না ধ্যান' এবং ২২ তারিখে ছিল—'সুষম জীবনযাত্রার দার্শনিক তত্ত্ব'। সভা-দুটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ।

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা) ঃ গত সেপ্টেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনা হয়েছে। আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ (আশ্রমাধ্যক্ষ) এবং স্বামী গণেশানন্দ। বুধবার এবং শনিবারগুলিতে যথাক্রমে তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন স্বামী প্রপন্নানন্দ। এছাড়া গত ৪ তারিখ আশ্রমে জন্মাষ্টমী-উৎসব পালিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সেপ্টেম্বর মাসে নিয়মিত আলোচনা ছাড়া গত ৪ তারিখ জন্মাষ্টমীর দিন 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা করেছেন স্বামী সনকানন্দ। ১১ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা করেছেন স্বামী বিনির্মলানন্দ।□

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর নামে রাস্তার নামকরণ

গত ১৫ আগস্ট '৯৬ ব্যাঙ্গালোর পৌরসভা পুরনো 'ম্যাড্রাস রোড'-এর নতুন নামকরণ করেছে—'শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ রোড'।

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিধাননগর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র (কলকাতা-৬৪) গত ১-৩ মার্চ '৯৬ তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা এবং মায়ের কথা, কথামৃত, শ্রীশ্রীচণ্ডী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে পাঠ হয়। তিনদিনই বিকেলে ধর্মসভা এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর বিষয়ে গীতিনাট্যের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন কাশীপুর উদ্যানবাটীর অধ্যক্ষ স্বামী নির্জরানন্দজী এবং বক্তা ছিলেন বেলুড় সারদাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবময়ানন্দ, 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় দিনের সভায় দমদম 'বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন'-এর অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার সভানেতৃত্বে বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা এবং ডঃ রীতা দত্ত। তৃতীয় দিন দুপুরে প্রায় ৩০০০ ভক্ত ও নরনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। এদিন বিকেলের ধর্মসভায় সভাপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দ। বক্তৃতা করেন সারদাপীঠের স্বামী প্রসন্নাত্মানন্দ। প্রতিদিনের সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। এদিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

রথতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থে (কাঁচড়াপাড়া, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব পালন করে। এদিন সকালে নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, কথামৃতপাঠ এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ভক্তিগীতি, কথামৃতপাঠ ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন জয়ানন্দ ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি এবং বক্তা হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ডঃ পার্থদেব ঘোষ ও ডঃ নমিতা দত্ত। সভান্তে প্রতিযোগী সকল বালক-বালিকাকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘ (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫-১৮ মার্চ '৯৬ চারদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। প্রথম দিন বিকেলে ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর সংঘ পরিচালিত শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় স্বামী কৈবল্যানন্দ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন এবং সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন পূর্বাহ্ণে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ। সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম কর্তৃক 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদা-স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণ-উৎসব কমিটি (রামপুরহাট, জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৩ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। সকালে নগর-পরিক্রমাদির পর বিশেষ পূজা ও সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং আকালিপুর (জেলা—বীরভূম) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন। দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্ত ও নরনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। বিকেলে ভক্তিগীতি পরিবেশন ও কথামৃতপাঠ করেন স্বামী বাগীশানন্দ। প্রসঙ্গতঃ, গত ১ বৈশাখ ১৪০৩ (১৪ এপ্রিল '৯৬) রামপুরহাটে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রেরণায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রের নামকরণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বর্তমানে রামপুরহাটে বিভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীর বাড়িতে পাঠচক্রের রবিবাসরীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তবে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের শিষ্য প্রয়াত সত্যবান মণ্ডলের পত্নী কনকলতা মণ্ডলের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের 'তপোবন'টি শীঘ্রই পাঠচক্রের অস্থায়ী ঠিকানা হতে চলেছে।

নিবেদিতা ব্রতী সংঘ (কলকাতা-৪৫) ঃ গত ২৩ মার্চ '৯৬ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় সারাদিনব্যাপী 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও সামাজিক তাৎপর্য' বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় কালচারের শিবানন্দ হল-এ। প্রথম অধিবেশনে ডঃ সতী চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সভানেত্রী এবং প্রধান অতিথি ও বক্তা ছিলেন যথাক্রমে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বাসুদেব বর্মণ ও নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পরিচালক শিবশঙ্কর চক্রবর্তী। দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য ও শ্রীমা সারদাদেবী'। এই আলোচনাসভায় সভানেতৃত্ব করেন অধ্যাপিকা বেলারানী দে। বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, ডঃ পাপিয়া চক্রবর্তী, ডঃ তাপস বসু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমিতা চক্রবর্তী এবং সংঘ পরিচালিত কর্মধারাকে প্রসারিত করার জন্য আহ্বান জানান সংঘ-সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (সাঁইথিয়া, জেলা—বীরভূম) ঃ গত ২৪ মার্চ '৯৬ পাঠচক্রের এক বিশেষ অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

'বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর গুরুত্ব' সম্পর্কে তিনি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। আলোচনাটির সাবলীলতা ও গভীরতা শ্রোতৃবৃন্দের মনে গভীর রেখাপাত করে। অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন যুবক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি' পরিবেশন করে সকলকে আনন্দদান করে। ঐদিন পাঠচক্রের মুখপত্র 'অর্ঘ্য'রও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। উল্লেখ্য, গত ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ পাঠচক্রটির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ করেন। বিগত শ্রীশ্রীমার জন্মতিথিতে নগর-পরিক্রমা, প্রসাদ-বিতরণ, জীবনী আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি পাঠচক্রে অনুষ্ঠিত হয়। মাসে দুই বা তিন বার পাঠচক্রের অধিবেশন বসে।

বেলডিহা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (শ্যামবাজার, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) : গত ৩১ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাক্ষেত্র বেলডিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দুদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, বেদপাঠ, ধর্মসভা ইত্যাদি। দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে বসিয়ে এবং ৩০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অর্হানন্দ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পরিতোষ পাল এবং শঙ্কর দাস। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সংঘের ৩০ জন সন্ন্যাসী যোগদান করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমে (বিজয়গড়, কলকাতা-৯২) গত ৩০ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর তিনদিনব্যাপী আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। প্রথম দিন সকালে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা-সহ নগর-পরিক্রমা, ভক্তিগীতি, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং দুপুরে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী সোমাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় স্বামী বলভদ্রানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ডঃ তাপস বসু। তারপর 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গীতিনাট্যটি পরিবেশন করেন শিবপুর 'কল্পতরু'র শিল্পিবৃন্দ। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম এবং দুপুরে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরে শিবপুর 'প্রফুল্লতীর্থ' কর্তৃক 'সাধনপথে শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতিনাট্যটি পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন বিকেলে 'মা সারদা' গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেন 'উপাসনা'র শিল্পিবৃন্দ। সন্ধ্যায় স্বামী পুরাণানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তারপরে 'নদে হতে নীলাচল' যাত্রাভিনয়টি পরিবেশন করেন 'রূপ ও রং' যাত্রা ইউনিট।

খগোল রামকৃষ্ণ সংঘ (পাটনা, বিহার) গত ৩১ মার্চ '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল—নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও কথামৃত পাঠ। দুপুরে প্রায় ১২০০ ভক্তকে বসিয়ে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রানন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন রাঁচি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মবিদানন্দ এবং সারদাপীঠের স্বামী শশাঙ্কানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ-সম্পাদিকা বকুল মিত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পর্ষদ্ (বোদরা, জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩ এপ্রিল '৯৬ সংঘের অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করে। সকালে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা ও হোম, গীতা ও কথামৃত পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভার প্রারম্ভে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করে পর্ষদ্ পরিচালিত 'বিবেকানন্দ সঙ্গীত কেন্দ্রে'র ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের ওপর ভাষণ দান করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও ডঃ কমল নন্দী। সভায় বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভান্তে নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায় 'কলির ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্যটি পরিবেশন করেন। তারপর অনুষ্ঠিত হয় নরনারায়ণসেবা।

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ সমিতি (কলকাতা-২৭) গত ৫-৭ এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর তিনদিনব্যাপী আবির্ভাব উৎসব এবং সমিতির বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন সকালে শোভাযাত্রা-সহ নগর-পরিক্রমা এবং দুপুরে ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ' বিষয়ে ভাষণ দেন রামহরিপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলের ধর্মসভায় 'শ্রীমা সারদা—দেবী ও মানবী' প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। সন্ধ্যায় 'শ্রীমা সারদাদেবী' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত 'সুরপীঠ' গোষ্ঠী। উৎসবের তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় 'অভিনন্দন' শিল্পিগোষ্ঠী কর্তৃক 'বিবেকানন্দ' নাটকটি অভিনীত হয়।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা-৫০) : গত ৬-১০ এপ্রিল পাঁচদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই কয়দিন বিকেলে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন 'শ্রীশ্রীঠাকুর ও আমরা সাধারণ মানুষ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন বেলঘরিয়ার স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষ স্বামী

অমলানন্দ এবং স্বামী অচ্যুতানন্দ। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শ্রীশ্রীমা ও বর্তমান নারীসমাজ'। বক্তব্য রাখেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। তৃতীয় দিনের সভায় প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা এবং মঞ্জু ভৌমিক 'ভারতীয় নারীর আদর্শ—শ্রীশ্রীমা' বিষয়ে আলোচনা করেন। চতুর্থ দিন 'ভারতীয় অর্থনৈতিক ভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে ভাষণ দান করেন বরানগর মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গোপেশানন্দ, সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ কমল নন্দী। পঞ্চম দিনে 'চিত্রাঙ্গদা' গীতিনাট্য পরিবেশন করে সংঘ পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ-সম্পাদক শান্তনু বসু।

বৃহত্তর কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কলকাতা-৩) আয়োজিত যুবসম্মেলন গত ৭ এপ্রিল '৯৬ **ইন্দ্রাণী পার্ক শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রে** অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক সুরেশচন্দ্র দেব স্বাগত ভাষণ দেন। যুবশক্তি যাতে উচ্চ আদর্শ অবলম্বনে কর্মে নিয়োজিত হতে পারে সে-বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রমেয়ানন্দ, পরিষদ-সভাপতি স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও সহ-সভাপতি স্বামী ঋদ্ধানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের আহ্বায়ক ডঃ কমল নন্দী। সম্মেলনে ভাবপ্রচার পরিষদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় শতাধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ।

গৌরহাটি রামকৃষ্ণ আশ্রমে (জেলা—হুগলী) : গত ২০ এপ্রিল '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, পাঠ, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকেলে ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দ এবং আঁটপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। সন্ধ্যায় শঙ্কর সোমের পরিচালনায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

বিহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের নবম বার্ষিক অধিবেশন গত ২০-২১ এপ্রিল '৯৬ **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তসংঘে (জামালপুর, বিহার)** অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিহারের ১৩টি কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সম্মেলনে বেলুড় মঠের প্রতিনিধি-রূপে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শ্রীকরানন্দ। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন পরিষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি যথাক্রমে স্বামী সুহিতানন্দ ও স্বামী আত্মবিদানন্দ। ভারতীয় রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অশোককুমার জৈন এবং মুঙ্গের জেলার সহ-ন্যায়াধীশ ডি. এন. চক্রবর্তী অধিবেশনে ভাষণ দেন। সংঘের সদস্যবৃন্দ উভয় দিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে 'নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্য' ও 'তরণীসেন বধ' নাটক-দুটি পরিবেশন করেন।

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির

বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম (শান্তিপুর, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১-৫ এপ্রিল '৯৬ পাঁচদিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবিরের আয়োজন করে। কলকাতার 'ভিমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র কয়েকজন বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক দ্বারা ৪৬ জন রোগীর চোখ অস্ত্রোপচার করা হয়।

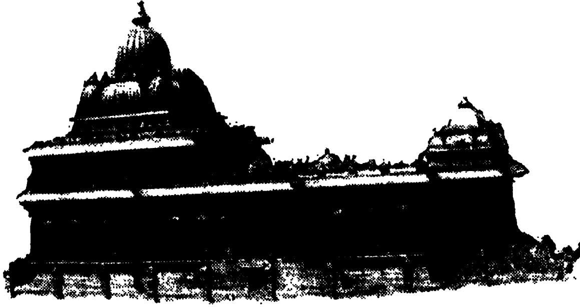
পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, টালিগঞ্জ (কলকাতা-৩৩)-নিবাসী **সত্যনারায়ণ সান্যাল** গত ১১ ফেব্রুয়ারি '৯৬ সকাল ৭টায় নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ছিলেন সম্পর্কে স্বামী নিখিলানন্দ ও স্বামী রমানন্দের ভাই। নিরহঙ্কার, সরল, পরোপকারী ধর্মপ্রাণ সান্যালবাবু পরিচিতজনের কাছে অতি প্রিয় ও শ্রদ্ধার্হ ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কল্যাণী (নদীয়া)-নিবাসিনী **মণিকা সূত্রধর** কলকাতার একটি হাসপাতালে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি '৯৬ দুপুর ১টা ২০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। স্থানীয় রামকৃষ্ণ সংঘে তিনি দীর্ঘদিন স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করেছেন। বিনয়, কর্মতৎপরতা ও সেবানিষ্ঠার জন্য তিনি অনেকের কাছে শ্রদ্ধেয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার আজীবন ও নিয়মিত পাঠিকা।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **সুকুমার দাস** গত ১৭ ফেব্রুয়ারি '৯৬ বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে লিপ্ত ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি কলকাতা টেলিফোন অফিসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি গদাধর আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহধন্য সুকুমারবাবু 'উদ্বোধন' পত্রিকার একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অশোক চৌধুরী** গত ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯৬ বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার স্বীয় বাসভবনে ইষ্টনাম জপ করতে করতে সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। বিনয়, মিষ্টভাষণ ও শিষ্টাচরণের জন্য সকলের কাছে তিনি প্রিয় ছিলেন। আত্মপ্রচারবিমুখ পরলোকগত অশোকবাবু একান্ত নিষ্ঠাসহকারে অধ্যাত্ম জীবনযাপন করে গেছেন।□



শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত

সর্বজনীন উপাসনালয়



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন : ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯ ; ফ্যাক্স : ৪৯৩-৪৫৮৯



রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

পুরী-৭৫২০০১, উড়িষ্যা

ফোন : (০৬৭৫২)-২২২০৭

● একটি আবেদন ●

● ভোজনগৃহ ও সাধুনিবাস নির্মাণ ●

পবিত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্র পুরীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখাকেন্দ্র। এই কেন্দ্র আদিবাসী ও হরিজন দুঃস্থ ছাত্রদের একটি ছাত্রাবাস, প্রতিদিন প্রায় দুই শতাধিক পাঠকের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, উড়িষ্যার পুরী, খুরদা-নয়াগড় জেলার দারিদ্র্য-পীড়িত অঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমাণ গাড়ি-সহ চিকিৎসার সুবিধা, স্থানীয় বিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষাদানকেন্দ্র ও মধ্যাহ্নকালীন খাদ্যদানের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে জনকল্যাণমূলক কার্য করে আসছে। প্রতিটি কার্যক্রমই বিভিন্ন মহানুভব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানের ওপর নির্ভরশীল।

এই আশ্রম পুরীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন-অভিলাষী আগত সন্ন্যাসী, অভ্যাগত ও আশ্রম-অন্তেবাসীদের জন্য একটি ভোজনগৃহ ও সাধুনিবাস তৈরি করতে চলেছে। ভোজনগৃহটি আশ্রম-অন্তেবাসী ও অভ্যাগতদের জন্য এবং দোতলায় সাধুনিবাসটি আগত সন্ন্যাসীদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই কাজে আশ্রমের প্রায় ১০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

আমরা এই কার্যে সাহায্যের জন্য সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে যেকোন দান চেক বা ড্রাফট-এ **SECRETARY, RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, PURI** এই ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি। সমস্তপ্রকার আর্থিক দান ভারত সরকারের আয়কর নিয়মের ৮০ (জি) আয়কর ১৯৬১ ধারানুযায়ী আয়কর ছাড়ের অধীন।

২৫ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্বে যেকোন দানের জন্য দাতার নাম ফলকে উৎকীর্ণ থাকবে।

স্বামী দীনেশানন্দ

অধ্যক্ষ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

পুরী-৭৫২০০১, উড়িষ্যা

উদ্বোধন স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র,
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায়
ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৩

১৫

ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস ঃ বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) সাধারণ গ্রাহকমূল্য ঃ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬০ টাকা ; সডাক—৭০ টাকা □
আলাদাভাবে কিনলে—প্রতি সংখ্যার মূল্য □ ৮ টাকা □ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □
৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৯তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৩—পৌষ ১৪০৪/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৭

☐ **মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে আগামী বর্ষের (৯৯তম বর্ষ ঃ ১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর মধ্যে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। টাকা দেরিতে জমা পড়লে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।**

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ ঃ ৬০ টাকা** ☐ **ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ ঃ ৭০ টাকা**

☐ **বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩২৫ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬৫০ টাকা (বিমানডাক)** ☐ **বাংলাদেশ—১৩০ টাকা**

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।**

☐ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ** বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ঐবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহাদয় গ্রাহকদের একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। একমাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ডাকে দেওয়ার অন্ততপক্ষে একমাস আগে পিন কোড-সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে।

☐ **গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেই তবে ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।**

☐ **আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহাদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।**

☐ **যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।**

উদ্বোধন

অগ্রহায়ণ ১৪০৩ নভেম্বর ১৯৯৬

দিব্য বাণী

সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্।

সাধুসঙ্গই ওষুধ।

কুলার্ণবতন্ত্র

অনেকজন্মজনিতং পাতকং সাধুসঙ্গমে।
ক্ষিপ্রং নশ্যতি ধর্মজ্ঞ জলানাং শরদো যথা॥

শরৎকালে যেমন সব জলাশয়ের জলের মালিন্য চলে যায় তেমনি জন্মজন্মান্তরের পাপ সাধুসঙ্গে অবিলম্বে নাশ হয়ে যায়।

গরুড় পুরাণ

নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, তেমনি জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই চঞ্চল জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হলেও তা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার নৌকাস্বরূপ।

আচার্য শঙ্কর

সাধুসঙ্গ করলে ঈশ্বরীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়।

সাধুসঙ্গ হলে তবে ধারণা হয়।

সাধুসঙ্গে নিজের ঘড়ি অনেকটা ঠিক করে লওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

৯৮তম বর্ষ—১১শ সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'

সৎসঙ্গ ঃ দুই

আমরা তীর্থে যাই। তীর্থবিগ্রহকে দর্শন করি। ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এবং ধর্মেও তীর্থযাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তীর্থের একটি বিশেষ আবহ আছে। সেই আবহ হইল আধ্যাত্মিকতার আবহ। উহার ফলে তীর্থযাত্রীর মনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগে, অন্তরে ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অনুভূতি লাভ করা যায়। কত ভক্ত, কত সাধক, কত উপাসক যুগ যুগ ধরিয়া তীর্থে ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন, ভাবিতেছেন। ঈশ্বরকে বুকের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তীর্থভূমিতে ঈশ্বরকে তাঁহারা জীবন্ত, জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে। বস্তুতঃ, তাঁহারাই তো তীর্থদেবতা—সচল তীর্থবিগ্রহ। তাই কেহ তীর্থদর্শনান্তে ফিরিলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তীর্থে গিয়া সাধুসঙ্গ করিয়াছেন কিনা, সাধুদর্শন করিয়াছেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীশ্রীমা যখন তীর্থে গিয়াছেন তখন সেই তীর্থের সাধু-সন্তদের দর্শন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের নিজেদের অন্তরের ব্যাকুলতায় যেমন, তেমন আমাদের শিক্ষার জন্যও। তাঁহাদের ভাব হইল—সাধুদের না দেখিলে, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য নিজেদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সান্নিধ্যে আসিতে না পারিলে তীর্থদর্শন বৃথা।

বস্তুতঃ, তীর্থে দুই ধরনের বিগ্রহ থাকেন। এক—অচল বিগ্রহ, দুই—সচল বিগ্রহ। মন্দিরের মধ্যে যিনি পূজিত হন তিনি যে অধিকাংশ মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে 'অচল'—সেকথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত ভক্তের ভাবদৃষ্টিতে তিনি অবশ্য 'অচল' নহেন—পূর্ণমাত্রায় 'সচল'। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে অতি-প্রসিদ্ধা 'গোপালের মা'র কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। তবে এইরূপ ভক্তের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। কোটির মধ্যে গুটিক। কিন্তু ঈশ্বরপ্রাণ সাধু-মহাত্মা, যাঁহারা তীর্থে নিজেদের সাধনা ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রকাশকে জীবন্ত করেন তাঁহাদের মধ্যেই তো 'অচল' তীর্থদেবতা 'সচল' রূপে প্রকট হন। সাধু-মহাত্মারাই সচল তীর্থদেবতা। তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রাণতা, অপার্থিবতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পবিত্রতা এবং সরলতা আমাদের মনে গভীর প্রেরণা সঞ্চার করে। ঈশ্বরপ্রেম বলিতে কী বুঝায় তাঁহাদের জীবন ও আচরণ দেখিয়া আমরা ধারণা করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, এই প্রত্যক্ষ প্রেরণা ও ধারণার জন্য সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গের কোন বিকল্প নাই। রামকৃষ্ণ সংঘে একটি কথা খুব প্রচলিত আছে—'ব্যাটারী চার্জ' (Battery charge)। ব্যাটারী 'ডাউন' *(down) হইয়া গেলে উহাকে পুনরায় 'চার্জ' করিয়া লইলে উহা* যেমন আবার শক্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়, তেমনই আমাদের হতোদ্যম মনকে, অবিশ্বাসী ও সংশয়ী দৃষ্টিকে, দোলায়মান ভক্তিবিশ্বাসকে সাধুর প্রেরণাপ্রদ সান্নিধ্য নূতন শক্তিতে পূর্ণ করিয়া দেয়। আমাদের হৃদয়-ব্যাটারী যেন আবার 'চার্জড' হইয়া যায়। সৎসঙ্গে একদিকে যেমন আমাদের মন 'চার্জড' হয়, অন্যদিকে তেমনই আবার 'পার্জড' (purged) হয় অর্থাৎ দূষণমুক্ত হয়, মালিন্যমুক্ত হয়। এই শুদ্ধির ফলে আমাদের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের চিন্তায় ও অনুভূতিতে ধারণা করিতে পারি, জীবন ও জগতের নশ্বরতা সম্পর্কে অবহিত হই এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি ধ্রুবদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হই। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-শোক, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, আশাভঙ্গ-নৈরাশ্যকে সহ্য ও স্বীকার করিতে শিখি। এই শিক্ষা নেতিবাচক নিশ্চেষ্টতা বা নির্লিপ্তি নহে—ইতিবাচক, স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ অনাসক্তি, যাহাকে পরতে পরতে সিক্ত করিয়া রাখে ঈশ্বরমুখী এক ধ্রুব জীবনবোধ—জীবনরসিকতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইতে একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করিলে বিষয়টি হয়তো স্পষ্টতর হইবে ঃ সিঁদুরিয়াপটির মণি মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। মণি মল্লিক পুত্রের সৎকার করিয়াই শ্মশান হইতে সোজা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে তখন বেশ কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। মণি মল্লিক বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কিগো, আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?" মণি মল্লিক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দিলেন।

বৃদ্ধ মণি মল্লিকের উত্তরে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সকলেই তাঁহাকে সময়োচিত সান্ত্বনাবাক্য দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। উপস্থিত সকলে তাঁহাকে ঐরূপে নানা সান্ত্বনাবাক্য বলিলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি শুধু মণি মল্লিককে বিলাপ করিয়া যাইতে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীরবতাকে কেহ কেহ উদাসীনতা, এমনকি মমতাহীনতা বলিয়াও ভাবিতে লাগিলেন। মণি মল্লিকের শোকোচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে কিছুক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তাল ঠুকিয়া মণি মল্লিককে উদ্দেশ করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

"জীব সাজ সমরে
ঐ দেখ, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান ভক্তি ব্রহ্ম-বাণ সংযোগ কর রে।..."

ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ লিখিতেছেন : "গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গি ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত!

"গীত সাঙ্গ হইল—কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জমজম করিতে লাগিল!" (দ্রঃ লীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়)

মণি মল্লিকের প্রাথমিক শান্ত ভাব দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিলেন উহা সাময়িক, উহাকে দৃঢ় করা দরকার। পুত্রশোকাতুর পিতাকে আপন মমতার অনুভূতির অংশভাক্ করিয়া তাই বলিলেন : "আহা! পুত্রশোকের মতো আর কী জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কিনা! খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।"

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা মণি মল্লিককে বলিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন : "এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, 'অক্ষয় মলো—তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন (ঘরের পূর্বে, কালীবাড়ির উঠানের সামনের বারান্দার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে। অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস বটে!'

"কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, 'তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনোপুঁটির মতো আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি, গঙ্গায় স্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল। আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দুচারবার টাল-মাটাল হয়েই যেমন তেমনি —স্থির হলো। দুচারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।' " (ঐ)

শোকসন্তপ্ত পিতাকে ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি স্থায়ী জীবনদর্শনের সঙ্গে পরিচিত করাইতে চাহিতেছেন। নিছক প্রবোধবাক্য, মমতাময় সান্ত্বনা সাময়িকভাবে শোককে কমাইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী শোকমুক্তির পথ যে উহা নহে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ জানিতেন। স্থায়ী শান্তি আসে একমাত্র ভগবানের কাছে আত্মনিবেদনে। সেই আত্মনিবেদনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে বলিলেন। কিন্তু সেই আত্মনিবেদনের একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন—যেমন ভিত্তি অর্জুনকে দিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। শরণাগতির ভিত্তি হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়াছিলেন আত্মতত্ত্বের দর্শন। সেই দর্শনই অর্জুনকে শেষপর্যন্ত আশ্বস্ত করিয়াছিল এবং অর্জুন নিষ্কম্প শরণাগতিতে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। সেজন্য মণি মল্লিকের মানসিক দৃঢ়তা ও শান্তির ব্যবস্থাপত্র দিয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতার কথা বলিয়া তাঁহাকে এবার সম্মুখীন করিতেছেন স্থায়ী জীবনদর্শনের সহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে অতঃপর বলিলেন : সংসারে কার সঙ্গে কী সম্বন্ধ? জাগতিক সমস্ত সম্বন্ধই তো প্রকৃত বিচারে অনিত্য। আপাতদৃষ্টিতে বড় নির্মম ভাষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মণি মল্লিককে বলিলেন : "কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এসকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিনকতক বেশ চলল। তারপর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা বয়ে গেল—ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত!"(ঐ) এই যখন সংসারের স্বরূপ, তখন কেন সেই সংসারে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, জন্ম-মৃত্যুতে আমরা বিচলিত হইব? এখানে দুঃখও অনিত্য, সুখও অনিত্য। স্থায়ী শান্তি শুধু ঈশ্বরের চিন্তায়, তাঁহাতে আত্মসমর্পণে। এই দর্শন কিন্তু মোটেই জীবন ও সংসারকে অস্বীকার করে না, বরং জীবন ও সংসারকে পূর্ণভাবে স্বীকার করে—ঠিক ঠিক ভাবে স্বীকার করে। ইহা নৈরাশ্যবাদ নহে, ইহা ভাগবতরসে জারিত অস্তিবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন : "একজন চাষার বেশি বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করে। ছেলেটি

ক্রমে বড় হলো। একদিন চাষা ক্ষেতে কাজ করছে, এমন সময় একজন এসে খবর দিলে যে, ছেলেটির ভারী অসুখ। ছেলে যায় যায়। বাড়িতে এসে দেখে, ছেলে মারা গেছে। পরিবার খুব কাঁদছে, কিন্তু চাষার চক্ষে একটুও জল নাই। পরিবার প্রতিবেশী-দের কাছে তাই আরও দুঃখ করতে লাগল যে, এমন ছেলেটি গেল—এঁর চক্ষে একটু জল পর্যন্ত নাই! অনেকক্ষণ পরে চাষা পরিবারকে সম্বোধন করে বললে, 'কেন কাঁদছি না জান? কাল আমি স্বপন দেখেছিলুম যে, রাজা হয়েছি, আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপনে দেখলুম যে, ছেলেগুলি রূপে গুণে সুন্দর। ক্রমে বড় হলো, বিদ্যা ধর্ম উপার্জন কল্লে। এমন সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল; এখন ভাবছি যে, তোমার ঐ এক ছেলের জন্য কাঁদব, কি আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদব।' জ্ঞানীদের মতে স্বপন অবস্থাও যেমন সত্য, জাগা অবস্থাও তেমনি সত্য। ঈশ্বরই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।" (কথামৃত, উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ২৩৭)

এই 'সত্য' প্রাতিভাসিক অর্থে। এই 'সত্য' আপেক্ষিক। পারমার্থিক অর্থে ইহা 'মিথ্যা'। অন্য সময় গল্পটি বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন:

"চাষী জ্ঞানী, তাই দেখছিল স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

"আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।" (ঐ, পৃঃ ৮০৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এই অপূর্ব সর্বাস্তিবাদ। এখানে কাহারও বিসর্জন নাই। প্রাতিভাসিক ও পারমার্থিক, আপেক্ষিক ও নিরঙ্কুশ—সবই এখানে স্বীকৃত। কিন্তু এখানে প্রাতিভাসিকের মধ্যে পারমার্থিকের অপূর্ব নিরঙ্কুশ অবস্থান। এই জীবনবোধ শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন সদ্য পুত্রহারা মণি মল্লিককে। অবশেষে মণি মল্লিকের দ্ব্যর্থহীন অঙ্গীকার: "এইজন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম—এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"(লীলাপ্রসঙ্গ: গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়) পুত্রশোকাতুরা কিসা গৌতমীকে বুদ্ধদেবের শান্তিদানের কাহিনী এখানে আমাদের মনে পড়িবে।

সাধুকে বলা হয় 'ভবরোগবৈদ্য'। তিনি শারীরিক ব্যাধির বৈদ্য না হইতে পারেন, কিন্তু সংসার-ব্যাধির অব্যর্থ নিদান তাঁহার হাতে। বৈদ্যচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে মণি মল্লিকের রোগনির্ণয় (diagnosis) করিলেন। তাহার পর দিলেন ব্যবস্থা বা বিধান-পত্র (prescription)। অবশেষে করিলেন অস্ত্রোপচার (operation)। ফল হইল—ব্যাধির মূলোৎপাটন এবং নিরাময়। একই জিনিস করিয়াছিলেন ভগবান বুদ্ধ কিসা গৌতমীর ক্ষেত্রে।

সাধুসঙ্গে মানুষের উত্থাই হয়। আমাদের ভবব্যাধির নিরাময় হয় এবং শান্তি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "সাধুসঙ্গে শান্তি হয়।"(কথামৃত, পৃঃ ৫১৮) সংসারের জ্বালায় জর্জরিত মানুষ "হাঁপ ছেড়ে বাঁচে"।(ঐ) সাধু বিভ্রান্ত মানুষকে, পথভ্রষ্ট মানুষকে লক্ষ্যের সন্ধান দেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের পর স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে যে-গানটি ('মন চল নিজ নিকেতনে') শুনাইয়াছিলেন এবং যে-গান শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই গানটির একটি স্তবকে আছে—সাধুসঙ্গ যেন ক্লান্ত-শ্রান্ত সংসার-পথিকদের কাছে পান্থশালার শান্তির আশ্রয়। পথভ্রষ্টদের পথের ঠিকানাও পাওয়া যায় সেখানে:

"সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিও বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ সে পান্থনিবাসিগণে।"

আমরা জানি, সংশয়ী ও অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথের জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল সেদিনই—রামকৃষ্ণ-পান্থধামে আগমনে। নরেন্দ্রনাথ হইতে বিবেকানন্দে উত্তরণের প্রকৃত সূচনা হইয়াছিল সেই আগমনেই।

সৎসঙ্গের ফল অমোঘ। প্রকৃত সাধুকে দেখিলে ত্যাগ-বৈরাগ্যের স্বরূপ কী, ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরানুরাগের আকার কী তাহা আমাদের ধারণা হয়। সৎসঙ্গে মনের ময়লা কাটে। মন নির্মল ও শুদ্ধ হয়। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়ে। অনিত্য সংসার ও ভঙ্গুর দেহের প্রতি মোহের নাশ হয়। মনে উচ্চ চিন্তার উদয় হয় এবং অশুভ চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনে রাখিতে হইবে, 'সৎসঙ্গ'-এর অর্থ শুধু যে ব্যক্তি-সাধুর সান্নিধ্য তাহা নহে, সৎচিন্তা, সদালোচনা, সৎগ্রন্থ-পাঠও সৎসঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্যের একদিনের কথোপকথন স্মরণীয়:

"প্রশ্ন: মনের মধ্যে অসৎ চিন্তা ওঠে কেন?

মা: মনের স্বভাবই হলো নিচের দিকে যাওয়া। মানুষ কত মনের জোর সম্বল করে বাঁধ দিয়ে রাখে। আবার বাঁধ ভেঙে কখনো কখনো জল বেরিয়ে পড়ে। তবুও চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ, সৎচর্চায় মন খুব ঊর্ধ্বমুখী হয়, সাধুদের কৃপায় অতি নীচলোকেরও মনের গতি ফিরে যায়। দেখ, বৃন্দাবনের সেই সোনা-খোঁজা সাধুর দিব্যজ্ঞান হয়ে গেল, পরশপাথর পেয়েও ফেলে দিলে। সাধুর বেশ ধরে পাখি ধরতে গিয়ে পাখিদের নির্ভয় ভাব দেখে ব্যাধের বৈরাগ্য উপস্থিত হলো। সেইজন্য সৎসঙ্গ করবে। সাধুসঙ্গ না পেলে সৎগ্রন্থ পড়বে। মহাপুরুষদের জীবন আলোচনায় চিত্ত শুদ্ধ হয়। দেখ, জলের গতি স্বভাবতঃ নিচের দিকে, কিন্তু সূর্যের আলো পেয়ে সেই জল আকাশে ওঠে, পাহাড়ের মাথায় বরফ হয়ে যায়—আবার বৃষ্টি, ঝরনা, নদী হয়ে জীবের কত কল্যাণ করে।" [দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ৩য় খণ্ড (প্রকাশিতব্য)—স্বামী বাসুদেবানন্দের মাতৃস্মৃতি]☐

সাধনের উদ্দেশ্য

স্বামী ভূতেশানন্দ

একজন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের কাছে বলছেনঃ "আমি জ্ঞান চাই না, শুদ্ধা ভক্তি চাই।" ঠাকুর তাঁকে বললেনঃ "যাঁকে ভক্তি করবি তাঁকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি?" অর্থাৎ ভক্তি করতে হলে ভক্তির পাত্র যিনি তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। সুতরাং যাঁকে ভক্তি করব সেই ভক্তির পাত্র ও তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান—এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করতে হলে তাঁকে কেন ভক্তি করব তা জানতে হবে। না হলে ভক্তির পাত্র সম্বন্ধে নানা বিভ্রান্তির অবকাশ থাকবে। তাই বলছি, উভয়ের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। একে আমরা 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'র সম্বন্ধ বলতে পারি। সাধারণতঃ মনে করা হয়, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম পরস্পরবিরোধী কিংবা একটির সঙ্গে অপরটির কোন যোগ নেই। এটা ঠিক নয়, এদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত ভক্ত হতে হলে তাকে জ্ঞানী হতে হবে এবং কর্মীও হতে হবে। আবার জ্ঞানী হতে হলে ভক্তও হতে হবে, কর্মীও হতে হবে। আর যথার্থ কর্মী অর্থাৎ কর্মযোগী হতে হলে তাকে ভক্ত এবং জ্ঞানী হতে হবে। আমরা যে 'ভক্তিযোগী', 'কর্মযোগী' বা 'জ্ঞানযোগী'—এইভাবে বিভেদ করি তা কেবল কোন্ দিকটির ওপর জোর দিচ্ছি তা লক্ষ্য করে।

প্রশ্ন উঠবে, শ্রীরামকৃষ্ণকে জানব কি করে? আর তাঁকে জানবার পরে আর কি অবশিষ্ট থাকে? সবই তো হয়ে গেল। তা নয়, জানারও স্তরভেদ আছে। ভাসাভাসা জানা, গভীরভাবে জানা আর একেবারে তদ্রূপ হয়ে জানা। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে দু-একটি বই পড়লে তাঁকে ভাসাভাসা জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে পড়ে চিন্তা করে তাঁর সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম।—এইটি গভীরভাবে জানা। আর এর চেয়েও বড় জানা হলো তদ্রূপ হয়ে জানা অর্থাৎ যখন আমি তাঁর স্বরূপ হয়ে যাব। অন্য অন্য ভাবে জানা হচ্ছে বাইরের রূপ জানা—মোটামুটি জানা। তাঁর স্বরূপ হয়ে গেলে তাঁকে ঠিক ঠিক জানা হয়। এই তন্ময়তাই শেষকথা।

অতএব প্রথমে বই পড়ে বা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা ভাসাভাসা জ্ঞান অর্জন করব, তারপর তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করব, তলিয়ে বিচার করে ভেবে মনের ভিতরে পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাব। এই দ্বিতীয় স্তরের জানার জন্য সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার অর্থ তাঁর সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা। আর তৃতীয় স্তরের যে জানা তা অতি দুর্লভ। স্বীয় পৃথক সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে যখন নিজেকে তাঁতে ডুবিয়ে দিতে পারব অর্থাৎ তন্ময় হয়ে যাব তখনই হলো জানার শেষ পর্যায়। আর ভক্তিরও সেটি শেষ পর্যায়। এরপরে আর করণীয় কিছু নেই।

কাজেই তাঁকে যারা ভক্তি করবে তাদের প্রথমে তাঁর বিষয়ে পড়ে বা শুনে ভাসাভাসা জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে মনের ভিতরে তাঁর ছাপটা পড়ে। কেবল কৌতূহল নিরসনের জন্য নয়, অর্থাৎ যেমন গল্প উপন্যাস বা ইতিহাস পড়ি সেরকম করে নয়—তার চেয়ে আরও গভীরভাবে, নিবিষ্টভাবে জানা হলো প্রাথমিক পর্যায়। এই নিয়ে সাধনার আরম্ভ হয়। এটি যেন মূলধন—পুঁজি। পুঁজিটুকু নিয়ে শুরু করতে হবে—তা অতি সামান্য হলেও, যেন একটি ছোট পানের দোকান করবার মূলধনের মতো। এই নিয়ে সাধনা করতে করতে ক্রমশঃ জানার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছানো যায়, যে-পর্যায়ে গেলে তাঁর সম্বন্ধে মনের সংশয় প্রায় চলে যায়, কিন্তু তখনো পুরো জানা হয় না। জানা সম্পূর্ণ হবে তন্ময় বা তৎস্বরূপ হয়ে গেলে। মনে রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য এইরকম তন্ময় হওয়া, তাঁতে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া। সাধনের পরাকাষ্ঠা এই—যেখানে 'আমি' থাকবে না, কেবল 'তিনি' থাকবেন। যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ 'তিনি' খুব কাছাকাছি হলেও দূরে। যেমন আমরা আমাদের দেহের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ তবুও যেন তার থেকে একটু দূরে। কারণ, আমার দেহ আর আমি—এই দুটি পৃথক সত্তা রয়েছে। যখন তার চেয়েও নিবিড় সম্বন্ধ হবে, যখন 'আমি' একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মাত্র 'তিনি' থাকবেন তখন সেটি হলো জ্ঞান এবং ভক্তির শেষকথা। সাধকের এই-ই লক্ষ্য। প্রথমে পড়ে বা শুনে ভাসাভাসা বা পরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ অল্প পুঁজি নিয়ে সাধনা আরম্ভ করতে হয়। যেমন, আমি কোন গ্রাম থেকে কলকাতা যাব। কলকাতা সম্বন্ধে আমি জানতে চাই। তখন পাঁচজনের কাছ থেকে নানা সংবাদ সংগ্রহ করতে হয়, তারপর কলকাতা সম্বন্ধে মনে

একটা ধারণা হয় যে, কলকাতা শহর কেমন এবং কোথায়, কিভাবে সেখানে যেতে হয়। এগুলি সব সংবাদ সংগ্রহ। কিন্তু তাহলেই কলকাতা যাওয়া হয় না। চলতে হয়। ট্রেনে বা বাসে করে এগোতে হবে। এগিয়ে কলকাতার কাছাকাছি গেলে হয়তো শহরের কোলাহল, চিমনির ধোঁয়া ইত্যাদি দেখে ভাবব, কলকাতার কাছাকাছি এসেছি কিংবা রাত্রিতে পৌঁছালে শহরের আলোর ছটা দেখতে পাব। তখন মনে হবে অনেক কাছে এসে গিয়েছি। এখন কলকাতার যে-পরিচয় পাচ্ছি আর যাত্রা করার আগে যে-পরিচয় পেয়েছি—দুটি কিন্তু এক নয়। এর পরেও যখন কলকাতায় বাস করে কলকাতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাব তখন কলকাতাকে পূর্ণরূপে যেন জানা হলো।

আমাদের সাধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কলকাতার মতো করেই নিবিড়ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা, কারণ সেখানে আমরা আমাদের 'আমি'কে নিশ্চিহ্ন করে 'তিনি'-ময় হয়ে যাব। এই অবস্থায় আরম্ভ কখনো হয় না, এটি শেষ পর্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ছাদে উঠতে হলে এক ধাপ, এক ধাপ করে পা ফেলে তবে পৌঁছানো যায়—সেইরকম সাধনপথে এক পা, এক পা করে বাড়িয়ে অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। এই এক পা, এক পা করে যাত্রা শুরুর জন্য দীক্ষা, তাঁর কথা শোনা, তাঁকে চিন্তা করা দরকার। সাধনা আরম্ভ করে এক পা, এক পা করে চলে প্রত্যেক পদক্ষেপে আমরা একটু একটু করে এগিয়ে যাই। কিন্তু পথ এত দীর্ঘ যে, অনেক সময় বোঝা যায় না এগোচ্ছি কিনা। সব সাধকের জীবনের অভিজ্ঞতা এই। সাধনা আরম্ভ করে বারবার মনে এই প্রশ্ন জাগবে: কি করছি, লক্ষ্যের দিকে—আমার উপাস্যের দিকে এগোচ্ছি কি? সংশয়ের কারণ—পথ দীর্ঘ, দু-এক পা কি দু-এক মাইল এগোলে কিছুই বোঝা যায় না। মনে সংশয় জাগে। যাদের এই সংশয় বেশি হয় তারা হয়তো 'আর পারি না' বলে থেমে যায়। অনেকের জীবনে এই অবস্থা হয় যে, কিছুদূর গিয়েই বলে—আর আমার দ্বারা হলো না, আর পারছি না, এখানেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি।

"যদি অলস ভরে
আমি বসি পথের পরে
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।"
(গীতবিতান, 'পূজা', ১৩৯)

সাধনজীবনের এটাই কথা—'সকল পথই বাকি আছে'। যতই এগোই না কেন মনে হবে, আরও কতদূরে আছে সেই "আনন্দধাম"। এইটি জেনে নিয়ে তবে সাধন-পথে চলতে হবে। পথ আবার কণ্টকাকীর্ণ—দুর্গম। পা ক্ষতবিক্ষত হবে, রক্ত ঝরবে, মাথার ঘাম পায়ে পড়বে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হবে, মনে হবে—আর পারি না; কিন্তু থামলে চলবে না, এগোতে হবে। এরই নাম 'সাধন'। অবসাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যাওয়া সাধনের প্রথম পদক্ষেপ। ধৈর্য, অসাধারণ ধৈর্য চাই। সাধনভজন আরম্ভ করে অনেকে আমাদের বলেন যে, এত করছি কিন্তু কি হলো? মন তো যেমন চঞ্চল তেমনই রয়েছে। স্থির হয়ে ভগবানের কথা দু-দণ্ড ভাবতে পারি না। এই প্রশ্নের উত্তর একটাই যে, এগিয়ে যাওয়ার মতো কী করেছি? এত কী সাধন করেছি যে, তাঁর সম্বন্ধে একটি অনুভব হয়ে যাবে? সাধন করে যাঁকে লাভ করা যায় না, সাধন-দুর্লভ যিনি, তিনি বিনা পরীক্ষায় ধরা দেন না।

ভাগবতের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। গোপালের দুরন্তপনায় গোপীরা অতিষ্ঠ হয়ে মা যশোদার কাছে কেবলই অনুযোগ করেন। বলেন, তোমার গোপাল আমাদের দইয়ের ভাঁড় ভেঙে দেয়, ননী খেয়ে ফেলে। উঁচুতে হাঁড়ি থাকলে বাঁশের খোঁচা দিয়ে ভেঙে ফেলে। শুধু তাই নয়, শিশুরা হয়তো ঘুমোচ্ছে, তাদের চিমটি দিয়ে কাঁদিয়ে দেয়। এইরকম নানান উপদ্রব করে। বলা বাহুল্য, যেসব গোপীরা অনুযোগ করতে এসেছেন তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাঁর দুষ্টুমিও ভালবাসেন এবং দুষ্টু বলে মা যশোদার কাছে অভিযোগ করতেও ভালবাসেন। যশোদা খুব বিব্রত হয়ে বললেন, এই দুরন্ত ছেলেকে আমি এবার বেঁধে রাখব। গোয়ালার বাড়ি, দড়ির অভাব নেই। 'বেঁধে রাখব' বলে মা একটা দড়ি নিয়ে ছেলেকে বাঁধতে গিয়ে দেখেন দু-আঙুল কম পড়েছে। এতটুকু ছেলে, তাঁকে বাঁধতে গিয়ে গরু বাঁধার দড়িতে দু-আঙুল কম পড়েছে! এটা যে আশ্চর্য ব্যাপার একথা মায়ের মনে হলো না। ভাবলেন, আরেকটা দড়ি জুড়ে নিয়ে বাঁধি। আরেকটা দড়িও আবার দু-আঙুল কম পড়ল। যত দড়ি ছিল সব নিয়েও ঐ দু-আঙুল আর কুলোচ্ছে না। ছেলেকে বাঁধতে গিয়ে পরিশ্রমে মা ক্লান্ত। ভাগবতের বর্ণনাটি ভারি সুন্দর। যশোদার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, চুল এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। শ্রান্ত-ক্লান্ত যশোদা আর পারছেন না। তখন গোপাল মায়ের কাছে স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়লেন। কখন পড়লেন? যখন মা আর পারলেন না।

ভক্তদেরও সেইরকম ভগবানকে বাঁধবার জন্য জপধ্যান, সাধনভজন প্রয়োজন। কিন্তু তাতেও কি তিনি বাঁধা পড়বেন? না পড়লেও করে যেতে হবে। শ্রান্ত-ক্লান্ত হতে হবে। সাধন করে করে সাধনের অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে হবে। বুঝতে হবে, কঠিন থেকে কঠিনতর সাধনা করলেও বস্তুলাভ করা সম্ভব নয়। মর্মে মর্মে এটি যখন বুঝতে পারব এবং বুঝে অহঙ্কার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখনই তিনি বাঁধা পড়বেন। এই কথাটিই সুন্দর কবিত্বপূর্ণভাবে ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদ্ স্বামী তুরীয়ানন্দ খুব বেদান্তচর্চা করতেন। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তান। ত্রিসন্ধ্যা জপধ্যান, গঙ্গাস্নান এবং বেদান্তবিচারে তাঁর সমস্ত দিন চলে যেত। নিজের সাধনে তিনি এতই একাগ্র ছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাঁর যাওয়ার সময় হতো না। অনেকদিন তাঁকে না দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন : "হরি কেন আসছে না?" তাঁর অন্য সন্তানরা বললেন, তিনি এখন সাধনে খুব ব্যস্ত, তাই তাঁর আসার সময় হয় না। ঠাকুর শুনে চুপ করে রইলেন। একদিন ঠাকুর বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। বলরামবাবুর বাড়ি ছিল ঠাকুরের কলকাতার 'বৈঠকখানা'। তিনি কলকাতায় এলে ভক্তমণ্ডলী সেখানে জড়ো হয়ে তাঁকে দর্শন করতেন। সেখানে পৌঁছে ঠাকুর হরি মহারাজকে খবর দিতে বললেন। কাছেই ছিল তাঁর বাড়ি। আহ্বান পেয়ে হরি মহারাজ যখন ঠাকুরের কাছে এলেন তখন দোতলার হলঘরে ভক্ত-পরিবৃত হয়ে ঠাকুর তাঁর মধুর কণ্ঠে একটি গান গাইছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে-কার্পেটের ওপর তিনি বসে আছেন তারও খানিকটা চোখের জলে ভিজে গিয়েছে। গানটি সাধারণ যাত্রাদলের, কিন্তু দলের গায়করা তো শ্রীরামকৃষ্ণের মতো হৃদয় দিয়ে গান করতে পারে না। গানের বিষয়বস্তু—অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে লবকুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ। রামচন্দ্রের সৈন্যরা লবকুশের কাছ থেকে ঘোড়া উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করছে। হনুমান বোধহয় অগ্রণী ছিলেন। সৈন্যরা পরাস্ত হলে লবকুশ হনুমানকে বেঁধে মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছেন : মা কত বড় একটা হনুমানকে বেঁধে নিয়ে এসেছি! হনুমান তখন গান গেয়ে বলছেন : "ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?"

ঠাকুর এই গানটি গাইছেন আর দুচোখে তাঁর অশ্রুধারা বইছে। হরি মহারাজ দূর থেকে এই দৃশ্য দেখলেন। তাঁর চোখ দিয়েও অশ্রুধারা বইতে আরম্ভ করল। তিনি বুঝলেন যে, এই গান তাঁকেই উদ্দেশ্য করে। হরি মহারাজকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ঠাকুর আজ তাঁকে ডেকে এনেছেন। আর কিছু বলতে হলো না। তিনি বুঝলেন, স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে সাধন করে কে তাঁকে ধরতে পারবে? সাধনের এই অভিমান বৃথা। এটি বুঝতে পেরে অভিমান বিসর্জন দিয়ে শ্রীগুরুর চরণে আবার নতুন করে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

হরি মহারাজ পরবর্তী কালে বলতেন : "সাধন কেন জান? তাঁকে পাওয়ার জন্য নয়, সাধনের অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার জন্য।" ঠাকুরের গল্পে আছে—উড়ে উড়ে পাখির যখন ডানা ব্যথা করে তখন সে একটা মাস্তুলে গিয়ে বসে। তেমনি ভগবানকে পাওয়ার জন্য সাধন করতে হবে, কিন্তু সাধনের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। মা যশোদা যখন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, আর পারলেন না তখনই শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা পড়লেন। হনুমানের অসীম শক্তিকে পরাভূত করে লবকুশ হনুমানকে ধরতে পারেনি। হনুমান জানতেন, তাঁরা রামচন্দ্রের সন্তান, তাই তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছেন। হয়তো এও জানতেন যে, এইভাবেই মা জানকীর দর্শনলাভ হবে।

সেইরকম সাধনের দ্বারা তাঁকে লাভ করব, লক্ষ জপ করে তাঁকে বশীভূত করে ফেলব—এটি আমাদের ভুল ধারণা! কখনো তা পারব না। সাধন কি তাহলে বৃথা, নিরর্থক? তাও নয়। ডানা ব্যথা করার মতো সাধন করে করে এই অভিমানটুকু চূর্ণ করতে হবে যে, সাধন করে তাঁকে লাভ করা যায় না। তখনই আমাদের ওপরে তাঁর কৃপা বর্ষিত হবে। এইটুকু মনে রাখতে হবে। তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করতে হয়—তিনি যেন আমাদের বেশি পরীক্ষা না করে, কঠোর পরিশ্রম না করিয়ে কৃপা করে আমাদের অভিমান দূর করেন এবং নিজে আমাদের কাছে প্রকাশিত হন।★ □

★ গত ১২ নভেম্বর ১৯৭৮ কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর ভাষণ।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বিশেষ রচনা

পরিবর্তনের মুখে রামকৃষ্ণ মঠ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলমবাজার মঠের দ্বিতীয় পর্যায়ের কালসীমা এপ্রিল ১৮৯৪ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। পটভূমিকায় দেখা যায়, গুরুভাই নরেন্দ্রনাথের জয়গানে স্বদেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা মুখরিত। বিশ্বমঞ্চে নরেন্দ্রনাথের সাফল্য ও তার তাৎপর্য আলোচনা করে দলপতির জন্য মঠবাসীদের বুক গর্বে ফুলে উঠেছে, কিন্তু এসকল আনন্দের মধ্যে তাঁদের মনে একটি সংশয় থেকেই যায় যখন তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল তাঁদের সম্বন্ধে উদাসীন, অথচ সেই সময়ে তিনি মাদ্রাজ, জুনাগড়, বেলগাঁওয়ে কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে চিঠিপত্রের লেনদেন করে চলেছিলেন। অবশ্য তাঁদের সংশয়ের কুয়াশা জমাট বাঁধবার আগেই বিদেশ থেকে লেখা নরেন্দ্রনাথের প্রথম চিঠি—তারিখ ১৯ মার্চ ১৮৯৪—এপ্রিল মাসে মঠে পৌঁছায়। সে-চিঠি নিয়ে মঠবাসীদের কী উল্লাস, কী উত্তেজনা! তাঁরা বারবার চিঠি পড়েন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন, নরেন্দ্রনাথের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেন। অতঃপর তাঁর চিঠি একটার পর একটা আসতে থাকে—কোন চিঠি সব গুরুভাইদের উদ্দেশে, আবার কোন চিঠি মঠের ব্যক্তিবিশেষের জন্য। অল্প সময়ের মধ্যে মঠবাসীদের সঙ্গে নেতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে, মঠ ও মঠবাসিগণের প্রত্যেকের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে পুরনো ভক্ত বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধযুক্ত তথ্যাদি চেয়ে পাঠান।

এসব খবরাখবর ছাড়াও নেতা নরেন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি চিঠি ছিল অগ্নিগর্ভ চিন্তাভাবনার বাহন। সেগুলি কামানের গোলার মতো মঠবাসীদের চিত্তের অঙ্গনে ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকে। তাঁরা উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। কেউ-বা বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবেন নরেন্দ্রনাথ কী চাইছেন, বিশেষতঃ তিনি যখন লেখেন : "তোমাদের character formed হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি বুঝলে?" অথবা তিনি যখন লেখেন : "সমাজকে, জগৎকে electrify করতে হবে।... ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম।... তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought-currents." অনেকাংশে দুর্বোধ্য মনে হলেও তাঁর ভাবনারাশি অনেক হৃদয়কে নাড়াচাড়া দেয়, অনেক চিত্তে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁরা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা চিঠিতে পড়েন : "তোলপাড় কর। তোলপাড় কর। একটাকে চীনদেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপানদেশে পাঠা। গৃহস্থদের কাজ নয়।... সন্ন্যাসীর দলকে হুঙ্কার দিতে হবে—'হ-র্, হ-র্, 'শ—ম্ভো'!" বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে তাঁদের সকলকে লেখা চিঠিতে পড়েন : "মহাহুঙ্কারের সহিত কর্ম আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কূর্মস্তারক-চর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্। ডর? কার ডর? কাদের ডর?" নরেন্দ্রনাথ তাঁর গুরুভাইদের শুধুমাত্র প্রেরণাগ্নি পাঠাচ্ছিলেন না। তাঁর অভিনব পরিকল্পনাগুলি জানাচ্ছিলেন, সে-সঙ্গে কর্মসূচীও পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু গুরুভাইদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পাচ্ছিলেন না। তাঁদের সক্রিয় করবার জন্য কখনো তিনি হুমকি দিয়ে লিখছিলেন : "I will wash my hands off for ever." আবার কখনো উৎসাহ দিয়ে লিখছিলেন : "যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক; বাকি কাউকে আমার চাই না।" কখনো-বা প্রেরণা জাগিয়ে লিখছিলেন : "সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help আমি চাই; কারুর সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ খবরদার যাতে না হয়।"

নেতার চিঠিগুলির চমৎকারিত্বে মঠবাসিগণ বিস্মিত হন। অভিনব ভাবনালোষ্ট্রগুলির অবিরাম বর্ষণে কেউ কেউ বিব্রত বোধ করেন, কেউ-বা সাময়িকভাবে ধৈর্য হারিয়ে একটু-আধটু বিরূপ মন্তব্য করে বসেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পরবর্তী একটি চিঠিতে "আরে দাদা, এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—একথা সত্য বটে।"—পড়ে তাঁরা থমকে যান। মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ বুঝি-বা অলৌকিক শক্তিবলে মঠের সকলের সবকিছু জানতে পারছেন। মঠবাসীদের ধারণা হয়—নরেন্দ্রের মধ্যে এক মহাশক্তির উন্মেষ হয়েছে, যার ছিটেফোঁটা তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে স্ফুরিত হচ্ছিল। তাঁর চিঠিগুলি ছিল যেন 'লেটার-বম্ব', চিঠি খুলে পড়তে না পড়তেই পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্তহ্রদ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত। কিন্তু এর মধ্যে তাঁরা দেখতে পেতেন শ্রীগুরুর মহিমা, অনুভব করতেন তাঁদের গুরুর বিশেষ প্রিয় নরেন্দ্রের শক্তির দাপট। তাঁরা

হতভম্ব হয়ে শুনতেন নরেন্দ্রনাথের শিহরণ-জাগানো বাণী ঃ "যখন তোমরা বলো রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরেই বলো, আমরা কিছু জানি না, তখনই আমি বলি liar, চোর, ঝুট বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে।" তাঁরা শুনতেন ঃ "আরে এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝতে লাগল, আর তোমরা বসে বসে দীনহীনা ব্যামোয় ভোগ? কার ব্যামো—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে।" কথা তো নয়, মনে হয় আগুনের ফুলকি, তপ্ত হাওয়া। কখনো-বা মনে হয় কড়া চাবুক। ফলকথা, মঠবাসীদের মনোজীবনে বিবেকানন্দ-বাণী প্রবল-গতি ঝড়ের মতো বইতে থাকে। স্বাভাবিক কারণেই তার প্রতাপ মঠ-বাসীদের ব্যষ্টিজীবনে বিভিন্ন মাত্রায় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং গোষ্ঠীজীবনে অনুভূত হয় তার অনতিক্রম্য চাপ।

নেতা নরেন্দ্রনাথের চিঠির মধ্যে সময় সময় বিভিন্ন জিনিসপত্র সরবরাহের অনুরোধ থাকত। তদনুযায়ী ভক্ত হরমোহন মিত্র বা রামদয়াল চক্রবর্তী বা মঠবাসীদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ বা অন্য কেউ সেসব সংগ্রহ করে পাঠাতেন। অধিকাংশ ফরমাশ থাকত প্রচুর সংস্কৃত শাস্ত্রাদি গ্রন্থের। প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় থাকত অড়হর ডাল, মুগের ডাল, আমসত্ত্ব, আমসি, আমতেল, আমের মোরব্বা, বড়ি, মশলা ইত্যাদি। বিশেষ দ্রব্যের তালিকায় থাকত রুদ্রাক্ষ ও কুশাসন। প্রিয় নেতা নরেন্দ্রনাথের জন্য এটুকু সেবা করতে পেরে মঠবাসী ও তাঁর অনুরাগীরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করতেন।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আলমবাজার মঠবাসীদের চিত্তের অঙ্গনে বিবেকানন্দ-সূর্যের আলো ও উত্তাপ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। মঠের স্বচ্ছমনা তাপসদের একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। সেটি হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান হয়েই স্বামীজী দুনিয়াময় হুলস্থুল বাধিয়েছেন—ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি স্বামীজীর মাধ্যমে ক্রিয়মাণ। স্বামীজীর স্বহস্তে লিখিত একালের চিঠিপত্রের মধ্যেও এই ভাব পরিস্ফুট। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে লেখা তাঁর একটি চিঠির মধ্যে পাই ঃ "আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন।" ভিন্ন একটি চিঠিতে পড়ি ঃ "উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে। Onward, onward।... নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এজন্মে অনন্ত বিস্তার—তাঁহার মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার।... 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে।... যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit আসবে, বিশ্বাস কর।... আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে।" ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা তাঁর একটা চিঠির অংশ ঃ "আমি যতদিন পৃথিবীতে আছি, তিনি আমার মধ্যে কার্য করিতেছেন—ইহাতে তোমাদের যতদিন বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" এদিকে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর মুখেও উচ্চারিত হয় একই ধরনের কথা। বলরাম-ভবনের পশ্চিমে একটা সরু গলিতে শরৎ সরকারের বাড়ি (বর্তমান ঠিকানা—৫৯/২, রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৩)। শ্রীমা সেখানে অবস্থান করছিলেন। স্বামীজীর লেখা একটা চিঠি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মাকে পড়ে শোনান। মা গোলাপ-মার মাধ্যমে বলেন ঃ "নরেন ঠাকুরের যন্ত্র, তাই তাকে দিয়ে তিনি এসব লিখিয়েছেন, যাতে তাঁর ছেলেরা ও ভক্তরা তাঁর কাজ করতে পারে, জগতের কল্যাণ করতে পারে। নরেন যা লিখেছে সব ঠিক, কালে নিশ্চয়ই সফল হবে।"[১২২] শ্রীমায়ের এই মন্তব্য মঠবাসীদের মধ্যে ও অন্তরঙ্গ ভক্তমহলে ছড়িয়ে পড়ে। মঠবাসিগণের মানসে স্বামীজীর এক অভিনব ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মঠবাসীদের সম্মুখে একটা চ্যালেঞ্জ

মঠবাসীদের সম্মুখে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিল একটি নতুন কাজের দায়িত্ব, যার সম্বন্ধে মঠবাসীদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁদের না ছিল জনবল, অর্থবল বা সাংগঠনিক কর্মের অভিজ্ঞতা, কিন্তু অনুপ্রাণিত মঠ-বাসিগণ এই দায়িত্ব একটা চ্যালেঞ্জের মতো গ্রহণ করেন; তাঁদের কয়েকজন দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে যান।

স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যে বিদেশে ও স্বদেশে তাঁর বেশকিছু সংখ্যক শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিংসায় জ্বলে উঠেছিল, কারো কারো স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা ক্ষেপে গিয়েছিল, এমনকি তাঁর জীবননাশেরও চেষ্টা করেছিল। এদিকে স্বদেশে স্বামীজীর অনুরাগিবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে

১২২ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৯

জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। আমেরিকাতে তাঁর বেদান্ত-প্রচারের রথখানির গতি বাধাশূন্য করবার জন্য স্বামীজী আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ৯ এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখে নির্দেশ দেন মাদ্রাজে একটা বৃহৎ জনসভার আয়োজন করে একটা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য। প্রস্তাবের মূলে থাকবে যে, স্বামীজী-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম যথাযথ হয়েছে।[১২৩] সে-প্রস্তাব আমেরিকার কয়েকটি প্রধান পত্রিকায় এবং শিকাগো ধর্মমহাসভার সভাপতি ডঃ ব্যারোজকে পাঠাতে হবে। অবশ্য এ-চিঠি মাদ্রাজে পৌঁছাবার আগেই ২৮ এপ্রিল ১৮৯৪ মাদ্রাজ শহরে পাচাইয়াপ্পার হল-এ একটি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন স্বামীজীর অনুরাগী স্থানীয় যুবকবৃন্দ। শহরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ সোচ্ছ্বাসে স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন। আগস্টের শেষভাগে এ-সংবাদ আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাঙ্গালোর ও কুম্ভকোনমে।

আলাসিঙ্গাকে লেখা উপরোক্ত চিঠিতে স্বামীজী কলকাতাতেও ঐধরনের জনসভা সংগঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। মাদ্রাজের সভার খবর চিঠি ও পত্রিকা মারফৎ জানতে পেরে এবং তারও আগে স্বামীজীর চিঠি[১২৪] পেয়ে মঠবাসীদের কয়েকজন কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েছিলেন। এ-খবর স্বামীজীর কানে পৌঁছায়। মঠবাসীদের উৎসাহ দিয়ে স্বামীজী লিখলেন ঃ "শশী প্রভৃতি যে ধুমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুশি। ধুমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধুমক্ষেত্র মোচে যাবে, 'বাহ্ গুরুকা ফতে!' আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি', ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরি হয়ে যায়।"[১২৫] এ-চিঠি মঠবাসীরা পাওয়ার আগেই ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ কলকাতার টাউন হল-এ রাজা প্যারীমোহন মুখার্জীর সভাপতিত্বে এবং চারহাজার নাগরিকের উপস্থিতিতে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের প্রায় একবছর পরে সংগঠিত হলেও "কলিকাতার সভাটি স্বামীজীর নিকট খুবই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, কারণ গৃহীত প্রস্তাব ও সভাপতির পত্রে স্বামীজীর অনেকগুলি প্রাণের কথার প্রতিধ্বনি ছিল।"[১২৬]

কলকাতার জনসভার সাফল্যে স্বামীজী খুশি হয়েছিলেন অপর একটি বিশেষ কারণে। প্রকাণ্ড একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে মঠবাসীদের কয়েকজন জড়তা, দ্বিধা, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির প্রাচীর ডিঙিয়ে বিরাট জনসভাটি সুচারুভাবে সংগঠন করেছিলেন। স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র প্রমুখ কয়েকজন খুবই পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ২২ অক্টোবর ১৮৯৪ স্বামীজী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে লিখলেন ঃ "এসকল মিটিং ও Address-এর প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের জন্য নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য। এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে —strike the iron while it is hot. মহাশক্তিতে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ কর।... মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে।... জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজানো উদ্দেশ্য নহে।" স্বামী অভেদানন্দকে অপর একটি চিঠিতে লিখলেন ঃ "তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই? অদ্ভুত কর্মক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের সকলের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে।... ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামার দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে বেশ কথা।... তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোন ভয়

১২৩ স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)।... প্রস্তাবটি এমন ধরনের হবে যে, মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ, যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কাজে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

১২৪ ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগে স্বামীজী মঠবাসীদের লিখেছিলেন ঃ "যদি কলিকাতা অথবা মাদ্রাজের হিন্দুরা সভা করে রিজলিউশন পাস করিত যে, ইনি আমাদের প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকদের অভিনন্দন করিত—আমাকে যত্ন করিয়াছে বলিয়া, তাহলে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল, কই কিছুই হলো না!" (পত্রাবলী, পৃঃ ২৫৮) স্বামী অভেদানন্দ 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৫) যে-চিঠির উল্লেখ করেছেন সেটি সম্ভবতঃ এই চিঠিই।

১২৫ নিউ ইয়র্ক থেকে ২৫।৯।১৮৯৪ তারিখে লেখা চিঠি

১২৬ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ১৫৪

নাই।... আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভ্রাতৃস্নেহবৎ তোমাদের মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই প্রভুর কার্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা।" এই চিঠিতেই প্রকাশিত হয়েছিল স্বামীজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত। তিনি লিখেছিলেন: "ফলে এই পর্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে।" স্পষ্টতই মনে হয়, স্বামীজী তাঁর নেতৃত্বের বৃহত্তর ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সামগ্রিক বিচারে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল।[127] এই অবসরে দেশবাসী তথা মঠবাসীদের মধ্যে জাগরণোন্মুখ এই শক্তিকে স্বদেশ এবং জগতের কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করতে স্বামীজী ব্যগ্র হয়ে ওঠেন।

এদিকে কলকাতায় জনসভা সংগঠনের জন্য প্রচুর জনসংযোগ, অর্থসংগ্রহ, দৈনিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, দেশব্যাপী বিবেকানন্দ-অনুরাগী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটা নির্জনতাপ্রিয় মঠবাসীদের নিকট ছিল এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। এর ফলে মঠ সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল বাড়ে; স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভাইদের সম্বন্ধে অনেকেই সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের যৌথ প্রচেষ্টায় সফল জনসভা স্বামীজীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সাংগঠনিক প্রস্তুতির একটি দিগন্ত উন্মোচিত করে। এর সূত্র ধরে স্বামীজী নতুন উদ্যমে মঠবাসীদের মধ্যে তাঁর ভাবনারাশি সঞ্চালিত করতে থাকেন।

মঠ ও শ্রীমা

মঠবাড়ির পশ্চিম দিকে একটু দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল কলুষনাশিনী গঙ্গা আর মঠবাসীদের ভাবজীবনে ফল্গুধারার মতো বহমান ছিল শ্রীরামকৃষ্ণধারা ও মা শ্রীসারদা-ধারা। কাশীপুর বাগানবাড়িতে হবু-সন্ন্যাসীদের গোষ্ঠীজীবনে শ্রীসারদা-ধারা ছিল খুবই ক্ষীণ। আলমবাজারের মঠজীবনে সে-ধারা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ, কয়েকজন মঠবাসীর মনোজগতে তাঁর অবস্থান, গতিবিধি ও ক্রিয়াকলাপ বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল।

আলমবাজার মঠের প্রথম পর্যায়ে শ্রীমার অনুমতিপত্র নিয়ে নরেন্দ্রনাথ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলেন। আলমবাজার মঠে শ্রীমা কখনো পদার্পণ করেছিলেন বলে জানা যায় না, কিন্তু কলকাতায় বা তার নিকটবর্তী কোন জায়গায় তিনি অবস্থান করলে অথবা কামারপুকুর ও জয়রামবাটী ভিন্ন কোন স্থানে গমন করলে শ্রীমার সঙ্গে যেতেন এক বা একাধিক মঠবাসী।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপূজার সময় মাতঙ্গিনীদেবীর আমন্ত্রণে শ্রীমা আঁটপুরে দুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকেন। সেসময়ে শ্রীমার পাদপূজা করে ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণ অনুভব করেন যে, তাঁরা জ্যান্ত দুর্গার পূজা করলেন।

১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে জননী ও সহোদরদের নিয়ে শ্রীমা কাশী হয়ে বৃন্দাবন গমন করেন। তাঁর সেবক-সঙ্গী ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। এপ্রিলে কলকাতায় ফিরে শ্রীমা জয়রামবাটী চলে যান ১৩ মে। ১৮৯৬-এর এপ্রিল-মে মাসে শ্রীমা বাগবাজারে শরৎ সরকারের বাড়িতে একমাস অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর সঙ্গী সেবক ছিলেন স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। এরপর শ্রীমা সরকারবাড়ি লেনে গুদামবাড়ির তিনতলায় বাস করেন। মায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। কালীপূজার পর মা জয়রামবাটী ফিরে যান।

১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীমা সেসময়ে জয়রামবাটীতে। সংক্ষেপে বলতে হয়, আলোচ্য কালে শ্রীমার ঊর্ধ্বগামী মন সহজভূমিতে পুরোপুরি না নামলেও তাঁর সঙ্গে মঠ ও মঠবাসীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছিল।

মঠজীবনের পুনর্গঠনে স্বামীজীর সঙ্কল্প

পাশ্চাত্য দেশে সংগঠন ও সংযোগশক্তির ক্ষমতা দেখে স্বামীজী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, সঙ্ঘের অঙ্গগণের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সহায়তা দ্বারা সে-শক্তির বিকাশ হয়ে থাকে। তিনি

১২৭ মাদ্রাজ, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, কুম্ভকোনম ছাড়াও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সভা-সমিতি সংগঠনের প্রস্তুতি চলেছিল। তখন স্বামী অখণ্ডানন্দ গুজরাটের নাথদ্বারে। সেখান থেকে প্রমদাদাস মিত্রকে ৪।১১।১৮৯৪ তারিখে তাঁর লেখা চিঠি থেকে জানা যায়, বম্বেতে একটি সভার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন যে, প্রমদাদাসবাবু কাশীধামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত সংস্কৃতভাষায় একটি ধন্যবাদপত্র আমেরিকাতে ধর্মমহাসম্মেলনের সংগঠকদের পাঠান। সম্ভবতঃ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল।

বুঝেছিলেন, সন্ন্যাসিসঙ্ঘের সফলতা নির্ভর করছে পরস্পরের ভালবাসার ওপর। সেই সফলতার পথে বাধা হচ্ছে দ্বেষ, ঈর্ষা, অহমিকাবুদ্ধি ইত্যাদি। এ-অভিজ্ঞতার আলোকে স্বামীজী আলমবাজার মঠজীবনকে নতুন রূপদানের জন্য মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি দৃষ্টি দেন মঠবাসীদের স্বাস্থ্যের প্রতি।

মঠবাসীদের অধিকাংশের শরীর ছিল মজবুত। কিন্তু পর্যটন ও তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় তাঁদের শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল। অর্থাভাবে সুচিকিৎসা ও সুপথ্য সংগ্রহ সম্ভব হতো না। উপরন্তু তাঁরা বারবার ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিলেন।[১২৮] স্বামীজী মঠবাসীদের উপদেশ দেন ফোটানো জল ফিল্টার করে পান করতে। ১১ এপ্রিল ১৮৯৫ তারিখে স্বামীজী শশী মহারাজকে লিখলেন: "তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তিপড়া বা অস্বাস্থ্যকর আহার বা পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত।... দ্বিতীয়তঃ খাবার ও রান্নার জল যেন ফিল্টার করা হয়।... সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে খাওয়া—এসকল অত্যাবশ্যক। যেপ্রকার বলছি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা না হয়।"[১২৯] আরেকটি চিঠিতে লিখলেন: "সকলে গুঁতোগুঁতি করে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে দুই জনের অধিক থাকা উচিত নহে।"[১৩০] অপর একটি চিঠিতে নির্দেশ দিলেন: "মাটিতে শোওয়া ত্যাগ করিবে; পার যদি —অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে তো বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় ব্যাধির কারণ। ঐসকল টাকার কাজ। সারদা তার বন্ধুদের পত্র লিখুক, ঐপ্রকার সকলে চেষ্টা কর। আমি এখানে চেষ্টা করছি বৈকি!"[১৩১]

উপরন্তু রোগ-নিরাময়ের জন্য স্বামীজী মানসিক শক্তি প্রয়োগের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্বামী সারদানন্দকে লিখেছেন: "যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপ দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে।"[১৩২] স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন: "রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসনপ্রতিষ্ঠা—'আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ'—ওর মানে কি...? বলো—আমার ভেতর সব আছে, ইচ্ছা হলে বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বলো, বাবুরাম যোগেন আত্মা—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বলো ঘণ্টাখানেক দু-চারদিন। সব রোগ-বালাই দূর হয়ে যাবে।"[১৩৩] এই সূত্র ধরে মঠবাসীদের কেউ রোগ-নিরাময়ের চেষ্টা করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলেও তার ফল কি হয়েছিল তা আমাদের অজ্ঞাত।

মঠবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে স্বামীজী তাঁর চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছিলেন তাঁদের সামনে। তিনি চাইছিলেন মঠজীবনকে প্রণালীবদ্ধ ও সুসংহত করতে এবং কিছু পরিবর্তিত আদলে গড়ে তুলতে। মঠের জন্য তিনি একটি প্রশস্ত বাড়ির সন্ধান করতে বলেন। তার একটা হলঘরে পুঁথিপাটা রাখতে হবে। সে-ঘরে তামাকসেবন নিষিদ্ধ। তামাকসেবনের জন্য একটা ভিন্ন ঘর থাকবে। মঠবাসীদের দিনচর্যা সুনিয়ন্ত্রিত এবং জনসাধারণের নিকট মঠের দ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য তিনি লেখেন: "প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কালী, হরি, তুলসী, শশী প্রভৃতি অদলবদল করে যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রপাঠ করে ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান-ধারণা ও একটু সঙ্কীর্তনাদি হয়। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা routine করিয়া লইলেই বড় মঙ্গলের বিষয়—সন্ধ্যাকালের পাঠাদির সময় সাধারণ

১২৮ যখন মঠে কয়েকজন ম্যালেরিয়া বা সর্দিজ্বরে কিছুদিন ভুগতেন, তখন তাঁরা চা খেতেন। গরম গরম চা খেয়ে আপাদমস্তক কম্বলে ঢাকা দিয়ে রুগী বসে থাকত, যতক্ষণ না খুব ঘাম বেরিয়ে শরীর হালকাবোধ করত। (দ্রঃ স্বামী বিরজানন্দের খাতা, পৃঃ ২৭)

১২৯ পত্রাবলী, পৃঃ ৩১০ ১৩০ ঐ, পৃঃ ৪০৯ ১৩১ ঐ, পৃঃ ৪২৮

১৩২ ২০ মে ১৮৯৪ তারিখের চিঠি (পত্রাবলী, পৃঃ ১৩৫)

১৩৩ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখের চিঠি (পত্রাবলী, পৃঃ ১৯৯)

লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে; এবং প্রতি রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ-কীর্তনাদি হওয়া উচিত, সেটা public-এর জন্য। এই নিয়মাদি করে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হতে গড়গড় করে চলে যাবে।"[১৩৪] এইভাবে মঠজীবনের কাঠামকে নতুন ঢৌলে গড়ে তোলবার জন্য স্বামীজী নানান নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি মঠবাসীদের মধ্যে কর্ম ও দায়দায়িত্ব বণ্টন করে দিচ্ছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত এক গুরুভাইকে তিনি লিখে জানালেন: "আমি তোমাদের সকলকে—তোমাদের ক্ষমতা ও অক্ষমতা জানি।"[১৩৫] এসব সত্ত্বেও মঠের তাপসগণ নতুন কর্মসূচী অবিলম্বে গ্রহণ করতে পারেননি।

মঠে বিদ্যাচর্চা

বরানগরে থাকাকালীন মঠবাসীদের কয়েকজনের বিদ্যাচর্চায় যে আগ্রহ ও প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তা আলমবাজার অধ্যায়ে বেড়েছিল বৈ কমেনি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অবসরসময়ে উচ্চ গণিতের চর্চা ও ইংরেজী সাহিত্যের পাঠ ছাড়াও সংস্কৃতভাষায় অনুষ্টুপছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী রচনা করেছিলেন। তার কতকাংশ হৃষীকেশ শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'বিদ্যোদয়ে' প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ খ্রীস্ট সাহিত্য ও তন্ত্রসাহিত্যের চর্চায় মনোভিনিবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রথম লেখাটি তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে ইংরেজী নিবন্ধ, সেটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকায়। শাস্ত্রপাঠে স্বামী অভেদানন্দের বিশেষ নিষ্ঠা সুবিদিত। আলমবাজার মঠে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমস্ত দিন প্রায় ধ্যানজপ ও পড়াশুনা করতেন। তিনি হৃষীকেশে থাকাকালীন মণ্ডলীশ্বর ধনরাজ গিরির নিকট শারীরক ভাষ্য পড়েছিলেন। স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ বেশ কিছুকাল প্রত্যহ দুপুরে প্রায় দুই ঘণ্টা তাঁর কাছে শারীরক ভাষ্য পাঠ করেছিলেন।[১৩৬]

পরিব্রাজন সমাপনান্তে মঠে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রথম প্রথম খুব অন্তর্মুখীন থাকতেন। তিনি নিয়ত শাস্ত্রপাঠ করতেন ও অপরকে শাস্ত্রপাঠে সাহায্য করতেন। শাস্ত্রাদির পাঠ ও আলোচনা—সবকিছু হতো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে। মঠবাসীদের সম্মুখে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের দিঙ্‌নির্দেশ। তিনি লিখেছিলেন: "বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না।... He was the living commentary to the Vedas and to their aim."[১৩৭] ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে মঠবাসিগণ প্রমদাদাস মিত্রের চিঠিতে জানতে পারেন যে, অযোধ্যায় এক পল্লীতে একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। তিনি ৪০ টাকা মাসিক বেতন ও সিধা পেলে মঠে আচার্য হিসাবে যোগদান করতে পারেন। মঠে অর্থাভাব, তবুও বেদপাঠে আগ্রহী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হন।[১৩৮] অবশ্য সেই বেদজ্ঞ পণ্ডিত শেষপর্যন্ত যোগদান করেননি।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ২১ জুন ১৮৯৫ তারিখে আলমোড়া থেকে যাত্রা করেছিলেন কৈলাস ও মানস সরোবরের উদ্দেশে। বিপদসঙ্কুল তিব্বতভ্রমণ শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরেছিলেন ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে। তিনি ইংরেজী পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান মিরর'-এ ৯টি সংখ্যায় তাঁর অসমাপ্ত ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেছিলেন।[১৩৯]

মঠবাসীদের বিদ্যাচর্চায় বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিলে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র। সেসব চিঠিপত্রের একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। স্বামীজী লিখেছিলেন: "পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মুখ্যু-ফুখ্যু জড়ো করিসনি বাপু।"[১৪০] এধরনের প্রেরণার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আমরা কতকটা ধারণা করতে পারব স্বামী শিবানন্দের স্মৃতিকথা থেকে। পরবর্তী কালে তিনি বলেছিলেন: "স্বামীজী আলমবাজার মঠে শশী মহারাজকে লিখলেন, 'দেখ শশী, এখন বুঝতে পারছি—এসব তাঁর কাজ; তিনি কেন এত ভালবাসতেন, অত করে বলতেন—সব বুঝতে পারছি।' পূর্বে স্বপ্নেও ভাবিনি কর্ম করতে হবে, ওদিকে ঝোঁকও ছিল না। স্বামীজীর এই চিঠি পেয়ে ভাবনা হলো—তাইতো কিছু করতে হবে। তখন পড়ার ঝোঁক হলো। টাকাকড়ি কিছু নেই, ঠিক এমন সময়ে বম্বে থেকে এক ভক্ত এল। সে কটা টাকা দিল, তাই দিয়ে কলকাতা থেকে দু volume Webster's Dictionary কিনে নিয়ে এলাম। আলমারি হলো, ডেস্ক হলো, একটু কর্মের ভাব এল।"[১৪১] [ক্রমশঃ]

১৩৪ পত্রাবলী, পৃঃ ৪০৯ ১৩৫ ঐ, পৃঃ ৪০১ ১৩৬ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১২৮-১২৯
১৩৭ পত্রাবলী, পৃঃ ২৫৫ ১৩৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১১৫
১৩৯ প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয় ২২।১২।১৮৯৫ তারিখে এবং শেষ কিস্তি ৩০।৫।১৮৯৭ তারিখে।
১৪০ পত্রাবলী, পৃঃ ৩১০ ১৪১ মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ১০৩

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী বিরজানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ (১৯৩৮-১৯৫১)। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের সন্ন্যাসিশিষ্য। সাধনপথের পথিকদের জন্য তাঁর 'পরমার্থপ্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি অবশ্যপাঠ্য ও অপরিহার্য। পরম পূজ্যপাদ মহারাজজীর মুখনিঃসৃত কয়েকটি কথা আমরা এখানে 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পরিবেশন করছি। মহারাজজীর কথাগুলি আমরা সংগ্রহ করেছি স্বামী গোকুলানন্দজীর সৌজন্যে। স্বামী গোকুলানন্দজী বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নয়াদিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্থান : বেলুড় মঠ

প্রশ্ন : 'রামকৃষ্ণলোক' আছে কি?

মহারাজ (গম্ভীরভাবে) : হ্যাঁ, আছে।

প্রশ্ন : স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের দেখা পাওয়া যায় কি?

মহারাজ : হ্যাঁ, পাওয়া যায়। ওঁরা আর কোথায় গেছেন? দৃঢ় আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে যা চাইবি তাই পাবি।

স্থান : হিমালয়ের বুকে শ্যামলাতাল আশ্রম।

শ্যামলাতাল আশ্রম স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিজের হাতে গড়া। এই আশ্রম ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। একাদিক্রমে এগার বছর জনমানববর্জিত ও অরণ্যানী পরিবেষ্টিত এই পার্বত্য আশ্রমে তিনি কঠোর তপস্বী জীবন যাপন করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হওয়ার পরেও তিনি মাঝে মাঝে শ্যামলাতাল আশ্রমে এসে থাকতেন এবং সেখানকার নির্জন শান্ত পরিবেশে সাধনভজনে ডুবে যেতেন। জরুরী কাজের তাগিদ না থাকলে তিনি এখানেই থেকে যেতে ভালবাসতেন। তাঁর আবাস এবং আশ্রম-বাড়িটির মধ্যে দু-তিন মিনিটের পথের দূরত্ব। তাঁর ঘরটি ছিল একটি উঁচু কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর তৈরি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনের লম্বা বারান্দার দেওয়ালগুলি কাঁচের। কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে হিমালয়-শৃঙ্গ নন্দাদেবী পরিদৃশ্যমান। কখনো কখনো নন্দাদেবীর তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গে প্রভাতী রোদের ঝলমলে মিষ্টি আলো পড়ে অপূর্ব এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চোখের সামনে ধরা পড়ে। মহারাজজীর শয়নকক্ষের পাশেই ঠাকুরঘর। সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ফটো আসনে রাখা আছে। শ্রীশ্রীমায়ের ফটোটি ভারী চমৎকার। মহারাজজী স্নান সেরে ঠাকুরঘরে যেতেন। সারা বাড়ি একটা জমাট আধ্যাত্মিক ভাবে গমগম করত।

সেবার (১৯৪৯) ছিল্ল দীপান্বিতা কালীপূজা। কালীপূজা পড়েছিল ২১ অক্টোবর। কালীপূজার দিন কয়েকজন ভক্ত নরনারী মহারাজজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করলেন। রাত্রে পটে মা কালীর পূজা হলো। দুদিন পর ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। সেদিন মহারাজজী নির্দেশ দিলেন, নবদীক্ষিতা মহিলারা নবদীক্ষিত পুরুষদের 'ভাইফোঁটা' দেবেন। দীক্ষিতদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী থাকলে দীক্ষিতা স্ত্রীরা তাঁদের স্বামীদেরও 'ভাইফোঁটা' দেবেন। যথারীতি বলতে হবে—"ভাইয়ের কপালে দিলেম ফোঁটা/যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।" নির্দেশ শুনে দীক্ষিতা স্ত্রীরা হতচকিত হয়ে গেলেন। মহারাজজীকে তাঁরা সসঙ্কোচে বললেন : "স্বামীকে 'ভাইফোঁটা' দেওয়া কি করে সম্ভব?" মৃদু হেসে শান্তভাবে অতি মিষ্ট স্বরে মহারাজজী যা বললেন (মহারাজজীর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর) তা এখানে তুলে দেওয়া হলো।

মহারাজ : মা, তোমাদের তো এখন শুধু স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কই নয়, তোমাদের যে এখন আরও একটা সম্পর্ক হয়েছে। (দীক্ষার পর) তোমরা যে এখন গুরুভাই-বোনও।

মহারাজজীর নিজের 'ডায়েরী'তে সেদিনের কথা উল্লিখিত আছে। তাঁর সেদিনের দিনলিপির পৃষ্ঠা এইরকম :

23 October Sunday, 1949.

Bhatri Dwitiya

Told the ladies that they should give ভাইফোঁটা to their spiritual brothers including their husbands and give them a feast....

স্থান : বেলুড় মঠ

মহারাজজীর কৃপাপ্রাপ্ত সঙ্ঘজীবনে প্রবেশেচ্ছুক জনৈক যুবকের বাড়িতে ঐবিষয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যুবকটির মুখে শুনে তাকে হতাশ হতে নিষেধ করলেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার মনকে পূর্ণ করে দিলেন।

মহারাজ : সঙ্ঘে যোগ দিবি, এতো খুব ভাল কথা। সংসারে শুধু অশান্তি। "ত্যাগাৎ শান্তিঃ"! বৈরাগ্যকে intensify (তীব্র) কর।

সংসারী লোকেরা, আত্মীয়স্বজন সাধারণতঃ চায় না তাদের ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে। সংসারী লোকেদের ঐরকমই ব্যবহার। নিজেদের মতো সকলকেই সংসারে টানতে চায়!... তুই কোন কিছুতেই বিচলিত হবিনি। সর্বদা মনে রাখবি, তোর পিছনে আমি রয়েছি—তোর গুরু রয়েছেন।☐

আলোচনা

কর্মসন্ন্যাসযোগ

কৃষ্ণা সেন

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' হিন্দুদের অতি পবিত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। আপাতদৃষ্টিতে রণবিমুখ পার্থকে সমরে উদ্যোগী করাই শ্রীভগবানের ইচ্ছা। কারণ, তাহলেই আবার ভারতে ধর্মরাজ্যের সূচনা সম্ভব হবে। তাঁর ইচ্ছাতেই কর্ম, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই কর্মত্যাগ—"তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।" সকলই তাঁর ইচ্ছানির্ভর। আমাদের জীবনটাই তো কুরুক্ষেত্র। পথ চলতে চলতে আমরা বিভ্রান্ত। কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা নয়—এ-প্রশ্ন সর্বদাই মনকে নাড়া দিচ্ছে এবং কোন্ পথে গেলে আবার পুনরাবর্তনের পথে পুনরাগমন-জনিত দুঃখভোগ করতে হবে না—এ-প্রশ্ন সাধকের মনেও চিন্তার ঢেউ তোলে। ধনঞ্জয় অর্জুন সাধারণ মানুষের প্রতীক। তাই তাঁর মনে যে-বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছে, তা-ই প্রশ্নরূপে তিনি পেশ করেছেন পুরুষোত্তমের কাছে। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুটিই পথ; কিন্তু আমরা মনে করি কর্মত্যাগ ও কর্মানুষ্ঠান—একে অপরের পরিপন্থী। যে-সাধক জ্ঞানযোগের অনুশীলন করেন, তিনি সাধারণতঃ নিজেকে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান না। কিন্তু 'গীতা'য় বহু সময়েই আমরা নিষ্কাম কর্মের প্রশংসা শুনি। তাহলে আমাদের কর্তব্য কি? করণীয়ই বা কি?

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন, কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুটি পথ হলেও, তার মধ্যে "কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে"—কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। সাধারণ মানুষ কর্মত্যাগ করে থাকতে পারে না বা তা থাকা উচিতও নয়। অলস মস্তিষ্কে অনেক সময় অন্যায় ভাবনার উদয় হয়। তাই কর্মপথ, যে-কর্ম নিষ্কামভাবে সাধিত হয়, সেই পথের দিশায় মানবের কল্যাণ। কর্ম করে অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে অথবা কর্ম না করে জ্ঞানযোগের মাধ্যমে 'নিঃশ্রেয়সঃ' অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ করা যায়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মের মধ্যে যে-মুক্তি তা-ই আনন্দময়, তা-ই গ্রহণযোগ্য। এই যে কর্মের মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ তা নানাভাবে সংঘটিত হতে পারে—ত্যাগের মধ্যে, আসক্তিবিহীন কর্মের মধ্যে, সর্বকর্মের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অনুভব করে ও শুভাশুভ সমস্ত কর্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করে। নিজেকে সেই পরমশক্তির যন্ত্রস্বরূপ মনে করে নিয়ে সত্যকে জীবনসঙ্গী করে নিতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ "সত্যকথাই কলির তপস্যা।" নিষ্কাম কর্মসাধনার ফলে যে-জ্ঞানোদয়, সেই জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরের পরিপূরক। যথার্থ কর্মযোগী এবং নিত্যসন্ন্যাসীর মধ্যে প্রভেদ বিশেষ নেই। এই মানুষের মন দ্বেষমুক্ত এবং ফলাকাঙ্ক্ষাহীন। রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব-বিবর্জিত মন নিয়ে তিনি অনায়াসেই সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হন। যে-ব্যক্তি "ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"—যাঁর মনে কোন প্রতিকূল ভাবনা এবং আসক্তির চিহ্নমাত্র নেই, তাঁর অন্তর পরিশুদ্ধ। শুদ্ধ নির্মল অন্তরই নির্দ্বন্দ্ব হতে পারে। কারণ, সেই মনে অনুরাগ-বিরাগ, প্রতিকূল-অনুকূল ইত্যাদি বিকারের লেশমাত্র নেই। কর্মসন্ন্যাস বা নিষ্কাম কর্মযোগের যেকোন একটি সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হলেই 'কৈবল্যমুক্তি' প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টা জ্ঞানী তাই কর্মযোগ ও কর্মত্যাগকে এক বলেই জানেন। কর্মত্যাগের ফলে যে-গতি, নিষ্কাম কর্মত্যাগের সাধনায় সেই একই গতি। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"—এই ভাবনায় ভাবিত মনে সন্ন্যাসের অনাসক্তি এবং পরম পদের প্রতি আসক্তি জন্মায়। তখন সেই মানুষ সম্যগ্‌দর্শী হয়ে ওঠেন।

নিষ্কাম কর্মযোগীও শেষে কর্মসন্ন্যাসের মাধ্যমে পরম জ্ঞান লাভ করেন। তাই কর্মত্যাগের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেনঃ

"সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥"

(গীতা, ৫।৬)

নিষ্কাম কর্মযোগ ব্রত গ্রহণ না করে প্রথমেই কর্মসন্ন্যাসগ্রহণ দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিষ্কাম কর্মযোগী কিন্তু কর্মসন্ন্যাসের ফলে অচিরেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তবে সম্পূর্ণরূপে চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নিষ্কাম কর্মযোগের প্রয়োজন। কর্মযোগে কর্মের

মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যে-কর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সংযোগ নেই, সেই কর্মকে কর্মযোগ বলা চলে না—সেই কর্মবৃত্তি নিষ্ফলা। এই কর্ম সকাম বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সংঘটিত হলে তা বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিষ্কাম কর্মেই চিত্তশুদ্ধি এবং মোক্ষপথ প্রশস্ত হয়। এই কর্মযোগের পথ বড়ই দুর্গম। কর্ম করতে করতে কর্মযোগীও কর্মের বন্ধনে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারেন। তাই সাধক কর্মীকে হতে হবে যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতাত্মভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বভূতে পরমেশ্বর বিরাজমান এবং পরমেশ্বর ও সাধক অভিন্ন—এই দৃষ্টিসম্পন্ন; তবেই কর্ম করেও তাদৃশ ব্যক্তি কর্মে লিপ্ত হবেন না। "যত্র জীব তত্র শিব" ভাবনায় ভাবিত হয়ে যে-সাধক নরনারায়ণের সেবায় নিজেকে লিপ্ত রেখেছেন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের মতো সব কিছুই কৃষ্ণময় দেখেন। তাঁর চিত্ত সংযত, চেতনা পবিত্র ও নির্মল। তিনি কখনই সেই সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষকে বিস্মৃত হন না বা ভগবৎ সেবা থেকেও কিছুতেই বিচলিত হন না। এরূপ আত্মস্থ ব্যক্তি কর্ম করেও কর্মে উদাসীন।

কিন্তু এই নির্লিপ্ততা সম্ভব হয় কি করে? শ্রীভগবান বলছেন: যুক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা সমাহিত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, ভোজন ও স্পর্শ এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম অর্থাৎ কথোপকথন, গমনাগমন ইত্যাদি সকল কর্মে ইন্দ্রিয়গণই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে—এই ধারণা করে 'আমি কিছুই করি না, আমার এতে কোন বিকার নেই'—এমন জ্ঞান হওয়াতে সর্ববিধ কর্ম করেও কর্মে বদ্ধ হয় না অর্থাৎ কর্ম তাঁর পক্ষে বন্ধনের কারণ হয় না।[১] ইন্দ্রিয়গুলিই কর্ম করে। আত্মা নির্লিপ্ত, যেন ইন্দ্রিয়দের কর্মের দ্রষ্টামাত্র। এখানে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। ঐ পরমাত্মার দর্শন সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন:

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন॥"
(তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্, ৪।১)

অর্থাৎ যে-পরমাত্মাকে জানতে না পেরে বাক্যসকল মনোবৃত্তির সঙ্গে ফিরে আসে, সেই পরব্রহ্মরূপ আনন্দকে জানলে কখনো ভয় হয় না। এই প্রসঙ্গে পরমহংসদেবের অমৃতকথা স্মরণীয়: "চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করাচার্য গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি!' সে বললে, 'ঠাকুর, তুমিও আমায় ছোঁওনি আমিও তোমায় ছুঁইনি। তুমি বিচার কর। তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বুদ্ধি; কি তুমি—বিচার কর। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ—কোন গুণে লিপ্ত নয়।" (নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে) "ব্রহ্ম কিরূপ জানিস? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভাল গন্ধ—সব বায়ুতে আসছে কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।" অন্যত্র ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন: "কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ-বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ-বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি—এসকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে, ব্রহ্ম নির্লিপ্ত।"

অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কর্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করে কর্মফলে নিরাসক্ত হওয়া প্রয়োজন। পদ্মপত্র জলে থাকে কিন্তু জলে লিপ্ত হয় না; তেমনি নিষ্কাম শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ কর্মযোগী কর্ম করা সত্ত্বেও পাপে লিপ্ত হন না। তিনি পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত। সকল কলুষ ও তামস-হরণ যাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁকে কলুষ স্পর্শ করতে পারে কি? তবে ব্রহ্মে কর্ম সমর্পণ অতীব কঠিন। অহংবোধ সহজে যায় না—সেই অহংকে অপসারিত করে চিদানন্দস্বরূপে একেবারে ডুবিয়ে দিতে হয়—"ডুব দে রে মন কালী বলে/হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।" এভাবে অহংবোধকে দূরে সরিয়ে যে-কর্ম করা হয়, তাকেই ব্রহ্মে স্থাপিত কর্ম বলা হয়। ব্রহ্মে কর্মস্থাপন আর ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ একই।

কর্মযোগী ফলাকাঙ্ক্ষা ও অহংবোধ ত্যাগ করে স্নানের দ্বারা শরীর, আত্মতত্ত্ব-চিন্তা দ্বারা মন এবং তত্ত্ববিচার দ্বারা বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করে ইন্দ্রিয়-সহায়ে কাজ করে যান। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান-ত্যাগী যোগীর দেহ, মন, ইন্দ্রিয় কর্ম করে কিন্তু যোগী কখনো মনে করেন না যে, 'আমি কর্ম করছি'। এখানেই অনাসক্ত যোগী ও ফলাসক্ত ভোগীর প্রভেদ। কামনা-বাসনার চরিতার্থতার উদ্দেশ্য নিয়ে ভোগী কর্মে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যোগীর কর্ম আত্মশুদ্ধির জন্য। একই কর্ম তাই সময়বিশেষে মুক্তি ও

১ স্বামী অপূর্বানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' দ্রষ্টব্য।

বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

"যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

(গীতা, ৫।১২)

—পরমেশ্বর একনিষ্ঠ কর্মযোগী ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম করতে করতে 'নৈষ্ঠিকী শান্তি' অর্থাৎ ঈশ্বরে একনিষ্ঠতাজনিত শান্তিলাভ করেন। বহির্মুখ ব্যক্তি কিন্তু বাসনাজনিত কর্মের ফলে বারবার সংসারে যাতায়াত করে।

বিভ্রান্ত মানুষের মনে স্বতই এই প্রশ্নের উদয় হয়—কোন্ কর্ম কর্তব্য, কোন্ কর্ম অকর্তব্য? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামগুণগান, নিত্যকর্ম (যদিও কর্ম তবু) এসব করতে হবে।... তবে সব কর্মই নিষ্কামভাবে করতে হয়। নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে (তাতে চিত্তশুদ্ধি হয়) ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়।" (ঈশানের প্রতি) "তুমি জপ, আহ্নিক, উপবাস, পুরশ্চরণ এইসব কর্ম করছ। তা বেশ। যার আন্তরিক ঈশ্বরের ওপর টান থাকে, তাকে দিয়ে তিনি এইসব কর্ম করিয়ে লন। ফলকামনা না করে এইসব কর্ম করে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়।"

সংযত পুরুষ এইভাবেই চিত্তবিক্ষিপ্তকর বিষয়গুলি মনে মনে পরিত্যাগ করে জ্ঞানময় প্রসন্নমানসে নবদ্বারযুক্ত দেহপুরে সানন্দে বাস করেন। তিনি দেহী হলেও আত্মা —তাঁর কর্মজনিত কোন বিক্ষেপ নেই; তাই দেহধারণ করলেও তাঁর আনন্দস্বরূপতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ প্রভৃতি সাতটি শিরস্থিত দ্বার এবং দুটি অধোগত দ্বারের সাহায্যে তাঁর শারীরিক ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানুষের মতো হলেও যেহেতু তাঁর কর্মজনিত কোন বিক্ষেপ নেই, তাই তিনি পরমসুখে আপ্লুত। অজ্ঞ মানুষ নিজেকেই দেহের অধীশ্বর মনে করে, কিন্তু সে যেমন কর্মফলের কর্তা নয়, দেহের অধীশ্বরও তেমনি নয়। জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল সম্বন্ধ কিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না; পূর্ব পূর্ব জন্মের সুখদুঃখ-জনিত কর্ম-সংস্কার বা প্রারব্ধ মানুষকে বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করায়। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট ত্রিগুণাত্মিকা কর্মপ্রবাহ অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। এই প্রবাহস্রোতে ভাসমান জীব দেহধারণ করে প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম করে চলে। কর্মক্ষয় অন্তে আত্মজ্ঞান এবং তবেই মুক্তি। বিভু পরমেশ্বর কারো পাপ বা পুণ্যফল গ্রহণ করেন না। তিনি পাপ-পুণ্যের কর্তা নন। প্রারব্ধবশতঃ যে-প্রকৃতি জীবে সঞ্চারিত, সেই প্রকৃতিই জীবকে পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত করে; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ জীব মনে করে ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন। জীবের জ্ঞান "অজ্ঞানেনাবৃত"—অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। জনৈক আলোচক বলেছেন ঃ "অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন দেহাদিতে অহংবোধ এবং বাহ্য বিষয়ে আসক্তির দ্বারা জীবের শুদ্ধ জ্ঞানশক্তি আবৃত থাকে। দিবাভাগে আকাশে সূর্য থাকিলেও তাহা যেমন মেঘের দ্বারা ঢাকিয়া থাকে, বাহিরে তাঁহার কিরণ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ পরমেশ্বর সকল জীবের অভ্যন্তরে সর্বদাই দেদীপ্যমান থাকিলেও অজ্ঞানতার দরুন মানবের নিকটে তিনি প্রকাশিত হন না। তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতেই মানবগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হইয়া উহা প্রাপ্তির জন্য শুভাশুভ কর্মে লিপ্ত হয় ও কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করে। অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন এই আসক্তিই মোহের কারণ হইয়া জীবগণকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং ইহার দ্বারাই তাহারা অসংযতভাবে কর্ম করিয়া শোক-দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে।

"বস্তুতঃ, আত্মা যে শরণাগত ভক্তের পাপ মার্জনা করিয়া তাহাকে অনুগৃহীত করেন অথবা তাহার পূজাদি গ্রহণপূর্বক তাহাকে কৃতার্থ করেন, তাহাও নহে। অজ্ঞানতাবশতই আত্মা ও পরমেশ্বরে ভেদ কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে পূজাদি দেওয়া হয় এবং ফল কামনা করা হয়।"

যাঁদের হৃদয়ে এই জ্ঞানের আলোক প্রস্ফুটিত হয়েছে, তাঁরা অজ্ঞানতমসা থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যালোকে উদ্ভাসিত প্রকাশের ন্যায় পরমেশ্বরের যথাযথ স্বরূপকে আত্মজ্ঞানের আলোয় উপলব্ধি করতে সক্ষম। এই অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানই পরম গতির পথ। দেহাত্মবোধের নাশ ও তাদাত্ম্যবোধের উদয়ে আর পুনর্জন্ম হয় না। এই বোধ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির জনক। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয়ে পরমেশ্বরকেই পরম আশ্রয় ও পরম গতি বলে মনে হয়; নিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরকথা শ্রবণেই তাঁদের পরম প্রীতি। জ্ঞানের আলোয় পরিশুদ্ধ এই মহীয়ানেরা অচিরেই ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণলাভ করেন।

এই আত্মপ্রতিষ্ঠ যোগীই প্রকৃত সমদর্শী। তিনি জানেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান থাকায় সবই চৈতন্যময়। এই চৈতন্যময়তা থেকেই বিভেদের বিলোপ। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ বিনয়ী ব্রাহ্মণ, হাতি

কুকুর বা গবাদি পশু এবং চণ্ডালাদি নিম্নবর্ণে কোন ভেদ নেই, যদিও তাদের দেহজাত ভেদ বর্তমান। সকল জীবের অন্তরেই সেই পরমাত্মা বিরাজিত। জড় প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের প্রভাবে জীবদেহের সৃষ্টি হলেও দেহমধ্যস্থ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা গুণগতভাবে এক। কিন্তু জীবাত্মা যেখানে একটিমাত্র দেহেই থাকতে পারে, পরমাত্মা প্রত্যেক দেহে বিরাজ করেন। সমদর্শী জ্ঞানী, যোগী দেহে অবস্থান করলেও জন্মমৃত্যুর প্রবাহমুক্ত—"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গঃ"—দেহে অবস্থানকালেই তাঁরা সংসার বা সৃষ্টিকে জয় করেছেন। সৃষ্টিকে জয় করার অর্থ প্রকৃতির অধীনতা থেকে মুক্তি। তাঁরা জানেন, ব্রহ্মই একমাত্র সম ও নির্দোষ, তাই তাঁরা স্থিরবুদ্ধি ও মোহবর্জিত হয়ে ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। প্রিয়বস্তুপ্রাপ্তিতে তাঁর কোন উল্লাস বা অপ্রিয়বস্তু প্রাপ্তিতে তাঁর কোন উদ্বেগ নেই। তাঁর বুদ্ধি স্থির এবং তিনি সমরসব্রহ্মে স্থিত। বুদ্ধিকে স্থির করা অভ্যাসসাপেক্ষ। বুদ্ধির ধর্ম যদিও স্থিরভাবে থাকা কিন্তু সাধারণ মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল মনের সঙ্গে মিলিত হয়ে চঞ্চল হয়ে পড়ে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিন্তু স্থিতধী এবং অসংমূঢ়—তিনি বিষয়ের রূপ ও গুণ সম্বন্ধে সজাগ বলে সর্ববিষয়ে ও সর্বব্যাপারে অনাসক্ত। যেহেতু দেহ এবং মনও বিষয়ের অন্তর্গত, তিনি তাদের মমত্বেও আর মুগ্ধ হন না।

অসক্তাত্মা, অনাসক্তচিত্ত, ব্রহ্মযোগযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী। পরমহংসদেব বলছেন: "যাঁর মনপ্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি সাধু তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চোখে দেখেন না। যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। যিনি কামকাঞ্চনত্যাগী তিনিই সাধু। সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বৈ কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সন্ন্যাসীর লক্ষণ।... সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা, আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশি হুঁশ।... যে-সাধু ঔষধ দেয় আর ঝাড়ফুঁক করে, যে-সাধু নেশা করে, যে-সাধু টাকা নেয়, যে-সাধু বিভূতি-তিলকের বিশেষ আড়ম্বর করে খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইনবোর্ডে মেরে নিজেকে বড় সাধু বলে অপরকে জানায়, তাদের কদাচ বিশ্বাস করি না।... সাধুর রাগ-দ্বেষ থাকবে না, সহ্য করা সাধুর দরকার।... ত্যাগীর পক্ষেই গেরুয়া। যাদের ভিতর-বার এক হয়ে গেছে, আসক্তির লেশমাত্র নেই—তারাই গেরুয়া পরার যোগ্যপাত্র। আর মনে আসক্তি, বাইরে গেরুয়া—সে বড় ভয়ঙ্কর। মনে ত্যাগ হলেই হলো; তা হলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে তো।" এপ্রকারে ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত মানুষ সেই পরমসুখ লাভ করেন, যাকে সর্বজ্বালাহর সাত্ত্বিক সুখ বলা হয়। সাত্ত্বিক ব্রহ্মবিদ্ সমাধিযোগে অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। এই বিবেকীরা জানেন যে, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-জনিত আনন্দ ক্ষণস্থায়ী এবং সেকারণেই দুঃখদায়ক। এই সুখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়—ক্ষণিক আনন্দের পরেই আসে দুঃখ। সংসারপথে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই আমরা এই বোধের সম্মুখীন হচ্ছি। আশার ছলনায় ভুলে এগিয়ে গিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসছি—মনপ্রাণ ভরে উঠছে গভীর হতাশায়। তাই ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলেছেন: "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।" অর্থাৎ ক্ষুদ্রবস্তুতে সুখ নেই। যা ভূমা বা বৃহৎ তা-ই সুখ। সচেষ্ট হলে দেহত্যাগের পূর্বেই এ-সংসারে থেকে কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুকে বশীভূত করা যায়। কামক্রোধের বেগকে দমন করার উদ্দেশ্যে কেউ ভোগ্যবস্তুর সামনে থেকে পালিয়ে যায়; কেউ-বা আবার ষড়্‌রিপুকে জয় করা অসম্ভব মনে করে দেহত্যাগের পরে মুক্তিলাভ হবে—এই আশা পোষণ করে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এদের সামনে দাঁড়িয়েই এদের মোকাবিলা করতে হবে। মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে বীরের মতো যুদ্ধ করে যেতে হবে—পালিয়ে গেলে চলবে না। এই যোদ্ধাই প্রকৃত আত্মতত্ত্ববিদ্।

উপরোক্ত আত্মতত্ত্ববিদ্ যোগী আত্মাতেই তৃপ্ত ও সুখী; তিনি আত্মাতেই বিশ্রান্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মজ্যোতিতে অন্তর আলোকিত হওয়ায় ব্রহ্মভাবে স্থিত হয়ে তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। নিষ্পাপ, ছিন্নসংশয়, আত্মরতচিত্ত ও সর্বভূতের কল্যাণদীপস্বরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মনির্বাণের অধিকারী। এই ব্রহ্মনির্বাণ কি? শ্রীঅরবিন্দের মতে এই নির্বাণ বৌদ্ধ দার্শনিকের নির্বাণ নয়। "এখানে 'নির্বাণ' শব্দের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উচ্চতর আত্মাতে নীচের অহং-এর বা আমি-র লয়। এই আত্মা দেশ-কালের অতীত, কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় উহা সীমাবদ্ধ নহে। জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল লীলায় উহা আবদ্ধ নহে; উহা আত্মানন্দে ও আত্মজ্যোতিতে পূর্ণ এবং নিত্য শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যোগী তখন আর 'অহং' নহেন, তিনি আর তখন দেহ ও মনের মধ্যে আবদ্ধ ক্ষুদ্র পুরুষটি থাকেন না, তিনি ব্রহ্ম হন; সনাতন আত্মার যে অক্ষর দেবত্ব তাঁহার

প্রাকৃত সত্তায় ওতপ্রোত, তাহার সহিত তিনি চেতনায় যুক্ত হন।" এই ব্রহ্মভূতস্থ যোগী সংযতচিত্তে, নিষ্পাপ সংশয়শূন্য মনে নিষ্কাম কর্মব্রতে রত থাকেন এবং সর্বদা জাগতিক সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে ব্রতী হন। আমরা মনে করি যে, পরম জ্ঞানী বা যোগীর সব কর্মের অবসান ঘটেছে; তাঁর ব্রহ্মময় চিত্তে সংসারের ক্লেশ-দুঃখ-পীড়া কোন রেখাপাত করে না। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় কি সম্ভব? এ-ধারণা কিন্তু ভ্রান্ত। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, ব্রহ্মনির্বাণ এবং সাংসারিক কর্মে কোন বিরোধ নেই। সংসারে চৈতন্য ও নির্বাণ একইসঙ্গে থাকতে পারে। জিতেন্দ্রিয় ঋষি সংসারে সাধনার জন্য কর্ম করেও ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে পারেন। সংসারে ব্রহ্মনির্বাণের অঙ্গ চৈতন্যলাভ এবং ব্রহ্মনির্বাণ তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে যখন সাধক নিজেকে বিশ্বজগতের হিতসাধনে নিযুক্ত করেন। সাধারণ মানুষেরাও পরোপকারে ব্রতী হয়, কিন্তু তারা অজ্ঞ বলে কিসে প্রকৃত মঙ্গল তা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না। সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞানী কেবল স্বজন বা স্বজাতির মঙ্গলকামনা করেন না, তিনি সর্বভূতহিতে রত। তাঁর দৃষ্টি বৈষম্যশূন্য বলেই তিনি সকলের মঙ্গলসাধনে সমর্থ।

কামক্রোধবিযুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞ যতিগণ কি জীবিতাবস্থায় কি দেহান্তে—উভয়তই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করে থাকেন। তাঁরা জীবিতাবস্থায় জীবন্মুক্ত এবং অন্তে চিরনির্বাণপ্রাপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, যখন আমরা নির্বাণলাভ করি বা নির্বাণে প্রবেশ করি তখন তা আমাদের "অভিতো বর্ততে" অর্থাৎ চারিদিকে ব্যাপ্ত থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য যে কেবল যোগিহৃদয়ে বর্তমান তা নয়, আমরা এই ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যেই বাস করি—যদিও তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। এই সর্বভূতস্থ আত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ আমাদের ক্ষুদ্র আমি-কে ধ্বংস করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে আমাদের এক পরম ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে। এই ঐক্যবোধকে প্রকৃতিগত করে নিতে পারলে তা আমাদের কর্মের ভিত্তি ও প্রেরণা হয়।

ব্রহ্মনির্বাণলাভের অন্যতম উপায় অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি রাজযোগের অঙ্গ। যোগাঙ্গ সাধন করে ধ্যানযোগ অবলম্বনে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত রেখে মোক্ষপরায়ণ ও ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ-পরিশূন্য যোগী দেহে থেকেও সদামুক্ত। তিনি জেনেছেন, পরমেশ্বরই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। তিনিই সকল লোকের ও জগতের ঈশ্বর এবং চরাচরের সুহৃদ্। এই জ্ঞানোদয়েই পরমা শান্তি। যজ্ঞ-তপস্যাদি কর্মের সময় মানুষ সাধারণতঃ নিজেকেই কর্মকর্তা ভাবে এবং কর্মফলও নিজেই ভোগ করতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু হৃদিস্থিত হৃষীকেশ দ্বারা পরিচালিত না হলে কোন কর্মই সুসম্পন্ন হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এই ঈশ্বরই সকল কর্মের কর্তা এবং যিনি কর্তা তিনিই অবিসংবাদিতরূপে ফলভোগী; অতএব কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব তাঁকেই সমর্পিতব্য। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি চৈতন্যযুক্তা। প্রকৃতির গুণত্রয়ের সঙ্গে যুক্ত করে সেই অখণ্ড সত্ত্বগুণান্বিত ঈশ্বরকে কল্পনা করি বলেই তিনি খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিভাত হন। সকল ক্রিয়ায়, সকল কর্তৃত্ববোধে সেই পরমপুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারলে তবেই আমরা কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের দাবি ছাড়তে পারি।

সংসারের খেলা খেলতে খেলতে আমরা যখন পরিশ্রান্ত হই, তখন অতন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর কৃপাবারিধারায় আমাদের সঞ্জীবিত করে তোলেন। আন্তরিকভাবে বুঝতে চাইলে আমরা উপলব্ধি করব, তিনিই আমাদের একমাত্র সুহৃদ্। তাঁর প্রীতি আমাদের চাই-ই। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্"—এই অসীম শক্তিশালী ও অপরিসীম স্নেহপূর্ণ আশ্রয়েই আমাদের পরমা শান্তি। তাঁকে আপনজন বলে ভালবাসলেই ভক্তি সিদ্ধ। চাই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়—ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর কথায়—কর্মপ্রবৃত্তি, সত্যাবগতি ও রসানুভূতি এই তিনের সামঞ্জস্য। ভক্তপ্রাণের পরমা আকাঙ্ক্ষাঃ

"তোমাকে আমি চাই যে চাই সকল কাজে,
প্রতিদিনের সকাল সাঁঝে সবার মাঝে।
জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে আছ গো তুমি মোর জীবনে,
যতই কাঁদাও সে বোধ যেন রহে গো মোর প্রাণে—
বিশ্বময় সবার মাঝে,
তোমার চরণধ্বনি বাজে—
লীলাভরে লুকিয়ে থাক পাছে ফেলি ধরে,
চরণ ছুঁয়ে হৃদয়কমল আলোয় ওঠে ভরে।
আমায় তুমি ডাক দিয়েছ তোমার কত কাজে—
সাধ্য নাই সাধনা নাই ভয়েতে মরি লাজে।
তোমার চরণ স্মরণ করি,
অভয় হব আশা ধরি।
বিমুখ তোমায় করব না আর ভেসে যাব কর্মস্রোতে—
বিশ্বাস আর নির্ভরতার মন্ত্র জপি দিনে রাতে।"□

অগ্নিশুদ্ধি চাই

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥"
(ঈশ-উপনিষদ্, ১৮)

—হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তুলাভের জন্য আপনি আমাদিগকে সুপথে লইয়া যান; হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন; আপনার প্রতি বহু নমস্কারবচন উচ্চারণ করিতেছি।
(অনুবাদ—স্বামী গম্ভীরানন্দ)

"বারবার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,
হে পূষণ! কবে হব শুচি?"
('পূষণ'—প্রেমেন্দ্র মিত্র)

চারিদিকে মিসকালো অন্ধকার।
অন্ধকার ছাড়া আর
কোনদিকে কিছু নেই আজ।
কি করে থাকবে যদি আমাদের একমাত্র কাজ
হয় রাত্রি দিয়ে দিন মুছে ফেলা?
এ এক বীভৎস খেলা
খেলেই চলেছি অন্ধকারে—
অন্ধকার নিয়ে কাড়াকাড়ি; কেউ কারে
দেখি না
চিনি না।
দেখে চিনে কী দরকার!
দুই চোখে অন্ধকার মাখি, আর
মনের কন্দরে
আঁধার জমাই থরে থরে।
কবি প্রশ্ন করে—এই যদি চলে তবে
শুচি হব কবে?
কে যেন উত্তরে বলে—শুচি হবে
অগ্নিশুদ্ধ হতে যদি পার, তবে।
আজ তাই
অগ্নিশুদ্ধি চাই।
অগ্নিশুদ্ধ না হতে পারলে, জেনো, শুচিতা আসে না;
আজ জেনো, অগ্নিশুদ্ধি পণ্য নয়, যায় নাকো কেনা।
অতএব একমনে আগুনকে ডাক—
পাথর-গলানো স্বরে বল—যেখানেই থাক
অগ্নিদেব, প্রাণসখা, দেখা দাও,
জ্বলে উঠে প্রচণ্ড উত্তাপে, জ্বালাও—জ্বালাও
যত কালো দৃষ্টি, কালো মন, আর
এই পাপ অন্ধকার।
আগ্নেয় ফতোয়া কর জারি—
আর যেন রাত্রি দিয়ে দিনগুলো মুছতে না পারি।
হে অগ্নিদেব! ওগো বন্ধু মহৎ!
আমাদের দেখাও সুপথ।

কথার মতো কথা

সুবোধকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কতদিন কত কথা শুনেছি যে কতবার,
কথার মতো কথাটি কেন শুনিতে পাই না আর!
কী সে কথা কবে কোথা কার কাছে শুনেছি,
কালীঘাটে মা কালীকে দেখতেও গিয়েছি,
কখনো সেখানে গিয়ে সে কথা তো শুনিনি,
হেথা হোথা ঘুরে কোন শান্তি তো পাইনি!
ভাবছি মনে মনে কথার মতো কথাটা কী?
কে কবে বলেছেন মনে তা পড়ে কী,
হঠাৎ মনেতে এল কথার মতো কথাটি যে
লুকিয়ে রয়েছে তা শ্রীশ্রীমায়ের বাণীতে—
"সংসারে সুখ পেতে হলে পরের দোষটি দেখতে নাই,
শেখ জগৎটা নিজের ভাবা, নিজের দোষটা দেখা চাই।"
আমরা সবাই ভুলটি করে সংসারেতে কষ্ট পাই
মায়ের কথার মতো কথায় পাবেই পাবে শান্তির ঠাঁই।

ঈশ্বরের প্রতি

শুভশ্রী বসু

হে ঈশ্বর, তোমার অপার করুণা
বুঝতে পারি না।
সংসারে কেন এত পঙ্কিলতা
সংসারের কেন এত মলিনতা
বুঝতে পারি না।
মনের সঙ্গে মনের
প্রাণের সঙ্গে প্রাণের
কেন এত জটিলতা
বুঝতে পারি না।
পাঁকের মধ্যে পদ্ম ফোটার মতো
সংসার যদি পদ্মবিভূষিত হতো
পাঁকের মাঝে শতদল হতো প্রস্ফুটিত
সুন্দরতর হতো সংসারের ছবি।
হে ঈশ্বর,
যারা ভাঙার বদলে শুধু গড়বে
ছিন্ন করার বদলে যারা বাঁধবে
শান্তি, প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য, সহ্য নিয়ে যারা বাঁচবে
আত্মার সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছিন্ন প্রেমমালা গাঁথবে।
সংসার থেকে কবে নির্বাসিত হবে
দম্ভ আর লালসার আস্ফালন
কৌলীন্য, রূপ আর অর্থের অহঙ্কার,
কবে প্রতি ঘরে গড়ে উঠবে
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, করুণা, ক্ষমার
বিরাট পরিবার—
অমলিন সোনার সংসার
ঘরে ঘরে বয়ে যাবে শান্তির স্নিগ্ধ প্রবাহ?
কবে, হে ঈশ্বর, কবে?

ঝড়ের বাণীতে মহা আহ্বান

মঞ্জু নন্দী মজুমদার

তুফান উঠেছে বিষম আজিকে,
দামিনী হাসিছে চকিত চমকে,
অপরূপ, অনুপম।
ঝঞ্ঝা খেলিছে মঠ-প্রাঙ্গণে
গরজিছে মেঘ ঐ গুরুগুরু
বিষাণের ধ্বনি সম॥

দ্রুমশাখা ও অটবী-লতিকা
আজিকে দামাল প্রবল ঝটিকা
উপাড়ি ফেলিছে কত।
বিশাল বৃক্ষ নাগলিঙ্গম
ভাঙিয়া পড়িল একটি নিমেষে
স্বামীজী-দেউলে আশ্রয় নেয় ভক্তজনেরা যত।

কিছু নাহি যায় বুঝিবারে আর,
বৃষ্টিধারায় সবই একাকার,
উথাল-পাথাল গঙ্গা-লহরী
আছাড়ি আছাড়ি পড়ে।
আকাশ গঙ্গা মিশে একাকার,
দেখা নাহি যায় এপার-ওপার,
বৃক্ষরাজি ও দেবালয়গুলি
যেন গিয়াছে কোথায় সরে।

স্বামীজী-দেউলে দ্বিতলের পরে
মুক্ত বাতাস ঝঞ্ঝা উগরে
ধাইছে প্রবল ঝলকে ঝলকে,
বলিতেছে যেন শিঙা ফুকারিয়া—
বন্ধন ছিঁড়ি আয় বাহিরিয়া,
আয় ত্বরা করি আয়রে সবাই
নিবেদিতে তোর নিজেকে॥

ভোরবেলা

পলাশ মিত্র

ভোরবেলা ঘণ্টাধ্বনি থামার পরে
কে যেন বলেছিলেন ঃ "আত্মনস্তু কামায় প্রিয়ো ভবতি।
আত্মাই পরম প্রিয়। বলেছিলেন ঃ
আত্মাই তোমার আত্মীয়।

ধূপের ভিতর থেকে
একটিই কালো হাত ইশারা করছিল। সারাক্ষণ।
ধূপের ধোঁয়া, চন্দন
রজনীগন্ধার গুচ্ছ
কালো হাতের ইশারা।

আবার শোনা গিয়েছিল সেই ঘণ্টাধ্বনি।
শোনা গিয়েছিল সেই সমুদ্রকণ্ঠ ঃ
আত্মাই পরম প্রিয়।

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মেলেনী পুজো ও তার গান

'উদ্বোধন'-এর ৯৮তম বর্ষের ৩য় সংখ্যাটি (চৈত্র ১৪০২) পড়ে এই চিঠি লিখছি। এই সংখ্যায় ডঃ তাপস বসু 'মেলেনী পুজো ও তার গান' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ। এতে অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় আছে। স্বল্পজ্ঞাত একটি বিষয়কে নিয়ে যেভাবে লেখক আলোচনা করেছেন তাতে মুগ্ধ হতে হয়। ডঃ বসু মাঝে মাঝে এধরনের প্রবন্ধ 'উদ্বোধন'-এ লিখলে কৃতজ্ঞ থাকব।

মানস মজুমদার
অধ্যক্ষ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

'উদ্বোধন' পত্রিকার চৈত্র ১৪০২ সংখ্যায় ডঃ তাপস বসুর লেখা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ 'মেলেনী পুজো ও তার গান' পড়ে আনন্দ পেয়েছি। ডঃ বসু পদ্মানদীর তীরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার নানা অঞ্চল পর্যটন ও ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে একটি নতুন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এজন্য তাঁকে অভিনন্দন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশ করে সাধারণ জনজীবনের প্রকৃত সংস্কৃতিকে উন্মোচিত করেছেন বলে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা। প্রকাশিত প্রবন্ধটি মূল বিষয়ে প্রবেশের উৎসমুখ। একে কেন্দ্র করে আগামী দিনে বড় ধরনের গবেষণা হলে আমরা বিস্তৃত তথ্য পাব। ডঃ তাপস বসু অধ্যাপনার সূত্রে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং লোকসংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ঘোষপাড়া অঞ্চলে কর্তাভজা সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে দোলপূর্ণিমায় যে লোক-উৎসব হয়ে আসছে, তা লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বড় সংযোজন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উৎসব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তাঁর অভিমতও প্রকাশ করেছেন। এবিষয়ে অধ্যাপক তাপস বসু একটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখলে আমরা খুশি হব।

বরুণকুমার চক্রবর্তী
বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, জেলা—নদীয়া

'উদ্বোধন' পত্রিকার গত চৈত্র ১৪০২ সংখ্যায় অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু মুর্শিদাবাদের লৌকিক দেবী 'মেলেনী ঠাকুরানী' সম্পর্কে একটি আকর্ষণীয় প্রবন্ধ লিখেছেন। রাজশাহী এবং মুর্শিদাবাদ—দুই রাষ্ট্রের দুটি জেলার মধ্যে বয়ে যাওয়া পদ্মানদীর দুই পারেই প্রচলিত আছে এই দেবীর পূজা। ডঃ বসুর লেখায় ক্ষেত্রগবেষণা এবং তথ্যবিশ্লেষণ দুটোই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করার হদিশ মিলছে। এই দেবীর পূজার মধ্যে হর-পার্বতীর পূজারই একটি লৌকিক অনুবর্তন ঘটেছে বলে তিনি যে-সিদ্ধান্ত করেছেন, সেনিয়ে প্রশ্নের অবকাশ অবশ্য আছে। আসলে, বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত যেকোন স্ত্রীদেবতাকেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে মহাশক্তির একটা কিছু রূপ বলে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং যেকোন পুরুষদেবতাই আমাদের সংস্কারে শিব। সুতরাং ডঃ বসুর সিদ্ধান্তও সেই চিন্তাগত ঐতিহ্যেরই অনুসারী হয়েছে।

তাপসবাবু যা তথ্যসংগ্রহ করেছেন তার থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই দেবী হলেন মূলতঃ ফুল-ফল-ফলনের অধিষ্ঠাত্রী। বাগিচার মালীরাই এর প্রবর্তক ছিলেন বলে লেখক যে-তথ্য পেয়েছেন, সেটাই এর পক্ষে বড় একটা প্রমাণ। 'মেলেনী' নামটার অন্তরালে 'মালিনী' শব্দটাই থাকা সম্ভব। অর্থাৎ, আদি উৎসে ইনি উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারারই প্রতীকস্বরূপা। সেই সূত্রেই পুরুষদেবতাও এসেছেন। কিন্তু তিনি নামহীন, কারণ পুরো অনুষ্ঠানটাই মেলেনী দেবীর নামে পরিচিত। মূর্তিদুটির গায়ে যেহেতু কোন রং লাগানো হয় না, সেইজন্যে এদের আদিম প্রত্নরূপ ('আর্কিটাইপ') সম্পর্কেও সংশয়ের অবকাশ নেই।

এনিয়ে আরও তথ্য তাপসবাবু সংগ্রহ করবেন আশা করছি। তখন হয়তো সবাই মিলে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করাও সম্ভব হবে।

পল্লব সেনগুপ্ত
বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, বাঙলা সাহিত্য বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর

'উদ্বোধন'-এ স্বামী অচ্যুতানন্দের 'হৃদি বৃন্দাবনে' পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম। গত আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনা পাঠ করেও বিশেষ আনন্দ পেলাম এবং অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। শ্রীজগন্নাথদেবের দারুমূর্তি সম্বন্ধে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্যের কাছে শোনা একটি উদ্ভট শ্লোক এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

এক পণ্ডিত অপর এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ

"পুরীধামে জগন্নাথদেব কেন দারুময় মূর্তি ধারণ করলেন?"

দ্বিতীয় পণ্ডিত উত্তরে বললেন ঃ

"একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা দ্বিতীয়াশ্চাপি চঞ্চলা।
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথঃ দুর্নিবারঃ॥
শয়নমপি মহান্ উদধৌ বাহনং পুণ্ডরীকারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতম্ দারুভূতো মুরারিঃ॥"

শিক্ষকমহাশয়ের কাছে এর ব্যাখ্যা যেরূপ শুনেছিলাম তা এইরকম ঃ এক স্ত্রী প্রকৃতিমুখরা বা স্বভাবমুখরা অর্থাৎ সরস্বতী—যিনি বিদ্যায় মুখরা। অপর স্ত্রী স্বভাবচঞ্চলা, অর্থাৎ

লক্ষ্মী—যিনি এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকেন না। তাঁর এক পুত্র ত্রিভুবনবিজয়ী মন্মথ (কামদেব)—যাঁর প্রভাব দুর্নিবার। তিনি স্বয়ং শিবেরও তপস্যা ভঙ্গের কারণ হয়েছিলেন। (শিবের নেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত মন্মথ বা কামদেব শিববরে কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন।) যাঁর শয্যা মহাসমুদ্র ও বাহন সাপ-খেকো গড়ুর। এইসব চিন্তা করতে করতে মুরারি (নারায়ণ) 'দারু' হয়ে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে জানাই, 'উদ্বোধন' পড়ে এত আনন্দ পাই যে তা লিখে ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসাধ্য। জানাশোনা সকলকে বলি এই পত্রিকা নিয়মিত পড়তে এবং যাঁরা গ্রাহক তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ প্রীতিলাভ করি।

সরোজকুমার বিশ্বাস
বীরপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রসঙ্গ ঃ 'উদ্বোধন'

আমি 'উদ্বোধন'-এর একজন সামান্য গ্রাহক। দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনের অবসান ঘটিয়ে গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে অবসর-জীবন যাপন করছি। হিজলডিহা, জেলা—বাঁকুড়া বিবেকানন্দ সেবাসমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও আগে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হইনি। এজন্য আমার গভীর লজ্জা ও অনুতাপ। জীবনের অনেকগুলি বছর সাংসারিক জটিল আবর্তে কেটে গেছে। সেবাসমিতির সম্পাদক শ্রীমান বিকাশ পালধীর প্রেরণায় গত ১৯৯৪ সাল থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হয়েছি। 'উদ্বোধন' হাতে আসায় যে-সঙ্গীকে পেয়েছি, তা আমার অশান্ত মনে প্রভূত শান্তি দিয়েছে। যে পরমা শান্তির জন্য আমরা অবিরত আকুল—তা আমাদের মনেই আছে, আমরা তার খোঁজ পাই না বা জানতেই চাই না। যাই হোক, 'উদ্বোধন'-এর প্রসঙ্গে আসি। 'উদ্বোধন'-এর প্রতি সংখ্যাতেই 'কথাপ্রসঙ্গে' স্তম্ভে প্রাণবন্ত সম্পাদকীয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজীর অপূর্ব ভাষণ এবং সুলেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পরমপদকমলে' স্তম্ভে অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ আলোচনা আমাকে অভিভূত করে। বর্তমানে অবসরজীবনে 'উদ্বোধন' আমার একান্ত সঙ্গী এবং সেইসঙ্গে স্বাধ্যায় হিসাবে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র সঙ্গে অন্যতম অবশ্যপাঠ্য।

হরিসাধন পাত্র
গ্রাম ঃ বাসুদেবপুর, পোঃ ত্রিবেণী, জেলা—হুগলী

আমি একজন প্রবীণ হোমিওপ্যাথ। বর্তমানে দূরপ্রবাসে আমার একমাত্র পুত্রের কাছে অবসরজীবন কাটাচ্ছি। অবসরজীবনে আমি পরম সুখে ও শান্তিতে 'উদ্বোধন' পত্রিকা 'গীতা'র বিকল্প হিসাবে পাঠ করে স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ সস্ত্রীক উপভোগ করছি। সেজন্য 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি। আমি গত সেপ্টেম্বর মাসে ৮৯ বছরে পদার্পণ করেছি। 'উদ্বোধন' আমি বারবার পড়ি, কিন্তু কখনো পুরনো বা একঘেয়ে মনে হয় না। আমার কাছে পত্রিকাটি অপরিহার্য ও পরম পবিত্র। 'উদ্বোধন' পত্রিকার জনপ্রিয়তা অক্ষয় ও ক্রমবর্ধমান হোক—এই প্রার্থনা করি।

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
হারমনি হাউসিং সোসাইটি
আই. সি. এস. কলোনী,
ভোঁসলেনগর, পুনে-৭, মহারাষ্ট্র

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৩ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' যেন অন্ধকারে আলোর দিশারী হয়ে এল আমার জীবনে। "সামঞ্জস্য মানে কিছু ত্যাগ এবং সেইসঙ্গে কিছু গ্রহণ"—আপাতনিরীহ এই বাক্যটির মধ্যে ভয়ঙ্কর কঠিন একটি সত্য লুকিয়ে আছে। যা আমার পছন্দের তাকে ত্যাগ করা, যাতে আমার বিরাগ তাকেই গ্রহণ করা—এরই নাম যদি সামঞ্জস্য হয় তবে সংসারাশ্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে তেমন সামঞ্জস্যই একান্ত দরকার। তা না হলে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজ এই সমন্বয় প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের বিচিত্র সংসারের প্রতিচ্ছবিটি সুন্দর বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং জগদম্বা হয়েও আমাদের চেনা অতিপরিচিত একজন ঘরোয়া মায়ের রূপ ধরে বিপরীতধর্মী বিচিত্রস্বভাবসম্পন্ন সব আত্মীয়স্বজন নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, সমন্বয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের পরম সামঞ্জস্যের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সংসারের কঠিন এবং জটিল আবর্তে পড়ে কখনো কখনো আমরা দিশাহারা হয়ে যাই। আমার জীবনেও সেরকম এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে 'কথাপ্রসঙ্গে' উপস্থাপিত শ্রীশ্রীমায়ের সংসারজীবনচিত্রটি আমার চলার সঠিক পথটি চিনিয়ে দিয়েছে। 'উদ্বোধন' যেন সত্যিই আমাদের "জুড়োবার জায়গা"। বস্তুতঃ, শ্রীশ্রীঠাকুর আর শ্রীশ্রীমায়ের অনুরাগী হতে গেলে আমাদের উচিত তাঁদের উপদেশগুলি অনুসরণ করা এবং তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্তকে কর্তব্যাকর্মরূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা। তবেই আমরা তাঁদের সার্থক অনুগামী হতে পারব। অত্যন্ত কঠিন হলেও একটা আলোর রেখা ধরে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ঠাকুর আর মা সেই আলোর রেখা। ধন্য 'উদ্বোধন'! আমাদের এইটি চেনাতে সাহায্য করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

নন্দিনী মিত্র
রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৫

হিমরাজ্যের দেশে

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধমাতা

হিমালয়ের পাদদেশে কয়েকটি তীর্থদর্শনের আহ্বান হঠাৎই এল। হিমালয়ের কুমায়ুন প্রদেশ। ঐ অঞ্চলে আগে যাওয়া হয়নি, গাড়োয়াল প্রদেশেই যতটুকু যাওয়া-আসা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিশাল পার্বত্য অঞ্চলকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন জেলায় ভাগ করা হয়েছে।

আমাদের গন্তব্য স্থানগুলি নির্বাচন করে সেসব স্থানে থাকার ব্যবস্থা অন্ততঃ তিন মাস আগে থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। বিশেষ করে শ্যামলাতাল ও মায়াবতীতে রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথিভবন ছাড়া অন্য কোথাও নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। আলমোড়াতে নামীদামী তিনতারা, পাঁচতারা হোটেলের অভাব না থাকলেও আমরা মিশনের অতিথিভবনেই উঠেছিলাম।

আমাদের ভ্রমণসূচীর যে-ছক কাটা ছিল তা হলো এরকম ঃ হাওড়া থেকে লখনৌ, সেখান থেকে নৈনীতাল এক্সপ্রেস ধরে টনকপুর। ছক অনুযায়ী টনকপুরে পৌঁছে সেখান থেকে মিশনের জিপে করে স্টেট হাইওয়ে ২৯ [যা পিথোরাগড়ের দিকে গেছে] ধরে সুখিডাং হয়ে শ্যামলাতাল আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। চারদিকেই পাহাড়, তার মাঝে একটি মনোরম পাহাড়ে আশ্রমটি স্থাপিত হয়েছে। একে তো ছবির মতো পারিপার্শ্বিক দৃশ্য, তার ওপর পাহাড়ী ও সমতলের নানা বর্ণময় পুষ্পসমারোহে স্থানটি স্বর্গশোভা লাভ করেছে। পবিত্রতা ও নির্জনতার মূর্ত প্রতীক দেবতাত্মা হিমালয়ের পবিত্র পাদপীঠে এসে মনপ্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল।



শ্যামলাতাল আশ্রম

হিমালয়, হিমালয় আর হিমালয়। 'ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর...'—এত অল্প কথায় এত ভাবব্যঞ্জক বর্ণনা সম্ভবতঃ খুব কমই আছে। সদা ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, একাবস্থ, নির্বিকার। সর্বত্যাগী মহাযোগী মহাদেবের প্রিয়তম আবাসস্থল হিমালয়। জ্ঞানী, যোগী, সৌন্দর্যপিপাসু—সকলেই হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে ছুটে আসেন দূর-দূরান্ত থেকে।

কিন্তু সুন্দর পরিবেশ হলে কি হবে, বিধি বাম! আকাশের মুখ অত্যন্ত বেজার। ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েই চলেছে, কখনো কম, কখনো বেশি। এমনই মেঘ জমেছে যে, অনন্তপ্রসারী তুষারধবল শৃঙ্গগুলি সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে গেছে। সেই চিরকালের আবরণ ও মুক্তির খেলা—যার প্রভাবে ভাস্বর-স্বভাব পরমাত্মাকে মায়া-মেঘ আবৃত করে! হঠাৎ দেখি, ওপর আকাশের মেঘ নিচের পাহাড়কে দেখতে মর্তে নেমে একেবারে জমে গেছে!

আশ্রমের গোশালার পাশ দিয়ে একটি পাহাড়ে সামান্য ওঠার পরেই পাওয়া গেল টনকপুর পয়েন্ট। এখান থেকে টনকপুর শহর, রেললাইন, ঘরবাড়ি, বাজার, কালী বা শারদা নদী, তার ওপরের সেতু সুন্দর দেখা যায়। নদীটি স্বচ্ছ সুন্দর লীলায়িত ভঙ্গিতে আলপনা কেটে কেটে চলেছে। নদীর এপারে টনকপুর, ওপারে নেপাল।

পরের দিন আকাশ কিছুটা পরিষ্কার। কাছেই একটি খাড়া পাহাড়ে আমরা উঠতে লাগলাম। কয়েকটি পাহাড়ী



শ্যামলাতাল

সমতলে এই দৃশ্য দেখা না গেলেও পাহাড়ে এরকম প্রায়ই দেখা যায়। সকালে সামান্য সময়ের জন্য বৃষ্টি থামাতে আমরা 'শ্যামলাতাল' নামে হ্রদটি দেখে এলাম। কুমায়ুন অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই 'তাল' বা জলাশয়গুলি। পাহাড়ের পাদদেশে এই তালগুলি অতি রমণীয় এবং এদের নামানুসারেই স্থানগুলির নামকরণ করা হয়। যেমন—শ্যামলাতাল, ভীমতাল, নৌকুচিয়াতাল ইত্যাদি। শ্যামলাতাল হ্রদটি বড় চমৎকার দেখতে। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে সুনীল নভোমণ্ডল, পার্শ্বস্থ বৃক্ষশোভিত পাহাড়গুলি নিয়ত প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে।

ছেলে জুটে গেল। তারা শুধু যে গাইডের কাজ করল তা নয়, খাড়া পাহাড়ে উঠতে আমার কষ্ট হচ্ছে দেখে তৎক্ষণাৎ গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি তৈরি করে দিল। তার সাহায্যে উঠতে আর কোন অসুবিধা হলো না। ছেলেগুলির হৃদয়বত্তা ও কর্মকুশলতা দেখে খুব ভাল লাগল। বেশ অনেকটা চড়াই ওঠার পর সমতলভূমি এল।

স্বামী বিরজানন্দের ধ্যানাসন এখানে রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এক অপার্থিব সৌন্দর্যের নিলয়। সকলদিকেই গিরিরাজের দিগন্তবিস্তৃত শিখর। আকাশ খুব পরিষ্কার না থাকায় নন্দাদেবী, ত্রিশূল প্রভৃতি

শৃঙ্গগুলি ভাল দেখা গেল না। সর্বত্র নিথর নিস্তব্ধ পরিবেশ। ওপর থেকে সব দৃশ্যই সুন্দর দেখায়। সাধকদের মানসস্তর স্বতই এখানে উন্নীত হয়।

স্বামী বিরজানন্দের তপস্যাপূত শ্যামলাতাল দর্শনের পর এলাম স্বপ্নলোকের অঞ্জনমাখানো আরেক তপোস্থলী 'মায়াবতী'তে। মায়াবতী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে আছে, সে আজকের কথা নয়। শ্যামলাতাল থেকে মিশনের জিপে করে সকাল ৮টা নাগাদ যাত্রা করে বেলা ১২টায় আমরা এখানে পৌঁছালাম। এখানকার পরিবেশ এত মনোরম যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অভ্রান্তদ্রষ্টা ঋষি। তিনি জানতেন যে, সনাতন কালের ঋষিদের মতো তীব্র তপশ্চর্যা বর্তমান কালে সম্ভব নয়। সেজন্য তিনি কর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি যোগ-চতুষ্টয়ের সমন্বয়সাধন করলেন। তীব্র নিষ্কাম কর্মসাধনার পরে মন অন্তরঙ্গ সাধন—ধ্যানতন্ময়তায় নিজ সত্তা বিলোপের জন্য ব্যাকুলিত হয়। ঠিক যেমন পাখি উড়তে উড়তে ডানা ব্যথা হলে আশ্রয় খোঁজে। নিজ আত্মায় 'বিশ্রামসুখ' লাভের জন্য এই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশটি বড়ই আদরণীয়। স্বামীজী এই উদ্দেশ্যে হিমালয়ে একটি 'গোটা পাহাড়' চেয়েছিলেন। মুক্ত পুরুষের সেই নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে এই মায়াবতী। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যা মিস্টার ও মিসেস সেভিয়ারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি 'গোটা পাহাড়' পাওয়া গেছে, যার চূড়ায় আশ্রমটি স্থাপিত। কোন রূপের উপাসনা নয়, এখানে অদ্বৈত অরূপের সাধনা—মূর্তি নেই, পূজা আরতিও নেই। আশ্রম-প্রাঙ্গণ বিচিত্র বর্ণগন্ধের পুষ্পসম্ভারে শোভিত হলেও মন্দির ও মূর্তি না থাকায় ফুলসাজ নেই। অঙ্গনের পুষ্পসৌন্দর্যই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের সজ্জা ও পূজা।



শারদা নদী

কী অপূর্ব নির্জনতা! নির্জনতা যেন রূপধারণ করেছে। কথা বলতে সাহস বা ইচ্ছা হয় না, বিশেষ করে রাতের দুর্ভেদ্য আঁধারে। বাহ্য প্রকৃতি স্তব্ধ, সে বিরাট বিশাল মৌনতাকে সর্বান্তঃকরণে অন্তঃরাজ্যে গ্রহণ করে মন নিঃসীম মগ্নতায় ডুবে যেতে চায়; বৃত্তির অনন্ত ওঠাপড়া মহাবিস্ময়ে থমকে যেতে চায়।

মায়াবতী আশ্রমটি যে-পাহাড়ে অবস্থিত তার পাশেই আরেকটি পাহাড়ের চূড়ায় স্বামী বিবেকানন্দ বসে ধ্যান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে ঐ স্থানটির গুরুত্ব বিরাট। অতি নির্জন পাহাড়ী প্রদেশ। আমরা অনেকে একত্রিত হয়ে সেখানে গেলাম, ঐভাবেই যাওয়ার নিয়ম। স্থানটির নাম 'ধরমগড়'। পাহাড়ে সামান্য ওঠার পরেই দেখা গেল স্বামী স্বরূপানন্দের সাধনপীঠ। একটি ছোট্ট কাঠের ঘর [ঠিক বাসের গুমটির মতো]। তার বেষ্টন করে করে পথ চলেছে। সে-পথ কখনো সঙ্কীর্ণ আবার কখনো খুব চড়াই, বাম বা ডানদিকে গভীর খাদ। জীবনের গতির মতোই আঁকাবাঁকা—অসাবধান হলেই পতন! চূড়ায় উঠে বেশ খানিকটা সমতলভূমি। সেখানে সিমেন্টের বেদি করা আছে, স্বামীজীর ধ্যানাসন। অসাধারণ সৌন্দর্যময় নৈসর্গিক পরিবেশ। যেদিকে দুচোখ যায় হিমালয় আর তার রূপোগলানো শীর্ষদেশ। সূর্য-কিরণসম্পাতে মণিরত্নরাজির মতো ঝলমল করছে।



ধরমগড়, মায়াবতী। স্বামীজীর ধ্যানাসন।

ভিতরে একটি চৌকি, একটি চেয়ার ও টেবিল, যা প্রায় এঁটে আছে। সাধনার চমৎকার পরিবেশ। এই পাহাড় ও আশপাশের পাহাড়গুলিতে গভীর অরণ্যানী। ওক, পাইন, পিচ, ফার, চীর প্রভৃতি পাহাড়ী গাছের ঘন সারি। বৃক্ষশীর্ষে রৌদ্রকরস্পর্শ থাকলেও নিচের মাটি তিনি কখনো স্পর্শ করেন বলে তো মনে হয় না। কারণ, নিচের দিকের মাটি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে। পাহাড়ী পথের যেমন নিয়ম—পাহাড়টিকে মন্দিরশীর্ষের মতো কোণাকৃতি বৃক্ষচূড়ায় তপনপ্রভা। সর্বত্র একই চৈতন্যে জরজর। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, স্বামীজীর নিকট "হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্তি দ্বারা ওতপ্রোত।"[১] এরূপ নির্জনতাময় দিব্য পরিবেশে অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচিত হয়। আলমোড়ার কাছে কাঁকড়িঘাটে কুশী নদীর তীরে এমনই এক দিব্যস্থানে স্বামীজী গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এসব স্থানের গাম্ভীর্য, সৌন্দর্য ও

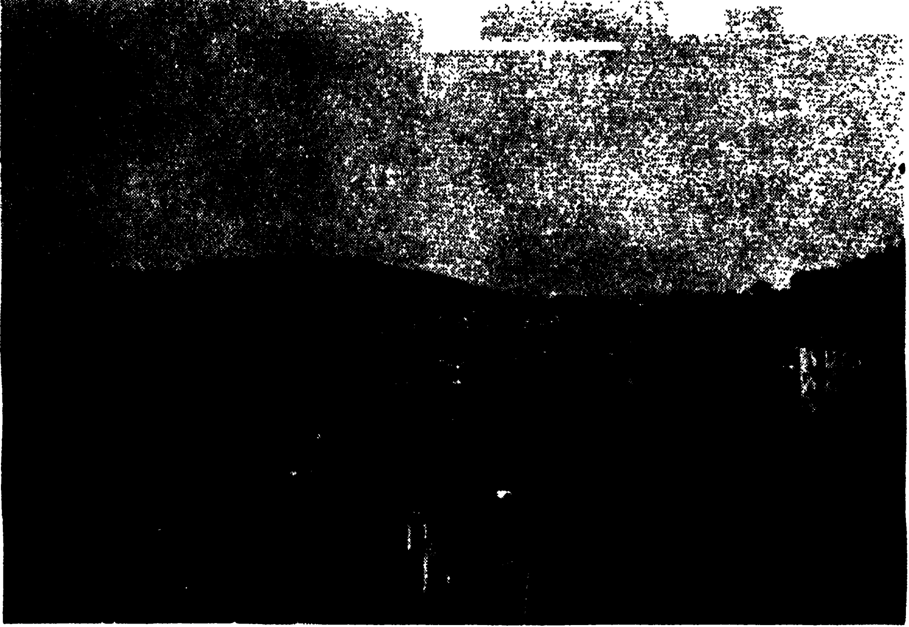
১ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা, ৭ম সং, ১৩৭০, পৃঃ ৬১

মাহাত্ম্যকে চিরসাথী করে নেওয়ার জন্য মনে দুর্বার বাসনা জাগে। ইচ্ছা হয়, কাল তার গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে যাক, এই অনৈসর্গিক সৌন্দর্য ও নির্জনতা চিরন্তন সত্য হোক।

হায় রে মন, তা কী হওয়ার!

যথাসময়ে মায়াবতীর আশ্রম-চত্বরে ফিরি। স্বচ্ছ নীল আকাশের নিচে সোনাঝরানো রোদে বসে শুনি পত্রের মর্মরধ্বনি—এছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আবার রাতের ঘন অন্ধকারে তারকাময় ঝকঝকে আকাশ বড় চমৎকার। গাছগুলি নভোস্পর্শী, অদ্ভুত সোজা ও স্থির। এরকম সোজা বা কুটিলতাহীন হলেই বুঝি নির্দ্বন্দ্বে ঈশ্বরকে ডাকা যায়! প্রকৃতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাত্রী আর কে আছে?

পরদিন সকালে মায়াবতী থেকে জিপে পিথোরাগড় বাসস্ট্যান্ডে গেলাম। সেখান থেকে কুমায়ুনের নানাস্থানের বাস ছাড়ে। আমরা আলমোড়াগামী বাস ধরলাম। তিন-চারটি পাহাড় ডিঙিয়ে পৌঁছালাম আলমোড়ায়। ছবির মতো শহর আলমোড়া। ঘনবসতি, বাসস্ট্যান্ড, বড় বড় বাজার, রেস্তরাঁ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাড়ি। ঠিক যেন পরপর সাজানো-গোছানো ছবি। আলমোড়া সম্বন্ধে বিশেষ কথা হলো এই যে, ভারতের অধিকাংশ শৈলশহর ব্রিটিশ-রাজের তৈরি হলেও আলমোড়া ভারতের প্রাক্-ব্রিটিশ শৈলশহর। কুমায়ুন রাজ্যের বিখ্যাত চাঁদবংশীয়দের রাজ্যের রাজধানী ছিল আলমোড়া। অশ্বজিনের আকারের একটি পাহাড়ের (saddle-shaped ridge) ওপর শহরটি অবস্থিত। চারদিকে পাইন বৃক্ষশোভিত পর্বতমালা—যাদের চূড়ায় চূড়ায় প্রাচীন মন্দির দেখা যায়।



ছবির মতো শহর আলমোড়া

এখানে এসে প্রথমেই স্বামীজীর কথা মনে হয়। পাশ্চাত্যে যাওয়ার আগে ও পরে সর্বসমেত তিনি তিনবার আলমোড়ায় শুভ পদার্পণ করেছিলেন। পূতস্মৃতি-বিজড়িত আলমোড়া। ভগিনী নিবেদিতা, ম্যাকলাউড, ওলি বুল, জুলফিকার প্রমুখ কত চিরস্মরণীয় নাম আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত! পুণ্যধাম টমসন হাউস, লালা বদ্রীশার বাড়ি, স্বামীজীর তপস্যার কাসারদেবী পাহাড়, সায়া পাহাড়—আলমোড়া নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এখানে ব্রাইট এন্ড কর্নার (Bright

End Corner) থেকে সূর্যাস্ত বড় চমৎকার দেখায়। বহুক্ষণ পর্যন্ত অস্তগামী সূর্যের লালিমা ঘন আঁধারের বুকে রক্তরাগ শিখা-সম জেগে থাকে। সাতরঙের বিচিত্র বর্ণময় ছটা দেখা যায়। ত্রিশূল, নন্দাদেবী প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি খুব কাছেই বলে মনে হয়। ব্রাইট এন্ড কর্নারের সামনেই আলমোড়ার 'শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর'।

আলমোড়ায় বিশাল বাসস্ট্যান্ড থাকায় পারিপার্শ্বিক তীর্থ বা দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে যাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। আলমোড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ছাড়ল। এখান থেকে দূরত্ব ৩৮ কিলোমিটার। পাহাড়ী পথ বড়ই মনোরম, বহুবার দেখা হলেও পুরনো হয় না। ঈশ্বর প্রকৃতিকে অকৃপণ হাতে সাজিয়ে রেখেছেন সকলের জন্য। যত খুশি দেখে প্রাণমন জুড়িয়ে নেওয়া যায়। ফুরিয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই। ঝিরঝিরে চামরের মতো ঝাউগাছের প্রতিটি সরু লকলকে পাতায় সূর্যের আলো বিস্ময়কর সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কত রকমের গুল্মলতা, পত্রপুষ্প!



আলমোড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর

নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বাসগুলি ছাড়ে। আগে থেকে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। এখান থেকে আমরা 'জাগেশ্বর' বা 'যজ্ঞেশ্বর' এবং 'বাগেশ্বর' নামে দুটি তীর্থদর্শনে গিয়েছিলাম।

হিমালয় ও তার সানুদেশ শিবময় স্থান। এখানে কত যে শিবমন্দির গড়ে উঠেছে তার ইয়ত্তা করা যায় না। সচরাচর শিবমন্দিরের গঠনে খুব একটা পারিপাট্য লক্ষ্য করা যায় না, অধিকাংশ মন্দিরই কেদারশৈলে কেদারনাথ-মন্দিরের মতো।

প্রথমে জাগেশ্বরের কথা বলি। বেলা ১১টা নাগাদ বৈচিত্র্যের কোন শেষ নেই।

মন্দিরের পথে প্রায় ২ কিলোমিটার ধরে দেবদারু গাছের সারি। পথের ডানধারে মন্দিরে দেবমিলন-মানসে নৃত্যভঙ্গিমায় চলেছেন 'জটাগঙ্গা' নামে একটি শীর্ণা নদী। মন্দিরের কিছু আগে 'দণ্ডেশ্বর' শিবমন্দির প্রহরীর মতো দণ্ডায়মান।

জাগেশ্বরে মন্দিরের প্রবেশদ্বারটি বেশ বড়। দুপাশে রয়েছেন দুই ভৈরব। অন্দরে সুবৃহৎ চত্বর। মন্দিরগুলি একই গড়নের। এখানকার নির্জন ও রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কুমায়ুন রাজ্যের চাঁদরাজারা ১৫শ

শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে বহুসংখ্যক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পূজারীদের কাছে শুনেছি, ছোট-বড় মিলিয়ে ঐ চত্বরে সর্বসমেত ১২৪টি মন্দির আছে। স্থাপত্যসৌন্দর্য ও বিশালত্বে তিনটি প্রধান মন্দির হলো জাগেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় শিব ও শ্রীপুষ্টিদেবীর মন্দির। চাঁদরাজত্বে শিল্পকলা,



জাগেশ্বর মন্দির

ভাস্কর্যের যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে, এই মন্দিরগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। একটি ঘরে অন্যান্য মন্দিরের বেশ কিছু দেবদেবীর সুন্দর মূর্তি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত আছে। বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণে অনেক পাইন গাছ আছে। তার মধ্যে একটির উচ্চতা প্রায় ২৫০ ফুট হবে। গাছটির গুঁড়ির দিকের ব্যাস ৩০।৪০ ফুটের মতো। ঐ গুঁড়িটি কিছুটা ওপরে উঠে দুটি পৃথক গাছ হয়ে উঠেছে। গাছটি প্রাচীন ও অভিনব। মন্দিরের সীমানার বাইরে কাছেই 'ব্রহ্মকুণ্ড' আছে। এই কুণ্ডের পবিত্র সলিলে অবগাহন করে ভক্তেরা দেবদর্শনে যান। এটিই প্রথা।

জাগেশ্বর শিব দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। পিনেটের ওপর লিঙ্গরাজ শুভ্রবস্ত্রাবরণে আবৃত, স্পর্শের জন্য উপরিভাগ ঈষৎ উন্মুক্ত। জাগেশ্বরে পূজারতি, প্রণামের পর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মন্দিরে গেলাম। উচ্চতায় দেড় ফুটের মতো এবং প্রস্থেও প্রায় তাই হবে। যিনি অনামক, অরূপক, অমূর্তক তাঁকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ভাগ করে বর্ণনা করা কত যে অবাস্তব ও স্পর্ধা তা বুঝতে পেরেও প্রার্থনা জানালাম—বারংবার জন্মমৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত কর, প্রভো।

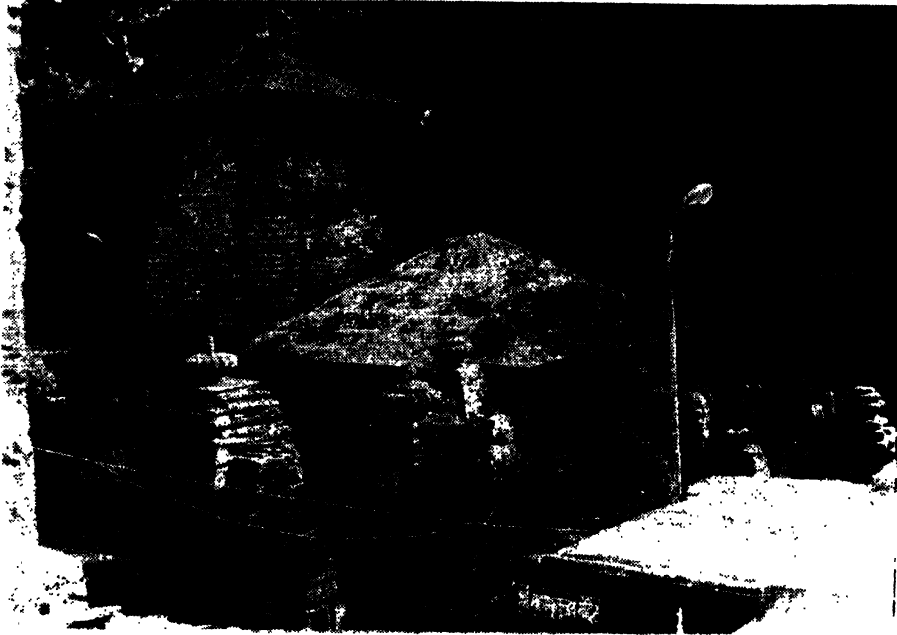
এখানে শিবের শক্তি শ্রীপুষ্টিদেবী। ইনি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। কালো-পাথরের সুন্দর দেবীমূর্তি—চক্ষু আয়ত, নাসিকা তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। মন্দিরের খুব কাছে উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের সুন্দর রেস্টহাউস আছে। সংসারের এক-ঘেয়েমির নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে কয়েকদিন হিমালয়ের শান্ত ও নির্জন পরিবেশে শান্তিতে কাটাবার পক্ষে এটি আদর্শ স্থান।

এরপরে আমরা বাগেশ্বরে যাই। আলমোড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সকাল ৭টা নাগাদ বাসে চেপে বেলা ১২টার পরে বাগেশ্বরে উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগের রেস্টহাউসে এসে পৌঁছাই। আলমোড়া থেকে এর দূরত্ব ৯০ কিলোমিটারের মতো হবে। পথের সৌন্দর্য এত মনোরম ও গম্ভীর যে, বাইরের জগতের অস্তিত্ব আছে বলে মনেই হয় না। চিরতুষারমৌলি শিখরগুলি রৌদ্রকিরণে সুবর্ণময়। পাহাড়ী পথে বাস ধীরগতিতে চলে। 'ওভারটেক' করতে গেলেই মহাবিপদ। পাহাড়ের গায়ে অনেক জায়গায় যানচালকের প্রতি সতর্কবাণী দেওয়া থাকে। গতির চেয়ে জীবনের মূল্য অধিক। বেশ কিছুটা চলার পরে পথের বাঁদিকে চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, ত্রিশূল,

পঞ্চচুল্লী প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি ঝাঁকিদর্শন দিয়ে সরে সরে গিয়েও কিছু পরে আবার আবির্ভূত হচ্ছে, যেন আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। নির্বাক বিস্ময়ে তাই চেয়ে দেখি। ভাবি, এভাবেই হিমালয় তার মায়াজাল বিস্তার করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃত হিমালয়-প্রেমীর কাছে জীবন-মরণ সব তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। হিমালয়ের গভীর নির্জনতা ও সৌন্দর্যের প্রবল আকর্ষণে সে ঘরদোর ছেড়ে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সেজন্য 'বাগেশ্বর' বা 'বাগীশ্বর' নাম।

মন্দিরটি উচ্চতায় ৫০ ফুটের মতো হবে। মন্দির-চূড়ায় গোলাকার পদ্মপাপড়ি, তার ওপর বাদামী রঙের কাঠের ফ্রেমের কাজ। তারও ওপরে চক্‌চকে পিতলের ধ্বজা। মন্দিরদ্বারের দুপাশে দুই গণেশ-মূর্তি এবং সামনে দুটি ষাঁড়। একটি ছোট ধবধবে সাদা খুব সুন্দর, অপরটি একটু বড় বেলেপাথরের। মন্দিরে ঢুকেই শিবের প্রকাণ্ড ছবি আছে।



মৃত্যুঞ্জয় শিবমন্দির

বাগেশ্বরের প্রেক্ষাপট অতি রমণীয়। এই স্থানটি একেবারেই সমতলভূমি। কত যে বৈচিত্র্য! উত্তরে উত্তুঙ্গ চিরন্তন হিমশিখর নন্দাদেবী, ত্রিশূল প্রভৃতি শৃঙ্গ এবং নিচে সমতলে হিমালয়ের পাদস্পর্শ করে চলেছে সরযূ ও গোমতী নদী। এরই সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর শিবমন্দির, অতি মনোরম পবিত্র তপোভূমি।

বাগেশ্বর শিবমন্দির সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। গোমতী-সরযূ নদীর সঙ্গমস্থলে একদিন হর-পার্বতী বসেছিলেন। এই পরম শুভক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেবের গুণগাথা কীর্তন করে আকাশবাণী হলো।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিশেষ বড় নয়। শিবলিঙ্গের চারপাশে আতপচাল দিয়ে সযত্নে অষ্টদল পদ্ম ও ত্রিশূল আঁকা আছে। সামনে কুলুঙ্গিতে লালচেলি-পরা দুর্গামূর্তি বিরাজমানা। শিব শক্ত্যাত্মক জগৎ—তাঁরা সর্বত্র একত্রে থাকেন।

বারাণসীর মতো এটিও শিবক্ষেত্র। ধর্মীয় আকর্ষণ ছাড়াও পর্যটকদের কাছে বাগেশ্বরের বিরাট আকর্ষণের কারণ হলো বিখ্যাত পিণ্ডারি হিমবাহ। সেখানে যেতে হলে বাগেশ্বর থেকে যাত্রা করাই প্রশস্ত। এই পবিত্র সঙ্গমে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে উত্তরায়ণী মেলা বসে।

সঙ্গমে পুণ্যস্নানান্তে তীর্থযাত্রীরা তাঁদের পছন্দমত জিনিসপত্রাদি কেনেন। ভারতের সর্বত্র মেলার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে পশমের জামা ও অন্যান্য হাতের কাজের বিরাট বাজার বসে। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক নৃত্যগীতাদি হয়। শিবরাত্রিতে বেশ ধুমধামের সঙ্গে শিবের পূজাদি হয় এবং অভিনয়, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। এসময় আশপাশের গ্রাম থেকে তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়া, মেলামেশায় স্থানটি মুখর হয়ে ওঠে।

বাগেশ্বর থেকে বাসে করে পরের দিন কৌশানি এলাম প্রায় বেলা ১২টার সময়। ঘণ্টা চারেকের পথ। একটি পাহাড়ের ওপর 'অনাসক্তি আশ্রম'। সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হলো আমাদের। এখানে গান্ধীজী কয়েকবার এসে বাস করেছেন। আশ্রম থেকে দীর্ঘ প্রসারিত শৃঙ্গগুলি অবারিত দেখা যায়। ভোর ৫টা থেকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেই ঐগুলি দেখতে ভিড় জমে যায়। প্রচণ্ড শীতের কাঁপুনির কথা মনেই থাকে না।

রাতের আঁধার অপসৃত হচ্ছে। শুভ্র তুষারমণ্ডিত শীর্ষগুলি ক্রমে ক্রমে আঁধারের যবনিকা ভেদ করে উষার আলোয় আবছা দেখা যাচ্ছে। এমন সময় পিছন থেকে সিঁদুরে লাল সূর্যের আবির্ভাব হলো। শ্বেতশৃঙ্গগুলি নিমেষে রঞ্জিত হয়ে গেল। এ এক অসাধারণ দৃশ্য! এইরকমই দৃশ্য দেখে আলমোড়ায় স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "ঐ যে ঊর্ধ্বে শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি উহাই শিব, আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে তাহাই জগজ্জননী!"[২]



গোমতী ও সরযূ নদীর সঙ্গম। সূর্যোদয়ের আগে তোলা।

কৌশানি থেকে চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ, নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, মীরাঘুন্টি, দেবীদর্শন, নন্দাদেবী, নন্দাকোট, পঞ্চচুল্লী, গৌরীপর্বত, হাতিপাহাড় প্রভৃতি পর্বতের যে বিশাল বিস্তৃতি তার দর্শন এই প্রত্যূষেই। এরা প্রায়শই মেঘে ঢাকা থাকে।

বিকালে অনাসক্তি আশ্রমের পাশে পাইনে ছাওয়া একটি

২ স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, পৃঃ ২৯

পাহাড়ে বসে থাকতাম। সামনেই চিরশুভ্র তুষারমুকুট-শোভিত শৃঙ্গগুলি। ক্রমে শুভ্রতা রাঙা আবীরে লিপ্ত হয়ে গেল। সূর্যাস্তের সময় হলো। এরকম পুণ্যক্ষণে রাশি রাশি উচ্চচিন্তা আসে। আর্য মুনিঋষিদের তপস্যায়, সত্তায় ও মননে এসব স্থান আজও ভাস্বর।

আশ্রমটিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে থাকা-খাওয়ার মোটামুটি সুব্যবস্থা আছে এবং এর পরিবেশ অতি মনোরম। গান্ধীজী যে-ঘরটিতে বাস করতেন সেখানে নিত্য ভজনাদি হয়। তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি ছবি ও লেখার মাধ্যমে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। গান্ধীজী এই স্থানটির সৌন্দর্যের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডের তুলনা করেছিলেন।

কাঠগোদাম, কর্ণপ্রয়াগ, নৈনীতাল, আলমোড়া, বাগেশ্বর, ভারারী, পিথোরাগড়, শ্রীনগর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে এখান থেকে বাস যাতায়াত করে। মাকড়সার জালের মতো বাসের পথ এখন দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত হয়েছে। পাহাড় এখন আর দুর্গম বা অগম্য নয়!

এখানে সবই সুন্দর। কিন্তু একটা কথা। যাত্রীদের বেশির ভাগই সাধারণ ভ্রমণকারী। তারা দলবেঁধে হৈহৈ করতে করতে আসে ও ছবি তুলে এক-আধদিনেই উধাও হয়ে যায়। একদল যায়, আবার অন্য এক দলের আগমন হয়। হিমালয়ের গম্ভীর নির্জনতায় ডুবে থাকার সময় বা ইচ্ছা নেই তাদের। বর্তমানের সদা চলিষ্ণু জগতে কারো একদণ্ড দাঁড়াবার বা বিরামের সময় নেই। কিন্তু এসব অপার্থিব সৌন্দর্য চোখ দিয়ে শুধু দেখার নয়, অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করার।



মাঝখানে ত্রিশূল পাহাড়

এরপর রানীখেত। কৌশানি থেকে বাসে প্রায় ৪ ঘণ্টায় রানীখেত পৌঁছানো গেল। সেদিন ছিল দীপাবলী উৎসব। উৎসবের সাজে সজ্জিত মানুষজনের ঢল নেমেছে পথে। সর্বত্র জিনিসপত্র কেনাবেচার মেলা বসে গেছে। কিন্তু একি! উত্তরাকাশে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি কোথায় গেল? তাদের দেখতে না পেয়ে মন ভীষণ দমে গেল। সারাদিন ও সন্ধ্যা কেটে গেল, কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে শেষরাতে উত্তরদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। যেদিকে তাকাই, নিবিড় আঁধারের মধ্যে চিরসঞ্চিত তুষারের হীরকজ্যোতি ঝলসে

উঠছে। এর চেয়ে সুন্দরতর কোন দৃশ্য আছে বলে মনে হয় না।

রানীখেত নামকরণের কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে। রূপকথায় আছে যে, একজন রানী ভ্রমণ করতে করতে এসে এই প্রদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানেই ঘরবাস করতে লাগলেন। তখন থেকেই এর নাম রানীখেত। গল্পের কথা ছেড়ে দিলেও কুমায়ুন রেঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলে এই পার্বত্য অঞ্চল সত্যই সৌন্দর্যরানী। পূর্বদিকে নেপাল থেকে গাড়োয়ালের বদরীনাথ, টিহরি, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, হাতিপাহাড়, গৌরীপর্বত প্রভৃতির বিশাল ব্যাপ্তি ৩০০ কিলোমিটারের মতো নিশ্চয় হবে। বদরীনাথের দিকে নীলকণ্ঠ, মানা, কামেটও দেখা যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে। উজ্জ্বল নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে এক অনুপম সৌন্দর্যের আলয়।

পাইন, ওক, সিডার, সাইপ্রেস প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ রানীখেত আপেলচাষের জন্য বিখ্যাত। পথগুলি সুন্দর। পোলো গ্রাউন্ড, গলফ কোর্সও আছে। আছে বৈচিত্র্যময় পুষ্পসম্ভার, কারুকার্যময় মন্দির। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য প্রায় সারা বছরই ভিড় লেগে থাকে।

এই অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন্দাদেবী। তাঁর নামানুসারে শ্রাবণ মাসে এখানে একটি মেলা বসে। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সকলের আনাগোনায় এবং অজস্র জিনিস-পত্রের আমদানিতে মেলা বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে।

আলমোড়াতে তো বটেই, কৌশানি, রানীখেত, বাগেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও বেশ ভাল দোকানবাজার দেখা যায়। পিচ, পেয়ারা, আপেল প্রভৃতি নানারকমের ফল, সবজি, ঘরসাজানোর জন্য নানারকম 'ফ্যান্সি' জিনিসপত্রও এখানে পাওয়া যায়। প্রায় সর্বত্রই 'গান্ধী আশ্রম' আছে। সেখানে স্থানীয় মেয়েদের হাতের তৈরি পশমী জামা, টুপি পাওয়া যায়। এগুলির 'ফিনিশ' খুব সূক্ষ্ম না হলেও ভারী শীতের পক্ষে বেশ উপযোগী এবং দামও বেশ কম। খদ্দরের পায়জামা, পাঞ্জাবি, চাদর, টুপি, ধূপ, মধু, চেয়ারের কুশন, কভার, আসন প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসব কুটিরশিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আছে। পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে দোকানে।

বেশ কিছুদিন ধরে হিমালয়ের হিমশিখরের সাহচর্যে কাটিয়ে এতই ভাল লেগেছে যে, কলকাতায় ফিরে অনেক সময়ে চমকে গেছি! সেই ঝকঝকে সুন্দর শিখরগুলি উত্তরাকাশে কেন দেখা যাচ্ছে না? এ সেই বিরাট শিশুর আনমনে লুকোচুরি খেলা নয়তো? □

চিরন্তনী

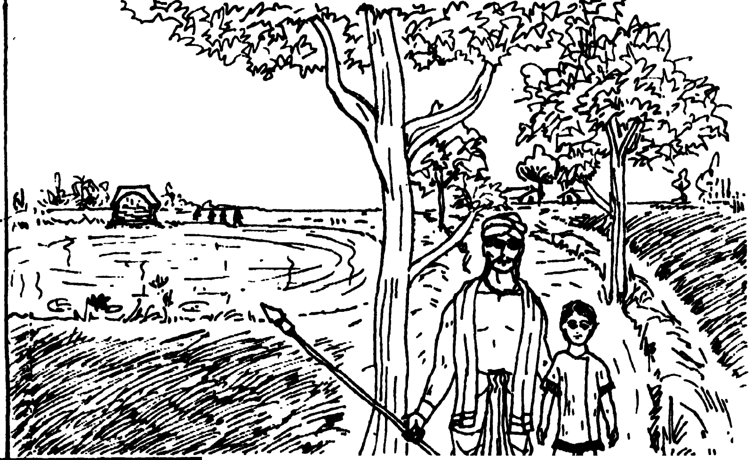
ধ্রুবের উপাখ্যান ৪

কথা ঃ ভগিনী নিবেদিতা* ☐ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত



ধ্রুবর কথায় রানীর আনন্দ হলো ঠিকই, কিন্তু উদ্বেগের ছায়াও দেখা গেল তাঁর মুখে। রানী উদ্বেগ ও আনন্দের আবেশে পুত্রের ইচ্ছায় সম্মতি দিলেন। তবু চিরদুঃখী রানীর মন আশঙ্কায় কেঁপে উঠল, এতে যদি তাঁদের বর্তমান নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কোন অশুভ পরিবর্তন আসে, যদি তাঁর জীবনের একমাত্র নয়নের মণিকে হারাতে হয়!

পরদিন একজন রক্ষীর তত্ত্বাবধানে পিতার সঙ্গে দেখা করতে ধ্রুব যাত্রা করল। পথ বড়ই সুন্দর। বৃক্ষশাখা আচ্ছাদিত ছায়াশীতল পথের দুপাশেই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝেই তারা বৃহৎ পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সুদৃশ্য তোরণশোভিত বাঁধানো ঘাট, পাশেই গ্রাম্য বালকেরা আনন্দে খেলা করছে।





ধ্রুব আরও দেখল, প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে জলাশয় ও দেবমন্দির। ভোরবেলায় পথ দিয়ে যেতে যেতে তারা দেখতে পেল— স্বর্ণকার, কুম্ভকার যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। ধ্রুবরা এগিয়ে চলল। [ক্রমশঃ]

[★ শুভ্রা দাশগুপ্ত অনূদিত]

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়ে

দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশে) আমাদের বাড়ি। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে আমি এবং আমার স্ত্রী রাজবালা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় লাভ করি। আমার স্ত্রীর বয়স তখন কুড়ি বছর। আমার ত্রিশ বছর। আট বছর আগে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে আমাদের বিবাহ হয়েছিল। স্ত্রীর বয়স তখন ছিল বার বছর। ঐ সময় পর্যন্ত আমাদের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় আমার স্ত্রীকে আত্মীয়-পরিজনের কাছে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। এতে সে অত্যন্ত মানসিক কষ্টে ও দুঃখে দিন কাটাত। আত্মীয়-পরিজনদের সমালোচনার হাত থেকে বাঁচতে এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে সে বাড়িতে সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ এবং গ্রামের প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষিকার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখত। আমি ঢাকায় কবিরাজী করতাম। একদিন আমার স্ত্রী রাত্রে স্বপ্নাদেশ পায় যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিণী সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং মনে শান্তি আসবে।

আমাদের পাশের গ্রাম কলমাতে আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত থাকতেন। তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে (ইন্দুবালা) দাদা-বৌদি বলতাম। তাঁদের কাছে আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনেছিল। তাঁরা উভয়ে ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেছিলেন।

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণের জন্য আমার স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের বংশে ছিল কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার রীতি। সেজন্য আমার মা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে স্ত্রীর দীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। আমিও এব্যাপারে আমার মাকেই সমর্থন করেছিলাম। আমাদের সমর্থন না থাকলেও আমার স্ত্রী কিন্তু তার নিজ সঙ্কল্পে অটুট ছিল। সে নিজেই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে পত্রমাধ্যমে যোগাযোগ করে এবং তার মনোবাসনা নিবেদন করে। শ্রীশ্রীমা তাকে গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে কলকাতায় আসতে বলেন। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে আমাকে রাজি হতে হয়। নৌকায় পদ্মা পার হয়ে স্টীমারে আমরা রাত্রে আসি গোয়ালন্দে। গোয়ালন্দ থেকে সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাই। অপরিচিত জায়গা এবং কোন পরিচিত আত্মীয় না থাকায় স্টেশন থেকে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে সোজা বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছাই। স্ত্রীকে 'মায়ের বাড়ী'তে পৌঁছে দিয়ে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার কোন আগ্রহ আমার ছিল না।

মাতাঠাকুরানীর কাছে আমার স্ত্রী নিজের দুঃখের কারণ এবং তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন: "ভেবো না মা, তোমার অবশ্যই ছেলেমেয়ে হবে। তুমি কুলগুরুর কাছে যখন মন্ত্র নাওনি তখন আমিই তোমাকে মন্ত্র দেব। তুমি কার সঙ্গে এসেছ?" স্ত্রী বলে: "আমার স্বামীর সঙ্গে।" মা বললেন: "ছেলে কোথায়?" আমার স্ত্রী বলল: "তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।" মা বললেন: "তাকে বাইরে রেখে এসেছ কেন? ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে এস।" স্ত্রী তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ডেকে নিয়ে গেল। আমি বাধ্য হয়ে এবং অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমাকে বললেন: "হ্যাঁ বাবা, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? আমার কাছে মন্ত্র নিতে চাও না? তুমি কি তোমার কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ?" আমি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে বললাম: "না, আমি কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিইনি, আর এব্যাপারে আমার মায়ের কাছে আমি কোন অনুমতিও নিয়ে আসিনি।" শুনে মা স্নেহসিক্ত কোমলকণ্ঠে বললেন: "বাবা, তুমি সব কাজই কি তোমার মায়ের অনুমতি নিয়েই কর?" আমি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকলাম। মা শান্ত কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললেন: "দ্বিধা করো না, বাবা। যাও, দুজনে গঙ্গায় স্নান করে এস, আমি তোমাদের দীক্ষা দেব। আমার কাছে দীক্ষা নিলেও কুলগুরুর যা প্রাপ্য তা অবশ্যই তাঁকে দেবে।" মায়ের এই কথা শুনে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। এক অপূর্ব অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। আমার দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে লাগল। আমি মায়ের দুই চরণ স্পর্শ করে তাঁর পদপ্রান্তে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে রইলাম। তিনি কি বুঝলেন কে জানে, বললেন: "আমি সব বুঝতে পারছি, বাবা। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তোমাদের দুজনকেই দীক্ষা দেব।"

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা (১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ)। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত আমরা দুজনে গঙ্গাস্নান করে এলাম এবং মা আমাদের দুজনকে একইসঙ্গে মন্ত্রদীক্ষা দান করে কৃতকৃতার্থ করলেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে আমার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়।[১] আমাদের প্রথম সন্তানকে শ্রীশ্রীমাকে দেখানোর জন্য আমার স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমার প্রথম পুত্রের বয়স যখন আড়াই বছর, তখন আমার স্ত্রী তাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে আসে। পুত্রকে দেখে তিনি খুব খুশি হন এবং আশীর্বাদ করেন। আমার স্ত্রী যখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, সে-সময়ে একফাঁকে আমার পুত্রটি মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পায়। কিছু রক্তপাতও হয়। আমার স্ত্রী দৌড়ে এসে ক্রন্দনরত পুত্রকে কোলে নিয়ে তার কান্না থামানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তার কান্না আর থামে না। তখন শ্রীশ্রীমা নিজে এসে স্ত্রীর কোল থেকে আমার শিশুপুত্রকে নিজের কোলে নিয়ে আদর করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের কোলে সে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে। আমার এই পুত্রটি চার-পাঁচ বছর বয়সে কলেরায় আক্রান্ত হয়। তার সঙ্গে আমার বড়দার দুই ছেলেও কলেরায় আক্রান্ত হয়। আমার পুত্রটি সুস্থ হয়ে উঠলেও আমার ঐ দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিন্তু মারা যায়। আমি নিশ্চিত যে, মায়ের অভয় স্পর্শের ফলেই আমার পুত্র সেবার মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছিল।[১] এই পুত্রর পরে আমার আরও দুই পুত্র এবং তিনটি কন্যার জন্ম হয়। মায়ের আশীর্বাদে আমার স্ত্রীর সন্তানকামনা পূর্ণ হয়েছিল। শুধু সন্তানকামনাই নয়, আমাদের জীবনকে সমস্ত দিক থেকেই পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী।★ □

১ লেখকের এই পুত্রের নাম নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত। কলকাতা পুরসভার উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনীয়ার নিখিলরঞ্জনবাবু এখনো জীবিত—বর্তমানে (ডিসেম্বর, ১৯৯৬) বয়স ৮২ বছর। ওঁর বিশ্বাস, 'সারদা-সরস্বতী' ওঁকে কোলে নিয়েছিলেন—সেই সৌভাগ্যে উনি আজীবন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

★ দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তের (মৃত্যু ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১) এই অপ্রকাশিত মাতৃস্মৃতিটি আমরা পেয়েছি তাঁর মধ্যম পুত্র শিশিররঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে। লেখকের স্ত্রী রাজবালা সেনগুপ্তকে (মৃত্যু ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) শ্রীশ্রীমায়ের লেখা চারটি চিঠি লেখকের মধ্যম পুত্র শিশিররঞ্জন সেনগুপ্তের সৌজন্যে এবং দুটি চিঠি লেখকের দ্বিতীয়া কন্যা নিবেদিতা দত্তগুপ্তের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। চিঠিগুলি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের প্রকাশিতব্য তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অনুষ্ঠান-সূচী (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪০৩)
(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৬ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	২২ নভেম্বর ১৯৯৬
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৮ অগ্রহায়ণ	রবিবার	২৪ নভেম্বর ১৯৯৬
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৩ পৌষ	বুধবার	১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬
শ্রীযীশুখ্রীস্ট		৯ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ পৌষ	বুধবার	১ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২১ পৌষ	রবিবার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৩০ পৌষ	মঙ্গলবার	১৪ জানুয়ারি ১৯৯৭

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৫, ২০ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার, শুক্রবার	২১ নভেম্বর, ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬
৫, ২১ পৌষ	শুক্রবার, সোমবার	২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ৫ জানুয়ারি ১৯৯৭

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসৌরভ

অভয়শঙ্কর রায়

আমার ছোট ভ্রাতৃবধূ হেমপ্রভা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিল। তারই কাছে আমি এবং আমার স্ত্রী (দ্বিতীয়া স্ত্রী) নিরুপমা শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনি। আমাদের পৈতৃক বাড়ি ছিল মানিকগঞ্জ জেলার (অধুনা বাংলাদেশের) তেওতা গ্রামে। কলকাতাতে ৪৪, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেনে (বর্তমানে ৪৫বি, আব্দুল হালিম লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬) আমাদের বাড়ি।

আমার দীক্ষা নেওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এব্যাপারে আমার ভ্রাতৃবধূই সব ব্যবস্থা করে। তার যোগাযোগে আমার স্ত্রী নিরুপমার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমত নির্দিষ্ট দিনে খুব সকালে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে সস্ত্রীক পৌঁছালাম। আগেই বলেছি, আমার নিজের দীক্ষা নেওয়ার কোন ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু সেদিন শেষরাত্রে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমি তখন বিছানায়। অর্ধজাগ্রত অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বললেন ঃ "এখনো তোর দ্বিধা গেল না? যা যা, তুইও একইসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে নে।" কথাগুলি বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঠাকুরের দর্শন এবং তাঁর কথা শোনার পর খুব আনন্দ হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু দমেও গেলাম। কারণ, একটু পরেই স্ত্রীকে নিয়ে বাগবাজারে যাওয়ার কথা। তার দীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করা আছে, কিন্তু আমার তো নেই! এত তাড়াতাড়ি সেসব সংগ্রহ করব কি করে? যাই হোক, স্বপ্নে পাওয়া ঠাকুরের নির্দেশমত স্ত্রীকে নিয়ে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। মাকে প্রণাম করতে মা স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ "আর তো তোমার দ্বিধা নেই বাবা! যাও, গঙ্গাস্নান করে এস। বৌমার জিনিস দিয়েই তোমাদের দুজনের দীক্ষা হবে।" মায়ের মুখে এই কথা শুনে আমি আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, মা কি করে আমার স্বপ্নের কথা আগে থেকে জানতে পারলেন? তবে কি মা সত্যিই জগজ্জননী—অন্তর্যামিনী? যথাসময়ে আমার ও আমার স্ত্রীর মায়ের কাছে দীক্ষা হয়ে গেল। এই ঘটনা ১৩১৬ সালের (১৯১০ খ্রীস্টাব্দের)।

দুঃখের বিষয়, যার জন্য আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় লাভ করেছিলাম, আমার সেই ভ্রাতৃবধূ হেমপ্রভা অল্পবয়সে দুই পুত্র রেখে মারা যায়। হেমপ্রভার মৃত্যুর কয়েক বছর পর তার ছেলেদুটিও মারা যায়। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, কুসংস্কারমুক্ত এবং মাতৃগতপ্রাণা হেমপ্রভা শ্রীশ্রীমায়ের অনেক স্নেহ পেয়েছিল। আমাদের পরিবারের ওপরে হেমপ্রভার প্রভাব ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমার স্ত্রী নিরুপমারও মায়ের অনেক স্নেহ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯১৫ থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নিরুপমা শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে অন্ততঃ ৪০।৪৫টি পত্র পেয়েছে।[১] আমার বড় ছেলে ও মেয়ে প্রায়ই অসুস্থ থাকত। নিরুপমা তাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাত। মাও করুণাপরবশ হয়ে আশীর্বাদ জানাতেন শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে। সেই আশীর্বাদের জোরে আমার ঐ দুই ছেলেমেয়ে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের পত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই জয়রামবাটী থেকে লেখা। সেগুলির অধিকাংশই নলিনী-দিদির হাতে লেখা। এছাড়া রাসবিহারী মহারাজ ও ব্রহ্মচারী জ্যোতিপ্রকাশের হাতে লেখা চিঠিও আছে।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর বলেছিলেন ঃ "এ (নিজেকে দেখিয়ে) আর কী করেছে? তোমাকে ঢের বেশি করতে হবে।" মায়ের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখি, সত্যিই মা ঠাকুরের অবর্তমানে কত কাজ করেছেন, কত আর্ত, অসহায় ও দুঃখী মানুষের জীবন শীতল করেছেন। আমরা যেমন মায়ের ৪০।৪৫টি চিঠি পেয়েছি এরকম চিঠি মায়ের কত সন্তানই তো পেয়েছেন। মায়ের চিঠিগুলিতে সন্তানদের জন্য তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর মমতা জ্বলন্তভাবে ফুটে উঠেছে দেখতে পাওয়া যায়। বাগবাজারে মায়ের শেষ অসুখের সময়ে আমার স্ত্রীকে তার পত্রের উত্তরে জানানো হয়েছিল ঃ "শ্রীশ্রীমার অবস্থা পূর্ববৎ আছে। কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, দৈনিক ২ বার করিয়া জ্বর আসিতেছে। পেটের ও পায়ের ফুলা কিছু কমিয়াছে। এই অষ্টমী, একাদশী না কাটিলে কিছু বুঝা যাইবে না।" চিঠিটির তারিখ ২৪ আষাঢ় (১৩২৭)—৮ জুলাই ১৯২০। এর মাত্র বারদিন পর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী স্থূলদেহ ত্যাগ করেন।★ □

---

১ এই চিঠিগুলির মধ্যে ৩৯টি চিঠি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' গ্রন্থের প্রকাশিতব্য তৃতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চিঠিগুলি আমরা পেয়েছি লেখকের তৃতীয় পুত্র গৌতমশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

★ লেখকের এই অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাটি আমরা সংগ্রহ করেছি তাঁর তৃতীয় পুত্র গৌতমশঙ্কর রায়ের সৌজন্যে। লেখক ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর স্ত্রী নিরুপমা দেবীর মৃত্যু হয় ২৪ আগস্ট ১৯৬৫।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সঙ্কলন

'কথামৃতে' না-বলা শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

সঙ্কলক ☐ জলধিকুমার সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রায় ৪৬ বছর জীবিত ছিলেন শ্রীম (শ্রীম-র দেহত্যাগ হয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে)। এই সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা শোনার জন্য বহু দেশী ও বিদেশী ভক্তরা যেমন যেতেন, তেমনি বেলুড় মঠের সাধুরাও যেতেন। ঠাকুরের কথা বলতে কখনো তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন না। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে তাঁর কথা ডায়েরীতে নিত্য লিখে রাখতেন। শ্রীম সেই ডায়েরী মাঝে মাঝে দেখে পরিশোধন করে দিতেন। পরবর্তী কালে স্বামী নিত্যাত্মানন্দ সেই ডায়েরীকে ভিত্তি করে ১৬ খণ্ডে 'শ্রীম-দর্শন' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শ্রীম কর্তৃক কথামৃতের ব্যাখ্যা ছাড়াও ঠাকুর, মা, দক্ষিণেশ্বর এবং ঠাকুরের পার্ষদগণ সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আছে। শ্রীম-কথিত হওয়ায় এগুলির মূল্য অসীম। 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থে বিধৃত 'কথামৃত'-এ না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা তুলে ধরা হবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীম—ঠাকুর শ্যামপুকুর বাড়িতে এসেই ভাঁড়ারে ঢুকলেন। হাঁড়ির নিচে বিড়ে নেই, ওপরে সরা নেই দেখে তৎক্ষণাৎ বাজারে পাঠালেন পয়সা দিয়ে। তিনি এলোমেলো ভাব পছন্দ করতেন না। সব সাজগোজ করে রাখতে বলতেন। যেখানে যা রাখার দরকার ঠিক সেখানে তা রাখতে বলতেন। এদিকে দিনরাত মুহুর্মুহুঃ সমাধি, পরনের কাপড়ের ঠিক নাই; কিন্তু ব্যবহারিক বিষয়ে এত দৃষ্টি। ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে, সে মিছরির হিসাবও করতে পারে। (১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩০)

শ্রীম—ঠাকুরের কী দৃষ্টি, সব দিক লক্ষ্য রাখতেন! একজন দশটার জায়গায় ছয়টা পান এক পয়সা দিয়ে এনেছিলেন, অমনি তিরস্কার, "ঠকবি কেন? আনবি ঠিক, বেশি হয় অন্যকে বিলিয়ে দে। তবু ঠকবি না।" এর মানে আছে, ও একটা স্বভাব হয়ে যায়। কামিনী-কাঞ্চনের বিষয়েও ঠকে যাবে শেষে। ঠকে যাওয়ার স্বভাব হয়ে যায়। বলতেন কিনা প্রায়ই, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? সব দিক হুঁশ থাকবে, সর্বদা সজাগ।... ধর্মের একটা প্রচলিত অর্থই হচ্ছে, বাইরের বিষয়ে এলোমেলো থাকা। কিন্তু ঠাকুর এসব দেখতে পারতেন না। বলতেন, মহা তমোগুণে এরূপ হয়। গীতায় বলেছেন, ভক্ত হবে 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত'। ঠাকুর পরনের কাপড়খানাও রাখতে পারতেন না, সর্বদা সমাধিস্থ। কিন্তু তেলের কেঁড়েতে তেল আছে কিনা তার খবর নিচ্ছেন। এ কয়টার ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন— প্রথম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। প্রায়ই আলস্যের জন্য লোক অপরিষ্কার থাকে। ঈশ্বরচিন্তা করে দেহভুল কজনের হচ্ছে! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। দ্বিতীয়, অপব্যয় না হয়। অনেকে জিনিস নষ্ট করে, তা দেখতে পারতেন না। একবার এক টুকরো লেবুর জায়গায় ছয় টুকরো কেটেছিল বলে তিরস্কার করেছিলেন কাশীপুরে। বলেছিলেন, ভক্তেরা কত কষ্ট করে অর্থোপার্জন করে, সেই অর্থে সেবা হচ্ছে, তার অপব্যবহার! বলতেন, লক্ষ্মীছাড়া থেকে কৃপণ হওয়া ভাল। দুটোই খারাপ, তবু তো যাতা নষ্ট না করে কৃপণ হওয়া ভাল।... তৃতীয়, ছেঁড়া কাপড় কিংবা ময়লা কাপড় দেখতে পারতেন না। বলতেন, সেলাই-করা কাপড় পরলে লক্ষ্মীছাড়া হয়। চতুর্থ, এলোমেলো ভাব—যেমন এখানকার জিনিস ওখানে রাখা।... পঞ্চম, নিজের রান্না নিজে করা। বলতেন, ভক্তরা যারা তাঁর ভজন করবে তারা নিজের দুটি চাল ফুটিয়ে নেবে। ভগবানে অর্পণ করে প্রসাদ পাবে। এতে পরের ওপর নির্ভরতা করতে হয় না। আর সত্ত্বহানিও হয় না। বলতেন, সর্বাবস্থায় তাঁর পূজা; কোনটাই অবহেলা করা চলে না। আহার, বিহার, শয়ন, চলন, বলন সর্বদা সর্ববস্তুতে তাঁর অনুধ্যান, তবে তো ধর্ম। (১৷১৪৫-১৪৭)

ঠাকুর সঞ্চয় করতে পারতেন না। একজন তিনটি জামা নিয়ে গিছল, একটি রেখে দুটি ফেরত দিলেন। আবার এদিকে সব বিষয়ে নজর। রামলালকে বললেন, "পুজোর সময় মেয়েদের কাপড় পাঠিয়ে দিস—নয়তো ওরা বলবে 'মামার বাড়ির কেউ নেই'।" (১৷১৬৮)

শ্রীম (ভাবিতে ভাবিতে মৌন ভঙ্গ করিয়া)—[ঠাকুরের] মান অপমান বোধ নাই। দারোয়ান বললে চলে যেতে, অমনি চললেন, গামছাখানা কাঁধে। ত্রৈলোক্যবাবু দেখে বললেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন, ফিরে আসুন।" অমনি হেসে ফিরে এলেন। (ভক্তদের প্রতি) হৃদয় মুখুজ্যেকে কালীবাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বললেন কর্তারা। দারোয়ান এসে ভুল করে ঠাকুরকে চলে যেতে বললে। অমনি তিনি চললেন, মুখে কথাটিও নাই—রাগদ্বেষ কিছুই নাই কিনা! (১৷২৪৪) [ক্রমশঃ]

শুধু তোমাকেই চাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যদি তুমি এই ভেবে থাক, 'শ্রীরামকৃষ্ণ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ' করছ বলে তোমাকে আমি সিংহাসনে বসিয়ে দেব, কালিয়া-কোপ্তা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব, এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি কিনে দেব, তোমার শরীরের যেখানে যত যান্ত্রিক গোলযোগ আছে, মাঝরাত্তিরে মেকানিক হয়ে ঢুকে সব ঠিক করে দেব, তাহলে তুমি কিন্তু বাপু মস্ত ভুল করবে।

কেন জান? তোমার প্রারব্ধ তোমারই। তোমাকেই ক্ষয় করে যেতে হবে। ঝোলায় ভরে কী এনেছ, তুমি জান না। ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে। খোদ মালিক তোমার জন্য যেমন যেমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেরকমই হবে।

তুলসীদাস বলছেন ঃ

"রাম ঝরোখে বয়েঠ কর সবকো মুজরা লে।
জ্যায়সা যাকে গকরি, অ্যায়সা উকো দে॥"

—ঐ দেখ, অনেক উঁচুতে গগনের গবাক্ষে বসে আছেন শ্রীরামচন্দ্র। দিবস-রজনী মানুষকে দেখছেন। কে কি করছে! কাজ অনুসারে পুরস্কার অথবা তিরস্কার।

কখনো কি ভেবেছ, আবার আসতে হবে? পুনঃপুনঃ গতাগতি। যেই শেষ হলো আবার শুরু। সাপলুডো। এক চালে নেমে এলে লেজে। আবার দান ফেলা। ধাপে ধাপে ওঠা। যতক্ষণ ছকে আছ, এই চলবে। ছকের বাইরে যাও, খেলা শেষ। তোমার কর্মের দিকে, তোমার মর্মের দিকে কি নজর রেখেছ! 'হাম্বা, হাম্বা' করেছ সারাটা জীবন। অহঙ্কারের একতারা বাজিয়েছ। মরণে কে তোমাকে মুক্তি দেবে! কসাই টানতে টানতে নিয়ে যাবে। কাটবে। নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে শুকোবে। তখন তুমি চড়বে গিয়ে একতারায়। বাউলের আঙুলে খেলবে। তখন বলবে 'তুঁহুঁ, তুঁহুঁ'। যদি তুমি অহং-এর খাঁচায় বসে 'তুঁহুঁ' বলতে পারতে তাহলে মরণ টপকে অমৃতের হ্রদে গিয়ে পড়তে। পুনর্জন্মের ভয় থাকত না। আর যদি আবার ফিরেও আসতে তাহলে নিত্যসিদ্ধের থাকের মানুষ হতে। সংসারের জালে পড়তে না আর।

তোমার এজীবনের সংস্কারে ভক্তি থাকতে পারে, থাকতে পারে প্রবল ঈশ্বরবিশ্বাস। তার মানে এই নয়, উত্তরোত্তর তোমার জীবন ধনে, মানে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এটা আর ওটাকে এক করে ফেললে একূল, ওকূল দুকূলই যাবে।

★

ঠাকুর তাঁর নিজের ঘরটিতে বসে আছেন। আগস্টের মাঝামাঝি। ১৮৮৩ সাল। কলকাতা তখন সরগরম। মাত্র কয়েকদিন আগে ৬৮নং বিডন স্ট্রীটে গুরমুখ রায়ের স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হলো। অভিনীত হলো গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ'। ম্যানেজার স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। বিনোদিনীর নামানুসারে 'বি-থিয়েটার' নাম হওয়ার কথা ছিল। স্টার কোম্পানির চক্রান্তে তা আর হলো না।

অন্যদিকে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অত্যন্ত তৎপর। ভৈরব ব্যানার্জী, সুরেন ব্যানার্জী ন্যাশনাল ফান্ড তৈরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। বরানগরের প্রেমচাঁদ মল্লিকের বাগানবাড়ি নেতাদের মিলনকেন্দ্র।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুরকে ঘিরে চলেছে অন্য আন্দোলন। বাইরে এক জগৎ, ভিতরে আরেক জগৎ। ঠাকুরকে ঘিরে বসে আছেন অধর সেন, বলরাম বসু, মাস্টারমশাই। বেলা প্রায় তিনটে। বর্ষাকালের ভ্যাপসা গরম। কারো গ্রাহাই নেই। ঠাকুর সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। কথায় কথায় সিংহবাহিনীর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে।

বড়বাজারে মল্লিকদের সিংহবাহিনী ঠাকুর দেখে এসেছেন। আবার চাষা-ধোপাপাড়ার জনৈক মল্লিকদের সিংহবাহিনীও ঠাকুর দেখে এসেছেন। বড়বাজারের মল্লিকদের খুব অবস্থা। আবার চাষা-ধোপাপাড়ার মল্লিকরা গরিব হয়ে গেছে। পোড়ো বাড়ি, এখানে পায়রার গু, ওখানে শেওলা, এখানে ঝুরঝুর করে বালি-সুরকি পড়ছে। বাড়ির সেই শ্রী নেই।

উভয়েই উপাসক। একজনের বৈভব উপচে পড়ছে, আরেকজনের পতন হচ্ছে।

ঠাকুর মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করছেন ঃ "আচ্ছা, এর মানে কি বল দেখি।"

মাস্টারমশাই নিরুত্তর।

ঠাকুর তখন নিজেই ব্যাখ্যা করছেন ঃ "কি জান, যার যা কর্মের ভোগ আছে, তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এসব মানতে হয়।"

কর্মফলের কথা গীতায় শ্রীভগবান এইভাবে বলছেন ঃ

"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"

(গীতা, ৮।১৯)

জীবচরাচরের জন্ম ও মৃত্যুকে বিশালের পটে স্থাপন করলেন ভগবান। তুমি কে? যেই সূর্য উঠল, তুমি বললে দিন। যেই সূর্য অস্ত গেল, বললে রাত। এ তো তোমার দিন-রাত। সেই অর্থে 'দিন-রাত' বলে কিছু নেই। অর্জুন!

তুমি স্রষ্টার দিকে তাকাও। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত জীবের দিন-রাত নয়।

মানুষের গণনায় সহস্রচতুর্যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন এবং সহস্রচতুর্যুগ পর্যন্ত তাঁর যে একটি রাত্রি—এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁর হয়েছে, তিনিই দিবারাত্রের প্রকৃত তত্ত্ববেত্তা। এইবার শোন পার্থ, ব্রহ্মার দিনাগমে অব্যক্ত কারণে এই চরাচরের আবির্ভাব, আবির্ভাব জীবগণের। আবার ব্রহ্মার রাত্রি-সমাগমে সেই অব্যক্ত নামক মূল কারণেই সবকিছুর লয়। আরও আছে পার্থ! ঐ প্রথমে যা বলেছি—"ভূতগ্রামঃ স এবায়ং" ইত্যাদি। সেই প্রাণিগণই—পূর্ব পূর্ব কল্পে যারা ছিল কর্মফলের বশে—বারে বারে আসে, ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে প্রলীন হয়। আবার ব্রহ্মার দিবাসমাগমে নিজ নিজ কর্মের ফলস্বরূপ প্রাদুর্ভূত হয়। ব্রহ্মই এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, একমাত্র কারণ।

তবে? ঠাকুর বলছেন, দুই উপাসকে দুরকম বৈষয়িক অবস্থা হলেও উপাসনার প্রভাব দেবীর মুখে ফুটেছে। "পোড়ো বাড়িতে দেখলুম যে, সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বলজ্বল করছে। আবির্ভাব মানতে হয়।"

দুটোকে জড়িয়ে ফেলো না—ধর্ম আর বিষয়। ধর্মাচরণের পাওনা অন্যরকম। অনুভূতিতে খেলা করে। তথ্য থেকে তত্ত্বে নিয়ে যায়। ভোগের সঙ্গে দুর্ভোগ আছে। দুটোর পারে যাও। তখন বাড়িও যা, পোড়ো বাড়িও তা। সম্পর্ক দেবীর সঙ্গে, সাধনার সঙ্গে। ভূমি আর ভূমা এক করে ফেলো না।

একে একে আরও অনেকে এসে গেছেন ঘরে। ঠাকুরকে ঘিরে বসেছেন সবাই। বৈঠক পরিপূর্ণ। বাইরে ভরা বিকেল। মেঘের ফাঁকফোকরে অস্তে নামা সূর্যের গোল মুখখানি। বর্ষার গঙ্গা ভরভরন্ত। ঠাকুর নিজের অভিজ্ঞতার কথা, অনুভূতির কথা বলছেন ঃ

"আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ, লালবাঁধ আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘষার প্রসাধনী) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি তো জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হলো, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ীদর্শন হলো—কোমর পর্যন্ত।"

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে ঠাকুর ধ্যানস্থ। সেই ভাবটি কেটে যেতেই ঘুরে এল ভক্তের সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ। তুমি ভক্ত বলে কেবল সুখের অধিকারী হবে—এ কেমন কথা! সুগন্ধী গরম মশলায় সব মশলাই থাকবে। কাঁঠালে রসাল কোয়ার সঙ্গে আঠাও থাকবে।

একজন কাবুলের রাজবিপ্লব ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ পাড়লেন। ইয়াকুব খাঁ সিংহাসনচ্যুত, অথচ তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, পরম ভক্তও ছিলেন। কেন এমন হলো! ভক্তের এই দুর্ভাগ্য কেন? ঠাকুর বললেন ঃ "কি জান, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিছিল। তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল।—কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

"আবার শোন, শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল।

"একজন কাঠুরে পরমভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হলো। কিন্তু কারাগার ঘুচল না। কি জান, প্রারব্ধ কর্মের ভোগ। যে কদিন ভোগ আছে, দেহধারণ করতে হয়। একজন কানা গঙ্গাস্নান করলে। পাপ সব ঘুচে গেল। কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচল না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।"

তাহলে কি পেলে! "দেহের সুখ-দুঃখ যাই হোক, ভক্তের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য থাকে, সে-ঐশ্বর্য কখনো যাবার নয়। দেখ না, পাণ্ডবদের অত বিপদ! কিন্তু এ-বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায় নাই। তাদের মতো জ্ঞানী, তাদের মতো ভক্ত কোথায়?"

শ্রীভগবান বলছেন, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিষ্কাম যজ্ঞই অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে যজ্ঞ। মন সেখানে স্থির—নিবাত, নিষ্কম্প দীপশিখা। বাসনার লেশমাত্র থাকবে না—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥"

(গীতা, ১৭।১১)

আর কোন কথা নয়। ঐ যে গজরাজের মতো ঘরে প্রবেশ করছেন নরেন্দ্রনাথ, সঙ্গে রয়েছেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর যাঁকে বলেন 'কাপ্তেন'। "নরেন এসেছিস! তাহলে গান গা।" দেওয়ালে ঝুলছিল তানপুরা। নেমে এল আসরে। বাঁয়া-তবলা সুরে বাঁধা হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ একটু পরেই ধরবেন—"সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।"□

বিজ্ঞান

প্রসাধন-প্রতিক্রিয়া

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ সুন্দরের পূজারী। নিজেকে সুন্দরভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপনে তাই তার ব্যগ্রতার শেষ নেই। প্রসাধন ব্যবহারে পুরুষ ও নারী উভয়ে আগ্রহী হলেও এজাতীয় উদ্যোগে নারীদের আগ্রহই অধিক। অভিনব প্রসাধনসম্ভার এ শতকে দেখা গেলেও প্রসাধন ও সজ্জারীতির ইতিহাস বহু প্রাচীন। অতীতে প্রসাধন-সামগ্রী তৈরি হতো প্রাকৃতিক উপাদান থেকে, আর আধুনিক প্রসাধন-উপকরণ জৈব ও অজৈব রাসায়নিক পদার্থের সমাহার। সমাজ ও শরীরের প্রয়োজনে প্রসাধনের দাবি অনস্বীকার্য, কিন্তু তার দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়োগ কতখানি স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়ক সে-সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিবন্ধে সেই আলোচনাই করব।

চুলের লোশন (স্প্রে ও ক্রীম)

চুলের বিশেষ পারিপাট্যের জন্য অধুনা 'হেয়ার-লোশন' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেলুনে, বিউটিপার্লারে, গৃহে ---সর্বত্র এই 'হেয়ার-লোশন'-এর গতিবিধি। আগে প্রসাধন ও সজ্জাবিন্যাসে তেলকেই প্রাধান্য দেওয়া হতো। বর্তমানে তার জায়গায় হেয়ার-লোশন স্থান করে নিয়েছে। হাতে করেও এই লোশন চুলে মাখা যায় আবার 'স্প্রে'ও এই লোশনকে চুলের গোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে। আগে এই হেয়ার-লোশনে ট্রাইক্লোরো মোনোফ্লুরো মিথেন ও ডাইক্লোরো ডাইফ্লুরো ইথেনের মিশ্রণ ব্যবহৃত হতো। অধুনা এর পরিবর্তে পলিভিনাইল পাইরোলিডন ও ভিনাইল পাইরোলিডন ব্যবহৃত হয়। এই হেয়ার-স্প্রে বা চুলের লোশনে সেল্যাক বা রেসিন থাকে, যা চুলকে যেমন ঔজ্জ্বল্য দেয় তেমনি তার সঠিক বিন্যাসেরও ব্যবস্থা করে। চুলের লোশনের উপাদান হিসাবে এক নমুনা পরীক্ষা করে পাওয়া গেছে---অ্যালকোহল, ইথানল, ল্যান্ট্রোল, মাইরিস্টাইল কোহল, আইসোপ্রোপাইল মাইরিসটেট, প্রোপেল্যান্ট ও সুগন্ধী দ্রব্য। চুল-পুষ্টিকারক বা 'হেয়ার-টনিক', চুলের লোশন বা স্প্রে, চুল-বিন্যাসকারক বা 'হেয়ার-কন্ডিশনার', চুলের ক্রীম প্রভৃতি দ্রব্য কেশ পারিপাট্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কিত। কেশবিন্যাসে তাদের বিশেষ ভূমিকাও অস্বীকার করার নয়। তবে এদের দীর্ঘ ব্যবহার কেবল চুলকে কর্কশই করে না, সেইসঙ্গে চুল উঠে যাওয়া, চামড়ায় ফোস্কা পড়া প্রভৃতি উপসর্গও সঙ্গী হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন রঙে ও সুগন্ধী দ্রব্যে অবস্থিত ভিনাইল ও পলিভিনাইল-যৌগ কার্সিনোজেনিক বা ক্যান্সার সৃষ্টিকারক। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, অধিকাংশ কেশপ্রসাধন দ্রব্যে ভিনাইল-যৌগ থাকে।

চুলের কলপ

কী পুরুষ, কী মহিলা সকলেই কলপের প্রতি বিশেষ আগ্রহী। তিনহাজার বছর আগেও এই কলপের ব্যবহার মানুষ জানত। তখন কলপ তৈরি হতো উদ্ভিজ্জ দ্রব্য থেকে। আর এখন তা মূলতঃ কৃত্রিম জৈবযৌগজাত। বাজারে কলপের রকমফের অনেক, তেমনি ব্যবহার-কারীদের সংখ্যাও গুণে বলা যাবে না। বাজারে চালু বিভিন্ন কলপে অস্থায়ী, আংশিক স্থায়ী ও স্থায়ী নামে ভেদরেখা থাকলেও স্থায়ী কলপেরই চাহিদা বেশি। কারণ, ঐ সমস্ত কলপ একবার চুলে লাগালে তারা অনেকদিন (প্রায় তিনমাস) স্থায়ী থাকে। প্যারাফিনাইল ডাইঅ্যামাইন, ডাইঅ্যামিনো অ্যানিসোল, টলুইন ডাই-অ্যামাইন, নাইট্রো প্যারাফিনাইল ডাইঅ্যামাইন, মেটা-ফিনাইল ডাইঅ্যামাইন, অ্যামাইনো নাইট্রোফেনল প্রভৃতি জৈবযৌগের কোন কোনটি স্থায়ী কলপের মুখ্য উপাদান হিসাবে থাকে। ঐ সমস্ত জৈবযৌগ কলপে শতকরা চার থেকে পাঁচ ভাগ হারে থাকে।

কলপে স্থায়ী কালোরও সৃষ্টিকারী জৈবযৌগগুলো সহজে মাথার চামড়া ভেদ করে চুলের গোড়ার রক্তনালীতে পৌঁছাতে পারে। তারপর তারা সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়ে একসময় কোষের ডি. এন. এ.-র অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটায় এবং তার ফলেই ব্যবহারকারীর দেহ ক্যান্সার

রোগে আক্রান্ত হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুশ আমেস দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর ঐ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আমেরিকার ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ ইঁদুরের দেহে ডাইঅ্যামাইনো অ্যানিসোল কলপ-যৌগ প্রয়োগ করে তাদের ত্বকে, থাইরয়েড গ্রন্থিতে ও লসিকাগ্রন্থিতে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করেছেন। জাপানের নারা মেডিকেল ইউনিভার্সিটির গবেষকবৃন্দ ইঁদুরের দেহে প্রয়োগ করেছেন কলপ-যৌগ টলুইন ডাইঅ্যামাইন এবং এর ফলে ইঁদুরের দেহে টিউমার সৃষ্টি হতে দেখেছেন। লন্ডনের বার্মিংহাম মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপক সি. ই. সাবনি ও ই. জে. জোন্স ইঁদুরের দেহে অস্থায়ী কলপ প্রয়োগে তাদের দেহের লসিকাতন্ত্রে ও জননতন্ত্রে টিউমারের প্রাদুর্ভাব দেখেছেন। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকেই বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্য হলো যে, কলপের অ্যামাইন-যৌগ ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। কাজেই ঐ সমস্ত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত কলপের প্যাকেট বা শিশির গায়ে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ থাকা আবশ্যক—"কলপ ক্যান্সার সৃষ্টি করে।"

আমেরিকার এপিডিমিওলজিক্যাল সংস্থার ডাইরেক্টর জে. উইস্টার মিগস জানিয়েছেন, আমেরিকায় ক্যান্সার-আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭২ জন প্রসাধন ব্যবহারকারী এবং তাদের বেশির ভাগই হলো হেয়ার-ড্রেসার, হেয়ার-কন্ডিশনার, বিউটিসিয়ান, হেয়ার-কাটার প্রমুখ। নিউ ইয়র্কের মাউন্ট সিনাই মেডিকেল সেন্টারের গবেষকদের এক সমীক্ষা-মতে, সেখানে স্তন-ক্যানসারে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৮৭ জন কলপ ব্যবহারকারিণী এবং তারা বিগত পাঁচবছর ধরে টানা কলপ ব্যবহার করে আসছে। ইউনাইটেড নেশন্স কসমেটিক্স, টয়লেট্রী ও ফ্রাগ্রান্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সমীক্ষার মতে, কোন মহিলা একটানা চারবছর কলপ ব্যবহার করলে তার দেহে কলপের বিষাক্ত অ্যামাইন-যৌগ তার দেহের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে ৪৮ মিলিগ্রাম জমতে পারে, যা সহজেই মারাত্মক বিষক্রিয়া বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই রূপসজ্জার উপকরণ হিসাবে কলপের প্রয়োজন থাকলেও তাকে নিত্যসঙ্গী করা কী বিপজ্জনক তা সহজেই অনুমেয়।

বডি-লোশন বা কসমেটিক পেস্ট

রূপচর্চার অন্যতম উপাদান হলো বডি-লোশন। এর মধ্যে পড়ে আফটারশেভ, স্কিনকেয়ার, কোল্ডক্রিম প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রসাধনদ্রব্যের অন্যতম উল্লেখ্য যৌগটি হলো ইথানল অ্যামিন। ঐ যৌগটি ইঁদুরের দেহে প্রয়োগ করে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। মানবদেহেও এর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। সুতরাং প্রসাধনদ্রব্যে ঐ পদার্থের মাত্রা বেশি থাকলে ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হবে।

বডি-লোশন বা কসমেটিক পেস্ট ফ্যাটে দ্রবণীয় হওয়ায় এর মধ্যে বহু ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া জীবাণুর অবস্থান সম্ভব। বিজ্ঞানী হারবোল্ড প্রসাধনদ্রব্য থেকে এরূপ বহু জীবাণু শনাক্ত করেছেন। প্রসাধনদ্রব্যে স্বচ্ছন্দে বিরাজমান ছত্রাক জীবাণুদের মধ্যে অ্যাস্পারজিলাস, ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম, রাইজোপাস, ট্রাইকোথেসিয়াম প্রভৃতি এবং ব্যাক্টেরিয়া জীবাণু হিসাবে অ্যাক্রোমোব্যাক্টার, এরোব্যাক্টার, মাইক্রোকক্কাস, সিউডোমোনাস, মেটাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি উল্লেখ্য। এই সমস্ত জীবাণু পেস্ট-প্রসাধনে বংশবিস্তার করে নিরাপদে। ফলে মানুষের দেহে প্রসাধন-প্রলেপের মাধ্যমে কোন কোন জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। সেই কারণে প্রসাধনসম্ভার প্রস্তুতিকরণে স্টেরিলাইজ করার বা জীবাণুমুক্ত করার বিধান আছে। কিন্তু সব প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুতকারকরা ঐ নিয়মরীতি অনুসরণ করে না। ফলে বিপত্তি অব্যাহতই থাকে। সেই কারণে ঐ সমস্ত দ্রব্য-ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তরল প্রসাধনদ্রব্যে লক্ষ্য রাখা উচিত—সেগুলো যথার্থই জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে কিনা।

লিপস্টিক

ঠোঁটে লাগানো এই প্রসাধনসামগ্রীতে থাকে তেল ও মোম। লিপস্টিকে তৈলদ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে ক্যাস্টর অয়েল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্যারাফিন তেল বা সিলিকন তেল থাকে। মোম লিপস্টিকের বিশেষ উপাদান। এর মধ্যে মৌ-মোম, প্যারাফিন, কারনুবা মোম এই প্রসাধনে ব্যবহৃত হয়। এগুলির বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিও ক্রেতাদের বিশেষ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। লিপস্টিকের বর্ণবাহারের কারণ হলো ব্রোমো অ্যাসিড ও অন্যান্য পিগমেন্টস বা রঞ্জককণা। যেসমস্ত লিপস্টিকে ব্রোমো অ্যাসিড থাকে সেগুলির রঙ অল্পস্থায়ী, যাতে রঞ্জককণা থাকে সেগুলির রঙ দীর্ঘস্থায়ী। রঙের সঙ্গে ঠোঁটকে উজ্জ্বল রাখতে লিপস্টিকের উপাদানে গোয়ানিন কেলাস, বিসমাথ অক্সিক্লোরাইড, মাইকা ও টাইটেনাম ডাই-

অক্সাইড মেশানো হয়। লিপস্টিকে চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকায় এতে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই অসুবিধা দূর করতে এর সঙ্গে মেশানো হয় বিভিন্ন সুগন্ধী দ্রব্য। ঠোঁটের ত্বক খুব পাতলা হওয়ায় তার মধ্যে যেকোন জলে দ্রবণীয় পদার্থ সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অনেকের দেহে তাই লিপস্টিক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে। এদের জন্য অনেকেই অ্যালার্জির শিকার হয়। এদের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে অনেকের ত্বকেই দেখা দেয় ঘা। মাথাধরা, চুলকানি জাতীয় প্রতিক্রিয়াও এদের প্রভাবজাত ফল।

কাজল

'কাজলনয়না হরিণী' হতে বহু রমণীই অভিলাষী। আর সেই উদ্যোগেই চোখের পাতায়, ভ্রূতে মেয়েরা কাজল ব্যবহার করে। কেবল কালোরঙই নয়, নীল, সবুজ, বেগুনী—এমন বহু রঙই নয়নসজ্জার উপকরণ হিসাবে অধুনা বহুল ব্যবহৃত। কাজল ছাড়া 'মাস্কারা'ও একটি চক্ষু-প্রসাধনী। চক্ষু-প্রসাধনী সাধারণতঃ কালো বা কালচে বাদামী বর্ণের হয়। এর মধ্যে থাকে লোহা, ক্রোমিয়াম অক্সাইড, কার্মিন, পেট্রোলেটাম, ল্যানোলিন, সেরিসিন, প্রোপাইলিন গ্লাইকল, মিথাইল সেলুলোজ প্রভৃতি।

চোখের সংবেদনক্ষমতা তর্কাতীত। ঐরকম জায়গায় ঐ সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপক প্রয়োগ চোখের বহুবিধ অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে। এর দীর্ঘ প্রয়োগে চোখজ্বালা করা, চোখ দিয়ে জলপড়া, চোখ লাল হয়ে থাকা, দৃষ্টি হ্রাস প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

পাউডার

গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহে স্বেদসিক্ত ত্বকের অস্বস্তি পরিহারে পাউডারের ব্যবহার বহু প্রচলিত। পাউডার হচ্ছে সূক্ষ্মদানার এক প্রসাধনসামগ্রী। গায়ে ঘামাচি বা চর্মরোগের ক্ষেত্রে মেডিকেটেড পাউডারের প্রয়োগবিধি আছে। আর সেই পাউডারের সূত্র ধরে আসে ফেস-পাউডারের কথা। বডি-পাউডার ও ফেস-পাউডারকে একই পর্যায়ে ফেলা ঠিক নয়। সাধারণ পাউডার বা বডি-পাউডার পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই ব্যবহার করে থাকে এবং গ্রীষ্মকালই হলো তাদের ব্যবহারের উৎকৃষ্ট সময়। অপরদিকে ফেস-পাউডারের ব্যবহার মেয়েদের মধ্যে প্রায় একচেটিয়া। ফেস-পাউডারে থাকে শতকরা ১৫ ভাগ কেয়োলিন (ক্যালসিয়াম কার্বনেট), ১৫ ভাগ জিঙ্ক অক্সাইড, ৫ ভাগ জিঙ্ক স্টিয়ারেট, ৫ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট এবং ৫০ ভাগ ট্যাল্ক (ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট)। এই উপাদান সাধারণ পাউডারে থাকলেও জমানো ফেস-পাউডারে টাইটেনিয়াম অক্সাইড ও চালের গুঁড়ো মেশানো থাকে। বডি-পাউডারে যে স্বেদনিরোধক ও জীবাণু-প্রতিরোধক দ্রব্য থাকে ফেস-পাউডারে তা থাকে না। ফলে ঐ পাউডার যত না শরীর সুরক্ষায় প্রযুক্ত, তার বহুগুণ রূপসজ্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

যেহেতু পাউডার জটিল রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ, তাই তাদের নিত্যব্যবহার চামড়ার ওপর স্তরকে পাতলা করে। পাউডারে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য ত্বকে সঞ্চিত হলে ত্বক বিবর্ণ হয়ে যায়। ত্বকের প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায়। ফেস-পাউডারের ব্যবহার এমন একটি অভ্যাসে দাঁড়ায় যে, পরিণত বয়সেও ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারিণীরা ফেস-পাউডার ছাড়া জনসমক্ষে হাজির হতে লজ্জা বোধ করে। ফেস-পাউডারের ভিত্তিদ্রব্য কেওলিন ও ট্যাল্ক-এর প্রতিক্রিয়াজনিত ব্যাধিকে টেল্কোসিস নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

উপসংহার

প্রসাধনসামগ্রী সভ্যতার অনিবার্য উপাদান হলেও তার প্রতিক্রিয়া কোন অংশে নগণ্য নয়। কম দামী প্রসাধন-সামগ্রীতে অনেক সময় উপাদানসমূহের মাত্রা ঠিক থাকে না। ফলে অসমবণ্টনজনিত উপাদানের ক্ষয়জাত প্রতিক্রিয়ার শিকার হতে হয় ব্যবহারকারীদের। অধিকাংশ প্রসাধনদ্রব্য যেসব সুগন্ধী দ্রব্যের সংমিশ্রণ সেই সুগন্ধী দ্রব্যও বহুবিধ রোগের সৃষ্টিকারী। প্রসাধনসামগ্রীর উপাদানসম্ভার জীবাণুদের আকর্ষণ করে। সেকারণে প্রসাধনদ্রব্যের স্টেরিলাইজেশন বাধ্যতামূলক। প্রসাধন-সামগ্রীকে বাজারে বের করার পূর্বে অবশ্যই তা সরকারি বিধি অনুযায়ী (ভারতীয় ওষুধ ও প্রসাধন ধারা, ১৯৬২) পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি প্রয়োজন বিজ্ঞান-মনস্কতার অধিকারী হওয়া অর্থাৎ জানা যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত প্রসাধনদ্রব্যকে নিত্যসঙ্গী করা উচিত নয়। কারণ, প্রসাধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব রাসায়নিক দ্রব্যই দেহ-সুরক্ষক নয়।□

মনের ঐশ্বর্য

শান্তি সিংহ

পত্রাবলী—গোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক : এইচ. রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট (ত্রিতল), কলকাতা-৭০০ ০০১। পৃষ্ঠা : ৬+১৮৪+২। মূল্য : ৪৫ টাকা।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ সাধু-বিদ্বৎসমাজে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস এবং কাশীধামে সুদীর্ঘকাল জ্ঞানচর্চায় নিরত থাকাই তাঁর জীবনের বড় পরিচয় নয়—তিনি ছিলেন অধ্যাত্মজগতের বিশিষ্ট দিশারী, অন্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতিমালায় ঐশ্বর্যবান।

সেই অধ্যাত্মঋদ্ধ মহাপুরুষের কাছে নানা সময় নানা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু মানুষ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ-অনুধাবনে আসার প্রেক্ষিতে বেশকিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি-বিচ্ছুরিত পত্রাবলী রচিত হয়, তারই মহার্ঘ সঙ্কলন আলোচ্য গ্রন্থটি। প্রাক্‌কথনে অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেছেন : "অধ্যাত্মজগতের নানা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতির মণিমাণিক্যকে একজন নিপুণ জহুরীর কাছে যাচাই করিয়া লইবার জন্য সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা কেহ সিদ্ধ মহাপুরুষ, কেহ-বা পরম জ্ঞানী বা ভক্ত, কেহ-বা প্রবর্তক সাধক।"

গ্রন্থে পত্রসংখ্যা ৮২। অধিকাংশ পত্র ১৯৪৪-১৯৪৫ সালে লেখা। পরবর্তী কালের কিছু পত্রও গ্রন্থে সংযোজিত। মহামহোপাধ্যায় আপন ভাষায় অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন, তবু কোন কোন পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মভাবনা-বিশ্লেষণের অনুরণন স্পষ্ট। ৭৬নং পত্রে গোপীনাথ কবিরাজ লিখেছেন : "সুফী সাধনায় প্রেমের স্থান খুব উচ্চে।... মানুষই প্রেমের বলে উন্নীত হইয়া ভগবত্তা লাভ করে।" স্বামীজী 'পরাভক্তি' প্রসঙ্গে উক্ত ভাবনাকে সুবিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—এ তথ্য অনেকেরই জানা। ১৪৩ পাতায়, ৬৭নং পত্রের শেষে কবিরাজ মহাশয় একটি বাঙলা কবিতার লাইন স্মৃতিসূত্রে উদ্ধৃত করেছেন—"মক্ষিকাও মরে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।" মধুকবির উদ্ধৃতিটি—'মরে না গো' নয়, 'গলে না গো' হবে। সম্পাদনা-কর্মে, অন্ততঃ পাদটীকায় এ তথ্য থাকলে ভাল হতো। তাছাড়া তিনি ৮২টি পত্র কাকে, কী সূত্রে লিখেছেন—তার উৎসনির্দেশ পরিবেশন করা অন্ততঃ অনুসন্ধিৎসু গবেষকচিত্তের জন্য থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। তাতে সঙ্কলনটির 'প্রামাণিকতা' আরও বৃদ্ধি পেত। যদিও 'প্রাক্‌কথনে' নিবেদিত হয়েছে : "যাঁহাদের উদ্দেশ্যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল, আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের নাম প্রকাশ করি নাই; কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন পরলোকগত, অনেকে সিদ্ধ আচার্য বা গুরুপদে অধিষ্ঠিত, অনেকে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁহারা যে-ভূমিতে থাকিয়া এসব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখন হয়তো অনেকে সে-সব ভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ-ভূমিগুলি চিরন্তন, সনাতন।"

গ্রন্থটির প্রকাশনমান শোভন। তবে পরবর্তী সংস্করণে ১১৩ পাতায় 'ন্যূনতা', ১৪৪ পাতায় 'উর্ধ্ব' ইত্যাদি মুদ্রণ প্রমাদ-রহিত হলে ভাল হয়।

পুণ্যতীর্থের অমেয় বাণী

তাপস বসু

কাশীর সারস্বত সাধনা—গোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক : এইচ. রায়চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট (ত্রিতল), কলকাতা-৭০০ ০০১। পৃষ্ঠা : ১৬+১২৮। মূল্য : ৩৫ টাকা।

পুণ্যতীর্থ 'কাশী' নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতবাসীর আত্মায় এক অতিরিক্ত স্পন্দন অনুরণিত হয়ে যায়। প্রাচীন এই তীর্থনগরীর অপর নাম 'বারাণসী'। দুই নদী 'বরুণা' আর 'অসি' এসে মিলেছে এই মহানগরীর পাদপীঠে, তাই নাম 'বারাণসী'। পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে অবস্থিত শিবক্ষেত্র এই বারাণসী শুধু বার্ধক্যের শেষ ঠাঁই নয়; এই প্রাচীন নগরীর ইতিহাসে ধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সারস্বত সাধনাও। একসময়ে সংস্কৃতচর্চার পীঠস্থান ছিল বারাণসী। এখনো ভারতের অন্যতম সংস্কৃত

মহাবিদ্যালয়টি এই শহরেই অবস্থিত। 'কাশী' নিয়ে ইংরেজী ও বাঙলায় বহু প্রবন্ধ, গ্রন্থ লেখা হয়েছে। হ্যাভেল সাহেব, যিনি নিবেদিতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন, বারাণসী নিয়ে ইংরেজীতে চমৎকার গ্রন্থ লিখেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটিও এই রচনাধারায় এক উজ্জ্বল সংযোজন। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তিনি গ্রন্থরচনার জন্য এমন আকর্ষণীয় বিষয় নির্বাচন করেছেন যা আমাদের পুণ্যতীর্থ কাশী সম্পর্কে আরও বিশেষভাবে আগ্রহী করে তোলে।

বিশিষ্ট সংস্কৃতবেত্তা পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ কাশীর সুপ্রাচীন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি কাশীর সারস্বত সাধনা অর্থাৎ সংস্কৃতচর্চার দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসকল বিদগ্ধ পণ্ডিত নিরলসভাবে সংস্কৃতচর্চা করেছেন তিনি তাঁদের জীবন এবং সাধনা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থে ছয়শ বছরের সারস্বত সাধনায় ব্রতী ১৫২ জন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞের ওপর ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ গবেষণা করেছেন। কিন্তু এই গবেষণাকে তিনি পূর্ণাঙ্গ বলে অভিহিত করেননি। উত্তরকালের গবেষকরা এই বিষয়ে গবেষণার জন্য এগিয়ে আসুক—এটিই ছিল তাঁর আন্তরিক আহ্বান। তিনি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "আমি তো ১৩শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত কাশীর সংস্কৃত সাহিত্যে সাধকদের বিবরণ উপস্থিত করেছি। এটি একটি দিগ্‌দর্শন ভিন্ন অন্য কিছু নয়, এর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যে-কালে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তারই ওপর ভিত্তি করে গ্রন্থ রচিত হয়েছে।... আজ ৬০।৭০ বছর পর আরও কত নতুন তথ্য জানার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু উৎসাহী গবেষক এদিকে অগ্রসর হলে অজ্ঞাত বিষয় আরও জানা যেত।"

আমরা আশা করব, পরা ও অপরা বিদ্যার পীঠস্থান কাশীকে কেন্দ্র করে পূর্ণায়ত সারস্বত সাধনা নিয়ে গবেষণার জন্য একালের গবেষকরা এগিয়ে আসবেন; তাঁরা বৌদ্ধসাহিত্য (পালি ও সংস্কৃত), জৈনসাহিত্য (প্রাকৃত ও সংস্কৃত), পুরাণ ও ইতিহাস, শিলালেখাদি ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে কাশী তথা বারাণসীর অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত রূপটি বিস্তৃত পরিসরে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের এই গ্রন্থটি সেই বড় মাপের গবেষণারই প্রবেশদ্বার। এই দ্বার উন্মোচন করে ডঃ কবিরাজ এক অসাধারণ নিষ্ঠা ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চকেদার দর্শন

কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্তি নগাধিরাজঃ (পঞ্চকেদার পর্ব)—দেবিদাস দত্ত। প্রকাশিকা: নমিতা দত্ত, ২।এ।১ ব্যানার্জীপাড়া স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, জেলা—হুগলী। পৃষ্ঠা: ১৭৮+২২। মূল্য: ৬০ টাকা।

যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের কাছে এক অদম্য আকর্ষণের স্থান হিমালয়। পর্বতারোহণের কষ্ট, তার ওপর বিপদ পদে পদে, তবুও হিমালয়ের অনিবার্য আকর্ষণের কাছে সবকিছুই হার মানে। এই আকর্ষণের কারণ অনেকগুলি, তবে তাদের মধ্যে মুখ্য কারণ প্রশ্নাতীত-ভাবে আধ্যাত্মিকতা। এহেন হিমালয়ের ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করে দেবাদিদেবের লীলাক্ষেত্র হিমালয়ের আপেক্ষিকভাবে দুর্গম পঞ্চকেদার পরিক্রমার বিবরণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে 'অস্তি নগাধিরাজঃ' গ্রন্থটিতে। পঞ্চকেদার ভ্রমণ-বিবরণ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ আছে, কিন্তু বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বর্ণনার বৈচিত্র্যে স্থানগুলি যেন আমাদের চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক দেবিদাস দত্ত তাঁর সাবলীল স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় পঞ্চকেদার-যাত্রার প্রতিটি দিনের ঘটনাবলীর একটি অতি সুন্দর বিবরণ আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। দিনপঞ্জীর আকারে গ্রথিত এই ভ্রমণবৃত্তান্তে যাত্রাপথের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পরিবেশিত হয়েছে মন্দিরগুলির অবস্থান, মন্দির-অভ্যন্তরের বিবরণ, বিগ্রহগুলির অবস্থান এবং আলোচিত হয়েছে স্থান ও মন্দিরের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লেখক এই ভ্রমণকাহিনী পরিবেশন করেছেন এক ধর্মাকাঙ্ক্ষী তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিতে। ফলে হিমালয়ের আধ্যাত্মিক মহিমা দর্শন ও শ্রবণে যাঁরা অভিভূত হন, তাঁরা এই বইটি পড়ে অধ্যাত্ম রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন। বিভিন্ন স্থানে পরিচিত গাড়োয়ালবাসীদের জীবনযাত্রা, পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনাগুলি বইটিকে আরও সুখপাঠ্য করেছে।

বইটির ছাপাই ও বাঁধাই বেশ ভাল। পঞ্চকেদার অঞ্চলের একটি বিশদ ম্যাপের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। প্রুফ-সংশোধনের ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি থেকে গেছে।

বইখানি পাঠ করলে অনেকেই হিমালয়-ভ্রমণে উৎসাহী হবেন আশা করা যায় কিংবা যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তাঁরা বইটি পড়ে হিমালয়-ভ্রমণের আস্বাদ পাবেন।□

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

হাওড়া রেলস্টেশনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্তপ্রচার-কেন্দ্র

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনদায়ী বাণী ও উপদেশ সকলের কাছে সহজে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম প্রধান ইংরেজী প্রকাশন সংস্থা **অদ্বৈত আশ্রম** (৫ ডিহি এন্টালী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪) **হাওড়া সাউথ প্ল্যাটফর্ম নং ২১-এ** চলতি বছরের প্রথমে একটি এবং **হাওড়া মেইন প্ল্যাটফর্ম নং ৮-এর** সামনে গত ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ আরেকটি সাহিত্যপ্রচার পরিষেবা-কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই দুই কেন্দ্র থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ইংরেজী ও বাঙলা মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'উদ্বোধন' সহ অদ্বৈত আশ্রম, উদ্বোধন কার্যালয় ও মঠ-মিশনের অন্যান্য প্রকাশন সংস্থা প্রকাশিত যাবতীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অধ্যাত্ম-সাহিত্য পাওয়া যাবে। প্ল্যাটফর্ম নং ২১-এর পরিষেবা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যথাক্রমে অছি পরিষদ ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী মুমুক্ষানন্দজী। প্ল্যাটফর্ম নং ৮-এর পরিষেবা-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন হাওড়া ডিভিসনের ডিভিসনাল ম্যানেজার জয়ন্ত রায়। প্রসঙ্গতঃ, **শিয়ালদহ (উত্তর) স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ৪-এর** সামনে অদ্বৈত আশ্রম আরেকটি পরিষেবা-কেন্দ্র খুব শীঘ্রই স্থাপন করবে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমে (গুজরাট) গত ৪ সেপ্টেম্বর '৯৬ স্বামীজীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ঐদিন তিনি **লিমডি রামকৃষ্ণ মিশনের** নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়টিরও শুভ উদ্বোধন করেন।

নেত্রমপল্লী মঠ (তামিলনাড়ু) গত ২১ আগস্ট ৮০টি বিদ্যালয়ের মোট ৬৪৮ জন গরিব ছাত্রদের মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম এবং কাগজ-কলমাদি বিতরণ করেছে।

জামতাড়া মঠ (বিহার) গত ১৩-১৮ সেপ্টেম্বর '৯৬ ছয়দিন ধরে নেতৃত্ব শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৪৫ জন আদিবাসী যুবক যোগদান করেছিল।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর **ভুবনেশ্বর মঠের (উড়িষ্যা)** নবনির্মিত সংযোজিত রন্ধনশালা ও অফিস বিল্ডিঙের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। গত ২২ তারিখে সারাদিনব্যাপী ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করে।

পুরী মঠ (উড়িষ্যা) গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১২টি সেলাইকল এবং ১২৫টি স্কুল ইউনিফর্ম গরিব ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশনের (ত্রিপুরা) ধলেশ্বরে নতুন চিকিৎসাকেন্দ্রটি গত ১১ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। ত্রিপুরার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিংহ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার মিশনের একটি সাহিত্য-পরিষেবাকেন্দ্রও উদ্বোধন করেন। ত্রিপুরার অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব

আলং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (অরুণাচল প্রদেশ) দুজন ছাত্র কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ১৯৯৬ খ্রীস্টাব্দের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম স্থান এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করেছে। বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র রাজ্য সায়েন্স সেমিনারে ২য় স্থান অধিকার করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ) ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. অনার্স পরীক্ষায় রসায়নবিদ্যায় ৭ম ও ১০ম স্থান, পদার্থবিদ্যায় ৭ম স্থান এবং গণিতে ১ম, ৬ষ্ঠ (২ জন) ও ৭ম স্থান অধিকার করেছে।

মেদিনীপুর আশ্রম বিদ্যালয়ের (পশ্চিমবঙ্গ) শিক্ষক হরিসাধন দাস ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার হাত থেকে 'জাতীয় পুরস্কার' হিসেবে একটি রৌপ্য পদক এবং নগদ ১০,০০০ টাকা লাভ করেছেন। বিদ্যালয়টিও জেলার সকল বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য ২৫ আগস্ট '৯৬ 'মেধা পুরস্কার'-এ পুরস্কৃত হয়েছে।

মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তামিলনাড়ু রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছেন। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে একটি পদক এবং নগদ ১,০০০ টাকা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন।

নারায়ণপুর মিশন আশ্রম (মধ্যপ্রদেশ) গত ৮ সেপ্টেম্বর '৯৬ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবায় উৎকর্মতার জন্য মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল সি. সুব্রহ্মনিয়ামের কাছ থেকে 'ভগবান মহাবীর ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছে। পুরস্কারটির মূল্য ৫ লক্ষ টাকা।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রম ২০টি গ্রামের (ইংলিশবাজার, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি) ১২,৪১৪ জন বন্যাপীড়িত মানুষকে ২১ দিন ধরে রান্না করা খাবার বিতরণ করেছে। এছাড়া এই আশ্রমের মাধ্যমে ২৫০ কিলোঃ ভাঙা বিস্কুট, ১২৫ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ, ৬২,০০০ জলশোধক বড়ি, ৭৫০টি রিহাইড্রেশন লবণাক্ত বড়ি এবং ১৫০

কিলোঃ ব্লীচিং পাউডার বিতরণ করা হয়েছে। বেলুড় মঠ থেকে আরও বহুসংখ্যক বস্ত্রাদি ও লণ্ঠন প্রেরণ করা হয়েছে।

ইছাপুর মঠের (হুগলী) মাধ্যমে ১০ দিন যাবৎ খানাকুল ১নং ব্লকের ৯০০০ জলবন্দী মানুষকে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বহু পোশাক-পরিচ্ছদ, শীতবস্ত্রাদিও বিতরণ করা হয়েছে।

রাজস্থান বন্যাত্রাণ

জয়পুর আশ্রম ১৩৭টি বন্যাকবলিত পরিবারকে তুলোর কম্বল বিতরণ করেছে এবং ভরতপুর অঞ্চলে ত্রাণের জন্য বেলুড় মঠ থেকেও বহু সংখ্যক শাড়ি, ধুতি প্রভৃতি প্রেরিত হয়েছে।

খেতড়ি আশ্রম খেতড়ি, জসরপুর, নলপুর গ্রামে ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৮৫টি পরিবারকে ২০ কুইণ্টাল গম বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

লাতুরে পুনর্বাসনের পর 'বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে এ মাসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গৃহীত হয়েছে। উচ্চমানের ধান, ডাল ও সবজির বীজ বপন, বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষরোপণ, নারীশিক্ষণ শিবির পরিচালন, ধোঁয়াশূন্য চুল্লী প্রস্তুতকরণ, শিশুদের উদ্যান পরিচর্যা, প্রার্থনা, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে গ্রামোন্নয়নমূলক কার্যসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে।

দন্তচিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ গত ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর দুদিন ধরে দন্তচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ১৪৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (আমেরিকা)ঃ সেপ্টেম্বর মাসের তিনটি রবিবার ও দুটি বুধবার বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ২৮ তারিখ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচনা করেছেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ। অক্টোবর মাসেও প্রতি বুধবার ও রবিবার ধর্মপ্রসঙ্গ এবং প্রতি শনিবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের সম্বন্ধে আলোচনা ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন (সিয়াটল, আমেরিকা)ঃ আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দের পরিচালনায় অক্টোবর মাসের রবিবার ও মঙ্গলবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ১৯ ও ২০ তারিখ আশ্রমে সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এবং ২১ তারিখ বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেণ্ট লুইস (আমেরিকা)ঃ অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সদানন্দ যোগীন্দ্রের 'বেদান্তসার' এবং বৃহস্পতিবার 'দ্য গস্পেল অব হোলি মাদার' পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড (আমেরিকা)ঃ অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং সান্ধ্য অধিবেশনে 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি এবং পটে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি মাসের ন্যায় এ মাসেও আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরণ্টো (কানাডা)ঃ অক্টোবর মাসের প্রতি রবিবার সকালে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা এবং শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন ছাড়াও কঠ-উপনিষদ্ ও স্বামীজীর পত্রাবলী থেকে পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

দেহত্যাগ

স্বামী সখ্যানন্দ (রাম বর্মা) গত ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় ত্রিচুর আশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি একবছর যাবৎ শয্যাগত ছিলেন। বহুমূত্র রোগের বৃদ্ধিতে তাঁর দেহাবসান ঘটে। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করার পর ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ত্রিচুর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। প্রয়াত স্বামীজী দীর্ঘদিন ত্রিচুর আশ্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করার পর অবসরগ্রহণ করে ত্রিচুর আশ্রমের উপকেন্দ্র পুনকুন্নামে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেন। মালয়ালম ভাষায় লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন তিনি। সরল, অনাড়ম্বর, আত্মপ্রশংসা-বিমুখ এবং সুমিষ্ট ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের কাছে শ্রদ্ধার্হ ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপনঃ গত ৬ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা করেছেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

বস্ত্র-বিতরণঃ গত ১২ অক্টোবর মহালয়ার দিন সকালে স্থানীয় দুঃস্থ ২০৯ জন বালক ও ১৯৩ জন বালিকার মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাঃ গত ২০ অক্টোবর মহাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক পাঠ যথারীতি চলছে।☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (ঘাটাল, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২০-২১ এপ্রিল '৯৬ দুদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন বিকেলে শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, মায়ের কথা ও লীলাপ্রসঙ্গ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী হরিদেবানন্দ। দ্বিতীয়দিন সকালে বৈদিক স্তোত্রপাঠ এবং বিকেলে ধর্মসভা আয়োজিত হয়। তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অকল্মষানন্দের পৌরোহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন জলপাইগুড়ি আশ্রমের স্বামী ত্রিপাদানন্দ এবং স্বামীজীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের স্বামী বলভদ্রানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক কমলকুমার মান্না। সভান্তে 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতৃদর্শন' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন তমলুকের 'গৈরিক' গোষ্ঠী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (ধুবড়ি, অসম) গত ১৯-২১ এপ্রিল '৯৬ তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালন করে। প্রথমদিন স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় কথামৃতপাঠ ও ধর্মপ্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রসঙ্গ করেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ এবং গুয়াহাটী আশ্রমের স্বামী দ্বিজেন্দ্রানন্দ। দ্বিতীয়দিন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বামীজীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে প্রবন্ধরচনা প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, স্বামী বিদ্যাব্রতানন্দ এবং স্বামী দ্বিজেন্দ্রানন্দ। তৃতীয়দিন সকালে আয়োজিত হয় নগর-পরিক্রমা, মায়ের কথা পাঠ ও আলোচনা এবং অসমে প্রচলিত নাম-সঙ্কীর্তন। দুপুরে প্রায় ৪০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সভান্তে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মহেশতলা, জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৯-২১ এপ্রিল '৯৬ তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবোৎসব পালিত হয়। প্রথমদিন সন্ধ্যায় 'সাধনপথে শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয়দিন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় যুবসম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী খদ্ধানন্দ। ভাষণদান করেন স্বামী সর্বময়ানন্দ, অধ্যাপক চন্দ্রশেখর দেবনাথ, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা। স্থানীয় স্কুল, কলেজ থেকে প্রায় ৫০০ যুবপ্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করে। ইনস্টিটিউট অব কালচারের পক্ষ থেকে সমাগত সকল প্রতিনিধিকে স্বামীজী সম্পর্কীয় দুটি বই ও স্বামীজীর ফটো উপহার দেওয়া হয়। তৃতীয়দিন সকালে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ পথ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৭০০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমের অধ্যক্ষ স্বামী অমলানন্দ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এ. কে. নায়েক। সভার সমাপনান্তে পরিবেশিত হয় বেতার ও দূরদর্শন-শিল্পী নবীন কয়াল ও সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

রামকৃষ্ণ সারদা সংঘ (সীতারামপুর, জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ এপ্রিল '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি। বিকেলে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তব্য রাখেন জয়দেব মুখার্জী এবং তারাপদ চৌধুরী, সভাপতিত্ব করেন আসানসোল আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গিরিশানন্দ।

স্বামী নির্বাণানন্দ স্মরণ সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে (বালি, হাওড়া) গত ২৮ এপ্রিল '৯৬ অনুষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন। আলোচনার বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ'। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। আলোচনা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ এবং স্বামী বলভদ্রানন্দ। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে ভবতোষ দত্ত ও পরিতোষ পাল। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সমিতির পক্ষ থেকে শিকড়াকুলীন গ্রাম ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে ৫০,০০০ টাকা, ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠে ২০,০০০ টাকা এবং বেলুড় মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সংঘ (পুইনান, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮-২৯ এপ্রিল '৯৬ দুদিনব্যাপী সংঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল প্রভাতফেরী, পাঠ, আলোচনা, জপ-ধ্যান, সমবেত ভজন, প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ। প্রথমদিন সকালে সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বিকেলে মায়ের কথা আলোচিত হয়। তারপর 'যত মত তত পথ' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন হাওড়ার 'অভিনন্দন' গোষ্ঠী। দ্বিতীয়দিন বৈকালিক ধর্মসভায় বেলুড় সারদাপীঠের সন্ন্যাসী স্বামী সনাতনানন্দ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সমর মণ্ডল।

পরে কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কার এবং ১৪৭ জন দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন প্রায় ১০০ নরনারায়ণকে সেবা করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে (কাসুন্দিয়া, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৪-৫ মে '৯৬ দুদিন ধরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব ও স্বামীজীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন বিকেলে দমদম বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণার সভানেতৃত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে বক্তৃতা করেন সারদা মঠের প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা। সভারম্ভের পূর্বে বৈদিক শান্তিমন্ত্র ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। স্বাগত ভাষণ দান করেন ডঃ নিমাইসাধন বসু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। দ্বিতীয়দিন সকালে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর বৈদিক স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে ৮½ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট স্বামীজীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় সাধুসেবা। বিকেলে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন আঁটপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ, স্বামী সনাতনানন্দ এবং স্বামী যোগস্বরূপানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিত ঘোষ ও অন্যান্যেরা। স্বাগত ভাষণ দেন ডঃ নিমাইসাধন বসু এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিমলকুমার ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ (জেলা—হাওড়া) গত ৯ মে '৯৬ সংঘের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভা পরিচালনা করেন পরিমলকান্তি দাস এবং অংশগ্রহণ করেন শঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা। আলোচনান্তে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করেন তরুণকুমার সরকার ও মানস বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (প্রাচীন মায়াপুর, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) : গত ১২ মে '৯৬ উদ্বোধনী উৎসব পালন করে। উৎসবে দাতব্য চিকিৎসালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রহড়া কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সঞ্চিতা দাস, কাউন্সিলার অমরেন্দ্রনাথ বাগচী ও ডাঃ টি. কে. চ্যাটার্জী। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী বহু ভক্তের সহযোগিতায় উৎসবটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বীরনগর, জেলা—নদীয়া) গত ১২ মে ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ তাপস বসু। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিমলকান্তি দাস। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে 'যুবজীবনের চরিত্রগঠনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত ভাষণ ও সমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কৃপানন্দ।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সংঘে (কলকাতা-৪২) গত ১৬ মে '৯৬ ফলহারিণী কালীপূজা উপলক্ষে সন্ধ্যায় 'শ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা ও অনন্যতা' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ তাপস বসু এবং এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর। আলোচনা সমাপনান্তে বিভিন্ন শিল্পী কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

রায়চক বিবেকানন্দ পাঠচক্রের (সজিনাগাছি, জেলা—মেদিনীপুর) উদ্যোগে মানুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১৯ মে বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের পরিচালনায় যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে স্বামীজীর জীবন ও বাণী, যুবমহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং চরিত্রগঠনে ব্যবহারিক পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ, বালিতাড়া যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক রঞ্জিতকুমার ঘোষ, হাসিমপুর বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক নিতাইচরণ মাইতি। প্রায় ১১৫ জন সদস্য শিবিরে যোগদান করে। যোগদানকারী সকল সদস্যের মধ্যে 'ভারতের পুনর্গঠন' বইখানি বিতরণ করা হয়।

ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (বিবেকানন্দ পার্ক, সোদপুর, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) : গত ২৭ মে '৯৬ দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—সকালে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যায় গীতা ও কথামৃত পাঠ ও আলোচনা। তারপর অনুষ্ঠিত হয় সমবেত ভজন, প্রার্থনা ও জপ-ধ্যানাদি। অনুষ্ঠানান্তে প্রায় ৬০ জন ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সারদা সেবা সংঘে (শিবপুর, জেলা—হাওড়া) গত ১ জুন ৯৬ সংঘের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল মঙ্গলারতি, ঊষাকীর্তন, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও হোম, কথামৃতপাঠ প্রভৃতি। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দান করেন বেলুড় সারদাপীঠের স্বামী যোগস্বরূপানন্দ। সভান্তে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করে সংঘের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলডিহা (শ্যামবাজার, জেলা—হুগলী) : গত ২ জুন '৯৬ ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'কেন বিবেকানন্দকে ভাল লাগে'। আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'কেন বিবেকানন্দকে প্রয়োজন' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সোমাত্মানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। সম্মেলনে প্রায় ১৮

জন যুবক, ৪০০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক যোগদান করেন। যুবপ্রতিনিধিদের প্রত্যেককে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ফটো-সম্বলিত একটি জ্যাকেট এবং স্বামীজীর জীবনী সংক্রান্ত একটি বই দেওয়া হয়। সম্মেলনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক অরুণকুমার কোলে।

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদে (আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ১-৩ জুন '৯৬ তিনদিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, নগর-পরিক্রমা, ভক্ত-সম্মেলন, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভা। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন আগরতলা মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দ এবং বেলুড় মঠের স্বামী রঘুনাথানন্দ। তিনদিনের এই উৎসবে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ (কল্যাণী, জেলা—নদীয়া) গত ৮-৯ জুন '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের সহযোগিতায় বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই উপলক্ষে সকালে গ্রাম-পরিক্রমা, সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং বিকেলে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ অবলম্বনে যুবশক্তি যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে, সেবিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন রহড়া কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ ও রহড়া মিশনের স্বামী কৈবল্যানন্দ।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৯ জুন '৯৬ বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠিত বিষয়ের মধ্যে মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম এবং ধর্মসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভায় ধর্মালোচনা করেন বারাসত মঠের স্বামী দ্বারকেশানন্দ। দুপুরে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদগ্রহণ করেন। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতিনাট্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি (তেঁতুলিয়া, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫-১৬ জুন '৯৬ দুদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। এই উপলক্ষে ইনস্টিটিউট অব কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের প্রথম অধিবেশনে 'বিবেকানন্দকে কেন প্রয়োজন' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দকে কেন ভাল লাগে'। আলোচনা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগদান করে। প্রত্যেককে পুরস্কৃত করা হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সান্ধ্যসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ, অধ্যাপক মৃণালকান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা। সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। দ্বিতীয়দিনে অনুষ্ঠিত হয় গ্রাম-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। স্বামী বলভদ্রানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ, ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। পরে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সম্পাদক স্বপনকুমার মজুমদার।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ সুকুমার ধর** গত ২১ মার্চ '৯৬ রাত ৮টা ৩৩ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই প্রযত্নে গ্রামগঞ্জের বহু গরিব-দুঃখী উক্ত চিকিৎসা বিভাগের সাহায্যে চিকিৎসিত হতো।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **বিদ্যুৎকুমার মুখোপাধ্যায়** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ মার্চ '৯৬ সকাল ৬টায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াশুনা করে ১৯৪৭ সাল থেকে আমৃত্যু এই আশ্রমে নিরলস স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। ছাত্রদের ড্রিল, পি. টি., ফুটবল প্রভৃতি খেলাধুলা শেখানো ছাড়াও সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। অকৃতদার, অনলস ও একান্ত বিশ্বস্ত বিদ্যুৎবাবু সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

তরুলতা ঘোষ গত ২ মে '৯৬ ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে সজ্ঞানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বেলুড় মঠ, যোগোদ্যান মঠ ও বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের যোগাযোগ ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘ ৪৫ বছরের গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অনিলকুমার পাড়ুই** গত ২১ মে '৯৬ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ডোমজুড়ে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। সুকণ্ঠের অধিকারী অনিলবাবু হাসিখুশি মেজাজ, সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং সেবা-পরায়ণতার জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **অনন্তনাথ মুখার্জী** গত ২৩ মে '৯৬ বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে পরলোকগমন করেছেন। ৮২ বছর বয়স্ক অনন্তবাবু স্থানীয় কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এবং মিশনের বহু সাধুর স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন 'উদ্বোধন' পত্রিকার দীর্ঘদিনের গ্রাহক। □

লবঙ্গ

মশলার রাজা লবঙ্গ আসলে রোদে শুকানো ফুলের কুঁড়ি। এর ইংরেজী শব্দ 'ক্লোভ' (clove) যে-শব্দ থেকে এসেছে, তার অর্থ 'পেরেক'। কারণ, কুঁড়িগুলি অনেকটা পেরেকের মতো দেখতে। আয়ুর্বেদ ওষুধে এর প্রচুর ব্যবহার রয়েছে; সেজন্য চরকসংহিতাতে এর 'দেবকুসুম', 'দিব্যগন্ধা' প্রভৃতি নামকরণ যথার্থ হয়েছে। চীনদেশে খ্রীস্টপূর্ব ২০০ সালেও এর প্রচলন ছিল, পরে খাবারে সুগন্ধ আনার জন্য এবং খাবার সাজানোর ব্যাপারে এর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। একসময়ে ইন্দোনেশিয়াতে এর চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাসীরা ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে মরিশাসে এর চাষ করে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশদের যাওয়ার আগে শ্রীলঙ্কায় লবঙ্গ নিয়ে যায় এবং এদেরই একচেটিয়া লবঙ্গ ব্যবসায় ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ভারতে লবঙ্গের প্রচলন করে।

যেসব দেশে বর্তমানে লবঙ্গের চাষ হয়, সেগুলি হলো ইন্দোনেশিয়া, পিনাং, জাঞ্জিবার, তাঞ্জানিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস প্রভৃতি। ভারতবর্ষে নীলগিরি, তেনবাসি পাহাড়, কন্যাকুমারী, কোট্টায়াম ও কুইলন জেলাতেই প্রধানতঃ এর চাষ। লবঙ্গগাছগুলি সবুজ, মোচাকৃতি এবং উচ্চতায় ৯-১২ মিটার হয়। এরা সমুদ্রতল থেকে ৯০০ মিটার উচ্চতায় জন্মায়। উষ্ণ জলীয় আবহাওয়া এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত গাছগুলির পক্ষে হিতকর। কুঁড়ি অবস্থায় লবঙ্গফুল তুলে রোদে শুকাবার ফলে এদের রঙ বাদামী হয়। যেসব ফুল তোলা হয় না, সেগুলিতে এক-বিচিওয়ালা ফল হয় যাকে 'মাদার অব ক্লোভ' বলে। উৎকৃষ্ট ধরনের লবঙ্গের রঙ বাদামী, প্রান্তে মুকুটের গঠন। এর আর্দ্রতা ১২ শতাংশ এবং গা অমসৃণ, তবে কোঁচকান নয়। ঈষৎ হলদে লবঙ্গগুলি অপক্ব, গা কোঁচকান এবং এতে লবঙ্গের সারবস্তু 'ইউজিনল' (cugenol) কম থাকে। ভাল লবঙ্গের ডাঁটা অংশ নখ দিয়ে টিপলে রস বের হয়; যেসব লবঙ্গ থেকে তেল নিষ্কাশিত হয়েছে সেগুলি টিপলে রস বের হয় না। লবঙ্গের উৎকৃষ্ট গন্ধের কারণ এর তেল, যা লবঙ্গের ১৪-২৩% শতাংশ। তেলের প্রধান উপাদান হলো 'ইউজিনল' (৭০-৯০ শতাংশ) এবং এর সুগন্ধির কারণ হলো 'মিথাইল-এন অ্যামাইল কিটোন'; তেলে অল্প পরিমাণে আরও অনেক যৌগ আছে।

ব্যবহার ঃ অনেক ভাল ভারতীয় খাবার তৈরিতে এর ব্যবহার আছে। রান্নার গুঁড়া মশলার মাধ্যমে রোস্ট, চাটনি, সস, মাংস, পেস্ট্রি, কেক, পুডিং, মোরব্বা, মশলাযুক্ত মদ, চিউয়িং গাম, মিষ্টান্ন, মুখ ধোওয়ার ওষুধ এবং মৃদু উত্তেজক হিসাবে পান-মশলা প্রভৃতিতে লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়। নানা ওষুধে এর ব্যবহার আছে। হজমি, উত্তেজক ওষুধ, বমি-নিবারক এবং উদরে বায়ু-নিবারক ওষুধ প্রভৃতিতে এর ব্যবহার আছে। দাঁতের নানা ওষুধে, এমনকি দাঁতের গোড়ায় সংক্রমণের চিকিৎসাতেও এটি ব্যবহৃত হয়। লবঙ্গ কি কি বস্তু দিয়ে গঠিত (composition), তা নির্ভর করে কিরকম জমি ও আবহাওয়ায় এই গাছ জন্মেছে এবং কিভাবে লবঙ্গ তোলার পর রক্ষিত হয়েছে তার ওপর। মোটামুটিভাবে এতে প্রোটিন—(প্রতি ১০০ গ্রামে) ৬.৩ গ্রাম, উদ্বায়ী (volatile) তেল—১৩.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট—৫৭.৭ গ্রাম, খনিজদ্রব্য—৫ গ্রাম, ট্যানিন—৫ গ্রাম, ভিটামিন 'সি'—৮১ মিলিগ্রাম, নিয়াসিন—১.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'এ'—১৭৫ ইউনিট, ক্যালসিয়াম—০.৭ গ্রাম, পটাসিয়াম—১.২ গ্রাম ইত্যাদি।

ইউজিনল ঃ লবঙ্গতেলের প্রধান অঙ্গ ইউজিনল আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে। তেল থেকে আলাদা করে এটি তৈরি হয় আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, ইউ. কে., জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও জাপানে। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকাতেই ২১৫ হাজার কিলোগ্রাম ইউজিনল তৈরি হয়েছিল। ইউজিনল ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক-জীবাণুকে নষ্ট করে। আগে থেকেই এটি মানুষের ওষুধে ও পচন নিবারণে ব্যবহৃত হতো। পশ্চিম ইউরোপে এটি দাঁতের নানা ওষুধে ও সুরভি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। এফ. এ. ও./বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (FAO/WHO) ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্টে জানিয়েছে যে, একজন ৫০ কিলোগ্রাম ওজনের লোক প্রতিদিন ১২৫ মিলিগ্রাম ইউজিনল খেতে পারে, যা ১ গ্রাম লবঙ্গে আছে। ইউজিনলে 'অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট' নামক রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যা শরীরের অনেক ক্ষতিকর জিনিসকে নষ্ট করে বলে এটি শরীরের পক্ষে হিতকর। (Nutrition News, July 1996, pp.1-3) □

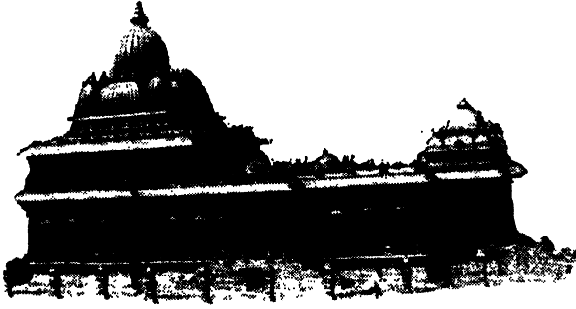


বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে—প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিবলোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।... ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে।... এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মতো করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দবাজার সংস্থা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০১

শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত
সর্বজনীন উপাসনালয়





শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪

আবেদন

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দ্বারা স্থাপিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। বহুমুখী সেবাকার্যে নিয়োজিত এই মঠ শীঘ্রই শতবর্ষ পূর্ণ করবে। ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের বহুদিনের ইচ্ছানুসারে মঠভূমিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বৃহৎ মন্দির-নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। বর্তমান যুগের সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী যেমন সকল ধর্মের অধ্যাত্মপিপাসু মানুষের আশ্রয়স্থল, তেমনি তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটিও হবে এক সর্বজনীন উপাসনাস্থল।

মন্দিরটির গঠন এমন হবে যাতে মন্দিরাভ্যন্তরে এক হাজার ভক্তের একসঙ্গে বসে উপাসনা ও ধ্যানাদি করার মতো জায়গা থাকে। এর স্থাপত্য ও অলঙ্করণে থাকবে রামকৃষ্ণ-মন্দিরসমূহের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ। মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হবে। মন্দিরটির সম্ভাব্য নির্মাণব্যয় ধরা হয়েছে চার কোটি টাকা।

গত ১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মন্দিরটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

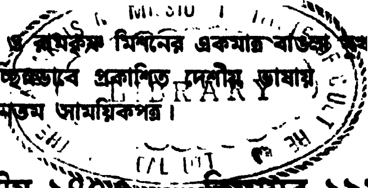
এই পবিত্র বিরাট কাজে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সমর্থন প্রয়োজন। যথাসাধ্য দান করে এই মহৎ পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করতে আমরা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। মন্দির-নির্মাণে দেয় অর্থ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফ্‌টে পাঠালে 'RAMAKRISHNA MATH, MADRAS'—এই নামে পাঠাতে হবে। এবাবদ যেকোন দান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে। এবাবদ সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।

বিশদ বিবরণের জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
ফোন: ৪৯৪-১২৩১, ৪৯৪-১৯৫৯; ফ্যাক্স: ৪৯৩-৪৫৮৯

স্বামী গৌতমানন্দ
অধ্যক্ষ

৺উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র।



সূচীপত্র ৯৮তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬





ব্যবস্থাপক সম্পাদক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আগামী বর্ষের (১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) সাধারণ গ্রাহকমূল্য : ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ—৬০ টাকা; সডাক—৭০ টাকা □ আলাদাভাবে কিনলে—প্রতি সংখ্যার মূল্য □ ৮ টাকা □ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) □ ৩০০০ টাকা (কমপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য, কিস্তিতেও প্রদেয়)



গ্রাহকপদ নবীকরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, সাতানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত দেশীয় ভাষায় ভারতের প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

৯৯তম বর্ষ ঃ মাঘ ১৪০৩—পৌষ ১৪০৪/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ১৯৯৭

☐ মাঘ/জানুয়ারি মাস থেকে পত্রিকা-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে আগামী বর্ষের (৯৯তম বর্ষ ঃ ১৪০৩-১৪০৪/১৯৯৭) গ্রাহকমূল্য জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণ করা বাঞ্ছনীয়। নবীকরণের সময় নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এর মধ্যে নবীকরণ না করলে পত্রিকা-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। টাকা দেরিতে জমা পড়লে প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য

☐ ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ ঃ ৬০ টাকা ☐ ডাকযোগে (By Post) সংগ্রহ ঃ ৭০ টাকা

☐ বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র—৩২৫ টাকা (সমুদ্রডাক), ৬৫০ টাকা (বিমানডাক) ☐ বাংলাদেশ—১৩০ টাকা

আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা

☐ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) কিস্তিতেও প্রদেয়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিতে হবে। বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

☐ ব্যাঙ্ক ড্রাফট/পোস্টাল অর্ডার যোগে টাকা পাঠালে "Udbodhan Office, Calcutta" এই নামে পাঠাবেন। পোস্টাল অর্ডার "বাগবাজার পোস্ট অফিস"-এর ওপর পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের চেক গ্রাহ্য। তবে তাঁদের চেক যেন কলকাতাস্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওপর হয়। পত্রোত্তরের জন্য এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তি-সংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

☐ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত (রবিবার বন্ধ)।

☐ ডাকবিভাগের নির্দেশমত প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখ (২৩ তারিখ রবিবার কিংবা ছুটির দিন হলে ২৪ তারিখ) 'উদ্বোধন' পত্রিকা কলকাতার কলুটোলা R.M.S.-এ ডাকে দেওয়া হয়। এই তারিখটি সংশ্লিষ্ট বাঙলা মাসের সাধারণতঃ ৮/৯ তারিখ হয়। ডাকে পাঠানোর সপ্তাহখানেকের মধ্যে গ্রাহকদের পত্রিকা পেয়ে যাওয়ার কথা। তবে ডাকের গোলযোগে পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে ইদানীং ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না বলে প্রায়ই গ্রাহকদের কাছ থেকে অভিযোগ আসছে। ডাকবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ ঐবিষয়ে আমরা করে চলেছি। কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ যখন এখনো আসছে তখন বুঝতে পারছি না কিভাবে এই সমস্যার সুরাহা হবে। অথচ সাধারণ ডাকে পাঠানো ছাড়া দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তের এত অধিক সংখ্যক গ্রাহকের কাছে স্বল্পমূল্যে কিভাবেই বা পাঠানো সম্ভব? প্রতি ইংরেজী মাসের ২৩ তারিখে ডাকে দেওয়ার পর অনেক সময় গ্রাহকরা একমাস পরেও পত্রিকা পান বলে খবর পাই। সে-কারণে সহৃদয় গ্রাহকদের একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করি। একমাস পরে (অর্থাৎ পরবর্তী ইংরেজী মাসের ২৪ তারিখ/পরবর্তী বাঙলা মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত) পত্রিকা না পেলে গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ করে কার্যালয়ে জানালে ডুপ্লিকেট বা অতিরিক্ত কপি পাঠানো হয়। দুমাস পরে জানালে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, ততদিনে মুদ্রিত অতিরিক্ত কপিগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ঠিকানা পরিবর্তন করতে হলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ডাকে দেওয়ার অন্ততপক্ষে একমাস আগে পিন কোড-সহ কার্যালয়ে জানাতে হবে।

☐ গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্ধারিত সময়ের (এক মাসের) আগেই ডুপ্লিকেট কপির জন্য অনুরোধ করেন, আবার কেউ কেউ কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি চাইছেন তা চিঠিতে উল্লেখ করেন না। উল্লেখ করেন না গ্রাহকসংখ্যাও। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেই তবে ডুপ্লিকেট কপির জন্য লিখবেন এবং কোন্ সংখ্যার ডুপ্লিকেট প্রয়োজন তাও নির্দিষ্ট করে জানাবেন। মনে রাখবেন, পত্রিকা-সংক্রান্ত যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহকসংখ্যা এবং গ্রাহকের নামের উল্লেখ আবশ্যিক। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

☐ আশ্বিন বা শারদীয়া সংখ্যার ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া হয় না। সহৃদয় গ্রাহকবর্গ জানেন যে, সাধারণ সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হয় না। কাগজ ও মুদ্রণাদির অতি-দুর্মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি বিনামূল্যে দেওয়া অসম্ভব।

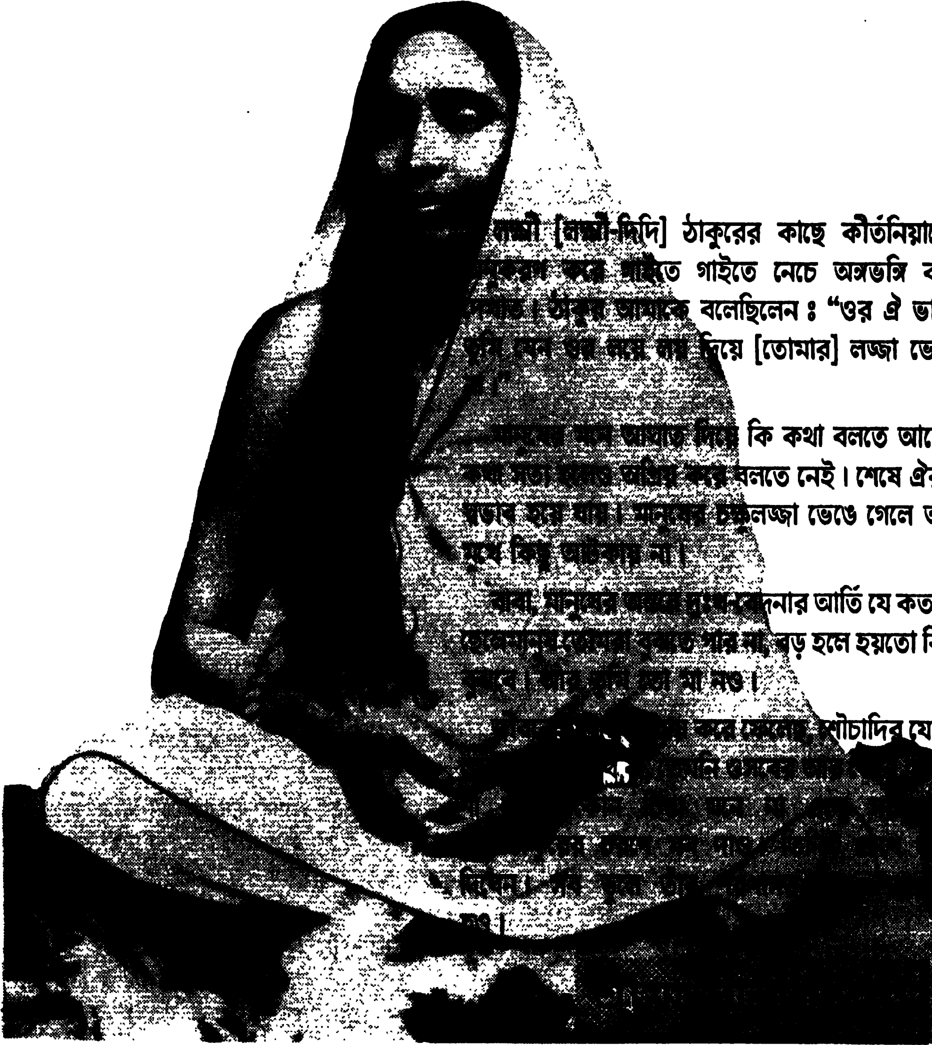
☐ যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) পত্রিকা সংগ্রহ করেন, তাঁদের পত্রিকা ইংরেজী মাসের ২৭ তারিখ থেকে বিতরণ শুরু হয়। স্থানাভাবের জন্য দুটি সংখ্যার বেশি কার্যালয়ে জমা রাখা সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেইমত তাঁদের সংখ্যা সংগ্রহ করে নেন। শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য নয়। সেটি কখন এবং কিভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেবিষয়ে যথাসময়ে পৃথক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

উদ্বোধন

পৌষ ১৪০৩

দিব্য বাণী

ডিসেম্বর ১৯৯৬



[illegible] [illegible-দিদি] ঠাকুরের কাছে কীর্তনিয়াদের [illegible] গাইতে গাইতে নেচে অঙ্গভঙ্গি করে [illegible]। [illegible] বলেছিলেন ঃ "ওর ঐ ভাব। [illegible] দিয়ে [তোমার] লজ্জা ভেঙো [illegible]"

[illegible] আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? [illegible] বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব [illegible]। [illegible] লজ্জা ভেঙে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না।

[illegible] বেদনার আর্তি যে কত তা [illegible] বুঝতে পারে না, বড় হলে হয়তো কিছু [illegible]। [illegible] মা নও।

[illegible] করে ফেলেছ, শৌচাদির যেমন [illegible] বাব [illegible] বে [illegible] ন্তি [illegible] দিতেন। [illegible] তে [illegible]।

৯৮তম বর্ষ—১২শ সংখ্যা

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে হয়।" ঃ শ্রীশ্রীমা



'কথামৃতে' বার-বার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে একটি কথা শুনি ঃ "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।" কিন্তু এই নির্দেশ কাহার বা কাহাদের জন্য? 'কথামৃতে'র পাঠক-পাঠিকারা জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণের এই নির্দেশ ঈশ্বরসাধক বা ঈশ্বরসাধকদের জন্য। "আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।" শ্রীচৈতন্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণও ছিলেন তাঁহার শিক্ষার মূর্ত রূপ। তাঁহার অতুলনীয় ঈশ্বরসাধনায় লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে শ্রীমতী ও গোপীদের দৃষ্টান্ত তো আছেই, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তেও মীরাবাঈ, ত্রৈলঙ্গস্বামী ও বামদেবের কথা সর্বজনবিদিত। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন উলঙ্গপ্রায় নির্ভীক পরমহংসকে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট পাতায় তাহাদের ভুক্তাবশেষ কুকুরদের সঙ্গে নির্বিকারভাবে মহানন্দে গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তখনকার পঞ্চবটীতে (সেখানে তখন দিনের বেলাতেও লোকে যাইতে সাহস করিত না) গভীর রাত্রিতে নির্ভয়ে সাধনায় মগ্ন হইতেন। নিজের চুল দিয়া (সাধন-অবস্থায় তাঁহার লম্বা চুল ছিল) মেথরদের শৌচালয় অবলীলায় পরিষ্কার করিয়াছিলেন। অঙ্গের বসন তাঁহার প্রায়ই খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাঁহার লজ্জার কোন বালাই ছিল না। শিশুর মতো এবিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসচেতন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যত তোমার ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতির ভাব পরিপক্ব হইবে ততই ঐসব 'পাশ' সম্পর্কে তোমার অসচেতনতা গভীরতর হইবে। যখন তুমি সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবে তখন উহারা তোমার অন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, বামদেব প্রমুখের জীবনে ইহার সত্যতা আমরা দেখিতে পাই।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' এবং রামকৃষ্ণভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার ও প্রসার-কারিণী শ্রীমা সারদাদেবী ঠিক ইহার বিপরীত কথাটিই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে হয়।" কথাটিতে প্রথমেই অনেকে হোঁচট খাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের বক্তব্যটি অনুধাবন করিলে এবং কোন্ প্রসঙ্গে তিনি কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা জানিলে আমাদের মনে কোন দ্বন্দ্ব তো থাকিবেই না, উপরন্তু বুঝিব উহা কত জ্বলন্তভাবে প্রাসঙ্গিক।

শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক স্বামী ঈশানানন্দ (বরদা মহারাজ) প্রণীত 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে প্রসঙ্গটি এইরকম ঃ

"১৩২৬ সাল ফাল্গুন মাস। জয়রামবাটীতে একদিন দুপুরবেলা রাধু, মাকু, নলিনী-দি প্রভৃতি নানা কথাবার্তায় খুব হৈচৈ করিতেছে, লাজলজ্জা বিশেষ মানিতেছে না।

"মা তাহাদিগকে বলিতেছেন, 'ও কি হচ্ছে তোদের! তোদের একটু লজ্জা-সমীহ নাই? মেয়েদের ওসব বাড়াবাড়ি ভাল নয়। মেয়েমানুষকে কত সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, সম্ভ্রম রেখে চলতে হয়। কথায় বলে—মেয়েদের হাঁটুর কাছে কাপড় উঠলে "দশ হাত কাপড়ে ন্যাংটা"। লজ্জা-শরম বজায় রেখে চলতে হয়।' তখন মেয়েদের মধ্যে একজন বলিতেছে, 'কেন পিসিমা, ঠাকুর তো বলেছেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়।' শ্রীশ্রীমা অমনি বলিতেছেন, 'না না। সে যাঁরা ভগবৎ-প্রেমে পাগল, তাঁদের কথা। আমি বলছি, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে হয়। যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়েমানুষের।' " (মাতৃসান্নিধ্যে, ৫ম সং, ১৩৯৬, পৃঃ ১৬২)

প্রসঙ্গ হইতে পরিষ্কার যে, কথাগুলি মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া বলা এবং "বিশেষ করিয়া" তাহাদের জন্যই বলা। মা বলিলেন যে, মেয়েদের ক্ষেত্রে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় "থাকতে হয়", অর্থাৎ থাকা প্রয়োজন, থাকা বাঞ্ছনীয়, থাকা উচিত। লজ্জা নারীর ভূষণ। বস্তুতঃ, ভারতীয় ঐতিহ্যে লজ্জা এবং নারীত্ব যেন সমার্থক। শ্রীশ্রীমা তাঁহার নিজের জীবনে দেখাইয়াছেন লজ্জাকে তিনি কেমনভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন অথবা লজ্জা তাঁহাকে কেমনভাবে আশ্রয় করিয়াছিল। বাস্তবে দেখা যায়, নারী যখন লজ্জার গণ্ডিকে অতিক্রম করে তখন তাহাকে সংযত রাখা কঠিন হয়। লজ্জা নারীকে রক্ষা করে, রক্ষা করে তাহার সম্ভ্রমকে, তাহার মর্যাদাকে, তাহার নারীত্বকে। ভারতের শাস্ত্র, ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের আচার্যবৃন্দ নারীর লজ্জার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও শ্রীমকে তাঁহার বালিকা কন্যাদের সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের লজ্জা না ভাঙিয়া যায়। বলিয়াছিলেন ঃ "লজ্জা মেয়েদের বড় দরকার।" ('কথামৃত', পৃঃ ১১৪২) দ্রৌপদী মহা তেজস্বিনী, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব-

শালিনী, কিন্তু কৌরবসভায় লজ্জারক্ষার জন্য তিনি কত ব্যাকুল হইয়াছিলেন সেই মর্মস্পর্শী উপাখ্যান আমাদের সকলের জানা।

লজ্জার সহিত নারীকে ঘৃণাও রাখিতে হয়, শ্রীমা বলিয়াছেন। সাধারণ অর্থে 'ঘৃণা' বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেই ঘৃণার কথা এখানে বলা হইতেছে না। এই ঘৃণার মধ্যে নিহিত আছে বীরত্বের ভাব। ত্রিভুবনবিজয়ী দুর্ধর্ষ রাবণ অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে বারবার বহু প্রলোভন দেখাইয়াছেন। সীতার দৃঢ়তাকে গুঁড়াইয়া দেওয়ার জন্য বহু নির্যাতন করিয়াছেন, অবশেষে জীবননাশের ভয় দেখাইয়াছেন। সীতা তখন অসহায়, রাবণের ক্রোধে সেই মুহূর্তেই তাঁহার জীবনহানি হইত। কিন্তু সীতা অকুতোভয়ে রাবণের মুখের উপর বলিয়াছেন : পাপিষ্ঠ, তোকে আমি ঘৃণা করি। তুই আমাকে হত্যা করিলেও জানিয়া রাখ, রাম-ভিন্ন অপর কোন পুরুষকে আমি স্বপ্নেও কামনা করি না। এই ঘৃণার পিছনে কী অতুলনীয় সাহস এবং তেজস্বিতা ছিল তাহা আমরা চিন্তাও করিতে পারি না। এই 'ঘৃণা' হইল যাহা আমার আদর্শবিরুদ্ধ, যাহা আমার ঐতিহ্যবিরুদ্ধ, যাহা আমার ধর্মবিরুদ্ধ তাহার প্রতি সুতীব্র উপেক্ষা বা বিরূপতার ভাব। শ্রীশ্রীমা যখন ঘৃণাকে রাখিতে বলিতেছেন তখন এই 'ঘৃণা'র কথাই বলিতেছেন।

'ভয়' বলিতে শ্রীশ্রীমা কী বুঝাইয়াছেন? এই ভয় দস্যুভয়, ব্যাঘ্রভয়, সর্পভয়, শত্রুভয় বা মৃত্যুভয় নয়। এই 'ভয়' সম্ভ্রমচ্যুতির ভয়, লোকাপবাদের ভয়, লোকলজ্জার ভয়। রাজপুত নারীরা বিধর্মীদের হাতে সম্ভ্রমহানির ভয়ে অবলীলায় দলে দলে জহরব্রতের মাধ্যমে আগুনে নিজেদের নিক্ষেপ করিয়াছেন। নারীর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এই সম্ভ্রমহানির ভয়। ইহা ভিন্ন লোকাপবাদের ভয়, লোকনিন্দার ভয়ও নারীকে সংযত রাখে। বস্তুতঃ, এই 'ভয়' যেন নারীর কাছে এক রক্ষাকবচের কাজ করে, নারীকে বিপথগামিতা হইতে রক্ষা করে। ফলে রক্ষা পায় গৃহ, পরিবার, সমাজ। সেজন্যই শ্রীশ্রীমা বলিলেন : "যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়েমানুষের।" পুরাণের বেদবতীর কাহিনীটি অনেকের জানা আছে। বেদবতী তপস্যারত ছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ অসৎ অভিপ্রায়ে বলপূর্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তপস্বিনীর তেজে তৎক্ষণাৎ রাবণের সর্বাঙ্গ জড়ীভূত হইয়া গেল। কিন্তু রাবণের হাতে শ্লীলতাহানির ঘটনায় বেদবতীর প্রতিক্রিয়া এমন তীব্র হয় যে, তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। সম্ভ্রমহানির ভয় ভারতীয় নারীর কাছে কতখানি বিপর্যয়কর তাহা ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন : "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে হয়।" "থাকতে হয়"-এর অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ঐ তিনটি থাকিলে তবেই নারীর জীবন সুরক্ষিত হয় বা সুরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ শুধু প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় বা উচিতই নয়, নারীর সুসংহত ও সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য ঐ তিনটি অপরিহার্য। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, ঐগুলি যেন স্বেচ্ছা-আরোপিত হয়, বলপূর্বক বাধ্য-বাধকতার ব্যাপার হইলে তাহাতে কোন কাজ হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুধু নারীর ক্ষেত্রেই কেন এই নির্দেশিকা, পুরুষের জন্য নহে কেন? সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তরে বলিব, এই নির্দেশিকা পুরুষের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। পুরুষ যদি তাহার জীবন ও মর্যাদাকে সুরক্ষিত রাখিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকেও লজ্জা, ঘৃণা, ভয়-এর নির্দেশিকা মানিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যে যেসব পুরুষ প্রাতঃস্মরণীয়, তাঁহাদের জীবন এই ত্রি-ভাবনার দ্বারা পরিচালিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ পিতৃসত্যপালনের জন্য রামের বনগমনের কথা স্মরণ করিতেছি। তিনি যে শুধুমাত্র পিতৃভক্তি ও পিতার সম্মানরক্ষার্থেই বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নহে, সেইসঙ্গে পিতৃসত্যপালন না করিলে সত্যবিচ্যুতি হেতু পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ও উপযুক্ত পুত্র হিসাবে তাঁহার নিজের অনিবার্য নিরয়গামিতা হইতে অব্যাহতিলাভের ভাবনাও নিহিত ছিল। এই ভাবনার মধ্যে 'লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়'—তিনটিই সম্পৃক্ত হইয়াছিল। রাবণবধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং পরবর্তী কালে সীতাকে নির্বাসনের মধ্যে কী শুধুমাত্র রামের প্রজানুরঞ্জন-ভাবনাই ক্রিয়াশীল ছিল, লোকাপবাদ ও লোকনিন্দার ভয়ও কী ছিল না? যুধিষ্ঠির কি দ্বিতীয়বারের দ্যূতক্রীড়ার আহ্বানকে অথবা দ্যূতক্রীড়ার পর বনবাসের শর্তকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না—যেখানে বিদুর প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীরা তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন এবং শকুনি-পরিচালিত দুর্যোধনাদির বদ মতলব সম্পর্কে তিনি নিজেও সম্যক্ভাবে অবহিত ছিলেন? অবশ্যই পারিতেন এবং ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে তাঁহার সুপরিচিত ধর্মাশ্রয়িতা ছাড়াও নিশ্চয়ই ক্রিয়াশীল ছিল 'লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়'-এর ভাবনাও। দানবীর বলীকে গুরু শুক্রাচার্য বামনরূপী নারায়ণের অভিসন্ধি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যবদ্ধ বলী সত্যভঙ্গের ভয়ে গুরুর নির্দেশে কর্ণপাত করেন নাই। ভরত রামের পাদুকাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং রামের প্রতিনিধিরূপে অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই যে রাজলক্ষ্মীকে অঙ্কগত করিয়াও ভরত ভোগ হইতে বিরত রহিলেন, এই "অসিধারাব্রত" পালন কী শুধুই ভ্রাতৃপ্রীতিবশতঃ?—অথবা ইহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ছিল 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়'-এর তাগিদও? প্রাচীন বা পৌরাণিক দৃষ্টান্তগুলি দেওয়া হইল ইহা বুঝাইবার জন্য যে, 'লজ্জা, ঘৃণা,

ভয়'-এর প্রেরণা কিভাবে আমাদের চিরশ্রদ্ধেয় পুরুষ-ব্যক্তিত্বগণকে পরিচালিত করিত।

শুধু পৌরাণিক যুগেই নহে, ঐতিহাসিক যুগেও মহাবীর, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রমুখ বরেণ্য আচার্যদের জীবনও আমাদের একই শিক্ষা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং সারদাদেবীর জীবনও আমাদের ঐ বিষয়ে সচেতন করে। প্রসঙ্গতঃ, কবীরের জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একদিন কবীর সদালাপ করিতেছেন। অকস্মাৎ সেখানে তাঁহার এক অনুরাগী ভক্ত আসিয়া উৎফুল্লভাবে কবীরকে বলিলেন, যে-ব্যক্তিটি সর্বদা অহেতুক কবীরের নিন্দা- সমালোচনা করিয়া বেড়াইত সে মারা গিয়াছে। সংবাদটি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই খুশি হইলেন। কিন্তু কবীরের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। মনে হইল এই 'সুসংবাদ' তাঁহার কাছে গভীর বেদনাবহ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইয়া গেলেন। এত বড় নিন্দুকের মৃত্যুতে তো স্বস্তি ও আনন্দ হওয়ার কথা! কেহ কেহ সরাসরি কবীরকে তাঁহার নিরানন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কবীর গম্ভীর ও ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন ঃ "আজ আমার সবচেয়ে দুঃখের দিন, কারণ আমার পরম সুহৃদের দেহত্যাগ হইয়াছে।" অতবড় সমালোচক এবং মিথ্যা-সমালোচক 'পরম সুহৃদ'! কবীর বলিলেন ঃ "তোমরা তো সবসময় আমার প্রশস্তিতে মুখর। আমার কোন দোষ তোমাদের চোখে পড়ে না, পড়লেও কখনো তার নিন্দা কর না। আমার গুণকে অতি-রঞ্জিত করে বেড়াও। কিন্তু তিনি সবসময় আমার দোষ, আমার ত্রুটির দিকে আমার এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সেজন্য আমি সর্বদা সতর্ক থাকতাম। আমাকে প্রাণপণে ত্রুটিহীন রাখতে চেষ্টা করতাম।" ভক্তরা সমস্বরে বলিলেন ঃ "কিন্তু তিনি তো সবসময় ভিত্তিহীন রটনা করতেন। কল্পিত অপপ্রচার করতেন। আপনার মিথ্যা নিন্দা করাই ছিল ওঁর স্বভাব!" শান্তকণ্ঠে কবীর বলিলেন ঃ "হতে পারে, তোমরা যা বলছ তা-ই হয়তো ঠিক। কিন্তু তাঁর ভয়ে আমি সর্বদা সতর্ক থাকতাম যাতে আমার মধ্যে তাঁর প্রচারিত দোষগুলি না থাকে। তাই তিনিই ছিলেন আমার প্রকৃত বন্ধু ও শুভার্থী। আজ তিনি চলে গেলেন, কে আমার দোষ-ত্রুটির কথা বলবে? কে আমার বিবেকের কাজ করবে? কার ভয়ে আমি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকব এবং নিজেকে সসঙ্কোচে সংশোধন করতে চেষ্টা করব?"

বস্তুতঃ, কী পুরুষ, কী নারী সকলেই যদি লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়-এর দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে বহু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সহজ সমাধান হইয়া যায়। আমরা ক্রমেই আমাদের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণতর ও শুদ্ধতর হইব। এবং পরিশেষে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলুষ হইয়া পূর্ণ মানবে পরিণত হইব।

একথা সত্য যে, শ্রীশ্রীমা তাঁহার নির্দেশিকাটি প্রধানতঃ নারীদের জন্যই দিয়াছেন, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে ইহা পুরুষ ও নারী সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজ—উভয়েরই কল্যাণ। তবে নারীর জন্য প্রধানতঃ কেন? কারণ, নারীর উপরেই গৃহ তথা পরিবারের সমৃদ্ধি ও মর্যাদা নির্ভরশীল। নারী—সে জননী হউক অথবা জায়া হউক —তাহার স্নেহ, প্রেম, শৃঙ্খলা ও শাসন পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহার সুনিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে পরিবারের কীর্তির প্রসার। কিন্তু পক্ষান্তরে নারীরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন—গণ্ডিরেখা প্রয়োজন। আমাদের ঋষিগণ নারীকে অগ্নিরূপে দেখিয়াছেন। অগ্নি মহাশক্তির প্রতীক। কিন্তু অগ্নিকে যদি একটি আধারের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত না রাখা হয় তাহা হইলে অগ্নি মহা বিপর্যয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তেমনই নারী যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, বল্গাহীন হয় তখন সে শুধু যে গৃহ ও পরিবারের মহা অনর্থ সৃষ্টি করে তাহাই নহে, সমগ্র সমাজকেই বিপর্যয়ের সামনে দাঁড় করাইয়া দেয়। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ-উচ্চারিত "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়" নারীর সেই অপরিহার্য শৃঙ্খল, নারীর স্বেচ্ছা-আরোপিত আধার—আশ্রয়। উহা শুধু নারীকেই বাঁচাইবে না, সমাজকেও বাঁচাইবে। শ্রীশ্রীমায়ের নিজের দৃষ্টান্ত জগতের সকল নারীর আদর্শ।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিকা ও শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশিকা কি পরস্পরবিরোধী নহে? না। প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিপূরক। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন সিদ্ধভূমির বা পূর্ণভূমির কথা, শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন সাধকভূমি বা সাধারণভূমির কথা। সাধকভূমি বা সাধারণভূমিতে মানুষকে দেহাত্মবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যতক্ষণ দেহাত্মবোধ থাকিবে ততক্ষণ প্রয়োজন শৃঙ্খলার, গণ্ডিবদ্ধতার। চারাগাছকে বেড়ার ভিতরে আবদ্ধ না করিলে উহাকে ছাগল-গরুতে খাইয়া ফেলিবে, মানুষে মাড়াইয়া যাইবে। ফলে উহার অকালমৃত্যু ঘটিবে। বেড়াবদ্ধ চারাগাছ যখন বৃক্ষে পরিণত হয় তখন হাতিও উহার কিছু করিতে পারে না। কাহারও নিকট হইতে উহার আর কোন 'ভয়' থাকে না। তেমনই সাধকভূমি হইতে সিদ্ধভূমিতে উত্তরণের পর 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়'-এর কোন ভূমিকা নাই, কিন্তু সিদ্ধভূমিতে উত্তরণের স্তর বা পর্যায় হিসাবে উহার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, পায়ে কাঁটা বিঁধিলে উহাকে বাহির করিবার জন্য অপর একটি কাঁটা লাগিবেই, কিন্তু কাঁটাটি বাহির হইয়া গেলে দুটি কাঁটাই ফেলিয়া দিতে হয়। সুতরাং শ্রীশ্রীমায়ের কথার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন থাকে না। ব্যক্তির জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য উহার প্রাসঙ্গিকতা চিরকাল থাকিবে। সর্বদেশে, সর্বকালে। □

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

মাকে প্রথম দেখি যখন আমার ছাত্র অবস্থা। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যেতাম। একদিন সেখানে কয়েকটি কিশোর গান করছে। বিদ্যাসাগর স্কুলের একজন শিক্ষকও সেখানে ছিলেন। তিনি বসতে বললেন। বসলাম। খুব ভাল লাগল। সেখানেই পরে জ্ঞান মহারাজের সংস্পর্শে আসি। বন্ধুদের সঙ্গে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটি ছোট শিবমন্দিরে যেতাম। তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সকলেরই পরিচালক ও উপদেষ্টা ছিলেন জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান)। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। স্বামীজী তাঁকে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকতে আদেশ করেছিলেন। জ্ঞান মহারাজ আমাদের মতো অল্পবয়স্ক বালকদের অধ্যাত্মপথে পরিচালনার চেষ্টা করতেন ও নানাভাবে তাদের এবিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মায়ের জন্মতিথিতে[১] জ্ঞান মহারাজ আমাদের বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী' বা উদ্বোধনে নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য—সেই পবিত্র দিনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করা। সমস্ত দিনের উৎসব তখন শেষ হয়েছে। মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) দোতলায় মায়ের ঘরের বারান্দা থেকে বললেন ঃ "সমস্ত দিন ভক্তদের দর্শন দিয়ে মা এখন ক্লান্ত। জ্ঞান মহারাজ একা মাকে প্রণাম করে যেতে পারেন।" জ্ঞান মহারাজ উত্তরে জানালেন, তাঁর সঙ্গের বালকদের যদি মাকে দর্শনের ও প্রণামের সুযোগ না হয় তাহলে তিনিও মাকে নিচের থেকেই প্রণাম করে যাবেন। সম্ভবতঃ মাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং মায়ের আদেশে রাসবিহারী মহারাজ আমাদের সকলকেই ওপরে গিয়ে মাকে দর্শন ও প্রণাম করার সুযোগ দিলেন। আমরা এক-একজন করে গেলাম। মা তখন তাঁর ঘরের দরজার সামনে স্বীয় স্বভাবসুলভভাবে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় একটি চেয়ারে শুধু পা-দুখানি বের করে রেখে বসেছিলেন। সুতরাং মায়ের মুখ দেখার সুযোগ আমাদের কারো হলো না। আমরা তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে এলাম। তখন সেখানে গোলাপ-মা, যোগীন-মা ও মায়ের সেবক রাসবিহারী মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ঐ একবার মাত্রই মাকে স্থূলশরীরে দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এর পরে মা দেশে চলে যান। একবছরেরও বেশি দেশে থেকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শেষে মাকে উদ্বোধনে আনা হয় স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ব্যবস্থায়। মা তখন খুবই অসুস্থ ছিলেন। পরে মায়ের শরীর ক্রমশঃ আরও খারাপ হতে থাকে। ফলে তাঁকে আর দর্শন করা হয়নি। অবশেষে ঐ বছরেই ২১ জুলাই তাঁর মহাসমাধি হয়। মহাসমাধির পর তাঁর দেহ উদ্বোধনে সকল ভক্তদের দর্শনের জন্য রাখা ছিল। সেই অবস্থায় দ্বিতীয়বার দর্শন।

তাঁর মরদেহ যখন উদ্বোধন থেকে বেলুড় মঠে সৎকারের জন্য আনা হয় তখন যে শোভাযাত্রা হয়েছিল তাতেও আমরা যোগ দিয়েছিলাম। স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নেতৃত্বে আমরা সকলে পদব্রজে উদ্বোধন থেকে বরানগর কুঠিঘাটে আসি। সেখানে মঠেরই একটি নৌকায় মায়ের দেহ মঠে নিয়ে আসা হয়। নৌকার মাঝি ও দাঁড়ী ছিলেন সাধুরাই। আরও কয়েকটি নৌকা সকলের জন্য ভাড়া করে রাখা ছিল। সেগুলির একটাতে গঙ্গা পার হয়ে আমরা মঠে এলাম। খালিপায়ে বাগবাজার থেকে কুঠিঘাটে আসতে প্রচণ্ড রোদের জন্য অনেকেরই পায়ে ফোস্কা পড়েছিল।

স্বামীজীর ঘরের দক্ষিণে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিজের হাতে লাগানো নাগলিঙ্গম গাছের ধার বরাবর তখন গঙ্গা ছিল। সেখানটায় গঙ্গার ধারটা ছিল ঢালু। মাকে সেখানেই নামানো হলো। সেখান থেকে মঠবাড়ির উঠোনে আমতলায় নিয়ে যাওয়া হলো, যাতে সাধু ও ভক্তরা মাকে দর্শন করতে পারেন। তারপর মায়ের বর্তমান মন্দিরের সামনে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘাট ঠিক নয়, তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা সমান ও সমান্তরাল ছিল। সেখানে মাকে স্নান করানো হলো। মঠে বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির সেই জায়গাতেই কেবল চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়েছিল। মুখাগ্নির জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে

১ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার সম্পাদক অরুণকুমার লাহিড়ী আমাদের জানিয়েছেন যে, তারিখটি ছিল ২৪ ডিসেম্বর (১৯১৮), মঙ্গলবার—৯ পৌষ, ১৩২৫। উল্লেখ্য যে, ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মায়ের জন্মতিথি দুবার পড়েছিল—প্রথমবার ৪ জানুয়ারি, শুক্রবার—২০ পৌষ, ১৩২৪।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

পাওয়া যায়নি। সেজন্য শিবু-দাদাকে (রামলাল-দাদার ভাই) দিয়ে মুখাগ্নি ও চিতায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করা হয়।[২]

দাহের পরে চিতাধৌত করার জন্য সাধুদের সঙ্গে ভক্তরাও গঙ্গাজল ঢেলেছিলেন। তারপর সাধুদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের দেহাবশেষ সংগ্রহ করেছিলেন। সাধুদের পর ভক্তরাও অনেকে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করল। তখন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ত্যাগ করে উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ "যারা এই পবিত্র চিতাভস্ম সংগ্রহ করছে তারা যেন মনে রাখে যে, এর পবিত্রতা রক্ষা করে নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা না করলে সর্বনাশ হবে।" তাঁর সেই গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত সতর্কবাণীতে আতঙ্কিত হয়ে ভক্তরা তাঁদের সংগৃহীত চিতাভস্ম পুনরায় চিতাস্থলে রেখে দেন। সাধুরা কেউ কেউ বোধহয় নিজেদের কাছে চিতাভস্ম রেখেছিলেন। অন্ততঃ একজনকে জানি—তাঁর কাছে মায়ের চিতাভস্ম ছিল। তিনি গিরিজা মহারাজ (স্বামী গিরিজানন্দ)। তিনি মায়ের পূতাস্থির নিত্য পূজা করতেন, বাইরে কোথাও গেলে যেখানে পূজার উপকরণ পাওয়া যেত না সেখানে তুলসীপাতা দিতেন।□

২ স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে এসম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকলেও দুর্গাপুরী দেবীর 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে রামলাল-দাদার দ্বারা 'শিরাগ্নিকার্য' সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। পূজ্যপাদ মহারাজজীর স্মৃতিকথা এই সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করছে। —সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রচ্ছদ

ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ। প্রাক্-ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের যে-বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাতে সমন্বয়-ভাবনা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সমন্বয় মূলতঃ হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ কম হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষই এমন একটি দেশ যেখানে এই সংঘর্ষের মধ্যেও সর্বদা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস দেখা গিয়েছে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার বিখ্যাত হংসেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে। নির্মাণ চলাকালীন নৃসিংহদেব পরলোকগমন করেন। ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে নৃসিংহদেবের বিধবা দ্বিতীয় পত্নী পুণ্যবতী শঙ্করীদেবীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ঐবছর স্নানযাত্রার দিন তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, কাশীতে নৃসিংহদেব দেবী হংসেশ্বরীর স্বপ্নলাভ করেন এবং মন্দিরে দেবীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠার আদেশ পান। বর্তমান মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে একটি ব্যতিক্রমী নিদর্শন। মন্দিরে অধিষ্ঠিত স্বপ্নদৃষ্ট কালীমূর্তিটিও একটি ব্যতিক্রমী মূর্তি। [ইনসেটে দেবীর মূর্তি দ্রষ্টব্য।] মূর্তিতে দেখা যায়—শায়িত মহাদেবের হৃদয় থেকে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে এবং তার ওপর দেবী আসীন। গর্ভমন্দিরের বাইরে চারপাশে ছোট ছোট বারটি প্রকোষ্ঠে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গর্ভমন্দিরের ওপরে ত্রিতলে (গর্ভতল থেকে ধরলে ষট্‌চক্রের চতুর্থ স্তর—স্থান ঃ হৃদয়, চক্র ঃ অনাহত) আছে আরও একটি শ্বেত শিবলিঙ্গ। হংসেশ্বরী-মন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে বাসুদেব-মন্দির। বাসুদেব-মন্দির বা বিষ্ণুমন্দির নৃসিংহদেবের পূর্বপুরুষ বাঁশবেড়িয়ার ভূস্বামী রামেশ্বর দত্তের দ্বারা ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এভাবে বিষ্ণুমন্দির, শক্তিমন্দির এবং শিবমন্দির একই প্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দির-প্রাঙ্গণকে এক মহা সমন্বয়ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। পরবর্তী কালে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের স্নানযাত্রার দিন রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণ আরও উল্লেখযোগ্যভাবে এই সমন্বয়-ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছিল। এই মন্দিরের মহাসাধক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগে সমন্বয়ের মহাবাণী "যত মত তত পথ" প্রচার করেছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর উদ্দেশ্য সেই বাণীকে "ঘরে ঘরে" পৌঁছে দেওয়া।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ বিশেষভাবে শক্তির সাধনা করে এসেছে। দেবীমূর্তি বা দেবীপ্রতীকের মাধ্যমে এই শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ। সাধনার মাধ্যমে জৈব-স্তর থেকে দৈব-স্তরে অথবা জীব-স্তর থেকে শিব-স্তরে উত্তরণে শক্তিসাধনার চরম তাৎপর্য নিহিত। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সাধনার সাতটি স্তরকে হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিভিন্ন অংশে প্রতীকীভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার মূল তাৎপর্যকে বলিষ্ঠ ভাষায় প্রচার করেছেন। 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে একদিকে সমন্বয় এবং অপরদিকে আত্মশক্তির বিকাশ ও জাগরণের বাণী প্রচার ছিল স্বামীজীর উদ্দেশ্য। বঙ্গদেশে সমন্বয় ও শক্তিসাধনার অন্যতম পীঠস্থান হংসেশ্বরী-মন্দিরকে আমরা সেজন্য 'উদ্বোধন'-এর নতুন বছরের প্রচ্ছদে তুলে ধরেছি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রামকৃষ্ণ সংঘের সঙ্গে হংসেশ্বরী-মন্দিরের একটি আত্মিক সম্পর্কের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী সন্তান এবং রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ বা মহাপুরুষ মহারাজ হংসেশ্বরী-মন্দিরের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দ বা হরি মহারাজ। পরে অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দও একবার মহাপুরুষ মহারাজের আগ্রহে হংসেশ্বরী-মন্দির ও দেবী-দর্শনে এসেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ যতদিন স্থূলদেহে ছিলেন ততদিন বেলুড় মঠ থেকে নানা পূজোপকরণ-সহ দুজন সাধুকে প্রতি অমাবস্যায় হংসেশ্বরী-মন্দিরে পাঠাতেন। তাঁরা ফিরে এলে তিনি মহানন্দে মায়ের নির্মাল্য ও প্রসাদী সিন্দুর-তিলক ধারণ করতেন। তিনি বলতেন ঃ "ঐ চতুর্ভুজা শান্ত কালীমূর্তি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতীক। শবাকার শিবের হৃদ্‌পদ্ম থেকে উত্থিত সহস্রদল পদ্মের ওপর দেবী আসীনা। লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে যতদিন মন থাকে ততদিন ধর্মরাজ্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণা হয় না। হৃদয়পদ্মে মন গেলে তখনই প্রকৃত ধর্মানুভূতির আরম্ভ। শিবের হৃদ্‌পদ্মে হাস্যময়ী মা বসে আছেন ভক্তের মলিন কামনা-বাসনা দূর করে শুদ্ধ মাতৃভাবে তার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে।"—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আলোকচিত্র ঃ ডাঃ স্বয়ম্ভূ মুখোপাধ্যায় □ সহযোগিতা ঃ ঠাকুরদাস ভট্টাচার্য □ প্রচ্ছদ অলঙ্করণ ঃ ট্রিনিটি গ্রাফিক্স

সৌজন্য ঃ বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবার, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ এবং তপন চট্টোপাধ্যায় (হংসেশ্বরী-মন্দিরের পুরোহিত)

স্মৃতিকথা

মাতৃস্মৃতিসুধা

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাস নাগাদ একবার মঠে এসেছি, গঙ্গারাম মহারাজের[১] সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কটকে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি বললেন: "আমি উদ্বোধনে যাচ্ছি, যাবে?" আমি আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর সঙ্গে চললাম। একজন মহারাজ—'বুড়োবাবা'[২]—বললেন: "গঙ্গারাম চেলা বাগিয়েছে ভাল। তবে আরেকদিন এসে মঠে প্রসাদ পেও।" আমি "যে আজ্ঞে" বলে রওনা হলাম। উদ্বোধনে এসে মায়ের দর্শন পেলাম। মাকে আমার সেই প্রথম দর্শন।

মাকে দেখলাম সর্বাঙ্গে সাদা চাদর জড়ানো। প্রণাম করলাম। তাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারব—তাঁর পায়ের ধুলো নিতে পারব, এ ছিল আমার স্বপ্নাতীত। গঙ্গারাম মহারাজকে দিয়ে মা নিচে প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বাড়ি[৩] ফিরব বলে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। গঙ্গারাম মহারাজ ও কপিল মহারাজ[৪] সঙ্গে সঙ্গে এলেন। উভয়েই বললেন: "তোমার মহাসৌভাগ্য!" গঙ্গারাম মহারাজ সেদিন সেখানেই রইলেন দুপুরে প্রসাদ পাবার জন্য।

তারপর অবশ্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উদ্বোধনে আছেন জানলেই আমি, পরেশ[৫], নগেন[৬] মাকে দর্শন করতে যেতাম। মঠে ও বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত করতে করতে বুড়োবাবার সঙ্গে খুব আলাপ হলো। তিনি আমাকে সাধু হবার জন্য খুব উৎসাহিত করতেন।

অন্তরঙ্গ অনুভূতির কথা কাউকে বলতে ইচ্ছে হয় না, কারণ আমি নিজেই এর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারি না। ছেলেবেলা থেকে, মাথা খারাপ কি কী—কিছুই বুঝতে পারি না। অন্ধকার ঘরে গেলেই জ্যোতির্ময় রাধাকৃষ্ণ-মূর্তি দেখতাম। স্বপ্নে দেখেছি মহাজ্যোতির্ময় ওঁকার—আকাশ ছেয়ে! আবার ঠিক সত্যিকারের ষাঁড়ে-চড়া হরগৌরী দিনকতক চোখ বুজলেই দেখতে পেতাম। তখন মির্জাপুর স্ট্রীটে (বর্তমানে সূর্য সেন স্ট্রীট) রিপন স্কুলে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজিয়েট স্কুল) থার্ড ক্লাসে (বর্তমানের অষ্টম শ্রেণী) পড়ি।

মঠে যোগ দেবার আগেই একদিন স্বপ্নে দেখলাম—মঠে উৎসব হচ্ছে। একজন একটা সোনার পাতে সিঁদুরমাখানো লাল পতাকা হাতে করে এসে বললেন: "এই তোর ইষ্টমন্ত্র।" দেখি একটা মন্ত্র সেই পতাকায় লেখা। দিনকতক তাই জপ করলাম কিন্তু প্রত্যয় হলো না—ছেড়ে দিলাম। কিছুদিন বাদে মঠে এসে বাবুরাম মহারাজকে আমার দীক্ষা নেবার কথা বললাম। তিনি কৃষ্ণলাল মহারাজের (স্বামী ধীরানন্দ) সঙ্গে আমাকে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। দীক্ষাকালে মার বাঁপাশে বসলাম। তিনি ধ্যানস্থ হলেন। অতি গম্ভীর! পরে বললেন: "তোমার দীক্ষা তো আগেই

১ স্বামী গঙ্গানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘে যোগ দেন। তীর্থাদি ভ্রমণ এবং তপস্যার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে তাঁর দেহত্যাগ হয়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

২ সন্ন্যাসনাম—স্বামী সচ্চিদানন্দ। পূর্বনাম দীননাথ সেন—'দীন মহারাজ' নামেও সংঘে পরিচিত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দের কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বয়সে তিনি শুধু যে স্বামী সারদানন্দের চেয়েই বড় ছিলেন তাই নয়, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সন্ন্যাসি-শিষ্য অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সেজন্য রামকৃষ্ণ-সংঘে তিনি 'বুড়োবাবা' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন কাশী সেবাশ্রমে ৮৬ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হয়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

৩ কলকাতায় তাঁদের নিজেদের বাড়ি পূর্বতন আমহার্স্ট স্ট্রীট (বর্তমানে রাজা রামমোহন সরণি) এবং হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলের কাছে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

৪ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ।

৫ পরবর্তী কালে স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘে যোগদান করেন। পরে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মার্চ লাহোর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দেহত্যাগ করেন।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

৬ স্বামী সহজানন্দ। সংঘে যোগদানের আগে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে সংঘে যোগদান করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর কাশী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ঠাকুর দিয়েছেন।” আমি বললাম : “আমার স্বপ্নে ঠিক বিশ্বাস হয় না, আপনিই আবার আমাকে বলে দিন।” তিনি হেসে বললেন : “এই তোমার মন্ত্র, এবার জপ কোরো।” বলে স্বপ্নপ্রাপ্ত পূর্বমন্ত্রই উচ্চারণ করলেন। আমি তাঁর নির্দেশমত জপ করতে লাগলাম। জপের সময় আঙুল ফাঁক হচ্ছে দেখে বললেন : “আঙুল ফাঁক রাখতে নেই, জপ স্খলন হয়।” তারপর বললেন : “আমি বলাও যা, তিনি বলাও তাই।” একটু থেমে আবার বললেন : “গুরু ও ইষ্ট একই। ঐ তোমার ইষ্ট এবং উনিই আবার রামকৃষ্ণ।” আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম : “মা, আমার যেন ভক্তি হয়”। মা আমার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে আঙুল দিয়ে বললেন : “ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞানচক্ষু ফুটবে, ঠাকুর তোমার এই তৃতীয় চক্ষু খুলে দেবেন, অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে, দেখবে কত কী অনুভূতি হবে! খুব ধৈর্য ধরে থেক।”

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় আমরা বাঁকুড়া থেকে শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য জয়রামবাটী যাই। এইসময় বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সেবাকার্য চলছে। আমরা সেখান থেকে একসঙ্গে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম—ভবানী, বীরেন, শৈলানন্দ স্বামী, গিরিজানন্দ স্বামী, বিভূতি (ঘোষ)। মার কাছে তখন রাসবিহারী মহারাজ ছিলেন। অরূপচৈতন্যও (হেমেন্দ্র) ছিল। এই দুর্ভিক্ষের সময় বৈকুণ্ঠ ডাক্তার (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) হঠাৎ মার কাছ থেকে একদিন সন্ন্যাস নিয়ে এল।...

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে আত্মারামের কৌটায় কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজো হয়। এবার (১৯১৫) জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রী-পুজোর সময় মাকে জিজ্ঞাসা করলাম : “আত্মারামের কৌটায় এঁদের পুজো হয়? ‘গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।/সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥’ বলে ঐ কৌটাতেই জপ সমর্পণ করি, তাতে দোষ হয় না?” মা বললেন : “তা হবে কেন? তুমি কী বেদান্ত পড়? ঠাকুরই মহেশ্বর, ঠাকুরই মহেশ্বরী। শুদ্ধসত্ত্ব যোগমায়া তাঁর শরীর—তিনি সশক্তিক ব্রহ্ম। শিব ও শক্তি এক। ঠাকুরের অসুখের সময় একদিন দেখলাম, মা-কালী ঘাড় বেঁকিয়ে রয়েছেন। জিজ্ঞেস করলাম, ‘মা, অমন করে রয়েছ কেন?’ বললেন, ‘ওর ঐটের (গলায় ঘার) জন্য। আমারও গলায় বড় ব্যথা’।”

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষের সময় কিছুতেই আর বৃষ্টি হয় না। বাঁকুড়ার কালো বিভূতির (ঘোষ) মারফৎ মাকে বলে পাঠানো হলো : “প্রায় দু-বছর (১৯১৫-১৯১৬) বৃষ্টি নেই, সমস্ত দেশ জ্বলে গেল; ভাল ভাল কুয়োর জল সব ফুরিয়ে আসছে। বাঁধগুলোর জলও হু হু করে কমতে আরম্ভ হয়েছে। রাস্তার দুধারে গাছগুলোয় পাতা নেই; এখন একটু ব্যবস্থা করুন!” মা শুনে গম্ভীর হয়ে বলেন : “তাই তো, ঠাকুর এ কী করলেন!” তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন : “ওদের পদ্মফুল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করতে বল, বৃষ্টি হবে'খন।” তারপর হেসে বললেন : “মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এদেশটুকুতে কিন্তু অনাবৃষ্টি নেই।” বাস্তবিকই সেই মরুভূমির মধ্যে জয়রামবাটী-কামারপুকুর যেন একটা মরূদ্যান। চারপাশে কেমন সবুজ, কুয়ো জলে ভর্তি, পুকুরগুলো টলমল করছে, আমোদরেও জল সর্বদাই।

আমরা পুরুলিয়া থেকে প্রায় সহস্রাধিক পদ্ম এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করলাম, আর সেইসঙ্গে বাণেশ্বর শিব এনে তাঁর মাথায় জল ঢালা হতে লাগল। সকালে বহু লোক একত্রিত হয়ে দারকেশ্বর নদীর ধারে একতেশ্বর শিবের মাথায় জল দিয়ে আসতে লাগল। দুপুর অতিক্রান্ত হওয়ার কিছু পরেই আকাশে কালো কালো মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হলো। তারপর প্রায় বিকাল সাড়ে চারটায় প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হলো, ক্রমাগত প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা; পরের দিন সকালে দেখা গেল কুয়ো, খাল, নদী, নালা, বিল সব জলপূর্ণ; মাঠে যে বিরাট বিরাট ফাটল ধরেছিল, সেগুলো সব জোড়া লেগে গেছে।

এই খবর চারপাশে ব্যাপ্ত হলো। দূর দূর থেকে, যেখানে বৃষ্টি হয়নি, লোক আসতে লাগল সেখানে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজো করবার জন্য। আমরা যথাসাধ্য সাইকেল করে গিয়ে অনেক জায়গায় ঐভাবে পুজো করতে লাগলাম। আর সেইভাবেই বৃষ্টি হতে লাগল। অনেক জায়গায় লোকেরা ঠাকুরের ছবি কিনে নিয়ে গিয়ে বামুন দিয়ে পুজো করালে এবং সেই একই ফল হলো।

একদিন জয়রামবাটীতে ললিত চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে কথাবার্তা হচ্ছে। মার এত কৃপা তবুও মদ ছাড়তে পারল না, অথচ মার প্রতি অসাধারণ ভক্তি। এইসব কথাবার্তা শুনে মা বলেছিলেন : “নাটাইতে লাল নীল সুতো গোটায়। গোটাবার সময় যেমন লাল নীল সুতো ক্রমে ক্রমে জড়ায়, আবার খোলবার সময়ও সেইসব লাল নীল সুতো পর পর খুলবে। তবে দুটোতে প্রভেদ অনেক—একটায় কর্মবন্ধন জড়াচ্ছে, আর একটায় কর্মবন্ধন খুলছে—দেখতে কিন্তু একরকম।”

উদ্বোধনে পুজোর বেদিতে অনেক ঠাকুর—ঠাকুর রাধাকৃষ্ণ, মার গোপাল, জগদ্ধাত্রী-কবচ, যোগেন-মার দুটি গোপাল, বাণেশ্বর, দুটি গোবর্ধনশিলা ও ঠাকুরের পট, কপিল মহারাজের মা-কালী ইত্যাদি। কপিল মহারাজের অসুখ করায় (বৈশাখ ১৩২৫) মঠ থেকে আমাকে উদ্বোধনে পুজো করতে পাঠানো হলো, বলরাম-মন্দিরে বাবুরাম মহারাজের দেহরক্ষার (১৪ শ্রাবণ ১৩২৫) কিছুদিন পূর্বে। বাড়িতে থাকাকালীন বাণেশ্বর, শালগ্রাম, শিব, গোপালকে যেভাবে পুজো করতাম, এখানেও সেইভাবেই করতাম। মা জয়রামবাটী থেকে এলে জিজ্ঞেস করলাম: "এসব ঠাকুর-দেবতা কিভাবে পুজো করব?" জিজ্ঞেস করলেন: "এখন কিভাবে কর?" আমি পূর্বাশ্রমে আমার ঠাকুমার কাছে যেসব মন্ত্র শিখেছিলাম সেইগুলি বললাম। তিনি বললেন: "নিজ ইষ্টবীজে সব পুজো করবে, ইষ্টই তো সব হয়ে রয়েছেন।" বলে ইষ্টবীজের সঙ্গে এক-একটি দেবতার নাম 'নমঃ' শব্দ যোগে বসিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। আবার বললেন: "কখনো যদি অন্য দেবদেবীর পুজো করবার ইচ্ছা হয় তো ঠাকুরের মূর্তিতে করলেই চলবে। কারণ, ইষ্ট ও তিনি এক এবং তিনিই সর্বদেবদেবীস্বরূপ হয়ে আছেন।"

একদিন দ্বিজেন (স্বামী গঙ্গেশানন্দ) প্রভৃতি আমরা সকলেই চা খাওয়ার পর 'খিদে পেয়েছে', 'খিদে পেয়েছে' করছি। অর্থাৎ সকালবেলায় ঠাকুরের যে প্রসাদ বিতরণ করা হয় সেটা করতে দেরি হচ্ছে। গোলাপ-মাই বিতরণ করেন। আমি ন'টার সময় স্নান করে সাড়ে ন'টায় পুজোয় বসি। পুজো সারতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যায়। পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখে গোলাপ-মা স্নান করতে গঙ্গায় গেছেন, ফিরতে খুব দেরি হচ্ছে। দেরি দেখে মা ঠাকুরের নৈবেদ্য দুভাগ করে একভাগ ঠাকুরের জন্য আগে তুলে রেখে বাকিটা নিবেদন করে ছেলেদের জন্য পাঠালেন। মহাপুরুষ মহারাজ শুনে বলেছিলেন: "এ সকলে করতে পারে না, মা-ই করতে পারেন।"

একদিন উদ্বোধনে চন্দন ঘষছি, মা উত্তরদিকের দরজার ধারে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মুখ করে মালাজপ করতে বসছেন। কেউ নেই দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "মা, মাঝে মাঝে মন দুর্বল হয়ে পড়ে কেন?" তিনি শুনেই মালা রেখে বললেন: "ওদিকে নজর দিও না, কার মনে দুর্বলতা না আসে এক ঠাকুর ছাড়া? আজ পর্যন্ত এমন কোন মহাপুরুষ জন্মেছেন কি, যাঁর মনে কখনো কোন দুর্বলতা ওঠেনি? যদি শুধরোবার চেষ্টা থাকে, যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, আমার মনে দুর্বলতা উঠেছে—তাহলে ঐ জিনিসটাই একটা মস্ত শিক্ষা; মহামায়া খুশি হয়ে তখন তাকে পথ ছেড়ে দেন। মানুষ কিছুদিন ভাল থাকলেই মনে করে 'আমার সব হয়ে গেছে', আরও উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা ছেড়ে দেয়। কিন্তু বিবেকীর মনেও মাঝে মাঝে দুর্বলতা দিয়েই ঠাকুর স্মরণ করিয়ে দেন যে, এখনো সাধনা শেষ হয়নি, ভূত-প্রেত সব ওত পেতে চারপাশে বসে আছে, সুবিধে পেলেই ঘাড়ে চেপে বসবে। এতে হয় কি—অহঙ্কার নষ্ট হয়। যতদিন বাঁচবে সাবধানে ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকবে, অহঙ্কার হলেই ঐসব হিজিবিজি মনে উপস্থিত হবে। শেষপর্যন্ত শরণাগতির ভাব নিয়ে থাকতে হয়। ঠাকুর একবার নিজের শরীরে কামের বেগ ধারণ করে দেখালেন, জীবের অহঙ্কার করবার কিছুই নেই।"

উদ্বোধনে একদিন বিকেলে ঠাকুর তুলছি—মা খাটে বসে। যোগেন-মা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন: "কেমন গা, এখানে কেমন লাগছে?" আমি বললাম: "এখানকার কাজ বড় একঘেয়ে; সেইজন্য মা এখানে না থাকলে অনেকসময় বড় শুকনো বোধ হয়। এখানে শাস্ত্রটাস্ত্র পড়াবার লোক-টোক নেই।" মা বললেন: "ঠাকুরের সেবা শুকনো হবে কেন? মনে বিচার করে দেখতে হয়, কেন শুকনো লাগছে? মানুষের মন এক-একটা অবস্থায় থেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্য অবস্থায় গেলে ভাল লাগে না, দেহ মন ঠিক আগের মতনই চায়। তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, দেখবে তিনি কেমন মন সরস করে দেন। আর সাধনার প্রথমজীবনে দিনরাত জ্ঞানচর্চা ভাল নয়, মনটা শুকিয়ে ওঠে। ঠাকুরের লীলাচর্চা করলেই দেখবে আবার মন কেমন সরস হয়ে উঠেছে। শরৎ কেমন সুন্দর 'লীলা-প্রসঙ্গ' লিখেছে, মাস্টারের লেখা 'কথামৃত' শুনলে প্রাণ শীতল হয়ে যায়। অক্ষয়মাস্টারের 'পুঁথি' রোজ একটু করে পোড়ো। সময় করতে পারলে রোজ আমিই একটু করে শুনতাম।"

কিছুক্ষণ বাদে নিচে এস দেখলাম, কে একখানা বাইবেল রেখে কোথায় গেছে। সেখানা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ল—"And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of

water, whose waters fail not."[৭]

উদ্বোধনে একদিন পুজোয় বসে বাণেশ্বর শিবকে স্নান করাবার সময় আমার হাত পিছলে পড়ে গিয়ে গড়গড় করে গড়িয়ে গেলেন। আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে তুলে এনে যথাস্থান গৌরীপট্টে স্থাপন করলাম। পরদিন সকালে রামকৃষ্ণপুর থেকে নীরদ মহারাজের (স্বামী অম্বিকানন্দ) মা[৮] এসে বললেন: "বাবা, কাল তুমি মহাদেব স্নান করাবার সময় হাত থেকে ফেলে দিয়েছ?" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম: "মা, আপনি জানলেন কেমন করে?" তিনি বললেন: "কাল স্বপ্নে দেখি, একটি পাঁচ বছরের ধবধবে ছেলে, মাথায় ছোট ছোট জটা, ন্যাংটো, নাচতে নাচতে এসে বলছে, 'আমায় ফেলে দিয়েছে'!" মা সামনে পা ছড়িয়ে বসে—কার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু সব শুনছেন। ভয়ে আমি তখন "গুরু কৃপাহি কেবলম্" জপ করছি—বুকের ধক্‌ধকানি নিজেই শুনতে পাচ্ছি! মা নীরদ মহারাজের মার দিকে তাকিয়ে বললেন: "ছোট ছেলেরা অমন কত পড়ে খেলতে গিয়ে।" তারপর হেসে বাণেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন: "তুমি বাবা অষ্টমূর্তিতে জগৎ ছেয়ে রয়েছ, ও অতটুকু ছেলে তোমায় ধরে রাখবে কেমন করে?" আমি মনে মনে বুঝলাম—"শিবঃ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরুঃ রুষ্টে ন কশ্চন।" যোগেন-মা বললেন: "এবার থেকে সাবধান হবে।" আমি তিনজনকেই নমস্কার করলাম। নীরদ মহারাজের মা আমাকে বললেন: "আমার বামুন বৃন্দাবনে চামরবীজন, চণ্ডীপাঠ করবে।"

আরেকদিন মার মিশি ফুরিয়ে গেছে। নীরদ মহারাজের মা সকালে মিশি নিয়ে হাজির। বললেন: "কাল স্বপ্নে দেখি মা মিশি চাইছেন।" বাড়ির সকলকে বলতে সকলে হেসে উঠল: "এত জিনিস থাকতে মা মিশি চাইছেন!" মা বললেন: "হ্যাঁ-গো, আমার মিশি ফুরিয়ে গেছে।"

উদ্বোধনে আমরা একবার নিচে খুব হট্টগোল করছি। তাতে গোলাপ-মা মাকে বলছেন: "তোমার ছেলেদের ওপর কোন শাসন নেই। পরমহংস মশাই ছেলেদের কেমন শাসনে রাখতেন। কারুর একচুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিল না।" মা বললেন: "কি জানি মা, আমি কারুর কিছু খারাপই দেখতে পাইনে, তা শাসন করব কি? আমি যে মা! আমি শাসন করব কি করে? আমি ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করে নিই। এরা ঠাকুরের ছেলে, শাসন করব বললেই হলো! তিনি কেমন সব ঠিক করে নেন। তাঁর আপনভোলা ভালবাসায় সব সোজা হয়ে যায়। আমাদের প্রেমের ঠাকুর, তাঁতে কোন কঠোর, রূঢ় ভাব নেই। যখন লোকে বলে—'আচ্ছা, এর ফল ভগবান দেবেন।', আমি কিন্তু তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, নির্বোধ সুবোধ সকলেরই মঙ্গল কর।' আমি ছেলেদের বলি—কাউকেও হিংসা করো না, ভগবানকেও বিচার করতে বোলো না। বরং যাতে অত্যাচারীর ভাল হয় তার সম্বন্ধে প্রার্থনা কোরো। ভগবানের বিচার নিক্তিধরা, একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। কিন্তু তাঁর দয়ারও আবার শেষ নেই।"

মার এই উপদেশটুকুর সঙ্গে তুলনা করলে বাইবেলের আমাদের পড়া কথাগুলো ছোট বলে বোধ হয়।—"Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord." (Romans, 12.19) "Say not, I will do so to him as he hath done to me." (Proverbs, 24.29) ভগবান যীশু কিন্তু বলেছিলেন: "Father, forgive them; for they know not what they do." (St. Luke, 23.34) "For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them." (Ibid., 9.56)

একবার কয়েকজন একজনের সম্বন্ধে মিথ্যাকথা প্রচার করে। মা শুনে রাসবিহারী-দাকে বললেন: "ওকে চৌবাচ্চা থেকে জল ছুঁড়ে ওদের মারতে বল, নইলে তারা দগ্ধ হয়ে যাবে!"

একজন খুব ছটফটে। মা তাকে একটু স্থির হয়ে ধ্যানজপ করতে বলেন। সে বলে: "মা, মন বসে না তো কি করব?" মা বললেন: "ধ্যান না হয় কঠিন, আমরা মেয়েমানুষ জপেতেই আমাদের সব হয়, নয় তোমরা তাই কর। একটু স্থির হয়ে বসে জপ করতে হয়। দশ-বিশ হাজার জপ রোজ করে দেখ কেমন মন আপনি নুইয়ে না আসে; যদি না আসে তখন বোলো। সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া ধ্যান হওয়া বড় কঠিন। তবে পুরুষমানুষ হলেই হয় না, মনে জোর চাই, বৈরাগ্য হওয়া চাই; নির্বাসনা এবং ভগবানে ভালবাসা না হলে ধ্যান হওয়া বড় কঠিন। চাররকম ধ্যানসিদ্ধ আছে—

৭ Isaiah, 58.11 ৮ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহি-পার্ষদ নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

(১) যারা জন্ম থেকেই সুকৃতি নিয়ে এসেছে, (২) যারা গুরুর শিক্ষা স্বীকার করে নানান রকমে অভ্যাস করতে করতে ধ্যানসিদ্ধ হয়েছে, (৩) আবার ঠাকুর বলতেন—'কৃপাসিদ্ধ'। গুরু কৃপা করে তাদের মনকে সংসার থেকে তুলে ধরেছেন। তাদের মনটা জলের ওপর পদ্মফুলের মতো ভাসে। এরা কৃপাসিদ্ধ। আর (৪) ঠাকুর বলতেন—'হঠাৎ সিদ্ধ'। যেমন, লোকে যেকোন কারণে হোক অপরের সম্পত্তি পেয়েছে। এদেরও পূর্বের তপস্যা আছে, কিন্তু কোন মোহে পড়ে বহুদিন ধরে প্রারব্ধ ভোগ করছিল, যেই প্রারব্ধ কেটে গেল, আর যেন রাস্তায় যেতে যেতে বহুমূল্য মানিক পড়ে পেল।

"ঠাকুর তো এবার দয়া করে লোকের মঙ্গলের জন্য কঠোর তপস্যা করে গেলেন। ছিল শুধু হাড় আর চামড়া, তার ওপর আবার লোকের পাপ নিয়ে রোগভোগ। তাঁতে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস করলেই, তাঁর নামজপ, তাঁর লীলাধ্যান করলেই কুণ্ডলিনী আনন্দে আপনি জেগে উঠবেন, এতটুকুও কঠোরতা করতে হবে না। কলিকাল, এখন কি আর লোকে সত্য-ত্রেতার মতো তপস্যা করতে পারে? এখন অন্নগত প্রাণ। ঠাকুরের নাম কর, দেখো তিনি খাওয়া-পরার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠাকুরের নাম করলে এবার কেউ কখনো অন্নকষ্ট পাবে না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন। গুরু-ঈশ্বরের সাহায্য না পেলে কি কেউ আপনি বন্ধন খুলতে পারে? তাই ঠাকুর অতি কঠোর তপস্যা করে তার ফল যেসব ভক্তেরা আসবে তাদের জন্য সঞ্চয় করে রেখে গেলেন। তিনি তো কৃপা করে দরজায় দাঁড়িয়ে, এখন তুমি দরজা খুললেই হয়!"

লোকটি ভাবতে লাগল, একবার শ্রীভগবান এলেন এবং সত্যের জন্য অক্লেশে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেই ত্যাগের ফলটি রেখে গেলেন বিশ্বাসী ভক্তদের জন্য। যারাই যীশুতে বিশ্বাসী হবে, সেই মুহূর্তেই তারা শ্রীভগবানের ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং পাপমুক্ত হবে। আর এবার তাঁর কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ্রতা, সাধন-ভজন সব ভক্ত ও অনুরাগী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য। তাঁর কথা এখনো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বাসী ভক্তদের সামান্য সাধন-ভজনে, 'রামকৃষ্ণ'-নাম শ্রবণে কুণ্ডলিনী আনন্দে আপনি জেগে উঠবেন। ভোর হয়েছে; ওঠ, দরজা খুলে দেখ সামনেই সূর্য দাঁড়িয়ে আছেন!

একবার আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। মাকে বললাম: "এমনিই মন স্থির হয় না, তাতে আবার শরীরে অস্বস্তি থাকলে মনটা বসতেই চায় না।" মা বললেন: "দেখ, মনটাকে দুভাগ করতে হয়; একটা যেন বিবেকী, আরেকটা যেন অবিবেকী—ছেলেমানুষের মতো। বিবেকী মনটা বাপ-মার মতো সর্বদা অবিবেকী মনটার পিছনে লেগে থাকবে। একটা কিছু আবোল-তাবোল করলেই তাকে শাসন করবে, গালমন্দ করবে; দেখনি, বাপ-মা যেমন দুষ্টুছেলেটাকে বকে-ঝকে। দেখবে, এইরকম কিছুদিন অভ্যাস করলেই মনটা শায়েস্তা হয়ে আসবে। কিন্তু অবিবেকী মনে যদি একটা বিষয়ে বহুদিনের অভ্যাসের ফলে দৃঢ়সংস্কার জন্মে যায়, তাহলে শত তিরস্কারেও সেটা যেতে চায় না। তখন ঐ দুর্বল মনের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, নইলে আর কোন উপায় নেই। তিনি ঈশ্বর—সব করতে পারেন; তিনি একটা ছাঁচ ভেঙে আবার নতুন ছাঁচে তৈরি করতে পারেন। ঠাকুরের ইচ্ছের কাছে দেখেছি মানুষের মনগুলো যেন কাঁচামাটির তালের মতো হয়ে যেত; আর তিনি যাকে যেমন ইচ্ছে তাকে তেমনি করে গড়ে তুলতেন।"

একদিন উদ্বোধনে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা হচ্ছিল। একজন এসে বলল: "ওসব মশাই রেখে দিন, ঠাকুরের কথা কিছু বলুন, শোনা যাক।" যোগেন-মা স্নান করে সেই সময় ঘরে ঢুকলেন। বললেন: "ঠাকুরের কথা বলতে গেলেই তো শক্তিতত্ত্ব আগে ওঠে। যখন তীব্র ব্যাকুলতায় কালীঘরের খাঁড়া গলায় বসাতে গেলেন—'দেখা দিবি তো দে নয় এই গলায় দিলুম', মা দপ করে আবির্ভূত হলেন... জগতের আবরণ উঠে গেল—সব চিন্ময়! শুধু মূর্তিই নয়, কোশা-কুশি পর্যন্ত।" আমি বললাম: "মহাপুরুষ মহারাজ একদিন বলেছিলেন, একদিন তিনি ও মহারাজ ঠাকুরের ঘরে বসে আছেন; ঠাকুর খাটে, তাঁরা মেঝেয়—মাদুরে। সন্ধ্যা হতেই মন্দিরে আরতির ঝাঁজ-ঘণ্টা বেজে উঠল। তাঁরা আরতি দেখবার জন্য উসখুস করতে লাগলেন। তখন দেখেন, সামনে মা-কালী। মহারাজকে বলছেন, 'তুই ব্রজের রাখাল, তোর প্রতি আমার বাৎসল্যভাব।'" যোগেন-মা বললেন: "মথুরবাবু দেখলেন, ঠাকুর নিজের ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকের রোয়াকে পায়চারি করছেন। যখন সামনের দিকে তখন দেখছেন শিব, আর যখন পিছন ফিরছেন তখন দেখছেন কালী—এলোচুল। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।' ভগবান যোগমায়া-সমাবৃত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আয়ান ঘোষকে তার বোন কুটিলা

খবর দিল যে, তার স্ত্রী রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বেরিয়ে গেছে। আয়ান শুনে হাতে তলোয়ার নিয়ে দেখতে গেল, যদি সত্য হয় তো রাধাকে কেটে ফেলবে। গিয়ে দেখে রাধারানী খড়্গ-মুণ্ডধারী মার পুজো করছেন। তখন বলল, 'কই গো কুটিলে কুটিলকালা, এ যে হেরি কপালিনী।' শ্রীকৃষ্ণতে নিজের ইষ্টমূর্তি দেখে খুশি হয়ে আয়ান ফিরে এল।

"যোগমায়া-সমাবৃত রূপ এক শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া অন্য অবতারে কোন উল্লেখ নেই। চন্দ্রশেখরের বাটীতে শ্রীচৈতন্য চণ্ডীরূপ ধরলেন ঃ

'ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথ কোলে করি।
মহালক্ষ্মীভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সম্মুখে বসিয়া সবে জোড়হস্ত করি।
মোর স্তব পড় বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
জননী আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপ পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মীস্তব কেহ চণ্ডীস্তুতি।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেমন মতি॥'

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যলীলা, ১৮ অঃ)

"এজন্য ভক্তেরা এঁদের সাক্ষাৎ ভগবান বলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, 'চৈতন্য ও কালী এক বোধ হলে, তবে তার জ্ঞান হয়েছে।' গোপালের মা আমাদের ঠাকুরকে গোপালরূপেই দেখতেন। নীরদ মহারাজের মার রামকৃষ্ণপুরের বাড়িতে ইষ্টদর্শন হলো—রামচন্দ্র! সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে পায়ের ধুলো নিলেন, মাথা তুলে দেখেন ঠাকুর! হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বৌমা, এবার বিশ্বাস হলো?' ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কোন দেবদেবীর চিন্তা করতে পারি না। তাঁদের চিন্তা করতে গেলেই ঠাকুরের কথা মনে পড়ে। নীরদ মহারাজের মার ঐরূপ দর্শনের আগে ছিন্নমস্তার ভাব হয়, দিনরাত হাতে মাথাটা ধরে রাখতেন। ঠাকুর যে সর্বদেবদেবীস্বরূপ। কলির জীবের পুজো নেবার জন্য সর্বদেবদেবী তাঁকে আশ্রয় করে রয়েছেন।"

গোলাপ-মা বলতেন ঃ "কোন একটা বিপদ-আপদ বা শক্ত অবস্থা এলে মা খুব জ্ঞানীর মতো ব্যবহার করতেন। যখন ঠাকুরের অসুখের সময় তারকেশ্বরে ধরনা দিলেন, শুনতে পেলেন কতকগুলো হাঁড়িভাঙার শব্দ; অর্থাৎ দেহ যাওয়া মানে পঞ্চকোষরূপ হাঁড়ি ভেঙে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মধ্যে যা ছিল তা তেমনি রইল। কেবল ভক্তদের জন্য একটা দিব্যশরীর নির্মাণ করে কিছুদিন খেলা করেন। ঐ শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনে হলো—কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? সেই সময় একদিন মা স্বপ্ন দেখলেন, মা-কালী ঘাড় বেঁকিয়ে আছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে কেন?' ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে মা-কালী বললেন, 'ওর (ঠাকুরের) ঐটের জন্য। আমারও বড় ব্যথা তাই।' ঠাকুর দেহ রাখলে মা কেঁদেছিলেন, 'আমার মা-কালী গো, আমায় একলা রেখে তুমি কোথায় গেলে!' "

রাসবিহারী মহারাজকে[৯] একবার মা বললেন ঃ "এ দুনিয়া স্বপ্নবৎ। ভাব, লীলা-টীলা সব স্বপ্নবৎ। আমার সঙ্গে কথা বলছ—এও স্বপ্নে। একমাত্র ঠাকুরই সত্য।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "পঞ্চকোষ ভেঙে গেলে তো তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হলেন, তাহলে 'লীলাশরীর'-এর কথা যে শোনা যায়, সেটা কি?" মা বললেন ঃ "সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, তবে কখনো কখনো দিব্যশরীর নির্মাণ করে তিনি ভক্তসঙ্গে লীলা করেন।" এই প্রসঙ্গে গোলাপ-মা বললেন ঃ "যে যেমন ঘরের—তাকে মা তেমনি কথা বলতেন। আমাকে (গোলাপ-মাকে) ঠাকুর বলতেন, 'শ্যাম জ্ঞানই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জগৎ, খেলা, লীলা—সব সত্য'।"

আমি রাসবিহারী মহারাজের কাছে শুনেছি, তিনি একদিন (কাশীতে) মাকে বলেছিলেন ঃ "নির্বাণ চাই না মা, তাহলে তোমায় পাব না।" মা শুনে বললেন ঃ "বোকা ছেলে! নির্বাণই যে তাঁর স্বরূপ!"

গোলাপ-মা বললেন ঃ "ঠাকুরের দেহরক্ষার পর অস্থি রাখা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে গোল বাধল। মা বললেন, 'দেখ গোলাপ কী কাণ্ড! অমন সোনার মানুষই চলে গেল, তার সঙ্গে খোঁজ নেই, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে!' "

উদ্বোধনে দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে গোলাপ-মা একদিন আমাকে ডেকে বললেন ঃ "দেখ হরিহর[১০], আমার বোধহয় দেহ আর থাকবে না; কেবলই দেখছি—একটা গৈরিকধারিণী রুদ্রাক্ষপরা ত্রিশূলধরা মেয়ে আমার শরীর থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তখন যেন দেহটা মড়ার মতো পড়ে থাকে।

৯ শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সেবক—স্বামী অরূপানন্দ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'
১০ লেখকের পূর্বাশ্রমের নাম—হরিহর মুখোপাধ্যায়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মায়ের শরীররক্ষার অনেক পরের কথা। একবার মনটা বড় চঞ্চল। ধ্যান, জপ-টপ যেন সব যান্ত্রিক (mechanical) হয়ে পড়েছে, করতে হয় সময়মাফিক করে যাচ্ছি। 'দেখি মা যদি কিছু বলেন' বলে 'মায়ের কথা' খুললাম। খুলতেই যেখানে চোখ পড়ল দেখি লেখা—"রোজ কি কারুর ঈশ্বরদর্শন হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ ফেললে কোনদিন পেল, কোনদিন পেল না, তা বলে কি চেষ্টা ছাড়তে আছে?'... এত চঞ্চল হলে চলবে কেন। যা পেয়েছ তাতেই লেগে থাকো। আর কেউ তোমার থাক না থাক, আমি তো তোমার মা আছি। ঠাকুরের কথা মনে নেই?—যারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, তাদের কাছে তিনি প্রকাশ হবেনই, অন্ততঃপক্ষে শেষের দিন তিনি নিজে এসে সকলকে নিয়ে যাবেন।"

গদাধর আশ্রম। একজন ভক্ত একদিন প্রশ্ন করল: "মা কি এখনো আপনাকে উপদেশ করেন?" আমি ঘাড় নেড়ে বললাম: "করেন।"

"কিন্তু এখন তো তিনি স্থূলশরীরে নেই?"

"স্থূলশরীরে যেসব উপদেশ, সেসব তো বইতে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন যে-উপদেশ করেন তা অনেকটা প্রতীকোপদেশ—symbolic spiritual instructions। প্রতীকটার আচ্ছাদন ভেঙে ফেললেই একটা মস্ত সত্য তা থেকে আত্মপ্রকাশ করে।"

"সে কেমন?"

"যখন চাটগাঁ থেকে কলকাতায় বোমা পড়া আরম্ভ হলো, কলকাতায় জিনিসপত্র খুব আক্রা বা পাওয়াই যায় না। মাঝে মাঝে কলের জল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কি করে আশ্রম চলবে? তার ওপর এই পুরনো বাড়ি (গদাধর আশ্রম)! স্বপ্নে দেখি শ্রীশ্রীমা—গণেশ-কোলে! তখন বুঝলাম ভয় নেই, মা কোলে করে আছেন।

"একবার কৃষ্ণপুজো করতে গিয়ে মনে হলো, মার পুজোটা আগে করে নিলাম না! কিন্তু তারপর যতবারই ধ্যান করি দেখি শিবের বুকে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে! একবার শিবকে মায়ের একটা বিভূতি বলে বোধ হলো। কিন্তু সেইদিনই মধ্যরাত্রে ধ্যানের সময় প্রথমেই দেখি শিবের বুকে শিব দাঁড়িয়ে—বাগছাল-পরা, কিন্তু হাতে খড়্গ-মুণ্ড! বুঝলাম কালী-কৃষ্ণ এবং শিব-শক্তিও এক।

"গীতা, ভাগবত, চণ্ডী পাঠ করবার সময় যেসব তত্ত্ব কখনো ভাবিওনি—ব্যাখ্যা করবার সময় কিন্তু আমার অশ্রুতপূর্ব সেইসব তত্ত্বকথা আপনি বুদ্ধির ভিতর জেগে ওঠে। দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তখন বুঝি, মা আমার ও দশের জন্য সেগুলো যোগান দিয়ে দিচ্ছেন —'এলে' দিচ্ছেন। আবার কখনো মনে হয়, এসব বুদ্ধির কল্পনা; কিন্তু হয়তো দীর্ঘকাল পরে দেখা গেল একটা কোন পুরাণ বা ভাষ্য বা টীকা বা উপনিষদের মধ্যে সেটি আছে। জানলাম কি কিরে? কেউ বলে: "পূর্বে হয়তো কোথাও পড়েছিলেন বা কারুর কাছে শুনেছিলেন, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন; এখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা পেয়ে জেগে উঠল বা বুদ্ধ্যারূঢ় হলো।" কেউ বলে: "হয়তো জন্মান্তরে পড়াশোনা ছিল, এখন সেগুলো অনুশীলন করতে করতে জেগে উঠেছে।" কিন্তু সেগুলো ছিল কোথায়?—নিজেরই অজ্ঞানভূমিতে। আমার এই অজ্ঞানভূমিটা (unconcious plane) কিসের অংশ? বিরাট অজ্ঞানের—"Great unconcious"-এর। এই যে বিরাট অজ্ঞানভূমি, এটাকে আমি একেবারে জড় মনে করি না। তিনি যখন ব্রহ্মশক্তি, তখন তিনিও চৈতন্যময়ী। সেজন্য কোন কোন দার্শনিক একে "Great unconcious conciousness" বলেন। এখন যাকিছু নাম-রূপ সবই তো এঁর গর্ভে। ইনিই তো বস্তুর ভিতর উচ্চ-নীচ ভাবাদর্শ প্রকাশ করছেন। আপেল পড়া দেখে নিউটনের মনের ভিতর যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটি জেগে উঠল, সেটি হলো কতকগুলো জাগতিক ঘটনার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। নিউটনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহামায়া তার জ্ঞানভূমিতে সেটি আরূঢ় করে দিলেন তাঁর মহামৌন অতল গর্ভ থেকে। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে"! কত লোকে কত culture করছে, কিন্তু কোন কিছুরই হদিস পাচ্ছে না—discovery বা invention কিছুই হচ্ছে না—মা তমঃরূপে তাকে আটকে রেখেছেন। আবার যখন তার ওপর খুশি হলেন তখন সত্ত্বরূপে তার ভিতর উদিত হয়ে সে যেটা দেখতে পাচ্ছিল না সেটা তাকে দেখিয়ে দিলেন।

"আমি শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে এখন এইভাবে উপদেশ পাই বলে মনে করি।"

আরেক রকমে তাঁর কথা শোনা যায়। যেমন—মহাসমস্যায় পড়েছি, তাঁর নামজপ করতে করতে হঠাৎ একটা সমাধান এসে উপস্থিত হয়; তখন বুঝি এ তাঁরই প্রেরণা। আবার দুজনে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, তার দু-চারটি কথা কানে গেল—সেটা জীবনের মহা ইঙ্গিত বলে বুঝতে পারলাম, তা তাঁরই কথা বলে বোধ হয়।

একটা সামান্য লোকের কাছে নিজের কষ্টের কথা বললাম, সে তার চমৎকার সমাধান করে দিল, যা তার পক্ষে অসম্ভব বলে বোধ হয়। এইরূপ নানাভাবে তিনি নানা কথা বলেন। তবে জ্ঞানীরা বলেন, এসব unconcious activity (মনের অচেতন ভূমির ক্রিয়া), কেবল বুদ্ধ্যারূঢ় হয় মাত্র। কিন্তু আমি বলি unconcious জড়, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন সিদ্ধান্তই মানুষ করতে পারে না।

জীব-চৈতন্যকে সেই অধিষ্ঠান বলা যায় না, কারণ জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানাবৃত, সে সর্বজ্ঞ নয় বা স্বতন্ত্রও নয়। এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়েছে, যা পুঁথি-পাতা বা বিজ্ঞানও কল্পনা করতে পারে না। জীব-চৈতন্যের অধিষ্ঠানে ভিতরের কতকটা সমাধান হতে পারে, কিন্তু বাইরের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জটিল সমস্যার সমাধান ঘটে কি করে? এইজন্যই ভাবি, মা-ই দয়া করে মাঝে মাঝে এইভাবে উপদেশ করেন।★ ☐

★ এই স্মৃতিকথাটি আমরা পেয়েছি স্বামী বাসুদেবানন্দের বিশেষ স্নেহভাজন স্বামী বেদান্তানন্দের সৌজন্যে। স্বামী বেদান্তানন্দ কৃষ্ণনগর (উকিলপাড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের (জেলা—নদীয়া) অধ্যক্ষ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

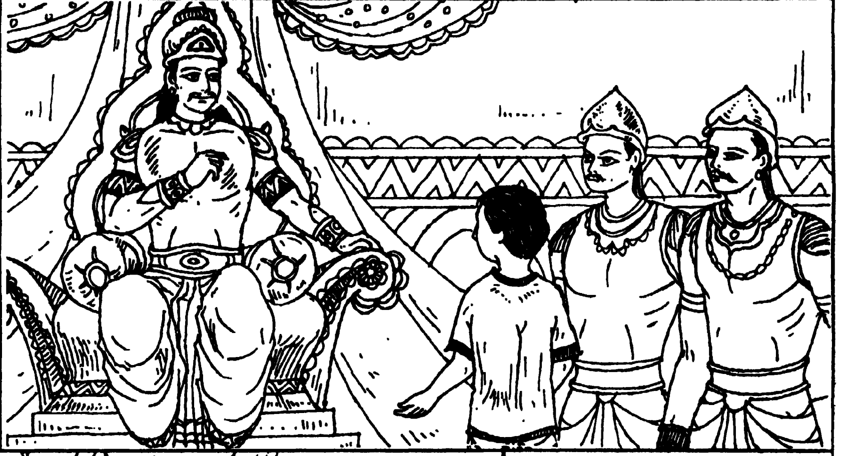
ধ্রুবের উপাখ্যান ৫

কথা : ভগিনী নিবেদিতা ☐ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত



দূরে রাখাল বালকেরা গরুর পাল নিয়ে মাঠে চরাতে যাচ্ছে। কখনো ধ্রুব পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, কখনো বা রক্ষীর কোলে চড়ে।

অবশেষে তারা রাজ-দ্বারে উপস্থিত হলো। সান্ত্রী-সেপাইদের পিছনে ফেলে ধ্রুব এগিয়ে চলল রাজসভার দিকে। সেখানে গিয়ে ধ্রুব রাজাকে দর্শন করল।





তারপর ছুটে গিয়ে রাজার দু-বাহুর মধ্যে আশ্রয় নিল। দীর্ঘ সাত বছর পর শিশুপুত্রটি হৃদয়ে পূর্ণ আস্থা ও ভালবাসা নিয়ে পিতার কাছে নিজেই এসেছে। আনন্দে অভিভূত রাজা তাঁর পুত্রকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুললেন। [ক্রমশঃ]

[অনুবাদ : শুভ্রা দাশগুপ্ত]

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

সুহাসিনী দেবী

আমার মা সুহাসিনী দেবী উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যেসব কথা ভক্ত মহিলাদের বলতেন এবং আমার মাকেও যা বলতেন সেগুলি তিনি খাতায় লিখে রাখতেন। গৌরী-মা এবং ঠাকুরের কয়েকজন সন্তানের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে যাঁদের সান্নিধ্য মা লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ। মা তাঁদের কথাও তাঁর খাতায় লিখে রাখতেন। মায়ের এই খাতা একদিন সরলাদেবী (পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) দেখেছিলেন। তিনি খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন: "এটা তুমি খুব ভাল কাজ করেছ। একদিন মা-ও তো ঠাকুরের কাছে চলে যাবেন। তখন তো আমরা আর তাঁর মুখের কথা শুনতে পাব না। লেখা থাকলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হলে পড়ে শান্তি পাবে। তুমি পড় বা যে-ই পড়ুক তারই মনে ভক্তি-ভালবাসা ও পবিত্রতার ভাব জেগে উঠবে।" মা তাঁর খাতায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে যা লিখে রেখেছিলেন তা এখানে তুলে ধরছি।

নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ, জেলা—হুগলী।

প্রথম সন্তান (কন্যা) শান্তি হবার পর দুটি যমজ মেয়ে হয়। কিছুদিন পর মেয়ে-দুটি মারা যায়। স্বাভাবিকভাবেই আমার মন তখন খুব খারাপ। আমার বাল্যবন্ধু সরলা-দি আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যায়। এটি ১৯১৮ সালের কথা। সরলা-দি তখন বোসপাড়া লেনে ভগিনী নিবেদিতার স্কুলে থাকত। এই সরলা-দিই পরবর্তী কালের সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। নিবেদিতার স্কুল থেকে সরলা-দি এসে মায়ের সেবা করত। মা তাকে খুব স্নেহ করতেন। সরলা-দি আমাকে উদ্বোধনে নিয়ে যায়। তখন 'মায়ের বাড়ী' এতটা বড় ছিল না। মা তখন দোতলায় তাঁর ঘরে পূজা করছিলেন। বারান্দা (তখন বারান্দাটি ছোট্ট একফালি ছিল) থেকে মাকে দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম মা গভীর ধ্যানমগ্না। আমি ধ্যানরতা মাকে এবং সিংহাসনে ঠাকুরকে দেখছিলাম। মাকে সেই আমার প্রথম দর্শন। দেখে মনে হলো, সত্যিই মা যেন জগজ্জননী। দেখতে খুব সুন্দরী নন, তবে কী এক জ্যোতিঃ যেন তাঁর সারা মুখে মাখানো। সেই মুখে অপূর্ব করুণার ভাব। কিছুক্ষণ পর মা চোখ মেলে ফুল, নৈবেদ্য দিয়ে একমনে ঠাকুরের পূজা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর ভোগ নিবেদন করে মা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সরলা-দি এবং আমি মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। মা সরলা-দিকে জিজ্ঞেস করলেন: "মেয়েটি কে?" সরলা-দি বলল: "আমার ছোটবেলার বন্ধু। কাছেই থাকে।" বলেই সে আমার বাবা-মার পরিচয় দিল। তারপর বলল: "কিছুদিন হলো ওর দুটি যমজ মেয়ে মারা গেছে। খুব মন খারাপ। তাই আপনার কাছে আনলাম।" শ্রীশ্রীমা মমতা-মাখা কণ্ঠে বললেন: "আহা বাছারে!" বলে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন: "বেশ তো, তুমি মাঝে মাঝে যখনই সময় পাবে আমার কাছে চলে এসো মা।" মায়ের সেই স্নেহস্পর্শে এবং মমতা-মাখানো কথায় আমার শরীর-মন যে কী হয়ে গেল তা আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। কী স্নেহ ও করুণা-মাখা সেই অপূর্ব দুটি চোখ আর কী প্রাণজুড়ানো সেই করস্পর্শ! মনে হলো যেন কত জন্ম-জন্মান্তরের আমার মা তিনি—কত স্নেহ, কত মমতা, কত করুণা পূর্ণকুম্ভের মতো বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন শুধু আমারই জন্য। মা গোলাপ-মাকে বললেন আমাদের প্রসাদ দিতে। গোলাপ-মা আমাদের ফল-প্রসাদ দিলেন। মা বললেন: "খাও মা। প্রসাদ খেয়ে হাত ধুয়ে চরণামৃত খেও।" আমরা তাই করে মায়ের ঘরে এসে বসলাম। মা কত কথা বললেন। সরলা-দি চুপি চুপি আমাকে বলল: "এবার আমাদের যেতে হবে, নইলে মায়ের জলখাবার খেতে দেরি হয়ে যাবে। গোলাপ-মা বকাবকি করবেন।" ইচ্ছে না থাকলেও উঠতে হলো। মাকে প্রণাম করতে মা দুহাত মাথায় দিয়ে বললেন: "এসো মা। ঠাকুর তোমার মনে শান্তি দিন। আবার এসো।" জীবন্ত জগজ্জননীকে প্রাণভরে দেখতে দেখতে সেদিনের মতো বিদায় নিলাম।

তারপর প্রায়ই যেতাম উদ্বোধনে মায়ের কাছে। কখনো সরলা-দির সঙ্গে, কখনো একাই, আবার কখনো সুধীরা-দি (সুধীরা বসু) কিংবা প্রফুল্ল-মাসির (বাল্যবিধবা—সরলা-দির ছোটমাসি) সঙ্গে। যতক্ষণ মার কাছে থাকতাম, খুব ভাল লাগত। তারপর আমার ছেলে হরু হলো। তখন আমরা এখনকার নিবেদিতা লেনের বাড়িতে। হরুর বয়স তিন-চার মাস হতে সরলা-দি বলল: "চল, মাকে তোমার ছেলে দেখিয়ে আনি।" গেলাম। আমাকে দেখেই মা বললেন: "এতদিন আসনি কেন গো?" আমি হরুকে মায়ের পায়ের কাছে রেখে বললাম: "এই যে মা—ছেলে হয়েছে বলে। একে আপনার পায়ের ধুলো দিন।" মা বললেন: "আহা, বাছাকে মাটিতে শোয়াচ্ছ কেন? দাও, আমার কোলে দাও।" হরুকে কোলে নিয়ে মা বললেন: "বাঃ, বেশ ছেলে!" হরুর মাথায় হাত বুলিয়ে মা আশীর্বাদ

করছেন দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম। মায়ের কাছ থেকে যখনই চলে আসতাম তখনই খুব মন খারাপ লাগত। কে জানে আবার কবে কখন আসতে পারব! আসার সময় মা মাথায় হাত দিয়ে, চিবুক স্পর্শ করে আদর করতেন। মায়ের এই ছোঁয়াটুকু যেন সবসময় লেগেই থাকত।

মা ছিলেন অন্তর্যামিনী। রোজ ভাবতাম—আহা, এতদিন মার কাছে যাচ্ছি, কখনো একটু মায়ের পদসেবা করার ভাগ্য হলো না! একটা দিনও যদি মায়ের পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম! মনের এই আকুতি মায়ের কাছে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারিনি গোলাপ-মার ভয়ে। বললে হয়তো মা নিজেই এটুকু সেবার অধিকার দিতেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে কাঁদতাম আর মনে মনে বলতাম: "মাগো, ঠাকুরকে তো দেখিনি—তোমার দয়ায় তোমাকে দেখলাম। তোমার কথা শুনলাম। তোমার চরণ স্পর্শ করলাম। আমার মাথায়, মুখে তোমার স্পর্শ পেলাম, কিন্তু সংসারী বলে কি আমার একটু সেবা নেবে না? তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেবার অধিকারও কি আমার নেই?" এরপরে একদিন মায়ের কাছে গেছি। সেদিন শান্তি আমার সঙ্গে ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, মা শুয়ে আছেন। দু-তিনজন ভক্ত মেয়ে মেঝেতে মাদুরে বসে। আমি দূর থেকে মাটিতে মাথা রেখে মাকে প্রণাম করতেই মা সস্নেহে বললেন: "এসেছ মা, বোসো। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। শরৎ, গোলাপ, যোগীন, সরলা সবাই ব্যতিব্যস্ত আমাকে নিয়ে। আমার নিজেরই লজ্জা লাগছে। তবে কি জান মা, দেহধারণ করলে দেহের ভোগ তো করতেই হবে।" এই কথা বলে মা চুপ করে রইলেন। আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন: "বুড়ো হয়েছি, বাতে ধরেছে। হাতে পায়ে বাতের ব্যথা। একটু টিপে দিলে আরাম হয়। তুমি একটু টিপে দেবে?" একজন ভক্ত মহিলা তৎক্ষণাৎ উঠে বললেন: "মা, আমি দিচ্ছি।" মা সস্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন: "তুমি বোসো মা। তুমি তো সেদিন কতক্ষণ দিলে। আজ সুহাস দিক।" আমার মনের ভিতর তখন ঝড় বইছে। আনন্দে বিস্ময়ে আবেগে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মনে মনে বলছি: "মাগো, তুমি অন্তর্যামিনী। তুমি আমার অন্তরের চাওয়া জেনেছ মা!" চোখের জল উপচে পড়তে চাইছিল। আমার পরম পাওয়ায় বুক-ভরা আনন্দের কান্না চেপে রেখে মাটিতে বসে মায়ের চরণে হাত বোলাতে থাকলাম। একটু পরেই মা বললেন: "ওকি! মাটিতে ওভাবে বসে কি হয় মা? তুমি উঠে এই তক্তপোশেই বসে একটু জোরে জোরে টেপ।" মায়ের আদেশ! মনে মনে ঠাকুর ও মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে তক্তপোশে বসে অনেকক্ষণ মায়ের তুলতুলে নরম পা-দুটি কোলে তুলে নিয়ে দেবতা, ঋষি, মুনির আরাধ্যা ও দুর্লভা আদ্যাশক্তির পদসেবা করলাম। একটু পরেই পাশ ফিরে শুয়ে মা বললেন: "খুব আরাম হচ্ছে।" মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, আমি শান্তিকে ইশারায় ডেকে চুপি চুপি বললাম: "আয়, তুইও একটু মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দে।" শান্তি তার কচি হাতে মায়ের পায়ে হাত বুলোচ্ছে দেখে মা হেসে বললেন: "ও মা, তুই! তোকে আর বুলোতে হবে না।" বলে ওকে একটু আদর করে চুমু খেয়ে পাশে বসতে বললেন। বেশ কিছুক্ষণ পর গোলাপ-মা এসে ঘরে ঢুকলেন। গোলাপ-মাকে দেখেই ভয়ে আমার হাত আপনা থেকেই থেমে গেল। এই বুঝি গোলাপ-মা বকুনি দেবেন মায়ের তক্তপোশে বসেছি বলে। মা চোখ বুজে ছিলেন। আমার হাত থেমে যেতে মা চোখ চেয়ে বললেন: "কি হলো গো?" তারপর গোলাপ-মাকে দেখে বুঝতে পারলেন সব। গোলাপ-মা মাকে বললেন: "আমাকে ডাকনি কেন?" মা কোমল কণ্ঠে বললেন: "তোমরা তো সবসময়েই করছ। এদেরও তো মনে ইচ্ছে হয়। তাই আমিই বলেছি। তক্তপোশে বসে পা টিপতে আমিই ওকে বলেছি।" গোলাপ-মা একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: "দাও গো মেয়ে, দাও।" এই প্রথম গোলাপ-মাকে হেসে এভাবে কথা বলতে দেখলাম। গোলাপ-মা হাসিমুখে মার ঘর থেকে চলে গেলেন। তার পরেও কিছুক্ষণ মায়ের পদসেবা করলাম। সন্ধ্যার মুখে মা বললেন: "থাক মা, থাক। এখন খুব আরাম লাগছে।" কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে হাত-দুটো দিয়ে আর কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছিল না। মনে হচ্ছিল—মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে রয়েছে হাত-দুটোতে, অন্য কিছুতে হাত দিলে সেই ছোঁয়া হারিয়ে যাবে। সেদিন রাত্রে আনন্দে আর ঘুম হয়নি। অন্তর্যামিনী মায়ের করুণার কথা ভেবে বারবার চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছিল। তারপরেও দু-তিনদিন ধরে হাত-দুটো দিয়ে কোন কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সন্ধ্যাবেলা শুনতাম—"দুর্গা দুর্গা, শিব শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণ, হরিবোল হরিবোল, গুরুদেব গুরুদেব, রাধা-শ্যাম, গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবারি, গোবিন্দ গোবিন্দ, জয় মা জগদম্বা।" মায়ের কাছে যে-ভালবাসা পেয়েছি তার কোন তুলনা হয় না। একদিন একজনকে মা বললেন: "সবসময় ঠাকুরের কথা চিন্তা করবে। দেখবে মন আপনা-আপনি শান্ত হয়ে যাবে।" মায়ের এই কথাটি আমি আজীবন মনে রেখেছি। জীবনে যখনই দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি, তখনই মায়ের কথাগুলি স্মরণ করে শান্তি পেয়েছি, শক্তি পেয়েছি।

একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে গিয়ে দেখি, মায়ের ঘরে বেশ কয়েকজন ভক্ত মহিলা বসে আছেন। মা শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে হাসিমুখে মা বললেন: "এস, এস। আজ যে মেয়েকে নিয়ে আসনি? ওরা সব ভাল আছে তো?" আমি বললাম: "হ্যাঁ মা, সবাই ভাল আছে। মেয়েকে আনলে বড় জ্বালাতন করে আপনাকে। অতিষ্ঠ করে তোলে সবাইকে। তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়। তাই আজ ওকে রেখে এসেছি।" মা হেসে বললেন: "কই, আমি তো বাপু বুঝতে পারি না আমাকে বিরক্ত করে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটু দুষ্টুমি তো করবেই। এই যে রাধিকে দেখছ—ও কি কম বিরক্ত করেছে? ওর মা তো পাগল! ওর যত কিছু আবদার আহ্লাদ সব আমার কাছেই। আর কী যে বায়না! কথায় বলে না, 'ভিজে চিনি শুকিয়ে খাব, শুকনো চিনি ভিজিয়ে খাব'—সেইরকম বায়না ছিল রাধির। বায়না না মেটাতে পারলে শুরু করে দিত চিৎকার, কান্না। কত কিল চড় যে আমাকে দিয়েছে কী বলব! আমার ওপরে রাধির অত্যাচার দেখে আমার মা অস্থির হয়ে যেত। গজর গজর করে বলত, 'নিজের পেটের তো একটা হলো না, যত সব পরের ঝঞ্ঝাট নিয়ে কেমন করে যে তুই হাসিমুখে থাকিস বাপু তা বুঝি না।' আমি আবার মাকে কতরকম বলে তবে শান্ত করতাম।" কথাগুলি বলে মা একটু চুপ করে থাকলেন। ঐ সময়ে একটি ভক্ত মেয়ে হাসতে হাসতে বলল: "আচ্ছা মা, আজ যদি দিদিমা থাকতেন তাহলে আরও কত অধৈর্য হতেন। আজ কত ছেলেমেয়ে 'মা মা' বলে এসে আপনাকে এত বিরক্ত করছে! আমরাও তো আপনার পেটে হইনি, তা বলে কি আমরা আপনার ছেলেমেয়ে নই?" একথা শুনেই মা উঠে বসলেন। তপ্তস্বরে বললেন: "কী বললে, আমার পেটে হওনি? তবে কার পেটে হয়েছ? আমার ছেলেমেয়ে নও? তবে কার ছেলেমেয়ে? আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি? সব মেয়ের ভিতরেই আমি, সব মায়ের মধ্যেই আমি রয়েছি। যে যেখান থেকেই আসুক সব্বাই আমার ছেলেমেয়ে। এটা সত্যি সত্যি জানবে। 'মা' বলে ডেকে যারাই আমার কাছে আসে তারা সবাই আমার ছেলেমেয়ে। আমার মা-ও শেষ জীবনে বুঝেছিলেন নরেন, রাখাল, শরৎ, সারদা, যোগেন, নিরঞ্জন, গিরিশবাবু, নিবেদিতা—এদের দেখে। তাদের 'মা' ডাক শুনে কত খুশি হয়েছিলেন মা। বলতেন, 'আহা আমার মনের সাধ মা-দুর্গা এতদিনে মিটিয়েছেন। আমার সারদার কত ছেলেমেয়ে! ওরা যখন আমাকে 'দিদিমা' বলে ডাকে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ওরা যখন আবদার করে আমার কাছে খেতে চায়, কথা বলে, গল্প করে তখন কত যে আনন্দ আমার হয় তা কি আর বলব!' মা কত খুশি হয়ে ছেলেদের নাড়ু-মুড়ি দিতেন আর ওরা একসঙ্গে হৈহৈ করে খেত। মা বসে বসে দেখতেন আর হাসতেন। মায়ের মুখে কী যে তৃপ্তি তখন দেখেছি! তখন অবশ্য মেয়েরা এত ছিল না, আর জয়রামবাটীতেও মেয়েরা এত যেত না। জয়রামবাটীতে যখন মেয়েদের যাওয়া শুরু হলো তখন মা চলে গেছেন। কিন্তু যাবার সময় আমার 'মা' হওয়া দেখে বড় আনন্দ নিয়ে গেছেন গো।"

যে-মেয়েটি মাকে প্রশ্ন করেছিল সে বোধহয় একটু সঙ্কুচিত বোধ করছিল। মা থামতেই মায়ের পা ধরে সে খুব কাঁদতে লাগল। মা তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন: "এখনো সময় আসেনি মা সবকিছু বুঝে নেবার। তাই তো আমার ছেলেমেয়েরা অবুঝের মতো কথা বলে। সময় হলেই সব বুঝতে পারবে।" আসলে 'আমরাও তো আপনার পেটে হইনি'—এই কথাটা মায়ের কাছে ছিল অসহ্য। মহিলাটি বারবার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইছিল। মা কিন্তু ক্ষমার মূর্তি হয়ে হাসছিলেন আর তাকে বোঝাচ্ছিলেন। দৃশ্যটি দেখে ওখানে সকলের চোখে জল আসছিল। মা কিছুক্ষণ পর বললেন: "দেখ মা, সবাই কি সহজে বুঝতে পারে? সংসারে মানুষের কত কষ্ট! এইসব কষ্ট দেখেই তো ভগবান বারবার নেবে আসেন। কিন্তু ভগবানের অবতারদের কজন চিনতে পারে, কজন বুঝতে পারে? যখন তাঁরা চলে যান তখন লোকে ক্রমশঃ বোঝে।" মা কি বলতে চাইছিলেন, স্বয়ং জগদম্বা পৃথিবীতে নেমে এসেছেন তাঁর রূপে?—তাঁকে জগতের মা বলে এখন সবাই চিনতে পারছে না, কিন্তু ক্রমে পারবে? সেদিন

আর কোন কথা হলো না। একটু পরে মাকে প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে সবাই চলে এলাম।

দু-চারদিন মায়ের কাছে না গেলে মন খুব খারাপ হয়ে যেত। একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে গেছি। দেখলাম, মা পা ছড়িয়ে পাশের ঘরে মেঝেয় বসে আছেন। একটি মেয়ে মায়ের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে মা হেসে বললেন ঃ "এস মা। (আমার সঙ্গে শান্তিকে দেখে) আজ যে দেখছি আমার পল্টন এসেছে।" শান্তি মাকে প্রণাম করতে মা তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে বললেন ঃ "শিশুদের ভিতরে ভগবানের আসন পাতা। তাদের মধ্যে তাঁর প্রকাশ বেশি, কারণ তারা সরল ও পবিত্র। তাই তো ঠাকুর বলতেন, শিশুর মতো মাকে ডাকলে মা ছুটে আসবেনই।" একটু চুপ করে যেন অন্তর্মুখী হয়ে মা বললেন ঃ "আহা, ঠাকুরের ঠিক এমনটিই হয়েছিল! তখন আমি জয়রামবাটীতে—খুব ছোটটি নই। শুনতাম, গঙ্গার পাড়ে মুখ ঘষে 'মা, মা' বলে কাঁদেন, 'দেখা দে, দেখা দে' বলে মাকে ডাকেন। লোকে তো বুঝত না কিছু। তাই পাগল বলে রটাত। শুনে আমার খুব কষ্ট হতো। কাউকে কিছু লজ্জায় বলতেও পারতাম না, শুধু ভানু-পিসীর কাছে গিয়ে ছলছল চোখে বসলেই সব বুঝতে পারত। আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে বোঝাত—'লোকের কথায় কান দিয়ে কেন মন খারাপ করিস? অমন শিবের মতো স্বামী তোর! আমি বাসরঘরেই চিনেছি। তুই ভাবিস না। একদিন দেখবি, ঐ পাগলই জয় করবে সবার মন। সে তো মায়ের নামে পাগল। মা-ই সব ঠিক করে দেবেন।' এরকম কত কথা বলে কাছটিতে শোয়াত। তাঁর মতো মাকে আর কি কেউ ডাকতে পেরেছে বা পারবে, মা? তিনি জগৎকে দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কেমন করে সব ভুলে শুধু 'মা, মা' বলে ডাকলে মাকে পাওয়া যায়। সেজন্যই তো তিনি বলতেন, 'শিশুর মতো সরল মনে মাকে ডাকলে মা যেমন সব কাজ ফেলে দিয়ে ছুটে আসে, ভগবানকেও তেমনি আন্তরিকভাবে ডাকলে আসবেনই আসবেন।' তোমরাই বল না, সংসারের কাজে যতই ব্যস্ত থাক, যখন ছেলে বা মেয়ে 'মা, মা' বলে চেঁচিয়ে কাঁদে তখন কি সব কাজ ফেলে রেখে আগে তাকে কোলে নাও না?" মায়ের কথা শুনে আমরা সবাই হাসতে থাকলাম। মা-ও হেসে বললেন ঃ "কি, ঠিক বলিনি?" আমরা হেসে বললাম ঃ "ঠিক বলেছেন মা।"

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম ঃ "আচ্ছা মা, তুমি যে—"। বলেই জিভ কেটে চুপ করে গেলাম। মা বললেন ঃ "কি হলো, জিভ কাটলে কেন?" আমি লজ্জিত হয়ে বললাম ঃ "মা, আপনাকে 'তুমি' বলে ফেলেছি—ক্ষমা করবেন।" মা জোরে হেসে বললেন ঃ "দেখ পাগলী মেয়ের কাণ্ড, তাতে কী হয়েছে? নিজের মাকে লোকে 'তুমি' বলে না তো কি 'আপনি, আজ্ঞে' করে বলে? আমি তো তোমাদের সকলের মা, সত্যিকারের মা। আমাকে 'তুমি'-ই তো বলবে।" মায়ের স্নেহ-বিগলিত কথাগুলি এবং মা যে আমাদের 'সত্যিকারের মা'—একথা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনে আমার সারা শরীর যেন কেমন হয়ে গেল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি মায়ের পায়ের ওপরে নিজের মাথা রেখে পা-দুটি ধরে খুব কাঁদছি। মা আমার মাথায় হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন শুনতে পেলাম ঃ "দেখ, মেয়ে আমার কেঁদে আকুল। বল, কি জিজ্ঞাসা করছিলে।" ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই গোলাপ-মা এসে মাকে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দেবার কথা বলতে মা আমাদের বসতে বলে ঐ ঘর থেকে ঠাকুরঘরে (যেটি তাঁর নিজের ঘরও) গেলেন। সেদিন সুধীরা-দিও ছিলেন। মা উঠে যেতেই সুধীরা-দি আমাকে বললেন ঃ "তুমি আজ করলে কি গো—আজ মায়ের নিজের মুখ থেকে মা যে জগতের সকলের মা এবং সকলের সত্যিকারের মা তা আমাদের সবাইকে জানবার ও শুনবার সৌভাগ্য করিয়ে দিলে! মা তো সবসময় নিজেকে গোপন করে রাখেন, ধরা দিতে চান না।" আমি বললাম ঃ "তাই তো সুধীরা-দি, আমরা কতটুকু মাকে বুঝতে পারি। তবু তো আপনি, সরলা-দি মাকে অনেক বেশি পান। আমি তো সংসারী—কখনো দুই-একদিন বাদে, আবার কখনো সাতদিন বাদে একটুখানি সময়ের জন্য মাকে কাছে পাই।" এরকম আমাদের কথাবার্তা চলছে, কিছুক্ষণ পর মা হাসিমুখে ফিরে এলেন। বললেন ঃ "কি গো, কি সব কথা হচ্ছে তোমাদের?" সুধীরা-দি বললেন ঃ "সুহাস আপনার কাছে বেশি আসতে পারে না, তাই দুঃখ করছিল।" মা বললেন ঃ "দুঃখ কেন মা, সংসার তো ঠাকুরই দিয়েছেন। ওটা তো তোমাদের কর্তব্য। কর্তব্য সেরে তবে তো আসবে। এই যে সুধীরা, সুমতি, সরলা—এরাও তো নিজের নিজের কাজ সেরে তবে আসে। ইচ্ছে হলেই তো হয় না মা। ইচ্ছে পূরণ তো মানুষের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছেয় সব হয়।" বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে দেখে চলে আসতে হলো। সুধীরা-দিরা বসে রইলেন। আমার আসতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। মায়ের কাছ ছেড়ে কখনোই আসতে ইচ্ছে হয় না।

চার-পাঁচদিন পর আবার গিয়েছি মায়ের কাছে। সেদিন ছিল ছুটির দিন। একাই গিয়েছি। মায়ের ঘরে ঢুকে দেখি অনেকে এসেছেন। মাকে প্রণাম করতে মা হাসিমুখে মাথায় হাত দিয়ে, চিবুকে চুমু খেয়ে বললেন : "বোসো মা।" সরলা-দি, সুধীরা-দিও ছিলেন। ওঁরাও হেসে ওঁদের পাশে আমাকে বসতে বললেন। সুধীরা-দি বললেন : "তুমি সেদিন মাকে কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিলে। সে-কথাটা কি?" আমি সঙ্কুচিত হয়ে বললাম : "সে এমন কিছু নয়। মা শিশুদের কথা বলছিলেন। তাদের সরলতার কথা, পবিত্র স্বভাবের কথা। ঐ প্রসঙ্গে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম, সব শিশুর মনে কি জানার আগ্রহ থাকে? কোন কোন ছেলেমেয়েকে দেখি, কেমন যেন জবুথবু। কিভাবে তাদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল জাগানো যায়? কিভাবে তারা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মতো হবে?" মা হেসে বললেন : "সে কি গো, তোমরা মা হয়েছ আর কিভাবে ছেলেমেয়েদের মনের খবর জানবে তা তোমাদের বলে দিতে হবে? শোন, ওদের সাথে খুব সহজ সরল ভাবে মিশতে হয়। গল্প করতে হয়। ওদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দিতে হয়। ওদের বেশি বকা-ঝকা করতে নেই, মারতে নেই। ওদের বেশি বকা-ঝকা করলে, মারধর করলে ওরা ভয়ে জবুথবু হয়ে যাবে, দূরে সরে যাবে। ওদের ভালবেসে বুঝিয়ে দিলে ওরা সহজে বুঝবে। ওদের প্রশ্নকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দিতে নেই। ধমক দিলে বা ভয় দেখালে ওরা কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবে। ওদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাবে।"

একদিন এক ভক্ত মহিলা মাকে প্রশ্ন করল : "আচ্ছা মা, ঠাকুর তো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন বারে বারে, কিন্তু যারা সংসারে রয়েছে তারা যদি সবাই স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ত্যাগ করে চলে যায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? আর সংসারে আছি বলে কি আমরা ঠাকুরের ভালবাসা পাব না? তিনিই তো সব করেছেন—গৃহী এবং সাধু, মেয়ে এবং পুরুষ! তাহলে আমরা কি পাব না তাঁর কৃপা?" মা যেন একটু উত্তেজিতভাবে বললেন : "সেকি কথা, মা? সংসারী হলে তাঁর স্নেহ, ভালবাসা, কৃপা তোমরা পাবে না—একথা মনে আনছ কেন? বরং ত্যাগী ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশি করে তিনি গৃহী ভক্তদের জন্য ভাবতেন। বলতেন, 'ওরা বড় দুঃখী, অনেক জ্বালা পায় সংসারে। অনেকে বেরিয়ে আসার জন্য হাঁকপাঁক করে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। অনেকে মনে মনে বড় ব্যাকুল হয় তাঁকে পাবার জন্য, কিন্তু সংসার-জালে জড়িয়ে পড়ায় কিছু করে উঠতে পারে না।' জান মা, ঠাকুর বলতেন, 'সংসারীদের বড় জ্বালা। তাই মাকে বলি—মা, ওদের মনে ভাব-ভক্তি দাও; তাতে ওরা শান্তি পাবে।' 'কথামৃতে' পড়েছ তো ঠাকুরের কথা—'একহাতে ভগবানকে ধর, আর একহাতে সংসারের কাজ কর'। সাধুরা তো ভগবানের জন্য সব ছেড়েছুড়ে সংসার থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের আর পিছুটান থাকে না। সংসারীদের কত মায়া-মোহ, দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে থাকতে হয়। তাদের পিঠে যেন বিশমন বোঝা। তাই ঠাকুর সংসারীদের জন্য বেশি ভাবতেন। তাঁর কাছে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ছিল না। পুরুষ ভক্তদের জন্য যেমন ভাবতেন, তেমনি ভাবতেন মেয়ে ভক্তদের জন্যও। তোমাদের তিনি খুব ভালবাসেন মা—একথা সবসময়ে মনে রেখ।"

আরেকদিন মায়ের কাছে বসে আছি অনেকে। সেদিন একজন ভগবান যীশুখ্রীস্টের কথা তুলেছেন। মা শুয়েছিলেন। যীশুর কথা ওঠায় উঠে বসে দুটি হাত জোড় করে যীশুর উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন : "নিবেদিতার কাছে যীশুখ্রীস্টের কথা আমি অনেক শুনেছি। ওদের যে বই আছে 'বাইবেল', তা থেকে সে আমাকে যীশুর কত সুন্দর সুন্দর কথা পড়ে শুনিয়েছিল। আহা, জগতের লোককে উদ্ধার করতে এসে যীশুকে কত দুঃখ-কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে, তবু হাসিমুখে তিনি সব সহ্য করেছেন—সবাইকে ভালবেসে অত অত্যাচারের পরও নিঃশর্তে ক্ষমা করে গেছেন! নিজের শিষ্যই তো তাঁকে ধরিয়ে দিলে! আহা, হাতে পায়ে বুকে পেরেক বিঁধে কত যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে তারা মারল! অত যন্ত্রণা, অত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও হাসিমুখে সবাইকে ক্ষমা করে গেলেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন তাদের অপরাধ না নেন। এই ভালবাসা, এই সহ্যশক্তি, এই ক্ষমা—এ কী মানুষের পক্ষে সম্ভব? ভগবান ছাড়া এরকম আর কে সহ্য করতে পারে? ভগবানই তো যীশুর রূপে এসে জগৎকে প্রেমের শিক্ষা দিলেন। তাই তো দেখ না, ওদেশের মেয়ে নিবেদিতা এদেশে এসে আমাদের ঘরের মেয়েদের জন্য কত অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেও হাসিমুখে কাজ করেছে, কত কষ্ট করে এখানে থেকে তাদের লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছে। লোকের বাড়ি গেলে তারা অপমান করেছে, ঘরে ঢুকতে দেয়নি—যদি-বা ঢুকেছে, চলে আসতে না আসতে অথবা চলে আসার পর গোবরজল, গঙ্গাজল ছিটিয়েছে। চোখে দেখেও কিছু মনে করেনি। হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছে। তার তো কোন দরকার ছিল না বাপু

নিজের জীবনকে তিল তিল করে ক্ষয় করে, এত অসম্মান, লাঞ্ছনা সহ্য করে এদেশের মেয়েদের জন্য কাজ করার! কিন্তু মেয়ের আমার এমন সুন্দর মন যে, যেহেতু নরেন চেয়েছে—তার গুরু চেয়েছে, গুরু বলেছে—তাই এদেশের মেয়েদের শিক্ষার ভার সে তার নিজের কাঁধে নিয়েছে। দুঃখ-কষ্ট, অপমান কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেনি, অথচ যাদের জন্য সে নিজেকে তিল তিল করে ক্ষয় করেছে তারাই তাকে দূর-দূর করেছে। আমাদের দেশের মেয়েরা কি এই পরিস্থিতিতে গুরুর জন্য এতখানি ত্যাগ করতে পারত?—বলত, 'বয়ে গেছে আমাদের'! তাই তো বলি, ঠাকুর যে কিভাবে কখন কাকে দিয়ে কী করিয়ে নেন তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না, বোঝে না।"

একদিন একজন ভক্ত মহিলা মাকে বললেন: "মা, আমরা তো সারা দিনরাত সংসার নিয়ে, সংসারের সকলের ফরমাস আর চাহিদা মেটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সারা দিন-রাতে পাঁচটা মিনিটও ঠাকুরকে ডাকতে সময় পাই না। আমাদের কী হবে মা? আমাদের ওপর কি তাঁর দয়া হবে না?" মা বললেন: "নিশ্চয় হবে মা। তিনি তো অন্তর্যামী। সবার বুকের মাঝে তিনি সবসময় আছেন। তোমার ভিতরে আকুতি থাকলে তা তিনি বুঝবেনই বুঝবেন। তাছাড়া সংসারের কাজ কি তোমরা কর মা? তিনিই করান। এ সংসার তো তাঁরই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কী কিছু হয় মা? তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। 'কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম নাহি হয়।' তোমার মধ্যে এই যে ব্যাকুলতাটা এসেছে, জানবে তাঁর ইচ্ছাতেই এসেছে। যে তাঁকে ভালবাসে, তাকে তিনি রক্ষা করেন। তাঁকে ভালবাস আর নাই বাস, তিনি তোমাকে ভালবাসেন। সংসারে সাধুও আছে আবার গৃহীও আছে। তবে গৃহীর জন্যই তিনি বেশি ভাবেন। সাধু তো তাঁকে ডাকবেই, কিন্তু গৃহীর যে পিঠে বিশমন বোঝা, ঠাকুর বলতেন। তাই গৃহীর জন্যই তাঁর চিন্তা বেশি। শুধু একটু স্মরণ-মনন করলেই হলো। মনে-প্রাণে ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাক। তাঁর স্মরণ-মনন কর। দিনান্তে দুফোঁটা চোখের জল ফেলে তাঁর নাম কর। ঐ দুফোঁটা চোখের জল ছাড়া তোমাদের কি-ই বা আছে বল? আর সবই তো তাঁর। ঐ দুফোঁটা জল শুধু তোমার। ওটুকুই তাঁকে দিও। তোমাদের কাছে বাঁধা হয়ে থাকবেন তিনি। ভয় কি মা, ঠাকুর এসে এবার তোমাদের জন্য ভগবানকে পাওয়ার এই সহজ পথ বলে দিয়ে গিয়েছেন।"

একদিন মায়ের কাছে গিয়েছি। মনটা খুব খারাপ। মাকে বললাম: "মনে যে কিছুতেই শান্তি পাই না, সংসারের জ্বালায় শেষ হয়ে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে কথা বলে শুধু শান্তি পাই।" আমার চোখে জল দেখে মা বললেন: "তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন মা, যাকিছু হচ্ছে সবই ঠাকুরের ইচ্ছেয় হচ্ছে! এই যে আমার কাছে আসা—এও তো তাঁরই ইচ্ছেয়। ভগবানকে ভালবাস, ছেলেমেয়েদের ভগবানকে ভালবাসতে শেখাও। তাঁকে যেন আপনার জন মনে করে তারা ভালবাসতে শেখে। পৃথিবীতে যখন জীব আসে তখন যে যার পূর্বজন্মের প্রাক্তনকে নিয়ে আসে। তাই অনেককে দেখা যায়, ছেলেবেলা থেকে ভগবানকে ভালবাসে। কেউ হয়তো বড় হয়ে বিপথে যায়। সবই নিজের নিজের প্রাক্তন কর্মের ফল। তবে তাঁর কৃপা হলে তাঁর নিজের লেখা তিনি কেটে দেন। নিজের লেখা নিজে কাটেন। এজন্যই তো তাঁকে বলে 'কপালমোচন'। সবই যখন তাঁরই হাতে তখন তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"

বড় তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। দু-দিন যেতে পারিনি। তারপরে যখন গেলাম, দেখলাম মা তাঁর ঘরে বসে আছেন। ঠাকুরের কথা বলছেন, নিজের কথাও বলছেন: "বিয়ের পর জয়রামবাটীতেই থেকেছি বেশি। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে আসতেন তখন শাশুড়ি-মা লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। তখন তো ছোটটি ছিলাম। যে যেমন বলত সেইমত করতাম। ওরা শিখিয়ে দিত কিভাবে শাশুড়ির সেবা করতে হয়, স্বামীর সেবা করতে হয়। শাশুড়ি-মা আমাকে বড় ভালবাসতেন। সন্ধ্যাবেলা পাড়ার সব মেয়ে-পুরুষ বাড়িতে আসত ঠাকুরের কথা শুনতে, তাঁর গান শুনতে। ঠাকুর কত কথা বলতেন—কত মজার মজার কথা। আবার তিনি কখনো কখনো গান গাইতেন। আমি চুপটি করে একপাশে বসে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কেউ ডাকলে ঠাকুর বলতেন, 'ওকে ডেকো না, ও ঘুমোক।' তারপরে তো দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন দেশে আসতাম তখন ঠাকুরের জন্য খুব মন খারাপ করত। জয়রামবাটীতে থাকলে ভানু-পিসির কাছেই বেশি থাকতাম। সে আমার মনের কথা বুঝত। পরের দিকে দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকলেও ঠাকুরের সঙ্গে বেশি দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল না। তখন তো তাঁর কাছে লোকের ভিড় হয়ে গেছে। তারপর তো সব ছেলেরা একে একে এসে গেল।" একজন হঠাৎ বলে উঠল: "আচ্ছা মা, ঠাকুর যখন তোমাকে ষোড়শীপূজা করেছিলেন, তখন তোমার কী মনে হয়েছিল?" মা একটু সলজ্জ হেসে বললেন: "কি জানি মা, আমি যেন কিছু বুঝতেই পারিনি। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। মা-ভবতারিণী বোধহয়

আমার ওপর ভর করেছিলেন। তাই বোধহয় কি হচ্ছে সেবিষয়ে আমার কোন হুঁশ ছিল না। ঠাকুর যে আমাকে সাজালেন, পায়ে আলতা পরালেন, পুজো করলেন, প্রণাম করলেন—আমি সব দেখছি, কিন্তু কিছুই যেন আমার মনে রেখাপাত করছে না। নইলে ঠাকুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, আর আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম! অনেক পরে যখন স্বাভাবিক হয়েছিলাম তখন মনে মনে বারবার তাঁকে প্রণাম করে মার্জনা চেয়ে নিয়েছি।" কথাগুলি বলে মা যেন কেমন স্থির হয়ে গেলেন। অনেকটা সময় চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলেন। অন্যরা তখন কি ভাবছিল জানি না, আমি কিন্তু তখন মনে মনে বলছিলাম: "মা, তুমি যতই লুকোতে চেষ্টা কর না কেন, ঠাকুরের দয়ায় বুঝেছি তুমিই স্বয়ং মা ভবতারিণী।"

ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই দেখতাম মা যেন অন্য জগতের হয়ে যেতেন। একদিন ঠাকুরের কথা বলছেন: "দক্ষিণেশ্বরে যখন প্রথম তাঁর কাছে এসেছি, তাঁর কাছে রয়েছি তখন 'ভাব', 'সমাধি'—এসব তো কিছু বুঝতাম না। দেখতাম, সারারাত ঠাকুর বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে এক অপূর্ব আলো। তাঁর সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ, নিথর। মুখে অপূর্ব হাসির রেখা। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়ে যেতাম। জড়সড় হয়ে বসে থাকতাম। কি করব বুঝতে পারতাম না। প্রথম প্রথম ভাগনেকে (হৃদয়কে) ডাকতাম। সে এসে ঠাকুরের কানে মায়ের নাম শোনাত। দেখতাম, ঠাকুর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন। রাত্রে আমার ঘুম হয় না বুঝতে পেরে কিছুদিন পর ঠাকুর আমাকে নহবতে পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে অবশ্য শিখিয়ে দিয়েছিলেন কিরকম ভাব হলে কোন্ নাম শোনাতে হবে। আমার জন্য কত চিন্তা করতেন। কিসে আমি ভাল থাকব তা ভেবে ব্যস্ত হতেন। কী ভালবাসাই না তাঁর ছিল! লোকে তো পাগল বলে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল। আমার মা-বাবার মনে কতই না ভাবনা হয়েছিল! পরে সব দেখেশুনে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।"

কয়েক মাস মায়ের সান্নিধ্যে মহানন্দে কেটে গেল। তারপর আনন্দের দিন শেষ হয়ে গেল। মা দেশে চলে গেলেন। কারণ, রাধু দেশে যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। রাধু ছিল তখন সন্তানসম্ভবা। বছরখানেক পর যখন মা কলকাতায় ফিরলেন তখন তিনি খুবই অসুস্থ। ফলে মায়ের সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ হয়নি। কিছুদিন পর দেখলাম মায়ের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। সরলা-দিকে মায়ের সেবার অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তাকে বেশির ভাগ সময় উদ্বোধনে মায়ের কাছেই থাকতে হয়। দেখে আমার মনে হলো, আমি যদি এই সংসারজালে জড়িয়ে না পড়তাম তাহলে আমিও তো মায়ের সেবা করতে পারতাম! মায়ের শরীর ভাল নয় বলে মায়ের দর্শন প্রায়-বন্ধ ছিল। মায়ের জন্য খুব মন খারাপ করত। একদিন সরলা-দি আমাদের বাড়িতে এল। বলল: "মা আগের চেয়ে একটু ভাল। এখন মাকে দর্শন করতে যেতে পার।" পরের দিনই মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। দেখলাম, মা খুবই দুর্বল। কথা বলতে কষ্ট হয়, বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। কিছুক্ষণ মায়ের কাছে বসে বসে মাকে দেখলাম। আসার সময় প্রণাম করতেই মাথায় হাত রাখলেন এবং অপূর্ব স্নেহের সঙ্গে মধুমাখা কণ্ঠে বললেন: "প্রসাদ নিয়ে যেও মা।"

কিছুদিন পর মা আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মায়ের দর্শন বন্ধই হয়ে গেল প্রায়। আমরা গিয়ে দূর থেকে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতাম। কখনো কখনো মা চোখ খুলে আমাদের দেখতেন। তার মধ্যেও দেখতাম, ইশারায় গোলাপ-মাকে অথবা সরলা-দিকে বলতেন সবাইকে প্রসাদ দিতে। একদিন দেখি, সদর দরজার কাছে শরৎ মহারাজ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন অনেক পুরুষ ও মহিলা ভক্তকে দেখলাম 'মায়ের বাড়ী'তে। মহারাজ বলছেন: "কেউ ওপরে যাবেন না। মায়ের শরীর একেবারেই ভাল নেই।" কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম। দু-একদিন পরে এল শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন। খবর পেয়ে ভোরবেলা 'মায়ের বাড়ী'তে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখে জল। মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। আমারও বুক ফেটে কান্না এল। দেখলাম, মায়ের ঘরে ফুলে ফুলে ঢাকা মায়ের ভাগবতী তনু। মুখখানা জ্যোতির্ময়—করুণায় ঢলঢল।

মাকে দেখেই মন ভরে থাকত। মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কত সুযোগ ছিল। কিন্তু তখন দীক্ষা নেওয়ার কথা তেমন মনে ওঠেনি। ছেলেমেয়ে সামলাতেই হিমসিম খেতাম। ভাবতাম, দীক্ষা নিয়ে পূজা-জপ কিছুই করতে পারব না। সরলা-দিকে দু-একবার বলেওছিলাম। সে বলত: "ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই সব হবে।" তারপর তো মা চলেই গেলেন। পরে মায়ের 'ভারী', 'বাসুকি' শরৎ মহারাজের চরণে আশ্রয় পেলাম। মাকে হারিয়ে তাঁর মধ্যে আবার মাকেই ফিরে পেয়েছিলাম।□

পিসিমার কথা

শান্তিরাম দাস

জয়রামবাটীর পাশের গ্রাম হলদিতে আমাদের বাড়ি। জাতিতে আমরা দুলে। শ্রীশ্রীমাকে আমরা 'পিসিমা' বলতাম। তার কারণ, আমার বাবা তাঁকে দিদি বলত। আমার বাবা যোগীন্দ্র দাস পিসিমার পালকি-বেহারাদের সর্দার ছিল।[১] বাবার নিজের পালকি ছিল—আট বেহারার পালকি। আমার মায়ের নাম লক্ষ্মী। মা পিসিমার বাড়িতে কাজ করত। ঘর-দোর পরিষ্কার করত, বাসন মাজত, কাপড় কাচত। মাকে পিসিমা 'মাঝি-বউ' বলতেন, কখনো বলতেন 'লক্ষ্মী-বউ'। পিসিমা বাবাকে 'যোগীন' বলতেন, মহারাজরা বলতেন 'যোগে'। পিসিমা যখন জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়া অথবা কলকাতার পথে বিষ্ণুপুরে যেতেন তখন বাবার পালকিতে যেতেন। বাবা খুব ডাকাবুকো ছিল। লোকে সমীহ করে চলত বাবাকে। বাবা কিন্তু পিসিমাকে খুব ভয় করত। পিসিমা যদি একবার বাবাকে ডেকে পাঠাতেন, তাহলে বাবা তটস্থ হয়ে পিসিমার বাড়িতে হাজির হয়ে বলত: "দিদি, আমাকে ডেকেছ গো?" পালকিবেহারার কাজ ছাড়া বাবা আমোদরে নৌকা-মাঝির কাজও করত এবং নদীতে মাছও ধরত। ঠাকুরের ভোগে মাছ দেওয়া হতো। সেই মাছ যোগাড় করার দায়িত্ব পিসিমা দিয়েছিলেন বাবার ওপর। আমার মা-ও কখনো কখনো আমোদর থেকে চুনোমাছ ধরে পিসিমাকে দিয়ে যেত। বাবাকে যখন পালকিবেহারার কাজে বাইরে যেতে হতো তখন পিসিমার বাড়িতে মাছ পৌঁছানোর দায়িত্ব পড়ত মায়ের ওপর। আমি নিজেও ছোটবেলায় পিসিমার বাড়িতে অনেকবার মাছ দিয়ে এসেছি।

আমরা ছয় ভাই-বোন। আমার ওপরে দুই দিদি, আমার পরে এক ভাই, দুই বোন। প্রথমে পর পর দুই মেয়ে হওয়ায় বাবা-মার মনে খুব দুঃখ ছিল। পাড়ার লোক, আত্মীয়-স্বজন ছেলে না হওয়ায় আমার মাকে নানা গঞ্জনা দিত। বাবাও ঐ কথা তুলে মাকে বকা-ঝকা করত, মদ খেয়ে এসে কখনো কখনো আবার মারতও। একদিন রাত্রে মদ খেয়ে বাবা মাকে বেদম মারল। পরদিন সকালে পিসিমার বাড়িতে কাজ করতে এসে মা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা পিসিমাকে বলে। পিসিমা শুনে তৎক্ষণাৎ বাবাকে ডেকে পাঠান। বাবা এসে ভয়ে ভয়ে পিসিমার সামনে দাঁড়াল। পিসিমা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বাবাকে বললেন: "যোগীন, ঐভাবে বউকে মেরেছিস কেন?" ম্লান হেসে বাবা বলল: "ও তোমার কাছে আমার নামে নালিশ করে দিয়েছে! কি করব বল দিদি, বংশ থাকবে না—এই দুঃখে ওকে মেরেছি।" পিসিমা দৃঢ়ভাবে বললেন: "আর কখনো বউয়ের গায়ে হাত তুলবি না বলে দিলাম। কোন গঞ্জনা দিবি না। ছেলে হয়নি বলে তোর যদি দুঃখ হয়ে থাকে, ওরও তো দুঃখ থাকতে পারে। ও বেচারা কি করবে?" বাবা আর কি বলবে, মাথা হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ পিসিমা বললেন: "যা, আমি বলছি, ঠাকুরের কৃপায় এবার তোদের ছেলে হবে। বউকে কিন্তু আর মারবি না।"

এর পর আমার জন্ম হয়। বাবা আনন্দে ডগমগ হয়ে পিসিমার কাছে ছুটে আসে আমার জন্মের সংবাদ জানাতে। পিসিমা খুব খুশি হয়ে হেসে বললেন: "এবার শান্তি হলো তো! পরপর দুটো মেয়ে হয়েছিল বলে খুব তো মাথা গরম করেছিলি।" বাবা মনে করল, পিসিমা আমার নাম রাখলেন 'শান্তি'। বাড়িতে গিয়ে বলল: "দিদি ছেলের নাম রেখেছে শান্তি।" তাই আমার নাম শান্তি—পোশাকী নাম শান্তিরাম। আমার বাবা ও মা বলত, পিসিমার বরেই তারা ছেলের মুখ দেখেছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি। আমি তখন মায়ের পেটে। মা একদিন পিসিমার নতুন বাড়ির সংলগ্ন পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরছে। পিসিমার শিষ্য বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু (বিভূতিভূষণ ঘোষ) তখন জয়রামবাটীতে রয়েছেন। মাকে তিনি চিনতেন। কারণ, বিভূতিবাবু

১ স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে হলদি গ্রামের পালকিবেহারাদের সর্দার 'যোগে দুলে'র উল্লেখ আছে। সেখানে একথাও বলা আছে যে, যোগে দুলে মায়ের "খুব অনুগত"। জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় শেষবার আসার সময় মা এই যোগে দুলের পালকিতেই জয়রামবাটী থেকে বিষ্ণুপুর এসেছিলেন। (দ্রঃ মাতৃসান্নিধ্যে, ৫ম সং, ১৯৮৯, পৃঃ ১৭৪-১৭৬)। এই 'যোগে দুলে'ই শান্তিরাম দাসের বাবা যোগীন্দ্র দাস।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রায়ই পিসিমার বাড়িতে আসাযাওয়া করতেন। মাকে পুকুরে ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরতে দেখে বিভূতিবাবু পিসিমাকে বললেন ঃ "মা, লক্ষ্মী পোয়াতি মানুষ। ও ঐভাবে পুকুরে মাছ ধরছে, ওর পেটের বাচ্চার কোন ক্ষতি হবে না তো?" পিসিমা বললেন ঃ "না বাবা। ওদের বর দেওয়া আছে।"

আমার জন্মের দু-তিন মাস পর পিসিমা বাবাকে একদিন বললেন ঃ "যোগীন, মুখেভাতের দিন তোর ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসবি। আমি তোর ছেলেকে প্রসাদ খাইয়ে দেব।" বাবা বলত, মুখেভাতের দিন সকালে বাবা-মা আমাকে কোলে করে পিসিমার বাড়িতে নিয়ে আসে। পিসিমা রাধু-দির বাটিতে দুধ-ভাত মেখে নিজে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন পিসিমা আমাকে একজোড়া রুপোর বালাও দিয়েছিলেন। বালাজোড়া আজও আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এখনো বেশ চকচকে আছে। কিশোরী মহারাজ (মায়ের সেবক স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) আমাকে বলেছিলেন ঃ "ওরে শান্তি, তোর ঐ বালাজোড়া মা তোকে নিজের হাতে দিয়েছিলেন। ওর একটা আলাদা মূল্য আছে। তুই বালাজোড়া আমাদের দিয়ে দে—বেলুড় মঠে দিয়ে দেব। মায়ের নিজের হাতে দেওয়া জিনিস তো!" আমি কিন্তু মহারাজকে বালাজোড়া দিতে পারিনি। যতদিন প্রাণ থাকবে কাউকে দিতে পারবও না। অনেক সাধু, ভক্ত ঐ বালাজোড়ার কথা শুনে দেখতে চান। আমি এনে দেখালে তাঁরা মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। পিসিমার আশীর্বাদের স্মৃতি আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, তাই যক্ষের ধনের মতো বালাজোড়াকে আগলে রেখেছি। রোজ মাথায় ঠেকাই।

ছেলেবেলা থেকেই পিসিমার বাড়িতে আসছি। তবে পিসিমাকে পুরনো বাড়িতে দেখার কথা মনে পড়ে না। আমার স্মৃতিতে নতুন বাড়িতে পিসিমাকে দেখার কথা মনে আছে। সেই দেখা প্রথম, যখন আমার বয়স আট বছরের মতো। পিসিমার যে পা-ছড়ানো ছবিটা আছে, ঐরকম অবস্থায় পিসিমাকে আমি প্রথম দেখি। বাবা বলায় আমি বারান্দায় উঠে পিসিমাকে প্রণাম করলাম। পিসিমা আমার চিবুক ধরে আদর করলেন। তারপর হাত ভর্তি করে খাবার দিলেন। এই খাবারের লোভেই আমি এবং আমার ওপরের দিদি পিসিমার বাড়িতে প্রায়ই আসতাম। এলেই হাতভর্তি খাবার পেতাম। 'খাবার' মানে খইনাড়ু, তিলনাড়ু, গুড়ের জিলিপি, তেলেভাজা—এইসব। তখন তো আর জয়রামবাটীতে এখনকার মতো ছানার মিষ্টি পাওয়া যেত না। শুধু আমরাই নই, পিসিমার বাড়িতে গেলে পিসিমা সবাইকে হাত ভর্তি করে নাড়ু ও খাবার দিতেন।

রাধু-দির মার মাথার গোলমাল ছিল। তাঁকে আমরা 'ক্ষেপী ঠাকরুন' বলতাম। তিনি পিসিমাকে মাঝে মাঝেই খুব গালাগাল দিতেন। একবার চেলাকাঠ দিয়ে পিসিমাকে মারতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা অবশ্য আমার দেখা নয়, আমি শুনেছিলাম। পিসিমা তো কাউকেই কখনো শক্ত কথা বলতে পারতেন না। সেদিন কিন্তু পিসিমার মুখ দিয়ে খুব শক্ত কথা বেরিয়েছিল। রাধু-দির মাকে চেলাকাঠ হাতে নিয়ে মারতে আসতে দেখে পিসিমার সেবক বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) তাঁর হাত থেকে ওটি কেড়ে নেন। নইলে সেদিন যে কী হতো কে জানে! রাধু-দির মার কাণ্ড দেখে সেদিন পিসিমা বলেছিলেন ঃ "পাগলী, এ তুই কি করছিলি! তোর ঐ হাত যে খসে পড়বে!" বলার পরে পিসিমার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর, এ তুমি আমার মুখ দিয়ে কী বলালে! এ আমি কী করলাম! এই মুখ দিয়ে তো কখনো অভিশাপ বেরোয়নি! তুমি ওকে ক্ষমা কোরো।" কিন্তু তখন তো যা হবার হয়ে গিয়েছে। পিসিমার মুখের বাক্য তো ভগবানেরও কাটার সাধ্য নেই। আমরা নিজের চোখে দেখেছি, রাধু-দির মার হাতে গলিত কুষ্ঠ হয়েছিল। পিসিমা তো মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

পিসিমার গলার স্বর ছিল আলাদা। বড় মিষ্টি। থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা কইতেন। পিসিমার নতুন বাড়িতে একটি টিয়াপাখি ছিল—গঙ্গারাম। অনেকগুলি বেড়াল ছিল—পাঁচ-ছটা হবে। কোনটা সাদা, কোনটা সাদা-কালো, কোনটা সোনালী-সাদা, কোনটা ছাই রঙের। পিসিমা যখন খেতে বসতেন, বেড়ালগুলো পিসিমার থালার চারপাশে চুপ করে বসে থাকত। খাওয়া শেষ হলে পিসিমা বেড়ালগুলোকে দুধ-ভাত মেখে খেতে দিতেন। বেড়ালগুলোর ভাগ্য দেখে হিংসে হতো। এখনো ভাবলে হিংসে হয়। গঙ্গারামকেও পিসিমা নিজে হাতে করে খেতে দিতেন। গরুগুলোকেও দিতেন।

পিসিমার ভালবাসার কথা ভোলা যাবে না। ছোটজাতকে পিসিমা কখনো ছোট করে দেখেননি। দুলে, বাগদি, বারুই, ডোম সবাই নিঃসঙ্কোচে পিসিমার বাড়িতে

যাতায়াত করত। সবাই যে কাজের জন্য পিসিমার বাড়িতে যেত তা নয়, ভালবাসার টানে যেত। সেযুগে বামুনদের বাড়ির ছাঁচতলায় ঢোকার অধিকার আমাদের ছিল না। জয়রামবাটীর বামুনরাও আমাদের ছোঁয়া থেকে শতহাত দূরে থাকত। সেযুগে জয়রামবাটীর বুকে আমরা পিসিমার একেবারে কাছে যাওয়ার অবাধ অধিকার পেয়েছি। পিসিমা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। নীচু জাতের লোকেদের নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছেন, এমনকি উচ্ছিষ্টও পরিষ্কার করেছেন। এইজন্য গাঁয়ের মোড়লরা, বামুনরা তাঁকে একঘরে করে দেবার হুমকি দিয়েছেন বারবার, জরিমানা করেছেন। কিন্তু পিসিমা কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেননি। তিনি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর সবকিছুই ছিল আলাদা।

পিসিমাকে দু-একবার হলদি গ্রামে কেনাকাটা করার জন্য আসতে দেখেছি। পালকি করে এসেছিলেন। তখনকার দিনে হলদিতেই ছিল রামকুমার যুঁইয়ের মুদিখানার বড় দোকান আর উপেন্দ্র যুঁইয়ের কাপড়ের দোকান। পিসিমার সঙ্গে একজন কি দুজন মেয়েলোক থাকত। হলদিতে এসে তিনি বসতেন কালীমন্দিরে। পিসিমার সঙ্গে যে বা যারা আসত, সেই মেয়েলোকেরাই জিনিসপত্র দোকান থেকে কিনত। শুনেছি, আরও আগে যখন কলকাতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ জয়রামবাটীতে ভক্তরা এসে উপস্থিত হতো তখন পিসিমা শেষরাত্রে একজন কি দুজন কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হলদি বা অন্য কোথাও জিনিসপত্র, সবজি ইত্যাদি কিনতে আসতেন। ভক্তরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আবার হেঁটেই ফিরে যেতেন। পিসিমা যখন হলদির কালীমন্দিরে এসে বসতেন তখন গাঁয়ের ছোট্ট ছেলেমেয়েরা এবং বড়রাও এসে জড় হতো। পিসিমা সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশে যেতেন। জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় সকলকে পুজো দেখতে ও প্রসাদ পেতে জয়রামবাটীতে আসতে বলতেন।

বাবার কাছে শুনেছি যে, সেসময় পশ্চিম থেকে মেয়ে-মদ্দ কুলিরা ঐ অঞ্চলে আসত। তারা ধানচাষের সময় এবং ধানকাটার সময় শ্রমিকের কাজ করত। গ্রামের বাইরে মাস-ভর কুঁড়ে বেঁধে থাকত। দিনের কাজ শেষ হলে সন্ধ্যাবেলা কুলিরা পিসিমার বাড়িতে অনেকেই আসত। একবার কামিনদের মধ্যে একজনের সন্তান প্রসব হয়। শিশুকে পাশে শুইয়ে রেখে কামিনটিকে ধানঝাড়ার কাজ করতে দেখে পিসিমার খুব কষ্ট হয়েছিল। পিসিমা মেয়েটিকে ডেকে একটি নতুন কাপড় দিয়েছিলেন। শিশুটির জন্য তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। কাজ শেষ হলে গাঁ ছেড়ে যাবার আগে কুলি-কামিনরা পিসিমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে যেত। তিনি তাদের সকলকে গুড়-মুড়ি, পুরনো কাপড় দিতেন।

তিনি যখন শেষবারের মতো জয়রামবাটী ছেড়ে কলকাতা গেলেন তখন আমার বয়স দশ বছর। পিসিমার সেই যাওয়ার ছবিটি আমার চোখের সামনে আজও ভাসে। সেবার পিসিমা শিহড় হয়ে বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন যথারীতি আমার বাবার পালকিতেই। পিসিমার সঙ্গে তাঁর ভাইঝিরা এবং সেবক বরদা মহারাজ ছিলেন। তখন জয়রামবাটী থেকে কোয়ালপাড়া-কোতুলপুর যাওয়া যেত দুটো পথে। একটা আমোদর পেরিয়ে দেশড়া হয়ে, অন্যটা শিহড়-শিরোমণিপুর হয়ে। প্রথম পথটা দূরত্বে কম হলেও পথের অবস্থা ছিল খুব খারাপ এবং দ্বিতীয় পথটা দূরত্বে বেশি হলেও পথের অবস্থা ছিল ভাল। বর্তমানে দ্বিতীয় পথটি আর চালু নেই। সেবার পিসিমা যখন পালকি করে জয়রামবাটী থেকে যাত্রা করেছিলেন তখন গ্রামের অনেকেই শিহড় পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতে গিয়েছিল। আমিও শিহড় পর্যন্ত পিসিমার পালকির পিছন পিছন গিয়েছিলাম। শিহড়ে শান্তিনাথের মন্দিরে পিসিমা পুজো দিয়ে সবাইকে প্রসাদ দিলেন। পিসিমার হাত থেকে শেষবারের মতো আমিও সেদিন প্রসাদ পেয়েছিলাম। তারপর কোয়ালপাড়ার পথে পিসিমার পালকি রওনা হলো। পিসিমাকে আমার সেই শেষ দেখা।

পিসিমার দেহরাখার খবর শুনে খুব কেঁদেছিলাম। কিশোরী মহারাজ আমায় কাঁদতে দেখে বলেছিলেন : "কাঁদছিস কেন রে বোকা! মা কি কোথাও গেছেন? এখানেই তো আছেন।" মহারাজের সেই কথা এখনো আমার কানে বাজে। আমি বিশ্বাস করি, পিসিমা আজও জয়রামবাটীতে তাঁর নতুন বাড়িতে আগের মতোই রয়েছেন। আজ আমার বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি। এখন খাটার ক্ষমতা নেই, তবু এখনো রোজ জয়রামবাটী আসি হলদি থেকে। পিসিমার উঠোনটা ঝাঁট দিই। আমার বিশ্বাস, পিসিমা এখনো এই উঠোন দিয়ে হাঁটেন। মহারাজরা আমার প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন : "তোমাকে এই বয়সে এত কষ্ট করে আর ঝাঁট দিতে হবে না। তোমার যখন খুশি আসবে এবং প্রসাদ পাবে।" আমি এখনো রোজ আসি, প্রসাদ পাই,

কিন্তু ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করিনি। কারণ, ঐ উঠোন দিয়ে যে পিসিমা এখনো হাঁটেন। তাই প্রাণের তাগিদে উঠোন ঝাঁট দিই। পিসিমার নতুন বাড়িতে এলে আমি যেন আবার আমার সেই ছোটবেলায় ফিরে যাই। চোখের সামনে বেড়ালগুলোকে দেখতে পাই, দেখতে পাই পিসিমার টিয়াপাখি গঙ্গারামকেও। দেখি—পিসিমা যেন নতুন বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে বলছেন ঃ "বাবা শান্তি, দেখে আয় তো গরু চরিয়ে ছেলেটা (রাখাল) ফিরে এল কিনা। বড় দেরি হয়ে গেল। ও না খেলে আমি তো খেতে পারব না!"

পিসিমার পা ছড়িয়ে বসা ছবিটা আমার চোখের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ভাসে। বৃদ্ধা—কিন্তু দুচোখে কী মমতা! তবে আমি কিন্তু একদিন পিসিমাকে এক অন্য মূর্তিতেও দেখেছিলাম। আমি আর আমার এক দিদি সেদিন পিসিমার নতুন বাড়িতে গিয়েছি। পিসিমা বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম পিসিমা উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলাম, পিসিমার মতো দেখতে, কিন্তু এ কোন্ পিসিমা? যুবতী, চলচল দিব্য কান্তি, পিঠের চুল সব খোলা—পিছনদিকে যেন পায়ের কাছে ভুঁয়ে ঠেকে গেছে। ঠিক যেন মা-কালীর মতো। দিদিকে ভয়ে ভয়ে চুপিচুপি বললাম ঃ "দিদি, পিসিমাকে দেখ। কত চুল পিসিমার মাথায়!" দিদিও একই দৃশ্য দেখতে পেল। ভয়ে একছুটে দুজনে বাড়ি চলে গেলাম। পিসিমার সেই মূর্তি আজও আমার মনে আছে।

পিসিমা আমার নাম রেখেছিলেন 'শান্তি'। আজ শুধু আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—কখন পিসিমা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে পুরোপুরি শান্তি দেবেন!□

সংগ্রহ ঃ কার্তিক সেন (ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী) এবং তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া, জেলা—হুগলী)

সংগ্রহকাল ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫ ; স্থান ঃ জয়রামবাটী

অনুষ্ঠান-সূচী (পৌষ-মাঘ ১৪০৩)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৩ পৌষ	বুধবার	১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬
শ্রীযীশুখ্রীস্ট	——	৯ পৌষ	মঙ্গলবার	২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৬
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ পৌষ	বুধবার	১ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২১ পৌষ	রবিবার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৩০ পৌষ	মঙ্গলবার	১৪ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৮ মাঘ	বুধবার	২২ জানুয়ারি ১৯৯৭
শ্রীশ্রীস্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ মাঘ	শুক্রবার	৩১ জানুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৬ মাঘ	রবিবার	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৮ মাঘ	মঙ্গলবার	১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৮ মাঘ	মঙ্গলবার	১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

একাদশী-তিথি (রামনামসঙ্কীর্তন)

৫, ২১ পৌষ	শুক্রবার, রবিবার	২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬,	৫ জানুয়ারি ১৯৯৭
৫, ২১ মাঘ	রবিবার, মঙ্গলবার	১৯ জানুয়ারি ১৯৯৭,	৪ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

করুণা-নির্ঝরিণী মা

সুরেশচন্দ্র চৌধুরী

আমরা পূর্ববঙ্গের লোক। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামে আমাদের বাড়ি ছিল। আমার বাবা গোপালগঞ্জে সরকারি উকিল ছিলেন। সেজন্য আমার শৈশব ও কৈশোর গোপালগঞ্জেই কাটে। স্কুলে পড়ার সময়েই আমি 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য হই এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। কিছুদিন পর রাজদ্রোহের অপরাধে আমাকে পুলিস গ্রেপ্তার করে এবং বছর দেড়েক কারাগারে কাটাই। জেলে থাকার সময় সহবন্দী এক যুবক ডাক্তারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনিও ছিলেন একজন স্বদেশী। ডাক্তার বন্ধুটির কাছে সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনতাম। অনুশীলন সমিতির সভ্য হিসাবে এবং স্বদেশী করার সুবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি আমি আগে থেকেই অনুরক্ত ছিলাম, কিন্তু ডাক্তার বন্ধুটির সান্নিধ্যে তাঁদের প্রতি অনুরাগ আমার বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছেই আমি প্রথম জানতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তখনো স্থূলদেহে বর্তমান আছেন এবং তিনি মাঝে মাঝে কলকাতার বাগবাজারে তাঁর বাসভবনে থাকেন। একথা শোনার পর থেকে আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয় কখন এবং কেমন করে আমি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন লাভ করব। জেলে যে সামান্য মাসোহারা পেতাম তা আমি একটু একটু করে জমিয়ে রাখতাম মুক্তি পেলে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যাবার পথ-খরচের জন্য।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের এক সুন্দর সকালে খুলনা জেলার দৌলতপুর কারাগার থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। মুক্তি পেয়েই একবস্ত্রে প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়লাম শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য। আমার তখন গন্তব্য বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয় তথা 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'। অবশেষে সেখানে পৌঁছালাম, কিন্তু মা তখন সেখানে ছিলেন না। তিনি কোথায় রয়েছেন সেকথা কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই আমি চলে গেলাম শ্যামবাজারে গৌরী-মার শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে। আমি তখন ছেলেমানুষ, ভেবেছিলাম মায়ের নামে আশ্রম যখন তখন মাকে নিশ্চয় সেখানে দেখতে পাব। বলা বাহুল্য, মা সেখানে ছিলেন না, তবে সেখানে গৌরী-মার দর্শন পেলাম। গৌরী-মা আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমার সব কথা শুনে গৌরী-মা আমাকে বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন। গৌরী-মাকে প্রণাম করে আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমি যে মাকে দর্শন করতে এসেছি এবং মা কোথায় রয়েছেন তা সেখানে কাউকেই, এমনকি গৌরী-মাকেও জিজ্ঞাসা করিনি। ভেবে নিলাম, মা নিশ্চয়ই কামারপুকুরে আছেন। সুতরাং এবার গন্তব্য কামারপুকুর। আমার সম্বল মাসোহারার মাত্র কয়েকটা টাকা। তার কিছুটা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। তখন কলকাতা থেকে অনেক হাঙ্গামা করে কামারপুকুর যেতে হতো। কিছুটা ট্রেনে, অনেকটা পায়ে হেঁটে। আমি সমস্ত পথ হেঁটেই চললাম।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে চলেছি আমার আরাধ্যা দেবীপ্রতিমার দর্শনে। খিদে পেলে খাই দু-পয়সার মুড়ি-বাতাসা আর রাস্তার ধারে পুকুরের জল। গ্রীষ্মের দাবদাহে দেহ জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে দেহ শীতল করি। ভিজে জামাকাপড় গায়েই শুকিয়ে যায়। তিনদিন পর দুপুরবেলা কামারপুকুরে এসে পৌঁছালাম। খুঁজে খুঁজে ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে শিবু-দাদার সঙ্গে দেখা হলো। শিবু-দাদা বললেন: "মা তো এখানে নেই। মা তো জয়রামবাটীতে।" হালদারপুকুরে স্নান সেরে শিবু-দাদার কাছে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে জয়রামবাটী যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। যাবার সময় শিবু-দাদাকে প্রণাম করতে তিনি বললেন: "ঠাকুরের নিজের হাতে লাগানো গাছের এই আমগুলি মাকে দিও।" আমের পুঁটুলিটি নিয়ে জয়রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম। যখন জয়রামবাটী পৌঁছালাম তখন পড়ন্ত বিকেল। মায়ের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন আমার রুক্ষসূক্ষ চেহারা ও মলিন বেশভূষা দেখে কেউ কেউ কিঞ্চিৎ অবাক হলেন বলে মনে হলো। তারপরে যখন জানলেন, আমি সদ্যমুক্ত জেলফেরৎ আসামী তখন তাঁদের মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখা গেল। বললেন: "এমনিতেই রোজ পুলিস এখানে এসে খোঁজখবর নেয়। নতুন কাউকে দেখলে নানারকম জেরা করে। তোমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই। তোমাকে তো বেঁধে নিয়ে যাবেই, সেইসঙ্গে মাকেও উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে দেবে। সুতরাং তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও।" এইরকম যখন বাক্যালাপ চলছে তখন একটি ছোট ছেলে এসে বলল: "কলকাতা থেকে যে-ছেলেটি এখুনি এসেছে, মা তাকে ভিতরে ডাকছেন।" ঐ একটি বাক্যেই আমার মন-প্রাণ করুণার নির্ঝরিণীধারায় যেন স্নাত হয়ে গেল। দু-ফোঁটা জলও চোখের কোণে জমল—বোধহয় মায়ের উদ্দেশে পাদ্য-অর্ঘ্য হয়েই।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি মা বারান্দায় বসে আছেন। যেন কতদিনের চেনা, সেভাবে মধুর কণ্ঠে বললেন: "যাও বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও। তারপর মুখে কিছু দাও।" শিবু-দাদার দেওয়া আমের পুঁটুলিটি মায়ের পায়ের কাছে

রাখতে রাখতে বললাম : "এই আমগুলো শিবু-দাদা পাঠিয়েছেন আপনার জন্য।" শিবু-দাদার বাড়িতে দুপুরে খেয়ে এসেছি বললে মা বললেন : "তা হোক, একটু কিছু মুখে দাও।" হাত-মুখ ধুয়ে আসতে মা তাঁর পাশে পাতা আসনে আমাকে বসতে বললেন এবং আমাকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার দেখতে সামান্যই— একবাটি মুড়ি, আরেকটা ছোট বাটিতে গোটা চারেক নারকেল নাড়ু। মা বললেন : "শিবুর ওখানে ভাত খেয়েছ। এখন এই খাও বাবা, রাত্রে ভাল করে খাওয়াব।" আহার্য সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ তার আস্বাদ। খাওয়া হলে মা বললেন : "রাত্তিরটা কাছেই কষ্ট করে কাটাও। কাল সকালেই স্নান করে তৈরি হয়ে থেক। আমি ডেকে নেব। এখন তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে। বরদা তোমাকে থাকার জায়গা দেখিয়ে দেবে।" মায়ের নির্দেশে একটি ছেলে কাছেই একটি অর্ধনির্মিত বাড়িতে রাত্রে বিশ্রাম করার জন্য আমাকে নিয়ে গেল। ছেলেটির নাম বরদা—পরবর্তী কালে স্বামী ঈশানানন্দ।

পরদিন সকালে স্নানাদি সেরে তৈরি হয়ে রয়েছি। সকাল নটা নাগাদ বরদা এসে আমায় ডাকল। বলল : "মা ডাকছেন।" মায়ের (পুরনো) বাড়িতে গিয়ে দেখি মা ঠাকুরঘরে পূজারতা। আমি যেতে আমাকে ইঙ্গিতে ওখানে আগে থেকে পাতা একটি আসনে বসতে বললেন। বসলাম। সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণের পট ছিল। মা বললেন : "বাবা, ঠাকুরকে প্রণাম কর।" 'ঠাকুর' বলতে যে শ্রীরামকৃষ্ণকে মা বোঝাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। ফলে আমি ঠিক করতে পারছিলাম না কাকে প্রণাম করব। তখন আমি মাকেই প্রণাম করলাম এই ভেবে যে, তিনিই আমার ঠাকুর। আমি মুখে কিছু না বললেও মার মুখে দেখলাম মধুর হাসি। তারপর মা আমাকে কৃপা করে মহামন্ত্র দান করলেন। কেমন করে করজপ করতে হবে তা দেখিয়ে তাঁর সামনে আমাকে জপ করতে বললেন। তারপর বললেন : "এখন বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ জপ কর।" আধঘণ্টা পরে বললেন : "তোমার খাবার তৈরি আছে। তুমি বাবা খেয়েই এখনি এখান থেকে রওনা হয়ে যাও। এখানে পুলিসের খুব উৎপাত। ওরা প্রায় রোজ এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। নতুন কোন লোক এলে তাকে জেরা করে, কখনো কখনো থানাতেও নিয়ে যায়। তোমাকে দেখলে ওরা তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারে।"

মাকে প্রণাম করে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম বারান্দায় আমার জন্য আসন পাতা। আসনে বসলাম, একজন মহিলা আমাকে খাবার দিলেন। খাওয়া শুরু করার আগে মা এলেন। এসে এক-টুকরো মিছরি জিভে ঠেকিয়ে প্রসাদ করে আমার হাতে দিলেন। খাওয়ার সময় মা পাশে বসে রইলেন। খাওয়া শেষ হলে মাকে পুনরায় প্রণাম করে রওনা হলাম। মা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। রাস্তায় যখন আসছি, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে জল। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল ততক্ষণ আমাকে দেখছেন দেখলাম।

আনন্দে ভরপুর হয়ে আমি পথ চলেছি। কোথায় যাব কিছু ঠিক নেই। রাস্তাতেই স্থির করলাম, সোজা বেলুড় মঠে যাব। বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হলাম। মঠে তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ছিলেন না। সাধুরা আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজকে আমার সবকথা বললাম। মায়ের কৃপা পেয়েছি শুনে এবং মঠে ব্রহ্মচারিরূপে থাকতে চাই জেনে তিনি আমাকে মঠে থাকার অনুমতি দিলেন। কিছুদিন মঠে ছিলামও ব্রহ্মচারী হিসাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। মঠে তখন চিকিৎসার সুবিধা ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বললেন : "তুমি এখন বাড়িতে গিয়ে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া কর এবং চিকিৎসা করাও। এখানে তো খাওয়াও নেই, চিকিৎসারও সুবিধা নেই।" বাড়ি ফিরে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম ঠিকই, কিন্তু বাড়ির চাপে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবার চাপে আর বেরিয়ে আসতে পারলাম না। মহাপুরুষ মহারাজকে পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি লিখলাম এবং এমতাবস্থায় তাঁর কি নির্দেশ তা জানতে চাইলাম। উত্তরে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে লিখলেন : "এটাই মায়ের ইচ্ছে জানবে। তুমি এখন বাড়িতেই থাক। বাবা-মায়ের সেবা কর। সৎ গৃহস্থ হও। সৎ গৃহীরও দরকার আছে, নাহলে ঠাকুরের পরিবার থাকবে কি করে?" মায়ের সঙ্গে পরবর্তী কালে আমার আর দেখা হয়নি, কিন্তু ঐ সামান্য দর্শনের স্মৃতিই আমার জীবনের প্রধান সম্বল।★ □

★ এই স্মৃতিকথাটি লেখকের কন্যা বীণা চৌধুরীর (বনহুগলী, কলকাতা-৭০০ ০৩৫) সৌজন্যে আমরা পেয়েছি।
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রাসঙ্গিকী

প্রাসঙ্গিকী বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-পত্রলেখিকাদের।
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শিকাগোর অনুভূতি

বেশ কিছুদিন শিকাগোয় থাকা হলো। 'শিকাগো'—এই শব্দটিতেই একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এখানেই তো স্বামীজীর নিজেকে মুক্ত করে পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার জায়গা। সুতরাং শিকাগোর একটি স্থানমাহাত্ম্য আছে। আসার সময় 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' সঙ্গে নিয়ে এসেছি। শিকাগোয় বসে 'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' পড়ার একটা আলাদা অনুভূতি। কলকাতায় পড়লে এই অনুভূতির অংশীদার হওয়া যেত না। কলকাতাতেও পড়েছিলাম, কিন্তু কলকাতায় পড়া আর শিকাগোয় পড়ার মধ্যে উপলব্ধির কিছু তফাত রয়েছে বলে আমার মনে হয়। এখানে বসে 'কথামৃত' এবং 'লীলাপ্রসঙ্গ' পড়েছি এবং পড়ছি। এই পড়াতেও যেন একটা বিশেষ তারতম্য হয়ে যাচ্ছে। এটাও কি স্থানমাহাত্ম্যের জন্য? স্বামীজী বলেছিলেন যে, তিনি যাওয়ার আগেই ঠাকুর আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাবপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। স্বামীজী শুধু নিমিত্ত মাত্র। তাঁর প্রচার তিনি নিজেই করেছিলেন। এথেকে বোঝা যাচ্ছে, শিকাগো এবং আমেরিকা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পছন্দের জায়গা। এজন্যই কি 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'বিশ্বপথিক' পড়ার সময় আলাদা অনুভূতি হচ্ছে? এর উত্তর আমার ঠিক জানা নেই, তবে এভাবে ভাবতে ভাল লাগছে। এখন খালি মনে হয়, আরও আগে কেন মঠের সঙ্গে এত গভীরভাবে সংযুক্ত হইনি? তবে পরে যুক্ত হয়েও যা পেয়েছি তাই বা কম কিসের? এই প্রাচুর্য এবং ভোগবিলাসের দেশে আছি ঠিকই, কিন্তু অর্ধেকের বেশি মন পড়ে রয়েছে দেশে। এই যে দেশের দিকে বেশি আকর্ষণ এবং প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসের মোহে আচ্ছন্ন না হওয়া—এর পিছনে মঠের আকর্ষণ রয়েছে বলে আমার নিশ্চিত ধারণা। দেশের বাইরে এসে দেশকেই বেশি ভাল মনে হচ্ছে এবং দেশে থাকাটাই বেশি কাম্য মনে হচ্ছে—এতো ঠাকুর-স্বামীজীর ওপর টানের জন্যই।

এজন্য ঠাকুরের কাছে বসে কাঁদতে ইচ্ছা হয় এবং বলতে ইচ্ছা হয়, তাঁর কত দয়া! তাঁর দয়া আছে বলেই তো ভুল জিনিস ও ঠিক জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখেছি। এদেশেও এখন দেখছি অনেকে 'ফ্যামিলি ভ্যালু' বিষয়টা বোঝার এবং অনুশীলন করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষ, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের মানুষের মাধ্যমে 'ফ্যামিলি ভ্যালু' জিনিসটি এদেশের মানুষের মনকে টানছে। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এরা ভীষণ পরিশ্রমী এবং 'সিস্টেমেটিক' জাত। তবে এদের জীবন বলগা-ছাড়া এবং আমরা জীবনে যাকে শোভন ও শালীন বলে মনে করি তার অভাব এখানে খুবই প্রকট। তবে আমার মনে হচ্ছে, ভারতীয় বা প্রাচ্যের 'ফ্যামিলি ভ্যালু'র প্রভাবে এরা এদের পরের প্রজন্মকে 'ভ্যালু-ওরিয়েন্টেড' করার চেষ্টা করছে। দুঃখ হয় এই ভেবে, এদেশের লোক তাদের যেসব দোষকে আজ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে—আমাদের দেশের লোকেরা সেগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে! এদেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষকে চূড়ান্তভাবে বিশৃঙ্খল, অলস এবং ফাঁকিবাজ দেখে দুঃখ হয়। আমাদের দেশে কেউ কিছু ভাল করতে গেলে কি সাধারণের কাছে, কি সরকারের কাছে কোন সহানুভূতি বা সাহায্য পায় না। তাই যাদের চেষ্টা বা ইচ্ছা থাকে তারাও কিছু করতে পারে না, বা যতটা হওয়া দরকার ততটা হতে পারে না। কিন্তু এদেশের মানুষ বা সরকার সবাইকে সাহায্য করতে চায়, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। দেশকে তারা ভালবাসে, আর আমাদের দেশে আমরা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। দেশের জন্য আমরা কতটুকু ভাবি এবং কতটুকু করি? মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইটি পড়তে খুব ভাল লাগছে। আমাদের দেশের মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে স্বামীজীর কথাগুলি যেন আরও প্রাণবন্ত লাগছে।

ছেলের অফিসের পাশেই 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে' ('Swami Vivekananda Way')। ইচ্ছা হয়, সারাক্ষণ এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি।★ ভাবি, আমরা কেন তাঁর এককণা শক্তিও পাইনি!

অপরাজিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্পাইস সার্কল, নেপার ভিলে
ইলিনয় ৬০৫৬৫, শিকাগো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

★ শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের শতবর্ষ উপলক্ষে 'শিকাগো সিটি কাউন্সিল' শিকাগোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ 'মিশিগান অ্যাভিনিউ'-এর যে-অংশটি আর্ট ইনস্টিটিউট-এর পাশ দিয়ে গিয়েছে তার নামকরণ করেছেন 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে'। ধর্মমহাসম্মেলনে স্বামীজীর মহান বাণী ও ঐতিহাসিক অবদানকে সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতির স্মারক হিসাবে শিকাগো সিটি কাউন্সিল গত ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধান্তটি কার্যকরী হয় গত ১১ নভেম্বর ১৯৯৫ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আর্ট ইনস্টিটিউট-এর প্রবেশদ্বারের সামনে যেখানে মিশিগান অ্যাভিনিউ এবং অ্যাডামস স্ট্রীট সংযুক্ত হয়েছে সেখানে নতুন নামকরণের ফলকটি স্থাপন করা হয়েছে। ফলকটির আবরণ উন্মোচন করেন আমেরিকাস্থ তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ভারতীয় কনসাল জেনারেল কে. আর. সিনহা সহ আমেরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদে প্রকাশ যে, অল্পদিনের মধ্যে এখানেই স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব শিকাগো-ভঙ্গির বিরাট মূর্তি স্থাপিত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ আর্ট ইনস্টিটিউট-এর 'ফুলারটন হল'-এর প্রবেশপথের কাছে স্বামীজীর একটি স্মৃতি-ফলক স্থায়িভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ফলকটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে যাতে আর্ট ইনস্টিটিউট-এ আগত সকল দর্শনার্থীরই চোখে পড়ে। পূর্বতন বিখ্যাত 'কলম্বাস হল'

—যেখানে স্বামীজী প্রথম ভাষণ দান করেছিলেন সেটি এখন আর বর্তমান নেই। 'ফুলারটন হল'টি পূর্বতন 'কলম্বাস হল'-এর একটি অংশ। ফলকটিতে উৎকীর্ণ আছে এই কথাগুলি : "এই স্থানেই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব কলম্বীয় প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসাবে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যিনি প্রথম ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসিরূপে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে এসেছিলেন। তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ধর্মীয় ভাব-বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত করেছিল।"

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ : দিগ্বিজয়ী স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষপূর্তি

আগামী মাসে (জানুয়ারি ১৯৯৭) ঐতিহাসিক শিকাগো-ভাষণের পর দিগ্বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি হবে। আজকের ভারতভূমিতে পদার্পণের আগে অবশ্য তিনি পদার্পণ করেছিলেন শ্রীলঙ্কায়—তখনকার সিংহলে। তখন অবশ্য শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ-ভারতের অধীনে ছিল। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি প্রথম ভারত-ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁকে দক্ষিণ ভারতের, প্রধানতঃ তদানীন্তন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন স্থানে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। বাড়িতে বাড়িতে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হয়, স্বামীজীর শিকাগো-ভঙ্গির ছবি মাল্যভূষিত করা হয় এবং সন্ধ্যায় আলোকমালায় প্রতিটি গৃহ সজ্জিত হয়। দক্ষিণ দেশে স্বামীজীর সংবর্ধনা 'নবরাত্রি' উৎসবে পরিণত হয়েছিল।

মাদ্রাজের পর স্বামীজী ফেরেন তাঁর জন্মভূমি কলকাতায় ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে। কলকাতাতেও তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। বস্তুতঃ, মাদ্রাজে, দক্ষিণ দেশের অন্যত্র এবং কলকাতায় স্বামীজীকে যে স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল তার তুল্য সংবর্ধনা দেশে অথবা বিদেশে তার আগে কোন সন্ন্যাসী তো পানইনি, কোন রাজা-মহারাজা বা বিজয়ী বীরও পেয়েছেন কিনা সন্দেহ।

আগামী জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব? এবিষয়ে আমার একটি প্রস্তাব আছে। ২৬ জানুয়ারি, শতবর্ষ আগে স্বামীজী যেদিন প্রথম ভারতভূমির পাম্বানে পদার্পণ করেছিলেন এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি, যেদিন সকালে স্পেশ্যাল ট্রেনে বজবজ থেকে তিনি শিয়ালদহ তথা কলকাতায় পদার্পণ করেছিলেন—আগামী বছর (১৯৯৭) এই দিন-দুটিতে আমরা ঘরে ঘরে মঙ্গলঘট স্থাপন করে, স্বামীজীর প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করে এবং সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িগুলিকে আলোকমালায় সজ্জিত করে শতবর্ষ পূর্বের সেই গৌরবময় ঘটনার স্মরণ করতে চাই। আমার মনে হয়, এই দুটি দিন আমাদের সকলের জাতীয় উৎসবের দিন। দিগ্বিজয়ী স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন ভারতের জীবনে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিল। আত্মবিস্মৃত পরাধীন ভারতবর্ষ তার দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ করে উত্থিত হয়েছিল। স্বামীজীর ভারতে প্রথম পদার্পণের দিনটি ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের একটি পরম উল্লেখযোগ্য দিন—সাধারণতন্ত্র দিবস। এইদিন স্বাধীন ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। দিগ্বিজয়ী স্বামীজীর ভারতে প্রথম পদার্পণের দিন এবং ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি হওয়া কি শুধুই কাকতালীয় ঘটনা অথবা, নতুন ভারতের মহান রূপকার স্বামী বিবেকানন্দের পরাধীন ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণের সঙ্গেই অভ্রান্তভাবে সূচিত হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের জন্মলগ্নটি?

আজ আমাদের সামনে একটি পরম সুযোগ সমাগত। আমরা ভারতের, অরবিন্দের ভাষায়, "বিরাট প্রাণপুরুষ"কে আমাদের হৃদয়ের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও জাতির কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হতে চাই।

সুজাতা চক্রবর্তী
আদর্শনগর হাউজিং কমপ্লেক্স, সোনারী কম্পাউন্ড,
জামশেদপুর-৮৩১০১১, বিহার

'উদ্বোধন' শারদীয়া ১৪০৩

'উদ্বোধন'-এর এবছরের শারদীয়া সংখ্যাটি যেন স্বর্গীয় সুষমায় ভরা। 'কথাপ্রসঙ্গে' স্তম্ভে 'আনন্দময়ী' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আনন্দময়ীর আগমনী বার্তা শারদ প্রকৃতির মধুরিমা বর্ণনার মধ্য দিয়ে যেমন অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে তেমনি সম্পাদক মহারাজের সুললিত ভাষার গুণে আমাদের মনে নির্মল আনন্দের হিল্লোল উঠেছে। সম্পাদক মহারাজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সুস্পষ্ট-ভাবে দেশবাসীর প্রতি শারদ উৎসবের সময় আমরা যে গভীর উদাসীনতা, উপেক্ষা ও উন্নাসিকতা দেখাই সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মন দেশের বর্তমান দুরবস্থায় অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করেছে, কিন্তু দেশবাসীর শুভবুদ্ধির ওপর তিনি আস্থা হারাননি। সেজন্যই দেশের মানুষের সুপ্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। 'উদ্বোধন'-এর এই উদাত্ত আহ্বান প্রতিধ্বনিত হোক বাঙালীর প্রতিটি গৃহে। আমরা যেন অপরের প্রতি কর্তব্যকর্মে, শ্রদ্ধায়, প্রেমে, সহমর্মিতায় সত্যি সত্যি সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠি। সম্পাদক মহারাজের প্রার্থনার সঙ্গে এই প্রার্থনা আমারও, এবং বিশ্বাস করি, আমাদের সকলেরই।

চিত্রা সেন
সফদরজঙ্গ এনক্লেভ
নিউ দিল্লী-১১০০২৯

কবিতা

মায়ের পরশ

দীপ্তিকুমার শীল

মাগো,
মন বসে না, জপ হয় না
ধ্যান তো দূরের কথা,
অবিশ্বাসের নিঃশ্বাসে মা,
বুকভরা শুধু ব্যথা॥
আনন্দ চাই, আনন্দ কি
সেটাই জানি না,
আনন্দময়ীকে ভুলে আছি
এটাও বুঝি না॥
উথাল-পাথাল মন-যমুনায়
সদা আশঙ্কারই ঢেউ,
অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই
হাত ধরে না কেউ॥
এমন সময়
রাত পোহাল, উষার আলোয়
দেখি তোমার মুখ,
বলছ তুমি—
"এই তো আমি
মা যে তোমার,
কিসের আবার দুখ॥"
আটপৌরে বসন তোমার
মুখটি হাসিমাখা,
দেখি—
আমার হৃৎকমলে
তোমার রাঙা চরণ রাখা;
আলোয় আলোয় ভরে গেছে
আমার ছোট্ট হৃদয়,
মায়ের পরশ পেয়ে
আমি হয়েছি যে নির্ভয়॥

জননী সারদা

তারক চক্রবর্তী

দেবী সে আমার ভ্রষ্টপাপ উদ্‌ভ্রান্ত যুবক—
আমজাদের মতো যারা কৃপা পায় কৃপাময়ী জগন্মাতা
স্বামীজীর জ্যান্ত দুর্গা সারদামণির।
যাঁর পুণ্যস্পর্শে জেগে ওঠে সেবাধর্মে জাগ্রত চেতনা
সুপ্তভূমি এই দেশে নারীমুক্তি প্রজ্বলিত শিখা
আগত সেদিন সুজলা সুফলা গ্রাম শহরে নগরে
জন্ম নেবে খনা লীলাবতী মৈত্রেয়ী গার্গী
শস্যশ্যামল ভূমি আকাশে সাগরে, মাগো, জননী সবার—
জননী সারদাদেবী ভারতীর রূপমূর্তি লহ নমস্কার।

বড়দিনে

রমলা বড়াল

মৃত্যুর নিষ্ঠুর রক্ত যার স্পর্শে পূত হয়ে যায়
কোন শব্দ, কোন মন্ত্র, কোন উচ্চারণ
তাকে স্পর্শ করে?
সব রক্ত করুণার ধারা হয়ে ঝরে
ওষ্ঠের অস্ফুট শব্দে বাতাসে বাতাসে
দয়া, দয়া, দয়া রব ওঠে।
কথা নয়, স্তুতি নয়, লোকাচার নয়—
পার যদি দয়া কর—আমাকে, আমাকে।
বুভুক্ষু, উলঙ্গ আমি,
জরাতুর, ভারগ্রস্ত আমি,
দেখ পথে শতহাতে শুধু তোমাদের দয়া চাই।
পার যদি দয়া দাও, আর কিছু নয়।

শুভ্র শুচি মানবের পরম মানব
হে চির দয়াল প্রভু,
দয়া করে দয়া দাও, তাপিত এ বড় শুষ্ক বুকে,
তারপর সেই দয়া শতহাতে টেনে নাও তুমি,
আমাকে বিমুক্ত নয়
নির্ভার নীরব এক করুণার প্রবাহের মতো
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে
মিশে যাব ফের এক মহাব্যাপ্ত
অসীম সাগরে॥

পরশমণি

বন্যা মজুমদার

তোমার দ্বারে যখন আমি আসি
ভুলেই যে যাই কী কথা তোমা সনে,
কত কিছুই চেয়ে তখন বসি
তুমি শুধুই হাস নিজের মনে।

দুহাত ভরে কতই কী যে দিলে
খুশি মনে বাড়ির পানে ধাই,
খেলনা পেয়ে খেলি আপন মনে
সুখের সীমা যেন আমার নাই!

খেলনাগুলি ভেঙে গেল যেদিন
অবাক হয়ে চেয়ে আমি থাকি,
কী নিয়ে যে মেতেছিলেম ভুলে
মূল্যহীন সবকিছুই যে, একী!

আবার গিয়ে দাঁড়াই তোমার দ্বারে
ভাসে বুকটি নীরব চোখের জলে,
তোমার মুখে শান্ত-মধুর হাসি
মাথা পাতি তোমার চরণতলে।

অনিত্য যা সবকিছু থাক পড়ে
বাসনাজাল, সব মিথ্যা জানি,
তোমার চরণ পেয়েছি এইবার
এই তো আমার পুণ্য পরশমণি॥

মা সারদা

দিগম্বর দাশগুপ্ত

তোমাকে যতই দেখি মনে জাগে ততই বিস্ময়
কী স্নিগ্ধ কী স্নেহমাখা প্রসন্নতা-ভরা ঐ মুখ
তোমার সম্মুখে এলে ভরে ওঠে সমগ্র হৃদয়
পরম আনন্দে এক, ভুলে গিয়ে সর্ব শোক-দুখ।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ চিত্তে যত ভাবি শুচি স্নিগ্ধ মনে
মহিমা-মণ্ডিত ঐ উজ্জ্বল তোমার মূর্তিখানি
ধন্য হয় দুনয়ন, কী যে শান্তি জাগে এ জীবনে
নিমেষে নিঃশেষ হয় যাকিছু দীনতা আর গ্লানি।

করুণার মূর্তি তুমি এ ধরায় মানবীর বেশে
এসে পাপী-তাপী সর্বজনে দিলে স্নেহ, দিলে বরাভয়
আজো দেখি কতজন তোমার চরণতলে এসে
শান্তি লভে, খুঁজে পায় এ জীবনে সুখের আশ্রয়।

অন্তভায় সমাচ্ছন্ন হয়ে যবে তোমার সন্তান
দুঃখ আর গ্লানিভারে হয় অবনত
তখন তুমিই মাগো সব দুঃখ, সব অকল্যাণ
দূর কর সন্তানের, পাপ মোহ ভয় গ্লানি যত।

খ্যাতিহীন পল্লীমাঝে হয়েছিল তোমার উদয়
আজ বিশ্বমাতারূপে সারা বিশ্বে তব পরিচয়।

কত খেলা কত ছলে

কৃষ্ণা সেন

মন ভোলাবি বলে মাগো,
কত খেলা কতই ছলে—
তাই তো ভুলে বসে আছি,
ও রাঙা চরণ ফেলে।
কত ডাকি বারেবার
দেখা দে মা একবার—
ধুলা যদি মেখে থাকি,
ধুলা ঝেড়ে নে মা কোলে।
আপন সন্তানে মাগো
ফেল ঠেলে, দূরে রাখ,
ভাব তব বুঝি নাকো—
অভিমানে হৃদি ভরে।

একবার 'মা' ডাকিলে
মা যে ছোটে কাজ ফেলে,
শতবার 'মা' 'মা' ডাকি,
তবু নাহি ভরে আঁখি,
বুঝেছি বুঝেছি এবার,
বাঁধতে হবে ভক্তিডোরে।
তোমার নাম করেছি যখন,
পাপ সব দূরে তখন,
মনে কোন ভয় নাই মা—
পাবই পাব রাঙা চরণ।
প্রাণভরে তোমায় স্মরি,
দেখা দাও মা নয়ন ভরি—
আর ভোলালে ভুলব না মা
লবই লব পরম শরণ।

সুধাসাগর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মাকে চিনেছি।

তিনি সমর্পণ। তিনি প্রেম। তিনি সেবা। তিনি সহিষ্ণুতা। তিনি উদারতা। তিনি প্রসারতা। কালাতীত। কালজয়ী। কালী।

অগ্নি তেজোময়ী, কিন্তু একটি আধার চায়। দীপের উপমা। দীপের আধার, তেল, সলতে, একটি স্ফুলিঙ্গ; তবেই না দীপশিখা! রামকৃষ্ণরূপী শিখার দীপাধার মা সারদা। আমি তোমাতে জ্যোতির্ময় হব।

হও।

তুমি আমাকে লালন করবে, সংরক্ষণ করবে, পরিমার্জনা করবে। সংস্কার করবে। চর্চা করবে।

তুমি আমার কে?

আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী তো বটেই, কিন্তু তোমার জীবনে ধর্ম ও ধর্মের সাধন ছাড়া তো আর কিছুই নেই, তাই আমি তোমার ধর্মসঙ্গিনী, সহধর্মিণী। তোমার সাধনপথের সহায়। না, আমার কোন কামনা-বাসনা নেই। ও দুটো আমি ফেলে এসেছি। আমি তৈরি সৈনিক। যে-যুদ্ধের তুমি ফিল্ড মার্শাল, আমি সেই যুদ্ধের শিবির। দিনান্তে শান্ত সমরাঙ্গন থেকে ফিরবে ক্লান্ত সৈনিকের দল আমার আশ্রয়ে। আমি কিছু নিতে আসিনি, আমি দিতে এসেছি, ঠাকুর।

তুলসীদাসজী যেমন বলেছিলেন: "সব ছোড়োয়ে সব পাওয়ে।" সব ছেড়ে দাও, দেখবে সব পেয়ে গেছ। মা সব ছেড়ে দিলেন—এমনকি দেহবোধও, ধীরে ধীরে সব পেয়ে গেলেন। ঠাকুরকে অন্যদের সব সংস্কার করে নিতে হয়েছিল। স্বামীজীর অহঙ্কারকে মারতে হয়েছিল, শ্রীম-এর অধীত জ্ঞানকে ছাঁটতে হয়েছিল, কেশবচন্দ্রে ভক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল, বিজয়কৃষ্ণকে সাধু চেনাতে হয়েছিল, রাসমণিকে বিষয়মুক্ত করতে হয়েছিল, মথুরামোহনকে স্বরূপ দেখাতে হয়েছিল। মাকে ওসব কিছুই করতে হয়নি।

কারণ—"Come empty"। এক জেন সন্ন্যাসীর কাছে এক মেজর জেনারেল এসেছেন। ফুল ইউনিফর্মে। কাঁধে, বুকে যাবতীয় ক্ষমতার পদক সাঁটা। কোমরে চওড়া বেল্ট। খাপে ঢাকা তরোয়াল ঝুলছে—প্রভুত্বের প্রতীক। উদ্ধত ভাবভঙ্গি। গটগট করে ঢুকলেন। সামনেই বসে আছেন জেন ধর্মগুরু। শান্ত, শিষ্ট, সৌম্য। জেনারেল কোমরবন্ধনী থেকে তরোয়াল খুলে খটাস করে টেবিলে রাখলেন। আসন টেনে নিয়ে পায়ের ওপর পা আড় করে বসলেন।

—শুনলাম, মানুষকে আপনি জ্ঞান দিচ্ছেন, সে-জ্ঞানে কাজও হচ্ছে। শুনি কী জ্ঞান! আমাকেও কিছু দিন তো। পরীক্ষা করে দেখি!

মহাপুরুষের ঠোঁটের কোণে খেলে গেল স্মিত হাসি।

—দূর থেকে এসেছেন। পরিশ্রান্ত আপনি। আগে এক পেয়ালা চা খান।

—বেশ! মন্দ প্রস্তাব নয়। চা চলতে পারে।

সন্ন্যাসী চা নিয়ে এলেন। ডানহাতে চা ভরতি একটি পেয়ালা আর বাঁহাতে একটি টি-পট। ভরতি পেয়ালাটি জেনারেলের সামনে টেবিলে রাখলেন। তারপর টি-পট থেকে সেই ভরা পেয়ালায় আরও চা ঢালছেন। পেয়ালা উপচে চা পড়ল ডিশে, ডিশ থেকে টেবিলে, টেবিল থেকে মেঝেতে।

জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন। ব্যঙ্গের সুরে বললেন: বুঝেছি, আপনি আমাকে কী জ্ঞান দেবেন! আপনার তো সামান্য এই জ্ঞানটুকুই নেই যে, ভরা কাপে চা ঢালা যায় না। ঢাললে উপচে পড়ে যায়!

সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে বললেন: ঠিক তাই। আপনি এটা বুঝেছেন। এখন বলছি—Please come empty। অহঙ্কারে টইটম্বুর হয়ে এলে, আমি আপনার পাত্রে যা ঢালব সব উপচে পড়ে যাবে। খালি পাত্র নিয়ে আসুন —Come empty।

মা ঠাকুরের কাছে এলেন শূন্য আধার নিয়ে। তিনি এলেন, না ঠাকুর তাঁকে আনলেন—সংশয় আছে। ঠাকুর বললেন, কোথায় খুঁজতে যাচ্ছ? সে যে জয়রামবাটীতে আছে 'কুটো বাঁধা' হয়ে। ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছিলেন। সারদা সরস্বতী। দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন, আধারটি কেমন। ধারণ করতে পারবে। ঠাকুর তো ছক সাজিয়ে এসেছিলেন। অখণ্ডের ঘর থেকে নরেনকে নামালেন। মথুরকে করলেন রসদদার। রাখাল হলেন মানসপুত্র। সাধন-গুরুরাও নির্বাচিত ছিলেন। পীঠস্থান রচনা করবেন রাসমণি। আর সারদা! সহধর্মিণী। তাঁকে তৈরি করবেন, পূর্ণ করবেন, রামকৃষ্ণ-জননী করবেন, মন্দিরের মা, চন্দ্রমণি মা আর মা সারদা এক হবেন। তাঁকে পূজা করবেন, সব সমর্পণ করবেন,

এমনকি জপের মালাটিও। তিনি হবেন ফলহারিণী, জগজ্জননী। নির্বিচারে সকলের মা। রামকৃষ্ণ-পরিবারের জননী।

ছেলেপুলে! একটি কী দুটি! মা বলে ডাকবে, পায়ে পায়ে ঘুরবে।

একটি, দুটি কী গো! শত সহস্র সন্তান লক্ষকণ্ঠে তোমাকে 'মা' বলে ডাকবে। তোমার এমন সন্তান হবে, যার ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি আগে যাব, তুমি পরে আসবে। জীবনের অন্ধকারে পোকার মতো যারা কিলবিল করছে, তাদের বড় কষ্ট গো! তুমি তাদের একটু দেখো। আমি যেমন কয়ে গেলুম, থেকে থেকে ভাবসমাধিতে লীন হলুম, কীর্তনানন্দে কেশবাদির সঙ্গে মাতোয়ারা হলুম; তুমি তেমনি তোমার নীরব, নিভৃত জীবনের মধুর মহিমায় হিত করবে, মোহিত করবে। যারা আমার কাছে সাহস করেনি তারা দুঃসাহসে তোমার কাছে যাবে। তুমি সতেরও মা হবে, অসতেরও মা হবে।

আমাদের মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গান :

"অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান॥
যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাকো ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে, সুধা করাও হে পান॥"

নরেনকে বলেছিলুম, তুই হবি বটবৃক্ষের মতো। তোমাকে বলছি, তুমি হবে সুধাসাগর। তোমার তীরে তৃষ্ণার্ত মানুষ, যারা সংসারে সুখ খুঁজতে গিয়ে কাঁটাগাছে ক্ষতবিক্ষত কশ, যারা সুধার বদলে কষায় চেখেছে, সুখের সন্ধানে বেতাল হয়েছে, ফাঁসিয়ে ফেলেছে চরিত্র, যারা অবশেষে বুঝেছে—

"পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাহে ছজন গোঁয়ার দাঁড়ী;
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙে গেল ভক্তির হাল; ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হলো বানচাল উপায় কি করি—
উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার;
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গানামের ভেলা ধরি॥"

তারা ছুটে আসবে "তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার" সারদানামের "ভেলা ধরি"। তুমি হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লিনিকের সিস্টার, রেড ক্রশ। সংসার সমরাঙ্গনের পাশে তোমার সেবা-শিবির। ক্ষতবিক্ষতে তোমার মাতৃমঞ্জুষার স্পর্শ। শূন্যকে পূর্ণ, পূর্ণকে বিপুল শূন্য করে তোলাই হবে তোমার কাজ। মনে রেখ, আমিও এসেছি, তুমিও এসেছ। আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। দুজনে মিলে হয়েছি—আমি তুমি, তুমি আমি। তুমি তোমার জিনিস নিয়ে এলে, আমি আমার জিনিস।

অতঃপর!

নরেন্দ্র-অগ্নিতে রামকৃষ্ণ-নির্যাসে সারদা-দুগ্ধ ও শর্করায় যে-আরক বিগলিত হলো তা ঘরে ঘরে, ঠোঁটে ঠোঁটে —কেউ বলছে 'চা', কেউ বলছে 'চায়ে', কেউ বলছে 'টি'। জীবরূপী পেয়ালায় পেয়ালায়। সারদা তুমি প্রমাণ করবে—Self-sacrifice is the real miracle out of which all the reported miracles grew. [Emerson] □

সংশোধন : কার্তিক ১৪০৩

'বিশেষ রচনা'য় ৫৭৮ পৃষ্ঠার ১ম কলমের ৭ পঙ্ক্তিতে '১৮৮২'-র স্থলে '১৮৯১' হবে।

'বিজ্ঞান নিবন্ধ'-এ ৫৮৯ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৩৫ পঙ্ক্তিতে '২৫ কোটি'র স্থলে '২৫৫ কোটি' হবে।

'বিবিধ সংবাদ'-এ ৫৯৮ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ২৪ পঙ্ক্তিতে 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী'র স্থলে 'স্বামী সারদানন্দজী' হবে এবং ৬০০ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১৪ পঙ্ক্তিতে 'স্বামী নিখিলানন্দ'-এর স্থলে 'স্বামী অখিলানন্দ' হবে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

নিবন্ধ

প্রসঙ্গ ঃ খ্রীস্টজন্মদিন বা বড়দিন

নচিকেতা ভরদ্বাজ

খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তক, পূর্ণ মানবতার প্রতিনিধি মহান যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে শুভ 'বড়দিন' পালিত হলেও আজ আর শুধুমাত্র খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নেই, পরন্তু বড়দিন আজ সমগ্র পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত এক বিশাল, সর্বজনীন, আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত। শুধু গির্জার মধ্যে পূজা-পাঠ-প্রার্থনা নয়—জাতিধর্মনির্বিশেষে সারা বিশ্বের বহু মানুষ যোগ দেয় এই আনন্দ-উৎসবে। নানারকম রূপবিন্যাসে ক্রিসমাস ট্রি ও সান্টাক্লজ সাজানো, বহুবিধ আলোকসজ্জা, মোমবাতি জ্বালানো, কেক খাওয়া, বিচিত্র বর্ণাঢ্য ও নানা রূপের শুভেচ্ছাপত্র-সহ হরেকরকম উপহার বিনিময়, নৃত্য-গীত—সবই এই উৎসবের অঙ্গ। পাশ্চাত্যের নগরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে-জনপদে—সর্বত্রই দেখা যায় আনন্দে উচ্ছল এক উৎসব-মুখর পরিবেশ, কিন্তু প্রাচ্যও এবিষয়ে কিছু কম যায় না।

আসলে উৎসব-অনুষ্ঠান-আচারের প্রতি একটি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে মানুষের অন্তরে। একঘেয়ে প্রত্যহ-পরিচর্যায় শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি বহন করে আমরা সাধারণ মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। জীবনের স্বাদ পালটাবার একটা সহজ সুযোগ যখন আসে আমাদের জীবনে আমরা তখন চাঙ্গা হয়ে উঠি। ধর্মীয় হোক, আর সামাজিকই হোক—উৎসবকে কেন্দ্র করে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে আমাদের চিত্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মবিচারের ফলে আমরা নিজেদের মুখোমুখি হতে পারি এবং অনেক সময় আমাদের একটি অভ্রান্ত আত্মোপলব্ধি ঘটে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের পবিত্র প্রভাবে। তাই আমাদের ভারতবর্ষে 'বার মাসে তের পার্বণ'-এর ব্যবস্থা।

দেশে দেশে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিই শুধু নয়, আমাদের সকল ধর্মানুষ্ঠান-ক্রিয়াকাণ্ডের পশ্চাতেও থাকে বিভিন্ন উৎস থেকে আগত বহুবিচিত্র সংস্কৃতিধারার সম্মিলন ও সমন্বয়। বলা বাহুল্য, খ্রীস্টজন্মোৎসবও এর ব্যতিক্রম নয়। অভিধানে দেখি, 'বড়দিন' কথার অর্থ 'ক্রিসমাস ডে'। 'বড়দিন' কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবশ্য আরও বহু অনুষঙ্গ। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার সঙ্গে প্রথমে সংঘাত এবং পরে সম্মিলন ও সমন্বয় ঘটেছে খ্রীস্টজন্মোৎসবের। আমরা একথাও জানি যে, সূর্যের পথ যখন ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরে আসতে থাকে, অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর থেকে ২১ জুন বা বাঙলায় ৮ পৌষ থেকে ৭ আষাঢ় পর্যন্ত কালকেই 'উত্তরায়ণ' বলা হয়। এই উত্তরায়ণে, অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর থেকেই দিন ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। তাই খুব সঙ্গত কারণেই একে আমরা 'বড়দিন' বলে থাকি। তাছাড়া বিশ্বের একজন সত্যিকার বড় মানুষের, ঈশ্বরপুত্রের জন্মদিন বলেও ২৫ ডিসেম্বর 'বড়দিন'রূপে চিহ্নিত। প্রাচীন কালে তো বটেই, একালেও বহু দেশে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই উত্তরায়ণ শুরু হওয়ার আগেই মাঠে মাঠে ফসল কাটা শেষ। গোলায় ধান-শস্যাদি তোলা হয়ে গেলে চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষের মেলে প্রচুর অবসর এবং তখনই আসে উৎসব আনন্দের সময়। ভারতবর্ষ যেহেতু ধর্মের দেশ, তাই আমাদের সকল উৎসব-অনুষ্ঠান, আচার-বিচার-বিধি আবর্তিত হয়ে এসেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। আমাদের সকল উৎসবেই সমাজ ও সামাজিকতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; তাই চাষবাস, কৃষি-কৃষক এবং শ্রমজীবী বা সাধারণ মানুষের জীবন-জগৎকে কেন্দ্র করেই এদেশে গড়ে উঠেছে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন। তবে শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মীয় এবং সামাজিক সকলরকম উৎসব-অনুষ্ঠানের মূলেই থাকে চাষী-মজুর-জেলে-জোলা-কামার-কুমোর প্রভৃতি শ্রমনির্ভর জীবিকার সাধারণ মানুষেরা। বস্তুতঃ, তাঁরাই সকলরকম উৎসব-অনুষ্ঠানের মূল প্রাণশক্তি। তাই দেখা যায়—এই সময়েই অর্থাৎ উত্তরায়ণের কালেই আমাদের দেশে পৌষপার্বণ ও নানাধরনের উৎসব-অনুষ্ঠান চলে এসেছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের দেশে খ্রীস্টধর্মের অনুপ্রবেশের পরে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানই নানা সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর জন্মদিনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই প্রায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত খ্রীস্টজন্মোৎসবকেও আমরা যেন গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করে, আমাদের মনের মতন করে 'বড়দিন' বলে গ্রহণ করেছি।

উপনিষদের সর্বত্যাগী তপস্বী ঋষি প্রার্থনা করছেন ঃ "আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণাহচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি

মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা।" (তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্, ১।৪।২)—আমার জন্য লোমশপশু-সমন্বিতা এবং অপরাপর পশুগণে সমাবৃতা সেই শ্রী বা লক্ষ্মীকে তুমি আনয়ন কর, যিনি সর্বদা আমাদের জন্য বহু বস্ত্র, গো, অন্ন ও পানীয় বস্তু আহরণ করবেন এবং দীর্ঘকাল ঐ সকলের সুব্যবস্থা করবেন। দেখা যাচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও লক্ষ্মীর কাছে অন্ন-পান-পশু-প্রজার জন্য কামনা করেছেন। অর্থাৎ এই অন্ন-পান-প্রজা-পশুর অধিকার অর্জনই সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিম প্রেরণা। প্রাণধর্ম পালনের এইসব নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতার শক্ত ইমারত এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠান, আচার-বিচার, বিধি-নিষেধের নিয়মাবলী। তাই দেখা যায়, খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইউরোপীয় সভ্যতার পীঠস্থান গ্রীসদেশে এই সৃষ্টি-শস্য-উৎপাদনের দেবতা ডায়োনিসাসের (Dionysus) মন্দির-প্রাঙ্গণেই নৃত্য, গীত, নাটক, কথকতা ও বর্ণাঢ্য বিচিত্র শোভাযাত্রা-সহ অনুষ্ঠিত হতো এক সর্বজনীন ধর্মীয় উৎসব। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই ডায়োনিসাসের মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকেই জন্ম হয়েছিল হাস্য ও করুণ-রসাত্মক (comedy and tragedy) নাটকের। এই ধর্মীয় উৎসবের কালও ফসল কাটার মরসুমের পরেই, অর্থাৎ উত্তরায়ণের শুরুতে। খ্রীস্টধর্মে দীক্ষার পরে ইউরোপে এই আদি উৎসবের সঙ্গে মিলেমিশে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গেল ২৫ ডিসেম্বরের খ্রীস্ট-জন্মোৎসব। পরবর্তী কালেও—খ্রীস্টধর্মের প্রথম যুগে ধর্মযাজকেরা ডায়োনিসাস-মন্দিরের উৎসবের অনুরূপ যীশুখ্রীস্টের জীবনকাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীত-নৃত্য-কথকতা পরিবেশন করে খ্রীস্টধর্মের প্রচার চালাতেন।

বর্তমানে আমাদের দোলপূর্ণিমার উৎসব শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য নামে অভিষিক্ত করে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীদের ঐশী প্রেমলীলারূপে গৃহীত হলেও মূলতঃ এটি ছিল মদনোৎসব বা বাসন্তী মেলা। এখন তাকে আমরা 'দোল' নামে অভিহিত করে থাকি। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আদিম ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের সহজ, স্বচ্ছন্দ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশই এই উৎসবের অঙ্গ। পরস্পরকে আবির মাখানো, পিচকারিতে বিভিন্ন রঙের খেলা, দোলপূর্ব সন্ধ্যায় চাঁচর বা 'নেড়াপোড়া' কিংবা পূর্ববঙ্গের ভাষায় 'বুড়ির ঘর পোড়া'র বহ্ন্যুৎসব প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়ে গেছে সেই প্রাচীন যুগের প্রতিচ্ছবি। আমাদের শিব-দেবতার পরিকল্পনার পশ্চাতেও রয়েছে বহুবিচিত্র ও বিপরীতমুখী সংস্কৃতির সহাবস্থান ও সমন্বয়। কামজয়ী ধ্যানস্থ শঙ্কর, ভাঙ-ধুতুরাসেবী চাষের দেবতা শিব এবং নটরাজ মহেশ্বরকে একই বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার আশ্চর্য এক রূপান্বয়। সুতরাং আবিশ্ব দেশে দেশে অনুষ্ঠিত খ্রীস্টজন্মোৎসব বা বড়দিনের পশ্চাতেও বহু বিচিত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে স্বাভাবিক সামাজিক নিয়মেই—নানা সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বাধিক আলোচিত মহান ব্যক্তিত্ব, প্রেম ও ক্ষমার মূর্ত বিগ্রহ প্রভু যীশুই যে বড়দিনের দেবতা—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঈশ্বরপুরুষ খ্রীস্টের সমগ্র জীবনই মানবকল্যাণে নিত্য-নিবেদিত। মানুষের জন্য, বিশেষ করে আর্ত অসহায় দুঃখী ব্রাত্যজনের মুক্তির জন্যই তিনি তাঁর সমগ্র জীবন-যৌবন, ধন-মান সবকিছু উৎসর্গ করে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে ঈশ্বরের অবতাররূপে গ্রহণ করে আপন বুকের রক্তে চরণ ধুইয়ে দিতে চেয়েছিলেন, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে 'ঋষি কৃষ্ণ' বলে বন্দনা করেছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন—জাতিধর্মনির্বিশেষে সমগ্র মানবসমাজের কাছেই তিনি পরম পূজ্য ঈশাবতার। বিশাল ব্যাপ্ত তাঁর মানবমহিমা, অতুলন তাঁর দিব্য কীর্তি। বিগত দুহাজার বছর ধরে শুধুমাত্র অবিরাম অক্ষরের অজস্র অঞ্জলিতেই নয়, পরন্তু রূপ-রঙ-রেখার বিচিত্র বিন্যাসে এবং প্রস্তর-পোড়ামাটি ও ধাতুর অজস্র রূপের উপস্থাপনায় কত যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে তাঁর পুণ্য নামে—তার কোন শেষ নেই। এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন জাতি নেই, এমন কোন ভাষা নেই—যেখানে খ্রীস্ট বন্দিত হননি। এমন কোন দার্শনিক-ভক্ত-ভাবুক নেই যিনি এই ঈশ্বরপুত্রকে নিয়ে কিছু না কিছু রচনা করেননি। পৃথিবীতে এমন কোন কবি-সাহিত্যিক নেই যাঁর হাতের কলম একবারও তাঁর মহাজীবন-কথা স্মরণ করে বিচলিত হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীতে এমন কোন শিল্পী নেই, যাঁর তুলি-কলম বর্ণের বেদনায় বিপ্লবী হয়ে ওঠেনি তাঁর উদ্দেশে। এমন কোন ভাস্কর নেই, যাঁর হাতের ছেনি-হাতুড়ি উদ্দাম হয়ে ওঠেনি তাঁর মহাজীবন ও কথামৃতের অমল অনুভবে। এমন কোন সুরকার নেই, যাঁর কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠেনি তাঁর জীবনচেতনার শুদ্ধ

অনুভবে। ইউরোপের রেনেসাঁ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের একটা বিশাল অংশ নিবেদিত খ্রীস্ট-জীবনের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে। সারা জগৎ-সংসার পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আজ তাঁর বিশ্বরূপের মহা মহিমায় এবং এ-বিশ্বরূপের কাছে নতজানু আজ সমগ্র বিশ্ব। দেশ-কালের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে তিনি আজ বেঁচে আছেন মানুষের মনে —আনন্দময় রূপে, শুভ্র শুদ্ধ এক মানবতার অনন্য অঙ্গীকারে, মহাজীবনের স্থির প্রত্যয়ে।

এই শুভ বড়দিনে তাঁরই আরাধনা করি আমরা দেশে দেশে। কিন্তু যাঁকে নিয়ে আজকের এই বড়দিন, যাঁকে কেন্দ্র করে আমরা খুশিতে, আবেগে, আনন্দে, পুষ্প-পতাকায়, গীত-বাদ্য-নৃত্যে, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়, আতসবাজি ও আলোকমালার বিপুল জলুসে মেতে উঠি—সেই ত্যাগীর সম্রাট, প্রেমের ঠাকুরকে আমরা কী সত্যি সত্যিই মনে রেখেছি? অনুসরণ করতে পেরেছি কী তাঁর দিব্য জীবনের সামান্যতম অংশ? যীশু বলেছিলেন, প্রেম-প্রীতিতে সকল মানুষকে আপন করে নিতে। বলেছিলেন, আর্ত, দুঃখী, দরিদ্রের সেবাই ঈশ্বরসেবা। সর্বভূতে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে, সর্বত্র তিনি ঈশ্বরদর্শন করতে বলেছেন। বলেছেন ঃ "আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক, স্বর্গরাজ্য আমাদের সকলের অন্তরে।" কিন্তু আমাদের কি সামান্যতম অন্তরশুদ্ধি হয়েছে? মর্তের মাটিতে তিনি স্বর্গরাজ্য স্থাপনার জন্য হৃদয়-রক্ত মোক্ষণ করে আত্মবলি দিয়ে গেছেন। আবিশ্ব সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কী সামান্যতম দায়িত্ব গ্রহণ করেছি? এই আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমাদের এইসব আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মুখোমুখি হতে হবে। খ্রীস্ট ছিলেন প্রেমের দেবতা। অথচ বর্তমান পৃথিবীতে শুধু স্বার্থ, লোভ-লালসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও হিংসায় উন্মত্ত আমরা প্রেম-প্রীতি, সহানুভূতি, ভালবাসাকে দূর করে দিয়েছি আমাদের জীবন থেকে। এই অপ্রেমের পৃথিবীতে আজকের বড়দিনের পুণ্যলগ্নে যদি আমরা সর্বত্র, সকলের কাছে তাঁর প্রেমের মঙ্গল-সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে পারি, যদি তাঁকে অনুসরণ করতে পারি আমাদের সকল কর্মে ও কথায় এবং শুধু প্রতিবেশীকে নয়—সকল মানুষকে সহানুভূতিতে, স্নেহে, ভালবাসায়, প্রীতিতে আপন করে নিতে পারি, তাহলেই আমাদের এই দেশ-দেশ-নন্দিত শুভ বড়দিন পালন সার্থক হবে। আমাদের সকলের জীবনে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক—সেই প্রত্যাশা বুকে নিয়ে আমরা কোজাগরী রাত্রি যাপন করব বড়দিনের পুণ্যলগ্নে।☐



আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সংঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় 'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আনন্দের বিষয় যে, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

একটি ১৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের ভিডিও ক্যাসেটে (PAL কিন্তু NTSC-তে পরিবর্তনযোগ্য) বর্তমান মিউজিয়াম, প্রস্তাবিত মিউজিয়াম ও সংরক্ষণশালার মডেল এবং বর্তমান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে। ক্যাসেটটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিউজিয়ামে এবং দেশ ও বিদেশের কয়েকটি কেন্দ্রে কিনতে পাওয়া যাবে।

স্বামী আত্মস্থানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া

ক্যাসেট সমালোচনা

ভক্তির আকুতি আছে, তবে গাওয়া উচ্চমানের হয়নি

স্বামী অনিমেষানন্দ

রামকৃষ্ণ জপরে মন—বেচুগোপাল দে। কথা ও সুরঃ অশোক চৌধুরী ও শিল্পী। বেটোভেন রেকর্ডস, হাওড়া। মূল্যঃ ২৮ টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ—ত্রয়ীর উৎস থেকে এই বাংলায় সংস্কৃতির যে একটি প্রবাহ চলেছে, সেই স্রোতস্বিনীর একটি নবতম তরঙ্গ 'রামকৃষ্ণ জপরে মন' ক্যাসেটটি। এই সংস্কৃতির ধারাকে সঠিক মাত্রায় বজায় রাখতে ক্যাসেটটির প্রকাশনার সঙ্গে সংযুক্ত প্রত্যেকেরই সামর্থ্য অনুযায়ী ভূমিকা পালনের জন্য সাধুবাদ প্রাপ্য।

একটি সংস্কৃত প্রণামমন্ত্র-সহ মোট এগারটি গানেরই শিল্পী বেচুগোপাল দে। এর মধ্যে পাঁচটি গানের কথা ও সুর শিল্পীর নিজের। বাকিগুলির গীতিকার ও সুরকার অশোক চৌধুরী। অশোক চৌধুরীর গীতরচনায় চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে আধ্যাত্মিক চরিত্রত্রয়ী সম্পর্কে গানগুলি রচিত হয়েছে, তাঁদের দিব্য জীবনের তত্ত্ব ও তথ্য বিষয়ে গীতিকারদ্বয়ের যথার্থ জ্ঞান বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। 'মোর হৃদয়-মন্দিরে', 'পরমা প্রকৃতি মা সারদামণি' গানগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও কয়েকটি গান কাব্যিক গুণসমৃদ্ধ।

গান গাওয়া প্রসঙ্গে বলতে হয়, গানগুলি যে উচ্চমানে গীত হয়েছে তা নয়। সঙ্গীতশিল্পীর মধ্যে অনেক দুর্বলতা আছে। প্রথমতঃ, উচ্চারণে যথেষ্ট জড়তা। দ্বিতীয়তঃ, নাসিকা-নিঃসৃত ধ্বনি বহুক্ষেত্রে প্রকট হয়ে শ্রুতিমধুরতা নষ্ট করেছে। তৃতীয়তঃ, স্বরক্ষেপণে কেমন যেন ক্লান্তির স্পর্শ বিদ্যমান। সেজন্য গানগুলি প্রত্যাশা অনুযায়ী আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু গায়কের কণ্ঠে যে ভক্তির আকুতি পরিস্ফুট হয়েছে তা অনেক দুর্বলতাকে কিছুটা ম্লান করতে সক্ষম হয়েছে এবং গানের আবেদনকে বৃদ্ধি করেছে।

ভৈরবী, মালকোষ, দেশ ইত্যাদি রাগনিবদ্ধ এবং কীর্তনাঙ্গ ও ভাটিয়ালির সুরগুলি শুনতে ভালই লাগে। যন্ত্রানুষঙ্গও খারাপ নয়, তবে গানগুলি অনেকক্ষেত্রে যন্ত্রানুষঙ্গের শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে। গানগুলি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। ক্যাসেটে সঙ্গীত পরিচালকের নাম উল্লেখ থাকলে ভাল হতো। শব্দগ্রহণের মান প্রশংসনীয় নয়—অনভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট।

ভক্তিগীতি শুধুই সঙ্গীত নয়, এপর্যায়ের গানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হলো ভক্তিরসের পরিবেশন। আধ্যাত্মিক ভাবের অনুধ্যানের জন্য ভক্তমন সঙ্গীতের আঙ্গিককে প্রাধান্য না দিয়ে ভক্তিরসসুধা পান করার উদ্দেশে ক্যাসেটটিকে গ্রহণ করবে, আশা করা যায়।

সুন্দর একটি স্তুতি-অর্ঘ্য

কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা স্তুতি অর্ঘ—শঙ্করপ্রসাদ সোম। গাথানি রেকর্ডস কোঃ, কলকাতা-৭০০ ০৭২। মূল্যঃ ২৮ টাকা।

সঙ্গীত-জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ-সঙ্গীতের জনপ্রিয় শিল্পী শঙ্করপ্রসাদ সোমের এই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা স্তুতি-অর্ঘ্যটি একটি প্রশংসনীয় পরিবেশনা। ক্যাসেটটিতে নয়টি গান আছে, তার সঙ্গে আছে কালজয়ী গান 'রামকৃষ্ণ শরণম্' এবং 'শ্রীসারদা-নামসঙ্কীর্তণম্'। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের কাছে এই গান ও স্তুতির হৃদয়গ্রাহিতা চিরন্তন। প্রাণের দরদে গানগুলি গেয়েছেন শিল্পী এবং কথা ও সুর সহযোগে প্রায় প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়। দু-একটি প্রচলিত এবং পরিচিত সুরসমৃদ্ধ এই ক্যাসেটটি শুনে ভক্তজনের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হবে, আশা করা যায়। দু-একটি গানের কোরাস অংশে সহগায়ক-গায়িকাদের পরিবেশন অবশ্য যথার্থ হয়নি। তাছাড়া 'অর্ঘ্য' বানানটি ক্যাসেট-শিরোনামে য-ফলাহীন হয়েছে। এই ভুল মারাত্মক। আশা করি, শিল্পী ভবিষ্যতে এগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবানুরাগী ভক্তবৃন্দ এই ক্যাসেটটি নিঃসন্দেহে সংগ্রহ করতে পারেন।□

বিজ্ঞপ্তি

'উদ্বোধন' পত্রিকায় উৎসবাদি বা পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ প্রকাশের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সেই সংবাদ আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো আবশ্যক। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

গত ১৭ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত বেলুড় মঠে সাড়ম্বরে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন, বিশেষ করে মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজার সময় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। পূজার ৩ দিন হাতে হাতে প্রায় ৫৪,০০০ ভক্তকে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। বেলুড় মঠ ছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আঁটপুর, আসানসোল, বারাসাত, মুম্বাই, কাঁথি, গুয়াহাটি, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদা, মেদিনীপুর, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর, কাশী অদ্বৈত আশ্রম এবং বিবেকনগর (আমতলী)।

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ৭ অক্টোবর '৯৬ পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ও পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী রামহরিপুর আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আশ্রমিক পরিবেশ, নিয়মশৃঙ্খলা এবং কর্মধারা দেখে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করেন। সমবেত ছাত্র, শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দের সামনে বক্তৃতায় তিনি বলেন: "রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ আছে।" আশ্রমের কাজের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ২৭ অক্টোবর এই আশ্রমে সারাদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল ধ্যান, ভজন এবং 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' ও স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও আলোচনা। স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী প্রমুক্তানন্দ, স্বামী অজরানন্দ এবং কয়েকজন ভক্ত-প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ স্বাগতভাষণ দান করেন।

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) গত ২৬-২৭ অক্টোবর '৯৬ আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে কৃতকার্যতা, উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতার ওপর দুদিনব্যাপী এক কর্মশালা সংগঠন করেছে। কর্মশালায় মোট ৫২৫ জন সদস্য যোগদান করেছিল।

উদ্বোধন

পাটনা আশ্রমের নবনির্মিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি গত ৬ অক্টোবর '৯৬ শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী আত্মস্থানন্দজী।

চিকিৎসা-শিবির

জামতাড়া মঠ (বিহার) গত ৬ অক্টোবর চিত্তরঞ্জনের রোটারী ক্লাবের সহযোগিতায় একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে মোট ২৮৩ জন রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়।

ত্রাণ

অন্ধ্রপ্রদেশ বন্যাত্রাণ

হায়দরাবাদ আশ্রমের মাধ্যমে কুড্ডাপ্পা জেলার কয়েকটি গ্রামে ২০০ বন্যাগ্রস্ত পরিবারকে ১০০০ কিলোঃ চাল, ১৩৭০ কিলোঃ রান্নাকরা খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

মালদা আশ্রমের মাধ্যমে গোপালপুর, কালিন্দী প্রভৃতি ২৭টি গ্রামে ২৯৬০টি বন্যাকবলিত পরিবারকে ১৫০০ শাড়ি, ১৫০০ চাদর, ৫০০ ধুতি, ১০০০ লুঙ্গি, ৫৯৭টি ভেস্ট, ১২৫টি হাফপ্যান্ট, ১৩,০৯৫টি ব্যবহৃত পোশাক এবং ৩০০ লণ্ঠন বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া আশ্রম ২৫০ কিলোঃ গুঁড়ো বিস্কুট ও ৩৮,০০০ জল-পরিশোধক বড়ি দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

সারদাপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন (জেলা—হাওড়া) হাওড়া জেলার রাজারপুর, বারগাছিয়া প্রভৃতি ৫টি গ্রামে ৭ দিন ধরে প্রত্যহ বন্যাগ্রস্ত প্রায় ৩০০০ মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেছে।

দুঃস্থ-ত্রাণ

বেলুড় মঠের মাধ্যমে হাওড়া জেলার নেতাজী কলোনীতে ৩৯০ জন বালক এবং ৪০০ জন বালিকাকে মোট ১৫৮০টি পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

রাজকোট আশ্রম (গুজরাট) পাঁচমহল জেলার নিমাক ও জাম্বুয়া গ্রামে দুদিন ধরে ৬০০ জন আদিবাসীকে রান্নাকরা ও শুকনো খাবার বিতরণ করেছে। এছাড়া পূর্বপ্রদত্ত সেলাই মেশিনের সাহায্যে যাতে তারা নিজেরা পোশাক তৈরি করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে কাপড় দেওয়া হয়েছে।

জয়পুর আশ্রম (রাজস্থান) ভরতপুর জেলার ১৫টি গ্রামে ৭৯০টি আদিবাসী পরিবারকে ৫০০ ধুতি, ৫০০ শাড়ি ও ৫০০ চাদর বিতরণ করেছে।

পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্র

লাতুরে পুনর্বাসনের পর 'বিবেকানন্দ গ্রামবিকাশ প্রকল্প'-এর মাধ্যমে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—বৃক্ষরোপণ, পশুখাদ্য উৎপাদন, স্বাস্থ্যপ্রকল্প ইত্যাদি। কাওয়ালি গ্রামের যুবকদের সাহায্যে একটি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বহির্ভারত

বেদান্ত সোসাইটি অব স্যাক্রামেন্টো (আমেরিকা): গত অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও চারটি রবিবার সকালে বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার ও শনিবার সন্ধ্যায় যথাক্রমে বেদান্তশাস্ত্র ও বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিস্কো (আমেরিকা) ঃ গত নভেম্বর মাসের রবিবার ও বুধবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক শনিবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়েছে। ১০ তারিখে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড (আমেরিকা) ঃ গত নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ ছাড়াও শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা) ঃ গত নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ হয়েছে। প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার যথাক্রমে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও 'দ্য গস্পেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ' আলোচিত হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব সেন্ট লুইস (আমেরিকা) ঃ গত নভেম্বর মাসের রবিবারগুলিতে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ হয়েছে। মঙ্গলবার সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারঃ এবং বৃহস্পতিবার 'গস্পেল অব দ্য হোলি মাদার' পাঠ ও আলোচনা হয়েছে।

বেদান্ত সোসাইটি অব টরন্টো (আমেরিকা) ঃ গত নভেম্বর মাসের প্রতি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনাদি হয়েছে। ৯ তারিখে স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ ও আলোচনা এবং শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন (বাংলাদেশ) ঃ গত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব আব্দুর রজ্জাক, জনাব মহম্মদ নাসিম, মৌলানা মহম্মদ নুরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিগণ, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের হাইকমিশনার এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আশ্রমে এসেছিলেন।

দেহত্যাগ

স্বামী ভাষ্যানন্দ (বসন্ত) গত ৪ অক্টোবর '৯৬ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সকাল ৯টায় শিকাগোর ডক্টর্স হসপিটালে দেহত্যাগ করেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ১ অক্টোবর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। দেহত্যাগের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর আশ্রমে যোগদান করেন। পরে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাস লাভ করেন। পূজনীয় মহারাজ গোলপার্কের ইনস্টিটিউট অব কালচারে দুবছর (১৯৬২-১৯৬৪) কর্মী হিসেবে থাকার পর নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে সহাধ্যক্ষ হিসাবে প্রেরিত হন। তার এক বছর পরে তিনি শিকাগো বিবেকানন্দ-বেদান্ত সোসাইটি কেন্দ্রের প্রধান হন। আমৃত্যু তিনি ঐ পদে ছিলেন। ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে শিকাগো কেন্দ্র এবং গ্যাঞ্জেস টাউনে সাধনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় তাঁর নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক বেদান্ত-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী **শ্রীমৎ স্বামী অশেষানন্দজী মহারাজ (কিরণ মহারাজ)** গত ১৬ অক্টোবর '৯৬ সকাল ৯টা ১০ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার পোর্টল্যান্ড কেন্দ্রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচর্য প্রাপ্ত হন এবং পরের বছর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ মহারাজের একান্ত ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম এবং মাদ্রাজ স্টুডেন্টস হোমের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে মঠ-কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজের সহায়করূপে প্রেরণ করেন। এছাড়া তিনি বস্টনে কয়েক মাস এবং হলিউডে পাঁচ বছর সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে বেদান্ত সোসাইটি অব পোর্টল্যান্ড কেন্দ্রে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। এই পদে তিনি আমৃত্যু কাজ করেছেন। পূজনীয় মহারাজ বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছেন। তিনি ছিলেন সুলেখক ও গ্রন্থ-রচয়িতা। 'Glimpses of Great Soul—A Potrait of Swami Saradananda' গ্রন্থটি তাঁর রচিত। 'Vedanta for East and West' পত্রিকায় তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারে তিনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। এই কাজে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২২ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ ও ২৪ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ ও স্বামী বিনির্মলানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা যথারীতি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।☐

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলকাতা-৭০০ ০০৬) গত ২৭ মে '৯৬ সোসাইটি-ভবনে 'ইন্দ্রনারায়ণ ও বিভাবতী মিত্র' স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ভারতবর্ষ'। সভান্তে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহিত মুখোপাধ্যায়। গত ৩০ মে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সোসাইটির সম্পাদক দীপ্তিকুমার শীল 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন, পরে স্বামীজীর কণ্ঠে গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই 'নিতাইচন্দ্র রায় স্মারক বক্তৃতা'টিও প্রদান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীমা সারদাদেবী'। গত ৩০ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন 'জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন দীপ্তিকুমার শীল। আলোচনান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দেবাশিস দত্ত।

বিবেকানন্দ স্মরণম্‌-এ (যোগেন্দ্রনগর, হালতু, কলকাতা-৭০০ ০৭৮) গত ৯ জুন '৯৬ স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বৈদিক স্তোত্রপাঠের পর 'আজকের সমাজজীবনে সার্বিক ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ-চর্চার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মলকুমার রায়। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পি. সি. রায় সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম সম্পাদক দীনেন্দ্র মারিক। অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এদিন একটি পাক্ষিক ইংরেজী পত্রিকা 'দ্য কন্সাসনেস' প্রকাশ করা হয়। সভার শেষে ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম-এ (কাসুন্দিয়া, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৬ জুন '৯৬ 'তারাপদ বসু পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সভার সভাপতি আঁটপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাতে উক্ত পুরস্কারটি অর্পণ করেন। প্রখ্যাত সারস্বত-ব্যক্তিত্ব ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিত্ব ও সাহিত্য-কৃতি বিষয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন এবং 'তারাপদ বসু' পুরস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন আশ্রম-সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ। তারপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন অমিত ঘোষ ও অসীম দত্ত।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের (রামকৃষ্ণপুর, বেলতলা পার্ক, জেলা—দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ১৮ জুন '৯৬ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে একটি আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে শ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। সভাপতিত্ব করেন আশ্রম-সভাপতি অধ্যাপক অরুণকান্তি নিয়োগী এবং সভার শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন ও স্বাগতভাষণ দান করেন যথাক্রমে সমীর চৌধুরী ও মোহিনীমোহন রায়। আলোচনায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে বহু শিক্ষাবিদ্‌, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ (গড়িয়া, কলকাতা-৭০০ ০৮৪) গত ২৩ জুন '৯৬ কবীরদাসজীর জন্মদিন উপলক্ষে 'সাধুসঙ্গ' বিষয়ে আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য সাধু-সজ্জনের জীবনাদর্শ অবলম্বনে ও বহু দৃষ্টান্ত-সহায়ে বিষয়টির সরল ও মর্মস্পর্শী আলোচনা করেন। তিনি সংঘ-প্রদত্ত কিছু পাঠ্যপুস্তক স্থানীয় বিদ্যালয়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

পাটুলি শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (কলকাতা-৭০০ ০৮৪) গত ২৩ জুন '৯৬ চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবে অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল—সকালে বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' পাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ এবং বিকেলে ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ও গীতি-আলেখ্য। সকালের অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। বৈকালিক অনুষ্ঠানে করেন প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা। ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও সোনালী দাস এবং প্রতাপ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসংঘ (গোয়াবাগান, কলকাতা-৭০০ ০০৬) গত ২ জুলাই '৯৬ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ-সভার আয়োজন করে। সভায় 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা। সভার সভাপতি নির্মাল্য বসু সভাশেষে ৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে প্রায় ৭০০০ টাকার পাঠ্যপুস্তক, খাতা-কলম প্রভৃতি বিতরণ করেন। বিশেষ উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বৈদিক শান্তিমন্ত্র—"সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌" দিয়ে শুরু হয় এবং তারপর স্বামীজী বিষয়ক গান, স্বামীজীর রচিত কবিতা আবৃত্তি এবং 'স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা' প্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়। বক্তব্য রাখেন ডঃ কমল নন্দী প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষাবিদ্‌। সভাপতিত্ব ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সূর্যকুমার সিংহ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ (কল্যাণী, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩ জুলাই '৯৬ ছাত্র-যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সকালের অধিবেশনে 'স্বামীজী আমার জীবনের আদর্শ' প্রসঙ্গে আলোচনা এবং বিকেলের অধিবেশনে 'স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবন' বিষয়ে প্রশ্নোত্তর-সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের স্বামী যোগস্বরূপানন্দ। স্থানীয় স্কুল-কলেজ থেকে সম্মেলনে প্রায় ৯০

জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। যোগদানকারী সকল ছাত্রছাত্রীকে স্বামীজীর ফটো প্রদান করা হয়।

গত ১৭ জুলাই '৯৬ পুণ্য রথযাত্রার দিন সকাল ৯টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শধন্য বাগবাজারের (বর্তমান ৪৭বি বোসপাড়া লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩) জীবনকৃষ্ণ ভৌমিকের গৃহে একটি মর্মরফলক উদ্বোধন করেন 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সম্ভবতঃ বাগবাজারের দীননাথ বসুর এই গৃহেই (তখন ৪০ নং বোসপাড়া লেনের 'বাঘওয়ালা বাড়ি') ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে উত্তর কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম পদার্পণ ঘটেছিল। সভায় বাগবাজারের পৌরপিতা সলিলকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ভাষণ দান করেন। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বেলুড়ের শিল্পী গীতি অঞ্জলি গোষ্ঠী।

খড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ জুলাই '৯৬ ভিত্তি-স্থাপন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও সাধুনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আপ্তকামানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রায় ১৫ জন সন্ন্যাসী এবং তিন সহস্রাধিক ভক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংঘ (বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৭) গত ২১ জুলাই '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংঘ-সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা প্রজ্ঞামাতার পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনাদর্শের আলোচনা, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা, গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ভজন পরিবেশন করেন সংঘের সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী ও শিক্ষিকাবৃন্দ। বহু ভক্তের উপস্থিতিতে সম্মেলনটি সারাদিনব্যাপী জপ, ধ্যান, পাঠ, আলোচনা ও ভজনের মধ্য দিয়ে বিশেষ আকর্ষণীয় ও প্রেরণাপ্রদ হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম (বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা) গত ২৩ জুলাই রামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ত্রিপুরার বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুমেধানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী বিভাকরানন্দ, স্বামী নিয়তাত্মানন্দ, ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক হরিলাল পোদ্দার এবং কো-অর্ডিনেটর শশধর দেবনাথ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে পাঠ ও আলোচনা করেন। এছাড়া জপ, ধ্যান ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনে মোট ৫০ জন ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংঘ (মালঞ্চ, বীজপুর, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৩০ জুলাই গুরুপূর্ণিমা উৎসব শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম এবং আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় বক্তব্য রাখেন রহড়া মিশনের স্বামী অম্বিকেশানন্দ। বক্তৃতাদানের পর তিনি বহু দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করেন। সন্ধ্যারতির পর 'পঞ্চতপা শিল্পিগোষ্ঠী' কর্তৃক 'শ্রীশ্রীগুরুপ্রণাম' গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসংঘে (পালপাড়া, চন্দননগর, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) সংঘপ্রতিষ্ঠার ৩০ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে গুরুপূর্ণিমার দিন বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—প্রভাতফেরি, বৈদিক স্তোত্র, গুরুগীতা ও 'কথামৃত' পাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা ও হোম। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। সভায় ভাষণদান করেন সারদাপীঠের সহকারী সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ। এদিন তিনি সংঘের বার্ষিক মুখপত্র 'শাশ্বত' প্রকাশ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘ (দমদম, কলকাতা-২৪) গত ১-৪ সেপ্টেম্বর '৯৬ চারদিন ধরে সংঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন। ভক্তিগীতি ও রামায়ণ গান পরিবেশন করেন যথাক্রমে শঙ্করপ্রসাদ সোম, নিখিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রহড়া কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দ। শেষ তিনদিন চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রানুষ্ঠান পরিচালনা করে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনশিক্ষামন্দির। চতুর্থদিনের দুপুরে ২৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শঙ্করপ্রসাদ সোম ও স্বপন মণ্ডল।

স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি (দুর্গাপুর, জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) ঃ গত ১-২ সেপ্টেম্বর '৯৬ বার্ষিক উৎসব পালন করে। প্রথমদিন সকালে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম। দুপুরে প্রায় ১০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দের পৌরোহিত্যে স্বামী সুমনসানন্দ ও স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ওপর ভাষণ দেন। দ্বিতীয়দিন যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন স্বামী ওঙ্কারাত্মানন্দ ও স্বামী সুমনসানন্দ। সম্মেলনে ১৫০ যুবক-যুবতী ছাড়াও বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (সান্ডেলের বিল, হিঙ্গলগঞ্জ, জেলা—উত্তর ২৪ পরগনা) গত ৪ সেপ্টেম্বর '৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বিষয় ছিল—বৈদিক স্তোত্রপাঠ, সমবেত জপ-ধ্যান, প্রার্থনা ও ভজন, 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও আলোচনা।

ধর্মপ্রসঙ্গ ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রহড়া বালকাশ্রমের স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দ। সম্মেলনে প্রায় ১৫০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ (হামিরপুর, রাউরকেলা, উড়িষ্যা) গত ৩০ জুলাই '৯৬ গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় বিষয় ছিল—সকালে বেদপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম, দুপুরে প্রসাদ-বিতরণ এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের পর শুরু হয় সান্ধ্য ধর্মসভা। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কাশী সেবাশ্রমের স্বামী শ্রীশানন্দ ও জামশেদপুরের স্বামী নটরাজানন্দ এবং সভাপতিত্ব করেন জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ। অনুষ্ঠানে শতাধিক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। গত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর সংঘের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দান করেন ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী অখিলাত্মানন্দ ও পুরী রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নিগমাত্মানন্দ। পরে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গোপেন চক্রবর্তী ও অজিত ভট্টাচার্য। এদিন সংঘের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ। ২৯ তারিখে ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মহারাজজী সম্মেলনটির শুভ উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে ছিল—জপ-ধ্যান, ভজন, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, ধর্মপ্রসঙ্গ এবং প্রশ্নোত্তরের আসর। ধর্মপ্রসঙ্গ করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ এবং স্বামী মুক্তিকামানন্দ। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে বিজনকুমার মজুমদার, দীপিকা সেন ও অরুণকুমার রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, ছবি দাস, গোপেন চক্রবর্তী ও অজিত ভট্টাচার্য। সংঘের সহসভাপতি ভরতভূষণ স্বাগতভাষণ দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনে প্রায় ২০০ জন ভক্ত যোগদান করেছিল। ৩০ তারিখ সকালে অনুষ্ঠিত বিষয়ের মধ্যে ছিল দীক্ষানুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় ধর্মসভা। সান্ধ্য সভায় শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের পৌরোহিত্যে বক্তব্য রাখেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, স্বামী অখিলাত্মানন্দ, স্বামী নিগমাত্মানন্দ এবং রাউরকেলার এ. ডি. এম. মিঃ এন. পি. দাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ-সভাপতি নরেশচন্দ্র নায়েক।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা গৌরী চক্রবর্তী গত ১৭ জুন '৯৬ সকাল ৬টা ১০ মিনিটে লেক টাউন কালিন্দী হাউজিং-এর নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি দমদম টেলিফোন অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত এবং স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীপ্রচার সংঘের একজন একনিষ্ঠা কর্মী ছিলেন। কর্তব্যপরায়ণতা ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের কাছে প্রিয়ভাজন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বাগবাজার স্ট্রীট নিবাসী গৌতম সেন গত ১৭ জুন '৯৬ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর। প্রয়াত সেন ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং কারিগরী শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের মালদা জেলাস্থ আর্সেনিক অঞ্চলে জলসরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বাস্তুকার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বাগবাজার থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সকাল ৮.৩৫ মিনিটে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ও এক বিবাহিতা ভগিনী বর্তমান। তাঁরা সকলেই বেলুড় মঠে দীক্ষিত। তাঁর বাবা তারাকুমার সেন সস্ত্রীক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহক। তাঁরা উভয়েই প্রত্যহ সকালে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে মাতৃদর্শনে আসেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে একদিনের জন্যও তা বন্ধ রাখেননি। প্রয়াত গৌতম সেনের স্ত্রী-কন্যাও এই দুর্ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতি তাঁদের শরণাগতিকে নিবিড়ভাবে আশ্রয় করে রয়েছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য প্রদীপকুমার দে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৫ জুন '৯৬ সকাল সাড়ে ৮টায় পরলোকগমন করেছেন। তিনি মেঘালয় সরকারের পূর্ত বিভাগের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা বিজনবালা রায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১২ জুন '৯৬ বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে বাঁকুড়াস্থিত নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৭৪ বছর বয়স্কা ভক্তিমতী বিজনবালাদেবী কঠোর পরিশ্রমী এবং সকলের প্রতি স্নেহ ও সেবা-পরায়ণা ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এরও নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ বৈদ্যনাথ রায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৫ জুন '৯৬ সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে এলাহাবাদস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। ৭৫ বছর বয়স্ক প্রয়াত ডাঃ রায় রামকৃষ্ণ মিশনের এলাহাবাদ মঠের চিকিৎসা বিভাগে দীর্ঘদিন স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সুমধুর ব্যবহার এবং সাধুপ্রীতির জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন গ্রাহকও ছিলেন।□

সারা বিশ্বের আসন্ন সঙ্কট : সংক্রামক রোগ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে সতর্ক করে দিয়েছে—যেসব সংক্রামক রোগ এখন অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, সেগুলি দিন দিন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধকে প্রতিহত করার ক্ষমতা (antibiotic resistance) আরও বেশি করে অর্জন করছে। ইউনাইটেড নেশন্স কর্তৃপক্ষ ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রোগগুলি—যেগুলি জনপ্রতি এক ডলার মাত্র খরচে ভাল হয়ে যাওয়ার কথা—ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ফিরে আসছে বলে আরও অর্থলগ্নীর জন্য আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তার 'ওয়ার্লড হেল্থ রিপোর্ট : ১৯৯৬'-এ বলেছে যে, গত বিশ বছরে এইডস, ইবোলা ভাইরাস (এটি আফ্রিকার জেয়ারি দেশে ১৯৭৬ সালে প্রথম দেখা দেয়) সহ অন্ততঃ ৩০টি নতুন সংক্রামক রোগ আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, "গত বছরে বিশ্বে, প্রধানতঃ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সংক্রামক রোগে মারা গেছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক। এই সংখ্যা সারা পৃথিবীতে সবরকম অসুখে মৃত জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল হিরোশি নাকাজিমা বলেছেন : "বিশ্বব্যাপী সংক্রামক রোগের সঙ্কটের কিনারায় আমরা পৌঁছেছি।"

পৃথিবীর কোন দেশেরই সংক্রামক রোগ থেকে উদ্ধার নেই। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেশির ভাগ সংক্রামক রোগের সমাধান ছিল অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ; কিন্তু এদের রোগ-প্রতিহত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য আজ আর সে-অবস্থা নেই। এই রিপোর্ট প্রকাশ করার সময় একজন জাপানি বিশেষজ্ঞ বলেছেন : "নতুন নতুন ওষুধগুলির এত দাম যে, সেগুলি সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। ওষুধ-প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছে—কি করে সারা বিশ্বের লোক এগুলি পায়, তবে কাজটি কঠিন।" বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলি অস্বাস্থ্যের শিকার হয়েই থাকবে। গত বছর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ মৃত ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে ৯০ লক্ষ মারা গেছে সংক্রামক রোগে। ১৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত দশকে নতুন ওষুধ আবিষ্কার কমে যাওয়ার সঙ্গে নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের রোগ-প্রতিহত করার ক্ষমতা। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের অবাধ ও অ-যথোচিত ব্যবহার যে এইরকম অবস্থা হওয়ার প্রধান কারণ—এরূপ ভাববার জোরালো সাক্ষ্য রয়েছে। অসংখ্য লোক ওষুধগুলি ব্যবহার করছে ভ্রান্ত সংক্রমণে, ভ্রান্ত মাত্রায় এবং ভ্রান্ত সময়ব্যাপী। এবিষয়ে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই অসহায়। এইসব ওষুধ আবিষ্কারের পিছনে কোটি কোটি ডলার খরচ হয়েছে, তারপর ওষুধগুলি বাজারে আসতে লেগেছে প্রায় ১০ বছর, কিন্তু এদের কার্যকারিতা থাকছে অত্যন্ত সীমিত সময়।

রোগজীবাণুরা এখন এমন একটা পরিবেশ পাচ্ছে যেখানে মানুষের জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের ছড়াছড়ি। এখন গবাদি পশুদের অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া হয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশে খোলা বাজারে এই ওষুধ পাওয়া যায় এবং সেইসব ওষুধের মধ্যে অনেকগুলিই আবার নকল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর জেনারেল র‍্যাল্ফ হেন্ডারসন বলেছেন : "এই নবজাত ওষুধ-প্রতিহতকারী জীবাণুগুলি একটি নতুন ধরনের প্রাণী এবং আগামী শতাব্দীতে এরাই হবে একটি বড় ধরনের অভিশাপ।" আন্তর্জাতিক ভ্রমণ মানুষের রোগের প্রসার বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনো বছরে ৫ কোটি লোকের ম্যালেরিয়া হয় এবং ২০ লক্ষ লোকের এই রোগে মৃত্যু হয় (প্রধানতঃ আফ্রিকায়)। গত বছর ৪০ লক্ষ শিশু-সহ ৪৪ লক্ষ লোকের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে (যেমন নিউমোনিয়া) মৃত্যু হয়েছে। কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক রোগে গতবছর মারা গেছে ৩১ লক্ষ লোক, যাদের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে ৫ বছরের কম বয়সের শিশু। এদের ৭০ শতাংশের সংক্রমণ খাদ্যের মাধ্যমে হয়েছে। বছরে ৩০ লক্ষ মারা যায় যক্ষ্মায়। এই সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে : "এই বিশাল সংখ্যা বিশ্বের আত্মপ্রসাদের মাশুল।" পৃথিবীর এই দুরবস্থাকে আরও শোচনীয় করতে "যক্ষ্মা এইডস রোগের সঙ্গে একটা অংশীদার হয়েছে।" এইডস-রোগীর অনেকেই মারা যায় যক্ষ্মা রোগে। বর্তমানে ২ কোটি লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত এবং এদের ৪৫ লক্ষ এইডস-রোগী। গত বছর ১০ লক্ষ লোক এই রোগে মারা গেছে। "বয়স্কদের মধ্যে—ইউনাইটেড স্টেটস, আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলের দেশগুলি এবং ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের শহরগুলিতে মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এইডস।"

[Pharma Pulse, May 23, 1996, p. 7]☐

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র,
আটানব্বই বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে
প্রকাশিত দেশীয় ভাষায়
ভারতের প্রাচীনতম
সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

৯৮তম বর্ষ

মাঘ ১৪০২ থেকে পৌষ ১৪০৩
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬

সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ছাপ্পান্ন টাকা ☐ সডাক : ছেষট্টি টাকা ☐ প্রতি সংখ্যা : আট টাকা ☐ শারদীয়া সংখ্যা : ছত্রিশ টাকা

উদ্বোধন

৯৮তম বর্ষ

মাঘ ১৪০২ থেকে পৌষ ১৪০৩/জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬

বর্ষসূচী

মেলেনী পুজো ও তার গান—৬২২; শ্রীজগন্নাথ ও নবকলেবর—৬২২; শিকাগোর অনুভূতি—৬৮১; প্রসঙ্গ : দিগ্বিজয়ী স্বামীজীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষপূর্তি—৬৮২; 'উদ্বোধন' শারদীয়া ১৪০৩—৬৮২

চিরন্তনী (শিশু ও কিশোর বিভাগ)
মদালসা ☐ কথা : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত—৩৫, ৭৯
শিবিরাজার উপাখ্যান ☐ কথা : ভগিনী নিবেদিতা, চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত—১২৫, ১৭৭, ২৩৯, ২৯৫
ধ্রুবের উপাখ্যান ☐ কথা : ভগিনী নিবেদিতা, চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত—৩৪৩, ৩৭৯, ৫৬৯, ৬৩৫, ৬৬৭
শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী ☐ কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত, চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত—৪৭৩

শিক্ষা-সংস্কৃতি ☐ বিবেকানন্দ-গবেষণায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টরেট অব লিটারেচার' (ডি. লিট.) প্রদান—২৬০, উচ্চশিক্ষার স্তরে বিবেকানন্দ-চর্চা প্রসারিত হচ্ছে—২৬০, সারদাদেবী-গবেষণায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ফিলজফি' (পিএইচ. ডি.') ডিগ্রি—৫৪৭, রামকৃষ্ণ-গবেষণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ফিলজফি' (পিএইচ. ডি.') ডিগ্রি—৫৪৭, মালদহে মিলেছে নবম শতকের বৌদ্ধবিহারের সন্ধান—৫৪৭

বিজ্ঞান-সংবাদ ☐ স্বর্ণসন্ধানে—১৫৬; মানুষের দেহে জন্তুর দেহাঙ্গ প্রতিস্থাপন কি নিরাপদ?—২০৮; মনুষ্যদেহে জন্তুর দেহাংশ প্রতিস্থাপন সাফল্যের পথে—৩১২; প্রস্রাব-চিকিৎসা—৩৬৪; পাকস্থলীতে ঘা বন্ধ করার টিকা—৪১৬; সারা বিশ্বের আসন্ন সঙ্কট : সংক্রামক রোগ—৬৯৬

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ☐ ধূমপান 'অভ্যাস' না 'নেশা'—৫৪৮, ঔষধ আবিষ্কারের জন্য কেরালার উপজাতিকে রাজ্য-অনুদান—৫৪৮, 'কনজাঙ্কটিভাইটিস' ('জয় বাংলা') প্রতিরোধে করণীয়—৫৪৩, লবঙ্গ—৬৫২

গ্রন্থ-পরিচয় ☐ অরিন্দম দাস ☐ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সম্পর্কে দুটি পুস্তিকা—২৫৪; কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ পঞ্চকেদার দর্শন—৬৪৬; চিন্ময়প্রসন্ন ঘোষ ☐ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দ ও মার্কস—৪৮, আচার্যবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ—৯৮; স্বামী চৈতন্যানন্দ ☐ চিরসুন্দর হিমালয়—২৫৩; জীবন মুখোপাধ্যায় ☐ শিক্ষাপ্রসঙ্গে—২০১, যুগপ্রবর্তকদের পদপ্রান্তে—৪০৯; তাপস বসু ☐ মন্দিরময় দক্ষিণ ভারত—২৫৩, পুণ্যতীর্থের অমেয় বাণী—৬৪৫; তারকনাথ ঘোষ ☐ ভাগবতী কথা—১৫০; নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ☐ কালের সেতু—২০১; পলাশ মিত্র ☐ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন গ্রন্থ—২০২, ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন-প্রসঙ্গ—৩০৭; স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ☐ সার্থক অনুবাদ এমনই হওয়া উচিত—৩৫৮; বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ☐ টি. এস. এলিয়ট ও আমরা—৩৫৯; স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ ☐ শ্রেয়োলাভের অন্যতম পথ : স্বধর্মপালন—১৪৯, বেদান্তগ্রন্থের প্রয়োজনীয় সম্পাদনা—৫৯৬; রমা চক্রবর্তী ☐ রামকৃষ্ণ-অনুধ্যান—৪০৯, সাধকের জীবন ও সঙ্কল্প—৪১০; শঙ্করীপ্রসাদ বসু ☐ ভাব ও রূপের দেবতা বিবেকানন্দের চিত্রমালা—৫৩৮; শান্তি সিংহ ☐ পূর্ণ মানবত্ব প্রসঙ্গে—৯৯, প্রসঙ্গ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—৫৯৫, মনের ঐশ্বর্য—৬৪৫; সচ্চিদানন্দ কর ☐ মহাজীবনের কথা—২৫৩; সচ্চিদানন্দ ধর ☐ সারদাকথা অমৃতসমান—৩০৬, মননে বিবেকানন্দ—৩০৬

স্মরণিকা-সমালোচনা ☐ অরিন্দম দাস ☐ বালকাশ্রমের বাণীবাহক—২৫৫

ক্যাসেট সমালোচনা ☐ স্বামী অনিমেষানন্দ ☐ ভক্তির আকুতি আছে, তবে গাওয়া উচ্চমানের হয়নি—৬৯০; কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ সুন্দর একটি স্তুতি-অর্ঘ্য—৬৯০

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ☐ ৪৯, ১০০, ১৫১, ২০৩, ২৫৬, ৩০৮, ৩৬০, ৪১১, ৫৪১, ৫৯৭, ৬৪৭, ৬৯১

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ☐ ৫০, ১০২, ১৫৩, ২০৫, ২৫৭, ৩০৯, ৩৬১, ৪১২, ৫৪৩, ৫৯৭, ৬৪৮, ৬৯২

বিবিধ সংবাদ ☐ ৫১, ১০৩, ১৫৪, ২০৬, ২৫৮, ৩১০, ৩৬২, ৪১৩, ৫৪৪, ৫৯৮, ৬৪৯, ৬৯৩

প্রচ্ছদ ☐ ৪, ৭৩, ১৬২, ২১৪, ২৮৭, ৩৭১, ৪১৬ (খ), ৬৫৮

বিজ্ঞপ্তি ☐ ১৫৫, ২০৭, ৫৯৬, ৬৯০

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসুশ্রী প্রেস থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০০৯
লেসারে অক্ষরবিন্যাস : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার, কলকাতা-৭০০ ০০৯

